পাঁচটি উপন্যাস

না স রী ন জা হা ন

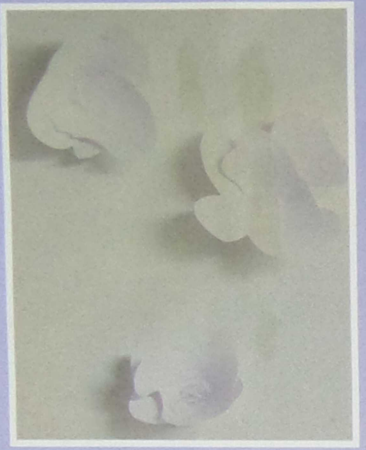

নাসরীন জাহানের বিভিন্ন ধরনের উপন্যাস থেকে বাছাই করে পাঁচটি ভিন্নধর্মী উপন্যাস এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 'উড়ুক্কু' নাসরীন জাহানের প্রথম উপন্যাস। অসম্ভব ডিটেইল ফর্মে লেখা এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র নীনা, বাস্তব এবং স্বপ্নের সাথে এমনই এক জীবনযুদ্ধরত নারী, যে স্বামীকে ডিভোর্স করে, সদ্যভূমিষ্ঠ সন্তানের মৃত্যুতে কাতর হয়, তার মায়ের প্রেমিকের ব্যক্তিত্বের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়েও মাথা উঁচু করে শেষ আলোটা দেখতে চায়।

'সোনালি মুখোশ' উপন্যাসের নিশি আবার পলায়নবাদী। সে নিজেকে ভয় থেকে বাঁচাতে একের পর এক মিথ্যের বহুবর্ণ জটে জড়াতে থেকে এমন ফাঁদে আটকে যায়, এক সময় এক বিশাল শূন্যতায় নিজেকে সে আবিষ্কার করে। এই উপন্যাসের আরেক বোহেমিয়ান প্রধান চরিত্র জাহিদ জীবনের স্রোতে চলতে চলতে শেষপর্যন্ত আর পরিণতি খুঁজে পায় না।

'চন্দ্রলেখার জাদুবিস্তার' বলা যায় জাদুবাস্তবতাধর্মী উপন্যাস। যেখানে একজন প্রতিকী রানী স্বৈরশাসক খোঁপার নিচে সাপ রেখে অঞ্চলবাসীর ওপর বিস্তার করে নির্মম শাসনের ধূম্রজাল।

'স্বর্গলোকের ঘোড়া'— প্রথাভঙ্গ ধারার এই উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র নন্দিনী, তার কৈশোর জীবনে দেহে পাক আর্মিদের গেঁথে দেয়া ক্রুশচিহ্নের দহন থেকে 'মিস্টার এম'কে বলে যায় একের পর এক কাহিনী। সব শেষে সে গিয়ে দাঁড়ায় তার জীবনের প্রথম পুরুষ, যে ভাস্কর, তার সামনে, যে তাকে ডানাওয়ালা ঘোড়ায় চড়িয়ে স্বর্গলোকে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখিয়েছিল।

'ক্রুশকাঠে কন্যা' উপন্যাসের নীলুফার গার্মেন্টস কর্মী, ক্লিস্ট, বিপন্ন মেয়েদের মধ্য থেকে অসহনীয় অবস্থায়ও রঞ্জন নামের এক স্বপ্নবাজ পুরুষের প্রেমস্বপ্নে জ্বলে, পূর্ণিমার দাউদাউ অগ্নিতে ছিঁড়তে ছিঁড়তে ঘুড্ডি অথবা মৃত্তিকা, দুটোই খামচে দাঁড়ায়।

প্রতিটি উপন্যাসেই এই সমাজের আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক দৈন্যের মধ্যে পুরুষ এবং নারীর চরিত্র প্রায় সমান গুরুত্বের সাথে এসেছে।

পাঁচটি উপন্যাস

পাঁচটি উপন্যাস

নাসরীন জাহান

অন্যপ্রকাশ

প্রথম প্রকাশ | একুশের বইমেলা ২০০৩

প্রচ্ছদ | মাসুম রহমান

© | অর্চি অতন্দ্রিলা

প্রকাশক | মাজহারুল ইসলাম
অন্যপ্রকাশ
৩৮/২-খ, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৬৬৪২৬০, ৯৬৬৪৬৮০
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯৬৬৪৬৮১

১ কম্পিউটার কম্পোজ | পজিট্রন কম্পিউটার্স
৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা

মুদ্রণ | কালারলাইন প্রিন্টার্স
৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা
ফোন: ৯৬৬৪৬৮০

মূল্য | ৫০০ টাকা

Panchti Upanyash | By Nasreen Jahan
Published by Mazharul Islam, Anyaprokash
Cover Design : Masum Rahman
Price : Tk 500 only
ISBN : 984 868 245 7

উৎসর্গ

শঙ্খ ঘোষ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমার লেখার প্রতি আন্তরিক অনুভূতির জন্য
আমি যাঁদের কাছে গভীরভাবে ঋণী।

অ ন্য প্র কা শ
প্রকাশিত
লেখকের অন্যান্য বই

উ প ন্যা স

শঙ্খনর্তকী
কমলাসুন্দরী আর এক সন্ধ্যার কাহিনী
নিকুন্তিলা
লি
ক্রুশকাঠে কন্যা
উড়ে যায় নিশিপক্ষী
মেঘের সোনালি চুল
স্বর্গলোকের ঘোড়া
উপন্যাস সমগ্র-১

গ ল্প

পাখি তুমি সেদিন রাতে কাঁদছিলে কেন
সম্ভ্রম যখন অশ্লীল হয়ে ওঠে
কাঠপেঁচা
গল্প সমগ্র-১
নির্বাচিত গল্প
দুই বাংলার ৫০ বছরের প্রেমের গল্প (সম্পাদনা)

ক লা ম

নারীর প্রেম তার বিচিত্র অনুভব

শি শু - কি শো র গ্র ন্থ

স্বপ্নবুড়ির সোনার কাঠি

সূচি

উড্ডুক্কু ০৯

সোনালি মুখোশ ২৪৩

চন্দ্রলেখার জাদুবিস্তার ৪৮৯

স্বর্গলোকের ঘোড়া ৫৪৭

ক্রুশকাঠে কন্যা ৬১৩

উড়ুক্কু

বাড়িটা যখন খুঁজে পেলাম, দিনের আলো তখন ফুরিয়ে এসেছে। গলির বাহান্ন পাক, নর্দমা, নারকেলের পচা খোসা, ধুলোর ঠাসা অসহ্য পতন সব ছাপিয়ে এতক্ষণ একটা উদ্দীপনাই কাজ করছিল— যেভাবেই হোক বাড়িটা খুঁজে বের করা। রিকশা থেকে নেমে পড়েছিলাম বড় রাস্তার মোড়ে। তখনো রোদ ছিল— নিস্তেজ, ফ্যাকশে। নাম্বারটা হাতে নিয়ে শুরু করতে যাব, তখুনি চারপাশ ধোঁয়া করে বৃষ্টি। ছায়া বৃষ্টির ধীর-মন্থর পতন মাথায় করে প্রায় দৌড়েই পাশের সরু বারান্দাটায় আশ্রয় নিই। নিঃশ্বাস টেনে দাঁড়াতে যাব— দেখি পেছনে একজন লোক, বৃষ্টিভেজা প্যান্টের পা গুটোচ্ছে। শাড়ির জল ঝেড়ে সরে দাঁড়াই। না, বারান্দায় আরো লোক আছে— দু'জন ভিখিরি। শতচ্ছিন্ন কাঁথায় শরীর ঢেকে মৌজ করে ঘুমুচ্ছে। কাঁথাটার বিভিন্ন অংশ ফুঁড়ে ওদের শরীরের বিপজ্জনক সব জায়গা দেখা যাচ্ছে। এইবার প্যান্ট গুটোতে থাকা লোকটার সামনে আমি মহাঅস্বস্তির মধ্যে পড়ে যাই।

পড়ন্ত বিকেলেই জ্বলে উঠেছে ল্যাম্পপোস্ট। ঝিরঝির বৃষ্টি, যেন বাতি চুইয়ে আলো পড়ছে। সামনের ক্ষত-ভরা ভাঙা গলিটা কেমন অস্পষ্ট হয়ে আসছে। জায়গাটা ঝাপ্‌সা করে তার বিপরীত দিকে জেগে আছে বিশাল শাদা বাড়িটা। সেই ধবধবে শূন্যতার দিকে তাকিয়ে ঝিম ধরে, গলা শুকিয়ে আসে। আমার হাত-পা কাঁপতে থাকে। মনে পড়ে, দুপুরে কিছু খাওয়া হয় নি। অফিসেও যাই নি আজ। সারাদিন টো-টো চক্কর খেয়েছি। কতদিন পর এই অপার স্বাধীনতা! কতদিন পর আজ নিজেকে ছেড়ে দেয়া!

বৃষ্টি ঝরছে পুরো পরিবেশটাকে বিধবা, শাদা করে দিয়ে। সামনের বিল্ডিংয়ের একজন লোক গোলাপ টবের কান ধরে এমন ভঙ্গিতে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে, বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না, সে শুধু বাগানই করেছে, গাছের জনক হতে পারে নি।

হাঁসফাঁস লাগছে। সেই শাদা জলো প্রকৃতির ঘোর বিভ্রম থেকে নড়তে পারছি না। চুম্বকের মতো আমাকে আটকে রেখেছে। কী নাজুক অবস্থা! বৃষ্টির ধোঁয়া ভেদ করে তাকিয়ে আছি এবং চুম্বকের আকর্ষণ কাটিয়ে সামনে এগুচ্ছি। হঠাৎ কী হয়, আমার জিব বেরিয়ে আসে। আমি শূন্যের দিকে সেটা বাড়িয়ে দিই। বৃষ্টির ছাঁটে যখন ভিজে উঠছি, পেছন থেকে কে যেন প্রায় খেঁকিয়ে ওঠে, আরে করছেন কী! ভিজে যাচ্ছেন তো!

পেছনে সরতে সরতে পিঠটা যখন সত্যি সত্যিই দেয়ালে গিয়ে ঠেকেছে, নিজেকে তখন আবিষ্কার করি এক নিরাপত্তাহীন শূন্যতায়। আশ্চর্য, যে লোকটা প্যান্ট গুটোচ্ছিল বৃষ্টিতে ঝাঁপ দেবার মতলবে, সে এখন আয়েশ করে দাঁড়িয়ে আছে। সবচেয়ে অবাক, বারান্দায় ভিখিরি দুটো নেই। যে ঝুলঝুলে, আঠালো আর দুর্গন্ধ-ছড়ানো কাঁথা তাদের গায়ে লেপ্টে ছিল, তারা চলে গেলেও তার কিছু টুকরো-টাকরা আর উৎকট গন্ধটা তো থাকবার কথা! আমি সীমাহীন ধূম্রজাল ভেদ করে দেখি, তারা নেই, তাদের চিহ্নটুকু পর্যন্ত নেই। বৃষ্টির মধ্যে কখন বেরিয়ে গিয়েছে, খেয়ালও করি নি। এখন সরু বারান্দার পুরোটা জুড়ে আমি আর সেই লোকটা। সে গোটানো প্যান্ট সোজা করে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু তার এই আকস্মিক সিদ্ধান্ত পাল্টানো কেন? দূরারোহ সংশয় নিয়ে আমি তার নির্বিকার মুখ দেখি। এতক্ষণে আমার শরীর বেয়ে ঠাণ্ডা স্রোতের ধারা নামতে শুরু করে। উঁচু বিল্ডিংয়ের পানির ট্যাংকের ওপর কাকের জটলা। আমাকে জলের স্রোতে নিমজ্জিত করে বৃষ্টি ক্রমশ বাড়ছে। চারপাশে ঘোর কুয়াশা। রাস্তার লাগোয়া ঘাসে-ছাওয়া চিলতে জমিতে দু'তিনটে ব্যাঙ উন্মত্ততায় মেতেছে। লোকটা পেছন থেকে যদি আমাকে হঠাৎ জাপটে ধরে? আমার হিম-

চামড়া স্ফীত হয়। এই বৃষ্টিপতন, ভীষণ নির্জন গলি, সামনের চুম্বক শাদা, আমি নিজেকে বাঁচাতে পারব তো ?

যাহ্, বাংলা ফিল্ম আর কি... নিজেকে ঝেড়ে সহজ হতে যাব, পিঠের কাছে নিঃশ্বাসের শব্দ। ভেতরে ভেতরে ছটফটিয়ে উঠতেই দেখি, মাপা দূরত্বে দাঁড়ানো স্থির সেই লোকটার চোখ এখন রাস্তা ছেড়ে আমার দিকে। তার সেই চোখে গভীর বিস্ময়। পরক্ষণেই বুঝতে পারি, আসলে নিঃশ্বাস নয়, বৃষ্টির ঝাপটের শব্দ। হায়রে ছিঁচকে আত্মা! দুর্বলতা এড়াতে ইস্পাতের ফলার মতো টান টান হয়ে উঠি।

ঘোর অতল থেকে নিজেকে টেনে তুলি। কেঠো হাসি হেসে স্রেফ বোকার মতো লোকটার দিকেই এগিয়ে যাই। বলি, মানে, এই যে এই নাম্বারের বাড়িটা খুঁজছিলাম, আপনি চেনেন ?

শাদা শার্ট, নীল প্যান্ট পরা লোকটার আপাদমস্তক এতক্ষণে খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ হয়। বোধহয় হপ্তাখানেক তার শার্টটা ধোয়া হয় নি। কলারের ভাঁজে ময়লার আস্তর। সম্ভবত সেভও করে নি দিন তিনেক। খোঁচা খোঁচা দাড়ির নিচেকার চামড়ায় ভাঁজ। চোখ দুটোও কুতকুতে। পুরো চেহারাটা কী অসম্ভব বিদঘুটে! আপাতদৃষ্টিতে লোকটার ভাবভঙ্গি নিরাপদ মনে না হলেও সংগোপনে ভয়টা কাটিয়ে উঠি, বিশেষ করে সে যখন বলে, বৃষ্টি কমলে আপনাকে সাহায্য করতে পারব। আপনি কোত্থেকে এসেছেন ?

এইরে, শুরু হলো! এখন কোথায় কী করেন, ভাইবোন ক'জন, স্বামীর ঠিকানা—এইসব টেনেটুনে প্রসঙ্গ একেবারে হাঁড়ির তলায় নিয়ে ঠেকাবে।

আমি তাই চটজল্দি 'রায়ের বাজার' বলে, গম্ভীর হয়ে রাস্তার দিকে তাকাই। বৃষ্টি ততক্ষণে গলি ছেড়ে অন্যদিকে চলে গেছে। চারদিকে ফিকে মৃদু আলো। জড়তা কাটিয়ে বাইরের সেই নরম আলোয় হাত বাড়াই। এক সময় আমি আর লোকটা রাস্তায় নেমে আসি। বাঁ গলি ডান গলি করে করে সে-ই নাম্বার নিয়ে একে-ওকে জিগ্যেস করে। আমি নিঃশব্দে তার পেছন পেছন হাঁটি। এক সময় আমার কাঙ্ক্ষিত নাম্বারের কাছাকাছি এসে লোকটা ঘড়ি দেখে। বিচলিত দেখায় তাকে। অত্যন্ত ক্ষিপ্র স্বরে আমাকে বলে, আপনি ডানে গিয়ে বাঁয়ে মোড় নিলেই সম্ভবত বাসাটা পেয়ে যাবেন। তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিই। হন্তদন্ত হয়ে সে চলে গেলে আমি আবারো একা।

চক্করটা খেতে হলো তারপরই বেশি। সে যত সহজে ডান-বাঁয়ের হিসেব বুঝিয়ে দিয়েছিল, ঢাকার বাড়িঘর মোটেই তেমন সুশৃঙ্খল নয়। খিদেয়-ক্লান্তিতে ক্রমেই তেতে উঠছিল মেজাজ। একটা বিশাল বিল্ডিংয়ের কাজ করছে কিছু শ্রমিক। প্রথমে তাদের কাছে এগিয়ে যাই। সামনে ইট-সুরকির স্তূপ। লম্বা রডের সারির ফাঁকফোকরে আমার পায়ের বুড়ো আঙুল ঢুকে যেতে থাকলে একটা চরম অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ে যাই। এই সময় বিরক্তি-ভরা মুখে রড সরাতে সরাতে একটা লোক আমার সামনে এসে দাঁড়ায় এবং আমার জিজ্ঞাসার জবাবে বলে, এ নাম্বারের বাড়ি সে চেনে না। এবার সত্যি সত্যি অসহায় হয়ে পড়ি। দিনের আলো শুষে নিচ্ছে সন্ধ্যা। চারপাশ ঘিরে নেমে আসছে প্রগাঢ় ছায়া। গলিটার গর্তে গর্তে কাদা-জল জমে থাকায় আমার শাড়ির ডগায় ভেজা বালু কিচকিচ করে। শাড়িটা ঝাড়তে গেলে সমস্ত গা শির শির করে ওঠে। এবার নিজেকে সেই ভাঙাচোরা রাস্তা থেকে যথাসম্ভব বাঁচিয়ে প্রায় লাফিয়ে হাঁটতে শুরু করি। এলাকাটার প্রায় সবগুলো বিল্ডিংই

প্লাস্টারবিহীন। হা হা ইট লাল দাঁত বের করে আছে। অ্যাডভান্স নিয়ে বাড়িঅলা সম্ভবত আধাআধি তৈরি বাড়ির মধ্যেই ভাড়াটে উঠিয়ে নিয়েছে। ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে। বাড়িগুলোর ছায়া ছায়া জানালায় মানুষের অদ্ভুত সব মুখ।

সংসার তো করেছি আড়াই বছর। ভাড়াটে বাড়িতে থাকার এত বিচিত্র অভিজ্ঞতা এত স্বল্প সময়ের ব্যবধানে আর কারো হয়েছে কী না সন্দেহ। আমি সেই বাতিহীন, নিরাপত্তাহীন রাস্তায় অতীতের মধ্যে গা ঘষটে পড়তে গিয়েও নিজেকে টেনে তুলি। আমি এখন কোথায় যাব?

এই বোধ আমাকে মর্মান্তিক করে তোলে। এরি মধ্যে ঝপাৎ— একটা পা ছোট্ট মতোন গর্তে সেঁধিয়ে যায়। আহ্! বুড়ো নখটা বোধহয় ভেঙেই গেল। দাঁতে যন্ত্রণা চেপে পা-টাকে উদ্ধার করি। হলে কী হবে, কাদায় ঠেসে গেছে স্যান্ডেল। এবার ধৈর্য হারিয়ে ফেলি। চোখের সামনেটা কেমন টলে উঠছে। ঝিমঝিম ঘোর আর একটা বমিবোধ আমাকে ছেঁকে ধরে। সেই সাথে ভয়ানক খিদে।

আমি কী বাসায় ফিরে যাব? একটা অশরীরী ভয় থেকে— আমার এই ভাবনা। ওখানে ফিরে যাওয়ার চেয়ে এই আঁধার রাস্তায় কোনো চলন্ত ট্রাকের তলায় পড়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো। পলকে নিজের মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়েঝুড়ে প্রায় মরিয়া হয়েই একজন মাস্তান গোছের ছেলের দিকে এগিয়ে যাই, প্লিজ ভাই—।

আমার এই সম্বোধনে সে যেন নিজেকে জাহির করার সুযোগ পায়। এরপর সে প্রায় হাত ধরেই বাড়িটার সামনে আমাকে দাঁড় করিয়ে দেয়, ইরফান সাহেব আপনার কে হন? তার এই বিড়ি-ফোঁকা মুখ থেকে বেরুনো অযাচিত প্রশ্নেও আমি বিনয়ী থাকি। নিজেকে বিস্তীর্ণ হাওয়ায় ছড়িয়ে দিয়ে ভেঙে ভেঙে বলি, জি, উনি আমার চাচা। সোজা ভেতরে চইল্যা যান— কথাটা বলেই সে চলে যায়।

কিন্তু এত ঝড়ঝাপটার পর আকাঙ্ক্ষিত বাড়িটা খুঁজে পাওয়ার আনন্দ ক্রমশ থিতিয়ে আসতে থাকে। কঠিন কুয়াশার আস্তরণে আমার গোটা অস্তিত্ব নিমজ্জিত হয়। ইরফানুল কবির! শেষ পর্যন্ত আমি তাঁর গেটের সামনে! সারাটা জীবন যাঁর কাছ থেকে আমরা কোনো সহানুভূতি, কোনো করুণা, কোনো স্নেহ কিংবা ঘৃণা, কিছুই পাই নি। আমাদের ব্যাপারে যিনি এত নির্লিপ্ত, কোনোদিন আমি যাঁর চেহারাই দেখি নি, আজ কিনা তাঁর বাড়িই খোঁজার জন্য এতখানি উন্মত্ত হয়ে উঠেছি?

পাঁজরের খাঁজে কেমন একটা ধাক্কা। সন্ধ্যার নিভাঁজ ছায়ায় চরম হতাশ আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় দাঁড়িয়ে থাকি।

বাড়িটা পুরনো। পুরো আদলটা জমিদার আমলের স্থাপত্যরীতির। জায়গায় জায়গায় তার চামড়া উঠে গিয়েছে। সামনে একচিলতে ঘাসের জমি, ছেঁড়াখোঁড়া। ডানামেলা একটা নিমগাছ দেয়াল ছাপিয়ে ওপরে উঠে গিয়েছে। তার মাথায় সন্ধ্যার একঝাঁক কাক, তাদের চিৎকার। অন্ধকার প্রকট হওয়ায় ল্যাম্পপোস্টের আলোরও বিস্তার ঘটেছে। দরজা-জানালার ফাঁক গলিয়ে বাড়ি থেকে যে আলো আসছে, তা-ও হলদে, চারপাশ ঘিরে রেখেছে অন্ধকার পাঁচিল। ভারি পা বাড়াই খোলা গেটের দিকে। তাহলে এসেই পড়েছি! বিক্ষিপ্ত, অসংলগ্ন হাঁটি। আজ আর পেছনে ফেরার উপায় নেই।

দরজায় নক্ করে গলায় দম আটকে দাঁড়িয়ে থাকি। ক্লান্তি, অবসাদ, টেনশনের পীড়ন আমাকে বিপর্যস্ত করে তোলে। অকস্মাৎ চেপে বসা দুঃসহ মস্তিষ্কক্রিয়ার ফলে ঘেমে যখন দস্তুরমতো স্নান করে উঠেছি, তখুনি সামনের দরজাটা খুলে যায়। যশোরস্টিজের শাড়ি পরিহিতা, খোলা চুলের এক মধ্যবয়সী সামনে। কীভাবে শুরু করব যখন ভাবছি, তখুনি তিনি আমাকে ভেতরে ডেকে নিলেন। আড়ষ্ট পায়ে হেঁটে সোফায় থিতু হয়ে বসি। তারপর শুরু করি, জি, মা আমাকে ঠিকানা দিয়েছিলেন। আমি, মানে আপনি হয়তো চিনবেন, আমার বাবার নাম সোবহান তরফদার। ইরফান চাচা বাবার খালাতো ভাই।

স্পষ্ট লক্ষ করি, আমার এই বিবরণে মহিলা ঈষৎ কেঁপে ওঠেন। কিন্তু খানদানি কায়দায় নিজেকে সামলে নেন পরমুহূর্তে এই বলে, আমি চিনেছি। তুমি ঢাকাতেই থাক বোধহয়, তেমনই তো শুনেছিলাম...। কৌতূহল অপসারিত হলে অন্য পাশের সোফায় সহজ হয়ে বসেন তিনি।

আপনিই বোধহয় কাকিমা এবং পরক্ষণেই চিরকাল যা হয় অস্বস্তির সময় খেই হারিয়ে ফেলা, বলি, আপনি জানেন আমি ঢাকায় থাকি ? মানে আপনি আমাকে চেনেন ? আশ্চর্য! কী করে ? প্রশ্নটা করেই বোকার মতো এতক্ষণ পর উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর পায়ে হাত ছোঁয়াতে যাই কিন্তু তাঁর তীব্র প্রতিরোধের মুখে তা সম্পন্ন হয় না। আমাকে বাধা দেয়ার সময় তাঁকে দাঁড়াতে হয়। তেমনি দাঁড়িয়ে থেকেই তিনি বলেন, তরফদার সাহেবের একজন মেয়ে ঢাকায় থাকে, কে যেন বলেছিল। যা হোক, তুমি একটু বস, আমি আসছি। আসলে দেখো, যোগাযোগ না থাকলে যা হয়, আত্মীয়তার সম্পর্ক অথচ কেউ কাউকে চিনি না।

আমি ফের দাঁড়াতে যাব, অমনি তিনি প্রায় হা-হা করে বলে উঠেন, বস বস। তারপর আস্তে-ধীরে পা ফেলে তিনি ভেতরে চলে যান। এবার আমি স্বভাব কায়দায় পুরো ঘরটা পর্যবেক্ষণ করে চলি।

বাইরের মতোই ঘরের ভেতরটাও জমিদারি কায়দায় বানানো। খাঁজকাটা দেয়ালের শাদা আস্তর ফ্যাকাসে। বিশাল এই ঘরে একটি মাত্র এক শ' পাওয়ারের বাল্ব। ফলে জন্ডিস-আক্রান্ত আলো দৃষ্টিকে পীড়িত করে। দু'সেট ভেলভেটে মোড়ানো সোফা বিশাল আকারের। দেয়ালে অনেক টিকটিকি। ওদের একচ্ছত্র চলাফেরা দেখে মনে হয়, যেন যত্ন করে পোষা। ঘরের পুব কোণে চা গাছের গুঁড়ির ওপর পেতলের বড় ফুলদানি, তাতে প্লাস্টিকের একঝাঁক ফুল ধুলোর আস্তরে ঢাকা। গুচ্ছ পাখাসমেত মৃত বাজপাখি দেয়ালের স্ট্যান্ডে ঝুলছে। এই পাখিটাই ঘরের প্রাচীনতাকে আরো প্রকট করে তুলেছে। কার্পেট দেখে মনে হয়, বাঘের চামড়ার। মেঝের মাঝামাঝি বেছানো। ঘরের গুমোট পরিবেশ এমনই যে, মনে হয়, অনেকদিন দরজা-জানালা খোলা হয় না। ভেন্টিলেটার দিয়ে যেটুকু হাওয়া আসে তাতে করে শ্বাসক্রিয়া স্বচ্ছন্দ হওয়ার সুযোগ পায় না।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এইসব দেখছি। আর নিজের অযাচিত কাঙালপনাকে বিন্দু বিন্দু করে আবিষ্কার করছি। যে লোকটিকে এত ঘৃণা করেছি, প্রতিদিন, আজ তাঁর এখানে আশ্রয়ের জন্য আমাকে আসতে হলো ? একটা হিমশাদা তরঙ্গ পায়ের পাতা ফুঁড়ে মাথা অব্দি ছুটে যায়। ইচ্ছে হয়, দৌড়ে বেরিয়ে পড়ি। যুগপৎ অস্বস্তি আর বিষাদ আমার পায়ের পাতা নিচের দিকে টেনে রাখে। ফ্যাকাসে আলোর তরঙ্গে বুঁদ হয়ে থাকি। তাছাড়া বাইরে অন্ধকার। কী অদ্ভুত, আমি এই বাড়িতে এসেছি! যার জন্য আমার বাবা-মা'র কুকুর

কামড়াকামড়ি ঝগড়া দেখেছি। মনে পড়ে, আমার ক্ষীণাঙ্গী, অসুস্থ মার সারাজীবনের যাবতীয় যন্ত্রণার একমাত্র উৎস ছিল অভাব। বাবার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ক্ষেত্রে মায়া-মমতা-প্রেমের কোনো কিছু কোনোদিন দেখি নি। তাদের কষ্টের মধ্যেও কোনো গভীরতা ছিল না। এরকম সম্পর্কের সেতুর ওপরেই আমাদের জন্ম— পুরো বিষয়টাই আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকে। প্রথম জীবনে অবশ্য মার মূল মানসিক কষ্টের কারণ ছিল এই ইরফান চাচা। তাঁর আর মার সেই সম্পর্ককে কেন্দ্র করে বাবা মাকে এত কুৎসিত কটূক্তি করেছেন আর এত কিল থাপ্পড় দিয়েছেন যে, ধীরে ধীরে সবকিছু তাঁর গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। ইরফান চাচা আর মার সম্পর্কটা আসলেই বিচ্ছিরি খোলামেলা এক ঘৃণিত সাবজেক্টে পরিণত হয়েছিল। আর আজ আমি নির্লজ্জের মতো চাচিকে বলে বসলাম কি না মা ঠিকানা দিয়েছেন! কেন মা'র কথা বললাম ? সে কি তাঁর কপালের ঢেউ দিয়ে এই বাড়িতে আমার আসাটাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার জন্যে ?

নাহ্! আমি কিছু ভাবতে পারছি না। ক্ষুধা-তৃষ্ণা-অস্বস্তি আমার চারপাশ অন্ধকার করে তুলছে। গা গুলোচ্ছে। এই স্তিমিত আলোর ঘোরে আমি কী অজ্ঞান হয়ে যাব ? চারপাশে এত সেভলনের গন্ধ কেন ? এটা বাড়ি, না হাসপাতাল ? আমি কী কোনো পুরনো ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে আছি ? সবকিছু মিলিয়ে আমার যখন আকাশপাতালহীন টালমাটাল দশা, তখন দরজায় একজন মহিলা, সম্ভবত বুয়া, আমাকে ভেতরে যেতে বলে। এবং কাঁধে সারাদিনের ব্যাগসহ আমার দু'পা আমাকে ভূতগ্রস্তর মতো সেদিকে টেনে নিয়ে চলে।

সব রকম ভদ্রতার পর পেটে যখন আমার দানা পড়েছে, তখন আমাকে নির্দিষ্ট একটা রুম দেখিয়ে দেয়া হলো ঘুমনোর জন্য। কাঁধের ব্যাগটা মেঝের একপাশে রেখে খদ্দরের চাদর বেছানো খাটে নিজেকে সটান মেলে দিয়ে আমার অস্তিত্বকে আমি নতুন শূন্যতায় আবিষ্কার করি। ড্রইংরুমের মতো এই ঘরটাও গুমোট, শ্বাসরুদ্ধকর। অবশ্য আমি তেমন আলো হাওয়ায় অভ্যস্ত নই। এই যে আজকের রাত, এই যে ওপরে বিস্তৃত শাদা ছাদ এবং এই যে আমার লজ্জাকর, অস্বস্তিকর আগমন... যেখানেই থেকেছি, সারাক্ষণ এর কোনো-না-কোনোটি আমাকে সবসময়ই আগলে থেকেছে। আমি কোনোদিন আকাশের দিকে ডালপালা-মেলা উন্মুক্ত গাছ হবার সুযোগ পাই নি।

এবার চারপাশে বাস্তবিকই ছেঁকে-ধরা আঁধার। আমার সব ছাপিয়ে এগিয়ে আসে রেজাউল। ওর সঙ্গে যখন ছাড়াছাড়ি হলো, আমার চারপাশে তখন ধোঁয়া, জটপাকানো অন্ধকার। এতদিনের সংসার! অভ্যাস বড় মারাত্মক। সংসারে থাকতে যুদ্ধটা একরকম ছিল। সেখান থেকে বেরিয়ে সেই রূপটা পাল্টাতে হচ্ছিল। আমি তখন ডুবছি-ভাসছি। একাকী অন্ধকার একটা ঘরে রাত কাটে। শব্দ শোনামাত্র ধড়ফড় করে উঠি। মাথার মধ্যে কারখানার সাইরেন বেজে চলে একটানা। প্রায় বিকারগ্রস্ত হয়ে উঠেছিলাম। ছোট্ট একটা কামরা, তার পাশ-ঘেঁসা বাথরুমটা ছিল ভয়ঙ্কর রকমের বিক্ষত। দাঁত বের করা কালচে ইট। হলুদ কমোডের মাঝখানটায় এমন একটা গর্ত ছিল, মনে হতো, কেউ খাবলা দিয়ে তার মাংস তুলে নিয়েছে।

সেই সব একাকী নিঃসঙ্গ রাতের প্রবল ভীতি ছিল ওই বাথরুমটি। এবং ছিটকিনির শব্দ। পাশের ফ্ল্যাটে কেউ ছিটকিনি খুলছে। অথবা মাঝরাতের হাওয়ার তোড়ে খুলে গেল আমারই ছিটকিনি, ধড়ফড় করে ঘুম ভেঙে যেত। তারপর সারারাত একটানা বসে থাকা।

আমি কোনোকালে একা ঘুমনোয় অভ্যস্ত নই। বাবা-মা'র সংসারে ভাই-বোন ল্যাপটালেপটি করে বড় হয়েছি। ভাবতে অদ্ভুত লাগে, ওরকম একটা কঠিন বাস্তবের মধ্যেও কারো কোনো প্রভাব ছাড়াই আমার একটা আশ্চর্য শৌখিনতা ছিল— ছবি আঁকা। যেন এই সব ঘিনঘিনে অবস্থা থেকে নিজেকে পরিত্রাণ পেতেই সেই নেশাটাকে আমি আমার মধ্যে দুর্নিবার করে তুলেছিলাম।

সেই একলা-একা কয়েকটা দিন কাটানোর সময়টাতে ঝেড়ে ফেলা পুরনো নেশাটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। খাটের তলা থেকে বের করে আনি আস্তরপড়া রঙ তুলি আর ভাঙা-চোরা ইজেল।

সমস্ত রঙ তখন খটখটে, জমাট বাঁধা। ঝুল আর ধুলোর জড়াজড়িতে তুলির অবস্থাও নাজুক। চোখের সামনে এইসব দেখে স্থির বসে থাকি। ক্রমশ রাত বাড়ে। এরি মধ্যে ঘরের কিছু জিনিস-পত্র বিক্রি করে ফেলেছিলাম। বাড়িঅলা মাঝে মাঝে খোঁজ খবর নিয়ে যায়— জানতে চায় বাড়ি ছেড়ে দেব কি-না! আমার তখন সত্যি সত্যি চরম অনিকেত দশা।

রেজাউলের সঙ্গে দীর্ঘদিন বসবাস করার সময় এই কামরাটাকে একটা অন্ধকার গুহা মনে হতো— ভয়ঙ্কর ভ্যাপসা, এক টুকরো আকাশ নেই, জানলা খুললেই পাশে আস্তর খসা বিল্ডিং। সবচেয়ে কষ্টকর ছিল দম রুদ্ধ-করা বাড়িটাতে কোনো বারান্দার অস্তিত্বহীনতা। ঘর থেকে বেরিয়েই সিঁড়ি। হয় নেমে যাও, নয় উঠে আস। সেই সঙ্গে ছিল আদ্যিকালের জংপড়া একটা ফ্যানের সীমাহীন উৎপাত। তার শব্দ ছিল ভয়াবহ। সেই শব্দে বারবার ঘুমের তন্ত্রী ছিঁড়ে যেত। ওটাকে নিয়ে আমার আরেকটা টেনশন ছিল। দু'দিন খটখট করে চলল তো তিনদিনের মাথায় ঘটাং করে গেল থেমে। বাকি আড়াই দিন ফ্যানহীন, বাতাসহীন, দুঃসহ গরমের ভাপ। মনে হতো সেদ্ধ হয়ে যাচ্ছি। পাগলের মতো জানালার পর্দা তুলে দিতাম। পাশের রুক্ষ দেয়াল যেন প্রবল বেগে ধেয়ে আসত আমার দিকে। অথচ বাড়ির ওই যন্ত্রণাকর ফ্যানটাই ছিল রেজাউলের প্রধান আকর্ষণ। সংসারের কাজ বলতে ওই জিনিসটার পেছনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে লেগে থাকাটাকেই মনে করত নিজের স্বস্তিকর একটা দায়িত্ব।

প্রাইভেট এক ফার্মে চাকরি করত রেজাউল। অফিস থেকে ফিরে সেই ঘামগন্ধের ভেতরে প্রথমেই সে ওপর থেকে ফ্যানটাকে নামাত। মেঝের পুরোটা দখল করে স্ক্রু-ড্রাইভার আর টেস্টারের খোঁচাখুঁচি চলত। এইসব দেখেশুনে মাঝে মাঝে আমার মাথায় রক্ত উঠে যেত। কেননা তার সেই দীর্ঘ নিমগ্নতার সময় বিছানায় বসে থাকা ছাড়া আমার আর কোনো কিছু করার থাকত না। এই নিয়ে প্রায়ই তুমুল ঝগড়া হতো। আমার রক্তে সবচেয়ে ক্ষতিকর যে বিষ, সে ছিল আমার জেদ। একেক সময় ইচ্ছে হতো, ওর পিত্তি জ্বলে ওঠে তেমন কোনো কাজে আমিও জড়িয়ে পড়ি। অবশ্য সেই জেদকে থিতু করে ফেলতেও আমার জুড়ি ছিল না। ফলে ও করতে পারলে আমি কেন পারব না, এরকম স্বাধীনতায় আমার মন সায় দিত না। ওর জন্য যেটা অন্যায়, আমার বেলায় তার ব্যতিক্রম হতে যাবে কেন? আমিও অন্যায় করলে তো তার সমান্তরালে নেমে যাওয়া হলো। কিন্তু তারপরও জেদটা আগুন হয়ে জ্বলার সুযোগ না পাওয়ায় দিনের পর দিন তার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ রাখতাম। অহঙ্কারী পা ফেলে তার সামনে দিয়ে হাঁটতাম। ঝপাৎ শব্দে চাবির গোছা আছড়ে ফেলতাম মেঝেতে। ফল হতো গভীর রাতে তার বাড়ি ফেরা এবং বিছানায় মুখ থুবড়ে নিঃসাড় পড়ে থাকা।

এই সব নিয়ে আমিও তার ব্যাপারে ততদিনে এক পা-দু'পা করে আকর্ষণ হারাতে শুরু করেছি। আপোস মানেই দুটো জানোয়ারের কুস্তোকুস্তি সঙ্গম। জঘন্য তেতো চুম্বন। ফলে আপোসহীন পরিস্থিতিই আমার জন্য স্বস্তিকর। একসময় রাত্তিরে রেজাউলই তরল আপোসে নেমে আসত। আমি দেখতাম একজন দিন মজুরকে, যার পৃথিবীতে বিনোদন বলে কোনো সঙ্গ নেই, ফলে শরীরের কাছে সে কতটা বিপন্ন! আমারও মায়া হতো। রোমাঞ্চ নয়, স্পন্দন নয়, শেষমেষ কেবল অভ্যাসের মায়ায় সমঝোতা!

বাবার মতো স্বামীর সংসারেও মূল সমস্যা ছিল টাকা। দীর্ঘদিন বাবার সংসারে প্রতিটা মুহূর্ত এটার সাথে ওটার জোড়া দিতে দিতে আমি সত্যিকার অর্থেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। স্বামীর সংসারে এসেও তার কঠিন পুনরাবৃত্তি। আমাদের ফ্ল্যাটে প্রায়ই পানি থাকত না। লোডশেডিংও ছিল এলাকাটার অপরিহার্য অঙ্গ। সূর্য যেন আমার একরত্তি ছাদটার ওপর এসে একঠায় বসে থাকত। সারাক্ষণ আমার মেজাজ থাকত তেতে। অফিস থেকে ফিরে চ্যাঁচামেচি জুড়ে দিত রেজাউল, বালতিতে একটু পানি ধরে রাখতে পারলে না?

সমান তালে আমিও চ্যাঁচাতাম, বালতি তো মাত্র একটা। ওতে আর কতটুকু পানি রাখা যায়? তা ছাড়া রান্নাবান্না করতে হয় না? আর আমি কি জানতাম ঠাস করে পানি চলে যাবে?

রেজাউলের সর্বাঙ্গে তখন সাবান, বোকার মতো কেবল পানি-শূন্য শাওয়ারের ট্যাপ ঘোরাচ্ছে। এক সময় টাওয়েল দিয়ে সাবান মুছে বাথরুম থেকে বেরিয়ে ফের হামলে পড়ত, তা জানবে কী করে? সারাদিন নবাবের মতো তো কেবল বসেই থাক। করতে আমার মতো চাকরি, ফিরে এসে পানি না পেলে দেখতে... বলতে বলতে সে পুরো পাউডারের কৌটোই নিজের শরীরের ওপর ঢেলে দিত। সাবান চিটচিটে শরীরে শাদা পাউডার লেপ্টে জবরজং সঙে পরিণত করত তাকে। ওর এই অবস্থা দেখে ওর ওপর মায়া হবে কী আমার নিজের জীবনের ওপর ঘেন্নাটাই প্রকট হয়ে উঠত। তাছাড়া ওর উচ্চারণ, বিষ ঝরিয়ে দিত শরীরে, নবাবের মতো বসে খাই? মেপে মেপে পানি খাওয়া, ভাত খাওয়া। তাছাড়া প্রায়ই টয়লেটের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। এবং ভয়ঙ্কর কমোডের গর্ত উপচে ঘিনঘিনে মল সারা বাথরুমে ছড়িয়ে পড়ত। ওগড়ানো বমিতে তখন মেঝে ভাসিয়ে দেয়া ছিল আমার রোজকার ঘটনা। কিন্তু তাতে তো আর সমস্যার সমাধান হতো না। ছোট বাড়িঅলার বাসা। মৌলিক চাপ বড় ভয়ঙ্কর। তার কাছে গিয়ে এর একটা সুষ্ঠু সমাধান চাইতাম। কখনো তেতে গিয়ে, কখনো অসহায়, নরোম মেজাজে। প্রত্যেকবার বাড়িঅলার জবাবও ছিল বড় মৌলিক, এই ভাড়ায় তো আপনি ইংলিশ ফিটিংয়ের মডার্ন বাথরুম পাবেন না। মরিয়া হয়ে বলতাম, আমি তো মর্ডান বাথরুম চাইছি না। উপচে ওঠা এই পানি... আপনিই বলুন, আমার স্বামী না হয় অফিস থেকে সেরে আসে... আমি একটা মেয়ে হয়ে এবাড়ি ওবাড়ি দৌড়াই কী করে?

তারপরও তার নিরুত্তাপ জবাব, দেখি কী হয়! এই দেখির পর কেটে যেত আরো দু-তিন দিন। সেই দু-তিন দিন মলমূত্রের গন্ধে ডুবে আমার আধ-মরা হবার অবস্থা হতো। এ তো গেল এক যন্ত্রণা। তার থেকে মাথা তুলেছি তো ছেঁকে ধরত চাল-ডাল-তরিতরকারির হিসেবপত্তর। পই পই করে হিসেব করে চলেও শেষকূল রক্ষা করা যেত না। সকালে রুটি ভাজি, দুপুরে মাত্র একটাই তরকারি বরাদ্দ ছিল। রাতে থাকত ভর্তা আলু অথবা বেগুনের।

অবশ্য আমাদের দু'জনের কাছেই একটা ব্যাপার বরাবর এক রকম ছিল-রাতের ভাতটা আমরা মেপে খেতাম। ব্যাপারটা কারো নজরে পড়লে মনে হতে পারত, আমরা দু'জনই ডায়েট কন্ট্রোলে ভীষণ সজাগ-সতর্ক। আসলে তা তো নয়। সঙ্গোপন ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে পড়ার ভয়ে নিজেদের কাছেই আমাদের সে কী অস্বস্তি! এর মধ্যেও সংসার চালিয়ে এক-দু' টাকা করে আমি আলাদা একটা মাটির পাত্রে জমিয়ে রাখতাম। কিন্তু মাসের একুশ দিনের মাথায় তার মধ্যে হাত পড়ত। মাসের শেষ দিকটা ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ। সংসারের হাল তখন গড়ের মাঠের মতো। দীর্ঘ ব্যবহারে ঝুরঝুরে বিছানার চাদরটা পাল্টালাম তো চাল শেষ। কোনোরকমে কেনা হলো আধা কেজি, ওদিকে তখন ক্রমেই শূন্যের কোঠায় নেমে আসছে মসলা, চিনি, বিস্কুট, সব্জি। ধার করে কোনোরকম একটা হসফস জোড়াতালি দিয়ে তার হাত থেকেও উদ্ধার পেয়ে যেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে যাব, ব্যস্, সন্ধ্যায় হঠাৎ করে ঘরের সবেধন নীলমণি বাল্বটা ফিউজ হয়ে গেল। তারপর আর কী, ভেতর থেকে ঠেলে ওঠা হাসির বুদ্বুদ! ভিখিরির আর ভয় কী, আকাশ তার বাবা, চাঁদ তার মামা, চেয়ে থাকতাম মোমের শিখাটার দিকে। আমার মতনই পিরিচের ওপর গলে গলে পড়ছে মোমটা। হে ক্রমে-নিঃশেষ-হতে-থাকা মোম! দাউ দাউ জ্বলে ওঠো, দৈত্য হও।

তারপর?

তারপর আর কী, দরজা খুলে রেখে বাইরে থেকে আসা এক চিলতে আলো দিয়ে চালিয়ে দিতাম আরো দু'দিন। আয়, আয় চাঁদ মামা, উপচে পড়া আলো আয়, উড়কি ধানের মুড়কি আয়, ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়ে আয়... ঝিম ধরে বসে থাকি, লাফঝাঁপ দিই অন্ধকারে। চিৎ হয়ে শুয়ে থাক, নয়তো ঘুমিয়ে পড়। বাল্ব কিনব কী, মোম কেনারই আর পয়সা নেই। আধ কেজি চালে তো আর একদিনের বেশি যায় না। ওটাই তো জীবনের পয়লা নম্বরের চাহিদা। আগে তো খেয়ে বাঁচতে হবে! এই সব ভাবতে ভাবতে অন্ধকার ঘরের বিছানায় শুয়ে একদিন হতাশায় নুয়ে এসেছিল রেজাউল, এরকম করে বাঁচা যায়? এরকম জঘন্য পরিবেশে? কুত্তার জীবনও এর চাইতে ঢের ভালো। ঘেন্না ধরে গেছে।

ফলে, সেরকম একটা সংসারে বসবাসের ব্যাপারটাকে রেজাউল কখনো নবাবি হালে থাকা বললে স্বভাবতই, সহ্য করা কষ্টকর হয়ে পড়ত আমার পক্ষে। ফলাফল, আর কিছুই না, দু'জনের মধ্যে বেঁধে যেত হলুস্থুল। ঘটনা হাতাহাতিতে গড়াবার আগেই আমি রান্নাঘরের ছিটকিনি লাগিয়ে, তার বদ্ধ আবহাওয়ায় অঝোরে কেঁদে কেটে কাটিয়ে দিতাম অনেকক্ষণ। এক সময় দু'জনই সহজ হয়ে আসতাম এবং আবারো শুরু হতো জৈবিকতার সাথে একই রকম যুদ্ধ। প্রতিদিনই মনে হতো, এই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি। পালিয়ে যাই দূরে কোথাও। এই দূরের স্বপ্ন হয়তো সবাই দেখে কিন্তু তার নাগাল আর পায় না। কঠোর এই বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই নিজেকে এক সময় বিন্যস্ত করতাম। রেজাউলের সামনে মেলে ধরতাম খোলা চুল, বলো তো চুলে কিসের গন্ধ?

সাবানের।

আর আমার গায়ে? বলে ঝুঁকে পড়তাম ওর দিকে।

হেসে বলত, ঘাম আর পাউডারের।

তবে যে একজন বলত, আমার গায়ে জংলি ফুলের গন্ধ? নিজেকে কোনোদিন এক চুল যত্ন করা ছাড়াই আমি প্রকৃতির অনাবিল অন্তরঙ্গতায় বেড়ে উঠেছি? রূঢ় সেই বাস্তবতায়

স্মৃতির অমল সেই হাওয়া বদ্ধ ঘরে আমার চোখ দুটো ভিজিয়ে দিয়ে যেত কখন। তাই একা হয়ে যাওয়ার পরও সেই ঘরটা আমার অস্তিত্বের অপরিহার্য একটা অংশ হয়ে দাঁড়ায়। এই ছায়ায় নিচ থেকে বেরুনো মানে খণ্ড খণ্ড মাংসে পরিণত হওয়া, কাক-কুকুরে টানাটানি করে খাওয়া। রাতের প্রবল ভয়ের পাশাপাশি ছিল এই বাড়িটা খোয়ানোর ভীতি। সোনার চেন, চেয়ার, টেবিল এক এক করে বিক্রি করতে করতে তলানিতে ঠেকতে কদ্দিন ? তারপর আমি কোথায় যাব ?

উৎকণ্ঠা আর দুশ্চিন্তায় আমার অবস্থা পাগলের মতো। একটা শূন্য বৃত্তের মধ্যে আমার নির্ভার দেহ পাক খায়, আছড়ায়। এইভাবে দিন কাটে। একরাতের কথা মনে পড়ে, বিকারগ্রস্তের মতো ছুঁড়ে ফেলছি রঙের কৌটা, জমাট বেঁধে-যাওয়া তুলি। ঠিক তখুনি হঠাৎ করে মাঝরাতে বাইরে থেকে শুনি একটা গোঙানি, সেই সঙ্গে রাতের বুকচেরা আর্তনাদের ধ্বনি। বিছানা থেকে সটান নিজেকে টেনে তুলি। তার পরেই কাউকে লাঠি-পেটা করার উপর্যুপরি উৎকট শব্দ।

আমার পেছন দরজার পাশেই খোলামেলা একটা মাঠ। কিন্তু দরজা খুললেই বারান্দাহীন অপার শূন্যতা। মনে হয় পা ফসকালে এই শরীর সমেত গভীর গহ্বরে তলিয়ে যাব। ভয়ে ভয়ে কোনোদিন ও দরজাটা খোলা হয় না। সেই আর্তনাদের তীব্রতা মৃত্যুর মতন আমাকে টানছে। আমি যেন কোনো ভুতুড়ে ছবির নায়িকা এবং তার মতো করেই সেই চিরবদ্ধ ছিটকিনিতে হাত দেই। জং ধরে গেছে। রাজ্যির ধুলো, কিছুতেই খুলছে না। জোরে টান দিয়ে টাল সামলে পড়ি। দাঁড়াতেই কম্পিত চোখ যেন অতল গহ্বর দেখে, দমকা বাতাসের ঝাপটা এই প্রথম এ পথে আসছে। আমার বুক ঠাণ্ডা হয়ে আসে। ফের আর্তনাদের শব্দ। ভয়ে ভয়ে সেই বিশাল শূন্যতার দিকে তাকাই, ল্যাম্পপোস্টের আলোর বিচ্ছুরণে অনেকটা স্পষ্ট হয়, আধা ন্যাংটো দু'জন লোককে পেটানো হচ্ছে। অসংলগ্ন কথাবার্তা থেকে আরো স্পষ্ট হয়, লোক দুটো চোর। লাঠির আঘাতে তাদের শরীর বেঁকে-বেঁকে উঠছে। পুরো মাঠে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আরো কিছু লোক।

সেই গোঙানির সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ, বাবাগো, আমি করি নাই...বাবাগো। আর্তনাদ করে ওঠা দু'জনের একজনকে চ্যাংদোলা করে ক'জন লোক মাঠের আরেক প্রান্তে নিয়ে ঝপাৎ করে ফেলে দিল।

দরজা বন্ধ করে দিই। বালিশে মুখ কান-গুঁজে বিছানায় পড়ে থাকি। জ্বর-জ্বর লাগতে থাকে। সেই সাথে প্রচণ্ড মাথা ব্যথা। এই ফাঁকে এক সময় ইলেকট্রিসিটি চলে যায়। সেই ভয়াবহ নিঃসঙ্গ রাতের কথা মনে হলে এখনো কেঁপে উঠি। ভয়ানক তৃষ্ণা পেয়েছিল। রান্নাঘরে যেতে হলে কুৎসিত বাথরুম অতিক্রম করে যেতে হয়। পানি রান্নাঘরের কলসিতে। হাতড়ে হাতড়ে এগুচ্ছি। মাঠ থেকে গোঙানির শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। মরে গেল নাকি! হঠাৎ পায়ের কাছে ঠাণ্ডা একটা কিছুর অস্তিত্ব অনুভব করি। বুকের মধ্যে ঘাই দিয়ে ওঠে বরফ টুকরো। সাপটাপ নাকি ? আবার ভাবি, এই দোতলায় পাইপ বেয়ে সাপ উঠবে কী করে ? কাঁপা কাঁপা হাতে জিনিসটা ওঠাই। একটা বোতল। নিঃশ্বাস টেনে টেনে অবশেষে কলসির কাছে যাই। মিটসেফের ওপর থেকে একটা গ্লাস নেই। গলায় পানি ঢেলে মাঝখানের সরু প্যাসেজে দাঁড়িয়েছি, কানের কাছে ফিসফিস... চিৎকার করে ঘরের দিকে ছুটে আসি। আবার একটা শোঁ শোঁ শব্দ, গলায় দম আটকে আসে। মাথা ঝাঁকাই। কিছুক্ষণ

পর টের পাই কানে পিঁপড়ে জাতীয় কোনো পোকা ঢুকেছে। ব্যাপারটা টের পাওয়ার পর শুরু হয় মরণ যন্ত্রণা। মনে হয়, পোকা নয়, আস্ত একটা গোখরা ঢুকে পড়েছে কানের ফোঁকরে।

মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে মাথা ঝাঁকাচ্ছি, চিৎ হচ্ছি। কাত হচ্ছি। যতই এসব করছি, ততই যেন আরো শক্ত করে কামড়ে ধরছে। প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে ব্যথা। না, পোকা নয়, সাপ নয়, আমার ভেতরে মৃত্যু প্রবেশ করছে। আজরাইল লম্বা একটা শলা ঢুকিয়ে দিয়েছে আমার অন্ধকার কানে। এই বোধ আমাকে এমনই অসহায় করে তোলে, আমি গলা ছেড়ে কেঁদে উঠি, উন্মাদের মতো ঘরময় ছুটতে থাকি। কী করব বুঝে উঠতে পারি না। আরেফিন... কুত্তার বাচ্চা... গালি দিতে থাকি। আমাকে বলে গেছে ক'টা দিন একটু কষ্ট করতে। তার জানাশোনা কে যেন একজন আছে কোন অফিসে। কথা দিয়ে গেছে ও আমার চাকরির ব্যবস্থা করবে। কিন্তু ওর আশ্বাসের ওপর আমার কোনো ভরসা নেই। নিজে রাজনীতি করে। দু'দিন পর পরই পুলিশের প্যাঁদানি খেয়ে আমার বাড়িতে এসে আশ্রয় নিত। ওকে নিয়ে আমার আর রেজাউলের মধ্যে কম তিক্ততা হয়েছে? আর আজ বোনটাকে একা একটা বাড়িতে রেখে লাপাত্তা। সব শালা স্বার্থপর! হাতড়ে হাতড়ে দেশলাই জ্বালাই। মোমের একটা টুকরোও যদি পাওয়া যেত! আবারো রান্নাঘরে। মিটসেফের ভাঙা ড্রয়ার ধরে টান দিতেই সার সার তেলাপোকা আমাকে ঘিরে ফেলে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিরশির করে ওঠে। লাইট অফ করলেই পুরো বাড়ি জুড়ে শুরু হয় তেলাপোকার রাজত্ব। মেঝে, মিটসেফ, বিছানা— সব জায়গায় তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য। ওরকম মৃত্যুময় অবস্থায় আমি মোমবাতির একটা টুকরোও খুঁজে পাই না।

হঠাৎ মনে হলো কানের ভেতর দাপাদাপিটা যেন থেমে গেল। আর মনে হতেই রান্নাঘরের মেঝেতে দাঁড়িয়ে হঠাৎ পাথর হয়ে যাই। নড়লে-চড়লে যদি আবার শুরু হয়? দম আটকে দাঁড়িয়ে আছি, পরক্ষণেই পিলে কাঁপিয়ে ফের সেটা দাপাতে শুরু করে। গোঙাতে গোঙাতে মেঝেতে বসে পড়ি। ঠিক এই সময় আচমকা ইলেকট্রিসিটি চলে আসে। ততক্ষণে আমি নেতিয়ে পড়েছি। কাঁপা কাঁপা হাতে কানের মধ্যে একগাদা পানি ঢেলে দেই। এবং ঘাড় কাত করে মাথার তালুতে থাপ্পড় দিতে থাকি। আশ্চর্য কাজ দেয়। একটু পরেই দেখি সাধারণের চাইতে সামান্য বড় আকৃতির একটা লাল পিঁপড়ের মৃতদেহ বেরিয়ে এসেছে। কানের যন্ত্রণা না কমলেও মানসিক শান্তিতে বিছানায় এলিয়ে পড়ি। খিদে আর ক্লান্তিতে অবসন্ন শরীরে আধো তন্দ্রায় বাকি রাত কাটিয়ে দিই।

পরদিন ভোরে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি, আর একদিনও এখানে থাকব না। সোজা বাবার ওখানে চলে যাব। পরক্ষণেই বাবার ওখানে যাবার ভাবনাটা আমাকে আরো অসহায় করে তোলে। এবং সেটা সম্ভবত এই ভাবনা থেকে যে, বিয়েটা আমি নিজের পছন্দে করেছিলাম। আমার এই সিদ্ধান্তে তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেও, জানি, আজ আমার এই পরিণতির দায়ভাগ তারা কিছুতেই নেবে না। ডিভোর্সের পর তাদের সঙ্গে প্রথম মুখোমুখি হওয়ার পর যে তিক্ততার সম্মুখীন আমাকে হতে হবে, ভাবতেই মনের গতি শ্লথ হয়ে আসে। চারপাশের এমন ছায়া, ঘোর বিভ্রম কখনো আমাকে মৃত্যু, কখনো জীবনের জল গেলাতে থাকে। স্রোত... স্রোত... নাকের জল কপাল অব্দি উঠছে, আর কুয়াশা— সেই ছায়া ভেদ করে একদিন হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢোকে আরেফিন। রাজনীতির সুবাদে উঁচু মহলের একজনের সঙ্গে

নাকি জানাশোনা আছে ওর। মোটামুটি চূড়ান্ত কথা হয়েছে। এখন শুধু ইন্টারভিউটা ফেস করতে হবে আমাকে।

হা! আমার ছেলেবেলায় বিস্কুট দৌড় খেলা। সুতোয় বাঁধা বিস্কুট মাথার ওপর ঝুলছে। হাঁ কর, লাফ দাও জোরে... আরো জোরে...।

কিন্তু চূড়ান্ত কথার পরও চাকরিটা শেষ পর্যন্ত হয় না। মনে আছে, প্রচণ্ড টেনশন চেপে শরীরে-মনে ভয়ানক জড়তা নিয়ে হাজির হয়েছিলাম। ছোট একটা প্রাইভেট ফার্মে অফিস সহকারীর চাকরি। ভারি অদ্ভুত লেগেছিল অফিসের পরিবেশ দেখে। স্কার্ট, স্লিভলেস ব্লাউজ পরে চুটিয়ে আড্ডা দিয়ে চাকরি করছে মেয়েরা। পুরুষের সংখ্যা খুবই কম। টানা প্যাসেজ ধরে প্রায় নিঃশ্বাস আটকেই সোজা বসের রুমে হাজির হয়েছিলাম। মেয়েরা এমন ভঙ্গিতে তাকাচ্ছিল, আমি যেন একটা চিড়িয়া। রুমে ঢুকে দ্রুত শাড়ির ভাঁজ ঠিকঠাক করি। কফির মরচে ধরা গন্ধ এবং বসের ঝাপসা মুখ। আমি অমুকের বোন অমুক, তমুক রাঘববোয়াল আমাকে পাঠিয়েছেন, এইসব ফিরিস্তি দেয়ার পর বস্ আমাকে চেয়ারে বসার অনুমতি দেন। এবং অকস্মাৎ কোনো ভান-ভণিতা ছাড়াই আমার সম্পর্কে মন্তব্য করে বসেন, আপনাকে তো তেমন স্মার্ট মনে হচ্ছে না।

বাইরে টাইপরাইটারের অস্পষ্ট শব্দ। দরজা ভেজানো, বসের ভুরু কোঁচকানো মুখ। ঠাণ্ডা চোখে চেয়ে আছেন আমার দিকে। মাথা জুড়ে বিশাল টাক। তাঁর কথা শুনে ভেতরের কাঁপন থেমে যায়। বোকার মতো প্রশ্ন করি, আপনি কী মিন করছেন?

আপনার ব্লাউজটা ভালো মতন ইস্ত্রি হয় নি, তাছাড়া কাঁধের আঁচলে সেফটিপিন আটকান নি। ফার্স্ট লুক বলে তো একটা জিনিস আছে।

মন্তব্যটা শুনে আমি দ্রুত আঁচল ঠিকঠাক করে বুকে সাহস জমিয়ে বলি, আপনি আমার ইন্টারভিউ নিন।

ইন্টারভিউই তো নিচ্ছি! তাঁর চোখে কেমন ক্রূর হাসি। আপনি কী ভাবছেন আমি আপনার সাথে খোশ-গল্প করছি? আমিও ক্রমেই সহজ হয়ে আসতে থাকি। বলি, কিছুদিন চাকরি করলেই আমি নিজেকে তৈরি করে নিতে পারব।

তিনি লম্বা করে সিগ্রেট টানেন, তাহলে প্রাথমিক পরীক্ষাটা হয়ে যাক, ধরুন, আপনি যখন কাজ করছেন, আই মিন চাকরি করছেন, তখন একজন পুরুষ আপনার গায়ে ধাক্কা দিল, আপনি কী করবেন? তার প্রশ্ন শুনে আমি পাল্টা প্রশ্ন করি, ধাক্কা কী তিনি ইচ্ছে করেই দেবেন?

হতে পারে। তিনি কফিতে চুমুক দিতে দিতে বলেন, ধরুন, ইচ্ছে করেই দিলেন।

ইচ্ছে করে হলে আমিও উল্টো তার গায়ে জোরে ধাক্কা লাগব, আমি বলি, যাতে সে হুমড়ি খেয়ে নিচে পড়ে যায়।

অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসেন তিনি, যদি গায়ে হাত দেয়?

কষে চড় লাগাব।

ঠিক আছে, আপনি এক হপ্তা পরে এসে খোঁজ নিয়ে যাবেন।

তখন আমার একটা চাকরির ভীষণ প্রয়োজন। আমি কী আর এক হপ্তা পরে যাই? তিন দিনের মাথায় গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। কিন্তু ভদ্রলোক আমাকে চেনেনই না। কেবল

হাজার কথার প্যাঁচ কষেন, আপনি! ও হ্যাঁ আপনিই তো, কী যেন! ও হ্যাঁ চাকরি! চাকরি হলে তো ডাকবোই। আসুন, এক হপ্তা পরে আসুন।

আরো এক হপ্তা! আমার মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। আরেফিন তার চ্যানেল ধরে আবারো দৌড়ায়। এক হপ্তা পর যথারীতি আবার যাই। তাঁর দেখা করার সময় নেই। অশ্লীল ভঙ্গিসর্বস্ব সব মেয়েদের মাঝখানে থ-মেরে বসে থাকি। এক সময় ঠেলেই ঢুকি। আমাকে দেখা মাত্র কুৎসিত ভঙ্গিতে চিৎকার করে ওঠেন তিনি, আপনাকে কে আসতে বলেছে?

জি আমি, আমার কথা জড়িয়ে যেতে থাকে, আপনিই তো বলেছিলেন।

পরে আসুন।— বলে তিনি ফাইলে নিমগ্ন হন। কী আর করা, বেরিয়ে আসি। পরে শুনি, আরেফিনের যে রাঘববোয়াল নেতা ছিল, তার সঙ্গে তার বসের কনট্রাক্ট ছুটে গেছে— চাকরি বাকরি এখানে হবে না। তাছাড়া এখানকার পরিবেশও ভালো না। কথাটা শুনে ঝিম মেরে বসে থাকি। কিন্তু আরেফিন হাল ছাড়ে না। দিনরাত সেই নেতার পেছনে লেগে থাকে। তার কাজ করে দেয়। এদিকে কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে চড়া রোদ মাথায় নিয়ে আমি একের পর এক অফিসে ক্রমাগত মরিয়া হয়ে ধন্না দিয়ে চলি। আসলে এভাবেই আমি জীবনকে তন্নতন্ন করে ছিঁড়েখুঁড়ে দেখেছি। ভেবেছি যুদ্ধ আর যন্ত্রণাই জীবনের আসল রূপ। মনের এই রকম অবস্থায় একদিন আরেফিন আলোর মতো, বাতাসের মতো খবর নিয়ে আসে, আমার একটা চাকরি হয়ে গেছে!

এসব ভাবতে ভাবতে যখন পাশ ফিরতে যাব, পিঠের ওপর কিসের তীক্ষ্ণ খোঁচা! লাফ দিয়ে উঠি। বাতি নেভানো হয় নি। বিছানা হাতড়ে একটা সুচ আবিষ্কার করি। কী ভয়ঙ্কর! বিছানায় সুচ পড়ে ছিল? এই তীক্ষ্ণ শলা আমার বুকে ঘা দিয়ে স্মরণ করিয়ে দেয়, নারী, তুমি কোথায় রাত কাটাচ্ছ! আসলেও আজকের এই রাত আমি এমন বাড়িতে কাটাচ্ছি, যার এলাকা দিয়ে হাঁটাও গতকাল আমার জন্য কল্পনার অতীত ছিল। ভেবে নতুন করে কাতর হই, শূন্য হই, ঘুমিয়ে পড়ি এক সময়।

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেলে বুঝতে পারি না, আমার অবস্থান আসলে কোথায়? বিভ্রান্তির ভেতর থেকে এক সময় বেরিয়ে আসি। প্রথমেই চোখ যায় দেয়ালে ঝোলানো হরিণের খটখটে মাথা ও শিঙের দিকে। তার খাড়া শিঙ দুটো আমার বুক ফেঁড়ে ভেতরে ঢুকে যায়।

আমাকে এখন সেই মহান ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি হতে হবে। আমি যখন ঘুমোতে আসি, তখনো তিনি বাইরে থেকে ফেরেন নি। রাতে তাঁর স্ত্রী আমার মা-বাবা, আমার সংসার ভেঙে যাওয়া আর আমি ঠিক আজকেই কোত্থেকে এলাম খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এসব ফিরিস্তি শুনে ফেলেছিলেন। আমি কোনো ব্যাপারেই খুব বেশি ভান-ভণিতার আশ্রয় নিতে পারি না। সরলভাবেই তাঁকে সব বলে দিয়েছি। সবকিছু শুনে তাঁকে বেশ দুঃখিত মনে হচ্ছিল। তিনি কি ভাবছিলেন তার ঘাড়ে উটকো একটা ঝামেলা এসে জুটল? জাহান্নামে যাক। আপাতত ভদ্রলোকের মুখোমুখি হওয়াটাই আসল। বিছানায় টানটান শুয়ে এদিক-ওদিক তাকাই। বুয়াও ঘুমিয়ে ছিল আমার ঘরে। কিন্তু এখন নেই। দরজা ভেজিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। আশ্চর্য, এই ঘরেও সেভলনের গন্ধ! আরো একটা গন্ধের মিশেল আছ। ড্যাম্প মেঝের সোঁদা গন্ধ। এ ঘরে আসবাব নেই বললেই চলে। মাঝখানে একটা খাট বেছানো, সাইডে একটা আলনা।

এক বছর আগের ক্যালেন্ডার ঝুলছে দেয়ালে। সম্ভবত এদের কোনো ছেলেপিলে নেই! সম্ভবত কেন, নেই-ই, থাকলে তো দেখতেই পেতাম। কী জানি বাবা, থাকতেও পারে। থাকলেই কী, না থাকলেই-বা কী! গতকাল অফিস কামাই দিয়েছি। ভেতরটা খচখচ করছে। অফিসের পরিস্থিতি তেমন সুবিধের নয়। হাজার রকম পলিটিক্স। এর মধ্যে আমার অনুপস্থিতি, কী যে হবে! ল্যাঠায় যাক, আজ তো শুক্রবার। হলিডে-র মুডটা নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। কিন্তু এই যে উদ্‌ভ্রান্তের মতো এখানে ছুটে এলাম, আমার সিদ্ধান্ত কী ? অনন্তকাল থেকে যাওয়া ? মামার হাতের লাড্ডু আর কী! তাহলে আর কী করব ? বাসায় ফিরে যাব ? ভাবনার তোলপাড় আমাকে ফের অবশ করে দিতে থাকে।

চাকরি হওয়ার পর পরই আরেফিন আমাকে একটা দম্পতির সঙ্গে সাবলেটের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। তাদের সঙ্গে প্রায় সাতমাস থেকেছি। ওরা স্বামী-স্ত্রী যে ঘরটায় থাকত, তার মাঝখানে সরু একটা প্যাসেজে ছোট্ট একটা চৌকি বেছানো। তারপরের ঘরখানাই আমার। তাদের সাথে সাত মাস থাকার অভিজ্ঞতা কষ্টকর, মায়াময়, কুৎসিত,বিচিত্র। আমার যেন জন্মই হয়েছে দাম্পত্য জীবনকে বাস্তব আর বিচ্ছিরি সব বোধের ভেতর দিয়ে বারবার চেনার জন্য। আমার সঙ্গে চমৎকার সমঝোতা ছিল তাদের। কিন্তু তারপরও প্রায়ই খুটখাট লেগে যেত। বেশি রাত অব্দি লাইট জ্বালাই, পানি বেশি খরচ করি! যদিও মাস কাবারি বিল আমরা ভাগাভাগি করে দিতাম। ফলে এসব নিয়ে গজগজ করা শুধু মহিলা আর আমার ভেতরেই সীমাবদ্ধ থাকলে কোনো কথা ছিল না। বাজারদরের চড়াগতি, বেতন বাড়ছে না, ভদ্রভাবে বেঁচে থাকাটাই এখন স্বপ্ন, যে দিন আসছে, দু'বেলা উপোস দিয়েও কূল রক্ষা করা যাবে না— এরকম উদাহরণের পর উদাহরণ টেনে এক এক সময় তার স্বামীও এসব ব্যাপারে নাক গলাতে শুরু করে। বলত, দেখুন বিল তো আমরা একা দিই না, আপনাকেও দিতে হয়। অবশ্য আপনার কথা আলাদা। আপনি চাকরি করেন, একলা মানুষ; তবুও যদি একটু বুঝেসুঝে চলেন...।

অনেক রাত অব্দি ঘুম না আসা তখন আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ফলে চোখের সামনে বই মেলে পড়ে থাকতাম। এই ব্যাপারটাতেই ওদের ছিল ঘোর আপত্তি। আমার বিয়ের পর রেজাউলের মাধ্যমে ভারি অদ্ভুত একটা ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল আমার। ছেলেটার নাম সত্যজিৎ। তার এক নম্বর নেশা আড্ডা দেয়া আর বইয়ের পাতায় আমগ্ন ডুবে থাকা। সত্যজিৎ ছিল রেজাউলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ফলে, আমার বাসায় তার আসা যাওয়া ছিল অবারিত। জঘন্য সেই বদ্ধ ঘরে সত্যজিৎ ছিল যেন এক ঝাঁক উদ্দাম হাওয়া। ঘরে ঢুকেই তার প্রথম কথা ছিল, এই ঘরে মানুষ থাকে ? তুই তো শালা বউটাকে কাবাব বানিয়ে ফেলবি। চল, চল একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি। ভীষণ বিব্রত রেজাউলের তখন পুতুপুতু শুরু হতো। আমি জানতাম, তার ভেতর নয়-ছয় হিসেব শুরু হয়ে গেছে। বাইরে যাওয়া মানেই রিকশা ভাড়া, চটপটি, ফুচকা...।

সেই সত্যজিতের সুবাদেই আমার কিছু ভালো বই পড়ার অভ্যাস তৈরি হয়েছিল। অবশ্য খুব ছোট্ট বেলা থেকেই নানা জাতের সভা-সমিতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম বলে আমার ব্যক্তিগত পাঠ-রুচি তেমন একটা খারাপ ছিল না। পরে সেই রুচির সঙ্গে কতকিছু যে এসে মিশলো! বিশাল এক বিশ্বের দরোজা খুলে গেল আমার চোখের সামনে। সারাদিন ঘিঞ্জি কাজের পর ওই একরত্তি রাতেই তো একটু পড়ার সুযোগ! আমি

কী আর ওই দম্পতির ক্যাঁচাল গায়ে মাখি ? বেতন পাই আর ক'পয়সা! আরেফিনকে সাহায্য করতে হয়। তার ওপর মফস্বলে থাকা বাবা-মা-ভাই-বোনাদের হাঁ করে তাকিয়ে থাকা তো আছেই।

এইসব খরচের পর বাড়তি বিলের একাংশও আমাকেই তো বহন করতে হতো। কিন্তু রাত জেগে বই পড়া, ওইটুকু শৌখিনতাও যদি আমাকে বলি দিতে হয়, তাহলে আমার আর থাকে কী ?

বাদ দিয়েছিলাম শেষ পর্যন্ত। আসলে কোনো ব্যাপারেই অতিরিক্ত ক্যাঁচাল আমার ধাতে সয় না। এই নিয়ে তাদের সঙ্গে একটা রফা হলেও কিছুদিন পর খিটমিট লেগে গেল অন্য একটা ব্যাপার নিয়ে। আমরা যে বাসায় থাকতাম, তার গা-ঘেঁসেই ছিল একটা বস্তি। সেই বস্তিরই একজন মহিলার সঙ্গে আমার কেমন অন্যরকম একটা হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। ওর স্বামীটি রিক্সা চালাত। ওদের ছিল একটা ফুটফুটে বাচ্চা। সেই মহিলা নয়, আমার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল তার শিশুটি। ওর চেহারায় এমন একটা কিছু ছিল, আমি সহজেই ওর অনুরক্ত হয়ে পড়ি। টলমল পা ফেলে হাঁটত। ওর কোমরে বাঁধা ঘুঙুরের শব্দ, খিলখিল হাসি, ধুলোমাখা নাদুসনুদুস শরীর আমাকে আশ্চর্য এক আবেশে ভরিয়ে রাখত। বাচ্চাটাও ছিল আমার জন্য পাগল। টানা বস্তির কাদাপাঁকে থই থই দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে সে একাই আমার দরজার কাছে নিঃশব্দে এসে দাঁড়াত, অদ্ভুত ভঙ্গিতে আমার ঘরের দরজাটা একটুখানি ফাঁক করে উঁকি দিত। আমি তাকাতেই ও এমন অভিনব কায়দায় জিব বের করত, আমি ছুটে যেতাম ওর কাছে। ওর সূত্র ধরেই ওর মা-ও আমার ঘরে আসত। আমার ঘর গুছিয়ে দিত। মাঝে মাঝে কাপড়-চোপড় কেচে দিত। এরি মধ্যে একদিন আমার প্রচণ্ড জ্বর। পাশের ঘরের দম্পতি কুমিল্লায় বেড়াতে গেছে। ঘরের ভেতরে আমি একা ছটফট করছি। কাতরাচ্ছি। জ্বরের তাপে কপালের শিরাগুলো ক্রমে নীলচে হয়ে উঠছে। বিছানা থেকে নেমে একটু পানি খাব, সে শক্তিও আমার ছিল না। ক্লান্ত চোখে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। শরীর খারাপ বলে অফিস থেকে সেদিন তাড়াতাড়ি চলে এসেছিলাম। এসেই নেতিয়ে পড়েছিলাম বিছানায়। তারপর ঘুম। ঘুম থেকে জাগতেই আমার শরীর যে বিছানার সঙ্গে এমনভাবে সেঁটে যেতে থাকবে, ভাবি নি। ঠকঠক কাঁপছিলাম। গিঁটে গিঁটে যন্ত্রণা। সর্দিতে নাক বন্ধ হয়ে আসছে। হাঁ করে দম ছাড়ছি। ঠিক এরকম একটা নাজুক মুহূর্তে মহিলাটি আমার ঘরে আসে। ওপরঅলা আমাকে যেন গভীর গহ্বর থেকে টেনে তোলার জন্যই তাকে পাঠিয়েছিলেন।

এসেই মহিলাটি হাঁ-হাঁ করে ওঠে, করছেন কী! এত জ্বর, আমারে জানাইবেন না! মইরা যাইবেন তো। আমার চোখের দৃশ্যপট থেকে তখন সবকিছু দূরে দূরে সরে যাচ্ছিল, ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে আসছিল সবকিছু। সেদিন সারারাত মহিলাটি আমার মাথায় জলপট্টি দিয়েছিল। পাশের দোকান থেকে প্যারাসিটামল কিনে এনে ভেজা পাউরুটির সাথে আমাকে গিলিয়ে খেতে সাহায্য করেছিল। আমার সঙ্গে মহিলার সেই রাত যাপনের খেসারত তাকে দিতে হয়েছিল। সারারাত কোথাও বসে মদ পান করেছিল তার স্বামীটি। সকালে সে ঘরে ফিরে এসে সব শুনে তাকে পিটিয়েছিল বেদম। এই ঘটনার পর থেকে বস্তির সেই মহিলার ঘরের দরজা এবং আমার দরজা এক হয়ে যায়।

কিন্তু ব্যাপারটাকে আমার পাশের দম্পতি কিছুতেই সহজভাবে মেনে নিল না। বাচ্চাটাকে ঘিরে আমার আদিখ্যেতা বউটির কাছে কেন জানি অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল। একদিন খেপে উঠে বলেই ফেলল, তোমার সমাজ বলতে কিছু নেই ? আমি এইসব ছোটলোকদের এই বাসায় কিছুতেই অ্যালাও করব না।

আমি নিরুত্তাপ উত্তর দিয়েছিলাম, ওরা তো আমার ঘরে আসে। তোমার অসুবিধের তো কোনো কারণ দেখছি না।

তুমি বুঝছ না, স্বর পাল্টে সে এবার বলতে থাকে, এরা চোর-ছ্যাঁচড়ের জাত, খাতির করে করে একদিন ঠিক দাঁও মেরে দেবে।

এইবার আমার সত্যি সত্যি হেসে মরার পালা, আমাদের কী আছে যে সে নেবে! আমার জবাবের ভঙ্গিতে সে আর কোনো কথা খুঁজে পায় না। হাল ছেড়ে দিয়ে কেমন চুপসে যায়।

অবশ্য ওদের দু'জনের সঙ্গে আমার যে শুধু খিটিমিটি লেগে থাকত, তাই নয়। এক সঙ্গে খাবার ব্যবস্থা হওয়ায় যদিও পেঁয়াজ-রসুন-তেল নিয়ে কোনো কোনোদিন সিরিয়াসলি লেগে যেত, কিন্তু বৌটি, মানে শানু,তার আশ্চর্য একটা গুণ ছিল, বেশিক্ষণ ভেতরে রাগ পুষে রাখতে পারত না। আমি তো কিছু ব্যাপারে একরোখা, জেদি। খিটিমিটি লাগার পর দরজা আটকে বসে থাকতাম। ফলে আপোস প্রস্তাব তার কাছ থেকেই আসত। চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলত, রাগটা একটু কমাও। এই রাগের জন্যই তো সব হারিয়েছ, তাও যদি না বোঝ।

এত করেও শেষ রক্ষা হলো না। একদিন ঘটল এমন বিচ্ছিরি একটা ঘটনা, যার জন্য উদ্‌ভ্রান্তের মতো আমাকে ঘর ছাড়তে হলো। এইবার আমার হাত-পা শিথিল হয়ে আসে। ভাবনার এই জায়গাটায় এসে আমি বিপন্ন হয়ে পড়ি। সৃষ্টিকর্তা! এই শানুকে আমি চিনি! কী ঘৃণা! যেন বল্লম সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আমার পিঠ দেয়ালে ঠেসে যাচ্ছে!

ঝনাৎ... মেঝেয় কিছু একটা পতনের শব্দে ধড়ফড়িয়ে বিছানা থেকে উঠে বসি। ভাবনার সুতো ছিন্ন হতেই দেখি হতবিহ্বল বুয়া দাঁড়িয়ে। আমার জন্য বেড-টি আনতে গিয়ে দরজায় ধাক্কা খেয়ে ট্রে-সহ চায়ের কাপ চিৎপাত। মেঝের ওপরে ভাঙা চায়ের কাপটার টুকরোর ছড়াছড়ি। ওদের সম্ভবত বেড-টির রেওয়াজ আছে। ছি ছি, লজ্জাটা বুয়াকে নয়, আমাকেই স্পর্শ করে বেশি। ভীষণ অস্বস্তি নিয়ে তার দিকে তাকাই, আমাকে চা দিতে কে বলল ?

খালাম্মা, থতমত খেয়ে ঢোক গিলতে গিলতে সে বলে, চা খায়া আপনেরে যাইতে কইছিল। কথাটা বলে বুয়া নিজেকে সহজ করে নিয়ে কাচের টুকরোগুলো তুলতে থাকে। ইরফান সাহেব নিশ্চয়ই অনেক রাতে ফিরেছেন। কাল বিকেল থেকে সকাল পর্যন্ত ঘোরের মধ্যে যা কিছু করেছি, এইবার যেন তার মধ্যে সচেতনতা ঢোকে। এ আমি কোথায় এসেছি ? লজ্জায়, অস্বস্তিতে আমি একেবারে থুবড়ে পড়ি। এখন এ ঘর থেকে বেরুনো মানেই সেই মহামানবের মুখোমুখি হওয়া। তাঁর ছুঁড়ে ফেলা প্রেমিকা আমার মা, আর সেই মা'র মেয়ে আজ অযাচিত ছ্যাঁচড়ের মতো তাঁর দরজায়। ঘেন্নায় রি রি করে ওঠে শরীর। জীবনের প্রথম আমি আহম্মকের মতো নিজেকে ছোট করলাম।

পুরো রাগটাই গিয়ে পড়ে সত্যজিতের ওপর। ঝোঁকের মাথায় ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা চলে গিয়েছিলাম তার কনফেকশনারিতে। সে তখন বেচাবিক্রি নিয়ে ব্যস্ত। আমাকে দেখেই চেঁচিয়ে ওঠে, কী-রে, অফিস বাদ দিয়ে এখানে! গিলে এসেছিস নাকি ?

ওসব গু-মুত আমি খাই না, আমার মেজাজ তখনো তেতে ছিল। তুই তোর কর্মচারীকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আয় তো। কথা মতো সত্যজিৎ বেরিয়ে আসে। বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে আমার পাশাপাশি হাঁটে।

কী-রে, তোকে আজ সিরিয়াস লাগছে, ব্যাপার কী! কোনো গণ্ডগোল হয় নি তো ?

আমি এবার ভেঙে পড়ি, বিশ্বাস কর সত্যজিৎ, আমি আর পারছি না। এভাবে বাঁচা যায় না।

সে রিকশা ডাকে। উর্ধ্বশ্বাসে সেটা তখন ছুটছে। মাথার ওপর তির্যক রোদ। হাত ব্যাগ মাথার ওপরে দিয়ে নিজেকে ছায়াবৃত করার চেষ্টা করি। সত্যজিৎ রিকশায় বসে মজা করে বলে, এবার আমাকে বিয়ে করে ফেল।

আমি খেপে যাই, প্যাঁচাল রাখ তো। তোর মতো মালাউনকে বিয়ে করে দোজখে যাই আর কী!

দোজখে তোর এক পা তো চলেই গেছে, আকাশ মুখো এক রাশ ধোঁয়া ছুঁড়ে দেয় সত্যজিৎ। স্বামীকে তালাক দিয়েছিস, তোদের ধর্মমতে ভীষণ গর্হিত কাজ। এখন আমাকে দিয়ে পাপটাকে সম্পূর্ণ কর... আরে আরে... এত রেগে উঠছিস কেন, যা বলবি ঝটপট বলে ফেল, নতুন কোনো ফ্যাকড়ায় পড়েছিস নাকি ?

না না তা নয়। আমি কেমন অবসন্ন হয়ে পড়তে থাকি। আমার মগজের পথ ধরে সার সার পিঁপড়ে হাঁটতে শুরু করে, একটা বাসের মুখোমুখি পড়েও অল্পের জন্য বেঁচে যায় আমাদের রিকশাটি। রিকশাঅলার ক্ষিপ্র গতিতে রিকশা সরানোয় দু'জন প্রচণ্ড ঝাঁকি খাই। ব্যাপারটায় খেপে যায় সত্যজিৎ। রিকশাঅলাকে মারার জন্য হাত উঠাতে গেলে আমি ওকে প্রায় চেপে ধরি, প্লিজ কোনো সিন ক্রিয়েট করিস না। আজ অনেকদিন পর আমি অফিসে যাচ্ছি না।

আবার বিশাল রাজপথের মাঝখান দিয়ে চলা। সত্যজিৎ প্রস্তাব দেয়, চল্ সালাহ্দিনের ওখানে যাই, শালা দু'দিন যাবৎ দরজা-জানালা বন্ধ করে উপন্যাস লিখছে। কেউ ধাক্কালেও খুলছে না। আজ ওর দরজা ভেঙে হলেও ঢুকব। না হলে তুই তো আছিসই। মেয়েমানুষের মিনতি-ভরা গলা শুনলে শালার দেবতাও মরা ঘুম থেকে জেগে ওঠে।

ব্যস্, বারোটা বেজে যায় ওখানে গিয়েই। যেমনটা ভেবেছিলাম, পরিস্থিতি তার পুরো উল্টো। সালাহ্দিন খাড়া টেবিলে ঠ্যাং উঠিয়ে মজাসে আড্ডা দিচ্ছে শাহতাব আর রঞ্জনের সঙ্গে।

আমাদের দেখে ওদের তিনজনের আরে... হলো... চেঁচামেচি হলো... কেমন আছ হে... হলো...। এক সময় তিনজনই ঝিম মেরে যায়। আজ কেমন গাঢ় আর কোমল মনে হয় ওদেরকে, বিশেষ করে রঞ্জনকে। কেমন দপ করে জ্বলেই যেন আবারো নিভে গেল। ওর চাপ দাড়ি, ধূসর চোখ, ছিপছিপে শরীরের চারপাশ ঘিরে উড়ন্ত ধোঁয়া, কুণ্ডুলি পাকানো, ছেঁড়া ছেঁড়া।

এক সময় ভণিতা না করে সালাহ্‌দিনই বলে, আজকে শালা আমার উপন্যাস তাহলে চাঙ্গে উঠল! গাউছিয়া মার্কেটে হেভি পুলিশ সার্চ হয়েছে। রন্‌জু শালাকে ন্যাংটা করে ছেড়ে দিয়েছে।

মানে, আঁতকে ওঠে সত্যজিৎ, কত টাকার মাল?

দেড় লাখ টাকার, টগবগে রঞ্জুর গলা থেকে তেতো রস বেরিয়ে আসে। শাহতাব চেঁচিয়ে বলে, এতক্ষণ এই নিয়েই হচ্ছিল... শালারা ইন্ডিয়ান মাল মনে করে অনেক বাংলাদেশী শাড়িও নিয়ে গেছে। সিগন্যাল পেয়ে দোকানের পেছনে বস্তার নিচে দামি কয়েকটা লুকিয়েছিল, নইলে ষোল আনাই চলে যেত।

ও আর ক'টা শাড়ি, সালাহ্‌দিনের গলায় ক্রোধ, শালারা বর্ডারে আটকাতে পার না, বউ-শালিরা শাড়ির জন্য ইয়ে দিলেই... মাইরি মুখ খারাপ করতে চাই না... এসো সার্চ মারাতে। রন্‌জু শালা কত হাতে পায়ে ধরে বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে শুরু করল... বাপটা তো ওকে বিশ্বাসই করতে চায় না। তারপরও যা একটু দাঁড়াচ্ছিল! যাও, শালা যাও, পুরানা লাইফে ফিইরা যাও, খিস্তির পর খিস্তি বেরোতে থাকে সালাহ্‌দিনের মুখ থেকে।

আমি মহাফাঁপরে পড়ে যাই। আচমকা এমন দুঃসংবাদের মাঝখানে পড়ার কোনো প্রস্তুতি আমার ছিল না। আমি এলে এদের সঙ্গে বেশির ভাগ আড্ডা হয় সাহিত্য, সামাজিক বিপর্যয়, প্রেম-ভালবাসা— এইসব নিয়ে। অথচ আজ তাদের আলোচনা ক্রমেই বাংলাদেশের রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতার দিকে যেতে থাকে। রাজনীতি আমার মগজের আশপাশ জুড়ে কখনো সখনো ঘোরাফেরা করলেও সেটা কখনোই ফাঁপা মাথা ভেদ করে ভেতরে ঢোকে না...। আমার এখন আরেফিনকে মনে পড়ছে, কেন, কিসের পেছনে সে এমন উদ্‌ভ্রান্তের মতো দৌড়চ্ছে, আমি বুঝি না। অনার্সের মতো পরীক্ষায় কেউ শাদামাটা একটা পাস দেয়, যার বাবা-মা'র প্রাণ শুধু তেলের অভাবে দপদপ করছে, যার বোন সকাল থেকে স্রেফ ক'টা টাকার জন্য অবিরাম সংগ্রাম করে, তার ভাই কি-না হলে থেকে রক্তক্ষয়ী বিচ্ছিরি স্বার্থের রাজনীতির শৌখিনতায় নিজেকে সেঁধিয়ে দেয়? ধুৎ, মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এদের সামনে এত ধোঁয়া! এরা তো আবর্তিত নিজেদের মধ্যে! অস্বস্তি লাগে। তামাকের পাতায় কী সব শুকা ভরছে সালাহ্‌দিন। সিমেন্ট উঠে যাওয়া মেঝের অংশটায় পা ছড়িয়ে বসেছে শাহতাব। ছোট চৌকির ওপর ঠাসাঠাসি রন্‌জু, সত্যজিৎ। বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে...সালাহ্‌দিন শুরু করে। বাড়ি থেকে চিঠি আসার কাসুন্দি সবখানেই এক। কী ভয়াবহ একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়েছি, অথচ ঢাকায় একরাত থাকার মতো একটা জায়গা নেই। সিদ্ধান্ত নিয়েছি, একেবারে স্থির সিদ্ধান্ত, ও বাড়িতে আর ফিরব না। তার পরপরই মাথার জট খোলার জন্য আজ এখানে আসা। আমার কী নিয়তিই এই, জট খুলতে এসে আরো দ্বিগুণ শক্ত জটে নিজেকে পেঁচিয়ে ফেলা?

ছোট্ট দেয়াল ঘড়িটার পেন্ডুলাম স্থির নিশ্চল। স্নো-র বিজ্ঞাপনে স্থূলাঙ্গী মহিলার হাসি। ব্লাউজ উপচে পড়ছে জীবন্ত মাংসখণ্ড। এদের চিৎকার, হতাশা, গ্লানির মাঝখানে আমার চারপাশ ঘিরে নেমে আসে অবর্ণনীয় নির্জনতা। সেই নির্জনতা হলুদাভ অথচ নিরাকার অথচ তার একটা রূপ আছে, অথচ তা যেন ফাঁপা সব তুলোর মতো, ধোঁয়া...। আসলেই আমি কী জেগে আছি? অনেক্ষণ পর ঝিমুতে-ঝিমুতে হাত বাড়ায় সত্যজিৎ, টান দিবি?

আমার ঠোঁট জোড়া ফুলে ওঠে। আমি তার বাড়ানো হাত দেখি। কোনো শব্দ শুনতে পাই না। আচ্ছা, আমার করোটির মধ্যে এমন ঝনঝন শব্দ হচ্ছে কেন? এদের ওগরানো ধোঁয়ায় আমিও কী আচ্ছন্ন? কী দারুণ ছবি ক্যালেন্ডারে! দেয়ালে প্রকট চুন, পানের পিকের মাঝখানে সাঁই সাঁই করে ধাঁধিয়ে আছে। আর অনাহূতের মতো একটা চেয়ারে আমি বসে আছি। আচমকা উঠে দাঁড়াই এবং এদের আরে আরে... উপেক্ষা করে জরুরি কাজের কথা বলে বেরিয়ে পড়ি। এবং মগজ থেকে ধোঁয়া অদৃশ্য হয়ে যাবার পর অকস্মাৎ সিদ্ধান্ত নিই ইরফান চাচার বাসায় যাব। আমাদেরই এক আত্মীয় একদিন নিউ মার্কেটে যখন ভদ্রলোকের ঠিকানাটা দিয়েছিলেন, তখন ব্যাগের মধ্যে কাগজটা দুমড়ে রাখার সময় কল্পনাও করি নি, ওই বাড়িতে আমি স্বপ্নেও কখনো যাওয়ার কথা ভাবব। অথচ সেই বিপন্নতায় ভূতগ্রস্তের মতো এই বাড়ির কথাই প্রথমে মনে হয়েছিল। তারপর বাহান্ন গলির তেপ্পান্ন পাক খেতে খেতে...। কিন্তু এ-ঘর থেকে এখন বেরুতে পারাই একটা সমস্যা। তারপর আবার চাচির স্থির দৃষ্টির মুখোমুখি হওয়া। ভদ্রলোকের সামনে গিয়ে আমি বলবটা কী? আমার এর পরের সিদ্ধান্তটাই-বা কী? সবচেয়ে প্রথম কাজ আরেফিনকে খুঁজে বের করা। এ বাসার অস্বস্তিকর বদ্ধতা থেকে যত জলদি বেরুনো যায়, আমার জন্য ততই ভালো। ঘর-ঘেঁসা বাথরুমে ঢুকে চোখের জলের ঝাপটা দিতে দিতে ভাবছিলাম শানুর কথা। তার সেই চেহারা, আমাকে তার অকারণ ঘেন্নার গনগনে মুখ। শরীর দিয়ে বিষ নামানো কটূক্তি। আমি ছটফট করে উঠি। বাথরুমের আয়নায় নিজের জলমগ্ন মুখ দেখি। কী বিবর্ণ, ক্লিষ্ট! নিজেকে প্রশ্ন করি, কিহে! কেমন আছ?

বুকের মধ্যে হাওয়ার ফরফর ঘূর্ণি। ধুলো উড়ছে। শুকনো পাতা উড়ছে। কেমন শূন্য করে দিচ্ছে আমাকে। ভুলে টুথব্রাস আনা হয় নি। বাথরুমেই পড়ে আছে। ফলে আঙুলেই পেস্ট লাগিয়ে দাঁতে চেপে ধরি। কী এক ভাবনার ঘোরে জোরে চাপ দিই। চারপাশে সমাচ্ছন্ন আঁধার— কী গাঢ়, কী প্রকট সেই ছায়া!

আমি যেখানে ছিলাম সেই শ্যাওলাধরা বিল্ডিংটার পাশ ঘেঁসে একটা দেবদারু গাছ উঠে গেছে। তার সামনে এক টুকরো বারান্দা। মাঝখানে ঘাসের জমিন। তার কিছুটা দূরেই সেই বস্তি। বারান্দায় বসেই আমি তাদের ভূতুড়ে জীবন— দুর্বহ গন্ধ, চিৎকার, চ্যাঁচামেচি, হাতুড়ির ঠুনঠুন শুনতে পেতাম।

গতকালকের রাতের পুরো ঘটনাকে উল্টেপাল্টে দেখি। বিশ্লেষণ করি। ঘটনাটার ঠিক কোনখানে আমার অবস্থান, কোন জায়গাটায় আমাকে দায়ী করা যায়! সে রাতে আমার চোখে ঘুমটা সবে লেগে এসেছে, আচমকা ঝনঝন শব্দ শুনে উঠে বসি। পাশের ঘরে তাহলে শুরু হয়ে গেছে। ক্রোধের সময় জিনিস আছড়ে ফেলা শানুর অভ্যাস। এ তারই আলামত। তারপর সবকিছু কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা, সুনসান, যেন কিছু হয় নি। আচমকা শানুর হিস হিসানি শুনতে পাই, কুত্তা... শুয়োর... তারপর একটানা গোঁ-গোঁ শব্দ। এসবই ওদের প্রতিদিনের ঘটনা। কিন্তু আজ বোধহয় কামাল ভাই শানুর গলা চেপে ধরেছে। দ্রুত বিছানা ছেড়ে উঠে যাই। উদ্‌ভ্রান্তের মতো শানুদের ঘরের দরজায় গিয়ে আঘাত করি। কিন্তু ধস্তাধস্তির শব্দের মধ্যে আমার কড়ানাড়া ডুবে যায়। ভয়ে আতঙ্কে আমার শরীর কাঁপতে থাকে। ক্রোধের সময় ওর স্বামীর যা চেহারা হয়, খুনির চেয়েও ভয়াবহ।

এবার শানুর কান্নার শব্দ শুনতে পাই। যা হোক তেমন ভয়াবহ কিছু ঘটে নি। শিথিল শরীরে আমি সোজা ফিরে আসি বিছানায়। বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই কোথা থেকে ছুটে আসে রেজাউলের প্রেতাত্মা। সে নিঃশব্দে আমার পাশে শোয়। গলায় হাত রাখে। একসময় কণ্ঠনালি চেপে ধরে। হুবহু শানুর স্বামীর মতো ওর চেহারা।

আমার কান্না পেতে থাকে। এক সময় এই সবের মধ্যেই প্রতিদিনের ঘুম নামতে থাকে চোখে। রেজাউল কী এমন ছিল ? প্রত্যেকটি মানুষই তো আলাদা। তুলনা চলে ?

তখন হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। কী কী সব বাজে স্বপ্ন দেখছিলাম। ছাদের ওপর থেকে পড়ে যাচ্ছি। দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে থাকলে দেখি সে আমি নই। আমার ছোটবোন রানু। হঠাৎ ঘুম ভাঙার পর আমার আকুলভাবে রানুকে মনে পড়তে থাকে। কতদিন বাড়ি যাই না! কদ্দিন ওদের দেখি না। এমন হয়েছে মাসেও এখন একবার ওদের কথা মনে পড়ে না।

এসব ভাবতে গিয়ে কিছুতেই আর ঘুম আসে না। মাথার লাগোয়া জানলার খটখটে পাল্লাটা সামান্য বাতাসেই খুলে গেল। এবং তারপরেই বাইরে থেকে কার যেন ঘন নিঃশ্বাস আছড়ে পড়ার শব্দ পাই। প্রথমে মনে হয় এ আমার মনের ভুল। কিন্তু শব্দটা ক্রমেই বাড়তে থাকে। লাফ দিয়ে উঠে বসি। জানলার কাছে চোর এসেছে ? মুহূর্তে আমার শরীরের লোম খাড়া হয়ে যায়। সরাসরি পর্দা তোলার সাহস পাই না। নিঃশব্দে দরজার কাছে ছুটে যাই। এবং সন্তর্পণে ছিটকিনি খুলে ঘরের মাঝ বরাবর সরু প্যাসেজ ধরে হাঁটি। শানুর দরজায় দ্রুত নক করি। একবার দু'বার। আমার সমস্ত শরীর কাঁপছে। ভেতরে বাতি জ্বলে ওঠে। আড়মোড়া ভেড়ে শানু দরজা খুলে চোখ গোল করে, তার স্বামী বিছানায় নেই। পেছনের দরজা ভেজানো। এক সঙ্গে ঘুমুলো, অথচ বিছানা খালি কেন ? শানুর গলার স্বর ভেজা অথচ অস্পষ্ট... তুমি উঠে এসেছ কেন ? ওর কথায় কেন জানি আমার সাহস বেড়ে যায়। যদিও কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। তারপরও ওকে টেনে আমার ঘরের দিকে নিয়ে আসি। পুরো ঘটনাটা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ঘটে যায়। আমার জানালার কাছে তাকে নিয়ে এসে চাপা উত্তেজনায় ফিসফিস করি, তুমি কোনো শব্দ শুনেছ ? শানু কান পাতে— শব্দটা এখন অন্য রকম। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর কেউ যেন হাঁপাচ্ছে— এরকম বোধ হয়। একসময় শানুর ক্ষিপ্র হাত আমার দরজাটা খুলে ফেলে এবং প্রায় দৌড়ের ভঙ্গিতেই সে বারান্দা অতিক্রম করে একটু ঘুরে আমার জানালার কাছে ছুটে যায়। হতভম্ব আমিও তার পেছন পেছন ছুটি। তারপরই আমার শরীরে রীতিমতো থর কাঁপুনি। বিবর্ণ আলোয় দু'টি ছায়ামূর্তির ছিটকে দু'দিকে সরে যাওয়ার দৃশ্য স্পষ্ট হয়। এবং একটি পুরুষ ছায়া পায়ের সমস্ত শক্তি নিয়ে ছোট্ট ঘাসের জমিন অতিক্রম করে রাস্তার দিকে দৌড়ে অদৃশ্য হলেও অবিন্যস্ত, বিপর্যস্ত মহিলাটি পালিয়ে যাওয়ার কোনো চেষ্টাই করে না। শানু ততক্ষণে তার চুলের গোছায় হাত দিয়েছে। এবং আমি বরফ শীতল চোখে বস্তির সেই রিকশাঅলার বৌটিকে দেখি। অবিকল স্ট্যাচুর মতো সে দাঁড়িয়ে। চুল ধরে হিড়হিড় করে তাকে টেনে আনে শানু। আমার বিপন্ন কণ্ঠস্বর তার ম্রিয়মাণ দেহকে কাঁপিয়ে দিয়ে প্রায় ঝাঁঝিয়ে ওঠে, কালুর মা, তুমি! কিন্তু লোকলজ্জার ভয়ে কালুর মাকে খুব বেশি ঝাড়তে না পেরে তাকে ঘাড় ধরে ঠেলে বের করে দিয়ে শানু এবার ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার ওপর।

আমি মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় কাঁপছিলাম। কালুর মা তার কান্না-ভেজা জবানবন্দিতে যেটুকু বলে, তার সারকথা শুনে কান্নার দমকে আমার বুকের প্রান্তর জুড়ে শুরু হয়ে যায় প্রবল

তুমি তাহলে বাসায় ফিরে যাবে বলে ঠিক করেছ ? চাচির হিম ঠাণ্ডা প্রশ্নে চমকে মাথা তুলি।

হ্যাঁ, অস্বস্তি নিয়ে বলি, আসলে এই যে আমার হুট করে এখানে চলে আসা, পুরো ব্যাপারটাই ইমোশনালি ঘটেছে।

তাতে কী, চাচির গলায় না সমর্থন, না প্রতিবাদ, মানুষেরই এমন হয়। মানুষ কী আর সারাক্ষণ হিসেব করে চলতে পারে ? আসলে বাথরুম থেকে বেরুতে বেরুতেই সিদ্ধান্তটা নেই। পুরো ব্যাপারটাই কেমন যেন গুলিয়ে যেতে থাকে। শানুর মানসিক সঙ্কটকে ক্রমেই নিজের করে নিতে থাকি। মানুষের এইরকম বিপর্যয়কর সময়ের কোনো অভব্য আচরণকে গুরুত্ব দিতে নেই। সত্যিই তো, ওর স্বামী যদি আর না ফেরে ? লজ্জা বড় ভয়ানক ব্যাপার। এর দায়ভাগ বাহ্যত আমাকেই বহন করতে হবে, যদিও এক্ষেত্রে আমার বিন্দুমাত্র দোষ নেই। কাল্লুর মার সঙ্গে আমার জানা-শোনা না হলেও ব্যাপারটা ঘটতে পারত। স্বীকার করি, তার সঙ্গে আমার সম্পর্কের পথ ধরেই ঘটনাটা ঘটবার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু ঠিক এই ব্যাপারটা তো অন্য কোথায়ও ঘটতে পারত! একই ঘটনা বাইরে কোথাও যে ঘটে নি তা-ই-বা বলি কী করে ? যেহেতু এর সঙ্গে যে জড়িত, সে নিজেই ইনোসেন্ট নয়। অনেকদিন ধরেই সে কাল্লুর মাকে নানাভাবে ফোসলাচ্ছিল। আর এ থেকেই বুঝতে অসুবিধা হয় না, এটা কোনো দুর্ঘটনা নয়। তার মনে অনেক আগে থেকেই এইসব কাজ করছিল। আমাকে কেন্দ্র করেও যে ভদ্রলোকের মনে এইসব ইচ্ছে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে না তারই-বা নিশ্চয়তা কী ? হয়তো নিজেকে সে সংযত রাখে। আমি লেখাপড়া জানা মেয়ে, অফিসে চাকরি করি—জায়গাটা খুব বিপজ্জনক, তাই হয়তো নিজেকে চেপে রাখে। আসলে সব মানুষের পক্ষে আত্মার কাছে শুদ্ধ থাকা সম্ভব হয় না। যেহেতু একজনের ইচ্ছেই তাকে জাগ্রত করে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখাটাই তো মানুষের সভ্যতা। আমার কী ইচ্ছে হয় না ? রেজাউলের সঙ্গে আমার এতদিনের অভ্যেস। অথচ একেকদিন কী মধ্যরাতে খোলস খুলে শরীরটা বেরিয়ে পড়ে না বিশাল আকাশের নিচে ? সে নগ্ন হয়, ছটফট করে। কাতরায়। তাই বলে শানুর ঘর থেকে তার স্বামী বেরিয়ে এলেই আমি নিজেকে ছেড়ে দেব ? আমার বোধবুদ্ধি আমাকে নিয়ন্ত্রণ করবে না ?

সন্ধ্যায় দু'জনের মধ্যে প্রচণ্ড ঝগড়া। ঝগড়ার উৎস আর কিছু নয়, টাকাকড়ির ঘাটতি। ঝগড়াঝাটির একপর্যায়ে কাঁদতে কাঁদতে শানু ঘুমুতে চলে যায়। তারপর তার পাশ থেকে উঠে মাঝরাতে তার স্বামী বেরিয়ে গেল। ঘটনাটা কোনোমতেই ক্রোধ থেকে ঘটে নি। আগে থেকেই ছক-করা ছিল। এখানে আমার অন্যায় কতটুকু ? কাল্লুর মা'র সঙ্গে তার স্বামীর অমন নটঘটের দৃশ্যটা দেখতে শানুকে সাহায্য করেছি, এই তো ? মাঝরাতে নিঃশব্দেও ঘটনাটা ঘটতে পারত। তাহলে সবকিছু থাকত শান্ত। কেউ কিছু না জানলেও কোনো কষ্ট ছিল না। বিপর্যয়কর কিছু ঘটত না। ব্যাপারটা নতুন করে উপলব্ধি করি। কিন্তু শানুকে এগিয়ে নেয়ার সময় আমি কী জানতাম আসলে এমন কিছু ঘটতে যাচ্ছে। তাহলে, ঘটনার কোনখানে আমি ? যা হোক, এখন আমার চাইতেও শানু বেশি অসহায়। ঝোঁকের মাথায় তাকে ফেলে আসা উচিত হয় নি আমার। এই রকম ভেবেটেবে নিজেকে নরম করে আমি চাচির ঘরে এসেছি। আমার এই সিদ্ধান্ত আমাকে নতুন করে অস্থির করে তুলছে। তাছাড়া গোড়া থেকেই আরেকটা টেনশান কাজ করছে,এই বুঝি ঘরে ঢুকলেন ইরফান চাচা। শুনেছি তিনি রাশভারী, ভীষণ গম্ভীর। তাঁর মুখোমুখি হওয়ার কথা ভাবতেই জ্বর

উঠছে শরীরে। কীভাবে ভদ্রলোককে পাশ কাটানো যায়, মনে মনে তার উপায় খুঁজতে থাকি। শেষে প্রশ্ন করি, চাচা ঘুম থেকে উঠেন নি?

না, প্রশান্ত জবাবে চাচি চা এগিয়ে দিতে দিতে বলেন, রাতে বাইরে আড্ডা দিলে উনি দশটা পর্যন্ত ঘুমোন।

আমাকে যে এক্ষুণি যেতে হয়। চায়ে চুমুক দিয়ে ছটফট করি আমি। গলার কাছে শুধু আটকে যাচ্ছে।

সে-কী! দেখা করবে না তাঁর সঙ্গে? চাচির বিস্ময়ে কোনো গাঢ়তা নেই। আমিও প্রশ্রয় পেয়ে বলি, আজ থাক। আমার কেমন অস্বস্তি হচ্ছে। আমি আরেক দিন আসব না হয়।

চাচি কী আমার অস্বস্তিকে মূল্য দিলেন? আশ্চর্য! কোনো প্রতিবাদ করলেন না! এরা এত ভদ্র কেন? একটু বেশি মাত্রায়? নাকি আমাকে এড়াতে চাইছেন। বুড়ো বয়সে এরকম যুক্তিহীন ঈর্ষা! কী জানি। বয়স্কদের সাইকোলোজি আমি কতটুকুই-বা জানি। আর যুক্তিহীনই বা বলি কী করে? মার সঙ্গে তাঁর স্বামীর কতটুকু সম্পর্ক ছিল? কতটা গভীর? এর কতটা জানেন চাচি? সে আমলের প্রেম কতটা ছোঁয়াছুয়ির পর্যায়ে গিয়েছিল? ধুৎ!

চাচির শোয়ার ঘরে কী বিশাল পালঙ্ক, কী ভীষণ উঁচু! এমন পালঙ্ক আমি জাদুঘরে দেখেছি। দেখে ভাবতাম, রাজা-বাদশাদের কী আজগুবি শৌখিনতা! সিঁড়ি বেয়ে পালঙ্কে ওঠো। কোনোদিন কী দ্রাক্ষারসের ঘোরে লোহার সিঁড়ি থেকে পা ফসকায় নি? অবশ্য রানী তো সঙ্গেই থাকতেন, উৎকৃষ্ট বাঁদি— নিশ্চয়ই সে-ই রক্ষা করত...। এই বিছানায় অবশ্য সিঁড়ি দিয়ে না উঠলেও চলে। অতটা উঁচু নয়। পালঙ্কের স্ট্যান্ডগুলো ভীষণ কালো। বেঁকে বেঁকে সাপের মতো ওপর দিকে উঠে গেছে। চাদরটা মখমলের। চেয়ার দুটোও রাজকীয় ঢঙের। বিশাল তার আকার। সব কিছু মিলিয়ে ঘরের ভেতর বেশ একটা দরবারি হাওয়া। দেয়ালে চমৎকার দুটো তেলছবি। সত্যিই চমৎকার। অ্যাবস্ট্রাক্ট ফর্মের। দৈত্যের মতো একটা লোক... চারপাশে প্রচণ্ড ঝড়, দৈত্যটা তার সাত-সাতটা হাত উঁচিয়ে ধরেছে সাতদিকে। দুটো হাতের মুঠোয় পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ। সারা ক্যানভাসে লাল-নীল রঙের ছোপ। অন্য ছবিটা ধ্বংসস্তূপের। নিখুঁত একটা অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ। ইট-পাথরের এত জীবন্ত রূপ ছবিতে আমি আগে কখনো দেখি নি। দেখতে দেখতে আমার ছবি আঁকার ঘুমন্ত ইচ্ছেটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। হাত নিশপিশ করে। আমার কেমন কষ্ট হতে থাকে। আমাকে অমন করে ছবি নিরীক্ষণ করতে দেখে চাচি বললেন, আমি এসবের কিছুই বুঝি না। তোমার চাচার এক সময়ের সংগ্রহ।

এই রুচিবান ভদ্রলোকটি আমার মায়ের মতো আটপৌরে, অগভীর আর ম্যাড়মেড়ে এক মহিলাকে ভালবেসেছিলেন? অদ্ভুত এক বিস্ময় আমাকে বিমূঢ় করে দেয়। সেই সাথে ভেতরে ভেতরে ভীষণ অহঙ্কারীও হয়ে উঠি। এবং বেরিয়ে আসি। এখন কী যে ঝরঝরে আর নির্ভার লাগছে নিজেকে!

ইরফান চাচার সঙ্গে দেখা না হওয়ার স্বস্তিটা দ্বিগুণ। নির্মল বাতাসে গা ভাসাই এবং দীর্ঘদিন পর টানা রাস্তায় সোজা রিকশায় চেপে বসি।

চলো হে পথ চলো, বলতে বলতে প্রথমে আরেফিনের হলের দিকে যাওয়ার কথাই ভাবি। ব্যাপারটা নিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলা দরকার। কেননা শানুদের সঙ্গে সে-ই আমাকে

ভিড়িয়ে দিয়েছিল। তবে এও জানি ইরফান চাচার বাসায় যাওয়ার ব্যাপারটা সে কিছুতেই সহজভাবে নেবে না। কী ভাববে ও আমাকে? নির্বোধ? ব্যক্তিত্বহীন? ছ্যাঁচড়া?

আমার এই ইমোশনের ব্যাখ্যা কীভাবে দেবে সে? ফের গভীর গাড্ডায় তলিয়ে যেতে থাকি। শূন্য হয়ে আসতে থাকে সব।

উল্টো পথ ধরে হাঁটছে অট্টালিকা, আকাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে এই-মাত্র-ওঠা সূর্য, দ্রুত ধাবমান ট্রাক-বাস আর উচ্ছৃঙ্খল রিকশা-টেম্পো। হুড ফেলে মিহি রোদে মাথা পেতে দিই। সেই রোদ, বিস্তৃত রাস্তা, ট্রাফিক জ্যাম, লাল-হলুদ বাতির জ্বলা-নেভা— এইসব উজিয়ে রিকশা মেহেরুন্নেসা মার্কেট পার হয়। ডান পাশে সার সার জুতোর দোকান। রকমারি সব জুতোর ডিজাইন। বাঁয়ে মোড় নিয়ে রিকশা এক সময় হাঁফ ছেড়ে দাঁড়ায়।

ভাড়া চুকিয়ে প্রায় দৌড়েই বড় রাস্তা পার হই। বঙ্গবন্ধু হলের পেছন দিকের ভাঙা দেয়ালের পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় হলের মূল গেটে। নামধাম, কার কাছে যাব, কখন ফিরব— এইসব ফিরিস্তি দিয়ে যখন টানা বারান্দা ধরে হাঁটছি, তখন দু'পাশের হলের জানলাগুলো দিয়ে ঝাঁক ঝাঁক কৌতূহলী চকচকে চোখ আমাকে গিলে ফেলতে থাকে। কো-এডুকেশনে পড়েও এদের নারী দর্শনের সাধ মেটে না! গা চিটচিটে গভীর অস্বস্তি নিয়ে দোতলায় উঠি। আমি পারতপক্ষে হলে আসি না। আজ নিয়ে সম্ভবত দু'দিন এলাম। আরেকদিন এসেছিলাম রেজাউলের সঙ্গে ডিভোর্স নিয়ে ঝামেলা বাধবার সময়। আরেফিনের একজন বন্ধু তখন সাক্ষী হিসেবে সঙ্গে ছিল।

যা হোক, ওর রুমে ঢুকতেই আরেক অস্বস্তির মুখোমুখি হই— একজন খালি গায়ে এই অসম্ভব গরমের মধ্যেই বুকডন দিচ্ছিল। আরেকজন লুঙ্গিতে মালকোচা মেরে ছোট্ট চৌকির ওপর পিঠ ঠেলে ঠেলে দোল খাচ্ছিল। হঠাৎ আমাকে দেখেই দু'জন যেন কারেন্টের শক্ খায়। তেলতেলে শরীরে দ্রুত শার্ট চড়ায়। লজ্জা কাটিয়ে আমি ক্রমেই নিভে আসতে থাকি, আরেফিন নিশ্চয়ই বাইরে।

মেজাজটা মুহূর্তে খিঁচিয়ে ওঠে। লুঙ্গি ঠিক করে অন্যজন এক সময় নর্মাল পজিশনে এসে আরেফিনের ফিরিস্তি দেয়—ও তো গতরাতে ফেরে নি।

হলের বাইরে ও কোথায় রাত কাটাবে? এইসব যখন ভাবছি, তখন 'বসেন, বসেন' বলে ভদ্রতা সেরে তাদের ভেতর থেকে একজন রুম ছেড়ে বাইরে ছুটে যেতে থাকে। বুঝতে পারি, আমার জন্য চা-বিস্কিট, কিংবা কোকটোক আনতে যাচ্ছে।

আমি ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে সজোরে প্রতিবাদ করি, প্লিজ, আমি কিচ্ছু খাব না। এক্ষুণি চলে যাব। শোন, বলে ভাবনায় পড়ে যাই। এদেরকে কী সম্বোধন করব? আরেফিনের বন্ধু এরা। আপনি আমার ঠিক আসে না। এই রকম ভাবছি আর চোখ হাঁটাচ্ছি রুমটার গলিঘুজিতে। তিনদিকে তিনটে টেবিল। দু'টি ক্যাঁচক্যাঁচে চৌকি। তার ওপর তোশকবিহীন চাদর বেছানো। একটা টেবিলের সামনের দেয়ালে সাঁটা অসংখ্য কাটা কাটা ছবি। মেরিলিন মনরো, শেখ মুজিব, ম্যারাডোন, রেখা... তালগোল পাকানো রুচির সমন্বয়। তবে আরেফিনের দেয়াল ফাঁকা। হেঁটে তার টেবিলের কাছে যাই। ওটার ওপর ধান দিয়ে বোনা রবীন্দ্রনাথের মস্তক, দেখে স্বস্তিবোধ করি। একবার ভাবি, ছবিটা দেয়ালে আটকে দিয়ে যাই। কিন্তু তারপরই আবার মহাঅস্বস্তি। আরেকটা বই যেই হাতে নিয়েছি, অমনি তার ভেতর থেকে ঝুর ঝুর পড়তে লাগল স্ট্যাম্প আকারের নগ্ন দেহের কিছু ছবি।

আমার অস্বস্তি ততক্ষণে অন্য দু'জনের মধ্যেও সঞ্চারিত। ওদের সামনে আমার কানজোড়া লাল হয়ে ওঠে। ওরা দ্রুত সেগুলো কুড়োতে তৎপর হয় এবং স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে বলে, আরেফিন এলে ওকে কিছু বলব?

শোনো, আমি সোজা রাস্তা ধরি, যখুনি আসবে, একটু কষ্ট করে বলবে, ও যেন সোজা আমার বাসায় চলে যায়।

হল থেকে বেরিয়ে সেই পুরনো রুটিন। নীলক্ষেতের পাশে কড়া রোদে ভাজা হয়ে বাসের জন্য দাঁড়িয়ে থাকা। মাথা বেয়ে ঝরতে থাকে নোনতা জল। এতটা পথের রিকশা ভাড়ার পুরোটাই গচ্চা যাওয়ায় কেমন খচখচ করছে ভেতরটা। মাসের উনিশ আজকে। বাড়ি ভাড়া আর অন্যসব বিল মিটিয়ে, মাসের শুকনো বাজারগুলো সেরে ফেলার পর গোড়াতেই আমার হাতে ছিল বেতনের চার ভাগের মাত্র এক ভাগ। সেই টাকাগুলো প্রতিদিন বিন্দু বিন্দু করে খরচ করার প্ল্যান ভীষণ সূক্ষ্ম ছিল। কেননা পাঁচ টাকা এদিক-সেদিক হলেই বেসামাল হবার জোগাড়। হিসেবের বাইরেই এমাসে এক জোড়া স্যান্ডেল কিনতে গিয়ে আমার প্রায় ভরাডুবি হবার অবস্থা। অথচ ওটা না কিনে উপায়ও ছিল না। গত দু'মাসে পিন মারতে মারতে ওটার এমন বেকায়দা অবস্থা করেছিলাম যে, ক'দিন আগে আলপিনের একটা ডগা আমার বাঁ পায়ের পাতায় আমূল ঢুকে গিয়েছিল। বাসায় এসে দ্রুত সেভলন ঘষেছিলাম। শানু ভয় দেখিয়েছিল, দেখ আবার না সেপ্টিক বাধিয়ে বস। তিন-চারদিন বেশ ভয়ে ভয়ে ছিলাম। শানুর ধাক্কাতেই শেষ পর্যন্ত স্যান্ডেল জোড়া কেনা হয়।

ফলে, এখন বলতে গেলে, ঝাড়া হাত-পা। হাতে এখন আছে দেড়শ' টাকার মতো। এই নিয়ে চলতে হবে পুরো মাস। গতকাল থেকে এবেলা পর্যন্ত আমার জীবন টানা রুটিনের বাইরে সম্পূর্ণ অন্যরকমভাবে কাটল। এতটা পথ রিকশায়, অনেকদিন হয় না। মাপজোক করে চলায় এখন এতটাই অভ্যস্ত হয়েছি যে, এতটুকু হেরফের হলে অনিঃশেষ অস্বস্তি হয়। অথচ আমার রক্তের মধ্যে আছে, বিয়ের আগে আরো বেশি ছিল, বোহেমিয়ানিজম, রুটলেসনেস... ঝড়ো পাখি... দৌড়াও...। আর সেই আমি কিনা আমার ডানা দুটোকে গোটাতে শিখেছি, রক্তের বুনো ধর্মকে শিখিয়েছি ধৈর্যের গান! কত কী যে আমি শিখেছি!

বাস এসে দাঁড়ায় শাঁ করে। ঘেমোগন্ধের দুর্বিপাকে আবর্তিত মানুষ লাফ দেয় দরজার দিকে। চাপে পড়ে ভেতরের মানুষ বেরুতে পারছে না। ফলে, আবে হালা... মাম্‌দোরপুত... নানা খিস্তি। এসব ব্যাপারে আমি এখন অসম্ভব দক্ষ। বাস ছেড়ে দেবার সময় ভাই সরেন তো... মুখস্থ বলে বলে ভিড়ের মধ্যে নিজের গা ডুবিয়ে দিই। ভিড়ের মধ্যে আমার শরীরের কোনো শুচিবাই নেই। তখন সে স্প্রিংবল— এই রকম আরো কিছু।

সামনে পেছনে মানুষ, ঘামের গন্ধ, অন্ধকার, প্রায় চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকি। কুণ্ডলী পাকানো ভ্যাপসা গরম শ্বাস রুদ্ধ করে দেয়। বুকের ভেতরে পুঞ্জীভূত দুশ্চিন্তা— শানুর স্বামী যদি না ফেরে? কথাটা ভাবতেই বুকের ওপর বিশাল এক পাথর চেপে বসে। কথা, চিৎকারের মাঝখানে স্থির নৈঃশব্দ্যে আধবোজা হই, ক্রমশ নিজেকে ছেড়ে দিতে থাকি... আর কী ঘটবে? আর কী ঘটার বাকি আছে? চল হে পথিক, চল...।

কিন্তু যত সহজে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছি, ঘরের দরজায় এসে অনুভব করি, অত সহজে কী পা ওঠে? আল্লাহ্ জানেন, কী পরিস্থিতির মুখোমুখি আমাকে হতে হবে। ভারি পা হেঁচড়ে

চৌকাঠে রাখি। আঙুলে এক পৃথিবীর চাপ নিয়ে দরজায় নক করি। অবসাদ আর হিম শীতলতায় কিছুক্ষণ দম আটকে থাকি। নিজের দরজার সামনে নিজেই আজ আসামীর মতো দাঁড়িয়ে। পর মুহূর্তে ভাবি, ফিরে যাব ? হায়রে আমার গ্লানির দ্বন্দ্ব!

দরজা খুলে দিল যে, তাকে দেখে আমি হাঁ। স্বস্তি, লজ্জা সব আমাকে এক সাথে ছেঁকে ধরে। আমার বিস্ময় যখন শেষ সীমায়, তখন দেখি দরজার চৌকাঠে হাসিমুখে শানু ও তার স্বামী দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখে শানুর এগিয়ে আসার আগে তার স্বামী নিজেকে সহজ করে বলে, এই যে এসে গেছেন! আর আমরা তো এদিকে টেনশনেই মরি। তার চেয়েও আন্তরিক শানুর আচরণ। আমাকে দু'হাতে জাপটে ধরে টেনে ঘরে আনে, বাঁচালে তুমি! নিজের ওপর এত রাগ হচ্ছিল যে কী বলব! আসলে আমি কোনো মানুষই না।

না না, সে-কী, আমার মুখ দিয়ে এছাড়া আর কোনো কথা বেরোয় না। দিন যতই যাচ্ছে আমার অভিজ্ঞতা তত বাড়ছে। ভেতরে ভেতরে আমার এরকম একটা অহঙ্কার ছিল যে, আমি মানুষ চিনি। তাদের আচরণ চিনি। যে-কোনো একটা ঘটনার, হোক তা সুন্দর, হোক না বিচ্ছিরি, তার পরিণতি সম্পর্কে কিছুমাত্র হলেও আমি আঁচ করতে পারি, অথচ কী ভুল ধারণাই না আমার! আমি কি ওদের এখনকার এই দৃশ্যকে সহজভাবে নিতে পারছি ? তৃতীয় একজন হিসেবে এত মিনিট-ঘণ্টা ধরে মানসিক ধকল সইবার পর আমার কাছে এই আপ্যায়ন তো নির্মল স্বস্তিকর হওয়ার কথা। ওদের সমঝোতায় আমার ভেতর থেকে কী গভীর একটা চাপ নেমে যায় নি ? কিন্তু আমার স্বস্তি নষ্ট করে দিতে থাকা এমন একটা ঘটনার এত দ্রুত নিষ্পত্তি হয় কী করে ? আমি এখানে থাকলে কী হতো ? কতটা বিষ থাকত গোখরার থলিতে ? কতটা অমৃত ? তাহলে তো আমার ডিভোর্স হওয়ার কথা না। ভুল কী আমারই ? আরো বেশি মানিয়ে চলার রীতিটা রপ্ত করতে পারি নি বলে ? আসামি আমি ? আমার ভেতরে সবকিছু তালগোল পাকিয়ে যেতে থাকে। জীবনটাকে এদের মতো সহজ করে নিতে পারলে আমাকে এত ভঙ্গুর পথ ধরে হাঁটতে হয় ?

আরেফিন এসেছিল, শানু রহস্যময় ভঙ্গিতে বলে, অনেকক্ষণ বসে গেছে। শুনে আমি ভেতরে জমে উঠি। বিহ্বলতা কাটিয়ে বলি, কী বললে তুমি ?

শানু তার শাড়ির আঁচল দিয়ে আমার বিছানার ধুলো সরাতে সরাতে উত্তর দেয়, আমি বলেছি তুমি অফিসে গেছ।

খুব ভালো করেছ, তুমি আসলেই গ্রেট। বলতে বলতে শানুকে টেনে ওর ঘরের দিকে নিতে থাকি। এখান থেকে চলে গেছি জানলে ছেলেটা খামোকা টেনশনে ভুগতো। শানু বলে, আমি তোমার মতো অত বোকা নই... ওর অনাবিল হাসি দেখে এইবার আমার হাসার পালা, জীবনে এই একটা কথাই একেবারে খাঁটি বলেছ। দাও, কিছু খেতে দাও আমাকে। খিদেয় জ্বলে যাচ্ছি। ওর স্বামী তখন বাথরুমে। সেখান থেকেই সে চ্যাঁচায়, কেন, হাওয়া খেয়ে পেট ভরে নি ?

এভাবেই একটা অধ্যায়ের সহজ সমাপ্তি ঘটে যায়।

পরদিন অফিসে যেতেই লিফ্‌ট বন্ধ। ব্যাপারটা দেখে প্রথমে দমে যাই। লিফটের দোর গোড়াতেই দেখা হয় বড়ুয়া বাবুর সঙ্গে। সিঁড়িতে পা দেয়ার আগে বাঁ হাত দিয়ে আয়েশ করে মুখে পানের খিলি ঢোকালেন। তার পুরো চাঁদিটাই প্রায় ফাঁকা। ডানদিকের কয়েক গাছা চুল সজোরে টেনে উঠিয়ে দিয়েছেন বিশাল শূন্য অংশে। পান-খয়েরের রঙে ঠোঁট জোড়া তার সারাক্ষণ টকটকে লাল। ভুঁড়িটা দেখার মতো। বিশাল তার আকার। এই গরমে ওই রকম একটা বেঢপ শরীরে চড়িয়েছেন এমন একটা চকমকে লিলেন শার্ট, দেখতে জবরদস্ত লাগছে। আমাকে দেখা মাত্রই তিনি বললেন, কী খবর, পরশু আসেন নি কেন ?

উত্তর না দিয়ে জানতে চাই, অফিসের খবর কী ?

গেলেই দেখবেন, সিঁড়িতে পা রাখেন তিনি, আপাতত এক্সারসাইজটা শুরু করা যাক, আমার ফিগারটাতো আবার, কী বলেন, দেখার মতো, মাঝে মাঝে লিফ্‌ট বন্ধ হলে...।

কী ব্যাপার, লিফ্‌ট বন্ধ কেন ? প্রশ্নটা করেই জবাবের অপেক্ষা না করে সিঁড়ি ভেঙে আমিও তার পাশাপাশি হাঁটতে থাকি। ভেতরে তখনো আমার চিরকালীন প্রলয়— পদসঞ্চালন কর নারী, উপরে উঠিয়া যাও...। লিফট বন্ধ কেন জানতে চাইছেন ? ওই এক সমস্যা, নাটকীয় স্বরে টেনে টেনে তিনি বলেন, দাবি-দাওয়া।

তিনতলায় উঠেই হাঁপিয়ে উঠি। শক্তি ক্রমেই লোপ পাচ্ছে কী ? অফিস করার সময়ও প্রায়ই অনুভব করি, আজকাল অল্পতেই শরীরে কেমন যেন ঝিম ধরে যায়। চারপাশ ছায়া হয়ে আসে। তার মধ্যে ঢেউ খেতে থাকে লাল, নীল, গোলাপি বল...। কিন্তু মনের শক্তির রাশ টেনে নিজেকে এলিয়ে পড়তে দিই না।

পরশু বস্‌ আপনাকে কিছু বলেছেন ? সহজ ভঙ্গিতে জিগ্যেস করেন বড়ুয়া বাবু। আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করি, পরশু কিছু বলেছেন মানে ? আমি তো পরশু অফিসেই আসি নি।

তিনিও তো পরশু অফিসে আসেন নি...বলতে বলতে তাঁর পা পাঁচতলার সিঁড়ি ছোঁয়। আমার শরীর জুড়ে নীল স্রোত বয়ে যেতে থাকে, ক্রোধে আমি ভাষা হারিয়ে ফেলতে থাকি। নিজেকে সংযত করে ঠাণ্ডা গলায় কেবল বলি, কী বলতে চাইছেন আপনি ?

এক সময় পাঁচতলায় গিয়ে দাঁড়াই দু'জন। তিনি আমার দিকে সরাসরি তাকান, এত খেপে যাচ্ছেন কেন ? আমরা যেমন, আপনিও তেমনি অফিসের এমপ্লয়ি। আমাদের হয়ে আপনি যদি জটিল একটা সমস্যার সমাধান করতে পারেন, আমরা তাকে অন্য চোখে দেখব কেন ? অফিসে কাজ করা, সারাক্ষণ ভারসাম্য ঠিক রাখা মেয়েদের পক্ষেই তো সহজ।

ফের মাথায় রক্ত উঠতে থাকে। মাঝখানে মাত্র একদিনের অনুপস্থিতি। এর ফাঁকেই এতখানি ? আমার পা আর ছ'তলায় ওঠে না। চারপাশে ঘিরে ঝিমঝিম অন্ধকার নামতে থাকে। এইবার সরল গলায় প্রশ্ন করি, পরশু বস্‌ আসেন নি অফিসে ? কিন্তু পর মুহূর্তেই প্রশ্নটা নিজের কানেই কেমন হাস্যকর, জলো শোনায়।

কেন আপনি, জানেন না, বড়ুয়া বাবুর গলায় স্পষ্ট অবিশ্বাস।

বিশ্বাস করুন— কেমন অসহায় বোধ করতে থাকি। টের পাই, ঠিক হচ্ছে না। ওতে করে ভদ্রলোকের সামনে আরো বেশি... আরো বেশি... কিন্তু নিজেকে সামলাতেও পারছি না। কেমন কান্না পেতে থাকে, আপনি অন্তত বিশ্বাস করুন। আসলে পরশু, মানে, এত জ্বর,

কী যে হলো, বমি, শুধু বমি... নিজেকে বিকিয়ে চাকরি করব ! উফ্ আপনাকে আমি বোঝাতে পারছি না। থেমে থেমে কথাগুলো বলতে গিয়ে রীতিমতো হাঁপিয়ে উঠি।

ঘাবড়ে যাচ্ছেন কেন ? তিনি এবার আমাকে আশ্বাস দেবার ভঙ্গিতে বলতে থাকেন। অফিসের অবস্থা এখনো এতটা খারাপের দিকে মোড় নেয় নি। আসলে পরশু তিনিও ছুটিতে ছিলেন কি-না! অফিস জায়গাটা তো খুব ভালো না, আপনি তো জানেনই... পা টেনে-টেনে সাত তলায় উঠি। ভেতরটা দমে গেছে। এখানে শুধু আমাকে নয়, চমৎকার সম্প্রীতির মধ্যেও অনেককেই নানা রকম টিপ্পনী সহ্য করতে হয়। আমি নিজেও কি কম অভ্যস্ত এসবে ? কিন্তু তারপরও কি হয়, ঠাণ্ডা হয়ে যাই, জমে যাই, মাথায় রক্ত চড়ে যায়, সহ্য করতে পারি না। আমার কপালটাই আসলে খারাপ। নইলে বস্ কেন সেদিনই ছুটি নিতে যাবেন ?

জাহান্নামে যাক... নিজেকে সহজ করার জন্য টান টান এগিয়ে যাই টেবিলের দিকে। অফিসে এসেই চোখের সামনে পত্রিকা মেলে ধরার চিরাচরিত অভ্যাসে চোখ আটকে যায় একটা খবরে— আগামী সাতাশ তারিখ ঢাকায় বারো ঘণ্টার হরতাল। এবং তার নিচেই 'পাশবিক' হেডিঙে তিন বছরের বালিকার ধর্ষণজনিত মৃত্যুর খবর। কানে আসতে থাকে একটানা টাইপ রাইটারের খটখট শব্দ। নিজেকে ভাঁজ করে ফাইলপত্রে মাথা ডুবিয়ে দিয়েছি, পাশের টেবিলে সুলতানার গলা, শরীর খারাপ ছিল বুঝি ? কম্পিউটারের কী বোর্ডের অস্পষ্ট অথচ বিরামহীন খুটখাট শব্দ কানের পর্দায় আছড়ে পড়তে থাকে, হ্যাঁ, আমি মাথা না উঠিয়েই বলি। কাচের পার্টিশানের ওপাশটা খালি। সম্ভবত আজও বস্ আসেন নি। নির্ধারিত সময়ের বাইরে এক মিনিটের বেশি দেরি হয় না তাঁর। আমাদের অফিসে তিনি কম্পিউটার মেশিন হিসেবে খ্যাত। কলিং বেল টেপার সঙ্গে সঙ্গে আহূত ব্যক্তির তার সামনে হাজির হওয়া চাই-ই চাই। টাইপে বিন্দুমাত্র ভুল পেলে আমাকেই কি কম নাস্তানাবুদ করেছেন ? চোখ পাকিয়ে বলে উঠেছেন, বি এলার্ট। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি, ব্যাপারটা কি করে যেন অফিসের সবাই টের পেয়ে গেছে। এরি মধ্যে ভেতরে-ভেতরে অফিসের পরিস্থিতি বেশ কয়েক দফা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। ইনক্রিমেন্ট আর বোনাসের সমস্যাই ছিল প্রধান। ঈদের বোনাস বেতনের আট ভাগের এক ভাগ দেয়ার চল বহুদিন ধরে। এমপ্লয়িদের বক্তব্য, ও দিয়ে মেইডসার্ভেন্টের শাড়িও হয় না। দুর্মূল্যের এই বাজারে ফি বছর জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বাড়ছে। অথচ সবার প্রমোশন, ইনক্রিমেন্ট সেই কবে থেকে বন্ধ। দাবিদাওয়া সম্পর্কিত এইসব ফিসফাস বসের কানেও গেছে। কিন্তু প্রতিবাদ তখনো এতটা দানা বাঁধে নি। বসের এক কথা, মালিকের এখন লোকসান হচ্ছে। অথচ যত দিন যাচ্ছে, সবাই কোম্পানির প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ছে। এরকম হতে থাকলে কোম্পানি বন্ধ করে দেয়া ছাড়া মালিকের কোনো পথ থাকবে না।

এইসব ফিসফাস, দীর্ঘশ্বাস, ক্রোধ, ঘৃণা, টিপ্পনী প্রতিদিন লেগেই আছে। অফিসে গেলে অবশ্য বেশির ভাগ সময়ই আমার ঠোঁটে তালা লাগানো থাকে। যে-কোনো মূল্যেই হোক চাকরিটা আমাকে টিকিয়ে রাখতে হবে। এমপ্লয়িদের দাবির সাথে আমার দাবির বিন্দুমাত্র দ্বিমত নেই। কিন্তু আমাকে সারাক্ষণ একটা ভয় ছেঁকে থাকে! কলিগদের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে আমার চাকরিটা যদি চলে যায়! ওটা এখন আমার বেঁচে থাকার প্রধান অংশ। কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে তাই সেটা খোয়াতে আমি রাজি নই। তাছাড়া বস্ এখনো পর্যন্ত যথেষ্ট ভদ্র। তিনি কোম্পানি বন্ধের কথা না বলে কর্মচারী ছাঁটাইয়ের থ্রেট দিতে পারতেন।

তাছাড়া তিনি নিজে তো একজন কর্মচারী। তাহলে সবাই একযোগে তার পেছনে লেগেছে কেন, ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না।

ফাইল আর লেজারে মাথা ডুবিয়ে আছে কেউ। কেউ মগ্ন খোশ-গল্পে। আঁচ করতে পারি, আমাকে ইঙ্গিত করেও ফিসফাস কিছু কম হচ্ছে না। কেমন বিপন্ন বোধ করি। কলম চালাতে গিয়ে আঙুল জমে আসছে। পরিবেশটা ক্রমেই কেমন বৈরী হয়ে উঠছে। প্রথম যখন এসেছিলাম তখন সবারই কী সহযোগিতা! চাকরির মজাই ছিল অন্যরকম। সেই আমি কী করে ধীরে ধীরে সবার বিরুদ্ধে গিয়ে দাঁড়িয়েছি! আদৌ দাঁড়িয়েছি কি না, কোনো পরীক্ষা ছাড়াই সেসব নিয়ে ইঙ্গিত, খোঁচাখুঁচি। ভীষণ অস্বস্তিকর সব ব্যাপার-স্যাপার! আগে এসব ছিল না। জীবন যে সহজ সুন্দর একতালে চলে না, আমাকে ঘিরে চলা এসব ঘটনাই তার প্রমাণ। চায়ের গাঢ় লিকারে ভাবনার গ্রন্থিগুলো ডুবে যায়। খয়েরি জল ছিঁড়েখুঁড়ে ধোঁয়া উড়তে থাকে।

সত্যি করে বলো তো, পরশু তোমার সঙ্গে বসের দেখা হয় নি, সুলতানা চেয়ার টেনে আমার টেবিলের ওপাশে এসে বসেছে। অবচেতনেই টাটকা পেপারটা সশব্দে দোমড়ানো আঙুলের তলায় ঠেসে দিই। ফের মুখ নেমে যায়। বুকের ভেতর অবিরাম শব্দ। কেমন যেন ফুলে উঠছে ধমনী ও শিরা। টিপটিপ কাঁপছে মাথার দু'পাশের রগ। শীর্ণ ধূসর একটা বেড়াল অস্তিত্বের বাক্স থেকে লাফ দেয়। এইসব ছায়া গাঢ়তা থেকে মুখ তুলি। সামনে চিৎপাত পড়ে আছে ফাইল, প্যাড, কলম। তৈরি হও, নিজেকে বলি, তৈরি হও জঘন্য কৈফিয়তের জন্য। কিন্তু গলার মাঝপথে এসে কী আটকে যায়! বেশি কিছু বলতে পারি না। ভেবেছিলাম, মুখ ফুঁড়ে জঘন্য কিছু শব্দ বেরোবে, বদলে ভিজে আসছে কণ্ঠ, সেই স্বর নিজের কাছেই কী যে অচেনা ঠেকছে! ফলে আমি এইভাবে শুরু করি, সুলতানা, এই সামান্য পয়সার একটা চাকরির জন্য অফিসে না এসে বসের সঙ্গে ডেটিং করতে হবে ? তুমিও একজন মেয়ে, আমি আশা করেছিলাম, তুমি অন্তত আমার সম্মানটা বুঝবে... বলতে বলতে আচমকা থেমে যাই। তারপর যা বলি তার জন্য আমার নিজেরই কোনো প্রস্তুতি থাকে না। কেমন একটা ক্রোধ, ক্ষিপ্ততা আমাকে বিহ্বল করে তোলে, এর চাইতে তো বেশ্যাবৃত্তিই ভালো। ওসব লাইনে পয়সাটয়সা আরো বেশি। বলেই টের পাই, এই ঝাঁঝের ভেতর দিয়ে নিজের দুর্বলতা যেন আরো গাঢ় হলো। অপমানে লাল সুলতানা এবার প্রায় ছিটকে দাঁড়ায়, আমার এই সহজ কথাটার তুমি এইরকম মানে করলে ?... ছিঃ, তুমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছ ? তার এই তীক্ষ্ণ শ্লেষের মুখে নিজেকে ঝাঁঝালো করে তুলতে আর অসুবিধে হয় না। ঠোঁটে বিষ মাখানো হাসি ঝরিয়ে বলি, বস্ তো আজকেও আসেন নি, খোঁজ নিয়ে দেখবেন আজকে তিনি কার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছেন ? দেখুন না, অফিসে অন্য কোনো মহিলা স্টাফ অনুপস্থিত কি-না!

সুলতানা দাঁড়িয়ে ছিল। এবার চেয়ারে বসে পড়তে পড়তে বলে, দ্যাখো, আমি তোমার চাইতেও সিনিয়ার, অন্তত চাকরির বয়সের দিক থেকে। একটু মানিয়ে চলতে শেখো। এ রকম মেজাজ-মর্জি নিয়ে তুমি কোথাও টিকতে পারবে না। অসম্ভব।

আহ্... মানিয়ে চলা। শানু আর তার স্বামী... ফটোফ্রেমে বাঁধানো সুখী দম্পতি। মানিয়ে চলা... কী সহজ করে দেয় জীবনকে... আত্মাকে ইনজেকশন দিয়ে দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখ। মূর্তির মতো, মমির মতো বেঁচে থাক...।

অফিস থেকে বেরুবার আগেভাগে সুলতানার টেবিলে যাই। ততক্ষণে ভেতরে আমি জুড়িয়ে এসেছি। তার মুখোমুখি হয়ে বিনীত ভঙ্গিতে তাই বলি, দুঃখিত, খুব খারাপ ব্যবহার করেছি তখন। আমি সম্ভবত অতটা অভদ্র নই।

না না তাতে কী, সুলতানার গলার স্বর এখন কোমল, না বুঝে তুমি একটু বেশিই উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলে, যা হোক...।

অফিস থেকে বেরিয়ে ক্রমেই আবার নিজের গাড্ডায় তলিয়ে যেতে থাকি। শুরু হয় আমার আত্মবিশ্লেষণ। আসলে আমি কখনোই জীবনে সাবলীল মন্থরতা পছন্দ করি না। আবার সৃষ্টি করা অমসৃণ পথ ধরে চলাটাকেও বড় কৃত্রিম বোধহয়। আমার প্রেমিক কিংবা আপনজন যখনই আমার কাছে তাদের নিবেদন করা প্রেম-ভালোবাসায় আমাকে ফেনিয়ে তুলতে চায়, তখন মনে হয়, সে আমার প্রাণের নয়। যে কখনোই আমার শত্রু হতে পারে না, সে কখনোই আমার প্রাণের মানুষ হতে পারে না।

কিন্তু সেই শত্রুতার মধ্যে যদি বিন্দুমাত্র মায়া না থাকে ? আমি যার সঙ্গে এক ছাদের তলায় থেকেই সংসার করেছি, সে কি আমার সহকর্মীদের মতো স্বার্থপর ছিল ? আমার কোনো সন্ধ্যা কি তার গাঢ় চুম্বনে উষ্ণ হয়ে ওঠে নি ? তাহলে যুদ্ধ ঘোষণা করে বেরিয়ে এলাম যে ? তবে কী শত্রুকেও হতে হবে আমার প্রত্যাশার মতোই মনোরম ? ভাবতে ভাবতে একসময় বিশাল সিঁড়িতে থমকে দাঁড়াই। কী আছে আমার ? বিদ্‌ঘুটে অহঙ্কারটুকু ছাড়া ? আমার বন্ধু সত্যজিৎ একদিন প্রচণ্ড ঝাঁঝ মেশানো স্বরে বলেছিল, তুই তোর রক্তের তৃষ্ণা নিয়ে এত গর্বিত, এত বিমর্ষ— এজন্যই ! নিজের ছোবলে নিজেই মরিস! এজন্যই সত্যজিৎকে ভালো লাগে। সে আমার বিমর্ষতা আবিষ্কার করেছিল, আমার যন্ত্রণাকে চিহ্নিত করতে পেরেছিল। তবে আমি কী চাই ? চরম বন্ধু, না পরম শত্রু ? রেজাউল কী ছিল ? ও ছিল একটা ছকহীন অসহ্য কোনো কিছুর মতো। ফলে ওর সঙ্গে আমি বসবাস করতে পারি নি। মুখে থুথু ছুঁড়ে দিলে কেউ যদি হা হা করে হাসে সে-ও তো এক ধরনের ব্যক্তিত্বহীন, যন্ত্রণাকর মানুষ, আমার কোনো প্রতিক্রিয়ারই সে কোনোরকম তোয়াক্কা করছে না। রেজাউলকে তো সে দলেও ফেলা যায় না। ছকহীন মানুষ আমি পছন্দ করি, তবে তার চেহারা যদি হয় রেজাউলের, তবে গুল্লি মারি সেই ছকহীনতাকে।

হঠাৎ করে কেন জানি মা'র কথা মনে পড়ে। বড় হওয়ার পর মা একবার আমার জন্ম-রহস্যের বর্ণনা দিয়েছিলেন ঠিক এইভাবে : একদিন শেষরাতে তিনি স্বপ্নে দেখেন, আকাশ আলোয় আলোয় উজ্জ্বল। বারান্দার লাগোয়া জামরুল গাছে তুমুল বাতাস। কোথা থেকে একটা সুন্দর ময়না এসে গাছটার ডালে বসেছে। তার গলায় হার। মা আকুলভাবে প্রার্থনা করেন, ময়নাটা যদি আমার হতো ? সঙ্গে সঙ্গে কী হয়, হারসহ ময়নাটা মার মুখ দিয়ে ঢুকে সোজা পেটের ভেতরে চলে যায়। সেদিন খুব ভোরে মা বাবাকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলেছিলেন, দেখো, আমার একটা সোনার রত্ন ছেলে হবে। আর সেদিনই আমি ভূমিষ্ঠ হই। মা'র সেই স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা এত প্রগাঢ় ছিল, দিন কয়েক তিনি আমার মুখের দিকে তাকাতেই পারেন নি।

সোনার ময়না পুত্র হলে কী হতো ? আমার ছোটভাই আরেফিন আজ আমার আয়ের ওপর দু'পা সোজা রেখে হাঁটছে। আর তার ডিভোর্সি মেয়েকে ঘিরে মা'র সেই যন্ত্রণার প্রগাঢ়তা নিশ্চয়ই আরো বেড়েছে। আরেফিনকে নিয়ে তার কি স্বপ্ন, আমার জানতে ভীষণ ইচ্ছে করে। বোনের উপার্জনে চলে, ভার্সিটিতে রাজনীতি করে, পরীক্ষায় ডাব্বা রেজাল্ট

করে, সেই ছেলেকে ঘিরে মার ধূসর চোখের আলোটা বড় দেখতে ইচ্ছে হয়। এইসব ভাবি, ভাবতে ভাবতে উত্তেজিত হয়ে ফের নিজেকে ঘুরিয়ে নিই। জীবনের ছকহীন রূপের কথা ভাবছিলাম, আমি কি কারো মধ্যে দেখেছি সেই রূপ ? দেখেছি সেই বন্ধুকে যে কখনো আমার মায়াবী শত্রু হয়ে উঠতে পারে ? সত্যজিৎ ? রন্‌জু ? এরা কি কেউ তেমন শত্রু হওয়ার যোগ্য ? কী জানি !

সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় দোতলায় আরেফিনের মুখোমুখি হই। এমনিতে ওর গায়ের রঙ কালো। মুখের ওপর গুটি বসন্তের দাগ। তার ওপর রোদে পুড়ে এখন ওকে আরো কালো আর বেঢপ দেখাচ্ছে। কালো চামড়া চুইয়ে পড়া জলে ওর শাদা শার্ট জবজবে। ওকে দেখেই পোস্টকার্ড সাইজের নগ্ন ছবি, ছেলে দুটোর নাজুক অবস্থা... এইসব মনে পড়ে। অস্বস্তি হতে থাকে। নিশ্চয়ই এসব কথা ওর বন্ধুরা ওকে বলেছে। তাই ওকে দেখা মাত্রই মনে মনে একটু রেগে যাই। আবার ভাবি, এসব করার এইতো ওর বয়স। কিন্তু ওর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ও-রকম ছবি সংগ্রহের ব্যাপারটা মেলে না! যা হোক, ও এসেছে, তাই মুখে খুশির হাসি ফুটিয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠি, তুই! কোত্থেকে ?

তোমার কাছেই... একটা হেভি প্রবলেমে পড়েছি, বলতে বলতে ও অদ্ভুত চোখে আমার দিকে তাকায়।

তাই তো ভাবছি, প্রবলেম ছাড়া তুই আর আমার খোঁজে অফিসে আসবি, মুহূর্তে কেমন তেতে উঠি। নিশ্চয়ই টাকাপয়সার দরকার ?

দ্যাখো, অতটা স্বার্থপর আমাকে মনে কর না, হঠাৎ কইে ওর স্বর কেমন ঝাঁঝালো হয়ে ওঠে, তোমার টাকা-আতঙ্কের রোগ দেখা দিয়েছে। ভেবো না, আমি তোমার কাছ থেকে টাকা না নিলে চলতে পারব না। প্রত্যেক মাসে তো আর নিই না। কথা বলতে বলতে সিঁড়ি ধরে শ্লথ অবসন্ন নিচে নামতে থাকি।

কি করবি, মাস্তানি ? বিশাল শাপলার চারপাশে আবর্তিত হচ্ছে মানুষ... জট বেঁধে আছে রিকশা। চারদিকে বিক্ষিপ্ত করতালির শব্দ যেন।

এছাড়াও অন্য পথ আছে, আরেফিন সহজ স্বরে বলে, আমাকে এত অকর্মণ্য ভাব কেন ? ধুৎ, তোমার এখানে আসার আনন্দটাই মাটি।

এবার আমার নিজেকে সামলে নেয়ার পালা, বাদ দে। বল, প্রবলেমটা কী ?

প্রবলেম, কী মনে হতেই হকচকিয়ে ওঠে সে। তারপর বলে, তুমি হলে কেন গিয়েছিলে ? আমি টেনশনে মরছি, অথচ দ্যাখো, তোমার কাছে এসে সেটা জিগ্যেস করতেই ভুলে গেছি। ওর মুখ লজ্জায় লাল, তার ওপরেই মনোরম হাসি ফুটে ওঠে।

আমি তো খেপেছি সেজন্যই। তুই সে প্রসঙ্গে না গিয়ে, এসেই...। সামান্য হেঁটে বাসের জন্য স্ট্যান্ডে এসে দাঁড়াই, বল তোর আসল সমস্যাটা কী ? কাউকে ভাগিয়ে নিয়ে আসিস নি তো ?

কী যে বলো, আরেফিন বাঁ হাতের চেটোয় বাচ্চাছেলের মতো কপালের ঘাম মোছে, আমি মরি পেটের ধান্দায়...। ওর ঠিক এই ভঙ্গিটাই আমাকে ছেলেবেলায় টেনে নিয়ে যায়। পিঠাপিঠি দু'জন। ওকে কাঁধে নিয়ে উবু হয়ে হাঁটছি আর ও হি-হি হাসতে হাসতে কিল

বসাচ্ছে আমার ঘাড়ে আর মাথায়। হঠাৎ কী হয়... ঝপাৎ.. ও হাত থেকে পড়ে যায় মেঝেতে। তারপর চিৎকার! আর আমি ভয়ে-আতঙ্কে দৌড়... দৌড়। অনেক রাত করে ফিরেছিলাম সেদিন। মাটির শাপলার ওপর কাক বসেছে। হেই, হেস হেস শব্দে ওটাকে উড়িয়ে দিই।

বলো না, হলে কেন গিয়েছিলে? আরেফিন আবারো সেই একই প্রশ্ন করে।

কেন, তোর হলে আমি যেতে পারি না? কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে দাঁত দিয়ে নখ খুঁটি।

সে-তো পারই। কিন্তু কখনো যাও না তো।

হঠাৎ মনের ভেতরে ইরফান চাচার প্রসঙ্গ উথলে ওঠে! বলতে চাই ওকে। কিন্তু কি ভেবে চেপে যাই। জানি, প্রসঙ্গটা ও জানলেই গ্যাঞ্জাম বাধিয়ে বসবে। তাই ওকে জানাব না, পলকে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ঝরঝরে হয়ে উঠি।

পাশ দিয়েই যাচ্ছিলাম, হঠাৎ কী মনে হলো, ঢুকে গেলাম তোর হলে, প্রসঙ্গটা পাল্টে ঝটপট বলি, আচ্ছা, মেয়ে বলে আমি হঠাৎ করে কিছু করতে পারি না?

এরি মধ্যে বাস এসে দাঁড়ায়। প্রচণ্ড ভিড়। জানলা-দরজায় গিজগিজ করছে মানুষ। ধুৎ! আজ কুস্তোকুস্তি করে উঠতে ইচ্ছে করছে না। দাঁড়িয়েই থাকি। একটা মিছিল যায় স্লোগান দিতে দিতে। দু'জন দ্রুত সরে দাঁড়াই। আমার যুক্তি যে আমলে নিল না আরেফিন, সেটা স্পষ্ট বোঝা গেল ওর মুখ দেখে। কিন্তু ঘাঁটালো না বেশি। বলল, একটু পুরনো ঢাকায় যাব। কাজের ধান্দা করছি। ফ্লাইং কিছু যদি করা যায়। ভার্সিটি জীবন শেষ করার আশা করতে করতে পিঠ দেয়ালে ঠেকে যাবে। সারাদিন শালার মিছিল-মিটিং। অবশ্য বিজনেসটার জন্য পুঁজি তো কিছু লাগবে, ও ক্রমশ ধূসর-বিবর্ণ হয়ে উঠতে থাকে, আসলে তুমি ঠিকই ধরেছ। এবার সে কেমন লজ্জা পায়, সব তো তুমি পারবে না... কিছু যদি ম্যানেজ করতে পার।

আমার ভেতরে হঠাৎ করেই দাপিয়ে আগুন জ্বলে ওঠে। ফুঁসে ওঠা সেই আগুনের শিখা যেন আমার দিকে শাঁ-শাঁ করে এগিয়ে আসতে থাকে। আর তার ভাপে ঘামতে ঘামতে বলি, আমি এক পয়সাও পারব না। কেমন কষ্ট করে চলি জেনেও যদি তুই... কষ্ট লাগে। মিছিলটা বাঁ দিকের পথে মোড় নেয়।

আমার উত্তর শুনে অসহায় ওঠে আরেফিন। বলে, আমি জানি। কিন্তু এরকম বেকার অবস্থা আমার একদম অসহ্য হয়ে উঠেছে। টিউশনিটাও আজ চলে গেল।

ওর কথা শুনে আঁতকে উঠি আমি। ভ্যাপসা গরম হাওয়ায় সাঁই সাঁই ধুলো উড়ছে। গা ঘেঁসে হেঁটে যাচ্ছে লোকজন। এর মধ্যে প্রচণ্ড ভিড়ের জন্য আরেকটা বাস মিস করি। অফিস শেষ। সবাই উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘরমুখো। আরেফিন না থাকলে এতক্ষণে যুদ্ধ করে আমিও উঠে যেতাম। কিন্তু পা দুটো যেন ভার হয়ে আসছে। এসব প্রসঙ্গ আমাকে কেমন শিথিল আর অবশ করে দিতে থাকে। আমি এক পা বাড়াতে চাইলে পেছন থেকে দু'পা টেনে ধরে কেউ, আমি এগোব কী করে? আমার মুখ দেখে আরেফিনই বলে, আমার জন্য কোনো চিন্তা কর না। ওরা বাচ্চাদেরকে বড় স্কুলে দেয়ার ধান্দায় চড়া রেটে সেই স্কুলেরই এক টিচারকে রেখেছে। ভর্তির ইন্টারভিউয়ের সময় কোনো প্রবলেম যাতে না হয়, সেজন্যে। না থেমে সে এক নাগাড়ে বলে চলে, অবশ্য আমিও ধান্দা করছি। আরেকটা টিউশনির ব্যবস্থা হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে। শালার এসব খুঁজে বের করাও এক ঝামেলা। জীবন যে কী ভয়ানক কঠিন

হয়ে গেছে! ওর কথার মাঝখানেই এবার আরেকটা বাস দেখে একলাফে আমি দরজার হ্যান্ডেল চেপে ধরি, তুই হতাশ হবি না, দেখি আমি কিছু টাকা ম্যানেজ করতে পারি কী না। হাসতে-হাসতে হাত নাড়ে সে, আমি কাল বাসায় আসব।

বাসায় এসে স্নান সেরে কুঁচি মরিচ-পেঁয়াজ দিয়ে যখন মুড়ি মাখাচ্ছি, তখন রহস্যময় ভঙ্গিতে শানু এসে আমার পাশে বসে। মুড়ি নিয়ে আমি আয়েশ করে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসি। তাকাই তার দিকে, এই এখন অদ্ভুত লাগছে ওকে। কথা না বলে শাড়িতে আঙুল জড়াতে থাকে। কিন্তু একটা বলার জন্য যেন উস্‌খুস করতে থাকে। আমার অনুমান মিথ্যে হয় না। নীরবতা ভেঙে এবার সে মনের কথা ঝপাৎ করে উগ্‌রে দিয়ে বলে, মনে হয় আমার খবর হয়ে গেছে।

মানে ? আমি বোকার মতো প্রশ্ন করি।

আশ্চর্য, বুঝছ না ? যেন আমি তার স্বামী, না বোঝার ভান করে যেন মজা করছি, ন্যাকামো করছ! আচ্ছা তুমি ক'মাসের মাথায় টের পেয়েছিলে ?

এবার আমার পুরো শরীর থরথর করে কেঁপে ওঠে। কী অবলীলায় সবকিছু ভুলে গেছি। যখন মনে পড়ে, সমস্ত শরীর বেয়ে যেন বিষরক্ত নামে। ভুলে থাকার অভ্যাসকেও কী চমৎকার কৌশলে এরি মধ্যে আয়ত্ত করতে শিখে ফেলেছি! দু'দিন ধরে এত ভাবনা ভেবেছি! অথচ একবারও...। কেমন হতবিহ্বল তাকাই শানুর দিকে। এখন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা উচিত। কিন্তু মিইয়ে যাচ্ছে মুড়িগুলো। শাদা দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে যাচ্ছে পিঠ। এত পুরনো, ভেবে ভেবে এত কষ্ট পাওয়া এই অধ্যায়টি কিছুতেই আমার কাছে সহজ হয়ে ওঠে না। ছোট্ট একরত্তি একটা বাচ্চা... হাসপাতালের শাদা ছাদ কাঁপিয়ে তার চিৎকার... সেভেলন... নার্স... থু থু... কান চেপে দৌড়ানো এবং সেই চিৎকারের ভয়াবহতা আমাকে ব্যাকুল, উন্মাদ করে তুলছে। হা আল্লাহ, বন্ধ কর, বন্ধ কর, এইসব শব্দের মর্মান্তিক ক্রিয়া! বিশাল হাতুড়ি আমার মাথার ঘিলু দুমড়েমুচড়ে এক করে দিচ্ছে। এসবের মধ্যেই দু' ঠ্যাঙের ফোঁকর থেকে এ কী আজব চিজ টেনে বের করে আনলেন ডাক্তার, জন্মের পর থেকে আটান্ন দিন পেরিয়ে গেলেও যার চিৎকার থামে না ? পতঙ্গের মতো আমি তখন দিকবিদিক ছুটছি— ফার্মেসি আর ওষুধ। রক্তাভ ঠোঁট গড়িয়ে অবিরল লালা ঝরছে। সবচেয়ে অসহ্য, টাকাকড়ির দুঃসহ টানাটানি। এ এক আজব চিজ যা নিয়ন্ত্রণ করছে মানুষের জন্ম আর মৃত্যু। তারই খোঁজে দিকবিদিক ছোটাছুটি। ধারকর্জ করতে করতে দেউলিয়া হওয়ার দশা। রেজাউলের মুখ বিবর্ণ, পাণ্ডুর। কিছু করতে পারছি না। ক্রমশ পিছোচ্ছি, পেছনে হা-হা শূন্যতা। এক সময় সবকিছু স্থির, নিশ্চুপ হয়ে যায়। নবজাতকের কান্না থেমে যায়। তারপর আমার দিশেহারা অবস্থা... আমি ঘরে, রাস্তায়, অফিসে সর্বত্র কান খাড়া করি,... যদি শোনা যায়... সেই চিৎকার, সেই কান্না ? রাতে বিছানায় শুয়ে ছটফট করি। আমার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে সেই চিৎকারের শব্দ, যার ভয়ে পালাতে চেয়েছিলাম। সেই শব্দ শোনার জন্য কত মাইলের পর মাইল বিনিদ্র রাত...।

আমি দুঃখিত, আমার পাল্টে যাওয়া চেহারা দেখে নিজেকে সামলে নেয় শানু, সম্ভবত এতক্ষণে সে অনুভব করেছে তার গর্ভে সন্তান আসার প্রসঙ্গটা আমার সামনে তোলা তার উচিত হয় নি। আমি কি নিজেকে কম সামাল দিতে শিখেছি ? মুড়ি মুখে তুলে এবার প্রায় চেঁচিয়ে উঠি, সম্ভবত একটু জোরেই, সে কী, তলে তলে এতকিছু, আর আমি জানি না! কামাল ভাইকে বলেছ ?

শানুর উচ্ছ্বাস দেখবার মতো, ওকে তো ক'দিন ধরেই বলছি। আমার ডেট ওভার হয়ে যাচ্ছে, তবুও হচ্ছে না। নিয়মের বাইরে একদিনও যায় না আমার। আজ আটদিন পর ইলিশ মাছ খেয়ে বমি বমি...।

ইলিশে অনেক সময় এমনিতেই বমি হয়। বেচারিকে খামোকা হতাশ করি, মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বলি, তোমার যেহেতু কখনো নিয়মের বাইরে যায় না, তাহলে হয়েই গেছে হয়তো। তুমি এক কাজ কর— ডাক্তারের কাছে যাও, টেস্টফেস্ট করিয়ে নিশ্চিত হওয়াই ভালো।

রাতে অস্ফুট ফোঁপানো কান্না। অন্ধকারে উঠে বসি। সবে দু'চোখে ঘুম লেগে এসেছিল, ঠিক সেই সময় পৃথিবীর সবচে' নাজুক এই শব্দ আমার তন্দ্রার ঘোর ছিন্নভিন্ন করে দেয় মুহূর্তে। অন্ধকার হাতড়ে বাতি জ্বালাই। সন্ধে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কামাল ভাই একগাদা কমলা আর আপেল হাতে নিয়ে হাজির হয়েছিল। ওদের পরিবারে এ এক অভাবিত ঘটনা। তাই শানুর উচ্ছ্বাস ছিল দেখবার মতো। ও আসলে অল্পতেই বর্তে যায়। এ আর কিছু নয়, নিজেকে ওর সবসময় ছোট করে দেখার বোধ। নিজেকে ও অসুন্দরী মনে করে। অথচ ওর কালো মুখের চত্বরে কী অদ্ভুত গভীর দুটো চোখ। যত্নহীন হলেও চুলের এত মসৃণতা আমি খুব কমই দেখেছি। নাক একটু মোটা হলেও পাতলা ঠোঁটের সঙ্গে বেশ মানানসই। ওর শরীরও মন্দ না। শুধু কিসের সঙ্গে কী পরলে মানাবে, সেটা জানে না বলেই ওর সৌন্দর্য শেষ পর্যন্ত সম্পন্নতার স্পর্শ পায় না। এসব ধরার মতন চোখ কামাল ভাইয়েরও নেই।

না থাকুক। শানু তারপরও সুন্দর। নিজের শরীরের কালো রঙ নিয়ে আক্ষেপ করুক, মনে করুক নিজেকে কুৎসিত, যতই ভাবুক, গায়ের রঙ হলুদে-আলতায় মেশানো না হলে, তার আবার সৌন্দর্য কী, তাতে কিছু আসে যায় না। আমার চোখে তো শানু সুন্দর। অথচ কী অদ্ভুত ব্যাপার, ওর এই রকম আক্ষেপ স্বামী বেচারাকে পর্যন্ত স্পর্শ করেছে। শানুর রূপের ব্যাপারে স্বামীর অবশ্য গোড়া থেকেই কেমন একটা দোনোমনো ভাব ছিল। দু'জন দু'জনকে প্রথম দ্যাখে বিয়ের রাতে। শানুর ভাষ্য, স্বামী তাকে প্রথম দর্শনে ভীষণ হতাশ হয়েছিল। বলেছিল, ছবিতে তোমাকে এত কালো লাগে নি তো! ব্যস্, সেই রাত থেকেই ব্যাপারটা শানুর বুকে চেপে বসে।

তোমরা বিয়ের রাতেই প্রথম দু'জন দু'জনকে দ্যাখো! আমি ওকে খোঁচা দেয়ার জন্য অবাক হওয়ার ভান করি।

তাছাড়া আর কী! শানুর বেশ অহঙ্কারী গলা। তোমার মতো প্রেম করে বিয়ে করব নাকি ?

ওরে বাব্বা, অপরিচিত একটা লোকের সাথে প্রথম রাতেই শুয়ে পড়লে ?

ও এবার খেপে যায়, তুমি মনে হয় অন্য গ্রহ থেকে এসেছ ? যেটা পবিত্র, যেটা শুদ্ধ, তাকে তুমি বাঁকা করে দেখছ, ব্যাপারটা কী বলো তো ?

ওইসব কালোটালো বলেও কামাল ভাই তোমার সাথে ইয়ে করল ?

শানু হেসে ফেলে, পুরুষ মানুষ না! গন্ধ পেলে আর রঙ! সে তখন গন্ধে পাগল।

কেন ? পারফিউম মেখেছিলে খুব ?

বজ্জাতি কর না তো ? নিজে যেন সারারাত বাতাস খেয়ে কাটিয়েছিলে। জেনে শুনে বিয়ে করেও কত ঠেকাতে পারলে সংসার ?

তুমি যেভাবে সংসার ঠেকাচ্ছ, আমিও খোঁচা দেই, অমন করে কেউ জোড়া দিলে ভাঙা প্লেটেও জোড়া লেগে যাবে। আমার জবাবের কী-বুঝল না-বুঝল, চুপ মেরে যায় শানু। আসলে ও কথায় খুব একটা প্যাঁচপোচের মধ্যে যেতে পারে না। তাই প্রসঙ্গটা আর বাড়াতে না দিয়ে কেবল বলে, মেয়েদের অত জেদ ভালো না। জেদ সংসারের ক্ষতি করে।

এই মহান যুক্তির পর তো আর কথা চলে না।

যা হোক, স্বাধীনতা পেয়ে স্বামী এখন প্রকাশ্যে তার সৌন্দর্যহীনতা সম্পর্কে নিরন্তর খোঁচা দিয়ে চলে। যেমন, মাথায় ফুল গুঁজলেই কি রূপ বেড়ে যাবে ? লিপস্টিক দিও না, এমনিতেই কালো চামড়া, মুখে লালবাগের কেল্লা জ্বলবে। উপমার কী ছিরি! এ সব প্রশ্নের উত্তরে শানুর যুক্তি শুনলে গা জ্বলে যায়, আমাকে তো আর আমি বানাই নি! আল্লাহ বানালে আমি কী করব ?

শানু আসলে ভীরু। ওতো স্বামীর মুখের ওপর পাল্টা বলতে পারে, আয়নাতে নিজেকে একটুখানি দেখ তো! খ্যাংড়াকাঠি, পাটশোলা কোথাকার! ভাঙা গালের নিচে তোবড়ানো থুঁতনি, এইটুকু মাথার দু'পাশে হাতির মতো বিশাল লটপটানো কান। তাহলেই তো স্বামীপ্রবর মুহূর্তে কোণঠাসা হয়ে যায়। তার মানে আমি কি চাই ওদের মধ্যে একটা অনিবার্য যুদ্ধ, যুদ্ধ শেষে বিপর্যয় ? নীনা, পরাজয় তোমার রক্ত কণিকার কোথাও নেই ? প্রতিদিন যুদ্ধ, এত বিপর্যয়। সব ছিন্ন করে এসেছ। তা-ও তা-ই চাও ? কী নেশা এতে... কী নেশা ? আপোস জানো না ? আপোস ?

তো, এত আপেল হলো, কমলা হলো, বুড়ো বয়সে বিছানায় যাওয়ার সময় কাতুকুতু হলো, বিছানার অশ্লীল শব্দ হলো, বেরিয়ে বাথরুমে যাওয়া হলো— এসবের মধ্যে কোনো বিপর্যয়ের কোনো শব্দ শুনি নি। এখন এমন করে কাঁদছে কেন শানু ?

অবশ্য ওদের ব্যাপারই আলাদা। আমি হিসেব মেলাতে গিয়ে তল পাই না। এর মধ্যে একদিন রাতে ওদের মধ্যে তুমুল ঝগড়া। ভীষণ ক্ষিপ্ত শানু সমান তালে চালিয়েছিল স্বামীর সাথে, তোমার চরিত্র জানি না ? অসভ্য, শুয়োর...। বেশ্যামাগি, হারামজাদি— কামাল ভাইয়েরও অস্পষ্ট হিস হিস ভেসে আসছিল।

তার উত্তরে ঝপাৎ! কী একটা কাচের জিনিস পড়ল মেঝেতে! এই রকম ঘটনার মুখে তৃতীয় কারো যা হয় আমারও তা-ই হয়েছিল। কেমন বর্ণনাতীত একটা অস্বস্তি, অজানা একটা ভয় আর শঙ্কা! বিছানার সাথে সেঁটে ছিলাম। মনের গহনে তখন ব্যর্থ গুনগুন— কিশোরী বউ যায়...। ভেতরে শানুর ঝাঁঝালো স্বর, যা, যা বেশ্যাদের দালালিই কর গিয়ে। দুই পয়সার মুরোদ নেই... ইত্যাদি ইত্যাদি। আয়, ঘুম আয়— বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করি... ধান ভানলে চিড়ে দেব, রাজকন্যার নূপুর দেব, মায়ের কানের দুল দেব...।

হঠাৎ চিৎকার— মেরে ফেললোরে! বাবারে! শানুর চিৎকারে ছিটকে দাঁড়াই। দৌড়তে গিয়ে টের পাই ভারি পা মাটির সাথে সেঁটে যাচ্ছে। এই রকম ব্যক্তিগত যুদ্ধে যাওয়া কি ঠিক হবে ? ভীষণ অসহায় বোধ করি। আবার চলে আসি বিছানায়। তারপর সব চুপ। বুক ঠাণ্ডা হয়ে আসে, মরে গেল নাকি ?

কিন্তু তারপরই সেই চিরাচরিত পুরনো ভঙ্গিতে শানুর অবিশ্রান্ত কান্নার দমক। লম্বা করে নিঃশ্বাস টেনে বিছানা আঁকড়ে ঘুমিয়ে যাই।

সকালবেলা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যেতে হয়। খুব ভোরে স্নান শেষ করা শানুর কী পবিত্র মুখ! টাওয়েল দিয়ে চুল ঘষছে। আমি জেগে আছি দেখে কাছে এলো। সহজ করে বলল, রাতে খুব, মানে ইয়ে ফিল করেছ? বিন্দু বিন্দু জল-ফোঁটা ওর চেহারাকে নরম করে তুলছে। ওর সামনে নিজেকে সহজ করে তুলতে চাই, না না তাতে কি, এ তো হতেই পারে। টাওয়েল দিয়ে চুল ঘষতে ঘষতে শানু আবার নিজের ঘরে। এই ওঠো না, ঘুমের কি পাগলরে বাবা...। ঘৃণায় বিষিয়ে উঠি। এরা মানুষ! এদের ভেতর থেকে কি মনের মৃত্যু ঘটেছে? মানুষ অভ্যাস দিয়ে সুখী হতে পারে? পরক্ষণেই নিজেকে সামলে উঠতে চাই, সবাইকে নিজের মতো মনে করছি কেন? এক জোড়া দেহের উত্তাপ যদি দুর্বিষহ মনের ক্লেশ মুহূর্তে মুছে দিতে পারে, আমার তাতে অসহ্য লাগার কী আছে?

কিন্তু আজকের কান্নাটা অন্যরকম। কামাল ভাইয়ের কথা শোনা যাচ্ছে না। কী এমন ঘটল যে অঝোরে কাঁদছে শানু? বিছানায় শুয়ে বই হাতে নিই। বাতি জ্বালানোই থাকে। শিবনারায়ণ রায়ের 'স্রোতের বিরুদ্ধে'। এর মধ্যে 'নাস্তিকতার ধর্ম জিজ্ঞাসা' শিরোনামের একটা প্রবন্ধ বেশ কিছুদিন আগেই সত্যজিৎ পড়তে বলেছিল। নানান অসুবিধায় এক পৃষ্ঠার বেশি এগোয় নি। সেই প্রবন্ধটারই ভাব ও ভাষার ঘূর্ণির মধ্যে ঘুরি— আচ্ছা, আমি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি? কী জানি, বেশি দূর হেঁটে গেলে তাকে খুঁজে পাই না। মাঝে মাঝে যখন রেল লাইন ধরে হাঁটতাম, তখনো বিয়ে হয় নি, দেখতাম, দূরে একটা ছায়া দাঁড়িয়ে আছে। নীলিমায় মিশে থাকা আবছা কুয়াশার মতো। তারপর এই যে দিন যাচ্ছে... এইসব দিনে আমার বিশ্বাসের গভীরে ঈশ্বর কোথায়? কোথায় সেই রেল লাইন? ছুটতে ছুটতে অনেক দূর যাব। দেখব তিনি তখনো সেই ছায়া দূরে ঝাঁকড়া বটগাছের মতো দাঁড়ানো? অথবা সেখানে আদৌ ওরকম কিছু নেই? আমি সময়ের সাথে সাথে সেই রেল লাইন, সেই ছুটে যাওয়া, সেই ছায়াকে খুইয়ে ফেলি নি? কী জানি। আমি কি আমার সব জানি? আশ্চর্য! ক'দিন বেশ ভুলে ছিলাম। আজ হঠাৎ বইয়ের পৃষ্ঠায় আমার সন্তান হামাগুড়ি দিয়ে ওঠে। সবগুলো অক্ষর ধুয়েমুছে গিয়ে একটি রূপান্তরিত হয় শিশুর আকৃতিতে। সেই শিশু হলুদ শরীরে কেঁপে-কেঁপে ওঠে। মাড়ি দিয়ে চেপে ধরে স্তনের বোঁটা। ছাড়িয়ে নিলেই অবিশ্রান্ত চিৎকারে চরাচর কাঁপিয়ে তোলে।

আমি ফিরে যাই সেই জীবনে। আমার শরীরের রস কচলে ভেসে ওঠে সেই দৃশ্য। আমার বুকে মুখ ঢুকিয়ে ও যেন রাজ্যির যন্ত্রণা ভুলে থাকতে চাইত। স্তনের গভীরে যেন দুধ নয়, বিষ-মেশানো রক্ত তার কোষে কোষে। ছাড়িয়ে নিলেই সেই চিৎকার! কাত হয়ে থাকতে থাকতে গা ব্যথা হয়ে যেত আমার। এইসব যন্ত্রণা ভুলে থাকার জন্য রেজাউলকে তার বন্ধুরা টেনে নিয়ে যেত বাইরে...। মনে আছে, হুইস্কির গ্লাসে একরাত তারা তাকে ডুবিয়ে রেখেছিল। সেদিন ওসব ছাইপাশ গিলে তার সে কী ঘোর-লাগা দশা! টলতে টলতে শিশুটির ওপর হামলে পড়েছিল। এ আমার জীবনে শনি হয়ে আসছে, মৃত্যু হয়ে আসছে। আহ্, দমবন্ধ হয়ে মরে যাব। আর আমি? পৃথিবীর কোন্ নেশায় ডুবলে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে, ভেবে পাই না। ফিসফিস করে ওর নরম শরীর ভিজিয়ে বলতাম, ঘুমোও... সোনা ঘুমোও...।

ঘুমোলেই স্বপ্ন দেখি আমি। বিজ্ঞানের ভাষায়, ঘুমের গাঢ়তা নেই। ঘুমের পর কি অপদেবতা আমাকে তাড়া করে ? তবে যে স্বপ্নে বাবাকে খাড়া বটগাছে হনুমানের মতো ঝুলতে দেখলাম ? উদ্বাহু সুদূর শূন্যে ঝুলছেন। সে কী অট্টহাসি তার! ঘুম ভেঙে যায়। আগ্নেয়গিরির লাভার মতন হিংস্র জিভ আমাকে পেঁচিয়ে ধরে। স্বপ্নের কত যে ধরন! বেশির ভাগ সময়ই জেগে থাকি। সারারাত পার করে দিই কাজল রেখার মতো রাজপুত্রের বিষসুচ উঠাতে-উঠাতে। সমস্ত সুচ উঠানোর পর তার চোখের দুটো বাকি রেখে আমি স্নানে গিয়েছি, রাজপুত্র চোখ মেলে যদি এই অপরিচ্ছন্ন কুৎসিত রূপ দেখে ? এসে দেখি, শুধু চোখের সুচ খুলে দিয়ে ভিন্ন এক নারী রাজপুত্রের প্রণয়ী হয়ে গেছে। আমার হৃৎপিণ্ডের অলীক চিহ্ন তার আর দৃষ্টিগোচর হয় না। আঙুলের ফাঁক গলিয়ে আমার হাড্ডি হিম-করা প্রহর কাটে। কত কী যে মনে পড়ে! আমার বর্তমান জীবনের রূঢ় বাস্তবতা কুয়াশার মতন ঢেকে রাখে আমার শৈশব, প্রথম যৌবন। এত বেশি স্মৃতিকাতর আমি, সত্যজিৎ বলে, দুঃখ বিলাসী! বিলাস! বড্ড মিষ্টি শব্দ। একদিন জিভ দিয়ে ছুঁয়ে দেখা যেত ? যৌবনের শুরুতে একজনের প্রেমে পড়েছিলাম। আমার জীবনে সে এক অলৌকিক সময় এসেছিল। ছেলেটা ছবি আঁকত... ইচ্ছে ছিল, সে হবে আমার পান্থপাদব। প্রবল প্রেমতাড়িত হলে আমার দু'ঠোঁটে বিষ জমা হয়। আমি ছোবল দিয়ে দিয়ে সেই বিষ-মেশানো প্রেম ঢেলে দিতে চাই। কিন্তু সেই বিষ সহ্য করার ক্ষমতা কি একজনেরও ছিল ? যাকে পান্থপাদবের মতো দেখতে চেয়েছিলাম, সে আমার দিকে একবারও ফিরে পর্যন্ত দেখেছিল ? বিষ জমা হওয়ার সুযোগ কোথায় ? তাকে বাস্তবের চেয়ে স্বপ্নেই পেতাম বেশি। সেই স্বপ্নও ছিল ফিনফিনে কবিতার মতো। এক রাতে স্বপ্নে দেখি, কী এক ঘোরে সে বলে যাচ্ছে, এই নাও আমার অস্তিত্ব, বসাও কামড়, টানো রক্ত তোমার লকলকে ডাইনির জিভ দিয়ে। শীর্ণ খাঁচার আগুনের এই স্রোত তুমুল হিংস্রতায় ফেনিয়ে তোলো। এর স্বাদ কখনো তুমি ভুলবে না। তোমার ঠোঁট থেকে মুছবে না এর দগদগে রঙ। ঘুম ভাঙার পর কবিতার মতো, গানের মতো, সেসব উচ্চারণ আমার চারপাশ ছায়া করে ঘুরেছে। বাস্তবের পুরুষ আমার জীবনে তখন এভাবেই স্বপ্নে আসত, দাঁড়াত পান্থপাদবের মতো। আমি ছুরি চালাতাম রক্তের প্রত্যাশায়, সে দিত জল... শুধুই জল। কিন্তু মহিম, কী করে অস্বীকার করি, আমার যৌবনকে সে জাগিয়ে তোলে নি ? লাইব্রেরির বইয়ের স্তূপে তার অজস্র চুম্বন... নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম না... হাঁ করলেই... বই শুধু বই... কী করে অস্বীকার করি সেই স্পন্দন ? চারপাশে বই সাক্ষী, তার দৃঢ় স্বীকারোক্তি, তোমার স্পর্শ আমার ঘুমন্ত সত্তাকে জাগিয়েছে, আমাকে পুরুষ করে তুলেছে। নীনা, তোমার কাছে আমার অপরিসীম ঋণ। কী করে উড়িয়ে দিই মহিমকে ? এইভাবে তখন আমার স্বপ্ন আর বাস্তব এক হয়ে যেত। এইসব ভাবতে ভাবতে মাঝরাতে ছটফট করে উঠি। বাতি নিভিয়ে নিজেকে বিছানায় চেপে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ি।

ঘুম ভাঙে খুব ভোরে। জানালা দিয়ে ধবধবে বেড়ালের মতো আলো হামাগুড়ি দেয়। ছাদের ওপর দিয়ে খটখট উড়ে যায় হেলিকপ্টার। সারাটা শরীর শিরশির করছে। কী বিদঘুটে রোমাঞ্চকর স্বপ্ন। আমাকে প্রবল আদরে কেউ জাগাতে চাইছে। দীর্ঘদিন পর শরীরে এক ধরনের তৃষ্ণা অনুভব করি। চুলের গোড়া খামচে ধরি। কে সেই পুরুষ ? প্রবল কুয়াশায় ডুবতে ডুবতে আবার ভেসে উঠি। বিবর্ণ চাঁদের আলো অবিশ্রান্ত খুলে যাচ্ছিল আমার শরীরের ভাঁজের পর ভাঁজে। চাঁদের সেই আলো ছায়া করে উদোম রেজাউলের বীভৎস শরীর টানটান দাঁড়িয়ে পড়ে। আমি শিশিরের মতো ক্রমাগত বাতাসে মিশে যেতে থাকি।

দরজা খুলে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই। আকাশে কুচবরণ কন্যার মেঘবরণ কেশ উড়ছে। ভেজা বাতাসের নরোম হাতছানি। চারপাশে ফসফরাসের ফিনকি তোলা আলো। ধমনীতে ছেঁড়াখোঁড়া শীতের ছায়া। পাশের বিল্ডিংয়ের ছাদে নিমের ডাল দিয়ে দাঁত খিলান করছে একজন লোক। হারমোনিয়ামের সুর তুলে সা-রে-গা-মা সেধে চলেছে দূরের কোনো এক কিশোরী। বস্তির মধ্যে ঢং ঢং টিন পেটানোর শব্দ। সব ছাপিয়ে আলটপকা আমার মগজে অন্য তরঙ্গ বয়ে যায়, বেহুলা লখিন্দরের বাসরঘরের কোন ফোঁকর দিয়ে সাপ ঢুকেছিল ? আমার বাসর ঘরেও কি তেমন কোনো ছিদ্র ছিল ? কী যে ভাবছি আমি!

হেইট!

খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠি। জানা হলো না, শানু কেন রাত ভর এত কেঁদেছে। কামাল ভাই বেরিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে সে বিছানায়। নিজেকে গুছিয়ে এক সময় আমিও অফিসে। এরপর রোজকার সেই রুটিন— টাইপ, ফাইল, বসের গম্ভীর মুখ, সহকর্মীদের পারিবারিক কাসুন্দি— আর বলবেন না, মাত্র এক মার্কের জন্য আমার ভাইঝিটা স্ট্যান্ড করল না, কি একটা বিয়া করলাম দাদা, বারো মাস বউয়ের ব্যারাম লাইগ্যা থাকে, সকালে ভাই নাস্তা হয় নি, গিন্নীর সাথে হেভি ফাইট, অফিসে আসার সময় কোনোদিন চিরুনি খুঁজে পাই না, কবে হরতাল ? সাতাশ তারিখ ? হে হে মন্দ না, একটা দিন রেস্ট, পোলার ফরম ফিলাপের টাকা দিয়ে এ মাসে আমি ফিনিস, শুকনা রুটি খেয়ে সারাটা রাত খালি পেট মোচড়ায়, খাঁটি কথা ভাই... এভাবে বাঁচা যায়, কে ? মিসেস গুপ্ত ? হ্যাঁ-হ্যাঁ ওর সাথে আমিও তো তাকে একদিন দেখলাম চাইনিজ রেস্টুরেন্টে, ছি ছি আরে থু, কি যে কন ভাই, দেশে শালার হরতাল-মিছিল ল্যাইগ্যাই রইছে, ধুৎ একটা কলমেও যদি কালি থাকত, ছোট ভাইয়ের কাছে গেছিলাম টাকার লাইগ্যা, হের বউ যা করল! এ্যার চাইতে জুতাপেটা করলেই ভালো হইত, কী দেশ ভাই, দশ টাকার জিনিস ধাম কইরা আঠারো টাকা হইয়া যায়, কারো কোনো প্রতিবাদ নাই, সব মাগির পুত দালাল!

এত সব কোরাস ছাপিয়ে আমার কান এবার সতর্ক হয়ে ওঠে। একজন গলার স্বর নিচু করে বলে, আমাগো বসই হইল গিয়া এক নম্বরের দালাল। মালিকের কাছ থাইক্যা নিশ্চয়ই কমিশন পায়। বসুন্ধরায় প্লট কিনছে।

কথাটা আর মাটিতে পড়ে না। সবাই সমস্বরে প্রশ্ন করে ওঠে, সত্যি ?

এবার একক ঝাঁকালো স্বর, হ্যায় কী একলা দালাল ? অফিসের অনেকেই দালাল। টের পাওয়া যায় না।

কিন্তু আজ এইসব পুরনো কাসুন্দির ফাঁক গলিয়ে অকস্মাৎ পত্রিকার হেডলাইনে সাদ্দাম হোসেন কুয়েত দখল করে বসে।

অফিসে মহাহুলুস্থুল। তপ্ত সংলাপ বিনিময়। এর মাঝখানে আমার ঠাণ্ডা চোখ প্রতিদিনের অভ্যাসে হেডলাইনের পথ ধরে হাঁটে। কুয়েত সীমান্তে ইরাকের সৈন্য সমাবেশ। যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ। এ ব্যাপারটার গুরুত্ব আমি সহজেই বুঝে উঠতে পারি না। কেউ চিৎকার করে ওঠে, মার্কিনের অত মাথা ব্যাদনা ক্যান... যা হোক... আমি নির্বিকার ছাপোষা মানুষ, সমস্ত কেওয়াস থেকে সন্তর্পণে গা বাঁচিয়ে অফিস শেষে আলটপকা বেরিয়ে আসি। ভিড়

ঠেলে বাসে উঠি। ভ্যাপসা গন্ধ-ছাওয়া পথ, অন্ধকার গলি ধরে ধরে দরজায়। বাসায় এসে শুনি, কি বিশেষ দরকারে সত্যজিৎ আমাকে খুঁজে গেছে। তার আবার বিশেষ দরকার কী? ভাবতে-ভাবতে শাড়ি পাল্টে বাথরুমে। শানুর মুখ থমথমে। আমি সন্তর্পণে ওর দিকে তাকাই শুধু। কিন্তু প্রশ্ন করি না। কি হয়েছে ও নিজের থেকেই বলুক। শাওয়ার উপচে জল পড়ছে। আজ বেশ ক'দিন পর অন্ধকার সরু বাথরুমটা জলের তোড়ে ভেসে যাচ্ছে। ধুমসে গা চোবাই। শরীরের ভাঁজে ভাঁজে থাকা তেতো ঘাম, জমাট ধুলোর জট খুলে যেতে থাকে। আহ্ শান্তি। ঘুম নামছে চোখে।

বেরিয়ে চুলে তোয়ালে জড়াচ্ছি, শানু প্রায় কেঁদে ফেলে, গতরাতে বাথরুমে গিয়ে দেখি রক্ত। যা ভেবেছিলাম ভুল। ভীষণ কষ্ট পেয়েছে তোমার কামাল ভাই। বলো আমি কী করব... গলা রুদ্ধ হয়ে আসে তার।

মন খারাপ হয়ে যায় আমারও। বিছানায় টেনে বসিয়ে ওকে সান্ত্বনা দেই। এ মাসে হয় নি, পরের মাসে হবে। তোমরা এত ঘাবড়ে যাও! পনেরো বছর পেরুনোর পরও কতজনের হতে দেখেছি। ভেতরে দুর্বল থাকলে মানুষ সহজ সান্ত্বনা বড্ড দ্রুত লুফে নেয়। আগ্রহী গলায় জিজ্ঞেস করে, তুমি নিজে দেখছ?

আমার এক খালারই হয়েছে, স্রেফ মিথ্যে ঝেড়ে দিলাম, দশ বছর পর হয়েছে।

শানুর চোখ ঝলসে ওঠে, কথাটা তুমি তোমার কামাল ভাইকে বলো।

ও চলে গেলে আমি আবার নিজের মধ্যে ফিরে আসি। সত্যজিৎ আমাকে কেন খুঁজছে! আরেফিনটাও আসবে বলে এলো না। তার ঠিক কত টাকা দরকার জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। আমি এ মাসে সুলতানার কাছ থেকে দু'শো টাকা লোন নিয়েছি। বেতন থেকে ওকে কিছু দেয়া সম্ভব না। আচ্ছা, সত্যজিতের কাছে চাইলে কিছু লোন পাওয়া যাবে না? কিছু একটা শুরু করে জোড়াতালি দিয়ে যদি দাঁড়াতে পারে আরেফিন! আজকালকার ছেলেরা চালাক আছে। দেখা যাবে উড়তে উড়তেই শেষ পর্যন্ত বসার একটা জায়গা করে নিয়েছে।

এভাবে ক্রমশ আমার ফেলে আসা শহরের সামনে দাঁড়াই। রানুর মুখ মনে পড়ে। ওর ক্রমপতনের খবর পাই। হাত-পা অসাড় হয়ে আসে। কখনো ক্রোধ জমে ভেতরে। সবচে' ছোটটা মন্টু, হারিকেনের আঁকাবাঁকা আলোর সামনে বই নিয়ে ঝিমোয়। এই বিংশ শতাব্দীর শেষেও ও-বাড়িতে হারিকেনের রহস্যময় ছায়া খেলা করে। বিল আটকে থাকায় তিনমাস আগে কারেন্টের লাইন কেটে দিয়েছে। আমি আসলে আমাদের পুরো পরিবারটার ওপর এত ক্ষিপ্ত কেন? নিজেকে বিশ্লেষণ করি, কিন্তু করলে কি হবে, ওদের সাহায্য করার আমার সামর্থ্য কোথায়? তাদের দুর্বিপাকের সমান্তরালে চলেছে আমার অক্ষমতা। কষ্ট থেকে রেহাই পাবার জন্যই কি এই ঘৃণা? ক্ষিপ্ততা? না, বাড়ি নিয়ে আর ভাবব না। রানু আমার রক্ত জল করে-দেয়া-একটা অধ্যায়। এখন আমি সেই অধ্যায়ের প্রতিটি অক্ষর ভুলতে চাই। ম্যাগাজিন ওল্টাতেই দেখি একটি শিশুর ছবি... আমি কোথায় যাব? মাথার দুটো শিরা চেপে ভাবি, সত্যজিৎ আমাকে খুঁজছে কেন?

এভাবে আরো একটা হপ্তা কেটে যায়। ঠিক দ্বিতীয় হপ্তার মাথায় এমন একটা অভাবিত ঘটনা ঘটে, যার ধাক্কায় আমার বিস্ময়ের সীমা থাকে না। আমার একাকার নিস্তরঙ্গ সময়ে যোগ হয় অদ্ভুত এক স্পন্দন। নিজেকে ভীষণ মূল্যবান মনে হয় আমার। এই ঘটনার আগে

অবশ্য সত্যজিতের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তার কনফেকশনারির সামনে যেতেই বলল, একটু দাঁড়া। হাতের কাজটা সেরে নিই। বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হলো না। অফিস থেকে সরাসরি তার ওখানে যাওয়ার পর সন্ধ্যা নেমে আসছিল। সামনে একটা চমৎকার ভেস্‌পা। খুশি খুশি গলায় ও বলল, এটা কিনেছি। পশ্চিমের আকাশ অসাড় করে দিয়ে রাত্তির নামতে চাইছে। আমি চঞ্চল হয়ে উঠি, তুই কি শুধু এই খবরটা জানানোর জন্যই বাসায় গিয়েছিলি?

আমাকে তুই ছোটলোক মনে করিস নাকি? তেতে ওঠে সত্যজিৎ। নিজেই আবার বিচলিত মুখে উস্কো চুলে আঙুল ঢোকায়, অবশ্য মোটর সাইকেলটা কিনে খুব অস্বস্তি হচ্ছে। রনজুর এই বিপর্যয়ের সময়...।

কারো জন্য কারো জীবন আটকে থাকে না, শাশ্বত বাক্যটি উচ্চারণ করি। তারপর জিজ্ঞেস করি, রন্‌জু এখন কেমন আছে?

বাপের প্যাদানি খাচ্ছে। সালাহ্‌দিনের ওখানে ঘনঘন গাঁজার আসর বসছে।

তোদের এই ভণ্ডামি দেখলে গা জ্বলে যায়। তোরা আসলে একেকটা মেনি বেড়ালেরও অধম। সত্যজিৎ ঠেলে-ঠেলে অনেক দূর নিয়ে এসেছে মোটর সাইকেল। বলল, তুই কি আমার পেছনে বসবি? নাকি জাত যাবে?

আমার অত শস্তা শুচিবাই নেই, হেসে বলি কিন্তু আমি ঠিক বুঝছি না, ভেসপায় চড়ে কোথায় যাব?

তুই আবার ভেবে বসিস না আমি কোনো সস্তা সুযোগ নিতে চাইছি। তোর জীবনটা তো পাঁকে পড়ে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে, চল্‌, ঘুরে আসি। দু'জনেরই ভালো লাগবে। অবশ্য তুই যদি অস্বস্তি বোধ করিস...।

দেখ সত্যজিৎ, আগেইতো বলেছি আমার কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এই শহরটা খুব ছোট। ফলে মানুষের মনও বিশাল নয়।

তোর কে আছে, কাকে তুই কেয়ার করিস? তুই তোর আত্মাকে বিশ্বাস করিস না? তার কাছে সৎ থাকলেই হলো। সত্যজিৎ স্টার্ট দেয়।

উড়ে যায় ভেসপা। আহ্‌ হিসেবের বাইরে একটা দিন! ধীরে ধীরে রাতের শহর জেগে উঠেছে। হু-হু বাতাস আমার আঁচল শূন্যে উড়িয়ে নিচ্ছে। বাতাসের তোড়ে সত্যজিতের স্বর কাঁপছে, কী বলছিলি, ভণ্ডামি? একজন মানুষের এত বড় একটা ক্ষতি আর তুই তাকে ছোট করে দেখছিস? রন্‌জুর অবস্থাটা তুই বুঝছিস না? বিশাল আলোময় জগৎ সঙ্কীর্ণ করে দিয়ে ভেসপা ছুটছে। এ এক অপূর্ব অনুভূতি! এরকম সুখ আর কোনোদিন পেয়েছি? রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে স্নায়ুতন্ত্র। তারপরও কথা বলতেই হয়। বাতাসের তোড় সামলে তাই বলি, গাঁজা খেলে এর সমাধান হবে? ত্রিশ ক্রস্‌ করেছিস। এই বয়সে ফ্রাস্টেশনের এই নমুনা মানায়? কান্দুপট্টিতে যেতে বলিস ওকে, যা করছে, তার পরের স্টেজ ওটাই।

বাতাসের ধাক্কায় নিজের কানেই অস্পষ্ট শোনায় নিজের স্বর। ফুটপাত, ল্যাম্পপোস্ট, ট্রাফিক বাতি দ্রুত পেছনে ফেলে এক সময় ক্রিসেন্ট লেকের কাছে এসে সত্যজিৎ থামে। বিস্তৃত ধু-ধু সিঁড়ি। তার ওপারে জলের সিল্কি চুল। স্রোতের তরঙ্গে সেই চুল কত রহস্যে যে পাক খাচ্ছে! এই জায়গাটা সন্ধ্যায় খুব রিস্কি, আমি বলি, পুলিশ বাজে সন্দেহ করে ধরে নিয়ে যায়। তাছাড়া চুরি-ছিনতাইও কম হয় না।

তোর অভিজ্ঞতা আছে মনে হচ্ছে। কার সাথে এসেছিলি ?

সেই কৈফিয়ত আমি তোকে দিতে যাব কেন ? ধুর। এসে ভালো লাগছে না।

স্বতঃস্ফূর্ততা কী জিনিস, সে তুই জীবনেও বুঝবি না, অস্বস্তির জন্যই তোর খারাপ লাগছে। আমরা শুধু এই পথটা ধরে হাঁটব।— বলে সে আগের প্রসঙ্গেই ঘুরপাক খেতে থাকে, কী বলছিলি, কান্দুপট্টি ? তুই গাঁজা খাওয়াটাকে ওরকম বাঁকা চোখে কেন দেখিস বল তো ?

সহজভাবে কোনো কিছু কেউ খেলে আমার আপত্তি নেই, আমি বলি, কিন্তু একটা কিছুতে ফ্লপ খেয়ে... বাংলা হিরো আর কী! কথাগুলো একটানা বলছিলাম কোনো গভীরতা থেকে নয়। মনেপ্রাণে চেপে-বসা কোনো অসাড় বোধ থেকে নয়, একটা কিছু বলা দরকার, ঠিক সেজন্যই।

দু'পাশে গাছ। সুপরিসর তকতকে পথ। সোডিয়ামের কাঁপা কাঁপা আলো। হু-হু জলের বাতাস। আমার ঘুম পাচ্ছে। আসলে এসব কথা বলতেই কি আমি এখানে এসেছি ? ওর গা ঘেঁসে হাঁটি। মোটর সাইকেল ঠেলে এগোচ্ছে সত্যজিৎ। এই আলো, এই হাওয়া ওকে অচেনা, চমৎকার করে তুলছে। উস্কো চুল বাতাসে উড়ছে। ওর চোখ, খোঁচা দাড়ির নিচে ফর্সা গাল, বাঁ হাতে অদ্ভুত কায়দায় সিগ্রেট ধরানো... এই সত্যজিৎকে আমি চিনি ? ঘুম ঘুম দৃষ্টি মেলে দিই সামনের দিকে। ঝাউগাছের ঝিরঝির হাওয়া... অদ্ভুত মাদকতা...। ও যদি আমাকে জড়িয়ে ধরে ? হঠাৎ কেমন থির থির কেঁপে উঠে শরীর। ও যদি আমার হাতটা একটু স্পর্শ করত ?

তোর সাথে রেজাউল দেখা করতে চায়, সত্যজিৎ আচমকা বলে। মনে হলো সিরিয়াস কোনো কিছু নিয়ে কথা বলবে।

আবার কেঁপে উঠি। পরক্ষণেই সরিয়ে দিই সেই হাওয়া... আজ থাক। দীর্ঘদিন পর এমন একটা সন্ধ্যা, এমন রুটলেস পথচলা... থাক। সত্যজিৎ আমার হাত স্পর্শ করলে কি করব ? এই অদ্ভুত নিসর্গ আমার সব ভাঁজ খুলে দেবে না তো ?

কিছু বলছিস ? সত্যজিৎ সিগ্রেটের আদ্ধেকটাই দূরে ছুঁড়ে দেয়। প্রশ্ন করি তোর সাথে কোথায় দেখা হয়েছে ওর ? নিজেকে গভীর গহ্বর থেকে ওপরে টেনে ওঠাই। বারে, আমার বেকারি ও চেনে না ? সত্যজিৎ সতর্ক করে দিয়ে বলে, তুই বিষয়টাকে গুরুত্বই দিচ্ছিস না!

আমি ঠাট্টা মেশানো স্বরে বলি, গুরুত্ব দেয়ার মতো নতুন কিছু বলেছে নাকি ?

খুব বাজে অবস্থায় আছে মনে হচ্ছে। ইন্সুরেন্সের চাকরিটা চলে গেছে। কোনো এক ফার্মে ঢুকেছে। সেখানেও সুবিধে করতে পারছে না। আমার সাথে পার্টনারশিপে বিজনেস করতে চাইলো। যা হোক একটা কিছু করতে চায়।

টাকা কোথায় পাবে ? হঠাৎ বোকার মতো প্রশ্ন করে বসি।

সেসব কিছু বলে নি। বলেছে তোকে দরকার। কিন্তু ওর বাজে অবস্থার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই, সেটা অন্তত আমি সাফ সাফ বুঝেছি।

আমাকে দরকার! কেন ? প্রশ্ন করে কেমন থিতিয়ে আসতে থাকি। সত্যজিৎ হারামজাদা, এই চমৎকার জায়গায় এনে এমন একটা অধ্যায় না তুললে কি ওর হতো না! নাহ্ জীবনেও আমার স্বস্তি হবে না। আমি জানি এই অদ্ভুত সম্মোহনময় সন্ধ্যাটা দলামোচড়া

অবশ্য সত্যজিতের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তার কনফেকশনারির সামনে যেতেই বলল, একটু দাঁড়া। হাতের কাজটা সেরে নিই। বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হলো না। অফিস থেকে সরাসরি তার ওখানে যাওয়ার পর সন্ধ্যা নেমে আসছিল। সামনে একটা চমৎকার ভেস্‌পা। খুশি খুশি গলায় ও বলল, এটা কিনেছি। পশ্চিমের আকাশ অসাড় করে দিয়ে রাত্তির নামতে চাইছে। আমি চঞ্চল হয়ে উঠি, তুই কি শুধু এই খবরটা জানানোর জন্যই বাসায় গিয়েছিলি?

আমাকে তুই ছোটলোক মনে করিস নাকি? তেতে ওঠে সত্যজিৎ। নিজেই আবার বিচলিত মুখে উস্কো চুলে আঙুল ঢোকায়, অবশ্য মোটর সাইকেলটা কিনে খুব অস্বস্তি হচ্ছে। রনজুর এই বিপর্যয়ের সময়...।

কারো জন্য কারো জীবন আটকে থাকে না, শাশ্বত বাক্যটি উচ্চারণ করি। তারপর জিজ্ঞেস করি, রন্‌জু এখন কেমন আছে?

বাপের প্যাদানি খাচ্ছে। সালাহ্‌দ্দিনের ওখানে ঘনঘন গাঁজার আসর বসছে।

তোদের এই ভণ্ডামি দেখলে গা জ্বলে যায়। তোরা আসলে একেকটা মেনি বেড়ালেরও অধম। সত্যজিৎ ঠেলে-ঠেলে অনেক দূর নিয়ে এসেছে মোটর সাইকেল। বলল, তুই কি আমার পেছনে বসবি? নাকি জাত যাবে?

আমার অত শক্তা শুচিবাই নেই, হেসে বলি কিন্তু আমি ঠিক বুঝছি না, ভেসপায় চড়ে কোথায় যাব?

তুই আবার ভেবে বসিস না আমি কোনো সস্তা সুযোগ নিতে চাইছি। তোর জীবনটা তো পাঁকে পড়ে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে, চল্‌, ঘুরে আসি। দু'জনেরই ভালো লাগবে। অবশ্য তুই যদি অস্বস্তি বোধ করিস...।

দেখ সত্যজিৎ, আগেইতো বলেছি আমার কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এই শহরটা খুব ছোট। ফলে মানুষের মনও বিশাল নয়।

তোর কে আছে, কাকে তুই কেয়ার করিস? তুই তোর আত্মাকে বিশ্বাস করিস না? তার কাছে সৎ থাকলেই হলো। সত্যজিৎ স্টার্ট দেয়।

উড়ে যায় ভেসপা। আহ্‌ হিসেবের বাইরে একটা দিন! ধীরে ধীরে রাতের শহর জেগে উঠেছে। হু-হু বাতাস আমার আঁচল শূন্যে উড়িয়ে নিচ্ছে। বাতাসের তোড়ে সত্যজিতের স্বর কাঁপছে, কী বলছিলি, ভণ্ডামি? একজন মানুষের এত বড় একটা ক্ষতি আর তুই তাকে ছোট করে দেখছিস? রন্‌জুর অবস্থাটা তুই বুঝছিস না? বিশাল আলোময় জগৎ সঙ্কীর্ণ করে দিয়ে ভেসপা ছুটছে। এ এক অপূর্ব অনুভূতি! এরকম সুখ আর কোনোদিন পেয়েছি? রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে স্নায়ুতন্ত্র। তারপরও কথা বলতেই হয়। বাতাসের তোড় সামলে তাই বলি, গাঁজা খেলে এর সমাধান হবে? ত্রিশ ক্রস্‌ করেছিস। এই বয়সে ফ্রাস্টেশনের এই নমুনা মানায়? কান্দুপট্টিতে যেতে বলিস ওকে, যা করছে, তার পরের স্টেজ ওটাই।

বাতাসের ধাক্কায় নিজের কানেই অস্পষ্ট শোনায় নিজের স্বর। ফুটপাত, ল্যাম্পপোস্ট, ট্রাফিক বাতি দ্রুত পেছনে ফেলে এক সময় ক্রিসেন্ট লেকের কাছে এসে সত্যজিৎ থামে। বিস্তৃত ধু-ধু সিঁড়ি। তার ওপারে জলের সিল্কি চুল। স্রোতের তরঙ্গে সেই চুল কত রহস্যে যে পাক খাচ্ছে! এই জায়গাটা সন্ধ্যায় খুব রিস্কি, আমি বলি, পুলিশ বাজে সন্দেহ করে ধরে নিয়ে যায়। তাছাড়া চুরি-ছিনতাইও কম হয় না।

তোর অভিজ্ঞতা আছে মনে হচ্ছে। কার সাথে এসেছিলি ?

সেই কৈফিয়ত আমি তোকে দিতে যাব কেন ? ধুর। এসে ভালো লাগছে না।

স্বতঃস্ফূর্ততা কী জিনিস, সে তুই জীবনেও বুঝবি না, অস্বস্তির জন্যই তোর খারাপ লাগছে। আমরা শুধু এই পথটা ধরে হাঁটব।— বলে সে আগের প্রসঙ্গেই ঘুরপাক খেতে থাকে, কী বলছিলি, কান্দুপট্টি ? তুই গাঁজা খাওয়াটাকে ওরকম বাঁকা চোখে কেন দেখিস বল তো ?

সহজভাবে কোনো কিছু কেউ খেলে আমার আপত্তি নেই, আমি বলি, কিন্তু একটা কিছুতে ফ্লপ খেয়ে... বাংলা হিরো আর কী! কথাগুলো একটানা বলছিলাম কোনো গভীরতা থেকে নয়। মনেপ্রাণে চেপে-বসা কোনো অসাড় বোধ থেকে নয়, একটা কিছু বলা দরকার, ঠিক সেজন্যই।

দু'পাশে গাছ। সুপরিসর তকতকে পথ। সোডিয়ামের কাঁপা কাঁপা আলো। হু-হু জলের বাতাস। আমার ঘুম পাচ্ছে। আসলে এসব কথা বলতেই কি আমি এখানে এসেছি ? ওর গা ঘেঁসে হাঁটি। মোটর সাইকেল ঠেলে এগোচ্ছে সত্যজিৎ। এই আলো, এই হাওয়া ওকে অচেনা, চমৎকার করে তুলছে। উস্কো চুল বাতাসে উড়ছে। ওর চোখ, খোঁচা দাড়ির নিচে ফর্সা গাল, বাঁ হাতে অদ্ভুত কায়দায় সিগ্রেট ধরানো... এই সত্যজিৎকে আমি চিনি ? ঘুম ঘুম দৃষ্টি মেলে দিই সামনের দিকে। ঝাউগাছের ঝিরঝির হাওয়া... অদ্ভুত মাদকতা...। ও যদি আমাকে জড়িয়ে ধরে ? হঠাৎ কেমন থির থির কেঁপে উঠে শরীর। ও যদি আমার হাতটা একটু স্পর্শ করত ?

তোর সাথে রেজাউল দেখা করতে চায়, সত্যজিৎ আচমকা বলে। মনে হলো সিরিয়াস কোনো কিছু নিয়ে কথা বলবে।

আবার কেঁপে উঠি। পরক্ষণেই সরিয়ে দিই সেই হাওয়া... আজ থাক। দীর্ঘদিন পর এমন একটা সন্ধ্যা, এমন রুটলেস পথচলা... থাক। সত্যজিৎ আমার হাত স্পর্শ করলে কি করব ? এই অদ্ভুত নিসর্গ আমার সব ভাঁজ খুলে দেবে না তো ?

কিছু বলছিস ? সত্যজিৎ সিগ্রেটের আদ্ধেকটাই দূরে ছুঁড়ে দেয়। প্রশ্ন করি তোর সাথে কোথায় দেখা হয়েছে ওর ? নিজেকে গভীর গহ্বর থেকে ওপরে টেনে ওঠাই। বারে, আমার বেকারি ও চেনে না ? সত্যজিৎ সতর্ক করে দিয়ে বলে, তুই বিষয়টাকে গুরুত্বই দিচ্ছিস না!

আমি ঠাট্টা মেশানো স্বরে বলি, গুরুত্ব দেয়ার মতো নতুন কিছু বলেছে নাকি ?

খুব বাজে অবস্থায় আছে মনে হচ্ছে। ইন্সুরেন্সের চাকরিটা চলে গেছে। কোনো এক ফার্মে ঢুকেছে। সেখানেও সুবিধে করতে পারছে না। আমার সাথে পার্টনারশিপে বিজনেস করতে চাইলো। যা হোক একটা কিছু করতে চায়।

টাকা কোথায় পাবে ? হঠাৎ বোকার মতো প্রশ্ন করে বসি।

সেসব কিছু বলে নি। বলেছে তোকে দরকার। কিন্তু ওর বাজে অবস্থার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই, সেটা অন্তত আমি সাফ সাফ বুঝেছি।

আমাকে দরকার! কেন ? প্রশ্ন করে কেমন থিতিয়ে আসতে থাকি। সত্যজিৎ হারামজাদা, এই চমৎকার জায়গায় এনে এমন একটা অধ্যায় না তুললে কি ওর হতো না! নাহ্ জীবনেও আমার স্বস্তি হবে না। আমি জানি এই অদ্ভুত সম্মোহনময় সন্ধ্যাটা দলামোচড়া

করে আমরা এখন নোংরা করে তুলব। প্রসঙ্গটাই এমন, এ নিয়ে কথা বলে সুন্দর কোনো পরিণামে পৌঁছুনো অসম্ভব। সেই পরিস্থিতির জন্যই নিজেকে ক্রমশ প্রস্তুত করে বলি, তুই ওকে কিছু বলেছিস?

বলেছি কাল পাঁচটার পর সালাহ্‌দিনের বাসায় আসতে, তোকে আমি নিয়ে যাব।

আমার সমস্ত চামড়া টানটান হয়ে ওঠে, সালাহ্‌দিনের বাসা ও চেনে?

গোয়েন্দাগিরি করছিস কেন? আমি ঠিকানা দিয়েছি।

সত্যজিৎ, তুই ওকে কথা দেবার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলি? আমার উত্তেজনা ফেটে পড়তে চায়, আমি কি খেলনা? হাতের মুঠোয় ভরে নিয়ে যাবি।

দেখ, সত্যজিৎ বলে, আমার বিশ্বাস থেকে ওকে কথা দিয়েছি। আমি যতদূর জানি তুই অত রক্ষণশীল না। যার সঙ্গে এতদিন কাটালি, ডিভোর্স হয়েছে বলে তার একটা কথা শুনতেও এখন তোর এত আপত্তি?

তারপর কিছুক্ষণ নীরবতা। চারপাশে চকমকে আলো রাত্তিরকে শাদা করে তুলেছে। সোডিয়াম বাতির এলাকা পেরিয়ে এসেছি। কেমন ভয় ভয় করছে এখন। শিরশির অনুভূতিতে শরীর কাঁপছে। এতক্ষণ মোহগ্রস্ততায় ভয় উঠে গিয়েছিল। শানুকে আর কি বলব, আমি নিজেই কি অল্পতেই বর্তে যাই না? আমার কি কোনো ব্যক্তিত্ব আছে? স্বপ্ন মেশানো মিষ্টি দুটো কথা বলে কেউ আমাকে চাঁদের আলোয় শুইয়ে দিলে পরক্ষণেই ভাঁজ খুলে দেব না? অসহ্য লাগছে, যন্ত্রণা হচ্ছে, সব ছাপিয়ে সেই নাজুক প্রসঙ্গেই আবার ফিরে আসতে হয়, সে আমাদের বিয়ে বিচ্ছেদ নিয়ে নতুন কোনো কাসুন্দি ঘেঁটেছে?

হ্যাঁ। তবে ও-কথা আমি বলতে চাই না। সত্যজিৎ ঠাণ্ডা গলায় বলে, আমার কাছে ব্যাপারটাকে কাসুন্দি মনে হয় নি।

চেপে যাচ্ছিস কেন? এইবার হেসে ফেলি, তুই জানিসই না ওর কোনো কথাতেই আমি আর অবাক হই না।

কিন্তু এ কথাটা তোর খারাপ লাগবে, সত্যজিৎ গম্ভীর গলায় বলে, অবশ্য আগেও একদিন ইঙ্গিত দিয়েছিল। কাল খোলাখুলি বলল। অবশ্য কথাটা তোকে বলতে সেই বারণ করেছে। এবার আমি নিস্পৃহ হয়ে পড়ি, তাহলে বলিস না!

কথা আর এগোয় না। আমি অবশ্য ভেতরে ভেতরে কৌতূহলে ফেটে পড়ছি। সত্যজিৎ উসখুস করতে থাকে। কিছুক্ষণ এভাবেই যায়। তারপর সত্যজিৎ আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। বলে, রেজাউল বলেছে ওর সাথে দৈহিক সম্পর্কের ব্যাপারে তোর কিছু বিকার ছিল, বিয়ে বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে ওটাও একটা প্রধান কারণ।

কথাটা শোনামাত্র বিদ্যুৎ-বেগে খাড়া হয়ে যাই। প্রচণ্ড ঝাঁকুনির সাথে সাথে একসময় থিতিয়ে আসতে থাকি। আমার বিপন্ন কণ্ঠস্বর সমস্ত চরাচরে আছড়ে পড়তে থাকে, কি বলছিস তুই? ওকরম একটা ঘটনার এই বিশ্লেষণ দিল সে? খেপে ওঠে সত্যজিৎ, তোদের ইন্টারনাল ব্যাপার-স্যাপারে আমি যেতে চাই না। তুই পেছনে বসতো। বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসি। তোদের এসব কিছু আমি বুঝি না। বিচ্ছেদের পেছনে এরকম কোনো কিছু থাকতে পারে ঘুণাক্ষরেও জানতাম না। আমি তোকে বিশ্বাস করেছিলাম। সারাক্ষণ তো তারই দোষ

দিয়ে আসছিলাম। ধুর, কেন যে তোকে সব বলতে গেলাম! আমি আসলেই একটা পেটফাঁপা ছেলে।

আমার বুক ঠেলে কান্না উঠছে। যেন ঘাই দিয়ে ওঠা একটা মাছ উল্টো বাতাসের ধাক্কা খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল, একদম জলের তলায়, এভাবে আহত যন্ত্রণার ঘেরাটোপ থেকে নিজেকে টেনে তুলে সত্যজিতের ভেসপার পেছনে বসি।

এক সময় সেই বাহন চলতে শুরু করে।

তুই কাল আসছিস?

ছিঃ সত্যজিৎ! এরপরও? তুই আমাকে মানুষ মনে করিস না?

বুক খালি হয়ে আসছে। আমি আবার সেই শিশুর চিৎকার শুনতে পাই। পুরো রাত জুড়ে চরাচর ভেসে যেতে থাকে সেই কান্নার ধারাজলে কি অপূর্ব ছায়াঘন রাজপথ! এ-কী, কানের কাছে সাঁই সাঁই হাওয়া, না কান্না? রানু, কেন নিজেকে নিভৃত্ত সলতে করে দিলি? কেন আমার জীবনটা এইরকম হলো? বারান্দায় দাঁড়াই, খোলা হাওয়ায় বাতাস নেব। উল্লাসমুখর শিশুরা মাঠের ওপর খেলছে। উচ্ছল আনন্দে তারা একটা মরা ইঁদুর ছুঁড়ে দেয় শূন্যে। পিঁপড়ের দখলে থাকা পেট ফোলা সেই ইঁদুরটা আমার পায়ের ওপর ঝপাৎ এসে পড়ে। পৈশাচিক ঢঙে লেহন করে পিঁপড়ের লম্বাটে জিভ। কেন সবসময় এরকম দুর্গন্ধ? ক্রোধে ক্ষিপ্ত রেজাউল ক্রমশ রাক্ষস রাজা, এগিয়ে আসছে আমার দিকে। সাঁ করে ওর একটা হাত আমার চুলের গোড়ায়। ভয়ে বিবর্ণ আমি ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছি। আমার মাথায় ঠোক্কর লাগাচ্ছে... কী অন্ধকার... কী পৈশাচিক কালো রক্ত! কী বীভৎস ঘৃণা! আহ্! মরে যাব! চারপাশ ঝাপসা হয়ে আসছে। ঠোক্কর লাগছে... অন্ধকার... শুধু অন্ধকার। সেই মানুষ শেষে আমাকে জড়িয়ে ধরে অনুতাপে ভেঙে পড়ে। কিন্তু কেন?

বাসায় এসে কি হয়, কান্নায় ভেঙে পড়ি। বালিশ আঁকড়ে অঝোরে কাঁদতে থাকি। রেজাউল সত্যজিতের কাছে এভাবে তুলে ধরল আমাকে? সত্যজিৎ বাসার সামনে এসে আমাকে বারবার বোঝাচ্ছিল— ব্যাপারটা আমি যেন না জানি, রেজাউল বারবার সেটাই চাইছিল। সত্যজিৎ তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলেই তাকে ও-ভাবে বলেছে। আমি যেন সালাহ্‌দিনের বাসায় যাই। অত সহজেই সেন্টিমেন্টাল হওয়া আমাকে সাজে না। সমস্ত কথার মুখে আমি ছিলাম নিশ্চুপ। ঘরে এসে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারি না। অবিশ্রান্ত জলের তোড়ে ভেসে এক সময় আমি শান্ত হয়ে আসি।

নিজেকে প্রশ্ন করি— কেন সত্যজিতের কাছে আমার ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করলাম না? নিজের দোষ এড়ানোর জন্য রেজাউল বিকারগ্রস্ততার কী ব্যাখ্যা করেছে কে জানে! আমার ওপর কেমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিল সত্যজিৎ! বাসায় আসার পর পুরোটা ব্যাপার এক এক করে ওকে খুলে বলা দরকার ছিল। অবশ্য কী-ই-বা খুলে বলতাম? ওরকম সূক্ষ্ম যন্ত্রণার ব্যাপারগুলো কি অন্যকে খুলে বোঝানো যায়, বিশেষ করে অবিবাহিত কাউকে? কিন্তু এতদিন পর রেজাউলই-বা কেন গায়ে পড়ে সত্যজিৎকে এসব বলতে এসেছিল? তাতে কী লাভ হয়েছে ওর? এত সাহস ও কোত্থেকে পায়? অতসব বিশ্রী কথা বলার পর আবার আমার সাথে দেখা করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে? সত্যজিতের ওপরও আমার রাগ কম হলো না। ওর ভণ্ডামিটা মনে পড়লে গা জ্বলে যাচ্ছে, যার জীবন দুর্গন্ধময়, তাকে 'চল একটু বাতাস

খেয়ে আসি' বলে বলে ভেসপায় উড়িয়ে নিয়ে, ওই রকম একটা মনোরম পরিবেশে এ কথাগুলোর বলার জন্য অত নাটকীয়তার প্রয়োজন ছিল না। জঘন্য সব প্রসঙ্গ নিয়ে সত্যজিৎকে কৈফিয়ত দেয়ার কোনো মানে নেই। যার যা ইচ্ছে ভাবুক। নাই-বা থাকল এ রকমের পলকা বন্ধুত্ব। আর দশটা মেয়ের থেকে আমি যে আলাদা, সেটা প্রমাণ করার জন্য রেজাউলের সাথে দেখা করতেও আমি বাধ্য নই। অত ঘোড়ার ডিমের উদারতা আমার মধ্যে নেই। আমি টিপিক্যালই।

রাত সাড়ে নটায় আরেফিন আসে। ওকে দেখে নিজেকে সহজ করি, তুই এমন হাওয়া হয়ে থাকিস কেন, বল তো ?

কী ব্যাপার, কাঁদছিলে নাকি ? আমাকে দেখামাত্রই ও বেশ বিচলিত হয়ে পড়ে।

কান্না পাচ্ছিল, তাই কাঁদছিলাম— প্রশ্নের উত্তরে কোনো ভান-ভণিতা করি না। তোর খবর কী ? কী করবি, ঠিক করেছিস কিছু ?

আশ্চর্য, বলো না, কাঁদছিলে কেন ? আরেফিন তখনো বিচলিত, জানো তো, তোমাকে আমি অত দুর্বল মনে করি না।

একটু কাঁদতেও পারব না ? নিজের সামনেও আমাকে আমার সবলতার পরীক্ষা দিতে হবে ? আমি তোকে কান্না দেখাতে গেছি ?

আমার কাছে তুমি অনেক কিছু চেপে যাও। কেমন ম্লান হয়ে যায় সে, আমি অনেকবার লক্ষ করেছি— খুব কষ্ট লাগে।

আসলে তোকে বলার মতো তেমন কিছু আমার জীবনে ঘটে না। তুচ্ছ প্রাত্যহিকতার এসব কাসুন্দি ঘাঁটতে আমার ভালো লাগে না।

বলার মতো সত্যিই কিছু ঘটে না ? আরেফিনের স্বর কেমন তির্যক হয়ে ওঠে, তুমি সেদিন রাগ করে বেরিয়ে গিয়ে রাতে কোথায় ছিলে, আমাকে বলেছ ?

মুহূর্তে কেঁপে উঠি। হকচকিয়ে তাকাই ওর দিকে, তোকে কে বলেছে ?

যে-ই বলুক, আরেফিন গম্ভীর হয়ে ওঠে, আমি সেদিন তোমার অফিসে গিয়ে দেখতে চেয়েছি তুমি নিজের থেকে বলো কি-না।

এখন ভেতরে ভেতরে আমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে থাকি। এ নিশ্চয়ই শানুর কাজ। অথচ সে দিন কি ভানটাই না করল! এরা যে কী জাতের মানুষ, সহজে বোঝা যায় না। সেদিন কি চমৎকার মিথ্যেটাই না ঝেড়ে দিল!

তুইও-তো প্রায়ই হলের বাইরে কোথায় রাতে থাকিস, আমাকে বলিস ? পাল্টা আক্রমণ করে ওর চোখের দিকে তাকাই।

প্রায়ই থাকি না, আরেফিনের গলায় বিরক্তি। আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ো না। বন্ধুর পুরো ফ্যামিলি দেশে গিয়েছিল। দু'রাত থাকতে হয়েছিল তার বাসা পাহারা দেবার জন্য। আচ্ছা, আমরা পরস্পরকে এইভাবে সন্দেহ করতে থাকব ? কেউ সরলভাবে কিছু জানতে চাইতে পারব না ? তাহলে আর সম্পর্ক কী ? সবাই নিজের ইচ্ছে স্বাধীন চলি। কোনো সমস্যা থাকল না।

ওসব বাদ দিয়ে এখন তোর খবর বল। আমি প্রসঙ্গ পাল্টাতে চাইলে ও বলে, কাল সারারাত ভার্সিটিতে গোলাগুলি হয়েছে। কী যে আতঙ্কে রাত কেটেছে! আমি উদ্বিগ্ন হয়ে ওর মুখের দিকে তাকাতেই মুহূর্তে এবার প্রসঙ্গ পাল্টায়, আজকের নিউজ দেখেছ ? পাঁচ শ' কুয়েতি মারা গেছে। উপসাগরের দিকে মার্কিন বিমানবাহী রণতরী রওনা দিয়েছে। এই নিয়ে ঢাকায় উত্তেজনা।

ওসব হলো গিয়ে জাহাজের খবর, আমরা ছাপাষা কেরানি। যা ঘটার ঘটতে থাক। এখন বল তোর ফ্লায়িং বিজনেসের খবর কী ?

আমাকে দিয়ে হবে না। আমার এক বন্ধু ওসব করতে গিয়ে পুলিশের কাছে ধরা খেয়েছে। ওর রমরমা অবস্থা দেখে প্রথমটায় একটু ঝুঁকেছিলাম। চিটাগাং পোর্ট এলাকা থেকে সিগারেট, কাপড়, কসমেটিকস্ এসব এনে ঢাকার দোকানে দোকানে সাপ্লাই দেয়া। ধরা খেলে বারোটা বেজে যায়। হেভি রিস্‌ক্। ভাগ্যিস ও-পথ আর মাড়াই নি।

যা হোক, আগেভাগেই তোর সুমতি হয়েছে জেনে খুশি হলাম, আমি ওকে আশ্বস্ত করে বলি।

আরেফিন এবার একটু নড়েচড়ে ওঠে। আমার কথায় খুশি হলো কী হলো না, বোঝা গেল না। শুধু বলে, আসলে বিজনেস করতে গেলে প্রচুর টাকার দরকার, প্রচুর...। বলতে বলতে হঠাৎ কী হয়, আরেফিনের স্বর নরম হয়ে আসে— একটা দুঃসংবাদ আছে।

দুঃসংবাদ, কিসের ? গভীর তল থেকে নিজেকে টেনে তুলি। প্রায় কাঁপা কাঁপা স্বরে সে বলে, পরশু আমার পকেট কাটা গিয়েছে। বাসে ভীষণ ভিড় ছিল। আমি দু'হাতে হ্যান্ডেল ধরে ছিলাম। আর সেই ফাঁকে... ভেবেছিলাম তোমাকে জানাব না, কিন্তু...।

কত টাকা ?

ন'শ।

অত্তো! আমি আঁতকে উঠি। এত টাকা তুই কোথায় পেয়েছিলি ?

এইবার আরেফিনের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে, টিউশনির টাকাগুলো উঠিয়ে একশো টাকা দিয়ে মন্টুর জন্য গুলিস্তান থেকে একটা শার্ট কিনেছিলাম। ও চিঠি দিয়েছিল। ঠিক করেছিলাম পরদিন বাবাকে দেখতে বাড়ি যাব। বাড়ির একটা ছেলে খবর দিয়েছিল, বাবার শরীর খুব খারাপ। বাঁ পকেটে খালি মানিব্যাগ ছিল। ডান পকেটে ছিল শুধু টাকা। পকেটমার শালা তো আমার চেয়ে চালাক, মানিব্যাগের পকেটে হাত দেয় নি। আমি জানি তোমার খারাপ লাগছে। কিন্তু এত বড় একটা ব্যাপার চেপে যাই কি করে ...।

খুব ভালো হয়েছে, রাগে-দুঃখে আমার কান্না আসতে থাকে। ঘটনা ঘটেছে পরশু, আর তুমি এসেছ কিনা আজ! বোঝাই যাচ্ছে ব্যাপারটা তোমার গায়ে লাগে নি। বলতে বলতে ওকে যাচ্ছেতাইভাবে অপদস্থ করার ঝোঁক আমাকে মুহূর্তে প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত করে তোলে। তাই ওর চোখের দিকে প্রখর তাকিয়ে অনর্গল বলতে থাকি, আমি সব সময় লক্ষ করেছি টাকার প্রতি তোর মায়া কম। যদি করতি আমার মতো একটা চাকরি, সহ্য করতি অফিসের লোকজনের টিপ্পনী, বসকে জড়িয়ে অশ্লীল ইঙ্গিত, তার পরও স্রেফ দু'হাজার টাকার জন্য মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হতো, আধবেলা খেয়ে না-খেয়ে বাড়িতে নিয়মিত টাকা পাঠাতে হতো, ছোট ভাইটিকে পড়ার খরচ যোগাতে হতো, তখন বুঝতি আসলে টাকা কী জিনিস!

তাহলে আর পকেটে টাকা নিয়ে বাসের মধ্যে উদাসীন হয়ে পড়তি না। রামছাগল না হলে তোর মতো ছাত্রের পকেট কাটা যায়?

কথাগুলো একদমে বলে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে আসি এবং আরেফিনকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই আমি বাথরুমে ঢুকে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিই। এমন কান্না পাচ্ছে কেন? বুক-ঠেলে ওঠা চাপা যন্ত্রণাময় তেতো রস গলার কাছে এসে চোখ ভিজিয়ে দিচ্ছে। বালতি থেকে জল তুলে মুখে ঝাপটা দিই। আসলে বড্ড অল্পেই আজকাল ভেঙে পড়ি। তাহলে কি এ-ই সত্য সহজেই ফুরিয়ে আসছি? অল্প পাওয়ারের বাল্বের আলোয় বাথরুম ফ্যাকাসে, হলদেটে। দেয়ালের চারপাশে চুন-সুরকি উঠে গেছে। এক চিলতে ভেন্টিলেটার, তা-ও মাকড়সা ঢেকে রেখেছে। এত ছোট্ট-পরিসরের জায়গা, দম নেয়া যায় না। নিজেকে সামলে হালকা হয়ে যখন বেরিয়ে এসেছি, হতভম্ব হয়ে শুনি, আরেফিন বেরিয়ে গেছে। বোকার মতো শানুকে বলি, তুমি একটু আটকাতে পারলে না? এবার ওর বিস্ময়ের পালা, তোমাদের মধ্যে কী হয়েছে আমি তার কী জানি? আমাকে দরজা বন্ধ করতে বলল, করে দিলাম।

নাহ্, নির্ঘাৎ মরে যাব। আসলে একটু বেশিই হয়ে গেছে হয়তো। টাকার জন্য ওর কষ্ট কি কম ছিল? সেই কষ্টেই হয়তো দু'দিন আসে নি। মাঝে মাঝে সর্বগ্রাসী জেদ আমাকে অন্ধ করে দেয়। চেয়ারে বসে ছোট্ট টেবিলটায় মাথা রাখি— তাহলে কি আমি সবার কাছ থেকে কেবলি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি! তাই যদি হয়, তাহলে সব দোষ কি আমার? হঠাৎ হুঁশ হয়, আরেফিন বলছিল বাবার শরীর খারাপের কথা! আশ্চর্য, এরকম একটা দুঃসংবাদ আমাকে তখন বিন্দুমাত্র স্পর্শ করল না? ঠিকই বলে সে, টাকা আমাকে বিকারগ্রস্ত করে তুলছে। আরেফিন নিশ্চয়ই ব্যাপারটা লক্ষ করেছে। প্যারালাইজড্ হয়ে বিছানায় পড়ে আছেন বাবা। মা চোখে দেখে কম। এমন কি বয়স তার? অথচ সন্ধে হলে ঘরের ভেতরেই অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে চলাফেরা। শুধু বাবা-মাকে নয়, বাড়ির সবাইকে আমার এখন দূরবর্তী দ্বীপের মানুষ মনে হয়। বাবার শাদা ঠাণ্ডা চোখ, মার জোরে জোরে নিঃশ্বাস টানা আর কেবলি নিজেকে তার শাপশাপান্ত করার একঘেয়ে দৃশ্য-পরম্পরা আমাকে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলতে চায়। এইরকম যে বাড়ির পরিবেশ, সেখানে বাবার আর কি খারাপ হবার আছে? যে অবস্থায় আছেন তার চেয়েও খারাপ পরিণতি কী? তবে কি সেই জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছেন তিনি...। না, না— এত খারাপ কিছু হলে তার খবর শুধু আরেফিন পাবে কেন? এতই যদি আমি অস্পৃশ্য, তবে আর ইনিয়েবিনিয়ে চিঠি লিখে সেই মেয়ের পয়সা নাও কেন? গা ঘিন-ঘিন-করা সব মাছির ঝাঁক! আমার ময়লা-নোংরা চাটতে লজ্জা করে না?

এদিকে অফিসে প্রবল উত্তেজনা। সাদ্দামের কুয়েত দখল নিয়ে সহকর্মীরা দু'দলে ভাগ হয়ে গিয়েছে। তাকে বাহ্‌বা দিচ্ছে কেউ। কেউ আবার তার অভিযানকে স্বেচ্ছাচারিতা মনে করে যুক্তরাষ্ট্রকে সাপোর্ট করছে। এই নিয়ে অফিস একেকদিন উপসাগরীয় অঞ্চলের মতোই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আমি ছাপোষা কেরানি মানুষ! জীবনের সাধারণ যুদ্ধেই কুপোকাত। ফলে কোনো উত্তেজনাই আমাকে স্পর্শ করে না, কেবল জানার জন্যই প্রতিদিনের নির্জন চোখ হেডলাইনে হাঁটাই— 'যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে ইরাকের হুঁশিয়ারি : আক্রান্ত হলে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেব'; 'ইউরোপের প্রতি ইরাক— বিশ্বযুদ্ধ এড়াতে হলে যুক্তরাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করুন' ইত্যাদি...। ক্রমশ দু'চোখে ঘুম নেমে আসতে থাকে আমার—।

এর দিন কয়েক পরেই ঘটে যায় সেই অভাবনীয় ঘটনাটি। চেয়ারে চিতপাত শুয়ে ছিলাম। বাইরের দরজা-লাগোয়া ঘরখানা আমার হওয়ায় স্বভাবতই দরজা খোলার দায়িত্ব আমারই। শিবনারায়ণ রেখে আমি পড়ছিলাম ভিনসেন্ট ভ্যানগগের আত্মজীবনী। আমার সামনের টেবিলে বইটা খোলা অবস্থায় ঘুমোচ্ছিল। মুখ থুবড়ে পড়ে থাকার মতো চমৎকার বই। ভ্যানগগের জীবনের শুরু, একের পর এক ছবি আঁকছে, বিক্রি হচ্ছে না। চরম অর্থ সংকটে তার বিপর্যস্ত অবস্থা। তারও আগে কয়লাখনির শ্রমিকদের সাথে কাটানো দুঃসহ জীবন। এর মধ্যেও নিরন্তর ছবি এঁকে যাওয়া। পড়তে-পড়তে কেমন হতাশ বোধ করছিলাম নিজের কথা ভেবে। তুচ্ছ বিঘ্নের মুখেই সব ছেড়েছুঁড়ে দিই। ভিনসেন্ট কি পরাজিত হন নি ? বইটা সামনে রেখে স্থির বসে ছিলাম। ভেতরে যুদ্ধ চলছিল, কেন আত্মহত্যা ? তারপরও তার শিল্পের তো জয় হয়েছে। ভাবনার এইসব চক্র থেকে নিজেকে ঝটিতি বের করে ভ্রু কুঁচকে দরজা খুলে দিই। একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক। সুঠাম, দীর্ঘদেহী। উজ্জ্বল ফর্সা রঙ। ক্লিন সেভড্ মুখ, দিঘল কপাল। জুলফির চুলে পাক ধরেছে। পোশাকেও বেশ আভিজাত্যের ছাপ। পলকেই ভদ্রলোকের পুরোটা আদল দেখে নিয়ে ভাবি তিনি হয়তো শানুদের কেউ হবেন। পাশ ফিরে ডাকতে যাব, তিনি একটু গলা ঝেড়ে জিগ্যেস করেন, আচ্ছা, এখানে নীনা নামের কেউ থাকে ? আমার পায়ের গতি থেমে যায়, বিস্ময় মেশানো স্বরে বলি, আমিই নীনা।

আমি কি ভেতরে আসব ?

ছিঃছিঃ দেখুন দেখি কাণ্ড, দরজা থেকে আমি হাত সরিয়ে নিই, আসুন !

তিনি ভেতরে এলে চেয়ার এগিয়ে দিই। প্রথম দর্শনেই মনে হয় মানুষটার অবয়বের সঙ্গে আমার এই খুপরি ঘরখানা ঠিক যেন খাপ খাচ্ছে না। কিন্তু সব ছাপিয়ে ভেতরে দুর্মর কৌতূহল, এই ভদ্রলোকের সাথে আমার পূর্বজন্মে কেন, ইহজন্মে কোথাও দেখা হয়েছে বলে তো মনে পড়ে না! অথচ তিনি কিনা আমার কাছেই এসেছেন! কিছুতেই মেলাতে পারি না। তারপর তিনি যা বললেন, তাতে আমার হৃদ্‌যন্ত্র বন্ধ হবার দশা হয়।

আমি কি সম্বোধনটা তুমি করে করতে পারি ? বলে বেশ রহস্যময় ভঙ্গিতে তিনি হাসেন, তাহলে কথা বলতে আমার একটু সুবিধে হতো। আমি প্রচণ্ড অস্বস্তির সাথে উচ্চারণ করি, নিশ্চয়ই, কিন্তু আপনাকে ঠিক...।

আমাকে তুমি কখনো দেখ নি। আমার নাম ইরফানুল কবির,... আমি...। বলতে বলতে তিনি থেমে যান।

অস্বস্তি কাহাকে বলে, কত প্রকার ও কী কী... আমার শুরু হয়ে যায়। প্রথম কিছুক্ষণ কথা বলতে পারি না। তারপর টাল সামলে নিয়ে থেমে থেমে চাপা উত্তেজনায় বলি, আশ্চর্য! আপনি! আমি ভাবতেই পারছি না। ঠিকানা পেলেন কোথায় ?

ঠিকানা দিয়েছে আমার স্ত্রী, তুমি তার কাছে দিয়ে এসেছিলে। ততক্ষণে চেয়ারে তিনি সহজ হয়ে বসেছেন, আমি ঠিক এখনো বুঝতে পারি না, সেদিন তুমি আমার সাথে দেখা না করে চলে এলে কেন ? অথচ আমার কাছেই গিয়েছিলে। আমি খুব অবাক হয়েছি।

আমি, মানে— আসলে সেদিনকার পুরো ব্যাপারটাই আমার জন্য ছিল ভীষণ লজ্জার। এই নিয়ে পরে এত গ্লানি হয়েছে যে কী বলব! আসলে এইরকম যোগাযোগহীনতার মধ্যে

এভাবে কোথাও যাওয়াটা আমার জীবনে সাধারণত ঘটে না। সেদিন যে আমার কী হয়েছিল, মনে হয়, মাথার ভেতরকার কিছুই ঠিক মতন কাজ করছিল না। যাওয়ার পর মনে হয়েছে, কাজটা ঠিক হয় নি। আসলে অস্বস্তি এড়াতেই আপনার সাথে দেখাটা হয় নি।

চলেই যখন গিয়েছিলে, তখন ওভাবে চলে আসাটা তোমার অন্যায় হয়েছে। বেশ অধিকার নিয়ে তিনি বলেন, একটু চিন্তা করে দ্যাখো, ব্যাপারটা যৌক্তিক হয়েছিল কি-না।

অন্যায়! হায়! আমার ভেতর জটিল প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। এক জীবন পেরিয়ে গেল। একদিন ভুল করেও নিজের খালাতো ভাই, তার বৌ-ছেলেমেয়েদের কোনো খোঁজ নিলেন না। আর আজ সেই তিনি আমার উপযাচক ভূমিকার কারণে হয়ে আমার অন্যায় খুঁজে বের করছেন। কী বিচিত্র মানুষের চরিত্র! বিমূঢ় ভাব কাটিয়ে আমি তাঁর সামনে ততক্ষণে সহজ হতে শুরু করেছি, দেখুন, গোড়াতেই আমার অন্যায় হয়েছিল। সত্যি বলতে কী, আপনার বাসায় আমার ওইভাবে ছুটে যাওয়া উচিত হয় নি। খুবই ছেলেমানুষী হয়েছিল!

আমার কথা শেষ হতেই নেমে আসে ঠা-ঠা নীরবতা। ডাল বাগার দেয়ার শব্দ রান্না ঘরে। ভোঁ ভোঁ করে এই ঘরে পাঁচ ফোড়নের গন্ধ ঢুকছে।

ভদ্রলোকের ব্যক্তিত্বের মোহ এমনই যে, এই গন্ধ আমাকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দেয়। লক্ষ করি, শানু দু'বার উঁকি দিয়ে গেছে। এইবার শান্ত গলায় তিনি বলেন, আমার বাসায় যাওয়ার জন্য তুমি কেন অনুতপ্ত সেটা যে আমি বুঝতে পারছি না, তা নয়। হয়তো ভাবছ, যাদের সাথে কোনো যোগাযোগ নেই, আন্তরিকতার কোনো সম্পর্ক নেই, তার ওখানে এমন হঠাৎ... ? আচ্ছা, আমার এই চলে আসাটাও বেশ নাটকীয় নয় ? জীবন কী সব সময় এক ছকে চলে ?

অন্তর্যামী নাকি ? যা হোক। আমি তাঁর কথার মুখে যথারীতি চুপচাপ থাকি। গাঢ় হয়ে সন্ধ্যা নেমেছে। বাতি জ্বালাতেই পুরো ঘর পাঁশুটে আর হলদেটে হয়ে ওঠে। নাহ্ আরেকটু বেশি পাওয়ারের বাল্ব না লাগালেই নয়। মাড়হীন সবুজ তাঁতের শাড়ি আমার গায়ের সাথে লেপ্টে আছে। আঙুলের ডগায় কালো মতন একটা ঠোসা। সেই আঙুল জিভে ছুঁইয়ে বসে থাকি।

ভদ্রলোক ঢোকার পর আমার গরিবানা যেন হঠাৎ করেই আরো প্রকট হয়ে উঠেছে। বিছানার রঙ-চটা ম্লান চাদরটা নিচের দিকে কেমন বেঢপ ঝুলে আছে। টেবিলের পায়াটার নিচে ঠেক্‌নোস্বরূপ যে ইট, সেটা দাঁত-কেলিয়ে যেন হাসছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে দেয়ালে ঝুল-কালির অসংখ্য বিদ্‌ঘুটে দাগ। অমসৃণ মেঝেটা আজ বড্ড বেশি স্যাঁতসেঁতে। এবং জং ধরা লটরপটর ফ্যানটা আজ যেন মাত্রাহীন জোরে ঘটর ঘট্ ঘটর ঘট্ শব্দ করছে।

আমি যদি যোগাযোগ রাখতাম— নীরবতা ভাঙেন তিনি, তুমি যথেষ্ট ম্যাচিওর্‌ড্। জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে তোমার। যোগাযোগ রাখলে সেটা কি সার্বিক বিচারে কল্যাণকর হতো ?

চমৎকার যুক্তি! এবার আমি অন্য পথ ধরি। তিনি কি ইঙ্গিত করতে চাইছেন ? তার কথার ভেতর দিয়ে মার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ব্যাপারটা দিনের মতো স্পষ্ট। এর চাইতে ভদ্র করে আর কিছু বলা যায় না। আমাদের সেই দুঃসহ দারিদ্র্যের সংসারে আমার মা-বাবার ভেতরে এই প্রসঙ্গ যেভাবে, যে-রকম অশ্লীলভাবে ঢুকে যেত, ভদ্রলোক যোগাযোগ রাখলে

তার রূপ কি হতো, আমি যে তা নিয়ে ভাবি নি, তা নয়। কিন্তু আসলে আমার ক্রোধের উৎস সেটা না। মাকে তিনি বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিলেন। পারিবারিকভাবে জানাজানিও হলো। শেষ মুহূর্তে তিনি সিদ্ধান্ত পাল্টালেন কেন? কেন দীর্ঘদিন নিশ্চুপ থাকার পর তিনি হুট করে ঢাকায় এসে বিয়ে করে ফেললেন? আর বাবা, সব জেনে তিনি মহান হবার ভূমিকায় নেমে পড়লেন। বিয়ে করলেন মাকে। তারপর তার সুরত কোনখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, আমি কি তিল তিল করে সেটা দেখি নি? আমি কাকে শ্রদ্ধা করব? কি হলে সব সুন্দর হতো! তার কি জানি আমি? জীবনকে আমি নর্দমায় শুয়ে কীটের মতন করে দেখেছি। না, আমার কারো প্রতি কোনো ক্রোধ নেই। তিনি কেন আজ সেই নর্দমার সামনে এসে দাঁড়ালেন, আমার আপত্তি সেখানেই। না থাক্, আপাতত থাক্— মনকে থিতু করি। তাই নাজুক ব্যাপার-স্যাপার থেকে আলগোছে নিজেকে ছাড়িয়ে সহজ করে বলি, আপনাকে চা দিই?

আচ্ছা, তুমি কি আমাকে এড়াতে চাইছ?

ভেতরে ভেতরে সাহসী হয়ে উঠি। হেসে বলি, আপনাকে এড়াব এত সাধ্য কোথায়? আপনি হচ্ছেন কিংবদন্তির নায়ক।

তুমি কিন্তু আমাকে অপমান করছ!

না, না সে-কী! আমি দু'হাত জোড় করে বলি, আসলে আমি একদমই ভদ্রতা শিখি নি। এ আমারই দোষ। অশিক্ষাও বলতে পারেন। যা হোক, আপনার গল্প বলুন, শুনি।

তিনি বলেন, গোড়ায় জট রেখে গল্প কতদূর এগোবে, বুঝতে পারছি না।

সেই ত্রিশ বছর আগের জট কি আমি খুলতে পারব? ফের ভেতরে তেতে উঠতে থাকি, আমি বুঝি আমার সময়কে। সে জন্যই আপনার বাসায় আমার ছুটে যাওয়ার গ্লানিকে আমি বড় করে দেখেছি। আজ আপনি এসেছেন, কাল আপনার বাসায় যেতে আমার আর গ্লানি হবে না।

গ্লানি হবে না? তাঁর মুখের হাসির ফোয়ারা, সত্যি বলছ তুমি?

সত্যি বলছি, হবে না। আপনার বাসায় যাওয়ার আগে অতীতের ওইসব ইতিহাস সত্ত্বেও আপনার সাথে আমার, আমি ব্যক্তিগতভাবে আমাকেই মিন করছি, যদি একদিনেরও আন্তরিক পরিচয়ের সুযোগ ঘটত, তাহলে আমার ওই যাওয়া নিয়ে কোনো গ্লানি হতো না। সেটা ছিল না বলে পরে বেশ অনুতাপ হয়েছে।

তোমার এখানে এসে খুব ভালো লাগছে... এই সহজ উচ্চারণের পর এতক্ষণে তিনি পুরো ঘরটা চোখ চালিয়ে দেখেন। আমার অস্বস্তির মধ্যে এই রুক্ষ ঘরখানা আবার জেগে ওঠে। কি মনে হতে পায়ে আমি তড়িঘড়ি স্পঞ্জ ঢোকাই। ভেতরে যাব, পেছনে হঠাৎ সেই গমগমে গলা— এই ছবিটা কার আঁকা?

কোন্ ছবিটা? ভাবতে-ভাবতে আমি যেন পাতাল ফুঁড়ে উঠি, চারপাশে তাকাই— কোথায় ছবি?

চেয়ারটা ছোট হওয়ায় ভারি দেহে তাঁর বসতে অসুবিধা হচ্ছে। আমার সেই বিখ্যাত ঘটর ঘটর ফ্যানের তুচ্ছ হাওয়ায় তিনি ভিজে উঠছেন, কিন্তু মুখখানা ভাবান্তরহীন, তর্জনী দেয়ালের দিকে— ওই যে দেয়ালের ওই ছবিটা।

ওহ্! দেয়ালে তো আবার একটা ছবি আছে। ধুলোর আস্তরে প্রায় ঢাকা। ওটার অস্তিত্ব সম্পর্কে আমার কোনো বোধই ছিল না।

তবুও অস্বস্তির সাথে বলি, আমার। এক সময় প্রচুর আঁকতাম। হাতুড়ে শিল্পী ছিলাম বলতে পারেন। আমার কথায় বিস্মিত হয়েই যেন উঠে দাঁড়ালেন তিনি। ছবিটির দিকে এগিয়ে যেতে থাকলে লজ্জায় আমি লাল হয়ে উঠি। ধুৎ! ছবিটা এভাবে এখানে না থাকলেই হতো। অসম্ভব যত্নে তিনি ছবিটা নামিয়ে তার ওপর জমে থাকা ধুলো ফুঁ দিয়ে দিয়ে সরান, এক সময় আঁকতে, ছেড়ে দিয়েছ কেন?

কুণ্ডুলী পাকিয়ে আসে ধোঁয়া। সেই জট পাকানো উদ্‌ভ্রান্ত দিনগুলো। শিল্পী হওয়ার কী দারুণ শখ! পরে নিজে নিজেই হেসে মরেছি, এসব কোনো ছবি? অথচ শুরুতে ছবি আঁকার জন্য কী করি নি! দুর্নিবার এক নেশায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো দিক-বিদিক ছুটতাম রঙ-তুলির টাকার জোগাড়ে। অবশ্য ছবি আঁকাআঁকির ব্যাপারে বাবার স্পষ্ট নিষেধ ছিল। প্রচণ্ড ধার্মিক মানুষ বাবার মতে ছবি আঁকা মস্তো গুনাহ্, বিশেষ করে মানুষের ছবি। কিন্তু স্বাধীন, বেয়াড়া তুলি কি মানুষবিহীন শুধুই প্রকৃতির সীমাবদ্ধ ক্যানভাসে তৃপ্তি কিংবা স্বস্তি খুঁজে পায়? মা বলতেন, মন দিয়ে পড়, ওটা কোনো কাজ হলো? ফলে, আমার চারপাশে স্রোত, একটা ছবি আদ্ধেক এঁকে রেখেছি। রঙ শেষ। হাতে ফুটো পয়সা নেই। রাতভর এক ধান্দা, কী করে রঙ কেনা যায়? মাঝরাতে উসখুস করতে করতে পিচ্চি মন্টু বিছানা ছেড়ে আমার কাছে আসে, ও আপা আমি সেলিমদের উঠোনে একটা দুল খুঁজে পেয়েছি, মাকে দেখাতেই ছোঁ মেরে নিয়ে লুকিয়ে রাখলেন। কাউকে বলতে না করেছেন, মনে হয়, সোনার। গা বেয়ে সন্তর্পণে বিছে ওঠে, টান হয়ে উঠে বসি। লাইটের ঝাপসা আলোয় মন্টুর মুখ ভয়ার্ত দেখায়। ফিসফিসিয়ে প্রশ্ন করি, মা ওটা কোথায় রেখেছে, দেখেছিস?

সিলিঙের পুঁটলিতে, কাগজ দিয়ে মুড়িয়ে।

বাবা জানেন?

না। মনে হয় ওটা সেলিমের বোনের ... ভয়ে বিবর্ণ মন্টু তখন রীতিমতো হাঁপাচ্ছে।

কে বলেছে সেলিমের বোনের? আমার স্বরে ক্ষিপ্ততা। তুই দেখেছিস? ওকে প্রশ্রয় দেয়া ঠিক হচ্ছে না ভেবে, গলার স্বরে দৃঢ়তা এনে বলি, তাছাড়া ওটা যে সোনারই তৈরি, সে কথা কে তোকে বলল? মা কি চোখে ঠিক মতো দেখেন? বুঝলি, তুই আর কোনোদিন পড়ে থাকা জিনিস কুড়িয়ে আনবি না। যা, শুতে যা।

খুব আস্তে 'আচ্ছা' বলে ধীরে পা ফেলে শুতে যায় মন্টু। এরপর পুরো রাত দম আটকে পড়ে থাকার সময়টায় মার প্রতি অদ্ভুত একটা ঘেন্না এসে জড়ো হয়। সেই ঘেন্না ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। এ আমি কোথায় জন্মেছি? অশ্লীল রুটিগুলোর উপার্জনকারী বাবার প্রতি, ঘরের আবর্জনার দুর্গন্ধের প্রতি, আপোসকামী রানুর প্রতি, টিনের ফুটো আর তুলো ফুঁড়ে বেরুনো তোশক— এই সব কিছুর প্রতি জমা হয় দম-বন্ধ করা অখণ্ড এক ঘৃণ্য অনুভব।

আমি কি এখান থেকে পালিয়ে যাব? কোথায় যাব আমি? সামনে কেবল ধু-ধু পথ। কেবল শূন্যতা। এই কি মায়ের রূপ? পয়সা দেখলেই চোখের কোটর উপচে যার মণি বেরিয়ে আসে? আর বাবা? সন্তান কি স্ত্রী, কারোর ওপর তার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। ঘুমের মধ্যে যদি কেউ তার পকেট হাত দেয়, সেই ভয়ে কোথায় কোন ইটের নিচে, দেয়ালের

ফোঁকরে হাড়কিপটে বুড়োর মতোন টাকা লুকিয়ে রাখেন। ডিম ভেঙে বেরিয়ে আসা কিশোরী রানু টাক-পড়া মজুমদারের হাফ বিল্ডিংয়ে গিয়ে হয়ে উঠছে ক্ষয়ে-যেতে-থাকা যুবতী। এবং সত্যি বলতে কি এইরকম এক সংসারে আমার ছবি আঁকার নেশা মানায়? তবুও এই নেশাই আমাকে প্রায় উন্মাদ করে তুলেছিল। আমাদের সংসারের এই বীভৎস আর বিশ্রী এই ঘৃণ্য পরিবেশে এটাই যে আমার আত্মার একমাত্র আশ্রয়। আর, সেই ভয়াবহ রাতটিকে আমি ভুলতে চাই। কী অসহ্য! কী যন্ত্রণাকর সেই রাতটির নিশ্ছিদ্র অভিযান! পরদিন ঝুলন্ত পুঁটলিতে দুল নেই।

মা ক্রমাগত হাতড়ে চলেছেন। তার যে চিৎকার করার জো নেই। পাগলের মতো হাতড়াচ্ছেন শুধু। ড্রয়ার, মিটসেফ, তোশকের তল...। ঠিক এর দু'দিন পর সস্তা কাঠের একটা ইজেল, ছবি আঁকার শিট আর কিছু রঙ-তুলি কিনে... মায়ের মুখোমুখি আমার বিড়ালের মতো থাবা, আর, আমার দিকে তাকানো মন্টুর স্থির শাদা চোখ... বড় তুচ্ছ হয়ে যাই... প্রতিদিন সেই চোখের সামনে ক্ষুদ্র হয়ে যেতে থাকি।

বিয়ের পরও সেই অবস্থার কোনো রূপান্তর ঘটে না। যেন পৃথিবীতে এই জীবনই যাপন করতে এসেছি। অর্ধেক বাবার সংসারে, বাকি অর্ধেক স্বামীর সংসারে। বিয়ের আগে আমার ঘোর উন্মাদনায় শিল্পিত হয়ে-ওঠা অদ্ভুত যুবকটির শরীর সংসারের ক্রমাগত পেষণে পাঁশুটে হয়ে উঠতে থাকে। যে ছেলে আগে আমার সামনে শার্ট খুলতে লজ্জা পেত, বিয়ের কিছুদিন পর থেকে সে-ই কিনা বিছানায় শুয়ে লুঙ্গি চাঙ্গে উঠিয়ে লম্বা করে শ্বাস টানে, নাক ঝেড়ে ময়লা ছুঁড়ে ফেলে মেঝেতে। মুখে কফ নিয়ে হক হক করে কথা বলে। আমার চোখের সামনে খুলে যায় মানুষের মৌলিক চেহারার বাস্তব দরজা। রেজাউলও, আমার দিকে তাকালে যে তরঙ্গগুলো তার চোখে ঝিলিক দিত, সেসব হারিয়ে ক্রমশ কী ম্রিয়মাণ!

আমি পরিণত হতে থাকি নিরুত্তাপ শীতল মানুষে। সাতাশ বছর বয়সেই আমি যেন ক্ষয়িষ্ণু এক বৃদ্ধা। মফস্বল থেকে বয়ে নিয়ে আসা একমাত্র শৌখিনতা— ছবি আঁকার নেশা খসিয়ে ফেলি অস্তিত্ব থেকে এমনভাবে, যেন রঙ নয়, ক্যানভাস নয়, প্রাণ থেকে খসিয়ে ফেলছি একমাত্র সবুজ, ঘাস মুছে নিংড়ে পিষে নিভিয়ে দিয়েছি শেষ আলোর রশ্মিটুকুও। তারপর দীর্ঘদিন পর আজ সেই প্রসঙ্গ উঠায় আমি বিমোহিতের মতো ইরফান চাচার দিকে তাকাই, কথা বলতে পারি না। তিনি আবার প্রশ্ন করেন, আঁকা ছাড়লে কেন? আত্মবিশ্বাসের অভাব?

এসব থাক, আমি ম্লান হেসে বলি, আমাকে দিয়ে এসব হবে না।

আমার ঘরে একটা চমৎকার ইজেল আছে, তুমি ভাবতেই পারবে না কত সুন্দর। ছবিটা যথাস্থানে রেখে তিনি আবার চেয়ারে, তুমি ইচ্ছে করলে সেটা নিতে পার। পরক্ষণেই তিনি বিব্রত, অবশ্য সেটা নিতে যদি তোমার আপত্তি না থাকে?

আমি নিরুত্তর।

তুমি চাইলে তোমার ছবি আঁকার সব উপকরণের ব্যবস্থা আমি করতে পারি।

আপনি কেন সেটা করবেন?

ওহ্ কেন করব ? করব নিশ্চিত স্বার্থ থেকে, হাসতে হাসতে তিনি যুক্তি দেখান, একটা সময় তুমি যখন সত্যি সত্যিই নাম করে ফেলবে, তখন তার পেছনে পেছনে আমার নামটাও চলে আসবে। আমি যদি তোমাকে দিয়ে শুরু করাতে পারি, ব্যাপারটা বুঝতে পারছ তুমি ? প্রেরণাদাতা! কম ভাগ্যের কথা ?

আমার ছবি দেখে তিনি সত্যিই মুগ্ধ। এবং সেটা টের পেতেই এক ধরনের বিহ্বলতা আমাকে বাকরুদ্ধ করে দেয়। তিনি তো সমঝদার লোক। সেদিন তার বাড়িতে গিয়েই ব্যাপারটা বুঝেছিলাম। আলিশান বাড়ি, দুর্লভ সব সংগ্রহ! এইরকম অভিজাত আর সত্যিকার রূপবান পুরুষের পাশে আমার মা কী ভীষণ বেমানান। আজ এতকাল পর এরকম একটা বৈপরীত্যের কথা ভাবতেও আমার কেমন লজ্জা করছে।

ধুৎ, কী সব ভাবছি!

মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করে আবার মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি এবং ভদ্রলোককে বেশ বিনয়ের সঙ্গেই বলি, আপনি আসলে আমার ছবি আঁকা ছেড়ে দেয়ার ভেতরের ব্যাপারটা টের পেয়ে গেছেন কিন্তু করুণা করতেও লজ্জা পাচ্ছেন। আমার ভেতরে ফের কথা বলার প্রবণতা মাথা চাড়া দিতে থাকে। তাই আমার পেছনে আপনার অবদানের কথাটথা বলে ব্যাপারটাকে আপনি হালকা করতে চাইছেন, যাতে আমি স্বস্তিবোধ করি।

আমার স্ত্রীই বলেছিল তুমি খুব বুদ্ধিমতী। ইরফান চাচার মুখে ভুবন-ভোলানো বিনয়ী হাসি, নইলে আমাদের প্রথম পরিচয়টা এ রকম সহজ হয়ে উঠত না।

আপনি কিন্তু মূল প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাচ্ছেন, বলতে বলতে আমি গরমে হাঁসফাঁস করি, বুদ্ধিমতী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে কিন্তু আপনি প্রমাণ করে দিলেন আমি আপনার আসল উদ্দেশ্যটা ধরতে পেরেছি।

ভদ্রলোকের কাঁচা-পাকা জুলফি চুইয়ে জল পড়ছে তখন। বুকে ফুঁ দিতে দিতে চুলে আঙুল চালান তিনি। প্রশস্ত কপালের পেছনটায় পাতলা চুল। তিনি গম্ভীর, সহসা মনে হবে রাশভারি। আমি নিজের ব্যক্তিসত্তাকে তার সামনে জোরালো করার জন্য প্রথম থেকেই সহজ তর্কে গিয়ে ক্রমশ তার আসল ব্যাপারটা আঁচ করতে পারি আর তার আন্তরিক আচরণে আমি ক্রমশ মুগ্ধ হতে থাকি।

তিনি বলেন, প্রচুর টাকা যেমন মানুষকে ব্যক্তিত্ববান করে না, তেমনি, আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি, দারিদ্র্যও মানুষকে ব্যক্তিত্বহীন করে তোলে। কেননা, দারিদ্র্যের কারণে মানুষকে অনেক নিচে নামতে হয়। নিজের সাথে অনেক আপোস করতে হয়। কিন্তু কেউ কেউ আছে নিজের নেশা বা পরম প্রবণতাকে সবচেয়ে বেশি মূল্য দিয়ে নিজেকে নামিয়ে নেয় সেইখানে, সেই অনেক নিচে। কিন্তু তুমি চিন্তা করে দেখো পুরো ব্যাপারটাই কিন্তু আপেক্ষিক। তুমি ভ্যানগগের জীবনী পড়েছিলে তো ? আর্টের জন্য কী করেন নি ভ্যানগগ ? চরম দারিদ্র্যক্লিষ্ট ভাইয়ের সাহায্য তিনি হাত পেতে নেন নি ?

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না একটিমাত্র ছবিকে কেন্দ্র করে আপনি আমার প্রতি এত আশাবাদী হয়ে উঠলেন কেন ? তাছাড়া নিজেকে একদম তলায় নামিয়ে নেয়ার কষ্ট যে কী দুঃসহ, ঠিক সেই অবস্থায় না পড়লে কেউ সেটা বুঝতে পারবে না। আমি ছটফট করে উঠি, জোর দিয়ে বলি, সবার পক্ষে যুদ্ধটা সহজ নয়, যতখানি সহজ যুদ্ধ করতে বলাটা।

তোমার ছবিতে কী দেখেছি আমার কাছে সেটা বড় কথা নয়। এক সময়ের প্রচণ্ড নেশাকে তুমি আজ ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছ, আমার কথাটা সেখানেই। এবং এই অবজ্ঞা, এই অনীহা অথবা অভিমান, যাই বলো, জীবনের কোন পরাজয় থেকে, কোন দুঃখবোধ থেকে? সেটা ভালো কি মন্দ সে বিচারের ভার তো তোমার না, রুমাল দিয়ে মুখ মুছে তিনি আবার আমার দিকে সরাসরি তাকান, নিজেকে নামিয়ে নেয়ার কষ্ট... তুমি যদি সে জন্য ছবি আঁকা ছেড়ে থাক, আমার আপত্তিটা সেখানেই। আমি মানুষের মধ্যে কোনো রকম সম্ভাবনা, হতে পারে সেটা ছোট্ট স্ফুলিঙ্গের মতো, ঝলসে উঠে মরে যেতে দেখলে খুব কষ্ট পাই। যুদ্ধ সব সময়ই কঠিন, সবার জন্যই। প্রায় সবকিছু সহজ করে নেয়াটাই মানুষের জন্য পরম স্বস্তিকর।

শুরুর সময় নেশাটাই প্রধান ছিল, অত কিছু তখন ভাবি নি। আমি বলি, তাছাড়া পৃথিবীর আরো সব লোক থাকতে আপনি আমাকে কেন জাগিয়ে তুলতে চাইছেন? এক বেলার পরিচয়ের সূত্রে ব্যাপারটা একটু বেশি নাটকীয় নয় কি?

আমার এইরকম চলে আসা, এতক্ষণ ধরে কথা বলা সেটাও তো নাটকীয়।

কিন্তু কেন এতসব নাটকীয়তা? বিষয়টি কি কোনো পূর্ব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত থেকে জন্ম নেয়া? এবার আমি ছেলে মানুষের মতো হেসে ফেলি, আপনার মনে এমন কোনো অনুতাপ আছে, যার শোধ আপনি এভাবে করতে চাইছেন?

ভীষণ গম্ভীর হয়ে উঠেন তিনি। এবার আমার ভয়ের পালা। প্রখর যুক্তিবান মানুষটি ক্রমশ বিবর্ণ হয়ে উঠছেন। আমি ভেতরে ছুটি। কী নাস্তা পাঠাতে হবে শানু জানতে চায়। আমার তখন চরম বিব্রতকর অবস্থা। অবশ্য এ থেকে শানুই আমাকে উদ্ধার করে। গুরুত্বপূর্ণ গেস্ট ভেবে বস্তির একটা ছেলেকে দিয়ে সে-ই নাস্তা আনিয়ে নিয়েছে। নাহ্ মেয়েটা সত্যি সত্যি ভালো। শানুকে আমার নতুন করে ভালো লাগে।

টেবিলে নাস্তা সাজিয়ে বাইরের ঘরে গিয়ে বলি, প্রচণ্ড গরম। আপনার যে খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারছি। এমন ঘিঞ্জি গলিতে আগে আর কখনো নিশ্চয়ই আসা হয় নি? তিনি তেমনই গম্ভীর, আমার কথার জবাবে কিছু বললেন না।

ভালো জায়গায় টান দিয়েছি, অস্বস্তির সাথে সাথে এক ধরনের তীব্র পুলকও বোধ করি। হেঁটে দরজার কাছে যাই, মূলত অস্বস্তি এড়াতেই, একটু বাতাসের আশায় দরজা মেলে দিচ্ছি, দেখি আবছামতো একটু দূরে, ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে বস্তির সেই শিশুটি। ন্যাংটো, মুখে আঙুল। প্রতিদিন যে শিশুটি আমার অনন্ত সুখের উৎস ছিল, দিন কয়েক তাকেও আমি বেমালুম ভুলে ছিলাম। উজাড় করা মায়ায় আপ্লুত হয়ে বারান্দা ধরে হেঁটে যাই, ভেতরে শানু। কেমন উত্তেজনা কাজ করছে, হেই হেই... কালু... ওকে ফিসফিসিয়ে ডাকি, কিন্তু ও পিছিয়ে যাচ্ছে— কোমরে অস্পষ্ট ঝুনঝুন... আমার সন্তানের সাথে এর অস্তিত্ব মিশিয়ে আমি কতদিন... নিজের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত কতদিন... আসলে তো ওকে আমি ভালোবাসি না, ভালোবাসি ওর ভেতরে বাস করা আরেকজনকে। ও খোলসমাত্র, ওর সাথে আমার যা কিছু, তার পুরোটাই প্রতারণা— আমি এগোই, ওই খোলসটার দিকেই। বারান্দা থেকে নিচে নেমে যাই, ওর এই আচরণ অস্বাভাবিক, নিশ্চয়ই শানু ওকে ঠ্যাঙানি দিয়েছে।

হেই... কালু... অন্ধকারের অস্পষ্টতায় আমার কণ্ঠে ফিসফিস তরঙ্গ কাঁপে— আয়-আয়। উল্টোমুখি দৌড় দেয় সে। ফাঁকা স্যাঁতসেঁতে কুৎসিত বস্তির মধ্যে তার ছোট্ট শরীরখানা মিলিয়ে যায়। কতক্ষণ থির দাঁড়িয়ে থাকি। একে একে সব খুইয়ে ফেলছি, ওর মার জন্যও হঠাৎ মায়া উপচে পড়তে থাকে। সেদিন সারারাত মহিলাটিকে সইতে হয়েছিল কী অপরিসীম গঞ্জনা, আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। যা কিছু ঘটেছে, সেখানে আমি তৃতীয় পক্ষ। আমি কখনো ওই ঘটনার গভীর কষ্টের জায়গাটায় প্রবেশ করতে পারব না। এছাড়া যিনি সেই নাটকের নায়ক, তাকেই যদি শানু মন উজাড় করে গ্রহণ করতে পারে, সেখানে এই মহিলাকে মাঝখান থেকে ক্রিমিনাল বানিয়ে কী লাভ ?

অবোধ সেই শিশুর অন্ধকারে মিশে যাওয়ার কষ্ট নিয়ে ঘরে ঢুকি। ভেতর থেকে কষ্টের সেই চাপটাকে ফুঁ দিয়ে ওড়াতে চাই, আপনি নাকি রিটায়ার করার পাঁচ বছর আগেই চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন, চাচি সেদিন বললেন, আমার খুব অবাক লেগেছিল। অদ্ভুত মানুষ তো আপনি!

কিন্তু তিনি কিছু ভাবছেন। আমার একটিমাত্র কথার বাণেই তার এই বিপর্যস্ত অবস্থা, আমার সামনে একটি দুর্বলতার প্রায় খোলামেলা উদ্‌ঘাটন। এবার বিরক্তবোধ করি, প্রশ্ন মেলে ধরি, সারাদিন কী করে সময় কাটান ? আমার তো দম ফেলবারই সময় নেই। আপনি তো আমার মতো এরকম একটা ঘরে থাকবার কথা ভাবতেও পারেন না, তাই না ? এই রকম খুচরো কথা চালাতে থাকি।

নিঃশব্দে চায়ের কাপ হাতে নেন তিনি। জীবনে এই প্রথম তার বয়সী একজন লোকের সঙ্গে কখনো সিরিয়াস, কখনো হাল্‌কা, কখনো সরস, কখনো এলোমেলো কথা বলার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু হঠাৎ কী মনে হতেই ভাবি, আচ্ছা, যেভাবে কথা বলছি, বেয়াদবি হয়ে যাচ্ছে না তো ? ক্রমশ তিনি আমার সহজাত ঘোরের মধ্যে অস্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকেন। আসলেই কি তিনি আমার ঘরে এসেছেন, কারো সাথে আমার তর্ক হয়েছে ? পুরোটাই বইয়ের ঘোরে ডুবে থাকার বিভ্রম নয়তো ? দৃষ্টি প্রসারিত করি। কেমন ঝাপসা লাগছে সবকিছু। আমি মিশ্র প্রতিক্রিয়ার শিকার হই। কী জটিল বিভ্রান্তি, গুলিয়ে ফেলি সবকিছু। খিলখিল হাসি, আমার সাথে অবিশ্রান্ত আধোকণ্ঠের বকবক... শিশুটি কেন ওখানে দাঁড়িয়েছিল ? ওই অন্ধকারে ? শিশুরা কি অন্তর্যামী ? আমার ভান করার ব্যাপারটা কী ও টের পেয়েছে ? ওর মায়ের উঠিয়ে দেয়া ভয়ের দেয়াল এতটাই উঁচু, ও যা কিছুতেই অতিক্রম করতে পারে না ? এসে দাঁড়ায় পুরনো অভ্যাসে, মায়ার টানে... তারপর কী ভয়, কী বাধা... উল্টোমুখি দৌড়... দৌড়।

শোনো নীনা, নিস্তব্ধ ঘরে অকস্মাৎ তাঁর স্বরের ধ্বনি, জানি না তুমি আমাকে কিভাবে গ্রহণ করেছ! কিন্তু তোমার ভাবনার সমান্তরালেই যে দাঁড়িয়ে থাকবে আমার স্বভাব বৈশিষ্ট্য, এমন দাবি তুমি করবে এতটা যুক্তিহীনও আমি তোমাকে ভাবতে পারি না। সহজ দৃষ্টিতে দেখতে পারলে জীবনের অনেক চাপ কমে যায়। তুমি তোমার পেইন্টিংয়ের পেছনে আমার উৎসাহের কারণ হিসেবে যার ইঙ্গিত করেছ, সে প্রসঙ্গে আমি খুব স্পষ্ট করে বলতে পারি যে, অনুতাপ করার মতো আমার জীবনে কিছুই ঘটে নি। আমি বিশ্বাস করি অনুতাপেই পাপ নিহিত... বলে তিনি থামলেন। ধূমায়িত চায়ে চুমুক দিলেন।

নিঃশব্দ সময় পেরিয়ে যায়, স্পষ্ট চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি ফের বলেন, আমি বিশ্বাস করি, একটি ভুলের অন্যরকম খেসারত মানুষ অনুতাপের ভেতর দিয়েই দিতে চায়, যা দিয়ে সে এক সময় মন থেকে সেই বিষয়টাকে মৃত করে দিয়ে ঝাড়া হাত-পা হয়ে যায়। অনুতাপের খেসারত দিয়ে কোনো বিষয়কে তুচ্ছ করে ফেলা আমার ধাতে নেই। তাছাড়া আমার জীবনের সবকিছুর প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। যা জন্ম নিয়েছিল এবং যে বিষয়ের মধ্যে আমি এক সময় ছিলাম, পরবর্তী জীবনে প্রায়শ্চিত্তের বিনিময়ে মন থেকে মুছে আমি সুখে বাস করতে থাকব এ ধরনের সহজ সাপ্টা ফাঁকির ব্যাপারটাকে যে-কোনো সচেতন মানুষই ঘৃণা করবে, অন্তত আমি করি।

চা শেষ করে তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন। এবার আমার পালা। কি এক ঢেউ, ভেতর থেকে ধাক্কা দিচ্ছে, এত কথা... পৃথিবী জুড়ে এত কথার কারুকাজ! কেমন ক্লান্ত লাগছে... তবুও শুরু যখন করেছি, তার থেকে হুট করে আমি বেরিয়েও তো আসতে পারি না। বলি, আপনি এটা কী বলছেন, পৃথিবীর সভ্য মানুষই অনুতপ্ত হয়। যে নিজের ভুলকে ভুল মনে করে না, যার ভেতর কোনো গ্লানি নেই, সে সুস্থ মানুষ হয় কি করে ? আপনি একজন খুনির কথা ধরুন। সে টাকার জন্য একটি মানুষকে খুন করল... ধরা যাক, তার কোনো শাস্তি হচ্ছে না— আমাদের দেশে এটা নতুন কোনো ঘটনা নয়। কিন্তু সবাই চলে গেল, একাকী একটি ঘরে সে শুয়ে আছে, আত্মার কাছে সে কোনো জাবাবদিহি করছে না— এরকম ক্ষেত্রে আপনি তাকে কী বলবেন ? এই যে লোকটা অনুতপ্ত হচ্ছে না, নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ছে, অনুতপ্ত হলে কি সে পাপী হয়ে যেত ? বলতে বলতে আমি কেমন উত্তেজিত হয়ে পড়ি, অনুতপ্ত হয় না একমাত্র সেই মানুষ, যে কেবল নিজের সিদ্ধান্তকেই সর্বোচ্চ মূল্য দেয়, যে দাম্ভিক, আত্মার কাছে যে শুদ্ধ নয়। ভাড়াটে খুনিরা অনেকটা ওরকমের হয়।

কিন্তু আশ্চর্য! আমার এমন একটা ধাক্কা খেয়েও তিনি স্থির। নিঃশব্দে একটু দাঁড়িয়ে আবার বসলেন। একটা ম্যাগাজিন হাতে নিয়ে তাই দিয়ে নিজেকে বাতাস করতে করতে তিনি আবার শান্ত স্বরে বলতে থাকেন, এক্ষেত্রে খুনিও তার আত্মার কাছে পরিষ্কার। সে যদি জানতই কাজটা তার অন্যায় হচ্ছে, তাহলে সে খুন করত না।

তাঁর যুক্তির জবাবে আমি এবার প্রায় চেঁচিয়ে উঠি, কী আশ্চর্য! আপনি এটাকে সাপোর্ট করবেন ? মানুষ হয়তো ভুলটা অন্যায় জেনে করে না, তখন হয়তো আত্মার কাছে সে পরিষ্কার, কিন্তু পরে ? সে যদি তার ঝোঁকের মাথায় করা কঠিনতম দোষটা ধরতেই না পারল, আপনি তাকে শুদ্ধ সচেতন মানুষ বলবেন ?

সত্যি বলতে কী, আমার কাছে অনুতাপকে একটা ফাঁকি মনে হয়, তিনি তার অবস্থানে তখনো অনড়, মানুষ অনুতাপ দিয়ে তার গভীরতর অন্যায় থেকে নিষ্কৃতি পেতে চায়। এর ভেতর দিয়ে তার সেই মূল অন্যায়ের ভার কমে যায়।

আপনি ভুল বলছেন, আমি বলে উঠি, এভাবেই তার মূল অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত শুরু হয়।

গভীরতম একটা পাপের প্রায়শ্চিত্ত সে অনুতাপের ভেতর দিয়ে করবে ? আশ্চর্য স্থির তাঁর গলা, এভাবে সে নিজের ভেতর থেকে পালাবে ?

আপনি বোধহয় তার বাহ্যিক শাস্তি প্রেফার করেন ? যেমন একটি চোরের গণপিটুনি ? একজন খুনির ফাঁসি... আমি আরো সূক্ষ্মতা থেকে কথাগুলো বলছি, অসহিষ্ণু গলার সঙ্গে বলে চলি, আমি চাই আত্মার শাস্তি। আত্মার শাস্তির ভেতর দিয়ে মানুষ শুদ্ধ হয়ে ওঠে।

ঘরের গুমোটতা ক্রমেই বাড়ছে। সেই সাথে বাড়ছে রাতের বয়স। বস্তির ভেতর থেকে হৈ-হুল্লোড়, চিৎকার ভেসে আসছে। এরা অনেক রাত অবধি অহেতুক হৈ-হল্লা করে। পাশাপাশি মাইকের মাতাল শব্দ তো রয়েছেই। দিনরাত এখানে হিন্দি ফিল্মের গান বাজে। সামনের রেস্টুরেন্ট থেকে পরোটা ভাজার গন্ধ আসছে। এসবের মধ্যে তিনি ভয়ানক ঘামছেন, দেখে তর্ক করার স্পৃহাটা কেমন মিইয়ে আসতে থাকে। তিনি কি আমার সঙ্গে কথা বলতে ভেতরে ভেতরে অস্বস্তি বোধ করছেন ? অবাক ব্যাপার, স্বল্প পরিচয়ের এই মানুষটিকে আমার আর দূরের বলে মনে হচ্ছে না। তাঁর সঙ্গে সমান তালে চালিয়ে যেতে পারার যন্ত্রণাকর একটা আনন্দও আমাকে অভিভূত করছে। তিনি এবার ধীরে মাথা নাড়েন, আমি তোমার যুক্তিকে পুরোপুরি অস্বীকার করছি না। কিন্তু আমরা যুক্তিকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে মূল বিষয় থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি— বলতে বলতে তিনি সযত্নে চায়ের কাপটা টেবিলে জায়গামতো রাখেন। তারপর সোজা হয়ে বসে আমার মুখের দিকে তাকান, কথা হচ্ছিল, অনুতাপের খেসারত নিয়ে। পৃথিবীর সব পাপকে তুমি এক সমান্তরালে দাঁড় করাচ্ছ কেন ? চুরি, ডাকাতি, ধর্ষণ, পরকীয়া প্রেম, নাস্তিকতা... সবকিছু কি পাপ ? প্রেম একটা পুণ্যের বিষয় কিন্তু এই প্রেমই স্বামীর অগোচরে কেউ যদি করে সামাজিকভাবে সেটা পাপ হিসেবে চিহ্নিত হবে। কিন্তু যে দু'জন এর সাথে সম্পৃক্ত তাদের কাছে এটা মহাপুণ্যের মনে হতে পারে। তর্কের খাতিরেও সবকিছু এক পাল্লায় ফেলে মাপলে চলবে কেন ? এখন ওসব তর্ক বাদ দিয়ে আমরা আমাদের প্রসঙ্গে আসতে পারি, কী বলো ? তিনি যেন হঠাৎ হাওয়া পাল্টাতে চাইলেন। আমিও বলুন— বলে কেমন থিতিয়ে আসতে থাকি।

আমি আমার জীবনের একটি অধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, যে অধ্যায়ের প্রতি আমার ভেতর শ্রদ্ধা আছে, তাকে আমি অনুতাপ দিয়ে ছোট করব কেন ? অনুতাপ হলেই না তার খেসারতের প্রশ্ন। অনুতাপকে সেই অর্থেই আমি পাপ হিসেবে ইঙ্গিত করেছি। আগেই বলেছি অনুতাপের পরবর্তী অধ্যায়ই খেসারত। মানুষ গভীর অন্যায় থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য স্থূলভাবে তার খেসারত দিয়ে মুক্তি পেতে চায়। কিন্তু আমি আমার এই যুক্তিকেও শাশ্বত বলে দাবি করছি না। তোমার মতো আমিও আমার সময়কে বেশি গুরুত্ব দিই। কিন্তু সময় কি দাঁড়িয়ে থাকে নীনা ? এইবার যেন ভীষণ উঁচু একটা দালান থেকে উদোম গায়ে নেমে আসতে থাকেন তিনি। সিঁড়ি ভাঙতে গেলে হাঁপাতে হয়, চুলে পাক ধরেছে। পঞ্চপাণ্ডবের কথা জানো তো ? কী প্রবল যুদ্ধ, রক্তক্ষয়, মৃত্যু...। যুদ্ধ শেষ হলে কী হতাশা! কেন এই হত্যা ? রক্ত ? কার মৃত্যু হয়েছে ? সবাই তো তার আপনজন, আত্মীয়। শেষে সে রওয়ানা হলো মহাপ্রস্থানের পথে। কত পথ... কী দীর্ঘ সেই যাত্রা! বুকের মধ্যে কত তোলপাড়... কত নদী... খাল। একে একে সবাই হাঁপিয়ে পথের মধ্যে থেমে পড়ল। বাকি রইল যুধিষ্ঠির। কী দারুণ মনোবল নিয়ে সে একাই সেই দীর্ঘপথ ধরে হেঁটে গেল। নীনা, মিছিমিছিই এতটা পথ পেরিয়ে এসেছি। একবার সব খুইয়ে ভেবেছিলাম যুধিষ্ঠির হবো। কার জন্য অনুতাপ ? কার জন্য খেসারত ? সবাই কি আমার নিজের মানুষ ছিল না ? আমি নিজেই বিরান একটা পথের ওপর মুখ-থুবড়ে-পড়া মানুষ। আমার সামান্য উৎসাহে তুমি যদি আবার শুরু করতে পার, আমি ভালো বোধ করব। এর মধ্যে কোনোরকম ভণ্ডামি নেই, তেমন স্থূল কোনো উদ্দেশ্য নেই, আকারে-ইঙ্গিতে তুমি যেটা বোঝাতে চেয়েছ।

কী অবসাদ! চারপাশে আবার ছায়া। মনে হচ্ছে ধূসর ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে আমার পুরো অস্তিত্ব পাক খাচ্ছে। ঘুরছে। এবার সত্যিই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে নিঃশব্দে বারান্দায় এসে একটু থেমে আমাকে স্পন্দিত করে অনুচ্চ স্বরে বললেন, এও আমার জীবনের একটা অভিজ্ঞতা। এসে ভালোই হলো। না এলে জীবনের অনেক বড় কিছু থেকে বঞ্চিত হতাম।

আমি আপনার বাসায় যাব, তিনি রাস্তায় নেমে গেলে প্রায় চিৎকার করেই বলি, আপনার সেই ইজেলটা অবশ্যই নিয়ে আসব।

অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসেন তিনি এবং ল্যাম্পপোস্টের মৃদু আলোয় সামনের নোংরা অমসৃণ দুর্গন্ধযুক্ত গলির পথ ধরে তার দীর্ঘ দেহটা ক্রমেই মিলিয়ে যেতে থাকে। একটা মাদি কুকুরের ওপর হামলে পড়েছে একটা পুরুষ কুকুর। বস্তির ভেতরে কেউ মায়াকান্না জুড়ে দেয়, সেই কান্না ছাপিয়ে ওঠে টিন পেটানোর শব্দ। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি। কামড়া-কামড়িরত কুকুর দুটো এবার বস্তির দিকে হাঁটা দেয়। এইসব দেখা শেষে এক সময় ঘরে আসি। মহাপ্রস্থানের পথে মুখ-থুবড়ে-পড়া যুধিষ্ঠিরের দেহ আমার চেতনা তোলপাড় করে। না, এ তাঁর বিনয়। তিনি মুখ থুবড়ে পড়েন নি, তার প্রতিটি অভিব্যক্তিতে সেই সুদৃঢ় ভঙ্গিটিই প্রকট। ভাবতে ভাবতে নতুন করে বিস্ময়ের ঘোরে তলিয়ে যাই। পুরো ঘটনাটিকেই আমার জীবনের সাথে সামঞ্জস্যহীন ভ্রম বলে মনে হতে থাকে। আমার এই গুরুত্বহীন, নিরন্তর ক্ষতবিক্ষত বেঁচে থাকার মধ্যে তাঁর এই উপস্থিতি, আমার পেইন্টিং, কিংবা আঁকাআঁকির ব্যাপারে তার এতটা গুরুত্ব দেয়া, এখন সেসব বন্ধ বলে আবার শুরু করতে তাঁর অনুপ্রেরণা-মেশানো তাগিদ, সবার ওপরে এসব কিছুকে এতটা মূল্য দেয়া— আমার প্রাত্যহিকতার সাথে ঠিক মেলে না। একান্ত নিজের মতো করে বেঁচে থাকার চেয়ে আমার কাছে তাৎপর্যপূর্ণ আর কিছু নেই। এর পেছনে যদি মার ছায়াও থেকে থাকে, তাতে কী! আমি আমার স্বকীয়তা নিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছি। তাতে করে মার সম্মান আরো বেড়েছে। তাঁর মেয়ে নিজের দারিদ্র্যের বিপন্নতা নিয়ে কারো পায়ের কাছে নত হয় নি। হঠাৎ কী হয় মার জন্য মনটা কেমন করে ওঠে। আমার সেই মা, একদিনের জন্যও তিনি সংসারে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারলেন না। কী যে ভয়াবহ ছিল সেই দিনগুলো। চরম দারিদ্র্যের সাথে যুদ্ধ করে, সংসারের ক্রমাগত পেষণে, তাঁর ভেতর থেকে স্নেহ আর ভালোবাসার অবলুপ্তি ঘটছিল। চালের সাথে নুন জোড়া দিতে দিতে সারাক্ষণ মেজাজ খিটখিটে থাকত। কোনোদিন তিনি বাবার শ্রদ্ধা পান নি। সংসারের একশোটা ফুটো বন্ধ করতে নানা সূক্ষ্ম চাতুরি তিনি রপ্ত করতে শিখেছিলেন। তাঁর ভেতর থেকে সরলতা, সততা এই শব্দগুলো ক্রমেই অপসৃত হচ্ছিল। আর তাঁর সেদিনকার আচরণ তো অভিনব। মনে পড়ে, একদিন পাশের বাড়ির একটি মুরগি রানু নিঃশব্দে জবাই করে চুলোয় চড়িয়ে দেয়। মা অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে ব্যাপারটা না দেখার ভান করেন। শেষে মুরগির মালিক এলে, মা কিছুই জানেন না এমন অভিনয় করে কী বিচিত্র স্বরে গলা টেনে বলেছিলেন, আহা! কেমন লাগে বলেন তো, জলজ্যান্ত একটা মুরগি হারিয়ে গেল! দেশটা আসলে চোর-ছ্যাঁচোড়ে ভরে গেছে। এও দেখেছি, আমাদের চাচাদের কাছে টাকা চাইতে গেলে, প্রয়োজনের চেয়ে বেশিই কাঁদতেন তিনি। বলা যায় আমাদের জন্যই নিজেকে তিনি নামাতে নামাতে এমন নিচুতে নিয়ে ঠেকিয়েছিলেন যে, তাঁর জন্য আমাদের অনুভব, অনুরক্তি আর শ্রদ্ধাবোধের সবকিছুই উবে গিয়েছিল। মা'র মতো অমন আর্ট-

কালচার বিবর্জিত ক্ষয়িষ্ণু মহিলার ছায়া যদি পড়েও থাকে ভদ্রলোকের বোধে ও বিচারে, তবুও আমার অহঙ্কারে কিছুমাত্র আঘাত লাগবে না।

এক সময় আমার শরীর হিম কাঁপিয়ে টেকো মজুমদারের আবির্ভাব ঘটে। বিছানায় বসেছিলাম, দেয়ালে হেলান দিয়ে, মগজে সহস্র ক্রিয়া, আসলেই কি চাঁদের নিচে আমাকে শুইয়ে দিলে সব ভাঁজ খুলে দেব ? এতটাই কাঙাল হয়ে আছি ? চন্দ্র কি অপদেবতা ? আমাকে বিবশ, শুভ্র করে তুলবে ? আমি তো বিয়ের রাতে বেহুলাই ছিলাম, তিল পরিমাণ সমস্ত ফুটোফাটা বন্ধ করে যখন সমর্পিত হতে যাচ্ছিলাম লখিন্দরের বুকে, তখুনি কী করে যেন প্রবেশ করে মনসা! তবে কি আত্মার দরজা দিয়ে আসা ? মনসাই কি ছিল আমার যথার্থ প্রেমিক ? বুকের মধ্যে বেজে ওঠে কান্নার কীর্তন।

আমার এরকম চিরকালীন দ্বন্দ্বের ছায়াপ্রাচীর বড় হয়ে উঠতে থাকলে দুর্ভেদ্যতা অতিক্রম করে রানু হেঁটে আসে, মজুমদারও, আমি সেই দৃশ্যের দিকে দীর্ঘদিন পর দর্শক হয়ে তাকিয়ে থাকি।

আমাদের বাসার ক'টা বিল্ডিং পর মজুমদারের হাফ বিল্ডিংটা ছিল ? গুণতে থাকি। তিনটে বাসা ছিল মাঝখানে। এই লোকটার চোখের সামনেই আমরা জন্মেছি, বড়ও হয়েছি। পোড়ো সেই বাড়িতে সে একাই থাকত। বড় হয়ে জেনেছি, তার স্ত্রী-কন্যারা সবসময় দেশের বাড়িতেই থাকে। ছেলে-সন্তান জন্ম দেয় নি বলে বৌকে ঘৃণা করত সে। তবে আর বিয়ে করে নি কেন ? তার সম্পর্কে এরকম সহস্র প্রশ্নের কোনো উত্তর ছিল না। তার বিল্ডিং ছিল আধাআধি তৈরি। এর পেছনকার আজব কাহিনীটিও সেই ছেলেবেলা থেকেই আমাদের কাছে তাকে রহস্যময় করে তুলেছে। বিল্ডিংয়ের কাজ যখন আধাআধি, এক রাতে স্বপ্নে দেখে, সে যদি গোটা বিল্ডিংটা তৈরি করে তবে তার চাপে পড়ে তার মৃত্যু হবে। সেজন্যই এ কাজে সে আর এগোয় নি। মজুমদার স্বপ্নবান। তার সব স্বপ্নই ফলে যায় বলে স্বপ্নকেই নিজের ঘাতক মনে করে সে।

মজুমদার ! শব্দটা উচ্চারণের সাথে সাথে সে বিদ্ঘুটে অবয়ব আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়, আমি তার সঠিক বর্ণনা দিতে পারব না। তবে তার চোখের ওপর ভ্রূ ছিল না। ডুমুর দানার মতো বীভৎস লাল চোখ, ভাঙা চোয়ালে বিশাল কালো জড়ুল। জড়ুলের ভেতর দিয়ে বেড়ে ওঠা গুচ্ছ চুলগাছ। স্পষ্ট মনে হতো একটা কুনো ব্যাঙ বসে আছে। মুখ জুড়ে যা বিখ্যাত, সে ছিল তার নাক। সবচেয়ে ভয়াবহ নাকের দুটো কালো গর্ত। দশাসই শরীর। প্রায় সাত ফুট লম্বা। উচ্চতার সাথে চরম বেখাপ্পা তার দু'টো হাত— অসম্ভব সরু আর খাটো। তার পোশাকও ছিল বেঢপ, বিচিত্র। কালো পাঞ্জাবির নিচে ঝুলঝুল করত গাঢ় লাল পাজামা।

আমাদের শহরে বিখ্যাত ছিল সে তান্ত্রিক হিসেবে। তার দেখা স্বপ্নকে সবাই সমীহ করত। সুদখোর হিসেবেও ছিল তার কুখ্যাতি। বলতে গেলে পাড়ার নিম্নবিত্ত সমস্ত পরিবারই ছিল তার সেই টাকার কাছে জিম্মি। এসবেরই একটা ছিল আমাদের পরিবার। এবং এমন একটা লোকের কাছে সেই ছোট্টবেলায় মা যখন আমাকে টাকা আনতে পাঠাতেন, আমার রক্ত জমাট বেঁধে দই হয়ে যেত। যেতে না চাইলে, সংসারের সহজ হিসেবে, পরের বেলা খাওয়া বন্ধ, ফলে যেতে বাধ্য হতাম। যতবার গিয়েছি, তার অদ্ভুত আচরণে মনের ভয় দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছে। একদিন সন্ধ্যায় তার ঘরে গিয়ে, দেখি, সমস্ত ঘরে ধূপের ধোঁয়া। বাতি

নেভানো। আমি গিয়ে পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার ঘরে সে জ্বালিয়ে দিল কুপির শিখা। তারপর চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে একনাগাড়ে বলতে লাগল— দোহাই! দোহাই! জিন-পরির... সাত আসমানের...। মজুমদারের সামনের পাটিতে দুটো দাঁত নেই, ফলে কালো মোটা ঠোঁট জোড়া ফুঁড়ে লকলকে জিব বেরিয়ে পড়ে। তার জিবের এই আচরণ তাকে ক্রমশ আরো ভয়াবহ করে তুলতে থাকে। আর তাই দেখে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটতে ছুটতে বাসায় এসে আমি হাঁপাতে থাকি। মা'র চোখ জ্বলজ্বলে, দিল ? আমি নিরুত্তর। মা আরেকটু কাছে আসে, ধমক দিয়েছে ? আমি ভয়ে ভয়ে সব খুলে বলতেই মা বললেন, লোকটা তান্ত্রিক। গায়েবি ক্ষমতা আছে। তোর বাবা বলে, সারারাত সে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। আল্লা-ভগবান দু'জনকেই ডাকে।

কী ভয়াবহ কথা! এরকম একজন লোকের কাছে মা আমাকে অবলীলায় পাঠায় ? আমার প্রতি কি একটু দয়ামায়া নেই ? রানুর অবস্থা ছিল আমার চেয়েও মারাত্মক। জন্মের পর থেকে রানুর মধ্যে ভয় বলে কোনো কিছু ছিল না। অথচ সেই রানুরও একমাত্র আতঙ্ক এই মজুমদার! তাকে দেখলে ভয়ে সে এতটুকু হয়ে যেত।

রানুর যখন তিনমাস বয়স তখন মজুমদার একদিন তাকে হাত বাড়িয়ে কোলে নিয়েছিল। চোখ মেলে তার মুখ দেখে রানু এমন ভয়ঙ্কর জোরে চিৎকার দিয়ে উঠেছিল যে, সন্ত্রস্ত মা তাকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন। কত ছোটবেলার কথা, অথচ সেই দৃশ্য আমার চোখে এখনো স্পষ্ট। রানুর ভয় দেখে মজুমদার কী রকম ক্রুব্ধ আর বিপন্ন হয়ে উঠেছিল। পাড়ার মধ্যে তার এমন একটা প্রভাব ছিল, তার সম্পর্কে যে ভয়, সেটা কেউ তার সামনাসামনি প্রকাশ করত না। আমাদের সেই ঘিঞ্জি পাড়ার প্রত্যেকের আর্থিক অবস্থা ছিল এক ও অভিন্ন চেহারার অর্থাৎ সচ্ছলতা ছিল প্রত্যেকের নাগালের বাইরে। ফলে মজুমদারকে তোয়াজ করা ছাড়া কারো কোনো গত্যন্তর ছিল না। মজুমদারের স্বাভাবিক ব্যবহার ছিল ভদ্র আর নরোম। কিন্তু টাকা শোধ করতে না পারার অক্ষমতায় অনেক ভদ্রলোককে আমি তার পা জড়িয়ে কাঁদতে দেখেছি। নিষ্ঠুরতা ছাড়া এ ব্যবসায় প্রফিট নেই। তার নিজেরও কথা ছিল তাই।

আমাদের চোখের সামনেই মজুমদার দেখতে দেখতে চরম বিত্তবান আর চূড়ান্ত ক্ষমতাধর হয়ে উঠল। সবকিছুর মূলে তার ওই সুদের ব্যবসা। তার কাছে দেনার দায়ে কতজন যে সর্বস্ব হারিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, তার গোনাগুনতি নেই। এসবের অনেক কিছু পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছ থেকে শোনা, কিছু কিছু আমার একেবারে নিজের চোখে দেখা। এসবই হতো মজুমদারের সুদ পাহাড় সমান হয়ে যাওয়ায়। তারপরও কিন্তু তার প্রয়োজন কেউ অস্বীকার করতে পারত না। তাই ভয়ে জমে গিয়ে মাকে জিগ্যেস করতাম, আপনারা কেন ওর কাছ থেকে টাকা আনেন ? আমাদেরও যদি কোনোদিন বাড়ি থেকে বের করে দেয় ?

আমরা তো অত বেশি টাকা নিই না।— মা আমাকে বুঝিয়েছিলেন। মাসের মাঝামাঝি তার কাছ থেকে টাকা আনি, তোর বাবা মাস পয়লা বেতন পেলে কিছু সুদ দিয়ে টাকাটা শোধ করে দেয়। এ ছাড়া বাঁচব কী করে ? আমি সেই বয়সে অত হিসেব মেলাতে পারতাম না। কিন্তু একটা জিনিস টের পেতাম, মজুমদারের প্রতি বাবার অসীম ভক্তি। বাবা নিজে ছিলেন ধর্মভীরু মানুষ। চাকরি ফেলে তবলিগ করে বেড়াতেন। মাঝেমধ্যে মসজিদে রাত

কাটাতেন। কাঁধে ছিল দু'দুটো আপন ভাইয়ের বোঝা। তাদের মানুষ করার দায়িত্ব। সংসারের খরচের ভয়ে বেশির ভাগ সময় টাকা-পয়সা না দিয়েই পালিয়ে বেড়াতেন। চরম সঙ্কটের মুখে কখনো মজুমদারের পরামর্শ নিতেন। বাবা বিশ্বাস করতেন, মজুমদারের নির্দেশে তিনি জীবনের অনেক ফাঁড়া কাটিয়ে উঠেছেন। অবসর পেলেই বাবা তার ওখানে গিয়ে সময় কাটাতেন। তাই সংসারের সব সঙ্কটের মুখোমুখি মাকেই হতে হতো। মার আদি বাড়ি ছিল মুর্শিদাবাদে। তার জ্ঞাতিগুষ্ঠির সবাই ওখানে। তার নিজের বাবা-মা অবশ্য মারা গেছেন বেশ কিছুকাল আগে। তাই সংসারে তাকে কুণ্ঠিত হয়েই থাকতে হতো। যার ফলে জোড়াতালি দিয়ে সংসার চালানোর জন্য খুব বেশি প্রতিবাদ তিনি করতে পারতেন না। এবং আমাদের সেই জোড়াতালির সাথে মজুমদারের সম্পর্ক ছিল অবিচ্ছেদ্য। ফলে এই রকম একজনের সাথে আমাদেরই সবচেয়ে হার্দ্যিক সম্পর্ক থাকায় মা বেশ গর্ব করতেন। একদিনের একটা ঘটনা এখনো আমার চোখে জল এনে নেয়। সংসারের নয়-ছয় টাকা বুঝিয়ে দিয়ে বাবা চলে গেছেন লম্বা তবলিগে। কয়েকদিন জোড়াতালি দিয়ে চালানোর পর এক ভোরে মা এক সের গম দিয়ে আমাকে আর রানুকে পাঠিয়ে দিলেন সেটা ভাঙিয়ে আনতে। রাতে শুকনো রুটি গিলেছি। ভোরে উঠে দস্তুর মতো কাঁদতে শুরু করেছে মন্টু। খিদেয় চোঁ চোঁ করছে পেট। রানুর খালি গা, তার প্যান্টটা ঝুলঝুল করছে। এক হাতে গমের পোঁটলা আর অন্য হাতে রানুকে ধরে হাঁটছি। প্রচণ্ড রোদ। মাথা ঝিমঝিম করছে। শূন্য ক্ষুধার্ত চোখের সামনে পাশের রেস্টুরেন্টগুলো কী জমজমাট, মোগলাই পরোটা, কিমাপুরী... রানুকে টানতে টানতে সেখানে থেকে আটা কলের কাছে নিয়ে আসি। প্রচণ্ড ভিড় মিলের মধ্যে। গমের বস্তাটা বাড়িয়ে দিলে দোকানের হর্তাকর্তা একজন প্রায় খেঁকিয়ে ওঠে, আমরা এক সের করে গম ভাঙাই না।

দাঁড়িয়ে থাকি। অনেকক্ষণ। রানুর মুখ শুকিয়ে কাঠ। জিভ দিয়ে শুধু ঠোঁট ঘষছে। আয় রানু হাঁটি... আয় রানু... লক্ষ্মী রানু...।

চোখ উপচে জল আসছিল আমার।

আবারো প্রায় অনির্দিষ্ট হাঁটা। রোদে রানুর ফর্সা টকটকে গাল লাল হয়ে উঠেছে। দরদরে ঘামে ওর সারা শরীর চোপসানো। কী দুরতিক্রম্য, ভঙ্গুর সেই পথ। হাঁটছি, শেষ হয় না। গলি, রিকশার ভিড়, স্কুল শুরুর গ্যাঞ্জাম সব পেরিয়ে আরেক আটার কলে। সেখানেও একই রকম ভেংচি। রানু হাউমাউ কাঁদতে শুরু করে। আমি অনেক কাকুতি-মিনতি করি। আটার কলের কর্মচারীরা কি আমাদের ভিখিরিটিখিরি ভাবছে ? নিজের পোশাকের দিকে তাকাই। চাচাতো বোনের দেয়া পুরনো ঝুলঝুলে জামাটা হাঁটুর তল অবধি গড়াগড়ি যাচ্ছে। ধুলোয় পুরো গা ডুবে আছে। রুক্ষ চুলের একটা বেণি লটপট করছে ঘাড়ের ওপর। সেই প্রথম নিজেকে ভীষণ অপমানিত আর ছোট বোধ হয়। রানুকে টেনে বাইরে আনি। অনুজ্জ্বল আলোর পথ ধরে কসাই পট্টি অতিক্রম করি। লাল মাংস, শাদা মাংস, সেইসব পেরিয়ে এক সময় ক্লান্ত হয়ে রেললাইনের ওপর রানুকে বসাই। সূর্যদেবতা ঘিলুর ওপর আসন গ্রহণ করেন। রানুর নাক বেয়ে সর্দি ঝরছে। ক্রমাগত হিক্কা তুলছে সে। ধুলো আর ঘামে ঝাঁকড়া চুলো রানুর মুখটা এমন আঠালো হয়ে আছে যে, গলা দিয়ে তার কান্নার স্বরটাও নেতিয়ে বেরোচ্ছে। আমিও কেমন ঝিমিয়ে এসেছি— হেই রানু, এই রেললাইন কোথায় গিয়েছে বল তো ? রানু কাঁদছে।

হেই রানু, আমরা মরে গেলে কোথায় যাব রে? রানু কাঁদছে।

রেললাইন টপকে টপকে হাঁটছি। ব্যথায় পা জোড়া টনটন করছে। কেমন বনবন চক্কর দিচ্ছে মাথা। হেই রানু ওই দেখ লাল ঘুড্ডি। কান্না থামিয়ে রানু ঘুড়ি দেখে, সেই দৃশ্য দেখে রানুর মুখে যে হাসি ফুটেছিল, তাকে আমি এখন মোনালিসার সেই দুর্জ্ঞেয় হাসির সাথে তুলনা দিতে পারি। নাক-মুখ ফুলে উঠেছে— এরি মধ্যে ঘুড়ি রেখে শুরু হয় ফের তার কান্না। কী করে ওকে থামাই? গা ছেড়ে দিয়েছে, কী করে ওকে বাড়ি নিয়ে যাই? গল্প শুরু করি, রানু, আমরা যখন বড় হবো, চাকরি করব, রেশমি আপার মতো বিয়ে হবে আমাদের। তুই তো সুন্দর, তোর বর তোকে কত খাবার, এই ধর পোলাও, মাংস, অনেক তরকারি, আইসক্রিম, কতকিছু খেতে দেবে! হাফপ্যান্ট টেনে হাত চোখের কাছে নিয়ে আসে রানু... মুহূতে-মুহূতে ম্লান উজ্জ্বলতায় এইবার প্রাণ থেকে সে উদ্দীপিত হয়ে ওঠে, সত্যি?

তারপর ওই রকম এক অবশ সকালের আবর্তে পাক খেতে-খেতে এক সময় পরাজিতের মতন বাসায় ফেরা। বুক ঠেলে ঠেলে তেতো কান্না উঠছিল, রানুর মুখে কী গুঁজে দেব? মা নিশ্চয়ই তীর্থের পাখির মতো বসে আছেন। কিন্তু না, বাসায় এসে দেখি, ডেকচিতে চাল ফুটছে। মা চাচার বাসা থেকে কিছু চালডাল নিয়ে এসেছেন। আহা! কী গন্ধ অদ্ভুত মাদকতা সেই লাল ভাতের গন্ধে!

বাবার ফেরার কথা দু'দিন আগেই। কিন্তু ফেরেন নি। দুপুরের সমস্যা না হয় মিটল, রাতের বেলা? এমনিতেই এর-তার কাছ থেকে ঋণ করি বলে পাড়ায় আমাদের ভাবমূর্তি যথেষ্ট খারাপ, কেননা ঋণ ফেরত দেয়ার ব্যাপারে আমাদের পরিবারের অক্ষমতা আর উদাসীনতা তুলনাবিহীন। আরেফিন তখন বড় চাচার ওখানে থাকে। বাবা দায়িত্ব নিয়েছিলেন নিজের ছোট দু'ভাইয়ের। তাদের একজন এম.এ. ফাইনাল ইয়ারে, অন্যজন পাস করে চাকরি খুঁজছে। আরেফিনের দায়িত্ব নেয়া বড় চাচাদের বিশাল অবস্থা। রেশমি আপার বিয়েতে সে কী রাজকীয় হৈচৈ। তবুও কেন ছোট দু'চাচার ভার বাবার ঘাড়ে বর্তেছিল, আমি বুঝতাম না। শুধু এইটুকু বুঝতাম বড় চাচাদের কাছে আমরা ছিলাম চরম অবজ্ঞা আর তাচ্ছিল্যের পাত্র। মা ছাড়া কেউ ও বাসায় পারতপক্ষে যেত না। মা যেতেন আরেফিনকে দেখতে। সংসারের কাসুন্দি ঘেঁটে কান্নাকাটি করতে, চাচার পরিবারের কাছে যেটা ছিল জঘন্য বিরক্তিকর। বাবাকে 'অকম্মার ধাড়ী' আখ্যা দিয়ে তারপর হয়তো মার দিকে কিছু ছুঁড়ে দিতেন চাচা। বলতেন, আমি এখানে দানখানা খুলে বসি নি। হোপলেসটাকে বলে দিও, সংসার টিকিয়ে তবে তো আল্লার নাম। তার তো এখন পথে ভিক্ষে করতে নামতে বাকি। মা খুব যত্নের সাথে টাকাগুলো আঁচলে বেঁধে নিয়ে আসতেন। বলতেন, তোর চাচা মানুষ নয়, ফেরেশ্‌তা। আমার আরেফিনকে লেখাপড়া শেখাচ্ছে। কী অল্পেই না বর্তে যেতেন মহিলা! তার মান-অপমানবোধ ছিল চূড়ান্ত রকমের ভোঁতা। ছোট চাচাদেরকে বাবা মানুষ করছেন, সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও বড় চাচা এই দায়িত্বটি এড়িয়ে গেছেন। এই সহজ হিসেবটি আমার মতো এক কিশোরী বুঝলেও সরল সেই মহিলাটি বুঝতেন না।

দুপুরে তো গরম ভাত হলো। রাতে? মা বললেন, আজ নিশ্চয়ই তোর বাবা ফিরবেন। বাবা ফিরছেন না, দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে। মা উঠোনে বসে ক্রমাগত কেঁদে চলেছেন। তাঁর ধৈর্যের দেয়াল ধসে যাচ্ছে। ক্রমশ নিজের জন্য, সন্তানদের জন্য, এসব কিছুকে ক্রমাগত

অভিশাপ দিয়ে চলেছেন। এসব দেখেটেখে ভাবতে থাকি, আচ্ছা, কোনোকিছু করে আমি নিজেই কি পারি না বাসার সবার রাতের খাবারের ব্যবস্থা করতে? ভাবতে ভাবতে অদ্ভুত একটা ফন্দি আসে মাথায়। মনে হচ্ছিল, এটা করতে পারলে আমার অসাধারণ একটা ক্ষমতা দেখানো হয়ে যাবে। আমি আশ্চর্য প্রদীপের দৈত্য হয়ে যাব। ভাবতে ভাবতে রোমাঞ্চিত হয়ে ঘরে ঢুকি। আমাদের সারা বাড়িতে অসংখ্য তেলাপোকা। ভাঙা মিটসেফের ওপর একটা বিস্কুটের সঙ্গে কীটনাশক মিশিয়ে মা রেখে দিয়েছেন ওটা খেয়ে তেলাপোকা মরে কি না তা-ই পরীক্ষা করে দেখার জন্য। পেটে প্রচণ্ড খিদে সত্ত্বেও, কী হয়, আমি সেই আহার সংগ্রহ মিশনের কথা ভুলে যাই। বিস্কুটটা দেখে আমার জিভে জল এসে যায়। বিষ মাখানো বিস্কুটের টুকরোটা পাশের বাসা থেকে নিয়ে এসেছিলেন মা। অযুত-নিযুত তেলাপোকা ঘরে, বিছানায়, রান্নাঘরে, মিটসেফের ড্রয়ারে। রাতে ঘুমুলে গায়ের ওপর দিয়ে হাঁটে। আলনার কাপড়গুলো পর্যন্ত কাটতে শুরু করেছে। আমাদের সংসারে তেলাপোকাগুলো যেন হ্যামিলনের গল্পের ইঁদুরের মতন হয়ে উঠছে। কী করে রাত যাবে? ভিক্ষে করতে বেরুবো? মা তো নিজেকে ছেড়ে দিয়ে উঠোনে বসে আছেন। তার চুলে বিলি কাটছে রানু। আমি মিটসেফের সামনে দাঁড়িয়ে। সেই বয়সেই আমি কী সব অনুভূতি-অনুভবে তাড়িত হতাম— কেয়ামত, পুলসেরাত, মৃত্যু... ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতাম গোরস্থানের সামনে। বুক হু-হু করত। বাবার কাছে ধর্মের গল্প শুনে শুনে আমার মনে এমন ভয় জমে গিয়েছিল যে, আল্লাহকে মনে হতো ভয়ঙ্কর কিছু। খুব কষ্ট হতো আল্লাহ নিষ্ঠুরের মতন আমাদের কেন পৃথিবীতে পাঠালেন, এইসব ভেবে। এবং ভাবনার পাশাপাশি চোখ জোড়া প্রখর তাক করে আছি বিস্কুটসোজা। হঠাৎ দেখি একটা তেলাপোকা এগিয়ে আসছে। অন্যদিক থেকে আরেকটি। পৃথিবী ছায়া করে বিকেল চলে যাচ্ছে। আমি স্থির দাঁড়িয়ে। বিস্কুটে ঠোক্কর লাগাচ্ছে। আমার চোখের পলক পড়ছে না। শরীরের গিঁট আলগা হয়ে আসছে। একটি মৃত্যু। এর ঘাতক আমরাই... কী চমৎকার, বিস্কুটের লোভ দেখিয়ে, ফুসলে...।

ক্রমাগত ঝিমিয়ে পড়ছে তেলাপোকা দুটো। তবুও বিস্কুটটা ছাড়ছে না। রানুর অত ক্ষুধা... কেউ যদি তাকে ডেকে একটা চমৎকার বাখরখানির লোভ দেখিয়ে, কিংবা একটা জিলিপি, বিষ মেশানো, ক্ষুধার্ত রানু চকচক করে উঠছে... মুখ বাড়িয়ে দিচ্ছে। আমার রগের ভেতর হিমস্রোত বইতে শুরু করে। আমি কান্না হারিয়ে ফেলি।

ঝিমুতে ঝিমুতে দুটো তেলাপোকাই উল্টে গেল। আমার মধ্যে অদ্ভুত এক অনুভবের গাঢ়তা। মাকে বড় নিষ্ঠুর মনে হয়। মনে হয় একদিন বিস্কুট খাইয়ে মা আমাদেরকে যদি এইভাবে মেরে ফেলেন? এরকম সংসারে মজুমদার ছাড়া বাঁচার আর রাস্তা কী? কিন্তু মজুমদারকে দেখে রানু যে একশো হাত দূরে। সমস্যার সমাধান আর হয় না। বহুবার সে বহু প্রলোভনে রানুকে কাছে ডেকেছে। জন্মের পর থেকেই সে কাছে এলেই রানু চিৎকার করে ওঠে। এই নিয়ে প্রথমে ধমক, শেষে বাবা কয়েকদিন মেরেওছেন রানুকে। কেননা রানুর এই ভয়ের মুখে মজুমদারের চেহারার কঠোর ভাব বাবার নজর এড়ায় নি। মজুমদার কখনো রানুর ওপর বীতস্পৃহ হোক, তার জন্য রানুর ওপর নেমে আসুক কোনো অলৌকিক শাস্তি— বাবা ভয় পেতেন। মজুমদার যেন বাবাকে সম্মোহন করে রেখেছিল। আমি মন্ত্র, ধোঁয়া এসব দেখে একবার ভয়ে পালিয়ে এসেছিলাম। মন্টুও খুব ছোট। মা তাই আমাকে আবার একা পাঠালেন দৈত্যটার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আসতে।

নিজের ভারি পা দুটো টেনে নিয়ে আবারো আমি হাফবিল্ডিংয়ের দোর গোড়ায়। পুরো শরীর থরথর করে কাঁপছে। চারপাশে রাত নেমে এসেছে। ভেজানো দরজায় উঁকি দিয়ে দেখি, মেঝেতে শুয়ে আছে মজুমদার। আমার পায়ের শব্দে ভূতের মতোন তাকায়। ইশারা করে ডাকে, হেই... এদিকে আয়...। ভয়ে ভয়ে এগিয়ে যাই।

তারপর জানতে চায়, কত ?

আমি বলি, তিরিশ টাকা। খুব সহজ মানুষের মতো সে উঠে ড্রয়ার খুলতে থাকে। ঘরের সেই আবহাওয়া এখন উধাও। সহজ আলোয় আমিও কেমন রেশমগুটির ভাঁজ ভেঙে ঝরঝরে হয়ে উঠি। বলি, আচ্ছা বিছানা ছেড়ে আপনি নিচে ঘুমোন কেন ? সে উত্তর না দিয়ে আমার দিকে টাকা বাড়িয়ে দেয়। তারপর গমগমে গলায় জিগ্যেস করে, তোর বাপ এখনো ফেরে নি ? আমি অস্ফুটে উচ্চারণ করি, না।

তারপর নিস্তব্ধতা। ভয়ে ভয়ে বেরিয়ে আসার জন্য পা বাড়াচ্ছি হঠাৎ ঘরের বাতি নিভে যায়। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে পুরো ঘর ডুবে গেলে আমি চিৎকার করার জন্য হাঁ করি। কিন্তু আমার অবশ হয়ে আসা শরীরের ভেতর থেকে কোনো শব্দ বেরোয় না। টের পাই আমার বিস্তারিত পায়ের সামনে অর্গল এবং তারপরই অকস্মাৎ পেছনে থেকে আমাকে জাপটে ধরে মজুমদার। সব জানালা বন্ধ। ঘুটঘুটে অন্ধকারের ভেতরে আমার ভারশূন্য দেহটি সে শূন্যে উঠিয়ে ফেলে। আমার বুকের সবটুকু জল চুমুক দিয়ে শুষে নিল যেন কেউ। কাকুতি-মিনতি করব, তার কোনো উপায় নেই, কেননা আমার কথা বলার শক্তি লোপ পেয়ে গেছে। কিছু বুঝে উঠবার আগেই সে আমাকে সেই অন্ধকারে প্রথমে দু'হাত ওপরে তোলা অবস্থাতেই চক্কর খাওয়ায়। আমার মনে হয় নিচে গভীর গহ্বর। দৈত্য রাজার তর্জনীর ওপর আমার শরীরখানা টলমল করছে। এই বুঝি পড়ে গেলাম... এই বুঝি... ভীষণ উঁচু পাহাড়ের অমসৃণ গায়ে ধাক্কা খেতে-খেতে আমার দেহটা ছিন্নভিন্ন হয়ে তলিয়ে যাচ্ছে। আচমকা আমাকে সে ধপাস করে মাটির ওপর নামায়। গরমে দু'কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। পেট উগরে বমি আসছে। তারপর কী হবে ? ভয়ে-উত্তেজনায় আমার মৃতপ্রায় অবস্থা। আচমকা বাতি জ্বলে ওঠে। দরদর করে ঘামছে মজুমদার। ঘামে, আঠায় মারাত্মক হয়ে উঠেছে তার চেহারা। চারপাশে কেমন অস্পষ্ট লাগছে। মনে হলো এই চক্করের মধ্যে পড়ে আমার মাথার ঘিলু কচলে গেছে। কিছুক্ষণ এভাবে যায়। পরক্ষণেই শুরু হয় তার হা-হা হাসি। সে হাসির কী বিকট শব্দ। মনে হলো পুরো হাফবিল্ডিংটা থরথর করে কাঁপছে। দাঁতহীন মাঢ়ির নিচে তার লম্বা লাল জিবখানা ধাক্কা খেয়ে বেরোচ্ছে, ফের ভেতরে ঢুকছে। এক সময় যেন কাতুকুতু দিচ্ছে কেউ, এমন ভঙ্গিতে আঁকাবাঁকা হয়ে হাসতে হাসতে প্রশ্ন করে, খুব ভয় পেয়েছিলি, না ?

আমি বোবার মতো ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে আছি তার দিকে। ঠাণ্ডা, বাকস্তব্ধ।

সন্ধ্যায় আরেকবার তুই এসেছিলি না ? মজা করার ভঙ্গিতে খিক্ খিক্ করে সে হাসে। ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়ি, হ্যাঁ।

তারপর পালিয়ে গেলি কেন ?

আমি নিরুত্তর।

কেন পালিয়ে গেলি, ভয়ে ? ভয়ানক কঠিন তার কণ্ঠস্বর। ধীরে মাথা নাড়ি, হ্যাঁ।

কী দেখে ভয় পেয়েছিলি ? আমার চেহারা ?

কাঁপতে কাঁপতে বলি, জানি না।

আমার চেহারা খুব বিদ্‌ঘুটে?

না।

ফের মিথ্যে বলছিস? রানু আমার চেহারা দেখে ভয় পায়, না? আচমকা এই প্রশ্নে আমি ঘাবড়ে যাই, সহসা উত্তর খুঁজে পাই না। আমাকে সজোরে ঝাঁকুনি দেয় সে, বল ও আমার চেহারাকে ভয় পায় কিনা?

হ্যাঁ।

এবার কী এক ক্রুদ্ধতায় সমস্ত ঘরে সে চক্কর খেতে থাকে। তাকে যেন অদ্ভুত এক জান্তব খেলায় ধরেছে! চক্কর খাওয়া শেষে আমার দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকায়, তোকে একটা জিনিস দেখাই— বলতে বলতে কাপড়ের পুঁটলি খুলে সে একটা বেড়ালের মৃতদেহ বের করে আনে। তার ফোলা শরীরে আঠার মতো রক্ত। আমার নাকের সামনে সেটাকে সে ঝুলিয়ে ধরে আমাকে প্রশ্ন করে, ভয় পাচ্ছিস? ভয়ে আবারো আমার রক্ত দই। আর সে বলতে থাকে, বদজিনদের আমি হত্যা করি পশু হত্যা করে। রানুর ওপর জিন আছর করেছে। আমি তন্নতন্ন করে সেই জিনটাকে খুঁজছি, প্রত্যেকটা প্রাণীর ভেতর। আমি নিশ্চয়ই তার সন্ধান পাব। মজুমদার পরাজিত হবে? ছোঃ।

বেড়াল মারলে বদজিন মরে যাবে? আবার বোকার মতো প্রশ্ন করে নিঃসাড় দাঁড়িয়ে থাকি।

শুধু বেড়াল না। আরো জীবজন্তু, যেমন ধর, পাখি, খরগোশ, কুকুর... এদের মধ্যে খারাপ জিনগুলো বাস করে। তাও সব কুকুর, বেড়াল না, তাদের চেহারা দেখলেই আমি বুঝতে পারি।

কিন্তু রানুর বদজিনটা ঠিক কার ভেতর?

ও একটা স্ফুলিঙ্গ। ওর মতো আগুন আমি দুনিয়ায় দেখি নি। ওর জিন যার-তার দেহে থাকবে না।

কী অবাস্তব বিদ্‌ঘুটে সব কাণ্ড। লোকটা কি পাগল হয়ে যাচ্ছে? সে হঠাৎ চোখ বোজে। আবারো বিড়বিড় করে। কিছুক্ষণ পর চোখ মেলে নাকের সামনে বেড়ালটা দোলাতে দোলাতে আবার তার সেই হাসি শুরু হয়। এবার আমি সত্যি সত্যি কেঁদে ফেলি, আমি বাসায় যাব। কেন ভয় দেখাচ্ছেন আমাকে?

রানুর জিনটা... বিড়বিড় করে সে, তোর বাপকে বলেছি, তবলিগে যাওয়ার আগে সে বিশেষভাবে এই দায়িত্বটা দিয়ে গেছে। হারামির বাচ্চাটাকে খুঁজে বের করতে চেষ্টার তাই বিরাম নেই। রানুর প্রতি আমার অন্যরকম এক মায়া আছে, বুঝলি। আমি বেঁচে থাকতে বদজিনটাকে ছেড়ে দেব না।

বাবা এসব জানেন? আমার বিস্ময় তখন চরমে।

তাহলে কী বলিস? মুরুব্বি মানুষের অনুরোধ, নইলে শুধু মায়ার জন্য এমন রাম খাটুনি কেউ খাটে? প্রাণীর পর প্রাণী হত্যা করতে হচ্ছে, কেমন কঠিন ব্যাপার তাহলে বুঝে নে!

এবার আমি সত্যিই চিন্তিত, পুরো ব্যাপারটা খেলো কিছু নয়। কেবল আমিই এসবের গুরুত্ব বুঝতে পারছি না। তবুও ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করি, রানুর বদজিন যদি হাতির পেটে

থাকে ? খামোকা বেড়াল, পাখি মারছেন। শুনে খেপে ওঠে সে, হাতি কি লোকালয়ে থাকে ? বেশি পাকামো আমার সহ্য হয় না। তুই তো বেশ চালাক। মিছেই ভয়ের ভান করছিস। শোন, রাতে স্বপ্নে দেখেছি, শূন্য বোতল নিয়ে আমি ঘুরছি। এই স্বপ্নের অর্থ আমি গরিব ঘরের বৌ পাব। তুই রানুকে বোঝাবি। আমি ওকে পছন্দ করি। আমি ওর মঙ্গল চাই।

আমি বাসায় যাব, গলায় কান্না আটকে আবার মিনতি করি।

যা না, আমি কি বাধা দিয়েছি তোকে ? খেঁকিয়ে ওঠে সে। পায়ে এক পৃথিবীর চাপ নিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে দরজার কাছে যাই। আমার গলায় দম আটকে থাকে। এই বুঝি পেছন থেকে থাবা দিল কেউ, এই বুঝি আমার দেহটা শূন্যে উঠে গেল।

পা-পা করে বেরিয়ে রাস্তায় নেমেই দৌড়, দৌড়...।

বাসায় এসে মার কাছে টাকাগুলো দিয়ে আমি হাউমাউ কাঁদতে থাকি। মা ভীষণ ভয় পেয়ে যান, এত দেরি হলো কেন ? কোথাও গেলে খবর থাকে না। আমার কান্না ক্রমেই বাড়ছে।

মা কেমন ঠাণ্ডা হয়ে যান। আমাকে টেনে রান্নাঘরে নিয়ে ফিসফিস করে প্রশ্ন করেন, কী-রে, কাঁদছিস কেন ?

মিটসেফের ওপর থেকে তেলাপোকা ঝাঁপ দেয়, আমি নিরুত্তর।

মার কণ্ঠ আরো চাপা, তোকে খারাপ কিছু বলেছে ? কিছু বলছিস না যে ? মা'র প্রশ্নের মুখে আমার কান্নার বেগ আরো বেড়ে গেলে মা আমাকে ধাক্কা দিয়ে রান্নাঘরের একদম কোনায় নিয়ে যান। তারপর গলায় সন্তর্পণ গাঢ়তা এনে জিগ্যেস করেন, তোর কাপড় খুলেছিল ?

আমি মাথা নাড়ি, না।

খারাপ কোনো ইঙ্গিত দিয়েছে ?

না।

হাঁপ ছেড়ে মা শেষে রেগেই ওঠেন, তাহলে এভাবে কাঁদছিস কেন ?

আমি এবার অসংলগ্ন বলে যাই, মা, সে একটা বেড়াল মেরে ধুৎ, কী সব... অন্ধকারে আমাকে ওপরে তুলে... বলল, রানুর ওপর কী সব জিনে-টিনের আছর!

পীর-আওলিয়ার সাথে তার যোগাযোগ আছে, মা বললেন। ওইভাবে সে ধ্যান করে। তাই তো ভাবছিলাম, ওর স্বভাব-খারাপের কোনো কথা তো শুনি নি। রানুর ব্যাপার নিয়ে তোর বাবাই ওকে বলেছে। ওর নাকি বেশ ক্ষমতা আছে। যা চায়, তাই হয়ে যায়। আমি কেমন খেপে উঠি, লোকটা পুজোও করে, ঈদও করে, বাবা কী করে তাকে ভক্তির চোখে দেখে ? মা অলস ভঙ্গিতে ঠোঁট বাঁকান, কী জানি, তোর বাবা বলে এসব লোক সব ধর্মের উর্ধ্বে।

স্পষ্ট মনে পড়ে, ওই বয়সেও সেদিন চিৎকার করে প্রতিবাদ করেছিলাম, আমার বাবাও তবে ওর মতো ভণ্ড। মা আমাকে কষে চড় লাগিয়েছিলেন।

এই রকম আবহাওয়ায় আমরা যখন বড় হয়ে উঠছি, আমার চারপাশে বাবা তখন ক্রমেই ধর্মের দেয়াল তুলেছেন, ক্রমাগত রোজা-নামাজের উপকারিতার কথা বিশ্লেষণ

করছেন, বিধর্মীর শাস্তি নরকের দাউদাউ আগুনে জ্বলে-পুড়ে কেবলি খাক হওয়া— এই সব বলে বলে আমাদের মনে ধর্মের পবিত্র আবহাওয়া সৃষ্টির ও তার কাছে আরো গভীরভাবে আত্মসমর্পিত হওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। চাচাদের চাকরির সংস্থান হওয়ায় তারা তখন অন্যত্র। দিনভর সংসারের কাজ আর শূন্য বাড়িতে মাথা গুঁজে বসে থাকা। কতক্ষণ সহ্য হয় ? এমনিতেই চরে-বেড়ানো-মেয়ে আমি। রানুকে নিয়ে সিনেমা হলের পোস্টার দেখা, স্কুল ফাঁকি দিয়ে নদীর ধারে ঘুরে বেড়ানো, কালীপুজো হচ্ছে, কালীর লকলকে লম্বা জিব, ধোঁয়া উড়ছে, কালীর সহস্র মুণ্ড... ভীত চোখে তাকিয়ে আছি, এসব করে করে সময় পেরিয়ে যেত। আর ঘরে ফিরে এই টোটোমির জন্য বাবার হাতে রামধোলাই। তখন আমার ডানা গজাচ্ছে। ধর্মের সাধ্য আমার পায়ে শেকল পরায় ? কিন্তু বাবার কঠোর চোখের পাহারা, কী করে উড়ব ? অগত্যা তর্কে জড়াতাম। মরলে যদি এতই শাস্তি, তবে আল্লাহ দয়াবান কী করে হন ? কেন মেয়েরাই শুধু নিজেকে কাপড় দিয়ে ঢেকে পথ চলবে ? পুরুষের পর্দার ব্যবস্থা নেই কেন ? অসহিষ্ণু বাবা প্রথম প্রথম প্রশ্রয়ই দিতেন। ধর্মের প্রয়োজনে খোলামেলাই বলতেন, মেয়েরা উগ্র হয়ে চললে পুরুষরা কুপথে যায়। আমি বেশ সাহসী কণ্ঠে উচ্চারণ করতাম, পুরুষদের খালি গা দেখে যদি মেয়েরা কুপথে যায় ? আমার সেই প্রশ্নে ঘরে বজ্রপাত হতো। উত্তরে বাবার হাতের সজোরে বসানো থাপ্পড়। পুরুষ আর নারীর শরীর এক হলো ?

বেহেশতের হুরির বর্ণনার সময় বাবার চোখ জোড়া হতো দেখার মতো। সেই চোখে আমি ভয়াবহ দুর্বার লোভের ছায়া দেখতাম। কী করে ওই চোখের মানুষ মা'র মতো ক্ষীণাঙ্গীকে নিয়ে ইহজীবন পার করছেন, ভেবে অবাক হতাম। একদিন আরেকটি থাপ্পড়ের প্রত্যাশায় প্রশ্ন করি, অন্য ধর্মের লোকেরা বেহেশতে যাবে না ? বাবা কঠোর গলায় উত্তর দিলেন, না। আমার প্রশ্ন, কেন ? একটি শিশু জন্মেই তবে কেন মুসলমান হয় না ? শিশু তার চারপাশে যা দেখবে তাই শিখবে। এমন তো হতে পারে, আমিই ভুল ধর্মে জন্মেছি। কিন্তু আমি কি আমার বাবা-মা'র শেখানো চিন্তার বাইরে যেতে পারব ? রাগে-ক্রোধে বাবার কেঁদে ফেলার উপক্রম হয়। তিনি নিশ্চিত ধরে নেন, আমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছি। এর পেছনে মার আশ্কারাই বেশি। কিন্তু আমিই-বা এমন অমীমাংসিত উত্তরে কী করে স্থির থাকি ? প্রশ্ন করা চলবে না... একী এ ধরনের রেওয়াজ ? আসলে আমি তখন বাইরে ঘুরে পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক বুঝতে শিখছি। বাবার চরম অমতে ঢুকে গেছি এমন একটা সংগঠনে, যেখানে সবাই ছেলে। আমি আর রানুই শুধু মেয়ে। আবৃত্তি, বক্তৃতা সবই হতো সেখানে। চরম দারিদ্র্য, কষ্টের পাশাপাশি আমার জীবনের অদ্ভুত গোপন স্বাধীনতা। স্টেজে দাঁড়িয়ে 'লিচু চোর' কবিতা কীভাবে আবৃত্তি করতে হবে কর্মকর্তারা পরম যত্নে আমাকে বোঝাচ্ছেন। সার সার চোখ যখন আমাকে দেখবে, তারা কি ঘুণাক্ষরেও ভাববে, স্টেজে আবৃত্তিরত ওই মেয়েটি আটামিলের কর্মচারীকে একসের আটা ভাঙাতে গিয়ে কী রকম কাকুতি মিনতি করে থাকে। এদের টিনের ঘরে আসবাব বলতে দুটি ভাঙা চেয়ার, নড়বড়ে চৌকি, তোশকের পেট ফুঁড়ে বের হওয়া কালো হয়ে যাওয়া তুলো, একটা আলনা, ওয়াড়বিহীন বালিশ, থকথকে মেঝে ? এদের সর্বাঙ্গে তেলাপোকা হাঁটাহাঁটি করে ? তার সঙ্গে আমার তর্কের বহর দেখে বাবা নিশ্চিতই ধরে নেন বাইরে কোনো কম্যুনিস্টের সাথে আমার খাতির হয়েছে যে আমাকে বিভ্রান্ত করছে। আর তাই নিয়ে তার কী দুঃখ আর জেরা।

স্টেজে উঠে অহঙ্কারে, উত্তেজনায় ঘেমে উঠতাম। এসব ব্যাপারে রানুর কোনো উৎসাহ ছিল না। আমি যখন অনুষ্ঠান শেষে চরমভাবে উত্তেজিত, কাঁপছি...রানু কেমন হয়েছে বল তো ? রানু তখন শিল্পীদের মধ্যে বিতরণ করা লাড্ডু খাওয়ায় ব্যস্ত। ঠোঁট উল্টে কেবল বলত, এসব দেখলে আমার হাসি লাগে। খাবারের ব্যাপার না থাকলে আমি আসতামই না। ভীষণ মর্মাহত হয়ে চেপে ধরতাম ওকে, এতে হাসির কী আছে ? কী দেখলে তোর হাসি পায় ? রানুর গালভর্তি লাড্ডু, মুখের ওপর তির্যক হাসির আভা। এই যে, একটা কবিতা হাত নেড়ে নেড়ে বলা... শেষে রানু সত্যিই হাসতে শুরু করত। এত লোকজনের সামনে একজন দাঁড়িয়ে হাত নেড়েনুড়ে নানা ভঙ্গি করে যাচ্ছে। কাণ্ড!

আমার বুক ভেঙে যেত। কেন, যাতে আমার অপরিসীম আনন্দ, রানু, আমার এত কাছের রানুর কাছে সেটাই বিরক্তিকর ?

স্কুলে পড়তাম। অবশ্য সেখানে পড়াশোনার কোনো বালাই ছিল না। সারবদ্ধ ছাত্রীরা কেবল রিডিং পড়ে যাও। টিচার উলের বল মেঝের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে কাঁটা হাতে সোয়েটার বোনায় মগ্ন অথবা আমাদের কিছু লিখতে বলে দিব্যি চোখ বুজে ফেলেছেন। জঘন্য, একঘেয়ে সময়। আর কী করা, পেছনের বেঞ্চে বসে তখন খাতায় আঁকিবুঁকি কর। আঁকার নেশাটা আমার সেখান থেকেই। স্কুল ফাঁকি দিতাম ভীষণ। সংগঠনের বন্ধুদের সাথে হয় কোথাও ফুটবল খেলা দেখতে চলে যেতাম, নয়তো ধান্দায় থাকতাম কোথায় কার বিয়ে অথবা রাস্তায় মিছিলে শামিল হয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু সবশেষে বিট্রে করল রানুই। ও ওসবে যাবে না। কিছুতেই বুঝে পায় না ও এসবে ভালো লাগার কী আছে! প্রথমে ওকে অনেক বোঝালাম। শেষে একদিন রীতিমতো খেপেই উঠলাম, তুই তো শুধু খাবার আর কোথায় কী পাওয়া যায় এইসব বুঝিস, যা লোভী হচ্ছিস দিন দিন। এসব তোর ভালো লাগবে কেন ? খাবার পেলে তুই যা খুশি তাই করতে পারিস। বাবা পাশের ঘরে শুয়ে ছিলেন। রানু তাকে শুনিয়ে চেঁচিয়েই বলে ওঠে, তোমরা ছেলেদের সাথে কী করে বেড়াও, আমি জানি না বুঝি ? বলে দেব বাবাকে।

আমার মাথায় রক্ত চড়ে যায়, তোর মতো নাকি ? বলতে বলতে হামলে পড়ি ওর ওপর, তোর মতো আমি ? খাবার দেখলেই জিব লকলক করে, অসভ্য। এরপর যা হওয়ার হয়। বাবা উঠে আসেন। আমার পিঠে প্রহার বরাদ্দ হয় এবং শেষ রায় আরো কঠিন—জীবনের জন্য ওসব সংগঠনে যাওয়া বন্ধ। যদি যাই, তবে...। রানুর কারণে আমার চারপাশে প্রাচীর ওঠে। রানুর ওপর অভিমানে, কান্নায় দীর্ঘদিন ওর সাথে আমার কথা বন্ধ থাকে।

আবারো শুরু সেই দুঃসহ জীবনের। দিন চলতে থাকে সেই একতালে। এরি মধ্যে হঠাৎ ঘটে যায় অভাবিত একটা ঘটনা। প্রাইমারি পাশ করায় আমি তখন অন্য স্কুলে। সকালে স্কুলে গিয়ে রানু আর ফেরে না। সে সাধারণত স্কুলের বাইরে কোথাও যায় না। পুরো পাড়া তন্নতন্ন করে খোঁজার পর খোঁজ নেয়া হয় স্কুলে, আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে। না, কোথাও নেই রানু। সন্ধ্যায় ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়ি আমরা।

সিলেটে কী একটা বিশাল ওয়াজ মাহফিল, বাবা সেখানে গেছেন। শহরের আনাচে-কানাচে তখন মহাসমারোহপূর্ণ দুর্গাপূজার আসর। ভীত ফ্যাকাসে মা আমাকে ঠেলে পাঠিয়ে দেন, যা তো নীনা, একটু পূজামণ্ডপে খুঁজে আয়। রানুকে খোঁজার ছলে দশভুজা দর্শন! বিস্তৃত রেললাইন ধরে ছুটতে থাকি। আসমান জুড়ে কুয়াশায় ডুবন্ত চাঁদ। সেই আলোয়

ভিজতে ভিজতে এক একটা করে ব্যবধানে থাকা স্লিপার টপকাই। আমাদের বাড়ির কাছে যে মণ্ডপ, সেখানে প্রচণ্ড ভিড়। ধূপের গন্ধে পুরো পরিবেশ অদ্ভুত রকমের নেশালু! মাইকে কান ফাটিয়ে গান বাজছে। ভিড় ঠেলে ঠেলে ফাঁকফোঁকর গলিয়ে এগিয়ে যাই। লাল, নীল, লাইটে জমজমাট করে সাজানো হয়েছে পুরো প্যান্ডেল। আমার চোখ তন্নতন্ন খোঁজে রানুকে। এক সময় আমি সোজা মণ্ডপের সামনে গিয়ে দাঁড়াই। বাঁশ দিয়ে পুরোটা জায়গা ঘিরে দেয়া হয়েছে। ওপাশে বিভিন্ন পাত্রে সাজানো নানা রকম ফলমূল-তরমুজ, আপেল, কলা, আনারস...। তার ওপাশেই যেন রাজপুরী। দশহস্ত বিস্তার করে দেবী দুর্গার অপরূপ মূর্তি। চারপাশে আরো সারবদ্ধ মূর্তি। এই প্রথম আমি নিজের চেহারা নিয়ে ভাবনায় মগ্ন হই। এবং রানুর সৌন্দর্যের কাছে আমার চেহারার ম্লানিমাটা টের পাই। কেমন কষ্ট লাগে। দশভুজার সামনে সেই প্রথম রানু এবং আমার দূরত্ব আবিষ্কার করা। কী আশ্চর্য, আমি যেন ঘোরে পড়ে গেছি। রানু কোথায়? সামনের সৌন্দর্য আমাকে টেনে ধরেছে। থোকা থোকা ফলের গন্ধও এমন মর্মান্তিক মধুর হতে পারে? রানু যদি এতগুলো ফল এক সাথে দেখত? ফিরে যাব, হঠাৎ দেখি ঢোল বাজানো শুরু হয়ে গেছে। একটা কুঁজোমতো লোক ধিনাক ধিনাক শুরু করতেই বাকি ঢুলি যেন ফূর্তি পায়। এবং তারপরই বৃত্তাকারে মেয়ে-পুরুষের একটা বড় দল পাখির পালক মাথায় গুঁজে নাচতে শুরু করে। মাটির পাত্র থেকে সাপের দেহের মতো কুণ্ডুলী পাকিয়ে উঠছে ধোঁয়া। মুহূর্তে আমি আমার সমস্ত পৃথিবী সম্পর্কে বিস্মৃত হয়ে পড়ি।

হঠাৎ টের পাই পেছন থেকে আমার হাত ধরে টানছে কেউ। ঘোরের মধ্যেই পেছন ফিরে তাকাই। এই ছেলেটিকে এর আগেও আমি এখানে দেখেছি। কী যেন নাম? ধোঁয়ায় ঘোর লেগে যাচ্ছে! হ্যাঁ মনে পড়েছে, অজয়! সে কানের কাছে ফিসফিস করে, মজা দেখবে এসো। আরো মজা? ভিড় ঠেলে মোহগ্রস্তের মতো বাইরে বেরিয়ে আসি। সে আমাকে টানতে টানতে প্যান্ডেলের কোনায় নিয়ে যায় আর তর্জনী তুলে দেখায়— রক্তমাখা মুখে একটি কালো মোটা ভয়ঙ্কর লোকের হাসি। সে হাসছে বিরামহীন হা-হা। পুরো পূর্ণিমা রাত এই দৃশ্যে ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। ঢকঢক করে গলায় ঢালছে পাঁঠার রক্ত। তার মুখ, বুক আর ভুঁড়ি চুইয়ে নিচের দিকে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। ভয়ে আমি চোখ বন্ধ করে ফেলি—

এই বুঝি মজা হলো? অজয়ের দিকে প্রশ্নবোধক চোখে তাকাই। ভীষণ নিষ্ঠুর মনে হয় ছেলেটিকে।

ভয় পাচ্ছ? জানতে চায় সে। এত চমৎকার একটি ছেলে আমাকে এতটা গুরুত্ব দিচ্ছে, আমি কেমন অভিভূত হয়ে পড়ি। সে আমার কম্পিত হাত ধরে টানে— আসল মজা তো এখনো দেখই নি। ভিড় ঠেলে আমাকে সে এক সময় পুজোমণ্ডপের পেছনে নির্জনে নিয়ে যায়। আবছা আলো-ছায়ায় প্রথমে সে আমার বুকে হাত রাখে। এরকম অভিজ্ঞতা এই প্রথম। বয়ঃসন্ধির স্তন বড় মারাত্মক, মনে হয়, বিষপিণ্ড বয়ে বেড়াচ্ছি। তাই সে স্পর্শে প্রথমে মনে হয় যন্ত্রণায় প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে কিন্তু পরক্ষণেই অলৌকিক এক সুখানুভূতি সারা দেহে যেন আগুন ধরিয়ে দেয়। আমার কম্পিত ঠোঁটের ওপর নেমে আসে তার মুখ। পৃথিবীর চারপাশে তখন ছায়া ছাড়া আর কিছুই থাকে না। এমন এক বোধ। এমন এক ঢেউ! ওর মুখে বিচিত্র গন্ধ! কেমন গা ঘুলোচ্ছে। পাশাপাশি কী এক অমোঘ অবশতা আর ক্লান্তিতে

ঘুম পায়। কিন্তু চুম্বনদাতার অস্থিরতাও কম ছিল না। তাড়াতাড়ি আমার হাতে এতটা আধুলি গুঁজে দিয়ে ভিড়ের মধ্যে সে উধাও হয়ে যায়।

এ তো মহামজা! পুরো বিষয়টা বুঝতে আমার কিছুটা সময় যায়। একটি চুমু ? স্রেফ একটি চুমু, আর কিছু না ? আর তার জন্য আস্ত একটা আধুলি ? শরীরে স্পর্শের সুখ শুধু টের পেয়েছি। কিন্তু অন্য একটা লোক তার মুখ আমার মুখে ডুবিয়ে দেবে ? ঘেন্না নেই ওর ? এ আবার কেমন মজা ? স্রেফ থুথু ভরে যাওয়া ছাড়া ? কুয়াশা-ভেজা প্রেতচন্দ্রের বয়স বাড়ে। এখন আধুলিটাই বিস্ময়। আধুলিটাই আনন্দ। সামনে বিস্তৃত আলোকিত রেললাইন। আমি নাচতে নাচতে বাড়ির পথ ধরি। কুয়াশাভেজা আলোর স্পর্শে আমার ঠোঁট জোড়া ভিজে ওঠে। কিন্তু পরক্ষণেই অবসাদ। নিস্তব্ধ রাত নেমেছে। রানু কি বাসায় ফিরেছে ?

বাসায় যেতেই মা উদ্‌ভ্রান্তের মতো দৌড়ে আসেন, পেলি ? অপরাধবোধ, লজ্জায় পরক্ষণেই আমি জমে যাই। মা আমার রাস্তার দিকে এইভাবে চেয়ে ছিলেন ?

আর রানু ? ফেরে নি তাহলে ?

রাত বাড়ছে। রানু ফেরে না। বাড়ন্ত মেয়ে, প্রতিবেশীদের ভয়ে মার পক্ষে কিছু বলাও সম্ভব হচ্ছে না। পুরো পাড়া ঘুমিয়ে পড়েছে। রানু ফেরে না। মধ্যরাত, বিছানায় পড়ে অঝোরে কেঁদে চলেছেন মা। রানু ফেরে না। আমার চোখে রানুর সেই মুখ..... পুঁটলিতে গম....উত্তপ্ত পথ। লাল হয়ে উঠছে রানু, কাঁদছে।

হাঁটুতে মুখ গুঁজি। অবিশ্রান্ত কান্নার মধ্যে দিয়ে এক সময় সকাল হয়। মা এত ভালোবাসেন রানুকে ? আমিও যদি কোথাও যাই ? অনেক অনেক দূরে ? মা এইভাবে কাঁদবেন ? যদি অজয় আমাকে বিয়ে করে ? আমাকে সন্ধ্যার সেই অলৌকিক দুর্গা বানিয়ে দেয় ? মার ভালোবাসা প্রকাশের ব্যাপারটা এত গরিব কেন ?

বিছানার সাথে লেপ্টে আছেন মা। ঘরে রাতের কিছু ভাত ছিল। ভাজার জন্য আমি শিথিল হাতে পেঁপে কুটছি, হঠাৎ কাঁপা আঙুল দার ওপর পড়তেই রক্তে আঙুল ভিজে ওঠে। আর সেই আঙুল জিবে ছোঁয়াতে যাব, ঠিক তখুনি দরজায় রানু। উস্কো চুল, রাতজাগা চোখ! আমি দা ফেলে প্রায় চিৎকার করে উঠি। মা লাফ দিয়ে দিয়ে বিছানায় উঠে বসেন। ওকে জড়িয়ে ধরে আমি ঘরে আনি, কোথায় ছিলি তুই ?

অদ্ভুত চোখে রানু আমার দিকে তাকায় শুধু, কিছু বলে না। আমি উত্তেজনায় খেই হারাতে শুরু করি, মৃত্যুর দশা হয়েছিল আমাদের, কোথায় ছিলি, রানু নিঃশব্দে বসে থাকে। কোমর থেকে দ্রুত বের করে ওকে আধুলিটা দিয়ে দিই। আমি রীতিমতো হাঁপাতে থাকি, তোকে কত খুঁজলাম। পুরো পুজোর প্যান্ডেল, কী সুন্দর নাচ, অজয়দা... ধুৎ...। কোথায় ছিলি তুই ? আমি তো ভয়ে শেষ, ভেবেছি জীবনেও আর তোকে দেখব না।

রানুকে কেমন শান্ত অবসন্ন লাগছে। বেশ অচেনা মানুষের মতো বিছানায় গিয়ে শোয়। আমাদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে। একটি শব্দও উচ্চারণ করে না। মা কত কাঁদল, আমিও, আশ্চর্য, কথা বলছিস না কেন তুই ? এবার মার পালা। অবিশ্রান্তভাবে রানুকে ঝাঁকুনি দিতে দিতে তিনি বলেন, বল কোথায় ছিলি ? বড় হচ্ছিস না ? মাথায় বুদ্ধি নেই ? বল...। বল, বল... মা কান্না শুরু করেন। সেই প্রথম রানু আমার কাছে অচেনা হয়ে ওঠে।

সারাদিন অঘোরে ঘুমনোর পর সন্ধ্যায় রানুর ঘুম ভাঙলে আমি প্রায় আছড়ে পড়ি ওর ওপর। ওর চুলে হাত রাখি, আঙুল ফুটিয়ে দিই। পুজোর গল্প করি। অবশ্য রানুকেও সেই প্রথম একটা অধ্যায় লুকনোর প্রয়োজন পড়ে। অজয়ের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে সবটুকু গল্প বলি। জানিস রানু এত ফল এত...। বিরক্ত বোধ করে সে। বালিশ আঁকড়ে চোখ বোজে। রানু আমাকে বাদ দিয়ে একলা একটি রাত কোথায় কাটিয়ে এলো? কৌতূহলে, কষ্টে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছিল। রানু এত বড় হয়ে উঠল কবে? এত রহস্যময়ী? ওর পাশে স্থির হয়ে থাকি। রাত বাড়ে। ছেঁড়া বালিশ ফুঁড়ে তুলো বের হয়ে রানুর চুল শাদা করে দিচ্ছে। সস্নেহে ওর মাথা থেকে তুলো সরাই। আকুল হয়ে প্রশ্ন করি, কোথায় ছিলি রানু, আমাকে বলবি না? বাইরে হাওয়া। টিনের চালে তুমুল হাওয়ার শন্‌শন্‌। তার একটু পরই বৃষ্টি পড়তে শুরু করে। স্নায়বিক চাপের প্রাবল্যে আমার দমবন্ধ অবস্থা। ক্রমেই তলিয়ে যেতে থাকি। চমৎকার বৃষ্টির ঠাণ্ডায় ঘুম নামছে চোখে। ফিসফিস করি... লক্ষ্মী রানু...। রানু কি একটা আস্ত রূপকথার বই চাপা দিয়ে রাখছে?

অনেক রাতে আমাকে শূন্য থেকে ধপাস ফেলে দিয়ে রানু বলে, আমি মজুমদারের ঘরে ছিলাম।

কো-থা-য়? কী বলছে আমি সহসা বুঝে উঠতে পারি না।

বললামই তো, রানু বিকারহীন। দেখো, মাকে আবার বলো না যেন। অবশ্য বললেই-বা কী! আমি কারো ধার ধারি নাকি?

না না, কিন্তু তুই... আমি কাঁপতে কাঁপতে শুরু করি, এত ভয় পেতি ওকে...। রানু, তুই পাগল হয়ে গেছিস? সারারাত ওই ভয়াবহ রাক্ষসের পাশে? কী করে?

রানু নিশ্চুপ। অসম্ভব তাচ্ছিল্য ভরে শাদা দেয়ালের দিকে চেয়ে থাকে। সারারাত ওখানে ছিলি? আর্তকণ্ঠে ফিসফিস করি। তোকে কিছু করে নি? রানু চুপ।

তোকে, মানে (মার ভাষায় বলি) তোর সাথে খারাপ কাজ করেছে?

না। রানু ঠাণ্ডা গলায় বলে, ও আমার বাবা-মার চেয়ে অনেক ভালো।

কী বলছিস তুই, কিছু করে নি? বিস্ময়-ছোঁয়া গলায় আবার প্রায় চেঁচিয়ে উঠি। সারারাত তবে কী করলি?

রানু আমাকে উন্মাদ উদ্‌ভ্রান্ত করে দিয়ে ফের চুপ হয়ে যায়। সারারাত ঘুম হয় না। রানুও জেগে আছে টের পাই। কিন্তু কী আজব এই বিপন্নতা, কেউ এগোতে পারছি না। এক সময় রানু আমাকে একজন পরিণত মানুষের মতো দেয়ালে ঠেস দিয়ে ধরে বলে, শুনতে চাও কী হয়েছিল? আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারব?

আমি অস্ফুটে বলি... তবুও। রানু বলতে শুরু করে, সন্ধ্যায় ওর বাড়ির সামনে দিয়ে মুদির দোকানে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ টের পাই, পেছন থেকে কেউ আমাকে জাপটে ধরেছে। চেয়ে দেখি মজুমদার। মাগো, কী শক্তি! আমাকে একটানে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে প্রথমে সে দরজা বন্ধ করে আমাকে চ্যাচাতে নিষেধ করে। তারপর কী কী সব বলে আমার মুখে ফুঁ দেয়। আমি যেন কেমন অবশ হয়ে যেতে থাকি। আমাকে সেই অবস্থায় তালা দিয়ে রেখে সে বাইরে যায়। কিছুক্ষণ পর বিরাট একটা বাক্স নিয়ে আসে। তুমি না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবে না। এত যে খাবার মিষ্টি, ফল, বিরানি...। আমার সামনে ওগুলো সাজিয়ে

আমাকে খেতে আদেশ করে। আমি তখনো ভয়ে কাঁপছি। এত খাবার এক সাথে? আমার তখন পাগল হবার মতো অবস্থা। আমি খেতে শুরু করি, আর সে শুরু করে গল্প। এত আজব গল্প জানে লোকটা! আমি যেন কেমন হয়ে যাই। তাকিয়ে থাকি তার দিকে। রানু থামে। আমি বাকরুদ্ধ হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকি। আবারো সে শুরু করে, এরপর ধ্যানে বসে সে। মাঝরাত অবধি আমাকে বসিয়ে রেখে ধ্যান করে। আবার খাওয়া, আবার গল্প, শুনবে কী কী সব গল্প? আমার স্তম্ভিত অবস্থা দেখে রানু থেমে যায়, লোকটা খুব ভালো, জানো আপা?

বাবা যদি জানেন? বোকার মতো প্রশ্ন করি।

বাবা তো আমার সব দায়িত্ব ওর ওপর ছেড়ে দিয়েছেন, রানু বলল, বদজিন ছাড়ানোর জন্যে। আমার ওপর নাকি খারাপ জিন আছর করেছে। সেজন্য আমি মনমরা থাকি, আমার শুধু খিদে লাগে। বলতে বলতে ঘুমে ঝিমিয়ে পড়তে থাকে রানু।

বাবার প্রতি ঘেন্নায় বিষিয়ে উঠি। আমার কেমন কান্না পেতে থাকে। রানু, লোকটা ভালো না, তোকে সে এইভাবে বশ্ করে ফেলল? ওকে তোর ভালো লাগল? রানু আমার কথা শোনে না। নিজেই যেন বিড়বিড় করছে, এমন গলায় বলে, কত কথা বলল আমাকে, তার নিজের জীবনের কষ্টের কথা। আমি কি ছাই এত বুঝি? বলল, একদিন ভূমিকম্প হবে, সব তলিয়ে যাবে। বিল্ডিং তোলার সময় একরাতে তাকে কোনো পীর স্বপ্নে নির্দেশ দিয়েছে, সে যেন পুরো বিল্ডিং না বানায়। তাহলে মাথার ওপর তিনতলা ভেঙে পড়বে আর সে মারা যাবে। দ্যাখো না, সে জন্যই সে খাটের নিচে ঘুমোয় ছাদ ভেঙে যাতে তার বুকের ওপর না পড়ে। একটা ছেলে হয় নি বলে তার কত দুঃখ। আমি স্বপ্নে কী কী দেখি সব সে জানে।

পাগল! আস্ত পাগল! আমি চেঁচিয়ে উঠি। তুই আর কোনো দিন ওর ওখানে যাবি না।

আপা, আমাকে সে বলেছে, ভূমিকম্প হলে সে আমাকে রক্ষা করবে। তার সে ক্ষমতা আছে। আমাকে এত ভালোবাসে লোকটা। আমার জন্য সে বেড়াল, খরগোশ, কুকুরছানাকে ইনজেকশন পুশ করে মেরেছে। ধ্যান করার সময় লোকটা হাউমাউ করে কাঁদছিল— আমি ওকে এতদিন ঘেন্না করতাম ভেবে আমার এত কষ্ট হচ্ছিল। লোকটা অসম্ভব দুঃখী, আমরা ওকে চিনতাম না।

রানুকে তাহলে কিনে নিয়েছে মজুমদার। সারারাত বিছানায় ছটফট করি। বাবা-মা-ভাইবোনের প্রতি সেই থেকেই আমার বিন্দু বিন্দু ঘৃণার শুরু। রানু পরদিন থেকে সত্যি সত্যি বদলে যায়। আমাকে সে এড়াতে শুরু করে। নিত্য নতুন পোশাকে আবৃত, মোহিত রানু কেমন প্রাণবন্ত, হাসি-খুশি হয়ে উঠতে থাকে। ওর এইসব বিচিত্র পোশাক দেখে ঈর্ষায় বিষিয়ে উঠতে থাকি। পাশাপাশি যন্ত্রণায়। ইতোমধ্যে মজুমদারের ওপর বাবা-মার নির্ভরতা আরো চার গুণ বেড়েছে। কেননা, সে রানুর ওপর আছর করা জিনকে তাড়িয়েছে। রানুও প্রাণবন্ত, মিশুক হয়ে উঠেছে। ওকে দেয়া পোশাক, সুস্বাদু খাবার-দাবার— এসব কিছুকেই তারা রানুর প্রতি মজুমদারের পরম স্নেহের উপহার হিসেবে গ্রহণ করেছেন। বাবাকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে, বাবা, এখন কোথায় তোমার ধর্ম? এবং সব শেষে আমি একা। কাগজে আঁকিবুঁকি করি। তুলিতে রঙ চড়াই। ভালো লাগে না। শুরু হয় আমার অবসন্ন, ছন্নছাড়া দিন। এখন বুঝি, তখন পর্যন্ত আমি শৈশবে ছিলাম, জীবনের টানাপোড়েন কখনো আমাকে আমার বয়সের অনুভবগুলো উপভোগ করতে দেয় নি। শৈশবেই নিজেকে মনে হয়েছে

জীবনের পোড়-খাওয়া যোদ্ধা নারী। কিন্তু এক সময় আমার দেহের একটা পরিবর্তন সত্যিই আমার জীবনে আক্ষরিক একটা পরিবর্তন ঘটায়। এত অসহায়, এত বিপন্ন নিজেকে আমার আর কখনো মনে হয় নি।

আমি জানতাম মেয়েদের এসব হয়। কোনো যন্ত্রণা নয়, ব্যথা নয়, হঠাৎ করেই হয়ে যায়। কিন্তু এর বাস্তব রূপটা সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই ছিল না।

ক'দিন ধরে টানা জ্বর। এসবের মধ্যেই শরীরের মধ্যে কী এক তাপ অনুভব করি। বাইরের টানাহ্যাঁচড়ায় আমি ছিলাম ক্লান্ত। আর তারই সঙ্গে যোগ হয় দেহের বিপন্নতা। বিছানায় কাঁচুমাচু শুয়ে রাতেরবেলা কেবল কাঁদতাম। এমন কেউ আমার জীবনে ছিল না, যে এসে আমার মাথায় হাত রাখলে আমি একবিন্দু নির্ভরতা পাব। সেই বয়সেই, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মনে পড়ে, অজয়ের ঘটনার পর যখন শৈশব যাই যাই করছে, আমি আমার দূরাত্মীয় পুরুষদের নানা রকম চেহারা দেখতে শুরু করেছি, বাসায় অতিথি এলে ছোট বলে হয়তো তাদের কারো সাথে আমাকে শুতে পাঠিয়ে দিলেন মা। মাঝরাতে সেই মানুষের গভীর নিশ্বাস হিংস্র হতে থাকলে পালাতে গিয়ে শুনতে পেতাম অদ্ভুত সব শব্দ, কাউকে বললে লাশ ফেলে দেব।

অন্য ঘরের মেঝেতে বসে হাঁপাতে থাকতাম। কাউকে বলা হতো না। নিজেকে এভাবে বাঁচাতে বাঁচাতে একরাতে স্বপ্নে দেখি আমাকে পিছু ধাওয়া করে দৌড়চ্ছে কিছু পুরুষ। সে কী সুদূর বিশাল পথ! কিছুতেই আমার পা চলে না, আমি টাল খেয়ে পড়ি, ফের দাঁড়াই। পুরুষগুলো চলে যায়। মাঝ রাস্তায় পড়ে আছি, হঠাৎ দেখি অজয়... আশ্চর্য! ওকে দেখেই এমন তরঙ্গ ওঠে, কী কোমল স্পর্শ ওর... এক ঘোর রোমাঞ্চ থেকে জেগে ওঠার পর, খুব ভোরে দেখি, আমার হাফপ্যান্টে রক্ত। আমি কেমন বোকা আর হতবাক হয়ে যাই। সারা শরীরে জ্বরের ছোঁয়া। অদ্ভুত ভয় হয়, বারবার পরীক্ষা করি, কোথাও কেটেছে কিনা! না, এই চল গভীর পাতাল থেকে উঠে আসা। আমার হাত-পা কাঁপতে থাকে, মনে হয়, কোনো ঘোর অন্যায় করে ফেলেছি। কেমন দিশেহারা, অসহায় বোধ করি। কোথাও কোনো ব্যথা নেই, যন্ত্রণা নেই, দীর্ঘদিন পর মাকে বড় আপন মনে হয়।

কাপড় তৈরির কায়দা শেখাতে শেখাতে মা অনেক কিছু বলেন, আগের মতো আর স্বাধীন দিন নেই আমার। আচারআচরণে আমাকে বদলাতে হবে... ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমার বুক হু-হু করে। চোখ উপচে জল আসে। সব শেষে মা ফিসফিস করেন, সাবধানে থাকিস। এখন কেউ তোকে কিছু করলে পেটে বাচ্চা এসে যাবে।

কিছু করলে মানে ? আমি আবারো দিশেহারা। এত সহজে কথাগুলো বলছেন মা। তিনি কি ধারণা করেন, আগে কেউ কিছু করতে পারে আমাকে ? আর অজয় ? সে যদি আমাকে আবার চুমু খায় ? অথবা সেই চুমুটি সে যদি এখন খেত, আমার বাচ্চা হয়ে যেত ?

অদ্ভুত এক বিভ্রান্তিময় দিন শুরু হয়। আমার তো রানু ছাড়া সেই অর্থে কোনো বান্ধবী নেই। কার কাছে এত সব জানাব ?

রানুও তো এখন দূরের। কী অসম্ভব যন্ত্রণায় একঘেয়ে দিন পেরিয়ে যেতে থাকে ক্রমাগত।

হেই রন্জু!— নীলক্ষেতের কাছে ফুটপাত ধরে রন্জুকে হাঁটতে দেখে বাসের জানলার কাছে বসেই চিৎকার করে উঠি। সে নির্বিকার হাঁটছে দেখে আবারো চিৎকার, রন্জু... এই...।

আচমকা মাথা ঘোরায় সে। কেন্নো কিলবিল ভিড়ে আমাকে খুঁজে পায় না। জানালা দিয়ে লম্বা হাত বাড়াই, এই যে,...।

আমাকে দেখে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সে। এবং জরুরি ভঙ্গিতে হাত নাড়ে, নেমে এসো। সামনের প্রচণ্ড ভিড়ের দিকে ওর দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করি, নামতেটামতে পারব না, তোমার খবর বলো।

নেমেই এসো না, খবর আছে— ওর এই রকম অনুরোধে আমি একটু বেকায়দায় পড়ে যাই। অস্বীকার করতে পারব না রেজাউলের সাথে বিচ্ছিন্ন হবার পর সত্যজিৎ, রন্জু আর সালাহ্‌দিনের অসম্ভব আন্তরিক সহযোগিতার কথা। ওদের চমৎকার সান্নিধ্যের কথা। তিনজনের নিবিড় আন্তরিক সহমর্মিতা না থাকলে সে সময় কোন স্রোতের টানে কোথায় ভেসে যেতাম, কে জানে!

আসলেই কি ভেসে যেতাম ? এমন চরম বিপর্যয় তো আমার জীবনে আরো এসেছে। সেসব বিপর্যয়ের বেশির ভাগ সময়ই চারপাশে কেউ থাকে নি, তখন কি ভেসে গেছি ? অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, আমার সঙ্কট-দুর্যোগের সেইসব দিনে যারা আর্থিক-মানসিক সহযোগিতা দিয়েছে, ভেঙে-পড়ার মুহূর্তে বন্ধুর মতো সাহস যুগিয়েছে আর এইভাবে আমাকে পথ চলতে প্রেরণা যুগিয়েছে, তাদের সংখ্যা আঙুলে গোনা হলেও তাদের কাছে আমি ঋণী নই।

কাল সারারাত এবং আজ সারাদিন অফিসে আমি ডুবে ছিলাম সেই অতীতের ভেতর, যার খোঁয়াড়ে ঢুকতে চাই না পারতপক্ষে। কিন্তু কী যে হচ্ছে, সারাক্ষণ মগজে কুটকুট কামড়ে চলেছে পোকা। কত ঘটনার সমাবেশ। ওসবে ঢুকতে না চাইলেও বাধ্য হতে হচ্ছি। কখনো হয়তো জরুরি ফাইল নাড়তে-নাড়তে আচমকা মনে হলো, আমাদের সেই পারিবারিক জীবনে ইরফান চাচা ঠিক কোথায় ছিলেন ? ফাইলের কাগজটা খুঁজে পাওয়ার পর দেখা গেল প্রশ্নবোধক সেই স্মৃতির কথাটা বেমালুম ভুলে বসে আছি। সুলতানার কাছে আরো কিছু টাকা ধার চাই।

সুলতানা নিজেও খুব স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে নেই। পরদিন বেতন হবে। সে-ও তার পারিবারিক সমস্যা আর শূন্য হাতের কাসুন্দি ঘাঁটে। এসব কিছুকে এখন আমার কাসুন্দিই মনে হয়। একঘেয়ে, চরম রকমের। গা বাঁচিয়ে থাকতে চাই। কিন্তু পারি কি ? বাধ্য হয়ে সব শুনি, শোনার ভান করে মাথা নাড়ি, অথচ মগজে পোকা হাঁটে নিঃশব্দে— আমার দু'জন চাচা, সে সময় তারা কোথায় ছিলেন ? এখন তারা কোথায় ? মেজো চাচা ভালো চাকুরি পেয়ে বন্দরনগরীতে। তাদের কেউ কি বড় ভাইয়ের বিন্দুমাত্র ঋণ শোধ করেছেন ?

বুক ঠাণ্ডা হয়ে আসে। হাত-পা'র গিঁট আলগা হয়ে যায়। চোখের সামনে ফরফর পাক খায় লাল-নীল লেজার। খটখট টাইপের শব্দ, ক্রমেই বাড়ছে। যেন কঙ্কালের হাড়ে বাতাস লেগেছে, এমনই মড়মড়। এসব শব্দ থেকে বাঁচতে চাই, কঙ্কালের অদৃশ্য হাড় থেকে তীক্ষ্ণ আঙুল বেরিয়ে এসে সেটা আমার বুক ফুঁড়ে ভেতরে ঢোকে। ক্ষত মুখে কাদামাটি চেপে

ধরি। অনেক কাক, এক সাথে চিৎকার করছে। 'দি বার্ডস'-এর সেই দস্যু পাখি, অসম্ভব চিৎকারে ছুটে আসছে, আমি উদ্‌ভ্রান্তের মতো দৌড়াচ্ছি। দৌড়াতে দৌড়াতে হোঁচট... কাক আমার পা খেয়ে চলে গেছে। মাথা চেপে ধরি। টেবিলের কঠিন কাঠে ঠেসে ধরি নিজেকে।

তোমার শরীর খারাপ ? সুলতানা ঝুঁকে পড়ে। তারপর রুমাল দিয়ে সে দ্রুত তার ঠোঁটের ওপরের ঘাম পাফ্ করতে শুরু করে। পরমুহূর্তে কী ভেবে টেবিল থেকে ব্যাগ এনে ক্রমাগত হাতড়ায়— এই নাও আরো দু'শো। কাল তো বেতন পাচ্ছই।

আর রেজাউল ? আমার জীবনে তার উপস্থিতি কতটা জমজমাট ? কোন পর্যায়ে আমাকে কতটুকু আলোড়িত করে তার প্রবেশ ঘটেছিল ? তারও আগে ? আমি কি আর কাউকে ভালোবাসতাম ? তাকে ঘিরে আমার স্বপ্নের রূপটা ঠিক কেমন ছিল ? আসলে কি আমার কোনো স্বপ্ন ছিল ? এত চরিত্র! চরিত্রের এত বিচিত্রতা! ভাবতে গেলে খেই হারিয়ে ফেলি। অবসাদে নুয়ে আসতে থাকি। কী অস্বাভাবিক বিমূর্ত এক ছবির ভেতর থেকে একটা আকৃতি নিয়ে বেরিয়ে আসে তার মুখ! সেই আর্টিস্ট, তার পাতলা দেহ, চোখ, মুখ আত্মার বিস্তৃতি ... আমি তার কতটুকু চিনেছিলাম ? আমার এই জীর্ণক্লিষ্ট প্রাণে এখন কতটা ব্যাপক তার ছায়া ? সুলতানা, অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। আমি টাকাগুলো ব্যাগে ভরতে গিয়ে নিজেকে সেই মহাচক্র থেকে টেনে তুলি। আসলে বেতন পাওয়ার পর শুরু হয় এত হা-হা চাহিদা, ফলে সেটা পাওয়ার আনন্দ কোনোদিনই পাই নি। আগে থেকেই খরচের হিসেবটা ঠিক করা থাকে।

তুমি এ মাসে দুশো টাকাই শোধ কর, সুলতানার সস্নেহ স্বর, আসলে আমাদের কারোর সমস্যা কারো চেয়ে কম নয়। মাঝে-মাঝে আমার নিজেরই এত বিশ্রী লাগে! আগের দুশো সুবিধে মতো শোধ করো, অস্থির হয়ো না।

বাস থেকে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে আধাসেদ্ধ আমি ফুটপাতে নেমে আসি। রন্‌জুর ওপর খেপেই উঠি প্রায়— এর পর বাসায় যাওয়ার রিকশা ভাড়া দিও। আমি আর কুস্তি করে বাসে উঠতে পারব না।

কত টাকা চাই তোমার ? রন্‌জুর কণ্ঠ গম্ভীর হয়ে ওঠে।

কী ব্যাপার, একবার ছ্যাঁকা খেয়ে পকেট কাটতে শুরু করেছ নাকি ?

আরে না না... এইবার সে হেসে ফেলে, ওটা তো আরো পরের অধ্যায়। অত দূর যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে নি এখনো। ঝিমন্ত বিকেল। বাস,লরি, ট্রাকের উর্ধ্বশ্বাসে চলাচল। লাল বাতি জ্বলছে, সবুজ বাতি নিভছে, হলুদ বাতি, ট্রাফিকের সুতীক্ষ্ণ বাঁশির ফুঁ... ইউরেকা... মাথার মধ্যে পাতানো স্টেডিয়াম, ফুটবল খেলা শুরু হয়। আমাদের পরিবারে ইরফান চাচাকে নিয়ে তিক্ততার একদিনের স্মৃতি মনে পড়ে যায়। আমি তখন সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়েছি। একদিন প্রোগ্রাম শেষ করে ফিরতে সন্ধ্যা পেরিয়ে গিয়েছিল। বাসায় এসে দেখি যুদ্ধ লেগে গেছে। বাবা হম্বিতম্বি করে গলা চড়াচ্ছেন। এত যে ক্ষীণকণ্ঠী মা, তারো গলা শীর্ষগ্রামে। আমার বিস্ময় থার্মোমিটারের একশো পাঁচে। দরজার সামনের ছড়ানো বালুতে পা ঠেসে যাচ্ছে, স্পষ্ট মনে পড়ছে সব, বাবা বলছেন, দেখতে হবে না কার মেয়ে ? মা'র চরিত্রেরই কোনো ঠিক নাই...।

কী বলতে চাও তুমি ? আমি আগেও লক্ষ করেছি, এই একটি প্রসঙ্গেই মা মারমুখি। বাবা টের পেয়ে সেই সুযোগটাই নিতেন বেশি। এতই যদি চরিত্র খারাপ জানতে, তবে বিয়ে করেছিলে কেন ? তখন তো পাগল হয়ে উঠেছিলে।

পাগল হয়ে উঠেছিলাম! বাবা দাঁতে দাঁত পিষেন, কী অমন রূপ তোমার! দয়া করেছিলাম, দয়া। নইলে একজনের ছুঁড়ে ফেলা উচ্ছিষ্টকে অন্যজন তুলে নেয় ?

এই তোমার দয়ার নমুনা ? মা হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করেন। বিয়ের পর থেকে বাঁদি-দাসীর মতো খাটছি, একটা দিন ভালো করে দু'টো কথা বলেছ ? মা মোটেই যুক্তির পেছনে পাল্টা যুক্তি দিতে জানতেন না। বাবার এরকম কুৎসিত ব্যবহার চরমে উঠলে তিনি দস্তুর মতো পরাজয় বরণ করতেন, অনেকটা শানুর মতো করে। তাঁর পরাজয়ের নমুনাও ছিল সাধারণ। সবশেষে কেবল বলতেন, আল্লাহ তো সব দেখছেন, তিনিই এর বিচার করবেন।

আমার কাছে এ ব্যাপারটাই ছিল সব থেকে বেশি অসহ্য। এ জীবনে মা'র চোখে প্রচুর জল দেখেছি। বাবার স্নেহ কি কোনোদিন পাই নি ? যেহেতু বাবা, স্নেহ ছিল না বিশ্বাস করি কী করে ? কিন্তু অনুভব করেছি কখনো ? তন্নতন্ন করে খুঁজতে থাকি— প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয়, তৃতীয়... সবগুলো পৃষ্ঠা তছনছ করি। বাবাকে ঘিরে আমার জীবনে কোনো নাজুক মুহূর্ত নেই ?

কী ব্যাপার ? ঝিম মেরে গেলে কেন ? রন্‌জু আমাকে ধাক্কা দেয়। চলো হাঁটি...।

খাড়া ফুটপাত ধরে দু'জন হাঁটতে থাকি। শুকনো বিকেল জুড়ে ধুলোর তোলপাড়। পা থেকে মাথা একাকার তার প্রলেপে। দুটো আধন্যাংটা ছেলে সাঁ... রাস্তা পার হয়। ওদের কানের পাশটা পিষে দৈত্য গাড়ি ছুটে যায়। আমি ফের ভাবনায় ডুবতে যাব, রন্‌জু রাস্তার পাশের হকারের কাছ থেকে পত্রিকা তুলে নেয়। হেডিংয়ে দ্রুত চোখ বুলিয়ে বলে, নীনা, বিশ্বযুদ্ধ লেগেই যাবে মনে হচ্ছে। আমি তল থেকে উঠি, তোমার মনে হচ্ছে ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে ? ফুটপাতের ধুলোর মধ্যে বসে পড়ে রন্‌জু। বলে, সাদ্দাম, যাই বলো— বাপের ব্যাটা। ওর চোখ-মুখ পত্রিকার পাতালে হারিয়ে গেলে আমি অবাক হয়ে বলি, তুমি তার এইসব সাপোর্ট করছ ?

তবে কি বুশ ব্যাটার পক্ষে যাব ?

না, না, আমি সেকথা বলছি না।

তাহলে কী বলতে চাইছ ?

সাদ্দাম তো আর মগের মুল্লুক পায় নি যে, মন যা চাইল, হুট করে তাই করে ফেলবে। একটা দেশ দখল করা চাট্টিখানি কথা নয়। এখন ঠ্যালা সামলাও। ও ব্যাটার মার্কিনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর শক্তি আছে ?

আমার কথা রন্‌জুর কানের গর্তে সেঁধোয় না। কানের লতি ছুঁতে পারে বলেও মনে হয় না। কী হয়, গলা ছেড়ে পত্রিকার মূল হেডিং আর খবর পড়তে শুরু করে— 'ইরাকের আকাশে ঝাঁক ঝাঁক বিমান... মার্কিন বাহিনী প্রস্তুত, ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর এত মার্কিন রণসজ্জা আর হয় নি...। আমি বিরক্তবোধ করতে থাকলেও ওর এই সশব্দ পত্রিকা পাঠে কৌতূহল বোধ করে কেউ কেউ। ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে যায় ফুটপাতের বারোয়ারি লোকজন।

সোৎসাহে তারা রন্জুকে বলতে থাকে, পড়েন ভাই, আরো জোরে জোরে পড়েন। ও একটু পড়তেই, ভিড় থেকে একজন খিস্তি ঝেড়ে বসে, তাও আবার ছড়ার ছন্দে— কেউ বলে সাদ্দাম শাবাশ, এইদিকে আমাদের পোঁদে বাঁশ। ছড়া শুনে হা-হা হেসে ওঠে কেউ। আবার কেউ খেঁকিয়ে ওঠে, মুখ খারাপ করেন ক্যান ? ছড়া-বলিয়ে লোকটা এবার ঝাড়া গলায় বলতে থাকে, মুখ খারাপ করব না মানে, সাদ্দাম কুয়েত দখল করল, আর আমাদের দেশে জিনিসপত্রের দাম হু-হু করে বেড়ে গেল! অন্য একজন বলে, রাত আটটার পর মার্কেট বন্ধ রাখতে হবে। বিদ্যুৎ, তেল— সবকিছুর ঘাটতি দেখা দিয়েছে। বিজনেস এখন চাঙ্গে...। সবাইকে ছাপিয়ে আরেকজনের গলা, যাই কন ভাই, যুদ্ধের ফলে কিন্তু আমাগো সরকারের লাভই হইছে। তার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলতেছিল, তার অর্ধেক শক্তি সাদ্দাম নিয়া গ্যাছে।

এইসব যখন চলতে থাকে এবং বেশ জমাট বাধার উপক্রম, আমি তখন রন্জুকে টেনে উঠাই। উঠে দাঁড়িয়ে ও পেপারখানা উপস্থিত লোকজনের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে আমার হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে উপসাগর এলাকা পেরিয়ে আসে, নীনা আমার ভালো লাগছে বেশ। ব্যবসাটার ফাঁড়াটা সম্ভবত কাটিয়ে উঠছি।

নখ খুঁটতে খুঁটতে প্রশ্ন করি, কীভাবে ?

সত্যজিতের সোর্সে একজন পার্টনার জুটে গেছে। দু'জনে পার্টনারশিপে বিজনেস করব। জাতে বাঙালি তো, তুষের আগুনের মধ্যে ডুবিয়ে রাখলেও মরব না।

তোমার পরিচিত সেই পার্টনার ?

বললাম তো সত্যজিতের সোর্সে। পরিচিত ছিল না, এখন হয়েছে। অসম্ভব ফর্সা, কোঁকড়া চুলের রন্জুকে বাতাস ধূসরিত করে তুলছে। তার ওপর বাসা বাঁধছে হলদেটে রোদ। ফুটপাতের শেষ মাথায় এসে দাঁড়াই। সামনে খোলা চৌরাস্তা। অসংখ্য বিজ্ঞাপন, চারদিকে বিচিত্র সব ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। অপর পাশে লাইন ধরে কসমেটিক, বেকারি, গার্মেন্টস, পোশাকের দোকান। গন্ধ আসছে, অদূরেই কাঁচাবাজার। প্রচণ্ড ভিড়। আচমকাই পারম্পর্যহীনভাবে ভেবে বসি, আমার দেহটি কেউ যদি খাড়া বাঁশের ওপর চৌরাস্তায় স্থাপন করে ? ধুৎ!

শোনো, আমি আমার স্বল্প অভিজ্ঞতায় মুরব্বিআনা ফলাই— পার্টনারশিপ বিজনেস খুব ঝুঁকির ব্যাপার। টাকা খুব বাজে জিনিস। তোমাকে নতুন করে কী বোঝাব, খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যেও এই সব বিজনেসের ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে খুনোখুনি হয়ে যায়। আর তুমি বলছ সদ্য পরিচিত, আমি কিন্তু ঠিক ভরসা পাচ্ছি না।

ব্যাপারটা নিয়ে আমি যে ভাবি নি তা নয়, রন্জু বলে, কিন্তু ধাক্কা খেয়ে আমিও শক্ত হয়ে গেছি। কোনো শালা আমার পাছায় লাথি দিতে আসলে আমিও তার শরীরের মেইন সেন্টারের সব কলকব্জা ঢিলে করে দেব।

আমার কণ্ঠ অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে, সেই তো গোলমালের মধ্যেই যাওয়া হলো।

নীনা, তুমি আমাদের বাসায় যাবে ? রন্জু জানতে চায়। ওসব হিসেবের গ্যাঁড়াকলে আর পা দিতে চাই না। তোমার সাথে দেখা হলো কোথায় দুটো মিষ্টি মধুর কথা বলব, চল আমার বাসায় চল।

হঠাৎ ?

এমনিতেই। রন্‌জু এরপর অসংলগ্ন কথা বলতে শুরু করে, তুমি কি বিয়েটিয়ে করবে না ? এইভাবেই জীবন কাটাবে ?

বিয়ে করব না কখনো বলেছি ? অদ্ভুত রহস্যময় হয়ে ওঠে আমার হাসি, তুমি আমাকে বিয়ে করবে ?

রন্‌জু প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেলেও নিজেকে সামলে নিয়ে হাসতে শুরু করে, আগের বিয়েটা করেই না মুশকিলে ফেলেছ। ফাদার স্ট্রেট রাস্তা দেখিয়ে দেবে। এমনিতেই তো নানাভাবে ফেঁসে...।

দু'জন তখন রাস্তার বাতাস খাব, এইবার আমি হাসতে শুরু করি, ওপরে থাকবে আ-কা-শ, তলায় জমিন!

তুমি শালা আরেকটু সুন্দর হলে সালাহ্‌দিনের সাথে ভিড়িয়ে দিতাম। হাঁদাটার আবার মেয়েদের গায়ের রঙ ফর্সা হলে তাদের ভেতরের নাটবল্টু না থাকলেও চলে। গবেট তো, চামড়াটাই সব। এই নিয়ে করবে সাহিত্য!

তুমি ওর দিকে আমাকে ঠেলতে চাইছ কেন ? আমার বাতাস খাওয়ার প্রস্তাবটা পছন্দ হলো না ?

সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে ইয়ার্কি করো না— রন্‌জু ক্রমশ গম্ভীর হয়ে ওঠে, আমি নিজেও বেশ ইয়ার্কি করে ফেলেছি। নীনা, তুমি কিছু মনে করো না।

হাঁটতে হাঁটতে টের পাই, আরেফিনের হোস্টেলের সামনে এসে পড়েছি, হঠাৎ করেই হুঁশ ফিরে আসে। কোনো রকম আগাম চিন্তা ছাড়াই রন্‌জুকে হঠাৎ বলি, তুমি আমাকে কিছু টাকা ধার দিতে পারবে ?

কত টাকা ?

আমি তোমার অবস্থা জানি, হঠাৎ ভেতরে খুঁতখুঁতি শুরু হয়... তোমার পক্ষে যতটা সম্ভব। দূর! হঠাৎ করে চেয়ে বসলাম! এখন খারাপ লাগছে।

ভদ্রতা করো না, রন্‌জু পরিস্থিতি সহজ করে দেয়, হাজার খানেক হলে চলবে ?

না, না অত না, তোমার এমন অসুবিধের সময়...।

আবার তো শুরু করছি, সে বলে, ঝুঁকি না নিলে শাইন করা যায় না। যেখানে লাখখানেক টাকা গচ্চা দিয়েছি, সেখানে এক হাজার টাকা, ফুঃ! কাল তোমার অফিসে দিয়ে আসব।

রন্‌জুকে বিদায় দিয়ে বিস্তৃত পথ ধরে সোজা আরেফিনের হোস্টেলে। টানা বারান্দায় অতঃপর হেঁটে দরজায় নক করা। একজন ঘুমোচ্ছিল— দরজা খুলে ঘুম জড়ানো কণ্ঠেই জানাল, আরেফিন বাড়ি চলে গেছে।

রাস্তায় নেমে আমার নিজের সাথে নতুন যুদ্ধের শুরু— টাকাশূন্য অবস্থায়, আমাকে কিছু না বলেই সে বাড়ি চলে গেল ? আমি নিশ্চয়ই তেমন রূঢ় কোনো আচরণ করি নি ? রাগে, ক্ষোভে গলা রুদ্ধ হয়ে আসে। ওর আত্মসম্মানবোধ এত টনটনে হয়েছে ? আর এই জিনিসটাই কি-না বিকোতে বিকোতে আমি প্রায় শূন্যে নামিয়ে এনেছি নিজেকে। আসলেই আমি এদের কাছের কেউ না। এরা আমাকে তাদের নিজেদের যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই ব্যবহার করছে। এরা হাড়-মাংস শুষে নেবার পর আমার কঙ্কালের ওপর দাঁড়িয়ে

ঠিক একদিন ডুগডুগি বাজাবে। আমি এইরকম স্বার্থপর ভালোবাসার জন্য নিজেকে আর কত খোয়াব ? পরক্ষণেই স্নায়ু টানটান হয়ে ওঠে, বাবার কি শরীর খুব খারাপ, এখনো তবে মরে যাচ্ছেন না কেন ?

আয় আয় ঘুম আয়... রাতে বিছানা পেতে নিজেকে শোয়াই। মাথার নিচে বালিশ দিয়ে দিই... চুলে হাত বুলিয়ে দিই... ঘুমোও... নীনা ঘুমোও... কী যেন গানটা ? এক বছর হাইস্কুলে গার্লস গাইড করেছিলাম... কে যেন শিখিয়েছিল ? সারিবদ্ধ মেয়েরা...শাদা ড্রেস, তার ওপর ভাঁজ করা সবুজ ওড়না, নৌকা বাইছি এমন অঙ্গ ভঙ্গি করে গাইতাম... চল্ চল্ চলরে নৌকা বেয়ে যাই, রো রো রো ইউর বোট, জেন্টেল ডাউন দি স্ট্রিম। সুরটা কেমন ? যেন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হচ্ছে এমনই গুঞ্জন! সরে যায় ছবি, সরে যায় গান, এগিয়ে আসে মহিম। বটতলায় পেইন্টিংয়ের একটা আনাড়ি প্রদর্শনী ছিল তার। কিছু বিচ্ছিন্ন লোক জমেছিল। তার একটা ছবির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম। বৃষ্টিতে ভিজছে নতমুখী একটা মেয়ে। সাবজেক্টটা এমন আহামরি কিছু ছিল না। কিন্তু তার ভেতর এমন নির্মলতা... বৃষ্টির জল দেখে মনে হচ্ছিল, ছুঁয়ে দিলে মেয়েটার গাল থেকে টুপ করে খসে পড়বে। আমার অবাধ তর্জনী বারবার ধাবিত হতে চাইছিল গালের সেই জলের দিকে। নতুন শিল্পী, ডাঁট রাখতে পারে নি, নিজেই চলে এসেছিল আমার কাছে। আপনার পছন্দ হয়েছে ?

কিছু হয় নি বলে ছেলেমানুষী তাচ্ছিল্যে অগ্রাহ্য করব ভাবছি, চোখ পড়ে অবয়বে। অবিন্যস্ত চুল। বিনীত ভঙ্গি...সেই থেকে সূত্রপাত। তারপর পায়ে পায়ে হাঁটিয়াছি কত পথ... উড়িয়াছি কত আকাশে...ভাসিয়াছি কত সমুদ্রে...সেই ছেলেটি এখন কোন্ দূরতম দেশে ? আমার জীবনে সে এক অপূর্ব প্রেম এসেছিল। কীভাবে প্রহর যায়, টের পাই না। ওর কনিষ্ঠ আঙুল ঠোঁটে তুলে নিতাম, স্বপ্নের মধ্যে কবিতার মতো করে বলতাম, মহিম, আমাকে তুমি অতিক্রম করে যাও। এই জ্যোতিষ্ক, এই আলো, এই চক্রাকার স্রোত, এই নিঃঝুম বিষ আমি সহ্য করতে পারছি না। তারপর ? তারপর তার সাথে রিকশায় শহরতলীর কত পথ চলিয়াছি, থামিয়াছি, ভাবিত হইয়াছি, পুনরায় চলিয়াছি। সে কি ছিল নিছক এক ছটফটে বয়সের মোহ সুগন্ধির মৌজ ? প্রশ্ন করতাম নিজেকে। তার স্পর্শ ছিল মৃত্যুর মতো। তার নিঃশ্বাসের শব্দে ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতাম। কী ছিল সেটা ? সে আমার খাতায় লিখেছিল, তোমার হাতে ইতোমধ্যে যে কয়েক ফোঁটা রক্ত ছিটিয়ে দিয়েছি, পৃথিবীতে তেমন সাবান নেই, যা দিয়ে তুমি এর দাগ তুলে ফেলবে। হাত যদি কেটে ফেলো, তবু তার নোনা গন্ধ তোমাকে ছাড়বে না। এসবই কি ছিল স্তুতি ? মিথ্যে ছিল ? মনে পড়ে, লাইব্রেরিতে জীবনের প্রথম সে চুম্বনের প্রস্তাব রাখল। কী এক ঘোরে সমর্পিত হওয়ার পর ছিটকে যাই। অজয়ের কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে, তার দেয়া আধুলির কথা। ছিঃ ছিঃ ছিঃ কী অসম্মানের ব্যাপার ছিল সেটা। তারপর মহিম, মাতাল-করা মহিম। আমি হাত ঢোকাই কামিজের তলায়। বিপন্ন ভঙ্গিতে পিছু হটতে থাকি। তোমাকে আঙুলের স্পর্শও দেব না... ভীষণ খারাপ এসব...। সে বলত, নীনা, ঐ আঙুলের ডগা ভেদ করে চলে গেছে আমার সুচের মতো চোখ। তন্নতন্ন করে ঘুরে এসেছে তোমার শরীরের তীর্থে। এখন সে আঙুলে ঠুলি পরালেও আমার ভ্রমণচিহ্ন ঢাকা যাবে না। আমাকে এসব সে বলত বড় বেদনাতুর, বড় গভীর কণ্ঠে। আমি কাঁদতাম... কেউ আমাকে এভাবে গুরুত্ব দেয় নি। মহিম, তুমি যদি আমাকে ফেলে যাও, আমার

ক্রন্দনময় রাত, রেললাইন, প্রকৃতি তোমাকে ক্ষমা করবে না। আমাকে তখন উন্মাদ-প্রায় করে তুলেছিল ওকে হারানোর ভয়, কেননা, আমার পাশ ঘেঁসে বসলেও কেবলই মনে হতো আমার পাশে সে নেই। আমার হাতে হাত রাখত, গভীর স্বরে কথা বলত, কিন্তু মনে হতো তার সামনে আমার ছায়া স্পষ্ট নয়। কী অসহ্য বেদনা আমার! সে ছিল আমার তুলনায় অনেক পরিণত। সেই বয়সে আমার এই অনুভবও অপরিণত ছিল না, আমি তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মাটির দশভুজা ছিলাম মাত্র, সে আমাকে আশ্রয় করে পুজো করত আমার পেছনের প্রাণাধিক দেবতার। আমি তা আবিষ্কার করি দীর্ঘদিন পর।

'আমি ভালোবাসি মেঘ... চলিষ্ণুমেঘ... ওই উঁচুতে ওই উঁচুতে... আমি ভালোবাসি আশ্চর্য মেঘদল'... এসব প্রসঙ্গ থাক নীনা। চলো অন্য প্রসঙ্গে যাই...। কিন্তু ওই যে আমার বাবার ঘর। প্যারালাইজ্‌ড্ বাবা পড়ে আছেন...। আমি দেখছি হাতল-ভাঙা চেয়ারে এসে বসেছে সেই যুবক। কী করে আমি এই প্রসঙ্গের ঘোর চক্র থেকে বেরোই ? হারিকেনের ধূসর আলো মাঝখানে রেখে ওই তো আমরা সেই ঘরে বসেছি। নিঃশব্দে, অনেকক্ষণ। কেউ কিছু বলতে পারছি না।

রানু বলত, কী এক ঢ্যাঙা মিনমিনে পুরুষ, ও আমার হাত ধরলে ঘেন্নায় মরে যাব। তুমি ওর সাথে সম্পর্ক করেছ ? তোমার যা রুচি! ওকে ঘিরে রানুর এসব মন্তব্যে আমার কান্না পেত। সুন্দর কী জিনিস রানু তা জানে না, এমন মনে হতো। ঘুমোও নীনা ঘুমোও, দেয়াল বেয়ে টিকটিকি উঠছে। বাতি জ্বলছে ঘরময়। একটি টিকটিকি, দুটো টিকটিকি... তিনটি টিকটিকি... বাল্বের চারপাশে অসংখ্য পোকা, একটি পোকা, দুইটি পোকা... ওমা! মেঝের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে ও আবার কে আসছে ? পাকিয়ে-ওঠা কুয়াশা আর ধোঁয়া ফুঁড়ে, মাথায় শিং ? ঘাড় উঠাই। ধীরে ধীরে সরে যায় সব। পুরো ফাঁকা মগজের ওপর একটি শিশু হামাগুড়ি দেয়। ক্রমশ বড় হতে হতে ঘর জুড়ে দাঁড়ায় সে। একটি শিশু... একটি শিশু... একটিই...। ওকে আমি কোলে তুলে নিই। মাড়ি দিয়ে ও স্তন চেপে ধরে। যন্ত্রণায় ছটফট করে ছাড়িয়ে নিই। এবং তারপরই সেই অবিনাশী চিৎকার। দুধের ভারে স্ফীত স্তন টনটনে যন্ত্রণায় কাতর। যেন বিষফোঁড়া...। সেফ্‌টিপিনের ডগা দিয়ে মুখ ছুটিয়ে দিই। বোবা স্তনের মুখ খুলছে না, ভেতরে থই থই শাদা ভাষা, কী যন্ত্রণা! তোর দাঁত নেই কেন রে বাচ্চা ? ছিঁড়ে ফেল! সেফটিপিনের ডগায় বিষাক্ত স্তন রক্তবমি উগরে দিতে থাকে। ডাক্তার ছুটে আসে, এ-কী করছেন আপনি! রানু, তোর যখন বিয়ে হবে, কত পোলাও...। ওই তো আটামিল... আরেকটু হাঁট, আরেকটু...। কী অসহ্য শিশুর চিৎকার! বিছানায় ছটফট করি, শিশুটিকে ছুঁড়ে দিই শূন্যে। আজ ওর কপালে শাদা শিং ? আশ্চর্য! নিজের সন্তানের মুখ এত অপরূপ, এত মায়াময় ? আমি যার চক্র থেকে কিছুতেই আর বেরুতে পারি না ?

পিলপিল করে সেই শিশুটি আঁচলের তলায় ঢুকে যায়। লম্বা নখ দিয়ে পেট আঁচড়ায়, ওর গায়ে কী চমৎকার দুধের গন্ধ। যেন সদ্য দোয়ানো হয়েছে। তুলতুলে শিশুটাকে চেপে ধরি বুকের সাথে। টের পাই, ওর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। ছেড়ে দিই। তারপরই চিৎকার। কান চেপে ধরি। হাসপাতালের প্যাসেজ ধরে দৌড়াই। বন্ধ হোক! বন্ধ হোক এই মৃত্যুময় কান্না। আর এখন! মধ্যরাতে কান খাড়া করি— কোথায় চিৎকার! কোথায় সেই কান্না! আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় অস্থির, উন্মাদ, তৃষ্ণার্ত হয়ে ওঠে। চিল, ও চিল তুমি কি আমার শিশুর কান্না দিতে পার ?

না।

খরগোশ, ও খরখোশ তুমি কি...?

না।

মৃগেল, ও মৃগেল মাছ...।

না।

বাতি নেভাই। ঘুটঘুটে অন্ধকারে দু'কান চেপে বিছানার ওপর হামলে পড়ি। আচ্ছা, ছোট চাচা গলায় দড়ি দিয়েছিল কেন? অমন লোহার মতো কটকটে মানুষটা! ধুৎ তার চেয়ে নাচি, কী চৌকস ঘাঘরা, রাত্তিরে বেরিয়েছি সিনডারেলা! হায়! আমার জুতো কই? ধুৎ!

নীনা, ওই দ্যাখো ঢাকা স্টেডিয়াম। ওই হলো যাদুঘর, ওইটা শিশুপার্ক। বাঁ পাশে? পুরনো রেডিও স্টেশন।

ওইটা নিউমার্কেট...নীনা, সব শেষে রামপুরা টিভি ভবন। ঘুমোও নীনা, ঘুমোও। রাত বাড়ছে, ঘুমোও।

এইভাবে দিন যায়। একঘেয়ে তরঙ্গহীন, প্রতি মুহূর্তের সাথে মর্মান্তিক অর্থ-যুদ্ধের ভেতর দিয়ে। এর মধ্যে একদিন বিকেলে হঠাৎ রেজাউল আমার অফিসে আসে। অফিসের গ্যাঞ্জাম-ট্যাঞ্জাম, প্রতিবাদ-ট্রতিবাদ কেমন ঝিমিয়ে এসেছে। কী অদ্ভুতভাবে এরা দপ্ করে জ্বলে ওঠে; আবার একসময় তেলহীন সলতের মতো এদের দপ করে নিভে যেতেও সময় লাগে না। সেদিন যথারীতি আমি আমার টেবিলে। বড়ুয়া বাবু তার টেবিল ছেড়ে আমার মুখোমুখি বসে বেশ অনেকক্ষণ, কী বলব, সংসারের প্যাচপ্যাচে পাঁচালি গাইলেন। এই হাস্যকর মানুষটার রিডে চাপ দিলে কখনোই অন্য কোনো সুর নয়, কেবলি একঘেয়ে সা-রে-গা-মা বাজে। এইরকম মুহূর্তগুলোই আমার কাছে সব চাইতে অসহ্যকর। খেলাধুলোয় আমার আগ্রহ নেই, তারপরও রোজার মিলার সর্বোচ্চ ক'টি গোল করেছে, ম্যারাডোনার বস্তির পরিবেশ কেমন ছিল, এসব নিয়ে ঝেড়ে যাও আধ ঘণ্টা, কিংবা ফিল্মের খবর, বছরে যা একটিও দেখা হয় না— বোম্বের শাবানা আজমীর সাথে আমাদের শাবানাকে মিশিয়ে দাও স্মিতা পাতিলের চেয়ে ববিতা কম কিসে— এইরকম হযবরল দাবি তুলে কচলে যাও ঘণ্টাখানেক, শুনব, মন দিয়েই শুনব, মাঝে মাঝে নিজের খোঁড়া যুক্তি ফলিয়ে তর্কও করব, কিন্তু ছেলের আমাশা, বউয়ের হাতে ঝাঁটাপেটা হওয়া, বাবার চোখের ছানিকাটা—এসব গেয়েছ তো, নীনা স্ট্যাচু। দু'কান বন্ধ করে চেয়ে থাকবে হাঁ করে। নো মন্তব্য, নো সহানুভূতি।

আমি কি গাই না এসব মশার গান? এক সময় নিজেকে আক্রমণ করি। রন্জুর কাছ থেকে টাকা নেয়ার সময় আরেফিনের কথা, নিজের কষ্ট করে চলার কথা, বাড়ির অবস্থার কথা বলি নি? বেচারা কতটা ভদ্র হলে অফিসে এসে টাকা দিয়ে যায়। আবার আমার এসব কৈফিয়ত শুনেটুনে সহানুভূতিও জানায়। আমি কেন এত স্পর্শকাতর? কিন্তু নিজের পক্ষে যুক্তি বের করতে আমার জুড়ি নেই, পরক্ষণেই ভাবি, আমি তো সারাক্ষণ কাসুন্দি ঘাঁটছি না, একজন মানুষের কাছ থেকে হাত বাড়িয়ে টাকাটা নেয়ার সময় মুখ বুজে নেয়াটা অস্বস্তি আর লজ্জাকর। তাই বলার জন্যই বলা, তাতে কোনো প্রাণ ছিল না। কিন্তু এরা বিনা স্বার্থে ঘণ্টার

পর ঘণ্টা ধরে এই নাজুক প্রসঙ্গগুলোকেই নানাভাবে বিশ্লেষণ করে করে নগ্ন করে তোলে। আমি তার কী উপকারে আসব ? কেন নিজেকে মিছেমিছি ছোট করে তোলা ? কী জানি ? হয়তো বুকের ভার কমে— এই রকম সিদ্ধান্তে আসি। নিজের বুকে-চেপে-বসা পাথর টুকরো করে ছড়িয়ে দাও সবখানে। কিন্তু আমি এত স্বার্থপর হয়ে উঠেছি কবে থেকে ?

বড়ুয়া বাবু উঠে গেল রীতিমতো চেয়ারে বসে ঝিমুচ্ছি। অফিস ছুটি হতে আর মাত্র কয়েক মিনিট। হঠাৎ খোলা দরজা দিয়ে রেজাউলকে ঢুকতে দেখি। ঢুকেই সে তার স্বভাব অস্থিরতায় চারপাশে তাকাচ্ছে। সম্ভবত আমাকেই খুঁজছে। দেড় বছর হলো ডিভোর্স হয়েছে। এরপর আজ দ্বিতীয় দিন। তার অদ্ভুত ভাসা দু'টি চোখ গর্তে ঢুকে গেছে। গালের চামড়ায় ভাঁজ। শুকিয়ে, উস্কোচুলের আস্তরে, কেমন মায়াময় হয়ে উঠেছে চেহারা। মানুষের আর্থিক অবস্থার ছাপ এত প্রকটভাবে শরীরে পড়ে ? কলম বন্ধ করে বোকার মতো তাকিয়ে থাকি। এক হিমশীতল সাপ তার ফণা দিয়ে আমার বুক থেকে জল উদ্‌গিরণ করে। গলার কাছে নিঃশ্বাস আটকে আসতে থাকায় কেমন ঠাণ্ডা বোধ করি।

একটু বেপরোয়া কায়দায় সে আমার টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ নিঃশব্দ সময় কাটে। আমি তাকে চেয়ার টেনে বসতে বলি। ফ্যানের বন্ বন্ শব্দ মগজ তোলপাড় করছে। মাঝখানে এক টেবিলের দূরত্ব। নিঃশব্দে চেয়ার টেনে সে আমার দিকে ঠাণ্ডা চোখে চেয়ে বসে থাকে। চূড়ান্ত নাটকীয়তা আর কী। কী যে অস্বস্তিকর মুহূর্ত! আমি ড্রয়ার টানি। ফাইল ভরে চাবি লাগাই। চাবির রিং টেবিলে ঠুকে অপেক্ষা করি— সে কিছু বলবে। দুঃসহ জড়তা। দু'জনের কেউই কিছু বলছি না। কেমন আছ, জিগ্যেস করে অস্বস্তি এড়াব, রেজাউল বলে, সালাহ্‌দিনের ওখানে যাও নি কেন ? এতক্ষণ এই প্রসঙ্গটি ভুলে ছিলাম। সত্যজিতের সেই উক্তি... আমার অসহ্য অপমান ধীরে ধীরে আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় সোচ্চার করে তোলে! আমি ঠাণ্ডা গলায় বলি, আমন্ত্রণটা তোমার ছিল, যাওয়াটা নিশ্চয়ই আমি আমার বলে দাবি করতে পারি ?

পুরনো অভ্যাস তাহলে পাল্টায় নি দেখছি, কেমন ম্লান হাসে রেজাউল। তারপর বোকার মতোই বলে, আমার কিন্তু বিশ্বাস ছিল, তুমি আসবে। অনেকক্ষণ অপেক্ষাও করেছি। ভয়ঙ্কর বাজে দিন গেছে।

বিশ্বাস করতে পারলে পরমায়ু হয়, আমি ঠিক সেইটেই কাউকে করতে পারি না, হাসতে হাসতে বলি, নিজেকে আরো বেশি না।

তুমি কি আমাকে কিছুক্ষণ সময় দেবে ? এইবার সে সোজা পথ ধরে। কী সম্মানিত সম্বোধন! ভালো লাগে। সংসার করার সময় তার এক টুকরোর জন্য অধীর কাঙালের মতো পথ চেয়ে থাকতাম। দূরত্ব কত অচেনা করে তোলে মানুষকে। আমি বলি, ঠিক আছে, চল।

দু'জন একটা ছোট রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসি। এখানে এসেও একই অস্বস্তি। কেউই শুরু করতে পারছি না। টেবিলে আঙুল দিয়ে আঁকিবুঁকি করে ভাবতে শুরু করি, আমার জীবন থেকে সেই অমোঘ প্রেম মহিমের প্রস্থানের কত পরে রেজাউলের প্রবেশ ঘটেছিল ? কত বছর, কতদিন, কত ঘণ্টা ? আমি ইচ্ছে করলে হিসেব করে বলে দিতে পারি। এর পরের প্রতিটি দুঃসহ দিন আমার চেতনার খরামাটি লাঙলের ফলার মতো ইঞ্চি ইঞ্চি চষে গেছে। আমি কী করে অস্বীকার করব, ওই রকম তীব্র প্রত্যাখ্যানের দুর্মর কষ্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর রেজাউল আমাকে কিছু মাত্র আন্দোলিত করে নি ? সে আমার এক গভীর অভিজ্ঞতা!

আমার মর্মান্তিক নিঃসঙ্গতা! কী ফিকে চাল, বিকেল, ঘুটঘুটে রাত্রি, বৃষ্টিপতন, নির্ঘুম মধ্যরাত! এর মধ্যে রেজাউলের উজ্জ্বল উপস্থিতি আমাকে নতুন পথ দেখিয়েছিল। সেই একই পথ ধরে চলা, যে পথে মহিমের সাথে হেঁটেছি, রিকশায় একই রকম সন্ধ্যা। শুধু বয়স বেড়েছে বলে সেই তরঙ্গগুলো ছিল না, ওইরকম ছেলেমানুষী অন্ধ কান্না, আবেগগুলো ছিল না। আমি তখন অনেক পরিণত। কিন্তু ভেতরে অদ্ভুত আন্দোলন ছিল। সেই প্রথম অনুভব করি— পুনরাবৃত্তির মাধ্যমেই আমরা প্রতিদিন সৃষ্টি করে চলি। আমি বুঝেছি এক জায়গায় আটকে থাকার জন্য মানুষের জন্ম হয় না। যত কষ্টকর হোক, যত অমসৃণ হোক, প্রবল মায়ায় শেকড় উপড়ে হাঁটার যন্ত্রণা যত গভীর হোক, মানুষের বিচিত্র পথে ধাবিত হওয়াটাই জীবনের সহজ প্রবণতা। জীবন এমনই, কুয়োর জলে চুবিয়ে ফের তাকে টেনে না তুললে জীবনের খাঁই মেটে না! এ-ই তার প্রক্রিয়া! অসভ্য খেলা! ফলে জীবনের তাগিদেই রেজাউলকে আঁকড়ে ধরেছিলাম। জানতাম, তার চাকরিটা মামুলি। বেতন সামান্য। কিন্তু তাই দিয়ে একটা রুম ভাড়া করে সেই ছোট্ট শহরে তার একদম একা, চমৎকার গোছগাছ থাকা আমাকে টেনেছিল। তাছাড়া বাবার অবস্থা তখন ভয়াবহ। চাকরি করে প্রথম ক'মাস ছোট চাচা বেশ চালাচ্ছিল। দূরে থাকত, মাসে-মাসে টাকা পাঠাত। তারপর স্ট্রোক করে বাবার বিছানায় পড়ে থাকা। ছোট কাকার চাকরি ছেড়ে চলে আসা, তার মৃত্যু... উপর্যুপরি এইসব ঘটনা-দুর্ঘটনা আমাদের সংসারটাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। এদিকে আরেফিন ইন্টারমিডিয়েটে থার্ড ডিভিশন পাওয়ায় এরকম গাধা তিনি মানুষ করবেন না বলে বড় চাচা তাকে ঘর থেকে বের করে দেন। যাহোক, সব মিলিয়ে আমার প্রতি রেজাউলের আকর্ষণটা ছিল ওই সব দুঃসহ বাস্তবতার পেষণের মধ্যেও রীতিমত এক অলৌকিক আহ্বানের মতো। মজুমদারের সাথে রানুর সম্পর্কের গেরো তখন আলগা হয়ে এসেছে। বাড়ি থেকে তার বউ আর মেয়েদের নিয়ে এসেছে সে। টগবগে রানু নিভন্ত সলতের মতো ফুরিয়ে আসছে। এইসব মর্মান্তিক পরিস্থিতি আমার ভেতর থেকে মহিমের ছায়া গুঁড়িয়ে ফেলেছিল। মনে পড়ে তার প্রবল প্রেমের উচ্চারণ, নীনা আমরা বিয়ে করব। আকাশ ও নক্ষত্রের মহাসভায় যার সামান্য স্তবক হবে সেই বিয়ের মন্ত্র। একদিন আমাদের শাপমুক্তি ঘটবে। তখন সব ছদ্মবেশ খুলে যাবে।

আমি কেঁদে ফেলতাম। কিসের শাপ মহিম? কী অপরাধ করেছি আমরা?

তারপরও সেই ভস্ম থেকে যন্ত্রণার মতো করে ফুঁড়ে উঠত তাকে ঘিরে আমার পরাজয় আর গ্লানি। আসলে সে নিজের মধ্যে নিজেকে স্থির করে উঠতে পারত না, ফলে আমার সান্নিধ্য তাকে আনন্দের চেয়ে বেদনার্ত করত বেশি। মনে পড়ে, এক বিকেলে সে বিষণ্ন গলায় বলেছিল, এই যে তোমার হাত, সুন্দর, আমি স্পর্শ করছি, আমি কি সত্যিই ঠিক সেই সুন্দরকেই স্পর্শ করছি, আমি কি সত্যিই ঠিক সেই সুন্দরকেই স্পর্শ করতে চেয়েছি? নীনা, আমি কি জানি ভেতর থেকে আসলে কতটুকু তোমাকে চাই? নীনা, বড় গ্লানি হয়, আমি সম্ভবত তোমাকে ঠকাচ্ছি। সত্যিই তোমাকে ঘিরে আমি আমার সত্যিকার অনুভবটা জানি না।

এইসব বলত, যখন আমার বাসায় তার যাতায়াত বাড়তে শুরু করে। বেদনায় কাতর হয়েও আমি এই স্বীকারোক্তির কোনো তল খুঁজে পেতাম না। সে আমার অনেক স্কেচ এঁকেছে। কিন্তু স্কেচে কিছুতেই আমি আমার মুখ খুঁজে পেতাম না। তার বদলে কী এক দেহ,

কী এক ভঙ্গি, কী এক মুখ, আমার ভীষণ চেনা। আমি সেই রঙের ঝোপে হাত গলিয়ে আসল বিষয়টাকে তুলতে চাইতাম, কিন্তু রঙ তো নয়, যেন ময়ূরকণ্ঠী জল, হাত দিতেই তরঙ্গিত হয়ে সেই রূপ হারিয়ে যেত। অনেক পরে, অনেক খুঁজে... আমি যখন পুরো ব্যাপারটা টের পাই, তখন আবিষ্কার করি, আমার ভেতর থেকে সে রানুকে টেনে বের করেছে, নির্মাণ করেছে, সেই অবয়ব। আমার সারা পৃথিবীতে ধ্বংসস্তূপ নেমে আসে। আমি রানুর অদ্ভুত সুন্দর ম্লান চেহারার দিকে চেয়ে থাকি। ভেতরটা ভেঙে তছনছ হয়ে যায়। রানু, তোর সুন্দরের কাছে আর কত ছোট হবো? ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি। নিজেকে ভাঁজ ভেঙে খাড়া করাই। মূলত রেজাউলকে এরপর থেকেই আমার মুমূর্ষুর মতো আঁকড়ে ধরার পালা। তখন আমি অনেকখানি নিশ্চিত— আবেগের বাড়াবাড়ি না থাকলেও, এই সেই মানুষ, যার কাছে আমার নিজস্বতার মূল্য আছে। তারপর? তারপর স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল? কী জানি। নাকি সবকিছুই ছিল বিভ্রান্তি, জটিলতা? আমি যার তল খুঁজে পাই না।

খটখটে কালো টেবিলে ধোঁয়ায় আপ্লুত গরম চা আর সিঙ্গাড়া। এপাশে আমি, পাশে বসে কাপে রেজাউলের চুমুক— আমরা কি আবার শুরু করতে পারি? এরকম ভয়াবহ একটা প্রস্তাব রেজাউল এত আচমকা দেয় যে, আমি হকচকিয়ে যাই। পর মুহূর্তে নিজেকে সামলে কাপ টেনে নিই। নিঃশব্দে চুমুক দিই। ডান হাতে সিঙ্গাড়ার পেট টসকে দিয়ে আলু বের করে আনি। বলি, সেটা কি খুব ভালো হবে? এরপর সীমাহীন নীরবতা। ভিড় কমে এসেছে রেস্তোরাঁয়। বিচ্ছিন্নভাবে লোকজন বসে চা খাচ্ছে। টুকটাক গল্প করছে। অন্যদিনের চাইতে আজ উত্তেজনা কম। চারপাশে চোখ হাঁটিয়ে রেজাউল ঝেড়ে কাশে, শোনো, আমি এখন ভীষণ খারাপ অবস্থায় আছি। অবশ্য অর্থ সঙ্কটকে এখনো পাত্তা দিচ্ছি না। ব্যাপারটা মানসিক। এত শূন্য আর একলা লাগে যে তোমাকে কী বলব, একেকদিন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। 'খুব ভালো' কিছু আমার না হলেও চলবে।

কী বোকার মতো বকে যাচ্ছ— এবার আমি কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণু হয়ে পড়ি, তুমি শুধু তোমার ভালো থাকা নিয়ে ভাবছ। কিন্তু যে প্রস্তাবটা তুমি দিয়েছ, তার সাথে আমার মতামত আর সিদ্ধান্তের বিষয়টাও জড়িত, না-কি?

তুমি কি এখন ভালো আছ?

আমি স্পষ্ট জবাব দিই, হ্যাঁ।

নীনা, এ তুমি জেদ থেকে বলছ। এরকম পরিস্থিতিতে একটা মেয়ের ভালো থাকাটা অস্বাভাবিক।

সংসার তো করেছ বেশ কিছুদিন। আমি বলি, আমার চরিত্র খুব স্বাভাবিক আর নির্মল হলে নিশ্চয়ই ডিভোর্সের প্রশ্ন আসত না।

তুমি কি এখনো তোমার সেই পুরনো অস্বাভাবিক জেদকেই আঁকড়ে থাকবে? প্রশ্ন করে চায়ে ফের চুমুক দেয় রেজাউল। আমি যদি বলি, এর পরিপ্রেক্ষিতে তুমি প্রতিদিন তোমার জীবনে কষ্টকেই প্রাধান্য দিচ্ছ বেশি, যা তুমি চাও না। কিন্তু জেদের কাছে পরাজিত হওয়াটাও তোমার জন্য অসম্মানজনক। এতে কি শুধু বিপর্যয়ই বাড়ছে না?

রেজাউলের হাতে পত্রিকা। এইসব বিরক্তিকর প্রসঙ্গ থেকে নিজেকে সরাতে টেনে নিয়ে সেটা মেলে ধরি। চক্রাকারে হেড লাইন ঘোরে। 'যুক্তরাষ্ট্রে বাজেট সংকট', 'বড় ধরনের

সংঘর্ষের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন আতঙ্কিত', 'হাজার হাজার বছর যুদ্ধ করব—সাদ্দাম', 'ক্যাম্পাসে আবার বন্দুক যুদ্ধ : নিহত ১ গুলিবিদ্ধ ৮', 'ইরাক কুয়েতের তেলক্ষেত্রে বিস্ফোরক পুঁতে রেখেছে',... ইত্যাদি— পত্রিকা ভাঁজ করে রাখি। আমার পত্রিকার নিউজ সমস্ত রেস্টুরেন্টে সঞ্চারিত। ভিড় বাড়ছে। তুমুল উত্তেজনা প্রতিটি টেবিলে। এসময় অনুভব করি, বিশাল রণক্ষেত্রে ভাসছে আমার লাশ। মনে হয়, লাগুক যুদ্ধ, সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যাক। কিন্তু আমরা যারা ছাপোষা, তারা বড় সুবিধাবাদী। গলি-ঘুপচি পেরিয়ে মুহূর্তেই নিজের জীবনে ফিরে আসি।

দেখো, এবার আমি সহজ গলায় সরাসরি বলি, খুব ভালো আছি— এমন অবিশ্বাস্য উচ্চারণ করব না। কিন্তু চমৎকার স্বাধীন আছি। পাশাপাশি সংসার করার সময় আমি যা ছিলাম তার চেয়ে সুস্থ আছি, অন্তত মনের দিক থেকে। স্বাধীনতার একটা অদ্ভুত আনন্দ আছে। আমি আশা করি তুমিও তাই আছ, তেমনই আনন্দে।

এসব বাদ দাও— রেজাউল অন্য পথে হাঁটে। তুমি কি আমার বেকারত্বকে ভয় পাচ্ছ ? আমার চাকরি এখনো যায় নি। মাঝখানে প্রবলেমে পড়েছিলাম, এখন কেটে যাচ্ছে সেটা। মোটকথা, আমার পক্ষে একা চলাটা এখন অসম্ভব কষ্টকর হয়ে পড়ছে, বিশ্বাস কর নীনা, একেক দিন মরে যেতে ইচ্ছে হয়।

তুমি পুরো ব্যাপারটাকে এত হালকা করে দেখছ! আমি রীতিমতো তেতে উঠতে থাকি, ডিভোর্সটা একটা ইয়ার্কি নাকি ? আমাকে এত সহজ, সস্তা ভাবছ কী করে, সেটাই আমার অবাক লাগছে। তোমার আনন্দ আর কষ্টের সাথে সাথে আমি আন্দোলিত হবো—এই সামন্ত ধারণাটা এখনো পাল্টাতে পার নি ? শোনো রেজাউল, ডিভোর্স হয়েছে আমাদের দু'জনেরই অপরিসীম অসমঝোতা, কষ্টের পরিপ্রেক্ষিতে। আমার প্রতি তোমার ভালো আর মন্দ লাগা বারবার বদলাক, আমার তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু তোমার প্রতি আমার যতটুকু শ্রদ্ধা আছে, এইসব ফালতু আবেগ প্রকাশ করে সেটা অন্তত নষ্ট হতে দিয়ো না।

ফালতু আবেগ ? রেজাউল কেমন উত্তেজিত হয়ে পড়ে। একে ফালতু আবেগ বলছ ? ভালো মিথ্যে বলতেও শিখে গেছ দেখছি! যেখানে ঘৃণা থাকে, বিচ্ছিন্নতা হয়, সেখানে আবার যৎসামান্য শ্রদ্ধাও থাকে নাকি ? কৌশলী কথা বাদ দাও নীনা, আসলে বলো স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতাতেই তোমার আনন্দ। যা ইচ্ছা তাই করে বেড়াতে পারছ, তাই সংসারকে খাঁচা মনে করছ। তুমি চিরকাল তা-ই ছিলে। সংসার এজন্যই তোমার কাছে অসহ্য ছিল। সংসারে চলতে গেলে পৃথিবীর বাউণ্ডেলে স্বাধীন মানুষও কিছু বন্ধন মেনে নেয়।

তুমি কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ, স্পষ্ট করে বলো তুমি কী বোঝাতে চাইছ ?

সত্যজিত, সালাহ্‌দিন... গড়গড় বলে যেতে থাকে সে। তোমার কত শুভাকাঙ্ক্ষী জুটে গেছে। স্বাধীনতার আনন্দ তো তোমার থাকবেই।

শোনো, কোনো পূর্ব চিন্তা ছাড়াই এইবার নির্লিপ্ত কণ্ঠে আমি বলি, সালাহ্‌দিনের সাথে কয়েক দিন আমি শুয়েছি। তার সাথে আমার সম্পর্কটা শুধু শারীরিক। অতএব আমার সাথে তার বিয়ের প্রশ্নই আসে না। আমার কিছু প্রবলেম আছে, তুমি জানো। আমার পক্ষে বিভিন্ন বিকৃতিতে যাওয়া কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। এখন বলো, আমাকে নিয়ে নতুন করে সংসার পাতবে ? তাহলে আমি রাজি আছি। কিন্তু ওদের কাউকে অস্বীকার করে নয়।

রেজাউল চায়ের প্লেট সন্তর্পণে সরিয়ে রেখে অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসে। তারপর টেবিলের ওপর রাখা আমার হাতে মৃদু চাপ দেয়— খেপে গেলে এত উল্টাপাল্টা বকো তুমি। ঠিক আছে, এ জেনেও আমি রাজি, তুমি কবে আসছ?

এই একটা জায়গায় এসে আমার কষ্ট হতে থাকে। দীর্ঘদিন এক সাথে থাকার ফলে আমার স্বভাবটা ওর চেনা হয়ে গেছে। আজ এত দিন পর ঠিক এই মুহূর্তটির এমন মূল্যায়ন, আমি ঠোঁট চেপে নিজেকে সামলাই। মৃদু ভঙ্গিতে হাসি, তুমি ভাবছ ঘটনাটা সত্য নয়, তাই হালকাভাবে নিচ্ছ। খুব উদারতা দেখাচ্ছ।

মোটেই তা নয়, রেজাউল বলে, আমি তোমার কথা বিশ্বাস করেছি।

এইবার ফাঁপরে পড়ে যাই। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বিষয়টার অন্য একটা দিক তুলে ধরি, বলি, এই সমাজ তোমার কাছে আমাকে যেতে দেবে কেন? ধর্মের নিয়ম অনুযায়ী আমাকে অন্য কারো ঘর করে পরে তোমার কাছে আসতে হবে। তুমি সেটা মানতে পারবে?

রেজাউল বলে, আগে রাজি হও। এসব পরের ভাবনা। সময় বদলাচ্ছে না? প্রয়োজন হলে দু'জন আবার বিয়ে করব, এখন কোনো কৌশল না করে আরেকটা সত্য কথা বলো, সত্যজিৎ তোমাকে কিছু বলেছে?

কোন ব্যাপারে? সিঙ্গাড়ার আলু নিস্পৃহ ভঙ্গিতে নখে বিদ্ধ করি। রেজাউল যেন জুৎসই ভাষা না পেয়ে সরলভাবেই আমতা আমতা করে, এই ধর, মানে তোমার সেক্সচুয়াল...?

এ ব্যাপারে সত্যজিৎ কী বলবে? ভেতরে জ্বলে উঠতে থাকা আগুন চেপে আমি অবাক হওয়ার ভান করি, তুমি কী বলতে চাইছ? তোমার প্রাক্তন স্ত্রীর এইসব ব্যক্তিগত ব্যাপার অন্য একজন তার কাছেই বলবে? তুমি কি বলতে চাইছ বুঝলাম না!

তখন খেপে উঠলে সেজন্য জিগ্যেস করলাম।

তুমি তাকে কিছু বলেছ বলে মনে হচ্ছে? নইলে এ প্রসঙ্গে ওর নাম আসবে কেন?

গোয়েন্দাগিরির অভ্যাসটা ছাড়, রেজাউল সিগারেট ঠোঁটে নেয়। ফশ্ করে দেশলাই জ্বালায়— আমি ওকে কিছু বলি নি। ওর সাথে তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব, আমারও। অনেককিছু থেকে অনেক প্রসঙ্গ উঠতে পারে। তাই ওর নামটিই আগে মনে এলো।

কী দুর্বল অজুহাত! আমি যখন তেতে উঠছি আবারো, তখন রেজাউল বলে, সত্যি করে বলো তো নীনা, সালাহ্‌দিনের ব্যাপারটা, ইয়ার্কিই তো করেছ?

এবার আমার ভেতরে নতুন করে ধস নামার পালা। আসলে ও যা, তার থেকে বেরোনো ওর পক্ষে অত সহজ নয়, যেটা আমি ভেবেছিলাম। আমি ভেবেছি, ঠিক ওই প্রসঙ্গে রেজাউল আসলে আমাকে চিনতে পেরেছে। যার ফলে আমার কষ্ট বেড়েছিল। ওর এই প্রশ্নে এক অস্বস্তিকর ঘেরাটোপ থেকে সটান বেরোতে সুবিধে হয়, আমি বলি, না, ইয়ার্কি করি নি, ওর সাথে আমি শুয়েছি। আমার এই নিঃসঙ্গ জীবনে সেটা কি অবাস্তব কিছু? আমার তো কারো সাথে দায়বদ্ধতা নেই।

এরপর রেজাউলের সিগারেট ফুরিয়ে আসে। বেয়ারা এসে কাপ-প্লেট নিয়ে যায়। রেস্তোরাঁয় শ্বাসরুদ্ধকরভাবে ভিড় বাড়তে শুরু করে। কাপ-প্লেটের টুংটাং এবং জনতার অসংলগ্ন হৈচৈ-এর মধ্যে ঢাকার মাথায় সন্ধ্যা নেমে আসে। আমরা দু'জন বেরোই, সমস্ত শহরে আলো জ্বলে উঠেছে।

রেজাউল যাওয়ার সময় বলে, আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি নি। আমিও হাসতে হাসতে বলি, তোমার এই কথার মধ্যেই তোমার বিশ্বাস লুকানো আছে। তারচেয়ে বলো বিশ্বাস করতে কষ্ট পাচ্ছ।

আমি কি এর পর তোমার সাথে দেখা করতে পারি ? রেজাউল সন্তর্পণে প্রসঙ্গ এড়ায়।

আমাদের যত কম দেখা হয় দু'জনের জন্য ততই মঙ্গল, তোমার কী মনে হয় ?

এইবার তুমি তোমার মত আমার ওপর চাপাচ্ছ... যা হোক, আমি যাই— ভিড়ের মধ্যে রেজাউলের অস্পস্ট পাতলা দেহ মিশে যায়। তারপরও আমি কতক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে থাকি।

বাসায় ফিরে দেখি হুলুস্থুল। শানু বাড়িওয়ালার সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত। সেই যুদ্ধে সে একক নেতৃত্ব দিচ্ছে। পেছনে তার স্বামী। শানুর ঘর্মাক্ত মুখ, বুকের আঁচল মাটিতে খসে পড়া, ক্রমাগত তার নিঃশ্বাস নেয়া— এসব দেখে ব্যাপারটাকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে। আমি যখন দরজায়, তখন সেই চূড়ান্ত ঝগড়ার শেষ পর্যায়। আমি তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে দরজায় দাঁড়িয়ে বিমূঢ় হয়ে যাই। ছাড়ব না বাসা, দেখি ব্যাটা তুই কী করতে পারিস। বুঝি না ভেবেছিস, ভাড়া বাড়ানোর পাঁয়তারা, তিনমাস আগে না একবার বাড়ালি ? মামুর বাড়ির মোয়া, না ? আজ এটা, কাল সেটা। চুপ কর বেটি— বাড়িওয়ালা ক্ষিপ্ত স্বরে বলে, আমার বাড়ি, না পোষালে আমি ছাড়তে বলব। তোর মতো পাঁচ পয়সার বেটির কাছে ভাড়া বাড়ানোর জন্য পাঁয়তারা কষতে হবে ?

ভদ্রভাবে কথা বলেন, এবার শানুর স্বামী এগিয়ে আসে এবং আমাকে দেখেই যেন প্রসঙ্গটা আবার উত্থাপন করে, একটা মেয়ে চাকরি করে। রাত করে সে ফিরতেই পারে। নানা কিসিমের ছেলেদের সাথে ফেরে, আপনি দেখেছেন ? আপনি একজন মুরব্বি হয়ে পাঁচ কথায় কান দেন কেন ? আপনি তো এখানে থাকেন না। অন্যের কথায়...?

হয়েছে, ওর সাথে অত ভদ্রতা মারাতে হবে না, শানু ফুঁসে ওঠে, বলে কি-না বাড়িটাকে বেশ্যাখানা বানাচ্ছি। কেনরে ব্যাটা ? বুড়ো বয়সে তোর কাস্টমার হওয়ার সাধ জেগেছে নাকি ? তোকে আমি চিনি না ? সেদিন ইনিয়েবিনিয়ে কী সোহাগভরা কথা! একটা মেয়ে, মাথার ওপর স্বামী নেই, গাছ নেই... কত কথা... ফাঁস করে দেব আসল মতলব ?

শানু একটানা বকে যায়। শানু এই পর্যন্ত পারে ? আর আমি ? এই অশ্লীল প্রসঙ্গটার কেন্দ্রবিন্দুতে ? কেমন জমে যাই। অবশ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। শানু আমাকে টেনে ভেতরে আনে। আয় তো নীনা, দেখি, ব্যাটা কী করে আমাদের তাড়ায়! তারপর আরো চিৎকার। আরো অসহ্য সব যুক্তি, পাল্টা যুক্তি, বাড়িওয়ালার এক সময় হঠাৎ প্রস্থান। তারপর রাত। শানুর গজ গজ, আমার অসহ্য পীড়ন। নিজের বাঁচার প্রতি আবারো আমার ঘেন্না।

বিচিত্র ঘিনঘিনে সব অনুভূতি নিয়ে বিছানায় চেপে শুতেই মগজের শিরা চোখ মেলে থাকে। সত্যজিৎ আমাকে কী ভাবছে ? সে কি তবে রেজাউলেরই বন্ধু ? আমি স্রেফ বন্ধুর স্ত্রী ? কিন্তু সেদিন ভর দুপুরে সালাহ্‌দিনের ঘরে গাঁজা খেতে খেতে যে লোকটা অদ্ভুত সব কথা বলে আমার কাছে গাঁজার মতো জিনিসটাকে মহান করে তুলল, আমার প্রাণের বন্ধু হয়ে উঠল, তাকে অত সহজে আমি ঝেড়ে ফেলি কী করে ? কী করুণ ক্রন্দনময় হয়ে উঠছিল তার কণ্ঠস্বর। এদেশ আমার নয় নীনা ? এত বছর ধরে এত রক্ত-ঘাম মিশিয়ে দিচ্ছি এই মাটির সাথে, অথচ দেখ, ওপারে কারা যেন মসজিদ ভাঙছে, তার জন্য কী জঘন্য তিরস্কার আর

অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে এপারে আমাদের। বাড়িওয়ালা কাল শাসিয়ে গেল, সব টাকা-পয়সা তো বর্ডার পার করে দিয়েছেন, আপনি মশাই বসে থাকছেন কেন? জলদি কেটে পড়েন। ওপারে আমার কে আছে যে যাব? শুধু ধর্ম কি আত্মীয়তা দিতে পারে? সৌদি আরব তোদের দেশ? নীনা, সেদিন কী ঘৃণায় গলি ধরে লোকগুলো ইটপাটকেল নিয়ে ছুটে এসেছিল আমার দিকে। এই দেখ, মাথা কেটে গেছে, সত্যজিৎ টলমল পায়ে দাঁড়িয়েছিল। এই দেশ ছেড়ে গেলে আমি বাঁচব? নীনা, তুই কোনোদিন বুঝবি না, কী গভীর যন্ত্রণা এতে। গতকাল থেকে সালাহ্দিনের বদ্ধ ঘরে পালিয়ে আছি, নীনা দেখ্ আমার এই নুলো, ভোঁতা, স্যাঁতসেঁতে হৃদয় থেকে দাউদাউ আগুন বেরোচ্ছে, আমি পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছি, নীনা, আমাকে ধর। একজন মানুষের যখন দেশ থাকে না, তার মতো রিক্ত ভিখিরি আর কে আছে পৃথিবীতে? আমি তাকে জাপটে ধরেছিলাম। সত্যজিৎ, সভ্য লোকেরা এসব করছে না, প্লিজ, তুই স্থির হ। এরা সবাই না। তারপর জীবনে প্রথম বড় মায়ায় সে আমার মুখ তার হাতে তুলে নিয়ে গভীর জড়তাময় কণ্ঠে বলেছিল, খাঁচার মধ্যে যে হলুদবরণ পাখি শুধু নিজের ঠোঁট কামড়ায়, আর ডানা ঝাপটায় কিন্তু উড়াল দিতে পারে না কখনো, অমন কোনো ছবির ফ্রেমে তোকে মানায় না। তুই বড় ভালো কাজ করেছিস নীনা, অন্তত উড়াল তো দিলি।

মুখ থুবড়ে যদি টিনের চালে পড়ি?

আবার উড়াল দিবি।

তবে তুই কাঁদছিস যে বড়? আমি তাকে খোঁচা দিই, ক'জন মৌলবাদীর উস্কানো রাজনীতির কাছে এইভাবে টোস্কা খেয়ে গেলি?

এ অন্য যন্ত্রণা। দেশের মাটি আমাকে পর করে দেবে? স্রেফ ধর্মের জন্য?

মাটি তোকে পর করে নি। আমি ঠাণ্ডা গলায় বলি, মাটির কী দোষ? তুই এভাবে ভেঙে পড়লে ওই অসভ্যদেরই যে জিতিয়ে দেয়া হয়।

ওই হলো, ক্যাঁচাল করিস না তো! আমাকে একটু কাঁদতে দে... বলে সে হাউমাউ করে সেদিন কেঁদেছিল। সালাহ্দিন আর আমি বহু কষ্টে তাকে সামলেছিলাম। সেই গভীর প্রাণের মানুষটি শুধুই রেজাউলের বন্ধু? সেসব কি তবে ভান ছিল? আমি ছটফট করি। যে অত গভীর কণ্ঠে উড়ালের কথা বলল আজ রেজাউলের সামান্য সর্দি মেশানো কান্নাতেই সে সমঝোতার প্রস্তাব রাখছে? রেজাউলকে নিশ্চয় ও-ই আমার অফিসের ঠিকানা দিয়েছে। আমি এখন কোথায় দাঁড়াই?

বন্ধের দিন সকালে ইজেলটা আনতে ইরফান চাচার ওখানে যাব, হন্তদন্ত সত্যজিৎ এসে হাজির। এসেই বলে, তুই বেরোচ্ছিস কোথাও?

আমি ওকে দেখে রীতিমতো অবাক। এইরকম সকালে ওর আচমকা আবির্ভাব, বাড়িওয়ালার সাথে শানুর তর্ক— আমি কেমন অস্বস্তি নিয়ে চেয়ার টেনে ওকে বসতে বলি। সত্যজিৎ বলে, সালাহ্দিন গতকাল এক্সিডেন্ট করেছে। পিজিতে ভর্তি করিয়ে দিয়েছি।

কোথায়? কীভাবে?

ঠিক এই সময় এরকম খবরের জন্য আমার কোনো প্রস্তুতি ছিল না, কেমন অসাড় বোধ করি।

প্রেস থেকে ফিরছিল। ফর্মা কয়েক প্রুফ শিট হাতে নিয়ে। টিকাটুলির মোড়ে রাস্তা ক্রস করবে, শালার এক মিনিবাস...অল্পের জন্য বেঁচে গেছে।

এখন অবস্থা কেমন ?

বেশি ভালো না। অনেক জায়গায় কেটেছে। যন্ত্রণায় খুব তড়পাচ্ছে।

আমি মোটামুটি তৈরিই ছিলাম। বেরিয়ে পড়ি তার সাথে। সন্তর্পণে রুমাল দিয়ে ঠোঁট থেকে লিপিস্টিকের প্রলেপ মুছে ফেলি। তারপর ওর পাশে সহজ হয়ে বসার চেষ্টা করি। রিকশায় অনন্ত স্তব্ধতা। সেদিনকার ঘটনার পর থেকে সত্যজিতের সাথে মানসিকভাবে সহজ হতে পারি না। অবশ্য তারপর আজই প্রথম দেখা। তা-ও দু'জনের মাঝখানে একটা দুর্ঘটনার নিঃশব্দতা। আমি অস্বস্তি নিয়ে আবাহনী মাঠের দিকে চেয়ে থাকি। এক সময় সায়েন্স ল্যাবরেটরি, মাসকো সুজ। বাঁয়ের রাস্তা হেঁটে গেছে খাড়া হাতিরপুল কাঁচাবাজারের দিকে। এবং ডানে মুজিব হল। আমরা দু'জন কেউই এতটা পথ কথা বলি না। এক সময় বাঁয়ে সিলভানা। শাহ্‌বাগের মোড়ে এসে মুখ খোলে সত্যজিৎ, প্রচুর রক্ত গিয়েছে। আমি ছিলাম বেকারিতে। হঠাৎ একটা ছেলে এসে খবর দিল। ওর বাবা-মা এত দূরে থাকে। কেউ এখনো জানে না।

খবর পাঠানোর ব্যবস্থা করা যায় না ?

সে-ই দিনাজপুর! দেখি, চেষ্টা করছি। শালা লেখা লেখা করে গেল। মাথার মধ্যে আর কিছু নেই। ক'দিন ধরে প্রেস আর বাসা ছাড়া দুনিয়া ভুলে গিয়েছিল। চাকরি করে যা জমিয়েছিল, সব ওই বইয়ের পেছনে ঢেলেছে। এখন এরকম একটা দুর্ঘটনা, আরো কত খরচ।

কী আশ্চর্য, নিজের টাকায় বই বের করছিল! প্রকাশক পায় নি ?

রিকশা দাঁড়ায় পিজির সামনে। যাকগে, একটু ঘুরে যেতে হবে। প্রকৃতি জুড়ে এখন কাচ স্ফটিকের উজ্জ্বলতা। সেই ধাঁধানো আলোর তোড়ে ঢাকার বিখ্যাত কাকেরা কেবলই ঘাই খাচ্ছে। ক্রমশ এগোই। লিফটের সামনে ভিড়। গেটম্যানকে হাজারো কথার প্যাঁচ দিয়ে বুঝিয়ে এখানে এসে হাঁ হয়ে থাকি। অতঃপর সিঁড়ি ভাঙো। এক ধাপ, দু'ধাপ, তিন ধাপ... ওপরে উঠছি... আরো ওপরে। কী বলছিলি ? নিজের টাকায় ? সত্যজিৎ নিঃশ্বাস টানছে, নতুন লেখক, প্রকাশক পাবে কোথায় ? অত পথঘাট চেনাও নেই তার।

আবার সেই হাসপাতাল। আমার বীণায় হাজার তন্ত্রীর শব্দ। প্রলম্বিত প্যাসেজ ধরে হাঁটি। কেমন শ্লথ, অবসন্ন হয়ে আসছে পা। সেভলনের টানা গন্ধ আমার মগজ ফুঁড়ে ঢুকে আমাকে ছায়াচ্ছন্ন করে তোলে। যেন সহস্র মৃত্যুর আর্তনাদ আছড়ে পড়ছে চারদিকে। দৃষ্টি রুদ্ধ করে রাখে অদৃশ্য কাচের পাল্লা। এক নিরন্তর হাহাকারের শব্দ আমার জান তোলপাড় করে আমাকে রক্তহীন করে তুলতে থাকে। সেই উষর ভূমিতে উজ্জ্বল মানব শিশু বৃত্তাকারে হামাগুড়ি দেয়। হাঁটে, দৌড়ায় শেষে চিৎকারের ভেতর দিয়ে তার সশব্দ ভূ-পতন। এক অর্থহীন শূন্য স্তব্ধতা ছিন্নভিন্ন করছে সেই হলুদ শিশুটির টানা চিৎকার। জন্ডিসের সে-কী সর্বগ্রাসী ভূমিকা। বেনিআসহকলা পাক খেয়ে মিশেছে একটি বিন্দুতে— হলুদ। পৃথিবীতে শুধু এই একটি রঙেরই বিষাক্ত ছায়া। আমার পা টলছে। ঝিমঝিম লাগছে। আমাকে ছিঁড়েখুঁড়ে, কচলে একাকার করে প্রবেশ সেই গন্ধের! হ্যাঁ, এই হাসপাতালের গন্ধই তো শিশুটির শরীরে ছিল। এই গন্ধে পুরো হাসপাতালকে ভাসিয়ে দিয়ে তবেই মৃত্যু হয়েছিল ওর।

আশ্চর্য নীল বিষের ভাণ্ড ডাক্তার তুলে দেন আমার হাতে, পান কর।

নিজেকে টেনে সেই বিশাল শাদা ঘরে ঢুকি। ওপরে সীমাহীন শাদা ছাদ। তার নিচে নিশ্চল সালাহ্‌দিন। বিকৃত মুখে যন্ত্রণা সামলাচ্ছে। তার পা, কপাল বলতে গেলে গোটা সালাহ্‌দিনই প্লাস্টারে ডোবানো। চারপাশে অসহ্য যন্ত্রণার গোঙানি। ওর চুলে হাত রাখি। তাতেই ও এমন আকুলভাবে আমার দিকে তাকায়, কেমন অস্বস্তিতে পড়ে যাই। ঠোঁট অল্প ফাঁক করে তারপরও ও হাসে। আমি কপট রাগে বলি, এর মধ্যেও হাসছ ? কাণ্ড তোমার!

যেন ফিসফিস, এমন অস্পষ্ট গলায় সে বলে— হাসব না ? আজই যে প্রথম বুঝলাম, পৃথিবীতে আমি একা নই।

নিজেকে একা ভাবতে পারার সুখ এটাই, আমি বলি। পৃথিবীর কাছে যখন কিছু চাওয়ার থাকে না, তখন আকস্মিক অল্প প্রাপ্তিই বড় হয়ে দেখা দেয়। আমার শাদা মসলিনের শাড়ি হাসপাতালের গন্ধে ভিজে ওঠে। না, না, হাত নাড়ে সে, তুমি বুঝছ না...।

আজ কথা বলো না, আমি ওকে বাধা দিয়ে ওর চুলে আঙুল ঢোকাই। আমি কাল আবার আসব। পরে এ নিয়ে তর্ক হবে। আরো দীর্ঘ নিঃশব্দ সময়। যখন উঠব, তখন সত্যজিৎ আমাকে এগিয়ে দেয়ার জন্য দাঁড়ায়। ওকে বলি, আমি একাই পারব, তুই ওর কাছে থাক। তাছাড়া ওর বাড়িতে খবর দেয়ার ব্যবস্থা করা দরকার।

নীনা, তুই কোনো কারণে রাগ করেছিস আমার ওপর ?

না।

সিঁড়ি ধরে নামছি। কে যেন ডাক দেয় পেছন থেকে। তিন ধাপ নেমে গেছি। ডাক শুনে মাথা ঘোরাই। স্রেফ হনুমান, একজন লোক। অসংলগ্ন চুল তার কপাল ঢেকে রেখেছে। খাড়া নাকের নিচে অসম্ভব পিচ্চি দুটো চোখ। আরো আছে খোঁচা দাড়ির বাহার। শুকনো, ঢ্যাঙা শরীরের ওপর ফ্যাকাসে শার্ট। প্যান্টও রঙ ওঠা। ভীষণ চেনা লাগছে লোকটাকে। কিন্তু নির্জন সিঁড়িতে কেমন ভয়ও লাগছে। মৃত সন্তানের দুঃস্বপ্নের ঘ্রাণ তখনো আমার সর্বঅস্তিত্ব গ্রাস করে রেখেছে, আমি সহসা কিছু বুঝে উঠতে পারি না।

কেমন আছেন ?

ভালো, বলে আমি সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকি। ভদ্রলোক কে, খুঁজে বের করার কোনো মানে নেই। এমন একজন বিদ্‌ঘুটে লোকের সাথে আমার কোনোকালে পরিচয় ছিল না। এটা আমি নিশ্চিত। চেনা লাগার সূত্র ধরে এমন নিঃশব্দ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকাটা বোকামি।

আমাকে চিনতে পারেন নি ? এবার সে নেমে আসে। এত ভয় পান আপনি ? সেদিনও ভয় পেয়েছিলেন। অথচ বরাবরই একলা চলছেন দেখছি।

মানে ? আমি দাঁড়াই। কবে ভয় পেয়েছি ? এত অধিকারের সুরে কথা বলছে, অথচ আমি তাকে চিনতে পারছি না। কোথায় দেখেছি একে ? মনে মনে হাতড়াতে থাকি। ধুৎ- হাত গিয়ে ঠেকে মৃত সন্তানের তলপেটে।

সেদিন বাসা খুঁজে পেয়েছিলেন ? সে এক ধাপ এগোয়। তার এই প্রশ্নে উদ্ভাসিত হয়ে উঠি, ওহহো সেই যে... আপনি তো মশাই সেদিন ক্লান্ত হয়ে আমাকে রাস্তায় ফেলে চলে গেলেন। তারপর ঘুরতে ঘুরতে...।

যাহোক পেয়েছিলেন তো?

হ্যাঁ তা পেয়েছিলাম।

আসলে আমার ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ ছিল। একজনের কাছে টাকা পেতাম। তখন না গেলে তাকে কিছুতেই পেতাম না। সে বিদেশ চলে যাচ্ছিল।

না, না আপনি অনেক করেছেন। আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। কী ব্যাপার, হাসপাতালে কেন?

আমার ছোট ভাইটাকে হপ্তাখানেক আগে ওর এক বন্ধু স্ট্যাব করেছে। অনেক রাতে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে...

বলেন কী! আমি আঁতকে ওঠি। বন্ধু বলছেন কেন, ও তো সাক্ষাৎ শত্রু ছিল।

হ্যাঁ, তা তো ছিলই। আসলে আমরা মানসিকভাবে প্রস্তুতই ছিলাম, এমন একটা কিছু একদিন ঘটবে। ওর সার্কেলটা খুব খারাপ ছিল।

চলুন, ওকে দেখে আসি। ক্ষীণ একটা দায়িত্ববোধ থেকে নিজেকে টেনে তুলি। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ভদ্রলোক জানতে চায়, আমি কেন এখানে এসেছি। আমি সালাহ্‌দিনের সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তিসহ হাসপাতালের প্রশস্ত রুমে প্রবেশ করি। এখানে জীবন কী আহত, বেদনাময়। কী বাচ্চা ছেলে! নিষ্পাপ চেহারা। একটা হাত ওপর দিকে স্ট্যান্ডের সাথে ব্যান্ডেজসহ বাঁধা, বুকেও ব্যান্ডেজ। ঘুমিয়ে আছে। পাশে এক বৃদ্ধা। ফ্যানের বাতাস আছে। তবুও তালপাতার পাখা দিয়ে মাথায় বাতাস করছে। আর দু'চোখ ঝিমন্ত। এই রকম অপরিচিত একটা বৃত্তে কীভাবে শুরু করতে হয়, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। মাথায় শাদা ঝুঁটি নার্স এসে টুল পেতে বসেছে। অস্বস্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। উদ্ধার করে সেই ভদ্রলোকই, আপনি সম্ভবত বাসায় যাচ্ছিলেন?

হ্যাঁ, চিকিৎসা কেমন হচ্ছে?

হাসপাতালের চিকিৎসা! তার স্বরে শ্লেষ মেশানো, হচ্ছে মোটামুটি।

এখন কেমন আছে?

ভালোই, তবে জাগলে বেশ কান্নাকাটি করে। চলুন হাঁটি। সিঁড়ির মুখে এসে সে জানতে চায়, সালাহ্‌দিন কত নাম্বার রুমে আছে? আপনার বন্ধু যেহেতু, একবার যাব। রুম, বেড নাম্বার সব জানিয়ে সিঁড়িতে পা রাখছি, বলল, আপনি কি আবার আসবেন?

তা আসব বৈকি। ও আমার খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এলে আপনার ওখানেও যাব। ওহ্ হো, জানা হলো না, আপনার বাসা কোথায়?

রায়েরবাজার। বলে ক্রমশ সিঁড়ি ধরে নিচে নামতে থাকি।

পেছন থেকে সে বলল, আমার নাম ওমর।

ও-আচ্ছা।

এই করতে করতে দুপুর গড়িয়ে গেছে। টানা রাস্তা ধরে হনহন হেঁটে রিকশা নিই। উফ! দুঃসহ এক পরিবেশ। মানুষের আর্ত গোঙানি! বিষাক্ত সেভলনের গন্ধ! একেকজনের হাত-পা ওপর দিকে খাড়া করে বাঁধা। মল-মূত্র-থুথু-বান্ডেজ, অবিশ্রান্ত স্মৃতি, কলজে খামচে-ধরা শিশুর কান্না, হাসপাতালের প্রতিটি খাঁজে আমি ওর মৃত্যুময় গায়ের গন্ধ পাই। কথা

বলছিলাম, কিন্তু কেমন উদ্‌ভ্রান্ত, অবশ লাগছিল। কলজে মুচড়ে ঝরছিল নীল কষ। ঘূর্ণায়মান পাখা ছাদের শাদা তোলপাড় করছিল।

খোলা রাস্তায় নেমে টানা নিঃশ্বাস নিই। তারপর আমাদের আদি পৃথিবীর জং ধরা হাওয়া এক সময় সব কাদা ধুয়ে নেয়। ট্রাফিক বাতি, মানুষের ঊর্ধ্বশ্বাস চলা, চাকার ঘূর্ণি, বিউটিপার্লার, সিনেমা হলের রঙিন ব্যানার, উত্তপ্ত পিচঢালা পথ, সার সার সাজানো দোকানপাট... এইসব অতিক্রম করে আমার রিকশা এক সময় হাজারো প্যাঁচ পেরিয়ে সেই প্রাচীন বাড়ির সামনে।

আশ্চর্য কাকতালীয় ব্যাপার। এই বাড়িতে আজ নিয়ে মোট দু'দিন আসা এবং দু'দিনই সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে। সেদিন রাস্তায়, আজ হাসপাতালে। কী উচ্ছৃঙ্খল চেহারা। অবশ্য অসম্ভব বিনীত সে। সেদিনকার অস্বস্তির মূলে ছিলেন ইরফান চাচা। আজ অস্বস্তি হচ্ছে তাঁর স্ত্রীর কথা ভেবে। তেমনই জড়তা নিয়ে আমার স্বয়ংক্রিয় তর্জনী দরজায় নক্ করে। এক সময় দরজা খুলে যায় এবং আজকে দরজায় মালিক নিজেই। আমাকে দেখে আন্তরিক উদ্ভাসনে উজ্জ্বল হয়ে উঠেন, কী আশ্চর্য ব্যাপার, তুমি?

ইজেলটা নিতে এসেছি। হাসি চেপে বলি।

তা, ওটা কি দরজায় দাঁড়িয়েই নেবে?

ঠিক আছে, আপনি চাইলে কিছুক্ষণ বসতে পারি। এইরকম হালকা চটুলতা দিয়ে শুরু হয়। সেই পুরনো কামরা, মোগলাই হাওয়া, গুমোট গন্ধ। সোফায় নিজেকে ঠেসে দিয়ে আর কথা খুঁজে পাই না। স্লিপিং গাউন পরা ইরফান চাচা বেশ তাজা, ঝরঝরে। সেভ করা উজ্জ্বল গাল, আন্তরিক হাসি। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে তাঁর চোখে আমাকে ঘিরে গাঢ় বিস্ময়। আমি দাঁড়াই,বলি, একটু চাচির সাথে দেখা করে আসি।

অত ভদ্রতার কোনো দরকার নেই, তিনি বলেন, তুমি বসো, এমনিই দেখা হয়ে যাবে। এ বাসায় এরকমের ভদ্রতা না করলেও চলে।

আমি বসি, কিন্তু সোফার বাক্সে বন্দি আমার অস্তিত্বে খচখচ লেগেই থাকে। না, এটা ঠিক ভদ্রতা নয়, সেদিন এসেছিলাম তিনি খুব আন্তরিক ব্যবহার করেছিলেন!

ঠিক আছে, পরে দেখা করে যেও— তিনি বলেন, এখন বলো তুমি কেমন আছ?

নাতিশীতোষ্ণ। আমি হেসে ফেলি।

চমৎকার বলেছ। তুমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অবস্থার মধ্যে আছ। আমার বুঝলে, গরমে প্রচণ্ড গরম লাগে, শীতে প্রচণ্ড শীত, ও-রকম না-গ্রীষ্ম না-শীত আমার জীবনে আসে নি। তারপর সীমাহীন স্তব্ধতা। তিনি কিছু ভাবছেন। সোফায় আধশোয়া অবস্থায় হেলান দিয়ে। ভ্যানিটি ব্যাগ হাতড়াই, মেঝেতে জুতো ঘষি, আবারো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি সেদিনকার দেখা কামরাটি। ফ্যানের চকচকে ঘুরন্ত ব্লেডের দিকে দ্রুত ধাবমান শাদা মসলিন। অবিন্যস্ত হাতে সামলে আজই লক্ষ করি, অশ্রুর মতো তার রঙ।

ভ্যানগগের জীবনী শেষ হয়েছে?

না।

কেন, আগ্রহ পাচ্ছ না?

বইটা চমৎকার। কিন্তু আমি কেমন কষ্টের মধ্যে পড়ে যাই।

কষ্টকে এড়িয়ে কি শিল্প সম্ভব নীনা ?

কী জানি! তবে কেন জানি কষ্ট খুব একঘেয়ে লাগে আমার কাছে। কষ্টের যন্ত্রণা আজকাল টের পাই কম, কিন্তু ওই একঘেয়েমি, ওটাই আর সহ্য হয় না।

ফশ্ করে লাইটার ধরিয়েছেন। ঠোঁটে সিগারেট। অতঃপর ধোঁয়া। এবং পরক্ষণেই নিঃশ্বাসের সামনে ধাই ধাই নেচে ওঠে গাঢ় সেভলনের গন্ধ। হাসপাতাল, শাদা ছাদ, বদ্ধ ঘর, সব একাকার হয়ে যায়। বমি আসতে থাকে। হাঁসফাঁস করে দাঁড়াই, আচ্ছা, আপনার সবগুলো রুমে সময় সময় এমন তীব্র সেভলনের গন্ধ! কেন বলুন তো ?

আমার মিসেসের প্রিয় গন্ধ ওটা। তিনি বলেন, পানির সাথে সেভলন দিয়ে প্রত্যেক দিন ঘর মোছায় সে। মজার ব্যাপার, জীবাণু ধ্বংসের কোনো উদ্দেশ্য থেকে যে এমনটা করে, তা কিন্তু নয়। স্রেফ সেভলনের গন্ধের জন্য।

সেভলনের গন্ধ প্রিয়! আমি আকাশ থেকে পড়ি, মানুষ সত্যিই বড় অদ্ভুত অথচ এই গন্ধটা সবচেয়ে অসহ্য আমার কাছে। মনে হয় ওটা রক্তের, মৃত্যুর গন্ধ!

তুমি অস্বস্তি ফিল করছ ? তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন।

না না, ঠিক আছে, আমি নিজেকে দ্রুত সামলে নিই। তিনি বলেন, জানো ওর আরেকটা অদ্ভুত শখ আছে, টিকটিকি পোষা। সারাঘর টিকটিকিতে ভরে যাবে, এটাই ওর স্বপ্ন। আমি হেসে ফেলি, আশ্চর্য মানুষের শখ। তারপর কেমন ঘোরে-পড়া-মানুষের মতো বিড়বিড় বলে যাই, জানেন, সেভলনের গন্ধের সাথে আমার একটি সন্তানের মৃত্যুর স্মৃতি জড়িত। এই গন্ধ পেলেই ওর চিৎকার, ওর লাশ আমার সামনে এসে দাঁড়ায়।

অ্যাশট্রেতে ছাই ঝাড়ছেন, পুনরায় টানছেন। তাঁর মুখ ধোঁয়ার কুয়াশায় ছাওয়া। একটু পর ধীরপায়ে উঠে যান তিনি। আমি তার পদবিক্ষেপে বিষণ্নতার একটা ছাপ দেখতে পাই। কিন্তু কী আশ্চর্য মানুষ, আমার এই অনুভবের মুখে কোনো প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলেন না, এক জঘন্য তেতো বিস্বাদে আমার প্রাণ অসহ্য হয়ে ওঠে। নিজের কাছে নিজেকে প্রচণ্ড রকমের বিচ্ছিরি লাগতে থাকে। আমি সেই বিশাল শূন্য ঘরে একা বসে থাকি। কেন এইরকম প্রকাশ করলাম নিজেকে ? কখনো কোথাও তো করি না ? আজ এমন গলায় আটকে থাকা জমাট শ্বাস বদ্ধ মুখ ছিঁড়েখুঁড়ে বেরিয়ে এলো কেন ? কেমন অসহায় লাগে। আমি কি চলে যাব ? কেমন হবে সেই হঠকারিতা ? একা বসে হাঁসফাঁস করি। কিছুক্ষণ পর উদ্ভাসিত মুখে তিনি প্রবেশ করেন। হাতে ইজেল। ড্রয়িংরুমের এক কোনায় স্থাপন করে ফুঁ দিয়ে ধুলো ওড়ান। তারপর শিশুর চোখে আমার দিকে তাকান, পছন্দ হয়েছে ?

আসলেই অদ্ভুত। খাঁজকাটা, কারুকাজ করা। ইজেলের এমন ময়ূরকণ্ঠী রূপ আমি আর দেখি নি। নিচের স্ট্যান্ডটাকে হাঁসের ছড়ানো পা বলে ভুল হয়। বার্নিশের বাদামি রঙে প্রগাঢ় গভীরতা। কিছুক্ষণ আগের বুকে চেপে বসা তিতকুটে অনুভবটা ফরফর কোথায় উড়ে যায়!

অদ্ভুত! আমি চেঁচিয়ে উঠি। শিল্পীর আঁকা ছবির চেয়ে তার মডেলের পোজ সুন্দর, ব্যাপারটা এরকমই ট্র্যাজিক হয়ে দাঁড়াবে। আমি এটার ওপর যা চড়াব এর সৌন্দর্যের সামনে সেটা ম্লান হয়ে যাবে না ?

এত হীনম্মন্যতায় ভোগো কেন ? তিনি বলেন, নিজের ওপর কিছুটা হলেও আস্থা রাখার চেষ্টা কর। আমি কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে তোমার আঁকাআঁকির ব্যাপারে ঝুঁকি নি। প্রথাগত

শিক্ষার অভাবে তোমার কাজে সংযম কম। কোনো ব্যাকরণ মানে নি তোমার ছবি। কিন্তু তোমার স্বতঃস্ফূর্ত তুলির টান, রঙের সিলেকশান, অপূর্ব— আমি কি একটু বেশি প্রশংসা করে ফেললাম ?

কেন, অনুতাপ হচ্ছে ? কথার ব্যাপারেও এত ব্যাকরণ মানেন আপনি! এত বেশি ভদ্রতাবোধের আবরণ দিয়ে নিজেকে তৈরি করেছেন, স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস প্রকাশের মধ্যে এত হিসেব-নিকেশ, জানেন, আমার একদম ভালো লাগে না।

ঠিক আছে, সারেন্ডার করছি। হাত তোলেন তিনি। খোলা মনে বলছি, তোমার ছবি আঁকার হাত চমৎকার। এরপর ট্রে-ভর্তি নাস্তা আসে। চারপাশে বিকেল। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। এর মধ্যে আমার আঁকা ছবিকে কেন্দ্র করে এমন একজন সমঝদারের উচ্ছ্বাস, বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি।

গ্রিক মিথ সম্পর্কে তোমার কেমন ধারণা আছে ? প্লেট থেকে টুকরো আপেল তুলে জানতে চান তিনি, আগ্রহবোধ কর ?

খুবই ভাসা ভাসা, আমি বলি, বন্ধুদের কাছ থেকে শুনে যতটুকু...।

তোমার পেইন্টিংয়ের ক্ষেত্রে এসব ধারণা তোমাকে অনেক সাহায্য করবে। রদ্যাঁর স্কালপচারে গ্রিক মিথের প্রভাব পড়েছিল। শুধু তাঁর নয়, আরো অনেক শিল্পীর, তোমার মনে হতে পারে, পুরনো আজগুবি সব গল্প। এসব শুনে মজা পাওয়া যেতে পারে, কিংবা ফালতু মনে হতে পারে সব কিছু, ভাবতে পার পেইন্টিংয়ের ক্ষেত্রে এইসব কাহিনী আবার কি ছায়া ফেলবে ?

আসলে চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে নানা-পর্বে এত বিচিত্র সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, এত বিপুল কাজকর্ম হয়েছে যে, এখন কিছু করতে গেলেই হাত কাঁপে। আমি বা আমরা এখন যা করছি, নতুন কিছু কি ? পুরাতনের পুনরাবৃত্তি নয় কি ?

তুমি কিন্তু খাচ্ছ না, তাঁর কথায় সংবিৎ ফিরে পেয়ে আমি দ্রুত পায়েশের প্লেট হাত তুলে নিই। কী মজার গন্ধ! খিদে তোলপাড় করা, অপূর্ব!

সেই কাহিনীটির কথাই ধরো— তিনি আবার শুরু করেন। খুবই প্রচলিত অরফিউসের কাহিনী— তার বাঁশির মাদকতায় স্তব্ধ বন, উড়ন্ত বিহঙ্গের ডানা বিবশ ক্লান্ত। আমি সাজিয়েই বলছি, তোমার সুবিধে হবে, বলতে বলতে তিনি আপেলের আরেকটা টুকরো হাতে নেন। পুরো ঘরে গুহার অন্ধকার ভর করে। তিনি বলেন, তো সেই অরফিউসের কমলকলি সুন্দরী প্রেমিকা ইউরিডাইসের হঠাৎ মৃত্যু ঘটে। ফলে পাগল হয়ে যায় অরফিউস। শুরু হয় তার অন্তহীন পথ চলা। যেভাবেই হোক প্রাণ সঞ্চারিত করতে হবে ইউরিডাইসের দেহে। নইলে তার বেঁচে থাকা অর্থহীন। সে মৃত্যুপুরীর দিকে রওনা দেয়। তার সুরের কান্নায় মুগ্ধ হয়ে মাঝি নদী পার করে দেয়। মুগ্ধ হয় মৃত্যু-দরজার প্রহরী তিন মাথাঅলা ভয়াল দর্শন দৈত্যরূপ কুকুর। মৃত্যুরাজ হেডেস অরফিউসের বাঁশির কান্নায় স্থবির হয়ে যায়। সে বলে, তুমি যাও, তোমার স্ত্রী তোমাকে অনুসরণ করবে, কিন্তু সাবধান, আলোক রাজ্যে প্রবেশ করার আগে তুমি পেছনে তাকাবে না। তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। নীনা, তুমি এর পরের অধ্যায়টিকেই চমৎকার করে পেইন্টিংয়ে আনতে পার। সেই ট্র্যাজিক অংশটি... অরফিউস যাচ্ছে। হাতে তার বীণা। সেই বীণায় আনন্দ! বিষাদের সুর নেই। অরণ্য প্রান্তর ছায়া অতিক্রম করে সে

হাঁটছে। অনেক পথ হাঁটার পর তার সংশয় জাগে। পেছনে তার প্রিয়তমা স্ত্রী আছে তো? সেই সংশয়ের প্রেক্ষিতে আলোকরাজ্যে প্রবেশের আগেই সে পেছন ফিরে তাকায়। কিন্তু হায়! এ-কী দেখছে সে! তার প্রেমিকা ক্রমশ অস্পষ্ট অস্পষ্টতর হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে! তুমি, বাঁশি হাতে যুবক, পেছনে প্রেমিকার অর্ধঅস্পষ্ট রূপ, পুরোটাই এ্যাবস্ট্রাক্ট ফর্মে আঁকতে পার। প্রেম নিয়ে হাজার বছর আগে থেকে সাহিত্য রচিত হচ্ছে, আসলে বর্তমানে তুমি বিষয়টাকে কীভাবে উপস্থাপন করছ, সেটাই আসল কথা। তোমার কল্পনার দৌড়, তোমার বিশেষ আঁক-রীতি, বিষয় ও আবহের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ রঙের ব্যবহার— এসবের সমাহারেই তোমার শিল্পকর্মও ঠিক ততখানিই সবার থেকে বিশিষ্ট হতে বাধ্য। আচ্ছা, শিল্পীর ওপর একটু বেশি মাতব্বরি ফলিয়ে বসছি না তো আবার?

আপনি একটু বেশি ভদ্রতা করেন, আমি হেসে বলি, আপনি শিল্পী হিসেবে আমাকে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলছেন, তাতে করে চারুকলার ছাত্ররা রীতিমতো হাসবে। যাকগে, আপনার কথা অদ্ভুত লাগছিল শুনতে। আমি জীবনের এইসব বিষয় থেকে অনেক দূরে সরে গেছি। তিনি বলেন, হৃদয়ের যত কষ্ট, গ্লানি সব এক করে ছড়িয়ে দাও শাদা কাগজে, নীনা, দেখবে কষ্ট একঘেয়ে নয়, বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে। অর্থকষ্টের যে গ্লানি আছে, অন্য কষ্টের স্রোতে সেটাও ভেসে গেছে। তখন তোমার কষ্ট ধাবিত হবে আরো বড়ত্বের দিকে। এইসব, টুকরো কষ্টকে তখন হাস্যকর মনে হবে...।

আপনি আমার কতটুকু জানেন? অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলি, কেন ভাবছেন আমার কষ্টের মূল কেন্দ্রবিন্দু অর্থ?

কখনো তা নয়, তুমি বুঝতে ভুল করেছ, তিনি প্রতিবাদ করেন। অর্থকষ্ট তোমার অনেক কষ্টের একটি অংশ। এরপর তিনি আমাকে অভিভূত, বেদনার্ত করে বলেন, একটি সন্তানের মৃত্যুর ভার যার ওপর আছে, তার সম্পর্কে কিছু না জানলেও তার কষ্টকে আমি ক্ষুদ্র করে দেখতে পারি না। আমাকে অতটা অযৌক্তিক ভেবো না।

এরপর তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে যান আশ্চর্য একটা কামরায়, যেখানে গিয়ে আমার ভেতরের পৃথিবী খুলে যায়। কী অদ্ভুত সংগ্রহ। সারবদ্ধ সাজানো শতশত বই। দেয়ালে অপূর্ব সব পেইন্টিং। আলমিরা খুলে শিটে আঁকা প্রচুর ছবি দেখালেন। বিভিন্ন দেশ থেকে সংগ্রহ করা। ধুলো জমে গেছে সব ছবিতে। কিছু-কিছু উইপোকার শিকার। আর পুরো ঘর জুড়ে কী নেশা-উদ্রেকী গন্ধ! যেন শত বছর দরজা বন্ধ ছিল। এমনই পুরনো, বিচিত্র। মাটির বালিহাঁস, ব্রোঞ্জের বিভিন্ন মূর্তি। কেমন দিশেহারা হয়ে পড়ি। টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত একটা ভারি মর্মরস্তম্ভ। আশ্চর্য! এত কালেকশান, আপনি যত্ন নিচ্ছেন না কেন? অস্ফুটে প্রশ্ন করি।

যত্ন নিতে নিতে হাঁপিয়ে উঠেছি, তিনি বললেন, ত্রিশ বছর ধরে চাকরির ফাঁকে ফাঁকেই এই সবের পেছনে ছুটেছি। আসলে সব সুন্দরেরই সমঝদার চাই। এ ক্ষেত্রে বলতে পার আমি একা-ই। পেতলের বাজপাখিটার ডানার খাঁজে ধুলো। ফুঁ দিই। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে চাচির আগ্রহের কথা জানতে চাই না। প্রশ্নটা বড় মামুলি শোনাবে। যাই হোক ভদ্রলোক আমাকে ক্রমশ অভিভূত করছেন।

ইচ্ছে করলে এইসব সংগ্রহ তুমি নিয়ে যেতে পার— এত আচমকা তিনি এই প্রস্তাব দেন যে, আমি হকচকিয়ে উঠি। তিনি বলেন, আমার কাছে এসবের গুরুত্ব কমে এসেছে। তোমার সবে শুরু। তোমার আগ্রহের যে তীব্রতা, আমার এখন আর সেটা নেই, তাই এগুলো তোমার কাছে বহুদিন যাবৎ নতুনই লাগবে। এত বছরের বিন্দু বিন্দু সংগ্রহ কী অবলীলায় দু'দিনের পরিচিত একটি মেয়েকে দিয়ে দিতে চাইছেন তিনি! এত বছর তবে আগলে রাখলেন কী করে? মায়া বলেও তো একটা জিনিস আছে।

আশ্চর্য ইমোশনাল মানুষ তো আপনি, আমি বলি, এখন আবেগ থেকে দিয়ে দিতে চাইছেন, পরে অনুতাপ হবে।

আমি সিদ্ধান্ত হঠাৎ করেই নিই। তিনি বললেন, এবং সেই সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত মনে করি। পরে এ নিয়ে আমার অনুতাপ হয় না।

আমি আবার কারো হঠাৎ-সিদ্ধান্তকে বেশি গুরুত্ব দিই না, হাসতে হাসতে বলি। কাউকে কিছু দিতে হলে, ধীরে ধীরে সেটা প্রাণ থেকে তৈরি হলেই ভালো। আমার তাই মনে হয়। এত চমৎকার সংগ্রহ, নিতে ইচ্ছে হবে না কেন? কিন্তু আমি নেব না। নেয়ার জন্যও যে নিচ্ছে তার একটা ন্যূনতম যোগ্যতা থাকা দরকার। আমার মোটেই সে-রকম যোগ্যতা নেই।

হ্যাঁ বুঝেছি, চমৎকার বিনয় তোমার। খুব যত্ন করে বালি হাঁসটাকে হাত থেকে আগের জায়গায় রেখে বড় একটা প্যাকেট এগিয়ে দিলেন— এর মধ্যে রঙ-তুলি আছে। এগুলো নিতেও তোমার কোনো প্রস্তুতির দরকার আছে?

এরপর একজন বিশেষ মানুষের প্রগাঢ় প্রভাব প্রাণের মধ্যে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসা, তাঁকে আরো ঘনিষ্ঠতায়, বিচিত্রভাবে আবিষ্কার করা, আর্ট, স্কাল্‌পচার, সাহিত্য আর জীবন নিয়ে তাঁর সঙ্গে নিরন্তর তর্কে জড়িয়ে পড়া। ফলে সালাহ্‌দিন, সত্যজিৎ আর রন্‌জুরা আমার কাছে ক্রমাগত ফিকে বিবর্ণ হয়ে আসতে থাকে। সরে যেতে থাকে দূরে দূরে। আর চাচি, প্রথম প্রথম বাসায় এসে ভদ্রমহিলার কারণে খুব অস্বস্তিবোধ করতাম। আমি জানি না তাঁর বাসায় আমার এখন এই হঠাৎ জুড়ে বসার ব্যাপারটার বিশ্লেষণ তিনি কীভাবে করছেন? প্রথম দিন তাঁর যে ব্যক্তিত্ব দেখেছিলাম, তাতে করে চাচার সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তর্কে ডুবে থেকেও ভেতরে কেমন যেন জমে থাকতাম। সারাক্ষণ একটা অস্বস্তি খচখচ করত! কিন্তু এক সময় আবিষ্কার করি, চাচার সাথে তার সীমাহীন দূরত্ব। তিনি যেন আমার মা'র অন্য এক আধুনিক সংস্করণ। এই প্রাসাদ বাড়ি আগলে রাখতে পেরেই যেন তার সুখ। এখানে তার অধিকার-অনধিকারের বিষয়ে কোনো বিকার নেই। শিল্প-সাহিত্যের ধারে কাছেও তাঁর অনুভূতি নেই। চাচার ব্যাপারে তাঁর ভয় আছে খুব। তাঁর কাছে তিনি তাই চিরকালই স্পর্শাতীত, দূরের। তাদের ওখানে আমার উপস্থিতির মুখে তাঁকে প্রতিবারই গম্ভীর, নিঃশব্দ দেখেছি। এটা তাঁর স্বভাব। এর মধ্যে গভীর কোনো পছন্দ বা বেদনা প্রচ্ছন্ন নেই। ব্যাপারটা উপলব্ধি করে আমিও ক্রমশ দুরন্ত হয়ে উঠি। তাঁর সেই উদাসীনতার আশ্চর্য সুযোগ গ্রহণ করতে শুরু করি। একেকদিন তার সাথে দেখাও হয় না, চাচার সাথে আড্ডা দিয়েই বাসায় চলে আসি। রাতে বিছানায় মুখ থুবড়ে পড়ে থাকি।

একদিন চাচা খুব কৌশল করে প্রশ্ন করেন, তোমার মা চমৎকার সেলাই জানত, সেলাইও কিন্তু একটা শিল্প, এখনো করে নাকি?

মা'র চোখের ভীষণ অসুবিধে— আমি বলি, সবকিছুই ঝাপসা দেখেন। আগে দেখতাম, নিজের সেলাই করা এটা-সেটা পাড়ায় বিক্রি করতেন। সেলাইকে শিল্প বলছেন ? সেদিক থেকে বিচার করলে, রান্নাও কিন্তু একটা শিল্প। চাচা কেমন দমে যান। যেন স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে এমন মুখ করে নিঃশব্দে বসে থাকেন। আমার ভালো লাগে সেই মুখ দেখতে। কারো কিছুকে ঘিরে জেগে-ওঠা স্বপ্নকে দপ করে নিভিয়ে দিতে আজকাল এমনই আমার সুখ। এবং সেই ম্লান মুখ পর্যবেক্ষণ করে, তার অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম সত্যকে টেনে বের করে এমনই আমার আনন্দ।

এর মধ্যে একদিন হাসপাতালে গিয়েছি। সালাহ্‌দিন অনেকটা সুস্থ। আমি হাসপাতালের সেই বিচিত্র হাহাকার কাটিয়ে উঠেছি অনেকটা। ঘা শুকিয়ে আসছে তার। টুল টেনে পাশে বসে কেমন আছে জানতে চাই। সে তার বই, প্রুফ দেখার কাজ শেষ করতে না পারার ব্যাপার-স্যাপার নিয়েই দুঃখ করে বেশি। বলে, এদেশে সাহিত্যের কোনো দাম নেই। এত খেটে গাঁটের পয়সা খরচ করে যাও-বা একটা বই বেরোলো, চলবে না। নিজে সেধে সেধে পুশিং সেল করে যে ক'টা কপি পার করা যায়। সাহিত্যচর্চাটা গরিবদের জন্য শৌখিনতা ছাড়া আর কিছুই না।

চিরকালই তর্ক করা আমার অভ্যাস। তার সেই হতাশাকে ঘিরে প্রতিবাদ করি, সাহিত্যের ক্ষেত্রটাই এমন। যুগে-যুগে গোটা পৃথিবীতে তাই হয়ে এসেছে। সারাজীবন সাধনা কর। কিছু হলে মৃত্যুর পর তার মূল্যায়ন হয়। তুমি যদি ভেঙে পড়, তবে অন্য মাধ্যম বেছে নিতে পার। মূল্য পাওয়ার, জনপ্রিয় হওয়ার অনেক সহজ পথ আছে।

কিন্তু তাই বলে একটা অনিয়ম শত বছর আগে থেকে চলে এসেছে বলে আমরা সেটাকে নিয়ম বানিয়ে মেনে নেব ? বেডে শুয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়ে সালাহ্‌দিন— এ রকম অবিচারের কোনো প্রতিবাদ করব না ?

কর, এর বিরুদ্ধে আন্দোলন কর, আমি বলি, একা একাই কর।

তুমি মনে হয় এইরকম অসহনীয় স্ট্রাগল সাপোর্ট করছ ? তার এ প্রশ্নের জবাবে আমি বলি, যত সুবিধেই তোমার চারপাশে থাকুক, মহৎ শিল্প সৃষ্টি কোনো সংগ্রাম ছাড়া সম্ভব নয়। অবশ্য চারপাশে কিছু সুবিধে থাকলে, শিল্প সৃষ্টির প্রাপ্তি থাকলে জীবনের নির্মমতা অনেকটা কমে আসে, সংগ্রাম হয় একান্ত ব্যক্তির। প্রাত্যহিকতার সাথে যুদ্ধ করে যে মেধার অপচয় ঘটে, শিল্পের পেছনে সেটা ঢালা যায়। আমি তোমার ক্ষোভকে অস্বীকার করছি না।

সেই তো ফিরে তুমি আমার যুক্তির পথেই এলে, কথা বলতে বলতে বিছানায় কেমন ঝিমিয়ে পড়ে সালাহ্‌দিন।

তারপর হেঁটে-হেঁটে সেই কামরাটায় যাই, যেখানে শয্যাশায়ী আহত ওমরের ভাই। নিঃশব্দ পায়ে তার সিটের পাশে দাঁড়াই। রক্তাক্ত একজন লোককে টানতে-টানতে একটা সিটের পাশে মাটিতে শোয়ানো হলো। কী অসহ্য চিৎকার তার। পুরো মেঝেতে রক্তের টানা দাগ। তার চারপাশ ঘিরে রেখেছে বিলাপরত আত্মীয়স্বজনরা। রক্তের ছোপে ছোপে মাছিদের হল্লা। সেদিক থেকে চোখে ফিরিয়ে কিশোরের দিকে তাকাই। গলা পর্যন্ত তার শাদা চাদরে ঢাকা। ছাদের দিকে ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে আছে। চোখে অসম্ভব ভয়। সেই ছেলেটির মা, সেই বৃদ্ধা তখনো বাতাস করে যাচ্ছেন। একটু পর ওষুধ হাতে ওমর আসে। আমাকে দেখে

একজন অসুস্থ রোগীর সামনে এমনভাবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, রীতিমতো অস্বাভাবিক লাগে। কী আশ্চর্য! আমি ভাবতেই পারি নি, আপনি আবার আসবেন।

কেন ? সেদিন তো বলে গেলাম, আবার আসব।

এরকম কথা তো কতজনই বলে, ওমর শব্দ করে হাসতে থাকে। সত্যি আপনার আন্তরিকতার প্রশংসা করতে হয়।

দেখুন, আমি আপনাকে নয়, আপনার ভাইকে দেখতে এসেছি, তার উচ্ছ্বাস বিরক্তিকর হয়ে উঠায় তাকে দমিয়ে দিতে চাই।

আমি কি বলেছি আপনি আমার জন্য এসেছেন ? তার এই প্রশ্নে এইবার আমি হেসে ফেলি।

কিন্তু এত স্বল্প পরিচয়ে এসব প্রসঙ্গ কী রকম বেখাপ্পা লাগতে শুরু করে। একে তো নোংরা বিপর্যস্ত চেহারা; তাছাড়া কেমন গায়ে-পড়া ভাব। লোকটাকে সত্যিই বিরক্তিকর লাগতে থাকে। সবচেয়ে অসহ্য প্রস্তাব দেয় সে বারান্দায় বেরিয়ে, আমি কি আপনাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি ?

কী বলছেন আপনি ?

আপনি কি আমার কথা শোনেন নি ?

শুনেছি। ঠাণ্ডা গলায় বলি, অতটা না করলেও চলবে।

আপনি কি আবার আসবেন ? জানতে চায় সে। ওহ্ বলাই তো হয় নি, সেদিন আপনার বন্ধুকে দেখতে গিয়েছিলাম। অনেক কথা হলো।

খুব ভালো করেছেন। বলে আমি সিঁড়িতে পা বাড়াই।

ও কি আপনার ক্লাসমেট ছিল ?

হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন ?

ক্লাসমেট ছাড়া এ দেশে মেয়েরা মন খুলে কোনো ছেলেকে বন্ধু বলতে দ্বিধা করে কি-না!

না, ক্লাসমেট ছিল না, তাছাড়া দ্বিধান্বিত হওয়ার মতো বাস্তবতা আমি কাটিয়ে উঠেছি সেই কবে।

আপনি কি বিরক্ত বোধ করছেন ?

না।

তারপরও টের পাই, লোকটা পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে অনুভব করি তার প্রতি বিরক্তি কমে আসছে। কারণ তল্লাশ করতে গিয়ে আবিষ্কার করি, যত অসহ্য চরিত্রেরই সে হোক, সে আমাকে গুরুত্ব দিচ্ছে খুব। আমাকে তার গুরুত্ব দেয়া কী, তার প্রতি আমাকে নরোম করে তুলছে ?

কিন্তু মাত্রাধিক গুরুত্ব যে অসহনীয়, সেটা টের পাই আরো কিছুদিন পর। তার আগে আমার নিঃসঙ্গ রাতের মধ্যে ঝরে পড়তে থাকে সার সার শীত, আমি কুঁকড়ে যাই, ফের দাঁড়াই, রক্তের মধ্যে মিশে থাকে মিহিগুঁড়ো নোনতা জল, শ্মশান রাত্তির পেরোনোর পর সেই একঘেয়ে হিসেবের সকাল... আলো নেই, স্বপ্ন নেই, কেবল দৃষ্টির সামনে অদৃশ্য চক্রবাক...।

এই রকম যখন দিন যাচ্ছে, এর মধ্যে আরেফিনের এক রুমমেট আসে বাসায়। জানায়, বাড়ি থেকে আরেফিন এসেছিল। হল তল্লাশি হয়েছে, ওর খাটের নিচে অস্ত্র পাওয়া গেছে। গেটের কাছে খবর পেয়েই সে গা ঢাকা দিয়েছে। রুমমেটের ভাষ্য— অস্ত্র রাখার মতো অত ডেসপারেট রাজনীতিতে এখনো আরেফিন যায় নি। ওটা ওর কোনো বিপক্ষ দলের কারো কাজ। ব্যক্তিগত শত্রুতা ওর অনেকের সাথে আছে। এখন হলে তালা। সে আপাতত বাড়ি যাচ্ছে। বাবার অবস্থা খুবই খারাপের দিকে, আমি যেন খবর পাওয়া মাত্র চলে যাই। সবকিছু শুনেটুনে কেমন বিমর্ষ হয়ে পড়ি। বেতন পেয়েছি, হাতে কিছু টাকা এখনো আছে। তাছাড়া রন্জুর দেয়া টাকাটা খরচ হয় নি। আরেফিনের জন্যই রেখেছিলাম। বাড়ি যেতে হলে এই মুহূর্তে এই টাকাটা খুবই কাজে লাগবে। কিন্তু অফিস থেকে ছুটি পাওয়াই একটা সমস্যা। সর্বত্র চাপা ক্ষোভ। বিন্দুমাত্র নড়চড় বস ক্ষমা করছেন না। তাছাড়া ভেতরে ভেতরে কেমন একটা আতঙ্ক, আরেফিনের খাটের নিচে অস্ত্র। এমন বিপজ্জনক অবস্থায়ও বাস করে ও ? অন্য কেউ অস্ত্র রেখেছে— এ আমাকে সান্ত্বনা দেয়া নয় তো ?

তুমিও কি পার্টি কর ? রুমমেট ছোকরাকে জিগ্যেস করি।

করি, আরেফিনের সাথেই।

আচ্ছা, এ ব্যাপারটা আমি একদমই বুঝি না। কেন এত ঝুঁকিপূর্ণ রাজনীতির সাথে নিজেকে জড়িয়েছ ? ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য ?

বাহ্ আমি ক্ষমতায় যাব কেন ? আমার দল যাবে। এইরকম অবিচারকে প্রশ্রয় দিয়ে চুপ থাকতে বলেন ?

কী রকম অবিচার ?

এই যে ছাত্রদের ওপর পুলিশের হামলা, বাজারে জিনিসপত্রের উর্ধ্বগতি, কোটি-কোটি টাকার ঋণে জর্জরিত করে দেশকে দেউলিয়া করে তোলা, আরো শুনবেন ?

আসলে তোমাদের রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য কী ? আমি ঠিকমতো তোমাদের বুঝে উঠতে পারছি না। সব ছেড়ে তোমরা কিসের পেছনে ছুটছ ? সত্যিই কি তোমরা দেশের কল্যাণ চাও ? না-কি দলীয় স্বার্থেই যা করার করছ ? আমার এই প্রশ্নে সে বলে, রাজনীতি সম্পর্কে অত অ্যাকাডেমিক পড়াশোনা আমার নেই, এ ব্যাপারে আমরা আমাদের ভার্সিটির নেতার আদর্শকে ফলো করি বেশি। তবে এটা বুঝি, ভীষণ দুঃসময়ের ভেতর দিয়ে আমাদের চলতে হচ্ছে। আমরা এক ভয়ঙ্কর অবস্থার শিকার। কল্পনা করতে পারবেন না, সর্বত্র কী ভয়ানক অনাচার চলছে।

কিন্তু আমি যতদূর বুঝি, দেশের কল্যাণের জন্য তোমরা কেউ ক্ষমতা চাও না। তোমরা যে লোভে সরকারকে টেনে নামাতে চাইছ, সরকার সেই একই লোভে প্রাণপণে গদি আঁকড়ে আছে। ক্ষমতার লোভ কার নেই ? আমার এ-কথায় সে ঝাঁঝ-মেশানো স্বরে বলে, আগে তো সামনে পড়ে থাকা কাচের টুকরো সরাই, তারপর আমরাও যদি কাচ বিছিয়ে রাখি, সেটা সরানোর জন্যও নিশ্চয়ই পরবর্তী প্রজন্ম থাকবে। অনাচার সব সময়, সব দেশের জন্যই সমান অনাচার। স্বেচ্ছাচারিতার দুর্ভোগ কেমন হয়, সে-তো ইরাককে দিয়েই দেখছেন। হাজার হাজার মানুষ সাফার করছে।

যুক্তরাষ্ট্র কি কম স্বেচ্ছাচারিতা করছে ? ভাসা জ্ঞান থেকেই আক্রমণটা করি, সাদ্দাম স্রেফ কুয়েত দখল করেছে, আর গোটা বিশ্বকে আঙুলের ডগায় তুলে নাচাচ্ছে যে মার্কিন, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কোথায় ? নাকি সে পৃথিবীর মাথা বলে সবকিছু কিনে নিয়েছে ?

আপনি সাদ্দামকে সাপোর্ট করছেন ?

আমি কোনো স্বেচ্ছারিতাকেই সাপোর্ট করছি না। ফকল্যান্ড দ্বীপ এবং কুয়েত দখল... দুটোই আমার কাছে সমান অপরাধ। আমি অসম্ভব সুবিধাবাদী মানুষ। রাজনীতি করি না। রাজনীতির অত প্যাঁচও বুঝি না। সারাদিন নিজের আনন্দ-বেদনার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছি, সে-জন্যই তো তোমার কাছে বিষয়গুলো বিস্তারিত জানতে চাইছি।

এই যে শহরে হরতাল হচ্ছে, আন্দোলন হচ্ছে, সাদ্দামের প্রসঙ্গে ফেটে পড়ছে বিশ্ব, অসহিষ্ণু শোনায় ছেলেটির গলা, আপনার কোনো রকম বিকার নেই বলতে চান ?

বিকার থাকবে না কেন ? কিন্তু যখন শুনি হলের মধ্যে অস্ত্র মজুদ থাকে, বাবা-মা'র কষ্টার্জিত উপার্জনে পড়তে আসা ছেলেরা নানা ঘটনার যোগে মাস্তানে পরিণত হয়, তখন সাধারণ মানুষ হিসেবে আমার ভয়টাই লাগে বেশি। আর হয় অশ্রদ্ধা। শহরের মানুষ হুজুগে মাতাল। সাদ্দামকে ঘিরে ওরা হুজুগে না মাতলে সরকারের বিরুদ্ধে তোমাদের পথের আন্দোলনটা এভাবে ভেস্তে যেতে পারত না। আমি বলি, হরতাল হলে আমি ব্যক্তিগতভাবে কোনো লাভ বা ক্ষতি অনুভব করি না। অফিসে যেতে পারি না, ঘরে একঘেয়ে সময় কাটে... এইটুকুই অসুবিধা বোধ করি। ছেলেটা দাঁড়ায়... আপা, দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাচ্ছে। যখন ছুরিটা আপনার বুক এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করবে, তখন ঠিকই জাগবেন, কিন্তু তখন আর সময় থাকবে না। আমি হাসি— আমার তো সেটাই ভয়... ছুরিটা কখন বুকে এসে বেঁধে... আরেফিনকে নিয়ে সে জন্যই তো আমার চিন্তা, তুমি হয়তো ক্ষুব্ধ হচ্ছো আমার এরকম স্বার্থপরের মতো চিন্তা দেখে। কিন্তু বিশ্বাস কর, আমাকে তোমাদের দলীয় কোন্দল, স্বার্থপরতা, ক্ষমতার লোভ... এসব কিছুই টানে না। শুধু একজন ছাত্র যখন গুলিবিদ্ধ হয়, আমি অসহায় একটা পরিবারের কথা ভেবে বিচলিত হই। ছেলেটার রক্তের ওপর পা রেখেই তার দল ক্ষমতায় যায়। সেই রক্তের সুফল ভোগ করে। তার কথা তখন তারা মনেও রাখে না। তুমিও তো রাজনীতি সম্পর্কে আমাকে কোনো সার্বিক সুস্থ ধারণা দিতে পারলে না। আমার এই নির্বিকারত্বকে ঘা দিয়ে জাগানোর জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন সেকি তোমাদের আছে ?

আমি আরেকদিন আসব... ছেলেটি চলে যেতে যেতে বলে। আপনার এখান থেকে বড় কষ্ট নিয়ে গেলাম।

আমি দুঃখিত, যদি তোমার স্বপ্নভঙ্গ ঘটিয়ে থাকি। তুমি একটু আরেফিনকে দেখো।

এতক্ষণ ছেলেটার সঙ্গে কথা বলেও মনের অন্ধকার দূর হয় না। থেকে যাই সেই পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকারের ঘেরাটোপে। তবে আজই প্রথম অনুভব করি, আরেফিন আমার কাছে ভালো মানুষের এক নিখুঁত মুখোশে আবৃত থাকে। ওকে নিয়ে আমার নিশ্চিন্ত থাকার কোনো কারণ নেই। এরি মধ্যে সে তার চারপাশে শত্রুর মাথা তুলে দাঁড়াবার সুযোগ করে দিয়েছে। নিজেকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। কেমন এলোমেলো, অসংলগ্ন লাগে। কী করব ভেবে না পেয়ে অস্বস্তিকর এক দ্বন্দ্বের ঘোরে বসে থাকি।

আরেফিনের এক রুমমেট মারফত অফিস বরাবর একটা দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়ে পরদিন আমি বাড়ির দিকে রওনা দিই। কেন যেন গতকাল থেকেই বেশ অস্থির লাগছে। প্রাণের সুগভীর শেকড়ে হ্যাঁচকা টান পড়ে যেন। নিজেকে প্রবল খুঁড়ে পাতাল থেকে প্রশ্ন ওঠে, আমি কি শেকড়চ্যুত, অনিকেত কেউ ? কেন দীর্ঘদিন ধরে বাড়ি যাওয়ার টান অনুভব করি না ? নিজের এই পলায়নপরতাকে বেশি প্রশ্রয় দেয়া ঠিক না। কেননা, আমি যেখানেই যাই এর বিন্দু কণাগুলো আমার রক্ত কণিকার সাথে হাঁটছে। সেই ছায়া, যাকে অস্তিত্ব ঝাঁকিয়ে ছুঁড়ে ফেলতে চাই, আমাকে জাপটে ধরে দ্বিগুণ। তাহলে এই সিদ্ধান্তে আসছি না কেন যে যুদ্ধ করব মুখোমুখি, ছায়ার ভেতরে প্রবেশ করেই।

ট্রেনের জানালার হাওয়া রীতিমতো মুখে চড় বসাচ্ছে। তারপর যেন বহু পথ হেঁটে, সহস্র বছর পর আমি সেই পুরনো গলিতে পা রাখি। অতি চেনা প্রাচীন দরজায় পা রাখি। আগে বুঝি নি, এই দরজায় পা রাখলেই আমার পুরো অস্তিত্বে এমন ধ্বস নামবে, কেঁপে কেঁপে উঠবে শরীর, ঘরে ঢুকতে প্রথমেই বাবার শয্যা। বাইরের রুমের খাটে লাশের মতন পড়ে আছেন তিনি। পাশের ঘরে রানুর কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। এঘরে আর কেউ নেই। একটা বেড়াল মেঝেতে বসে শিশুর মতো হাই তুলছে। দিনের আলো ফুরিয়ে এসেছে। আমি কাঁপা, শূন্য চোখে বাবার বিছানার দিকে তাকিয়ে থাকি। হারিকেন জ্বালিয়ে মা পাশের ঘর থেকে আসেন। নিঃশব্দে টেবিলে হারিকেনটা রেখে দরজার দিকে তাকান।

কে ?

আমি।

টের পাই মা ঝাপসা দেখছেন। কাছে এগিয়ে আসি। আমার গায়ের লোম শিরশির করছে। ভেতর থেকে অবিশ্রান্ত ঢেউ, গলার কাছে এসে ধাক্কা খাচ্ছে। ব্যাগ কাঁধে অসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি।

কাছে এসে মা ধনুকের ছিলার মতো টানটান হয়ে উঠেন। একটা পুরনো সবুজ শাড়ি গায়ের সাথে লেপ্টে আছে। মুখের চামড়া আরো কুঁচকে গেছে। চুল কেমন জটা ধরা। কাছে আসতেই কাপড়ের উৎকট বিশ্রী গন্ধ নাকে আছড়ে পড়ে। কেমন ঘুলিয়ে যাই। মা এত ক্ষয়িষ্ণু হয়ে গেছেন ?

মা'র সেই কুঁচকানো ক্ষীণ হাত সস্নেহে চেপে ধরি। সেই ঝাঁঝড়া ডালে ভর করেই ভেতরে ঢুকি। ধীরে ধীরে বাবার বিছানার কাছে যাই। দরজায় দাঁড়িয়েছে রানু। পেছন পেছন মন্টুও। এ ক'দিনে সে বেশ জোয়ান হয়ে উঠেছে। কী অদ্ভুত ছায়া সারাটা ঘরে। সেই সাথে ভ্যাপসা গরম। বাবার শরীর চাদর দিয়ে ঢাকা। আমি হতবিহ্বল চোখে সেই ক্ষীণ আকৃতির দিকে চেয়ে থাকি।

তাঁর একটা হাত টেনে নিয়ে অস্ফুটে ডাক দিই, বাবা! একবার দু'বার।

তিনি ফ্যালফ্যাল তাকান। কিন্তু আশ্চর্য প্রতিক্রিয়াশূন্য সেই দৃষ্টি। কেমন আছেন ? মনের গভীর থেকে উচ্চারণ। তিনি হাঁ করেন কিছু বলার জন্য। কিন্তু গলা দিয়ে গোঁ-গোঁ আওয়াজ হয় শুধু। আমার অস্থিমজ্জা নিঃসাড় করে দিয়ে তখন নীল রক্তের কম্পন, বাবার এই অবস্থা হয়েছে ? তাঁর হাত আরো সজোরে চেপে ধরি। এত অপরাধী লাগছে নিজেকে। পরক্ষণেই পেছনে কান্নার শব্দ শুনতে পাই। নিরন্তর ক্ষত-বিক্ষত মহিলাটি অবিশ্রান্ত ধাক্কায়

কাঁদতে শুরু করেছেন। কী বিচিত্র হারিকেনের আলো— সিলিং স্পর্শ করলে, মেঝে করে না। নানা জায়গায় মাটি ভেসে ওঠায় ভঙ্গুর মেঝেতে ঝাঁপসা আঁধার। কয়েকটা মাকড়সা জালের দড়িতে দোল খাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর অপরিচিত জড়তা-জড়ানো পায়ে মন্টু এগিয়ে আসে, কেমন আছ আপা ? ওর চুলে হাত রাখি, ভালো। মাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে রানু, কাঁদছেন কেন ? কেঁদে কোনো লাভ আছে ?

চিরকাল লাভ-লোকসানের হিসেবটাই বুঝলি— ভাবতে ভাবতে রানুর দিকে খরো দৃষ্টিতে তাকাই। আগের সেই বর্ণাঢ্য সজ্জা নেই ওর। কেমন ম্লান হয়ে এসেছে মুখ, সমস্ত উজ্জ্বলতা থিতিয়ে এসেছে। অবশ্য আমার বিয়ের আগের থেকেই তার এই অবস্থার শুরু। ফ্যামিলি নিয়ে আসার পর ওর জীবন থেকে যখন মজুমদারের ছায়া সরে যেতে শুরু করেছে। এখন নাকি রানু কেমন বিকারগ্রস্ত হয়ে উঠেছে, আরেফিন বলেছিল। অনেক বন্ধু-বান্ধব জুটে গেছে তার। বাসাতেই আড্ডা হয়। বাইরে বেরোয় না। মেঝে জুড়ে তেলাপোকার হল্লা। একটি কুকুরকেও দেখি, গন্ধ শুঁকতে-শুঁকতে ঘরে এসে ঢুকেছে। ছোট্ট বেড়ালটার সাথে তার যুদ্ধ লেগে যায়। হেই... মা'র ক্ষীণ হাত নড়ে ওঠে। এ নিয়ে আর কারো কোনো বিকার দেখি না। বাবার এই অবস্থা কবে থেকে ? আমাকে জানাস নি কেন ? রানুর কাছে জানতে চাই। ব্যাগের ভেতর থেকে বাবার জন্য আনা আপেলগুলো মন্টুর দিকে এগিয়ে দেই। রানু যেন গুনগুন করে গান করছে এমন ভঙ্গিতে বলে— হপ্তা খানেক আগে অবস্থা খুব খারাপ হলে হাসপাতালে নিয়ে যাই। তারপর থেকেই জবান বন্ধ। ডাক্তার বলেছে, আর ভালো হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাই নিয়ে এসেছি। তোমাকে জানালে কী হতো ? রানুর গ্রীবা উচ্চকিত করার ভঙ্গির মধ্যে একটা অদ্ভুত শ্লেষ ফুটে ওঠে।

তুই এখানে থেকে কোন আসমানটা জয় করছিস ? মুহূর্তে খেপে উঠি। তোর বেয়াদবি অসহ্য পর্যায়ে চলে গেছে রানু, একটু সংযত হয়ে কথা বলবি। মন্টু রানুকে ধাক্কায়— তুমি চুপ কর তো।

ঠিকই তো বলেছি। রানু ঝাঁঝালো স্বরে বলে, উনি তো মেহ্‌মান। খবর দিয়ে উনাকে আনতে হবে। রাগে-দুঃখে ছটফটিয়ে উঠি। দাঁতে দাঁত চেপে বলি, আমার যেন কত অবসর। কোথায় কী হচ্ছে সব খবর রাখব। তোর মতো তো বাড়তি যোগ্যতা আমার নেই। রূপ বিক্রি করে ঘরে বসে টাকা কামাতে পারব। মা এবারে প্রায় লাফিয়েই উঠেন— এতদিন পর, এতদূর জার্নি করে এলি, কোথায় হাত-মুখ ধুবি, ভাত খাবি, কী সব বলছিস! পাগল হয়ে গেছিস তুই ?

হ্যাঁ হ্যাঁ দেন, রানুকেই সাপোর্ট দেন— আমার গলায় কান্না আটকে আসে, চিরকাল তো তাই দিয়ে এসেছেন। মন্টু রানুকে টেনে নিয়ে যায় পাশের ঘরে। মা সস্নেহে আমার পিঠে হাত রাখেন। সারাজীবন এই ভুলটাই বুঝলি আমাকে, আর জেদ করলি। জেদ করে কী হয়েছে ? নিজের সর্বনাশ ছাড়া ? এখন একটু বুঝতে শেখ। আমি মা, আমার কাছে সব সন্তানই সমান।

এভাবেই অস্বস্তিকর একটা অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে।

রাতে বিছানায় শুয়ে রানু আর আমি অদ্ভুতভাবে সহজ হয়ে উঠি। দীর্ঘদিন পর সেই পুরনো নস্টালজলিক ছাদের নিচে শুয়ে আমরা দু'জন কেমন অভিভূত হয়ে পড়ি, ওর প্রতি আমি এক অদ্ভুত মায়া, দূর থেকে এ্যদ্দিন যা উপলব্ধি করি নি আর কেমন এক নিগূঢ় টান

অনুভব করি। টের পাই চোখে জল উপচে আসছে। রানু অবশ্য অত দ্রুত সহজ হয় নি। বিছানায় উপুড় হয়ে কাঁদছিল। এতদিন পর বাড়ি এসে প্রথমেই রানুকে এভাবে আক্রমণ— আমার ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল। আমি ওর মর্মবেদনা টের পাই। টের পেয়ে আমার চার গুণ কষ্ট বাড়ে। কিন্তু এমন নাজুক ঘটনার পর ওকে টেনে সহজ হওয়াও হয়ে উঠছিল না।

আরেফিন ফেরে অনেক রাতে। সে ফিরে পরিবেশটাকে আরো যন্ত্রণাময় করে তোলে। আমাকে দেখেই তার সে কী উচ্ছল আনন্দ। তারপর জানতে চায় রানুর কান্নার অন্তর্নিহিত কারণ। মন্টু পুরো ঘটনা চুলচেরা খুলে বলে মাথা নিচু করে বসে থাকে। সব শুনে আরেফিন সোজা সাপ্টা উত্তর দেয়— সত্যি কথা সহ্য করতে এত কষ্ট হলে নিজেকে বিকিয়ে দেয়া কেন ? যে পথে রানু চলেছে, সে পথে চলতে হলে দুটো কান ছেঁটে ফেলাই ভালো।

আরেফিনের কথা কানে গেলে আরো গভীর হয় রানুর কান্না। এক অসহায় বিপন্ন শিশুর মতো ঘরের কোণে বসে নিজেকে উপুড় করে দিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে সে। আর বিভক্ত আমি আত্মগ্লানিতে ছটফট করি। আমি রানুকে কেন সহ্য করতে পারছি না ? মজুমদারের জন্য ? ব্যাপারটার পক্ষে জোরালো কোনো যুক্তি খুঁজে পাই না। তবে কি দায়ী সেই মহিম ? মনে পড়ে, একদিন কী গভীর কণ্ঠে বলেছিল, নীনা, আমি ঠিক বোঝাতে পারব না, কেন আমি রানুর প্রতি এমন আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম। ওর সৌন্দর্যের মধ্যে আছে অদ্ভুত এক নির্জনতা। সমস্ত পৃথিবী ঘুরে, এক জীবন পেরিয়ে গেলেও মানুষ যার দেখা পায় না। তার এসব কথার মুখে আমি নিঃশব্দে, অপ্রতিরোধ্য জল সজোরে ঠেকিয়ে দুটো কলম নিয়ে ঠোকাঠুকি খেলছিলাম। সে বলেছিল, তোমাকে এসব কখনো বলতে চাই নি। কিন্তু আমি কী করব ? এত চমৎকার সরল মেয়ে তুমি! তোমাকে ঠকাতে আমার ভীষণ গ্লানি হচ্ছিল।

তার এইসব কথার স্রোতে আমার ভেতর রানুর অবয়ব ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। তার সেই যন্ত্রণাময় অনুভবে নির্দোষ রানু এমন অসহ্যভাবে আমার অস্তিত্ব থেকে ক্রমশ গভীর গহ্বরে তলিয়ে যেতে থাকে যে, আমি হাত বাড়িয়েও এক সময় তার স্পর্শ পাই না। সেটাই কি তবে মূল কারণ ? কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না। সবাই শুয়ে পড়ে। বাবা-মা এক বিছানায়। মন্টু, আরেফিন মেঝেতে। অন্য ঘরে গিয়ে নিঃশব্দে আমি আমার আড়ষ্ট হাত রানুর পিঠে রাখি। রানু সেই স্পর্শে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ে। সারা ঘরে হারিকেনের টিমটিমে আলোর চিত্র-বিচিত্র ছায়া। সহসা কিছু কথা বলতে পারি না। ওর পাশে বিছানায় শুয়ে পড়ি। হাত তেমনই নিশ্চল পড়ে থাকে ওর কম্পিত দেহের ওপর। হারিকেনের ধোঁয়ায় তামাটে দেয়াল ধরে অনেকগুলো টিকটিকি। কেমন তেলচিটচিটে ভ্যাপসা গন্ধ বিছানায়।

বালিশের কভারগুলো ধুতে পারিস না ? নিজেকে সহজ করার জন্য প্রশ্ন করি। রানু নিরুত্তর।

বাসার অবস্থা এমন হয়েছে, এসে কষ্টই লাগছে। আসলে আমার মা-বাবারা বড় দুর্ভাগা, আমরা তাদের জন্যে কিছুই করতে পারলাম না। গুমোট ঘরের স্তব্ধতা ভেঙে চলি এইসব বলে বলে। রানু ক্রমশ স্থির হয়ে আসছে। জড়তা কাটিয়ে এবার অন্যরকম গলায় বলি, আমি জানি, তখন এসব বলা আমার উচিত হয় নি, কিন্তু...।

ঠিক আছে, আর অনুতপ্ত হতে হবে না, রানু আমার দিকে পাশ ফিরে শোয়।

কেমন আছিস তুই ?

রানু ম্লান হাসে। তারপর বলে, আমার কথা বাদ দাও। তোমার কথা বলো, তুমি কেমন আছ ?

আমার কী খবর জানতে চাইছিস ?

বাহ্, খবর তো সব তোমারই। জানার জন্য আমার জান ফেটে যাচ্ছিল। আর তুমি কিনা এসেই...। শিশুর মতো চোখের জল মুছে সে সহজ হয়ে আসতে থাকে। কী যে হয়, আমার গলায় জড়তা, মাঝে মাঝে মাথা ঠিক থাকে না। তুই সব ভুলে গিয়েছিস, বল ?

ভুলে গিয়েছি, রানু শিশুর মতো হেসে ফেলে, এখন তোমার কথা বলো।

এবার আমার কণ্ঠনালিতে সহস্র নখের থাবা। কী বলব ওকে ? যে তীক্ষ্ণধার বল্লম নিরন্তর খুঁচিয়ে চলেছে আমাকে, আমার এতদিনের দাম্পত্য জীবন, আমার স্নায়ু-অবশকরা অধ্যায়, যা ফেলে এসেছি, কেন ফেলে এসেছি, তার কি কোনো সুশৃঙ্খল কারণ আছে ? আমি কি বোঝাতে পারব যে লোকটা সত্যিকার অর্থে তেমনভাবে কোনোদিন হাত তোলে নি আমার গায়ে, গভীর রাতে মদ খেয়ে ফেরে নি, পরনারীতে আসক্ত হয় নি, আমি সেই চরিত্রের কী বিশ্লেষণ করব এবং কতটা সুস্থ যুক্তির পক্ষে দাঁড় করাতে পারব নিজেকে ?

বিয়ের রাতে কী অদ্ভুত এক আচ্ছন্নতা থেকে মিলিত হচ্ছিলাম তার সাথে। প্রচলিত হিসেবে আমি তখনো কুমারী। আনন্দের সাথে সাথে কী ভয়ানক বিষযন্ত্রণা! সুখ আর কষ্টের স্ববিরোধী প্রতিক্রিয়ায় ছটফট করছিলাম। সেই হিংস্র-হয়ে-ওঠা পুরুষটি সব প্রতিরোধ ঠেলে ক্রমশ এগোচ্ছিল। আমার কণ্ঠ-নির্গত-যন্ত্রণাধ্বনি উপেক্ষা করে এক সময় ঘর্মাক্ত অবসন্ন সে উঠে দাঁড়ায়। আমি নিঃসাড় শুয়েছিলাম মেঝেতে। পুরো চাদর আর মেঝে রক্তের স্রোতে ভেসে যাচ্ছিল।

সেই দৃশ্য দেখে সে যেন চেতনালোকে ফিরে আসে। কী গভীর কুৎসিত বাস্তবতা! আমি কী করে রানুকে বোঝাবো ? পর মুহূর্তে সেই মানুষের গায়ে কেমন এক দৈবশক্তি ভর করেছিল। আমাকে চ্যাংদোলা করে সে যখন শূন্যে উঠায়, আমার মনে হয়েছিল, এ হুবহু মজুমদারের হাত। আমার অমন দেহখানা নিয়ে সে ঘরময় চক্কর খায় আর মস্তিষ্ক বিকৃত লোকের মতো বিড়বিড় করে, উফ্ নীনা, কী যে আনন্দ হচ্ছে আমার!

আমি হতবিহ্বল। রক্ত দেখে লোকটা পাগল হয়ে গেছে ? পরক্ষণেই আমার ঠাণ্ডা করোটিতে তার উচ্ছ্বসিত তীক্ষ্ণধার শব্দগুলো সশব্দে ধাক্কা খায়। তুমি সতী! আশ্চর্য! বিশ্বাসই হচ্ছে না আমার। এরপর ধপাস করে আমাকে নিচে ফেলে দিয়ে সে বানরের মতো হামাগুড়ি দেয় আর সেই রক্তকণা সমানে দু'হাতে মাখতে থাকে, আমি তোমার জীবনে প্রথম ?

মানে ? আমার শূন্য ফাঁপা দেহ জলে পতিত হয়, চারপাশে সার সার শ্যাওলা, ক্ষুদে সব কীট, ঝাঁঝাঁ রোদ, দিকচিহ্নহীন নির্জলা ঢেউ, আমি তলাতে থাকি— তুমি এসব কী বলছে ? তুমি কী ভেবেছিলে ?

এত বন্ধু ছিল তোমার! এর আগে প্রেমও ছিল, মানে... সে বিরাট কিছু পাওয়ার সুখে কেবল খেই হারাতে থাকে।

আমি কি রানুকে বোঝাতে পারব প্রথম রাত থেকেই কী অপরিসীম ঘৃণা নিয়ে আমার দাম্পত্য জীবন শুরু হয়েছিল ? সীতার অগ্নিপরীক্ষার গ্লানিময় বিবমিষায় সে-রাতে আমারো ইচ্ছে হয়েছিল ধরণীকে দু ফাঁক করি ? কিন্তু মাটি তো আমার মা নয়, আমাকে ঠাঁই দেবে।

এসব কিছুর পর আরো কত দুর্বিষহ দিন আর রাত। এই দুর্বহ-দুর্বিষহতার চূড়ান্ত ফল আমার সন্তানের মৃত্যু। নিজেকে চেপে নিঃশ্বাস টেনে আমি বলি, রানু আমার বাচ্চাটা মরে গেল। কষ্টে আমার বুক ফেটে যাচ্ছিল। তোরা কেউ একবারের জন্যও গেলি না। রানুর শরীর শিথিল হয়ে আসে। সে সহসা কিছু বলতে পারে না। একথা বলার পর নতুন করে স্রোত আমার ভেতর থেকে জেগে উঠছে। হাত পা নিঃসাড় হয়ে আসছে আর নতুন করে জন্ম নিচ্ছে ক্ষোভ। গলার কাছে জল জমে দম আটকে আসছে। রানু খুব অস্পষ্ট স্বরে বলে, বাবার অবস্থা তো জানো। মা কত কেঁদেছেন, বাবাকে ফেলে কী করে তিনি যাবেন? আর আমি? বলতে বলতে সে থেমে যায়। আবারো মিনমিন করে, আমার মনে হচ্ছিল আমি গেলে তোমার যন্ত্রণা আরো বাড়বে। তাই, এত কষ্ট হচ্ছিল, তবুও... তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না, আরেফিনের কাছ থেকেই তোমার সব খবর নিতাম। সলতে বেশি কমানো ছিল। চিমনি আঁধার করে হঠাৎ আলো নিভে যায়। পুরো ঘর অন্ধকারে ডুবে গেলে রানুর হাতে পাখা মচমচ শব্দে বাতাস করে। আমি ওর গায়ে সেই পুরনো ঘ্রাণটা পাই।

আমি এবার প্রসঙ্গ বদলাই। বলি, বাইরে থেকে সব কিছুই রঙচঙে মনে হয়, রানু এখন তোর ব্যাপারটা তুই আমাকে খুলে বল তো, অবশ্য তোর যদি ইচ্ছে থাকে। মজুমদারের পুরো ব্যাপারটা আসলে কী? তাছাড়া কী সব বন্ধু-বান্ধব, বাসায়, বাবার চোখের সামনে! কার ওপর জেদ করছিস? রানুর হাতপাখা থেমে যায়। গরমে হাঁসফাঁস করে উঠি। পাশের ঘরে শোনা যাচ্ছে ঘুমের ঘোরে বিড়বিড় করছে মন্টু। এবং তার কিছুক্ষণ পর, টিনের চাল ঝমঝম ভিজিয়ে বৃষ্টি শুরু হয়। ভেন্টিলেটার উপচে জলের ঝাপটা আসে। মুখ বাড়িয়ে দিই। আহ্, শান্তি! কাঠের জানালা উপচে জলের অবিরল অবিন্যস্ত ধারা নিচের দিকে নামছে। অন্ধকার সয়ে আসায় সেই ঝাপসা জলের লাইনের দিকে চেয়ে থাকি।

তোমাকে আমি কী বলব? রানু এভাবে শুরু করে। আমার ব্যাপার-স্যাপার পৃথিবীর কাউকে বোঝানোর মতো না। আমি ছাড়া দ্বিতীয় যে-কারো কাছে ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর মনে হবে। খুবই স্বাভাবিক সেটা। কিন্তু আপা, আমি বুঝতে শেখার পর থেকে যে মানুষটা আমাকে চারপাশ থেকে গ্রাস করে রেখেছে, সে যত কুৎসিৎই হোক, আমাকে যে স্নেহ, যে ভালোবাসা, যে বিচিত্র সব ঘটনার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, আমার কাছে সে এখন সৃষ্টিকর্তার মতো। আমি তাকে ছাড়া কিছুই ভাবতে পারি না।

তুই একটি বিচ্ছিরি অবস্থার শিকার রানু, শান্ত স্বরে বলি। তোর এখন বয়স হয়েছে, এটুকু তো অন্তত বোঝার ক্ষমতা হয়েছে। কৌশলে সে তোর সব রকমের সর্বনাশ করেছে, তারপরও ওরকম একটা ভণ্ড আর লম্পটকে তুই শ্রদ্ধা করিস? কী করে?

আমি কী করে সেটা তোমাকে বোঝাই? রানু আমার হাত চেপে রেখেছিল। হঠাৎ ওর শরীরের আচমকা শক্ত হয়ে ওঠা টের পাই। গুটিকয় ঘটনার কথা বললে তুমিও অবাক হবে। কোনো তল খুঁজে পাবে না। আমি সেসব কথা কাউকে বলতে পারি নি। সবাই ভাববে, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তুমি বলছ কৌশলে সে আমার সর্বনাশ করেছে। সবাই তাই বলে। পাড়ায় আমাকে নিয়ে টি-টি পড়ে গেছে। ফলে, আমরা বলতে গেলে পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। আমার কি কম কষ্ট হয়? কিন্তু লোকটাকে আমি দায়ীই বা করি কী করে?

আমি চুপ করে থাকি। কোনোরকম ক্ষোভ প্রকাশ করতে গেলে তার এই অকপটতার পথে সেটা বাধা হয়ে যাবে। আসলে এ এক বিশাল রহস্য। আমার জানা দরকার। রাত বাড়ছে। বৃষ্টির শব্দের ভেতর আমরা দু'জন আরো বেশি সহজ হয়ে আসি।

রানু, যেন তার সামনে কেউ নেই, নিজেকেই শুনিয়ে যাচ্ছে, এমন ম্রিয়মাণ স্বরে বলতে শুরু করে, জানো আপা, মজুমদারের প্রধান যন্ত্রণা এবং ক্ষোভ ছিল—আমি তার বিকৃত চেহারা দেখে ভয় পাই। কিন্তু তারপরও আমার প্রতি তার অদ্ভুত আকর্ষণ কেন, সে নিজেও সেটা জানত না। এই মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় সে প্রায় উন্মাদ হয়ে আমাকে একদিন রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে যায় তার ডেরায়। তারপর সমস্ত রাত... তুমি তো সব জানোই। অবশ্য একটা রাত পাশাপাশি কাটিয়ে তার প্রতি আমার যে ভয় আর অশ্রদ্ধা ছিল, সেটা কমে আসে।

এইভাবে দীর্ঘ ছ'মাস কেটে যায়। কিন্তু সবচেয়ে যেটা আশ্চর্যের বিষয়, এই ছয় মাসে একদিনও সে আমার শরীরের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে নি। সবে প্রাইমারি স্কুল-পেরুতে-যাওয়া এই আমি, আর কতটা ছোট! তবুও তার অনীহার ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারতাম। বুঝতে পেরে তার প্রতি অসীম শ্রদ্ধায় নুয়ে যেতে থাকতাম। কী কুৎসিত তার চেহারা! সেই বিকৃত চেহারাকেই এক সময় আমার কাছে সুন্দর, মায়াময় মনে হতে থাকে। তখন তার বাসায় যাওয়ায় আমার বাধা ছিল না। অনেক রাত অব্দি সেখানে থাকতাম। রাত বাড়ত, ধূপের কুণ্ডুলী জ্বালিয়ে চোখ বুজে বসে থাকত সে, মাঝখানে ধোঁয়া পাকিয়ে উঠত। বলত, তার ঘৃণ্য জীবনের কাহিনী, তার এই কুৎসিত চেহারা আর প্রথম দিককার দরিদ্র জীবনের জন্য তার প্রতি মানুষের প্রচণ্ড ঘৃণার কথা। বলত, আমার ঘৃণাই তার জীবন চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ করে দিচ্ছিল। আর ক'টা মাস যদি আমি একই রকম মনোভাব পোষণ করতাম, তাহলে সে আত্মহত্যা করত।

তুই সে সব কথা বিশ্বাস করেছিলি? আমি এক সময় ভেতরের শ্লেষ ধরে রাখতে পারি না।

সে-সব প্রসঙ্গে এখন অনেক রকম প্রতিক্রিয়া আছে কিন্তু তখন আমি সত্যিই অভিভূত হয়েছিলাম। রানু বলে, আমি ঠিক বুঝছি না আপা, কেন সেসব নাজুক অধ্যায়গুলো তোমার কাছে মেলে ধরছি। তুমি এ্যাদ্দিন পর এসেছ, আমাদের দু'জনের মাঝখানে সময়ের কত দূরত্ব। আচ্ছা, তুমি আমাকে খুব ঘৃণা কর, না?

তোর ব্যাপারে আমার কষ্ট আছে, বলতে গিয়ে বুকের মধ্যে একটা চাপ অনুভব করি, কিন্তু ঘৃণা নেই।

মহিমের ব্যাপারে কোনো ক্ষোভ? জানতে চায় সে, বিশ্বাস কর, লোকটাকে প্রথম ভালোই লাগত। কিন্তু সে তোমার সাথে এত গভীরভাবে মেশার পরও আমাদের বাসায় এসে আমাকে দেখেই— বিশ্বাস কর, আমার ভীষণ ঘেন্না লাগত। জানো, তোমার বিয়ের পরও সে আমাকে দেখলে কেমন... না, না থাক এসব।

তারপরও এসেছে? আমার গলা ফুঁড়ে আর্তস্বর বেরিয়ে আসে। এ পর্যন্ত আসতেই আমি বিবর্ণ, নীল, ব্যাধিঘোর মানুষ যেন, ত্বকের নিচে থর কাঁপুনি শুরু হয়। কী সুবিন্যস্ত, গোছানো কথা শিখেছে রানু। অভিজ্ঞতা ওকে এত পরিপূর্ণ করেছে!

হ্যাঁ, তারপরও আসত। রানু বলে যায়, একদিন আমার হাত ধরে সে কী কান্না! আমি যত বলি, মা এসে পড়বে, আপনি যান, তত জোরে সে হাত চেপে ধরে আর বলে, আমি দয়া না করলে সে ছবি আঁকা ছেড়ে দেবে। দেশ ছেড়ে চলে যাবে। এসব শুনতে খুব খারাপ লাগছে তোমার, না ? কী যে ছেলেমানুষ ছিল লোকটা!

ছেলেমানুষ ছিল ? এমন ব্যক্তিত্ব! পাশাপাশি কত পথ হেঁটেছি। সে সময় অস্থির আর ছেলেমানুষ তো ছিলাম আমিই। কী সব বলতাম, ভাবলে এখনো হাসি পায়। সেই নিঃশব্দ আর্টিস্ট! তার সিগ্রেট টানার ভঙ্গির মধ্যেও ছিল আশ্চর্য নিস্পৃহতা। একটার পর একটা জ্বালাতো, আর কী সব ছবি আর রঙ বিন্যাসের গল্প করত। তার মুখোমুখি দাঁড়ালে মনে হতো বিশাল বৃক্ষ—কেবলই আমার ক্ষুদ্র হতে থাকা। সেই তাকে ছেলেমানুষ মনে হতো রানুর কাছে! এতটাই বিপন্ন হয়ে উঠেছিল মহিমের প্রেম ? নিজেকে সে এরকম জায়গায় নামিয়ে এনেছিল ? আমার বুক ঝাঁ ঝাঁ করে।

তুই মজুমদারের কথা বল, আমি অস্থির হয়ে বলি, এ প্রসঙ্গটা এখন থাক। প্রচ্ছন্ন আঁধারে রানুর দেহটা যেন পাক খায়। আলতো ভঙ্গিতে সে পাশ ফিরে শোয়। তারপর এমন কিছু ঘটনার বর্ণনা করে, যা শুনে আমি প্রগাঢ় বিস্ময়ে আচ্ছন্ন হতে থাকি। তখন ওর পাশাপাশি থাকতাম। রানু ফিরে আসত কখনো রঙের জৌলুস নিয়ে, কখনো ভীত, অন্যমনস্কতার ভেতর। এসব ব্যাপারে আমাকে গোড়া থেকেই সে এড়াত। ফলে আমাদের দূরত্ব হয়ে ওঠে সীমাহীন। এত কঠিন, আর চাপা স্বভাবের ছিল সে, এত ভয়াবহতা চেপে রাখত নিজের মধ্যে! অথচ আজ, এত বছর পর একটু টোকা দিয়েছি কি দিই নি, সর্বাঙ্গ থেকে খসিয়ে ফেলছে সব। সব কথা, স্মৃতি গ্লানি, যন্ত্রণাগুলো।

রানু বলে— ছ'মাস পর একদিন আমিই যেন কেমন হয়ে যাই। ভেবে অবাক লাগে, কত কম ছিল বয়স। কী করে যে ওই বয়সের একটি মেয়ের ভেতর এমন অনুভূতি জন্ম নিতে পারে! আমি শুয়েছিলাম। মজুমদার বরাবরের মতো আমার চুলে হাত বুলোচ্ছিল। একদিন তার হাত আমার চুল ছাড়িয়ে পিঠের দিকে নেমে আসে। বেশ কিছুক্ষণ। তারপরই নিজেকে ছাড়িয়ে সে একটা অদ্ভুত রূপকথার বই নিয়ে আমাকে পড়ে শোনাতে থাকে। কী সব কাহিনী, স্বপ্নের জগতের নারীদের, পুরুষের সাথে তাদের অপরূপ জলকেলী। সে রাজ্যের সবাই নগ্ন। একজন পাতা দিয়ে শরীর ঢেকেছে বলে সবাই অশ্লীল, অশ্লীল বলে চিৎকার করে উঠছে। আরো কী কী সব বর্ণনা। শুনে কেমন অবশ হয়ে আসতে থাকি। তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকি।

সে বলে, এখনো সময় হয় নি। তার কী সব নিষেধ আছে। ভীষণ অপমানিত হই। কিন্তু তার প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে যায় হাজার গুণ। এরও এক হপ্তা পর প্রথম তার সাথে মিলিত হই। প্রথম দিন ভীষণ কষ্ট হয়। সে আমাকে ছুঁড়ে দেয় যাঃ, তুই ভীষণ ছোট, বলে। শেষে একদিন বলে, অবশ্য তোর মজাই আলাদা। তারপর কতদিন, কত রাত! আপা, তোমাকে বোঝাতে পারব না, কী অদ্ভুত তার ভঙ্গি। এমন আলতো করে আমাকে তুলে ধরত, ওরকম হিংস্র একজন লোকের কাছ থেকে অমন কোমলতা কল্পনাও করা যায় না। আমাকে বলত, স্বর্গের দরোজায় ঢুকে পড়েছে। এখন তার মৃত্যু হলেও কোনো কষ্ট নেই। আমাকে পেয়ে তার মৃত্যু ভয় চলে গেছে। হোক ভূমিকম্প, ভেসে যাক সব। আপা বিশ্বাস কর, আমি এখনো, তার বউ-মেয়েরা চলে এসেছে, তারপরও কাঙালের মতো ওর কাছে ছুটে যাই।

একটু স্পর্শের জন্য সারাক্ষণ ছটফট করি। এখন কী অদ্ভুত পরিবর্তন তার। আমাকে দেখে কুকুর তাড়া করে দাঁত খিঁচিয়ে ওঠে। বলে, তার গুরু বলেছে, আমার ওপর শনি ভর করেছে। আমার স্পর্শে তার সব ছাই হয়ে যাবে। তার বাসার সবাই কী নিষ্ঠুর অপমান করে আমাকে। তবু আমি যাই, বারবার যাই। আমি জেনে গেছি, এছাড়া আমার আর কোনো পথ নেই।

বৃষ্টি থেমে গেছে। ঘরে ফোঁকর গলিয়ে চাঁদের আলোর ছত্রাক। আমার স্নায়ু, হৃৎপিণ্ড কী এক অবশতায় শিথিল! এসব কোনো উপাখ্যান নয়। আমারই সহোদরা, কী নিপুণ এক ঘটনার শিকার যে, তার আত্মজীবনী।— একটু বাইরে গিয়ে বসবে ? জানতে চায় সে। আপা, তোমার কি ঘেন্না লাগছে এসব শুনতে ?

না।

জানো আপা, এর আগে একবার সে আমাকে তার গ্রামের বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল, যেখানে তার স্ত্রী-সন্তানেরা থাকে। তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না, গ্রামে তার কেমন প্রভাব! সব লোক তাকে সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে আগত অলৌকিক পুরুষ মনে করে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, তার পরিবারে সবাই আমাকে বেশ সম্মানের সঙ্গেই গ্রহণ করে। সে তার স্ত্রীকে বলে, এ আমার ভবিষ্যৎ পুত্র সন্তানের মা! এর যেন কোনো অনাদর না হয়। আমি তখন নিতান্তই ছোট্টমোট্ট মেয়ে। কিন্তু মজুমদারের কথাকে তারা বেদবাক্য মনে করত। আমাকে তারা বলল, মজুমদার স্বপ্নে দেখেছে, কয়েক বছর পর আমি তার পুত্র সন্তানের মা হবো।

আমি আদর-খাতিরের মধ্যে বেশ সময় কাটাতে থাকলাম। একদিন গাছে দড়ি দিয়ে দোলন বেঁধে দোল খাচ্ছি, কেমন যেন ভেজা মনে হলো নিজেকে। চুপচাপ গোয়াল ঘরের গিয়ে দেখি রক্ত! মেয়েদের এরকম কিছু যে হয়, সেটা জানতাম না। বারবার পরীক্ষা করি। নাহ্ কোথাও কাটে নি। আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল, এটা একটা অপরাধ। গোপন করার বিষয়। আমি মুছে ফেললেই এ চলে যাবে।

আমি উদ্‌ভ্রান্তের মতো মুছছি, যাচ্ছে না। হঠাৎ দেখি, দরজায় মজুমদার। আমার প্রাণ শুকিয়ে গেল। সে ব্যাপারটা দেখে সে-কী খুশি! গোপনে বউকে গিয়ে ব্যাপারটা বলল। তার বউ অন্য বউ-ঝিদের নিয়ে আমার সারা গায়ে হলুদ মেখে বলল, পুকুরে এক ডুব দিয়ে আয়। আমি তাদের কথামতো ডুব দিয়ে এসে উঠোনের পিঁড়িতে বসলাম। তারা আমার সামনে পেতলের বদনাভর্তি পানি রেখে বলল, আমি যেন সেই জলের দিকে তাকিয়ে নিজেকে সুন্দর দেখি, আর বিড়বিড় করে বলি, আমার এরকম সুন্দর এক পুত্র সন্তান হোক।

লজ্জায়, কাঁপুনিতে নুয়ে পড়তে পড়তে আমি তা-ই বললাম। তুমি জানো না আপা, কী মধুর স্মৃতি সেটা! হায়! কোথায় সেই পুত্র! কোথায় স্বপ্ন! এখন সেই শরীর খারাপের দিনগুলোকে সৃষ্টিকর্তার পাঠানো অভিশাপ বলে মনে হয়... বলতে বলতে রানু দম নেয়ার জন্যে থামে।

তারপরের কাহিনী আরো ভয়ঙ্কর। জানি, তুমি বিশ্বাস করবে না। তবুও বলছি, আমি এর কোনো তল খুঁজে পাই না। জানি না কোন নেশায় অবশ করিয়ে আমাকে সে এসব দৃশ্যের মুখোমুখি করত। একদিন তার বাসায় গিয়ে দেখি, একটি ছেলে হাউমাউ করে

কাঁদছে। ছেলেটি বেশ সুন্দর। ফর্সা, লম্বা গড়ন। এমন দৃশ্য প্রায়ই দেখতাম। সব টাকার সমস্যা। ততদিনে এসব আমার গা-সওয়া হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ছেলেটি বলছিল, এইমাত্র তার মা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনায় তার একটা পা চলে গেছে। হাসপাতালে মা-কে রেখেই সে ছুটে এসেছে। কিছু টাকা তার দরকার। মজুমদার তখন কী কঠিন আর ঠাণ্ডা গলায় বলে, আগের পাওনার টাকা আগে ফেরত দাও।

তারপর ছেলেটি বহুক্ষণ সেই পাথরে মাথা কুটল। এক সময় কাঁদতে-কাঁদতে ওখান থেকে চলে গেল। আমি এবার প্রায় হামলে পড়ি তার ওপর, এত নিষ্ঠুর আপনি?

মন্তব্যটার উত্তরে সে শুধু নিঃশব্দে হেসেছিল। প্রশ্ন করেছিল, তুমি তো এর আগেও এ রকম দৃশ্য দেখেছ কোনো প্রতিক্রিয়া তো প্রকাশ কর নি?

করি নি।

আজ কেন করছ? ছেলেটি সুন্দর, সে জন্য?

আমি চুপ করে থাকি।

তোমার সুন্দরের সংজ্ঞা এখনো পাল্টায় নি? সুন্দর বলতে তুমি এ-ই বোঝ?

আমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠি, ছেলেটির মা...।

বাহ্, বেশ মায়াও আছে দেখছি!

যা হোক। এই ঘটনার পর থেকে সে আমাকে নিয়ে নতুন খেলায় মেতে ওঠে। আমি যেন কাদা মাটি, স্রেফ পুতুল, নতুন করে তৈরি করে আমাকে। প্রতিদিন বোঝায়— মানুষের বুকের ভেতর মায়া থাকাটা জীবনের জন্য সবচে' ক্ষতিকর। এই মায়ার জন্য জীবন যন্ত্রণাময় হয়ে ওঠে। তার টানকে উপেক্ষা করা যায় না। জীবন থেকে সবার আগে এইসব বিষয়গুলো ঝেড়ে ফেলতে হবে। তারপর আমাকে শেখায়, পৃথিবী জুড়ে অনন্তকাল ধরে এক ধরনের সৌন্দর্যের জয় চলে আসছে। আমি যদি কুৎসিতকে সুন্দর জেনে সুন্দরকে কুৎসিত ভেবে চলতে পারি, তবে আমার জীবন সহজ হয়ে আসবে, যেহেতু প্রচলিত সুন্দরের নাগাল এই জীবনে মানুষ পায় না। তারপর চলল আজব নিরীক্ষা। যেমন একটা চমৎকার টিয়ে পাখি। ডানা পুড়িয়ে সে তাকে খাঁচার মধ্যে ভরে রাখল। পাখিটার সে-কী আর্ত চিৎকার! আমি অবাক চেয়ে থাকতাম। আমার চোখ ভিজে আসত।

এই চিৎকার, বাঁচার জন্য—সে বলত, চমৎকার নয়? ফড়িঙের পা ছিঁড়ে উড়িয়ে দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরত, আদর করত, আমাকে ক্রমাগত বোঝাত, এইসব কঠিন পরীক্ষায় আমাকে ওতরাতে হবে। সবচে' আশ্চর্যের ছিল তার স্বপ্ন বর্ণনা। বিভিন্ন মানুষ তার কাছে আসত স্বপ্ন সমস্যা নিয়ে। সে তাদেরকে স্বপ্নের অর্থ বলে দিয়ে পয়সা উপার্জন করত। একদিন আমিও, স্বপ্নে দেখি, রাশি রাশি স্বর্ণ কুড়চ্ছি। বৃত্তান্ত শুনে সে ভয়ানক বিচলিত হয়ে পড়ল, বলল, কয়েক দিনের মধ্যেই আমি কঠিন বিপদের মধ্যে পড়ব। বিশ্বাস কর আপা হলোও তা-ই, কুয়োর মধ্যে পড়ে আমার ঠ্যাং ভেঙে গেল। অনেকদিন সোজা হয়ে হাঁটতে পারি নি। আমার কাছে তখন থেকে লোকটা সৃষ্টিকর্তার মতো। আমি তাকে অস্বীকার করতে পারি না। ধীরে ধীরে তার জীবন যাপনের সাথে আমিও অভ্যস্ত হয়ে উঠি। রক্ত দেখে গায়ে রোমাঞ্চ অনুভব করি। বাঁধা একটা বেড়াল, তার গায়ের সব লোম পুড়িয়ে ফেলা হলো। শেকল বাঁধা অবস্থায় তখন সে লাফাচ্ছে। কষ্টের মধ্যেও কী যেন এক উত্তেজনা টের

পেতাম। যেন অনেক একঘেয়েমি কেটে গেল। কষে চড় লাগাল কিশোর বয়েসী একটা ছেলের গালে। চিৎকার করে উঠল ছেলেটা। আমার কাছে পুরো ব্যাপারটাই অসম্ভব গতিময়, মজাদার মনে হতো। রানু থামে। চরম উৎকণ্ঠিত আমি গলায় নিঃশ্বাস আটকে শুনি। কোনো মন্তব্য করি না। রানু লম্বা এক দীর্ঘশ্বাস টেনে ফের শুরু করে— তারপর অনেকদিন পেরিয়ে গেছে। এভাবেই তার ছায়ায় বড় হয়ে উঠেছি আমি। বাবা-মার নিষেধ উপেক্ষা করে চলে যেতাম তার ওখানে। আমার প্রতিদিনের সাথে তখন সে ভীষণভাবে জড়িয়ে গেছে।

জানো আপা, কী আজব কাণ্ড, এর মধ্যে একদিন ভূমিকম্প হলো। আমি তখন মেঝেতে শুয়ে ছিলাম। যখন পুরো বাড়িটা দুলতে শুরু করল, আমাকে টেনে নিয়ে সে খাটের নিচে ঢুকে গেল। থরথর করে কাঁপছিল। ভয়ে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, কী করে বোঝাব তোমাকে আপা, কী প্রবল মায়ায় সে তার শরীর দিয়ে আমাকে ঢেকে রাখছিল যাতে ছাদ ভেঙে আমার ওপর না পড়ে। কতক্ষণ পর ভূমিকম্প থেমে গেলে সে আমাকে টেনে মেঝেতে বসাল। কী নিষ্ঠুর চেহারা! তাড়াতাড়ি কয়লা ভর্তি মাটির পাত্র নিয়ে এলো। তারপর তাতে ধূপ ছিটিয়ে আগুন জ্বালাল। রক্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, সাবধান, নড়বি না।

তারপর ধোঁয়ার ওপর উন্মাদের মতো হাত ঘুরিয়ে বলতে লাগল, আয়, আয়, অশুভ আত্মা, আয়। যে আমাকে ভয় দেখাচ্ছিস— আয়...। তার ঘরে পরে তো আর যাও নি। গেলে দেখতে কী ভয়াবহ পরিস্থিতি। পুরো ঘরে কাঠ খড় পড়ে থাকত। দেয়ালে শ্যাওলার আস্তর। ঘরের ভেতরও ইটের খাঁজে খাঁজে বুনো লতাপাতা। সারাক্ষণ সে পর্দা টেনে ঘর ছায়া করে রাখত। বাইরের দেয়াল ফুঁড়েও বেরিয়েছে জংলি লতানো ডগা। একটা আস্ত ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে বাড়িটা। এরি মধ্যে হঠাৎ দেখি একটা কঙ্কালের মাথা ছিটকে এসে পড়ল। আর তাই দেখে ভয়ে শাদা হয়ে এলো তার চোখ... এই তো, এই তো সেই মাথা। এত বছর পর! কোত্থেকে এলো! সেটা হাতে নিয়ে বিকারগ্রস্ত মানুষের মতো বিড়বিড় করতে থাকল মজুমদার, শালা টাকা নিয়ে টাকাও দিবি না, জমিও দিবি না, কী করে বেঁচে থাকবি তুই ?

ততক্ষণে আমার রক্ত পানি হয়ে গেছে। ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছি। কী দেখছি এসব! এ-কী! রক্তাক্ত, ল্যাংড়া বেড়াল হেঁটে আসছে। তারপর হঠাৎ কুকুর। তার শরীরও রক্তে চোবানো। মজুমদারকে মাঝখানে রেখে ধূপদানির চারপাশ ঘিরে হাঁটছে তারা। ডানা ঝলসানো টিয়ে আর ময়না তারস্বরে চ্যাচাচ্ছে। হঠাৎ কঙ্কালের মাথা এবং অদ্ভুত শব্দ। রক্ত পতনের চিড়চিড় শব্দ। চোখ লাল করে টানা চিৎকার করে যাচ্ছে মজুমদার... কোথায় পালাবি ? আয়... শনি... আয়। তারপর অন্ধকারে কী দেখে সে বিশাল জিব বের করে— এ-কী! কী চাস তুই ? আমাকে হত্যা করবি ? হাঃ হাঃ, আমার মৃত্যু হবে ভূমিকম্পে। তোকে আমি ডরাই না...আয়, আবার তোকে হত্যা করব, এই, এই ধোঁয়া ছাড়লাম। গল্প করতে করতে রানু অশরীরী ভঙ্গিতে সেই পরিবেশের প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়ে, আমি যে তার পাশে সেটা বেমালুম ভুলে চেতনাহীনের মতো টান হয়ে বসে শূন্যের দিকে তাকায় এবং বলতে থাকে, মজুমদারের মুখ থেকে গড়গড় করে ধোঁয়া বেরোতে শুরু করে। তারপর যেন স্পষ্ট দেখি, ছায়ার মতো শাদা একটা মানুষ অন্ধকার দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। মাগো, এসব আমি কী দেখছি ? ধোঁয়ার স্রোতের তলায় মজুমদারের মুখ ঢেকে যাচ্ছে! হে আল্লাহ, আমাকে বাঁচাও... চিৎকার করতে করতে আমি একসময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।

পরদিন ভোরে নিজেকে আমি আবিষ্কার করি রাস্তায়। মজুমদার আমাকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। আমার চারপাশে তখন মানুষের ভিড়। তারপর...।

অসম্ভব... আমি চিৎকার করে উঠি। পুরোটাই জাদু। অথবা কিছু দিয়ে অবশ করে স্বপ্ন দেখিয়েছে। তোকে তাড়ানোর ফন্দি।

পরদিন দিনের বেলায় দেখি— রানু কী এক ঘোরে বলে যায়, ভূমিকম্পে তার দোতলার দিকে উঠতে থাকা বিল্ডিংয়ের একটা অংশ গুঁড়ো হয়ে ছাদে পড়ে আছে।

ঠিক আছে, সত্যি— আমি কেমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠি, তবে সেটা কাকতালীয় ব্যাপার। ভূমিকম্প এমনিতেও হতে পারে। পুরোটাই তার ভোজবাজি। নিশ্চয়ই এর পরপরই সে তোকে তাড়িয়েছে?

হ্যাঁ!

তুই তারপরও ওর কাছে ছুটে যাস? ছিঃ রানু, এত বয়স হয়েছে তোর। ওরকম একটা লোকের জন্য নিজের জীবনটা নষ্ট করে দিচ্ছিস? ওর চালাকিটা বুঝছিস না?

কী করব আমি? উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ে রানু। সবকিছু ভোলার জন্য নিজেকে কত নিচে নামিয়েছি। ছেলেদের সাথে আড্ডা দিই, সিগারেট টানি। ওরা আমাকে ফাঁকফোকরে স্পর্শও করে। সব ক'টা ছেলেকে মনে হয় ম্যাড়ম্যাড়ে। ওদের চেহারা, কী শিশুর মতো! কী মেয়েলি ওদের হাত! এসবের ভেতরেই আমি প্রাণপণে সেই লাল বিশাল দু'টি চোখ, লোমশ হাত আর কোমল থাবা খুঁজি। সব শিশু। হুবহু শিশু, বমি লাগে, ঘেন্না ধরে যায়। এত বছরের অভ্যেস! থালার পর থালায় সুস্বাদু সব খাবার সাজিয়ে আমাকে মুখে তুলে খাওয়ানো... আমি কোথায় পাব আপা? তার বলা বিচিত্র কাহিনী, যা না শুনে এক রাতেও আমার ঘুম হয় না। কে আমাকে এসব দেবে? তবুও আড্ডা দিই। নিজের মধ্যে বুঁদ হয়ে থাকি। তৃষ্ণা বেড়ে বুক খাঁখাঁ করে। বারবার পাগলের মতো ছুটে যাই, তার বাসায়। সে এখন বড় কারবারি হয়ে উঠেছে।-ভীষণ ব্যস্ততা দেখায়। আমাকে বলে, ভাগ্ ভাগ্ অপয়া, নারকেলের ছোবড়া।

রানু, তুই এসব কী বলছিস আমাকে? ওর শীতল হাত চেপে ধরে কেঁপে উঠি। এইভাবে তোর জীবন যাবে?

একদিন নিশ্চয়ই সে নিজের ভুল বুঝবে... এই রকম ভয়ঙ্কর আশাবাদ ব্যক্ত করে নির্জীব হয়ে যায় রানু।

আর আমি? ইস্পাতের তীক্ষ্ণ আঁকশি বুকে নিয়ে দাঁড়াই। দরজা খুলে বাইরে বেরোই। বাইরে অদ্ভুত জ্যোৎস্না। ঝিঁ-ঝিঁ ডাকছে একটানা। ধবল আলোর স্রোতে প্রকৃতি নিমজ্জিত। বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকি। কী বিশুদ্ধ হাওয়া! বিমূর্ত আলোছায়ায় মোড়ানো। নিজেকে ছেড়ে দিই শূন্যে। উড়ে যাও, তোমার ডানায় লাগুক তুমুল বাতাস, আর মহাশূন্যের রোদ্দুর তার আশ্চর্য রঙ দিয়ে ঢেকে দিক তোমার পেছনের পৃথিবী।

কিন্তু তাতেই কি আমাকে সহজ সাপ্টা ছেড়ে দেয় সব কিছু? কোনোকালে এক মুহূর্তের জন্যও সব ছেড়ে উড়াল দিতে পেরেছি? ওই যে মহিম, দাঁড়িয়েছে, খোলা দরজা আড়াল করে। যে আমাকে বলত, ভেতর থেকে অস্থিরতা খসিয়ে শুদ্ধ সুন্দর মানুষ হও, আমি তাকে কেন গ্রহণ করতে পারছি না? আমার ব্যক্তিত্ব তৈরিতে যার ছিল বিন্দু বিন্দু ভূমিকা,

সেই তার কাছেই আমাকে ছাপিয়ে যখন রানু প্রধান হয়ে ওঠে, তখন আমার কাছেও তার অস্তিত্ব কেন স্বীকৃতিশূন্য হয়ে পড়ে? আমি যে অসাধারণ কেউ নই, সেটাকেই কেন স্পষ্ট করে তোলে না আমার মনোভাব? আমি একদিন যার হৃদয়ের কেন্দ্র জুড়ে ছিলাম, তার সেই মনের কেন্দ্র অন্য কেউ অধিকার করতেই পারে। আমি এই সত্যকে, এই হয়ে-ওঠা হঠাৎ মনস্তাত্ত্বিক সত্যকে অনাচার মনে করছি সে আমার স্বার্থ আর একান্ত গভীর অনুভবকে আঘাত করেছে বলেই! সেই তো মনের দিক থেকে ক্ষুদ্র মানুষ, যে মানবিক সম্পর্কের উত্থান-পতনের অ-আ বোঝে না।

কী অদ্ভুত শুক্লবর্ণ রাত। জ্যোৎস্নায় ঘেমে উঠেছে ভেজা মাটি। মজুমদার সেই অপার্থিব আলো ফুঁড়ে নিষ্পলক চেয়ে থাকে। দুর্মর যন্ত্রণায় হাঁসফাঁস করি। পেছনে পায়ের শব্দ পেয়ে চকিতে মাথা ঘোরাই। রানু এসে দাঁড়িয়েছে। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে অপরূপ রানুর করুণ বিপন্ন চেহারা। ওকে অনেককাল বর্ণাঢ্য সাজে দেখে আমি অভ্যস্ত। আজ ওর পরনে কী ম্লান, রঙ জ্বলে-যাওয়া ধূসর কামিজ। গলায় লটপট করছে ওড়না। সবচেয়ে নিষ্প্রভ ওর চোখ জোড়া। এত কালো হয়ে গেছে সে। একদম বেমানান।

দু'জন পাশাপাশি বারান্দায় বসি।

আপা, তোমার মনে আছে, রানু কেমন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, সিনেমা হলের পোস্টার দেখতে গিয়ে হলের ভেতর ঢুকে পড়তে চেয়েছিলাম বলে দারোয়ানের সে-কী ঠ্যাঙানি!

কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠি আমিও, হ্যাঁ হ্যাঁ তারপর দু'জনের সে-কী দৌড়!

এক ময়রার দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলাম, তুমি টানছিলে আমাকে... রানু ওড়না দিয়ে হাসি চাপে। তারপর রাস্তায় পড়ে থাকা আখের ছোবড়া চিবিয়েছিলাম বলে তুমি আমার গালে কষে থাপ্পড় বসিয়েছিলে।

তোর যা খিদে ছিল....হাসতে হাসতে বলি। কিন্তু হঠাৎ করেই বুকের সুতোয় টান পড়ে। প্রগাঢ় যন্ত্রণায় স্থির হয়ে যাই দু'জনই। আঁধার মৌনতার ভূত আবারো চেপে ধরে রানু আর আমাকে।

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে দেখি, রানু শব্দহীন মূর্তি, মেঝেতে বসে আছে। উস্কো চুল। চোখে সারারাত না ঘুমোনোর রক্তাভা। ঘুমিয়েছিলাম এক পৃথিবীর জটিলতা মগজে পুরে। অস্থিরতা ডুব দিয়েছিল চোরাবালির মধ্যে। হঠাৎ জেগে উঠতেই এরকম দৃশ্য। মনে পড়ে ঘুমোনোর আগের গভীর রাত পর্যন্ত কী সব যন্ত্রণাদায়ক, আজগুবি, কুৎসিত অধ্যায়গুলো। জেগে অনুভব করি আমার স্নায়ুগ্রন্থিগুলো অবশ, অসুস্থ হয়ে আছে। দৃষ্টি প্রসারিত করি। দরজা খোলা। ভেতরে নানা তরঙ্গে শাদা আলো প্রবেশ করেছে। দৃষ্টি আলোর ধবলতার ভেতরে রানু যেন স্কেচ। স্কেচ দেখেই টুক করে অন্য বেদনা উঁকি দেয়। আশ্চর্য! এখনো আঁকা শুরু করা হয় নি! ইজেলটা বাসায় রেখে এসেছি দেয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে, মনে পড়ে।— রাতে ঘুম হয় নি? হাই তুলে প্রশ্ন করি।

রানু বলে, আমার প্রায়ই এমন হয়। এত অসম্ভব ছটফটানি। মনে হয় দম আটকে মরে যাই। নাহ্, মনে মনে ভাবি, কোনো কিছুর গভীরে প্রবেশ করব না। এই একঘেয়ে, জরাজীর্ণ জঘন্য পৃথিবীর কোনো আঁচড় লাগতে দেব না নিজের অস্তিত্বের কোথাও। টাল সামলে

মেঝেতে দাঁড়াই। আমি মৃত্যুবরণ করলেও পৃথিবী বেঁচে থাকবে তার মেরুদণ্ড সোজা রেখে। আমার হৃৎপিণ্ডের থর কাঁপুনি, দুঃসহ যন্ত্রণার শাস্তি, আমি একাই অনুভব করব। কাতরাব, ছটফট করব, এক সময় স্থির হয়ে যাব। কী প্রয়োজন এইসব বিষাক্ত, ক্লিশিত কষ্ট বিভিন্ন জায়গা থেকে বিন্দু বিন্দু তুলে নিজের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলার ? নিজেকে এক যন্ত্রণাময় অসহ্য মানুষে রূপান্তরিত করে কী লাভ ? তাতেই কি আমার ভেতর থেকে এই আনন্দময়, বীভৎস পৃথিবীর স্পন্দন বন্ধ হয়ে যাবে ? মেঝে ছেড়ে নিঃশব্দে হেঁটে যায় রানু।

কাঠের চেয়ারে ক্লান্তিতে ঢলে পড়ি। ব্যাগ গুছিয়ে আরেফিন আসে, আমি ঢাকায় যাচ্ছি, তুমি কবে আসছ ?

আগামীকাল। তুই আজকেই যাচ্ছিস কেন ? হল তো বন্ধ। দু-তিনদিন পর শুনেছি ঢাকায় হরতাল, ঝুঁকি নিয়ে না গেলেই কী চলে না ?

আমি এক বন্ধুর বাসায় উঠব। বিশেষ প্রয়োজন আছে। ওর এই কথার পর আমার মনে পড়ে, হল তল্লাশি আর খাটের নিচে অস্ত্র পাওয়ার কথা। আবারো সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসতে থাকে। নাহ্ বাঁচব না বেশিদিন।

তোমার অফিসের খবর কী ? মশারি সরিয়ে বিছানায় বসে আরেফিন।

কোন খবর জানতে চাইছিস ?

মাঝখানে হেভি গণ্ডগোল শুনলাম। চাকরিটা চলে যায় নি তো ?

না, সবকিছু ঝিমিয়ে গ্যাছে— আমি বলি, শেষ দিকে মালিকপক্ষ সোজা ছাঁটাই করার প্ল্যান নিয়েছিল। তারপর আর কী, মহাগ্যাঞ্জাম। সবকিছু আপনাআপনিই ঠিক হয়ে গেছে।

এ-ও দেখি আমাদের রাজনীতির মতোই, আরেফিন হাসে, যখন হয় খুব জোরেসোরে। সারা বছর ঝিমিয়ে থাকে। এ যেন সিজোনাল উৎসব।

তুই বুঝিস সেটা ? সব বুঝেও ভাবছিস এভাবে পরিবর্তন আনবি ?

আসলে পুরো বিষয়টা ধরা খাচ্ছে সংঘবদ্ধতার অভাবে। যারা ক্ষমতায় আছে, যারা আন্দোলন করছে, প্রায় সবাই ধান্দাবাজ, চরিত্রহীন, দেশকে কেউ ভালোবাসে না। সবাই নিজের স্বার্থের বিষয়ে অন্ধ! আসলে আমিও ফ্রাস্টেটেড হয়ে পড়ছি। কেমন অন্যরকম গলায় আরেফিন বলে, আমাদের পার্টির একজন লিডার, যে এই পথে আমাকে এনেছে, যার আদর্শের আমি ছিলাম অন্ধ অনুসারী, পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে ক'দিন আগে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার কী জানো, তাকে ধরিয়ে দিয়েছে আমাদেরই পার্টির চেয়ারম্যান।

কেন ?

সে ফ্রাস্টেটেড হয়ে পড়েছিল। সরকারের সাথে আঁতাত করে ভিন্ন একটা দল করার পরিকল্পনা করছিল, পার্টিতে তার প্রচুর প্রভাব, তাতে করে পার্টি আরো বিভক্ত হয়ে পড়ত। বিশ্বাস কর, আমি এই দেশের কোনো নেতা, কোনো দলকে আর শ্রদ্ধা করি না। সব এক।

সবই বুঝছিস তুই, তারপরও...। আমি অবাক হয়ে বলি, আমি আর তোকে কী বোঝাব ?

তুমি আমার কথা বলছ তো ? আরেফিন হাসে, আমরা সবাই সবকিছু বুঝি। সব জানি, তুমি হিসেব করে দেখো ভার্সিটি এলাকার কোন্ খুনটার বিচার হয়েছে ? গুণ্ডা-বদমাশ পুষে তবে ক্ষমতায় টিকে থাকতে হয়। একেকজনের মুখে দেখবে, দেশপ্রেমের কী তুবড়িবাজি!

জাতি-জাতি বলে প্রাণ ফাটিয়ে ফেলে। এরকম নষ্ট পৃথিবীতে বাস করতে ইচ্ছে হয় না। বুভুক্ষুর মতন নিজেদের পেট ভরাবার জন্য সবাই সিংহাসন চায়। এইসব হিসেবের কাছে আমি তো একটা চুনোপুঁটি। তুমি সাদ্দামকে দেখো, মার্কিনের মতো সাক্ষাৎ বাঘ দরজার সামনে দাঁড়িয়েছে, নিজের শক্তি সম্পর্কে তার সম্পর্কে আন্দাজ নেই? তারপরও তার হম্বিতম্বি কমছে? পারলে তাকে বোঝাও তো? একজন লোকের স্বেচ্ছাচারী খেয়ালের কাছে লাখ লাখ মানুষের মৃত্যু... বুঝেছ, রাজনীতি জিনিসটাই এমন। তোমার আমার চিন্তামতো সহজ সাপ্টা পথে চলে না।

তুই কি মনে করেছিস স্রেফ কুয়েতের উপকারের জন্য যুক্তরাষ্ট্র আটঘাট বেঁধে নেমেছে? আমি বলি, এখানে মার্কিনেরও সাদ্দামের মতো স্বেচ্ছাচারী লোভ নেই?

হ্যাঁ, সে নিশ্চয়ই আছে। আরেফিন বলে, ওই তো বললাম রাজনীতির রকমই এই। বিরোধী পার্টি ঘনঘন হরতাল ডেকে এই যে দেশের ক্ষয়িষ্ণু অর্থনীতিকে একেবারে ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলছে, সেকি দেশকে এই স্বৈরাচারী সরকারের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য ভালোবেসে করছে? গদিতে বসলে ধীরেধীরে তারা নিজেরাও কি ওরকমই স্বৈরাচারী হয়ে উঠবে না? কিন্তু ওসব ভেবে জনগণ তো চোখের সামনে ঘটতে থাকা অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে পারে না। তারা বিশ্বাস করে, সুসময় আসবে এবং সেই অন্ধ স্বপ্নের জন্য প্রাণ দেয়। আর এদিকে সরকারকে দেখো, সারাক্ষণ এ দলে ও দলে কোন্দল লাগিয়ে, ধর্ম নিয়ে মানুষের সাধারণ সেন্টিমেন্টকে উস্কে দিয়ে, দেশের মধ্যে একটা হজফজ বাঁধিয়ে দিয়ে নিজেদের কায়েমি স্বার্থের ঘাঁটি মজবুত করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। এইরকম অস্থিরতা থাকলে তাদের ওপর থেকে মানুষের চোখ সরে যাবে অন্যদিকে। তারা কেবলি চায় সবাই নিজেদের মধ্যে কোন্দলে লিপ্ত থাকুক। তখন তারা ফাঁক তালে তাদের সুবিধাগুলো যথাসাধ্য আদায় করে নেবে। এই যে, যে-কোনো মূল্যেই এদের গদিতে বসে থাকার প্রবণতা, জনগণ না চাইলেও, এ-কি দেশকে ভালোবেসে বলতে চাও? বলেই আরেফিন ঝেড়ে হাসে, দিব্যি নেতাদের মতো লেকচার দিয়ে দিলাম। বুঝলে, সবাই ধান্দাবাজ। শুধুই ধান্দা ছাড়া কারো মধ্যে আর কিছু নেই।

এই যদি হয় অবস্থা, তবে সব বুঝেও তুই এই অস্তিত্ব বিপন্ন করা রাজনীতি আঁকড়ে থাকবি? আমি ভীত কণ্ঠে বলি। তুই আমাকে যতই গাল দিস— আমি মূর্খ, পিঠ-বাঁচানো-মানুষ, একদম খাঁটি নিম্ন মধ্যবিত্ত; কিন্তু সবকিছু জেনে-শুনে নীতিহীন কোনো লক্ষ্যের জন্য প্রাণ দেব কেন?

আরেফিন প্রতিবাদ করে, এটা একটা স্বপ্ন, নীতিহীন জেনেও কী স্বপ্ন দেখি জানো? এইসব ঠেলেঠুলে একদিন সুদিন আনব, এখন পর্যন্ত আমরা যারা ইনোসেন্ট আছি, ক্যাডারভুক্ত হয়েও নষ্ট হয়ে যাই নি, তারাই রাজনীতিকে টিকিয়ে রেখেছে। কথা বলতে বলতে দু'জনই একসময় ঝিম মেরে যাই। কিছুক্ষণ পর শঙ্কিত গলায় বলি, বিশ্বযুদ্ধ লেগে যাবে না তো আরেফিন?

বিশ্বযুদ্ধ? আরেফিন অবাক হয়। অতবড় যুদ্ধে মরতে পারলে তো ভাগ্যবানই হতাম। আমরা তো মরব বাজার দরের চাপে, বেকারত্ব ঘোচাবার যুদ্ধে... ওর সাথে এই রকম কথা চলতে থাকে। অসংলগ্ন, পারম্পর্যহীন। কিন্তু এসবের ফাঁকেই একসময় নিজেকে আর

চেপে রাখতে পারি না, সটান প্রশ্ন করে বসি, তোর খাটের নিচেও নাকি কী সব অস্ত্র পাওয়া গেছে? বিষয়টা কী আরেফিন, তুই এত রিস্কি জীবনযাপন করিস?

বিশ্বাস কর, ওসব অস্ত্র আমার না। আমাদের বিপক্ষ দলের কাজ। আমি ওদের দেখে নেব।

তুই এসব ছেড়ে চলে আয়, আমি আকুল স্বরে বলি, বাসার এই পরিস্থিতি, আমাদের এসব মানায় না। তুইও কিছু দায়িত্ব নে আরেফিন। আমি একা আর পারছি না।

বিষয়টা আমার রক্তের মধ্যে ঢুকে গেছে, কাঁধে ব্যাগ নিয়ে আরেফিন সিরিয়াস হয়ে ওঠে। এ এক অদ্ভুত নেশা, ভার্সিটিতে জুনিয়র ছেলেদের সম্মান, প্রতিবাদী সভা, পুলিশের অন্যায় লাঠির সাথে যুদ্ধ—আমি এসব থেকে বেরোতে পারব না। একেক সময় মনে হয়, আমি একাই এক ঘুসিতে সব অপক্ষমতা গুঁড়িয়ে দিই। এখন নিজের ওপরই রাগ লাগে। নিজেদের মধ্যেই প্রেম নেই, সংঘবদ্ধতা নেই। নিজেরা কামড়াকামড়ি করে স্বৈরাচারকে আরো ক্ষমতাশালী করে তুলি। বিচ্ছিরি লাগে, যখন দেখি, কেউ দেশকে এক ফোঁটা ভালোবাসছে না, সরকারকে অক্ষম প্রমাণ করার জন্য সামান্য কারণে হরতাল ডাকে, তবুও সব জেনেও এর থেকে বের হওয়ার পথ পাচ্ছি না।

তোদের এসব আমি বুঝি না, আমি বলি, তুই বলছিস্ এর মধ্যে তোর প্রাণ আছে, আবেগ আছে। রাজনীতি সম্পর্কে আমার ধারণা, শ্রদ্ধা কোনোটাই নেই। ঘৃণাও কম নেই, আমি শুধু এর ঝুঁকিটা অনুভব করতে পারি। তাই ভয় পাই।

সব বঙ্গ ললনারই তাই পায়— সে বলে, তুমি তার ব্যতিক্রম হবে কেন? বাদ দাও, এসব ফালতু প্রসঙ্গ। আমি টিউশানি পেয়েছি। চারজনের একটা গ্রুপ। সে জন্যই আদাজল খেয়ে ছুটছি। পেটে দানা না পড়লে সব ভোঁকাট্টা।

তোর কাছে তো টাকা নেই, আমার কাছে চাইছিস না যে?

তুমি দেবে কোত্থেকে? এখানে থেকেই দেখো, খরচ কাহাকে বলে। যে গ্রুপটাকে পড়াচ্ছি, বেশ ভালো ওরা। পকেট কাটার কথা শুনে কিছু এ্যাডভান্স দিল। বাকিটা ম্যানেজ করে নেব।

আমি সম্ভবত কালই যাচ্ছি, অফিসের ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে একটু টেনশনে আছি।

আরেফিন চলে গেলে আমি বাবার কাছে আসি। এখনো ঘুমিয়ে আছেন। নিঃশ্বাস টানছেন অস্বাভাবিক শব্দে ধাক্কা দিতে-দিতে। মা মেঝেতে বসে তরকারি কুটছেন। সেই চিরন্তন ভঙ্গি। শুধু শিরদাঁড়ার দিকটা একটু বেশি বাঁকানো, ফলে উবু হয়ে মাথাটা দায়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছে একটু বেশি। স্থির চোখে চেয়ে থাকি সেদিকে কিন্তু মগজে টাল খাচ্ছে মজুমদারের মাথা। কিছুতেই থামছে না। কী নিষ্ঠুর, কুটিল শৈল্পিক হত্যা! রানুকে ক্রমশ সে খুন করেছে। আর মা? নিঃশব্দে তরকারি কুটছেন। ভীষণ একাগ্র তিনি তাঁর কাজে। কিন্তু কী এক বিশাল উই ঢুকেছে ঘরে, সব ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে। মহিলা প্লাস্টার করছেন, বার্নিশ লাগাচ্ছেন... একবারের জন্যও কি দেখার চেষ্টা করছেন, কিসের ওপর এই প্রলেপ? এর ভেতরে কী? তিনি কি জানেন না? দেখলেই আয়ু কমে যায়, না দেখে যতক্ষণ থাকা যায় ততই মঙ্গল, ততই প্রশান্তি! অক্ষমতায় হোক, বাঁচার তাগিদেই হোক, উঁই ঢোকার পথ যে তাঁরা নিজেরাই করে দিয়েছেন।

পিঁড়ি টেনে মা'র পাশে বসি— আচ্ছা মা, আপনার কোনো হাতের কাজ আমাদের ঘরে আছে? কোনো সেলাই, নকশা... এইসব?

মা তরকারি কোটায় নিমগ্ন, তবু সচকিত জানতে চান— তোর হঠাৎ করে এসবের কী দরকার পড়ল?

আমি তখন আপনার করা কাজগুলো অত খেয়াল করি নি কিনা, আমি বলি, এখন ইচ্ছে হচ্ছে, দেখি, সেগুলো কেমন ছিল। মা'র হাত থেমে যায়। কাঁপা কাঁপা হাতে দা পাশে রেখে তরকারির পাতিলসহ তিনি আশ্চর্য নিস্পৃহ ভঙ্গিতে দাঁড়ান— সেসব কি আর আছে! কবেই তো বিক্রি হয়ে গেছে! মা রান্নাঘরে গেলে আমি কেমন নিভে গিয়ে বাবার খাটের পাশে এসে দাঁড়াই। পেশাব করার জন্য লুঙ্গির তলা থেকে প্লাস্টিকের বালতি অব্দি একটা নল লাগানো হয়েছে। তিনি এমনভাবে তাকিয়ে আছেন, মনে হচ্ছে, গর্ত থেকে ঠিকরে চোখ দুটো বেরিয়ে পড়বে। এবার নিঃশ্বাসের মৃদু উত্থান টের পাওয়া যাচ্ছে। ফিসফিসে গলায় জানতে চাই— খুব কষ্ট হচ্ছে বাবা? উত্তরে বিকৃত মুখ করে তিনি গোঁ গোঁ শব্দ করেন শুধু। অবিশ্রান্ত লালায় তাঁর দাড়ি ভিজে যায়। আমার বুকের ভেতরটা হুহু করে ওঠে। মুখ সরিয়ে বসে থাকি। সমস্ত দেয়াল পলেস্তরা ওঠা। মাকড়সার জালের ছড়াছড়ি বাঁশের সিলিং জুড়ে। শিস দিতে দিতে মন্টু ঢোকে। আমি জানতে চাই— ফিজিওথেরাপি করা হচ্ছিল, কিছু হয় নি?

সে তো ম্যালা আগে। পাঁচদিন করেই বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। দিনে পাক্কা ষাট টাকা করে লাগে।

এমন একজন পেশেন্টকে হাসপাতাল ছেড়ে দিল?

তারা ছাড়ে নি। মোটামুটি শেষ জবাব শুনে আমরাই ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছি। কিছু হলে নিজের বাড়িতে হওয়াই ভালো। মৃত্যুর আবার ভালো-মন্দ! এবার আমার বুক জুড়ে শুরু হয় ভিন্ন বোধের ঢেউয়ের খেলা। সবকিছু কী সহজ এদের কাছে! জীবনের রূঢ় বাস্তব এরা কত অবলীলায় মেনে নিচ্ছে। সেই মতো প্ল্যান করছে। রাস্তা তৈরি করছে। জীবনকে এভাবে নিতে পারলেই নির্বাধ হয় পরমায়ু।

তুই যে দুটো রিকশা নামিয়েছিলি, তার থেকে কিছু আসছে?

আসছে, তবে ম্যালা গ্যাঞ্জাম। দু-দিন পরপর এরা নাটবল্টু চেন-ফেন সব নষ্ট করে ফেলে। ওদের সাথে চিৎকার করতে-করতে আমি নিজেই এখন রিকশাওয়ালা বনে গেছি।

তুই টাকা পেয়েছিলি কোথায়?

কিসের টাকা? রিকশা কেনার? সেটা ম্যানেজ হয়ে গিয়েছিল।

ম্যানেজ হয়ে গিয়েছিল মানে? কীভাবে?

মা দিয়েছিল দু'হাজার, কী সব সোনাদানা বেচে। বড় চাচার হাত-পা ধরে এক হাজার, বাকিটা ম্যানেজ করেছি।

বাকিটাই তো পুরোটা— কী এক যন্ত্রণা থেকে বিন্দু বিন্দু হিসেব নিতে শুরু করি, সেটা কোত্থেকে এলো?

তোমার কাছে তো চাই নি, মন্টুর গলায় এবার ঝাঁঝ ফুটে ওঠে, তুমি এত গোয়েন্দাগিরি করছ কেন?

সে তো আমি জানি। তাহলে তো আর এত প্রশ্ন করতাম না।

চাঁদা তুলে, মন্টু এইবার মরিয়া হয়ে উদ্ধত মাথা তোলে। একটা সমিতি গড়ার কথা বলে আমরা চার-পাঁচজন নেমে পড়েছিলাম। একটানা সাতমাস। অনেক জমেছিল। ভাগাভাগি করে নিয়েছি।

সাথে পিস্তল ছিল ?

তার দরকার পড়ে নি। রিকশা দুটো না কিনলে সংসারের যা অবস্থা, বাবার পেনশনের টাকা দিয়ে শুধু এই বাজারে একটা মিসকিনেরও চলে না। তুমি তো গিয়ে বেঁচেছ। পুরো ফ্যামিলি রক্ত বেঁচেও রক্ষা পেত না।

কথা আর এগোনো যায় না। এসব ব্যাপারে যত পাশ দিয়ে হাঁটা যায়, ততই ভালো। আমি ভাবি, মন্টুকে এভাবে প্রশ্ন করা আমার উচিত হয় নি। কিন্তু মাঝে মাঝে কী হয়, একরোখা একগুঁয়েমিতে পেয়ে বসে। আমি কি জানি না এসবের উৎস ? ভাঙা গাড়িটা কোন ধাক্কায় চলছে ? কোনো মানে হয় আগ বাড়িয়ে এসবের মুখোমুখি হওয়ার ? বাড়ি এসে একটা জিনিস স্পষ্ট অনুভব করছি, ঘর থেকে নড়তে ইচ্ছে হচ্ছে না। আমার এত অসম্ভব স্মৃতিময় পথঘাট, আমার আজন্মের প্রতিবেশ, দূরে থাকলে এসবই এমন সর্বগ্রাসী হয়ে আমাকে আঁকড়ে ধরে, এমন যন্ত্রণাকরভাবে, চোখে জল এসে যাওয়ার মতন করে আমাকে আক্রান্ত করে রাখে, এত সুদূর, এত স্পর্শাতীত মনে হয় এই শহরকে; অথচ এখানে এসে মনে হচ্ছে, এদের কাছ থেকে যত পালিয়ে থাকা যায়, যতই লুকিয়ে রাখা যায় নিজেকে ততই প্রশান্তিদায়ক। স্মৃতির পথ দূরবর্তী হওয়াই ভালো। তার নিকটবর্তিতা বড় মর্ম-পীড়ক।

এক দুপুরে বাসার সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়েই এর স্পষ্ট প্রতিফলন দেখতে পাই। লুঙ্গি মালকোঁচা করে রাস্তার টিউবওয়েলে পানি নিতে এসেছে পাশের বাসার আনাম চাচা। আমাকে দেখে অদ্ভুতভাবে দৃষ্টি প্রসারিত করে বলেন, ক্যাডা গো ? আড়ষ্ট স্বরে বলি, আমি নীনা। ভালো আছেন চাচা ?

ভালো আছ তো, এতদিন পর আইলা! আমাগোরে ভুইল্যা গেছ ?

না, একদম সময় পাই না, চাকরির পেছনেই দিন চলে যায় তো।

এদিকে সারাক্ষণ মুসলমানের ব্যাটা সাদ্দামের লাইগা চিন্তায় অস্থির হয়া আছি, মনে অয় বিশ্বযুদ্ধ লাইগ্যাই যাইব, যাই হোক তুমার স্বামী আসে নাই ? একলাই আইছ ?

একলাই, বলতে শরীরের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে। কী ভান! যেন জানেন না কিছুই। এখনই ধীরে ধীরে প্রশ্নের তীক্ষ্ণতা শেকড় স্পর্শ করবে। ঘরে ফিরব বলে পাশ ফিরেছি, বলেন, রানুরে একটু ঠ্যাকাও। পাড়ায় তো আর থাকা যায় না।

রানু আপনার কী করেছে ?

আমার কী করবে ? শুধু নিজের ক্ষতি করলেই ক্ষতি ? পাড়ার পরিবেশটা দেখবা না ? তা তোমারে কী বলব। তোমারও নাকি ডাইভোর্স হইয়া গেছে ? আমাদের ঘরে মেয়ে আছে, চিন্তা তো এইসব কারণেই হয় মা, কী বাপের কী সন্তান! কোন পাপ যে করছিল তুমার বাপ— বাদ দেও এই সব। এখন কও ঢাকায় কুয়েতের পক্ষে রিয়েকশান কী ?

আর সহ্য হয় না! আমার পরিচিত পৃথিবীর মৃত্যু ঘটেছে। সম্ভবত আমরাই এর হত্যাকারী। অথবা শিকার। জানি না! কেবল শরীরে অসহ্য জ্বালা অনুভব করি। অস্তিত্ব বিষাক্ত করা এই সব প্রসঙ্গ! যার বিষযন্ত্রণায় প্রতিনিয়ত বিক্ষত হচ্ছি। এখন প্রকাশ্যে এর

জবাবদিহি করতে হচ্ছে। আমার অতীতের নগ্ন প্রকাশ শুরু হচ্ছে।... সহ্য হয় না। কথা বলারও রুচি হয় না।

ঘরে ফিরে দেখি, একটা প্রমাণ সাইজ কাঠের ওপর নিজেকে সঁপে দিয়ে স্থির পড়ে আছেন বাবা। কিন্তু তাঁর গলা চিরে বিচিত্র শব্দ বেরোচ্ছে এবং চোখ জোড়া ভয়াল লাল! পুরো শরীর লোহার মতন টানটান! অসম্ভব যন্ত্রণায় মাথা ঝাঁকানোর চেষ্টা করছেন। পাশাপাশি কিছু দেখে ভয়ার্ত চোখে ওপর দিকে তাকাচ্ছেন। নীলচে হয়ে উঠছে মুখ, চোখ রক্তবর্ণ।

আমি এক দৌড়ে মার ঘরে যাই। মা প্রথমে আমল দেন না। বলেন, প্রায়ই এমন হয়। কিন্তু আমি আমার মনের চোখ দিয়ে দেখছি, মানুষটা স্থির কোনো মহাশক্তির সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। আমি মাকে টেনে নিয়ে আসি। সেই মুখ দেখে মাও কেমন বিহ্বল হয়ে পড়েন। তাড়াতাড়ি তিনি বাবার শিয়রে বসে যান। বালিশ থেকে মাথাটা উঁচু করে ধরেন, যাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের সুবিধে হয়। বোঝা যাচ্ছে দম টানতে তাঁর অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে। আমিও তাঁর পিঠের কাছটায় যাই। টান দিয়ে ওঠাব— উফ্ আল্লাহ! সমস্ত পিঠে পচন ধরেছে। অয়েলক্লথের সাথে সেই ঘায়ের আঠালো পুঁজ লেগে সেটা পিঠের সাথে আটকে গেছে। কী বিশ্রী গন্ধ! আমি কেমন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। মা বলেন, অয়েলক্লথসহই ওঠা। তাই করি। অবশ্য বাবার দেহ খুব একটা ভারি না। অসুস্থতায়-অসুস্থতায় হাড্ডিসার বলতে যা বোঝায়, তাই। তবুও, সেই দেহটাকেই তুলতে গিয়ে মা আর আমি রীতিমতো ঘেমে উঠি। দু'জন দু'মাথায় ধরে তাকে টেনেটুনে বিছানায় বসাই। অয়েলক্লথ আর বাবার পিঠের পুঁজে পুঁজে আমার দু'হাত একাকার। এই সময় হঠাৎ বাবার গলা চিরে বেরুনো গর্জনে আমি আর মা এক সঙ্গে চমকে উঠি। তিনি চোখ উল্টে উল্টে ওপর-মুখী দম টানতে শুরু করেন। ঠিকরানো চোখে বাঁ হাত তুলে দরজার দিকে কী যেন দেখতে থাকেন।

তাই দেখে মা চিৎকার করে ওঠেন, মন্টু... মন্টু।

মন্টু কোথাও নেই। রানু এগিয়ে আসে। সবচেয়ে অদ্ভুত লাগে তার আচরণ। মা চিৎকার করে বলেন, রানু, জানালা খুলে দে। তোর বাবার নিঃশ্বাস আটকে আসছে। রানু ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। এবং নির্লিপ্ত চোখে দেখতে থাকে বাবার মুখের উত্থান-পতন।

এবার আমি চেঁচিয়ে উঠি, রানু, শুনছিস না মা কী বলছেন?

আমার এ কথার পর আমি রানুর ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠতে থাকা মুখে মৃদু কাঁপন লক্ষ করি। কিন্তু তার অবস্থানের কোনো পরিবর্তন দেখি না। বাবাকে মার ওপর ছেড়ে দিয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে আমি জানালার কাছে ছুটে যাই। দরজা খুলে দিই। মা বলেন, বাবা মরলে ওর তো সুবিধে হয়, ও নড়বে কেন? জানালা খুলতে অন্ধকার কিছুটা হালকা হয়ে আসে। এক ফোঁটা হাওয়া আসে। কিন্তু তারপরও বাবার যন্ত্রণাকর অভিব্যক্তির কোনো পরিবর্তন ঘটে না। দাড়ি চুইয়ে লালা বুক অব্দি গড়াচ্ছে। কিন্তু গলার গোঁ-গোঁ শব্দ কমছে না। উদ্বিগ্ন হয়ে ফের রানুকেই বলি, একটু ডাক্তারকে খবর দে রানু, দেখ না মন্টু কোথায়?

কিন্তু রানু কাঠ হয়ে আছে। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বাবার ওপর বিদ্ধ। প্রথমে ভাবি, সম্ভবত বেশি নার্ভাস হয়ে পড়েছে, তাই মাথায় কিছু ঢুকছে না। কিন্তু বাবা এক হাত ওপরে তুলে যখনই বীভৎস মুখ করে আ-আ শব্দে চিৎকার দিয়ে উঠলেন, আমি স্পষ্ট দেখি, রানু কেমন

উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। পলক পড়ছে না চোখের। সেখানে যেন এক ফিকে উজ্জ্বল আলো খেলে যায়। আমার বুক থেকে স্ট্র দিয়ে জল শুষে নেয় কেউ। কেমন হতবাক হয়ে পড়ি। এবং তেমনই মিশ্র অবস্থায় দাঁতে দাঁত চেপে ছুটে যাই রাস্তায়। ভাগ্য ভালো, মন্টু রাস্তায় কিছু উদ্ভটগোছের ছেলের সাথে আড্ডা দিচ্ছিল। আমি দূর থেকে তাকে ডাকি এবং বাবার অবস্থার কথা বলে তাড়াতাড়ি ডাক্তার আনতে পাঠাই।

বাবার অবস্থার পরিবর্তন নেই। মা তাকে উঁচু বালিশে শুইয়ে দিয়ে তার নিথর ডান হাত ধরে ক্রমাগত ব্যায়াম করাচ্ছেন। আমি তার নাকের কাছে পাখা এনে রুদ্ধশ্বাসে বাতাস করি। কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করি, বাবা... বাবা।

কিন্তু তাঁর বিস্ফারিত চোখ শূন্যে। অবশ হওয়ায় স্থির ঠোঁটের একপাশ নিচের দিকে ঝুলে পড়েছে। বাকি অংশে থর-কাঁপুনি।

একবার একটা ছবি দেখেছিলাম। একটা খোঁড়া জীবন্ত হরিণকে টেনে-হিঁচড়ে তার প্রায় গলা অব্দি খেয়ে ফেলল একটা নেউলে। গোঙাতে গোঙাতে একপর্যায়ে এসে মারা গেল হরিণটা। ছবিতে দেখা সেই হরিণটার সাথে বাবার মিল খুঁজে পাই আমি। একই দশা যেন দু'জনার। ক্ষতাক্ত হরিণ— ক্ষতাক্ত পিঠের বাবা। দু'জনই কী অসহায় তাদের শারীরিক অক্ষমতার জন্য।

মা ভেজা তুলো ঘষে ঘষে একদিকের ঘা পরিষ্কার করেন তো, আরেকদিকের মাংস খসে পড়ে। আর সেই সঙ্গে খলবলে রক্ত আর পুঁজের স্রোত শরীরের এপাশ ওপাশ থেকে বেয়ে বেয়ে নামে। আর তার মধ্যে বাবার চোখ জোড়া কেমন বুজে বুজে আসতে থাকে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল আসে পুরো ঘরকে তামাটে আর বিবর্ণ করে। সারা মেঝে জুড়ে কাদাজল লেপ্টে আছে। দেয়ালে টিকটিকির মুণ্ডু নিয়ে নামছে লাল পিঁপড়ের দল। রানু সেই একই ভঙ্গিতে বসে আছে। কখনো বাবার বিকৃত কণ্ঠস্বর উচ্চস্বরে বাজলে ত্বরিত গতিতে মুখ বাড়িয়ে দেখছে, কিন্তু সেই চেহারায় না কোনো ঢেউ, না কোনো তরঙ্গ, না বেদনা কিছু নেই। বাবাকে ফেলে আমি মরিয়া হয়ে এবার রানুকে দেখি। বাবার কষ্ট বাড়লে অদ্ভুত হয়ে ওঠে ওর মুখ। যে মুখ নিয়ে সে আগে মেলার জিনিস দেখত, একটা বিশাল হাতি হেঁটে যাচ্ছে দেখত কিংবা বিশাল বিয়ের আয়োজন, চোখের বিস্ময়ে অনেকটা তারই ছাপ।

নাহ, আমার এখন রানুকে দেখার সময় নেই। ডাক্তার এসে গেছে। বাবার শারীরিক অবস্থার খবর পেয়ে প্রতিবেশীদেরও অনেকেই এসে যান। দীর্ঘদিন পর কিছু প্রতিবেশীর মুখোমুখি হয়ে আমি তীব্র অস্বস্তি নিয়ে একটু দূরত্বে গিয়ে দাঁড়াই। ঘর জুড়ে তাদের ব্যগ্র, ব্যস্তসমস্ত ছোটাছুটি, উদ্বেগ-মেশানো মন্তব্য আর কথাবার্তায় গুমোট ভাবটা কেটে যায়।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, ডাক্তার আসার পর মুহূর্তেই শীতার্ত মানুষের মতো কাঁপতে কাঁপতে খিঁচুনি দিয়ে বাবা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। আমার রক্তের মধ্যে চিড়িক দিয়ে ওঠে ঢেউ। ডাক্তারের নির্দেশে হন্তদন্ত মন্টু স্যালাইন আনতে ছোটে। সাথে কিছু ঔষধ এবং এইসব যোগাড়যন্ত্র করতে গিয়ে আমার ক্ষীণ অর্থের জমাট বান্ডিলে ততক্ষণে ভাঙন শুরু হয়ে গেছে।

সন্ধে নাগাদ সব প্রস্তুতি শেষ হয়। খাটের স্ট্যান্ডের সাথে স্যালাইন ঝোলানো হয়েছে। মলমূত্রে পুরো বিছানা ভেজা। দীর্ঘদিন ধরে মা এই কাজের সেবাদাসী। কিছু পরামর্শ দিয়ে

চড়া ভিজিট নিয়ে ডাক্তার চলে গেলে আমার আর্থিক অবস্থা দস্তুর মতো বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। যা হোক, এখন সেটা নিয়ে চিন্তা করে কোনো লাভ নেই। আমি একটা জিনিস স্পষ্ট টের পাই, বাবা সম্ভবত রওনা দিয়েছেন। অবশ্য মন্টু ব্যাপারটাকে আমলই দেয় না। দীর্ঘ বছর ও মাসের ব্যবধানে সে বাবার এমন বহু উত্থান-পতন দেখেছে। মার মুখ দেখে তাঁর প্রতিক্রিয়া বোঝার উপায় নেই। তবুও কিছুটা হতাশাগ্রস্ত দেখায় তাঁকেও।

সন্ধ্যা পেরিয়ে গেলে ভিড় কমে আসে। কিছু নিকট আত্মীয় তখনো রয়ে যায়। আমার দূর সম্পর্কের এক চাচি এসে পাশের বাসায় আনাম চাচার স্ত্রীর সাথে ইনানো বিনানো গল্প ফাঁদে। কাঠের বিছানায় বাবার শীর্ণ দেহ তেমনি মিশে আছে। স্পষ্টভাবে তার বুকের ওঠানামা টের পাওয়া যাচ্ছে। কী বিদঘুটে গন্ধ! অসম্ভব নিপুণ হাতে মা বাবার শরীরের নিচ থেকে গু-মুত সমেত ওয়েলক্লথ ধরে টান দেন। এবং রানুর শরণাপন্ন হন— তোর বাবার পা দুটো ওঠা তো! আমাকে আবারো স্তম্ভিত করে দিয়ে এইবার রানু টানটান দাঁড়ায়। এবং ক্ষিপ্রগতিতে বাবার ঠ্যাং ওপরে তুলে মাকে ওয়েলক্লথ বের করতে সাহায্য করে। ওয়েলক্লথ বের করে মা যখন সেসব নিয়ে কলতলায়, রানু তখন ভেজা ন্যাকড়া এনে বাবার পায়ে লেগে থাকা এক গাদা মল মোছায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ভোটকা গন্ধে আমার দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম। অথচ সেই ঘিনঘিনে পাঁকে ঝুঁকে থাকা অবস্থায় রানুর মুখে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। হারিকেন জ্বেলে টেবিলে রাখে মন্টু। এক চিলতে বিচ্ছুরিত আলো বাবার শরীরে আড়াআড়ি ছায়া ফেলে।

ঘরে প্রতিবেশী আরো দু'চারজন এসে জোটে। সেই সম্মিলিত জোটের সামনেই আয়েশে গালের মধ্যে খিলি পোরে আমার সেই চাচি এবং বর্ণনা করে চলেন তার মৃত্যুপথ যাত্রী ভাসুর ছিলেন আস্ত ফেরেশতা। যখন সবে চাকরিতে ঢুকেছেন, তখন তাঁদের বাড়িতে কত কমলা, মুরগি এইসব নিয়ে যেতেন। কোনোদিন কারো মনে চোট দিয়ে কিছু বলেন নি। সর্বদা আল্লাহর বন্দেগিতে মগ্ন ছিলেন। তাঁর মতো লোকের কপালে যদি হাবিয়া লেখা হয় তবে তা হবে তাঁর সন্তানদের কুকীর্তির জন্য। এ কথা বলে তিনি আমার দিকে সরাসরি তাকান। নিজের বক্তব্যকে স্বস্তিকর আর জোরালো করার জন্য এবার অভিনব কায়দায় তিনি তর্জনী নাড়ান, হ্যাঁ হ্যাঁ তোমাকেই বলতাছি মেয়ে, আমি আর কী বলব। আরেফিনটাও বড় চাচার বাসায় ছিল বইল্যা কিছুটা মানুষ হইছে। আত্মীয় লাগো, বছরেও একবার আসি না বুঝো না কিসের লজ্জায়? এরকম পরিস্থিতিতে যন্ত্রণাকর অবস্থায় পড়া ছাড়া কোনো পথ থাকে না।

রানু গম্ভীর মুখে তখনো জলচৌকির ওপর বসে আছে। চাচির কথা চালাচালির মধ্যে তার বিন্দুমাত্র ভাবান্তর নেই। আমি বাবার মাথার কাছে বসে হাত পাখা দিয়ে বাতাস করে চলি একটানা। পুরো ঘরে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। আমি হাঁসফাঁস করে উঠি। চাচির প্রসঙ্গের সূত্র ধরে প্রতিবেশীরাও টুকটাক মন্তব্য করতে পেছ-পা হন না। কিছু নৈতিক দায়িত্ব তাদেরও আছে। আমাদের নিশ্চুপতার সুযোগে দ্বিগুণ উৎসাহে আনাম চাচার স্ত্রী আবারো গলা চড়ায়— বাড়িতে যে একটা মা আছে, তা বোঝার কোনো গতি নেই। আপনি তো দূরে থাকেন, দেখেন না। ছি-ছি কী অশ্লীল কাণ্ড! বিশেষ কইরা রানুর কারণে আমরা নিজেদের মেয়ে লইয়া ডরে থাকি, তুই যখন দুধের শিশু, নাক টিপলে দুধ বাইর অয়, তহন তুই করলি বুইড়া মজুমদারের লগে লটর-পটর। তুই খবিস না অইলে ওই ব্যাটা তরে লইয়া অমন

মামদোবাজি করে! আর মন্টু? হেয় তো মাস্তান হয়া উঠতাছে। ফ্যামিলিটা ধ্বংস হয়া গেল। আপনাদেরকে নতুন করে আর কী বলব, ঘরের বদ্ধতা চিরে এবার চাচির গলা ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে ওঠে, ফ্যামিলি ধ্বংসের দেখছেন কী? আরো দেখবেন। শুরু তো করছে হের চাচায়। নিজের আত্মীয়, বলতেও লজ্জা লাগে। বড় ভাই দানা পানি দিয়া বড় করল, লেখাপড়া শিখাইলো, তুই কী করলি? একটা চাকরি পাইলি। চইল্যা গেলি কুমিল্লায়, তারপরে? অসীম স্তব্ধতা নেমে আসে তার এই 'তারপরের' ওপর। কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। এবার ভেতরে ভেতরে এ-গল্প শোনার ব্যাপারে আমিও আগ্রহী হয়ে উঠি। দীর্ঘদিন পর সেই ভয়াবহ নাজুক বিষয় আমাকে কৌতূহলী করে তোলে। শরীরের মধ্যে কেমন কাঁপুনি অনুভব করি এবং সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য চোখে ভেসে ওঠায়, ভয়ও।

তারপর তুই চাকরি ছাইড়া আইলি, চাচি ফের শুরু করে— কয়দিন ভূতের মতন ঘরে বইসা রইলি। একদিন রাইতে গলায় দড়ি দিলি। ক্ষতিডা কার হইলো? তোর ভাইয়ের? না তর? পরে শুনছি, কোন ম্যারেড মহিলার সাথে ব্যভিচারী সম্পর্ক গইড়া উঠছিল, এইসব কথা কি চাপা থাকে? পাপ! পাপ! এই গুলোরে ঝাটায়া পাড়া থাইক্যা বিদায় করন উচিত। নাইলে কেয়ামতের আর দেরি নাই কইলাম। এই পর্যন্ত বলে ইস্তফা দেয় চাচি। এরপর প্রতিবেশীদের পালা। কিন্তু আমি ওদের সেই অম্লমধুর কথার ক্ষেত্র পেরিয়ে ডুবে গেছি অন্য অসীম তলায়, আমার কাছে এসবই নতুন তথ্য। সত্যিকার অর্থে ব্যভিচারী সম্পর্কের কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা আমার জানা নেই। সেই সম্পর্কটি যদি সত্যিই হয়ে থাকে, তার সাথে প্রাণের যোগ ছিল। তা না হলে আত্মহত্যার প্রশ্ন আসত না। আর প্রাণেরই যদি সংযোগ থাকবে, একটি সম্পর্কে যতই দেহ থাকুক, আমি কোন যুক্তিতে একে ব্যভিচার বলি? আর আমার সেই কাঠের মতো শক্ত চাচা, কোনোদিন যে হেসে কথা বলে নি, সকালে বেরিয়ে রাতে কঠিন মুখে এসে বিছানায় শুয়ে পড়া ছাড়া যার সাথে আমাদের বাসার কোনো সম্পর্ক ছিল না, হিসেবের বাইরে নড়তো না এক বিন্দু, সে কি-না চাকরি ছেড়ে দিল! এত দুর্লভ চাকরি। কুমিল্লা থেকে এসে নিশ্চুপ বসে রইল। একদিন রাতে আমাকে ডেকে বলল, তুই ছবি আঁকছিস এখনো? না ছেড়ে দিয়েছিস?

আমি ছবি আঁকি, চাচা সেটা জানে, আমার রীতিমতো ভিরমি খাওয়ার অবস্থা। আমাকে দ্বিগুণ হতভম্ব করে জীবনের প্রথম সেদিন সে আমার দিকে পঞ্চাশটি টাকা বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, তোর ছবি আঁকার কিছু সরঞ্জাম কিনে নিস্।

পরদিন খুব ভোরে আমার ঘুম ভাঙে। বাথরুমে যাওয়ার জন্য দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়েছি, ও আল্লাহ! এই বাইরের ঘরেই, বাবা যেখানে শুয়ে, তার মাথার ওপরেই জং পড়া পুরনো সিলিং ফ্যানটা ছিল, তার সাথে গামছায় বাঁধা চাচার নিথর দেহটা দুলছে। বিকৃত মুখ থেকে জিভ বেরিয়ে পড়েছে। গালে এক চিলতে শুকনো রক্তের রেখা। অস্পষ্ট মনে পড়ে, বনভূমি ফাটিয়ে একটা আর্তস্বর, নিজের আর্তস্বরে নিজেই ছিন্নভিন্ন, কম্পিত, মেঝেটা টাল খেয়ে সটান ছাদে উঠে গেল, আর সিলিং ফ্যানসহ চাচার দেহটা যেন মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল! সশব্দে পলেস্তরা ওঠা দেয়াল এগিয়ে আসছে এবং ভয়ঙ্কর ঘূর্ণি... তারপর কিছু মনে নেই। আর আজ চাচি বলছে সেই মৃত্যুর একটা জটিলতম সূত্রের কথা। সেই দৃশ্য দর্শনের পর আমি দীর্ঘদিন স্বাভাবিক হতে পারি নি।

তারপর কত রাত, কতদিন... ভেবে ভেবে... কেন ? কী সেই অন্তর্নিহিত কারণ ? কোনো তল পাই নি। তারপর বাবা সেই ফ্যানটা বিক্রি করে দিয়েছিলেন। সেই ঘটনার পর থেকেই বাবা মূলত ভয়ঙ্কর রকমের নীরব হয়ে যান। চরিত্রের মধ্যে জাগতিক সংসারের যাও কিছু ছিটেফোঁটা উপকরণ ছিল, সবকিছু ধুয়েমুছে সেখানে এককভাবে জায়গা করে নেয় সৃষ্টিকর্তা আর পরকালের শান্তির ধ্যান। আজ সেই ঘটনার অন্তর্নিহিত কারণ শুনে আমার সারা শরীর জ্বর তপ্ত হয়ে ওঠে। কী অসম্ভব প্রলাপ বকছে সবাই। আমাদের ঘরে এসে আমাদের কাসুন্দিই ঘেঁটে যাচ্ছে। কোনো শালার পাঁচ পয়সার কাছেও আমাদের জীবন জিম্মি নেই। তবুও চুপ করে আছি, প্রতিবাদ করছি না। এই জরাজীর্ণ ঘর, একটি অপমৃত্যুর বদ্ধ বাতাস যেখানে, সেখানে আজ বাবার শাদা হয়ে ওঠা পাণ্ডুর মুখ রক্তাক্ত, বিক্ষত দেহ, আমার রক্ততরঙ্গকে হিম করে দিচ্ছে। আমাদের বিপন্ন, নিঃশব্দ ভদ্রতার কী অবাধ সুযোগ নিচ্ছে এরা!... রানু, মন্টু, মা— একের পর এক সবাই প্রসঙ্গ হয়ে আসছে। বিভিন্ন কোণ থেকে তার বিশ্লেষণ হচ্ছে। সব শুনেও কী ভয়ঙ্কর ভাবলেশহীন রানু। ওর তো দু'কানই কাটা। ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে পারে না সবাইকে ? কিন্তু কথার আঁচড় গায়ে লাগলে তবে না প্রতিবাদের প্রশ্ন। বিকৃতিকে ভালোবাসে রানু, ভালোবাসে যন্ত্রণাকে, রানু শেষ হয়ে গেছে।

প্রতিবেশীরা চলে যায় এক সময়। দেয়ালে ঠেস দিয়ে প্রাণহীন বসে থাকেন মা। মন্টু দাঁড়িয়ে আছে স্যালাইন স্ট্যান্ডের পাশে। হ্যারিকেন জ্বলছে বদ্ধ অন্ধকারের নাভি চিরে চিরে। নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে মার মৃদু কান্নার শব্দ শুনতে পাই।

ঘুণধরা চেয়ারের পায়া থেকে অসংখ্য গুঁড়ো কাঠ মাটিতে। রানু সেই চেয়ারে বসে নিজের গায়ে হাওয়া লাগাচ্ছে। এর মধ্যে মার বিপন্ন কণ্ঠস্বর মৃত্যুর মতো শোনায়— বাঁচবে তো ? তারপর খোলা দরজায় ছায়া। ক্ষিপ্রগতিতে মুখ ঘোরাই। আমার শরীরের আগুন মুহূর্তে ঠাণ্ডা ফোস্কায় পরিণত হয়। যেন দৈত্য, শূন্য থেকে মাটিতে নেমে এলো। কঠিন ক্রূর চোখে তার দিকে তাকাই— মজুমদার। ধীর পায়ে হেঁটে সে বাবার শয্যার পাশে যায় এবং তাকে দেখে ধনুকের ছিলার মতন খাড়া হয়ে ওঠে রানু। এত অদ্ভুত তার আনন্দ, এত অশ্লীল তার প্রকাশ যে, ঘৃণায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে থাকে আমার। দ্রুত উঠে রানু বাবার মাথার কাছে চেয়ারটি পেতে দেয়। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধতা। মজমুদার এক সময় গম্ভীর কণ্ঠে বলে, সময় শেষ হয়ে গেছে।

এবং তার এই গায়েবি আওয়াজে আপ্লুত রানু উদ্ভাসিত মুখে বলে, আপনার পক্ষেই সেটা জানা সম্ভব। আপনার সেই শক্তি আছে। আমি আপনাকে খবর দিতে চাইছিলাম। বাবার বর্তমান যে অবস্থা, তাতে এই মন্তব্য যে-কোনো শিশুও করতে পারে। সেটা রানুকে বোঝানো সম্ভব না। এই রূপকথার ভয়াল দৈত্যটি ঘরে ঢোকার পর আমার হাড় মাংস এক হয়ে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। আমার বিক্ষত দেহে যেন ঝাঁকে ঝাঁকে লাফিয়ে পড়েছে জল বিছুটি। মাকড়সার জালের ঝুলকালি হালকা বাতাসে কাঁপছে। কঠিন মুখে বসে আছে মজুমদার। রাত দীর্ঘতর হয়। দেয়ালে ঠেস দিয়ে অপলক চেয়ে আছি। স্যালাইনের ব্যাগ বদলে দিচ্ছে মন্টু। ভীষণ স্পন্দনহীন বাবার দেহ। দুটো টিকটিকি লেজ নাড়ছে অনেকক্ষণ ধরে। একটি নাড়ছে, থেমে গেলে লেজ তোলে অন্যটি। অসীম ধৈর্য এদের। কঠিন চোখে পর্যবেক্ষণ করি। জেগে উঠেও এত সময় নেয়! মরার মতো পড়ে আছে স্থির। মাঝে-মাঝে লেজের উত্থান-পতনে অশ্লীল ইঙ্গিত। দীর্ঘসময় পর একটি খেপে যায়। অন্যটিকে দ্রুত

কামড় দিয়ে ছুট লাগায়। অনেক দূর। সেখানে বেশি অন্ধকার। দৃষ্টি প্রসারিত করি। পেছনে অন্যটি। সেখানেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। লেজ নাড়ার ক্রীড়া-কৌশল অব্যাহত। হাঁপিয়ে উঠি। ভয়ঙ্কর কুটিল মুখের মজুমদার বাবার মাথার কাছে স্থির। কেবল অস্থির রানু। হাঁটছে ঘরময়। এক সময় আমার চোখ আবারো ওপর দিকে চলে যায়। অসম্ভব সুসংলগ্ন হওয়ার পরও মেয়ে টিকটিকিটা পুনরায় ছুট লাগিয়ে, দূরে। বাবা শুয়ে আছেন জীবন-মৃত্যুর মাঝখানের শয্যায়। হারিকেন নয়, চারপাশে জ্বলছে পঞ্চপ্রদীপের শিখা। বল্গাহীন অশ্বের মতো আমার বিপরীত ভাবনা ছোটে। আমার কপালে সিঁদুরের রেখা... কাঁধে রুদ্রাগ্নিবীণা কন্যা— তুমি কে ?... কলাবতী কন্যা আমি, মেঘবরণ কেশ/তোমার পত্র পাঠাও যদি কলাবতীর দেশ।

পঞ্চপ্রদীপের ভাঁজ খুলে নিচে নেমে আসি। চারপাশে দাউদাউ মরুবালির ঝড়... কিন্তু এ-কী সমুখে বানর কেন ? কোথায় সেই সুপুত্র রাজকুমার ? মহিম একাগ্রচিত্তে কার মুখ আঁকছে ? আমার চরণের আলতা স্পর্শ করে যে পুরুষ... তার সারা দেহে সুঁচ কেন ? পরনের লুঙ্গি খুলে ঝাঁপ দেয় রেজাউল। কুড়মুড় করে খাই অজিতের মুণ্ডু, কুড়মুড় করে খাই কুসুমের পিণ্ডি...। এ-কী! কুসুমের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে মানব শিশু। হায়! ডিম ভেবে আমি তাকে খেয়ে ফেলছি! ছিদ্র দিয়ে উঁকি দেয় কে ? মাগো কী বিশাল শঙ্খচূড়...। দৃষ্টি প্রসারিত করি।

নখরামো শেষ! এখন দেয়ালে একটা টিকটিকি অন্যটির সাথে সঙ্গমে লিপ্ত। মার শাদা মুখ জলহীন। অন্ধকার ফুঁড়ে ডাইনির মতো মজুমদার দাঁড়িয়েছে। স্বল্প তেলের বদ্ধতায় পড়ে ছটফট করছে প্রদীপ শিখা। দপ! দপ! দপ!

মধ্যরাতে বাবার মৃত্যু ঘটে।

এরপর আরো দু'মাস পেরিয়ে যায়। এই দু'মাসেও আমার জীবনে সেই সাবেকি দারিদ্র্য, ঘিনঘিনে বাস্তবতা নিরন্তর আমাকে খুঁড়ে গেছে। মাঝে মাঝে খেই হারিয়ে ফেলি। কোনো কিছুর তল খুঁজে পাই না। এতদিন বলতে গেলে একাই ছিলাম। আমাদের পরিবারটা ছিল আমার মুমূর্ষু স্মৃতির মধ্যে। কিন্তু বাড়ি থেকে ফেরার পর তাদের সমস্ত চাপ এখন বাস্তবিক অর্থে আমার গভীর এক দায়িত্ববোধের আওতায়। নিজেকেই প্রশ্ন করি, আর কত পারা যায় ? তবুও, এড়ানো তো যায় না। আমার মধ্যে জীবন-যুদ্ধ ছাড়াও ছিল একচিলতে নিজস্ব একটা পৃথিবী। কিন্তু সেই পৃথিবীর সবকিছু খসে পড়তে থাকে ক্রমশ। এখন সারাক্ষণ কেবল এক দিকেই কেন্দ্রীভূত সমস্ত চিন্তার জট— অর্থ। এই দু'মাস বেতন পেয়ে প্রথম হপ্তায়ই এক হাজার টাকা করে পাঠিয়ে দিয়েছি বাড়িতে। তারপর বাড়ি ভাড়া দিয়ে ঝাড়া হাত-পা। শানুর কাছ থেকে কিছু নিয়ে, সংকোচ কাটিয়ে বড়ুয়া বাবুর কাছেও হাত পেতেছি। আমার বিয়ের আংটিতে এতদিন হাত পড়ে নি। গতকাল সেটাও বিক্রি করে দিয়েছি। আমার বৈবাহিক সম্পর্কের শেষ চিহ্নটাও ধুয়েমুছে গেল। কিছু লোন শোধ করে বাকি টাকা দিয়ে পাঁচ কেজি চাল, এক কেজি ডাল, একটা সাবান, এক কেজি আলু, এক কেজি চিনি, ব্যস টাকা শেষ। শানুকে অনুরোধ করি, তোমাদের সাথে এক সাথে খেয়ে পোষাবে না আমার, কয়েকটা মাস আমার রান্না আমিই করব। তুমি কিছু মনে করো না ভাই।

শানু বিস্ময় প্রকাশ করে, আমি বুঝছি না, তাতে করে তোমার লাভ কী হবে! একা খেলে খরচ হবে না ?

সে হিসেব তুমি বুঝবে না। প্লিজ, ক'টা মাস আমি আমার মতো করেই চলি। কিছু মনে করো না লক্ষীটি।

আসলে গতমাসে বলতে গেলে তাদেরকে খাওয়ার টাকা দেয়াই হয় নি। যা দিয়েছি তাতে করে মাসের সাত কী দশদিন মাত্র খাওয়া চলে। তারপর খুচরোখাচরা কিছু দিয়েছি। এই নিয়ে আমার অস্বস্তি আর গ্লানির সীমা নেই। এমনিতেই বেচারি নিজেই থাকে হাজারো সঙ্কট আর টানাটানির মধ্যে। ইদানীং কামাল ভাইও কেমন বিশৃঙ্খল হয়ে উঠছে। আজকাল মাঝেমধ্যেই রাতে বাড়ি ফেরে না। বলে, অন্য কাজের ধান্দা করছে। যদি একটা মুদির দোকান দেয়া যায়। এর সাথে রাতে বাইরে থাকার কী সম্পর্ক, চোখ আর নাকের জল এক করেও শানু এর তল খুঁজে পায় না। এতকিছুর পরেও নিজের স্বামীর চরিত্র নির্দোষ-নির্মল, সে কথা বলে ও সান্ত্বনা খুঁজে পেতে চায়। বলে, বাচ্চা না থাকলে পুরুষদের কোনো ঘরের টান থাকে ? তারই-বা কী দোষ ! সে তো এসব না করে আর একটা বিয়েও তো করে ফেলতে পারত। আসলে মানুষের নিজেকে বাঁচানোর কী অদ্ভুত সব কায়দা! বিশ্লেষণ করতে গেলে অবাক হতে হয়। জানালার একটা পাট বন্ধ হয়ে গেলে কী দ্রুত সে অন্য পাট খুলতে ব্যস্তসমস্ত হয়ে পড়ে। এ নিজেকে স্বস্তির মধ্যে বাঁচিয়ে রাখার ফাঁকিভরা কৌশল ছাড়া আর কী। নিজেকে নিজের কাছ থেকে, অন্যের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার সহজতম পথ। এসবের মধ্যে আমিও তাদের কাছে একটা বোঝা হয়ে উঠছি। এতদিনের আন্তরিকতা, মায়া, এখনো তাই ভাগাভাগি করে আছি। কিন্তু ক'দিন ? আমারও তো আর এভাবে চলে না।

পুরো ঢাকা শহর জুড়ে এখন এক উত্তেজনা, এক ভয়, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কি আসন্ন ? পত্রিকার কাটা কাটা হেড লাইন বুক হিম করে দেয়... 'পরিস্থিতি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মতো। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও... বুশ'। 'ট্রিগারে আঙুল। যুদ্ধের জন্য দুই পক্ষ মুখোমুখি।'

এছাড়াও কিছুদিন আগে থেকে শুরু হওয়া লাগাতার হরতালের থিতানো জের এখনো চলছে। বাড়ি থেকে হরতাল জেনেও ঝুঁকি নিয়ে ফিরে এসে কী বিপর্যস্ত অবস্থাতেই না পড়েছিলাম! একদিকে বাবার মৃত্যুজনিত কারণে বাড়ি থাকতে হলো ক'দিন, অন্যদিকে অফিসের টেনশন। আরেফিন সাহস দিল, স্টেশনে নেমে গেলে অন্তত একটা রিকশা তো পাবই। সকাল সন্ধ্যা হরতাল। স্টেশনে নেমে দু'জন বোকা বনে গেলাম। ধুধু ঢাকা শহর। রিকশাগুলো সব সার বেঁধে ঘুমুচ্ছে। কী আর করা, লাগেজপত্তর নিয়ে দু'জন হাঁটতে শুরু করি... হাঁটতে হাঁটতে... এ এক মজা, শূন্য নগরীর এ রাস্তার আমেজই আলাদা। তবে আমি বেশ হাঁপিয়ে উঠছিলাম। বড় ব্যাগটা আরেফিন নিজে নিয়ে তাড়া দিয়ে আমাকে টেনে নিচ্ছিল। হঠাৎ লক্ষ করি, একটি বিশাল মিছিল এগিয়ে আসছে। মিছিলের সামনে পুলিশের কর্ডন। স্পষ্ট টের পাই, আরেফিন উত্তেজিত হয়ে উঠছে। আমি ওর হাত চেপে ধরি। স্লোগানের শব্দ বাড়ছে। সার সার পুলিশ। মিছিলটাকে কাছে দেখে আমার ভিরমি খাওয়ার যোগাড়। এত বিশাল। আমি হাঁ হয়ে ফুটপাতের ওপর গিয়ে দাঁড়াই। মুহূর্তে মিছিলের ভেতর থেকে কে একজন বেরিয়ে— শালা আরেফিন, তুই হাওয়া খাচ্ছিস, এই বলে সুটকেসসহ আরেফিনকে ভিড়ের মধ্যে টেনে নেয়। তখনই ঘটে ঘটনাটা। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ। সাথে সাথে ছিন্নবিচ্ছিন্ন ঝাঁঝের মধ্যে পড়ে যাই। হতবিহ্বল হয়ে আরেফিনকে খুঁজি।

কিন্তু পুলিশ ততক্ষণে গ্যাস শেল ছুঁড়ছে। তারপরও মিছিলকে ঠ্যাকাতে পারছে না। ধোঁয়া, চিৎকার, দু'চোখে টিয়ারগ্যাসের ঝাঁঝালো ঝাল! খেই হারিয়ে দিক-বিদিক ছুটতে থাকি। এর মধ্যে হঠাৎ একটা গুলির শব্দ যেন আমার হৃৎপিণ্ডের ওপরে এসে পড়ল। পাগলের মতো দৌড়ে এক জায়গায় এসে দেখি, রক্তমাখা দু'জন যুবককে পুলিশ দিব্যি তাদের গাড়িতে ভরে মুহূর্তে হাওয়া হয়ে গেল। কিছু দূরেই বিক্ষুব্ধ জনতার রোষের শিকার একটা লাল টয়োটাকে দাউদাউ পুড়তে দেখি। নাক মুখ প্রচণ্ড যন্ত্রণায় জ্বলছে। সেদিন পায়ে কী ভর করেছিল, চোখে গ্যাসের আঁধার নিয়ে কীভাবে যে দরজায় এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলাম... ভাবলে এখনো স্বপ্নে দেখা দৃশ্য মনে হয়। আমার শীতার্ত বুকে পা ফেলে তারও দু'ঘণ্টা পর সুটকেস বুকে চেপে ধরে আরেফিন আসে, উস্কোখুস্কো মুখ, হতচকিত ভঙ্গি, আমাকে দেখে সে যেন প্রাণে জল ফিরে পায়— সাব্বাশ বালিকা... অক্ষত আছ তাহলে! এইভাবে ঢাকা শহরের উত্তেজিত বুকের প্রান্তর জুড়ে আমার উদ্‌ভ্রান্ত দিন কাটে।

গত দু'মাসের মধ্যে তিনদিন গিয়েছি ইরফান চাচার বাসায়। একমাত্র ওখানে গেলেই কিছুটা হলেও আমার বেঁচে থাকার অর্থ আবিষ্কার করতে পারি। সামান্য সময়ের জন্য হলেও এইসব জঘন্য হিসেব-নিকেশ, হাঁপ-ধরা-বাস্তবতা থেকে মুক্তি পাই। মনে আছে বাড়ি থেকে ফেরার পর আমি যখন চরম বিপর্যস্ত, বাবার মৃত্যু, রানুর যন্ত্রণা, মন্টুর বখে যেতে থাকা, মার নিস্পলক ঠাণ্ডা মুখ... মগজের ভেতরে এইসব দুঃসহ বিষয় দাবড়ে বেড়াচ্ছে, তার মধ্যেই টানা অফিস, টাকাকড়ির চূড়ান্ত টানাটানি, তখন কী এক টানে ছুটে গিয়েছিলাম ও বাড়িতে। সেখানকার নিস্তব্ধতা, ইরফান চাচার চিরকালীন স্থিরতা, আমাকে ঠেসে ধরেছিল ভয়ানকভাবে। বলতে গেলে গিয়েই বাসায় ছুটে আসার জন্য পা বাড়িয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, বসো।

বসে উশখুশ করছি, জানতে চাইলেন, ছবি আঁকা শুরু করেছ?

না, আমি রীতিমতো খ্যাপাটে ভঙ্গিতে বলি, আমার জীবনে হাজারো কাদার ঘাঁটাঘাঁটি, আমার ওসব হবে না।

হলে এর মধ্যেই হবে। তাঁর ঠাণ্ডা দৃষ্টি আমার ওপর বিদ্ধ, এত ছটফট করছ কেন? সুস্থির হয়ে বসো।

আপনি ভাগ্যবান, সুস্থিরতা কেনার ক্ষমতা রাখেন, গাড্ডায় পড়া মানুষকে রঙিন স্বপ্ন দেখাতে পারেন, কী এক জেদ থেকে একনাগাড়ে বলে যাই, ছবি আঁকা আমাকে দিয়ে হবে না। আপনি দয়া করে এ বিষয়ে আর কিছু বলবেন না। তিনি ম্যাগাজিন হাতে নিয়ে আশ্চর্য শিথিল হাতে ওল্টাতে থাকেন। আমি হনহন হেঁটে তাঁর বাসা থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। তিনি একটি কথাও বলেন নি।

রাতে ইজেলে শিট চড়াই। রঙের লিনসিটে তুলি ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি দীর্ঘক্ষণ। একসময় অবসাদে নুয়ে আসতে থাকে শরীর। এভাবে অনেকক্ষণ। ক্রমশ ঝিমিয়ে আসি, ছাদে হা-হা শূন্যতা। সব গুটিয়ে বিছানায় আছড়ে পড়ি।

তারপর নিজেকে বিন্যস্ত করে আরো দু-দিন তাঁর বাসায় গেছি। গেলে হাজারো তর্ক হয়। মানুষের প্রবণতা, বৃদ্ধি, সামাজিক অস্থিরতা, তাঁর নিজের জীবন নিয়েও বিস্তর আলাপ। কীভাবে সংঘাতে সংঘাতে বেড়ে উঠেছেন, এইসব। কিন্তু ছবি আঁকা বা শিল্পচর্চা নিয়ে

কোনো কথা হয় না। আমিও বলি না। আমার পক্ষে সম্ভব হলে আঁকব, নইলে না। কিন্তু এই একটি ব্যাপারে ইরফান চাচা আশ্চর্য নাছোড়। খাওয়া, ঘুমানোর চিন্তা না থাকলে নিজের জন্য আঁকার বিষয় নিয়ে ভাবা যেত। আমার জীবনে সেই আরাম কই?

তিনি বলেন, নীনা, কখনো শান্তিনিকেতনে গেলে রামকিংকরের মূর্তিগুলো দেখো। স্কাল্পচারের কী অদ্ভুত ফরম্... সবগুলো মূর্তি দাঁড়িয়ে, কোনো পেলবতা নেই, নিরেট কালো, মনে হয়, সব হাড় পুড়ে গেছে। মানুষ আকৃতির ছাই দাঁড়িয়ে আছে। নীনা, ভাবতে পারবে না— তাঁর ধৈর্য দেখে এইবার হেসে ফেলা ছাড়া আমার কিছুই করার থাকে না।

সালাহ্‌দিন রিলিজড্ হয়েছে শুনেছি। যাওয়ার দায়িত্ব বোধ করছি। কিন্তু ভেতর থেকে তাগিদ অনুভব করছি না। আরেফিন শহরতলির কোনো একটা হাইস্কুলে চাকরি পেতে যাচ্ছে। কথাবার্তা হয়ে গেছে। মাস পয়লা জয়েন করবে। সেখানে নাকি বিস্তর টিউশনির সুযোগ। কিন্তু তাতে করে তার নিজের ক্লাসের ক্ষতি হবে। কিন্তু ও নিয়ে আপাতত সে ভাবছে না। পাসের ব্যবস্থা নাকি হয়ে যাবে।

সত্যজিৎ, রন্‌জু কারুর সাথে অনেকদিন ধরে যোগাযোগ নেই। অফিস থেকে বাসায় ফিরে ছাদের দিকে স্থির চোখ রেখে শুয়ে থাকি। শুরু হয় চিরকালীন স্নায়বিক যুদ্ধ— কেন আমার জীবনে সুন্দর কোনো রূপান্তরের ক্ষীণ স্বপ্নটুকুও নেই? তার চেয়ে তলিয়ে যাই না কেন? আমাকে ফেলে দেয়া হোক ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত কোনো সাত তলার নিচে। একটা পা ঢুকে আছে পাথরের স্তূপে, টেনে বের করতে পারছি না। মাথায়, চারপাশে সর্বত্রই ভাঙা দেয়াল। এক চিলতে আকাশ নেই। ফিকে রৌদ্রের কণামাত্র নেই। আহার, আলো আর বাতাসবিহীন কাতরে-কাতরে এক সময় ঝিমিয়ে আসব। যন্ত্রণায় চিৎকার করতে-করতে মরে যাব। এই রকম একটা মাঝামাঝি অবস্থা— ফাঁকফোকর দিয়ে এক টুকরো আকাশও দেখব, ওড়ার বাসনাও বুকের মধ্যে সৃষ্টি হতে থাকবে, কিন্তু কিছুতেই সেদিকে হাত পর্যন্ত বাড়াতে পারব না। এর চাইতে সেটা ঢের সুন্দর বাঁচার হবে।

তারচে' দেয়াল তুলে ফুটোটা বন্ধ করে দিই না কেন? কিছু দেখব না। সৃষ্টি হবে না কোনো আকাঙ্ক্ষা, ভুলে যাব আকাশের চেহারা।

কী অসম্ভব প্রত্যাশা নিয়ে সংসার শুরু করেছিলাম। তার ভেতর থেকে আমি নিজেই তো বেরিয়ে এসেছি। কিছুটা আপোস করে, নিজেকে সংসারের খাপ মতো তৈরি করে কাটিয়ে দিতে পারতাম একটি জীবন। দেশের বেশির ভাগ মেয়েই তো এর চাইতে ঘিনঘিনে জীবনযাপন করছে। স্বামী লাথি দিয়ে বের করে না দেয়া পর্যন্ত তার ভেতর থেকে তারা বেরোয় না। আমার পায়ের তলায় বেঁচে থাকার মতো এমন কী ভিত আছে? না পারিবারিক অবস্থা, না পড়াশোনা, কোনো দিকেই আমার পরিচয় দেয়ার মতন অবস্থা নেই। অনার্সটাও শেষ করতে পারি নি, কোন অহঙ্কারে লম্বা ঠ্যাং ফেলে সংসার থেকে বেরিয়ে এসেছি। কিন্তু তারপরও আমিই তাকে ডিভোর্স দিয়েছি। কোন সচেতন উপলব্ধি থেকে এর উৎপত্তি? কোথেকে পেয়েছি সেই সাহস? বিনিময়ে কি তার দেখা পেয়েছি, সংসারে থাকতে কিছুতেই যাকে স্পর্শ করতে পারছিলাম না? সেই একই জীবনেরই তো পুনরাবৃত্তি। একই যুদ্ধ। তবে?

একই যুদ্ধ কী? এবার আমি অন্য পথ ধরি। আমার সেই অসীম যন্ত্রণাগুলো? পাশাপাশি থেকে জটিল মানসিক পীড়ন? তার থেকে বেরিয়ে আসি নি? রাত এলেই একজন

লোক, যার গভীর অর্থে কোনো সুখ কিংবা দুঃখবোধ নেই, বিছানায় এসেই পুরুষত্ব জাহির করার খেলায় খেপে উঠত, জীবনে যার আর কিছুই চাওয়া-পাওয়ার স্বপ্ন ছিল না, দিনমজুরের মতো কাজ শেষে মাংসের একটা দলার ওপর নিজেকে যে নিঃসাড় করে দিতে চাইত। তখন আমি আনন্দে কি কষ্টে আছি তার হুঁশ নেই, আমি যেন স্রেফ মাটির দলা— এমনভাবে ফেলে আছড়ে খেলতে চাইত। দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে থাকতাম। তারপরও তৃপ্তি নেই, রাতভর ছটফট করত। কী অসহ্য দৃশ্য! ভাবলে এখনো রক্ত জল হয়ে যায়। বাইরে থেকে প্যান্ট-শার্ট পরা ভদ্র সুস্থ যুবকটির ঘরে ফিরতেই কী ঘিনঘিনে রূপ, যেন সে টয়লেটে ঢুকেছে। এখানে কোনো সৌন্দর্যের প্রয়োজন নেই। প্রথমে পোশাক খুলেই হাঁটুর ওপর অব্দি উঠানো খাটো লুঙ্গিটা পরত। ফ্যানের বাতাসে পোষায় না, ভুঁড়ি মেলে দিয়ে কী বিচিত্র প্রক্রিয়ায় তালপাতার পাখায় বাতাস খেত! এবং কী দুর্বিষহ, রাতে আমি ঘরের দরজা বন্ধ করলেই টান দিয়ে সেই ত্যানাটিও খুলে ফেলে এমন ভঙ্গিতে এগিয়ে আসত, যেন কুস্তিতে নামছে। হাঁ হয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে রাখতাম। কী ভয়ানক, কুৎসিত একটা নগ্ন পশু...। এ নিয়ে কখনো ঝগড়া, খিস্তি, কখনো নিজের মমতাময় দেহটার ওপর সেই পশুটাকে দাবড়াতে দেয়া। জীবনকে এইভাবেই গ্রহণ করেছিলাম। দাম্পত্য জীবন আমাকে শিখিয়েছে, দুটি নরনারীর দৈহিক সম্পর্ক মানে গলায় বিষ চেপে হলেও একটি সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা। ক্রমে আমিও এসব কিছুকে সেভাবেই নিতে শুরু করেছিলাম। তারপরও মাঝে মাঝে হিস হিস করে উঠতাম। লজ্জা হয় না তোমার? এই রকম কুৎসিত সব ভঙ্গি! ছি, আমাকে মানুষ মনে কর না!

স্ত্রীর কাছে লজ্জা... হা হা শব্দে হাসত সে। তুমি দেখছি একটা মানসিক রোগীতে পরিণত হচ্ছ।

দীর্ঘদিন এইভাবে গেছে। কী অদ্ভুত বিকারগ্রস্ত লোকটা! কী অদ্ভুত তার স্বভাব! দিনের হিসেবি, ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষটাই রাত এলেই কী দ্রুত পরিবর্তিত! কখনো চুলের গোড়ালি শক্ত হাতে চেপে ধরে, কখনো বিছানা থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে, তারপর কী অতৃপ্তি! ছটফটানি! আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারতাম না এই অতৃপ্তির গূঢ় অর্থ। মাঝেমধ্যে তুলকালাম সব কাণ্ড বেধে যেত। দাপটে গলা চড়াতাম কখনো, স্রেফ পশু, কুত্তা, আমাকে এভাবেই একদিন মেরে ফেলবে তুমি! কিন্তু তাতেও সে দমে যেত না। এসব কারণে কোনোদিন তার ইচ্ছের মৃত্যু ঘটে নি। বিড়বিড় করত, অসুস্থ! নইলে পুরুষের স্পর্শে কোনো মেয়ে এমন নিথর হয়ে থাকে? তুমি দেখছি আমাকে বেশ্যা পাড়ার দিকে ঠেলে দিয়ে ছাড়বে। তুমি নিজে অসুস্থ, তোমাকেই ডাক্তার দেখানো দরকার। কিন্তু ওই দরকার পর্যন্তই, ডাক্তার দেখানোর সাথে অর্থ নামের যে জটিল বিষয়টি সম্পর্কিত তার প্রতি ছিল অসীম মমতা। বলতে গেলে সংসারের প্রতি আমার চরম বীতশ্রদ্ধ হওয়ার পেছনে তার চরিত্রের সেই দিকটাই প্রধানত দায়ী। অসম্ভব কৃপণ ছিল সে। অর্থের প্রতি প্রবল প্রেম ছিল তার। আবার সেটা উপার্জনের ব্যাপারে ছিল চরম আলসেমি। উপার্জন বাড়ানোর চিন্তা না থাকলেই যে একজন লোক স্ত্রী সহবাস করবে না, এমন চিন্তাকে কখনোই আমি সুস্থ মনে সায় দিই নি। কিন্তু একজন লোক, তার যা কামাই, সেই অনুপাতে ন্যূনতম খরচটা তো সংসারে করবে? অফিস থেকে ফিরে প্রথমেই আমার দিকে পিঠ দিয়ে পকেটের টাকাগুলো বের করত। এক টাকার গণ্ডগোল হলেও হিসেব করে করে রাত পার করে দিত। এদিকে আমার হাতে বিশটি টাকা ধরিয়ে

দিয়ে সকালেই উধাও হয়ে যেত। ঘরে কোনোদিন শুকনো বাজার মজুদ থাকে নি। এই বিশ টাকায় চালাও দু'বেলা। সম্ভব ? নয়-ছয় করতে-করতে রাতে আমার মাথা খারাপ হওয়ার দশা হতো। রাতে তাকে হিসেব করতে দেখে দৈনিক খরচাপাতির ফিরিস্তি দিতেই, তিলমাত্র দেরি না করে সে টানটান হয়ে উঠত, দাও হিসেব, কেন চলে নি ? তো পাই পাই করে হিসেব দিতাম। ঘরে চাল ছিল। দুপুরে কোয়ার্টার কেজি আলু কিনেছি দেড় টাকায়। তেল কোয়ার্টার লিটার আট টাকা। কোয়ার্টার কেজি ডাল সাত টাকা। চিনি কিনেছি সাড়ে তিন টাকার। তারপরও চা-পাতা পটের তলানিতে, পেঁয়াজ, রসুন, মাছ, তরকারি কিচ্ছু নেই। পাশের বাসা থেকে পেঁয়াজ ধার করেছি। দুপুরে আলু ভর্তা খেয়েছি, রাতেও তাই।

একটু মুশকিলই হলো— তখন তাকে চিন্তিত দেখাত। একটু সহ্য করে চল নীনা, যে টাকা পাই তাতে কষ্ট করে না চললে দুদিন পর তো সংসার ছেড়ে পালানো ছাড়া আমার কোনো পথ থাকবে না। নিজেকে এক সময় শান্ত করে আনতাম। তার এই অপারগতার অন্য মানে করে ক্ষিপ্ত হওয়ার কোনো মানে হয় না। কিন্তু বদ্ধ ঘরে একাকী সারাদিন কাটিয়ে বিকেল হলেই একেকদিন অসম্ভব হাঁপ ধরে যেত। এমন একটি দিনও তখন আসে নি, যেদিন সে তার সামর্থ্যের ওপর ভর করে নিজের থেকেই বলতে পারত, একটু বাইরে যাই চলো। আমি যখনি বলেছি, তখনি শুরু হয়ে যেত রিকশা ভাড়ার নয় ছয় হিসেব। কত মিষ্টি করে কতবার সে হিসেব আমাকে বুঝিয়েছে, বিশ্বাস কর নীনা, ঢাকায় রিকশার ভাড়াই সব। এখান থেকে ক্রিসেন্ট লেক পাক্কা আট টাকার রাস্তা। তারপর ফেরার ব্যাপার আছে। গিয়ে কিছু না খেয়ে তো মুখ বুজে বসে থাকবে না। আর বাস ? ওটা দিয়ে পাগল ছাড়া কেউ বউকে নিয়ে হাওয়া খাওয়ার প্রোগ্রাম করে ? এই নিয়ে সত্যজিৎ অনেক টিটকারি দিয়েছে। সে গা করে নি। আমার মতোন শহর-দাবড়ে-বেড়ানো একটা মেয়ে তখন স্রেফ একজনের আপোসকামী স্ত্রী। স্বামীর সামর্থ্যের দিকে হাঁ করে কাটাও প্রতিটা মুহূর্ত। নিজের ওপরই ঘেন্না ধরে যেত। একদিন সত্যজিৎ প্রস্তাব দিয়ে বসল, তুই একটা চাকরি নে না। এব্যাপারে রেজাউলের ছিল সাফ জবাব, নারী স্বাধীনতায় আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু চাকরি নেয়ার আগে অনার্স শেষ করতে হবে। আগে তার চেষ্টা কর।

অবশ্য আমার কিছু স্বাধীনতার ব্যাপারে তার কোনোরকম গোঁড়ামি আমি দেখি নি। বেশিরভাগ সংসারে যেটা প্রধান সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। আমি তো প্রায় সংসারেই দেখেছি বিয়ের পর একজন মেয়ে তার ছেলে ক্লাসমেটকে বন্ধু হিসেবে পরিচয় দিতেও আড়ষ্টতা বোধ করে। কিন্তু ওর বন্ধুরা আমাকে নাম ধরে তুই-তোকারি করত। তার চরিত্রের এইসব স্ববিরোধিতা আমাকে অবাক করে দিত। অনেকদিন খালি বাসায় সত্যজিৎ আর তার অন্য বন্ধুরা এসেছে। সে এসে দেখেছে আড্ডা দিচ্ছি। পরে সে নিজেও এসে এই আড্ডায় শামিল হতো। কিন্তু স্বাধীনতার বিস্তার কি অত ছোট জায়গাকে ঘিরে ? আমি হয়তো একা কোথাও গেলাম, হেঁটে এলাম অনেক পথ, হয়তো বাসায় এসে রেজাউল দেখল, আমি বাইরে। ফিরে এলে সে এ নিয়ে বেশি প্যাঁচট্যাচে যেত না। প্রথমেই জানতে চাইত বাইরে যাওয়ার খরচ কোথায় পেলাম। এজন্যই কোথাও যাওয়া হতো না আমার। আর অনার্স পড়ার ঝক্কি-ঝামেলার শেষ তো আর আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল নয়। তার সঙ্গে কত রকমের ফ্যাসাদ— ভর্তি হও, তারপর মাসের বেতন, পরীক্ষার ফরম্‌ফিলাপ কর— এইসব হেনতেন কত কিছু। রেজাউল তো এসব ব্যাপারে একদম নির্বিকার।

স্বাধীনতা সে দিয়েছিল, কিন্তু তার বিস্তার রোধ করার শেকলও তার হাতেই ছিল। তাই, তখনো একই ঘটনা। চিলতে খিড়কির ফাঁক দিয়ে চেয়ে দেখ মেয়ে, কী সুন্দর আকাশ বাইরে, পারলে ওড়ো।

সেই মানুষ। ঘরে ঢুকে কোনোদিন একটা চুমু না, রোমাঞ্চময় স্পর্শ না, কেবল হিসেব। না হলে পড়ে থাক ভাঙা ফ্যানটি নিয়ে। অথবা খোঁচাও ফিউজ হয়ে যাওয়া বাল্ব। আর বিছানায় এসেই ভয়ঙ্কর দাপট, যেন সারাদিন রাজ্য জয় করে এসেছে। তারপরও বোকার মতো তার প্রশ্ন, তোমার ভালো লাগে না?

না, না, না,। আর কতবার বলব!

তুমি একটা গণ্ডার নারী, তোমার মতো একটা বরফের দলাকে বিয়ে করেছি, এ আমার দুর্ভাগ্য। আমার সেক্সের তুখোড় ভূমিকার কোনো মূল্যায়নই হলো না। তোমার জায়গায় অন্য মেয়ে হলে সেন্ট পার্সেন্ট বর্তে যেত।

তাহলে অন্য মেয়েকে নিয়ে চালাও না কেন সেক্স এক্সপেরিমেন্ট?

ওই একটি অভ্যাসই নেই, থাকলে এত লাথি খেয়েও অমন ছোঁকছোঁক করি? তার এমন স্বীকারোক্তিতে আশ্বস্ত হতাম বেশ, বলতাম, তুমি একটু নরম হও। বিশ্বাস কর, আমার অসহ্য লাগে। ইচ্ছে করলে স্বাভাবিক উপায়েই ব্যাপারটাকে সুন্দর করা যায়।

যে সুন্দর বোঝে, সে এতেই সৌন্দর্য খুঁজে পাবে, রেজাউল বলত। এইভাবেই আমার ভালো লাগে। তুমি বলো পশুত্ব, এসবে যত বেশি পশুত্ব, ততই তার মজা। আমার কষ্ট, তুমি সেটা বুঝলে না।

এরপর আর তর্ক করার স্পৃহা থাকত না। পাশাপাশি লোকটার ঘরের টান, অফিসের বাইরে কোথাও একটু সময় কাটায় না, মদের আড্ডায় যায় না, নারী বলতে সে একমাত্র আমাকেই বোঝে, আমাকে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখতে পারছে না বলে মাঝে মাঝে তার হতাশা— এসব বুঝিয়েই নিজেকে সুস্থির রাখার চেষ্টা করতাম।

সংসার যাচ্ছিল এমনই এক ছন্দে। একঘেয়ে একতালে। একদিন তার এরকম বিকৃতির অন্য এক রূপান্তর আবিষ্কার করি। দেখি, টেবিলে একটা ম্যাগাজিন। পৃষ্ঠা ওল্টাতেই কিছু কিশোরের ছবি। নগ্ন। নারীর মতোই তারা কোমল, পেলব। রেজাউলকে প্রশ্ন করায়, বলল, তোমাকে দেখানোর জন্যই এনেছি, কেমন এরা? আকর্ষণ ফিল কর?

কী বলছ তুমি, আমি খেপে উঠি, কী বাচ্চা ছেলে!

তুমি এদের সৌন্দর্য সম্পর্কে জানোই না— কেমন রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসে সে, তথাকথিত পৌরুষ, এসবে নিশ্চয়ই মুগ্ধ তুমি? আমি কেমন কাঁপতে থাকি,আমার চারপাশ অন্ধকার হয়ে আসে। ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্ন করি, কি বলতে চাইছ তুমি স্পষ্ট করে বলো। সে তখন অভিনব কায়দায় প্রসঙ্গ পাল্টায়, কিছুই না। কী সুন্দর সব যুবক, এদের তুমি বাচ্চা বলছ! কতটা মুরুব্বি হয়েছ, সেটাই লক্ষ করছিলাম।

সেই থেকে আমার নতুন যন্ত্রণা শুরু। আমি গভীরভাবে তাকে পর্যবেক্ষণ শুরু করি। কেন, আমাকে উল্টেপাল্টেও লোকটা ঠিক তৃপ্ত নয়? সত্যজিৎ রদ্যাঁর একটা জীবনী পড়তে দিয়েছিল আমাকে, যার মধ্যে কীছু ন্যুড স্কালপচারের ছবি আছে। বইটি উল্টেপাল্টে উত্তেজিত হয়ে আমাকে বলেছিল, দেখেছ, পুরুষদের ন্যুডগুলো, কী অদ্ভুত এদের কাঠামো, না?

আমার মাথায় তখন দাবাগ্নি। কিন্তু কোনো সুনির্দিষ্ট সূত্র আবিষ্কার করতে না পেরে তাকে যুতমতো আক্রমণও করতে পারছি না। তখনই প্রথম মনে হলো, দেখতে হাবাগোবা হলেও অসম্ভব ধূর্ত সে, উত্তেজিত হয়ে আমাকে বলেছিল, এখনো আমি তার চুলের ডগার নাগালও পাই নি।

প্রচণ্ড অস্থিরতার ভেতর দিয়ে আমার দিনগুলো কাটতে থাকে। একদিন রাতে, দু'জনই নিঃশব্দ বিছানায় শুয়ে ছিলাম। পুরো ঘরে অন্ধকার বিছানো। আমি আমার শিথিল হাত তার উরুতে রাখি। নিজেকে বোঝাই, ভুল পুরোটাই। আমার মানসিক অস্থিরতাই এর জন্য দায়ী। কেমন অন্যরকম গলায় জানতে চাই, আচ্ছা, তোমার স্কুল বা কলেজ জীবন সম্পর্কে আমার কিছুই জানা হয় নি। আজ তোমার স্কুল জীবন সম্পর্কে বলো না তুমি ?

এতদিনে সেই জীবন সম্পর্কে জানতে চাইছ আশ্চর্য মেয়ে তো তুমি!

এটা তো হতেই পারে, আমি বলি জীবনের জন্য ওই অধ্যায়টার গুরুত্ব অপরিসীম। অথচ কেউই কারুর সেই জীবন সম্পর্কে তেমন করে কিছুই জানি না।

সে-রাতে অনেক গল্প হয়। তার ছেলেবেলা, ধর্মভীরু কুসংস্কারাচ্ছন্ন ফ্যামিলির নিয়মের মধ্যে তার বেড়ে ওঠার বিস্তারিত কাহিনী শোনায় আমাকে। সে-রাতেই আমি প্রথম জানি, সে ক্লাস ফাইভের পর থেকে হোস্টেলে ছিল। তার যে রুমমেট, সে ছিল অত্যন্ত বাজে স্বভাবের। অনেক বিকৃতি ছিল তার। যা হোক, হোস্টেলে থেকেই রেজাউল ম্যাট্রিক পাস করে।

তোমার সে বন্ধুর কী ধরনের বিকৃতি ছিল ?

আমরা ছেলেটাকে পছন্দ করতাম না এটুকু মনে আছে। ম্যাট্রিক পাস করার পর থেকে শুরু হয় মেসের জীবন। বি.এ পাস করা পর্যন্ত সেখানেই ছিলাম।

তোমার জীবনে তখনো কোনো মেয়ে আসে নি ?

মেয়েদের আমি ঘৃণা করতাম— দৃঢ় কণ্ঠে বলে সে। জানোই তো আমার কোনো বোন ছিল না। মাকে হারিয়েছি ছোটবেলায়। তারপর হোস্টেলে, মেস... সব জায়গাতেই আমার চারপাশে ছিল ঝাঁকঝাঁক ছেলে। কেন জানি কৈশোর থেকেই আমার মেয়েদের পুতুপুতু কোমলতা দেখতে বাজে লাগত।

আশ্চর্য, এর মধ্যে আমাকে কী করে তোমার ভালো লাগল ?

অত গোয়েন্দাগিরি করো না। তুমি খুব ডেসপারেট ছিলে, নমনীয়তা কম ছিল তোমার মধ্যে, এসবই আমাকে টেনেছিল। দেখো না, কেউ তোমাকে ভাবি ভাবি বলে গলে পড়তে চাইলে কেমন রাগ লাগে আমার ? তুমি নীনা, স্ট্রং নারী, গোড়াতে তোমাকে এরকম দেখেই পছন্দ করেছিলাম, কিন্তু পরে জীবনের বাস্তবতা— যাকে গে, এর বেশি কিছু বলতে পারব না।

রেজাউল ঘুমিয়ে পড়ে। পুরো রাত আমার নিদ্রাহীন কাটে। কেন আমার মধ্যে এমন ভয় ঢুকল ? সে অফিসে যাওয়ার পর দরজা-জানালা সব বন্ধ করে ভূতের মতো বসে থাকি। দিকভ্রান্ত অবস্থায় আরো সূত্র খুঁজতে থাকি। চষতে শুরু করি ভেতরের অলিগলি। তার আগের ও বর্তমান সব আচরণের পারম্পর্যহীনতা নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে থাকি। কী অসহনীয় খচখচানি হৃৎপিণ্ডের মধ্যে! তখনই আরো স্পষ্ট করে টের পাই, সে আমাকে নিয়ে

সুখী নয়। আমাকে ছিঁড়ে নিংড়ে একাকার করে সে নিরন্তর সুখ পাবার চেষ্টা করে চলেছে। এই উপলব্ধি হওয়ার পর আমার গায়ের রোম খাড়া হয়ে ওঠে। আমাকে বিয়ে করা তার একটা স্রেফ নিরীক্ষা! আমি নিরেট গিনিপিগ! অসহ্য ঘৃণায় বিষিয়ে উঠি, রাতে সে হাত বাড়ালে বিদ্যুৎ বেগে খাড়া হয়ে যাই। এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মেঝেতে বসে থাকি।

কী হয়েছে তোমার? ঝাঁঝালো প্রশ্নে সে আমাকে ফের টেনে তোলার চেষ্টা করে। আমি শক্ত হয়ে বসে থাকি। সে মেঝের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে এমন ভঙ্গিতে এগিয়ে আসে, দেখে মনে হয় চারপেয়ে কোনো জন্তু। দাঁতে দাঁত চেপে ধরি। আমার পাশে শুয়ে আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে হঠাৎ সে বলে ওঠে, আমি ওসব ছেড়ে দিয়েছি।

কোন সব?

তুমি যা ধারণা করছ, সহজ স্বরে সে বলে, সে জন্যই মেস ছেড়ে দিয়েছিলাম। আসলে খুব নেশা হয়ে গিয়েছিল। নেশাটা যে বাজে অনেক পরে সেটা টের পাই।

কতদিন আগে থেকে? আমি কাঁপা গলায় প্রশ্ন করি, মানে কোন বয়সে প্রথম?

স্কুলজীবন থেকেই।

যদি বলি অভ্যাসটা তুমি এখনো ছাড়তে পার নি?

তাহলে আমার কিছুই করার নেই, যেন দায় সারল, এমন ভঙ্গিতে ঠোঁট ওল্টায় সে, আমি জানি তুমি টের পেয়েছ। আমার বলা দরকার মনে করলাম, বলে দিলাম। কীভাবে নেবে সেটা তোমার ব্যাপার।

অবিশ্রান্ত কান্নায় মাঝরাতে নরম ঝিমুনি এসেছিল। আমি তখন নিশ্চিত ছিলাম, আমার থাকা-না-থাকায় রেজাউলের কিছু যায় আসে না। কোনো অনুতাপ নেই, গ্লানির কষ্ট নেই। নিরুত্তাপ মুখে ভয়াবহ কথাগুলো বলে দেয়ার ছুতোয় সে তার সততার আনন্দে নির্ভর। যদি চেপে রাখত, আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করত অন্যভাবে, আমি বুঝতাম আমাকে সে ভয় পাচ্ছে, গুরুত্ব দিচ্ছে। এই বিষয়টাকে ঘিরেই আমি সংসার থেকে বেরিয়ে যেতে পারি। কিন্তু সে জেনে গেছে সেটা সহজ নয় আমার পক্ষে। সম্ভবত গেলেও তার কিছু যায় আসে না। অবশ্য পুরোটাই আমার আশঙ্কা। স্নায়ুর শিথিলতায় আমি ক্রমশ অবশ হয়ে আসতে থাকি। তখন, সেই মাঝরাতে আমাকে হ্যাঁচকা টান দিয়ে ফেরায় সে, বলে, যদি না বলতাম, কী করতি তুই? অত ভড়ং ভালো লাগে না। বলতে বলতে সেই একই খেলা। আমার শাড়ি ধরে টানতে থাকে এবং ক্রমশ নরম হয়ে এসে বলতে থাকে, তুমি বিশ্বাস কর, আমার কাছে এই সংসারটাই এখন বড়। কোনো কিছুর বিনিময়ে আমি একে হারাতে পারি না। তোমাকে বোঝাতে পারব না...।

আমার চারপাশে তখন অপার অন্ধকার। দুর্দান্ত বেপরোয়া হয়ে উঠেছে সে। আমি হাত দিয়ে হিংস্র ধাক্কায় তাকে ঠেলে দিই। তার এই বিবর্তিত নরম রূপ আমাকে আরো তীব্র ঘৃণার ফেনায় তলিয়ে দিচ্ছে। ব্যথায় টনটন করছে মাথা। অবিশ্রান্ত জলের ধারায় ফুঁপিয়ে উঠি। তেমন অর্থে প্রতিবাদ করার ক্ষমতাও আমার সত্তা থেকে মরে যাচ্ছে। ধীরে-ধীরে থিতিয়ে আসতে থাকি। সে-রাতে আমাকে ধর্ষণ করে অবসন্ন দেহে ঘুমিয়ে পড়ে আমার স্বামী।

সেইসব দুঃসহ স্মৃতি মনের পর্দায় ভেসে উঠতেই মাথার শিরা দপদপ করে।

শানু দরজা লাগিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ। আজো তার স্বামী ফেরে নি। মেঝে থেকে টাল সামলে উঠে দাঁড়াই। তারপর কী ঘটেছিল ? সন্তান গর্ভে এলো। ঢকঢক করে জল ঢালি গলায়। শূন্য ইজেল সটান দাঁড়িয়ে আছে। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিই নিচে। নিজেকে ধাতস্থ করার চেষ্টায় তারপর বিছানায় উঠে বসি। তাকে বিয়ে করে যে আমার ভুল হয়েছে, তখন প্রায়ই আমার এ কথা মনে হতো। আর্থিক সঙ্কটের তীব্র যন্ত্রণা তো ছিলই। মেহমান আসলে ঘরে কিছু থাকত না বলে কতদিন অসুখের ভান করে পড়ে থেকেছি। সংসারের অতি প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার প্ল্যান হয়েছে হাজারবার, পরক্ষণেই তা বাতিল হয়ে গেছে। কখন বিপদ আসে এই আশঙ্কায় রেজাউল গোপন সঞ্চয় ঠিক রাখতে মাঝে মাঝে একবেলা উপোস দিত। তবু সে সঞ্চয়ে হাত পড়ত না। ভাবতে ভাবতে জেদে যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠে পরক্ষণে নিজেকে আক্রমণ করি, এইসবে ঢুকে পড়ে আমি নিজেও কি ম্যাড়াম্যাড়ে হয়ে উঠছিলাম না ? লুঙ্গি চাঙ্গে উঠিয়ে বিকট অবস্থায় শুয়ে থাকত সে। আমিও কি উদোম পিঠ পেতে দিয়ে তাকে ঘামচি খুঁটে দিতে বলতাম না ? তবে তো স্বপ্নভঙ্গ তারও হয়েছিল। তার প্রতি আকর্ষণ হারিয়েছিলাম বলে তার স্পর্শ ছিল আমার জন্য যন্ত্রণাকর। ওই রকম অবস্থায় আমাকেও কি তার মনে হয় নি দলাদলা মাংস ? তার মনে হয় নি, যে মোহগ্রস্ততায় সে আকৃষ্ট হয়েছিল একটা দাবড়ে-বেড়ানো তুখোড় মেয়ের প্রতি, সে তার স্বপ্নভঙ্গ ঘটিয়েছে ?

অবশ্য আমার যে রূপান্তর ঘটেছিল, সে-তো তারই অশিল্পিত আচরণের কারণে।

সে যদি বলে, আমি তার পছন্দ বুঝি নি, আমি নিজেও তার কাছে অশিল্পিত ? ভাবতে চাই না আর। মাথা চেপে বসে থাকি। অসহ্য পীড়ন ভ্রূর দু'পাশে, কপালে। প্রায়ই এত ব্যথা হয়, রাতেই অধিকাংশ সময়, ফলে কেমন উন্মাদ দশা পেয়ে বসে। পায়চারি করি বিছানা ছেড়ে উঠে, দরজা খুলে শানু বেরিয়ে আসে। প্রশ্ন করে, কিসের শব্দ হলো ? তারপর সে মেঝের ওপর চিৎপাত ইজেলটাকে পড়ে থাকতে দেখে। ধীর পায়ে চেয়ার টেনে আমার মুখোমুখি বসে। দু'চোখ তার অসম্ভব লাল, বোঝা যায় এতক্ষণ কেঁদেছে সে। আমি কিছু বলি না। সেও বাকস্তব্ধ বসে থাকে, সহসা কিছু বলতে পারে না। এতক্ষণ আমার চারপাশে বৃত্তাকারে আবর্তিত হচ্ছিলাম আমি নিজে। এখন যুক্ত হয় আরেকজন মানুষ। কেমন থিতু হয়ে আসি। হাত-পা আলগা হয়ে ঘুম নামতে থাকে চোখে। জড়ানো মুখে তার দিকে তাকাই।

শানু সস্নেহে আমার পিঠে হাত রাখে, তুই আজ আমার ঘরে ঘুমাবি, আয়।

অফিস থেকে বেরিয়ে রিকশা নিই। টানা রাস্তা ধরে রিকশা চলে। লাল বাতি জ্বলে উঠতেই ট্রাফিক জ্যামে আটকে যাই। তক্ষুণি আমার হুঁশ হয়, ব্যাগে বেতনের টাকা। টাকাগুলো নিয়ে সোজা বাড়ি চলে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু ক'দিন ধরেই সালাহ্‌দিনের ওখানে যাব যাব করছিলাম। আজ তাই আগাপাস্তলা চিন্তা না করেই বেরিয়ে পড়েছি। কিন্তু এখন চারপাশ থেকে আঁকড়ে ধরেছে ভীতিকর আশঙ্কা। যে হারে ছিনতাইকারীদের দৌরাত্ম্য বেড়েছে, যে-কোনো সময় টাকাগুলো হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। কিন্তু যেভাবেই হোক আমি ভালোবাসি গতি। ভয়টয় পেয়ে পিছু হটে যাওয়াও আমার প্রবণতার মধ্যে নেই। ছেড়ে দিলাম নিজেকে ভাগ্যের ওপর। সালাহ্‌দিনের খুপরি ঘরের সামনে একসময় আমার রিকশা

এসে থামে। ভাড়া চুকিয়ে তার টিনের গেটে নক্ করি। তার বাসায় যতবার গেছি, তুমুল আড্ডা, তাই কখনো দরজা বন্ধ থাকে না। আজ পরিবেশটা বেশ নিস্তরঙ্গ।

দরজা খোলার পর সালাহ্‌দিনের চোখে আলোকিত দৃষ্টি।

হাতের প্লাস্টার খোলা হয় নি। মুখে রাজ্যের দাড়ি। ভ্রূর ওপর গভীর ক্ষতের কালচে দাগ। ঘরে ঢুকে মনে হয় বহুকাল এখানে মানুষ থাকে নি। মেঝের ওপর কলার খোসা পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। টেবিলের উচ্ছৃঙ্খল কাগজপত্রে ধুলোর সর।

ছোট খিড়কির ওপর বেড়ে উঠেছে মানিপ্লান্টের সরু ডগা। সিগ্রেটের অসংখ্য অবশিষ্টাংশ ঘরময় ছড়ানো। অবিন্যস্ত বিছানার চাদর তেল চিটচিটে।

চেয়ার টেনে নিঃশব্দে বসি। বিছানায় হেলান দিয়েছে সালাহ্‌দিন।

আশ্চর্য, কেউ আসে না?

আসে মাঝে-মাঝে। সালাহ্‌দিন বলে, মা এসে থেকে গেছে কিছুদিন। তারপর অসীম নীরবতা। কী বলব বুঝে উঠতে পারছি না। সালাহ্‌দিন অনুরোধ করে, তুমি আমার এই ব্যান্ডেজটা চেঞ্জ করে দিতে পারবে?

পায়ের গোড়ালির ওপরের অংশে ব্যান্ডেজ, এতক্ষণে আমার চোখে পড়ে। স্বাভাবিক প্রবণতায় উঠে দাঁড়াই। টেবিলের ওপর রাখা প্যাকেট থেকে তুলো আর ব্যান্ডেজ বের করে নরোম হাতে তার পা উঁচু করে ধরি।

পুরোটা ব্যান্ডেজ খোলা পর্যন্ত সালাহ্‌দিন নিঃশব্দে বসে ছিল। এবার ঘরের নীরবতা ভেঙে পৃথিবীর প্রতি অদ্ভুত নিরাসক্ত সালাহ্‌দিন বলে, আগের মতো আড্ডা আর ভালো লাগে না। কিছুক্ষণ তাল মিলিয়ে ঝিমিয়ে আসে। বন্ধুরাও অতিষ্ঠ হয়ে গেছে। কেউ আর খুব একটা আসে না। গত তিনদিনে একজনও আসে নি। ঘর অন্ধকার করে নিঃশব্দে পড়ে থেকেছি। রাস্তায় কোনো ছেলে পেলে তাকে দিয়ে দোকান থেকে পাউরুটি কলা আনাই। এই খেয়েই আছি— বলতে বলতে বালিশে মাথা কাত করে শুয়ে পড়ে সে।

দুপুরে কী খেয়েছ?

কিছু না, চোখ বুজে থাকে সে। মুখে এমন ভঙ্গি, যেন তার চারপাশ থেকে পৃথিবী খসে পড়েছে। সে শুঁয়োপোকার মতো ঝুলকালির ভেতর শেষ আশ্রয় নিয়েছে। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। কিছুদূর হাঁটার পর একটা হোটেল এসে ঢুকি। পলিথিনের ব্যাগে করে ভাত-তরকারি নিয়ে ঘরে এসে দেখি, জগে পানি নেই। ছোট রান্নাঘরের ট্যাপও জলহীন। একটা আধুলি দিয়ে রাস্তায় খেলতে থাকা একটা ছোকরাকে পানি আনতে পাঠাই। ঘোর-লাগা চোখে চেয়ে থাকে সালাহ্‌দিন। রান্নাঘর থেকে থালা এনে পুরো খাবার সাজিয়ে তার দিকে এগিয়ে দিলে বুভুক্ষু মিসকিনের মতো কেঁদে ফেলে সে। হাত চেপে ধরে তাকে আমি শান্ত হতে বলি।

খাওয়া শেষ হলে সব গুছিয়ে আমি যখন সুস্থির হয়ে বসেছি, তখন বিকেল পালিয়েছে। আমার ভেতরে বেতনের টাকার খচখচানি। বড় ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে গেল আজকের যাত্রাটা। কিন্তু এখানে এসে সেই অনুতাপের বেশির ভাগই মন থেকে উবে গেছে।

আমি যখন উঠব, কেমন অভিভূত গলায় সালাহ্‌দিন বলে, তুমি আমার এখানে চলে আস না, একদম চিরকালের মতো।

অতএব, আমাকে আবার বসতে হয়।

ঘরে গাঢ় ছায়া। সুইচে চাপ দিতেই ধুলোমাখা বাল্ব ধূসর আলো ছড়ায়। ওর বিপন্ন মুখের দিকে চেয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে হেসে উঠি, কেন দুর্বল মুহূর্তকে প্রশ্রয় দিচ্ছ? পরে এ নিয়ে অনুতাপ হবে তোমার।

আমি চিন্তা করেই বলেছি, সালাহ্‌দিন বলে, অনুতাপ নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।

তুমি মোটেই চিন্তা করে বলো না, আমার ভেতর এইবার কেমন যন্ত্রণা হতে থাকে। এটা তোমার ঠিক এই মুহূর্তের আবেগ।

তুমি হয়তো ঠিকই বলেছ, সালাহ্‌দিন ফের নির্জীব হয়ে আসে। বিশ্বাস কর, আগে তোমার সাথে আড্ডা দিতাম ঠিক, কিন্তু তোমার প্রতি আমার তেমন কোনো শ্রদ্ধা ছিল না। তোমার ডিভোর্সের ব্যাপার নিয়ে তোমাকে রীতিমতো ঘৃণাই করতাম। তোমার উচ্ছৃঙ্খল উচ্চাকাঙ্ক্ষাই এর জন্য দায়ী, তোমার ন্যূনতম মানিয়ে চলার ক্ষমতা নেই আমার এমনটা মনে হতো।

এত তাড়তাড়ি কী করে তোমার ধারণা পাল্টে গেল?

কী জানি, পুরোটাই অনুভবের ব্যাপার। ধারণা হওয়া, পাল্টানো, কোনোটাই কোনো যুক্তিকে ঘিরে হয় নি। সালাহ্‌দিন লম্বা করে নিঃশ্বাস টানে, আমার মনে হতো, সত্যজিতের সাথে তোমার সম্পর্কের মধ্যে কিছু একটা অশ্লীলতা আছে। আমি জানি না, আজ তোমাকে কেন এসব বলছি।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি। তারপর উঠে দাঁড়াই। ভেতরের অসহ্য পীড়ন সামলে নরোম গলায় বলি, কেন এসব বলে দিচ্ছ? মানুষ না জানলে কোনো কিছুতেই কোনো কষ্ট নেই। কাপড় খুললে তবেই না মানুষ নগ্ন। তুমি হয়তো সত্য বলে সততার আনন্দ পাচ্ছ, কিন্তু যে সত্য মিথ্যের চেয়ে কুৎসিত, সেটা ভেতরে রাখাই ভালো। এতে করে সুখ না পেয়ে আমি অপমানিত হচ্ছি বেশি।

নীনা, আমি দুঃখিত... গেটের কাছে খুঁড়িয়ে এগিয়ে আসে সালাহ্‌দিন। ততক্ষণে আমার ভেতরের সব উদ্দীপনা ধুয়ে-মুছে গেছে। বুকের ভেতর শুরু হয়েছে অসহ্য তোলপাড়। আমি বলি, তুমি সুস্থ হলে আমার কাছে তোমার প্রস্তাবটা নিয়ে যেও। তখুনি না হয় তোমার এখানে আসার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেব।

কথাটার ভেতরে যে চাপা ক্রোধ, সেটা টের পায় না সালাহ্‌দিন। কেমন অভিভূত চোখে তাকায়। দরজার বাইরে যেই পা রাখতে যাব, অমনি আমার হাত চেপে ধরে সে। ঘাড় ঘুরিয়ে তার ঘামে-ভেজা এক বিচিত্র মুখ দেখি। ঠোঁট জোড়া অসম্ভব কাঁপছে। দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ছে। বাইরের পৃথিবীতে দস্তুর মতো সন্ধ্যা নেমে গেছে।

কিছুক্ষণ আমার হাতটা তার মুঠোর ভেতরে থাকে। সেই অবস্থায় নরম অথচ শ্লেষ-মেশানো স্বরে বলি, চুমু খেতে ইচ্ছে করছে?

দ্রুত আমার হাত থেকে নিজেকে সরিয়ে হকচকিয়ে ওঠে সালাহ্‌দিন।

আমি ঠোঁট বাড়িয়ে দেই, তবে খাও।

যেন বিদ্যুতের শক্ লাগল, এমন ভঙ্গিতে আমার হাত ছেড়ে দেয় সে, ছিঃ নীনা... এবং আমি মহাপৃথিবীর পথে নেমে আসি।

পুরো পথের অনেকটা সময়ই ভুলে থাকি, আমার ব্যাগে টাকা। কষ্ট, ঘৃণা, ক্রোধ, গ্লানি— সব মিলিয়ে মর্মান্তিক হয়ে উঠছে বোধ। আমি তার সততাকে সহজভাবে নিতে পারছি না কেন ? নিজেকে শান্ত করতে ভাবি, কথাগুলো সে না বললে তার কোনো ক্ষতি হতো না। কিন্তু বলে দিয়েছে কোনো এক নাজুক অনুভূতি থেকে। তারপরও তাকে অপমান করে এলাম কেন ?

কিছুক্ষণ পর টের পাই, যন্ত্রণাটা অন্যখানে। এইসব পুষে রেখে কী চমৎকার আন্তরিকভাবে সে আমার সাথে মিশেছে। আমার এই একলা-একা জীবন-যাপনকে স্বাগত জানিয়ে কতদিন বলেছে, দারুণ র‍্যাডিক্যাল তুমি। অকর্মণ্য, ভোদাই, অবিবেচক আর অত্যাচারী স্বামীর ঘর কামড়ে পড়ে থাকার চেয়ে প্রত্যেক মেয়েরই উচিত লাথি দিয়ে চলে আসা। তাছাড়া আমার ডিভোর্সের পর তার অসম্ভব সহানুভূতি। সান্ত্বনাসুলভ কত কথা। বলেছে, সত্যজিৎকে এজন্যই শ্রদ্ধা করি, সে তোমার স্বামীর প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে তোমার বন্ধুত্বের অসম্মান করি নি। এত সূক্ষ্ম অভিনয়ের আড়ালে এমন ঘৃণা চেপে রাখার দায় তো কেউ তো তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয় নি ? আমি আর কাকে বিশ্বাস করব ?

বাসার কাছাকাছি গলির ভেতর রিকশা ঢুকতেই দেখি, ল্যাম্পপোস্টের নিচে মাস্তান গোছের একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে উস্কো পোশাক, চোখজোড়া কেমন লাল। গালে ফোস্কার মতো ব্রণ।

মুহূর্তেই মাথা থেকে সব জঞ্জাল সাফ! শরীরের ভেতর দিয়ে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যায়। ব্যাগটা সজোরে আঁকড়ে ধরি। ছেলেটা বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

রিকশাটা ল্যাম্পপোস্ট অতিক্রম করার সময় আমার শরীর ঠাণ্ডা লোহার মতো। দমবদ্ধ অবস্থায় আরো কিছুটা পথ। শিরশিরিয়ে উঠছে শিরদাঁড়া।

টানটান মাথা পেছনে ফেরাই না।

বাসার কাছাকাছি রিকশা এসে থামার পর টের পাই আমার পুরো শরীর ভিজে উঠেছে। হাঁপ ছেড়ে অনুভব করি, সালাহ্‌দিন, তার কথা, মগজের মধ্যে ঘৃণিত আন্দোলন— কর্পূরের মতো শূন্যে উড়ে গেছে।

ব্যাগটা বুকে চেপে নিশ্চিন্তে একা একাই হাসি।

রিকশা ভাড়া চুকিয়ে ঘরে ঢুকতেই ওম শান্তি! আমার রুমে চুটিয়ে লুডু খেলছে শানু আর কামাল ভাই। ওদের উচ্ছ্বসিত হাসির তরঙ্গের সাথে আমিও একাত্ম হয়ে যাই।

কী অসম্ভব নির্ভার লাগছে। হা-হা— পৃথিবীটা এই এখন আমার দখলে।

অনেকদিন পর রাত নামতেই রঙ-তুলি আর ক্যানভাসের সহবাসে উন্মাতাল হয়ে উঠি। তুলির ছোপছাপে ক্রমশ ফুটিয়ে তুলতে থাকি মনে ভর করা একটা দৃশ্য। ঘরের বদ্ধ গুমোট, দেয়ালের অশ্লীল দাগ সব আমার চারপাশ থেকে সরে যেতে থাকে। তুলির আঁচড়ে জেগে উঠছে অন্ধকার একটা ঘর। দপদপ জ্বলছে প্রদীপ। আমি যেন সেই ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে। ক্যানভাস জুড়ে নিকষ অন্ধকার। আমার তুলির স্পর্শে মাঝখানে জ্বলজ্বল করে ওঠে জ্বলন্ত একটা লম্বা শিখা। তার মধ্যে এক প্রায় নিষ্প্রাণ এক কিশোরী। প্রদীপের শিখা পড়েছে সেই কিশোরীর মুখে। রঙের আলো-আঁধারির খেলার মধ্যে ফুটে উঠেছে তার ভয়ার্ত ফ্যাকাসে

দৃষ্টি। ক্যানভাসের একটি অংশে আমি এরকম বিষয় একটা মূর্ত করার চেষ্টায় বলতে গেলে গোটা রাতই পার করে দিলাম।

অসমাপ্ত ছবিটা রেখে যখন ঘুমোতে যাব, টের পাই, সারা শরীর ব্যথায় টনটন করছে। গলা শুকিয়ে খরখরে হয়ে উঠেছে। পানি খেয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ি। পুরো শরীর জ্বর জ্বর তপ্ত মনে হয়। একটা অসহ্য চাপা উত্তেজনায় অত্যন্ত অস্থির বোধ করি। দীর্ঘদিন পর হাত বড় অনভ্যস্ত আর আনাড়ি। কী হচ্ছে ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। কিন্তু যা আঁকতে চাইছি— সেই থিম আমাকে ঘোরগ্রস্ত করে রাখে অনেকক্ষণ।

পরদিন অফিসে বসেও একই তাড়না। কাজের দুঃসহ চাপের মধ্যেও আমাকে বিদ্যুতের মতো আকর্ষণ করতে থাকে আমার ঘর। এবং ঘরের মধ্যে জেগে থাকা নাজুক ক্যানভাসটি। তাড়াতাড়ি হাতের কাজ গুটোচ্ছি, দেখি, আমার টেবিলের সামনে একজন পুরুষের ছায়া। ঘোর কাটিয়ে সরাসরি তাকাই। বিস্ময়ে, বিরক্তিতে আমার ভ্রূ কুঁচকে ওঠে— ওমর।

চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলে, বেশ কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, অদ্ভুত লাগল, আপনি লক্ষই করলেন না।

এই রকম উটকো পরিচয়ের সূত্রে ঠিকানা জোগাড় করে সরাসরি অফিসে চলে আসা, ব্যাপারটা আমার অসম্ভব বাড়াবাড়ি মনে হয়। আমি রীতিমতো অভদ্র রকমের গম্ভীর হয়ে বসে থাকি। একটা কথাও বলি না। কিন্তু তাতে করে তার মধ্যে কোনো ভাবান্তর লক্ষ করি না। বলে, নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছেন ঠিকানা ছাড়া কীভাবে এলাম? পেপার মেলে ধরি চোখের সামনে, 'মেডিক্যাল স্টুডেন্টরা স্ট্রাইক করছে, বিনা চিকিৎসায় রোগী মারা যাচ্ছে।' আমি মোটেই অবাক হচ্ছি না— ঠাণ্ডা গলায় বলি।

বিরক্ত হচ্ছেন?

না।

আমি রহস্য-টহস্য করতে পারি না। আপনার যে বন্ধু ছিল হাসপাতালে, ওমর খুব সরলভাবে বলে, কী যেন নাম তার? যাকগে, আমি তার কাছে থেকে ঠিকানা নিয়েছি। আশ্চর্য, আপনি আর গেলেন না কেন?

নিয়মিত খোঁজ নিয়েছেন? প্রশ্ন করি। পেপারে চোখ হাঁটছে, 'ওয়াসার পানির পাইপে মরা ইঁদুর।'

আপনি মনে হয় মাইন্ড করছেন। অবশ্য তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমার ভাবটাই এমন, আমার কাছে যেটা মূল্যবান, তাকে খুব গুরুত্ব দিই। অন্যের কাছে সেটা বাড়াবাড়ি বা হাস্যকর মনে হতে পারে।

নিজের অনুভবকে মনে হয় একটু বেশিই প্রশ্রয় দেন? আমি আর ভেতরের উষ্মা চেপে রাখতে পারি না। পেপারে মিছিলের ছবি, গণতন্ত্রের দাবিতে ভার্সিটির ছাত্ররা রাস্তায় নেমেছে।

হতে পারে, সে বলে। বললাম তো, এর একটা বাজে দিকও আছে, যার ফলে অন্যের কাছে সেটা অনেক ক্ষেত্রেই বিরক্তিকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আমি তাতে দুঃখ পাই না।

সহকর্মীদের কারো-কারো চোখ আমার টেবিলের দিকে। লোকটার পরনে উদ্ভট পোশাক। যথারীতি উজ্জ্বল দাড়ি। চুলে যে তার ক'দিন চিরুনি পড়ে নি, সবার কাছে সেটাই দর্শনীয় হয়ে উঠেছে। মনে হয়, ভেতরে সে কেমন সেঁধিয়ে গেছে। পরিচয়ের সূত্র ধরে একজন লোক আসতেই পারে, অপমানের বোধই যার মধ্যে জন্ম নেয় নি, তার সাথে যুদ্ধ করে কী লাভ ? ছুটির ঘণ্টা বাজছে। সবাই পাততাড়ি গোটাতে তৎপর। হাই তুলছে কেউ-কেউ। মুখের সামনে থেকে পেপার নামাই না, শিরোনাম— 'নগরীতে একদিনের দুর্ঘটনায় মোট ন'জনের মৃত্যু।' এক সময় কাগজ ভাঁজ করে রেখে আমি প্রশ্ন করি, আপনার ভাইকে বাসায় এনেছেন ? সে বেশ উৎসাহিত হয়ে বলে— ধুর, তর্কে-তর্কে আসল কথাই বলা হয় নি। আসলে এ জন্যই আপনার এখানে আসা। ওকে বাসায় নিয়ে আসার কিছুদিন আগে থেকে তার কিছু অস্বাভাবিক আচরণ আমাদের অবাক করে দিতে থাকে। সব বলে আপনাকে লাভ নেই, শুনলে অবাক হবেন সে আপনাকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে।

স্রেফ গুল! লোকটা গায়ে পড়ে সম্পর্কটাকে বাসা পর্যন্ত নিয়ে যেতে চাইছে। কথাটা ভাবার পর ভেতরের বিরক্তি চেপে রাখতে পারি না। গলায় তীক্ষ্ণতা এনে বলি— সে আমাকে দেখেই নি ভালো করে, আমাকে চেনে না, আপনি দয়া করে আপনার আসল উদ্দেশ্যটা খুলে বলুন তো। ভাই দেখতে চেয়েছে, এই রকম ভান-ভণিতায় যাওয়ার দরকার কী ?

আপনি বিশ্বাস করুন, আমি মিথ্যে বলছি না— তার মুখটা করুণ দেখায়। আমি আগেই বলেছি তার সমস্ত ব্যাপার-স্যাপার বেশ অদ্ভুত হয়ে উঠছে। আপনাকে ও দেখেছে। যে-কোনো কারণে হোক আপনার মুখটি গেঁথে গেছে ওর মনে। ও এ ব্যাপারে আমাকে বারবার অনুরোধ করেছে। জানেন, ও দিনে দিনে কেমন বিকারগ্রস্ত হয়ে উঠছে। ক্র্যাচে ভর দিয়ে প্রায়ই মাঝরাতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। মা ওকে চারদিক থেকে পাহারা দিয়ে রেখেছে। কিন্তু রাখলে কী হবে, ফাঁকি দিয়ে কীভাবে সে উঠে যায়। ছিটকিনি খোলে। প্রশ্ন করলে কী সব উল্টোপাল্টা কথা বলে। বলে, আমি মৃত মানুষ, মৃতদের সাথে দেখা করতে যাই। বলতে-বলতে থমথমে হয়ে ওঠে ওমরের মুখ।

কী এক অবশতায় আমি স্থির হয়ে থাকি।

সে বলে চলে, সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, গোরস্থানের পাশে শেষ রাত অব্দি একদিন বসে থাকলে আমার দাদির সাথে নাকি তার দেখা হয়। মাথায় হাত বুলিয়ে দাদি অনেক গল্প করেন। ছোটবেলায় কীভাবে বাবা বিয়ে করেছিলেন, কীভাবে সেই বালিকাবধূ জলে ডুবে মারা যায়, এইসব। তারপর বাবা মা'কে বিয়ে করেন। শুনে তো মার মাথা খারাপ হওয়ার যোগাড়। মা ছাড়া আমাদের পরিবারে কেউ এসব জানে না। ও বলেছে, দাদির কপালে একটা কালচে দাগ আছে। মা স্বীকার করলেন সেটা। আমাদের জন্মের আগেই দাদি মারা যায়। আরো আশ্চর্য, সারাক্ষণ চোখ বুজে কেবলি সে বিড়বিড় করে, সেই লাশটা কোথায় ? সেই লাশটি কোথায় ? বলো কার লাশ ? বহু প্রশ্ন করেও এর উত্তর পাই নি। জানেন, আমিও প্রায়ই গোরস্থানের পাশে বসে থাকি। ওমরের মুখ কালচে হয়ে ওঠে, সে অবশ্য অন্য কারণ, থাকগে, তার ব্যাপারটা আমাদের কারো মাথায় ঢুকছে না।

আমি বলি, দেখুন আমি কোনো আজগুবি কথায় বিশ্বাস করি না। দাদি, বাল্যবিবাহ এসব কথা কোনো-না-কোনোভাবে সে শুনেছে। অসুস্থ অবস্থায় তা-ই বকে যাচ্ছে। মৃত্যুর কবল থেকে ফিরে এসেছে। লাশ নিয়ে ভাবাটা তাই খুব স্বাভাবিক নয় কি ?

কিন্তু মধ্যরাতে বাইরে যাওয়া ?

আমি তো ভাই মনোবিজ্ঞানী নই। ব্যাপারটার সাথে খুনের মোটিভ জড়িত। ভয় থেকে মানুষের অনেক বিকার হতে পারে। সাধারণ বুদ্ধিতে আমি এটাই বুঝি। ওকে কোনো ডাক্তার দেখান।

আপনি কি যাবেন ?

কাল তো বন্ধের দিন। আপনি পরশু একবার আসুন। আমি যাব।

আজ কি সমস্যা আছে ? ইতস্তত করে সে। আমার সারা মগজ তোলপাড় করছে ইজেলে সাঁটা ক্যানভাস। ছবিটা আমাকে স্রোতের মতো টানছে। রঙের এক নেশাতুর গন্ধ আমার নাকে। যেন কত যুগ পর আমার রক্তে সেই উন্মাদনা। সেই স্বপ্নে পাওয়া পেইন্টিং। আমি বলি— আজ অসুবিধে আছে। আপনি পরশুই আসুন।

বাসায় এসে আমার ভেতরের পুরো আন্দোলনটাই ভেস্তে যায়। প্রথম আমি আমার শ্যাওলা-পড়া সিঁড়ির ওপর বাচ্চা কোলে স্তব্ধ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি বস্তির সেই মহিলাটিকে। মানুষের শরীরের এত দ্রুত পতন আমার আর চোখে পড়ে নি। শুধু চামড়ার ফ্রেমে আটকে আছে ভেতরের হাড্ডিগুলো। আর পটকা মাছের মতো ফুলে উঠেছে তার পেট। মহিলাটি আমাকে দেখে ধড়ফড়িয়ে ওঠে। তারপর দ্রুত বস্তির দিকে হাঁটা দেয়। কালু কোলে বসে আমার দিকে কাঙালের মতো চেয়ে থাকে। বুকের মধ্যে কষ্ট অনুভব করি। ডাকি, এই শোনো, শোনো...। কিন্তু আঁচলে মুখ চেপে মহিলাটি বস্তির মধ্যে ঢুকে যায়। দরজায় ভারি পা রাখি।

ঘরে ঢুকে দ্বিতীয় ধাক্কা। পাগলের মতো একটানা বকে যাচ্ছে শানু। আমাকে দেখে প্রায় হামলে পড়ে, এই মাসের বাসা ভাড়া দাও।

আমি হকচকিয়ে যাই। অবিন্যস্ত শাড়ি। ঘর্মাক্ত মুখ। পুরো ভঙ্গিতে মারকুটে ভাব স্পষ্ট। সে বলে, বেতন পেয়েও বাসাভাড়া দিচ্ছ না। আমি তো এতিমখানা খুলে বসি নি। তুমি টাকা জমিয়ে রাখবে, আর আমি গাঁটের পয়সা খরচ করে তোমাকে পুষব ?

ছিঃ ছিঃ, আমি ছটফটিয়ে উঠি, কোন মাসে আমি তোমাকে টাকা দেই না ? তুমি একা বাড়িভাড়া দিয়েছ, এমন একটা মাস দেখাতে পারবে ? এ মাসে আরেফিনের নতুন চাকরি, বলল, প্রথম মাসে কিছু চলার জন্য দিতে হবে। তাই ভেবেছিলাম— বলতে বলতে কেমন কান্না এসে যায়। ব্যাগ রেখে দড়াম করে ড্রয়ার খুলি। টাকাটা তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলি, আমি কালই বাসা ছেড়ে চলে যাব।

টাকা ছুঁড়ে দিচ্ছিস কেন ? খিঁচিয়ে ওঠে সে, আমি কি ভিক্ষা নিচ্ছি ? তা-যা না, ভয় দেখাচ্ছিস কাকে ? তোর মতো মেয়ের থাকার অভাব হবে ? তোর চরিত্র আমি জানি না ?

আর সহ্য হয় না, এক ধাক্কায় আমি তাকে বিছানার ওপর ফেলে দিই, হারামজাদি বদমাইশ কোথাকার। আমি বুঝি না, তুই কিসের ঝাল মেটাচ্ছিস আমার ওপর ? কালুর মা'র পেটের বাচ্চাটা কার ? এই করে তুই কলঙ্ক ঢাকবি ? সোজা পুলিশে খবর দেব।

আমার মাথায় দাউদাউ দাবাগ্নি। ঘৃণায়, ক্রোধে, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে কোমরে আঁচল জড়াই, গলা টিপে মেরেই ফেলব তোকে। নিজের ভাতারকে সামলাতে পার না, দোষ আমার ? আমি ওই বেটিকে না ডাকলেও তোর ভাতার ধোয়া তুলসিপাতা হয়ে থাকত ভেবেছিস ? সে ওই বেটির বস্তি চেনে না ?

মুহূর্তেই আগুন জল হয়ে যায়। হাউমাউ কাঁদতে শুরু করে সে। তুমি আমাকে এভাবে অপমান করলে? তুমি তাহলে সব জানো? সবাই আমার শত্রু। চেপে রাখবে, বলবে না। মাতারির কি স্বামী নেই? একদিন আমার স্বামীর সাথে থাকল বলে... শিশুর মতো হিক্কা তুলতে থাকে শানু। দু'পয়সা খসাতে এসেছিল। এগুলোকে চিনি না? ছ্যাচড়ের জাত। বলে, স্বামী নাকি লাথি দিয়ে বের করে দিয়েছে। তোর মতো বেটিকে লাথি দেবে না তো...। আর বলতে পারে না, একদম মাটিতে ঠ্যাং ছড়িয়ে গলা আরো চড়িয়ে কেঁদে ওঠে সে।

পুরো ব্যাপারটার নাটকীয়তায় আমি রীতিমতো থ। সন্তান, কালুর মা, আন্দাজের ওপর এত যথার্থ সূক্ষ্ম ঢিল ছুঁড়তে পারব, এক মুহূর্ত আগেও আমার ধারণায় ছিল না। মাথা ঝিমঝিম করছে। সারাদিন অফিস শেষে এমন পরিস্থিতি। কেমন শিথিল হয়ে আসছে শরীর। মেঝে থেকে শানুকে টেনে ওঠাই, এত জোরে চিৎকার করছ কেন? মানুষ শুনলে তোমারই বারোটা বাজবে। তুমি নিজেই তো বেশ দুর্বল দেখছি। মহিলাটা বললেই তো আর তোমার স্বামী তার বাচ্চার বাপ হয়ে যাবে না। তুমি নিজেই তো জানো তার স্বামী আছে। কিন্তু তারপরও তোমার যা অবস্থা, এরকমটা দেখলে পাবলিক বেটিকে কামাল ভাইয়ের কোলে বসিয়ে দিয়ে যাবে। এ সময় তোমাকে শক্ত হতে হবে। এইরকম কিছু মামুলি উপদেশ পেয়ে শানু আচমকা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আমাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যায় ভেতরে, এরা কিন্তু সাংঘাতিক। ব্ল্যাকমেইল করবে না তো?

বিরক্তি চেপে বলি, তোমাকে দুর্বল দেখলে করবে। আগে নিজেকে ঠিক কর।

না না, তা পারব না, স্যাঁৎ করে আঁচল দিয়ে নাক মোছে শানু। তুমি তো দেখো নি, যা দজ্জাল ভঙ্গিতে ঠ্যাঙানি দিয়েছি।

এসব ঘটনার পর রাতে যখন ক্যানভাসের সামনে দাঁড়াই, মাথার ঘিলু কচলে খায় অন্ধ গেরো। হয় না, এভাবে হবে না। পরক্ষণেই অন্য এক তেতো বোধ আমাকে অসাড় করে তোলে। রাগের মাথায় বাসা ভাড়াটা দিয়ে দিলাম শানুকে। সে-ও নিয়ে নিল। বাড়িতে এ মাসে টাকা পাঠাই নি। তারপর আছে আরেফিন-সমস্যা। ভেবেছিলাম এ মাসে ভাড়াটা না দিয়ে, আগামী মাসে যে ভাবেই হোক ম্যানেজ করে একবারে দু'মাসেরটা এক সঙ্গে দেব। তখন আরেফিনও কিছু সাহায্য করতে পারত। ধুৎ! দু'দিন বেশ ভুলে ছিলাম এসব। আজ আবার কাঁকড়ার মতো সব ছেঁকে ধরেছে। ধৈর্যের সীমা ধ্বসে পড়তে চায়। নিজেকে আবার আঁটোসাঁটো করে বাঁধি নিজের ভেতরেই। সামনে খাড়া করাই আধাআধি শেষ করা ছবিটাকে। ক্রমশ বিদ্‌ঘুটে জটগুলো আলগা হয়ে আসে। এক সময় কোমল নরমতা বুকের মধ্যে অদ্ভুত এক ঠাণ্ডা এনে দেয়। কালো রঙের কৌটোয় তুলি ডোবাই। এবার অন্ধকার ক্যানভাসের একপাশে প্রদীপ। প্রদীপের অপরদিকে রাক্ষসের মতো একটা মুখ, যেন আরব্য রজনীর আফ্রিদি দৈত্য। তার দৃষ্টি ভয়াল শূন্যতায়। আরো খণ্ড-খণ্ড মস্তক। আলোছায়ার মধ্যে ঝাপসা ভাসতে থাকে বেড়ালের, কুকুরের। রাত তিনটার ঘণ্টা বাজে কোথাও। আচমকা সংবিৎ ফিরে পাই। পুরো পৃথিবীর স্থবিরতা এই ঘরে। অসম্ভব স্নায়বিক চাপে অবশ হতে থাকি, ক্যানভাস জুড়ে অদ্ভুত প্রেতপুরী। কীসব হিজিবিজি আঁচড়। ঝাঁকালো রঙের মাঝখানে যখন একটি হাত মূর্ত হয়ে ওঠে, অন্য রঙে তা ঢেকে যায়, কখনো গালের একপাশ... মানুষকে যেভাবে আমরা কখনো ভিন্ন ভিন্ন অংশে দেখি, রঙের আনাড়ি বিন্যাসে একরৈখিক হয়ে সেইসব চিত্র আমার মনশ্চক্ষুর মধ্যে একটা কাহিনী এনে দেয়।

সেই আঁধার রাতে ক্যানভাসটিকে আমার হিংস্র নিষ্ঠুর বীভৎস সুন্দরের এক বহুমাত্রিক জীবন মনে হতে থাকে। যেন ছবি নয়, তুলি দিয়ে কোপ দিয়ে দিয়ে আমি সেইসব দৃশ্য থেকে রক্ত বের করে আনছি, সেই মৃত্যুতে যে চিড়িক দিয়ে ওঠা রক্ত, যে আর্তনাদ, এর মধ্যে হিমহিম করে বয়ে যায় যে সন্তুরের মীড়ের সুর... একসময় আমি সেই টানে ছবির মধ্যে থেকে জীবনের ঘোর কাটিয়ে বেরিয়ে আসি। শেষবারের মতো ক্যানভাসের দিকে তাকিয়ে ভেতরটা ফাঁপা হয়ে যায়। কিচ্ছু হয় নি, এই বোধের তীব্রতায় কেমন নিস্তেজ হয়ে আসি। ঠোঁট শুকিয়ে চড়চড়ে। দু'পায়ে কোনো অনুভূতি অনুভব করছি না। ব্যথায় টনটন করছে হাত। টলতে টলতে বিছানায় আছড়ে পড়ি। ছিঁড়ে ফেলব এটাকে। ফিনিশিং টাচফাচ দেব না। আবার শুরু করব। অন্য কোনো ভাবনা দিয়ে।

রাতে বিচিত্র সব স্বপ্ন দেখি। আমাকে কবর দিয়ে চলে গেছে সবাই। হিম নিস্তব্ধতা পুরো কবর জুড়ে। এবং কালো মোষের মতো অন্ধকার। হঠাৎ দেখি সামনে একটা রেল লাইন। এর মাথা কীভাবে কবরের সাথে জুড়ে গেল, ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। উদ্‌ভ্রান্তের মতো দৌড়তে থাকি কাঠের স্লিপার ধরে। কুয়াশার মতো শাদা অন্ধকার চারপাশে।

দেখি, একটা ট্রেন আসছে হুইসেল বাজিয়ে। হঠাৎ ট্রেনের গতি থেমে যায়। প্রত্যেক বগিতে মানুষের খণ্ডিত মস্তক। ইঞ্জিনের মধ্যে ডাঁই করে রাখা হয়েছে মানুষের মৃতদেহ। ভয়াল, আতঙ্কে আমি বিবর্ণ। তারপরই দেখি তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে হলুদ শিশু। আখের ছোবড়া চিবুচ্ছে ও। এ যেন আমার সন্তান! গলা ফাটিয়ে চিৎকার করি। এত ক্ষুদ্র তার আদল, অথচ দাঁতগুলো কত বড় বড়! দিব্যি হাঁটছে ও। আমি পাগলের মতো বুকে চেপে ধরি ওকে। কিন্তু নিজেকে ছাড়িয়ে অদ্ভুত নিস্পৃহ ভঙ্গিতে ও অনেকটা এগিয়ে যায়। আমাকে আলতো করে আহ্বান জানায়, এসো। আমি সেই ক্ষুদ্র ন্যাংটো অবয়বটির পেছন ধরে হাঁটি। বিস্তৃত পথ— কী বিশাল, হাঁপিয়ে উঠি। অবসন্ন শরীর লুটিয়ে পড়তে চায়, তবুও সে থামে না। হঠাৎ একটি প্রতিধ্বনিময় শব্দ শুনি— তুমি কি ঈশ্বরকে বিশ্বাস কর?

করি। করি। কাঁপা কাঁপা গলায় বলে চারপাশে তাকাই।

একজন কিশোর। গায়ের চামড়া এত শাদা যেন সুঁচ ফোটালেই ভেতর থেকে নিশ্চিত দুধ রক্ত বেরোবে। পরনে পাদ্রিদের মতো পোশাক। আমার শিশুকে কোলে তুলে হুঙ্কার দেয় সে, মিথ্যে বলছ তুমি! আমি দেখি, ভীষণ চেনা কিশোরটির মুখ। কোথায় দেখেছি, কুয়াশার মধ্যে প্রাণপণে হাতড়াতে থাকি। নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে সে। তার কোলে শিশুটি হাসছে! আমার বিস্ময় চরমে ওঠে, হাসপাতালে দেখেছিলাম। স্ট্যাব খেয়ে ভর্তি হয়েছিল। কার যেন ভাই, উফ্ মনে করতে পারছি না। ঠকঠক করে কাঁপছি, কার ভাই?

আচমকা ঘুম ভেঙে যায়। ধড়ফড়িয়ে তাকাই চারপাশে। এ-কী, আমার চোখ জলে ভিজে গেছে কেন? বালিশের কভার নোনা জলে চোবানো। স্বপ্নে তো আমি কাঁদি নি? অথবা কেঁদেছি, মনে করতে পারি না। বুকের মধ্যে কষ্টের স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। চারপাশে আশ্চর্য নির্জনতা। দরজার ফাঁকফোঁকড় দিয়ে ভোর ঢুকছে। কিন্তু এত কেঁদেছি কেন? বুকের মধ্যে শূন্যতারই-বা এত ঘূর্ণি কেন? ভাবতে থাকি। অস্তিত্ব অবশ করে আবিষ্কৃত হয়, দীর্ঘদিন পর আমি আমার সন্তানের মুখোমুখি হয়েছি। কতোদিন ভুলে ছিলাম এসব। যন্ত্রণার ঘায়েও আস্তর পড়ছিল ক্রমশ। স্বপ্নে এসে খোঁচা দিচ্ছে, সেই মুখ, আবারো রক্তাক্ত করে তুলছে দুর্বল জায়গাটা। আমি সেই অধ্যায় নিয়ে ভাবতে চাই না। ছটফটিয়ে বসি। সামনে

ক্যানভাসের প্রেতপুরী। ঝাঁঝালো রঙের কারসাজিই সার— কিছুই হয় নি। ছুঁড়ে ফেলার জন্য দাঁড়াতে চাই কিন্তু অবশ শরীর নেতিয়ে পড়ে বিছানায়। কোনোদিন আমি শিশুটির হাসি দেখি নি। শুধু অবিশ্রান্ত কান্না। আজ দেখেছি ওইটুকুন শিশুর কী বড় দাঁত! কী কোমল মিষ্টি হাসি। আমি চেয়ে থাকি সেই দিকে।

আমি ঢুকে যাই সেই শিশুটির জন্মলগ্নের মর্মস্পর্শী স্মৃতির মধ্যে। ভ্রূণ থেকে ক্রমশ পেটের মধ্যে ওর বেড়ে ওঠা, পুরোটা বছরই আমার গেছে দুর্দান্ত অস্থিরতার মধ্যে। ইউরিন টেস্ট করিয়ে যেদিন প্রথম জানলাম ভেতর ভ্রূণের অস্তিত্ব, রেজাউলের উচ্ছ্বাস ছিল তুঙ্গে। কিন্তু আমি ততদিনে তার ওপর থেকে সব শ্রদ্ধা, সব মোহ হারিয়ে ফেলেছি। আমার সমস্ত স্বপ্ন কেন্দ্রীভূত হয় সেই ভ্রূণটিকে ঘিরে। প্রথম তিন-চার মাস আমার মরার দশা হয়! ক্রমাগত বমি। মেঝে, বাথরুম ওগরানো বমির স্রোতে ভেসে যেত। সবকিছু দুর্গন্ধময়—মাছ, তরকারি, ভাজি, মিষ্টি। নিদ্রাহীন কুৎসিত রাত অতিবাহিত হতো অসহ্য ছটফটানির ভেতর দিয়ে। সবচেয়ে যন্ত্রণাকর ছিল আমার পাশে শুয়ে থাকা রেজাউল। তার পুরো গায়ে বোয়াল মাছের গন্ধ। পেট ঘুলিয়ে দম বন্ধ হয়ে আসত। ওকে এড়াতে একসময় বালিশ নিয়ে নিচে বিছানা পাতি। কিন্তু সে ছিল রক্তে-মাংসে প্রতিটা মুহূর্ত উগ্র ও উষ্ণ। নেমে আসত নিচেই, জোর না খাটিয়ে কাকুতি-মিনতি করত। তার সাথে সে-ই আপোসটাও ছিল আমার জন্য প্রচণ্ড স্নায়বিক চাপের। কিন্তু ক্রমাগত প্রত্যাখ্যান করলে তো দাম্পত্য সম্পর্কটাই ঝুঁকিময় হয়ে ওঠে, তাই শরীর-মনের সেই নাজুক অবস্থায় আপোস না করে পারতাম না।

আমার আরেকটা ভয়ানক অসুবিধে ছিল। এমন খাবারের প্রতি আকর্ষণ বেড়েছিল যার অধিকাংশই কেনার সামর্থ্য আমাদের থাকত না। কমলা, মুরগির রোস্ট, পাঙ্গাস মাছ, ঘি, হালিম। এই সময় রেজাউল প্রায়ই বাজারে এসব পাওয়া যাচ্ছে না, অথবা পকেট শূন্য— এইসব বলেটলে পাশ কাটিয়ে যেত, আবার হপ্তা কি দু'হপ্তার মাথায় দুর্লভ কোনো উপহারের মতো হাতে তুলে দিত আমার প্রিয় এইসব খাবার। বলতে গেলে, নিয়মিত পুষ্টিকর অথবা পছন্দসই খাবারের অভাব আমাকে প্রতিদিন দুর্বল আর ক্ষীণ করে তুলছিল। সারাক্ষণ তাই মেজাজ খিঁচিয়ে থাকত। এসব কিনে না দিতে পারার জন্য তেমন কোনো কষ্ট বা অনুতাপ রেজাউলের মধ্যে ছিল বলে মনে হতো না। এবং প্রায়ই আমার মনে হতো, এরকম অবস্থায় থাকতে পেরে লোকটা সুখী। আসলে আরেকটু ভালো থাকার কোনো চেষ্টা তার মধ্যে কোনোদিনই দেখি নি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এ ব্যাপারে তাকে হয় হতাশ, নয়তো নির্জীব থাকতে দেখেছি। এবং যত দিন যাচ্ছিল পারিপার্শ্বিক বদ্ধতার জন্যই হয়তো আমার ভেতর কিছু বিকারগ্রস্ততা ভর করছিল। আমার মনে হতো, জন্ম-নেয়া শিশুটা বিকলাঙ্গ হবে। আমার এইরকম আলোহীন জীবনে তার পক্ষে কখনোই সুস্থ হওয়া সম্ভব নয়।

এক অবিনাশী ভয় আমার বুক খামচে ধরত। মনে হতো, সন্তান নিয়ে আমি নিরন্তর নিমজ্জিত হচ্ছি মিশমিশে কালো অন্ধকারে। কাঙাল হাত বাড়িয়ে রেজাউলকে স্পর্শ করতে চাইতাম। কিন্তু এত নির্বিকার চরিত্র ছিল তার যে, আমার সে সব আশঙ্কার ব্যাপার-স্যাপার কঠোর ধমকে এড়াতে চাইত, কোনো সহানুভূতি পর্যন্ত দেখাত না। বলত, বড় দুর্বল মেয়ে তুমি! সহ্য ক্ষমতা বাড়াও। তোমার ভাব দেখে বুঝতে কষ্ট হয়, গরিবের ঘরে যুদ্ধ করে করে বড় হয়েছ।

এভাবে ভয়ে ভয়ে এক সময় পেটের মধ্যে শিশুর প্রায় পূর্ণতা প্রাপ্তিকে টের পাই। একসময় রাতে তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করি তাকে। ডানের শিশু হামা দিয়ে বামে আসে। উঁচু পেটে হাত রেখে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে রেজাউল। সেই রোমাঞ্চ ক্রমশ তাকে শারীরিকভাবে উত্তেজিত করে তোলে। যথারীতি কঠিন অনড় আমি। একদিন দু'দিন— ধীরে ধীরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে থাকে সে। প্রতিদিন রাত অতিবাহিত হতো কুৎসিত ঝগড়ার ভেতর দিয়ে! কী ভয়ানক চাপ! ঘরে বসে বসে দম আটকে আসত।

সেই ঝগড়াই চূড়ান্ত আকার ধারণ করে একদিন। এক সুদর্শন কিশোরসহ অফিস থেকে বাসায় ফেরে সে। বলে, ওর বড় ভাইয়ের সাথে আমরা এক মেসেই থাকতাম। তখন সে নিতান্ত শিশু ছিল। ঢাকায় এসেছে, হপ্তা খানেক থাকবে। তুমি কল্পনা করতে পারবে না নীনা, ও কেমন লাজুক ছেলে। মেসের কথা শুনেই আমার ভেতরটা হিম হয়ে আসে। সে রাতের বিস্তারিত কথা আমার সামনে জট পাকিয়ে দাঁড়ায়। রেজাউলের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার বর্ণনা। মেসের এক ছেলের সাথে জীবনের প্রথম কীভাবে অদ্ভুত অভিজ্ঞতায় সে জড়ালো। মেসের ওপারেই ছিল বিস্তৃত চর, তারপর নদী। ওখানকার দু-তিনজন বন্ধুর একজন রেজাউলকে জ্যোৎস্নার কিছু অলৌকিকতা আছে— এই প্রলোভনে সেই চরে একদিন তাকে নিয়ে যায়। সেদিন নাকি আসলেই ভাসা চোখের মতো টলটল করছিল চাঁদ। শূন্য খাড়া চরাচরে কেবল কুমড়ো ক্ষেতে শেয়ালের কান্নার শব্দ। হুহু বাতাসে সেই লোকটা তাকে বালুর মধ্যে চেপে ধরল... সেই প্রথম অভিজ্ঞতা... রেজাউল ম্লান কণ্ঠে বলছিল, এরপর মেসের অন্য ছেলেরাও এ খেলায় মত্ত হয়ে পড়ে। জানো, তখন পর্যন্ত আমি এ্যাকটিভ ছিলাম না। প্যাসিভ হিসেবে ব্যবহৃত হতাম, কিন্তু একদিন সেই বন্ধুদের সাথে আমার মেথরপট্টি যাওয়ার সুযোগ ঘটে। সারারাত সেখানে ঢোল, করতাল, নাচগানের আসর চলত। আসরের মধ্যে চলত বোতল বোতল 'বাংলা'র চর্চা। সারারাত মত্ততার পর দু'একজন মেথর মেয়ে দেহ ব্যবসার কাজে নেমে পড়ত। যা হোক, আমি তখন মদ গিলে অজ্ঞান। একটি মেয়ের সাথে ধবল আলো ফুটবার সময় জীবনের প্রথম দৈহিক সম্পর্ক হয়। সে অবশ্য আমাকে তেমন আনন্দ দিতে পারে না। আমি অনুভব করি একজন পুরুষই অনেক চৌকশ, এবং রোমাঞ্চকর...। তারপর থেকে ধীরে ধীরে আমিও এ্যাকটিভ হয়ে উঠতে থাকি...। কী প্রয়োজন ছিল এইসব গল্প আমাকে বলার ? আমি ওর সততাকে সম্মান করব সেই জন্যে ? না-কি আমাকে অবলীলায় সব বলে দিল বলে ব্যাপারটাকে আমার প্রতি তার অবজ্ঞা হিসেবে নেব ? আমি প্রচণ্ড বাধায় ওকে থামিয়ে দিয়েছিলাম... থামো... আর শুনতে চাই না।

ফলে, মেসের কথা শুনেই আমার মাথায় দাবাগ্নি। তাছাড়া তখন আমি এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস করি না রেজাউলকে। রান্নাঘরে এসে চাপা ক্রোধে ফেটে পড়ি।

একটু কষ্ট কর না কিছুদিন— রেজাউলের স্বরে মিনতি। আমার ভীষণ স্নেহের ছিল সে। তুমি বিছানায় থাকলে, আমরা দুজন না হয় ফ্লোরিং করব ?

চালাচ্ছিলে বাইরেই চালাতে, হিসহিসে গলায় বলি, ঘরে টেনে আনার কী দরকার ছিল ?

তুমি কী বলতে চাইছ ? পাথরের মতো মুখ হয়ে ওঠে রেজাউলের।

কী বলতে চাই বোঝ না ? আমি তেমনিই ক্ষিপ্ত, এক সাথে নিচে থাকার আনন্দে তুমি ভুলে যেতে পার দু'জন পুরুষসহ একটি ঘরে একজন মহিলার ঘুমানোটা কতখানি অশ্লীল।

তা-ও এই অবস্থায়, গরমে আমি গায়ে কাপড় রাখতে পারি না। কিন্তু আমি তো সেটা ভুলতে পারি না।

কিছুক্ষণ রক্তচোখ করে সে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর আচমকা আমাকে টেনে ঘরে নিয়ে আসে। ছেলেটি ম্যাগাজিন পড়ছিল। আমাকে হতবাক করে দিয়ে টেনে তাকে বিছানায় ফেলে রেজাউল এলোপাতাড়ি চুম্বন করতে থাকে। তার হাত দ্রুত চলমান ছেলেটির সর্বাঙ্গে। বিস্ময়ে বিমূঢ় আমি। হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকি। এক সময় সে হাঁপাতে থাকে। লজ্জায় অস্বস্তিতে মৃতপ্রায় ছেলেটি আমার দিকে তাকিয়ে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। প্রায় চৈতন্যহীন অবস্থায় আমি মেঝেতে বসে পড়ি। গলা শুকিয়ে এসেছে। অসম্ভব কাঁপুনি শরীর জুড়ে। ঘৃণায়, ভয়ে, কান্নায় রেজাউলের দিকে তাকাতে পারি না।

এ ঘটনার পাঁচদিন পর আমি হাসপাতালে ভর্তি হই। সেদিন অল্পঅল্প ব্যথা অনুভব করছি সকাল থেকেই। দুপুরের পর সেটা আরেকটু বাড়তির দিকে। এর আগে দু'একবার এরকম ব্যথা হয়েছে। নিজেকে টেনে হাসপাতালের আউটডোরে গিয়েছি। ডাক্তার বলেছে, ফল্‌স্‌ পেইন। কিন্তু সেদিনকার ব্যথাটা সত্যিই অন্যরকম। এইভাবে একসময় রাত আসে গুটি গুটি পায়ে। কী অপার শূন্যতা। ধাপে-ধাপে ব্যথা বাড়ছে। আমার মুখের ওপর রেজাউলের উদ্বিগ্ন মুখ। চোখ বন্ধ করি, আহ্‌, অসহ্য যন্ত্রণা। নিরন্তর বেড়ে চলেছে। যত গভীর হচ্ছে রাত, ততই বল্লমের ধার। ঘা দিচ্ছে পেছন থেকে। শিশুর মতো চিৎকার করি। নার্স এসে দেখছে বারবার, ঘেমে ভিজে উঠছি। আমার শরীর বাঁকা, ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। এক সময় আমার বিষময় দেহ ট্রলিতে উঠানো হলো। এর আগে ডাক্তার বারবার চেক করেছে, দেখেছে, সেই মহান শিশুটি যে পথে আসবে তার দরজা খুলছে না। অথচ জল ভাঙতে শুরু করেছে। উদ্বিগ্ন হয়ে ডাক্তার বলেছে, চাপ দিন, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে চাপ দিন। সেই শক্তি কি আমার আছে? এক ফোঁটা চাপ দিতে গেলেই বল্লমের ধার বিষাক্ত হয়ে ওঠে। এর মধ্যে আমাকে অসাড় করে দিয়ে পেটের মধ্যে শিশুটি যেন চুপ হয়ে গেল। আশ্চর্য, মরে গেল কি? গলা ফাটিয়ে কাঁদছিলাম, মরে যাক! ডাক্তার আমার পেট কেটে ফেলুন! রেজাউল, শুয়োরের বাচ্চা, এ-কী দিলি তুই আমার পেটে?

কোথায় যাচ্ছি? যাচ্ছি কি আগুনের বিশাল হাঁ-এর দিকে ক্রমাগত? ঘাম স্রোতের মধ্যেও ঝলসে যাচ্ছি, পুড়ে যাচ্ছি।

তারপর শিশুর প্রচণ্ড চিৎকার। জল ভেঙে প্রবল বেগে বেরিয়ে আসার দরুন বাচ্চাটা প্রচণ্ড শ্বাস কষ্টে পড়েছিল। ও বেরিয়ে আসার পর অন্য সমস্যা, ফুল বেরোচ্ছে না। আমি তখন অতসব প্রবল বাধার কতটুকু বুঝি? নিঃসঙ্গ আমার সব সমাধান কী করে ডাক্তার করেছিলেন, কে জানে? নির্ভার শরীর তখন নেতিয়ে এসেছে। শিশুটিকে ধুইয়ে-মুছিয়ে যখন শোয়ানো হলো আমার পাশে, দৌড়ে আসে রেজাউল। আর আমি সেই মুখ দেখে সব কিছুর পর নিজের বেঁচে থাকার মানে খুঁজে পাই। তারপর তার অসুস্থতা, মৃত্যু। এজন্য আমি অনেকটাই দায়ী করি রেজাউলকে। তখন নিরন্তর হতাশায়-যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছি আমি। শিশুর চিৎকারে কেঁপে উঠছে আমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। টাকা, স্যালাইন-ঔষধ— আমি আঁকড়ে ধরি রেজাউলের শার্ট— জোগাড় কর।

কোথায় পাব ? তার এই জবাব শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমি কাঁপা কাঁপা হাতে তার জামার কলার চেপে ধরি। কোনো প্রচেষ্টা নেই। সারাদিন বাইরে থেকেও একজন লোক মৃত্যুমুখী নবজাতকের চিকিৎসার টাকা জোগাড় করতে পারে না ?

সারাদিন সে ছুটে বেড়ায়। সন্ধ্যায় হাসপাতালে ফিরে দেখে আমার বিকারগ্রস্ততা। একদিন চিৎকার করে বলি, ভিক্ষে করতে পার না ? অথবা তুমিই থাক ওর পাশে, আমি শরীর বেচে নিয়ে আসি।

পাগল হয়েছ তুমি ? চিৎকার করত সে। যা পারছি, তা তো আনছিই।

ও যা আনে, তাতে করে একটা স্যালাইনের দামও হয় না, পাগলের মতো কাঁদতে থাকি। ওকে তুমি বাঁচাও, প্লিজ। ফলে রেজাউলের পালিয়ে থাকা বেড়ে যায়। সে হতাশ হয়ে সত্যজিৎদের আড্ডায় পড়ে থাকে।

একদিন স্তব্ধ হয়ে যায় সব।

ভাবতে-ভাবতে আবার বুক শূন্য হয়ে আসে। শিশুটি হাসছে। ওইতো টেবিলের ওপর বসে, মেঝেতে শুয়ে, চেয়ারে পা ঝুলিয়ে, কখনো শূন্যে ভেসে। কী অভিনব বিচিত্র সেই হাসি! তৃষ্ণার্ত চোখে চেয়ে থাকি। নিজের ভেতরে ক্রমাগত বিশ্লেষণ চলে। কেন রেজাউলকে দায়ী করছে ওর মৃত্যুর জন্য ? রেজাউলের দারিদ্র্যের জন্য কি তাকে দায়ী করা চলে ? একটি শিশুর জন্য কি পিতার আকুতি কম থাকে ? কিন্তু আকুতিরওতো রকমফের আছে। কেউ বুক পেতে শিশুকে আগলায়, কেউ সন্তান পালনের অক্ষমতায় রাস্তায় ফেলে যায়। দুটোরই উদ্ভব মায়া থেকে। নিজের সন্তানের ক্রমান্বয় পতন সহ্য করতে না পেরে শূন্যের হাতে তাকে ছেড়ে দেয়া। আমার স্পষ্ট মনে আছে, সেই উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় আমি তাকে বলেছিলাম, তার বাড়িতে তার নামে যেটুকু জমি আছে, সেটা বিক্রি করে দিতে। কিন্তু এ ব্যাপারে রেজাউল ছিল অনড়। বলেছিল, তবে তো চিরদিন শূন্যতায় বসবাস করার জীবনকে বেছে নিতে হয়। আমি হাজার যুক্তি দাঁড় করিয়েও এর উত্তর খুঁজে পাই না। কেন না রেজাউলকে আমি ছেড়ে এসেছিলাম নিজস্ব অনুভূতির এক ঘৃণিত বিষাক্ত বোধ থেকে।

দরজায় নক হচ্ছে। কামাল ভাই বেরিয়ে যাওয়ার পর ভোরে অঘোরে ঘুমোচ্ছে শানু। অনেক রাত অব্দি দু'জনের মধ্যে তুমুল ঝগড়া হওয়ার ব্যাপারটা টের পাওয়া গেছে। আমি তখন পেইন্টিংয়ের গভীরে। এদের এসব এখন বড্ড গা সয়ে গেছে। অবিন্যস্ত শাড়ি ঠিক করে উস্কো চুলেই দরজা খুলি। খুলেই মহাঅস্বস্তি। প্রাণখোলা হাসি হাসতে-হাসতে দরজায় ইরফান চাচা। প্রশ্ন করেন, আসব ?

সে-কী! আমার বিস্ময় তখনো কাটে না। এত সকালে ? আজব মানুষ আপনি!

আসুন, সাদর আহ্বান জানিয়ে পরিচ্ছন্ন কাপড় নিয়ে বাথরুমে চলে যাই। কিছুটা পরিপাটি হয়ে বেরিয়ে দেখি, তিনি আমার পেইন্টিংয়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। কী অস্বস্তিকর অবস্থা! ছবিটা এখনো পুরো অবয়ব পায় নি। আরো কিছু কাজ বাকি, আর এইরকম আনাড়ি অবস্থায় ভদ্রলোকের আগমন। কেমন মিইয়ে যেতে থাকি। ভেতরের চাপা উত্তেজনায় ঘেমে উঠি। আমি ছবি আঁকা শুরু করেছি, ভেবেছি, তিনি বিস্ময়ে আনন্দ প্রকাশ করবেন। কিন্তু তা-না করে খুব গম্ভীর গলায় শুধু বললেন, তোমার পেইন্টিংয়ের মজাটাই এখানে। কোনো নিপুণতার ধার ধারে না। আনাড়িপনার মধ্যেও চিন্তা দিয়ে তাকে তুমি সুন্দর করে তোলো। সম্ভবত আমিও আনাড়ি সমঝদার।

আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না খুশি না দুঃখিত হবো। চেয়ারে বসে শার্টের হাতা গোটাতে থাকেন তিনি। আমি বিছানায়। তিনি বললেন, পুরো ক্যানভাস জুড়ে বীভৎসতা। একটি কিশোরী, মরার মতো মুখ, চেয়ে আছে আলোর শিখার দিকে। অন্ধকার মৃত্যু তাকে গ্রাস করছে। বেড়াল, কুকুরের খণ্ডিত মাথা। দৈত্যের মতো একটি মুখ, ঝাপসা দেখা যাচ্ছে, দু'হাত ওপর দিকে উঠানো। সম্ভবত মেয়েটিকে সে উঠিয়ে নিতে চাইছে। ভীষণ জটিল!

না না উঠিয়ে নিতে চাইছে না, আমি বলি, অবশ্য কেউ সেভাবে ভাবলেও ছবির কোনো ক্ষতি হবে না। পুরো আইডিয়াটা একটা সত্য ঘটনাকে ঘিরে। মেয়েটি আমার ছোট বোন রানু। তখন সে কিশোরী। আসলে দক্ষতার অভাবে সেই আইডিয়ার কিছুই ফুটিয়ে আনতে পারি নি এখানে।

দৈত্য, খণ্ডিত মস্তক— কিছুটা বিস্ময় প্রকাশ করেন তিনি—এর মধ্যে রানু, এটা কি তার কোনো স্বপ্নকে ঘিরে ?

না, আমি অস্থির স্বরে বলি, পুরো ব্যাপারটা মনে পড়ায় কেমন এলোমেলো লাগে, বলি, আসলে ও এক অদ্ভুত শিকার। ওই দৈত্যের মতো লোকটার নাম আবদুল আলী মজুমদার।

ইরফান চাচা চুপ হয়ে যান। আশ্চর্য! কৌতূহল প্রকাশ না করাটা এদের এক অভিনব ভব্যতা। কিছুক্ষণ কেউ কিছু বলি না। তিনি বলেন, তুমি শুরু করেছ, আমি আনন্দিত হয়েছি। আমার অনুরোধ একটাই, নিজের ওপর আস্থা হারিও না।

কিছুক্ষণ থেমে তিনি বললেন, জানো নীনা, একসময় আমি প্রচুর ভ্রমণ করেছি, বিশেষ করে আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোতে। যে জাত শিল্পী, কোনো রকম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াও যে তার শিল্পকর্ম অভিনব হয়ে উঠতে পারে, সেটা আমি প্রথম পর্যবেক্ষণ করি কোনারকের সূর্যমন্দির দর্শনের পর। ঘোড়া, রথ, হাতি, রমণীর নৃত্যরত ভঙ্গি... কী অসাধারণ সব শিল্পকর্ম! পাথর কেটে কেটে তৈরি করা ভাস্কর্য— মৈথুনরত নারী ও পুরুষ। ওরকম জীবন্ত, ওরকম প্রেমময় উষ্ণ অভিব্যক্তি— সারাজীবন ধরে দেখলেও চোখ ও মনের তৃষ্ণা মিটবে না। অথচ এসবের স্রষ্টা যেসব শিল্পী, তাদের হাতে-কলমের কোনো শিক্ষা ছিল না। তাদের পরামর্শটুকু দেয়ার মতো কোনো শিক্ষকও ছিল না। কিন্তু কী করে যে তখনকার সামন্তপ্রভু বা রাজরাজড়াদের আদেশকে শিরোধার্য করে এত নিখুঁত মূর্তি গড়ত ওরা... নেপালের ওল্ড সিটির মূর্তিগুলোর কথাই ধরো, ওখানকার কৃষ্ণা টেম্পল, ষোল শ গোপীর মাটির চেহারা, কারা করেছে ওসব ? নীনা, স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিভার তুলনা হয় না। জ্ঞান তাকে সমৃদ্ধ করে মাত্র। কিন্তু প্রতিভাহীন জ্ঞান ? সে দিয়ে কেবল পণ্ডিত হওয়া সম্ভব। তাজমহলের ভাঁজে ভাঁজে যে সৌন্দর্য... তার নির্মাতা কি শাহ্জাহান ছিলেন ? এর পেছনে ছিল কারিগর শিল্পীদের প্রতিভা, তুমি রিকশার পেছনে অনেক ছবি দেখো না ? কারা আঁকে ওসব!

আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনি। এই একজন নির্জন লোককেই কেবল উপসাগরীয় যুদ্ধ, হরতাল, সন্ত্রাস, কোনো কিছুই স্পর্শ করে না। তাই এর জলে ডুব দিতেই আমার সুখ। পালাতে সুখ। আমার দেয়ালের ক্যালেন্ডারে রমণীর সুন্দর মুখ ঝুলছিল। তিনি হাসেন, ক্যালেন্ডারের একটা নিয়ম বড় নির্মম, একটি সুন্দর ছবি তোমার সামনে ঝুলছে, কিন্তু হয়তো তার দর্শনের সময়ও মাত্র দু'মাস। মাস পেরুলেই সে বলে উঠবে, ওল্টাও, অতিক্রম কর, ভেতরে আরো সুন্দর ছবি আছে...। সঙ্গে সঙ্গে সহজ তর্কে লিপ্ত হই, কিন্তু ক্যালেন্ডারের মূল

উদ্দেশ্য যেহেতু ছবি নয়, তারিখ, সেহেতু আমি এতে নির্মমতার কিছু দেখি না... সময় বয়ে যায়, এটা তো মানতে হবে। তিনি হাসেন, তা-কি আর মানছি না ? এই পাতা উল্টে উল্টে তো নিজেকে বুড়ো বানিয়ে ফেলছি। এখন আসল কথায় আসি, তোমার কি আজ কোনো ব্যস্ততা আছে ?

আমি মাথা নাড়ি, না।

চলো তাহলে, বেরিয়ে পড়ি, জীবনটা একদিনের জন্য একটু পাল্টানো যাক, কী বলো ?

কোথায় ? চাপা আনন্দের সাথে সাথে আমার ভেতরে বিস্ময়ের ঝিলিক।

সে-প্রশ্ন করো না, বেরিয়ে পড়াটাই আসল। কোথায়, সে-চিন্তা পরে হবে।

এ লোক দেখি অদ্ভুত বোহেমিয়ান। আমার চুপসে যাওয়া স্বপ্নের আরেক রূপান্তর। কতদিন ভেতর থেকে ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠি— বেরিয়ে পড় নীনা, বেরিয়ে পড়... হয় না। কী হিসেব প্রতিটি পদক্ষেপে! দারুণ রোমাঞ্চ অনুভব করি। সেই চোখে চেয়ে থাকি, সেই সৌম্য, বাইরে স্থির অথচ ভেতর অস্থির মানুষটির দিকে। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি পরক্ষণেই আমার ক্যানভাসের দিকে। পুরো ছবিটার ময়নাতদন্ত করছেন যেন। হঠাৎ আমার চোখে ভর করে সেই কিশোর। পাদ্রিদের পোশাক পরা। ওমরের ভাই। স্বপ্ন দেখার পর তাকে সত্যি সত্যি দেখার বাড়তি টান অনুভব করছি এখন। ভেতরে আবারো জমা হয় বিষাদ। এখন হাসি নয়, শিশুর কান্না ভেসে আসছে। আমাকে বিবরবাসী করে দিয়ে সেই কান্না নিরন্তর বেজেই চলে। আমি স্থবির দাঁড়িয়ে থাকি। একটু পরেই নিজেকে ঝেড়ে ফেলি। ভেতরের দিকে দৌড়াই।

আক্রান্ত হই অজানার পথে পা বাড়ানোর অন্যরকম রোমাঞ্চে।

এবং বেরিয়ে পড়ি। রায়ের বাজারের ঘুপচি, ময়লা গলি থেকে বেরিয়ে রিকশা মহাশূন্যে। তিনি বলেন, জানো, এক সময় আমার একটা গাড়ি ছিল। তখন মনে হতো এ ছাড়া কোনোদিন চলতে পারব না। এক সময় চরম সঙ্কটে পড়ে সেটি বিক্রি করে দিই। সঙ্কট কেটে যাওয়ার পর আর কেনা হয়ে ওঠে নি। বুঝলে নীনা, আমি হলাম গিয়ে সেই রাজা, যার প্রাসাদ আছে, সিংহাসন নেই— বলতে বলতে নিজেই হাসতে শুরু করেন, বুঝলে, ভাবনার মজাটাই এখানে, নিজেকে রাজার নিচে নামানো যায় না। তাঁর এইসব কথায় আমি নিঃশব্দে শুধু হাসি, কিছু বলি না।

উদ্দাম হাওয়া। ট্রাক, বাস, লরি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। চুল ওড়ার ফলে ইরফান চাচার প্রশস্ত কপালের অনেকটা উন্মোচিত।

এরপর নিঃশব্দে শুধু চারপাশ দেখে যাওয়া। কিন্তু খোলামেলা এই পরিবেশে আমি এখন অন্য মানুষ। ইচ্ছে হয় সব উগড়ে দিই। ভেতরের সব জঞ্জাল, চাপা ক্ষোভ। সূর্য মেঘের পেটে, চারপাশে অদ্ভুত বৃষ্টিময় পরিবেশ।

নীনা, তুমি আরব্য রজনী পড়েছ ?

আমি হেসে ফেলি— সব না, কিছু। আশ্চর্য, ক্যানভাসে মজুমদারের মুখ আঁকতে গিয়ে আমার আফ্রিদি দৈত্যের কথা মনে হচ্ছিল।

তোমার যা প্রবণতা, তিনি বললেন, সেখান থেকে তুমি অনেক ছবি আঁকার উপাদান পেতে পার। ওসব কাহিনীর প্রায় গুলোতেই দেখবে, সুন্দর রমণীরা সুদর্শন স্বামী ফেলে

নিগ্রোদের সাথে আনন্দলীলায় মত্ত হচ্ছে। এবং স্বামী টের পেয়ে আর কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে সটান দ্বিখণ্ডিত করে ফেলছে স্ত্রীসহ নিগ্রো প্রেমিককে। তখন হত্যা আর শরীর— দুটোরই খুব গুরুত্ব ছিল। আরো বিচিত্র সব কাহিনী। পেইন্টিংয়ের ক্ষেত্রে এসব বৈচিত্র্য খুবই চমৎকার। অবশ্য আমি এসব বলছি পুরাণের প্রতি আমার আলাদা এক ধরনের মোহ থেকে।

আমার আসলে আর্টের আদ্যোপান্ত জানা দরকার, আমি বলি। বলতে গেলে এ সম্পর্কে কোনো পড়াশোনাই আমার নেই।

আচ্ছা, আবদুল আলী মজুমদার কে ? তিনি প্রশ্ন করেন, অবশ্য তোমার অসুবিধে থাকলে বলার দরকার নেই।

এব্যাপারে আপনার নিস্পৃহতা আমাকে পীড়া দিচ্ছিল, আমি বলি, বড় কৃত্রিম বোধ হচ্ছিল। অত মেপে মেপে সভ্য হওয়া আমার প্রবণতার মধ্যে নেই। আশ্চর্য মানুষ আপনি! এতক্ষণে জানতে চাইলেন ?

আমার একটা বিশেষ স্বভাবকে তুমি কি করে মনে করছ এটা আমার তৈরি করা ? তিনি বলেন, আমি এভাবেই বেড়ে উঠেছি। আমি মনে করি, কেউ কিছু বলতে চাইলে সাগ্রহে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলবে। তুমিই-বা মেয়ে অকপট হও না কেন ? কিছু বলতে হলে অন্যের আগ্রহের দিকে চেয়ে থাকার ভান-ভণিতায় না গেলেই তো পার।

বা-রে, শ্রোতার আগ্রহ না বুঝেই বকবক করব ?

তোমার বলা তুমি বলবে। শ্রোতার দিকে তাকিয়ে নিজের স্বতঃস্ফূর্ততা নষ্ট করবে কেন ? আর নিশ্চয়ই যাকে নিজের নাজুক অধ্যায়গুলো বলা যায়, তার সম্পর্কে তোমার একটা ধারণা থাকবে। তুমি তো তা সবাইকে বলে বেড়াচ্ছ না। এরকম ভূমিকা শেষে অতঃপর শুরু হয় মূল গল্প। রিকশা ঢাকা কলেজের সামনে দিয়ে এগোচ্ছে। কিছুক্ষণ পর প্রচণ্ড ভিড়ের গাউছিয়া।

এক দেশে ছিল এক মজুমদার। তাহার ছিল সুদের ব্যবসা। রানু নামের এক কিশোরী জন্মকাল হইতে তাহার বিকট চেহারাকে ভয় পাইত... মোটামুটি এই কায়দায়, যেন কাহিনীটা আমার থেকে কত দূরের। কোন কালে, কার আমলে এসব ঘটনা ঘটেছিল, সে সব বিষয়ের অন্তঃস্তলের বেদনা থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে নির্বিকার বলে যাই, এই রকম খোলাপথে বেদনা নয়, কষ্ট নয়, বিস্মৃত হও নীনা, তোমার গতকালকার পৃথিবীর কথা।

রিকশা কখন ইডেন কলেজ পেরিয়ে পুরনো ঢাকার ঘিঞ্জির মধ্যে প্রবেশ করেছে বলতে পারি না। ভীষণ সরু রাস্তা। দু'পাশে ক্ষয়িষ্ণু প্রাচীন বাড়িগুলোর ভেতর দিয়ে যেতে যেতে অদ্ভুত এক ধরনের মজা অনুভব করি। যদিও সীমাহীন বদ্ধতা, কিন্তু প্রাচীনতার মধ্যে এক ধরনের রোমাঞ্চ আছে, যা পুলকিত করে। এদিকে আমার আসা হয় না কোনোদিন। বড় আশ্চর্য লাগে, জানালা আর এক চিলতে আকাশ ছাড়া ভেতরের মানুষগুলো বেড়ে ওঠে কীভাবে ?

সব শুনে ইরফান চাচার স্বরে অকপট বিস্ময়— নৃশংস! এরচে' হত্যাকাণ্ড অনেক পবিত্র। লোকটি, মানে মজুমদারও এক ধরনের নিপুণ হত্যাকারী। অভিনব তার পন্থা। খুব গম্ভীর দেখায় ইরফান চাচার মুখ। ঘটনাটা গভীরভাবে তাঁকে নাড়া দিয়েছে বোঝা যায়।

তিনি বলেন, এ প্রসঙ্গে আমার একটি তুলনা মনে আসছে। দস্তয়েভস্কির সময়কার এক ধরনের হত্যাকাণ্ডের কথা। একদল হত্যাকারী ঘিরে রেখেছে শিশুসহ মাকে। তারা শিশুটিকে মারার এক বিচিত্র কৌশল বের করেছে। প্রথমেম আদর করে শিশুটিকে তারা হাসাতে চেষ্টা করে, শিশুটি হাসে। ঠিক সেই মুহূর্তে হত্যাকারী শিশুর মুখের খুব কাছে পিস্তল তুলে ধরে। তারপর পিস্তলটা যথারীতি নেয়ার জন্য হাসতে হাসতে শিশুটা হাত বাড়ায়। ঠিক সেই মুহূর্তে তাকে গুলিবিদ্ধ করা হয়। একে বলা হয় পাশবিক নিষ্ঠুরতা। কিন্তু সেই যুগে এর বিশ্লেষণ ছিল অন্যরকম। পশুরা এমন শিল্পকৌশলমণ্ডিত হত্যা করতে পারে না। অমন ভয়ানক নিষ্ঠুরতা কেবল মানুষের পক্ষেই সম্ভব। বলতে বলতে ঝিম মেরে যান তিনি এবং আমিও কেমন থিতিয়ে আসতে থাকি। কোনো মানে ছিল না আজ এই প্রসঙ্গ তোলার। আজ বেহিসেবি বেরিয়ে পড়েছি। অসহনীয় হয়ে উঠেছে জীবনের রূঢ়তা। প্রতিদিনকার শ্বাসরুদ্ধকর বন্দিত্ব।

তিনি বলেন, ঠিক আজকে এমন উন্মুক্ত একটা অবসরের দিনে এসব প্রসঙ্গ ওঠায় তোমার খারাপ লাগছে হয়তো, একজন মানুষ হঠাৎ একটা দিনকে আনন্দময় করে তুলতে চাইলে সাধারণত এমনটা মনে হতেই পারে। কিন্তু নীনা, আমি অভিজ্ঞতা দিয়ে জেনেছি, নিজের কাছ থেকে পালিয়ে একটি মুহূর্তের জন্যও মানুষের পক্ষে সুখী হওয়া সম্ভব নয়। যদি সুখী হতে চাও, তাহলে দুঃখকে মাঝে মাঝে বুক থেকে হাতের মুঠোয় নিয়ে নাও। তারপর তাকে সেই হাতের মধ্যে নেড়েচেড়ে পাশাপাশি বুকের মধ্যে জায়গা করে দাও আনন্দকে। তাতে করে আনন্দের গভীরতা বাড়ে। কিন্তু একদিনের জন্য দুঃখকে সমূলে সরাতে চেয়েছ তো আনন্দের ভানই হবে সার। সত্যিকার আনন্দ কিছুতেই পাওয়া যাবে না।

আমি যদি বলি, আপনি নিজেই তো সে কাজটি করছেন, আনন্দের ভান করে নিজের কাছ থেকে সারাক্ষণ পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, তাহলে? আচমকা এমন ধারণা তাঁর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে আমি অস্বস্তি এড়াতে সরু গলিগুলো দেখতে থাকি। ডানে-বাঁয়ে মানুষের প্রচণ্ড ভিড়ের ফাঁকফোঁকড় দিয়ে ধীরে ধীরে এগুচ্ছে রিকশা। সামনেই একটা বিশাল ভঙ্গুর বাড়ি। জায়গায় জায়গায় ইট ঝুলে পড়েছে। দেয়াল ফুঁড়ে উঠেছে অসংখ্য বটের চারা। নিশ্চিত মনে হয় ইটের স্তূপ আকাশ ছুঁয়েছে। এবং এ বাড়িতে কোনো সিঁড়ি নেই। মাথা কাত করে অবাক হই। প্রায় চূড়োয় একটা জানালা এবং তাতে পর্দা টাঙানো। ওখানেও মানুষ থাকে? আসলে মানুষের পক্ষেই সব সম্ভব, কথাটা নতুন করে মনে হয়। লাইটার দিয়ে সিগ্রেট ধরিয়েছেন তিনি। ধোঁয়া উড়িয়ে বলেন, তুমি নিশ্চয়ই আমার সংসার আর স্ত্রীর সাথে আমার সম্পর্কের ব্যাপারটাকেই আকারে-ইশারায় বোঝাতে চেয়েছ?

এবার আমার মুখে তালা। আরেক প্রস্থ ধোঁয়া ছেড়ে তিনি বলেন, কিছু ব্যাপার আছে যা কিছুতেই কাউকে বলে বোঝানো যায় না। আমি আমার কোনো ব্যাপার কারো কাছে তুলে ধরায় অভ্যস্ত নই। আমার শুভাকাঙ্ক্ষী প্রচুর। কিন্তু তারা কেউ কোনোদিন আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারের একাংশও জানতে পারে নি। আমি দাবি করছি না আমার এই অভ্যাসটা খুব ভালো, সব জায়গায় গ্রহণযোগ্য।

দুঃখিত, আমি বলি। আমার কৌতূহল সম্ভবত অভদ্র রকমের।

অত ভদ্রতা করো না— তিনি বলেন, বিনয় তোমার মধ্যেও কম নেই। রিকশা এসে থামে সোওয়ারি ঘাটের কাদা-জলে থিকথিকে রাস্তার মধ্যে। সামনেই সুবিশাল বুড়িগঙ্গা।

ঢাকার এত কাছে একটা নদী। কোনোদিন এদিকে আসা হয় নি। মেঘ ফুঁড়ে রোদ উঠেছে। বড় তেজহীন, মায়াময়। ভাড়া চোকানোর পর সেই থিকথিকে রাস্তা পেরিয়ে ঘাটের কাছে দাঁড়াই। অসংখ্য নৌকা, গিজগিজ করছে মানুষজন। এত মানুষ, এত নৌকার ভিড়ে এই জায়গাটায় এসে নদী তার রহস্য হারিয়েছে।

এত প্রবল ঢেউ! ছোট নৌকাগুলো উত্থান-পতনের মধ্যে আন্দোলিত হচ্ছে বেশ। পাশাপাশি উদ্দাম হাওয়া। আমি বেশ চমৎকৃত হই। কিন্তু মগ্ন মুডটাকে নষ্ট করে দেন ইরফান চাচাই। বলেন, অত স্রোতের মধ্যে নৌকায় ওঠাটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে। চলো, অন্য কোথাও যাই। আমার ঠোঁটে উত্তর তৈরিই ছিল। সামনে এমন বিস্তৃত জল। তাতে অবগাহন না হোক, তার বুকে নৌকোয় চেপে একটু বিহারও করতে না পারার অতৃপ্তি নিয়ে ফিরে যাব, কোনো মানে হয়? বলি, এই প্রথম বোঝা গেল আপনার বয়স হয়েছে। এ বয়সে কারো পক্ষে কোনো ঝুঁকি নেয়া সম্ভব হয় না।

কেমন তেতে ওঠেন তিনি, তুমি কি আমাকে বালক ভাবতে শুরু করেছিলে? তা ছাড়া বোকার মতো হঠাৎ কোনো কিছুতে ঝুঁকি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া, তারুণ্যের এরকম ধর্মকে কোনো ম্যাচ্যুর্ড লোক সাপোর্ট দেবে?

সাপোর্টের ধার তো তরুণরা ধারে না, তাঁর ক্রোধ আমাকে রোমাঞ্চিত করে, বলি, অবশ্য সব তরুণের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য বলে আমি মনে করছি না। কিছু তরুণ আবার জীবনের সবতাতেই অত্যন্ত হিসেবি। অবশ্য প্রেমের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় হিসেবকে জলের তোড়ে ভাসিয়ে দিলেও হিসেবটা তাদের নির্ভুল থাকে বিয়ের ক্ষেত্রে।

তুমি কি তোমার নিজের জীবনের দৃষ্টিকোণ থেকে কথাগুলো বলছ? তিনি রহস্যময় ভঙ্গিতে প্রশ্ন করেন।

না, আমি এবার স্বরে দৃঢ়তা এনে বলি, কেন না বোঝার ভান করছেন?

একটা ডিঙি নৌকা কাছে এগিয়ে এলে আমাকে ওঠার জন্য ইশারা করেন তিনি। লাফ দিয়ে উঠে পড়ি তাতে। তারপর তিনিও। সার সার নৌকার ভিড় ঠেলে এক সময় সেটা মুক্ত জলের ওপর গিয়ে পড়ে। জলের ঠাণ্ডা স্পর্শ... টের পাচ্ছি... এবং বাতাস... আহ্ কী চমৎকার দোলা!

তোমাদের ডিভোর্সটা কার পক্ষ থেকে হয়েছিল? খুব সন্তর্পণে তিনি এই প্রশ্নটা করেন। মূল প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাচ্ছেন দেখে ভেতরে ভেতরে বেশ বিরক্ত হয়ে উঠি। যাকগে, কেউ এমন অপমানজনকভাবে কিছু এড়াতে চাইলে আমিই-বা কেন গায়ে পড়ে আগ্রহী হয়ে উঠব?

কিন্তু এই প্রথম এতদিন পরে তিনি আমার দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলেন। আমি টের পাই, বড় নাজুক বিষয়, বিশেষ করে কাউকে এসব বলা। কোনো মানে হয় না। কিন্তু এই খোলা আকাশ, অবিশ্রান্ত ঢেউ... ইচ্ছে হচ্ছে খুলে ধরি, সব, বেরিয়ে যাক, সব পাপ, সব গ্লানি, তিতকুটে বোধ, যুক্তি দিয়ে বোঝাতে না পারি, অনুভব দিয়ে যদি সম্ভব হয়? কাঁধে একটা ব্যাগ ছিল। তার ভেতর থেকে চিপ্‌সের প্যাকেট বের করে তিনি বলেন, খাও।

আপনি ব্যাগে এসব রাখেন? ভারি মজার তো। প্যাকেট খুলে দাঁতের নিচে পাঠিয়ে দিই এক টুকরো। নির্লিপ্ত গলায় বলি, ডিভোর্স আমিই দিয়েছি।

কেন দিয়েছিলে?

সে-সব আপনাকে বোঝানো যাবে না।

বিয়েটা কি প্রেমের ছিল?

হ্যাঁ।

সংসার কতদিন করেছ?

জেরা করছেন কেন? দু'বছরের মতো।

এত তাড়াতাড়ি একটা মানুষকে চিনে ফেলেছিলে? যদি বলি, দাম্পত্য জীবন কী, তা না জেনে যেমন তুমি জীবন শুরু করেছ, তেমনি না জেনেই সেটা পায়ে মাড়িয়ে এসেছ? বিয়েটাকে নিছক ইয়ার্কি মনে করে...।

আপনি এসবের কতটুকু জানেন? ক্ষিপ্ত হয়ে উঠি আমি, কিছু না জেনে আপনাকে অমন মন্তব্য করার অধিকার কে দিয়েছে?

তিনি খুব নরম স্বরে হাসেন, তোমার বয়স খুব কম নীনা। সে-জন্যেই খুব দ্রুত উত্তেজিত হয়ে ওঠো। তুমি নিজেই চিন্তা করে দ্যাখো, কোনো ঘটনার অনেক দূরে দাঁড়িয়ে থেকে মন্তব্য করাটা কতটা বোকামির। হতে পারে ভেতরটা নোংরা, কিংবা সুন্দর, পরিচ্ছন্ন কিন্তু তার জন্য সবচেয়ে আগে দরকার মূল অবস্থাটি ভেতর থেকে পর্যবেক্ষণ করা। প্রেম এবং বিয়ের ক্ষেত্রে হিসেবের যে ফিরিস্তি তুমি দিয়েছ, খুবই সস্তা সেই দৃষ্টিকোণ, আমি তোমার কাছে তেমন বিশ্লেষণ আশা করি নি।

প্রচণ্ড শব্দ তুলে একটা লঞ্চ এগিয়ে যায়, ফলে ঢেউয়ের আঘাতে প্রচণ্ডভাবে দুলে ওঠে নৌকাটা। টাল সামলে কাত হয়ে পড়ি দু'জনই।

আসলে খোঁচাখুঁচি বন্ধ করলে আমাদের সম্পর্কটা আরো অপকট, সরল হতে পারে— আমি এবার সহজ পথে আসি, সেটা আমাদের দু'জনের জন্যই মনে হয় ভালো হবে। মানুষের প্রাণ ভরে কান্নার মতো অন্তত একটা জায়গা তো থাকতে হয়।

শোনো, তিনি হঠাৎ শুরু করেন, আমাদের দাম্পত্যজীবন কখনো সুখের ছিল না, সহজ করে বলতে গেলে প্রথমে এটাই বলতে হয়। এবং জটিলতায় না গিয়ে আরেকটা কথাও খুব সরল করে বলা যায়, তোমার মার সাথে আমি, শাদা অর্থে যাকে প্রতারণা বলি, তাই করেছি। কিন্তু দাম্পত্য জীবনের অ-সুখতার সাথে সেই ঘটনার তেমন অর্থে কোনো সম্পর্ক নেই।

চিপ্‌স চিবুচ্ছি। জলের চঞ্চলতা দেখছি। বাতাস এড়িয়ে কৌশলে সিগ্রেট ধরান তিনি— কিন্তু সে ঘটনা নিয়ে আগেও বলেছি, আমার কোনো অনুতাপ নেই। তার সাথে আমার সম্পর্ক অনেক গভীর ছিল এবং পুরোটাই ছিল বয়সের একটা মায়া বা মোহ যা-ই বলো। এক সময় তা থেকে বেরিয়ে নিজেকে বিশ্লেষণ করি। তোমার মা'র স্বপ্ন ছিল একটা ঘর, বারান্দা আর বাগানের মধ্যে সীমিত। পৃথিবীর আর কোনো বিশালতা, সৌন্দর্য সম্পর্কে তার জ্ঞান বা আগ্রহ কোনোটাই ছিল না। ছোট ওই বৃত্তের বাইরে কখনোই তার চিন্তা পাখা মেলত না। আমার কোনো শৌখিন জিনিস কেনা, দুর্লভ জিনিস সংগ্রহ করা, ভ্রমণের নেশা— এসব কিছুই তার বাজে খরচ বলে মনে হতো। তিক্ততা কিংবা অনীহা প্রেম নষ্ট করে দেয়। আমি, বুঝলে, এক সময় হাঁপিয়ে উঠতে শুরু করি, বুঝতে পারি, স্ত্রীকে আসলে আমি বন্ধু হিসেবে পেতে চাই। শুধু সামাজিকতার কথা চিন্তা করে তাকে যদি আমি বিয়ে করি, তবে সেটা

তাকে করা হবে করুণা করে। আমি অন্তত তার ভালোবাসার প্রতি অশ্রদ্ধাশীল হতে পারি না। জানো, তখন এ নিয়ে নিজের সাথে অনেক যুদ্ধ হয়েছে। যুদ্ধ হয়েছে নিজের বিবেকের সাথে, অনুভবের সাথে, এক সময় এমন একটা সময় আসে, যখন আর পেরে উঠি না। পালিয়েই আসি বলতে গেলে। তোমার মা'র অদ্ভুত একটা মায়া জন্মেছিল। ঢাকায় এসে তাই ছটফট করতাম। তারও বেশ কিছুদিন পর একটা আর্ট একজিবিশনে আমার স্ত্রীর সাথে আমার পরিচয় হয়। যে সময়ের কথা বলছি, সে সময় ওরকম প্রদর্শনীতে মেয়েরা যেত না বললেই চলে। ওর চালচলন, প্রখর রুচিজ্ঞান— এসবের প্রতি আমি বেশ আগ্রহী হয়ে উঠি—

বলতে বলতে ইরফান চাচা থেমে যান।

আধপোড়া সিগারেটটা স্রোতের মধ্যে ছুঁড়ে দেন। খুব বিমর্ষ দেখায় তাঁকে। ফের শুরু করেন, এক সময় আমাদের বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের পর আমি ওর ভেতর এক ধরনের অসুস্থতা লক্ষ করি। ওকে বন্ধুদের আড্ডায়, খোলামেলা কোনো কোনো জায়গায় বা পার্কে নিতে চাইলে ওর মনে হতো ও সুন্দর বলে ওকে আমি সব জায়গায় প্রদর্শন করতে নিয়ে যেতে চাই। ফলে ও আমার সান্নিধ্য এড়াতে শুরু করল। আলাদা বিছানা পাতল। আমার সাথে কোথাও যাওয়া, আমার বন্ধুরা এলে তাদের সামনে আসা, সব বন্ধ করে দিল। আমি ওকে ঘন্টার পর ঘন্টা বোঝাতাম এটা ওর একটা মনগড়া ভাবনা মাত্র। একে প্রশ্রয় দেয়া ঠিক না, কিন্তু ও নিজের জেদ অনড় আঁকড়ে থাকল। এক সময় মনে হলো, আমাকে হয়তো তার পছন্দ নয়, অথবা অন্য কিছু আছে যা আমি জানি না। তন্নতন্ন করে এর ভেতরের কারণ খুঁজতে শুরু করি। ও ছিল ওর বাবার একমাত্র মেয়ে। বিয়ের পর ও সেই সূত্রে বেশ সম্পত্তির অধিকারী হয়। এবং বিশ্বেস কর, এই সম্পত্তির ঘটনাকে ঘিরেই ওর মধ্যে একদিন লক্ষ করি তীব্র আত্মঅহঙ্কার, সেই সাথে শ্লেষের বিষ-মাখানো কথার বাণ, যা ও সোজা ছুঁড়ে দিয়েছিল আমার দিকে। বলেছিল, তুমি শুধু আমার জন্য আমাকে বিয়ে কর নি। আমার যদি সম্পত্তি না থাকত, আমি যদি নিঃস্ব হতাম, নিশ্চয়ই তুমি আমাকে বিয়ে করতে না। এসব নিয়ে কতদিন কত দুর্বহ তর্কবিতর্ক! নীনা, তোমাকে কী বলব, তখন কী দুঃসহ দিন যে গেছে! অনেক পরে ও আমাকে বলেছিল, আমি যাকে খুশি বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। যার সাথে ইচ্ছে থাকতে পারি শুধু যেন স্ত্রী হিসেবে ওকে এ বাড়িতে থাকার মর্যাদা দিই। নইলে ওর বাবার বাড়িতে ওর মুখ থাকবে না।

তবে বিয়ে করেছিলে কেন ? ক্রুদ্ধ গলায় জানতে চেয়েছি।

বিয়েটা সামাজিকভাবে অপরিহার্য তাই। তারপরও ওর সে কী কান্না! কান্নার গমক বুকে চেপে রেখেই বলে চলে, ও যখন কিশোরী, তখন থেকেই একজনকে ভালোবাসত। আমার সঙ্গে বিয়ে হবার আগ পর্যন্তও সেই সম্পর্কটা অক্ষুণ্ন ছিল। তাকে ও স্বামী বলেই মনে করত। ওদের বাড়িতে যখন কেউ থাকত না, ছেলেটার সঙ্গে ও দৈহিকভাবেও মিলিত হতো। এইরকম উদ্দাম সম্পর্কের মুখে তাদের দু'জনের বিয়ের দিন-তারিখও পারিবারিকভাবে ঠিক হয়েছিল। কিন্তু ছেলেটা তার আগেই চুপচাপ দেশ ছেড়ে চলে যায় অস্ট্রেলিয়ায়। এবং সেখানে গিয়ে অল্পদিনের মধ্যেই বিয়ের কাজটি সেরে ফেলে। তার পরও ও তার সেই সাবেক প্রেমিকের জায়গায় অন্য কাউকে এখনো কল্পনা করতে পারে না, ঠাঁই দেয়াতো দূরের কথা। আসলে কী জানো নীনা, প্রতিটা মানুষের জীবনই ছবির নায়ক কিংবা নায়িকার মতোই ঘটনাবহুল, কোনোটা পাথরচাপা, কোনোটা প্রকাশ্য।

ইরফান চাচার মনের অর্গল যেন আজ খুলে গেছে। মনের এতদিনকার পাষাণ ভার যেন নামিয়ে ফেলতে চাইছেন পল কয়েকের ভেতরে। তাই বলে চলেন, এর মধ্যে আমাদের একটি সন্তান হয়। আমাদের সেই অসহ্য অস্বস্তিকর পরিবেশে কেমন অসহায়ের মতো সে বেড়ে উঠতে থাকে। তাই তার বয়স যখন সাত, আমি তাকে আমেরিকায় তার চাচার কাছে পাঠিয়ে দেই। তারপর থেকে আর কী, ঠেলাগাড়ির এই জীবন, ঠেলে যাও। অবশ্য, এসবের ফলে আমার লাভও হয়েছিল।

এবার তাঁর গলার স্বরে নিস্পৃহ অথচ একটা উৎসাহিত ভঙ্গি। মানুষ যেমন একদিকে বঞ্চনার শিকার হলে, অন্যকিছুতে আত্মসমর্পণ করে সেই বঞ্চনার ব্যাপারটা পুষিয়ে নেয়, আমার বেলাতেও তাই ঘটল। আমাকে পেয়ে বসলো শিল্পকর্ম আর প্রাচীন কিছু সংগ্রহ করার পাশাপাশি ছুটিছাটায় কোথাও ভ্রমণের প্রবল নেশা। কিন্তু জানো নীনা, সত্যি বলতে কী, ওরকম অবস্থাতেও তোমার মার সঙ্গে আমার সম্পর্কের ব্যাপারটা নিয়ে আমার কখনোই কোনোরকম আফসোস বা অনুতাপ হয় নি। আমি একটিকে আরেকটি ব্যাপারের পরিপূরক ভাবতে পারি না। আমার জীবনের জন্য দু'জনের কেউই প্রযোজ্য ছিল না। কেননা এই মহিলাকে বিয়ে না করে যদি তোমার মাকে করতাম, তখনো তো জানতাম না আমার পরিণতি এই হবে, ফলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াতো, তার সঙ্গে আমার জীবনের যে সূচনা হতো, দু'দিন না যেতেই তাকেও একঘেয়ে, ক্লান্তিকর আর বস্তাপচা মনে হতো। মাঝখান থেকে তোমার মা'র জীবনটা দুর্বিষহ হয়ে উঠত। ভালোই হয়েছে, তাকে ঘেঁটে নষ্ট করি নি। তার অকৃত্রিম ভালোবাসা, অদ্ভুত সারল্য— এগুলোকে আমার নিজের জীবনের পরম সঞ্চয় বলে মনে হয়।

কেমন কষ্ট লাগছে। বুকের ভেতরটা খচখচ করছে। স্থির চেয়ে থাকি নদীর দিকে। হঠাৎ তিনি ঘোর থেকে যেন জেগে ওঠেন, ছোপ ছোপ প্রসঙ্গের ভেতর থেকে ঘাই দিয়ে তোলেন তর্জনী, নীনা, ওই দেখো নবাব বাড়ি। আমি তল থেকে উঠি, দেখি, গোলাপি, পুরনো অভিজাত নবাব বাড়ি। নদীর পাশ ঘেঁসেই। কানে বেজে ওঠে ঘুঙুরের শব্দ। শরাবের বোতলের টুংটাং। হেঁটে আসছেন নবাব, শব্দ পাই। গোলাপি ঘোরে অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করি... চমৎকার! ইরফান চাচা হাসেন, চমৎকার বলছ তো। এরাই মানুষকে মানুষ মনে করত না। গর্ভবতী মায়ের পেটের সন্তান ছেলে কি মেয়ে, এমন বাজি ধরে জমিদারেরা তার পেট কেটে নিজেদের কথার সত্যতা যাচাই করেছে... আরো কত যে নিষ্ঠুরতা! অথচ আজ বলছি চমৎকার। আমি সমস্ত ছায়া ছিন্ন করে ঘোর থেকে বেরিয়ে আসি, বাদ দিন তো এসব।

এক জীবনের গল্প বিশ মিনিটে সেরে ফেললাম— ইতস্তত করে আবার তিনি আগের প্রসঙ্গে, ঠিক এজন্যই বলতে চাই না। বড় ওপর দিয়ে যায় সবকিছু। পুরো ব্যাপারটা নিছক গল্পে পরিণত হয়। শ্রোতার মন যত নাজুকই হোক, প্রতিদিনের সূক্ষ্ম জীবনপাত, অনুভূতির গাঢ়তা কিছুতেই তাকে স্পর্শ করানো যায় না।

আমি ফিরে আসি মূল প্রসঙ্গে, কিন্তু আমি যেদিন প্রথম আপনার বাড়িতে যাই, চাচির কাছে আমার পরিচয় দিই, জানেন, মার কথা শোনার পর সেদিন অদ্ভুত এক ভাবান্তর লক্ষ করেছিলাম তাঁর মুখে। এটাও তো হতে পারে যে, তাঁর সম্পর্কে আপনি যা ভাবছেন, সেটা ঠিক নয়। আপনার ব্যাপারে নির্বিকার হলে তিনি মাকে ঈর্ষা করতেন না।

তিনি বলেন, সেটা তোমার দেখার ভুল হতে পারে। নিশ্চয়ই তোমার মন তৈরি ছিল ওই প্রসঙ্গটি এলে আমার স্ত্রী কিছুটা বিচলিত হবে, এই রকম ভাবনায়।

আমি প্রতিবাদ করি, আপনি কেন ভাবছেন সেই ত্রিশ বছর আগের একজন মহিলার এত বছর পরও কোনো রকম রূপান্তর হয় নি? হতে পারে দীর্ঘ বছরের ব্যবধানে তিনি সব বিষয়ে সহজ হয়ে এসেছিলেন। আপনিও-বা কেন জেদ ধরে পড়ে থাকলেন? তাঁর পরবর্তী অবস্থার কোনো খোঁজ নিলেন না কেন? আমি বলতে চাইছি, আপনার পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোনো চেষ্টা ছিল না কেন?

দেখো— তিনি বলতে থাকেন, সে আমাকে তার সব কথা জানিয়েছিল বলেই যে তার সাথে আমার সব সম্পর্ক চুকেবুকে গিয়েছিল, সেটা কেন ভাবছ? আমরা প্রতিদিন এক টেবিলে খেতে বসি। এই দীর্ঘ জীবনে তার ঘরে বেশ কয়েকবার রাত যাপন করেছি, কিন্তু সেটা ছিল নিতান্তই শাদামাটা জৈবিক চাহিদা থেকে। সঠিক অর্থে, নিস্পৃহতা ছাড়া তার মধ্যে প্রাণ ছিল খুবই কম।

আপনি কী করে ভাবছেন এই দীর্ঘ বছরেও তাঁর মধ্যে কেবল নিস্পৃহতাই সঞ্চিত ছিল? হতে পারে সেটা আপনার ভাবনা। পরে তার ভেতরকার পরিবর্তনের কোনো খোঁজ নিয়েছেন কখনো? হতে পারে আপনাকে তিনি যা কিছু বলেছেন, সে জন্য আজীবন তাঁর ভেতরে জড়তা থেকে গিয়েছিল, যেটাকে আপনি ঘৃণা বলে মনে করছেন? বলে আমি তাকাই মহাশূন্যের দিকে। তরঙ্গিত নদীর ওপর আকাশ নেমে এসেছে। দুপুর গড়াচ্ছে। বরিশাল টু ঢাকার বিশাল লঞ্চগুলো অনড়, এক ঠায় দাঁড়িয়ে। ইরফান চাচার আঙুলের নির্দেশে ঘাটে নৌকা ভেড়ে। আমি দেখি, গোলাপি নবাব বাড়ি ডুবে আছে জলে।

নীনা, তিনি আবার শুরু করেন, আসলে যুক্তি আর তর্ক দিয়ে মানুষের অনুভূতি কিংবা বিশ্বাস এসব কিছুই বোঝানো যায় না। আমি এর মধ্যে আছি, দেখছি প্রতিদিন, তোমার কথা হয়তো ঠিক, ওর ভেতরকার পরিবর্তনের কোনো খোঁজ হয়তো আমি নিই নি। কিন্তু পরিবর্তন হলে, তাকে স্পর্শ করে তা টের পাব না, আমার ইন্দ্রিয়কে আমি অত দুর্বল মনে করি কী করে?

কাদা থকথকে ঘাট। সামনে ঘিঞ্জি নৌকার সারি। মাছের আঁশটে-পচা ঘ্রাণ! ঝিরিঝিরি বৃষ্টি নামতে শুরু করেছে। দু'তিনটে নৌকায় পা রেখে লাফিয়ে ঘাটে উঠি। কাদা, জল আর আবর্জনার স্তূপে পুরো ঘাট ঠেসে আছে। দুটো বাঁশ কাদা থেকে এক ফুট ওপরে আড়াআড়ি শোয়ানো। শুকনো জায়গায় গিয়ে তার মাথা ঠেকেছে। ভীষণ সাবধানে ধীরে পা ফেলে পার হই। এত বিচিত্র মানুষের সমাবেশ। ঘামের ভ্যাপসা বদ্ধতা। জায়গাটা পার হয়ে রিকশার কাছে এসে তিনি প্রশ্ন করেন, এবার মনে হয়, আমাদের খিদে লাগা উচিত, এখানকারই কোনো হোটেলে বসি, কী বলো?

এ হলো গিয়ে জা-গ-তি-ক কিংবা মৌলিক চাহিদা, এর কাছে এসে বাঘের মতো মনও ইঁদুর হয়ে যায়, চলুন... বলতে বলতে রিকশায় চেপে বসি। আবারো ঘুপচি গলিঘুজি। মৃদু বৃষ্টিপাতের ফলে মাথার ওপর হুড তুলে দিয়ে দু'জোড়া পা থেকে বুক পর্যন্ত অয়েলক্লথে ঢেকে নিতে হয়। বৃষ্টিতে রিকশার সাইজ কি ছোট হয়ে গেছে? বড্ড অস্বস্তির এই ঠাসাঠাসি। নিঃশব্দে অনেক পথ— লক্ষ্মীবাজার, পাতলাখান লেন... হাজারো বাঁকের পাক

কষে এক সময় রিকশা এসে দাঁড়ায় স্টার হোটেলের সামনে। বিস্তৃত হোটেল, টানা প্যাসেজ ধরে হেঁটে এক সময় কেবিনে। তিনি শাদামাটা ভাত-মাছের অর্ডার দেন। আমাকে প্রশ্ন করেন, তুমি ? চিন্তা না করেই বলি, মোরগপোলাও। বলেই মনে পড়ে, আ-হ্য কতদিন খাই নি এবং এই বোধ মুহূর্তে আমাকে বিমর্ষ করে তোলে। বাসায় এসব হয় না। অফিস থেকে ফিরে সবজি কোটো, ভাত চড়াও... কী যে অসহ্য লাগে! ডিম ভাজি কিংবা ভর্তা দিয়েই চলে বেশির ভাগ সময়।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা। এক সময় ব্যাগ থেকে তিনি সোনালি রঙের একটা ফটোফ্রেম বের করে আনেন, তাতে ঝাপসা শাদাকালো একটা ছবি। বলেন, এই যে এটা দেখছ, অনেক দিন ধরে আমার কাছে পড়ে আছে। আমার সেই বয়সের আবেগের ফসল, যখন তোমার মা'র সঙ্গে আমার সম্পর্ক চলছে। ঠিক সে সময় তোমার মা'র একটি ছবি তুলেছিলাম। পরে ফ্রেমে সোনার পাত বসিয়ে বাঁধিয়েছিলাম। ঘাঁটতে ঘাঁটতে সেদিন বেরিয়ে পড়ল। তুমি কিছু মনে না করলে এটা তুমি তাকে দিয়ে দিতে পার।

এবার আমি উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর বিশাল এক বরফ-স্তূপের নিচে চাপা পড়ে যাই। সেই অবস্থায় কানে আসে পর্দার ও পাশের মহা-আড্ডাটা। কাপ পিরিচের টুংটাং। বলি, বুড়ো বয়সের আবেগ, বলতে লজ্জা পাচ্ছেন কেন ? আমার কথায় ভীষণ অবাক চোখে তিনি আমার দিকে তাকান, তার পুরো অবয়বে স্পষ্ট আহত ভাব। ফ্রেম হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখি। কেমন ফাঁকা হয়ে আসছে বুক। কী চমৎকার ভঙ্গি, বেণি ধরে হাসছে। আমার মা! এত মিষ্টি ছিল! কই, আমার স্মৃতির মধ্যে তো সেই মুখ নেই ? তবে কি বিয়ের পরপরই তিনি ভাঙতে শুরু করেছিলেন ? তিনি বলেন, আমি যতদূর জানি তুমি অত রক্ষণশীল মেয়ে নও। মা'র সাথে তোমার সহজ সম্পর্ক। আমি কি কোনো ভুল করছি ?

হাসতে হাসতে বলি, ভুল একটা আপনার হয়েছে। আপনি যদি এখন আমার এই বয়স্ক ক্ষয়িষ্ণু মাকে দেখেন, তবেই বুঝবেন। আমি নিশ্চিত এখন তিনি ছবিটা ফেলে দিয়ে, ফ্রেমটা বিক্রি করে দেবেন।

তাঁর মুখ নীলবর্ণ হয়ে ওঠে। স্থির বসে থাকেন কিছুক্ষণ। এই ফাঁকে খাবার আসে। স্পষ্ট দেখছি, মরাটে আঙুলের নিচে জল হয়ে গেছে ভাতের দানাগুলো। চেয়ে থাকি। পুরো ঘটনার একটা বিশ্রী প্রতিক্রিয়া চলছে আমার ভেতরে। মা'র প্রতি ঈর্ষায়, না-কি ক্ষোভে... ভেবে পাই না, ভেতরটা বিষিয়ে উঠছে।

খাওয়া শেষে রুমাল দিয়ে হাত মুছতে মুছতে শান্ত স্বরে বলেন, নীনা, আক্রমণ করার অস্ত্র ভেতরে মজুত থাকলেই সব অস্ত্র ব্যবহার করতে নেই।

সবই তো স্পষ্ট করে বোঝেন, আমি কেমন কঠিন হয়ে উঠি, তাহলে আর অল্প বয়সের আবেগ বলছেন কেন ? বলুন এখনো আপনি মাকে ভালোবাসেন ?

আমি বুঝছি না তুমি খেপে উঠছ কেন ? তাঁর এই কথার ধাক্কায় যেন সংবিৎ ফিরে পাই। নিজেকে সহজ করে হাসি, খেপে উঠলাম কোথায় ? আপনাকে একটি সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করাতে চাইলাম। দুঃখিত, আমার প্রকাশটা হয়তো খুব রূঢ় হয়ে গেছে।

নীনা, দিন ফুরিয়ে এসেছে। এখন আর কিছুই ঘাঁটতে ভালো লাগে না। এছাড়া আমার কিছু বলার নেই, বলে গম্ভীর হয়ে যান তিনি।

মাথামুণ্ডু না বুঝে আবার রিকশায় চেপে বসি। দীর্ঘপথ জুড়ে কী নিঃশব্দ অস্বস্তি! সেটা দূর হলে বড় মর্মান্তিক হয়ে উঠতে থাকে একটা দুর্মর লজ্জাবোধ। এক সময় তিনি বলেন, বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে। শোনো, একটা ছোট গল্প বলি— প্রাচীন দুই ঋষির মধ্যে তর্ক হচ্ছিল। একজন প্রশ্ন করেন, পৃথিবীতে কোন নারী সবচেয়ে সুন্দর? অন্য ঋষি উত্তর দিয়েছিলেন, যে নারীর মুখ পথশ্রমে ক্লান্ত নয়, সে কখনোই সুন্দর নয়।

শুনে কেমন আপ্লুত হয়ে পড়ি! অদ্ভুত, আপনি জানেনও বটে!

এই তো হাসি ফুটেছে... বলে হা-হা শব্দে তিনি হাসতে থাকেন। মুহূর্তেই তাঁর কাছে আমি শিশুতে রূপান্তরিত। আমার জীবনের একটা অদ্ভুত কষ্টময়, আনন্দময়, যন্ত্রণাময়, স্মৃতিময় দিনের অবসান ঘটে।

এরপর থেকে শুরু হয় আমার চূড়ান্ত অর্থকষ্টে দিন যাপনের পালা। বেশ কিছুদিন পালিয়ে বেড়ানোর পর আবারো হলে ফিরে এসেছে আরেফিন। তার হাইস্কুল এয়ারপোর্ট পেরিয়ে সেই কোন আজমপুরে। টেম্পো, বাস শেষে পায়ে হেঁটে সেখানে যেতে প্রতিদিন বেশ ঝক্কি পোহাতে হচ্ছে তাকে। আমার কাছে এলে আমি পাঁচ শ' টাকা দিয়ে আর দিতে না পারার অপারগতা প্রকাশ করি। সে বেশ বিমর্ষ হয়ে পড়ে। এদিকে বাড়িতে টাকা পাঠাতে না পারার একটা ভয়ঙ্কর চাপ তো আছেই। বাড়ি ভাড়া, লোন শোধ— এই করে করে আমার এখন প্রায় ঝাড়া হাত-পা অবস্থা। অফিসে সারাক্ষণ কেমন থিতিয়ে থাকি। অফিসে আবারো চাপা উত্তেজনা শুরু হয়েছে। কেউ ঠিক মতো কাজ করছে না। পুরনো বিদ্রোহ চাগিয়ে উঠেছে। বস্ মহাক্ষিপ্ত। আমিও তা-ই চাই। একটা কিছু হসফসের পর যদি কিছু টাকা বাড়ে! কিন্তু উল্টোটা যদি হয়? কারো মধ্যে কোনো একতা নেই। আবার ভাবি, যদি সমূলে উৎপাটন করে সবাইকে! কত লোক দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। স্রেফ অফিসের খরচ বাদে যদি তিনশ টাকাও থাকে, তবুও একটা চাকরি চাই। চেয়ার ভরতে এক ঘণ্টা সময়ও লাগবে না। ভাবলেই কেমন জ্বর-জ্বর লাগে। মুখ-কান বুজে উবু হয়ে থাকি টেবিলে।

টেবিলে মুখ গুঁজলেই আমি আন্তর্জাতিক মানুষ। অফিসে কুয়েত দখল, বুশ, সাদ্দাম প্রসঙ্গ এখন ডাল-ভাতের মতো ব্যাপার। কিন্তু প্রতিদিনের অসংলগ্ন হেড লাইন আমাকে হিম করে তোলে : 'মার্কিনের বোমা বর্ষণে মসজিদ, নার্সারি, হাসপাতাল ধ্বংস'; তারও আগে 'বুশ গর্ভাচেভের ব্যর্থ শীর্ষ বৈঠক', 'সৌদি মরুতে রক্তের নহর বইবে— ইরাক'। বিশাল পৃথিবীর এক প্রান্তের এই যুদ্ধে আমি সক্রিয় অংশীদার না হলেও, আমি যে তার বাইরেরও কেউ নই, তার প্রমাণ কুয়েত দখলের এই যুদ্ধের আলোড়নে আমি নিজের মধ্যে অস্থিরতা টের পাই।

এর মধ্যে রেজাউল আরেক দিন অফিসে এসেছে। বহু ভান-ভণিতার পর একই প্রসঙ্গ। আমি আমার স্থির সিদ্ধান্ত থেকে যাতে নড়ি, তার জন্য প্রচুর আকুতি। বলে, ভেবে দেখলাম, ফুটো পয়সার মায়া করে জীবনটাকে জঘন্য করে তোলার কোনো মানে নেই। চাকরির পর আরো কিছু চেষ্টা করতে হবে, পার্টটাইম যদি কিছু করা যায়। এবং নিজেদের বিনোদনের জন্যও কিছু খরচের বাজেট রাখা দরকার।

লোভ দেখাচ্ছ? বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করি, তুমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছ?

সে বলে, কোনোদিনই তোমার কিছু সহজ করে দেখার অভ্যাস নেই। তুমি জেদ ছেড়ে দিয়ে একবারের জন্য একটু সহজ হয়ে দেখো, আমাদের ভুলগুলো আমরা শোধরাতে পারি কি-না।

আমাদের কারো কোনো ভুল ছিল না, আমি বলি, আমি কোনো ভুলের কারণে সংসার ছেড়ে আসি নি। তুমি এমন লেগেছ কেন আমার পেছনে? একা রান্না করে খেতে কষ্ট বলে? আমি তো এখন চাকরি করছি, রান্নাবান্না করা তো এখন সম্ভব নয় আমার পক্ষে।

দেখো, একটু কঠিন শোনায় রেজাউলের স্বর, রান্না করার জন্য শহরে অনেক ঝি-চাকর আছে। পয়সা ছিটালেই আসে।

ওই পয়সা ছিটানোতেই তো তোমার সমস্যা। দেখো রেজাউল, আমি এইসব স্থূল ব্যাপার নিয়ে তোমার সাথে বুলি কপচাতে চাই না। একটা সহজ সিদ্ধান্ত শুনে নাও, তুমি আমার সাথে পরিচয় রাখতে পার, যোগাযোগ রাখতে পার যত খুশি, তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু যে খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসেছি, তাতে আমি আর ঢুকছি না।

এর পর পরই শুরু হয় তার চাপা গজগজ— আমার মনোভাবের জন্যই নাকি তার এই পতন, বাইরের দুনিয়ার মজা টের পেয়ে গেছি, আমার আসল স্বভাবই এই, সংসারে থাকতে ভড়ং করেছি। শেষে প্রখর গলায় যখন তাকে শাসাই, এটা অফিস, এটুকু সচেতনতা তার থাকা উচিত তখন সে তার জায়গা থেকে না সরে দাঁড়িয়ে বলে, একদিন বাসায় যাবে। সব ব্যাপারে খোলামেলা কথা হওয়া দরকার। সংসারটাকে খাঁচা মনে করলেই বন্দিত্বের প্রশ্ন। এরকমের চক্র থেকে আমার বেরোনো দরকার। সে তো অন্য একটা বিয়ে করেও ফেলতে পারত, তা-না করে আমার কাছেই আবার ফিরে আসতে চাইছে, আমার বোঝা উচিত... এইসব বলেটলে সে চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়ায়। একবার পেছন ফিরে আমাকে দেখে। তারপর সত্যিই চলে যেতে থাকে।

তার অপসৃমান ছায়ার দিকে তাকাতেই আমার দৃষ্টির সামনে এগিয়ে আসে নগ্ন রেজাউল... গা ঘুলিয়ে সেই বিচিত্র চিন্তাগুলো আসে... মানুষের শয্যার আচরণ হুবহু পশুদের মতো। আমি রাস্তায় নেড়ি কুকুরদের দেখেছি... হুবহু সেই আচরণ... ফাইলে প্রাণপণে মুখ ঢোকাতেই নিজেকে উদ্ভাসিত করে পাল্টা যুক্তি তৈরি হয়, এমনো তো ভাবা যায়, পশুদের আচরণ একদম মানুষের মতো...। এ আরেক ফ্যাসাদ। হাজারো কাসুন্দির চক্রাবর্তে বেশ অসহ্য ঠেকে। সে চলে গেলে আমার পেছনের সংসার সামনে এসে খাড়া হয়। খুঁটে-খুঁটে পরখ করি, কোথায় কতটুকু মায়া, কতটুকু ঘৃণা, সব মিলিয়ে আমার ভেতরে বেশ জবরজং অবস্থা তৈরি হয়। সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে শুয়ে থাকি বিছানায়। দুপুরে রুটি ভাজি গিলেছি। রাতে রান্না করে খাওয়ার কথা মনে হলেই শরীরের গ্রন্থিগুলো আলগা হয়ে আসে। তারপরও নিজেকে টেনেহেঁচড়ে ভাতের হাঁড়িতে আলু ছেড়ে দাও। তারপর আছে তেল-নুন...। মাঝে মাঝেই হাত পাততে হয় শানুর কাছে, সে আমাকে সহজ পথ বাতলে দেয়, একটা বিয়ে বসে ফেলো। মেয়েমানুষের একা জীবন যায়?

ছেলেতো আমার জন্য গলির মোড়েই দাঁড়িয়ে আছে— এই রকম হেঁয়ালি করে তাকে পাশ কাটাই। কী করে, কোন পথে জানি না, কিছুদিন ধরে কামাল ভাইয়ের আয়-উপার্জন বেশ একটু বেড়েছে। শানুও ইদানীং নিজেকে নিয়ে বেশ মশগুল থাকে। তার সংসারের

চিৎকার-চ্যাচামেচি কমেছে। শানুকে মাঝেমাঝে দুটো-একটা শাড়ি কাপড় উপহার দিয়ে, বাহারি রান্নাবান্নার আয়োজনে ব্যস্ত রেখে কামাল ভাইয়ের বাইরে রাত কাটানোর ব্যাপারটা বেড়েছে। আমি সেদিন কী যেন টুকটাক কিছু একটা করছি, এমন সময় শানু সন্তর্পণে আমার পাশে এসে দাঁড়ায়। তারপর বলে, শোনো, কামালের এক বয়স্ক চাচা ম্যালা টাকার মালিক, বউ মারা গেছে সেই কবে, তোমাকে বলছি, ঝুলে গেলে কেমন হয়? পুরুষের আবার বয়স! তা ছাড়া, তোমার জীবন তো আর দাগহীন শুদ্ধ তুলসী পাতা নয়। ভেবে দেখো। ভেতরে প্রচণ্ড রাগ হয়। ইচ্ছে করে ওর চুলের মুঠি ধরে ওকে আছড়ে মেঝেতে ফেলে দিই। কিন্তু সে ক্রোধ দমন করে আমি ওর কথার জবাব না দিয়ে নিজের কাজে মন দিই।

সেদিনের পর ইরফান চাচার সাথে আর যোগাযোগ নেই। আমিও যাচ্ছি না কী এক যন্ত্রণা থেকে। মানুষটার ব্যক্তিত্ব, শৌখিনতা, বয়স, স্বাচ্ছন্দ্য— সব মিলিয়ে আমার জন্য অদ্ভুত এক যন্ত্রণা যার মূল উৎস আমি খুঁজে পাই না। ফটোফ্রেম এনেছি ঠিকই; কিন্তু মার জীবনের এই পড়ন্ত বিবর্ণ বেলায় সেটা তাঁকে দেয়ার কোনো উৎসাহ খুঁজে পাই না। তাহলে পুরো ব্যাপারটাই অসম্ভব রূঢ় আর হাস্যকর হয়ে যাবে। এর মধ্যে দেখা দিয়েছে নতুন একটা উপসর্গ, পেটের বাঁ পাশে প্রায়ই ব্যথা হয়। সম্ভবত আলসারের, সহ্য করি। ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সাহস হয় না, অফিসে যাই। সবার প্রতিবাদে, অথবা নিঃশব্দতার ভেতর বড্ড নিশ্চুপ বসে থাকি। আমার সহকর্মীরা, সবাই যার যার আসনে, সামনের টেবিলের ওপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে দিয়েছে। এই বুঝি সেই গলার ওপরে সেঁটে থাকা মুখখানা হতাশায় ঝুলে পড়ল। তাদের কণ্ঠস্বর, অতি ব্যবহারে কিংবা আর্থিক কষ্টে বিবরণে যা সর্বদা নিয়োজিত, এই বুঝি ঝনঝন করে বেজে উঠল। অথবা নিজের ব্যর্থতা একঘেয়ে যন্ত্রণাকাতর জীবন ঢাকার প্রয়াসে এমন ঠাট্টায় মেতে উঠল, যা সেই বদ্ধ হাওয়াকে আরো গুমোট, অশ্লীল করে তুলল। সারাক্ষণ তাই ভয়ে ভয়ে থাকি।

তবুও আসে ওরা। বড়ুয়া বাবু, সুলতানা, কিবরিয়া সাহেব। মুখোমুখি বসে অফিসের অবস্থা পর্যালোচনা করে। আমাকে আবছায়া টোকা দেন, বস্ দেখি আপনাকে বেশি ডাকে না, কিছু হয়েছে?

ব্যাপারটা আমার সত্যিই লক্ষের মধ্যে নেই। ভদ্রলোক এমনিতে বেশি প্রয়োজন ছাড়া কাউকে সচরাচর ডাকেন না। আমি তাদের প্রশ্নের উত্তরে, কিছু হয় নি— বলে চুপ করে থাকি। তারা তখন এমন সব প্রসঙ্গে চলে যায়, যা কানে যাওয়া মাত্র আমি স্ট্রেইট স্ট্যাচু। — হ্যাঁ হ্যাঁ, ম্যানহোলে পড়ে গিয়েছিল, আমার চাচাতো ভাই, রাত করে বাড়ি ফিরছিল, বাসার সামনেই, ল্যাম্পপোস্টের বাল্ব ফিউজ দীর্ঘদিন ধরে, ঘুটঘুটে অন্ধকারে সোজা খোলা ম্যানহোলে...।

সে-কী! ক্রমশ আমার ভেতর উত্তেজনা বাড়ে, মারা গিয়েছে?— মৃত্যুটাকেই শুধু দেখলেন, বক্তা বেশ হতাশ হয়। হাত-পা ভেঙে শরীরে আছে কিছু? জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে গেল। সামনের এক পাটি দাঁতও থেঁতলে গিয়ে উঠে গেছে। সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম, এর চেয়ে মৃত্যু ভালো ছিল। এরপর প্রসঙ্গটা আমার টেবিল থেকে রুমের সর্বত্র ছড়িয়ে যায়। চোর ছ্যাঁচড়ের উৎপাত, সরকারি ল্যাম্পপোস্টের বাল্ব... এরকম বিভিন্ন ধ্বনি-প্রতিধ্বনি চারপাশে রেখে আমি আমার ফাইলে হুমড়ি খেয়ে পড়তেই বড়ুয়া বাবু আসেন। এসেই টিপ্পনী কেটে বলেন, কিবরিয়া সাহেবের চোখ ভালো না, একটু আঁচল টেনে থাকবেন।

মাথার ওপর কারো স্বামী নেই জানলেই ওর লালা ঝরতে থাকে! অসহ্য! ক্রোধে ঘৃণায় আমি নিঃশ্বাস আটকে বসে থাকি।

এক সময় ঠিকই বসের রুমে ডাক পড়ে। পরিপাটি চুল ধবধবে শার্ট, ক্লিনসেভড বসের মুখ ভীষণ নির্বিকার। অপজিটের টেবিলে বসে আমি ভাষা হারিয়ে ফেলি। এক সময় তিনি বলেন, আপনার টেবিলের পাশে প্রায়ই ভিড় লক্ষ করি। বেশ চাপা গুঞ্জন। আপনিও কি দল পাকাচ্ছেন নাকি ? ভেতরটা ধড়াস করে ওঠে। কিন্তু ঘটনায় সত্যতা না থাকলে আপনা থেকেই সাহস বেড়ে যায়। মাথা খাড়া রেখে তাই বলি, জি না স্যার, তারা এলে কথা না বলে যতটুকু সম্ভব এ্যাভয়েড করার চেষ্টা করি, এর পরও তারা আসে। আমি তো তাদের মুখ চেপে ধরতে পারি না।

তারা কী বলে, তা আমি জানতে চাইব না, বসের নিরুত্তাপ গলা। এরপর থেকে কথা বললে এ্যাভয়েড করবেন। কাজ ফেলে জটলা করা আমি সহ্য করব না।

তার রুম থেকে বেরোলে হামলে পড়ে সবাই, কী ব্যাপার, পার্সোনালি আপনাকে ডেকে নিল, কিছু হিল্লে হলো ?

টেবিলে বসে মাথা ঢুকিয়ে দিই ফাইলের মধ্যে। কিন্তু তাদের কৌতূহল অসহ্য রকমের। আমার টেবিলের পাশে দাঁড়িয়েছে কেউ কেউ, কী, কথা বলছেন না যে! আমার টেবিলের সামনে ভিড় করবেন না... আমি বলি, স্যার পছন্দ করেন না। এ কথার পর রুমের পুরো পরিবেশ থমথমে হয়ে ওঠে। সুড়সুড়িয়ে সবাই চলে যায় যার যার আসনে। এবং ধীরতালে শুরু হয় টিপ্পনীর বিভিন্ন রূপান্তর, চাকরিটাই কি সব ? সম্মানী লোকের সম্মান না থাকলে চাকরি ধুয়ে জল খাবে ? বসের চরিত্র জানি না ? আমরা মরি আমাশা, কলেরায়, মালিক তাকে এয়ারকুলার গাড়ি দিয়েছে। ঠাণ্ডা খেতে খেতে অফিসে আস, ঠাণ্ডা ঘরে বসে কী ছাইভস্ম কর, বুঝি না ? মালিকের দালাল। আর তার সাথে যদি মেয়েছেলে যোগ দেয়... কী আর বলব ভাই...মেয়েলোকের স্বামী মাথায় থাকলে তার থাকে এক ভাতার, স্বামীর ঘর থেকে বেরিয়ে এলে— দশ ভাতার! এরকম চলতে চলতে তার মাত্রা যখন চরমে, তখন কোনোদিকে না তাকিয়ে অফিস ছুটির পর সোজা ছিটকে বাইরে বেরিয়ে আসি।

মতিঝিল বাসস্ট্যান্ড থেকে গাদাগাদি করে বাসে উঠি। তারপর কনুইয়ের অশ্লীল গুঁতো, চুলে টান— এসবের মধ্যেই বাসের হাতল ধরে ওপরমুখী হয়ে সহ্যাতীত দাঁড়িয়ে থাকা। রোজকার ঘটনা এসব। এই এতদিনেও গা সওয়া হয় নি। মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে ওঠে। চারপাশে বাসের গর্জন, মানুষের কোরাস... দীর্ঘপথ। শাহবাগের মোড়ে জলের ফোয়ারা, খরখরে। থামতেই কিছু লোক নেমে গেলে হুমড়ি খেয়ে সামনের সিটের একাংশ দখল করি। প্রসারিত রাস্তা। অসংখ্য রিকশা, গাড়ি সামনে। নীলক্ষেতের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় আরেফিনের কথা মনে পড়ে, টিউশানির টাকায় হলচার্জ দিয়ে কী সব তোশক-বালিশ, চাদর কিনেছে। এ মাসে অতদূরে গিয়ে ক্লাস করানো, পাঁচশোয় যে কতটুকু রফা হবে, কে জানে! সায়েন্স ল্যাবরেটরির মোড়, উদ্‌ভ্রান্ত মানুষ উঠছে, নামছে। ঝিমিয়ে-পড়া বিকেল। গাড়ির ঢুলুনিতে চোখ বুজে আসে। ঝক্কর ঝক্কর... এরকম ঝাপসা আবেষ্টনের মধ্যে এক সময় শংকরের মোড়।

চারপাশে ঘিঞ্জি দোকান। ডানে মোড় নিতেই মসজিদ। তাকাতেই সেই স্বপ্নের কথা মনে হয়। পাদ্রিপ্রবর প্রশ্ন করছেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস কর ? এবং তারপরই এক অদ্ভুত ঘোরের

মধ্যে মনে পড়ে, একদিন পর আসার কথা ছিল ওমরের, আজ প্রায় এক হপ্তা ধরে তার পাত্তা নেই। আজব লোক! জাহান্নামে যাক, এমন ভাবনার পর আরো কিছু পথ। বাঁয়ে খোলা মাঠে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে কিছু ছেলে। একজনের লুজ ইলাস্টিক হাফপ্যান্ট বারবারই কোমর গড়িয়ে নিম্নগামী। বাঁ হাতে টানছে, ডান হাতে নাটাই। ওপরে খোলা আকাশে উড়ন্ত সবুজ ঘুড়ি। দাঁড়িয়ে থাকি। বেশ ফুরফুরে, সহজ হয়ে আসছে সবকিছু। ধীরে ধীরে শীত আসছে, খুব আলতোভাবে চামড়ার ভাঁজে ভাঁজে টের পাওয়া যায়।

পরদিন ছুটির আগমুহূর্তে দুর্মর ভঙ্গিতে ওমর এসে ঢোকে। পোশাকআশাকে আগের চেয়েও কিম্ভূতকিমাকার। শার্টের এক কোনায় তেলতেলে কালির স্পষ্ট ছোপ। এসেই বেশ সিরিয়াস গলায় বলে, উফ ক'দিন কী রাম খাটাই না খাটলাম! বুঝলেন, নিঃশ্বাস নেয়ার সময় পাই নি। প্রতিদিনই ভেবেছি। আপনি না জানি কত কিছু ভেবেছেন। মরমে মরেই যাচ্ছিলাম। সেই কবে আসব বলেছিলাম!

লোকটাকে অপমান করার জন্য সচেতনভাবে বলি, টেনশানের কোনো কারণ নেই। ব্যাপারটা আমি বেমালুম ভুলেই গিয়েছিলাম। তার চেহারায় দমে যাওয়া স্পষ্ট ভাব। নিঃশব্দে চেয়ার টেনে বসে। প্রশ্ন করি, ছোটভাই কেমন আছে?

কোনো চেঞ্জ নেই, বলে আবার সোৎসাহে শুরু করে, কী বলব, তাকে দেখার সুযোগ পেয়েছি আমি? গার্মেন্টিস, প্রেস, বাসা এই করে করে...।

আপনি কি গার্মেন্টিসে চাকরি করেন?

না, বি.এ পাশ করে কয়েক বছর ফ্যা ফ্যা করে ঘুরেছি। হপ্তাখানেক আগে আমার ছোটবেলার এক বন্ধুর সাথে দেখা। মহাধনী সে। গার্মেন্টিসের মালিক, দেখা হতেই অনেক কথা। আমাকে বলল, ও তার গার্মেন্টিসের প্যাড, ভিজিটিং কার্ড, টাইম কার্ড— এসব বাইরে থেকে ছাপায়। আমি তাদের সেসব কাজ প্রেস থেকে করিয়ে তার থেকে টুপাইস উপার্জন করতে পারি। ব্যস, পরদিন থেকেই লেগে গেলাম। সাহস করেছি পুরনো ঢাকায় একটি প্রেসের সাথে আমার দীর্ঘদিনের ভালো সম্পর্ক থাকায়।

লাভের কিছু টের পাচ্ছেন?

অত তাড়াতাড়িই কি সব হয়? সময় লাগে, সময়! তবে কাগজ কেনার সময় বেশ কিছু লাভ হয়েছে—এই আর কি! বন্ধুর গার্মেন্টিস না হলে কাগজের টাকা আপাতত আমাকেই বহন করতে হতো। সে খুব ভালো। আমার দুরবস্থা দেখে আমাকে একটা সুযোগ দিচ্ছে।

অফিস শেষে বেরিয়ে পড়ি তার সাথে। মাথায় হঠাৎ করে কড়কড়ে নোটের তাড়া ঘাই মারতে শুরু করে। অবশ্য ব্যাপারটা বাস্তবত হাস্যকর হলেও, একটা অদম্য কৌতূহল আমাকে পেয়ে বসে। তাই রিকশায় বসে ওমরকে জিগ্যেস করি, কাগজে কত প্রফিট হয়েছে, সে বলে, প্রথম অবস্থায় বেশি কাগজ কেনার অর্ডার পাই নি। বেশি কিনতে পারলে প্রফিট বেশি হতো, যেমন ধরুন— বারো রিম কাগজ যদি কিনি, তাহলে প্রতি রিমে পঁচিশ টাকার মতো রাখতে পারলে পাঁচ শ' টাকার মতো লাভ হবে। অর্ডার বেশি হলে প্রফিটও বেশি। পুরোটাই নির্ভর করছে আপনার দক্ষতার ওপর। তাছাড়া আপনাকে পার্টি কতটুকু বিশ্বাস করছে, তার ওপরও। আপনাকে কি আমি কিছু বোঝাতে পারছি?

আমার মগজে হঠাৎ অন্য খেলা শুরু হয়। এটাই আমার সহজাত প্রবণতা, মনে হয়, মৃত্যুর সময়ও রাতের বাজার করেছি কি-না মনে পড়বে, উল্টোটাও, লটারিতে দশ লাখ টাকা পেয়ে ভাবতে বসে গেলাম, জীবনে প্রথম যে ছবি এঁকেছিলাম, সেটা কে নিয়েছিল? তেমনই পারম্পর্যহীনভাবে প্রশ্ন করি, উপসাগর যুদ্ধ সম্পর্কে আপনার কী মনে হচ্ছে?

ওমর কোনো ভাবনা ছাড়াই নির্লিপ্ত জবাব দেয়, সাদ্দাম না হটলে বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য। আর হটে গেলে মার্কিনকে আর কেউ কোনোদিন হটাতে পারবে না। আরে ধুৎ! কোথায় কোন ইরাকে যুদ্ধ চলছে, জাহাজের সংবাদে আমাদের কাজ কী। আমরা চলেন ডোবার কথা ভাবি। চুনোপুঁটি।

জীবন তো আমাদের একটাই। কী মানে এই রক্তক্ষয়ের? আমি বলি, আর যদি বিশ্বযুদ্ধ লাগে? তখন এই চাল-ডাল রেশনের বিশাল হিসাবগুলো কি হাস্যকর তুচ্ছ হয়ে যাবে না?

হা হা হাসে ওমর, বিশ্বযুদ্ধে মরলে তো নিজেকে ভাগ্যবানই মনে করতাম। মহাপ্লাবনে পিঁপড়ের মৃত্যু। ভেবে দেখুন? এতবড় মৃত্যুর কত আগেই ওই যে দেখছেন, লক্কর ঝক্কর স্কুটারটা আসছে... ওর পায়ের তলাতেই পিষে মরবেন। আজকের কথা ভাবুন। কী খেয়ে দুপুরে নিজেকে বাঁচাবেন। সেটাই ভাবুন।

ওমর মন্দ বলে নি কথাগুলো। কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করি তাই নিয়ে। তারপর খুব স্বাভাবিকভাবেই উপসাগর থেকে একসময় প্রেসে ফিরে আসি, কেমন সময় ব্যয় হয় এসব কাজে?

ধাক্কা খেতে খেতে রিকশা একটা ভাঙা গলির ওপর দিয়ে এগোয়। সে প্রশ্ন করে, আপনি এ কাজের ব্যাপারে বেশ ইন্টারেস্টেড মনে হচ্ছে?

আমি সহজসাপ্টা বলি, দেখুন, এ চাকরির বেতনে আমার একদম পোষাচ্ছে না। হঠাৎই আমার মনে হলো, বলতে গেলে আপনার কথা শুনেই, চাকরির বাইরেও আমি একটা কিছু করার চেষ্টা করে দেখতে পারি। ওমর সোৎসাহে লাফিয়ে ওঠে প্রায়, তাহলে আমার সাথে নেমে পড়ুন, দু'জন মিললে কাজ আরো বেশি এগোবে।

লোকটা খুব সরল— এই এখন সেটা মনে হলো। তার নিজের কাজেরই কোনো শেকড় নেই। সবেমাত্র বন্ধুর বদৌলতে ফুটো শূন্য শুরু করেছে, এর মধ্যে ভাগীদার জুটে যাওয়ায় প্রবল উৎসাহ। হেসে বলি, আমি দু'একদিন আপনার সাথে ঘুরব। চাকরির বাইরেও পৃথিবীর কিছু পথঘাট চেনা দরকার। সুবিধেজনক মনে হলে তারপর না হয় চিন্তা করব কোন পথে এগুব।

আপনি আমার চেয়ে প্র্যাকটিক্যাল, এবার ওমর গম্ভীর হয়ে ওঠে।

আপনার চেয়ে বেশি হয়তোবা, আমি বলি, সত্যিকার প্র্যাকটিক্যাল লোকের তুলনায় নিশ্চয়ই নয়। জীবনের তাগিদে ধাক্কা খেয়ে যতটুকু না হলেই নয়, ঠিক ততটুকু। তারপর নিঃশব্দ পথ। দাঁতে নখ খুঁটতে খুঁটতে সে হঠাৎ প্রশ্ন করে, ওহ্ হো, আপনার সম্পর্কে কিন্তু কিছুই জানা হলো না। এখানে কি বাবা-মা'র সাথে আছেন?

একটা গলিতে ঢুকেছে রিকশা। বৃষ্টির ছিটেফোঁটা নেই, তবুও পাশের ড্রেন ওপচানো কাদা-পাঁকে-ভরা জলে রাস্তা ডুবে আছে। দুর্গন্ধে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরার উপক্রম। ক্ষত-বিক্ষত

এই পথে জীবন হাতে করে চলতে হয়। এঁটো খাবারের স্তূপও চারপাশে। ডানে-বাঁয়ে ধাক্কা খেয়ে রিকশা এগোচ্ছে। হাঁ করে আছে ম্যানহোলের মুখ, মনে পড়ে অফিস সহকর্মীর কথা। তার বর্ণনা করা পঙ্গু লোকটার কথা। গভীর রাতে এর ভেতর কেউ পড়ে গেলে কে তার খবর জানবে? পচেগলে মিশে যাবে ওই দুর্গন্ধ-ভরা জলের সাথে। এ এক নির্মম অপঘাত! অপঘাতের কথা মনে হতেই চাচার চেহারা ভেসে ওঠে। ফ্যানের সাথে দোল খাচ্ছে। চিড়িক দিয়ে ওঠে রক্ত। নিজেকে সামলে সহজ হওয়ার চেষ্টা করি, এখানেই একটা ফ্যামিলির সাথে সাবলেট থাকি। মা বাড়িতে থাকেন। বাবা মারা গেছেন।

তারপর আবারো কিছুক্ষণ নিঃশব্দ পথ। এক সময় ওমরের উৎসাহকে নষ্ট করে দেয়ার জন্যই বলি, আরো বিস্তারিত যদি শুনতে চান, তবে বলি, আমার বিয়ে হয়েছিল। চার-পাঁচ বছর আগে। দু'বছর আগে ডিভোর্স হয়ে গেছে। তারপর থেকে চাকরি করছি, বলতে গেলে আমার ঘাড়ের ওপর এখন পুরো একটা পরিবারের ভার।

আমি জানি, খুব নির্বিকারভাবে ওমর বলে, ওই যে আপনার বন্ধুটি ছিল হাসপাতালে, তার কাছে শুনেছি।

বাইরেও আমার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়া শুরু করেছেন? বলি, তবে যে ভান করলেন, আমি বাবা-মা'র সাথে থাকি কি-না জানতে চাইলেন? রিকশা টিনের একটা আস্তর পড়া বাড়ির সামনে থামে। আমি ব্যাগে হাত দেয়ার আগেই সে দ্রুত মানিব্যাগ খুলে ভাড়া মেটায়। তার এই একটি মাত্র ভঙ্গিতেই এতক্ষণে তাকে আমার ভালো লাগে। টাকার জন্য ফ্যা ফ্যা করা একটা লোক যে আমার ব্যাগের দিকে তাকিয়ে থাকে নি, সেটাই আমার জন্য যথেষ্ট।

রিকশা চলে গেলে সে কেমন অন্যরকম দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায়। তার চরিত্রের সাথে পুরো বেমানান স্বরে বলে, কারো খুব বেশি শুভাকাঙ্ক্ষী থাকলে তার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়ার দরকার হয় না। খবর এমনিই জানা যায়। আমি যেদিন আপনার বন্ধুকে দেখতে যাই, তখন, তার ওখানে আপনার আরেকজন বন্ধু উপস্থিত ছিল, নাম মনে নেই, তার সম্ভবত একটা বেকারি আছে। সাহিত্যের প্রতি অসম্ভব ঝোঁক, মনে হলো। যা হোক, কথা সেটা নয়। দু' জনের মধ্যে আপনাকে নিয়ে বেশ কথা হচ্ছিল। আপনি, আপনার স্বভাব, ডিভোর্স, এইসব নিয়ে বেশ তর্ক। আমি যে তৃতীয় একজন বান্দা সেখানে উপস্থিত, সেটা তারা বেমালুম ভুলে গিয়েছিল। আমি তাদের তর্কের বিষয়বস্তু আপনার কাছে বিশ্লেষণ করব না, তবে এটুকু টের পেয়েছি, তাদের একজন আপনার জবর শুভাকাঙ্ক্ষী!

টিটকারি দিচ্ছেন? আমার গা জ্বলে ওঠে, আপনি কিন্তু এক জায়গার কথা অন্য জায়গায় লাগানোর মতো নিন্দনীয় কাজটি করলেন।

আপনার ভেতরে দুর্বলতা, তাই এমন করে ভাবছেন। ওমর বলে, আমি মোটেই তাদের নিন্দা করি নি। আমি তাদের সম্পর্কে খারাপ ভালো কোনো মন্তব্য করি নি, আপনি কেন ভাবছেন সে সব তর্কের বিষয়বস্তু আপনার বিপক্ষে ছিল? অবশ্য কিছুই বলতাম না। বাইরেও আপনার সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছি। কিছুটা হলেও তো আপনাকে এঁরি মধ্যে জেনেছি, এইসব বলেকয়ে আপনি আমাকে দোষারোপ করলেন, তাই আমি চুপ থাকতে পারলাম না।

সরু গলির ভেতর দিয়ে তখন ট্যাংরা মাছের একটা পুঁচকে সরকারবিরোধী মিছিল যাচ্ছে। ক'দিন আগের রমরমা হরতাল, গোলাবারুদ আর নেই। ক্রমেই সবকিছু ঝিমিয়ে আসছে। স্রেফ রুটিন পালনের জন্য যেন এই হাস্যকর মিছিল। কোনো মানে হয়!

ওমর সেই ভাঙাচোরা টিনের দরজায় নক করতে থাকে। কথার প্যাঁচ জানে বটে লোকটা। তাকে অতটা স্থূল, মোটা মাথার একজন ভাবাটা আমার ঠিক হয় নি। কিন্তু একটু আগে করা তার মন্তব্যের ফলে আমার ভেতরে শুরু হয় মিশ্র এক আলোড়ন! ফলে কেমন অবসন্ন, নিস্তেজ মনে হয় নিজেকে। আমার চারপাশের এত আপন পৃথিবী, যখন অদ্ভুত অন্তরঙ্গতা নিয়ে ওদের সাথে হাঁটছি, তখন কী মায়া, কী হৃদ্যতা, যখনই হাঁটা শেষ করে মোড় ঘুরেছি, তাদের দিকে পিঠ, তখনই কুৎসিত মন্তব্য, তখনই তাদের স্বর পাল্টে যাওয়া, কষ্ট লাগে।

দরজা খুলে যায়। একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। কী ভয়ঙ্কর ভঙ্গুর চেহারা! লম্বা গলা, ঘাড় থেকে অনেক ওপরে চামড়ায় ভাঁজ পড়া মুখ। চোখ দুটো কোটরে। সরু দেহের ওপর লটপট করছে ঢোলা কামিজ। যেন উঁইপোকা বিন্দুবিন্দু করে শুষে নিচ্ছে তার সবকিছু। বিহ্বল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে দ্রুত দরজা থেকে সরে দাঁড়ায়।

তোশকের ওপর পাটি বিছানো। তার ওপর শুয়ে আছে সেই কিশোর। মেঝে, মাটির কি সিমেন্টের বোঝা মুশকিল, এমনই এবড়োখেবড়ো। তার ওপর বসে সেই বৃদ্ধা, হাসপাতালে দেখেছিলাম, আনারস কাটছেন। যে শাড়ি তার পরনে, কাঁথা বানানোর উপযুক্তও নয়। আরেকটি ন্যাংটো শিশু, বয়স ছ' সাত হবে, পাশে বসে আনারসের খোসা চিবুচ্ছে। সমস্ত ঘরে আসবাব বলতে দুটো মরচে ধরা ট্রাঙ্ক, একটা ছ্যাতলা পড়া আলনা, চুনকালি মাখা একটা টেবিল-চেয়ার। বাড়ি জুড়ে ঝুলকালির ছড়াছড়ি। আনারস কাটা থামিয়ে বৃদ্ধা ভাবলেশহীন চোখে আমার দিকে তাকান। স্যান্ডেল টেনে কিশোরের পাশে তার বিছানায় বসি। বিশ্রী ঘামের গন্ধে পেট ঘুলিয়ে ওঠে। সেই কিশোর, স্বপ্নে দেখা তার মুখ, তার কোলে ছিল আমার শিশু সন্তান। ফলে তার প্রতি কেমন এক মায়া, টান অনুভব করছি। আমার সব ইচ্ছে ছাপিয়ে এই কিশোর বড় আপন, বড় কাছের। স্বপ্নের অনুভূতি সম্ভবত এমন মায়ার, এমনই বিচিত্র। ছেলেটা আমার দিকে নিস্পৃহ চোখে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। সেই দৃষ্টিতে সমস্ত পৃথিবীর প্রতি চরম অনীহা। শাড়ি কাটা ওড়নায় যৌবন ঢেকে সেই ক্ষীণাঙ্গী মেয়েটি এখন মুখ বাড়িয়েছে।

আমার বোন, পরিচয় দেয় ওমর। দা ফেলে দাঁড়িয়েছেন সেই বৃদ্ধা। এক পৃথিবীর কর্কশতা তার মুখে। ছেলেটা কিছু যেন বলতে চাইছে। বৃদ্ধা এগিয়ে যান, খুব কাছে। ছেলেটা এবার মুখ খোলে, বড় অমসৃণ, ভাঙা কণ্ঠ... বৃদ্ধা কান পাতেন। তার কণ্ঠে ভয়ঙ্কর অস্পষ্টতা। সেই মুহূর্তে মনে হয়, ছেলেটি মৃত্যুপুরীর মানুষ। কীভাবে ঠিকরে বেরোচ্ছে তার চোখ। আমি স্বপ্নেও তাই দেখেছি। ভয়ার্ত চোখে চারপাশে তাকাচ্ছে। আঙুল তুলে দরজার দিকে দেখায় সে— ওই যে।

আমরা সবাই তাকাই। বাইরে সন্ধ্যা নামছে। ছেলেটার চোখ বিস্ফারিত— ওই যে, আসছে...। আবারো তাকাই। মৃত্যুর মতো নিঃশব্দ পরিবেশ। সমস্ত ঘরে ছায়া। উদ্‌গ্রীব বোনটি এগিয়ে আসে। হাতে চা, মনে হলো জন্ডিস আক্রান্ত রোগীর পেশাব। কী যে হয়, ছিটকে বেরিয়ে আসি।

পেছন পেছন ওমর। রাস্তায় নেমে ঠাণ্ডা গলায় বলি, আপনি মিথ্যে কথা বলেছেন। ও আমাকে মোটেই দেখতে চায় নি— বলে নিঃশব্দে হাঁটতে থাকি। ধীরে ধীরে আত্মার গ্রন্থিগুলো আলগা হয়ে আসতে থাকে। সহজ বোধ করছি কিছুটা। ওমর বলে, সব মিথ্যে বলি নি। শুধু ওইটুকু, আপনাকে দেখতে চাওয়ার ব্যাপারটা।

আপনার মিথ্যে বড় দুর্বল ছিল, আমি বলি, কিন্তু আমি বুঝছি না আপনি আপনার বাসায় আমাকে কেন নিতে চাইলেন ? এবং তার জন্য এত ভান-ভণিতারই-বা কী দরকার ছিল ?

আমি আসলে সেইটা দেখতে চাইছিলাম, আমার বাসার পরিবেশে আমাকে দেখে আপনি আমাকে কতটা তাচ্ছিল্য করতে পারেন।

আশ্চর্য! হঠাৎ করে আপনি আমার চোখে আপনাকে আবিষ্কার করার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠলেন কেন ? আমি বুঝতে পারছি আমার ব্যাপারে আপনি বেশ আগ্রহী, কিন্তু এসব হাস্যকর পরীক্ষায় ফেলে আমাকে যাচাই করতে চাওয়া, আমার কাছে রীতিমতো অপমানজনক ঠেকছে। ভারি পদক্ষেপে হাঁটছে ওমর। আমি রিকশা ডেকে দরদাম করায় ব্যস্ত হয়ে পড়ি। রাস্তার মাঝখানের গর্তগুলোয় থকথকে কাদা। শাড়ি বাঁচিয়ে দুটো ইটের ওপর এসে দাঁড়াই।

ওমর বলে, আমি কি আপনার বাসা পর্যন্ত যেতে পারি ?

আপনি কিন্তু আমার কথা এড়িয়ে যাচ্ছেন।

দেখুন, আমার মান-অপমানের বোধটা বড়ই ভোঁতা। আসলে আমি নিজেও এখন বুঝতে পারছি না, কেন আমি আপনাকে ওরকম পরিবেশে টেনে নিয়ে গেলাম। ওই যে বললাম, আপনি আমাকে এরপর কীভাবে বিবেচনা করেন তা দেখি, আর কিছু নয়। খুব বাজে লাগছে আপনার, না ?

আমার নিজের পরিবেশ এরচে' সুন্দর কিছু না, আমি বলি। আসলে জন্মের পর থেকে এরকম পরিবেশ দেখে দেখে হাঁপিয়ে উঠেছি। এজন্যই এসব আর ভালো লাগে না। এর মানে এই নয় যে, আপনার দারিদ্র্যকে আমি ঘৃণা করছি। আসলে এই পুরো ব্যাপারটারই কোনো মানে ছিল না।

রিকশায় উঠে বসলে ওমর বলে, বললেন না, আপনার সাথে আসব কি-না ?

বাসা চিনলে তো আমার জন্য মুশকিল হয়ে যাবে। আপনার যা চরিত্র, দু'দিন পরপরই এসে হামলা করবেন।

লাফ দিয়ে রিকশায় উঠে আমার পাশে বসে হা হা শব্দে হাসে ওমর, বাহ্ আমাকে তো বেশ চিনে ফেলেছেন।

পরদিন অফিস শেষে ওমরের সাথে বেরিয়ে পড়ি। সেই পুরনো ঢাকার ঘুপচি গলি। মনে পড়ে নদী ভ্রমণের কথা। কতদিন হলো যোগাযোগ নেই ইরফান চাচার সাথে। হঠাৎ চাগিয়ে ওঠা ছবি আঁকার নেশাটাও ক্রমশ নিভে এসেছে। চাকরির বাইরেও কিছু পথঘাট চেনা দরকার। আর চাকরির যা অবস্থা, কোনোদিন যে কী হয়, কে জানে! আজকে লিফট বন্ধ ছিল। এরপর পা টেনে টেনে চূড়োয় ওঠা! অফিসে ঢুকেই দেখি, কেউ নিজস্ব আসনে নেই। কিছু কর্মী ছাঁটাই হয়েছে। সবাই উত্তেজিত হয়ে জটলা করছে। ফোর্থক্লাস এমপ্লয়িরা গেটের

সামনে সিগারেট টানছে, টেবিলে বসে বুক কাঁপছিল। এরকম পরিস্থিতিতে আমি খুব অল্পতেই ঘাবড়ে যাই। এর কিছুক্ষণ পর বসের রুমে ডাক পড়লে আমার উত্তেজনা চরমে উঠে যায়। কাঁপা কাঁপা পায়ে এগোই। কাচের পার্টিশানের ওপারে বসের শীতল মুখ। রুমে ঢুকে অনাবিল ঠাণ্ডায়ও ঘেমে উঠি। টেবিলের গ্লাসের নিচে অনেক ছবি, ভিজিটিং কার্ড। সেদিকেই চেয়ে থাকি। তিনি বলেন, আপনার সিনসিয়ারিটির কারণে অফিস আপনার ওপর প্লিজ্‌ড। আপনি খুব তাড়াতাড়িই এর রেজাল্ট পাবেন। শুধু একটু হিসেব করে চলবেন। পুরো পরিস্থিতি কীভাবে ম্যানেজ করতে হয়, সে ব্যবস্থা আমরা করছি।

ভেতরে ভেতরে বেশ অভিভূত হয়ে পড়ি। কম্পন আরো বেড়ে যায়। ধন্যবাদ, বলে দাঁড়াতে যাব, তখন বলেন, একটুখানি মানসিক প্রস্তুতি রাখবেন, একটা ব্যাপারে আপনার সাহায্য লাগতে পারে। আমাদের মেহজাবিন তিনদিন ধরে আসছে না। জানেন তো আগামীকাল ন্যুইয়র্ক থেকে আমাদের একটা পার্টির আসার কথা। যদিও এই দায়িত্ব আপনার না। বরাবর মেহজাবিনই এই কাজটা করে আসছে, কিন্তু পরশু থেকে সে অসুস্থ। বাইচান্স কাল সে মিস করলে...।

আমি কেমন ফ্যাকাসে হয়ে উঠি। বসের কণ্ঠ নিস্পৃহ। আমার গলা শুকিয়ে আসে। মেহজাবিন, অফিসের বিতর্কিত বাউণ্ডুলে মেয়েটা। যার অফিসে কোনো সিট নেই, অফিসের যাবতীয় ফ্লায়িং কাজের দায়িত্ব তার ওপর। কী উদ্ভট তার পোশাক! কথায় কথায় মুখে খিস্তি। একদিন, মনে হলে এখনো শিউরে উঠি, অফিসের লিফট ধরে নামছি, পুরো লিফট খালি। আমি আর মেহজাবিন। ফশ করে সে লাইটার জ্বালায়। এবং মাতাল ভঙ্গি আর ক্রুদ্ধ চেহারা নিয়ে আমার বেণির ডাগায় আগুনের শিখা ছুঁইয়ে দেয় প্রায়। আমি ধড়ফড়িয়ে আর্তনাদ করে উঠতেই ফুঁ দিয়ে শিখাটা নিভিয়ে হি হি হাসিতে ফেটে পড়ে সে। তার কাজের দায়িত্ব পড়েছে কি না আমার ওপর? এতদিন ভাবতাম বস্‌ খুব সম্মান করেন আমাকে। ভেতরটা কেমন গুঁড়িয়ে যেতে থাকে। তিনি আমার বিচলিত চেহারা দেখে বলেন, দেখুন, এয়ারপোর্টে কোনো পার্টিকে রিসিভ করতে যাওয়ার মধ্যে কোনো অসম্মান নেই। অফিসের পক্ষ থেকে এটা ভদ্রতা মাত্র।

আমি জানি অফিসের অর্ডার, এই কাজটাও আমাকেই করতে হবে। কিন্তু এসব কাজের সত্যিকার ধরনটা আমার জানা নেই। তবে বাইরে থেকে দেখলে এসব কাজকে খুবই ন্যক্কারজনক মনে হতে পারে। অফিসের সহকারীদের টিপ্পনীর মুখোমুখি হতে হবে। আমি যেন কেমন মরিয়া হয়ে উঠি, স্যার, এখানে আমার কী প্রয়োজন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। বলেই টের পাই প্রশ্নটা একজন অফিস কর্মীর পক্ষে শিশুর মতো হয়ে গেছে। নিজেকে শুধরে নিয়ে বলি, ঠিক আছে স্যার, আমি যাব।

সেই থেকেই ভেতরটা খচখচ করছে, ওমর কখন থেকে অনর্গল বকে যাচ্ছে, তার কাজের ধরন, কী করে, কতটুকু বুদ্ধি খাটিয়ে সে তার কাজে পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে, কোন পথে এগোলে কতটুকু লাভ, প্রথম চারপাঁচটা দিন সে ধরতেই পারে নি হেনতেন এইসব। রীতিমতো বিরক্তিকর ঠেকছিল। তবুও আমি তো একটা খড়কুটো আগলে ধরে বাঁচতে পারি না। হাত ফসকে গেলেই অতল জলে তলিয়ে যাওয়া। এই চাকরিটা আমাকে অসহায় ব্যক্তিত্বহীনে পরিণত করেছে। আমি কি জানি না আমার দৌড় কোন পর্যন্ত? বস্‌

এয়ারপোর্টে যাওয়া কেন, যদি আমাকে নিয়ে এক হপ্তার জন্য সমুদ্রের হাওয়া খেতেও যেতে চান, এখন যত সহজে ভাবছি রেজিগনেশন লেটার বসের মুখের ওপর ছুঁড়ে দেব, সত্যি সত্যি সেই পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে আমি নিজের মধ্যে সেঁধিয়ে যাব না? আমার ফ্যামিলি, যুদ্ধের জীবন, অস্তিত্বের চরম সঙ্কট আমার হাড়-মাংস এক করে একসময় এমন একটা চিন্তায় আমাকে কেন্দ্রীভূত করে দেবে না— সমুদ্রের হাওয়াই তো, গেলামই না হয়, অন্য কোনো দুর্গন্ধযুক্ত নর্দমা তো নয়। কী সব ভাবছি! ওমরের কথা কানে আসছে না। বুঝতে পারছি না, আগামীকালকের পরিস্থিতির মুখোমুখি কীভাবে হবো? যদি কাল যাই এবং আমার স্মার্টনেসে অফিস মুগ্ধ হয়, তারপর থেকে এরকম আরো পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে আমাকে। আমি মেহজাবিনের পরিপূরকে দাঁড়িয়ে যাব। এবং যদি আনাড়িপনার পরিচয় দিই, তবে? এই পার্টি কতটা গুরুত্বপূর্ণ, কে জানে? শেষে নোনা জলে ডুবে মরতে হবে না তো। একটা ঘুপচি প্রেসের সামনে এসে রিকশা থামে। সার সার বিল্ডিং দু'পাশে। রিকশা, ঠেলাগাড়ি, আবর্জনা আর নর্দমার গন্ধে বড় ভয়াবহ চারপাশের পরিবেশ। এই ঢাকা শহরে আমি কি একদিনের জন্যও এক চিলতে সুন্দর দেখব না?

ভেতরে ঢুকে আরেক জগৎ। ওই টুকুন ঘুপচি রুম। তার মধ্যে মেশিনপত্র এবং কালিঝুলি মাখা কর্মচারীতে ঠাসা। মালিকের চেহারাও কর্মচারীদের মতোই। সামনে চাপাচাপি টেবিল। তিনি দেয়ালে চেপে থাকা চেয়ারে বসে আছেন। ওমরের সাথে বেশ খাতির বোঝা গেল, আরে আসেন... আসেন... এই আহ্বানের পর ভদ্রলোকের সাথে তার খাতিরের গভীরতা আমাকে বোঝাতেই যেন ওমর অহেতুক তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে, গেস্ট নিয়ে এসেছি। উত্তরে লোকটি সরাসরি বিস্ময় প্রকাশ করেন, তোমার সাথে মহিলা গেস্ট! বড় অবাক করলা তো!

এবার ওমরকে বেশ গর্বিত দেখায়। আমার দিকে তাকায় এমন দৃষ্টিতে যেন বলতে চাইছে, তুমি ভেবো না, তোমার সাথে অত গায়ে পড়ে মিশছি বলে আমার মূল স্বভাবটা এই। অবশ্য আমার ভেতরও একটা মৃদু অহঙ্কার কাজ করে। এই মহিলাবর্জিত লোকটা এমন করে আমার পেছনে লেগেছে, ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ উপভোগ্য!

প্রেসের মধ্যে দাঁড়িয়ে ওমর তার বিদ্যা অনুযায়ী মাস্টারিটা শুরু করে— এই প্রেসেই আমি ইন্ডাস্ট্রির লেজার, ভিজিটিং কার্ড, টাইম কার্ড, প্যাড এইসবের ডিজাইন নিয়ে মাপসহ ছাপতে দিই। অবশ্য কাশেম ভাই না থাকলে আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব ছিল না, বলে সে মালিকের দিকে ইশারা করে। মালিক ওমরের এই স্তুতিতে না গলে কী সব হিসেবনিকেশে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

এরপর ওমর আমার দিকে তাকিয়ে বলে, সবচেয়ে আগে আপনাকে পরিচিত হতে হবে প্রেসের সাথে। ওই যে ওটা হচ্ছে ট্রেডেল মেশিন, বলে আঙুল তুলে মেশিনগুলো দেখায়, কাজ শিখতে হলে আগে এসবের সাথে আপনার পরিচিত হওয়া দরকার। অফসেটে ছাপার জন্যও মেশিন আছে, অটোমেটিক মেশিন এবং ওই যে দেখুন কাগজ কাটার কাটিং মেশিন।

পেটের বাঁ দিকে ঘা দিচ্ছে। নাহ্, ডাক্তার না দেখালেই নয়। আলসারটা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে যাচ্ছে না তো? কেমন হাঁপিয়ে উঠি, বলি এসব পরে চিনব। আগে বলুন, আমি কাজ পাব কী করে?

কাজ পেতে হলে কোনো এনজিও বা গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির সাথে আগে পরিচিত হতে হবে। ওমর বিজ্ঞের মতো বলে। কোনো আর্টিস্ট বন্ধু থাকলেও অনেক সাহায্য পাবেন। যেমন ধরুন, এনজিওর কাজ পেয়ে আপনি প্রেসে ছাপতে দিলেন। ছাপার আগে ডিজাইন করে, কখনো ব্লক করে, কখনো পজেটিভ নেগেটিভ করে তারপর প্লেট বানিয়ে অফসেটে ছাপতে হবে। ব্লক করলে অবশ্য অন্য মেশিন। তো আপনি ডিজাইন পাচ্ছেন কোথায় ? আর্টিস্ট বন্ধু থাকলে আপনি বিনে পয়সায় তার কাছ থেকে কাজটা করিয়ে নিতে পারেন।

দেখুন, ভেতরে এতক্ষণে আমি মিইয়ে আসতে শুরু করেছি। বলি, অতসব ঝক্কির সময় কই ?

ওমর বেশ দমে যায়। গম্ভীর গলায় বলে, নিজের ওপর অত বিশ্বাস কম থাকলে তো হবে না। কাজে পসার হলে দরকার মতো চাকরি ছেড়ে দিয়ে সময় বের করবেন। রিস্ক না নিলে কি শাইন করা যায় ? প্রেসময় ছড়ানো কালি, মবিল, ছেঁড়া ন্যাকড়া। কেরোসিনের গন্ধে পেট ঘুলিয়ে ওঠে। এছাড়া অসম্ভব বদ্ধতা। এক সময় মালিকের কাছ থেকে ভদ্রতার বিদায় নিয়ে বাইরে এসে বলি, আমি ভাবছিলাম গাছে কাঁঠাল... মানে বলতে চাইছি, কাজ কোথায় পাব তার খবর নেই, আগেই প্রেসের সাথে আবোলতাবোল পরিচয়। ওমর কিছুক্ষণ আমার পাশাপাশি নিঃশব্দে হাঁটে। এক সময় সে বলে ওঠে, আপনি তো ইচ্ছে করলে টিউশানিও করতে পারেন। আমার নিজেরই দু'তিনটে টিউশানি আছে। বলতে গেলে এর ওপরই কয়েক বছর ধরে টিকে আছি। নইলে বাবার যে ছাপোষা চাকরি...।

এ নিয়ে আমিও বিস্তর ভেবেছি, বলি, কিন্তু পাঁচটা পর্যন্ত অফিস করার পর টিউশানি করলে ঘরে ফিরতে ফিরতে তো রাত হয়ে যাবে। সন্ধের পরের ঢাকাকে আমি ভীষণ ভয় পাই।

এই ভয়টাই একটু কমাতে হবে, ওমর বলে, জীবনে একা চলতে চাইবেন, আবার ভয়ও পাবেন। তবে তো অন্য প্রস্তাব রাখতে হয়, কারো ঘাড়ে ঝুলে পড়েন।

তেমন ঘাড় পেলে তো ঝুলতামই... আমি হেসে ফেলি। জীবন ভরই তো ঘাড়ে ঝুলতে চেয়েছি। দেখি, হাড় নেই। ঘাড়ে শুধু পিচ্ছিল মাংস।

এই ঝুলে পড়ার অভ্যাসটা ছেড়ে দিন, দেখবেন সবকিছু ঠিক হয়ে গেছে, ওমর উপদেশ দেয়। এই ঝোলাঝুলির জন্যই আমাদের মেয়েদের কিছু হলো না।

ওরে বাবা! এরপর আর কথা চলে না। আজ দ্রুত সন্ধ্যা এসে যায়। কী ঠাণ্ডা বাতাস! রাজপথে এসে লম্বা করে শ্বাস টানি।

পরদিন অফিসে এসে আমার এক রাতের ভয়ঙ্কর চাপ থেকে অনাবিল মুক্তি ঘটে। মেহজাবিন এসেছে। গতকাল অনেক রাত অব্দি ভেতরে কী দুঃসহ দ্বন্দ্ব। স্বপ্নে দেখেছি, বসের মুখের ওপর চাকরি ছাড়ার কাগজ ছুঁড়ে মেরেছি। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে বুকের মধ্যে থরকাঁপুনি, কেনো এত সহজ একটা ব্যাপারকে আমি নিজের মধ্যে জটিল করে তুলছি ? স্রেফ কিছু গেস্টকে এয়ারপোর্ট থেকে রিসিভ করে আনা। আমাকে তো এর বেশি কিছু করার নির্দেশ অফিস দেয় নি। মানসম্মানের ব্যাপারটা অতই যদি নাজুক হবে, তবে আর চাকরি করা কেন ? সবাই কি আমার জন্য পথঘাট ঘষেমেজে মসৃণ করে রাখবে ? এসব ভাবনার

পরও আমার দুশ্চিন্তা কাটে নি, কী অসহ্য পীড়ন। নিশ্চয়ই এ-ই আমার শুরু। এপথ ধরেই আমাকে একটু করে অন্ধকারের পথে পা রাখতে হবে।

সকালে সেজেগুজে চোখ মুখ লাল করে অফিসে এসেছি। এবং... তারপরই মেহজাবিন। কী অপার শান্তি! জীবনে প্রথম মেয়েটাকে টেনে আমার টেবিলের সামনে বসাই। সে চোখ টিপে বলে, কী-হে, বস্ নাকি তোমার ওপর টোপ ফেলেছিল?

তিনি তোমাকে তাই বলেছেন বুঝি? আমার শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা রক্ত নামে।

তিনি আমাকে এভাবে বলেন নি, চেয়ারে বসে রুমালে ঠোঁটের চারপাশ সন্তর্পণে মোছে মেহজাবিন। বলেছেন, তুমি না এলে মিস নীনা তরফদারকে পাঠাতে হতো। তুমি নাকি বেশ নার্ভাস ফিল করছিলে?

তুমি একে টোপ বলছ কেন? শীতার্ত চোখে তাকাই তার দিকে।

এভাবেই শুরু হয়। যা হোক, আমি এসে গেছি, মেহজাবিন দ্রুত উঠে দাঁড়ায়। অপূর্ব পারফিউমের ঘ্রাণ তার চারপাশে। নেশা ধরে যায়। মিস নীনা তরফদার, তুমি যে জায়গায় আছ আপাতত তোমাকে নড়তে হলো না, বাহ্! তোমার শাড়িটা কিন্তু অদ্ভুত, যেন ডিমের কুসুম, তোমাকে কিন্তু সুন্দর দেখাচ্ছে! তুমি এত সিম্পল থাক কেন? রঙ মাখলে তো বেশ দেখায়, কেউ বলে নি? জুতোয় টুকটুক শব্দ তুলে বাইরে বেরিয়ে যায় মেহজাবিন। এবং তারপর থেকে আমার ভেতর নতুন প্রতিক্রিয়া, মেহজাবিন এসেছে বলে আমার আনন্দেরই-বা কী ছিল? বস্ যে প্রস্তাব রেখেছেন, আমার সার্ভিস লেটারে এমন কোনো কাজের উল্লেখ ছিল না। মেহজাবিন আসায় ব্যাপারটার একটা অস্থায়ী সমাধান হয়েছে মাত্র। সে না এলে এই কাজটা আমাকেই করতে হতো। আমার যতটুকু অপমানিত হওয়ার তাতো আমি হয়েই গেছি। আমার তো আর নিশ্চিন্ত থাকা চলবে না। কী জানি, আমিই হয়তো সবকিছু বেশি বেশি করে ভাবছি।

বাস, রিকশা এসব করে বিকেলে ইরফান চাচার বাসায় যাই। ড্রয়িংরুমে বসেছিলেন তিনি। দরজা খোলা। ইরফান চাচা এলানো সোফায় চোখ বুজে আছেন। শো-কেসের ওপর রাখা ক্যাসেটে সন্তুর বাজছে। সদ্য রেখে যাওয়া কাপের চা থেকে পাকিয়ে উঠছে ধোঁয়া। সমস্ত দৃশ্যে এমনই ঘোর, এমনই অনির্বচনীয় মোহ, আমি তাঁর পায়ের কাছে নিঃশব্দে হাঁটুমুড়ে বসি। চায়ের ধোঁয়ার কাঁপন এবং সন্তুরের মিহি তরঙ্গ এক সমান্তরালে চলছে। এর মধ্যে ইরফান চাচার ধ্যানমগ্ন ঋষিতুল্য মুখ। প্রবলভাবে মনে হয়, এই পুরুষ ছাড়া আমার পৃথিবীতে আর কোনো ছায়া নেই। একমাত্র এর মধ্যেই নিজের আত্মা, শরীর, হাড়, মাংস উপুড় করে ঢেলে দেয়া যায়। আমি তাঁর হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরি। এবং কাঁদতে থাকি। তিনি চোখ মেললে দ্রুত নিজেকে সামলে দাঁড়াই। সোজা হেঁটে যাই টানা বারান্দা ধরে। খুব অল্প সময়ের জন্য আমি তাঁর চোখে অসহ্য নির্লিপ্ততা দেখি। চাচির ঘরে ঢুকে দেখি অবেলায় শুয়ে আছেন তিনি। কোঁকড়ানো চুল নিচের দিকে ছড়ানো, বুয়া বিলি কাটছে। আমাকে দেখে বিস্ময়জাগা চোখ মেলে উঠে বসেন।

আমি নিঃশব্দে চেয়ার টেনে বসি। কী এক আলো তার মুখে, বহুবর্ণ রঙের এক অদ্ভুত মিশ্রণ। মহিলার মধ্যে কী যেন আছে। অহঙ্কার তাঁকে মানায় বেশ। এলো চুলের ভাঁজেও শিল্পিত কারুকাজ। আর তার ভেতরাত্মা কিনা ছুঁতে পারেন নি ইরফান চাচা, ভেবে বেশ পুলকিত হই। ক্ষমতা আছে বটে তাঁর!

তিনি প্রশ্ন করেন, কী ব্যাপার ? চাচার সাথে ঝগড়া হয়েছে ? এত সহজ তাঁর গলার স্বর! এই বাড়িতে আসার ঘটনাকে ঘিরে আমার এতদিনকার জড়তা, মুহূর্তে ধুয়েমুছে যায়। সলজ্জ বলি, না আজ আমি আপনার কাছে এসেছি।

বুড়ো বয়সে আমাদের দু'জনের মধ্যে সমঝোতা করতে চাও ? হাসতে হাসতেই তিনি বলেন, জীবন তো ফুরিয়েই এসেছে। তোমাকে তো আমি বেশ বুদ্ধিমান বলেই জানি। এসব নিয়ে কাদাজল নাইবা ঘাঁটলে ?

দেখুন, আমি কোনো সমঝোতা করতে আসি নি, একটু গল্প করব শুধু।

সেটা আমি বিশেষ পারি না, তিনি বলেন। খুব সোজা করে বলতে গেলে কারো সাথে গল্প করাটা রীতিমতো বিরক্তিকর আমার কাছে। তোমার চাচা ওটা বেশ পারেন। নিশ্চয়ই সেদিন সারাদিন তোমাকে বেশ জ্বালিয়ে মেরেছেন ?

কোনদিনের কথা বলছেন ? এবার আমার অবাক হওয়ার পালা। তিনি বলেন, ওই যে, যেদিন নদীতে গেলে। আমাকে বলেছেন, তোমার কাছে নাকি আমাদের সাত জীবনের গান গেয়েছেন। এত কথা বলতে পারে মানুষটা! কীভাবে যে সহ্য কর!

খুব অভদ্রভাবেই আমি ছুটে তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। কী অদ্ভুত মানুষের চরিত্র! আমি আসলে পৃথিবীর কিছুই চিনি না। অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে আমি এখনো মায়ের পেটেই রয়ে গেছি।

ড্রয়িংরুমে এসে ঠাণ্ডা হয়ে বসে থাকি। ম্যাগাজিন রেখে চাচা প্রশ্ন করেন, নতুন কিছু আঁকলে ?

আমার ভেতরটা জ্বলছে। সবকিছু এত তরল এই ভদ্রলোকের কাছে ? কী জটিল দাম্পত্য জীবনের বর্ণনা করেছেন আমার কাছে। সেই দিনটাকে আমি অপরিসীম গুরুত্বের সঙ্গে নিজের ভেতরে ঠাঁই দিয়েছি। আর তিনি কি না এই বিশ্লেষণ হাজির করেছেন তার স্ত্রীর কাছে ? তাছাড়া দু'জনের ভেতরে প্রকৃত যে সম্পর্ক, তার সঙ্গে ইরফান চাচার বক্তব্যের কিছুই যে মিলছে না।

গ্রিক মিথ নিয়ে নতুন কিছু ভাবলে ? তিনি প্রশ্ন করেন। নতুন কিছু এঁকেছ ?

দেখুন, কেমন খেপে উঠি আমি। আপনি অভিজ্ঞ মানুষ স্বীকার করছি। আঁকিয়ে হিসেবে আমি এখনো শিশু, সেটাও অস্বীকার করছি না। আপনি সব বোঝেন। কিন্তু একজন শিল্পী, সে যত দুর্বলই হোক, অন্য কেউ কোনো চিন্তা, কোনো সাবজেক্ট তার ওপর চাপিয়ে দিয়ে তাকে দিয়ে আর যা-ই হোক স্বতঃস্ফূর্ত সুন্দর কোনো ছবি আঁকাতে পারে না। আপনি কেন ভাবছেন, যেসব সাবজেক্টের ব্যাপারে আপনি দুর্বল, সেসব ব্যাপারে আমার ভেতরও দুর্বলতা কাজ করবে ?

কেমন নিষ্প্রভ, শাদাটে হয়ে ওঠেন তিনি। চামড়ার ভাঁজে দুধের সরের মতো খাঁজকাটা তরঙ্গ খেলছে। কী বিশাল নিঃশব্দতা চারপাশে। আমি তার মধ্যে থরো থরো কম্পমান। বাঁদিকের পাঁজরের তলায় ঘা, হাত দিয়ে চেপে ধরি। তিনি বলেন, আমি দুঃখিত। আসলে প্রতিদিন মানুষ কিছু কিছু করে শেখে মানুষের কাছ থেকেই, সে যেই হোক, মানুষের ঋণ এভাবেই বেড়ে ওঠে। কী হয়, ব্যাগ থেকে টেনে একটা ফুলস্ক্যাপ কাগজ বের করি। সাইন পেনে আঁকা নগ্ন নারীদেহ। অফিসে বসে আঁকিবুঁকি করেছিলাম। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্তও ওটা

তাঁকে দেখানো বিন্দুমাত্র আগ্রহ আমার মধ্যে ছিল না। এখন মেলে ধরি টেবিলের ওপর। ঠাণ্ডা চোখে তাকাই তার দিকে। কী এক ছায়াচক্র ঘোরে চারদিকে।

একটু ঝুঁকে পড়ে ছবিটার দিকে নিঃশব্দে চেয়ে থাকেন তিনি। তারপর মৃদু স্বরে বলেন, তোমার কি রাগ কমেছে ? আমি কি কিছু বলতে পারি ?

আমি মোটেই রাগ করি নি, ঠাণ্ডা গলায় বলি। আমার আচরণকে অত সহজভাবে নিলে আমি অপমানিতই হবো বেশি।

তাহলে নিজেকে খুলে ধরছ না কেন ? তিনি প্রশ্ন করেন। আসার পর থেকে, তুমি চিন্তা করে দেখো, দুর্বোধ্যতার একটা ছেলেমানুষী খেলায় লিপ্ত হয়েছে কি না ?

সেটা আপনার খেলা, আমি বলি, নিজেকে দুর্বোধ্য করে তুলে মজা পাওয়া। ভেতরে ভেতরে ভীষণ সাধারণ আপনি। কিন্তু তার সত্যিকার প্রকাশ হলে তার সৌন্দর্য অন্যরকম হতো।

কী বলতে চাইছ তুমি ?

আগে বলুন, আমি কি একটা শিশু ? গিনিপিগ ? সারাদিন স্রেফ লোফালুফি, খেলে ঘরে এসে স্ত্রীর কাছে এই বলে নিজেকে মেলে ধরলেন, বেশ মজাদার দুঃখময় আনন্দময় খেলা খেলে এসেছেন। আমাদের কথাবার্তা, ক্রোধ, মেধা এতই স্থূল ? বলে, প্রায় জলভরা চোখে তাকাই তার দিকে। ফ্যানের বাতাসে কাগজের নগ্নদেহ দুলে ওঠে। সন্ধ্যা নেমেছে বাইরে। মৃদু মন্থর শীত চারপাশে। ইরফান চাচার মুখে কী ভীষণ শূন্যতা! তাঁর এত গভীর করুণ মুখ আমি আর দেখি নি। তিনি ফাঁপা, ভঙ্গুর কণ্ঠে বলেন, আমি ভীষণ নিঃসঙ্গ নীনা। যতক্ষণ তাঁর সাথে থাকি, সারাদিনের খুঁটিনাটি রুটিন চারণ করা ছাড়া আর কিছুই করা হয় না। তার মধ্যে প্রাণ থাকে না। এটি আমার অভ্যাস। বিশ্বাস কর, সেখানে কাউকে আমি ছোট করি না।

এই বিপন্নতার পর আমি দীর্ঘক্ষণ অসাড় বসে থাকি। সহসা আমি কথা খুঁজে পাই না। পরিস্থিতি চূড়ান্ত রকমের অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে। আমি ঝুঁকে চোখ মুছে বলি, আমার স্কেচটা নিয়ে কিছু বলুন। এবার আমাদের আলাপচারিতা ভিন্ন পথ ধরে। আমারই হেলাফেলায় আঁকা ছবি নিয়ে বিস্তর কথা হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি ভেনাসের উদাহরণ তুলে ধরেন। এশিয়া মাইনরের মাঝামাঝি একটা দ্বীপে তার অবস্থান। স্পন্দমান স্থির দেবী। নগ্ন, সুন্দর, শুভ্র। এত জীবন্ত এবং নগ্নতার ভেতর এত শিল্পিত সুন্দর, তাকে স্পর্শ করতে ইচ্ছে হয়, প্রচণ্ড ঘোর লাগে, মনে হয় ছুঁয়ে ছুঁয়ে খুঁড়ে এক করতে পারলে হয়তো তৃপ্ত হওয়া যাবে, কিন্তু না, কিছুতেই সেই সুন্দরের ভেতর পৌঁছানো যায় না। ভেনাসের সেই মূর্তির একটি ছবিও তিনি আমাকে দেখালেন। গভীর মনোযোগে চেয়ে দেখি। সুন্দরের ভেতর এত নিটোলতা আমার পছন্দ নয়, আমি তাকে বলি, ভারতীয় স্কালপচারের অমসৃণ সুন্দর আমার বেশি পছন্দ।

এ নিয়ে বিস্তর তর্ক। শিল্প নিয়ে নানারকম কথা, যুদ্ধই শিল্পের প্রধান অস্ত্র। শিল্পীকে পৃথিবীর কোনো কিছুই রুদ্ধ করতে পারে না। তিনি বলেন, একসময় আরবদের সমাজে প্রাণীর ছবি আঁকা নিষিদ্ধ হলো। তুমি লক্ষ করেছ নীনা, সে সময়ের মসজিদে, পোস্টারে যে আরবি হরফ দেখা যায়, তার বিভিন্ন টানের মধ্যে অদ্ভুতভাবে কিছু প্রাণী, ধরো, পাখির ডানা, উটের মুখ, হরিণের লেজ এইসব অস্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসে কী না ? এক পর্যায়ে প্রসঙ্গ অন্যপথে মোড় নেয়। ঘুরে আসে ফের সেটা আমার দাম্পত্যজীবনে, তার ভাঙন, এবং সেই

পুরনো কাসুন্দি— শতকরা নিরানব্বইজন মেয়ে যেখানে আপোস করছে, আমি কেন তা করি নি, কতটা অসহিষ্ণু আমি, কতটা অপমানিত, কতটা র‍্যাডিক্যাল, আরো কিছুদিন আমি অপেক্ষা করতে পারতাম কি-না, এ সম্পর্কে আমার অভিমত, দেয়ালে পিঠ ঠেকার আগেই আমি বেরিয়ে এসেছি... ইত্যাদি।

কী করে জানো তুমি, দেয়ালে পিঠ ঠেকত ? তাঁর প্রশ্ন। উল্টোটাও হতে পারত। আরো ভালোর দিকে। মানুষই তো পরিবর্তনশীল। নইলে সে এখন তোমার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে কেন ?

যুক্তি দিয়ে শুধু সুন্দর তর্কই করা চলে, আমি বলি। মানুষের অনুভূতি, উপলব্ধির ক্ষমতা অনেক বড়। আঙুল কেটে তবে আমাকে বুঝতে হবে ক্ষরণের যন্ত্রণা ? আমি তা টের পেয়েছিলাম। আজ তার কাছে আমি দুর্লভ বলে তার পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা এত তীব্র। কিছু মানুষের স্বভাবই এই, ইচ্ছে করে হারিয়ে ফেলা জিনিস হাতড়ে বেড়ানো। এ নিয়েও অসংখ্য মতামত। আমার টেবিল চাপড়ানো। উত্তেজিত হয়ে কখনো দাঁড়িয়ে পড়া। তাঁর স্থির গোঁয়ার্তুমি।

একসময় ঝিম মেরে বসে থাকি।

কিছুক্ষণ পর তিনি ভেতর থেকে একটা খাম নিয়ে আসেন। এবং গলার স্বরে আজ্ঞার সুর ফুটিয়ে বলেন, এতে কিছু টাকা আছে, তোমার শোধ করার সামর্থ্যের হিসেব করেই দিয়েছি। দিচ্ছি লোন হিসেবেই। তুমি অন্যভাবে নিলে আমি কিন্তু এবার আহত হবো।

কেমন জমে যাই। কেবল বলি, আমি তো চাই নি। কেন আপনি দিচ্ছেন ?

দেখো নীনা, তুমি যদি তোমার সাথে আমার সম্পর্কটাকে সব সময় ফর্মাল রাখতে চাও, আমার তাতে কষ্ট পাওয়া ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না। কিন্তু মানুষের মূল সঙ্কটকে মানুষ কখনোই চেপে রাখতে পারে না। অবচেতনের গহন তলদেশ ফুঁড়ে সেটা বেরিয়ে আসবেই। আর্থিক সঙ্কট সম্পর্কে ক্ষিপ্ত হয়ে তখন তুমি বললে না, আমার মতো যদি আপনার মানুষের কাছে লোন থাকত, যদি একটা ফ্যামিলির চাপ থাকত, স্রেফ দেড় দু'হাজার টাকা লোনের ভয়ে পালিয়ে বেড়াতে হতো... এসব বলে বলে আমাকে কোণঠাসা করলে, ক্ষিপ্ত হলে তো তোমার কিছু মনে থাকে না। আপাতত দু'হাজার লোন শোধ কর। আমারটা সুবিধে মতো দিও।

তাইতো, এতক্ষণে আমার হুঁশ হয়। এমন একটা তর্কের ব্যাপার বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম ? আসলেই আমার আর্থিক সঙ্কট এখন চরমে। মাঝে মাঝে রাতে স্রেফ বিস্কুট আর পানি গিলে পড়ে থাকি। তিনি ও কথা বলায় আমার সামনে আমার জঘন্য জীবন, দু'তিন পয়সার কর্কশ হিসেব, খেই হারিয়ে ফেলা, এসব এসে দাঁড়ায়। আমাকে কেমন বিপন্ন, অসহায় করে তোলে। তাই তো, রন্জুর কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। সত্যজিতের ওখানে যাই না। আজ মাসের উনিশ পেরোনোর পর আমি ঝাড়া হাত-পা। লোনের টাকাও শেষ। আগামীকাল শানু বাড়ি যাবে, বলল তার টাকাগুলো দিয়ে দিলে তার ভালো হতো। কিন্তু যে রকম সঙ্কট, এবং সেই সঙ্কটকে ঘিরে সারাক্ষণ যে-রকম মানসিক চাপ, তাতে করে বড্ড ভয় পাই। ঠিক করেছিলাম, বাসায় গিয়ে বলব, আমার কাছে টাকা নেই। তুমি এখন আমাকে যেভাবে খুশি নিতে পার। কিন্তু তারপরও শরীরের মধ্যে হিম শীতল অস্থিরতা।

অফিসেও বেশ কিছু লোন হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ আগে এত তর্কের মধ্যেও ভাবছিলাম, টিউশানি শুরু করব। তাই ইরফান চাচার এই প্রস্তাবে আমার ভেতরে লজ্জা, গ্লানি, আনন্দের এক অদ্ভুত খেলা চলতে থাকে। কেমন অপমানও অনুভব করি। আস্তে করে বলি, দেখুন, আমি কি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপনার কাছে আমার অবস্থার সামান্য বর্ণনাও দিতে পারব না? আপনি কি ভাবছেন, এইসব বলেকয়ে আমি আপনার কাছ থেকে কিছুমাত্র সুবিধা আদায় করতে চেয়েছি?

তাঁর মুখ কেমন অন্ধকার হয়ে আসে। নিঃশব্দে খামখানা নিয়ে তিনি একটি ম্যাগাজিনের নিচে চাপা দিয়ে রাখেন। কি করব, দুর্মর সংশয়ের ভাবে বিহ্বল হয়ে পড়ি। আমার সঠিক অবস্থাটা আমি ঠিক এখনই অনুভব করতে পারছি। আর্থিক অন্তঃসারশূন্যতা আমাকে কদ্দূর টেনে নিয়ে যাবে কে জানে? বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে। ঘরে হলুদাভ আলোর বর্ণবিচ্ছুরণ। ইরফান চাচা তখন গম্ভীর, নিশ্চুপ।

ঘোর আলোর অবয়ব ছিঁড়ে দাঁড়াই। অসহায় আর্ত স্বরে তিনি বলেন, আমি টাকাগুলো তোমাকে দান করতে চাই নি।

বুকের মধ্যে ফরফর পাক খায় খরশান রোদ। কুশ্রী জটিলতাগুলো অগ্রাহ্য করে ম্যাগাজিন উঠিয়ে খামখানা নিয়ে ব্যাগে ভরি। দরজার দিকে এগিয়ে যাই ঠোঁটে মৃদু হাসি ঝুলিয়ে। তিনি এগিয়ে আসেন দরজায়, তোমার ন্যুড স্কেচটি আমি রেখে দিলাম। মেয়েদের হাতে এসব এত সুন্দরভাবে আসতে পারে, আমার ধারণায় ছিল না। তুমি আঁকো নীনা, এঁকে তোমার নাম করতে হবে না। নিজের জন্যই আঁকো। এর বেশি আমি কিছু বলব না।

আমাকে আপনি ভালোবাসেন, তাই খুঁতগুলো আপনার কাছে কম ধরা পড়ে... হাসতে হাসতে চিরদিনের সন্ধ্যার পথে পা বাড়াতে যাব, আচমকা তিনি আমাকে দাঁড়াতে বলেন। তারপর আমি তাঁর চরিত্রের হঠাৎ কিছু করে ফেলার আরেক রহস্যের মধ্যে ঢুকে পড়ি। আমাকে ডেকে নিয়ে যান তিনি তাঁর সেই পুরনো কারুকাজ করা কামরায়। যেন জাদুঘর। এই ঘরে এসে কেমন বিহ্বল হয়ে পড়ি। সেই পুরনো গন্ধ। অভিনব সংগ্রহ। আলমিরা খুলে বের করেন এক ফুট লম্বা একটা রঙিন মোমবাতি। সাপের দেহের মতো বাঁকানো, ঠোঁট দিয়ে বেরিয়েছে সুতোর ডগা। ফুঁ দিয়ে ঝেড়ে ফশ্ করে দেশলাই জ্বালান। স্ট্যান্ডের ওপর রেখে সেটাকে জ্বালিয়ে দেন। বলেন, তোমাকে একটা চমৎকার অংশ শোনাবো, তাই আটকালাম। সবকিছুর জন্যে একটা পরিবেশ দরকার... বলতে বলতে বইয়ের স্তূপ ঘাঁটতে থাকেন। আমার ভেতরে অবিরাম কাঁপুনি। খসখস কী সব পাতা খুলে বাতি নিভিয়ে তিনি আমার পাশে এসে বসলে আমার সেই কাঁপুনি আরো দ্রুততর হয়। রানু, মজুমদার, আর চারপাশের অন্ধকারে মোমবাতির অগণন চক্রের ঘূর্ণি। যে ভয়াবহ ছবি বুকের মধ্যে চিত্রিত, সেই কুশ্রী ছবিগুলো আমার প্রাণজাল ছিঁড়ে কিছুতেই বের হয় না।

কিন্তু এক অভিনব সৌন্দর্যে কিছুক্ষণ পরই আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। বাইবেল খুলে, যেন কোনো পাদ্রি, এমন অনড় গম্ভীর স্বরে পড়তে শুরু করেন। বলেন, সোলেমানের পরমগীতের একটা অংশ তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি। কেন যেন হঠাৎ মনে হলো, তোমাকে এর কিছু অংশ শোনাই। তুমি কি অস্বস্তি বোধ করছ?

আমি অভিভূত হয়ে মাথা নাড়ি, না। আমার সম্মতি পেয়ে তারপর তিনি পড়তে শুরু করেন—

আমি নিদ্রিতা ছিলাম, কিন্তু আমার হৃদয় জাগিয়া ছিল।
আমার প্রিয়ের স্বর, তিনি দ্বারে আঘাত করিয়া কহিলেন,
আমায় দুয়ার খুলিয়া দেও, অয়ি মম ভগিনী, মম কপোতী। মম শুদ্ধমতী!
কারণ, আমার মস্তক ভিজিয়া গিয়াছে শিশিরে!
আমার কেশপাশ রাত্রির জলবিন্দুতে।
আমি আমার অঙ্গরঙ্গিনী খুলিয়াছি, কেমন করিয়া পরিধান করিব ?
আমি পা দু'খানি ধুইয়াছি, কেমন করিয়া মলিন করিব ?
আমার প্রিয় দুয়ারের ছিদ্র দিয়া হস্ত বিস্তার করিলেন।

দপ্‌দপ্‌ মোমবাতি জ্বলছে। ইরফান চাচার গলায় কী ভীষণ আবেগ, ডোরাকাটা আলো-ছায়ায় কী অদ্ভুত গুঞ্জনধ্বনি! আমার তরঙ্গিত রক্তের খাঁজে খাঁজে কী আশ্চর্য ঘ্রাণ। আমি তাঁর দেবতুল্য চেহারার দিকে চেয়ে আছি। কী চমৎকার ঘ্রাণ! যেন একাকী প্রাচীন গ্রিক নগরীর উঁচু কোনো চত্বরে বসে তিনি পড়ে যাচ্ছেন।

তাহার জন্য আমার চিত্ত উচাটন হইল।
আমি আপন প্রিয়ের জন্য দুয়ার খুলিতে উঠিলাম।
তখন গন্ধরসে আমার হস্ত ভিজিল।
অর্গলের হাতের উপরে।
আমি আপন প্রিয়ের জন্য দুয়ার খুলিয়া দিলাম।
কিন্তু, আমার প্রিয় ফিরিয়া গিয়াছিলেন। চলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি কথা কহিলে আমার প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল।
আমি তাহাকে অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু পাইলাম না।
নগরে ভ্রমণকারী প্রহরীরা আমাকে দেখিতে পাইল।
তাহারা আমাকে প্রহার করিল, ক্ষত-বিক্ষত করিল...।

এইটুকু পড়েই তিনি থেমে যান। চারপাশে প্রগাঢ় নৈঃশব্দ্য। তিনি খোলা পাতা বন্ধ করে আমার দিকে তাকান। আমার জলে-স্থলে-অন্তরিক্ষে তখন কী ভীষণ তোলপাড়! আমি নিজেই বুঝতে পারছি না, একটা প্রাচীন কামরা, একটা দীর্ঘ মোমবাতির শিখা, একজন মধ্যবয়সী লোকের সৌম্য কণ্ঠে এমন কী মায়া, যার টানে আমার ঘিনঘিনে জীবন, হিসেব-নিকেশ, আমার উৎপীড়িত অতীত সব দ্রুত সরে যাচ্ছে, দূরে... বহুদূরে। আমি ম্লান চোখে সেই অপসৃয়মাণ জঘন্য ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকি। এক জীবন যদি এই রকম পরিবেশের মধ্যে বুঁদ হয়ে থাকা যেত! যদি তা-ই হতো ?

আমি প্রশ্ন করি, তারপর ?

ঘোর ছিন্ন করে তিনি পাতা ওল্টান, বলেন, দেখো, সোলেমান সেসময় আরেকটি অংশে কী লিখেছিলেন—

আমাদের একটি ছোট ভগিনী আছে,
তাহার কুচযুগ নাই;

আমরা নিজ ভগিনীর জন্য সেদিন কী করিব,
যে দিনে তাহার বিষয়ে প্রস্তাব হইবে ?
সে যদি ভিত্তি স্বরূপা হয়,
তাহার উপরে রৌপ্যে গম্বোজ নির্মাণ করিব।
সে যদি দ্বার স্বরূপা হয়, এরস কাষ্ঠের কবাট দিয়ে তাহা ঘেরিব।

তিনি বইটা ভাঁজ করে রাখেন। আমি অস্ফুটে প্রশ্ন করি, তারপর ?

থাক, বলে নিজেকে দ্রুত সামলে নিয়ে তিনি কী যেন বলতে চান। আমি হকচকিয়ে দাঁড়াই, প্লিজ বলবেন না, আপনি ছেলেমানুষী কিছু করেছেন। তাহলে পুরো স্বপ্নটার মৃত্যু হবে— একথা শুনে এমন ভঙ্গিতে তিনি হাসেন, আবারো তার কাছে আমি একজন সরল ছেলেমানুষে রূপান্তরিত হই।

তিনি বাতি জ্বালাতে চাইলে আমি দ্রুত বাধা দিই। কী অদ্ভুত! ছেলেবেলায় আচ্ছন্ন হওয়া, কেঁদে কেঁদে বুক ভাসানো একটা গল্প হঠাৎ আমাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছে। আমি তাঁকে বলি, আপনি সেই রূপকথাটি পড়েছেন ? এক মৎস্যকুমারী, সে ভালোবাসত ডাঙার এক রাজকুমারকে, কী দুর্বহ যন্ত্রণা তার। জলে পতিত রাজকুমারকে সে সেবা দিয়ে ভালো করে তোলে। শেষে একদিন এক জাদু-বুড়ির কাছ থেকে সে মানুষ হওয়ার জন্য প্রচণ্ড কষ্ট সত্ত্বেও নিজের লেজটা কাটিয়ে ফেলে। যখন প্রাসাদে যায়, দেখে রাজকুমার বিয়ের মঞ্চে বসে আছে। তাকে আর চিনতে পারে না। সেই জাদু-বুড়ি বলেছিল, মানুষ হয়ে তুমি যদি এরপর জলে ফিরে আসতে চাও, তোমার কোনো অস্তিত্ব থাকবে না, তুমি ফেনা হয়ে যাবে। বিশাল সমুদ্র! জাহাজে করে বউ নিয়ে যাচ্ছে রাজকুমার। জাহাজের পাটাতনের কিনার ঘেঁসে দাঁড়িয়ে অঝোর ধারায় কেঁদে চলেছে মৎস্যকুমারী। শেষে বিকট তরঙ্গ রাশির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ধীরে ধীরে সে ফেনা হয়ে জলের সাথে মিশে যায়।

চেয়ারে স্থির বসে আছেন ইরফান চাচা। তাঁর মুখ উদ্ভাসিত। আমি সমস্ত ঘরে পাক খাই। সেই আলমিরাটির সামনে দাঁড়াই। যেটা অভিনব সব ছোট আকারের মূর্তিতে ঠাসা। বলি, ধরা যাক এটা একটা জাহাজ, আমি মৎস্য কুমারী। লেজ কেটে গিয়ে নতুন গজানো পা থেকে রক্ত ঝরছে, ধরা যাক, এটা সেই রেলিং। আমি ঘরের কোণের বিশাল কারুকাজ-করা চেয়ারটাকে মাঝখানে নিয়ে আসি। চোখ বুজে বলি, অদ্ভুত জলরাশি সামনে, কী ভীষণ স্রোত, হে তরঙ্গ আমাকে গ্রহণ কর। আমি তলিয়ে যাই, ফেনা হয়ে যাই... বলতে বলতে চেয়ার থেকে হাত সরিয়ে উবু হয়ে বসে পড়ি মাটিতে। সেই অবস্থায় বিহ্বল চোখ মেলে ইরফান চাচার মুখ দেখি। তাঁর দৃষ্টি ঋষ্যশৃঙ্গের চোখের মতো নিষ্পাপ। এমনভাবে চেয়ে আছেন, গভীর অরণ্যে তরঙ্গিনীকে দেখে ঋষ্যশৃঙ্গের যে দশা হয়েছিল, তাঁর সমস্ত দৃষ্টিতে ঠিক সেই বিস্ময়। তারপর অন্ধকার। কুয়াশাচ্ছন্ন পথ সামনে। এবং এক ভয়াবহ নীরবতায় ঢেকে যায় আমার চারপাশের পৃথিবী। আমি হাঁটুতে মুখ ডোবাই।

ইরফান চাচা আমাকে টেনে দাঁড় করান। চারপাশে বাতি জ্বলে উঠেছে। আমার চোখ জলে ভিজে গেছে। আজ যে কী হয়েছে আমার! ইরফান চাচা কেন আমাকে বুকের কাছে চেপে ধরছেন না ? দীর্ঘ বছর পর আজ আমি ভেসে যেতাম! যন্ত্রণায়, আগুনে পুড়ে আমি খাক হয়ে যাচ্ছি। কেন তিনি আমাকে গ্রহণ করছেন না ? তিনি শুধু বলেন, চলো, আজ তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিই। প্রতিদিনের মতোই তাঁর কণ্ঠস্বর সংহত, অবিচল।

ঘর থেকে বেরোতেই মনে হলো একটা ছায়া দ্রুত অপসৃয়মাণ। লক্ষ করে দেখি, পেছনে ছড়ানো চুল, ইরফান চাচার স্ত্রী। যেন পায়চারি করতে করতে টানা বারান্দা ধরে নিজের ঘরে যাচ্ছেন। বুকের ভেতরটা আচমকা ছলকে ওঠে। বিস্মিত চোখে ইরফান চাচার দিকে তাকাই। তিনি ঘরে নিঃশব্দে তালা লাগাচ্ছেন। মহিলা আড়ি পেতে ছিলেন তবে ? রাস্তায় এসে এ নিয়ে আর কথা হয় না। আমি অনেক ভেবেও এই ঘটনার মর্মভেদ করতে পারি না। সত্যিই তাঁর স্ত্রী অদ্ভুত চরিত্রের।

রিকশা চলছে হালকা কুয়াশায় আলো-ছায়ার পথ ধরে। আমি আবারো আপাদমস্তক ডুবে যেতে থাকি আজকের পুরো ঘটনার জট-জটলার মধ্যে, তিনি বলেন, জানো, আমিও ঠিক এমন ছিলাম। কোনো গল্পের মধ্যে এভাবে নিজেকে ঘুলিয়ে ফেলতাম। স্টার সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে নিজেকে মনে হতো উইলিয়াম হোল্ডেন কিংবা উত্তম কুমার। রাস্তা ধরে হাঁটতাম। চারপাশে অহঙ্কারী মাথা তুলে তাকাতাম, এক মুহূর্তের জন্যও নিজেকে সেই চরিত্রের বাইরের কেউ মনে হতো না।

একদিন তো এই নিয়ে আমার স্ত্রীর সাথে গোলমাল লেগে গেল। দু'জনই কী একটা ছবি দেখে ফিরছিলাম। নায়িকা ছিল গ্রেটা গার্বো। ছবির হুবহু দৃশ্যের মতো করে ওর পিঠে মুখ রেখে ফিসফিস করছিলাম, উফ্ গ্রেটা, আমার গ্রেটা... পরিণতি তো বোঝোই। আশ্চর্য! বয়সের সাথে সাথে কী অদ্ভুতভাবে মানুষের মন থিতিয়ে আসতে থাকে। চারপাশে রাতের মন্থর দৃশ্য। ঠিক এই বিশেষ মুহূর্তে হঠাৎ করে মনে হয়, তিনি তার সময়কার গল্প করছেন, তার পরের প্রজন্মের এক মেয়ের কাছে। মানুষটার বয়স হয়েছে।

চাচির কাছে গিয়ে কখনো আমার মায়ের কথা মনে হওয়ায় নিজেকে ঘুলিয়ে ফেলেন নি ? কী এক বেদনাধূসর গভীরতা থেকে, জেদ থেকে আমি তাঁকে এমন একটা প্রশ্ন করে বসি। করার পর বোধোদয় হয়, কোনো মানে হয় না এসব প্রশ্নের। সোডিয়াম বাতির তামাটে আলোয় নিমজ্জিত চারপাশ। অনেকটা টানা পথে কোনো কথা হয় না। এই প্রথম আমার হাত তিনি তার হাতে টেনে নেন, মৃদু চাপ দিয়ে বলেন,এইরকম চিন্তাভাবনাহীন প্রশ্ন তোমাকে মানায় না। তুমি অনেক পরিণত।

আমাদের গলিতে অসম্ভব বন্ধুরতা আর চিরকালীন পচাগন্ধ। বাসার কাছে এসে তিনি বলেন, এই রিকশাতেই ফিরে যাই। আজ আর বাসায় ঢুকব না।

ধীর পায়ে নেমে আসি। রাতের পাতলা ঠাণ্ডা বাতাস। আমি হেসে বলি, খুব ছেলেমানুষী হয়ে গেল হয়তো। রিকশা ঘুরলে তিনি জোরে হাসেন, দেখেছ, শেষ পর্যন্ত কিন্তু তোমার কাছেই ছেলেমানুষী মনে হলো।

বাসায় এসে রীতিমতো চমকে উঠি। গম্ভীর মুখে শানু দরজা খুলে দিয়েছে। রেজাউল বিড়ি ফুঁকছে। আমার বিছানায় পা উঠিয়ে বসেছে সত্যজিৎ। কেমন অবসাদ অনুভব করি। ব্যাগ রেখে 'কেমন আছ ?' সেরে ভেতরে গেলে শানু গলা তুলে বলে, ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দাও। এখন ওর সাথে কথা বললেও তোমার পাপ হবে।

পরিচয়পর্বও হয়ে গেছে তাহলে! বাইরের ঘরে এসে রীতিমতো রুক্ষ মেজাজে টানটান বসে থাকি। অনেকটা নিজেকে রক্ষা করার জন্যই। নিশ্চয়ই আমার এই রাতে ফেরাফেরি

নিয়ে কোনো কঠোর মন্তব্য হজম করতে হবে। কিন্তু বড় নিভন্ত রেজাউলের দৃষ্টি। বড় আপন মানুষের মতো বলে, আজ তোমাকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। তাছাড়া আমরাও এসেছি অনেকক্ষণ। আজ চলি। অন্য কোনোদিন আসব।

সত্যজিৎ বলে, তুই নীনার সাথে অত ভদ্রতা করছিস কেন ? কী যে অদ্ভুত মানুষের চরিত্র! এক সময়, এক সাথে, একঘরে কতদিন ছিলি, আর আজ এমন ভঙ্গিতে কথা বলছিস, যেন আজই প্রথম পরিচয়। রেজাউল দাঁড়িয়ে স্যান্ডেল পরে। নারে, সারাদিন খুব টো-টো করতে হয়েছে। শালার পেটের ধান্দা। আমার নিজেরই বড্ড ক্লান্ত লাগছে।

তুই যা, আমি নীনার সাথে কিছু কথা বলব। সত্যজিতের কথায় গেটের কাছে চলে যায় রেজাউল।

পুরো ব্যাপারটা কি প্ল্যান করে করা হয়েছে ? ঝাঁঝালো স্বরে প্রশ্ন করি। আমি এলে সত্যজিৎকে বসিয়ে তুমি চলে যাবে। অত ভণিতার দরকার কী ? দাঁড়িয়ে যায় রেজাউল, তোমার পক্ষে সেটা ভাবা খুবই স্বাভাবিক। সহজ করে কিছু দেখার মতো সরলতা তো তোমার মধ্যে নেই।

সত্যজিৎও দাঁড়ায়— আমিও চলে যাচ্ছি। নীনা তুই কিন্তু আমাকেও অপমান করলি।

অত সেনসেটিভ মন নিয়ে বন্ধুত্ব করিস! আমি হেসে ফেলি। তুমিও বসো না রেজাউল! পেটের ধান্দা তো আমাকেও করতে হয়। রেজাউল তারপরও বড় স্নেহার্দ্র স্বরে বলে, নারে আজ যাই, শরীরটা সত্যিই ভালো ঠেকছে না। অন্যদিন আসব।

আমার আহ্বান উপেক্ষা করে তার চলে যাওয়ার ভঙ্গিটিকে বড় অকৃত্রিম ঠেকে, যদিও তার সাথে আমার সম্পর্কজনিত কেতা-কায়দা আমার কাছে বড় অস্বস্তিকর লাগে।

সে চলে যেতেই ঘরে প্রগাঢ় নির্জনতা। আমার সামনে তরঙ্গরাশি... হে সমুদ্র আমাকে গ্রহণ কর, হে তরঙ্গ, আমাকে ফেনায় রূপান্তরিত কর... তারপর আমাকে অসাড় করে নবজাত শিশু দীর্ঘদিন পর কেঁদে ওঠে, বুকের মধ্যে তাকে ঠেসে ধরি। আমার ছোট চাচার ঝুলন্ত দেহ সিলিং ফ্যানের মধ্যে পাক খায়। কেমন বিহ্বল হয়ে পড়ি।

নীনা, সেদিন লেকের পাড়ের ঘটনার পর থেকে তুই আমাকে এড়িয়ে চলছিস, আমি কি জানতে পারি, কেন ? সত্যজিতের এই প্রশ্নে আমি অতল থেকে ওপরে ভেসে উঠি। ঘুমন্ত চোখে তার দিকে তাকাই। কিছু বলি না।

তুই সেসব প্রসঙ্গে সম্মতি বা প্রতিবাদ কিছুই করিস নি। সত্যজিৎ বলে, এখানে আমার দোষ কোথায় ?

তোকে আমি দোষ দিয়েছি ? আমি আসলে বড় ব্যস্ত। এসব ব্যাপার নিয়ে বুলি কপচাতে বড় নোংরা লাগে।

তুই রেজাউলের ব্যাপারে কিছু ভেবেছিস ? সে খুব সন্তর্পণে অন্য প্রশ্নের দিকে যায়।

কোন ব্যাপারে ? আমিও না জানার ভান করি।

ও তোর সাথে আবার এক হতে চাইছে।

এবার আমার পালা। চেয়ার টেনে সহজ হয়ে বসি। দু'হাত ওপরে তুলে চুলের রাবার ব্যান্ড খুলতে খুলতে সহজ গলায় বলি, আমার না কী সব সেক্সচুয়াল ট্রাবল আছে! এখন কি সে ভাবছে সেসব অসুবিধে কাটিয়ে আমি অন্য নীনা হয়ে উঠেছি!

হয়তো এসব এখন তার কাছে বড় কোনো ফ্যাক্টর নয়, সত্যজিৎ বলে, মানুষেরইতো চেঞ্জ হয়!

সে বলেছিল না, কী সব বিকারগ্রস্ততা আছে আমার, দীর্ঘদিন একা থাকার পর আমার সেসব আরো বেড়েছে, খুব ধীরে ধীরে বলি, আমি সেই রূপান্তরের এক এক করে বিশ্লেষণ দেব তার কাছে, শুনে সে এক হতে রাজি হলে আমিও রাজি।

তুই খুব সহজেই খেপে উঠিস, সত্যজিৎ বলে। বিছানায় তুই ওকে সহ্য করতে পারতি না, একথা ঠিক নয়?

একজন ভদ্রলোক দরজা বন্ধ করেই, লাইট জ্বলছে, দড়াম করে আমার সামনে উদোম হয়ে গেল, তারপর হনুমানের মতো আমার দিকে এগিয়ে আসতে থাকল, হ্যাঁ, তোকে অশ্লীলভাবে বলতে হচ্ছে, তার পাশে শুয়ে আমি তারপরও উষ্ণ হয়ে উঠতে পারি? সবকিছুর মধ্যে ন্যূনতম শিল্প বলে তো কিছু থাকা চাই।

আমার শরীর থেকে আবারো ক্লেদাক্ত কষ বেরোয়। কান্না ঠেলে উঠতে থাকে। যেন মাংস, যকৃত, প্লীহা সবকিছু ফুঁড়ে আবারো ঢুকছে সেই শলাকা, যা আমি উপড়ে ফেলেছি। দেয়ালে ঠেস দিয়ে বিছানায় বসেছে সত্যজিৎ। শানু ভেতরে থাকায় অস্বস্তি অনুভব করি। এবং স্রেফ রক্ষণশীল মহিলার মতো আপন কারো কাছে নিজের প্রাক্তন স্বামীর এরকম খোলামেলা বদনাম করে মনের গহনে আবার কষ্টও বোধ করতে থাকি। নিজেকে অসম্ভব গতানুগতিক মনে হয়। ডিভোর্স হয়ে গেলেই কেন একজন মানুষ সম্পর্কে ঘৃণা বা বিদ্বেষ-মেশানো কথা উচ্চারণ করতে হবে? কিন্তু প্রসঙ্গের ভেতর ঢুকে পড়েছি, স্ববিরোধী আচরণে বেরিয়ে পড়াটাও এখন একটা সমস্যা।

এটা তোরই প্রব্লেম, সত্যজিৎ বলে। হাজারটা দম্পতির খোঁজ নিয়ে দেখ, দু'জনের সামনে দু'জনের নগ্নতা, তা সে যে রকমেরই হোক, তাদের কাছে নর্মাল, সহজ। এটা তো প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমের সম্পর্ক নয়।

তবে সেই হাজারটা মেয়ে থাকতে আমাকে আবার তার দরকার পড়েছে কেন? চেষ্টা তো সে কম করে নি, আমি সব কিছুর মধ্যে সৌন্দর্য খুঁজি, কুৎসিত কদাচার পশুত্ব আমার কাছে অসহ্য।

তুই তাকে বাজে সন্দেহ করতি, সত্যজিৎ বলে। তার কাছে কম বয়সী কোনো ছেলেবন্ধু এলে তুই তাদের সাথে সহজ ব্যবহার করতি না, এটাতো ঠিক। মানুষেরই সন্তান হয়, সন্তানের মৃত্যু হয়। সন্তানের মৃত্যুর পর তুই তাকে পুরোপুরি এড়িয়ে চলতি। এই করে করে তার জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিলি, হাজার হোক সেও তো রক্তেমাংসে গড়া মানুষ। তুই তার ক্রাইসিসটা দেখবি না?

ছেলেবন্ধু এলে কেন সহজ ব্যবহার করতাম না, সে কথা তোকে বলে নি? সেই বিকৃতিও কি আমার?

আমি সে কথাও জানি। সত্যজিৎ বলে, ও সেটা অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছিল। অতীতকে সামনে টেনে তুই তার বর্তমানকে দুর্বিষহ করে তুলতে পারিস না।

আমাকে বিয়ের আগে সে তার সেই অতীত বলে নি, একদিক থেকে সে আমাকে ঠকিয়েছে। আমি সন্দেহ করার পর তবেই বলেছে। দেশের নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট মেয়ে

তাদের স্বামীদের অতীতের কুকীর্তি ক্ষমা করে দেয়, আমি সেও না হয় মানছি। কিন্তু সেই অতীত যদি আমার বর্তমানের সুখ নষ্ট করে দেয়? আমাকে তা-ও সহ্য করতে হবে, মেনে নিতেই হবে, এমন দায় আমাকে কে দিয়েছে? তাছাড়া আমার সন্তানের মৃত্যুর পর— আমি জানি মানুষের সন্তান হয়, মৃত্যু হয়, তুই তৃতীয় ব্যক্তি, তোর পক্ষে এটা বলা আরো সহজ; কিন্তু সন্তানটির জন্ম দিয়েছি আমি, সহ্য ক্ষমতা সবার সমান থাকে না— যেখানে আমি দারুণভাবে বিপর্যস্ত, উন্মাদপ্রায়, তুই বিশ্বাস করবি, পাঁচ দিনের মাথায় সে আমার শরীরের জন্য কাঙাল হয়ে উঠেছিল। আমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে সে-কি কাকুতিমিনতি। এরপর থেকে প্রায় প্রতিদিন। কখনো জন্তুর মতো আক্রমণ করতে চাইতো। আমি তারপর থেকে তার প্রতি ধীরে ধীরে সব শ্রদ্ধা হারাতে শুরু করেছি। আমাকে সে তখন একবিন্দু মানসিক আশ্রয় দেয় নি। সে কি সন্তানের পিতা ছিল না? আমি কি তার শোককে অস্বীকার করব? বললাম তো, সবার সহ্য ক্ষমতা সমান থাকে না। আমি তবে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্টের দলে পড়ি না।

বলতে বলতে হাঁপিয়ে উঠি। অনুজ্জ্বল আলোর স্রোতে আমার কম্পিত দেহ ক্রমশ থিতু হয়ে আসে। লম্বা মোমবাতির শিখাটি দপ করে জ্বলে ওঠে সামনে। কী সৌম্য মূর্তি, আবৃত্তি করছেন— তাহার জন্য আমার চিত্ত উচাটন হইল... তরপর ভেনাসের সেই স্কালপ্চার, স্পষ্ট ভেসে ওঠে— অসহ্য সুন্দরকে স্পর্শ করা যায় না। একটা স্থির রুপোর নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল করে সুন্দর। ঝাঁপিয়ে পড়ি, তছনছ করে দিতে চাই মানুষের সহজাত প্রবণতায়। ফিরে এসে দেখি, ছুঁয়েছি, এই সুখটুকু ছাড়া আর কিছুই নিয়ে আসি নি। সুন্দর তেমনই স্থির অনড়, জ্বলজ্বল করছে।

এই মানুষটার সাথে পরিচয় না হলে আমি জীবনের কতটুকু চিনতাম? এবং তারপর আরেকটি কক্ষ। কোমল নরোম রানুর দেহ একটা বিশাল দৈত্যের হাতের ওপর। আবিষ্ট রানু চোখ বুজে আছে। কী ভয়াবহ, আশ্চর্য এক ঘ্রাণ! কোত্থেকে আসছে! আগরবাতির! বাবার লাশ বিছানায় শোয়ানো! কী ধোঁয়া চারপাশে! সব অস্পষ্ট, ঝাপসা।

সে অনেক বদলে গেছে, মেঝেতে নেমে সত্যজিৎ বলে, আজই আমাকে আসতে আসতে বলছিল, তোর কাছে সে কোনো সৌন্দর্যের ধার ধারত না, এটা তার একটা বড় ভুল ছিল। নীনা, তোর কি শরীর খারাপ?

কেমন ঝিমঝিম করছে মাথা। রাত অনেক হয়েছে। সত্যজিৎ দরজার কাছে গিয়ে তারপর বলে, আমি তোকে জোর করব না। তুই চিন্তা করে দেখতে পারিস। ও ভীষণ নিঃসঙ্গ।

এবার দুর্বিষহ এক বেদনা আমার বুকে চিৎ হয়ে শোয়। মাঝে মাঝে কাত হলে একটু শ্বাস টানতে পারি। এক রাতে প্রচণ্ড মাথা ব্যথার সময় রেজাউল অনেক রাত অব্দি আমার মাথা ম্যাসেজ করে দিয়েছিল। সমস্ত কালিমা ছাপিয়ে হঠাৎ সেই দৃশ্য আমাকে বিহ্বল করে তোলে। সেই রাতের সেই মায়াময় রেজাউল হঠাৎ আমাকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরে, সত্যজিতের সাথে আমার এসব তর্কে কেমন কান্না পেতে থাকে। শুধু ওর কাসুন্দি ঘাঁটলাম। সহনশীলতার অভাব আমার ভেতরে কি কম ছিল? নিজেকে ছেঁটে কি মনে হতেই দ্রুত ব্যাগ খুলি, এই টাকাগুলো রনুজুকে দিয়ে দিস্। অনেকদিন হয় নিয়েছি।

সেদিন সে বলছিল, সত্যজিৎ বলে, ভালোই করেছিস। তার অবস্থা বিশেষ সুবিধের না। কী সব পার্টনারশিপ করবে বলে ক'দিন বেশ নাচল। এখন আবার ফুটো বেলুন।

ওকে আসতে বলিস... বলে আবারো অবসাদের কোলে। কেমন ঝিমুতে থাকি। সত্যজিৎ চলে গেলে শুরু হয় শানুর সাথে টাকার হিসেব। কাল ভোরে সে বাড়ি যাচ্ছে, সাথে কামাল ভাই। শেষে আমাকে শানু বলে, ছেলেগুলো এভাবে তোমার এখানে আসে, একটু হিসেব করে চলো। আশেপাশে কানাঘুষো শুরু হয়েছে। বাড়িওয়ালা আজো শাসিয়ে গেছে, বলে ডিভোর্সি মেয়ের চরিত্র কী হতে পারে আমি জানি। একবার যে মাংসের স্বাদ পায়—।

প্লিজ, প্লিজ শানু থামো, আমি ডুকরে কেঁদে উঠি, ছিঃ! ছিঃ!

পরদিন পুরো বাড়িতে আমি একা!

বিকেলে হন্তদন্ত হয়ে অফিসে এসে ওমর বলে, আপনার একটা চমৎকার টিউশানির ব্যবস্থা হয়ে গেছে। তারপর ধপ্ করে চেয়ার টেনে বসে খোলা ফ্যানের নিচে। সামনের শার্টের বোতাম খুলে দেয়। আজ তার চেহারার অবস্থা আরো দুর্বিষহ। রীতিমতো অসহ্য লাগে। আমার কথার অপেক্ষা না করেই সে বলে চলে, কালই তবে জয়েন করছেন?

এরকম হনুমানের মতো দাড়ি রেখেছেন কেন? আমি বলেই ফেলি, ইয়াংম্যান, একটু সচেতন যদি না থাকেন। কেউ আপনাকে কিছু বলে না?

বলবে না কেন? হাঃ হাঃ হাসে ওমর। এই তো আপনি বললেন। তাতে কি? বুঝলেন, কয়লার চরিত্র। তার পরপরই প্রসঙ্গটা এড়িয়ে খুব সহজ গলায় বলে, আসার সময় যা একটা দৃশ্য দেখলাম না! বুঝলেন, একটা মিনিবাস একজন কিশোরীকে চেপ্টে দিয়ে গেল। একদম আমার চোখের সামনে। যা রক্ত!

মরে গেছে? আমি প্রশ্ন করি।

হেঃ হেঃ! অত বড় একটা মিনিবাস, ওইরকম পুঁচকে একটা ছুঁড়ি, বেঁচে থাকে কী করে? তার এইরকম ভাব-ভঙ্গি দেখে হঠাৎ করেই খেপে উঠি আমি। মৃত্যুর সংবাদে এত হাসির কী আছে? আশ্চর্য মানুষ তো আপনি!

তবে কাঁদব নাকি? ওমরের কোনো ভাবান্তর হয় না। মৃত্যু কোনো ব্যাপার? আগে-পরে সবাইকে ওই চুলোয় যেতে হবে। এ নিয়ে ভেবে মরার সময়ের আগেই মরি আর কি!

এ লোকের সাথে এসব প্রসঙ্গে কোনো কথা চলে না। আপাতত কাজের কথাই হোক। প্রশ্ন করি, টিউশানির বিস্তারিত বর্ণনা দিন। টিউশানি এনেছেন বলেই ঝিম মেরে গেলেন যে?

ঝিম মারলাম কই?

আপনি যে বেশি বকবক করেন সেটা বোঝেন?

খুব বেশি করি কি? কানে লাগার মতো?

সেটা নিজে না বুঝলে আপনার যে বয়স হয়েছে, তাতে অন্য কেউ বলে বোঝাতে পারবে না। আপনার বিজনেসের খবর কী? *ঠাস্‌ঠাস্* প্রসঙ্গ পাল্টাতে শুরু করি।

এখন পর্যন্ত লাভের মুখ দেখছি। সে বলে, আরো ক্যাশ টাকা থাকলে এ লাইনে আরো শাইন করতে পারতাম। আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে।

সেটা থাকলে অনেকেই অনেক কিছু করতে পারে, আমি বলি। ওটা ছাড়া দেখুন কতদূর যেতে পারেন।

এখন টিউশনির কথা হোক, ওমরকে বেশ ব্যস্ত দেখায়, ধনীর একমাত্র মেয়ে, একটু পাগলাটে স্বভাবের। বেতন বেশ ভালো। আপাতত এক হাজার। তাকে ম্যানেজ করতে পারলে আরো বাড়বে। মেয়েটার পড়ায় একদম মন নেই।

আপনার সাথে কী করে যোগাযোগ হলো ?

আমার সাথে হবে না ? কার সাথে আমার যোগাযোগ নেই ? মেথর থেকে শুরু করে...। যাকগে, শুধু কাজের বেলায় ফ্যা ফ্যা। ভাবছি টিউশানির দালালি ধরলে মন্দ হয় না।

সেটা আবার কেমন ?

এই যে আপনাকে একজন এনে দিলাম। এতে আপনার একটা হিল্লে হলো। আপনি সেজন্য আমাকে কিছু দিলেন। এরকম যাকে জুটিয়ে দিলাম, সেও কিছু দিল। এইভাবে আর কী...।

ধুর ! এ ব্যাটার সাথে কথা বলে মাথাটা নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। পত্রিকা মেলে ধরি চোখের সামনে। খুন, ধর্ষণ, ছিনতাই, চাঁদাবাজদের উৎপাত! ভার্সিটির হলে প্রচুর অস্ত্র। সব ছাপিয়ে বড়ুয়ার গলা ঝনঝন বেজে ওঠে, বুঝলেন, ভারতে দাঙ্গা হয় আর এদেশের সরকার নিজের বিরুদ্ধে আন্দোলনের মোড় ঘোরানোর জন্য গুণ্ডাদের দিয়ে মন্দির ভাঙায়। বোঝেন খেলা! প্রসঙ্গটার প্যাঁচ থেকে গা বাঁচাবার জন্য আবার আমি ওমরের কাছে ফিরে আসি, দালালি ব্যবসা আমাকে দিয়েই শুরু করবেন ?

দেবেন নাকি ? সে সিরিয়াস ভাব করে— ঠিক আছে, আপনি না হয় এক বেলা চাইনিজ খাইয়ে দেবেন। অনেকদিন শালার ও খাবার খাই নি।

অনেকদিন আগে কে খাইয়েছিল ?

এবার কিন্তু ফালতু বকবক আপনি করছেন বেশি, ওমর খুব গম্ভীরভাবে বলে, আপনি তবে আজকেই যাচ্ছেন ?

আজকেই ? আমি বিস্মিত, সব কিছুতেই আপনার বেশি তাড়া।

এই আগামীকাল করে করেই আমাদের বাঙালিরা গেল...।

তার এই কথার পর বেরিয়ে পড়ি।

ঝাড়লণ্ঠনের আলো। দামি আসবাবপত্রে ঘর কেয়ারি করা। তার আগেই পেরিয়ে এসেছি সুবিশাল গালিচার মতো লন এবং লোমশ বিদেশী কুত্তা। অভিভূত হয়ে দেখছিলাম, পাথরে বাঁধানো ফায়ারপ্লেস। ঘরের কোণে উন্নত স্তনের রমণী, বড় জীবন্ত স্ট্যাচু। সেদিন দেখেছিলাম সাপের মতো প্যাঁচানো মোমবাতি। আগুন ধরানোর পর নিঃশব্দে গলছিল মোমমস্তক। আজ আরো অভিনব ফুলদানি। কাচের একটা অজগর হাঁ করে আছে। তার মুখে অজস্র নার্সিসাস ফুল। আর কী চমৎকার এয়ারফ্রেশনারের গন্ধ। আমি সেই মোহময় ড্রয়িংরুমে অভিভূত বসে থাকি। এই রকম পরিবেশে সবচাইতে বেঢপ লাগছে ওমরকে। সোফার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে নাক খুঁটছে। এক সময় গা-জ্বালানো গলায় বলে ওঠে, ব্যাটা জীবনে কামিয়েছে বেশ। ঘুস খেয়ে খেয়ে একেবারে পটকা মাছ।

কী করে জানলেন ঘুস খেয়েই ? আমি ফুঁসে উঠি।

সরকারি আমলা ছিল। যে বেতন পেয়েছে তাতে করে কি এই বেহেস্তপুরী করা চলে? ওমর দাঁত বের করে হাসে। চাকরির পাশাপাশি কালো বিজনেসও করত। আপনি এই সমাজের কোনো খোঁজই রাখেন না।

শুনুন, আমি এখানে এসব শুনতে আসি নি— ঠাণ্ডা স্বরে বলে নিঃশ্বাস চেপে বসে থাকি। এই চৌকশ মোহাচ্ছন্ন ছায়া, এই অপার্থিব হিম ঘোর... এর থেকে বজ্জাত লোকটা আমাকে ছিঁড়ে তোলায় বড় ম্রিয়মাণ হয়ে উঠি। এই মুহূর্তে এই আলোময় জগৎই সত্য। কী দরকার অন্ধকারের ইতিহাস শুনে?

কিছুক্ষণ পর অপরূপ একটা সুন্দরী মেয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। মৃদু ছন্দে অদ্ভুত মিউজিক বাজছিল। এই চাকচিক্যসর্বস্ব পরিবেশে মেয়েটার আগমন দারুণ ছন্দময়। মোমের সাথে গোলাপি জল মিশিয়ে তৈরি করা হয়েছে তার মসৃণ ত্বক। অদ্ভুত সিল্কি চুল, চলার ভঙ্গি। আমি একজন পুরুষের তৃষ্ণা নিয়ে হাঁ হয়ে চেয়ে থাকি মেয়েটার দিকে।

মেয়েটা আমাদের দিকে না তাকিয়ে একটা বিশাল পুতুল কোলে নিয়ে নিজের মধ্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। লাফিয়ে লাফিয়ে অপর পাশের সোফায় বসে। দীর্ঘ একটা সময় অস্বস্তির মধ্যে কেটে যায়। ওমর ফিসফিস করে বলে, সম্ভবত ও-ই আপনার ছাত্রী। ভদ্রলোকের মেয়ে তো একটাই।

মেয়েটির অযত্নে পরা পোশাকের মধ্যেই কী দারুণ আভিজাত্য। আমি চেয়ে থাকি। এবং আমার বুকের ভেতরটা মরুভূমি হয়ে উঠতে থাকে। কী চমৎকার চমকবাজি! ঢোকার পর থেকে এই বাড়ির প্রতিটি জিনিসের মধ্যেই দেখছি এক অপার্থিব কারিশমা। নিজের পোশাকের দিকে তাকিয়ে নিজেকে কাঙাল বলে বোধ হয়। প্রবল হীনম্মন্যতা চারপাশে আমাকে ছেঁকে ধরে। ইংলিশ মিউজিকের মেলোডিয়াস সুরে যে এত মাদকতা, আমি কি জানতাম? পাথরে বাঁধানো ফায়ারপ্লেস কাঁপছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত তরল ঠাণ্ডার গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসানো অপূর্ব বালিকা, সেও দুলছে। পৃথিবীটা তার চটি স্যান্ডেলের তলায়, সেই দোলায় ভীষণ দুর্বিনীত অথচ বিকারহীন ভঙ্গি। এই মিউজিক, ঠিক এই গান যদি আমার ঘরে বাজিয়ে দেয় কেউ? তার রূপ কেমন হবে? ঠিক এই কণ্ঠ আমার চ্যাপটানো খাটে, নড়বড়ে চেয়ারে, পলেস্তরা-উঠে-যাওয়া দেয়ালে, বিকৃত মেঝেতে— মোটকথা সেই বদ্ধ-গুমোট-ঘরে কতটা অস্বস্তির সাথে বেজে উঠবে? বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে।

এবং তারপর একজন ভারিক্কি, সৌম্য চেহারার স্লিপিংগাউন পরা ভদ্রলোকের আগমন ঘটে। তাঁকে দেখে ওমর ত্বরিত গতিতে দাঁড়িয়ে চাকরের ভঙ্গিতে একটু বেশি ঝুঁকে কুর্নিশ করে, ওর এই অদ্ভুত কায়দার কারণে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আমি আরো ছোট, আরো বেশি তুচ্ছ এক প্রাণীতে রূপান্তরিত হই।

তিনি হাত উঁচু করে তাকে বসতে বলে নিজেও অন্য একটি সোফায় বসলেন। ওমর বিনীত হাসিতে দাঁত বের করে, স্যার, আপনার অফিসের কেরানি কাদের আলী, আমি তার বন্ধু। আমাকে হয়তো আপনি দেখে থাকবেন।

আচ্ছা, আচ্ছা। ভদ্রলোক পরবর্তী বাক্য শোনার জন্য কিঞ্চিৎ উদগ্রীব হয়ে উঠেন।

আপনি বোধহয় আপনার মেয়ের জন্য একজন টিচার চেয়েছিলেন, ওমর উসখুস করে বলতে থাকে। কাদের আলী আমাকে বলেছিল। তিনি নির্লিপ্ত গলায় বলেন, ও, হ্যাঁ। ইনিই

কি সেই টিচার? আমি বিগলিত হয়ে বলি, জ্বি। আগে অবশ্য আমি টিউশানি করি নি। এই প্রথম...। তিনি দাঁড়ান। এতক্ষণে খেয়াল করি, মেয়েটা ঘর থেকে চলে গেছে।

ধীর পায়ে ভেতরে যেতে যেতে তিনি বলেন, ওকে কেউ বিশেষ ম্যানেজ করতে পারে না। ব্যাপারটা নিয়ে আমি হতাশ। কাল থেকে আপনি আসুন, দেখুন কিছু করতে পারেন কি-না।

নিজের অস্তিত্বকে মূল্যবান করতেই যেন মৃদু প্রতিবাদ করে বলি, কাল শুক্রবার। আমি পরশু থেকেই আসব।

ঠিক আছে, তাই আসুন, একটু এগিয়ে আবার দাঁড়ান, চা-নাস্তা খেয়ে যাবেন। বলে, নির্লিপ্তভাবে চলে যান। ঘামে ভেজা শরীরে সহজ হয়ে বসেও আমি ব্যাপারটার তল খুঁজে পাই না। ন্যূনতম ইন্টারভিউ নেয়ারও প্রয়োজন বোধ করলেন না তিনি! অদ্ভুত এদের স্বভাব! ওমর হা-হা করে হাসে, দেখলেন! হয়ে গেল!

বাসায় ফিরলে আমার অশান্তি চার গুণ বেড়ে যায়। সেই বিশাল রাজপ্রাসাদ। তার নরোম সবুজ নিটোল চাকচিক্য আমাকে চারপাশ থেকে ভয়াবহভাবে আক্রমণ করে। আহা, আমার জন্মটা যদি হতো সেই প্রাসাদে? স্রেফ একটি জন্মের তারতম্যের জন্য আজ আমি এখানে। এই একটি জীবন! আমি মাথা কুটে রক্তপাত ঘটালেও কি সেই জীবনে যাওয়া সম্ভব আমার পক্ষে? আমার কাছে যা দূরের আকাশ, সেটা তাদের তর্জনীর নখের ডগায়। আমার পাথর-শক্ত শয্যা, সারাদিন লেগে থাকা দুর্গন্ধময় ঘর, বন্ধ করে রাখা ছোট খিড়কি, সর্বোপরি, বিশাল নিস্তব্ধ রাত আমাকে ক্রমাগত দগ্ধায়। এই প্রথম একটি ভালো শাড়ির জন্য, একজোড়া চকচকে স্যান্ডেলের জন্য, নিজের দুর্বিষহ দিন-রাতের যুদ্ধের জন্য চোখের তলা ভিজিয়ে ফেলি।

পুরো বাড়িতে কবরের নির্জনতা। শুধু দূরে অস্পষ্ট মাইকে পুরনো দিনের উর্দু গান বাজছে, বড় ভেজা, বিচ্ছিন্ন। বাতি জ্বালিয়ে রাখি, ছটফট করি। এই অদ্ভুত হঠকারী যন্ত্রণা তাড়িয়ে নিয়ে নিয়ে এক সময় আমাকে চরম একটা জায়গায় নিয়ে ফেলে। কী অর্থ এই নিঃসঙ্গ ক্ষুধার্ত জীবনের? সতীসাধ্বী বিধবা শরীর? ছোঃ! এই ভাবনা প্রলম্বিত হয়ে আমাকে শারীরিকভাবে তৃষ্ণার্ত করে তোলে। বাড়িওয়ালার কথা মনে পড়ে— যে মাংসের স্বাদ পায়! আহা! কী ন্যাংটো মাংসরে! না, স্বাদ সে আমি পাই নি। তবে পাওয়ার তৃষ্ণা আছে। কেন বঞ্চিত হচ্ছ নীনা? কাল থেকেই কারো সাথে সম্পর্ক করে নাও। ভেসে যাও, ভেসে যাও... তুচ্ছ করে দাও তথাকথিত... ও মাই গড! আমি নখের শক্ত আঁচড়ে বিছানা খামচে ধরি। নাকের ভেতর সেই এয়ারফ্রেশনারের গন্ধ আসছে। সেই মিউজিক, আমি এক অদ্ভুত মাদকতার ভেতর প্রবেশ করছি। আল্লাহ, মৃত্যুর পর আমি কিছুই চাই না। মৃত্যুর পর থাকুক অসীম শূন্যতা। শুধু ওই প্রাসাদে ওই মোমের বালিকার মতো নির্লিপ্ত অথচ দুর্বিনীত পা রাখতে চাই। বিশাল লনের কেয়ারি করা বাগানে হুবহু ওই বালিকার মতো স্পর্শ করতে চাই ঝাঁকড়া চুলের কুকুরটিকে এবং সেই নীল গ্লাসের হিম গাড়িটি, যেটা দাঁড়িয়ে ছিল হেলাফেলায়, তার স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে দুর্দান্তভাবে বেরিয়ে পড়তে চাই। তারপর কোথায়?

কী জানি। কেনরে ঘা দিচ্ছিস বুকের তল? কী ক্ষতি করেছি তোর? মেঝেতে নেমে আসি। উবু হয়ে বসে থাকি। ইজেলের পাশে ভাঁজ করে রাখা ছবিটা টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিই শূন্যে। অন্তত এই ক্ষমতাটুকু আমার আছে!

অনেক দেরিতে ঘুম থেকে উঠি। অলস মন্থর ছুটির দিনের সকাল। কতক্ষণ বালিশ চেপে বিছানায় শুয়ে থাকি। ভীষণ চায়ের তৃষ্ণা পেয়েছে। কিন্তু চুলোয় কেটলি চাপানোর আলসেমি বড্ড ভয়াবহ। বস্তির কোনো ছেলেকে দিয়ে ডালপুরি আনিয়ে নাস্তাটা সেরে নেয়া যাবে। ঠিক এই মুহূর্তে মনে হয়, পাশাপাশি কোনো সন্তানের দায়িত্ব না থাকাটা নেহাত মন্দ নয়। বড় স্বাধীন, জড়তামুক্ত দিন। কিন্তু আর্থিক সচ্ছলতা থাকলে স্বাধীনতাকে শুষে পান করা যায়। ঘর থেকে বেরোতে গেলেই যখন স্রেফ আধুলি, সিকি পথ আটকে দাঁড়ায়, তখন বড্ড বেশি বিরক্ত লাগে।

বিছানা ছেড়ে উঠব, দরজায় শব্দ। খোলার পর দীর্ঘদিন পর আরেফিনকে দেখি। দাড়িটাড়ি রেখে জবরদস্ত পুরুষ হয়ে উঠেছে। ঠিক আজকের শূন্য দিনে ওর আগমনে আমি খুশি হয়ে উঠি, বলি, মাস্টারি নিয়ে এতই ব্যস্ত হয়েছ যে...। আমার তির্যক কথার মুখে হন্তদন্ত ভাব দেখায় আরেফিন, বেশিক্ষণ বসতে পারব না। পারলে এক কাপ চা দাও। আমি ভীষণ দমে যাই। বাথরুমে গিয়ে মুখে জল ছিটিয়ে চুলোয় কেটলি চাপাই। চা বানানোতে আর অবসাদ নেই। ঘরে এসে এতক্ষণে চোখে পড়ে পেইন্টিংয়ের খণ্ডাংশ। কেন যে অত রাত ধরে ছাইপাশ সব যন্ত্রণা নিয়ে বিহ্বল ছিলাম! ভেবে এখন হাসি পাচ্ছে। আরেফিনকে অস্থির দেখাচ্ছে। প্রশ্ন করি, কী হয়েছে তোর?

হল ছেড়ে দেব ভাবছি।

কেন?

অত দূরে গিয়ে ক্লাস করানো কষ্টকর। কিছু টিউশনি পেয়ে গেছি সেখানে।

পড়াশোনা ছেড়ে দিবি?

সে-রকমই ইচ্ছে, অকম্পিত স্বরে আরেফিন বলে, আর ভালো লাগে না।

অন্য কোনো অসুবিধে? আমি জানতে চাই, ইচ্ছে হলে খোলাখুলি বলতে পারিস।

আসলে আমি খুব সঙ্কটের মধ্যে আছি। এতদিন একটা দল করতাম, বছরের পর বছর তার পেছনে শ্রম-মেধা সব ঢেলেছি। এখন দেখছি, যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমরা লড়ছি, তার সাথেই হাত মেলাচ্ছে আমাদের লিডারেরা। সব দেখে-শুনে বিশ্বাস, আস্থা হারিয়েও আমি তা থেকে সরতে পারছি না। আমার যারা শিষ্য, যারা আমার প্রলোভনে পড়ে দলে যোগ দিয়েছিল তারা আমাকে ছাড়বে কেন? এদিকে লিডারেরা উল্টো আমাকে থ্রেট দিচ্ছে। আমি যেন বাড়াবাড়ি না করি।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে আমি বলি, লিডার তো একজন দু'জন মানুষ। সে গুটিকয়েক মানুষের জন্য তুই তোর পার্টির ওপর বিশ্বাস হারাচ্ছিস কেন? ব্যক্তি আর দল কি এক হলো?

তুমি এসব বলছ? আরেফিন অবাক হয়। আমি কি আবার শুরু করব? জানো, ভার্সিটিটা এখন জলদস্যুদের আখড়া। প্রতিদিন হত্যা, সন্ত্রাস।

তুই আবার শুরু করবি কিনা আমি বলে দেব কেন? ব্যক্তি ছাড়া দল হয় না আমি জানি। কিন্তু তুই যদি কোনো আদর্শকে বিশ্বাস করিস, দু'একজন ব্যক্তির দোষে তার থেকে সরে আসারও কোনো কারণ দেখছি না।

বিপক্ষ পার্টি খুব লেগেছে পেছনে, আরেফিন বলে, হলে থাকা খুব রিস্কি, আমাদের পুরো হল এখন তাদের দখলে।

এক্ষেত্রে তুই হল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারিস। তোর জীবন একটাই আরেফিন, একটু বুঝে চলিস। ভুল কিছুর জন্য আবার না তোর নিজেকে খুইয়ে ফেলতে হয়।

কেটলি উপচে পড়ার শব্দ হয়। আমি রান্নাঘরে দৌড় দেই। চা ঢেলে এনে কাপটা আরেফিনের হাতে দিয়ে বলি, কামাল ভাইরা বাড়ি চলে গেছে। একা থাকতে বড্ড বিচ্ছিরি লাগে।

কবে গেছে?

গতকাল।

তুমি রাতেও একা থাকছ?

নয়তো কী? আমি কি আরেকটা বিয়ে করেছি নাকি?

গরম চা গলায় ঢেলে আরেফিন দাঁড়ায়। তুমি অন্তত আমাকে ভুল বুঝো না। এত সঙ্কট চারপাশে। তোমার সাথে কথা বলে আজই প্রথম সবচেয়ে বেশি শান্তি পেলাম। এখন একটু হলে যাব। জিনিসপত্রগুলো সরাতে হবে। রাতে এসে থাকব এখানে।

থাকবি? এইবার ফের খুশি হয়ে উঠি, বাঁচালি। ধুমসে আড্ডা দেয়া যাবে।

সে চলে যাওয়ার পর আমার সামনে আস্ত একটি নিঃসঙ্গ দিন। সকাল থেকেই বেশ জ্বর জ্বর বোধ হচ্ছে। দম নিতে পারছিলাম না। নাস্তা না খেয়েই গা চুবিয়ে স্নান করি। ভাবি একটু ঝরঝরে বোধ হবে। সেটাই যেন কাল হলো। দুপুর আসার আগেই ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে আসতে থাকি। কিন্তু তারপরও দুর্বিনীত ইচ্ছায় নিজের বিরুদ্ধে দাঁড়াই। ইজেলটাকে মুছে তকতকে করে খাড়া করাই। তোশকের নিচ থেকে বের করে আনি লম্বাটে শিট। রঙগুলো জমে আছে। ফলে এগুলোকে উপড়ে ফেলে দিয়ে ইরফান চাচার দেয়া টিউব থেকে রঙ বের করি। সব বিন্যস্ত করে পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই আঁকি বুঁকি করতে থাকি। একটি ক্লিশে চাঁদ, মাটির থেকে কিছুটা ওপরে একজন রমণী। কাগজের মোড়কে ডুবন্ত দেহ। তার অম্লান হাতের তর্জনী স্পর্শ করতে চাইছে চাঁদের সেই বিবর্ণতাকে। ধীরে ধীরে এমন একটা বিষয় আমার ওপর চেপে বসলে কোনো রকমে লামছাম একটা কিছু তৈরি করতে চাই, শিটে রঙের ছোপ দিতে দিতে কী এক ঘোরে দিন কাবার হয়ে যায়, ব্যথায় টনটন করতে থাকে শরীর। তবুও কিছুতেই সেই চিন্তা একটা আকৃতির রূপ পায় না। বরং টের পাই আমার তুলির আঁচড়ে রমণীর শরীর খণ্ডাংশে পরিণত হচ্ছে। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হাত ওপর দিকে বাড়ানো। আমার ইচ্ছে সেখানে কোনো রূপ পায় না। গোঁয়ারের মতো রঙের ওপর রঙ চড়াচ্ছি। আমার দৃষ্টি বদ্ধ জলাশয়ের মতো নিস্তরঙ্গ। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। পায়ের তলা থেকে কণ্ঠার হাড় পর্যন্ত ঠকঠক করে কাঁপছে। বমি আসছে। ওগড়ানো বমির ধাক্কায় এক সময় উবু হয়ে বসে পড়ি।

চারদিকে দরজা-জানালা বন্ধ। বাতি নিভিয়ে ভাঙা খিড়কিটা খুলে দিই। পাশের বাড়ির ছায়াচ্ছন্ন এক চিলতে ম্লান আলো ক্যানভাসের একাংশকে মায়াময় করে তোলে। নিঃশ্বাস নিতে পর্যন্ত কষ্ট হচ্ছে। কী জানি কেন হঠাৎ করে আমার মধ্যে এমন দুঃসহ ছায়া চেপে বসে। সেই বিশাল রাজহংসের মতো শাদা বাড়ি, গালিচার মতো লন, দোলখাওয়া কিশোরী

আবারো আমাকে গ্রাস করে। নিজের আজন্ম পরিবেশের ওপর আবারো ঘৃণা জন্মায়। আরেফিনকে আজ আমি নিজেই ওই পথে ঠেলে দিলাম কেন ? আমি তো কোনোদিন তার এমন ঝুঁকিময় জীবন চাই না ? পরিবর্তন এনে কিছু যদি একটা করতে পারে, তার ক্ষীণতম লোভে ?

ছো, পরিবর্তন! আমি কি মাথামুণ্ডু চিন্তা করে কিছু বলেছি ? শুধু যুক্তির পেছনে যুক্তি সাজিয়েছি। এই হরিরলুটের দেশে আসবে পরিবর্তন! টনটন করছে মাথা। জমে আসছে আঙুলের ডগা। জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ঘষি। এক সময় প্রায় চেতনাহীন বিছানায় আছড়ে পড়ি। এবং তারপর শুরু হয় আসন্ন শীতের ঘনঘোর, অদ্ভুত বৃষ্টিপাত। জানালা বন্ধ। সারাদিন ধরে এক অদ্ভুত লোহিতাভ ছায়ার মধ্যে ডুবে থাকি। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করে। আজই সত্যিকার অর্থে সালাহ্‌দিনের সেদিনকার অবস্থাটা টের পাই। বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির পতন। কিছুটা ধাতস্থ হয়ে প্রায় টলতে টলতে রান্নাঘরে যাই। চালের ডেকচিতে আলু ছেড়ে বিছানায় ফিরে আসি। কান্না পাচ্ছে। ভীষণ অসহায় বোধ হচ্ছে। কী দুঃসহ প্রকাণ্ড এই দিন!

এক সময় সন্ধ্যা আসে। ভাত খেয়ে, কিছুটা থিতু হয়ে নির্নিমেষ চেয়ে থাকি রঙতুলির যাচ্ছেতাই অপচেষ্টার দিকে। আর ঠিক তখুনি দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। বাইরে এখনো বৃষ্টির ঝিরিঝিরি পতন। শীতে আমার হাড়-হাড্ডিমজ্জা এক হয়ে আসছে। কাঁপা হাতে দরজা খুলে দিই।

দিতেই ঝড়ের বেগে ঘরে ঢোকে রেজাউল। তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত জলের দাগ। সে কিছু না বলে দ্রুত বাড়িটা একবার প্রদক্ষিণ করে ভীষণ বিভ্রান্ত ভঙ্গিতে আমার পাশে এসে দাঁড়ায়। অস্পষ্ট স্বরে বলে, ওরা চলে গেছে তাহলে ?

তা জেনেই তো তুমি এসেছ।

এর উত্তরে কেমন স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায়, আমি কেমন ভীত হয়ে পড়ি। বড় অপরিচিত এই চোখ। অমন কাঁপছ কেন ? প্রশ্ন করে সে।

ভীষণ জ্বর, সরল গলায় বলি।

সে আমার কপালে হাত রেখে বেশ চমকে ওঠে। এবং আমাকে ধরে বিছানায় শুইয়ে দেয়। চারপাশে বাতি-নেভানো-সন্ধ্যা। বালিশের নিচ থেকে কাঁথা বের করে এমন মায়াময় ভঙ্গিতে আমার শরীরে জড়িয়ে দেয় যে, আমাকে একটা গভীর ভাবাবেশে পেয়ে বসে। বাথরুম থেকে বালতি আর মগ এনে আমার মাথায় পানি ঢালে আর কপালে জলপট্টি দিয়ে দেয়। আমি অবোধ শিশুর মতন বহুদিন পর কারো সেবার হাতে নিজেকে নিঃসাড় ছেড়ে দিই।

গা খুলে ও যখন আমাকে স্পঞ্জ করে দিচ্ছে তখন সেই আড়ষ্টহীনতার মধ্যে বিচ্ছেদের কাগজটার কথা আর মনে থাকে না। অনেকক্ষণ পর আরাম বোধ করি। এবং তারপরই ঠেলে আসা কান্নার স্রোতে উষ্ণ নিঃশ্বাস। এই মানুষটাকে আমি চিনি ? আমার দীর্ঘদিনের অতৃপ্তি, যন্ত্রণা আজ চূড়ান্ত উষ্ণতায় রূপান্তরিত হচ্ছে। আমি নীনার খোলস খুলে অদ্ভুত আদিমতায় আকাশের নিচে উদোম হই। এই কি প্রথম স্পর্শ আমার জীবনে ? কোথায় লুকিয়ে ছিল এই মায়া ? এই পুরুষ কি এই প্রথম দাঁড়িয়েছে আকাশের নিচে ?

আমার শীতার্ত শরীরের আপ্লুত উষ্ণতা কিছুতেই সেই জটিলতার জট খুলতে পারে না। তার অসীম তৃষ্ণা কোথায় কার কাছে সমর্পিত হয়, সে নিজেই জানে না। আমি দেখতে পাই, সমুদ্রের ওপর ভাসছে আমার লাশ। স্পষ্ট দেখতে পাই সেই দৃশ্য, হিংস্র ফসফরাসে ঢেকে গেল আমার শরীর। সামনে, চাঁদে পোড়া জল আর দিকচক্রবালে আলতো অল্প ঢেউ, ক্রমশ নিস্তেজ রাত বাড়তে থাকে...।

সে-রাতের সেই অদ্ভুত বৃষ্টিপাতের পর চারপাশ ঝাঁকিয়ে শীত নামতে শুরু করছে। এবং আমার জীবনে এরপর থেকেই ক্রমাগত কী অনচ্ছ ছায়া, কী ভাবলেশহীন চড়াই উতরাই। ক্রোধ, যন্ত্রণা, বিকার সব যেন কোনো এক অশরীরী স্রোত টেনে নিয়ে গেছে। ধীরে-ধীরে আমি যেন একটা জড় মানুষে পরিণত হচ্ছি। অফিসের ম্যাড়ম্যাড়ে আবহাওয়ায় নির্লিপ্তভাবে কাজ সেরে, বিশাল জনারণ্যে নেমে আসি। রাস্তার বাতি জ্বলে উঠেছে। সেই সুদৃশ্য সবুজ লন পেরিয়ে, যেখানে বেতের চেয়ার পেতে অবসন্ন ভঙ্গিতে চা খাচ্ছে এই বাড়ির কর্তা-কর্ত্রী, উঠে যাই সেই অভিজাত ড্রয়িংরুমে। এখন পর্যন্ত মেয়েটির সাথে সহজ হতে পারছি না। অন্য এক পৃথিবীর খুঁটিনাটি বিষয় তার নখদর্পণে, লেটেস্ট ভিডিও ক্যাসেট, রোমাঞ্চকর বই, আলিশান পার্টির খবরাখবর, অত্যাধুনিক মডেলদের ব্যক্তিগত জীবনাচার... এসব।

এসব খবরের বিষয়ে আমার অজ্ঞতা প্রথমেই আমাকে তার কাছে মূর্খ করে তুলেছে। তার সামনে তাই সারাক্ষণ গাম্ভীর্যের, আদর্শের মুখোশ এঁটে থাকতে হয়। এবং যথারীতি এই দিয়ে তাকে কব্জা করা তো দূরের কথা, তার কনিষ্ঠ আঙুলের স্পর্শও আমি পাই না। তারপরও যাই। চারপাশে এত অর্থকষ্টের বেড়াজাল, যেতেই হয়। আমার সাথে ক্রমাগত ইংরেজি কপচায় সে, দক্ষ আমেরিকানদের মতো। এ জায়গাতেই আমি চোপসানো বেলুন। নিজেকে রক্ষা করার জন্যই যেন ক্রমাগত বাংলা ভাষার ওপর জোর দিই। সচেতন করে দিই তাকে, সে এই দেশ এবং ভাষার বাইরের কেউ নয়। উদাহরণ দিতে গিয়ে এ ভাষার জন্য প্রাণ বিসর্জন দেয়ার প্রসঙ্গটাও আসে। কিন্তু এসব বক্তৃতা সেই বালিকার ভালো লাগবে কেন? যথারীতি দু'জনই এক সময় হাঁপিয়ে উঠতে থাকি।

মেয়েটার রুমে একজোড়া উলঙ্গ পুরুষ-রমণীর চুম্বন দৃশ্যের বিশাল পোস্টার টানানো। টেবিলের যে পাশে আমার চেয়ার, সেখান থেকে একদম সোজাসুজি চোখে পড়ে। একদিন বলে ফেলি, এ ঘরে তোমার বাবা আসেন না?

পা নাচিয়ে ক্রমাগত বই উল্টে চলে সে। পরিচিত ভঙ্গিতে শ্রাগ করে, না।

চুমুর জন্য দু'জনের উলঙ্গ হওয়ার দরকার ছিল কি?

যারা পোস্টার বের করেছে, তাদেরকে প্রশ্ন করেন, তা ছাড়া একটা বিশেষ পর্যায়ে গিয়ে উলঙ্গ অবস্থাতেই মানুষ চুমু খায়...।

কিন্তু এই ছবি তুমি ঘরে রেখেছ কেন?

আমার ভালো লাগে তাই।

পড়াশোনা করতে ভালো লাগে না?

না।

তবে স্কুলে যাও কেন ?

যাওয়াটা একটা ফ্যাশন, না গেলে চলছে না, সে জন্যে। মুখে চুইংগাম। চুষতে চুষতে এক সময় কিশোরী মেয়েটি তার বিছানার ওপর লাফিয়ে পড়ে। মখমলের নরম শয্যা। রাতের তরঙ্গময় আলো শুয়ে থাকে তার ওপর। তার ভেতরে তলিয়ে গিয়ে খুব তীব্র গলায় উচ্চারণ করে সে, আপনাকে আমার ভালো লাগে না। গেঁয়ো ভূত কোথাকার! আপনার কোনো যোগ্যতা নেই এ বাড়িতে আসার।

সিনথি... প্রায় আর্তনাদ করে উঠি।

আমাকে ধমক দিলে কষে চড় লাগিয়ে দেব, তার এই কথার মুখে যখন ক্ষিপ্ত আমি নিজেকে সামলানোর কষ্টে ব্যস্ত তখন সে হিঃ হিঃ হাসির হট্টগোলে ভেঙে পড়ে। মুহূর্তে ভাবি, অন্যপথে এগোতে হবে আমাকে। ভাবি এবং নিজের ধৈর্যের দৌড় দেখে নিজেই অবাক হয়ে যাই।

বাসায় ফেরার পর মগজে দুঃসহ ঘণ্টাধ্বনি। সেই ঘটনার পরদিনও রেজাউল এসেছিল। সেদির রাতে আরেফিনের আসার কথা ছিল। ঘোর কাটিয়ে উঠে এক সময় তাই রেজাউলকে ঠেলে বের করে দিয়েছিলাম। নিঃসাড় পড়ে ছিলাম সারারাত। দুঃসহ গ্লানি, ঘেন্না আমাকে মৃতপ্রায় করে তুলেছিল। আরেফিন আসে নি।

পরদিনও রেজাউল আসে। গতরাতের ঘটনাটা বেমালুম চেপে গিয়ে তার মতো ছেলে আমাকে চা করে খাওয়ায়, দুপুরে বাইরে থেকে ভাত এনে দেয়। আমার আধাআধি শেষ করা ছবিটার প্রশংসা করে। শেষে আমার সিদ্ধান্ত জানতে চাইলে আমি কিছুদিন সময় চাই, আমাকে আরো ভাবতে হবে বলি।

সেই থেকেই ভাবছি। আবার কি শুরু করব ? একজন মানুষ এমন আমূল বদলে গেল, এর কতটা অকৃত্রিম ? মানুষই তো পরিবর্তনশীল... ইরফান চাচার কথামতো নিজেকে ফের দাঁড় করাই। সে আমাকে প্রগাঢ় বন্ধনে বেঁধে এক সময় চলে যায়।

পরদিন আবার আসে। পুরনো মাংসের ঘ্রাণ পেয়ে গেছে কি ? আমি স্বাভাবিক স্বরেই তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করি। কিন্তু তার মুখ সর্বদা উদ্‌ভ্রান্ত, চুল উস্কো, চোখ জোড়া লাল টকটকে। প্রতিরোধ ভেঙে যাওয়ায় আমাকে গ্রাহ্য করার প্রয়োজনবোধ করে না। আমার সরলতার সুযোগে আমাকে চেপে ধরে বিছানায়। প্রথমে ভীষণ ক্ষুব্ধ এবং অপমান বোধ করলেও এক সময় নিজেকে তলিয়ে না দিয়ে পারি না। যে অশিল্পিত মানুষটাকে বিয়ে করেছিলাম তার মধ্যে এতখানি শিল্পের উদ্ভব ঘটল কী করে ? কী কোমল, নরোম তার আচরণ। এছাড়া আমিও তো দীর্ঘ দিবস-শর্বরী বুভুক্ষু রমণী। তার স্পর্শের প্রতিটি বিন্দুর মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দিই সমস্ত বিবেকবোধ এবং বিবেচনার বাইরে...। যাওয়ার আগে রেজাউল নীরব, বিষণ্ন স্বরে বলে। তার অতীত, জীবনে কিছু না পাওয়া, কোথাও নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পারার কথা।

আমি মাথা নত করে শুনি। কোনো মন্তব্য করি না। সে চলে যায়। যাওয়ার আগে বলে, সব সময় চুল খোলা রাখ কেন ? গুছিয়ে বেঁধে রাখতে পার না ? ওর এই মন্তব্যে ওকে নতুনভাবে বিশ্লেষণ করি। ও আসলে এখনো সনাতন স্বামীই রয়ে গেছে। প্রেমিক হলে

নিশ্চয়ই খোলাচুল পছন্দ করত। জানি! কিন্তু আমার চুলের পরিপাটিত্য সম্পর্কে তার সচেতনতা আগে কি ছিল ? এভাবে নিজেকে ওর কাছে খুলে দেয়া ঠিক হলো ? আমি এক মর্মান্তিক দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে যাই। আমি কি ওকেই শরীর দিয়েছি ? আমার বুভুক্ষু শরীর যুক্তিহীনভাবে কোথায় কার কাছে গিয়ে নত হয়েছে আমি কী জানি ? নিজের সাথে, অন্যের সাথে, প্রাণের সাথে, প্রতিপক্ষের সাথে অভিনয় করতে করতে নিজের মৌলিক কষ্টকে পর্যন্ত খোয়াতে বসেছি। নিজেকে চিনতে পারি না আর।

পরদিন শ্লথ ভঙ্গিতে অফিস, একঘেয়ে বাস, ফের নিঃসঙ্গ গুহায়, যেন-বা আদিম মানুষ, ভূতের মতো বসে থাকি। দরজায় শব্দ। খুলতেই আজও রেজাউল। ওর হাতে আইসক্রিমের কৌটা, বলে, তুমি পছন্দ করতে। ওকে দেখে আমার শরীর স্পন্দিত হয়। নিজের ওপর রাগ জন্মায়। ও জানতে চায়, আমার সিদ্ধান্ত কী ? এখনো ওকে ভুল বুঝছি কিনা ? ওর পরিবর্তন কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য আমার কাছে ? ভাবনার গভীর অতলে ডুবেও আমি এসবের কোনো সদুত্তর খুঁজে পাই না। ফলে অবিন্যস্ত নিজেকে আবার খুলে দিই। আজও সুন্দর ভঙ্গিতে সে আমাকে গ্রহণ করে। তারপর দীর্ঘক্ষণ কথা। বিছানায় শুয়ে ও আমার চুলে আঙুলের চিরুনি চালায়। মফস্বলে হলে এরকম অবস্থায় টিটি পড়ে যেত। ভাগ্যিস ঢাকায়! এখানে পাড়া বলে তেমন কিছু নেই। কেউ কারো হাঁড়ির খোঁজ রাখে না। তবুও বাড়িওয়ালার ভয়ে কেমন আড়ষ্ট হয়ে থাকি। কখনো যদি হঠাৎ এসে পড়ে ? রাত গভীর হলে রেজাউল আবার আসবে বলে চলে যায়।

এখন আমার সিদ্ধান্ত কী ? ক্রমশ আমার তৃতীয় চোখ যেন খুলে যাচ্ছে। আমি যেন স্পষ্ট টের পাচ্ছি ওর এই কোমল স্পর্শ, নিজেকে শিল্পময় করে তোলা, পুরোটাই ওর কষ্ট করে বানানো। সারাক্ষণ সে সতর্ক, কখন তার আগের বন্য রূপটি প্রকাশ পেয়ে যায়। অত্যন্ত কায়দা করে, সতর্কতার সাথে সে নিজেকে আমার সামনে উপস্থাপন করছে। ফলে কেমন যেন স্বতঃস্ফূর্ততাশূন্য আমাদের সহবাস। ঘোরের মধ্যে ব্যাপারটা আমি আবিষ্কার করতে পারি নি। সেই একই পুরুষ! যতই শিল্পিত হয়ে আসুক, আমি স্পন্দিত হলাম কেন ? নিজেকে নিঃসাড় করে দিয়ে একটা সত্য আবিষ্কৃত হয়, ও এখন নিষিদ্ধ, এই বিষয়টাই তখন আমাকে রোমাঞ্চিত করেছে। বানানো সৌন্দর্যের আয়ুতো পদ্ম পাতার জল। বাতাসের সামান্য টোকাতেই টুপ করে খসে যায়। নিজের ওপর ঘেন্নায়, আক্রোশে বুক ঠেলে কান্না আসতে থাকে।

পাশের ঘরের দম্পতি ফিরে এসেছে। বয়সী রাত অদ্ভুত শিশির-আবছায়ায় চোবানো। কম্বলের তলায় কম্পিত শরীর ডুবে থাকে এবং আমার মস্তক যেন হলাহলের চারণভূমি। আমি কার কাছে যেতে চাইছি ? তার মানে কি এই নয় প্রতিনিয়ত নিজের ভারে অসহ্য হয়ে উঠছি ? কেন এইভাবে প্রতিরাত ওর তলায় নিজেকে বিছিয়ে দিলাম! সেসব রাতে কি আমি একজনের ছায়া অন্যজনের ওপর আরোপ করি নি ? কার ছায়া কার ওপর ? তাও কি আমি জানি ? আমি কি আসলে এলিয়ে পড়তেই চাই ? সে যে-কোনো মানুষই হোক ? এটাই কি সত্য ? কী জানি! শুধু ছায়াম্লান ঘরে দীর্ঘশ্বাস টের পাই। বুকের মধ্যে আঁকশি দিয়ে চেপে ধরেছে কেউ, এমন বোধ হয়।

ইরফান চাচা ক্রমশ গম্ভীর বিষণ্ন মূর্তিতে রূপান্তরিত। শীতে তিনি বেশ কাতর হয়ে পড়েন। চামড়ার ভাঁজে বয়স দাঁত বের করে। খুকখুক কাশেন। রুমাল দিয়ে সন্তর্পণে নাক মোছেন। বিরাট আলখেল্লায় নিজেকে ডুবিয়ে স্থির বসে থাকেন। আমি কী বলি, শোনার জন্য চেয়ে থাকেন।

বলার স্পৃহা যেন তাঁর ভেতর থেকে ক্রমে ফুরিয়ে আসছে। অস্বস্তি নিয়ে ফিরে আসি বাসায়। বিছানায় পড়ে থাকি। এর মধ্যে চোখও ইদানীং খুব যন্ত্রণা দিচ্ছে। সারাক্ষণ জল পড়ে। কিছুক্ষণ বই পড়লে সব ঝাপসা হয়ে আসে। টনটন ব্যথা করে মাথা। বুকের ব্যথাটাও উত্তরোত্তর বাড়ছে। আমি একজন ডাক্তারের কাছে যাব ? যে চড়া ভিজিট প্রফেসারদের। এরপর আছে ইউরিন, ব্লাড, হাজারো টেস্ট। একদিন বেশ অসহায়ভাবেই ওমরকে নিজের এই দুরবস্থার কথা বলি। ওমর কুছ পরোয়া নেহি বলে সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, কালই হাসপাতালে চলুন। প্রফেসারকে টাকা দেয়ার সাধ্য আমাদের আছে ?

হাসপাতালে কি চিকিৎসা কিছু হয় ? খামোকা পণ্ডশ্রম।

আমাদের মতো হাভাতেদের যেটুকু হয় সেইটুকু লাভ।

কিন্তু নিজেকে ওই হাভাতেদের দলে ফেলতেও অহঙ্কারে বাধে। কিন্তু অহঙ্কার ধুয়ে কি আমি জল খাব ? আগে তো আমাকে বাঁচতে হবে।

পরদিন সকালে অফিস ছুটি নিয়ে বাসে ঝুলতে ঝুলতে ওমরের সঙ্গী হয়ে যাই। আজিমপুর চৌরাস্তার মোড়ে নেমে রিকশা ভাড়া বাঁচাতে দু'জন ভিড় ঠেলে হাঁটি। ফড়িঙের মতো উড়তে উড়তে হাঁটে ওমর। মাঝে ভদ্রতাও করে, রিকশা নেব ? আমি হাসি, না, বেশতো হাঁটছি। যা হোক, শহীদ মিনারের কাছে এসে কোনো অনুভূতি ছাড়াই আরেফিনকে মনে পড়ে। বলেছিল, স্মৃতিসৌধ দেখলে ওর রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। গোটা বায়ান্ন সাল সামনে এসে দাঁড়ায়। আফসোস করে, সে সময়ে জন্মালে সে আন্দোলনে নামার গর্বের অংশীদার হতে পারত। কিন্তু আমার মধ্যে ঠিক ফাল্গুন মাসের প্রবল জোয়ারের সময়টা ছাড়া খাড়া শূন্য শহীদ মিনার অন্য সময় প্রগাঢ় কোনো বোধের জন্ম দেয় না।

এসবের মধ্যে নিজেকে বহুবার উল্টেপাল্টে দেখি, আমি কি স্বার্থপরভাবে আত্মকেন্দ্রিক ? রাজনীতির ভণ্ডামি, বিপ্লব, সামাজিক অরাজকতা, মুক্তিযুদ্ধ, গণতন্ত্র এসবের কোনো কিছু আমাকে তেমনভাবে আন্দোলিত করে না ? অথচ আরেফিন দেশে ছড়িয়ে থাকা নানারকম দুর্নীতির কথা বলতে বলতে হতাশায়, ক্রোধে কেঁদে পর্যন্ত ফেলে। ছেলেটা এখনো যথেষ্ট পবিত্র রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতির অনেক কলুষতাই ওকে স্পর্শ করতে পারে নি। অথচ তার বোন হয়ে আমার মধ্যে কিনা কোনো চেতনার জন্ম হলো না ? কেবল নুন-ভাত যোগাড়যন্ত্রের গাড্ডার মধ্যে নিজেকে সেঁধিয়ে রাখলাম ? নিজেকে বেশ অপরাধী মনে হয়। সেই ভাবনার-চক্রে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ ওমরকে প্রশ্ন করি, রাজনীতিতে কোন দলকে সাপোর্ট করেন ? ওমর আরেক কাঠি সরেস, সারাদিন পেটের ধান্দা করেই কূল পাই না। কী পছন্দ করি, কখনো ভেবে দেখি নি।

তবুও বিশেষ কাউকে ? একটু হলেও ?

কাউকেই না, ওমরের সহজ সাপ্টা উত্তর, সব শালার ক্ষমতায় যাওয়ার ধান্দা। ক্ষমতায় গেলেই সবার এক চেহারা। দেশটাকে লুটেপুটে খাওয়ার... যাকগে লেকচার বেশি হয়ে

যাচ্ছে। আমরা মরি নিজেদের ধান্দায়। বেঁচে আছি কী না তা-ই মাঝে মাঝে টের পাই না... এই যে আউটডোরে এসে পড়েছি। আপনি দাঁড়ান, আমি দেখি, কোথায় রসিদ দিচ্ছে। আমি তার সাথে হাঁটি। সমস্ত আউটডোর জুড়ে ভিড়। অধিকাংশই গ্রাম থেকে আসা রোগী। অসহ্য মরাটে গন্ধ। আর বিশ্রী নোংরা। হাসপাতাল যদি এত নোংরা হয় রোগী বাঁচে কী করে? বেঞ্চের পাশে টেবিল। তার মধ্যে মাথা গুঁজে একজন টানা লিখে যাচ্ছে। খসখস।

নাম?

নীনা তরফদার।

বয়স?

ত্রিশ।

রোগ?

কেমন ঘুলিয়ে ফেলি, চোখ ব্যথা। না, না গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা। ওমর বিজ্ঞের মতো বলে, এক ডাক্তার তো আর আপনার সব রোগের চিকিৎসা করবেন না। আগ বাড়িয়ে সে-ই তারপর বলে, গ্যাস্ট্রিক। আজ চোখের ডাক্তার আসে নি।

যা হোক। প্লাটফর্মে গোঙাতে থাকা কেউ মুহূর্তের জন্য থমকে আমার দিকে তাকায়। নিজেকে টেনে নির্দিষ্ট কক্ষের সামনে দাঁড়াতেই... লাইন। ওমর আমাকে পাশে বিছানো বেঞ্চের ছিন্নমূল রোগীদের মাঝখানে নির্বিকার ঠেসে বসিয়ে দেয়... আপনি এখানে বসুন। আমি লাইনে দাঁড়াই।

থুথু, পেশাবের লাইন, পানের পিক, ডেটলের ঘ্রাণ, কারো শাড়ি থেকে উড়ে আসা পাট ভেজানো গন্ধ, ঘাম, চারপাশের উৎসুক চোখ, সমস্ত আউটডোরে বিভিন্ন কোরাস, দেয়ালে ঠেস দিয়ে থাকা রোগী, ঔষধের শিশি ভাঙার শব্দ, সব মিলিয়ে হাঁপিয়ে উঠতে থাকি। কিছুটা দূর থেকে লক্ষ করি, নিজের সহজ স্বভাবে লাইনের মাথায় গিয়ে দারোয়ানের সাথে বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে হা-হা হাসছে ওমর। তার মানে ভজিয়ে ফেলেছে। বিড়ি শেষ করে এক সময় ত্রস্তভাবে সে আমার সামনে আসে, আরে আসুন বলে এবং নিমিষে আমাকে ছোঁ দিয়ে লাইনের সমস্ত রোগীর প্রবল আপত্তির মুখে প্রায় ধাক্কা দিয়েই একটা কক্ষের ভেতরে ঠেলে দেয়।

ভেতরে ঢুকে আমার জবরজং অবস্থা। অসহিষ্ণু ডাক্তার খেঁকিয়ে বিদেয় করছে ভীত সন্ত্রস্ত এক গেঁয়ো যুবককে, যাও, এখানে কানের চিকিৎসা হয় না। নাক কান গলা বিভাগে যাও, যত্তসব! এর মধ্যে আমি লাফ দিয়ে পড়ায় ডাক্তার রসিদ দেখে মুখ তোলে, অসুবিধে কী?

মাথায় টাক। মুখখানা জীবনানন্দ দাশের মতো। আমাকে দেখে চোখে ভাঁজ পড়ে। সম্ভবত এরকম ভদ্র পোশাকের কোনো রোগী এখানে আসে না। আমি কোথাও জার্নিতে কিংবা ডাক্তারের কাছে গেলে সচেতনভাবে পরিপাটি পোশাক পরেই যাই। চেয়ার টেনে বসে ফিরিস্তি দিতে থাকি। কখন, কীভাবে ব্যথাটা আক্রমণ করে, তার রূপ কী। ধীর গম্ভীরতার সাথে ডাক্তার সব শুনে এক সময় ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে আসেন এবং এইসব কথোপকথনে যখন দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়, সামনের টানা লাইনের কথা ভেবে আমি অসহিষ্ণু বোধ করি। সবশেষে ডাক্তার জানান, হাসপাতালে ভালো চিকিৎসা হয় না। যাবতীয় টেস্ট-ফেস্টও বাইরে

থেকেই করতে হয়। বিকেলে আমি তার চেম্বারে গেলে তিনি যাহোক আমার জন্য কিছু করতে পারেন। যেহেতু চেহারা জীবনানন্দের মতো, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলে না। গনগনে মেজাজ নিয়ে এক সময় বাইরে বেরিয়ে আসি।

যথারীতি আমার কোনো চিকিৎসা হয় না। পেটের ব্যথা অভ্যাসমতো চলতে চলতে এক সময় থিতিয়েও আসে। দিন কাটে সেই পুরনো একই ছন্দে। ছুটে যাই ইরফান চাচার বাসায় এবং বরাবরের মতো আমি আমার সব খুলে যেতে থাকি। আমার কিশোরকাল, কোন পুরুষ নির্জনতায় জাপ্টে ধরেছিল, ভয়ে রা পর্যন্ত করতে পারি নি, হঠাৎ একটা বেড়াল পতনের শব্দ শুনে সে ধড়ফড়িয়ে সরে দাঁড়াতেই আমার দৌড়ে পালিয়ে আসা। সেই সময়ের আরো স্মৃতি, সাজানো কনেকে কান্নায় আরো আপ্লুত করার জন্যই যেন সেই সুর- আমরা বৃত্তাকারে সেই বউকে ঘিরে গাইতাম, এতদিনে আইলা ভাইজান গো, আমার প্রাণের আম্মা কেমুন আছে, ওহ্ হোরে এ এ...।

তিনি চেয়ে থাকেন। বিমুগ্ধ শ্রোতার মতো শোনেন। আমার উৎসাহ বাড়ে। রানুর আটামিল থেকে ফিরে আসা, পুজোয় অজয়ের চুমু, প্রথম রক্তপাতের অভিজ্ঞতা পর্যন্ত... আমার একবিন্দু কুণ্ঠা হয় না। তারপর সেই আর্টিস্টের সাথে প্রেম, বলতে বলতে কেমন থিতিয়ে আসতে থাকি। তারপর স্বরে ম্লানিমা ঢেলে বলি, সব জায়গাতেই আমার পরাজয়টা বড় বেশি। এক সময় ওমরের প্রসঙ্গ আসে। তার চরিত্রের বিস্তারিত বর্ণনা শুনে ইরফান চাচা আগ্রহী হয়ে ওঠেন, একদিন ওকে নিয়ে এসো না।

আমি তো আর কাজ পাই না, হেসে বলি। শেষে আপনার পিছু ধরবে। যখন তখন জ্বালিয়ে মারবে আপনাকে। কিন্তু এক সময় এসব প্রসঙ্গও ভালো লাগে না।— তারপর নীনা ঘরময় হাঁটে। আক্রান্ত হয় অন্য এক অনুভূতির ঘোরে। কিছুতেই সেই রাতের রেজাউলের আবির্ভাবের ব্যাপারটা বলা হচ্ছে না। এই একটি অধ্যায়েই একশো জড়তা তাকে জাপটে ধরে। সে সহজ হতে পারে না। অস্থিরভাবে হেঁটে সে আবারো ভদ্রলোকের মুখোমুখি, ওহে, তোমাকে বেশ কাতর মনে হচ্ছে।

এতে মজা পেয়ে তিনি হাসেন, সাহস বাড়ছে দেখছি। নীনা বলে, অত মান্যিগুন্যি আমি করতে পারব না... বলে, ঘরে আরেকপ্রস্থ পাক খায়। নীনা গুনগুন গান গায়। নীনা বিড়বিড় করে আওড়ায়, পোকা হাঁটছে রক্তে, মাংসে, মগজে, শিরায়, রোদ পড়েছে অন্ধকারে, কিংবা রোদের মধ্যে লোডশেডিং, কি সব বলছি... নীনা মেঝেতে বসে পড়ে। মাঝখানে খাট, বৃত্তাকারে খেলছে। হি হি হাসছে কিশোরী, একসময় সেই কিশোরী তাকে ধরে ফেলে, খপ। কোনোদিন তার গায়ে হাত তোলে নি যে রেজাউল এই ব্যাপারটাকে ঘিরে সে-ই একদিন তার মাথা ঠুকে দিচ্ছে দেয়ালে। চুল চেপে ধরে ধাক্কা দিচ্ছে। একে কি গায়ে হাত দেয়া বলে? নাকি চুলে হাত দেয়া? মাথা ঠুকে দেয়া? কী বলে? শিশুটি কান্না ভুলে হাসছে তাকে দেখে। মাড়ি উপচে দাঁত উঠছে তার। শিশুটি কোলের মধ্যে বড় হচ্ছে। নীনা ক্রমশ সেঁধিয়ে যেতে থাকে নিজের মধ্যে।

আমি তাঁকে ধোঁয়ার আস্তরণ থেকে টেনে তুলি। খাড়া করাই। আমার মুখোমুখি। সমস্ত ঘর জুড়ে আমি আর নীনা। চেয়ে থাকি স্থির চোখে তার দিকে। এক সময় সব জট খুলে লম্বা হয়ে দাঁড়ান ইরফান চাচা। প্রশ্ন করেন, তুমি কি অস্বস্তি বোধ করছ? দৃষ্টি প্রসারিত

করি। একজন নির্জন দর্শক তাকিয়ে আছেন। আমি শান্ত পায়ে সোফায় গিয়ে বসি। সর্দিতে খুব মৃদু শব্দে নাক টানছেন। অনেকক্ষণ পেরিয়ে যায়। তিনি আর কিছুই বলেন না। এদিকে আমিও কথা খুঁজে পাই না। আবারো দাঁড়াই। ম্যাগাজিন ওল্টাই। পায়চারি করি। কখনো আমার পাগলাটে ছাত্রী সিনথির গল্প করি। টিউশানিটা ছেড়ে দেয়ার কথা বলি।

হেরে যাবে ? স্বভাব কায়দায় উৎসাহ দেন তিনি। জেনেশুনেই তো মেয়েটার দায়িত্ব নিয়েছিলে। আবার প্রেরণা পাই। আর সে জন্যেই এখানে এসে অপার শান্তি। এক সময় মৃত্যু প্রসঙ্গ তোলেন তিনি। প্রায়ই নাকি স্বপ্নে দেখেন, মৃত্যু তাঁকে খোলামাঠ ধরে টেনে নিয়ে চলেছে। কিংবা কালো একটা ছায়া, পেছন থেকে ধাক্কা দিচ্ছে প্রবল ঘূর্ণির মধ্যে, বিশাল জলরাশির মধ্যে পতিত তাঁর দেহ। কিংবা, অন্ধকার একটা ঘরে তাঁকে আটকে রেখেছে কেউ। লম্বা সাঁড়াশি দিয়ে তার চোখ ক্ষত-বিক্ষত করা হচ্ছে– উৎকট, রক্তাক্ত ছায়া, কিংবা... শুনতে শুনতে হাঁপিয়ে উঠি। বারান্দায় কাঁচা রোদের অনচ্ছ ছায়া। এক সময় চোখ বুজে অবসন্ন ধীর কণ্ঠে তিনি বলেন, এক বয়সে আমার গল্প লেখার অপচেষ্টা ছিল। তার একটা কাহিনী মনে পড়ছে, আমি তাঁর মুখোমুখি মোড়া স্থাপন করি, বলুন। তিনি বলেন, একজন সন্ন্যাসী, সব স্পষ্ট মনে নেই, তবুও বলছি, তিনি শুরু করেন, তার চুল এলোমেলো নতমুখী। অন্ধকার পথ ধরে হাঁটছে। দীর্ঘ তার যাত্রা। সেই যাত্রায় হাঁটতে হাঁটতে এক সময় সে নির্জন একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। উঁকি দিয়ে দেখল, এক অপরূপ রমণী তানপুরা বাজাচ্ছে! তার চোখে জল।

এ-কী, এ-পথ তো আমার নয়! আমি যাকে চাই... মেয়েটি তার পেছনে উদ্‌ভ্রান্তের মতো দৌড়ায়... দাঁড়াও। বিরুদ্ধ বাতাসের স্রোত ভেদ করে ক্ষীণ কণ্ঠের আহ্বান সন্ন্যাসীর কানে যায়। মেয়েটিকে দেখে সামান্য দাঁড়িয়ে আবার দৌড়ায় সে, আমি তো মুক্তমানুষ। নিজের পৃথিবীতেই আমার ফিরে যাওয়া উচিত। বিশাল মাঠ। দু'জনই দৌড়াতে থাকে। এক সময় ক্লান্তি এসে রোধ করে দু'জনের পথ। দু'জন মুখোমুখি তখন। মেয়েটি বলে, আমি তোমার সাথে যাব।

সন্ন্যাসী প্রশ্ন করে, কোথায় ? কেন যেতে চাও ?

এটা আমার পথ, যার সাধনা আমি এতদিন ধরে করছি।

সন্ন্যাসী তাকে অনেক বোঝালো। চারপাশে নত হয়ে আছে নির্জন রাত। কিছুতেই বোঝে না মেয়ে। জ্যোৎস্নার বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে দু'জন এক সাথে এগোয়। সামনে সমুদ্র। সন্ন্যাসী এক সময় বলে, তুমি দাঁড়াও। আমি সমুদ্রের ওপার থেকে ঘুরে আবার তোমার কাছে আসব। স্তব্ধরাত। ফেনিয়ে উঠছে সমুদ্রের গর্জন। অস্ফুটে বলল রমণী, তুমি যদি এসে দেখো আমি সমুদ্রের ঢেউ হয়ে গেছি ? বিশাল সমুদ্রের স্তিমিত দৃষ্টি মেলে দিয়ে সন্ন্যাসী বলল, তবে তাই হয়ো।

বলতে বলতে সোফায় আধশোয়া ইরফান চাচা কেমন ঝিমিয়ে পড়েন। এক সময় অচেতন ঘুমের অসীমে তলিয়ে যেতে থাকেন তিনি। এত ক্লান্তি, এত অবসাদ বেড়েছে তাঁর!

বাসায় এসে ছটফট করি। কেন এই গল্প ? সন্ন্যাসীর আড়ালে আসল মানুষটি কে ? তিনি কি ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন ? তাড়িত, বিভ্রান্ত আমি কঞ্চির মতো টান টান হই। পরদিন ফের ছুটে যাই। কে এই সন্ন্যাসী ?

বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তের মেয়ে, সন্ন্যাসীর পরিচয় চাও ? তিনি হাসেন। এ স্রেফ একটা গল্প।

কেন শুনিয়েছেন আমাকে ?

ঠিক আছে, আর শোনাব না।

তবুও বলতেই হবে...।

তিনি এবার গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন, কোথাও আমি সন্ন্যাসী, আবার কোথাও তুমি। আমাদের দু'জনকে কিছুই বেঁধে রাখতে পারে না। কিন্তু তবুও বিভ্রান্তির জট খোলে না। আমি আবার ধাবিত হই অন্যপথে। বাড়ির অবস্থা করুণ। আরেফিন সামান্য কিছু করে টাকা পাঠালেও আমার পক্ষে বলতে গেলে কিছুই করা সম্ভব হচ্ছে না। আমি ঋণের বোঝা একটু একটু করে শূন্যে নামিয়ে আনার ব্যর্থ চেষ্টায় রীতিমতো গলদঘর্ম। মন্টু রীতিমতো মাস্তানে পরিণত হয়েছে। আরেফিন সে রাতে আসতে না পারার জন্য বিস্তর দুঃখ প্রকাশ করে টুকটাক করে বাড়ির এই হালনামা পড়ে যায়। বলে রানুর কথা। ও এই বয়সেই ভঙ্গুর ক্ষয়িষ্ণু এক নারীতে রূপান্তরিত। কোথায় যেন টাইপ শর্টহ্যান্ড শিখছে। মাঝে মাঝে সেখানে যাওয়া ছাড়া সারাদিন বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে থাকে। এবং, মা, তাঁর কান্না ছাড়া অন্য কোনো অবলম্বন নেই। এর মধ্যে একদিন রানুর একটা চিঠি আমাকে মৃত্যুর প্রান্তিক সীমায় নিয়ে দাঁড় করায়। নিজের সম্পর্কে কিছু না, একে ঠিক চিঠিও বলা যায় না, যেন কথা বলছে, এভাবেই লিখেছে—

আপা,

তোমাকে একটা কথা জানাই। মন্টুর জন্মের পর বাবা নাকি এত ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, আমাদের তিন ভাইবোনকে বেঁধে রাতভর গোরস্থানে শুইয়ে রেখেছিলেন। মা বলেন, এসবই তিনি করেছিলেন রাগের মাথায়, সংসারের অভাবের কারণে। তিনি চাইতেন না, আর কোনো সন্তান হোক। আল্লাহর ওপর মাতবরি করতেও তিনি ভয় পেতেন, এই জন্যই মাকে তিনি কন্ট্রোল করতে দিতেন না।

রানু

এটা কোনো চিঠি ? কিন্তু তারপরও এমন ধাঁ ধাঁ করছে কেন বুক ? সেই নিস্তব্ধ প্রেত গোরস্থানের অলৌকিক বাতাস আমার দেহের সমস্ত দরোজা রুদ্ধ করে দেয়। নিঃশ্বাস আটকে আমার মরার উপক্রম হয়। এসব কাউকে বলা যায় ? আমাকে বিপর্যস্ত দেখে শানু আমাকে বুদ্ধি দেয়, বাড়ি থেকে ঘুরে আস একবার। এবং কী হয় সঙ্গে সঙ্গে আমি স্পষ্ট জবাব দিই, না, আমি আর সেধে কোনো শ্মশানঘাট দেখতে যাব না। এইসব ইন্দ্রিয়-শিথিল-করা প্রসঙ্গ, বড় অবসন্ন, শ্লথ করে তোলে আমাকে। বুক ঠেলে কান্না আসে। ওরা কি চায়, আমি আত্মহত্যা করি ?

সিনথির সাথেও আমার সম্পর্কের ধরন-ধারণ পাল্টে ফেলেছি। পাঠ্যবই ছাড়া পৃথিবীর যাবতীয় প্রসঙ্গ নিয়ে কথা হয়। অধিকাংশই স্থূল। আমীর খানের উত্থান, কিমি কাতকারের যাবতীয় পোজের বিবরণ। শেষে প্রশ্ন করি অমিতাভ বচ্চনকে কেমন লাগে ?

কেমন বুড়ো বুড়ো, বলে সে সোৎসাহে তার গতকালকে পড়া কোনো একটা রোমাঞ্চকর বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ কোনো অধ্যায়ের বর্ণনা দেয়।

একদিন সে আমাকে বিছানায় বসিয়ে তার বিশাল সাজবাক্স নিয়ে আসে। হেয়ার স্প্রে, ব্রেশন, আইশ্যাডো— এসব সম্ভারের মধ্যে আমাকে ডুবিয়ে আমার লম্বা চুল হেয়ার ড্রায়ারের গরম উষ্ণতায় আয়ত্তে আনার অপচেষ্টা করতে করতে বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে, চুল ছোট করে ফেলুন না, কী বিচ্ছিরি লাগে।

তাহলে আমাকে ভালো লাগবে ?

লাগবে না মানে, ভীষণ ভালো লাগবে। মাথায় এক ঝাঁক ঝামেলা রেখে কিভাবে যে ঠিক থাকেন ! এইরকম কথার ফাঁকে এক সময় মামুলি প্রশ্নে আসি, কে তোমাকে বেশি ভালোবাসে ? জিভ উল্টে জবাব নেয়, ভেবে দেখার সময় পাই নি। তবে মা-বাবার লাইফটা চার্মিং। সারাক্ষণ পার্টি, হুল্লোড়, ড্রিংকস, দৌড়াও... দৌড়াও, উফ্ লাইফ কি ফার্স্ট। আমি এখনো সেভেনটিন ক্রশ করি নি। সব কিছু এনজয় করার অধিকার নেই।

ওর ঘরে অনেকগুলো পেপার, বেশির ভাগই সাপ্তাহিক। ডাঁই করে রাখা। ধুলো জমে গেছে ওসবের ওপর। তুমি পড় ? প্রশ্ন করি।

ধুর! এসব মানুষ পড়ে ? যতসব প্যানপ্যানানি, কে মরল, কে লুটপাট করল, কোথায় ডায়রিয়া হয়েছে... বোগাস...। সিনথি কথা বলে আর ঘরে জুড়ে তরঙ্গময় পাক খায়। ঠোঁটের ভাঁজে পুরনো সুর... আই লাভ য়্যু মোর দ্যান আই ক্যান সে। এক সময় উচ্ছ্বসিত প্রশ্ন করে, আচ্ছা, ম্যাডোনার লেটেস্ট শো দেখেছেন ? উফ্ যা সেক্সি না! এবং পরক্ষণেই আমার প্রতিক্রিয়ার তোয়াক্কা না করেই হুড়মুড় করে ফিসফিসিয়ে আমার কানের ওপর আছড়ে দেয়, জানেন, সেদিন পার্টিতে ড্যান্সের সময় জিন্নাহ চাচা এক ফাঁকে মাম্মির ব্লাউজের নিচে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছিল। আমি না টুক করে দেখে ফেলেছিলাম। আর ড্যাডি, ড্যাডি তো মিসেস আলীকে নিয়েই বিভোর। মাম্মির যা হেভি ব্রেস্ট, বুক দিয়েই জিন্নাহ চাচাকে ধাক্কা দিয়েছিল। নিজেকে ব্যালান্সড্ করতে গিয়ে চাচার সে কি হাসি। মা-ও কম পাজি না। আমি জানালা দিয়ে সব দেখেছি।

মাথা গরম হয়ে ওঠে আমার। শিরা টনটন করে। এই মেয়েকে কী বলব ? এরা কি এই দেশের বাসিন্দা ? নিজেকে জড়ো করতেই যেন সমস্ত পত্রিকা বিছানায় ছড়িয়ে দিই। অসংলগ্ন হাজারো হেডলাইন— 'বাগদাদ : শেলটারে শত শত লাশ', 'প্রচণ্ড স্থলযুদ্ধ শুরু', 'অসংখ্য মানুষের হতাহতের দাবি', 'সাদ্দামের গোপন অবস্থান জানতে আমেরিকান গোয়েন্দাদের তৎপরতা', 'খুলনার শাহনাজের আর ঢাকা দেখা হলো না', 'বাংলাদেশে আন্দোলন আবার চাঙ্গা হয়ে উঠছে', 'উনিশ বিশ দু'দিন লাগাতার হরতাল', 'ইরাক হামলা প্রতিহত করেছে', 'ইরাক সুইসাইড হামলা শুরু করবে'। 'চাঁদাবাজরা দোকানদারের চোখ উপড়ে নিয়ে গেছে'।

ঘুমন্ত চোখে সিনথির দিকে তাকাই, সিনথি, পড়তে তো ভালো লাগে না তোমার, ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবো কিছু ?

ভবিষ্যৎ ? সিনথির সামনে যেন আজব কোনো দরজা খুলে দিই, মা-বাবার মতো আজ লন্ডন, কাল ফ্রান্স... বলতে বলতে হাসে, আমার মাও তো স্রেফ ম্যাট্রিক পাশ মহিলা, তাতে কী কিছু আটকে আছে তার ? তাছাড়া, আজ হোক কাল হোক আমি এই দেশ ছাড়বোই। কী জঘন্য দেশ! ঘর থেকে বেরুলে গলির মোড়ে গু-মুত, ওহ্ সো হোপলেস। বাইরেই

সেটেল্ড হবো। তার এইসব অনুভূতির মুখোমুখি পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার 'খরা' শিরোনামের পুরনো পেপারের চৌচির জমির ওপর দাঁড়ানো ন্যাংটো অবোধ ক্রন্দনময় শিশুটি স্রেফ ফটোগ্রাফি হয়ে যায়। সিনথি হাসে, ড্যাডিই আমাকে গাধা ঠাউরে আমার ঘরে এসব পেপার পাঠায়। ড্যাডির যা উদ্ভট মানসিকতা। বাদ দিন, এখন নিজেকে একটু চেঞ্জ করুন তো! বলেই তার ঢিলে সালোয়ার-কামিজগুলো আমাকে সে পরতে দেয় এবং এইসব জট থেকে বেরিয়ে আমি আবার তার সমান্তরালে, এসব করে তোমার বয়সে ফিরে যেতে পারব ? বলতে বলতে সেগুলো গায়ে চড়াতে থাকি।

আপনি রেগুলার, অন্তত মাসে একবার ব্লিচ করবেন।

সেটা আবার কী ? বোকার মতো প্রশ্ন করি।

এও জানেন না ? কোথায় যে বাস করেন আপনি ! বিউটিপার্লারে গেলে ডিটেল্‌স্ জানতে পারবেন— দেখতে ময়দার মতো, লিকুইড, কিন্তু খুব ঝাঁঝ। লাগালে মনে হবে চামড়া পুড়ে যাচ্ছে। সিনথি বর্ণনা দেয়, লাগিয়ে বসে থাকতে হবে, পনেরো থেকে বিশ মিনিট। রেগুলার করলে অনেকদিন ইয়াং থাকতে পারবেন।

সবার সামনে ময়দার ওরকম মুখোশ পরে বসে থাকলে ভূতের মতো দেখায় না ?

কী-যে বলেন! হিঃ হিঃ হাসতে থাকে সিনথি। আপনার ফেইসের মধ্যে আশ্চর্য এক বিউটি আছে, কিন্তু কেমন স্লাইড আস্তর পড়ছে তার ওপর, আপনি হারবাল ফেসিয়াল করলেও ভালো রেজাল্ট পাবেন। আশ্চর্য! কাজল ছাড়া আর অন্য কিছু দিয়ে সাজেন না কেন ?

কেন, লিপস্টিক তো দিই। তবে হালকা করে।

আমার সাজা শেষ হলে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াই। যেন কোনোদিন দেখি নি। নিজের আপাদমস্তক নিজের কাছে হঠাৎ এমন বোধ হয়। অদ্ভুত এক ইউরোপিয়ান মেয়েতে রূপান্তরিত আমি। এগিয়ে যাই। কি প্রগাঢ় অস্বস্তি, কি দ্রুত বিবর্তিত আমার অস্তিত্ব। পোশাক! বড় আজব চিজ! খোলস ভেঙে বেরিয়েছি, এখন আমি অন্য মানুষ। উদ্ভট লাগছে কি ? আরেকটু এগিয়ে যাই। এবার মুখ। চোখের নিচে সামান্য ছায়া জমেছে। চুড়ো করে চুল বাঁধা। ক্রমশ নিজেকে অন্যভাবে দেখি, ইহা একটি নীনা। ইহার দুইটি কান আছে, দুইটি চোখ আছে, চুল, নাক, ঠোঁট আছে। ইহার দুইটি হাত এবং দুইটি পা আছে, ইহার মুখও আছে। আরো এগিয়ে যাই, ভ্রু আছে, ইহা একটি মানুষ।

আপনার এত চেঞ্জ হয়েছে টিচার... সিনথির কথায় অনেক ওপর থকে নিচে নেমে আসি, আমাকে তোমার ভালো লাগে ? সিনথি লাফিয়ে ওঠে, খুব। আপনি খুব ইন্নোসেন্ট! সরি, আপনাকে আগে আমি চিনতে পারি নি, বলতে বলতে সে-ও ঢলে পড়ে, টিচার, আই অ্যাম অ্যালোন!

এভাবে দিন যায়, বুকের মধ্যে সমাচ্ছন্ন ছায়া নিয়ে। যেখানে যতটুকু সম্ভব নিজের সাথে আপোস করে। দীর্ঘ নির্জন রাত নিয়ে। একদিন এই করেই দাঁড়াতে হয় এক গভীর সত্যের সামনে। যার জন্য কয়েকদিন আগেও আমার বিন্দুমাত্র প্রস্তুতি ছিল না। ঘটনার আকস্মিকতায় আমি তো হতভম্ব, বিমূঢ় হয়ে পড়ি। ভীষণ ভয়, শিরদাঁড়া-হিম-করা অনুভূতির মধ্যে এক সময় আমি আমার ভেতরে সন্তানের উপস্থিতি টের পাই।

ঘটনাটির আশঙ্কা নিয়ে আমি যতটা না ভাবিত হই, তার চেয়ে বেশি বিস্মিত হই এর আকস্মিকতায়। পুরো মাসে আঙুলে-গোনা দু'জনের রাত সম্পর্কের ভেতরে কখনোই কোনো আশঙ্কা মাথা তোলে নি। রেজাউলের সংসারে এমন ঢের ঢের সময় গেছে, প্রতিবন্ধকতাহীন দিন— সন্তান জন্মের আগেই বেশির ভাগ সময়, বেশ ক'মাস। আজ আমার ভেতরে, বিন্দুমাত্র আশঙ্কা, দুশ্চিন্তা, ভাবনা ছায়া না ফেলা সত্ত্বেও এমন একটা জটিলতার মুখোমুখি হতে হবে, আমি কল্পনাও করতে পারি নি। এই রকম বিচিত্র শঙ্কাময় প্রতিক্রিয়ায় রক্ত হিম হয়ে আসে। হিসেব কষি, তখন মাসের কোন্ সময় ছিল ? কতটা রিস্কি সময় ? ভেতর থেকে ঠেলে আসা বমির স্রোত, বাঁধা সময়সীমার পর অনেকদিন পেরিয়ে গেলেও পিরিয়ড না হওয়া, চারপাশের পৃথিবীর ঝিম চক্কর খাওয়া... এসবের পরেও তো ঘটনাটা মিথ্যে হতে পারে। আমি কোনোরকম টেস্ট ছাড়া নিশ্চিত হই কি করে ? কিন্তু এতকিছুর পরও হৃৎপিণ্ডের পেণ্ডুলামে কিছুমাত্র স্থিরতা আসে না।

উদ্‌ভ্রান্তের মতো রাত জেগে থাকি। আমি আমার চোখের সামনের পৃথিবীর দ্রুত পরিবর্তন স্পষ্ট দেখতে পাই। অবলুপ্তি ঘটবে কি আমার একছন্দে আর একঘেয়েমির কাঁধে ভর করে চলা মোটামুটি নিরুপদ্রব জীবনের। ম্রিয়মাণ আলোর দিকে মরা চোখে চেয়ে থাকি।

এভাবে দিন যায়। সারারাত অসহ্য ছটফট, কেন এত বোকা আমি ? বিংশ শতাব্দী পেরিয়ে যাচ্ছে, অথচ আমি কি-না কোনো কন্ট্রোল ছাড়া নিজেকে ওভাবে ছেড়ে দিলাম, স্রেফ গ্রাম্য মহিলার মতো ? আমাকে তখন কোন ভূতে ধরেছিল ? ক'দিন ধরে কিছুতেই ঘুম আসে না। তন্দ্রা এসে নিমেষে কেটে যায়। এবং তারপর ধড়ফড়িয়ে ওঠে বুক। সেই ভয়ঙ্কর জাগ্রত অবস্থায় একরাতে চিবিয়ে দুটো ঘুমের বড়ি খাই। আর তখন বেশি করে আমাকে খুঁড়ে খেতে শুরু করে সেই দৃশ্য! বাবা আমাদেরকে নিয়ে নিস্তব্ধ অন্ধকার গোরস্থানে শুইয়ে দিয়ে এসেছেন! স্রেফ একটি জন্মের কারণে! আমার কেন মনে নেই সেই স্মৃতি ? অবশ্য আমরা সবাই পিঠেপিঠি, তবুও কত বয়স ছিল আমার ? কম্বলের নিচেও তীব্র শীতের হিম। কম্বল ছুঁড়ে ফেলে নিঃশব্দে দরজা খুলি। বস্তির ওপার থেকে কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। রাতের প্রকৃতি ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে সেই অস্পষ্ট গোঙানি কেবল বাড়ছে। বারান্দায় এসে দাঁড়াই। উত্তরের ধোঁয়াশে বাতাস আমার আত্মাকে স্পর্শ করে। ওপর দিকে তাকাই। মরা ছাদের এক চিলতে ফাঁক দিয়ে ফিকে ছায়াচাঁদ দেখা যায়। গাঢ় কুয়াশায় আবৃত যেন। তারই ম্রিয়মাণ আলো এই ল্যাম্পপোস্টহীন এলাকাকে বড় করুণ, রহস্যময় করে তুলেছে।

আবার বুক ধড়ফড়িয়ে ওঠে। অন্ধকার বারান্দায় আমার প্রায় পায়ের ওপর দিয়ে একটা বেড়ালকে অন্য একটা বেড়াল তাড়া করে ছুটে গেল। তারপর বিস্তৃত শূন্যতা। কিন্তু বস্তির অবিনাশী কান্নার স্পর্শ দীর্ঘ সময় ধরে আমাকেও গ্রাস করে রাখে।

গলায় জল ঢেলে বিছানায় আসি। কম্বলের গায়ে প্রবল শীত। টেনে তুলতে কেঁপে ওঠে শরীর। হঠাৎ করে ঠিক যেন নাকের কাছে গোঙানির শব্দ শুনি। ক্ষিপ্রগতিতে উঠে বসি। একদম জানালার কাছে, গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়। এবং পরক্ষণেই দু'টি বেড়ালের ধস্তাধস্তির শব্দ শুনে নিঃশব্দে শুয়ে পড়ি। সারারাত দু'টো শিশিরসিক্ত বেড়ালের চিৎকার আমাকে জাগিয়ে রাখে। খুব ভোরে খবর পাই, সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে বস্তির কালুর মা মারা গেছে।

ওমরের সাথেই অফিস থেকে বেরোই। দাড়ি সেভ করায় আজ তার মুখ বেশ ঝকঝকে হয়ে উঠেছে। কিন্তু পোশাকের অবস্থা তথৈবচ। একদিন উদ্ভট দাড়ি সম্পর্কে বলেছি, সে ওইটুকু পর্যন্ত সচেতন হয়েছে। পোশাক, স্যান্ডেল এইসব সম্পর্কে আবার আলাদা করে বলতে হবে। রামগাধা আর কাকে বলে! ক'দিনে বেশ শুকিয়ে গেছে। বলল, তার ফ্লায়িং বিজনেস পড়তির দিকে। কার কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা এনে ঢুকিয়েছিল, সেইটেই বের করতে পারছে না। ওমরের আকৃতির একটা বৈপরীত্য এতদিনে আমার চোখে পড়ে। তার মুখের আদলটি বেশ প্রৌঢ়ের মতো। কিন্তু কোমর থেকে শুরু করে নিচের দিকে স্রেফ বালক। প্যান্টও পরে জবরদস্ত। হাঁটলে লটপট করে। খেয়াল করে দেখলে বাজে-লাগা-বোধে আচ্ছন্ন হতে হয়। ভাবি, রেজাউলের সাথে আবার সমঝোতায় যাচ্ছি, এই সিদ্ধান্তটা তাকে জানাব। কথা শুরু করি এভাবে, হাসপাতালের পর সেই যে হাওয়া হলেন, আপনার ছোটভাইয়ের খবরও তো জানা হলো না।

ও! আপনাকে তো বলাই হয় নি। সে পাগল হয়ে গেছে।

সে-কী ? কবে ?

তা মাসখানেক হয়ে গেল।

আশ্চর্য! আমি খেপেই উঠি প্রায়। আপনার সাথে তো এর মধ্যে দেখা হয়েছে। আপনি বললেন না যে ?

বললে কী হতো ? সে ভালো হয়ে যেত ?

উল্টোপাল্টা কথা ছাড়ুন। এখন সে কোথায় আছে ?

বাসায় তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে... বলতে বলতে ওমর হা-হা হাসে, দড়িবাঁধা অবস্থায় সে যা আজব কায়দায় নাচে, দেখতেন যদি!

আপনি রিকশা থেকে নেমে যান।

দেখুন, আপনার সাথে গেলে আমার ভাড়াটা বেঁচে যায়। আমাকে যেতেই হবে। ভদ্রলোক আমাকে একটা চাকরির আশ্বাস দিয়েছেন।

ডাক্তার দেখিয়েছেন তাকে ?

হাসপাতালে নিয়েছিলাম। তারা তাকে পাবনায় নিয়ে যেতে রেফার করেছে।

সেখানে নিয়ে যাচ্ছেন না কেন ?

দেখুন, এসব ফালতু প্রসঙ্গ বাদ দিন। যার পাগল হওয়ার হয়েছে, এক সময় ভালোও হবে। এসব নিয়ে অন্যের পাগল হয়ে কোনো লাভ আছে ?

কেন নিচ্ছেন না পাবনা ?

সোজা কথা, তার চিকিৎসার খরচ বহন করার ক্ষমতা আমাদের নেই। হাসপাতালের ফ্রি চিকিৎসা কি হয়, নিজেই তো দেখলেন, বলে ওমর কেমন গম্ভীর হয়ে যায়। তারপর বলে, ধান্দা কি করছি না ? সিনথির বাবার অফিসে নাছোড়বান্দার মতো ধরনা দিচ্ছি। একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে নিশ্চয়ই। এখন আপনার খবর বলুন ?

এরপর আর নিজের খবর বলার স্পৃহা থাকে না।

আমরা দু'জনই নিঃশব্দে সেই রাজপ্রাসাদে ঢুকে যাই। ড্রয়িং রুমের গদি আঁটা সোফায় তলিয়ে থাকে ওমর। আর আমি সেই স্বর্গের বিস্তৃত সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠতে থাকি। লম্বা বারান্দা অতিক্রম করার সময় সেই ভারিক্কি সৌম্য চেহারার সিনথির বাবার মুখোমুখি। আড়ষ্টপায়ে দাঁড়াই। তিনি চশমা তুলে আমাকে দেখে যে প্রশ্ন করেন, তাতে আমার শূন্যপতন ঘটে, আপনি এখনো আছেন?

তবে কি মনে করেছেন তিনি? জ্বি... বলে ভীষণ আহত হয়ে এগোব, বলেন, প্রয়োজন হলে এ্যাডভান্স নিতে অস্বস্তি বোধ করবেন না। কি এক জেদ থেকে বলি, জি, আপাতত তার দরকার পড়বে না। সিনথির ঘরে গিয়ে দেখি সে সমানে সিগ্রেট ফুঁকছে এবং নাইট গাউনের পাতলা আবরণে দেহ ঢেকে নিজেকে আয়নায় দেখছে, কেমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠি, আজ সোজা করে বলো, তুমি আমার কাছে পড়বে কি না?

সে নির্বিকার উত্তর দেয়, না।

তবে কি আমি টিউশনিটা ছেড়ে দেব?

তা দিতে পারেন... বলে গুনগুন করে গান গায়। পা ঠোকে মেঝেতে। এগিয়ে গিয়ে তার মাথায় সস্নেহে হাত রাখি, সিনথি এটা জীবনের পথ নয়, তুমি একটু বুঝতে চেষ্টা কর...।

আপনি বেরিয়ে যান, সে সহজ কণ্ঠে আদেশ করে।

এরপর আমার আপোসের পালা। যথারীতি চারপাশে ঝাঁকিয়ে রাত নামার পর এক সময় আমি বিশাল সিঁড়ি ধরে নেমে আসি। নেমে ড্রয়িংরুমে, ভীষণ বিস্মিত হয়ে দেখি, ওমর তখনো বসে আছে। কাছে গিয়ে প্রশ্ন করি, আপনি এখনো আছেন, কী ব্যাপার?

সে বলে, দু'বার খবর পাঠিয়েছিলাম, সাহেব বলেছেন, তার সময় হবে না। বলেছেন চলে যেতে।

তারপরও বসে আছেন?

কী করব, আমার যে একটা চাকরির খুব দরকার।

বিস্তৃত লন পেরিয়ে স্বরে ঝাঁঝ মিশিয়ে প্রশ্ন করি, এভাবে নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে চাকরি পাবেন?

তাহলে কিভাবে পাব? তার সরল প্রশ্ন। আমি ভদ্রলোকের পেছনে দিনের পর দিন লেগে থাকব। তিনি আমাকে সেদিন অফিসে আশ্বাস দিয়েছেন কেন?

কিসের আশ্বাস, জুতো পরিষ্কার করার চাকরি?

আপনি মনে হয় খেপে যাচ্ছেন? ওমর ম্লান কণ্ঠে বলে। জুতো পরিষ্কার কি কাজ নয়? আপনি ঘেন্না করছেন কেন?

অত লেকচার দেবেন না, তাহলে লেখাপড়া শিখেছিলেন কেন?

কী আশ্চর্য! লেখাপড়ার চাকরি না পেলে আমি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব? আপনি আমাকে ভাত দেবেন?

সামনে বিস্তৃত রাজপথ। এখান থেকে আমার বাসায় যাওয়ার তেমন কোনো বাসের ব্যবস্থা নেই। তাই প্রতিদিনই বেশকিছু অতিরিক্ত পয়সা গচ্চা যায়। গত মাস এবং এ মাসে

অফিসে বিজ্ঞাপনের বাড়তি কিছু মামুলি ডিজাইন করে দিয়ে হাতে বাড়তি অল্প কিছু পয়সা এসেছিল। ইরফান চাচার লোনটা ছাড়া আমার আর তেমন কোনো লোনও নেই। কিন্তু ওই দু'হাজার টাকাই মাঝে মাঝে আমার দম আটকে দেয়। রিকশায় বসে অনেকক্ষণ কোনো কথা বলি না। ওমর আজ বেশ গম্ভীর, আলোছায়াময় পথ ধরে রিকশা এগোয়। সে হঠাৎ বলে, জানেন, আমি একবার পাগল হয়ে গিয়েছিলাম।

আপনি কি এখন নিজেকে সুস্থ মনে করেন?

না না, এখন ভালো হয়ে গেছি। এবার সে সোৎসাহে শুরু করে, বাবা ছিল দু'পয়সার কেরানি, সে পালিয়ে বেড়াতো। অনেক রাতে ঘরে ফিরে সোজা ঘুমিয়ে পড়ত। সেদিন সারাদিন আমরা ভাইবোন না-খেয়ে ছিলাম। সন্ধ্যায় পাগলের মতো হয়ে উঠলাম। তখন বয়স আর কত, ষোল-সতের। রাস্তায় বেরিয়ে আনাড়ির মতো এক লোকের পকেটে হাত দিলাম, আর যায় কোথায়! বুঝতেই পারছেন পরিণতি! হায়রে, বেদম গণপিটুনি! হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল কয়েকদিন। তারপরই পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের দু'ভাইয়েরই আঘাতজনিত কারণে পাগল হওয়ার পরিণতি... হা-হা। কি মজা না?

ভেতরটা ফাঁকা হয়ে যায়, প্রায় কাতরোক্তি করি, আপনি হাসছেন? এটা কোনো হাসির ঘটনা?

হাসির নয়তো কী? পাগল হওয়ার পর কী করতাম শুনলে আপনিও হাসবেন। ওমর তেমনই হাসতে থাকে। মা বলেছে, একবার নিজের গু নিজেই খেয়েছিলাম, হা-হা।

থামুন। প্রায় চেঁচিয়ে উঠি। মানুষটা এইসব নিয়ে এত নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করে? সব ছাপিয়ে মিশ্র অনুভূতিতে আমার বুক থেকে কান্না ঠেলে ওঠে। আশ্চর্য! ওমরের পরিবারের সাথে কোথায় যেন আমাদেরও একটা গভীর মিল! আমার অসহ্য লাগে। রিকশার বরফ হাওয়া আত্মা স্পর্শ করে। গায়ে টেনে চাদর চড়াই। ঝাপসা ধোঁয়াটে পথ। সবুজ বাতির পতন, তারপর থেমে যাওয়া।

জানেন, খুব সরল গলায় ওমর বলে, আজ কেন যে আমি আমার সব কথা আপনাকে বলছি! আমার বোনটি, গতমাসের শেষ দিকে তার এ্যাবরশন করাতে হয়েছে, কার সাথে কী সম্পর্ক বাঁধিয়েছিল! এখন তার যা শরীরের অবস্থা। তাকানো যায় না। আপনি কি বিরক্ত হচ্ছেন?

ওমর বিদায় নেবার পর আমার চারপাশে জাঁকিয়ে ভিড় করে নাড়ি-তোলপাড়-করা সব ঘটনাংশ। কাল্লুর মা'রও এই একই পরিণতি। অবশ্য তার ঘটনা আলাদা। তার হারামি স্বামীটা নাকি দু'দিন আগে তার পেটে কষে একটা লাথি মেরেছিল, কিন্তু তারপরও...। এই প্রথম আমি ওমরকে নিয়ে ভাবনায় মগ্ন হই। এই প্রথম তাকে আমার কাছে সরল অথচ রহস্যময় মনে হয়। এবং আরেকটি ব্যাপার, আমাকে কঞ্চির মতো খাড়া করে, তার অবলীলায় বলে যাওয়া বোনের এ্যাবরশনের ঘটনাটা। আমাকে তাড়িতই করে না, এক ধোঁয়াশাময় গহ্বরে নিক্ষেপ করে। একটা কঠিন সত্যের মুখোমুখি আমাকে দাঁড় করিয়ে দেয়। ভাবায়, শঙ্কিত করে, আমার ভেতরও তো সেই বীজ অঙ্কুরিত! আমি কি এর কারণেই রেজাউলের কাছে সমর্পিত হতে চাইছি? সেই কারণেই কি আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে, না? কিন্তু সেদিনের পর থেকে রেজাউল কোথায়?

আমাকে অভিভূত করে দিয়ে এর মধ্যে একদিন আরেফিন একটা শাড়ি নিয়ে আসে আমার জন্য। সলজ্জ কণ্ঠে বলে, নিজের উপার্জনে! আমি শাড়িটার ঘ্রাণ শুকতে গিয়ে কেঁদে ফেলি। কী হয়েছে তোমার? এমন চেহারা হয়েছে কেন? আরেফিনকে বিচলিত দেখায়। আমি কুয়াশা ফুঁড়ে উঠি এবং পারম্পর্যহীনভাবে রানুর চিঠির কথা বলি। আরেফিন হেসে ফেলে, আমার নিজেরও মনে নেই। তবে বাবা আমাদের বেঁধে নিয়ে গিয়েছিলেন সেটা ঠিক নয়, রানু বাড়িয়ে লিখেছে। আমিও চাচার কাছে শুনেছিলাম, যাকগে রাগের মাথায় কে কি করে...! আশ্চর্য! এরা সবাই জানে, আর আমি বড় মেয়ে হয়ে সেটা জানি না? এইবার আরেফিন বিরক্ত হয়, তুমি বিষয়টাকে এত সিরিয়াসলি নিচ্ছ কেন? জীবনে এত সংগ্রামের পরও? আশ্চর্য!

তুই বুঝবি না আরেফিন, আমাদের বাবা, যত রাগই হোক তার, ওইরকম শূন্য গোরস্থানে নিয়ে যাবে আমাদের! সারারাত আমরা ক'জন অবোধ শিশু খাঁ-খাঁ গোরস্থানে... মৃতদেহের সঙ্গে... আমার বাঁচতে ইচ্ছে করে না। মা এখনো বেঁচে আছেন কোন্ স্বপ্নে?

আপা, তুমি শান্ত হও, আরেফিন বলে, যা যাওয়ার তা তো চলে গেছে। এছাড়া সারারাত গোরস্থানে ছিলাম এটা তোমাকে কে বলেছে?

আরেফিন চলে যাওয়ার পর বারান্দায় একটা ছায়ার আবির্ভাব। ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়াই। কিছুটা ঝুঁকে লক্ষ করি, অন্ধকারে প্রেতের মতো বসে আছে কালু। আমার কলজের সুতোয় হঠাৎ টান পড়ে। পিঠে হাত রেখে ফিসফিস করি... কালু... হেই কালু এবং টেনে দাঁড় করাই, ক'দিনে বেশ লম্বা হয়েছে। অন্ধকারে মুখটা দেখা যাচ্ছে না। তবে ওর হিক্কার শব্দ শোনা যাচ্ছে। কান্নায় কান্নায় চোখ জোড়া ভীষণ ফোলা। তাকে ঘরে নিয়ে আসি। কী বিবর্ণ, ক্লিষ্ট মুখ! যথারীতি তাকে দেখেই শানুর সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়। ভুরুতে সহস্র ভাঁজ ফেলে দরজা খুলেই ভেতরে চলে যায়।

খিদে পেয়েছে? তাকে প্রশ্ন করি।

হাতের উল্টো পিঠে নাক মুছে মাথা নাড়ে সে, হ্যাঁ। ছেঁড়া হাফপ্যান্ট নিচ থেকে ঝুলছে, উদোম গা আর মুখ এমন করুণ... আমার ভেতর থেকে উপচে ওঠে মায়া। তাকে বিছানায় বসিয়ে রান্নাঘরের দিকে যাব, নিস্তব্ধতা ছিন্ন করে বাইরে বিকৃত একটা চিৎকার শোনা যায়... কালু, অ কালু এবং বিদ্যুৎ বেগে খাড়া হয়ে ওঠে শিশুটির শরীর। বাজান... বলে কম্পিত পায়ে দরজার দিকে দৌড় দেয়। আমি দ্রুত ব্যাগ হাতড়ে দশটা টাকা তার ঝোলা ব্যাগে ঢুকিয়ে দিই... কিছু খেয়ে নিস।

এবং দরজা খোলার পর মুহূর্তেই তার দেহ যেন হাওয়ায় মিশে যায়। বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। তার পরপরই আবার যথারীতি শানুর আগমন। নিজেকে তৈরি করেই সে বেরিয়েছে, তুমি ওকে ঘরে আনলে কেন?

দেখো, ছেলেটার মা মারা গেছে, আমি বলি, মায়া বলে তো একটা জিনিস আছে।

এসব আদিখ্যেতা করতে হয় তা অন্য জায়গায় গিয়ে কর, সে বলে, তুমি ইচ্ছে করেই আমাকে অপমান করার জন্য এসব কর। আমার বাসায় আমি সেটা সহ্য করব না।

আমি ওকে তোমার বাসায় আনি নি, দয়া করে আমার সাথে লাগতে এসো না, আমি এখানে বিনে পয়সায় থাকি না। আমি জানি, এরকম কথা সহ্য করার মতো চরিত্র শানুর না।

সে মহাহুলস্থূল বাঁধিয়ে দেয়, সাথে কান্না। তার দুর্বল জায়গাগুলোতে ঘা দেয়াই নাকি আমার অভ্যাস। আজকে আবার থাকা-খাওয়ার খোঁটা দিচ্ছি। সে আর এক সাথে থাকবে না, আজই কামাল ভাইকে...। চুপচাপ বসে থাকি। নিজেদের দুর্বলতা ঢাকার জন্য এত স্বার্থপর হতে পারে এরা? খাওয়া-দাওয়া সেরে বিছানায় যাওয়ার পর আমি একা। পাশের ঘরে কামাল ভাইয়ের সাথে ফিসফিস করছে শানু। অসহ্য। এদেরকে এড়িয়েই বা আমি চলি কি করে? এই বিশাল রাজধানীতে আমার মতো একজন মেয়ের একা থাকাটা যে কী ভয়াবহ, সে কি আমি জানি না, তবুও মাঝে মাঝে লেগে যায়, নিজেকে ঠিক রাখতে পারি না।

সারাদিন মাথাটা ঝিম ধরে ছিল। হঠাৎ রাত বাড়ার পর বমির বেগ পায়। ইউরিন টেস্ট করাচ্ছি না ভয়ে। নিশ্চিত সংবাদটা আমার প্রাণ আমূল বিদ্ধ করবে। তার চেয়ে থাক। আশঙ্কা আর অনিশ্চয়তার ভয়ে থাকাই ভালো। কিন্তু বমির বেগ আমার বুক খালি করে দেয়। মনে হয় শুধু এই একটা কারণের জন্যই আমাকে রেজাউলের কথা ভাবতে হবে। আমার সামনে দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা থাকবে না। এবং সেই অসহায়তা আমার জন্য মারাত্মক হবে।

কী ভয়ানক বিপদের মধ্যে যে পড়লাম! দিব্যি দিন চলছিল। কি মানে ছিল এমন জটিলতায় জড়ানোর? তার আগে আমাকে স্পষ্ট করে জানতে হবে, আমি রেজাউলকে কতটুকু অনুভব করছি, ওয়াক... উদ্‌ভ্রান্তের মতো দৌড়ে বাথরুমে গিয়ে বমি উপড়ে দিই।

পরদিন বাড়িওয়ালা এসে সরাসরি বাসা ভাড়া বাড়ানোর সিদ্ধান্ত জানায়। আমি তাকে স্পষ্ট বলি, বছরের মাঝখানে তার বাড়ি ভাড়া বাড়ানোর কোনো অধিকার নেই। তারপর অধিকার-অনধিকার নিয়ে বিস্তর তর্ক। এক পর্যায়ে সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে থাকলে আমি নরোম হই। অনেকটা মিনতি করার ভঙ্গিতে তাকে আমাদের দৈন্যদশার বিবরণ দিই। সে নিজেও বর্তমান বাজার-দরের ঊর্ধ্বগতির বিবরণ দেয়। মাঝখানে শানু এসে আমাদের আলোচনায় বাগড়া দিয়ে বসে। সে তার সাবেকি ভঙ্গিতে কঠোর হয়, এক পয়সাও বাড়াব না, দেখি কি করতে পারেন। বাড়িওয়ালার ফের রুদ্রমূর্তি। পানজাবির খুঁটি এক হাতে চেপে ধরে বাইরে পানের পিক ফেলে এসে জোর গলায় ঘোষণা দেয়, আগামী মাসেই বাসা ছাড়তে হবে। নইলে পাড়ার গুণ্ডা লেলিয়ে দেবে পেছনে। এবং তারপরেই আসে সেই পিত্তি জ্বালানো প্রসঙ্গ— বাসাটাকে আমরা কী বানিয়েছি, হাজার রকমের লোক আসে, বাসার ইজ্জত বলে তো একটা ব্যাপার আছে। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, এইসব প্রসঙ্গের মুখে শানুর কণ্ঠে আজ অন্যরকম সুর। সে বলে, এসব কথা যাকে বলার তাকেই বলেন। গণহারে কিছু বললে আমি সহ্য করব কেন?

আমি বলি, দেখুন, আমি অফিসে চাকরি করি। সেই সূত্রে জানাশোনা মানুষ আসতেই পারে। খুব বেশি কেউ তো আসে না। আপনি বাইরে থেকে বেশি বেশি শোনেন। এই প্রসঙ্গেও বিস্তর তর্ক। শেষে সে জানিয়ে যায়, আগামী মাস থেকে অন্তত দু'শো টাকা করে হলেও বেশি দিতেই হবে। তার মানে প্রত্যেক মাসে আমার আরো একশো টাকার মামলা। গজগজ করতে করতে ভেতরে যায় শানু। বাড়াবে না ভাড়া? এটা হলো অতিরিক্ত ট্যাক্স। একেকজন মেহমানদারি করবেন, তার খেসারত আমাদেরকে দিতে হবে কেন? বুঝি না, বিয়ের কথা বললে কেন গায়ে ফোস্কা পড়ে? ডিভোর্সি মেয়ে হলো গিয়ে ছোটা গরু, একবার বাইরের ঘাসের স্বাদ পেলে কেউ কি—!

এসব ঝগড়া ইচ্ছে করেই পাশ কাটিয়ে যাই। কিছু না বলে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে থাকি। এবং আমার অস্তিত্বে একটি সন্তানের উপস্থিতির মুখোমুখি বাড়িওয়ালার প্রায় মারমুখী মূর্তি কটকট করে ওঠে বিকৃত কায়দায়। কেমন ভীত হয়ে উঠি আমি। এবং তারপর মজুমদারের মুখ। তার খণ্ডখণ্ড মাথা উড়তে থাকে। পুরো ঘর সয়লাব হয়ে যায় তার মস্তকে। রক্ত চোখে চেয়ে থাকে আমার দিকে এবং তারপরই এগিয়ে আসে একটি শুয়োরের মাথা। বিশাল মেথরপট্টির কাদার মধ্যে গড়াগড়ি খেত ওগুলো। কী উৎকট গন্ধ! চন্দনা নামের একটা মেথর যুবতী ছিল, সে ভাত পচিয়ে কি সব মদফদ বানাত। সেদিকে কখনো গেলে দেখা যেত ভদ্র যুবকেরা কি দ্রুত ঢুকে যাচ্ছে তার আখড়ায়। ছোট্টবেলায় কখনো চাচার বাসায় গিয়ে রাত কাটালে এই দৃশ্য দেখতে পেতাম। সারারাত মাইকে কাওয়ালির শব্দে ঘুম আসত না। ঘটাং ঘটাং শব্দে মাঝ রাতের ট্রেন যেতে থাকলে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসতাম। জানালায় মুখ বাড়িয়ে দেখতাম টলতে টলতে খিস্তি আউরে লোকজন বেরিয়ে আসছে। ভারি সাজুগুজু হয়ে থাকত চন্দনা। তাকে দেখেই প্রথম আমার যুবতী হওয়ার সাধ হয়। কত বিচিত্র ফিতায় চুল বাঁধা থাকত তার। তার অবিশ্রান্ত হাসি। একদিনই শুধু তাকে কাঁদতে দেখেছিলাম। তার প্রিয় শুয়োর ছানাটি ট্রেনে কাটা পড়লে তীরের বেগে সে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল রেললাইনের ওপর। সে কি বুক থাপড়ানো বিলাপ! সন্তান হারানোর চিৎকারও বুঝি এত গভীর হয় না। ওই রকম সারাক্ষণ তরল মেজাজে থাকা মেয়ের বুকের মধ্যে এত ভালোবাসা থাকতে পারে? বিস্মিত হয়েছিলাম। সে যদি আমার চাচার ঝুলন্ত লাশ দেখত!

এইরকম নানা চক্রের ভেতর দিয়ে সময় বয়ে যায়। বুকের অতলতায় ক্রমাগত বিক্ষুব্ধ জলের ধারা। পরম গাঢ়তায় তুলোর বালিশে মুখ গুঁজি। বালিশ ভিজে ওঠে ক্রমশ। কি ছায়া চারপাশে। কি ম্রিয়মাণ, দুঃসহ-দুর্বহ সকাল-দুপুর-রাত। এভাবে দিনগুলো অতিক্রম করি এবং সেই অবসন্ন পল-অনুপলের পথ ধরে একদিন রেজাউলও আসে।

এই কি সেই রেজাউল? কিছুদিন আগে যাকে চিনতাম? কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে পড়েছে। চোখ কোটরে, পোশাকে কালসিটে রঙের ছড়াছড়ি। চুলে চিরুনির দাগ নেই। চেয়ারে বসেছে কেমন জবুথবু। আমার দিকে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকায়। এবং সেই দৃষ্টির সামনে আমার হৃৎস্পন্দন থেমে যায়। কি গভীর, ক্লান্তিময় মূর্তি! রাতের আলোতে আমার দীর্ঘ ছায়া দেয়ালে, আমি নিজের সেই আকৃতির দিকে চেয়ে ভেতরের দ্বন্দ্ব লুকোই— খবরটা জানাবো ওকে? কিছু একটা বলার জন্য উসখুস করছে সে। আমার কোনো সংবাদ কি আজ তার জন্য সুখকর হবে? অথচ তা-ই তো হওয়ার কথা ছিল। যে-কোনো কারণেই হোক তার অপেক্ষায় ছিলাম, কিন্তু তার বিবর্ণ মূর্তি আমাকে ম্রিয়মাণ করে তোলে। এই রেজাউলের পুরো অবয়বে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, আমার দাম্পত্য জীবনের রেজাউল। মাঝখানে যে অভিনব পোশাকটা সে তার সমস্ত অস্তিত্বে জড়িয়ে এসেছিল, সেট যেন আজ সে খুলে এসেছে। না, মৃত্যুর বিনিময়েও এর সান্নিধ্যের কথা ফের ভাবা যায় না। আহ্ পাঁজরের নিচে ঘা দিচ্ছে। আমি কি ডাক্তারের চেম্বারে যাব?

তোমার কাছে কিছু টাকা হবে?

কত?

এই ধরো পাঁচশো... বলে ভীষণ বিব্রত বোধ করে সে, আমি ব্যাগে হাত দিলে সে স্বরে মৃদুতা এনে বলে যায়, বেশ কয়েক দিন হয় আমার চাকরিটা চলে গেছে। গণছাটাইয়ের মধ্যে আমিও পড়ে গেছি। এ কদিন অনেক ধরাধরি করলাম, কিচ্ছু হলো না।

হলদেটে পানসে আলোয় শিথিল আমার হাত ক্রমাগত ব্যাগ হাতড়ায়। শিশিরের অস্পষ্ট পতনের শব্দ অবচেতনে। গায়ে কার্ডিগান জড়িয়ে আমি সেই সঙ্কীর্ণতার ধোঁয়াজল থেকে বেরোই। সে বলে, ভাবছি দেশে ফিরে যাব। মফস্বলে গিয়ে যদি কিছু একটা করা যায়।

আমার ভেতরে কি এক অজানা কারণে ধস নামতে শুরু করে। সহিষ্ণুতার শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়েছি আজ। নিজেকে এত পতিত লাগছে। তাহলে এতদিন কি আয়ত্ত করেছি? কতটা তৈরি করেছি নিজেকে? ঘোর তলানি থেকে ওপর দিকে উঠে আসি। টাকাগুলো বাড়িয়ে দিলে, সে কেমন মিনমিনে গলায় বলে, তুমি কি কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছ?

আমি হেসে ফেলি।

কী ব্যাপার, হাসছ কেন?

তুমি টাকাগুলো রাখো। ভদ্রতা করতে হবে না।

আমি ভদ্রতা করছি?

আহ্ রেজাউল... মৃদু ধমক দিয়ে চেপে বিছানায় বসি। এইভাবে আরো কিছুটা সময় পেরিয়ে যায়। এক সময় সে উঠে দাঁড়ায়।

তার পদক্ষেপে কি ভারহীনতা। লজ্জাময় ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে হাসে। দরজার কাছে যাই।

নিজের দুর্বলতা ঢাকার জন্য যেন সে কঞ্চির মতো টানটান হয়। এবং বিশাল অন্ধকার পৃথিবীতে পা রাখে।

ভোঁকাট্টা ঘুড্ডির মতো উড়তে থাকি। দীর্ঘদিন পর নিজেকে বিপর্যস্ত অথচ প্রবলভাবে মুক্ত মনে হয়। রেজাউলের বেড়াজাল আমাকে অনেকদিন ধরেই আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল। অষ্টপ্রহরে জুড়ে কেবল পীড়নময় দ্বন্দ্ব, সিদ্ধান্তহীনতার জট, এবং শেষাবধি আমার সুগভীর গর্ভে সন্তানের ভ্রূণের বেড়ে ওঠাকে ঘিরে তার ওপর এলিয়ে পড়তে চাওয়া, কোনো কিছুর মধ্যেই আমার কোনো নিজস্বতা ছিল না। এবার যথার্থই নিজেকে শূন্যে ফেলে আমার একদম একলা-একা সিদ্ধান্ত নেয়ার পালা, আমি কি করব? আমি কি নষ্ট করে ফেলব ভ্রূণটাকে?

• সিনথির রাজপ্রসাদে বিচিত্র ভিডিওর মগজ-ধোলাই-করা-নাচ দেখতে দেখতে, অফিসের বন্ধ কাসুন্দির মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে, শীতের নির্জন পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমার ভেতর কেবল একটা দ্বন্দ্বেরই চড়াই-উতরাই, এরপর আমার কি সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত।

কলজে-খামচে-ধরা কম্পিত রাত, আমার একার দুর্বিষহ রাত এখন একটা চিন্তায় পরিব্যাপ্ত... অঙ্কুরটাকে মেরে ফেলব? কিন্তু তার পক্ষে যখন দাঁড়াই, আমাকে তাড়িত, অবসন্ন করে ফেলে আরেকটা অনুভূতি। আমার প্রথম সন্তানের বিষণ্ন পরিণতি। চারপাশে সেই হাসপাতাল-শূন্য-করা-চিৎকার আবারো ধ্বনিত হয়। সর্বাঙ্গ শিথিল-করা এই প্রশ্নে

আন্দোলিত হতে থাকি, দ্বিতীয় সন্তানের হন্তারক তবে আমিই হতে চাইছি। সোজা হয়ে আর দাঁড়াতে পারি না।

তাছাড়া রেজাউলের জন্য অপেক্ষার সময়টাতে অদ্ভুত দ্বন্দ্বের মধ্যে এইরকম অনুভবের স্পর্শ-বর্ণ-গন্ধ আমার ভেতর জন্ম দিয়েছে এক বিশাল শক্তি— এর ডালপালা হবে, শালপ্রাংশু হবে সে... ভেতরে নিবিড় এক মায়ার জন্ম দিয়েছে। এর জন্ম আমার কাছে আকস্মিক, অনাহূত। যেদিন টের পেয়েছি তার পরদিন থেকে ক'দিন আমাকে সেই আকস্মিকতা স্থবির করে রাখবে এটাই স্বাভাবিক। সেই আকস্মিক পীড়ন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য স্বাভাবিক ছিল সেই অঙ্কুর সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গ থেকে আকস্মিকভাবে ঝেড়ে ফেলা। কিন্তু তখন আমার মনে তৈরি হচ্ছিল সামাজিকভাবে নিজেকে খাড়া করার প্রক্রিয়া এবং এর সামাজিক স্বীকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে ছিল রেজাউল। ফলে আমার পায়ের তল থেকে সঙ্গে সঙ্গে মাটি সরে যায় নি। কিন্তু রেজাউলের জন্য অপেক্ষার সময়টাতে আমি তার আগমনের আকস্মিকতা কাটিয়ে উঠেছি। তারপর পেরিয়ে গেছে আন্দোলিত অনেক পল-অনুপল। মুহূর্ত ও মাস। এখন আর আমি তাকে অঙ্কুর বলতে পারি না। ক্রমশ টের পাচ্ছি এখন একটা পরম আকৃতিতে রূপান্তরিত হচ্ছে সে, আমি তাকে হত্যা করব যে কারণে, সেই বিস্ময়ের আশঙ্কা তো থিতিয়ে এসেছে। ধরা যাক, এক ভিখিরি মেয়ে কারো সেরা গয়নাটি চুরি করে পালাতে গিয়ে ধরা পড়ল, শেষে জানা গেল, সে এর আগে তিনদিন অনাহারে ছিল, চুরি করা জিনিসটার মূল্য জানে না, চুরি করেছে বিক্রি করে ভাত খাবে বলে। যার গয়না চুরি হয়েছে, সে তখন অন্য জেলায় অবস্থিত স্বামীর সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়। তারপর মেয়েটাকে সাতদিন আটকে রাখার পর তার স্বামী এসে তাকে চুরির ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রবল পিটুনির সিদ্ধান্ত নিল। যার চুরি গেছে সে কি সাতদিন আগের ক্রোধ নিয়ে মেয়েটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে? আমার স্বকীয়তা আমাকে, কোন পথে টেনে নিতে চাইছে?

তাছাড়া আমার রক্তের মধ্যে যার উদ্ভাসন, সে তো চোর হয়ে নিভৃতে অনধিকার প্রবেশ করে নি। আমিই তার আসার পথ করে দিয়েছি। হা আল্লাহ্! কি বিচিত্র কায়দায় চারপাশের পৃথিবী দুলছে। আস্ত মেঝে গন্ধে ডুবিয়ে বমি... বমি। পাশের ঘর থেকে দৌড়ে আসে শানু। তার বিস্মিত চোখ আমাকে চারপাশ থেকে ছেঁকে ধরে। তার শরীর জড়িয়ে ধরে দাঁড়াই। হাত-মুখ ধুয়ে বিছানায় চলে আসি।

পরদিন ধুসর সন্ধ্যার পথ ধরে সত্যজিতের বেকারিতে যাই। ভেতরে রনজু সালাহ্‌দিনদের তুমুল আড্ডা চলছে। আমাকে দেখে সমস্বরে চিৎকার করে ওঠে তারা, শালার দোস্ত তুমি! অনেকদিন পর ওদের বন্ধু শাহতাবকে দেখি, তার ফর্মাল প্রশ্ন, কেমন থাকা হচ্ছে? বড় আন্তরিক আহ্বান। আমিও মিলিত হই। সত্যজিৎ ভেতরে ভেঙেচুরে এরি মধ্যে অনেক বড় করেছে তার বেকারি। জায়গা হয়েছে প্রচুর। বেশ ভালোই যাচ্ছে ব্যবসা, বোঝা গেল। টুল টেনে বসে যাই।

আড্ডায় বিশ্বজগৎ চষে ফেলা হয়। গর্বাচেভের মহান উত্থান, আজকাল নোবেলে পুরস্কারেও কারচুপি, ম্যারাডোনার ক্রন্দনময় বিদায়, যা দেখাচ্ছে ম্যাডোনা, জুহি চাওলা কম কিসে? যা বলেছিস, রবীন্দ্র সঙ্গীতে চমৎকার ডাইমেনশান এসেছে, শিবিরের হাতে একুশ ঘন্টা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জিম্মি, সরকারবিরোধী আন্দোলনটা বুঝি থিতিয়েই গেল, খামোখা এখন লাগাতার হরতালের ঝিমন্ত তাল তুলে দেশের অর্থনীতিকে আরো পঙ্গু করার চেষ্টা।

এই সব করে করে এক সময় প্রসঙ্গ ইরাক অভিমুখে যাত্রা করে, সত্যজিৎ চিৎকার করে ওঠে, ইরাকের সমস্ত রাসায়নিক ম্যাটেরিয়াল বুশ ধ্বংস করে ফেলছে। যা একটা অবস্থা চলছে না!

তা বেশ করছে, শাহতাব বলে, তুমি কেন বাপু পরের দেশ দখল করার অনাচারে লিপ্ত হও? লক্ষ লক্ষ মানুষকে জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে ফেলার কোনোই অধিকার সাদ্দামের নেই। এখন অবস্থাটা বোঝো, উপসাগরে ষাট মাইল ব্যাপী তেলের ট্যাঙ্কে আগুন জ্বলছে।

আমাদের সরকারও তো লোক পাঠিয়েছে, সত্যজিৎ বলে, ওদের অবস্থা কী?

ওরা আর ক'জন! শাহতাব বলে, বাংলাদেশী যারা ওখানে আটকা পড়েছে ওদের অবস্থাটা চিন্তা কর? অনাহারে, অনিদ্রা... আমার এক খালাতো ভাই কুয়েত আছে। আধপাগল খালাকে এয়ারপোর্ট থেকে আনাই যাচ্ছে না। সে এয়ারপোর্টকেই ঘরবাড়ি বানিয়ে ফেলেছে। এরকম অসংখ্য লোক... যা-ই বলিস, সাদ্দাম কাজটা অন্যায় করেছে। কিন্তু সালাহ্‌দ্দিন এই যুক্তি মানতে রাজি না, তোমরা তো মার্কিনের পা-চাটা কুত্তা। তোমরা কি করে বুঝবে, এটা সাদ্দামের অনাচার নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। ব্যাটার বুকের জোর আছে, সৌদি ভূ-খণ্ডেও অভিযান চালিয়ে দখল করেছে কয়েকটা ফাঁড়ি। এখন যুক্তরাষ্ট্রকে একটা ঠ্যালা দিলেই হয়। সত্যজিৎ আগের মতোই চিৎকার করে ওঠে, ট্যাংরা হয়ে বোয়ালের পেছনে লাগতে আস? মার্কিনের স্বেচ্ছাচারী অন্যায়ের প্রতিবাদ ইরাক আরেকটা অন্যায় দিয়ে করবে? তোরা এটাকে সাপোর্ট করবি? ফলে তুমুল হট্টগোল, তর্ক, গলাভাঙা চিৎকার। সেই চিৎকারের কঠিন প্রাচীর ভেদ করে কোনো সুযোগ হয় না আমার ন্যূনতম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার। ঝিম ধরে বসে থাকি। এবং নিজের মধ্যে ধ্যানস্থ হই। হিড় হিড় করে টেনে আমার ঘাতক বাবা আমাদের শুইয়ে দিচ্ছেন গোরস্থানে। পরক্ষণেই চোখ ছাপিয়ে অন্য দৃশ্য, আমরা প্রাণভরে ভাত খাচ্ছি, তাই দেখে বাবার চোখে আবেগে জল এসে যাচ্ছে। সেই ছবিও মুছে যায়। এবার দেখি বাবা বিছানায় শুয়ে। তারপর সেই কটাক্ষরত রমণীরা। আমি উন্নত পেটে দাঁড়িয়েছি তাদের সামনে।

ব্যভিচারিণী, পিশাচিনী, ছি! ওরা দলা দলা থুতু ছুঁড়ে দেয়। এরপর রেজাউল... মহিমের চির প্রেমে নিমজ্জিত আমি কি তাকে ঠকাই নি? কেবল অস্তিত্ব সঙ্কটের দায়ে তাকে বিয়ে করেছিলাম। ভালোবাসা ছিল না, সংসার পেতেছি। তার ওপর প্রতিনিয়ত আরোপ করেছি মহিমকে, এই অপরাধ কি রেজাউলের বালক প্রীতির চেয়ে কম কিছু?

আর এখন? এখন মহিম, রেজাউল— সবাই এক বিশাল ছায়াময় শক্তির সামনে অপসৃয়মাণ। আর এই যে আমি গর্ভে একজনের ভার নিয়ে তাঁর তলায় নিজেকে লোটাতে চাইছি, সেটা কতটুকু যুক্তিযুক্ত? নিজেকে নিয়ে আমি কোথায় দাঁড়াব? সবকিছু মিথ্যে করে দিয়ে এই বয়সে মা'র সেই প্রেমিক কেন এখন আমার কাছে মহান সত্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে? কেন আমি একা চলতে পারি না? জীবনের এই জট-জটিলতা আমাকে আর কোন অতলে ডোবাবে?

সারসার বিস্কুটের বৈয়াম, সেভেনআপ, পেপসি, মিরিন্ডা, চকোলেট, নারকেলের তক্তি, প্লাস্টিকের ফুল, হরলিক্স, কেক, পেস্ট্রি, পুতুল, হটপ্যাটিস— একই ঘরে। এক সঙ্গে বিচিত্র গানের সমাহার যেন, ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি... এবং হট্টগোল, হরেক স্বাদের গন্ধ। কেমন

ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে যাই। একসময় সালাহ্দিনের সহজতাই স্বস্তিকর লাগে, যুদ্ধ প্রসঙ্গ পাল্টে আমার দিকে ফিরে বলে, কবিতা লেখা শুরু করেছি। শুনবে? সত্যজিৎ চেঁচিয়ে ওঠে, মেয়ে দেখলেই শালার কাব্য চাগিয়ে ওঠে। মেয়েদের মন গলানোর কী সহজ পথ!

এবার রনজু চ্যাঁচায়, ও তো মেয়েই। তুই কি বলতে চাইছিস ও পুরুষ? এক সাথে এক ঘরে থেকেই দেখ না, কার পেটে বাচ্চা আসে!

অসহ্য! আমি সেই ভয়াবহতা থেকে ছিটকে বেরোই। এই কি এদের চিন্তার উচ্চতা? চারপাশ ছায়া করে দূরে একটা আলোকোজ্জ্বল জানালা জেগে থাকে। যত এগোই, ততই ছায়া। মাথায় সার সার পাথর, স্নায়ু-শিরশির-করা জলের শব্দ এবং শ্বাসরুদ্ধ করা কিসের যেন মরাটে গন্ধ! হাঁসফাঁস করে এইসব থেকে নিজেকে ছাড়াই। এবং হঠাৎ-উড়ে-আসা বাতাসের প্রবল একটা ঝাট আমাকে কব্জা করে রাস্তায় হেঁচড়ে নিয়ে ফেলে।

বাইরে আলোকিত ফুটপাত। লম্বা করে নিঃশ্বাস টানি। শীতের বিশুদ্ধ বাতাস। কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডানা ঝটপট কাক। বিস্তৃত সড়ক ধরে যন্ত্রদানব দৌড়চ্ছে। কার্ডিগান ফুঁড়ে-ঢোকা বাতাস বিবশ রোমকূপকে জাগিয়ে তুলে কেবলি সুড়সুড়ি দেয়।

পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে সত্যজিৎ। সোডিয়াম বাতির আলোতে তামাটে মানুষ। পাশাপাশি হাঁটি। সত্যজিৎ বলে, তোকে আমরা অতটা সেনসেটিভ মনে করি না, রনজুর ইয়ার্কিটা—।

প্লিজ, ও প্রসঙ্গ থাক। আমি থামিয়ে দিই। তারপর নিঃশব্দ পথ চলা। ও আসায় আমার অস্থিরতা অনেক কমে গেছে। নিজেকে আমি ততক্ষণে সামলে নিয়েছি। একসময় গল্পচ্ছলেই বলি, সত্যজিৎ তোর কাছ থেকে কারো বিশেষ একটা ব্যাপারে সমাধান চাইব। কিন্তু তুই বেশি প্রশ্ন করবি না, এই শর্তে।

সত্যজিৎ কিছু বলে না। হাঁটছে নিঃশব্দে।

উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলি, ধর অবিবাহিত একটা মেয়ে, তার পেটে হঠাৎ সন্তান এলো। কিন্তু যার ভ্রূণ, সে তখন দূরে, মেয়েটা তখন কি করবে?

দূরে মানে? সত্যজিতের প্রশ্ন, প্রতারণা করে পালিয়েছে?

ধর, সহজ অর্থে তা-ই।

বাচ্চাটা কত মাসের?

ধর, আড়াই।

তা হলে অপারেশন করিয়ে ফেলবে, সত্যজিতের সহজ উত্তর। বিংশ শতাব্দীর মেয়ে হয়ে রামগাধার মতো প্রশ্ন করছিস?

শীত লাগছে। তামাটে ফুটপাতের অলস পথ ধরে আমরা এগোই। চারপাশে হলুদাভ কুয়াশার ধোঁয়াটে আস্তরণ। কোত্থেকে হু-হু বাতাস আসে।

সেই মেয়েটি কি তুই?

তুই কিন্তু প্রশ্ন করছিস!

আমি কোনো শর্তে যাই নি।

আমি কি অবিবাহিতা?

অন্যের কাসুন্দি ঘাঁটছিস ? সে যে-ই হোক, এখানে ঝামেলা চুকিয়ে ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ, এটাই আমার একমাত্র সমাধান।

কথা আর ডালপালা খুঁজে পায় না। মনে নিশ্চিতই সন্দেহ নিয়ে চলে যায় সত্যজিৎ। বুঝতে পারি চলে যাবার ভঙ্গি থেকে।

আমার সামনে শীতের সুদিঘল রাত। এবং মৃত্যুর মতো জেগে থাকার কষ্ট। বুক ধড়ফড় করে। চারপাশে মাছের আঁশটে পচা গন্ধ। কখনো বদ্ধ জলাশয়ের মতো অচৈতন্য পড়ে থাকি। কখনো বিশাল একটা ছায়া আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। দীর্ঘ মোমবাতি জ্বেলে আমাকে বাইবেল থেকে কবিতা পাঠ করে শোনায়। আমি নতজানু হই। এইভাবে আমার বিষাদ-ছাওয়া রাতগুলো পেরোতে থাকে।

পরদিন ক্ষয়িষ্ণু গলি ধরে, নর্দমার দুঃসহ দুর্গন্ধের অত্যাচার কোনো মতে এড়িয়ে ওমরের বাসায় যাই। তাদের বাড়িটা যেন আরো প্রাচীন, আরো ভঙ্গুর। পুরো বাড়িটা শুধু আবর্জনা, মুতের গন্ধ। ওর মা'র পরনের শাড়িটা ছেঁড়াঝুলো ত্যানারও অধিক। আমাকে দেখে বিব্রত মহিলাটি ভেতরে ঢুকে যায়। লুঙ্গিতে গিঁট লাগাতে লাগাতে উদোম গা ওমর বাইরের ঘরে আসে। আগাপাস্তলা চিন্তা না করেই চলে এসেছি। বেশ অস্বস্তি বোধ করি। কিন্তু আহত হই ওমরের আচরণে। আমার এই অপ্রত্যাশিত আগমনের খবর যেন সে জানত, এমন ভঙ্গিতে হাসতে থাকে, এসেছেন তাহলে!

আমার কি আসার কথা ছিল ?

কোনোদিন আসবেন না, তাই ভেবেছিলাম।

আপনি একটু শার্ট প্যান্ট পরে আসুন তো, বাইরে বেরোব। চৌকির পায়াগুলো এমন নড়বড়ে যে, ভারি শরীরের কেউ বসলে নির্ঘাত পড়ে গিয়ে হাড়হাড্ডি চুরচুর হয়ে যাবে। কিন্তু তার ছোট ভাইটি কোথায় ? পাঁশুটে পর্দার ফাঁকে দিয়ে উঁকি দিচ্ছে তার বোন। ওমর কিছু না বলে ভেতরে যায়। এই ফাঁকে আমি তার বোনটাকে ডাকি। ক্ষীণকায়, দেখে মনে হয়, শোলচর্মসার বৃদ্ধা। এ ঘরে কোনোদিনই বাতাস কিংবা এক চিলতে আলো ঢুকেছে বলে মনে হয় না। মেয়েটার চোখ জোড়া কী চরম নির্বিকার! এবার আমার চোখ গিয়ে ঠেকে ওদের ঘরের বাঁশের সিলিংয়ের পুরোটা জুড়ে লম্বা হয়ে ঝুলে থাকা ঝুলকালিতে। একটা মরা তেলাপোকা হল্লা করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে একঝাঁক লাল পিঁপড়ে।

ভীত সন্ত্রস্ত মেয়েটি এগিয়ে আসে। দু' চোখে এমন সরলতা, স্পষ্ট মনে হয় একজন কামুক কিশোরও যদি তাকে শোবার কথা বলে, তার না করার ক্ষমতা থাকবে না।

আপনার ছোটভাইটা কোথায় ? প্রশ্ন করি।

ওকে আমার এক কাকা পাবনা নিয়ে গেছে... বলে মেয়েটি অস্বস্তির সাথে তার খাটো ওড়না ধরে টানতে থাকে। কী বিপত্তি, একদিকে জোরে টান দিলে, অন্যদিকে উদোম হয়ে যায়।

পাবনায় কাউকে নিয়ে যাবার মতো এদের তাহলে একজন কাকাও আছে। কিন্তু এত গন্ধ, এ বাড়িতে টেকাই মুশকিল। ওমর এলে বেরিয়ে পড়ি।

বাইরে বেরিয়ে প্রথমেই প্রশ্ন করি, আপনার বোনকে কে এ্যাবরশন করিয়েছে ?

আমার মা।

আপনিও তাই চাইছিলেন ?

দেখুন, ছেলেটার কোনো পাত্তা ছিল না। এছাড়া আর কি করার ছিল ?

শুক্রবারের উদ্ভাসিত সকাল। রোদ-ভাজা শহরের ওপর দপদপ পা ফেলে হাঁটি এবং নির্জনে কোথাও গিয়ে বসে বলার চাইতে, কী হয়, চারপাশের এই ঘিঞ্জি ভিড়বাট্টার ভেতরেই আমি বলে ফেলি আমার সেই মর্মান্তিক-গোপন কথাটা- শুনুন, আমার গর্ভে একটা সন্তান এসেছে। ওমর চকিতে আমার মুখের দিকে প্রখর চোখে তাকায়। আমি বলে চলি, মাস দুয়েক আগে স্বামীর সাথে... বুঝতেই পারছেন... আর তা থেকেই... কিন্তু এখন আমি কি করব, কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারছি না।

ওমরের মুখে ছায়া পড়ে। শীতের খরশান রোদে মুহ্যমান বিশাল রাজধানী। এবং চারদিকে বিচিত্র সব শব্দতরঙ্গ। মাথা নিচু করে আমরা পাশের একটা ছোটো চায়ের স্টলে ঢুকে যাই। কোনার একটা মামুলি টেবিলের দু'পাশে দু'জন বসি। ব্যাগ রেখে তার দিকে তাকাই।

আপনি কি স্বামীর কাছে ফিরে যেতে চাইছেন না ?

আমার সে-রকমই ইচ্ছে।

মাঝখানে কালো টেবিল। এবং চারপাশে চটুল আড্ডা। শীতের মৃদু আমেজে চায়ের উষ্ণ ঘ্রাণ। এবং পিরিচ-কাপের তাল-কাটা টুংটাং। ওমর বলে, কি বলব বলুন, তবে আমার একটাই পরামর্শ, আপনি বিয়ে করে ফেলুন। আমাদের সমাজ বড় ভয়াবহ। নইলে আপনাকে চরম খেসারত দিতে হবে।

বাচ্চাটাকে নষ্ট করে ফেলার পরামর্শ দিচ্ছেন না কেন ?

বড় নাজুক প্রসঙ্গ, ওমর বলে, এসব আমি বিশেষ বুঝি না। আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা-ভক্তি কেমন, সেটা বলে বোঝাতে পারব না। আপনার অনাগত সন্তানের প্রতিও আমার মমতা... না, না আমি তার মৃত্যুর কথা ভাবতে পারি না। এ সন্তানের বাবা হওয়াটাও ভাগ্যের ব্যাপার।

কিন্তু প্রথম প্রশ্ন হলো, জেনে-শুনে এই দায়িত্ব নিতে যাবে কে ? আমি বলি, তারপর যে দায়িত্ব নেবে সে-তো তার পিতা হবে না, সুতরাং ভাগ্যবান হওয়ার প্রশ্ন সেক্ষেত্রে কি আর আসছে ?

ডালপুরি, চা এসে যায়। আহ্, ধোঁয়া, পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে। ওমরকে আজই প্রথম খুব স্থির মনে হচ্ছে। জেনেশুনে কেউ দায়িত্ব না নিলে, না জেনে নেবে, ওমর সহজ স্বরে বলে, আপনি নিশ্চয়ই এক্ষেত্রে প্রতারণার প্রশ্ন তুলবেন ? আমি এসব বিশেষ বুঝি না। সম্ভবত একটা বস্তির মতো জঘন্য পরিবেশে বেড়ে উঠেছি বলে আমার পাপপুণ্য, প্রতারণা, এসব ব্যাপারে মগজ খুব ভোঁতা। আমি জটিলতা না করে কোনো বড় কাজ, সেটা যদি সামাজিকভাবে চিহ্নিত পাপের ভেতর দিয়েও হাসিল করতে হয়, তাতে কোনো অন্যায় দেখি না। আর জন্ম যে কেউ দিতে পারে, কুকুর বেড়ালও দেয়, প্রতিপালনই পিতার আসল কাজ, শাদা মাথায় আমি এইটেই বুঝি। তাছাড়া পাপ যে ঠিক কোনটা এতদিনেও আমি সেটা বুঝতে পারি নি। ওমর এরপর হেসে ফেলে, আপনাকে একটা গল্প বলি। গল্পটা বিখ্যাত কারো লেখা হবে। আপনি হয়তো তার নাম জানবেন। আমার অতসব মনে থাকে না।

অবশ্য আমাদের এখনকার প্রাসঙ্গিক বিষয়ের সঙ্গে গল্পটার মূল আদৌ হয়তো কোনো মিল নেই। গল্পটা মনে ভীষণ দাগ কেটেছিল বলেই বলছি। এক প্রেমিকা তার প্রেমিককে বলল, তুমি যে আমাকে গভীরভাবে ভালোবাসো, তার প্রমাণ কী? তুমি যদি আমাকে সাতদিনের মধ্যে একটি লাল গোলাপ এনে দিতে পার, তবেই আমি বুঝব তোমার ভালোবাসা নিখাদ, শ্রেষ্ঠতম। তো প্রেমিক ছুটল লাল গোলাপের খোঁজে। সেই মরশুমে সে দেশে একদমই লাল গোলাপ ফুটত না। একদিন, দু'দিন, তিনদিন... প্রেমিক পাগলের মতো সমস্ত শহর চষে বেড়ালো। নিদ্রাহীন উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় সাতদিনের মাথায় সে একটা গাছের নিচে বসে কাঁদতে লাগল। তখন সেই গাছের মাথায় বসে গান গাইছিল একটা নাইটিঙ্গেল পাখি। প্রেমিকের কান্না দেখে তার বুক ফেটে গেল। সে গোলাপ গাছকে করুণ মিনতি জানাল, তুমি কি একজন প্রেমিকের অসহায় কান্না শুনতে পাচ্ছ না? তার জন্য অন্তত একটি ফুলের জন্ম দাও। গোলাপ গাছ বলল, ফুলের জন্ম না হয় দিলাম কিন্তু লাল রঙ আমি কোথায় পাব? সে লাল রঙ আমি দেব, বলল নাইটিঙ্গেল পাখি।

নাইটিঙ্গেল পাখি গোলাপ গাছের কাঁটায় বিঁধিয়ে দিল নিজের বুক। ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত সেই কাঁটার বুক বেয়ে গোলাপ গাছে সঞ্চারিত হতে লাগল। নাইটিঙ্গেলের শরীরের রক্তে রক্তে ভোর রাতে ফুটে উঠল টকটকে লাল গোলাপ। খুব সকালে নাইটিঙ্গেল মারা গেল।

এদিকে সপ্তাহ শেষে হতাশ, পাগল, ব্যর্থ প্রেমিক ভোরে সামনের গোলাপ গাছে ছোট্ট একটি লাল গোলাপ দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে প্রেমিকার কাছে ছুটে গেল। সে গোলাপ দেখে প্রেমিকা কী বলল জানেন? ওমর আমার দিকে সপ্রশ্ন তাকায়। আমার ঘোর চেতনায় মিহি তোলপাড়... নাইটিঙ্গেলের বিন্দু বিন্দু রক্তে আমার চায়ের রঙ লাল। চুমুক দিই।

প্রেমিকা বলল, এটা একটা গোলাপ হলো? গল্পটা শেষ করেই ওমর হা-হা হাসতে থাকে। আপনার নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে, পৃথিবীতে তবে ভালোবাসা বলে কিছু নেই? প্রথম কিন্তু আমারও তা-ই মনে হয়েছিল।

এমন গল্প বলে কেউ হাসে? অথচ আমার কেমন কান্না পাচ্ছে। আমি আমার সর্বস্ব নিয়ে যদি সেই স্থির মানুষের সামনে নতজানু হই? যদি বলি, এই যে আমার বেদনা, গ্লানি আনন্দ। তুলে নিন আমাকে। যদি তিনি আমার মা'র মতো আমাকেও ছুঁড়ে দেন নর্দমায় আর বলেন, এটা একটা নীনা হলো?

ওমর বিড়ি ধরায়, এবং চিৎকার করে, বিড়ি কেন খাই? পয়লা নম্বর তৃপ্তি পাই।

কিযে হিবিজিবি খান, অন্তত একটা ব্রান্ডে স্থির হন... ওমর, ভালোবাসা তবে এই? তেহারির ঘ্রাণ। চা এবং বিড়ির ধোঁয়া আমাদের চারপাশে কুয়াশা তৈরি করে। ওমর আবারো হাসে, আপনি সেই প্রেমিকার তাচ্ছিল্যই দেখলেন? ভালোবাসা যদি এ-ই হবে, তবে নাইটিঙ্গেল পাখি রক্ত দিল কেন?

আমি তার হাত চেপে ধরি, এরকম ব্যাখ্যা আমাকে শোনাচ্ছেন কেন? ওমর কেমন থিতিয়ে যায়, আমি মূর্খ গবেট মানুষ, আমার আবার-ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ! সেই পাখির রক্তপাতের কাছে কত তুচ্ছ আপনার এসব জটিলতা। চোখ মেলুন নীনা, দেখুন, বুঝতে চেষ্টা করুন নিজেকেও। আপনারা আলোর মধ্যে বড় হয়েছেন। নিজেকে চিন্তা-চেতনায় বড় করে

তুলতে পেরেছেন। আমি গু মুতের মধ্যে বেড়ে-ওঠা-মানুষ। আমি আপনাকে কি বলব ? তবে এটুকু বলতে পারি, যা আগেই বলেছি, যদি একান্ত নিজের সঙ্গে না পারেন, তবে কাউকে বিয়ে করে ফেলুন। নয়তো ফিরে যান স্বামীর কাছে। এখন বুঝছেন না, কিছুদিনের মধ্যেই চড়া দাম দিয়ে আপনাকে বুঝতে হবে আপনার স্বাধীনতা কত বিপন্ন। আমার উদ্বেগ তখন চরমে। কোনোমতে বলি, আমাকে জীবন যে-কোনো এক ধারে নিয়ে ফেলুক, তবুও তার কাছে আর ফেরা যায় না।

ওমর কেমন কেঁপে ওঠে, তবে অন্য কাউকে, আপনার যাকে ইচ্ছে হয়!

চায়ে চুমুক দিচ্ছে ওমর। ধোঁয়াটে আলোর আস্তরণ ভেদ করে তার দিকে চেয়ে থাকি। এমন খেলাচ্ছলে সে কি নিজেই জানে সে কী বলছে ?

আমার চারপাশে আশ্চর্য নরম ঢেউ। সে ঢেউ ছাপিয়ে টি স্টলে হট্টগোল। উষ্ণকাপে ঠোঁট চেপে ধরি। বুকের মধ্যে বিচিত্র তোলপাড়। উস্কো জঙ্গুলে চুলের ওমর মুহূর্তেই সব ঝেড়েঝুড়ে ফেলে নিজের স্বকীয়তায় ফিরে আসে, কি সব ভারি ভারি কথা হলো। মাথা থেকে ফেড়ে ফেলুন তো সব। চলুন, আজকে একটু ঘুরে বেড়াই। টিউশানি অবশ্য আছে একটা, গোল্লায় যাক। ব্যাগে টাকা আছে তো ?

তলানি শুষে কাপটা রেখে দিই। বুক জুড়ে পুঞ্জীভূত শাদা। আমি তেমনই ধোঁয়াটে চোখে ওমরের মুখোমুখি, কিন্তু হুট করে বিয়েটা করব কাকে ? গলির মোড়ে ছেলে দাঁড়িয়ে আছে ?

কেমন নিভে আসে ওমর। বিহ্বল চোখে আমার দিকে তাকায়। এবং স্বভাব বিরুদ্ধ সংযত স্বরে বলে, দয়া করে এরকম কোনো প্রশ্ন আমাকে করবেন না। আমি আমার স্পর্ধার সীমা লঙ্ঘন করতে চাই না। সেটা আমার জন্যে বেশি চাওয়া হবে।

কী করব আমি ? ঘরে ফিরে অসহ্য যন্ত্রণায় তড়পাতে থাকি। আমি কি জানি না যে সঙ্কটে আমি পড়েছি, তার পরিণতি কী ? চারদিক থেকে একটা লম্বা সাঁড়াশি আমার গলা চেপে ধরবে, শ্বাস রুদ্ধ করতে চাইবে। আমার অস্তিত্বকে ছিঁড়েখুঁড়ে শূন্যে দাঁড় করাবে, ওখানে থেকে আমি কোন পথ ধরে নেমে আসব ? আকৃতিতে রূপান্তরিত হতে থাকা শিশুটিকে খুন করব ? কিন্তু পেটের ওপর হাত রাখার পর কী বিচিত্র মায়া, নরম ঢেউ আমাকে গভীর মোহাবিষ্ট করে রাখে।

আমি আসলে কী চাইছি ? আমার সমস্ত অস্তিত্ব কোথায় গিয়ে লুটিয়ে পড়তে চাইছে ? আমি কি জানি না ওমরের ইচ্ছে ? ওই নর্দমায় বেড়ে ওঠা ওমর কোথায় কতটা বড় হয়ে উঠেছে তা কি আমি টের পাচ্ছি না ? কিন্তু এতদিন ধরে আমার স্বপ্নের বিস্তারের মধ্যে যিনি বিশাল হয়ে উঠেছেন, সমস্ত অস্তিত্ব আজ তাঁর ছায়ায় দাঁড়াতে চাইছে, ঠিক এই জায়গায় এসে বুঝছি সেই মানুষ ছাড়া আমার সামনে আর কোনো সত্য নেই। কিন্তু এই অবস্থায় তার সামনে দাঁড়ালে তিনি কি বলবেন ? উত্তেজনায়, উৎকণ্ঠায় নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। গলা দিয়ে পাকিয়ে উঠছে বমির বেগ। শিরা শিথিল করে সমস্ত শরীর কাঁপছে। চারপাশে বড় মায়াবী, প্রকৃতি-আঁকড়ে-ধরা-রোদ। ওমরের সাথে ঘুরতে ইচ্ছে হয় নি। আজকাল কোথাও স্থির হতে পারছি না। মুখ চেপে উবু হয়ে বিছানায় বসে থাকি। এর মধ্যে শানু এসে আমাকে আরো অতলে নিক্ষেপ করে বলে, সামনের মাসটায় শুধু আমরা এ বাড়িতে থাকব, তার পরের মাসে অন্য কোথাও চলে যাব।

ঝাপসা চোখে তার দিকে তাকাই।

তার মুখে আনন্দ, এর চাইতে বেশি ভাড়ার আরো ভালো বাসায় যাচ্ছি। তোমার কামাল ভাইয়ের ব্যবসা ভালোর দিকে। ইচ্ছে করলে তুমিও আমাদের সাথে থাকতে পার। এতে অবশ্য তোমার খরচ কিছুটা বাড়বে। ওয়াক... বমি ঢেলে দিই মেঝেতে।

আমাকে দ্রুত চেপে ধরে শানু, ক'দিন ধরে আমার সন্দেহ হচ্ছে। তোমার কী হয়েছে, সত্যি করে বলো তো নীনা ?

ভেতর থেকে কী যেন ধাক্কা দিচ্ছে। আবারো তেতো জল গলা উপচে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে। চারপাশ আঁধার হয়ে আসছে। বুকের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে, ফাঁপা, শূন্য। শানু ক্রমাগত ঝাঁকুনি দেয়, নীনা চেপে রেখো না। আমাকে পর ভেবো না, বলো কী হয়েছে ?

কিছু না। বলে নিস্তেজ পড়ে থাকি বিছানায়।

দু'দিন ধরে টিউশনিতে যাচ্ছি না। কোনোরকমে অফিসটা সারছি। টিউশনি থেকে পাঁচশো টাকা রেজাউল নিয়ে নেয়ায় এ মাসে আমার হাত রীতিমতো শূন্য। তারপরও শান্তি একটাই, অফিসের অবস্থা শান্ত। আগামী মাস থেকে আমার কিছু বেতন বাড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বস্ আমাকে তেমনই আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু এসব আনন্দ উপভোগ করার মতো মন আমার নেই। মগজের কোষে কোষে নীলমাছির হল্লা। কি শিথিল নিভন্ত দিন। এক বন্ধের দিন বিকেলে, টিউশানি করতে বেরিয়ে পড়ি। চারপাশে তখনো উজ্জ্বল রোদ। সেই আলোর পথ আমাকে এনে দাঁড় করায় একটা বিশাল গেটের সামনে। সেদিন সিনথিকে দেখেছি ঝিমুচ্ছে। আমার সন্দেহ হয়, সম্ভবত সে ড্রাগে আসক্ত হয়ে পড়ছে। এ বাসায় এলে আমার আরেক যন্ত্রণা। লাগামহীন একটা ঘোড়ার পেছনে অনর্থক ছুটে চলা।

লন অতিক্রম করব, হি-হি হাসি শুনে বাঁয়ে মুখ ঘোরাই। বিশাল লনের ওপর শাদা কুকুরটার সাথে খেলছে সিনথি।

দাঁড়িয়ে যাই। চারপাশে উঁচু পাঁচিল। কেয়ারি করা বাগানের মাঝখানে অদ্ভুত দৃশ্য। এই মেয়ে কোনো পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত হতে পারে ? উজ্জ্বল রোদ পড়েছে তার মুখের ওপর। এই যে অপাপ ফর্শা মুখের অপরূপ কিশোরী, প্রাণখোলা হাসির তোড়ে ভেসে তার শাদা ঝাঁকড়া কুকুরটার সাথে খেলায় মেতেছে, এর চেয়ে সুন্দর দৃশ্য পৃথিবীর আর কোথাও আছে ?

মুগ্ধ চোখে দাঁড়িয়ে থাকি। সিনথি বল ছুঁড়ে দিচ্ছে, আর তার ঠোঁটের ঘায়ে সেটা ফিরিয়ে দিচ্ছে কুকুরটা এবং সেই বল লুফে নেয়ার সময় ঘাসের ওপর লুটিয়ে পড়ছে সিনথি। তাঁর ঘর্মাক্ত মুখে ছড়িয়ে পড়ছে তার খাটো করে ছাঁটা চুল। ফের সে বলটি দূরে ছুঁড়ে দিল, দৌড়ে চলেছে কুকুরটা। জায়গা মতো গিয়ে মুখে বল নিয়ে ফের ছুটে আসছে। অকারণেই সিনথি হি-হি হেসে গড়িয়ে পড়ছে।

এবার সিনথি শার্টের পকেটে বল পুরে কুকুরটাকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দেয়। আমি ধীরে সবুজ ঘাসের কার্পেট মাড়িয়ে এগিয়ে যাই। কিন্তু সেদিকে মেয়েটির ভ্রূক্ষেপ নেই। সে ঝাঁপিয়ে পড়ে কুকুরটির ওপর। তারপর তাকে চেপে ধরে উচ্চগ্রামে হাসতে থাকে। সেই বিশাল খোলা প্রান্তর জুড়ে সিনথির অবিশ্রান্ত হি-হি শব্দ ধ্বনিত হতে থাকে।

কিন্তু এ কী! সিনথির মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠছে কেন ? কুকুরটাকে নিজের গা-ঘেঁসে শুইয়ে দিয়ে সিনথি তার ফর্শা আঙুল অস্থির চালিয়ে যাচ্ছে নিজের সর্বাঙ্গ জুড়ে। কী অদ্ভুত

জড়াজড়ি। সিনথির চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। তার হাসির মধ্যে বিচিত্র মাদকতা। কুকুরটাকে উল্টেপাল্টে উদ্‌ভ্রান্তের মতো চুমু খাচ্ছে, কখনো প্রচণ্ড শক্তিতে নিজের প্রায়-উন্মুক্ত বুকের ওপরে চেপে ধরছে।

মুহূর্তে পৃথিবীটা টলে ওঠে। আমি নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছি না। বিকৃত গলায় প্রায় চিৎকার করে উঠি, সিনথি! কিন্তু তার কানে আমার সেই ডাক পৌঁছায় না। ঘৃণায়, বিবমিষায় আমার মাথা ধরে যায়।

ছুটতে ছুটতে সেই রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসি।

পরদিন অফিসে গেলে উদ্ভাসিত সুলতানা এগিয়ে আসে, তোমার প্রমোশন হচ্ছে শুনলাম?

আরে না, বস্ সামান্য কিছু বেতন বাড়াবার ইঙ্গিত দিয়েছেন মাত্র, এখনো কনফার্‌ম্‌ড্ কিছু নয়।

সে-তো সবারই বাড়ছে সুলতানা বলে। আমাদের হাজারটা দাবির ফুটোফাটা এক আঙুলের চাপে বন্ধ করে দিচ্ছে।

সবারই বাড়ছে জানতাম না, এখন জেনে ভালোই লাগছে। এ নিয়ে তাহলে বাড়তি কোনো খোঁচা সহ্য করতে হবে না। মেহজাবিন আর বস্‌কে যে ভুল আমি বুঝেছিলাম এখন দেখছি সেটাও অবান্তর। সম্ভবত সে সময় তারা সত্যিই সমস্যায় পড়েছিল। যাকগে, এখন মাথায় হাজার সঙ্কট। শানু চলে যাচ্ছে। আপাতত বিশাল আবাসিক সমস্যা আমার সামনে। গতরাতে তাকে সব বলে দিয়েছি। সে ইচ্ছেমতো আমাকে গালিগালাজ করেছে, আতঙ্কিত, ভীত হয়েছে। শেষে নিজের একটি সন্তান হচ্ছে না বলে কান্নাকাটি করেছে। আমাকে ভীষণ পীড়াপীড়ি করেছে, বলেছে নষ্ট করে ফেল। আমার পাপ, ইসলামি আইনে এর ভয়াবহ শাস্তি, তীব্র সামাজিক সঙ্কট, কোনো কিছুই তুলে ধরতে বাদ রাখে নি। আমার জন্য যেটা সবচেয়ে কষ্টকর, আমার প্রতি তার যে শ্রদ্ধা, সেটা শূন্যে নেমে এসেছে। কেমন ঘৃণার চোখে সেদিন তাকাচ্ছিল এবং উল্টোপাল্টা বকবক করছিল!

বাড়ি থেকে এসেছে মা'র সংক্ষিপ্ত চিঠি। চিঠির প্রত্যেক লাইনেই তাদের প্রতি আমার উদাসীনতার আক্ষেপে ভরা। নাহ্, বেতন পেয়ে কিছু না পাঠালে চলছে না। কিন্তু সঙ্কট বেড়েছে অন্য দিকেও। সম্ভবত ঝুঁকির ভয়েই শানু তাদের সাথে নতুন বাসায় আমাদের একত্রে থাকার প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে। ফাইলপত্রের মধ্যে মাথা নুয়ে আসে। হৃৎপিণ্ড কর্ষণ করে সামনে এগিয়ে আসে বিস্তৃত সবুজ লন। ফুলের মতো সেই কিশোরী। একটি নিষ্পাপ কুকুর। কী দুর্বিষহ যাতনাকর সময় গেছে তখন। এরপর নিজের সমস্ত কীর্তি শানুকে বলে দেয়ার পর ওর অবিশ্রান্ত ভীতিকর সংলাপ এবং রাতে বিছানায় যাওয়ার পর কুশ্রী সব ছবির পর ছবি। কুশ্রীতা কোথায় ছিল? কিশোরীর মধ্যে? কিন্তু দোষী নির্ধারিত হওয়ার মতো বয়স কোথায় তার? তবে দৃশ্যটা আমার জন্য যথেষ্ট পীড়াদায়ক ছিল। টিউশানিটা আর করব না বলে সিদ্ধান্ত নিই। এও না হয় একটা সমাধান হলো। কিন্তু যতই দিন পেরোচ্ছে ততই আমার জীবন ঝুঁকিময় হয়ে উঠছে, এর কী হবে? আমি কীভাবে দাঁড়াব আমার প্রতিবেশিদের সামনে? চিন্তায় শিরা-উপশিরা সব বিষাক্ত হয়ে ওঠে। আমার কাপড়ে হাজার ফুটো, সেফটিপিন দিয়ে কত জায়গা আটকাব?

অফিস টাইম সকালে আধ ঘণ্টা আগে বাড়িয়ে দিয়েছে, শ্লেষমাখা ঠোঁটে হাসে সুলতানা। এখন জাস্ট আটটায় হাজির হতে হবে, বুঝলে, এইসব হলো গিয়ে চাল। ফুটোফাটা বাড়িয়ে অন্যদিকে পুষিয়ে নেবে। এসবের জবাবে কি বলা যায়?

গতরাতে মাকে দেয়া ইরফান চাচার সোনালি ফটোফ্রেমটা বের করেছিলাম। আমার কম্পিত হাত ওটার পুরো অস্তিত্ব ছুঁয়ে দেখছিল। সোনায় মোড়ানো বালিকার মতো নিষ্পাপ মুখ... আমি খুঁটে খুঁটে দেখেছি সেই মুখ... সেই ছবির নারী আমার প্রতিদ্বন্দ্বী, দেখে দেখে বুকে বিষ জমেছে, তা-ও তাকিয়ে থেকেছি। কিছুতেই সেই নারী আর আজকের বৃদ্ধাকে এক করতে পারি নি। রাত বেড়েছে। এবং আমার ওপর আরো গভীর ছায়া ফেলেছে সেই পুরুষ, তাঁর যৌবন কাল, তাঁর প্রৌঢ়ত্ব, দিনের পর দিন আমাকে তাঁর স্থির করে তোলা। আসলে কি স্থির হয়েছি? স্থিরতার অন্তর্নিহিত জলে অবগাহন মানে কি আরো গভীর প্রবল স্রোতে তোলপাড় হওয়া নয়?

মাথাটা ধরে আছে সকাল থেকেই। অফিস থেকে ছুটি নিয়ে দুপুর থাকতেই বেরিয়ে পড়ি। অনেকটা পথ বাসের চাপে ভাবলেশহীন দাঁড়িয়ে থাকা। তারপর রিকশার পথ। আজ ইরফান চাচার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে প্রথম দিনের মতো উত্তেজনা। কী দুর্মর সংশয় আর অস্বস্তি! আজ তর্জনীর নিচে অগ্নিকুণ্ড। আজ আমার জীবনের চরম পরীক্ষা। বলাই বাহুল্য এসব ভাবনার তোড়ে আমার ভেতরে দ্রুত কম্পন বাড়ছিল। দরজায় নক করি।

ভদ্রলোকের বাইরে কোনো কাজ নেই। বাসা ভাড়ার টাকাই তাঁর প্রধান উপার্জন, ফলে সারাদিন প্রায় বাসাতেই থাকেন। আগে নাকি তবুও সন্ধ্যার পর বাইরে যেতেন, অনেক রাত অব্দি আড্ডা দিয়ে কাটাতেন, এখন তা-ও কমেছে। আমাকে দেখে তাঁর মুখে সেই চিরকালীন উদ্ভাসন, আরে নীনা তরফদার যে! আসুন... আসুন!

জড়তা কাটিয়ে আমিও সহজ হই... সারাদিন কি করে যে কাটান! ক্লান্ত লাগে না?

বুড়ো বয়সে থির বসে কাটানোর জন্যই তো মানুষ সারাজীবন দৌড়ায়, তিনি হাসতে হাসতে বলেন। ভাবি, প্রত্যেকের নিজের বাঁচার পক্ষে ঠোঁটের ডগায় যুক্তি তৈরিই থাকে।

খুব অসময়ে এসে গেলাম?

অফিসে যাও নি আজ?

ছুটি নিয়ে চলে এসেছি, বড্ড বাজে লাগছিল।

ভালোই করেছ, তিনি বলেন, আজকে আমারও খুব খারাপ লাগছে। তারপর অনেকক্ষণ নিঃশব্দতা। একসময় সোফায় জাঁকিয়ে বসি। দুপুর পেরোচ্ছে, তবুও তাঁর গায়ে পুলওভার, গলায় মাফলার। মুখখানা বেশ অমসৃণ, কালো হয়ে উঠেছে। প্রশ্ন করি, শরীর খারাপ?

হ্যাঁ, বেশ জ্বর বোধ হচ্ছে। তাছাড়া ছেলেটার চিঠি এসেছে বাইরে থেকে, পেটে টিউমার হয়েছে, অপারেশন হবে। সেই থেকে বেশ অস্থির লাগছে।

এতক্ষণে আমার হুঁশ হয়। ভদ্রলোকের তো একটা ছেলেও আছে। যদিও পিতা হিসেবে এর আগে তিনি কোনোদিনই আমার সামনে উপস্থিত হন নি। কী নাজুক প্রসঙ্গ! কেমন থিতিয়ে আসি। তবুও তাঁকে সান্ত্বনা দিই... এটা একটা নর্মাল অপারেশন। উন্নত বিশ্বে এসব তো রীতিমতো ডালভাত, আপনি নিজেও জানেন সেটা।

কিন্তু দূর থেকে সবই বেশি লাগে নীনা, তিনি বলেন, আমি শুধু তার জন্মই দিয়েছি। কাছে থাকে নি বলে আমি নিজেও কতদিন তার অস্তিত্বকে ভুলে থেকেছি; কিন্তু যত বয়স বাড়ছে ততই এমন কিছু ব্যাপার আমাকে ভীত, চঞ্চল করে তুলেছে, যা আগে আমাকে করত না। কেন জানি মনে হয়, আমার মৃত্যু হবে একা একটা অন্ধকার ঘরে। তৃষ্ণায় গলা ফাটিয়ে ফেললেও কেউ একফোঁটা পানি এনে দেবে না। কী হয়, ঘরে বসে বসে ছেলেটার ছবি বের করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি। প্রবল একটা মায়া বুক উপচে ওঠে। এতদিন এসব কোথায় ছিল ?

উত্তরে কী বলব ? আমার ভেতরটা ভেঙে আসছে। ঝিম ধরে থাকি। তারপর আচমকা উঠে দাঁড়াই, আজ চলি। আসলে আমার নিজেরও কোথাও ভালো লাগছে না।

সে-কী! তিনি এই প্রথম তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ভঙ্গিতে আমাকে বাধা দেন, অফিস থেকে ছুটি নিয়ে এলে, এক্ষুণি উঠবে ? নীনা, এত খেয়ালি মেয়ে তুমি! নিজের অস্থিরতাকে তুমি একটু বেশিই প্রশ্রয় দাও।

প্লিজ, আমি অন্যদিন আসব, দরজার কাছে যাই। আপনি অন্যভাবে নেবেন না। আমার ভালো লাগছে না।

আমি কারো স্বতঃস্ফূর্ততার বিরুদ্ধে যাব না, তিনি বলেন, তবে তোমার আচরণে বেশ আহত হলাম,এবং একথা অকপটে বলতে আমার সঙ্কোচ হচ্ছে না। তার কথায় কী হয়, দরজা থেকে ঘুরে এসে সোফায় মুখ ঢেকে বসে থাকি। তিনি অদ্ভুত স্নেহে আমার মাথায় হাত রাখেন, তুমি সম্ভবত কিছু বলতে এসেছিলে, বলে সহজ হয়ে যাও। কেন সব সময় আশা কর, তুমি যে পরিবেশের কল্পনা কর, সেখানে ঠিক তাই পাবে ? কিছু ব্যাপার নিজের মতো করে তৈরি করে নিতে হয়।

আমি আসলে অদ্ভুত একটা সঙ্কটের মধ্যে পড়েছি, প্রায় ফিসফিস করে বলি। আসলে কথাটা কীভাবে যে বলব, বিক্ষিপ্ত, বিহ্বল চোখে তাঁর দিকে তাকাই। তিনি শ্রোতা হিসেবে প্রতিদিনের মতোই নির্জন। নিজের আসনে গিয়ে বসেছেন। সোফার পাশে বসে নরম আঙুলে ফুলদানিতে রাখা প্লাস্টিকের ফুলের ধুলো মুছি। ঘরে প্রতিদিনের ঘোর কুয়াশা। বলি, এর মধ্যে আমার একরাতে ভীষণ জ্বর, বাসায় কেউ ছিল না। আমি যে ঠিক কি ভাষায় আপনাকে বুঝিয়ে বলি, এই যে খেই হারাতে শুরু করেছি, আশ্চর্য! আপনার চোখ এত নির্লিপ্ত কেন ? বলতে বলতে ফের নিজেকে শক্ত করি, মানে সেদিন কি হলো, নিঃসঙ্গতায়, যন্ত্রণায় ছটফট করছিলাম। সন্ধ্যা পেরিয়ে যাওয়ার পর রেজাউল এসেছিল।

কেমন ভেজা ভ্যাপসা গন্ধ, জানালা ফুঁড়ে আসা এক চিলতে আলোর উজ্জ্বল চকচকি টেবিলের গায়ে, হাত রাখি সেই আলোময় উষ্ণতার মৃদু তাপে।

এবং সেদিন একটা নাজুক ঘটনার পর আমার ভেতরে আমি একটা জন্ম টের পাচ্ছি... বলে গভীর প্রত্যয় নিয়ে তাঁর দিকে তাকাই... আমি এখন কী করব ?

আমার কথা শেষ হতেই তিনি অনড় একটা কাঠের মূর্তিতে রূপান্তরিত হন। নিজের নির্দিষ্ট আসনে স্থির বসে থাকেন। চেহারায় কোনো ঢেউ নেই, আশ্বস্ত হওয়ার মতো নির্বিকারত্বও নেই। ভেতর থেকে ট্রে ভর্তি চা-নাস্তা আসে। সে সব রেখে বুয়া নিঃশব্দে ভেতরে চলে যায়। আমার বলার পালা শেষ হতেই কেমন নির্ভার মনে হয় নিজেকে। এর

পরের পুরো অধ্যায় তাঁর নিজের। আমি অন্য কিছু স্পর্শ না করে কেবল গরম কাপটা দু'হাতে ঠেসে ধরি। ঠোঁটের কাছে নিয়ে চরম অস্থিরতায় চুমুক দিতে থাকি।

দেখো নীনা, সন্তর্পণে নিজের কাপটা হাতে তুলে নিতে নিতে তিনি তাঁর কথা শুরু করেন, বিষয়টার সূত্রপাত সম্পর্কে আমি কোনো প্রশ্ন তুলব না, কেননা, আমি সেই পরিবেশ, তোমার অবস্থান... এসবের কিছুই জানি না। কিন্তু স্বীকার করছি, ঠিক এধরনের কোনো পরিস্থিতির জন্য আমি মোটেই তৈরি ছিলাম না, ফলে বেশ নার্ভাস বোধ করছি এবং অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে, আমি তো জানতাম তুমি রেজাউলকে এই একটা ব্যাপারেই সহ্য করতে পারতে না।

আমিও আপনাকে কিছু বোঝাতে পারব না... আমি কাঁপা কাঁপা গলায় বলি, তবে সেই পরিস্থিতিতে ওরকমটা ছাড়া আর কিছুই ঘটতে পারত না, বলতে বলতে কেমন ঝিমিয়ে আসি। অবশ হাতে কাপটা ট্রের ওপর রাখি।

তিনি সোফার ওপর আধশোয়া ভঙ্গিতে। আমার ভেতরাত্মায় জলের শব্দ। ঠোঁট শুকিয়ে আসছে। পুরো অস্তিত্ব জুড়ে মৃদু কম্পন। গভীর উত্তেজনায় তাঁর দিকে চেয়ে আছি। তাঁর সিদ্ধান্তের ওপরই আমার স্বর্গ-নরক স্থির হয়ে যাবে, কেন যেন আমার ভেতরে তেমনই এক বদ্ধ প্রস্তুতি।

তুমি সেই জাদুকরের গল্পটা জানো?

দোহাই, আমাকে আর কোনো গল্প শোনাবেন না, আমি বাধা দিই।

সহজ হও, বলে তিনি আচমকা নরম হয়ে ওঠেন। শোনো, আমি বিশ্বাস করি, যে-কোনো রকমের দৃঢ়তা মানুষকে অনেক জটিলতা মুক্ত হতে সাহায্য করে। দুর্বলতা থেকে যার উৎপত্তি, তাকে দুর্বলতার ভেতর দিয়ে বেড়ে উঠতে দেয়ার চেয়ে দৃঢ়তার সাথে নিজের মধ্যে সহজ সত্যটাকে স্বাভাবিক করে তোলাই উচিত। আমি কি তোমাকে কিছু বোঝাতে পারছি?

না।

আমার শরীর কিভাবে বেড়ে উঠেছে, কিংবা এই পৃথিবী কি ভাবে চলছে, সে সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের লক্ষ লক্ষ বছর চলে যাবে, তিনি বলতে থাকেন, আমাদের প্রাণের এই যে স্পন্দন, প্রাণ বিলুপ্ত হলেই চোখের সামনে একটা পৃথিবীর মৃত্যু। এ ব্যাপারেও সামান্যতম অভিজ্ঞতা লাভ করতেও কোটি জীবন পার হয়ে যাবে, কিন্তু একটা ভ্রূণ, অথবা একটা আত্মাকে তুমি মুহূর্তেই ধ্বংস করে দিতে পার কেবল সেই অস্ত্রের আঘাতে, আর সে হলো তোমার একান্ত নিজস্ব সিদ্ধান্ত। তোমার ক্রোধ নিয়ে আমি যেমন তোমার কোনো শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারব না, তেমনি তোমার ভালোবাসার টানে কাউকে আমি জড়িয়ে ধরতেও পারব না। সিদ্ধান্তটা নিতে হবে তোমাকেই।

আমার আঙুলের চাপে চিপ্‌স গুঁড়ো হয়ে যায়। প্লেট থেকে একটা করে চিপস্ তুলি, আর গুঁড়ো করি। কেমন জ্বরজ্বর বোধ হচ্ছে। তিনি সর্দির জন্য বারবার সন্তর্পণে রুমাল ব্যবহার করছেন। তারপরও তাঁর নিজেকে আমার প্রতি মনোযোগী রাখার চেষ্টা আমাকে উদ্যোমী করে তুলতে থাকে।

ইচ্ছে হয় তাঁর পায়ের কাছটায় হাঁটু মুড়ে গিয়ে বসি। দু'হাত ওপরে তুলে প্রার্থনা জানাই, আপনি নেমে আসুন। এবং এরকম একটা আকাঙ্ক্ষার পর আমার বুকে পুঞ্জীভূত গাঢ় ছায়া। হৃৎস্পন্দন বৃদ্ধি পায়। কথা বলতে পারি না।

সুধীন দত্তের উটপাখি কবিতাটি পড়েছ ? বলতে থাকেন তিনি, তার কয়েকটা লাইন এরকম— কোথায় পালাবে ? ধু ধু করে মরুভূমি,/উদাসীন বালু ঢাকবে না পদরেখা... 'আমি জানি এই ধ্বংসের দায়ভাগে/আমরা দু'জন সমান অংশীদার,/অপরে পাওনা আদায় করেছে আগে,/আমাদের পরে দেনা শোধবার ভার...।' হঠাৎ একটা ঝড় শুরু হয় মনে। প্রায় চিৎকার করে উঠি, আমাকে কেন শোনাচ্ছেন এসব ? কোন পথ দিয়ে এগোব, শেষে কোথায় গিয়ে দাঁড়াব, আমি এর কোনোই কিনার করতে পারছি না। তাছাড়া কার দেনা, কীভাবে শোধ করব, তার আমি কী জানি ?

আগে কোন পথে এগুবে, সেটা বের কর। এবং তারপর সেই পথই তোমাকে তোমার শেষ গন্তব্যে নিয়ে যাবে।

আপনি হেঁয়ালি করছেন... আমি আবারো প্রায় চিৎকার করে উঠি। আমি এখন কি অবস্থায় আছি আপনি উপলব্ধি করতে পারছেন না ? ভান করে আপনি দায়িত্ব এড়াতে চাইছেন ?

তা কি কখনো নিয়েছি আমি ? ভীষণ সহনশীল তাঁর গলার স্বর। নীনা, কেন নিজেকে ছোট কর ? তোমার দায়িত্ব নেয়া যায় ? নিজেকে অন্যের ওপর যে এলিয়ে দেয়, তার ব্যাপারেই শুধু আসে দায়িত্ব নেয়ার প্রশ্ন। তুমি নিজেই তোমার জন্য যথেষ্ট। আমি কোনোদিন তোমাকে এলিয়ে পড়তে দেখি নি। তোমাকে তেমন করে ভাবিও না।

আমিও মানুষ, আমারও ক্লান্তি আছে... বলে, নিজের মধ্যে সেঁধিয়ে যাই। অবসন্ন মাথা সোফায় বিছিয়ে দিই।

নীনা, পৃথিবীর সবচেয়ে জটিল, বিস্ময়কর গ্রন্থ হলো মানুষ। সে নিজেও জানে না তার পক্ষে কী করা সম্ভব! ঠিক এই মুহূর্তে তোমার সবচেয়ে বেশি পরিহার করতে হবে ক্লান্তিকে। আমি বলতে চাইছি, যে অবস্থার মধ্যে তুমি পড়ে আছ, আমাদের সামাজিক অবস্থা তুমি জানো, আমাদের ধর্মীয় সংস্কার, আমাদের প্রতিবেশ, সবাই তোমাকে নগ্নভাবে বিদ্ধ করবে। তুমি কি তাদের সেই ছুরির মুখে নিজেকে এলিয়ে দেবে ?

আমি তবে কী করব ?

যুদ্ধ করবে, এবার তাঁর উচ্চারণ স্পষ্ট এবং দৃঢ়, যার জন্ম হয়েছে, তাকে নষ্ট করে ফেলা খুব সহজ। লালন করাটাই বড় ব্যাপার। তোমার ভেতরে সন্তানটি বড় হবে। তুমি তাকে জন্ম দেবে। এবং তাকে কেন্দ্র করে যত রকমের সামাজিক যুদ্ধ আসবে, তার সবগুলোকে দৃঢ়তার সাথে প্রতিরোধ করতে হবে এবং তোমাকেই, আমি তোমাকে ঠিক সেই জায়গাটাতেই দেখতে চাই।

সে অনেক কঠিন... বলতে বলতে গভীর অন্ধকারে ডুবে যেতে থাকি।

আমি যে নীনাকে চিনি, তিনি স্বরে প্রত্যয় ঢেলে বলেন, সে এই কঠিন পথটাই অতিক্রম করবে। সভ্য বিশ্বে যেটা কোনো সমস্যাই নয়, বরং আনন্দের সাথে গ্রহণ করছে, কেন

এখানে সেটা ঘৃণার যোগ্য হবে ? তাকে আমরা প্রশ্রয়ই-বা দেব কেন ? আমি চাই যুদ্ধটা তোমাকে দিয়েই প্রথম শুরু হোক।

আমার চোখের সামনে অস্বচ্ছ ছায়া। যেভাবে ক্রমাগত ভাঙন চলছে ভেতরে, নিজেকে সবার সামনে ধোপদুরস্ত রাখাই একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

তুমি ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়েছ আবারো ? যেন জটিল একটা বিষয়কে সহজ করার জন্যই ঘরের হাওয়াকে ঘোরাতে চাইছেন তিনি। আমি নতমুখে বলি, না।

নীনা, আমি একটি বুড়ো বৃক্ষ। শেকড়ে উই ধরেছে, গম্ভীর বিষণ্ন তাঁর স্বর, পাখির ডানা ঝাপটানোর শব্দেই যার ডাল ভেঙে যায়।

চারপাশে তখন ছায়া নেমে এসেছে। কেমন বিহ্বল চোখে তাকাই দেয়ালের ফ্যাকাসে শাদা আস্তরের দিকে। দেয়ালের বাজপাখিটি স্থির, আমার মুখোমুখি।

আমি সোফা থেকে উঠে তাঁর কাছে যাই। কী প্রাজ্ঞ, মায়াময় মুখ! আমি তাঁর হাত চেপে ধরি। মেঝেতে বসে তাঁর হাত মুখের কাছে টেনে নেই। ভেতরে ফুলে উঠছে কান্না। চোখ দু'টো জ্বলছে। তিনি আমার চুলে নিঃশব্দে হাত বোলান। নীনা, অসম্ভব নিরাশ অথচ ধীর কণ্ঠে উচ্চারণ করেন তিনি, একটা জীবন পার করে দিলাম যা খুঁজতে খুঁজতে, আমি তার সন্ধান পেয়েছি। একটা বয়স ছিল, যখন তাকে পেলে তার মালিকানার আশায় তাকে ঘরবন্দি করতাম হয়তো। এখন দূর থেকে দেখেই শান্তি। পেয়েছি, এটা ভেবেই শান্তি।

আমি যদি সমুদ্রের ঢেউ হয়ে যাই ? অন্ধকার গহ্বর থেকে উঠে এসে প্রশ্ন করি। আচমকা, কোনো পূর্বপরিকল্পনা ছাড়াই। বড় মোলায়েম তাঁর হাসি, 'তাই হয়ো' বলার জন্যও সন্ন্যাসীর বয়সটা দরকার। বয়সের একটা দুর্বিনীত সাহস থাকে, উপেক্ষা কিংবা গ্রহণ করার। নীনা, এলিয়ে পড়ো না। নিজেকে চেনার, আবিষ্কার করার এটাই সব থেকে যথার্থ সময়। একদম একা হয়ে যাও। পৃথিবীকে সঙ্গে রাখ, তবে কখনোই মাথার ওপরে নয়।

কিন্তু পৃথিবীকে সঙ্গে রেখে এককভাবে বাঁচা সম্ভব ? নিষ্ঠুর একাকিত্ব আমাকে প্রতিদিন অসহ্য মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে না ? ইরফান চাচার কোমল হাত তখনো আমার মাথায়। তার ম্রিয়মাণ কণ্ঠ সমস্ত ঘরে স্পন্দন তোলে। তুমি কি কোনোদিনই একাধিক হতে পেরেছ ? একজন পূজারী, তার নিপুণ হাত গড়ে তুলল মূর্তি, প্রতিমা। সকাল দুপুর ও রাতের অবিশ্রান্ত কষ্টের ভেতর দিয়ে যেদিন তার মূর্তি মোহনীয় ভঙ্গিমায় দাঁড়াল, তার চারপাশ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তখন সেই আলোয় উদ্ভাসিত পূজারী চিৎকার করে উঠল, এই তো আমার নির্মাণ। এই সেই সুন্দর, যার ভেতর দিয়ে আমি আমার জীবন পার করে দেব। কিন্তু সেই মূর্তির মুখোমুখি তখন কোন মানুষ ? ভঙ্গুর ক্ষয়িষ্ণু এক পূজারী। যে তার সব ঢেলে নিঃস্ব হয়ে গেছে। পূজারী তার চোখ দিয়ে দেখবে সুন্দরকে। সে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে যাবে। কিন্তু সেই নিঃশেষিত ক্ষয়িষ্ণু বৃদ্ধকে সেই মোহনীয় মূর্তি তার স্পর্শ দেবে কেন ? পূজারী শুধু স্পর্শ করবে তার তৈরি মাটিকে, পাথরকে। রঙ দিয়ে ঠেসে রাখা নারকেলের ছোবড়াকে।

ইন্দ্রিয় শিথিল হয়ে আসে। আমি দাঁড়াই।

তিনি কথা বলায় তখনো অক্লান্ত, তোমার বয়সটা ফিরে পেলে, তোমার মতো সুযোগ পেলে নিশ্চিতভাবে আমি যুদ্ধটা করতাম। সংসার নিরানব্বইটা লোকে করে। এবং নিরানব্বইটা লোক সামাজিক শিশুর জন্ম দেয়। এর মধ্যে কোনো অভিনবত্ব নেই।

দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াই। তিনি ধীর অথচ ঋজু পদক্ষেপে এগিয়ে আসেন। অন্ধকার দরজায় অনড় ভঙ্গিতে এসে দাঁড়ান। তারপর প্রতিদিনের মতো আমার সন্ধ্যার পৃথিবীতে নেমে আসা। সোডিয়াম বাতির তামাটে আলোয়, ঘনঘোর স্তূপীকৃত কুয়াশায় আমার প্রতিদিনকার হেঁটে চলা।

ঘরে এসে কান্নায় ভেঙে পড়ি। দীর্ঘদিন পর অনেক রাত অব্দি টানা কান্নার স্রোতের মধ্যে কাটিয়ে একসময় থিতু হয়ে যেতে থাকি। মনে হয়, পৃথিবীটা শূন্য হয়ে গেছে। কিন্তু কিছুতেই সেই শূন্যতার স্থির উৎস খুঁজে পাই না। শুধু টের পাই, বিশাল পৃথিবীতে আমি একদম একলা হয়ে গেছি। বিশাল ছাতার মতো আমাকে ছায়া দেয়া গাছটা সমূলে সরে গেছে। এখন সমস্ত চরাচর জুড়ে ধু-ধু নিঃসঙ্গতা। দরজায় শব্দ হয়। সম্ভবত আমার জেগে থাকার শব্দ পেয়ে কিংবা বাতি জ্বলছে দেখে শানু বেরিয়ে এসেছে। আমি বিছনায় উঠে বসি। সে কাছে এসে নিঃশব্দে বসে, জানতে চায় আমি কি সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

আমি, কিছু না, বলে দেয়ালের দিকে মুখ করে বসে থাকি।

সে বলে, তুমি কুকাম ঘটাতে যেমন ওস্তাদ, জেদটাও তোমার ষোলোআনা। ভাবলেও গা শিউরে ওঠে। এখনো সময় আছে, তাড়াতাড়ি ওটাকে ঝেড়ে ফেলো।

বিরক্তিতে ওর কপালের ভাঁজ স্ফীত হয়ে উঠছে। আমি তখনো নিশ্চুপ। সে বলে, তোমার কামাল ভাই একজন পীরকে চেনে। তুমি কাল আমাদের সাথে চলো। তার কাছে গিয়ে মাথা কুটে আল্লাহ্‌র কাছে মাফ চাও।

তা হলেই আমার পেট থেকে বাচ্চাটা শূন্যে উড়ে যাবে, না? শ্লেষ মেশানো স্বরে বলি।

কথার ছিরি দ্যাখো। শানু খেপে ওঠে, প্রায়শ্চিত্ত বলে তো একটা জিনিস আছে। আমি স্বপ্নেও তোমাকে অতটা চরিত্রহীন ভাবি নি। তোমার কামাল ভাই তো রীতিমতো ভয় পাচ্ছে। শেষে সে না ফেঁসে যায়। তুমি বড় রিস্কি মেয়ে।

তুমি পীরের কাছে তার জন্যই দোয়া চাওগে, আমি বলি, তার জন্য একজন মহিলার মৃত্যু হয়েছে।

আমার কথা আর মাটিতে পড়ার সুযোগ পায় না। শুরু হয়ে যায় শানুর সাঁড়াশি আক্রমণ। যাবতীয় অশ্লীল গালিসহ আমার ওপর সে প্রায় আছড়ে পড়ে। এবং এক সময় লুঙ্গি গোটাতে গোটাতে কামাল ভাইও বেরিয়ে আসে। শানুকে টানতে টানতে সে আমাকে স্পষ্ট জানায়, আগামী মাসেই আপনি পথ দেখবেন, এই আমার শেষ কথা।

তারপর দরজা বন্ধ হয়ে যায়। শানুর অবিশ্রান্ত অস্পষ্ট গজগজ কানে আসছে। বালিশ আঁকড়ে মড়ার মতো পড়ে থাকি। ভীষণ চক্কর খাচ্ছে মাথা। আবার চারপাশে ধোঁয়া, যুদ্ধটা তবে এখান থেকেই শুরু হলো? আমার সামনে পর্যায়ক্রমে হাজার হাজার রুদ্রমূর্তি এসে দাঁড়ায়। মার ফ্যাকাসে ভীত মুখ, আরেফিনের বিস্মিত চোখ, মন্টু, রানু... তারপর দ্রুত বদলাতে থাকা চারপাশের পৃথিবী। ভয়ে, উৎকণ্ঠায় কাঁপতে কাঁপতে বাবার চোখের সামনে পড়ি। মৃত্যুর আগে খোলা দরজায় কী যেন দেখাচ্ছিলেন। কী হিম ধরানো ভীত সেই চোখ, সেই এক মুহূর্তের চাউনি আমাকে চিনিয়েছিল, মৃত্যু কী জিনিস! নাহ্! বাঁচতে হবে। রাত

জাগতে জাগতে কবে আমি পাগল হয়ে যাব! বাতি নিবিয়ে বিছানা আঁকড়ে ধরি। প্রাণপণে চোখ বুজি। সীমাহীন অন্ধকারের পথ ধরে সাজানো একটা প্রতিমা জেগে ওঠে এবং একজন ক্ষয়িষ্ণু নিঃস্ব বৃদ্ধ পূজারী এগিয়ে আসে। ভেতর থেকে ঠেলে বমি আসছে। মাথার দু'পাশের রগে অসহ্য ব্যথা। ধড়ফড় করে উঠে বসি। নিজেকে এত নিঃস্ব মনে হচ্ছে! কেমন মৃত্তিকাহীন, আকাশহীন। আমি কোথায় দাঁড়াব? আসলে কি সত্যিই আমি চেয়েছি কোনো বৃক্ষের. ছায়ায় দাঁড়াতে? আমার সাথে প্রতারণা করেছে কেউ? আমি কি নিজেই জানি কি বাণী শোনার আশায় সেই দরজায় ছুটে গিয়েছিলাম?

পৃথিবীর সব ঠিক আছে, সবাই ঠিক আছে। শুরু থেকে এ পর্যন্ত কেবল আমার সার্বিকতা কেন এতটা বিসদৃশ্যময়? পেটের বাঁ-পাশ আবারো মোচড় দিয়ে ওঠে। বিছানায় গড়াগড়ি খাই। এক সময় থিতু হয়ে আসি এবং হাড়-মাংস আলগা হতেই যেন মার কান্না শুনতে পাই। বাবা যখন প্যারালাইজড়, তখন কাটা কনডমের মুখ পাইপের মাথা এবং প্রস্রাবের রাস্তার সাথে চিলিমচি পর্যন্ত বেঁধে দেয়া থাকত। যাতে শুয়েই বাবা জলত্যাগ করতে পারেন। বাবা তখন অবোধ শিশুরও অধম। তাকে নগ্ন করে সবার সামনেই বলতে গেলে তার ধোয়া-মোছার কাজ করতেন মা।

কিন্তু কি এক গোয়ার্তুমিতে বাবা তাঁর সুস্থ পা-টা দিয়ে সবকিছু উল্টেপাল্টে দিতেন। ফলে সমস্ত ঘর বিচ্ছিরি গন্ধে সয়লাব হয়ে যেত। ভালোমন্দ খেতে না পারার কষ্ট, ছোটদেরকে দিয়ে বাইরে থেকে যা-তা কিনিয়ে এনে খাওয়ার পরিণতিতে অবশ্যম্ভাবী ডায়রিয়া এবং এসব কিছুর মুখে মার মিহি ক্রন্দন প্রতিদিনই আমাদের অস্তিত্ব তোলপাড় করত। কিন্তু বিস্ময়ের সাথে বাবার ক্রমাগত গজগজ এবং ক্রুদ্ধতার আরেক রূপ একদিন আবিষ্কার করি, তিনি ওই অবস্থাতেও মাকে কামনা করতেন এবং তার শারীরিক উন্মাদনা এতই প্রবল ছিল, তিনি মার চূড়ান্ত ক্ষোভ এবং অনীহার প্রতিবাদেই যেন পাইপ, কনডম সব ছুঁড়ে ফেলে লুঙ্গির তলায় হাত চালিয়ে প্রায় প্রকাশ্যেই হস্তমৈথুন করতেন। এবং সেসব মুহূর্তে যেমন প্রগাঢ় কান্নায় মা সমস্ত পরিবেশ নিথর করে তুলতেন... আজ রাতে হুবহু সেই কান্নার শব্দ শুনি। আজকের এই বিসঙ্গত রাত, চামড়ার তলায় বাচ্চা, ফুস্‌মন্তরে সব উড়িয়ে দেয়া যায় না? তার চেয়ে ওই যে মহিম ওর সাথে কথা বলি? যে তার বন্ধুর বিশাল রাজপ্রাসাদে আমাকে প্রথম চুম্বনে আপ্লুত করে বলেছিল, তুমি প্রকৃতি। এই যে তোমার চুল, এইসব ঘাস। এই যে চামড়া, মাংস, কপালের টিপ... এইসব মাটি রোদ... আমি চুম্বন করতে চাইছি... এ তোমার ঠোঁটে নয়, মন্দিরের পবিত্র সিঁড়িতে...।

ভাবতে ভাবতে হাঁসফাঁস করি। তার অদম্য চুল, কাঁধ এইসব স্পর্শ বিস্তারের প্রাবল্যে সোফার ওপর আমার কানের দুল খসে পড়েছিল। তারপর ক্রমাগত হাতড়াও, সোফায়, সমস্ত ঘরে, কোথায় দুল? সেই কি ছিল তবে পতনের সূত্রপাত?

ঘুমিয়ে পড়ি এবং স্বপ্নে দেখি জন্মের পর পরই আমি শিশুটিকে গলা টিপে হত্যা করেছি। মাঝরাতে ঘুম ভাঙলে আতঙ্কে পেটের ওপর হাত রাখি। মেথরপট্টির সহস্র শুয়োর চন্দনার কান্নার দেয়াল উপচে রেললাইনের দিকে ছুটে যায়। শিশু হত্যার ভয়াবহতা আমাকে স্তব্ধ করে রাখে। 'স্বপ্নে তুমি তোমার বন্ধু অতীশকে খুন করেছিলে বলে জাগ্রত অবস্থায়ও বহুদিন কেন বিমর্ষ ছিলে? আমার প্রশ্ন এই যে, স্বপ্নেও তুমি কেন হত্যাকারী' -এই কথাগুলো কোথায় পড়েছি?

ছেঁড়া মশারি ফুঁড়ে মশা ঢুকেছে। কারখানার ভোঁ ভোঁ সাইরেন যেন। বস্তি থেকে ভেসে আসা কান্না ক্রমশ ম্রিয়মাণ। মহিম আমাকে রমণী করেছিল কিন্তু সেই সৃজনের গভীরতায় এত ফাঁক কি করে ছিল যে, দ্রুত সেই জায়গায় স্থাপিত হয়েছিল রানুর অস্তিত্ব? সে আমাকে ভালোবাসে নি, তার গভীরতায় আমার স্থান ছিল না বলেই কি আমার ভেতর থেকে তার ছায়া মৃত অশরীরী হয়ে গেছে? এ কথা আমি আগেও ভেবেছি, আদৌ কি সেই ছায়া সরে গেছে, মরে গেছে? একজন কিশোরী, যে সবেমাত্র ভালোবাসার পাঠ গ্রহণ করেছে, তীব্র কষ্টে সে অবিশ্রান্ত কান্নায় রাতের পুরো জ্যোৎস্না ভিজিয়ে দিত। যত রূঢ় বাস্তবতাই পরবর্তী জীবনে তাকে অধিকার করুক না কেন, সে-সব স্মৃতিমেদুর ছবি কি সহজে মুছে যাওয়ার? ইরফান চাচা কি তবে মহিমেরই পরিণত রূপ? মানুষ কি সারাজীবনই এরকম দুঃখবাদী যে এর ছায়া ওর মধ্যে হাতড়ে বেড়ায়? আমি তো আমার সমস্ত অস্তিত্ব বিছিয়ে রেখেছিলাম মহিমের জন্য। সে তো ইচ্ছেমতো আমাকে ফেলে আছড়ে খেলতে পারত কিন্তু আমার হাতটিও সে এত যত্নে নিজের হাতে তুলে নিত, যেন একটি শিশুর হাত, অসাবধান হলেই মচকে যাওয়ার সম্ভাবনা। আমি তার প্রেমের মধ্যে ছিলাম না। তবে কি স্নেহের মধ্যে? আমাকে ছাপিয়ে রানুই কি তবে প্রেমময়? হা আল্লাহ্, কেন এখন সেই মানুষটা এমন কড়া নাড়ছে? কেন তার আঁকা যাবতীয় ছবি আমার চারপাশে উড়ছে, ঝাপসা হচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে?

রিকশায় করে একদিন টানা পথ তার সাথে গিয়েছিলাম। কী ভীষণ নিমজ্জিত ছিল সে নিজের মধ্যে। পেছনে হাসপাতাল, এগিয়ে যাচ্ছি। জানতে চাইলাম কী হয়েছে? সে এমনভাবে তাকিয়েছিল, সেই চোখে সব ছাপিয়ে আশ্চর্য এক স্নেহ এবং আমি যেন ক্ষুদে এক বালিকা, কিভাবে কী বললে কতটুকু কম কষ্ট পাব, তার ভেতর যেন তারই দ্বন্দ্ব। একসময় সে নিজের অক্ষমতার কথা জানায়, জানায়, এই অক্ষমতার উৎস কোথায়, সে নিজেই তা জানে না। আমার দেহ শূন্যে উঠিয়ে ধপাস করে ফেলে দেয় কেউ। সেই প্রথম আবিষ্কার করি তার অস্তিত্বের কোথাও এই বালিকার ছায়া নেই। সেই কম্পিত চুম্বন, অবারিত রিকশার পথ ধরে চলা, ছবি আঁকাআঁকি নিয়ে ছেলেমানুষী উচ্ছ্বাস... পুরোটাই আমার একার স্বপ্ন। সব ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে, পরিণত হয়ে উঠেছে রানু। তারপর পেরিয়ে যায় অনেক সময়। 'নহন্যতে' বইয়ে চোখ ডুবিয়ে ক্রমাগত কেঁদে চলা। আমার অস্তিত্ব থেকে একজন মির্চাকে হারিয়ে কেবলই অস্ফুট উচ্চারণ... মির্চা-মির্চা...। ওইরকম একটা গ্লানিময়, স্বপ্নময় কষ্ট থেকে কিভাবে রেজাউল আমাকে ছিঁড়ে তুলেছিল? তুমি কি মির্চা হতে চাও? মহিমকে প্রশ্ন করি।

মহিম শূন্যের মধ্যে পাক খায়, চাই, চাই।

তবে আমার সন্তানকে কোলে তুলে নাও। তুমি এর প্রেমিক বাবা হও। আমার পেট ফুঁড়ে শিশুটিকে টেনে বের করি। ইস্, কী ভয়াবহ রক্ত। হকচকিয়ে চারপাশে তাকাই। জানালা গলিয়ে পালিয়েছে মহিম। হি-হি হাসতে হাসতে গভীর গহ্বরের মধ্যে হাবুডুবু খাই। অসহায় অবিশ্রান্ত হাত-পা ছুড়ি। চারপাশঘেরা মশারিকে মনে হচ্ছে মাটির দেয়াল। ওপরেও মাটি। আমি শায়িত সেই কবরের মধ্যে। হকচকিয়ে ওপর দিকে মশারি উঠিয়ে দিই। কোত্থেকে নোনা ইলিশের গন্ধ আসছে। মাগো! উঠে বসি। নাকের কাছে বালিশ চেপে বসে থাকি। শীত বাড়ছে। দাঁতেদাঁতে ঠোকর লাগে। দেয়ালে বসে জ্বলজ্বল চেয়ে

থাকা বাজপাখিটা আচমকা এগিয়ে আসে। আমি মেঝেতে দাঁড়াই। বুকটা এমন জ্বলে যাচ্ছে কেন? তেতো জলে জিভ ভিজে ওঠে। মাথা টলছে। অনেকক্ষণ অন্ধকারে থাকায় ছায়ার আবরণটা হাল্কা হয়ে এসেছে। চেয়ার টেনে বসি। টেবিলে মাথা রাখি। মা, মাগো... বুক বিদীর্ণ করে দীর্ঘদিন পর অস্ফুটে উচ্চারণ করি। সেই ক্ষীণাঙ্গী বৃদ্ধার একটু স্নেহার্দ্র হাত যদি আমার মাথায় থাকত। কেমন কাঙালের মতো সেই হাতের দিকে চেয়ে থাকি। ভেতরে সহস্র তোলপাড়... আমি কী চাইতে গিয়েছিলাম ইরফান চাচার কাছে? আমার জীবনে তাঁর প্রভাবের সত্যিকার রূপ কী? কিছুতেই এর তল খুঁজে পাই না।

কোত্থেকে আসে এসব আজব বিচ্ছিরি ঘ্রাণ? গা ঘুলিয়ে নাক কুঞ্চিত হয়ে আসে। উঠে দাঁড়াই। সন্তর্পণে বাইরের দরজা খুলি। শীতার্ত হাওয়া, নিঃশ্বাস টানি। বারান্দায় এসে দাঁড়াই। পাতলা অন্ধকার ভেদ করে চোখে পড়ে বারান্দার এক পাশে বেড়ে ওঠা ফলসা পাতা শিশিরে ভিজে উঠেছে। গায়ে ভালো করে চাদর জড়াই। সামনে অন্ধকার নির্জন বস্তি, বস্তির ঘুপচি ঘরগুলো, লণ্ঠনের মৃদু আলো, আবর্জনার স্তূপ, এবং কালুর মার মৃতদেহ। শিরশির করে ওঠে শরীর। আমি কেন একবারও মহিলার লাশটা দেখতে যাই নি? কেন সব জটিলতা থেকে আমি পালাতে চেয়ে তার মধ্যে আরো বেশি করে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যাই?

অথচ একসময় বস্তির কাদার পথ ভেঙে, ইটের ওপর থরোথরো পা ফেলে তেলচিটচিটে মেঝেতে বেছানো বিছানায় গিয়ে বসি নি? কি অস্বাস্থ্যকর ছিল সেই পরিবেশ! পলিথিন দিয়ে বেড়ার সিলিং আটকে রাখা হতদরিদ্র একটা ঘুপচি ঘর। সেখানে গেলেই শীর্ণ দেহের ম্লান সেই মহিলা কুণ্ঠিত হয়ে উঠত, তার চরম দারিদ্র্য, জবুথবু শতচ্ছিন্ন শাড়ি, মলমূত্র তার কাছে যেন প্রকট হয়ে উঠত। পিঁড়ি টেনে বসে ছেলেকে টেনে নিলে এমন চোখে তাকাত, আমি যেন ত্রাণকর্তা অথবা মহামানব কেউ।

সেই মহামানব তার মৃতদেহকে ভয় পেয়েছিল?

কেন সিলিং ফ্যানে দড়িতে ঝুলে ছোট চাচা সুইসাইড করেছিল? কি বিচিত্র কায়দায় লাশটি ঝুলছে! ধুৎ!

সকালে অনেক দেরিতে ঘুম ভাঙে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠি। লেপ ছুঁড়ে ফেলে লাফিয়ে বিছানা থেকে নামি। মাথাটা জমে আছে। শীতের দিনে সকালে অফিস করাটা কী যে কষ্টকর। টানা সারাদিন ঘুমাতে পারতাম? এত অবসন্ন বোধ হচ্ছে! এক হাতে দাঁত ব্রাশ করি, অন্য হাত মুখে জলের ঝাপটা দিই। রাতের ঠাণ্ডা ভাত আছে। একটা ডিম ভেজে নেব। নিজেকে তৈরি করে রান্নাঘরে গিয়ে দেখি, দু'টো চুলোই আটকে রেখেছে শানু। অথচ আমি ওঠার আগেই তার রান্না শেষ, চিরদিনই তাই হয়ে এসেছে। বাটিতে ডিম ফাটিয়ে আমি বলি, ডেকচিটা নামাও।

ডেকচিতে ভাত ফুটছে।

ও চুলোতে কী?

ভাজি।

দ্যাখো, তুমি গায়ে পড়ে লাগতে এসো না। একটা চুলো আমার পাওনা। আমার সময় নেই। একটু ফ্রি করে দাও।

চুলো তুমি একটা কিনে নিও, সে বলে। এটা আমার কেনা।

তাহলে কিন্তু আমিও একটা ডাবল কিনে নিয়ে আসব, আমি বলি, তোমারটা সরাতে হবে।

তাই কিনো, বলে সে নির্বিকার সবজি নাড়তে থাকে। আমি তাকে ধাক্কা দিয়ে ভাতের ডেকচি সরিয়ে কড়াই চাপাই। তেল ঢালার ঠিক আগে ভাগে সে জোরে আমাকে ধাক্কা দিয়ে কড়াইটা উল্টে দেয়। আর যায় কোথা! আমার মাথায় দাবাগ্নি। তাকে ধাক্কা দিয়ে সোজা মাটিতে ফেলে দিই। তার বাজখাঁই চিৎকার শুনে কামাল ভাই বেরোনোর আগেই আমি হনহন হেঁটে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি।

অনেকটা পথ হিতাহিত জ্ঞানশূন্যতায় কাটে। এক সময় আমার সংবিৎ ফিরে আসে। শানু এখন নিশ্চিতই সমস্ত পাড়া মাথায় করে আমার কুকীর্তি জাহির করবে। কথাটা ভেবে আমার পা-জোড়া শ্লথ হয়ে আসে। ভাবি, জাহান্নামে যাক অফিস। ফিরে গিয়ে যাহোক একটা আপোস করি। ঝিম ধরে দাঁড়িয়ে থাকি কতক্ষণ। পরক্ষণেই মাথায় বিদ্যুৎ খেলে যায়। কানুর মার মৃত্যুর পর সে আমার সামনে রীতিমতো ছুঁয়ে দেয়া কেন্নো হয়ে আছে। ফলে সে আমার ব্যক্তিগত কিছু নিয়ে আমাকে ঘাঁটাতে সাহস করবে না। অত বোকা সে নয়। নিজের ভেতরে দুর্বলতা থাকলে গলা আর কতটা উঁচুতে চড়াবে ?

বাসে উঠি। পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলছে। তবুও কোথায় একটা খচখচ অস্বস্তি, শানু যদি মেঝেয় পড়ে গিয়ে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে থাকে, তাহলে তো আমার এখন থেকেই পালিয়ে বেড়ানোর পালার শুরু।

অফিসে বনরুটি, মিষ্টি গিলে অস্থিরতার মধ্যে মুখ থুবড়ে থাকি। কোনো কাজেই শান্তভাবে মন বসাতে পারি না। ধোঁয়ায় আপ্লুত চায়ে ঠোঁট ডুবিয়ে দিয়েছি, হাসতে হাসতে বড়ুয়া বাবু আসেন, আচ্ছা, আপনার এখানে প্রায়ই একটা হনুমানের মতো লোক আসে দেখি, মালটা আসলে কে ?

ওমরের কথা বলছেন বুঝতে পারি। অস্বস্তি নিয়ে একটা মিথ্যে কথা ঝেড়ে দিই, একসময় আমরা এক পাড়ায় থাকতাম। পারিবারিকভাবে আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠ। চিড়িয়া বটে একখানা, বড়ুয়া বাবু চেয়ার টেনে বসেন, মনে হয় রোজ কয়লার খনি থেকে উঠে বসেন।

লোকটা ওই রকমই... বলে চুপ হয়ে থাকি।

কী ব্যাপার ? বস্ আর আপনাকে বিশেষ পাত্তা দিচ্ছেন না দেখছি, বড়ুয়া বাবু অন্য পথে হাঁটেন। আগে তো হরহামেশাই কাজের জন্য ডাকতেন।

কাজ নেই, তাই হয়তো ডাকেন না।

যাকে নিয়ে এই মাত্র কথা হচ্ছিল, সেই হনুমানটা হঠাৎ এসে হাজির হয়। আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত জ্বলে ওঠে। বড়ুয়া বাবু হে হে করতে করতে উঠে যান। ওমর চেয়ার টেনে বসে, একটা খবর দিতে এলাম।

জাহান্নামে যাক আপনার খবর, আমি খেপে উঠি, আপনি বেরিয়ে যান।

সে-কী! আমি আবার কী করলাম ?

এটা একটা ভদ্রলোকের অফিস, এইরকম নোংরা পোশাক নিয়ে বস্তিতে চলাফেরা করা যায়, কোনো ভদ্রপাড়ায় নয়। সে চুপ হয়ে যায়। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলে, সেটা তো ধীরে সুস্থে বুঝিয়ে বলা যায়।

তার জবাব শুনে আমি আরো তিন গুণ তেতে উঠি। আপনি কি শিশু? আমি আপনার গার্জিয়ান? ঠাণ্ডা মাথায় বুঝিয়ে বলব? বেরিয়ে যান বলছি। কোনোদিন আমার অফিসে আর আসবেন না। সারাদিন ধরে মাথায় অসহ্য দহন। চোখে আগুন নিয়ে চেয়ে থাকি ওমরের দিকে। দু'একজন সহকর্মী ঘাড় ঘুরিয়ে আমার উত্তেজিত অবস্থা দেখতে থাকে। ওমর নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ায়। এবং অত্যন্ত গোবেচারার ভঙ্গিতে অফিস থেকে বেরিয়ে যায়।

স্থির হয়ে বসার পর আমার অনুতাপ শুরু হয়। কাজটা ভয়ানক বাজে হয়ে গেল। উপলব্ধি করার পর শুরু হয় নতুন যন্ত্রণা। নিজের এইসব অস্থিরতার জন্য নিজের ওপরই ভয়ানক ক্রোধ জন্মায়। এসব করে কি আমি নিজেকে পৃথিবীতে আরো বেশি একাকীত্বে, আরো বেশি শূন্যে নামিয়ে ফেলছি না?

অফিস শেষে নিজেকে টেনে, সিঁড়ি হেঁচড়ে নিচে নেমে আসি। কেন নির্লিপ্ত আর স্থির হতে পারছি না? এভাবে আমি উঁচু পাঁচিল টপকাব? অফিসের সিঁড়িতে দাঁড়াতেই সামনে বিশাল জনারণ্য। এবং তার মধ্যেই সিঁড়ির একপাশে জবুথুবু ওমর দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পাই। কী ভয়ানক স্বস্তি! উদ্ভাসিত মুখে তার দিকে তাকাই। তাতেই যেন সে বর্তে যায়। দ্রুত সামনে এগিয়ে আসে, ইস, যা ভয় পেয়েছিলাম! তবুও যাই নি, মানুষের রাগ আর কতক্ষণ থাকে। তখন সন্ধ্যা নেমে আসছে।

রিকশায় উঠি। হু হু ঠাণ্ডা বাতাস প্রতিরোধ করে রিকশা এগোয়। আমি প্রশ্ন করি, কী খবর নিয়ে এসেছিলেন?

ওমর লাফিয়ে ওঠে, খবর হলো দু'টো। আমার ছোট বোনটা একটা সেলাইয়ের দোকানে কাজ পেয়েছে এবং আমি একটা গার্মেন্টসে, কথা পাকাপাকি প্রায়। আগামী মাসে জয়েন করব। সুপারভাইজারের পোস্ট। দু'ভাই-বোনের চাকরির মধ্যে অদ্ভুত মিল। শালার সেলাই দিয়ে পৃথিবীর সব কুকীর্তির দরজা বন্ধ করে দেব।

আমি উৎসাহ প্রকাশ করি, বাহ! সত্যি ভালো খবর। এটা কি সেই গার্মেন্টস, ওই যে আপনার ধনী বন্ধুর, যে আপনাকে কাজ দিয়েছিল?

হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রায় চিৎকার করে ওঠে ওমর। ব্যবসায় গচ্চা খেয়ে আমি তো তার পায়ে গিয়ে পড়লাম, একটা কিছু কর, নইলে মৃত্যু ছাড়া আমার পথ নেই।

কেমন থিতিয়ে আসে। এই লোক আসলে পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে চলার কোনো কায়দাকানুন জানে না। নইলে পা যদি ধরেই থাকে, আমার কাছে এসব চেপে গেলে কী হয়? রিকশা একটা গলির পথ ধরে চলছে। ওমর বলে, আমি সামনেই নেমে যাব। আপনার যেতে কোনো অসুবিধা হবে না তো? আমি তার কথা এড়িয়ে নিজের মধ্যে ডুবন্ত... এবং হঠাৎই বলি, আপনি আমার জন্য একটা বাসা দেখুন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, শস্তায় এক রুমের একটা বাসা।

যেখানে আছেন?— ওমর ইতস্তত করে।

আমি যেখানে আছি, সেখানকার পরিবেশটা দুঃসহ হয়ে উঠেছে, গলায় আন্তরিকতা ফুটিয়ে বলি, আমার কোনো কিছুই তারা আর সহজভাবে নিতে পারছে না।

ওমরের মুখে ছায়া। থমকে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবতে থাকে, আমি লক্ষ করি। তার এই স্থির ভঙ্গিটাই ভয়ানক সুন্দর। থমকে থাকা অবস্থা থেকে সে যেন বাস্তবে ফিরে আসে এবং প্রশ্ন করে, একা থাকবেন?

আমি হেসে ফেলি, আগে তো একা উঠি।

সিনথিদের বিশাল বাড়ির সামনে একসময় নিজেকে আবিষ্কার করি। নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই কখন পাল্টেছি, আমি কি তা জানি? পরে ভেতরে ভেতরে ঘটে যাওয়া সব ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে কিলবিলে তোলপাড়ের শুরু হয়েছিল। অবশ্য এসব কিছুর সঙ্গে আমার টিউশানি ছেড়ে দেয়ার কোনো যোগসূত্র খুঁজে পাই নি। তাছাড়া আমায় ভর করে আছে এখনো ইরফান চাচার ঋণের বোঝা। কী একটা ছাইপাশ চাকরি করছে আরেফিন। তবুও তার ওপর বাড়ির দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে ক'মাস ধরে মোটামুটি নিশ্চিন্তে আছি বলা যায়। আর নিজের জীবনেই-বা আর কাঁহাতক আলু, পটল, চচ্চড়ি সহ্য হয়? ঘরের বিছানা-তোশক ছিঁড়তে ছিঁড়তে তলায় ঠেকেছে। কতদিন কোনো কিছু কিনি না! এর মধ্যে টিউশানি ছেড়ে দেয়ার মতো শৌখিনতা আমাকে মানাবে কেন? লন অতিক্রম করার সময় ভেতরে হই-হট্টগোলের শব্দ শুনতে পাই এবং সেই সাথে অদ্ভুত মিউজিকের একটা তরঙ্গ। বারান্দায় শাদা অর্কিড ফুল ডালসহ ওপর দিকে উঠে গেছে। সেখানে দাঁড়িয়েই খোলা জানালা দিয়ে স্পষ্ট দেখি, ভেতরে কোনো উৎসব চলছে। গ্লাস-বোতলের লাগাতার টুংটাং। এবং পৃথিবীর তাবৎ সুন্দর পুরুষ-রমণী সেখানে এক হয়েছে। কেউ কোনায় দাঁড়িয়ে গল্প করছে, কেউ ছন্দে ছন্দে পা ফেলে জোড় বেঁধে নাচছে। কী ঝলমলে আভিজাত্য! ঘোর লাগে। মেয়েদের অদ্ভুত ছাঁটে চুল কাটা, বিচিত্র পোশাক, যতটুকু দেখা যাচ্ছে... এ আরেক পৃথিবী। কিম্ভূতকিমাকার আকৃতির একটা লোকও বিশাল বপু দুলিয়ে নাচছে... হাতে গ্লাস। বারান্দায় চাকর-খানসামাদের ছোটাছুটি। আমাকে দেখে একজন দাঁড়িয়ে যায়। আমি ঠোঁটে আঙুল চেপে... চুউপ... বলায় সে হনহন করে নিজের কাজে ছুটে যায়। আমার এখান থেকে উৎসবের মাত্র একাংশ দেখা যাচ্ছে। কী হাসি! অল্প সময়ের জন্য হলেও এমন করে হাসতে পারলে পরমায়ু পাওয়া যায়। সবাই হাসছে। সেই অদ্ভুত তরঙ্গ আমাকে বিহ্বল করে তোলে। কী অপূর্ব ঘ্রাণ। ওই যে বয়স্ক মহিলাগুলো, আঁটোসাঁটো পোশাকের বদ্ধতা দিয়ে বার্ধক্য ঢাকছে, চিৎকার চ্যাঁচামেচি করে ভুলে যেতে চাইছে সব, নিজের চেহারা-সুরতের কথা ভুলে কিম্ভূত আকৃতির লোকটা নাচছে, ক'জন পারে সেটা? যা হোক, এতক্ষণে আমার নিজের দিকে খেয়াল হয়। যে শাড়ি পরে এসেছি, চেহারায় যে কেরানিমার্কা ক্লান্তি, এই বাড়ির কেউ দেখে ফেললে, তার মতো দুর্ঘটনা আর কিছুই হবে না। আর এই অবয়বে পার্টি পর্যন্ত যদি পৌঁছুতে হয়... ধরণী দ্বিধা হও... ফিরে যাওয়ার জন্য দাঁড়িয়েছি, সিনথির মার অট্টহাসি শুনে চমকে তাকাই। জানালা দিয়ে এখন তাঁকে দেখা যাচ্ছে। পরনে শাদা কামিজ, গোলাপি ধুতি এবং সম্ভবত পার্লার থেকে চুল কার্ল করে এনেছেন— মোটা শরীরে বিচিত্র লাগছে তাকে। একজন ভদ্রলোকের সাথে কথা বলতে বলতে তার এই অট্টহাসি চারদিক কোরাসময় করে তুলছে।

লন ধরে বেরিয়ে আসি। কুয়াশায় ঢাকা রাত, কিছুটা নির্জন পথ। দীর্ঘদিন চলাফেরা করায় রাতের ভয় কিছুটা কমে এসেছে আমার। কিন্তু তারপরও নির্জনতা দেখলেই তা ছেঁকে

ধরে। রোঁয়া ওঠা একটা মাদি কুকুর কেঁউ কেঁউ করে হেঁটে যাচ্ছে। এখন দ্রুত হেঁটে আমি রাজপথ ধরতে চাই। আচমকা পেছন থেকে কার যেন গলা। বুক ধড়ফড় করে ওঠে। কাউবয় টাইপের দু'জন ছেলে, কানে দুল, নেশাগ্রস্ত গলায় আমাকে প্রশ্ন করে, আপনি সিনথির টিচার?

হ্যাঁ, আমি ভয়ে ভয়ে বলি।

আপনার কাছে একশো টাকা হবে? টেনে একজন জানতে চায়। দেখুন হাজার হোক আপনি সিনথির টিচার, আপনার কাছ থেকে আমরা ছিনতাই করছি না। খুব প্রয়োজনে পড়ে চাইছি।

রাস্তা জনশূন্য। যা-ও দু-একজন যাচ্ছে, ঘাড় খাড়া করে যেন এই দৃশ্য দেখছে না। বুকে হিম ভয় নিয়েও জানতে চাই, কেন? নেশা করবেন? গালকাটা আর জংলি টাইপের চুল যে ছেলেটার, সে অনর্গল হা-হা হেসে টাকাটা নিয়ে বলে, সিনথির ব্যাপারে আপনি কিছু সাহায্য করতে পারবেন? আমি চারপাশে তাকাচ্ছি। কিছু দূরেই জনারণ্য। আলোময় রাজপথ।

কী ব্যাপারে? এতক্ষণে আমার শরীর থেকে রক্ত উড়তে শুরু করেছে।

শালিকে একটু প্যাঁদানি দেব। একজন বলে, আপনি আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবেন? এবং একজন আচমকা ছুরির মতো কিছু শব্দ ছুঁড়ে দেয়, এই জায়গাটা নিরাপদ নয়, আপনি আমাদের সঙ্গে আসুন।

আমার দু'পা মাটির সাথে ঠেসে যাচ্ছে। আতঙ্কে বিবমিষায় শরীরে জমাট বেঁধে গেছে ঘাম। এবং এরি মধ্যে কোথা থেকে পেছনে জুটে গেছে আরেকজন যুবক। আমার স্থিরতা দেখে ভদ্রতার মুখোশ খুলে দাঁত খিঁচিয়ে ওঠে একজন, কী ব্যাপার, কানে বাতাস যায় না?

নিজেকে উপড়ে তুলি। এবং কংক্রিটের পথ ধরে হাঁটি। হঠাৎ আমাদের মফস্বল শহরের একটা ঘটনা মনে পড়ে মুহূর্তেই। রাত বারোটায় সিনেমা দেখে ফিরছিল এক দম্পতি। ছুরির মুখে স্বামীটি টুঁ শব্দ করে নি। একদল ছেলে তার স্ত্রীকে টেনে স্কুলের মাঠে নিয়ে ফেলে। ছোট শহরে বেশ তোলপাড় হয়েছিল এই ঘটনা নিয়ে। হাসপাতালে মেয়েটিকে বিচিত্র কৌতূহল থেকে আমিও দেখতে গিয়েছিলাম। বিছানায় চোখ বুজে ছটফট আর কেবলি চিৎকার করছিল সে, সরে যাও, ওপর থেকে সরে যাও... উফ্ দমবন্ধ হয়ে আসছে, সরে যাও...।

আমার শিরদাঁড়া ফুটো করে পেরেক ঢোকায় কেউ। জংলি ছেলেদের অনুসরণ করতে গিয়ে এক ফাঁকে গোঙানির মতো শব্দ করে উঠি, আমাকে ছেড়ে দিন।

ডরান ক্যান? মুখে দাগকাটা ছেলেটা তার আসল ভাষায় ফিরে যায়, আপনারে স্রেফ একটা কামের জিনিস বুঝায়া দিমু। রাস্তা থেকে একটু দূরে একটা আধাআধি তৈরি পাঁচিলের সামনে তারা দাঁড়ায়। এবং সেই পাঁচিলের হিম-ধরানো চেহারা দেখে আমার দম রুদ্ধ হয়ে আসে। ফ্যালফ্যাল তাকাই এবং হুমড়ি খেয়ে পড়ি একজনের পায়ের ওপর, আমাকে ছেড়ে দিন। টলতে টলতে ছেলেটা আমাকে টেনে তুলতে গিয়ে বুকের মাঝ বরাবর সজোরে কনুই দিয়ে গুঁতো দেয়। সঙ্গে সঙ্গে দু'টো যুবক এগিয়ে এসে আমার কম্পিত দেহ হাত দিয়ে চেপে স্পর্শ করে বলে, ডরান ক্যান? আসেন, আমরা আপনের কোনো ক্ষতি করব না।

তারা এগোয়। নিজেকে ছাড়িয়ে তাদের পেছন পেছন মৃতপ্রায় আমার পা দু'টো চলছে। রাতের ঘোর নির্জনতায় ছেলে তিনটের খাড়া অবয়ব পাক খায়। এবং একজন ঢুকে যায় সেই পাঁচিলের মধ্যে।

থরথর করে কাঁপছিলাম। এতদিনের সীমাহীন ভয়। বাস্তবিকই আমি আজ তার মুখোমুখি। হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে খিঁচিয়ে উঠে কানে দুল পরা ছেলেটা, সম্মান করতাছি গায়ে লাগে না? একেবারে হান্দায়া দিমু, আয়... এবং এমন বীভৎস চিৎকারে আমার যখন যথার্থই প্রাণ পাখি উড়ে যাওয়ার উপক্রম, নির্জন রাস্তার গলি ধরে হঠাৎ একটা গাড়ির সার্চলাইটের আলো। ছেলে দু'টো দৌড়ে ভেতরে চলে যায়। এবং উল্টো দিকে আমিও প্রাণান্তকর দৌড় দিই।

আলো জ্বালিয়েই গাড়িটা চলে যায়। এইমাত্র ঘটে যাওয়া ঘটনা হুবহু কোনো সিনেমার ঘটনার মতোই। একটা তির্যক আলো আমাকে টেনে তুলেছে সেই গহ্বর থেকে। আমি যে সেই বিশাল পথটা কোনো বায়ুযানে চড়ে, কতটুকু শূন্যে পা উঠিয়ে পেরিয়ে এসেছি, নিজেই বলতে পারব না। ঘামঝরা নির্ভার শরীর, কম্পিত বুক নিয়ে প্রথমেই আলোকোজ্জ্বল রাজপথের ওপর দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস টানি। হঠাৎ পেছনে শব্দ! হাঁসফাঁস করে পেছনে তাকাই। একটা লোক দৌড়ের ভঙ্গিতে পথ হাঁটছে। চারপাশ আঁধার হয়ে। আমি কি কোনো দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছি? এবার আমারই সারা শরীর এক পৈশাচিক ঘোরে টলছে। ছায়া হয়ে আসছে সব। এক সময় চরম বিভ্রান্তিকর অবস্থায় টলতে টলতে নিজের দরজায় দাঁড়াই।

সারা দিন পর আমি এ কোথায় দাঁড়িয়েছি? মগজ তোলপাড় করছে সিনথিদের বাসার কুৎসিত মিউজিকের শব্দ। এখন এসব বিষয়ের পর আমার জন্য কি শাস্তি অপেক্ষা করছে? চোখ উপচে জল আসে। সহসা নক করতে পারি না।

দরজা খুলে দেয় কামাল ভাই। যথারীতি সে আমার সাথে কোনো কথা বলে না। ভাবতেই শরীর রি রি করে ওঠে, এতদিন এইসব অশিক্ষিত অভদ্রদের সাথে বাস করেছি! সে ভেতরে যাওয়ার পর ব্যাগ রেখে আমি বাথরুমে। কাঁচাবাজারের দুর্গন্ধের ভিড় ঠেলে গতকাল রূপচাঁদা মাছ কিনেছিলাম। রাতে ভেজে রেখেছিলাম। সকালে গরম করার সুযোগ পাই নি। শীতের দিন বলে এখনো পচে নি। কিন্তু কেমন একটু গন্ধ ধরে গেছে। কড়া করে ভেজে ভাতের সাথে মাখাই। মন্দ লাগছে না।

আমি কাজ সেরে যখন বিছানায়, তখন রান্নাঘরে শানুর শব্দ পাই। বাতি জ্বালিয়ে দু'দিনের বাসি পেপার মুখে ধরে রাখি। বড় বড় হরফের হেডিং জানান দেয়, কুয়েত দখলকারী সাদ্দাম হোসেন কঠিন বিপর্যয়ের মুখোমুখি। ঘরে ফেরার অল্পক্ষণের মধ্যেই যুবকদের আক্রমণের রেশ অনেকটাই কাটিয়ে উঠি। কাগজটা ভাঁজ করে রেখে বাতি নিভিয়ে দিই। পেটের ওপর হাত রাখি। নতুন করে বুক খালি হয়ে আসে। প্রাণটির অস্তিত্ব টের পাওয়ার মতো বয়স এখনো হয় নি। স্থির হয়ে আছে। তবুও ছুঁয়ে ছুঁয়ে পরখ করি। কি অদ্ভুত রোমাঞ্চ। দেখি বিশাল এক গ্রামের পথ ধরে আমি হাঁটছি। চারপাশে হু হু হাওয়া। অবারিত ধান ক্ষেত। একটা বড় ইটখোলার সামনে দাঁড়িয়ে দেখি, খাড়া ওপর দিকে উঠে গেছে অশথ গাছ। তার নিচে ধ্যানমগ্ন একজন পীরের মতো কেউ। কম্পিত পায়ে কাছে এগিয়ে যাই, তার বজ্রকণ্ঠ বাতাস বিদীর্ণ করে, তুই আল্লাহর কাছে মাফ চা। ঘোর অন্ধকার ফুঁড়ে আমি খাড়া হই... কিসের জন্য?

হারামজাদি... বেশরিয়তি... চিৎকার করে ওঠে সে, পাপ স্বীকার না করলে দোজখবাসী হবি তুই... তোর কপালে...।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। শীত লাগছে। কম্বল গায়ে টেনে অনড় দীর্ঘ সময় পড়ে থাকি। এক সময় সেই সঙ্কীর্ণতার হলুদ ছায়া ছিঁড়ে উঠে আসি ওপরে। একটা অবারিত গ্রামে আমি পৌঁছেছিলাম। কিন্তু আমার স্বপ্নে হঠাৎ গ্রাম কেন? আমার শৈশব, কৈশোরের সাথে গ্রামের সম্পর্ক খুব ক্ষীণ। আমার জন্মের আগেই আমার দাদা-নানারা মারা যান। আমি জন্মের পর আমার স্মৃতির মধ্যে গ্রাম বলতে একটি কুপির লম্বা শিখা, বাইরে হু হু বৃষ্টিপাত এবং শাদা ঘোমটায় আবৃত আমার সৎদাদির মুখ ছাড়া আর কিছুই মনে করতে পারি না।

সেই কোন জন্মে একবার গ্রামে গিয়েছিলাম। পীরের মহাজাগতিক কণ্ঠস্বর আমার বুক বিদীর্ণ করে। ছটফট করি। কিন্তু এই সব বিষম যন্ত্রণা ছাপিয়ে আমাকে এক চিলতে বাতাস ছুঁয়ে যায়, স্বপ্নে আমি প্রতিবাদী হয়ে প্রশ্ন করেছিলাম, কেন মাফ চাইব?

এরপর যতই দিন যেতে থাকে, আমার জীবন সঙ্কটের পর সঙ্কটে হয়ে উঠতে থাকে বিষনীল। শিশুটি আমার ভেতর বেড়ে উঠছে। কী ভয়ানক একটা ভয় সারাক্ষণ আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে থাকে। কিছুতেই আমি কোনো স্থিরতায় পৌঁছুতে পারি না। ক'দিন আগে সিনথির টিউশানি ছেড়ে দিয়েছি। মেয়েটার জন্য অসম্ভব মায়া হয়। কী ধারালো পথ ধরে হাঁটছে। সে কি এসবের কিছু বোঝে? কিন্তু ওদের ওখানে যাওয়া ছেড়ে দিলেও ছায়ার মতো একটা ভয় আমাকে অনুক্ষণ অনুসরণ করতে থাকে। ওই ছেলেগুলোর সাথে যদি আবার দেখা হয়! পুলিশ কি আমাকে সাহায্য করবে? আরেফিন বলেছিল, ভার্সিটিতে বন্দুকযুদ্ধ শুরু হলে পুলিশরা নিষ্ক্রিয় দাঁড়িয়ে মজা দেখে।

একদিন সত্যজিৎদের আড্ডায় গিয়েও সেই ভাবনার প্রতিফলন দেখি। প্রত্যেক সরকারই ভোট কারচুপি করে ক্ষমতায় আসে, আমাদের দেশে আসবে গণতন্ত্র... ভুয়া সব... সত্যজিৎ টেবিল ফাটায়। শাহতাবের যুক্তি অন্যরকম, তাই বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব? দিনের পর দিন চলতে থাকা অরাজকতাকে প্রশ্রয় দেব? প্রতিবাদ করব না?

প্রতিবাদ কর... মায়ের জোয়ান ছেলে হয়েছ... গুলি খাওয়ার পর তোমার লাশ পর্যন্ত বাবা-মা পাবে না।

কিন্তু নিজেরাই যে দিনের পর দিন লাশ হয়ে বেঁচে থাকছি, এর কী সুরাহা করবে? তার চেয়ে প্রতিবাদ করে মৃত্যু ভালো। খেয়াল করছিস সত্যজিৎ, কোটি কোটি টাকার ঋণের তলায় চাপা পড়ে বিশ্ববাজারে আমাদের দেশে অবস্থাটা? আমরা কি বেঁচে আছি? শেয়াল-কুকুরও এরচেয়ে ভালো বাঁচে!

যে সরকারই আসবে... একই রকম হবে তার চরিত্র। ফায়দা লোটার সেই একই রকম ধান্দা। একটা পার্টি দেখা, এই সরকারকে হটিয়ে যাকে বসানোর মতো মনে হবে তোর? কারো কোনো চরিত্র আছে? এবং এই সব তর্ক চলতেই থাকে। আমি নীরব শ্রোতা হয়ে যাই। অনুভব করি, রাজনীতিকে ঠিকমতো জেনেই তবে তাকে ঘৃণা বা গ্রহণ করা উচিত। আমি কিছু না জেনেই এসব সম্পর্কে চরম নির্বিকার।

ইরফান চাচার ওখানে যাই না। বুকের মধ্যে সারাক্ষণ বল্লম গেঁথে থাকে। অফিসের টেবিলে বসে কেবলি বমি বমি ভাব। ভয়ে চারপাশে তাকাই। পত্রিকা মেলে ধরি... বুশের

মার্কিন সৈন্য হাজার হাজার ইরাকি নাগরিকের দেহ নিশ্চিহ্ন করে দেয়। সুলতানা ফাইলের ভেতর নিমগ্ন। একটু কাঁচা আম খাওয়া যেত ?

'নৃশংস' শিরোনামে তিন বছরের শিশুকে ধর্ষণ করে কোনো যুবক। অফিস আজ শান্ত। বড়ুয়া বাবু অব্দি গভীরভাবে কলম পিষছেন। বমির বেগ বাড়ছে। সন্তর্পণে হাত রাখি পেটে। রক্তস্রোতের ভেতর বরফকুচিগুলো হাঁটতে শুরু করে। মসজিদের সামনে দাঁড়ানো প্রেসিডেন্ট। বিশাল ছবি। ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের সাথে জুম্মার নামাজ আদায় করছেন। ছিনতাইকারীর হাতে প্রাণ দিলেন একজন মহিলা। ভারতে বাবরি মসজিদ ভাঙাকে কেন্দ্র করে রক্তক্ষয় কমছে না।

'অবশেষে সাদ্দাম নিঃশর্তে কুয়েত ছাড়তে রাজি হয়েছে।'

'বুশের রাজকীয় উত্থান, বিনিময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচুর অর্থ লাভ।'

'বিশ্ববাসী হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।'

এর মধ্যেই আমার সন্তানের জন্মকে ঘিরে হাজার শব্দের হুল্লোড়। শিরোনাম : 'একজন রমণী দাবি করছেন তিনিই সন্তানটির পিতা।'

বমির বেগ বাড়ছে। মাথা নুয়ে আসতে চাইছে টেবিলের সাথে।

'স্রেফ একটা বাল্ব চুরি করতে গিয়ে একজন যুবকের তড়িতাহত হয়ে মৃত্যু।' বড়ুয়া বাবু হেঁটে আসেন, একশোটা টাকা লোন হবে ?

পঞ্চাশ টাকা হবে।

তা-ই দিন। বাচ্চাটা ক'দিন ধরে মিষ্টি খাওয়ার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে। গা গুলোচ্ছে। মুখ নামিয়ে আনি। টাকা নিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে চলে যান বড়ুয়া বাবু। 'আরিচায় বাস খাদে পড়ে পঞ্চাশ জনের মৃত্যু।' এবং বিভিন্ন দলের বিবৃতি, 'গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলন যে-কোনো মূল্যে অব্যাহত রাখতে হবে'। ওমর এবং শাহতাবের একই উক্তি... আমরা কি বেঁচে আছি ? এই সব অনুভূতির পর যখন কাগজ ভাঁজ করে রাখি, তখন অন্য ভয়, আরেফিন যদি গুলিবিদ্ধ হয়ে মরে ? এই ভাবনার সূত্র ছিঁড়েখুঁড়ে চারপাশে ভূতের মতো চক্কর খায় উস্কো চুলের কিছু বিদঘুটে মুখ। শাণিত আলোয় তারা ছুরি ঝলসায়। আমাকে পাঁচিলের দিকে টেনে নিয়ে চলে একদল যুবক।

পরদিন অফিসের চেয়ারে বসতেই ঘাই দিয়ে ওঠে নদীর হু হু হাওয়া, গোলাপি নবাব বাড়ি। আমার চোখে জল এসে যায়। আমার এত ঘুম পাচ্ছে কেন ? কি মনে হতে সুলতানার টেবিলের দিকে যাই। চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসি। সে প্রশ্ন করে, তোমাকে অমন ক্লান্ত দেখাচ্ছে কেন ? উত্তর দিয়ে হঠাৎই বলি, আচ্ছা, এম আর সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা আছে ? বলেই টের পাই কী চরম বোকামিটা করেছি। সে অবাক চোখে তাকায়, কেন ?

প্রায় তখনই নিজেকে সামলে নিই, না, মানে আমি যাদের সাথে সাবলেট থাকি, সেই বাড়ির মহিলা করাতে চাইছে। আমার কাছে পথঘাট জানতে চাইছিল।

কত মাসের ? সে জানতে চায়।

এই তো, আড়াই তিন। বলতে বলতে ভেতরে ঘেমে উঠি।

তাহলে খুব একটা অপরিণত না। বিশেষ করে তিন হলে, সুলতানা বলে, তা, নষ্ট করতে চাইছে কেন?

দুটো বাচ্চা হয়ে গেছে... বলতে বলতে ভয় দম বন্ধ হয়ে আসে। আমি কি আগে কখনো শানুর বন্ধ্যাত্বের কথা বলছি?

কিন্তু সুলতানার মুখ স্বাভাবিক, ক্লিনিকে এসব তো হরহামেশাই হচ্ছে। হাসপাতালে গিয়েও করতে পারে। ব্যাপারটা খুব সহজ। একটা সরু নল ভেতরে ঢুকিয়ে, নলটাকে পাকিয়ে ভেতরটা স্প্রে করে সাফ করে আনে।

নলটা কি বাচ্চার শরীর ছিদ্র করে ঢোকে? অস্ফুটে প্রশ্ন করি।

সুলতানা দ্বিগুণ বিস্ময়ে তাকায় আমার দিকে, সে-কী! সন্তান বলছ কাকে? সবে ও ফুটছে। আড়াই তিন বললে না?

কী সব উস্কোখুস্কো ভার নিয়ে রাস্তায় নামি। অনেকটা পথ দারুণ উৎকণ্ঠায় পার করে দিয়ে নিজের কাছেই জানতে চাই, আমি আসলে কী চাইছি? নিজের ভেতরের বিষ বাইরে ছড়িয়ে ছড়িয়ে বেড়াচ্ছি কেন? হাতের ডাইনে হঠাৎ একটা ক্লিনিকের সাইনবোর্ড। তাতে লাল অক্ষরে নিচে লেখা 'এখানে এম আর করানো হয়'। তড়িঘড়ি রিকশা থামাই। খুঁটিনাটি সব জানার আশায় কি এক ঘোরে রিকশাকে দাঁড়াতে বলে সিঁড়িতে পা রাখি। টন টন করছে মাথা। সুলতানার বিদ্রূপ মাখা চোখ শূন্যে ঝুলতে থাকে। ওপরে উঠতে গিয়েই একটা বিশাল শলাকা, সরুপথে ঢুকে আমার সন্তানের শরীর বিদ্ধ করে এবং সেই সরু নলের সুতীক্ষ্ণ ফণা স্রোতসহ পাকিয়ে পাকিয়ে আমার সন্তানকে আলুভর্তা বানায়, ডাল বানায়, সেই ক্ষীণতম প্রাণের স্পন্দন বীভৎস খিঁচুনিসহ স্থির হয়ে যায়।

নিজেকে নিয়ে ফিরে আসি। অদ্ভুত কাল্পনিক বিভ্রমে ইরফান চাচার মুখোমুখি নীনাকে হাঁটুমুড়ে বসাই। তার সেই ভারি কোমল হাত কান্নায় কান্নায় ভিজিয়ে দিই। রিকশা ছোটে টানা রাস্তা ধরে। পুরো অফিসের ফাইলপত্র আমার মাথায় ঠেসে দিচ্ছে কেউ। সেই স্তূপের নিচে চাপা পড়ে আমাকে আর দেখা যাচ্ছে না। আহা, যদি এমন করে লুকোতে পারতাম? এসব কথা যখন ভাবছি হঠাৎ বোধ হয়, একটা ছায়া আমার পিছু নিয়েছে। অফিস থেকে বেরোতেই সন্ধ্যা। চারপাশে বাতি জ্বলে উঠেছে। সেই আলোর ওপর অর্ধবৃত্তাকার আধমরা চাঁদ। অফিসের আধখোলা জানালা দিয়ে কেউ ছুঁড়ে দিচ্ছে আমাকে। টনটনে মাথাব্যথা নিয়ে গতকাল শেষরাত অব্দি ঘুমোই নি। তন্দ্রা এলেই দুঃস্বপ্ন। কখনো সেই স্বপ্নে আমার পেটের মধ্যে মৃত সন্তানের আরেক রূপান্তর। চামড়ার তলায় জীবন্ত এই অনুভূতিতে রোমাঞ্চ। কখনো সে টলমল হেঁটে ধপাস পড়ে যাচ্ছে কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তার বাড়ন্ত আকৃতির দরুন পৃথিবীর সামনে আমি সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে ধরা পড়ে যাচ্ছি। এক রাতে স্বপ্নে স্পষ্ট দেখেছি, মাটিতে গলা পর্যন্ত পুঁতে পাঞ্জাবি পরা কিছু লোক আমার মাথায় পাথর ছুঁড়ে মারছে। তারপর থেকে মাথা ধরে থাকে সারাক্ষণ চামড়া টান করে দেয়া বিশ্রী নিঃসঙ্গ মুহূর্তে আমাকে বড় দুর্বল করে তোলে।

অফিস থেকে বেরোতেই ব্যথাটা যেন সরে দাঁড়ায়। রিকশা, গাড়ি, মানুষ সব ছাপিয়ে বাস স্ট্যান্ডের দিকে যাব। ফের মাথায় চাপ। নবাবের শরীর হয়েছে তোমার... নিজেকে বকতে বকতেই বাধ্য হয়ে রিকশা নিই। তাছাড়া নিজেও বুঝতে পারছি, শরীরের এইরকম

নাজুক মুহূর্তে বাসে কুস্তাকুস্তি করে ওঠা রিস্কি ব্যাপার। কিন্তু বেশ ক'দিন ধরে আমাকে সেই ঝুঁকির পথ ধরেই হাঁটতে হচ্ছে। এবং তারপরই যেন টের পাই কানে দুল পরা হুবহু সেই ছেলেটি যেন আমার পিছু নিয়েছে। বুক ঠাণ্ডা হয়ে আসে।

অনেকটা পথ গায়ে থর-কাঁপুনি নিয়ে বসে থাকি। কিছুক্ষণ পর আর ছেলেটাকে দেখি না। হাঁফ ছেড়ে টের পাই ভার্সিটির সামনের বিস্তৃত পথে এসে পড়েছি। ওদিকে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ চলছে, রিকশা তাই ঘুরে এসেছে। আমি টেনে বাতাস নিয়ে ওপর দিকে তাকাই। কী অপূর্ব পুরনো রোদ্দুরের বিন্যাস! আর বিস্তৃত কড়ুইয়ের কালো পাতাগুলো কী অভিনব মায়ায় ধবল আকাশটাকে চিতা-হরিণীর মতো করে রেখেছে। রিকশা বাঁয়ে মোড় নিলে ফের ভয়ে রক্তশূন্য হয়ে পড়ি। সেই ছেলেটিকে পেছনের রিকশায় দেখা যাচ্ছে। সিগ্রেট টানছে সে। ভালো করে লক্ষ করি, না, এ অন্য ছেলে। অনেকক্ষণ পর ভিন্ন পথে চলে যায় সেই রিকশা। শরীর থেকে ঘাম ছেড়ে গেলেও বাসায় এসে আমি অনেকক্ষণ ধরে স্থির হতে পারি না।

এই রকম কোথাও কোনো ছায়া দেখলেই চমকে উঠি। রাতে দুঃস্বপ্ন বাড়তে থাকে। একদিন ইচ্ছে হয় শানুর দরজায় ধাক্কা দিই। তাকে জড়িয়ে ধরে থিতু হই। কিন্তু তার আচরণ এখন সব রকমের ভব্যতার বাইরে চলে গেছে। রান্নাঘরে তার কোনো জিনিসে স্পর্শ লাগলে সে সঙ্গে সঙ্গে ধুতে শুরু করে দেয়। ফলে আমার মাথায় রক্ত চড়ে যায়। এই রকম পরিস্থিতিতে কাঁচা বাজার করা, বাড়িতে টাকা পাঠানোর অসহ্য কষ্ট, বিছানার চাদর, নিজের জন্য একটা তাঁতের শাড়ি কিনতে না পারার অক্ষমতা আমাকে প্রায় পাগল করে তোলে। কত আর ঝেড়ে ফেলা যায়?

সব কিছু ছাপিয়ে পায়ের পাতা থেকে মগজ পর্যন্ত হিম হিম বইতে থাকে অন্য এক যন্ত্রণা, আমি একে না-কোনো ভাষা, না-কোনো বেদনা— কিছুতে রূপ দিতে পারি না। টেলিফোন করার অভ্যেস আমার একদম নেই। কয়েনবক্সে লাইন ধরা সবচেয়ে অসহনীয়, তাই ব্যাপারটা পারতপক্ষে পরিহার করে চলি। কিন্তু একদিন কী এক ঘোরে ছুটে যাই সেদিকেই। ইরফান চাচা কখন কবে যে নাম্বারটা দিয়েছিলেন, মনেই ছিল না। মতিঝিলের টেলিফোন বুথে গিয়ে দাঁড়াই। উত্তেজনায় চোখে জল এসে যায়। সিকি ফেলে নাম্বার ঘোরাই। এক সময় অপর প্রান্ত থেকে একজন মহিলার কণ্ঠ শুনতে পাই। কিন্তু লাইন চাওয়ার পর দীর্ঘ এক নীরবতা। লাইনে দাঁড়ানো পেছনের লোকজন টেলিফোন বুথে গিয়ে উসখুস করছে তখন। ঠিক এসময় সেই অনির্বচনীয় বিশাল কণ্ঠ... হ্যালো।

হ্যালো হ্যালো... ওপাশে উদ্বিগ্ন কণ্ঠ। নিঃশব্দ কান পেতে তাঁর ভারি গলা শুনি। কাঁপতে কাঁপতে লাইন কেটে দিই। বিশাল সড়ক ধরে হেঁটে আসি। বাসায় এসে বিছানায় মুখ থুবড়ে থাকি। শানুর সাথে কথা বন্ধ। বাসার পরিবেশটা দুঃসহ হয়ে উঠেছে। বমি, ঝিম ধরা এসব কমে এসেছে। এখন কি এক ভার, কলজে ছিঁড়ে ফেলে লোহার আংটা। আমাকে নিচ দিকে চেপে রাখে কোনো অলৌকিক বিকট দৈত্য। এর মধ্যে জটিল মস্তিষ্ক ক্রিয়া, আমি কোনো লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারি না।

একদিন এইসব বিক্ষিপ্ততার ভেতরের ওমরের মুখোমুখি হই, আপনি কি আমার বাচ্চার দায়িত্ব নেবেন? এই শব্দতরঙ্গ তাকে স্পষ্টতই চমকে দেয়। সে বিহ্বল চোখে আমার দিকে তাকায়। কথা হচ্ছিল একটি চায়ের স্টলে বসে। কাপ থেকে পাকিয়ে উঠছে ধোঁয়া। ওমর বলে, আপনি বাচ্চাটার পিতৃত্ব সঙ্কটে পড়েছেন তো? আমার কি সেই শক্তি আছে?

কেমন ঝিমিয়ে আসি। আবার চারপাশে ধোঁয়া এবং জটিল মানসিক পীড়ন। চারপাশে কি কুটিল গোল গোল চোখ, আচ্ছা, ছেলেগুলো যদি আমাকে টেনে সেই পাঁচিলের দিকে নিয়ে যেত ?

ওমর বলে, আপনি আমার কাছে করুণা চাইছেন কেন ? আমি জানি, আমি খুবই নগণ্য একজন, আপনাকে চাওয়ার দুঃসাহস আমার কোনো কালেই হয় নি। আপনি যদি সমাজকেই ভয় পেয়ে থাকেন, তবে আমি রাজি এর পিতৃত্বের দায়িত্ব নেয়ার জন্য। সন্তানের ব্যবস্থা না হয় হলো, আপনি তখন কোথায় থাকবেন ?

আপনারা সবাই এত কথা জানেন, কেমন অসহিষ্ণু হয়ে উঠি। কথায় কথায় চারপাশে দেয়ালই উঠছে শুধু। আমি কোনো পথ পাচ্ছি না।

ধোঁয়ার আস্তরে ওমরের মুখে ছায়া। আমার কাপটা বয় টেনে নেয়ার সময় আমি আরেক কাপ চাই, কেমন গলা শুকিয়ে আসছে।

আমার মান-অপমান বোধ খুব কম... ওমরের গলা এই প্রথম ভিজে আসে। চিরকাল সবার মুখে তা-ই শুনে এসেছি। টাকার জন্য জীবনে নিজেকে কত জায়গায় কতভাবে বিকিয়েছি। মানুষের লাথি-ধাক্কা খেতে খেতে কেমন ভোঁতা হয়ে গেছি। কোনো কিছুতেই আর গা করি না। কিন্তু দেখুন, আপনি কি একটা কথা বললেন, তাতেই আমি কেমন বড় বেশি অপমানিত হয়ে গেলাম। শেষ পর্যন্ত আপনিও আমাকে ব্যবহার করতে চাইছেন ? দেখুন, কেমন কান্না এসে যাচ্ছে।

সেই চায়ের স্টলের ভিড়ের মধ্যেও আমি টেবিলে রাখা তার হাত চেপে ধরি। বিশ্বাস করুন, এটাও ঠিক না। আমাকে ভুল বুঝবেন না, একে একে সবাই চলে গেছে। ওমর, একজন মানুষ নেই যার পাশে দাঁড়িয়ে আমি বাঁচতে পারি। আমি কি জানি, আমি আদৌ আপনাকে ভালোবাসি কি না ? কী করে আপনি ভাবছেন, এই যে স্থিরতা, আমি একদম ঠিক ঠিক তাই নিয়ে আপনার পাশে নিজেকে দাঁড় করাবো ? আমাকে একটু একটু করে সেটা বুঝতে হবে। সামনে পুরো জীবনটাই তো পড়ে আছে।

কাপ আসে। চায়ে ফের চুমুক দিই। ওমর সহসাই নিজেকে ঝেড়ে ফেলে, আপনার সব কথার ভেতর ধরার মতো ক্ষমতা আমার নেই। আমি আমার পক্ষ থেকে এটুকুই বলতে পারি, আপনি চাইলেও আমি আপনাকে সহজে ছাড়ছি না। এ জন্য আপনি আমাকে ব্যক্তিত্বহীন, ছ্যাঁচড় যা খুশি ভাবতে পারেন। আপনাকে সেদিন নাইটিঙ্গেল পাখির গল্প বলেছিলাম না ? নীনা, আমি রক্ত দিতে পারি, কেননা আমার সেটা ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু নিজেকে বদলাতে পারি না।

এ কথার পর কী বলা যায় ? আরো বেশি করে হিম বরফে রূপান্তরিত হওয়া ছাড়া কীই-বা আমার হওয়ার আছে ? কিন্তু তারপর আমার জন্য আরো তীব্র শীতলতা অপেক্ষা করছিল। রুমাল দিয়ে ঠোঁটের কোনা মুছছি, ওমর তার স্বাভাবিক স্বভাবে হেসে বলে, আপনাকে আমার জীবনের একটা ট্র্যাজিক ঘটনা বলি। এটা বলে বেড়ানোর মতো কোনো কাহিনী নয়। যারা আমার পরিচিত তারা সেটা নিজের চোখে দেখেছে, তারা ছাড়া এই আপনাকেই প্রথম বলছি। এরপর আপনি ইচ্ছে করলে আমাকে আরো বেশি ঘৃণা করতে পারেন। আরো কুৎসিত ভাবতে পারেন।

স্টলের ভেতর হঠাৎ উঁচু গ্রামে রেডিও বাজতে শুরু করে। সিনেমার বিজ্ঞাপন উচ্চকণ্ঠে চলায় তার কথা শোনার জন্য আমাকে আরেকটু ঝুঁকতে হয়।

আমার এক বন্ধু ছিল, ওমর বলে চলে, আপনাকে আগেই বলেছি, আমার জীবনে কোনো বন্ধু নেই, আমি কারো সাথে তেমন গভীরভাবে আর মিশতে পারি না। দু'জনই ক্লাস এইটে পড়তাম। জানেন তো খুব গরিব আমরা, তখনো তাই ছিলাম। আমাদের দু'জনের ঘুরে বেড়ানো, স্কুল ফাঁকি দেয়া-সব কিছুতেই মিল থাকলেও তার একটা বাড়তি গুণ আমাকে খুব হীনম্মন্যতায় ভোগাতো। চমৎকার ছবি আঁকত সে। একবার হলো কী, একটা ভয়াবহ ছবি আঁকার মধ্যে নিজেকে ঢুকিয়ে ফেলল সে। সারাদিন দরজা আটকে থাকে। ডাকলেও সাড়া দেয় না। যদিও হঠাৎ বেরোয়, উদ্‌ভ্রান্ত, উস্কখুস্ক ভাব। প্রতিদিন ফিরে আসি। এভাবে বেশ কয়েক মাস কেটে যায়। আমি কেমন নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ি। তো একদিন তার ছবি আঁকা শেষ হলো। দু'জন মিলে বেশ দু'চার পয়সা করে চাঁদা তুলে ছবিটাকে ফ্রেমে বাঁধালাম। শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়াল, তা দেখে তো আমি থ। আপনাকে আমি ভাষায় বোঝাতে পারব না, কাচের ফ্রেমে বন্দি এক অন্য পৃথিবী। সে বলল, এই ছবি দিয়ে তার জীবনটাই বদলে যাবে, সে অনেক বিখ্যাত হবে, ধনী হবে। জানেনই তো আমি ছিলাম চূড়ান্ত গরিব। সব দেখে আমার মনটাই ভেঙে গেল। আমি পড়ে রইব আঁস্তাকুড়ে। সে সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাবে সাত-মহলের চূড়োয় ? দু'জনের জীবনই যাবে পাল্টে ? ঘরে তখন নিত্যদিন কুকুর কামড়াকামড়ি অভাব, একদিন কি হলো ছবিটা আমি চুরি করে ফেলি।

রেডিওতে বিজ্ঞাপনের শব্দ কমে এখন খবর হচ্ছে। ঠাণ্ডা হাত কানের চামড়ায় ঠেসে বসে থাকি।

বিশ্বাস করুন, কোনো ঈর্ষা থেকে নয়, ওমর বলতে থাকে, আমি নিজেও জানি না কেন তখন ও কাজটা করেছিলাম। সেটা বেচতে গিয়ে আমার স্বপ্নভঙ্গ হয়। কিন্তু তখন আমার ফেরার কোনো পথ ছিল না। একেবারে জলের দামে সেটা বেচে দিয়ে ঘুরে এসে ভূতের মতো বসে থাকি। ওমর থামে। আমি তখনো চেয়ে আছি। পাশের টেবিলে আড্ডার চূড়ান্ত উত্তেজনার মুহূর্তে একজন টেবিলে জোরে ঘুষি বসায়, ইসলামি রাষ্ট্র কায়েম করে মুখে ধর্ম নিরপেক্ষতার বুলি কপচানো ? রাবিশ! এবং রেডিওতে আমার স্নায়ু শীতল করা গান আয় রে... মেঘ আয় রে...।

সে-রাতেই আমার বন্ধুটি আত্মহত্যা করে, ওমর আবার শুরু করে, এ খবর শুনে আমি কষ্টে, গ্লানিতে প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। নাওয়া-খাওয়া ভুলে পুরো একমাস তার কবরের পাশে বসেছিলাম। মাথা ঠুকতাম মাটির সাথে। সবার কত ঠাট্টা, অপমান, পরিহাস। তারপরও আজ এত বছর কেটে গেছে। মাসের সাতাশ তারিখে, যে তারিখে সে মারা গেছে, আমি সারারাত তার কবরের পাশে বসে থাকি। কতজন এটাকে পাগলামি বলেছে। এসব অর্থহীন বলে বুঝিয়ে সবাই কত টেনেছে, ওখানে আর না যাওয়ার জন্য। কিন্তু আমার মন বুঝলে তো— বলতে বলতে ওমরের চোখ ফের ভিজে ওঠে। পরক্ষণেই মাথা নেড়ে বলতে থাকে, আমি একটা লোভী কুত্তার বাচ্চা। এই করে করে প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। জানেন, যে-কোনো জিনিসের জন্য জীবন বাজি রাখতে পারি। কিন্তু আমার এই কুৎসিত জীবনের কতটুকুই-বা মূল্য আছে। কিন্তু ভয় লাগে, ধরুন চুরি করলাম আপনাকে,

জীবন বিকিয়ে দিয়ে আপনাকে জয় করলাম, কিন্তু আপনাকে ছাড়া, সব আছে, তার ভেতরে কেবল আপনি নেই।

কাপের ওপর আমার হাতের ছাপ বসে গেছে। কেমন বোবার মতো অনড় বসে থাকি। চারপাশ কুয়াশা হয়ে আসে। ওমর আবারো আগের প্রসঙ্গে আবর্তিত, জানেন, আমার বন্ধুর নাম ছিল অপু। আমি পুরো 'পথের পাঁচালী' ঘেঁটে ফেললেও কি সেই অপুকে খুঁজে পাব? কি সব কথা যে আজ আপনাকে বলছি।

আমিও কিন্তু ছবি আঁকি... ঠাণ্ডা গলায় শুরু করি। এক সময় ছবি আঁকার জন্য কি করি নি? জানেন আমার ছোট ভাইটা একদিন একজোড়া সোনার দুল...।

থাক, নাইবা বললেন সেসব, ওমর বাধা দেয়। ছবি আঁকা নিয়ে আমি উল্টোপাল্টা কোনো কিছু একদম সহ্য করতে পারি না। আপনি আঁকেন জেনে কেন যেন আমার নিজেকে নিয়ে ভয়ই বাড়ে শুধু। আপনি লক্ষ করেছেন নিশ্চয়ই, এই নিয়ে কখনো আমি আগ্রহ প্রকাশ করি নি?

আমি কি তাহলে আঁকা ছেড়ে দেব? তাকে পরীক্ষা করতেই যেন হঠাৎ আমার এই প্রশ্ন।

সে-কী! তা কেন হবে? সে মহাব্রিত। শুধু ওই নেশাটার সাথে আমার মতো অকল্যাণকে না জড়ালেই হলো। মোটা মাথার একটা গবেট আমি। ওইসব সূক্ষ্ম শিল্পটিল্পর আমি কী বুঝি? দেখেছেন, আমিও আজ চান্স পেয়ে আপনাদের মতো কথা বলতে শুরু করেছি। একটু সুযোগ দিয়েছেন কী অমনি মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে রাজা বাদশা বনে গেছি। এই জন্যই লোকে বলে বানরকে...।

থামুন!— বলে ধমক দিয়েই আমি অনেকক্ষণ ঝিম ধরে বসে থাকি। কী তীব্র অবশতা, নড়তে পারছি না। কিন্তু ওমরের চরিত্রে কোনো শিথিলতা নেই, নিজেকে ঝেড়েঝুড়ে পরমুহূর্তে সহজ স্বরে বলে, আপনাকে তো আসল কথাই বলা হয় নি। দেখুন, কী সব প্রসঙ্গ এসে গেল। একটা বাসা পাওয়া গেছে। শহর থেকে একটু দূরে, তবে বাসের সুবিধা ভালো। ম্যালা ঝক্কি গেল দিদি! ট্যাপের পানির আরাম পাবেন না, টিউবওয়েল। তাই এক হাজারে রাজি হয়েছে।

অবশ শরীর টেনে বাইরে বেরিয়ে আসি। ফুটপাত ধরে দুজন হাঁটি। মধ্যরাতের বিশাল নির্জনতায় বাবার মৃত্যু হয়েছিল। বিস্তৃত জনারণ্যের দিকে চেয়ে আমি বাবার মুখ খুঁজি। ঝাপসা সব। ওমর একটা ঝুলঝুলে জ্যাকেট গায়ে ঝুলিয়েছে। গলায় মাফলার। গালে তার যথারীতি পুনরায় গজানো দাড়ি। পায়ের চেয়ে একটু ছোটই হবে চপ্পল। গোড়ালি বেরিয়ে পড়েছে। ওকে এই অবস্থায় দেখে ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে উঠছি। বরং আচমকা ফিটফাট, চৌকশ হয়ে গেলেই ওকে বেখাপ্পা লাগবে। হঠাৎ পকেটে হাত রেখে সে শীতে কুঞ্চিত নাকে ভাঁজ ফেলে বলে, তাহলে বাসাটা কালই আপনি দেখতে যাচ্ছেন?

হ্যাঁ, আমি বলি। ভোরে আমার বাসায় চলে আসবেন। কুয়াশায় ভিজতে ভিজতে দু'জন যাব।

এরপর রিকশায় ঘুপচি গলি, নর্দমা, স্তূপীকৃত ময়লা, পচা ডাব, মাস্তান গোছের ছেলের বিড়ি ফোঁকা, গলির মাঝখানে রক্তমাখা ন্যাপকিন, দু'টো কুকুরের দীর্ঘস্থায়ী সঙ্গম দৃশ্য দেখা

শেষে আমার বাসার সামনে ওমর আমাকে নামিয়ে দেয়। একজন অপুর আত্মহত্যা, শরীরের সমস্ত রক্ত নিঃশেষে দান করে রক্ত গোলাপ-ফোটানো নিথর নাইটিঙ্গেল এবং আরেকজনের দুর্বিষহ গ্লানির ওপর পা রেখে ঘরে আসি।

সারাটা রাত প্রচণ্ড অস্থিরতায় আর ঘুম আসে না। সেই চিরকালীন যাবতীয় দ্বন্দ্ব যা আমাকে শুষে পান করে একবার শূন্যে ওঠায়, ফের দ্বিধাবিভক্ত পৃথিবীর অতলে নিক্ষেপ করে, এইসব অনুভূতির পীড়নে ছটফট করি। গলায় শ্বাস চেপে বসলে উঠে বসি বিছানায়। বালিশ ফুঁড়ে তুলো বের হয়ে বিছানা একাকার হয়ে যায়। কেমন হাঁসফাঁস লাগে। মেঝে দিয়ে একটা ছুঁচো দৌড়ে যায়। গলায় জল ঢালি। তারপর মুমূর্ষু আঙুলে বাতি জ্বালিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা ইজেলটা খাড়া করাই। ন্যাকড়া দিয়ে তকতকে পরিষ্কার করি। বড় অবসন্ন লাগে। দরজা খুলে বাইরে বেরোই। দমকা অন্ধকারে আবৃত চরাচর। এক সময় দেখি, দূরের একটা আলোর স্তম্ভ থেকে এক চিলতে আলো এসে বারান্দায় পড়েছে। কী তির্যক সেই আলোর বিস্তার! যেখানে পড়েছে, বড় উজ্জ্বল হয়ে, চারপাশের অন্ধকারকে তরল করে দিয়ে। কুয়াশা ঝরছে এবং এইভাবে প্রকৃতি ক্রমশ ধবল হয়ে উঠছে। ঠাণ্ডা হাওয়া। আমি ক্রমশ কেমন শান্ত হয়ে আসি। টেনে শরীরে চাদর জড়াই এবং অদ্ভুত চোখে, যেন এই প্রথম দেখছি, এইভাবে মাথা খাড়া রেখে চেয়ে থাকি, সেইদিকে।

সোনালি মুখোশ

নিশির দেহ যখন শাদা চাদরের স্রোতের ভেতর থেকে ঘাই দিয়ে উঠেছে, তখন চারপাশে তুমুল বৃষ্টি। অবিন্যস্ত হয়ে ওঠে সব। তন্দ্রাচ্ছন্ন নিশি টের পায়, তার দীর্ঘ চুল সাপের মতো এঁকেবেঁকে কণ্ঠ ছাপিয়ে বালিশ অব্দি গলা বাড়িয়েছে, আর হিংস্র বাতাস যেন সব ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে, যেন-বা কালো মোষ, শিং খাড়া করে সশব্দে ধেয়ে আসছে। তন্দ্রার ঘোরটা কেটে যায়।

নিশি দেখে, মাথার ওপর বনবন ঘুরছে ফ্যান। ততক্ষণে বৃষ্টি থেমে গেছে। সারা ঘরের নিঃসীম স্তব্ধতা তার শরীরকে বিছানার এক কোণে ঠেসে রাখে। নিশি মাথা ওঠাতে চায়, হাত তুলে সাঁতারের ভঙ্গিতে পাক খেতে চায়।

নাহ্, শরীর যেন ছেড়ে দেয়া দই হয়ে লেপ্টে গেছে বিছানার সাথে।

কলেজ থেকে বেরিয়ে ঠা-ঠা রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে নিশি দেখেছিল এক জায়গায় জটলা। সাধারণত রিকশা নেয়, আজ কী হয়েছিল, এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল সব। তারপর হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর।

টানা সূর্য তখন ঘিলু স্পর্শ করতে উদ্যত। এছাড়া জ্যাম, ধুলো, রাস্তার পাশের আঁটকুড়ের গন্ধ।

মাথার মধ্য ছিন্নবিচ্ছিন্ন শব্দ খেলা করে, সংসারে তোমার প্রাণ নেই। কিছুতে তোমার মায়া নেই, এই যে তুমি আছ, এ শুধু কিছু জায়গা দখল করে থাকা।

রাতের এইসব কথার পর আর ঘুম হয় নি।

যেন সেই শব্দের ধাক্কায়ই দুপুরে একটা কিছুতে নিজেকে অকৃত্রিম মনোনিবেশ করাতে চেয়েছিল— কী হয়েছে?

তার এই প্রশ্ন-জটলার মধ্যে কিছুমাত্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না। সূর্যের তীক্ষ্ণ পরিস্রাবণে নিশির চোখে ছায়া নামে, আচ্ছা, হয়েছেটা কী?

একজন বৃদ্ধ ভাবলেশহীন তাকায়— চোর!

কী চুরি করেছে?

ম্যানহোলের ঢাক্‌না।

বাসায় ফিরে রোজকার কাজ। ভাতের মধ্যে ডিম ছেড়ে দেয়ার পরই খিদেটা কেমন মরে যায়। এলিয়ে পড়ে বিছানায়। ভাত না নামানো পর্যন্ত টেনশান থাকে, মায়া নেই, প্রাণ নেই, আমি তাহলে এত দিন কী নিয়ে আছি? এর আগে আফজালের সাথে অনেক অভিমান হয়েছে, পারস্পরিক সহমর্মিতায় এক হয়েছে কখনো, কিন্তু ওর মতন মানুষ ঠিক এইভাবে ওকে কখনো দেখে নি। সত্য হোক মিথ্যে হোক, এ একজনের বিষয়ে একটু অন্য ধরনের আবিষ্কার, নিশিকে এ্যাদ্দিন পর সে সত্যি-সত্যিই চেতনার মূলে আঘাত করেছে।

ভাত নামিয়ে বিছানায় নিজেকে ছেড়ে দিতেই তন্দ্রা। কী যে হয়েছে আজ, অকারণেই চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। ছেলেবেলার বাঁশিঅলা ভোঁ শব্দে এক শতাব্দী তোলপাড় করে হেঁটে যায় অজানার পথে। নিশি স্পষ্ট দেখে, ডুগডুগি বাজছে, বাঁদর নাচছে। ঘুড্ডি উড়ছে—

ভোঁকাট্টা, তারপর সব মিলিয়ে যায়। ভারি দুর্বল বোধ করে সে। যেন মজ্জায় কামড় বসিয়েছিল জোঁক, সব রস চুষে নিয়েছে। শীত লাগে নিশির, সে বিহ্বল তাকায় চারপাশে। বৃষ্টিমুখী কারুকার্যময় রোদ্দুর বৃত্তাকারে নাচতে থাকে।

নিশি ডুবে যায়। সারা শহরে মড়িঘরের স্তব্ধতা নেমে আসছে। যেন সাত সমুদ্রের ওপার থেকে সমস্বরে ডেকে উঠল ঘোড়ার দল। নিশি সেই জল কেটে শ্বাস টানতেই শুনতে পায় ফোন বাজছে।

এরপর অদৃশ্য বড়শির টানে সে ওপরে উঠে আসে। কম্পিত হাত রিসিভারে রাখতেই ওপাশে আফজালের গলা, কী ব্যাপার, ঘুমোচ্ছিলে ?

নিশি ততক্ষণে বেহাল অবস্থা সামলে উঠেছে, না।

তুমি কি অসুস্থ বোধ করছ ? গলা এ রকম শোনাচ্ছে কেন ?

মাথাটা ধরেছিল।

এর আগেও ফোন করেছিলাম, তুমি-না বলেছিলে আজ ক্লাস নেই ?

ছিল, ভুল বলেছিলাম।

অমন কাটকাট উত্তর দিচ্ছ যে ? মাথার ভূত এখনো নামে নি ?

আমার মাথায় কখনো ভূত ছিল না। এরপর এই কথার তীক্ষ্ণতা সামলাতেই যেন নিজেকে বিন্যস্ত করে স্বর নিচে নামায়, তুমি কখন আসছ ?

একজন ব্যাংক কর্মচারী কখন বাসায় ফেরে, সে তো তুমি জানোই। যাহোক বড় অবাক করলে তুমি, বললে ক্লাস নেই, আবার কলেজে গেলে—।

নিশি জানলার পাশে বসে শহর দেখে।

এক চিলতে মাঠ, তার এপাশে ঝাঁকড়া নিমগাছ। কিছু দূরের সরু রাস্তা ধরে রিক্‌শা যাচ্ছে। এখানে একটাই লাভ, যেহেতু পাশের বিল্ডিংয়ের কাজ সবে শুরু হয়েছে, সেহেতু এক মুঠো আকাশ এখনো ঢাকা পড়ে নি, নিশি যা শুয়ে শুয়েই পর্দা তুলে দেখতে পারে। এ সত্যি এক আজব চিজ, ওইটুকু আকাশের কত বর্ণ, কত ছায়া! এরপর ভেতরে ভেতরে অস্বস্তি শুরু হয়। বলেছিলাম কলেজে যাব না, সত্যিই ক্লাস ছিল না, কিন্তু সকালে ছন্দার ফোন, জরুরি চলে আস, ক্লাসের ঠেলায় তো মাঠে বসার সুযোগ পাই না, আমি ঘরে বানানো পিঠে নিয়ে আসছি, মজা করে খাব, বন্ধের সময় কলেজে যাওয়ার মজাই আলাদা। অন্যদিন হলে আফজালকে সরল সত্যি জবাবটাই দিত। কিন্তু মনে হচ্ছিল এতে সে বাগড়া দেবে, যুক্তি দেখাবে যে কলেজে রোজ যাচ্ছ, সেই কলেজেই বন্ধের সময় মজা ? এ স্রেফ মেয়েলি ঝোঁক— সে এসবের মধ্য থেকে অন্যকিছু খুঁজতে চাইবে, এও বিচিত্র নয়। নিশি এসব বিষয় সন্তর্পণে এড়াতে চায়।

এরপরই ছেলেবেলার ভোঁ বাঁশি, আবারো। সেই পথ ধরেই সাজিদুলের ছায়া মূর্ত হয়ে ওঠে। যেন একশো বছর আগে দেখা কেউ। কিছুতেই স্পষ্ট হয় না, এ স্রেফ ছায়া এবং তার নাম— কাকতালীয় বুঝি একেই বলে, সশব্দে ফোন বেজে ওঠে।

রিসিভার উঠাতেই হাত অবশ হয়ে যায়।

মমতাদি বলেন, কত কাল পর। চিনতে পেরেছ তো?

নিশি বলে, আমি একবার যে স্বর চিনি, সেটা কখনো ভুলি না।

তুমি আগের মতোই আছ, খুব স্বস্তি হলো আমার।

এরপর স্তব্ধতা।

নিশি জানে, এতদিন পর এই ফোন অহেতুক নয়। মুহূর্তখানেক আগে যে ঘাম জমেছিল শরীরে, তা ঠাণ্ডা হয়ে ঠেসে বসে, আরো বেশি শীত আরো গভীর ছায়া, আরো তীব্র কম্পন...। মমতাদি এরপর খেই হারিয়ে উল্টোপাল্টা কীসব বলেন, তোমার নাম্বার ছিল কিন্তু কী এক অস্বস্তি, তোমাকে সে দিন রাস্তায় দেখলাম, এইসব। চিরকাল নিশির সাথে তার ঠাণ্ডা তর্ক হয়েছে, এতদিন পর সেই পরিবেশ তৈরি হয় না। সে অস্থির হয়ে বলে, রহস্য করছেন কেন? কী হয়েছে বলুন?

তুমি আসতে পারবে?

নিশির বুক কাঁপতে থাকে, সে আবার অসংলগ্ন হয়ে ওঠে। একটি রৌদ্রোজ্জ্বল দিন মুহূর্তে অস্তোন্মুখ হয়ে তার দৃষ্টির সামনে থেকে গহ্বরে তলিয়ে যায়, নিশি দেখে ছায়া, সন্তর্পণে এর ভেতর থেকে মাথা টান করে, কী হয়েছে ওর?

অবস্থা খুবই খারাপ।

কী আশ্চর্য, কতদিন পর হঠাৎ আজই ওর কথা মনে হয়েছিল।

মমতাদির স্থৈর্য চিরকাল নিশিকে বিস্মিত করেছে। এই একটু কেটে গিয়েছে, বললে দেখা যাবে কাচের টুকরোর ঘায়ে পায়ের তলা দু'ফালি হয়ে গিয়েছে, অনেক আড্ডা অনেক গল্পের পর হয়তো এক সময় বলে উঠবেন, রাস্তায় আমার সোনার চুড়ি দুটো ছিনতাই হয়ে গিয়েছে। যে কারো মৃত্যু সংবাদেও খুব বেদনা প্রকাশ করেন না, আনন্দের উচ্ছ্বাস পরিমিত, তার সবকিছুই চূড়ান্ত সংহতির আড়ালে ঢাকা পড়ে থাকে।

নিশির কথায় তিনি বললেন, কেন ভান কর, তুমিই না বললে একবার যে স্বর চেন, তা কখনো ভোলো না। তুমি প্রায়ই কোনো দুঃসংবাদের জন্য প্রস্তুত থাক, প্রতিদিনই ওর কথা তোমার মনে হয়।

প্রতিদিন মনে হয় না, নিশির মধ্যে গণ্ডগোল লেগে যায়, না ওকে আমার মনে পড়ে না, প্রতিদিন না, সহসা না, শুধু ওর অসুখটাকে, ওর মুখ ভাসে না, মাঝে-মধ্যে শুধুই ছায়া।

ওর অবস্থা ভীষণ খারাপ, মমতাদি তাঁর গলার স্বরে চিরকালের দৃঢ়তা ধরে রাখতে পারেন না, কেমন যেন ভেঙে পড়তে থাকেন, আমি ফোনে আর কিচ্ছু বলতে পারছি না।

বেঁচে আছে?

এখন পর্যন্ত।

মেয়েটিকে এক ঝলক দেখেছিল।

বিদ্যুচ্চমকের মাঝখানে, যেন মেয়ে নয়, কাঠের ঘর্ষণে প্রজ্বলিত অগ্নি, কিছু বুঝে ওঠার আগেই লণ্ঠন হাতে এগিয়ে এসেছিল বৃদ্ধা, কে?

তার পেছনে ঘুটঘুটে রাত। আর হাওয়া, যাচ্ছেতাই, কর্কশ, এত বালু, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছিল। শহরতলির অজানা খেতে শেয়ালের একটা ডাকের ধাক্কাতেই সে ছিটকে পড়েছে এ বাড়ির দরজায়, ভয় কিংবা ঝড়ের ঝাপটায় নয়, বিদঘুটে একটা স্বর তার টানা শরীরকে ঘা দিয়েছে মাস্তর,

দরজা খুলতেই অগ্নিমুখ

কিংবা বৃদ্ধা।

সে বলে, ভীষণ জ্বর আমার। আজ রাতটা থাকব।

মেয়েটিকে পেছনে ফেলে প্রলম্বিত হয় বৃদ্ধার মুখ, তোমাকে এখানে থাকতে দেয়া হবে, কী করে ভাবছ তুমি?

এত জ্বর, তার দাঁতে দাঁতে ঠোক্কর লাগে, গাছের নিচেই থাকতাম, কিন্তু বৃষ্টির ভয় তাড়িয়ে নিয়ে এলো।

এরপর নীরবতা।

আকাশ দাপিয়ে অন্ধকার বাড়ছে। সেই সঙ্গে তুমুল বাউরি বাতাস। বিদ্যুতের যে বাহার, আস্ত আসমান ভেঙে পড়বে।

আমি কি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব?

মহিলা লণ্ঠন উঁচু করে বলেন, তোমার চেহারা দেখি?

সে মুখ বাড়ালে বৃদ্ধা বিড়বিড় করে, ঘরে আমার জোয়ান মেয়ে রয়েছে।

আমি আপনার জোয়ান মেয়ের কোনো ক্ষতি করব না।

বৃদ্ধার হারিকেনের ছায়া ছত্রাকারে ছড়িয়ে পড়ে, সাথে অন্ধকার, সাথে বিদ্যুচ্চমক, এর মাঝে গুঁড়িগুঁড়ি শুরু হয়েছে। তপ্ত মাটির বন্ধ ধোঁয়ায় কেমন গম্ভীর হয়ে উঠেছে সব।

বৃদ্ধার খোলা চোখে ছিল শকুনের চাউনি।

সে স্তব্ধ দাঁড়িয়ে থাকে।

বৃদ্ধা বলে, না, তোমার মুখে কোনো পাপ নেই, তুমি ভেতরে এসো।

সারাসকাল টানা ঘুম দিয়ে জাহিদ গতরাতের দৃশ্য স্মরণ করে। এ স্বপ্ন নয়, বিভ্রম নয়, সত্যিই সে এ বাড়ির একটি তক্তপোশে শুয়ে আছে।

সারারাত একটি বদ্ধ ঘরের তক্তপোশে শুয়ে ঘুমনোর পর বৃদ্ধা এসে তাকে প্রশ্ন করে, তোমার নাম কী হে ছেলে?

অচেনা পরিবেশে সে রাতভর কেঁচোর মতো নিজের চারপাশে নরোম মাটির চক্র তৈরি করছিল।

চোখ মেলতেই ওপরের কালচে ফাটা ছাদ হা-হা করে ওঠে। গুঁড়ো সিমেন্ট বাতাসের ধাক্কায় তার শরীর খসখসে করে তুলেছে।

সে চোখ খুলে বিভ্রান্ত বোধ করে, অগ্নি ঝলকে কিশোরীমুখ প্রতিভাত হয়েছিল, মুহূর্তে সেই মুখ সরে রূপান্তরিত হয়েছিল বৃদ্ধায়, অথচ রাতে দু মুঠো খেয়ে ঘুমোনো পর্যন্ত প্রেতের

মতো সে বৃদ্ধাকেই চারপাশে ঘুরঘুর করতে দেখেছে— কী যে অমঙ্গল এসেছে গাঁয়ে, তুমি আবার কোন লক্ষণ নিয়ে এসেছ কে জানে ?

রাতে সে কোনো কথা বলে নি। বৃদ্ধা সকালে তার কপালে হাত রেখে বলে, তোমার কপালে তো জ্বর নেই।

জ্বরে আমার কলজে পুড়ে যাচ্ছে, বলে সে বিহ্বল চোখে বৃদ্ধার দিকে তাকায়।

কলজের মধ্যে জ্বর ? বৃদ্ধার চোখে ছায়া নামে, হতেই পারে, সবই তো উল্টাপাল্টা হচ্ছে। তবুও তোমাকে আমার আরেকটু বাজিয়ে নিতে হবে।

বাতাসের ধাক্কায় পোড়ো বাড়িটির ছাদ ভেঙে পড়ার উপক্রম হলে সে দেয়ালের শ্যাওলাগুলো দেখতে থাকে। অপর্যাপ্ত আলোয় ওগুলোকে দেখাচ্ছে খণ্ডবিখণ্ড, বিমূর্ত ছবির মতো।

আমাকে তো বাড়িতে ঢুকিয়েই ফেলেছেন, আর কী বাজাবেন ?

বৃদ্ধা হিম কণ্ঠে ফিসফিস করে বলে, আমি জানতাম তোমার মতো কেউ আসবে, সেটা তুমিই কিনা, সেটাই এখন যাচাই করার বিষয়।

উদ্ভট সব!— ভাবতে ভাবতে তক্তপোশে কুকুর ছানার মতো কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে সে ঘুমিয়ে পড়তে চায়। বৃদ্ধা ছায়া হাত নাড়ে, আমি বাপু তোমার নাম জানতে চেয়েছিলাম।

নাম ? সে যেন এক উদ্ভট প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছে, তারপরও বলতেই হয়, অনেকটা তাচ্ছিল্যের সুরেই বলে, জাহিদ।

বৃদ্ধা প্রশ্ন করে, বাড়ি ?

সে ঊর্ধ্বলোকে ইশারা করলে বৃদ্ধা তার আঙুল প্রদর্শনের সাথে সাথে মাথা নাড়ায়। এক সময় তার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, শূন্যে ?

সে মজা করে মাথা নাড়ে, হ্যাঁ।

তাই তো হওয়ার কথা, কিন্তু জাহিদ , কে রাখল এই নাম ?

আমি নিজেই। এবার সে টান টান হয়ে বসে, একটা নাম ছাড়া মনুষ্য সমাজে চলা যায় ?

খোলা দরজা দিয়ে সকালের শাদা বাতাস ঢোকে। রাতের ভুতুড়ে ছায়ায় বৃদ্ধার মুখটিকে এবড়ো-থেবড়ো দেখাচ্ছিল, মরাটে আলোয় মনে হচ্ছিল সামান্য বাতাসেই হাড়-চামড়া সব খসে পড়বে। ধবল আলোয় সে বিস্মিত হয়ে প্রত্যক্ষ করে বৃদ্ধার শরীর। কী রকম টানটান, যেন কোনো জাদুকর ফুঁ দিয়ে যুবতীর শরীরকে থুত্থুড়ে বৃদ্ধার শরীরে রূপান্তরিত করেছে। শাদা চুল, কপালের ভাঁজ করা চামড়া, চোয়ালের প্রস্ফুটিত হাড় বাদ দিয়ে দেখলে মহিলাকে বৃদ্ধা ভাবার কোনো কারণই নেই। শুধু চোখের নিচেকার গভীর কালি প্রমাণ দেয়, তার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে শত বছরের ঝড়। শক্ত পাথরটির মধ্যে এ জন্য ক্ষয় ধরতে শুরু করেছে।

বৃদ্ধা বলে, তুমি তো সেরে গেছ, এখন নাশতা খেয়ে বিদায় হও।

জাহিদ বলে, আপনিই তো বলেছেন আমার আসার খবর জানতেন, আমি চলে গেলে যদি আপনার অকল্যাণ হয় ?

বৃদ্ধা বিভ্রান্ত বোধ করে, তোমাকে ছেলে ঠিকমতো বুঝতে পারছি না, কী যে করব আমি!

শরীর কিছুটা চাঙ্গা হলে জাহিদ বাইরে বেরোয়। চতুর্পাশে বিশৃঙ্খল গাছের সারি। দেশের কোনো গ্রামে জাহিদ এত বৃক্ষ দেখে নি। ধুম বৃষ্টি হয়েছে রাতে। সন্দেহ হয়, অচিরেই বন্যা এসে গ্রামটাকে না ভাসিয়ে নিয়ে যায়। খেত ডুবে আছে জলে। গর্তের গাদায় পা হড়কে প্যান্টের প্রান্ত ভিজে একশা হয়ে গেছে। পথের পাশের ঝোপের পিঁপড়ে কাঁচা রোদ পেয়ে পিল পিল বেরিয়ে এসেছে। ত্রি-সীমানায় শব্দ নেই। শুধু পাখির টানা শিস, যা ইন্দ্রিয় শিথিল করে তোলে, তখুনি মনে পড়ে বাবাকে, জাহিদ যেন স্মৃতিভ্রষ্ট। এই ভাবে স্মরণ করতে চায় সব, আমি আসলে কাকে খুঁজতে এসেছি? ওই ছিন্নবিচ্ছিন্ন হাত-পা-কাটা মানুষটা কে? তার ঘোলা মাথায় ফরফর ঘোরে ধোঁয়া বাতাস, আমি পাপী! পাপী! কে বলেছিল এই কথা? জাহিদ মাথা ঘোরায়। শূন্য সব।

পাপ! শ্লেষসিক্ত ঠোঁটে হাসে সে। বৃদ্ধার মুখ মনে পড়ে, বড় রহস্যময়! এই গ্রামে কোনো সহজ স্বাভাবিক মানুষের বাস অসম্ভব, চারপাশের বুনোগন্ধময় পরিবেশ দেখে জাহিদের এই বোধ তীব্রতর হয়।

অনেক দূর হেঁটে আলের ওপর বসে পড়ে। কাদায় একাকার কৃষক বিস্মিত চোখ খোলে, এলাকায় নতুন মনে অইতাছে?

জাহিদ সিগ্রেট এগিয়ে দেয়। ফলে ভিখিরির মতন অভিভূত কৃষক কাজ ফেলে তার সামনে এসে বসে, আমরা তো ভাই বিড়ি খাই। আপনে কুন বাড়ির কুটুম?

জাহিদ হাসে, আমি কারো কুটুম নই। শুনলাম এই গ্রামের গোরস্থান থেকে দু' মাথার অজগর উঠে এসেছিল, আমি ওটাকে দেখতে এসেছি।

জাহিদ স্পষ্ট দেখে, মুহূর্তে কৃষকের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে। তার ঠোঁটে জ্বলতে থাকা সিগ্রেট নিচে টাল খেয়ে পড়ে, কাদায় লুটিয়ে পড়া অর্ধেক সিগ্রেটের দিকে হতাশ চোখে চেয়ে সে খেই হারিয়ে ফেলে, সাবদান, এই কতা আর একবার উচ্চারণ কইরেন না। সর্বনাশ অইয়া যাইবো।

সর্বনাশ হলে আমার হবে, আপনার অসুবিধা কী? আচ্ছা, মূল বিষয়টা কি আমাকে একটু খুলে বলবেন? জাহিদ ফের আরেকটা সিগ্রেট তার দিকে এগিয়ে দেয়, আপনি শুধু সত্য ঘটনাটা আমাকে বলবেন, আমি যদি কিছু না জানি, তবে নিজেকে সাবধান করব কীভাবে?

কৃষক ঠিক ভেবে পায় না তার কী বলা উচিত। সে জাহিদের পাশেই জুত মতন হাঁটু গেড়ে বসে, শহর থ্যাইকা আইছেন বুঝছি, তয় বুঝলেন কিনা এইসব বিষয় লইয়া কতা কইতেই বড় ডর লাগে। এই গেরামের আবদুল খালিকের নাম নিচ্চয় হুনছেন?

জাহিদ চুপ করে থাকে।

হেই আবদুল খালিকের বাপেরে চল্লিশ বচ্ছর আগে জোতদাররা খুন করছিল। কয় মাস আগে আবদুল খালিক তার বড় ভাইরে লইয়া গোরস্থানের সামনে গিয়া দেহে, কবর থাইক্যা উইট্যা আইছে ইয়াবড় অজগর, তার দুই মাতা, একমাতার মইধ্যে আবদুল খালিকের মৃত

বাপের মস্তক বহানো। হেই মাতা দেইখ্যা দুই ভাই কী দৌড়! বড় ভাই খালি চিল্লায়, আমি আব্বারে চিনছি, আমি আব্বারে চিনছি।

সেই বড় ভাই এখন কোথায়?

কুতায় আবার? বেহেশ্‌তে। ওই জিনিস দেখলে মানুষ বাঁচে? হেয় উঠানের উপরে আইস্যা গ্যাজলা তুইল্যা মইরা গেলো। আল্লাহর কী কেরামতি দেহেন, এই ঘটনার পরে গেরামে মরণ কলেরা আইলো। কিছু বুজনের আগেই অর্ধেক মানুষ মইরা সাফ। আবদুল খালিক অজগর দেহনের পরেও এত ঝড়ে টিইক্কা রইলো। বুজলেন, পরহেজগার বান্দা। হেয় অহন এই গেরামের পীর।

খাঁ খাঁ প্রান্তরে জাহিদের শূন্যচোখ ঘোরে। অস্ফুট দীর্ঘশ্বাস গলার কাছে এসে আটকে যায়। ভিজে ঘাস কেমন চকমক করছে, প্রখর হচ্ছে সূর্য।

আফনে ক্যাডা?

কৃষকের এই প্রশ্নে সে বলে, আমি? এই গ্রামে নতুন এসেছি।

সিঁড়ি দিয়ে আচ্ছন্নের মতো নামে। রিকশা জ্যামে আটকে পড়লে নিশির অকস্মাৎ মনে হয়, সাজিদুল মরে গেছে, মমতাদির পক্ষে এর চেয়ে অন্যভাবে আর কিছু বলা সম্ভব ছিল না। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই নিকটবর্তী মানুষের কাছে মৃত্যু-সংবাদকে অসুস্থতা হিসেবেই চিহ্নিত করে। আর তা যদি হয়, বুকের কালোশিলা ধকধক করে, আঙুল দিয়ে সে শাড়ির আঁচল উল্টোপাল্টা প্যাঁচাতে থাকে,

তাহলে,

আমি মুক্ত।

একটি প্রাচীন পাথর দীর্ঘদিন মুমূর্ষু আত্মায় চাপ দিয়ে বসেছিল, অবশ হাতের শক্তি ছিল না তা সরায়, আর তাকেই কেউ দীর্ঘজীবন পর ঠেলে ফেলে দিল, হা মুক্ততা! ট্রাফিক জ্যামে শ্বাস নিতে গিয়ে নিশির চোখে জল উপচে আসে।

কিন্তু সেই পাথরের ভেতর কি নিশির সব শক্তি, সব অক্ষমতা জমা হয়েছিল? এখন তবে এই বাতাসে ভেসে ওঠা অস্তিত্ব নিয়ে সে কী করে দাঁড়ায়? সে তো নিশ্চিত জানত, জীবন ঘষটে ঘষটে, ক্ষয়ে ক্ষয়ে সাজিদুল বাঁচবে, অস্থিমাংস সব খসে কঙ্কাল হয়ে গেলেও ওর প্রাণ দপ দপ করবে। ওর প্রাণটির আছে বেঁচে থাকার অসীম ক্ষমতা। এর বাইরে হঠাৎ কী করেই-বা বিপরীত ঘটনা ঘটবে?

মমতাদির সিঁড়িতে অন্ধকার। গোড়ায় দাঁড়িয়ে স্থবির হয়ে ওঠে নিশির পা। কতদিন পর এ বাড়িতে এলো! এ যেন নিশির আগের জন্মের কোনো নিবাস। তার স্তব্ধ করোটিতে সিঁড়ির ওপারে দাঁড়ানো মমতাদির ঠাণ্ডা কণ্ঠ গেঁথে যায়, এসো।

ছোট ছিমছাম বাড়িটির কোনো পরিবর্তন নেই। কেবল দেয়ালে অনেকদিন রঙ পড়ে নি। সেই ফার্নিচার, শুধু কভার পাল্টেছে। ক্যালেন্ডার কাঁপছে বাতাসে। মমতাদির মুখের বলিরেখা প্রবল হয়েছে।

নিশি তার চোখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল চেয়ে থাকে।

ওর অসুখটা তো জানতেই তুমি, মমতাদি শান্ত গলায় শুরু করেন, নিশি অস্থির হয়ে তাকে বাধা দেয়, এখন সে কোথায়?

অনেকদিনের যন্ত্রণা, মমতাদি টেনে টেনে উচ্চারণ করেন, সহ্য করতে না পেরে কাল রাতে বিষ খেয়েছে।

সর্বগ্রাসী তরঙ্গ এসে ক্ষুদ্র ঘরটি থেকে নিশিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। নিশি দেখে, এক আচাভুয়ো প্রাণী এসে বিশাল নখ তাক করে তাকে বলছে, ভণ্ড, স্বার্থপর। সে অবসন্ন দেহে এলিয়ে পড়ে সোফায়। এখনো বেঁচে আছে, তবে সম্ভাবনা খুবই কম।

এই অবস্থায় আপনি বাসায়?

হাসপাতালেই ছিলাম, যেভাবে নল ঢুকিয়ে বের করে, এর চেয়ে হাত-পা কেটে ফেলা কম কষ্টের, সহ্য হচ্ছিল না, চলে এসেছি।

ওর এই রকম পরিণতি হবে জানতাম, সারাজীবন ধরে এই-ই ও নির্মাণ করেছে, নিশি শ্বাস আটকানো স্বরে বলে, সবকিছুর জন্য এত মৃত্যুর মতো গ্লানি হয়!

তুমি এভাবে বলো না, মমতাদি বলেন, পৃথিবীর একজন মানুষও ওর একটি দোষও ক্ষমা করে নি।

কেন? আপনি তো করেছেন।

সবচেয়ে প্রিয় মানুষের ক্ষমাহীনতা কাউকে যখন নর্দমায় ফেলে দেয়, তখন মা-বাবা-আত্মীয় কারুর ক্ষমাই তাকে আর টেনে তুলতে পারে না। এই পৃথিবীতে ওর কে আছে বলো? আমার ক্ষমা ওর ক্ষতিই করেছে, মৃতের মতন বাঁচিয়ে রেখেছে ওকে, নইলে অনেক আগেই মুক্তি পেত।

নিশি ছটফট করে, আমি আর কিছুই ভাবতে পারছি না, চলুন হাসতাপালে যাই। ততক্ষণে রুদ্ধশ্বাস কান্নায় মমতাদি ভিজে উঠেছেন। সোফার ডানায় কনুই ঠেসে তিনি আঁচলে মুখ চেপে ধরেন, কী করে অসুখ ভালো হবে? বুকের ব্যথায় ছটফট করত কিন্তু ওষুধ খেত না, আমিও তার কেউ না, নিজের দম আটকে আসাটাকেই প্রাধান্য দিলাম, ওর মা যদি হতাম, শেষ সংবাদটি জেনে আসার জন্য অপেক্ষা করতাম।

নিশির সামনে আচমকা খুলে যায় অগুনতি পথ, কীরকম আঁকা-বাঁকা, কোনোটা টানা, কোনোটায় গুচ্ছ ঘাস, দূরে পাহাড়, সে চোখ বুজে যে কোনো একটি ধরে ছুটতে থাকে, ছুটতে ছুটতে সমুদ্র, বিহ্বল তাকায় চৌদিকে, তরঙ্গায়িত জল ফেনা বিস্তার করে বলে— ওর যন্ত্রণা ওর কাছে কিচ্ছু ছিল না, ও আত্মার ভারে অসহ্য বেদনার্ত ছিল। নিশি আঁকড়ে ধরে মমতাদির হাত, একবার অন্তত ওকে দেখে আসি?

হাসপাতালের টানা প্যাসেজ ধরে ওরা যখন হাঁটছিল, নিশির মাথায় কিছু খেলছিল না, না আলো, না ছায়া, কেবল প্রাণপণে সাজিদুলের মুখ মনে করবার চেষ্টা করছিল, গলা, গোঁফ পর্যন্ত ভাসে, মাথায় অল্প চুল, কিন্তু হুবহু মনে পড়ে না। এখানে জীবন এবং মৃত্যুর সম্মিলিত গন্ধ, নার্সের টুক টুক হেঁটে যাওয়া, ট্রলিতে রোগীর আহাজারি, নিচের ফুলের বাগানে ঝপাত— ময়লা ফেলে দিল কেউ।

এর মধ্যে বড় মর্মান্তিক হয়ে ওঠে অন্য এক দুশ্চিন্তা, আফজাল যদি ফের ফোন করে?

এখানে সাজিদুলের জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন, নিশির শরীর হিম কাঁপিয়ে রক্তের মধ্যে খেলা করে ডেটল, নলাকৃতির ছুরি ঢুকে যাচ্ছে সাজিদুলের পেটের ভেতর, ভুঁড়ি খুবলে খেয়ে নিচ্ছে বিষ, কিন্তু সাজিদুল আফজালের কে? স্রেফ উটকো রাস্তার লোক, নিশি কাঁপতে থাকে।

ওরা দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়।

ও. টি থেকে ডাক্তারের গম্ভীর কণ্ঠ সশব্দে আছড়ে পড়ে, সম্ভাবনা খুবই কম, এখন পর্যন্ত কিছু বলা যাচ্ছে না, ওর আত্মীয়দের ডাকুন।

মমতাদি বলেন, ডেকেই কী লাভ? ওর তো সেন্স নেই।

ডাক্তারের স্বর কর্কশ হয়ে ওঠে, যে মরতে চায়, তাকে মরতে দেয়াই ভালো। এইসব কাপুরুষ পেসেন্ট দেখলে মাথায় রক্ত চড়ে যায়। কী যে ঝক্কির মধ্যে ফেলেছে, তা আপনারা বুঝবেন না। ওর অবস্থা বিশেষ ভালো বুঝছি না, আত্মীয়রা আসুক।

ক্ষমা করে দিন ওকে, মমতাদির আহত স্বর থর থর কাঁপে, একটু সদয় হোন।

ডাক্তার ঘর্মাক্ত কপাল মুছে ম্লান হেসে বলেন, সদয় না হলে ওর সাথে সাথে আমরাও কি মৃত্যুর সাথে যুদ্ধ করছি না? আপনি ওর কে?

দিদিমা।

ওর আর কেউ নেই?

না।

মমতাদির উচ্চারণের এই দৃঢ়তা নিশিকে অকস্মাৎ ফাঁপা করে তোলে। শূন্য চক্রে চক্কর খায় সমস্ত অস্তিত্ব, তাই তো, ও তো সাজিদুলের কেউ না, স্রেফ পরিচিত, মরণোন্মুখ রোগীকে মানবিক কারণে দেখতে এসেছে। হঠাৎ তার কাছে সবকিছু অর্থহীন হয়ে ওঠে। এই ভাবে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে।

নিশির অবশ দেহ দেয়ালের সাথে ঠেসে যায়, কোনো খবর আসে না।

মমতাদি বলেন, তুমি চলে যাও। তোমার বাসায় অসুবিধে হবে। নিশি খাদ থেকে টেনে তোলে নিজেকে, আমি কি বেরোনোর সময় তালা লাগিয়ে এসেছি? ঘর থেকে বেরোনো পর্যন্ত দৃশ্যটা কিছুতেই মনে পড়ে না। তবে অস্থিমজ্জা কাঁপিয়ে আরেকটা চিন্তা তাকে ঠাণ্ডা করে দেয়, এতক্ষণে নিশ্চয়ই আফজাল চলে এসেছে।

সে কি সিঁড়ির মধ্যে বসে আছে?

জাহিদ... জাহিদ... কোনো সমুদ্রের ওপার থেকে স্রোতের মতো ডাক ভেসে আসে। আচ্ছন্ন জাহিদ কণ্ঠ চেনার চেষ্টা করে, বাবা। হাত-পা-মুণ্ডুহীন বাবার দেহটাকে কাগজের মতো ভাঁজ করে একটা গর্তের মধ্যে পুঁতে ফেলা হলো। মফস্বল শহরের একটা টানা রেললাইন চোখে ভাসে। এরপর ধু-ধু গ্রাম। বৈষ্ণবী, কী করে তোমার জীবন কাটে?

জল খেয়ে, হাওয়া খেয়ে। কী ঝড়! টানা সাতদিন, ভেসে গেল সব। বন্যায় মাচা তৈরি হলো গাছের ডালে। গলা অব্দি জল নিয়ে আচ্ছন্নের মতো জাহিদ দেখেছিল, বৈষ্ণবীর হলুদ পোশাক ভেসে যাচ্ছে।

হাঁড়ি-বাসন, গরু-ছাগল সব ভাসছিল। স্রোত টেনে নিয়ে গেছে দাদার বাড়ির চিরকালের নির্মাণ। মাচার মধ্যে চাপাচাপি। চারদিকে হাঙর জলের হাঁ। কী দারুণ দুর্গন্ধ! অবশ মায়ের স্তন কামড়ে পড়ে থাকা শিশুটি স্রোতের মধ্যে ঢলে পড়তেই শুকনো গলা থেকে এক জীবনের কান্না উঠে এলো।

জাহিদের কম্পিত হাত নিসাড় করে পেঁচিয়ে ধরল সাপ।

এক সময় স্বাভাবিক হলো সব। হেলিকপ্টারে রিলিফ এলো। ক্ষুধা-ক্লান্ত মানুষের সাথে মাঠে দাঁড়িয়ে জাহিদ অবাক হয়ে দেখছিল তার বনবন ডানা।

তুই যদি আমাকে কলাই খেতে দিস, আমি তোকে—

কী দিবি? শুকনো ঠোঁটে প্রশ্ন করেছিল খেদি।

হেলিকপ্টার কিনে দেব।

খেদি বিশ্বাস করে কলাই দিয়েছিল।

এরপর বাতাস খাওয়া, জল খাওয়া, খেদি স্তব্ধ কণ্ঠে বলেছিল, তোর মতো ঠাণ্ডা ছেলে দেখলে ভয় লাগে, তোর চোখ একদম সাপের মতো।

তুই সাপের চোখ দেখেছিস?

তোর মতো মিথ্যুককে বলব কেন? আমার কলাই ফেরত দে।

এরপর অস্পষ্টতা, বাবার প্রখর আত্মদীপ্ত চোখ, ইট-খাওয়া কুকুরের ভোঁ ভোঁ চিৎকার, ভাই-বোন চক্রাকারে ঘোরে, মায়ের জবুথবু ঘুমিয়ে থাকা। নিজেকে সে সেদিনই টের পায়, গ্রামে গিয়ে দেখে খেদির জ্বর, মরে গেল। একটুও কান্না ওঠে নি, একটুও দুঃখ হয় নি। সটান চলে এসেছিল শহরে। শুধু হেলিকপ্টারের জন্য আফসোস হতো। আয়নায় সাপের চোখ খুঁজত।

বাড়ন্ত বয়সে আরেকবার নিজের মুখোমুখি— আমার প্রিয় শিক্ষিকা, জাহিদ বিড়বিড় করে, রোজলিন, তার নিঃশ্বাস ফেলার শব্দেও জাহিদ কেঁপে উঠত। সে জানল তার সব ইন্দ্রিয় কাজ করছে। এরপর—

'ওহে অগ্নি এত ভালো! দাও খেয়ে দেখি।'

সন্ধ্যার ছায়ায় মুখ বাড়ায় কিশোরী।

পেছনে বৃদ্ধা।

আবার গণ্ডগোল লেগে যায়। এই বৃদ্ধাই কি নানা রূপ ধারণ করছে? ঘরের আবহাওয়া এমন, যে-কোনো বুজরুকি বাস্তব বলে মেনে নেয়ার জন্য যথেষ্ট। এই বৃদ্ধার যদি দু'টি ডানা গজায়, সে যদি উড়তে শুরু করে, অথবা জীর্ণ দেয়াল, ফাটা মেঝে, যার মাঝে মাঝে গজিয়েছে গুচ্ছ গুচ্ছ ঘাস, সব মুছে এই ঘর হয়ে ওঠে বাগান বাড়ি, নূপুর পায়ে নাচতে থাকে নর্তকী, কিন্তু অস্বাভাবিক মনে হবে না।

জাহিদ টেনে চোখ খোলে। দেখে, বাস্তবিকই কিশোরী।

স্ফটিক আলোয় কাল এই মুখকে অনির্বচনীয় মনে হয়েছিল। পেছনে ঘুটঘুট করে হেঁটে আসা বৃদ্ধা স্বর নিচু করে বলে, এ-ই আমার মেয়ে। কাল তোমার ভয়ে লুকিয়ে রেখেছিলাম।

জাহিদ বসতেই তক্তপোশ মড়মড় করে ওঠে। খিড়কি দিয়ে আসা এক ফালি ধবধবে সন্ধ্যা ঘরের বদ্ধতাকে শুষে নিয়েছে।

জাহিদ বলে, আজ বের করে আনলেন যে ?

বৃদ্ধা বলে, তোমার চেহারায় যে পাপ নেই, সেটা আমি লণ্ঠনের আলোয় দেখেছিলাম। লণ্ঠনের আলোয় কী বিশ্বাস ? সারারাত ভয়ে কেটেছে। সকালের আলোয় তোমাকে আবার দেখেছি। তোমার কথা শুনেছি। তুমি সাধারণ কেউ নও, তোমার চোখ মানুষের চোখ নয়।

জাহিদ কেঁপে ওঠে, ছেলেবেলায় খেদি বলেছিল, বাড়ন্ত বয়সে রোজলিন, আরো পরে নিশি, রোজলিন অবশ্য অন্য রকম বলেছিল, চুম্বকের মতো, তবে কেন তুমি আটকে গেলে না ? কেন বয়সের বিস্তর ব্যবধান সব হয়ে উঠল ? জাহিদ কত রাত ছটফট করেছে, আজ বৃদ্ধা বলছে, আমার চোখ কিসের মতো, আজ সে জানতে চায় না।

কিশোরীর মুখ মৃতের মতো ঠাণ্ডা। রাতের কারসাজিতে তাকে যতটা অসামান্য মনে হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি সাধারণ সে, কেবল শাদা চামড়ার তুলনায় ভেতরে রক্ত নেই এখন এটাই প্রকট হয়ে উঠেছে। ওর চোখও অস্বাভাবিক শান্ত। এ বাড়ির কিশোরীর আচরণ বৃদ্ধার মতো, বরং বৃদ্ধাটিই ছেলেমানুষী চাঞ্চল্যে সারাক্ষণ অস্থির থাকে।

তোমার নাম কী ?

জাহিদের এই প্রশ্নে তার মধ্যে ভাবান্তর হয় না। সে নিষ্পলক দাঁড়িয়ে থাকে। বৃদ্ধা মেয়েটির থুতনিতে স্নেহের টুসকি মেরে বলে, যাও সোনা, ভেতরে যাও, বারান্দায় রাজ্যির বিড়াল এসেছে, দেখ গিয়ে ওরা মাটি খুঁড়ে তাবিজগুলো বের করে ফেলেছে কি না!

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকা শীতল মেয়েটি বেরিয়ে গেলে বৃদ্ধা বলে, ওর নাম হীরা, জন্মের পর সে স্ফটিক খণ্ডের মতোই ঝলমল করছিল।

নিঃশ্বাস টানতে গিয়ে বৃদ্ধার আঁচল সরে যায়, উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে প্রস্তরীভূত কুচযুগল।

হীরা কথা বলতে পারে না ?

বৃদ্ধা আঁচল টানে, পারে। তবে নিয়তি ওর স্বর কেড়ে নিয়েছে। আমার সাথে যা দু একটা কথা বলে।

কঠিন কোনো অসুখ হয়েছিল ?

বৃদ্ধা জাহিদের অনেক কাছে মুখ এনে বলে, বাড়ির চারপাশে তাবিজ পুঁতেছি। বজ্জাত বিড়ালগুলো খুঁড়ে ফেলে, সব বলব তোমাকে, কখন কে শুনে ফেলে!

আপনার আর কোনো সন্তান নেই ?

সব মরেটরে একমাত্র ও-ই টিকে আছে। কোন্দিন সটকে পড়ে, তাই মুঠোর মধ্যে রাখি। এই যে আমার বুক দেখছ, ধকফক করে, ওর মধ্যে একটা বাক্স আছে, তার মধ্যে ভ্রমর, ওই ভ্রমরের ভেতর ওর বাস। ও না থাকলে শকুনের আয়ু নিয়ে কী করব ?

জাহিদ এভাবে কোনোদিন কোনোকিছু অনুভব করে নি। সে যখন মফস্বল থেকে বি.এ পাশ করে এম.এ-র জন্য ঢাকার হোস্টেলে এসে উঠেছে, তখনই খবর আসে, চলন্ত ট্রেন থেকে একটা বাস ধরার জন্য লাফিয়ে নিচে নামতে গিয়ে তার বাবা মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। সেদিন সন্ধ্যায় তুমুল ঝড়। সে হোস্টেলের বারান্দায় বসে বাতাসের আকাশ-চেরা চিৎকার দেখেছে। কারেন্ট চলে যাওয়ায় পুরো পরিস্থিতি হয়ে উঠেছে বিভীষিকাময়। সে বিদ্যাসাগরের নদী সাঁতরে মার কাছে যাওয়ার গল্প পড়েছে।

ঝড় থামলে ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে সে যখন বাসস্ট্যান্ডের দিকে যাচ্ছে, তখন তার মনে পড়ছে একটিই ঘটনা, এক সন্ধ্যায় মা উপুড় হয়ে কাঁদছেন, বাবা একটি চেয়ারে স্থির বসে থেকে বলছেন, আমি কত বেতন পাই, তুমি জানো?

না।

স্ত্রী হিসাবে এইটা জানা তোমার দায়িত্ব ছিল না?

তুমি আমারে কোনোদিন জানাও নাই।

তোমারও আগ্রহ ছিল না। একজন সরকারি কর্মচারী কত টাকা বেতন পাইতে পারে এইটুকু ধারণা না নিয়াই তুমি ছেলেমেয়ে মানুষ করার দায়িত্ব মাথায় নিছো, তাদেরকে জন্ম দিছো।

তাই বলে তুমি ডাকাতি করবা? আমি তোমার সাথে একখাটে ঘুমায়া জানতে পারবো না, বছরের পর বছর সব জমি বিক্রি কইরা আজ তুমি নিঃস্ব হয়া গেছো? বাড়ির জমির কথা বাদ দিলাম, বাসার পাশের অমন তাজা মাঠটা, আমার বাচ্চারা খেলতো, দেখলে বুকে কত বল পাইতাম, আজ ওইটাতে অন্যলোক বাড়ি ওঠানোর জন্য মাপ-জোক করতাছে তা দেইখা তবে আমারে জানতে হবে, তুমি এইটাও বিক্রি কইরা দিছো?

বাবার গলার স্বর তেমনই দৃঢ়, আমি ওসব বিক্রি কইরা বেতনের সাথে জোড়া লাগায়া সংসার চালাইতেছি, আমার এখন মনে হইতেছে, তুমি ভাবতা আমি ছয়-পাঁচ আনা ঘুস খায়া এ সংসার চালাইতেছি! এতে তুমি কোনো অপরাধও দেখতা না। এ জন্যই জানতে চাইতা না একজন সরকারি কেরানির কত আয় হয়।

বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে যখন জাহিদ পৌঁছায়, তখন অনেক রাত। ঝড় থামার পর তার ঘড়ির হিসেব ছিল না। নিয়ন লাইটের ছায়ায় চারপাশ ঠাণ্ডা হয়ে আছে। বৃষ্টির জলে সব ধুয়েমুছে ঝক ঝক করছে শহর। বাড়ি যাওয়ার শেষ বাসটিও চলে গেছে জেনে সে শিথিল ব্যাগটি হাতে পেঁচিয়ে খাঁ-খাঁ শহর ধরে হাঁটে, ভেজা বাতাসের ঝাপটায় মাঝেমধ্যেই কুঁকড়ে উঠছে শার্ট। বিশাল রাজপথের নির্জন সৌন্দর্য সেদিনই প্রথম সে অবলোকন করে।

অনেক রাত অব্দি বসে ছিল ফুটপাতে। ভেতরের ঠেলে-ওঠা যন্ত্রণা সামলাতে নয়, বরং তার ভেতরে কোনো বোধ কাজ করছিল না, তা-ই তাকে অস্বস্তিতে ফেলেছিল। কী রকম নেশা নেশা ঘোর। বসে থাকতে ভালো লাগছিল।

টহলরত পুলিশ তাকে প্রশ্ন করে, উদ্দেশ্য কী?

সে বলেছিল, আমার বাবা মারা গেছে।

পুলিশ তার কাঁধে সহকর্মীর মতো হাত রেখেছিল, আহা, বড্ড দুঃখজনক, ফুটপাতে না বসে থেকে তার দাফন-কাফন করুন গিয়ে।

বাস চলে গেছে, বলে সে পুলিশের বেষ্টন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ভাবলেশহীন হাঁটতে থাকলে পেছনে শুনেছিল উচ্চকিত কণ্ঠ, নিজেকে শক্ত রাখুন।

হোস্টেলে সহপাঠীদের কাউকে সে কিচ্ছু না বলে বিছানায় শুয়ে টানা ঘুম দিয়েছিল।

পরদিন আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করেছিল তার বাড়ি যাওয়ার সব ইচ্ছে মরে গেছে। বাবার খণ্ডিত দেহ দেখতে যাওয়ার কোনোই মানসিক প্রস্তুতি তার নেই। সে এইসব বিপর্যয়, দায়িত্ব সবকিছু থেকে নিজেকে সরানোর জন্য এমন কিছু করতে চাইছিল, যা তাকে একটুখানি স্বস্তি দিতে পারে।

নিশিকে মনে পড়ে তখনই। সে শুনেছে কোনো এক ব্যাংক কর্মচারীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। বন্ধুদের কাছ থেকে কয়েন সংগ্রহ করে সে সারাদিন রাস্তায় ঘুরে বিরক্তিকর লাইনে দাঁড়িয়ে সেই ব্যাংকের বিভিন্ন ব্রাঞ্চে ফোন করেছে। অসুবিধে ছিল একটাই— ওর স্বামীর নামটা সঠিকভাবে মনে করতে পারছিল না। ধারণার ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন ব্রাঞ্চে ফোন করতে করতে এক সময় সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। দুপুর গড়ালে ঘামজর্জর হয়ে রিকশাঅলাদের সাথে ফুটপাতে বসে ডাল-ভাত খায়। তার কোনো দুশ্চিন্তা হচ্ছে না, কষ্ট হচ্ছে না— এই ব্যাপারটাই তাকে সবচেয়ে বেশি বিপন্ন করে তুলেছিল। হঠাৎ জুবায়েরকে মনে পড়ে, সে-ই বলেছিল নিউমার্কেটে নিশির সাথে দেখা হয়েছিল তার।

সিঁড়ি টপকে ওর দশতলা অফিসে গিয়ে দেখে জুবায়ের অনেক চৌকশ হয়েছে। তাকে দেখেই সে বলে, তুই! ঢাকায় কবে থেকে?

এইসব করে করে নিশি— জুবায়ের বলে, সে তো অনেকদিন আগে দেখা হয়েছিল, আমি বলেছি তুই বাড়ি থাকিস না, টানা ডুব দিস এখানে-ওখানে, আমার সাথেই এক যুগ পর পর দেখা দিস— এরপর জুবায়ের নোটবই হাতড়ে নিশির ঠিকানা দেয়, তা এতদিন পর ওকে খুঁজছিস? তোকে সত্যিই বুঝলাম না দোস্ত, যা হোক, ফুটপাতে উঠেছিস নিশ্চয়ই। না, টিটকিরি দিচ্ছি না, তোর যা স্বভাব এর চেয়ে ভালো করে আর ভাবতে পারছি না, আমার বাসায় আয়, টেনে আড্ডা দেয়া যাবে।

টানা বিকেল কেটে যায় বাড়ি খুঁজতে খুঁজতে।

নিশির চমকে যাওয়া রক্তবর্ণ মুখ দেখার উত্তেজনায় জাহিদ বারংবার অসংলগ্ন হতে থাকে। শেষে কাঙ্ক্ষিত নাম্বারের সামনে গিয়ে সে স্থবির হয়ে যায়। ঠাণ্ডা হাত বেল চেপে ধরে। ভেতর থেকে একজন গলা বাড়িয়ে জানায়, ওরা দু'মাস আগে এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।

বৃদ্ধার ঘরে রাত নেমে এসেছে। থেমে থেমে চিৎকার দিচ্ছে শেয়াল, বৃদ্ধা বলে, দেখছ না সলতেটা নিভু নিভু, তেল ফুরিয়ে গেছে।

এরপর কী হবে?

হাপুস-হুপুস ভাত খেয়ে ঘুমিয়ে থাকব।

এভাবেই চলছে?

এ-ভাবেই।

আপনার স্বামী মরেছেন কবে?

ওপার থেকে চলে আসার ক'মাস পরেই। হীরার তখন জন্ম হয় নি।

ওপারেই বুঝি মূল বাড়ি?

হ্যাঁ। কেন যে এখানে এলাম! এসে আর যেতে পারলাম না, এ গাঁয়ের সাথে গেঁথে গেলাম।

আপনাদের চলছে কীভাবে?

এই বাড়িটা আমার চাচা শ্বশুরের। তার কেউ ছিল না। মরার সময় দিয়ে গেছেন। চলার কথা বলছ? শিল্পীদের জীবনে যা হয়, চলছে সামান্য দামে শিল্পকর্ম বেচে। মাঝেমধ্যে অর্ডারিও করি।

শিল্পকর্ম?

আমরা মা-মেয়ে দুজনই শিল্পী। সুচের কাজ করি। ওপারে থাকতে স্বামীর সাথে ঘুরে আর্ট একজিবিশন দেখেছি। ছ'মাস খেটে আমরাও ঘরের দেয়ালে ছবির পর ছবি সেঁটে একবার প্রদর্শনী করেছিলাম। কত কাজ— গ্রাম, প্রকৃতি, হরিণ, মানুষ! ওই যে পাড়ার সন্দীপন, ও খুব স্লোগান-ট্লোগান দিয়ে লোকজন ডেকে এনেছিল। সবাই দেখে গেছে। সুন্দর বলেছে, তবে কেউ কেনে নি। এর মধ্যে এনজিও-র লোকেরা খবর পেয়ে কাজ দেখে অবাক। বলে, আপনারা করেছেন? এরপর চাপা হাসি, এসবের বুঝি প্রদর্শনী হয়? আমি ওদের হাসিকে পাত্তা দিই নি। তো ওরা বলল আমাদের অর্ডারি করবেন? এরপর একটা পুরো চাদরে কাজ করে দেয়ার মজুরি পঞ্চাশ দেবে বলল। আমি রাজি হই নি। এখন পেটের দায়ে গাঁয়ের মা-বৌদের শাড়ি, কুশন এইসবে মাঝেমধ্যে নকশা-টকশা করি। সন্দীপন বলেছে, শিল্পী মরলে শিল্পকর্মের কদর হয়। ও-ই মাঝেমধ্যে শহরে গেলে আমাদের কাজ দোকানে দিয়ে আসে।

হারিকেনের তেল কেনার জন্য জাহিদ সন্ধ্যায় শহরতলিতে বেরোয়। এমন মরাটে গ্রাম জাহিদ এই জন্মে দেখে নি। সারা গ্রামে দু তিনটে মাত্র মুদির দোকান। তা-ও অধিকাংশ জিনিসই কিনতে পাওয়া যায় না। সন্ধ্যার পর শেয়াল ছাড়া সব মরে যায়। আজকাল দূর অজ পাড়া গাঁয়ে যেখানে ভি.সি.আর কারেন্ট বাতি সব চলে গেছে, সেখানে শহরের কাছে থেকেও এই গ্রামকে জন-বিচ্ছিন্ন দ্বীপ মনে হয়। আগে থেকেই এই গ্রাম কুসংস্কারে পূর্ণ ছিল। ইমাম, মৌলবিদের প্রভাবে গ্রামে বাংলা শিক্ষা খুব একটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। সেই দু'মাথা অজগর দর্শনের পর থেকে গাঁয়ের এই দশা আরো মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। মানুষজন ধর্মভীরু হয়ে উঠেছে। প্রথম দিকে সরকারি কর্মকর্তারা সরেজমিনে তদন্ত করে পুরো বিষয়টিকে ভুয়ো বলায় গ্রামের লোকজন ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের ওপর চড়াও হয়েছিল। ওদের অবিশ্বাস উচ্চারণের কারণেই নাকি পরে গ্রাম জুড়ে মরণ কলেরা এসেছিল। এরপর থেকে শহরের লোকজনকে এরা সন্দেহের চোখে দেখে।

এনজিও-র অফিস খোলার পরিকল্পনা চলছিল। তারা গাঁয়ের লোকজনকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করছিল, আবদুল আলীমের অলৌকিক মৃত্যুই সব নয়, সে হিস্টিরিয়া রোগে ভুগছিল। উল্টোপাল্টা দেখা তার পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু নয়।

কিন্তু সেই সাপের গায়ের গন্ধ? টের পাচ্ছেন না দক্ষিণের গোরস্থান থেকে কী রকম আজগুবি গন্ধ আসছে? এই গাঁয়ে আগে এই গন্ধ আসত না।

কোথায় গন্ধ ? তারা নিঃশ্বাস টেনে সন্দেহ পোষণ করেছিল, আমরা তো পাচ্ছি না।

আপনারা আমাদের সাহায্যে কবর খুড়ুন, দেখুন—।

এরপর গ্রামের লোকজন জোটবদ্ধ হয়ে ইট-পাটকেল ছুঁড়ে তাদেরকেও তাড়িয়েছে।

এ-সবই জাহিদ সন্দীপনের মুখ থেকে শোনে।

অন্ধকার মুদির দোকানে বসে সে বিড়ি ফুঁকছিল। তেল-ভরা শিশিটা এগিয়ে দিলে তামাটে রঙের ছেলেটির চোখে অদ্ভুত বিনয় লক্ষ্য করে জাহিদ। সে যখন দাম দিতে চাইল গলার স্বর টান টান করে সন্দীপন বলল, দাম দেওন লাগবো না।

কী আশ্চর্য! এ গাঁয়ে বিনে পয়সায় বেচাকেনা হয় ?

দিনে গেছিলাম, হীরার মুখে আপনার কথা হুনছি।

তুমি সন্দীপন ?

ছেলেটি মাথা নামায়, ওর অনেক ক্ষতি হইছে, আপনে ওই বাড়ি ছাইড়া দেন।

বিশ্বাস কর, আমি ক্ষতি করতে আসি নি। তুমি যেভাবে খুশি আমাকে শপথ করাতে পার, কিন্তু আমি আশ্চর্য হচ্ছি, হীরা তোমাকে আমার কথা বলেছে শুনে ও-তো কথাই বলে না!

আপনে কোরান ছুঁইবেন ?

কেন ?

ওই যে ওগোর কুনো ক্ষতি করবেন না ?

ছোঁব।

ছেলেটি ঝাঁপি নামিয়ে লুঙ্গির গিঁট ভালো করে এঁটে অন্ধকার রাস্তায় নামে। কিছুদূরে মাটির একটা টিলা। ওটার ওপর বসে সে বিড়ি এগিয়ে দেয়।

জাহিদ দীর্ঘদিন পর অন্য স্বাদ পায়।

ধু ধু গ্রামে একটানা ঝিঁঝির ডাক, দূর থেকে ভেসে আসছে দোতারার মিহি শব্দ। বনপল্লবে ঢেউ লেগেছে। নিচে মোষ-কালো রাত কিন্তু দূর আকাশের অক্ষরেখায় আশ্চর্য শাদা ছায়া।

সন্দীপন, গোরস্থানের গন্ধ তুমি পাও ?

সন্দীপন বলে, আমি ভিন্ন ধর্মের মানুষ।

কথা তো ধর্ম নিয়ে হচ্ছে না, দুই মাথার অজগর, বিশ্বাস কর ?

সন্দীপন আর্তচিৎকার করে থামিয়ে দেয় ওকে, চুপ! কেউ হুনলে শেষ হয়া যাইবেন।

নিশ্চুপ জাহিদ শূন্য গ্রামের দিকে চেয়ে থাকে। ঘরের বদ্ধতা থেকে বেরিয়ে গ্রামের বিস্তৃত আসমান, বিস্তৃত রাতের প্রহরে টিলার ওপরে বসে জীবনকে দেখা এই প্রথম। তার মধ্যে অদ্ভুত এক বোধ কাজ করে, সে অনুভব করে, দক্ষিণের গোরস্থান থেকে উঠে আসছে শব্দ, সারা চরাচর নিথর করে দিয়ে বাজছে শিঙার মর্মবিদারী ফুঁ। জাহিদ দেখে, সব ঢেকে যাচ্ছে, মূর্ত হয়ে উঠছে রোজলিনের মুখ। এ ঠিক মুখ নয়, মুখের অবয়ব, মানুষ যার চেহারা ভুলে যায় তার যন্ত্রণা প্রাণের মধ্যে এমন মর্মান্তিক জীবন্ত থাকে কী করে ?

সন্দীপন প্রশ্ন করে, আপনি কে?

সে নিরুত্তর।

মাসিমার বুকের মইধ্যে এত তাড়াতাড়ি ঢুইক্যা গেলেন? মহিলা বড় সরল আর এইডাই আমার ডর, সন্দীপন বলে, এখন কন্ আপনে এই গেরামে কেন আইছেন?

দু'মাথা অজগর দেখব।

মাথা খারাপ আপনের? এই কতা এই গেরামের অন্য কারো সামনে কইলে, মাতাডা দুই টুকরা কইরা ফালাইবো, বলতে বলতে সন্দীপন বিড়ির শেষ টুকরো ধানী জমির নিঃসীমের দিকে ছুঁড়ে দেয়, লুঙ্গি মালকোচা করে সুস্থির মতন বসে বলে, আপনে এক কাম করেন, এই গেরামের অবস্থা তো হুনছেন, দুইদিনেই আপনের মতন মানুষের খবর হয়া যাইবো। আপনে গেরামের মানুষজনরে কইবেন আপনে হীরার মামা, কোইলকাত্তা থাইক্যা আইছেন। আর দুইমাথা অজগর বা অন্য কোনো উল্টাপাল্টা কিছু নিয়া মুখ খুলবেন না।

ছেলেটির সরলতায় মুগ্ধ জাহিদ হাসতে হাসতে বলে, তার মানে তুমি আমার উদ্দেশ্য না জেনেই আমাকে এ গাঁয়ে থাকার অনুমতি দিচ্ছ?

সন্দীপন চুপ হয়ে যায়।

কোরান ছুঁইয়ে শপথ না করিয়েই?

সন্দীপন বলে, আপনি ছুঁইতে চাইছেন, এই দিয়াই আমার বিশ্বাস হইলো। যদি ভঙ্গ করেন, তাইলে মানতে অইবো আপনের মাতার উপরে ভগমান নাই। তাইলে আপনে ছুঁইয়াও তা ভঙ্গ করতে পারবেন। ওগোর বাড়িতে একজন বিশ্বাসী পুরুষ বড় দরকার। আমরা ভিন্নজাত, কিছু করতে গেলে নানা কতা অয়—

আমি এখানে স্থায়ীভাবে থাকব, তা কী করে ভাবছ তুমি?

যে কয়দিন থাকলেন... আমরা তো একদিন কইরাই বাঁচি, সন্দীপন বলে, কাইল কী হইবো, তার কী জানি আমরা?

রাতে বিছানায় শুয়ে আফজাল বলে, বিশ্বাস কর নিশি, আমি তোমাকে আর চিনতে পারছি না।

চারপাশে পর্দা টেনে নিশি খাটের তলায়, ওয়ারড্রোবের পেছনে এ্যারোসল স্প্রে করে। বাতি নেভানোর জন্য সুইচে হাত দিলে আফজাল বলে, তোমার নীরবতা কিন্তু সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

নিশি আর বাতি নেভায় না। নিঃশব্দে খাটের কিনারে এসে বসে, তুমি সারাদিন কী কর, কোথায় যাও, আমি জানতে চাই? আমার নিজস্ব একটি দিনও কি থাকতে পারে না তোমার হিসেবের বাইরে? আফজাল বলে, তুমি যদি এভাবে বলো তাহলেই সব ঘোলাটে হয়ে ওঠে। সরলতার কোনো বিকল্প নেই নিশি। আমি ব্যাংকে কাজ করি। আমার সময়ের হিসেবও তোমার জানা। তুমি নিজেই তোমার আচরণ বিশ্লেষণ করে দেখ, আমি বারবার ফোন করছি, তুমি রিসিভ করছ না, কেমন দুশ্চিন্তা হয়। তারপর বাসায় এসে দেখি তালা।

সন্ধ্যা গড়িয়ে যাচ্ছে, পাশের বাসার ভাবির বাসায় বোকার মতো বসে আছি, এরপর ফিরলে বিধ্বস্ত হয়ে। বারবার জানতে চাইছি, কী হয়েছে, কোথায় গিয়েছ, কিছুই বলছ না। এখন এমন একটা উত্তর দিলে...!

তুমি ফোন করেছিলে কেন ? নিশি ঠাণ্ডা গলায় জানতে চায়, কলেজ থেকে ফেরার পর তোমার সাথে কথা হয় নি ? তুমি কেন বারবার ফোন করে আমি বাসায় আছি কী-না যাচাই কর ?

উত্তেজনায় উঠে বসে আফজাল, বারবার করি ? সে যদি করতাম আর তোমার মধ্যে যদি শুদ্ধতা থাকত, তুমি সুখী হতে। কিন্তু আমি তা করি না। কী কারণে আজ তোমার কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছে, তুমিই জানো। তুমি উল্টো বলছ। প্রথমবার ফোন করে তোমাকে অসুস্থ মনে হলো। দ্বিতীয়বার ফোন করে আমি খোঁজ নিতে পারি না ?

নিশি টের পায় সে নিজের সারা অস্তিত্বে ছেড়ে দিচ্ছে অদৃশ্য ঘুণপোকা। এত দিনের নির্মিত ভাস্কর্যে সে অন্ধ ছেনি চালাচ্ছে। কী রকম ভূমি সরে যাচ্ছে, ছায়া উর্ণনাভ জাল বিস্তার করছে, সাজিদুলের পাকস্থলীর বিষ অকস্মাৎ তার রক্তে প্রবেশ করে। নিশি কুঁকড়ে ওঠে, চকিতে বাতি নিভিয়ে অন্ধকারে সে ফুঁপিয়ে ওঠে।

আফজাল সবুজ আলো জ্বেলে বড় বিচলিত বোধ করে। নিশির কাঁধে হাত রেখে বলে, কী হয়েছে ? আচ্ছা, আমি যদি ঠিক এই আচরণ করতাম, তোমার কেমন লাগত ?

নিশি বলে, বাবার বাসায় গিয়েছিলাম। রিনির বড় জ্বর।

আফজালের শিথিল হাত কঠিন হয়ে আসে, এই সহজ ব্যাপারটা নিয়ে তুমি এত নাটক করলে ? নিশির মনে হয়, সে কোনো নিষিদ্ধ কোনো ভয়াবহ কিছুর প্রত্যাশা করেছিল, ফলে হতাশ হয়েছে। সে মাথা তুলে বলে, রিনির জ্বর, এটা সহজ ব্যাপার ?

তুমি কখনোই যুক্তির আসল সূত্র ধরতে পার না। তুমি তোমার বাবার বাসায় ছিলে এটা বললেই তো ঝামেলা চুকে যেত। অথচ আমাকে অপবাদ দাও, আমি যুক্তি বুঝি না। এই যে এখন তুমি বাবার বাসায় গিয়েছিলে বলছ, আমার কাছে অবিশ্বাস্য লাগছে। রিনির জ্বর তুমি আমাকে ফোনে জানাতে পারতে। আমারও সেখানে যাওয়াটা দায়িত্ব ছিল।

ফোন পেয়ে এত অস্থির লাগছিল, তোমাকে চেষ্টা করেছি। এনগেজড্ পাচ্ছিলাম, আর ধৈর্য হয় নি।

এসে কথাটা সহজভাবে বললে না কেন ?

নিজেকে একটু দেখলাম, দেখলাম কাউকে কিছু না বলে কোথাও যাওয়ার স্বাধীনতা আমার আছে কি-না।

আফজাল হাসে, ভালো যুক্তি দিয়েছ। কাল রাতে এজন্যই ওসব বলেছিলাম, এখন নিজেকে বিশ্লেষণ করে দেখ, বোনের জ্বরের সংবাদে অস্থির হয়ে ঘর থেকে বেরিয়েছ, নাক-মুখ ফুলিয়ে তার চিন্তায় কাঁদছ। তার এই অবস্থায় তোমার নিজের স্বাধীনতা আছে কি না দেখার সাধ হয়েছিল ?

তোমার কী অন্যকিছু মনে হচ্ছে ?

আফজাল তীক্ষ্ণ চোখে নিশির দিকে তাকায়, না। আমার কিচ্ছু মনে হচ্ছে না।

কী মনে হচ্ছে, আমি কারো সাথে ডেটিং করতে গিয়েছিলাম ?

আমার কিছুই মনে হচ্ছে না, আফজাল বালিশ ঠিক করতে করতে বলে, আমি এখন ঘুমুবো। তোমার এইসব হাবিজাবি নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় আমার নেই।

দেখ, তাই যদি হতো তবে আমি সচেতন থাকতাম, তুমি তো খুব যুক্তিবান লোক, তুমিই বিষয়টা চিন্তা কর। আমি ফিরে এসে তোমাকে একটা কিছু বানিয়ে বলতে পারতাম, নিশির গলা ভিজে ওঠে, আমার একদিনের কোনো আচরণও কি অস্বাভাবিক হতে পারে না ?

রাতের বিছানায় এলিয়ে যেতে যেতে ঘুমগ্রস্ত আফজাল বলে, পুরো বিষয়টাকে প্রথম থেকে তুমিই জটিল করে তুলেছ, যা হোক...।

এরই মধ্যে জানালা কাঁপিয়ে বৃষ্টি শুরু হয়। জল নয়, সারসার রক্তের নহর দূর পাহাড়ের পথে এগিয়ে যাচ্ছে, নিশি দেখে, কী রংবাজ জল, কেমন ফুলে-ফেঁপে উঠছে। তার খণ্ডপ্রাণ ধুক ধুক করে লাফায়। সে ঘরের জলে যেন-বা কানকোহীন মাছ। ভুস করে ভেসে উঠতে চায়। নিঃশব্দে দরজা খুলে বারান্দায় যায়, না, জলের উগ্র উল্লম্ফন নেই, কী সুশৃঙ্খল পতন, যেন ইউনিফর্ম্-পরা মেয়েরা প্যারেড করছে।

ডাক্তার বলেছেন, ওর পেটের বিষ যথাসাধ্য পরিষ্কার করা হয়েছে, সেন্স যেহেতু ফেরে নি সেহেতু চব্বিশ ঘণ্টার আগে কিছু বলা যাচ্ছে না। চব্বিশ ঘণ্টা হতে আর কত সময় বাকি ?

গতরাত তিনটায় ও বিষ খেয়েছে।

আঙুলের করে ঘন্টা গোনে নিশি। এরপর বৃষ্টিময় শহরের মুখোমুখি নিজেকে কঠিনভাবে দাঁড় করায়, আসলে আমি কী চাইছি ? চাইছি কি সাজিদুলের মৃত্যু হোক ? কেন নিজের সাথে ভান করছি ? হাসপাতালের দেয়ালে হেলান দিয়ে সেই যে আমার মৃত্যুময় অস্থিরতা, এ কি ডাক্তারের উদ্ভাসিত মুখ দেখার জন্য ? কিন্তু এই পৃথিবীতে সাজিদুল নেই, চূড়ান্ত পতন তাকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে গেছে, সেই মৃত্যুকে আমি স্বস্তিকরই-বা ভাবছি কেন ?

আমাকে বিশ্বাস করতে হবে, সে বিষ খেয়েছে ? এ শুধুই দেহের যন্ত্রণা সে সহ্য করতে পারছিল না বলে ?

বৃষ্টির ছাট নিশির মুখ ভিজিয়ে তোলে। সে দেখে করুণ জল কণাগুলো রাস্তার বাতি চুইয়ে নিচের দিকে পড়ছে, আলো হয়ে উঠেছে বিষাদগ্রস্ত। সাজিদুল আমার বিবেক, প্রায়ই সে যাত্রার মঞ্চ ফুঁড়ে উদাস গান গেয়ে ওঠে। আমি জানি ও অপরাধী, জেল-খাটা লোক, কিন্তু আমিও তো সেই অপরাধের সুযোগ নিয়েছি। সাধারণভাবে ওর ব্যাপারে সবাই আমার পক্ষে ছিল, ওর জীবন থেকে সরে আসার জন্য এ-ও আমার জন্য অনেক সহায়ক হয়েছিল। ওর একটি অপরাধও কেউ ক্ষমা করে নি— এ্যাদ্দিন পর মমতাদির ভেতর থেকে উত্থিত উচ্চারণের কী উত্তর দেব আমি ? ঠিক আছে, ক্ষমা করতে আমি বাধ্য নই, তবে আমি নিশ্চয়ই তার মৃত্যু চাইতে পারি না ? সেতো কোনোদিন এক মুহূর্তের জন্য আমার সুখের পথ রুদ্ধ করতে সামনে এসে দাঁড়ায় নি।

নিশি অনুভব করে, ওর এই শক্তিই প্রতিটা মুহূর্ত তার মাথাকে অবনত রেখেছে। একজন অপরাধীর এইরকম অকৃত্রিম উদারতা নিশিকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছে। জেল থেকে ফিরে সে যদি নিশির পায়ের কাছে আছড়ে পড়ত, তবে তাকে ভোলা নিশির পক্ষে অনেক সহজ হতো।

আজ আফজালকে কী সুনিপুণ যুক্তিতে মিথ্যে কথা বললাম, আমি জানি এও আমার আরেক বিপর্যয়ের সূচনার লক্ষণ। সাজিদুল যদি আমার জীবনে মৃতই, তবে এতকাল পর তার জন্য আমি আমার অস্তিত্বকে বিপজ্জনক করে তুলছি কেন?

আমি এখনো এতটা দক্ষ হতে পারি নি, এজন্যই ঘরে ফেরার সময়ও কোনো প্রস্তুতি তৈরি করা হয়ে ওঠে নি। প্রথমে বোকার মতো ধরা খেয়েছি। শেষে নিজেকে বাঁচানোর জন্য জগাখিচুড়ি যা-তা একটা জোড়াতালি লাগিয়েছি। আমাকে ক্ষমা করার জন্য যদি আফজাল বাধ্য না থাকে? ওকে যদি জীবনের সবকিছু বলা যেত? এ এক হাস্যকর স্বপ্ন, এছাড়া সাজিদুলের নামেই যে ওর অস্থিমজ্জায় বিষ ছড়াতে শুরু করে। ওর ভাষা লোপ পায়। ঘৃণ্য মুখে শুধু একটি শব্দই উচ্চারণ করে, চোর। অথচ তার সম্পর্কে তেমন কিছু জানে না সে, জানে, আমার সাথে তার বিয়ের কথা হয়েছিল, সেই ক'টা দিনই আমরা পরস্পরকে জানার চেষ্টা করেছি, এরপরই সে—।

হে বৃষ্টিপাতময় ঘর—

আমি এখন কোথায় গিয়ে দাঁড়াব?

সাজিদুল বেঁচে আছে কী না জানার আগেই সবেগে নিশি মালিবাগের দিকে ছোটে। ভোরবেলা আফজালের অফিস। যাওয়ার আগে বলল, তুমি ফোনে রিনির অবস্থা জানিও, ছুটি হওয়ার পর আমি যাব।

রাতভোর বৃষ্টির সমস্ত কোমলতা গিলে ফেলেছে পাকতে-থাকা কটকটে রোদ। হুড উঠিয়ে নিশি নিষ্কম্প চোখে রিকশাঅলার এঁকেবেঁকে চলা আর তার ঘাম জবজবে চর্মসার শরীরের সঞ্চালন দেখে।

মৌচাকে প্রচণ্ড ভিড়। বুকের অস্থির উল্লম্ফন বাড়ছে। শুকিয়ে আসছে ঠোঁট জোড়া। এই শহরের ঘন কোলাহল মাঝেমধ্যেই ওর শ্বাস আটকে দেয়। অথচ তার ছেলেবেলা, বাড়ন্ত বয়সের সমস্তটাই কেটেছে এই ঢাকাতে। মাঝেমধ্যে আত্মীয়স্বজনের বাড়ি যাওয়া ছাড়া ঢাকার বাইরে খুব একটা থাকা হয়ে ওঠে নি তার। শুধু একবার টানা বন্ধ কাটিয়েছিল জাহিদদের মফস্বলে, তখন চাচা ওখানে চাকরি করত।

ভিড় কাটলে রিকশা বাঁয়ে মোড় নেয়, সামনে বিস্তৃত পথ, এরপর রেলক্রসিং। তার সামনে আসতেই ট্রেন।

নিশি ভিড় কিলবিল রিকশায় বসে ট্রেনের মানুষ দেখে। দেখে, ট্রেনের ক্ষিপ্র, চলন্ত গনগনে চাকা। ইচ্ছে হয় ঝাঁ করে মাথা গলিয়ে দিতে। দেব নাকি?

কী-সব আবোল তাবোল ভাবছি! নিজেকে সহজ করার জন্য রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর ধরতেই চলতে শুরু করে রিকশা। দরজায় দাঁড়িয়ে নিজেকে সে বারংবার তৈরি করে, গতকালের মিথ্যার দায় থেকে কতটা সন্তর্পণে নিজেকে বাঁচানো যায়, এই প্যাঁচ কষতে

কষতে তার গলা শুকিয়ে আসে। ঘরে ঢুকে শোনে, রিনি গতকাল শিক্ষা-সফরে কক্সবাজার গেছে, দিন চার পরে আসবে।

সরোবরের ধারে একটি মেয়ে ধর্ষিত হয়েছে। এক সময় সে মৃত্যুবরণ করে। কাণ্ডটি ঘটিয়েছে এক মেষপালক। মেয়েটি কী করে মরে গেল! মেয়েটির বাবার সীমাহীন যন্ত্রণা, ভেতরে ভেতরে দুর্ধর্ষ হয়ে উঠছেন কিন্তু কিছুতেই তিনি এই ক্ষোভের প্রকাশ ঘটাতে পারছেন না। এক সময় চাবুক দিয়ে সপাং সপাং নিজের সমস্ত শরীরে মারতে শুরু করলেন, সেকী বীভৎস দৃশ্য! রক্ত ফেটে বেরোচ্ছে, দম বেরিয়ে আসার উপক্রম হচ্ছে, তারপরও নিজেকে প্রাণান্ত আঘাতে তিনি ক্ষতবিক্ষত করে ফেলছেন। নিশি অনেকদিন আগে একটি ছবিতে এ দৃশ্য দেখেছিল। সে ভাবলেশহীন চোখে সেই চাপ চাপ রক্তের দিকে চেয়ে থাকে। ঘোর বৃষ্টিতে একদিন, জাহিদের সাথে ছোট্টমোট্ট রেস্টুরেন্ট থেকে চা খেয়ে তারা যখন রিকশায়, তখনই কালো বৃষ্টির সে-কী বিচ্ছুরিত ফেনা! নিশি ফিসফিস করছিল, ভীষণ ভয় করছে।

জাহিদের ভেজা শরীর লেপটে যাচ্ছিল তার গায়ের সাথে। তবুও কী এক নিভৃত দূরত্বে সে নিশির দেহ থেকে না ঘ্রাণ, না উষ্ণতা কিছুই যেন নিচ্ছিল না। দিগ্বিদিক আছড়ে পড়ছে জল, শীতে দাঁত ফেটে যাচ্ছে। কোঁকড়ানো চামড়া ভিজে উঠছে ছিটানো জলে, রিকশাঅলা পেরে উঠছে না বাতাসের সাথে, আঙুলের চিমটি থেকে উড়ে যেতে চাইছে অয়েল ক্লথ। সেই হিমজলের ঘর্ষণেও উত্তপ্ত হয়ে উঠছে নিশির হৃৎপিণ্ড, সে কথা হারিয়ে ফেলে, শুধু বলে, ঢাকার বাইরে কখনো এতদিন থাকি নি। জাহিদ হেসে উঠছিল, সিগ্রেট খাবে?

তোমাকে বুঝি না জাহিদ, নিশির উষ্ণ হতে থাকা ইন্দ্রিয় জ্বলে যেতে থাকে, এরকম একটা পরিবেশ, তোমার কোনো অনুভূতি হচ্ছে না?

হচ্ছে, বাতাসের তোড়ে তার স্বর ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, একদিন যাকে হারিয়ে ফেলেছি, তাকে ভীষণ মনে পড়ছে।

নিশির ওড়নার প্রান্ত বেয়ে জল গড়ায়। সে খামচে ধরেছিল জাহিদের হাঁটু, আমি কখনই তোমার চিবুক আর কাঁধের ভাগ চাই নি, তুমি যদি নিজেকে বিভক্ত মনে কর! শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? কেউ তোমার মাথায় দায় চাপায় নি, তুমি যেদিকে খুশি হেঁটে যেতে পার।

নিশির থরোথরো হাত চেপে অসাড় করে দিয়ে জাহিদ বলেছিল, আর একটিও কথা না।

হাওয়া থামতে থাকে, ইস্পাত ফলার মতো সশব্দে আছড়ে-পড়া বৃষ্টির ধার ক্রমশ কমে আসছে, শুধু স্রোতের মতো ধোঁয়া, নিশি অস্ফুটে উচ্চারণ করে, আজকের বৃষ্টিটা দু'জনে ভাগ করে নিলাম।

অস্তোন্মুখ শয্যা থেকে নিশি নিজেকে টেনে তোলে, রিনি ঢাকার বাইরে যাবে, আমাকে তোমরা জানাবে না?

মা অবাক, সেদিন আমার সামনেই না তোকে বলল। তুই তো আবার এ বাসায় হপ্তা পার না করে আসিস না।

নিশি বিড়বিড় করে, ও তাই তো বলেছিল! আমিই সব গুলিয়ে ফেলেছি।

নিজেকে টেনেহিঁচড়ে নিশি পাশের বাসায় যায়। মমতাদির ঘরে ফোন বেজে যাচ্ছে। কেউ ধরছে না। তিনি কি হাসপাতালে? সাজিদুল? জানা হলো না ওর কী অবস্থা এখন।

নিশির কম্পিত হাত অন্য নাম্বার ঘোরায়, শোনো আফজাল, রিনি এখন ভালো আছে, আমি তোমার অফিসে এসে বিস্তারিত বলছি।

আমার অফিসে কেন? আফজালের স্বর তীক্ষ্ণ শোনায়, তার মানে তোমাদের বাসায় আমাকে আসতে মানা করছ?

নিশি প্রায় মূর্চ্ছিতের মতো হয়ে ওঠে, অসুবিধা আছে, সব বুঝিয়ে বলতে পারছি না। আমি এক্ষুণি তোমার অফিসে আসছি।

কী আশ্চর্য! অফিসে আমার দরকার কী? তুমি সোজা বাসায় চলে যাও, বিকেলে তো আমি আসছিই।

কোথায় আসছ? ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে নিশির গলা।

তোমার বাপের বাসায় আসছি না, আমার নিজের দু'কামরার একটি বাসা আছে, আমি সেটার কথাই বলছি। ঠিক আছে, আমি ফোন রাখছি।

তুমি রাগ করছ, আমি পরে বুঝিয়ে বলব। অন্য বাসা থেকে করছি বুঝতেই পারছ, রিনি সুস্থ— এটা জানানোর জন্যই ফোন করলাম।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিশি দেখে কাগজের মুখ, তাও যেন কেউ এক খাবলায় দুমড়ে দিয়েছে।

ছেলেবেলায়ও এরকমই হতো, স্রেফ ফস্‌কা গেরো ছাড়াতে গিয়ে কী না কী করত, গিট হয়ে যেত অন্ধ। মাথা ঝিমঝিম করে নিশির, আমি যখন কারুকাজ করা সুতোর দিকে এগোচ্ছি, তখনো কি আমি ভেবেছি, আমি তুচ্ছ পোকা, এবং ওই সুতোগুলো তৈরি করেছে মাকড়সারাই?

বাবা বেতের চেয়ারে হেলান দিয়েছেন। তাঁর প্রত্যয়পূর্ণ মুখ নিশির বুকে জল এনে দেয়, বাবা, রিনিকে কক্সবাজার থেকে আজ আনা যায় না?

তোর জ্বর হয়েছে? বাবা ওর কপালে হাত রাখেন, নাহ্‌ ঠিকই তো আছে।

বাবা, ভীষণ জ্বর, চামড়ায় টের পাচ্ছেন না, কাল সারারাত ছিল। এরকম হয় না, আমি অনুভব করছি জ্বরে পুড়ে যাচ্ছি অথচ...।

টেনশন হলে এরকম হয়, তোর কী হয়েছে?

বাবা... নিশি কাঁদতে থাকে।

বাবা বলেন, চল ভেতরের ঘরে যাই। খুব একটা মারদাঙ্গা ছবি আছে, দেখবি? তুই না খুব কমার্শিয়াল দেখিস।

আপনি তো পছন্দ করেন না।

তোর মা এনেছিল, দেখ্‌ না যদি ভালো লাগে?

ছবি দেখব না, এখানেই বসে থাকি ?

আফজালের সাথে কিছু হয়েছে ?

না।

তাহলে তো ঘোলা হয়ে যাচ্ছে সবকিছু।

আমার নিজস্ব কোনো অসুবিধা থাকতে পারে না ?

তা পারে অবশ্য, তবে এ তো আর ছোটবেলার কথা নয়, চোখ মুছিয়ে, বেলুন দিয়ে ভুলিয়ে দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে তুই হেসে উঠলি। এখনকার অনেক বিষয়ই আর বুঝি না।

বেলুনের ঘটনাটা আপনার মনে আছে ? নিশি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

না না, বাবা হাসেন, এই মাত্র তুই মনে করিয়ে দিলি। যাহোক, সত্যিই তোকে হাসাতে পারলাম তাহলে। কিন্তু এ তো ছোটবেলা নয়, হাসি দিয়েই সব ঝঞ্ঝাট থেকে বেরিয়ে এলাম। তুই একটু ঘরে একা গিয়ে শুয়ে থাক। দুপুরে এক সঙ্গে খাব।

নিশি ঘুমিয়ে পড়ে।

অনেক কাঠ, তার নিচে জল, জলের মধ্যে মাছ, মাছের পেটে আংটি। সেই মাছ চক্কর খাচ্ছে। মুখ থেকে বেরিয়ে এলো ভুস আংটি। নিশি চোখ মেলে আঙুল দেখে।

আংটিটার মাঝখানে সাতটি পাথর বসানো। একটা পাথর কোথায় খসে পড়েছে ? ঘুমোনোর আগে তো চোখে পড়ে নি ? ভীষণ বিস্মিত নিশি সারবাঁধা কাঠের দিকে চেয়ে থাকে। কাঠগোলা। কোন্ ছেলেবেলায় সেখানে গিয়ে খেলত। অস্পষ্ট মনে পড়ে একটা নাম— হাসি। এইটুকুন সেই মেয়েটা ছেনি দিয়ে কাঠের ছাল তুলে বাড়ি নিয়ে যেত জ্বালানির জন্য। হাসির সঙ্গে কত দুপুর, কত বিকেল কেটেছে তার ইয়ত্তা নেই। একদিন হঠাৎ করেই শোনে, গড়ানো কাঠের নিচে পড়ে হাসি মারা গেছে।

এত বছর পর মনে পড়ল হাসিকে ? নিশির অন্তরাত্মা ছটফট করে, তখন তাদের বাসাটা কোথায় ছিল ? তখন সে ফ্রি প্রাইমারি স্কুলে পড়ত, টু কি থ্রিতে। ক'দিন পর ওদের বস্তিতে গিয়ে দেখেছিল সব স্বাভাবিক, এক দঙ্গল ভাইবোন হুটোপুটি করছে।

তার মা নিশিকে দেখে বলেছিল, ও হাসি ? বলে চোখে জল তুলে ফুটো স্তনের বোঁটাটা কোলের মেয়েটার মুখে ঠেসে দিয়েছিল।

কিছুক্ষণ পরই নিশির সর্বঅস্তিত্ব কাঁপিয়ে ক্রমঘূর্ণায়মান বাস্তবতা তার মুখোমুখি দাঁড়ায়, যেন আরব্য রজনীর দৈত্য, ওর বিশাল বপুর দিকে তাকিয়ে নিশি স্থবির হয়ে থাকে। কী আশ্চর্য! আমি হাসপাতালে গেলেই পারতাম, কিন্তু আমার উল্টোপাল্টা কথা শুনে আফজাল যদি এর মধ্যে এসে পড়ে ? হ্যাঁ, এই ভয় ছিল। আমি এখানে থেকেই-বা কী করতাম ?

এরকম হ-য-ব-র-ল নিয়ে শাওয়ারের নিচে দাঁড়ায় নিশি, জীবন এত তুচ্ছ ? একজনের মৃত্যুর চেয়েও ভয় পাচ্ছ একটি মিথ্যেকে ?

সব বলে দেবো আফজালকে, এরপর যদি ও মনে করে ক্ষমার অযোগ্য, তবে, তবে ? বিশাল ধরিত্রী, পথ বিস্তার কর।

হীরা বারান্দায়।

জল যাচ্ছে সর্পিল বেগে। উল্টে গেছে গেলাস। ওর চোখ দেখে মনে হচ্ছে দূরায়ত ঝরনার নিঃশব্দ পতন দেখছে।

হীরা, তোমার কাজ বড় সুন্দর, জাহিদ মোড়া টেনে বসতেই যেন বদ্ধ জলে ইটের পতন ঘটে। বিহ্বল হীরা চেয়ে থাকে, সুতোর এত সুন্দর নকশা আমি এই প্রথম দেখলাম। প্রতিউত্তরে হীরার গলা থেকে অস্ফুট একটা শব্দ ওঠে শুধু। যার মর্মার্থ উদ্ধার করা জাহিদের পক্ষে দুরূহ হয়ে পড়ে। জাহিদ সেই শব্দ ধরেই এগোয়, তুমি একদিন অনেক বড় শিল্পী হবে, কার কাছে থেকে শিখেছ এসব কাজ? হীরা ভীত চোখে চারপাশে তাকায়। তারপর নিঃশব্দে দাঁড়ায়। কিছু না বলে পা ঘষটাতে ঘষটাতে কিছুটা গিয়ে একসময় প্রায় দৌড়েই ভেতরে চলে যায়।

পরদিন বিছানায় বসে হীরা সুতোর কাজ করছিল।

জাহিদ 'হাউ' বলে তাকে চমকে দেয়।

কিশোরীর ভুরুতে বয়েসী ভাঁজ জমে। তার সেই মুখের সামনে হাস্যকর ছেলেমানুষে রূপান্তরিত হয় জাহিদ। তারপর নিজেকে সহজ করতেই বলে, এই ফোঁড়ের নাম কী?

হীরা নিরুত্তর।

বৃদ্ধা পেছনে এসে দাঁড়ায়, ও এমনই হয়ে গেছে, আমাকে ছাড়া কারো সাথে কথা বলে না।

সন্দীপনের সাথে?

হীরার চোখে অস্পষ্ট আলো, জাহিদ দেখে। তার দুর্মর জেদ চাপে, একটি গেঁয়ো ছেলে! যাহোক, এরকম হাস্যকর প্রতিযোগিতায় গিয়ে লাভ নেই।

বৃদ্ধা বলে, ও সন্দীপন। ও! সন্দীপন হলে তাহলে অন্যকথা?

পরদিন বৃষ্টি।

ঝড়ের সে-কী লেলিহান-দাপট!

খিড়কির ভেতর দিয়ে আছড়ে পড়ছে জল। জাহিদের মনে হয়, আস্ত বাড়িটা থরথর করে মুহূর্তে গুঁড়িয়ে যাবে। দিন থাকতেই সমস্ত ঘরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার নেমে আসে। ছাদ চুঁইয়ে পড়া জলে বিছানা-মেঝে ভিজে যাচ্ছে। তৎপর বৃদ্ধা জল-পতনের জায়গাগুলো আবিষ্কার করে করে বাটি, গেলাস যা পাচ্ছে মেঝের ওপর বসিয়ে দিচ্ছে। হারিকেন জ্বালিয়ে এনেছে হীরা। ঘরের বিদঘুটে ছায়ায় ওর মুখ বার বার ঝলছে উঠছে।

কিছুক্ষণ পর জাহিদ আবিষ্কার করে, এ হীরার মুখ নয়, বাইরের অত্যুজ্জ্বল বিদ্যুতের শিখা মুহুর্মুহু ঘর আলোকিত করছে। সেই আলোর তোড়ে ভেসে যাচ্ছে হীরার মুখ, দপদপ করছে শিখা।

আজ দুপুরে রান্না হলো না, বৃদ্ধা মাথা মুছে বলে, বাজার ছিল না, মুড়ি-গুড়ে চলবে?

চলবে।

জাহিদের এই উত্তরে বৃদ্ধা বলে, তোমাকে তো বাপু বুঝতে পারছি না, আর ক'দিন থাকবে? জাহিদের চোখ ঘরের আলো-ছায়া ভেদ করে বিদ্ধ করে হীরার চোখ। হীরা কেমন হকচকিয়ে ওঠে।

এরপরেই বড়ো ভয়ঙ্কর শব্দে বেজে ওঠে বৃদ্ধার স্বর, তুমি কি কাউকে খুন করে এসেছ?

চারপাশের বাতাস, নাড়ি-ওল্টানো খিদে, পচা শ্যাওলা, ভুতুড়ে জীর্ণ দেয়াল বৃদ্ধার ওই উচ্চারিত জিজ্ঞাসাকে যথেষ্ট বাস্তব করে তোলে।

খুন! শূন্য থেকে পতিত জাহিদ কেমন থমকে যাওয়া চোখে বৃদ্ধার দিকে তাকায়, আপনার চোখে ছানি পড়েছে?

দেখ ছেলে, আমার দৃষ্টি বড় পরিষ্কার।

তবে যে প্রথম দর্শনে বললেন পাপ নেই?

তাই তো! বৃদ্ধা কেমন গুলিয়ে ফেলে সবকিছু। মাথাটা মাঝেমধ্যে গোলমাল করে। মাথার অসুখ দৃষ্টিকেও অন্ধ করে দেয়।

জাহিদ হীরার হাত থেকে হারিকেন নিয়ে তক্তপোশের পাশের কাঠের ভাঙা টেবিলের নিচ থেকে তার ব্যাগটা বের কর। চেইন খুলে কাপড়ের তলা হাতড়ে টাকার বান্ডিল থেকে বের করে একটা নোট। তারপর হারিকেনের আলোয় সেটা মেলে ধরলে বৃদ্ধার চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে, পাঁচশো?

পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে হীরা, তার চোখ নিষ্পলক, ভাবান্তরহীন।

কোথায় পেয়েছ?

জাহিদ শূন্যে তর্জনী তোলে, বৃদ্ধা কেমন কাঁপতে থাকে, আস্তটা আমাকে দিয়ে দিলে?

বিকেলে বাজার করবেন।

তুমি কি ডাকাত?

না।

চোর?

না।

মানুষ?

না।

তবে কি আকাশ থেকে এসেছ?

জাহিদ এবার নিরুত্তর। এক সময় ব্যাগের চেইন লাগিয়ে চোখ বুজে বিছানায় শুয়ে পড়ে।

ঝড়ের দাপট কমে এলে জাহিদ খিড়কি খোলে। ধবধবে বৃষ্টি। জাহিদের মনে পড়ে, বাবার দুর্ঘটনার পর তিনদিন সে ভাবলেশহীন ঘুরে বেরিয়েছে। ক্রমশ ওই রকম একজন বিক্ষত মানুষকে দেখতে যাওয়ার স্পৃহাও তার মধ্য থেকে ফুরিয়ে আসছিল। যে বাবার সাথে ছেলেবেলায় এক রিকশায় আইসক্রিম খেতে খেতে বাসায় ফিরেছে, বড় হওয়ার পর থেকে তাঁর সাথে তার আশ্চর্য বিচ্ছিন্নতা তৈরি হচ্ছিল। বাবা ছিলেন চূড়ান্ত বহির্মুখী। ঘরের

মৃতপ্রায় সন্তানকে ফেলে অন্যের অন্ধ সন্তানের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন। বন্ধের দিন কম্বল আর বালিশ নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন পথে, কখনো সমুদ্রের ধারে। কখনো রেল স্টেশনে রাত কাটাতেন। মার সাথে তার আদৌ কোনো দাম্পত্য সম্পর্ক ছিল কি-না, জাহিদের রীতিমতো সন্দেহ হতো, মার গর্ভে যদি তাদের জন্ম না হতো! মা চিরকাল সহিষ্ণু। স্বর উঁচুগ্রামে তুলে কোনোদিন কথা বলতেন না।

বাবা রাতে ফিরে বললেন, মৃণাল সেনের যা একটা ছবি দেখছি না! শোনো, কাহিনীটা শোনো, নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের একটা মেয়ে বাড়ি ফিরতেছে না। রাত বাড়তেছে, ভাড়াটেদের মধ্যে গুজুরফুসুর শুরু হয়া গেছে, তার পরিবারের মধ্যে নাইমা আসছে অন্ধকার। এক পর্যায়ে তারা চাইতেছিল মেয়েটি আর না ফিরুক।

বাত্তি নিভাইতেছি, আমার ঘুম পাইতেছে, মা নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলেন।

বাকি গল্পটা শুনতে না পেরে বড় আফসোস হতো জাহিদের।

তোমার সাথে আমার কোনোদিনই হইবো না, বাবা চাপা গলায় ক্ষোভ প্রকাশ করতেন।

আমার সাথে তোমার হওয়ার দরকার কী, তুমি সুপুরুষ, অনেক মহিলাই এখনো চট কইরা তোমার প্রেমে পইড়া যায়। তুমি তোমার জীবন নিজের মতো ভোগ করতেছো।

আমার চরিত্র সম্পর্কে অপবাদ দিতেছ ? বাবা বলতেন, অথচ তুমি ভালো কইরা জানো এই বিষয়ে আমি কেমন, আমি সংসারের চাপ থাইকা মুক্তি পাওয়ার জন্য, হাঁপ ছাড়ার জন্য ঘর থাইকা বাইর হয়া জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরি।

আমি কোনো কৈফিয়ত শুনতে চাই নাই, মা পাশ ফিরতেন, আমার সাথে বিছানায় শুওনের সময়, আমার পেটে বাচ্চা দেওনের সময় সংসারের চাপের কতা মনে পড়ে নাই ? তুমি এই জীবনে নিজেরে ছাড়া আর কাউরে চিনো না।

আমি জঙ্গলে ঘুরি ঠিক, দুনিয়ার সব মানুষ কি এক রকম ? তা-ই বইল্যা আমি এই সংসারের সব দায়িত্ব ফালায়া অন্য সংসার পাতছি ?

বাবা ছিলেন ভারি মনভোলা। একবার ট্রেনে করে কোথায় যাচ্ছিলেন। সঙ্গে জাহিদও ছিল। চানাচুর ভাজা একমনে কিনে দিব্যি খাচ্ছেন, গান গাইছেন, হঠাৎ জাহিদের দিকে লক্ষ্য হলো, ওহ্হো তোরে দেই নাই বুঝি ? তুই নাকি কবিতা লেখস ?

জাহিদ ঘেমে উঠেছিল, কে বলেছে ?

কে জানি বলল, পত্রিকায় দেখছে, আমিও পড়লাম, কীসব মুণ্ডুফুণ্ডু লিখছস, 'জীবনের লালায় বিষ আছে।' এইসব কোনো লাইন ? রবীন্দ্রনাথের পরে এইদেশে কারো কিছু লিইখা লাভ আছে ? সারাজীবন কবিতা লিইখা পইড়া রইবি ওর পায়ের তলায়। এইসব বুইঝাও কেউ এইসব বিষয়ে আগায় ?

জাহিদ নিরুত্তর।

তুই এইবার কোন্ ক্লাসে উঠছস ?

বাবা, আমি কলেজে পড়ি।

মেট্রিক হয়া গেছে ? ওহ্হো সেকেন্ডিভিশন পাইছিলি বইলা খুব বকা দিচ্ছিলাম, না ?

সেই বাবার প্রতি কোনো বিদ্বেষ, কোনো হৃদ্যতা কিছুই জন্মে নি। সংসার, আত্মীয়, প্রতিবেশী ক্রমেই সে যৌথতার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। সে দেখত, প্রতিবেশীরা হয়তো কোনো বিপদের সময় এগিয়ে আসছে, কিন্তু অন্য সময় তার এত বেশি ক্ষতি করেছে, যা চিন্তা করা যায় না। একটা সংসারের কোনো মেয়ে কিংবা ছেলের জীবনে পতন ঘটলে, তারা হয়ে উঠেছে সবচাইতে বেশি নিষ্ঠুর এবং নিন্দামুখর।

সে অনুভব করেছে আত্মকেন্দ্রিক লোক ভালো, যে আত্মকেন্দ্রিক, সে সমাজের পক্ষে কখনো ক্ষতিকর নয়, হয়তো সে সমাজের খুব একটা উপকারে আসে না। কিন্তু ক্ষতিকর নয়, সে-ও তো উপকারী। দিনের পর দিন সে এভাবে তৈরি হচ্ছিল। একদিন এভাবেই সে দাঁড়ায় অপার শূন্যতায়। সে টের পায় পৃথিবীতে ঈশ্বর বলে কেউ নেই, সমাজকে সুস্থ রাখার জন্য যুগে যুগে মহাপুরুষরা ধর্ম তৈরি করেছে। সে ঘামতে থাকে। অনুভব করে, তার চিরকালের ভূমিটা ক্রমেই সরে যাচ্ছে। সে এসে দাঁড়ায় কঠিন এক বাস্তবতার মধ্যে, যেখানে লড়াইটা মারাত্মক কঠিন।

তিনদিন পর ঘুরে ঘুরে জুবায়েরের অফিসে যায়, চায়ে চুমুক দিয়ে বলে, বড় অস্থির বোধ হচ্ছে, কদিন আগে খবর এসেছে বাবার...।

তীব্র শ্লেষে ঝাঁপিয়ে উঠেছিল জুবায়ের, তুই মানুষ?

সেদিন সন্ধ্যায়ও আজকের মতো ঝড় ছিল। জুবায়েরের অফিস থেকে সটান বাসস্ট্যান্ডে। তারপরই ঝড়টা শুরু হয়।

ফেরিঘাটে পৌঁছুতেই ভয়ালরূপ ধারণ করে। চারপাশের জলরাশি প্রকাণ্ড দৈত্যের হাত হয়ে ফেরিটাকে ঠেলা দিতে থাকে। সঙ্গে বিষ হুলের মতো তীব্র বৃষ্টি। মটমট শব্দে ভেঙে পড়ছে নদী তীরবর্তী গাছপালা। বাসে বসে থাকা মানুষগুলো ভয়ে চুপসে গেছে। অস্পষ্ট প্রার্থনা, গোঙানি এইসবের ভেতরে প্রতিবারই জাহিদের মনে হচ্ছিল, আর একটা ধাক্কা, তারপরেই তলিয়ে যাবে সব। সে মৃত্যুর জন্য তৈরি হচ্ছিল, অবাক হয়ে দেখছিল নিজের রূপান্তর— হাত-পা পাথরের মতো হয়ে গেছে। এর মধ্যেও মনে হচ্ছিল সৃষ্টিকর্তা বলে কেউ নেই, প্রকৃতি তাকে মৃত্যুর কাছে নিয়ে যাচ্ছে। দাঁতে দাঁত চেপে চোখ বুজে সে নিজেকে অসীমের দিকে ছুঁড়ে দেয়ার প্রস্তুতি নিতেই কেউ যেন কানের কাছে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করে, তোমার শেষ ইচ্ছে কী?

সে স্তব্ধ হয়ে চোখ বুজতেই যেন শেষবারের মতো অস্পষ্ট উঁকি দিয়ে গেল রোজলিনের মুখ, তারপর স্রোতের মতো অন্ধকার।

এর পরই যেন মহাশূন্য থেকে ভেসে এলো একটি ধ্বনি, চানাচুর।

সটান চোখ মেলতেই মুহূর্তে জীবনের সব অর্থ পাল্টে গেল। আমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। এই ছেলেটির কাছে কত স্বাভাবিক এই জীবন, সে ভাবছে, এর মধ্যেও কেউ-না-কেউ তার চানাচুর খাবে।

সেই অস্পষ্ট চানাচুর ধ্বনি তার নির্জলা বুকে অসীম শক্তি যোগায়, তাহলে বিপদ নেই? এটাই জীবনের স্বাভাবিক রূপ? আমি দেখি নি বলে নিজেকে গভীর গহ্বরে ছেড়ে দিয়েছিলাম?

সন্ধ্যায় হীরা হারিকেনের গ্লাস মুছছে, জাহিদ বলে, শুনলাম তুমি আমাকে সহ্য করতে পারছ না, চলে যেতে বলেছ ?

হীরা নিরুত্তর, তার চঞ্চল হাত ঘষতে ঘষতে পরিষ্কার করে কালি।

জাহিদ বলে, তুমি আমার দিকে তাকাও।

হীরা মুখ তোলে না।

জাহিদ কঠিন গলায় বলে, শুনতে পাচ্ছ না ? আমি বলছি তাকাও।

হাত থেকে গ্লাস পড়ে চুরচুর হয়ে যায়,হীরা চোখ তুলে কেঁপে ওঠে, কাকাবাবু!

কাকাবাবু ? কে শিখিয়েছে ?

সন্দীপন দা।

তুমি আমাকে স্যার বলে ডাকবে।

বদ্ধ পুকুরে এককোঁটা তরঙ্গ ওঠে, কেন ?

আমি ঠিক করেছি, আমি তোমাকে পড়াব।

মিন মিন করে হীরার কণ্ঠ, ক'দিন ?

যদ্দিন থাকব।

বৃদ্ধা এসে হীরার পেছনে দাঁড়িয়েছে। তার চোখ-মুখে আলো। ঘুমকাতুরে বেড়াল সন্ধ্যার হাই তোলে, তাকে হেইট বলে সঙ্গে সঙ্গে হেসে ওঠে জাহিদ, তাহলে তুমি বোবা নও। এখন বলো তুমি সুচের কাজ কার কাছ থেকে শিখেছ ?

মা'র কাছ থেকে, আরক্তিম হয়ে ওঠে হীরার মুখ, পৃথিবীতে একমাত্র সে-ই এই কাজ সবচেয়ে সুন্দর জানে।

তুমি জানোই না তুমি গুরুমারা শিষ্য।

ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে হীরা, মা সম্পর্কে এভাবে বলবেন না, এই মিথ্যে আমার সহ্য হয় না।

বৃদ্ধা সজোরে হেসে ওঠে, এবারে বিশ্বাস হলো ? আমি বুড়ো, জঙ্গলের ছাল উঠে যাওয়া শকুন, আমাকে দিয়ে কি হবে ? তোর ধারে-কাছে যায় আমার কাজ ? হীরা অকস্মাৎ ফুঁপিয়ে ওঠে। বৃদ্ধা তার মাথায় স্নেহের হাত বোলান, আচ্ছা বাবা মানছি, আমারটাই সুন্দর। হীরা শিশুর মতো হেসে ওঠে।

দূর থেকে ভেসে আসছে গুঞ্জন।

বিস্তৃত ফাঁকা প্রাঙ্গণের চক্রে পড়ে সেই গুঞ্জন বাতাসের সোঁ-সোঁ ধ্বনির মতো শোনায়। জাহিদ কান পাতে।

বৃদ্ধা তখন অন্য জগতে, কতকাল পরে মেয়ের হাসি দেখলাম, তুমি বাপু ফেরেশতার বংশধর।

জাহিদ জানালা থেকে ফিরে আসে। ওর কী হয়েছিল ? কী এমন দুর্ঘটনা ?

জাহিদকে টেনে বৃদ্ধা ঘরে নিয়ে আসে, চুপ চুপ! বাতাস সব শুনে ফেলবে, এরপর ওদের কানে যাবে, ওরা আবার আসবে।

কারা ?

ওই যে সেই ছায়ামানুষেরা, যারা ওর ক্ষতি করেছে।

দূরের গুঞ্জন ধ্বনি তীব্র হচ্ছে এবার। বৃদ্ধা সচকিত হয়। সন্তর্পণে উঁকি দেয় খিড়কি পথে। অস্পষ্ট উচ্চারণ করে, কী আশ্চর্য!

বৃদ্ধাকে সরিয়ে জাহিদ স্পষ্ট চোখ পাতে, দূরের একটি বাড়ির উঠোনে রাজ্যির ভিড়।

ফাঁকা প্রাঙ্গণের চারদিক থেকে ধাবমান মানুষ সেদিকেই ছুটছে।

দেখে আসি ?

জাহিদের এই প্রশ্নে বৃদ্ধা কিছু একটা ভাবে। তারপর বলে, তুমি এক কাজ কর, প্যান্ট বদলে লুঙ্গিটা পরে যাও। তাহলে হঠাৎ করে তোমাকে দেখে কেউ অচেনা বলে মনে করবে না।

জাহিদ ইট খোলার বাঁকে দাঁড়াতেই দেখে, সন্দীপন, বাতাসের মতো ছুটছে।

ওকে খাবলে ধরে জাহিদ বলে, কী ?

সন্দীপন উদ্‌ভ্রান্ত, এখনো হুনেন নাই ? দুই মাতা অজগর।

জাহিদ বিস্মিত, ধরা পড়েছে ?

আরে না। সন্দীপন হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, চান্দুর বেটি লায়লা কী এক আজিব টানে গোরস্থানের দিকে গেছিলো। গত রাইতে হেয় নাকি খোয়াবে দেখছে, অজগর মরা মানুষ খাইবার লাগি আহাজারি করতাছে, আবদুল খালিকের নিষেদে ওই জাগায় কবর দেওন বন্ধ আছিল। সাপে বোলে কয়, লায়লা, কবর দেওন যে বন্ধ, অহন জিতা মানুষ খাই ? ঘুম থাইক্যা উইঠ্যা হেই মাইয়া কী বুইঝ্যা আবার পুরান গোরস্থানে গেছিলো। উঠানে অহন ফিট দিয়া পড়ছে।

রোদ আর বাতাসের সম্মিলিত ঘূর্ণিতে আলোধূলিময় হয়ে উঠছে চারপাশ। ঠা-ঠা রোদে মাথা ফেটে চৌচির হবার উপক্রম। হাঁটতে হাঁটতে জাহিদ মৃদুকণ্ঠে বলে, তুমিও তাহলে এসব বিশ্বাস করতে শুরু করেছ ?

চোক্কের সামনে কিসব ঘটতাছে, সন্দীপনকে বিহ্বল দেখায়, মায় কইছে, মানুষরে গোর না দিয়া পুড়াইলে এই সমস্যা থাকত না। মরা মানুষের দেহই কবরে গিয়া অজগর অইছে, পুড়াইলে কি ছাই থাইক্যা কিছু বারাইতে পারত ? আমি মায়েরে বকা দিছি, মরা মানুষ যদি অজগর হইতে পারে তয় ছাই থাইক্যাও ভূত-প্রেতের জন্ম হইতে পারে, এইসব হইলো গিয়া যার যার ধর্মের নিয়ম, এই নিয়া কতা কওন ঠিক ?

তুমি কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে না। এই অজগরের বিষয়টা, তোমার মনে হচ্ছে সত্যি ?

রোদ পুড়ে তামাটে হয়ে উঠেছে সন্দীপনের মুখ, সে বলে, কিচ্ছু বুঝি না দাদা, তয় গেরামে নতুন বিপদ নামলো এইডাই বুঝতাছি। অহন কত রহমের ফতোয়া যে জারি অইবো!

চান্দুর দহলিজে দুনিয়ার মানুষ।

উঠোনের মাঝখানে জিওল মাছের মতো তড়পায় যুবতী কন্যা। জাহিদ অবিশ্রান্ত গুঞ্জন-শব্দের মাঝখানে নিজের পাতলা দেহখানা সেঁধিয়ে দেয়, সুন্দরী মেয়ের গ্যাঁজলা ভরা মুখের সামনে রঙিন কাপড় ঘোরাচ্ছে একজন লোক। সন্দীপন ফিসফিস করে বলে, আবদুল খালিক।

চারপাশের ঠাসা ভিড় জাহিদের মাথার ওপর উপচে পড়ছে। আঁচল খসা উন্নত দেহ, ফরসা ত্বক, সর্বোপরি, মেয়েটির গড়াগড়ি খাওয়ার ব্যাপারটাকে কিছু যুবক লোলুপ দৃষ্টিতে উপভোগ করছে। এছাড়া আছে মানুষের চিৎকার চ্যাঁচামেচি, মাছির ভন্‌ভন্‌, প্রখর নির্জলা সূর্য। ভিড় সরাতে ভলান্টিয়ার নিযুক্ত করতে হয়েছে। এসবের মধ্যেই একাগ্র ধ্যানে আবদুল খালিক লায়লার মুখের ওপর কাপড় ঘোরাচ্ছে আর সূরা পড়ে বারংবার ফুঁ দিচ্ছে। চারদিকে নানা মত, নানা গুঞ্জরণ, সবার মুখে কী এক চাপা ভয়, কারো কণ্ঠই উচ্চকিত নয়, কিন্তু ঠেলে-ওঠা উত্তেজনায় কেউ কথা না বলেও পারছে না।

গজব! এইসব হইল গিয়া গজব। কেয়ামতের আগে এইসব আলামত দেহা দেয়। মানুষের মইধ্যে ধর্ম আছে? আমাগোর দুই ভাইয়ের সাপ দর্শনের আগের ঘটনা মনে আছে? গেরামে একটার পর একটা কুকাম, হিন্দু ছেলের হাত ধইরা পলাইলো মুসলমান মাইয়া, আবুর বউ লাইগেশন করাইলো, ভি.সি.আর-এ কীসব বুলুর ব্যবসা শুরু করলো খানের ব্যাটা, আর ওই হারামির বাচ্চা কুতুইব্যা খিদার জ্বালায় মুচির বাড়ি গিয়া শুয়োরের গোশ্‌ত খাইলো, আরে চুতমারানি তর অত খিদা, গেরামের মাইনসের গু খাইতে পারলি না?

প্রসঙ্গ এরপর নানা বাঁকে ঘুরতে থাকে।

এইরহম একটা খোয়াবের পরে মাইয়া কেমনে গোরস্থানে যায়?

এই সবই লিখন, লায়লার কুকীর্তি আমরা কম জানি?

চুপ চুপ!

আবদুল খালিকের স্বর উচ্চকিত হচ্ছে। পড়াপানি চোখে-চুলে সর্বাঙ্গে ছিটিয়ে সুরার আদ্যোপান্ত ঘেঁটে ফেললেও যখন লায়লার তড়পানো কমে না, হাত-পায়ের গিরেগুলো ক্রমেই নীল হয়ে ফুলে উঠছে, জাহিদ স্পষ্ট দেখে, আবদুল খালিকের চোখে ভয়।

সাপ অইলো শয়তানের আরেক রূপ, আবদুল খালিক এবার নিজেকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে, গেরামে ধর্ম নাশ হইলে শয়তান আহে, এই শয়তানের এক মাতায় আবার আমার মরহুম কামেল বাপের মস্তক বহানো। বুঝলেন ভাই, সাপে মনে করছে এই মুখ দেইখ্যা তারেও সবাই কামেল মনে করবো। শয়তানের আছে নানান রূপ, আপনেরা বেবাকেই জানেন আদম-হাওয়ার গটনা, মায়ারূপ দিয়া হেয় আদমের অতবড় সর্বনাশ না করলে এই গুনাহগার দুনিয়ার জন্ম হইতো না। তাও হেই পাপ পয়লা ভুলাইছিলো কারে?

নারীরে।

নারীরে ভুলানো সহজ, নাইলে এইরহম খোয়াবের পরে কেউ গোরস্থানে যায়? শয়তান দর্শনের পরে লায়লার শরীল না'পাক হয়া গেছে। এই না'পাক শরীরে আইসা বইছে শয়তানের চেলাচামুণ্ডারা, তারা লায়লার শরীলে বইয়া তাস পিডাইতাছে, এই জন্যই

বেদম যন্ত্রণা হইতেছে তার। ভাইয়েরা ভিড় কমান। আমি অহন জুয়াড়ি শয়তানগুলারে ভাগাইমু।

দীর্ঘ বছর পর প্রচণ্ড ভিড়ের শ্বাস-আটকানো পরিবেশে জাহিদ যেন সেই শব্দ শুনতে পায়। তুর গাঁয়ে মাঁনুষ মাঁনুষ গঁন্ধ— কী চমৎকার করেই না বলত রোজলিন! জাহিদের পাঠ্যবইয়ের কাজ শেষ হলে রোজলিন বিচিত্র সব গল্প শোনাত তাকে। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে জাহিদ প্রবেশ করত পরাবাস্তব সেই পৃথিবীতে। আজ চোখের সামনে লায়লা, সাপ, মানুষের মস্তক— সব শুনে ভেসে আসছে সেই হাজার বছর আগে ফেলে আসা অবাস্তব পৃথিবী। রোজলিন তার কাছে হয়ে উঠেছিল সহস্র রজনীর শাহরাজাদ।

হাজার রাত কেটে যাচ্ছে মন্ত্রমুগ্ধের মতো গল্প শুনতে শুনতে। বয়সের ভেদ মুছে যাচ্ছে, সে হয়ে উঠছে বাদশাহ শাহরিয়ার। মানুষ পরিণত হচ্ছে মেষে, কবিরাজের খণ্ডিত মুণ্ডু কথা বলছে, ধোঁয়া পাকিয়ে বেরিয়ে আসছে রাক্ষস— এর মধ্যে কী নেশা! রোজলিনের মুখ, তার চোখ, থরো থরো ঠোঁট, ভাঁজ দেয়া থুঁতনির দিকে জাহিদ নিষ্পলক চেয়ে থাকে, ওর ওড়না থেকে বেরিয়ে আসছে ঘ্রাণ, মানুষের পারফিউমের ব্যবহার সম্পর্কে তখনই সে প্রথম জেনেছিল।

ট্র্যান্সলেশান ভুল হচ্ছে, উল্টোপাল্টা হয়ে যাচ্ছে সরল অঙ্ক, স্কেলের রেখা সমান হচ্ছে না— ক্ষিপ্ত রোজলিন লাল হয়ে উঠছে, তোমার হয়েছে কী?

আপনি স্কুলে আর পড়াতে যাবেন না।

কেন?

আমার ভালো লাগে না, আমি দেখেছি সবার প্রতি আপনার সমান মনোযোগ। আমি একা আপনার ছাত্র হতে চাই।

রোজলিন ভাষা হারিয়ে ফেলেছিল, পরক্ষণেই তার স্বভাবসুলভ কায়দায় হেসে উঠে বলেছিল, পেটে পেটে এত হিংসে? এরপর সে মানুষের ঈর্ষা এবং তার ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণ দিয়েছিল।

আবদুল খালিক বলে যাচ্ছে, নারী কিসে না ভোলে? ফুল দেখলে ভোলে, পুরুষের অর্থে ভোলে, আমের আচারে ভোলে, সাজসজ্জায় ভোলে, মিথ্যা প্রলোভনে ভোলে, এই, এই আমি লাঠি তুললাম, ভাগ ভাগ শয়তান, হে ভাইয়েরা, লায়লা পাপ করেছিল, কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের জন্য ইহজীবনে সে যদি বাইচা না থাকে, পরজীবনে তার দোযখ কে ঠেকাইবে? বক্তৃতার ঢঙে কথা বলতে গিয়ে আবদুল খালিক তার সহজাত আঞ্চলিক ভাষা থেকে অবচেতনে বেরিয়ে এসেছে, ভাইয়েরা, চোখের সামনে পষ্ট দেখতাছি ঘোর দুর্দিন।

শোনো, ঈর্ষা কী পরিমাণ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে সে সম্পর্কে একটি গল্প বলি। জাহিদের মধ্যে রোজলিন পুনরায় মূর্ত, একরাজ্যে ছিল অপূর্ব সুন্দর এক পাখি। তার গলায় ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠসঙ্গীত, শরীরে ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রূপ, এই পাখিটার জন্যই সেই রাজ্যটা ছিল বিখ্যাত।

ভোরে সারা চরাচর স্তব্ধ হয়ে উঠত তার গান শুনে, সেই গানের প্রেরণা নিয়ে সবাই কাজে বেরোতো। ফলে সেই রাজ্যের এক গায়কের খুব ঈর্ষা হলো আর এত সাধনার গান কেউ শুনত না বলে।

সে অনেক খুঁজে, অনেক সাগর-পাহাড় পেরিয়ে দেবতার রাজ্যে গেল। সেখানে গিয়ে সে মাথা ঠুকতে লাগল।

দেবতা বলল, কী চাই তোমার, কেন এই রক্তপাত?

সে বলল, আমি আমার রাজ্যের শ্রেষ্ঠ পাখির কণ্ঠ চাই, না যদি পাই, আমার প্রাণ আপনারা হরণ করে নিন।

দেবতা বলল, সেই পাখি তার রূপ তার উদারতা সব মিলিয়ে সুন্দর। তার কণ্ঠ তার সেইসব জাদুকরী শক্তিরই একটি অংশ; তুমি যদি তার সব চাও, আমার পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। আলাদাভাবে যদি তার কণ্ঠ চাও, তাহলে তা দিচ্ছি, কিন্তু মনে রেখো, তোমাকে হতে হবে তার মতো উদার, নইলে শুধু তার কণ্ঠ দিয়ে তুমি কিছু করতে পারবে না।

সেই গায়ক, যার নাম ডেভিড, সে অভিভূত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে দেবতার জয়গান করতে লাগল।

পরদিন সকালে পাখির কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেলে রাজ্যের মানুষ আশ্চর্য হয়ে শুনল গির্জার চূড়ো থেকে নয়, ডেভিডের প্রাসাদ থেকে সেই গান ভেসে আসছে। তারা ডেভিডের ঐশ্বরিক শক্তি দেখে তাকে ভয় পেতে শুরু করল। এরপর থেকে ভোরে ডেভিড গান গায়, সমস্ত অঞ্চলের মানুষের মতো সেই সুন্দর পাখিও বসে সেই গান শোনে, আর ভাবে, দেবতা কী দয়াময়! আমি নিজে গাইতাম বলে বঞ্চিত ছিলাম এই সুরের আস্বাদন থেকে, এখন আমিও একজন শ্রোতা। নিজেকে পূর্ণ করতে পারছি অপূর্ব সুরের মূর্ছনায়।

সকালের পরে ডেভিডের আর কদর থাকত না। দিনক্লান্ত মানুষ গির্জার সামনে গিয়ে সেই পাখির রূপ দেখে নিজেদের ক্লান্তি দূর করত। সুর হারিয়ে সেই পাখি দেখতে হয়ে উঠল আরো অভিনব, আরো সুদর্শন। পর্যটকরা এসে যদি এই রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সুন্দর দেখতে চাইত তখন সবাই সন্ধ্যার গির্জার সামনে গিয়ে দাঁড়াত। সবাই বলত, এই পাখির কণ্ঠ নিয়ে ডেভিড নামের একজন গায়ক মস্ত শিল্পী হয়েছে। কিন্তু এটা ওর নিজস্বতা নয়। ডেভিড এসব শুনে হিংসায় জ্বলে ছাই হয়ে গেল। একদিন হলো কী সবাই ঘুম থেকে জেগে ওঠার আগে সে গির্জার সামনে গিয়ে পাখিটাকে আমন্ত্রণ জানাল তার বাড়ি আসার জন্য। উদার সরল পাখি ডেভিডের ডাকে সাড়া দিয়ে উড়ে এলো। ডেভিড তাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে গোপনে হত্যা করল। এরপর সে ভাবল, ক'দিন ওকে কেউ না দেখলেই ওর কথা ভুলে যাবে।

সারা রাজ্যে হায় হায় উঠল, সবাই চিৎকার করতে থাকল। হা! আমরা সুন্দর হারিয়ে ফেলেছি।

দেবতা ক্রুদ্ধ হলো।

তার চোখের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেলো ঈর্ষাকাতর ডেভিড।

এই গল্প আপনি নিজে বানিয়েছেন মিস?

জাহিদের এই প্রশ্নে অপ্রস্তুত রোজলিন হেসে উঠেছিল, কী করে বুঝলে?

পাখি গান গাইতো গির্জায়, গায়কের নাম ডেভিড এইসব শুনে মনে হলো।

তুমি অনেক বুদ্ধিমান।

তাহলে ঠিক ধরেছি তো?

এখানকার গির্জা বড় অপরিষ্কার, যত্ন নেয়ার কেউ নেই। বড্ড খারাপ লাগে।

ঠিক আছে মিস, সন্ধ্যায় আপনি গির্জায় যাওয়ার আগেই আমরা সব বন্ধুরা মিলে সেটিকে পরিষ্কার করে রাখব।

তাহলে সব ছাত্রকে বাদ দিয়ে শুধু তোমাকে পড়ানোর কথা বলবে না তো?

জাহিদের মুখ রক্তাভ হয়ে ওঠে, ঠিক আছে আর বলব না।

যা জাউরার পুত, যা খানকির ঝি হুগার তলে যা, ইন্দুরের গর্তে যা, বলতে বলতে আবদুল খালিক লায়লার গায়ে নিমের ডালের ঝপাত বাড়ি লাগায়। গায়ে, বুকে উরুতে, মারতে মারতে সে টের পায় তার সমস্ত শরীরে যেন আগুন ধরে যাচ্ছে, লায়লার বিকট সৌন্দর্য, ধলা চামড়ার কম্পন, স্ফীত রাঙা ঠোঁট, কী ভয়াবহ ঘোর! নিজেকে দ্রুত সেই জট থেকে বের করার জন্য আবদুল খালিক কি এক গোঁয়ার্তুমিতে লায়লার চুলের গোড়া ঠেসে ধরে তাকে বৃত্তাকারে ঘোরাতে থাকে। ভিড়ের কল শব্দ থেমে এসেছে। জাহিদ সরে এসেছে রোজলিনের জগৎ থেকে। মজা দেখতে আসা ছেলেগুলো পর্যন্ত থ বনে গেছে। লায়লার কব্জি থেকে সুতোসহ তসবি খসে পড়েছে। ঠোঁট উপচে ফেনার মতো ভেসে উঠছে রক্ত।

বাবার খণ্ডিত দেহ— জাহিদ পুনরায় ডুবে যায়, ছি-ছি এ বাপের পুত্র সন্তান? ধিক্ ধিক্! প্রতিবেশীদের সীমাহীন তিরস্কার, জন্মের সময় বিষ দিল না ক্যান? এ্যাকসিডেন্টের খবর পায়াও তিনদিন পরে আসে?

মার চোখে ছিল অচেনা চাহনি, বুঝতে পারছিলেন না জাহিদ নামের কোনো সন্তানকে আদৌ তিনি গর্ভে ধারণ করেছিলেন কী-না! বাবাকে দেখাচ্ছিল শিল্পীর করে রাখা অর্ধেক ভাস্কর্যের মতো। ব্যান্ডেজ মোড়ানো সর্বাঙ্গ, মনে হচ্ছিল, ওসব সিমেন্টের আস্তর।

আশ্চর্য সংযম তাঁর, বেশির ভাগই কাটাতেন ঘুমিয়ে, চোখ মেলে নিজেকে দেখতেন অপার বিস্ময়ে, কিচ্ছু বলতেন না।

মা বললেন, প্রথম চোখ মেলার পরও কিছু বলে নাই। আমি ভাবছিলাম হয়তো চিৎকার করবো। নয়তো সব দেইখা আধ পাগলা হয়া যাইবো। কিন্তু...।

কী করে চাকার তলায় একজন মানুষের দুটো পা এবং একটা হাত একই সঙ্গে সেঁধিয়ে যায়? ঠিক কী কায়দায়? জাহিদের এই ভাবনার মধ্যেই সদর থেকে গাড়িতে করে ডাক্তার আসে। সন্দীপনকে অনেকক্ষণ দেখে নি জাহিদ। এরপর অস্পষ্ট মনে পড়ে, এইসব ঘোরের মধ্যে সে-ই কোনো এক সময় ওকে ঠেলা দিয়েছিল ডাক্তার আনার জন্য। জনতার তীব্র রোষের মাঝখান থেকে কেউ কিছু বুঝে উঠবার আগেই আবদুল খালিকের থাবা থেকে ডাক্তার লায়লার দেহটি ছিনিয়ে নেন, আপনারা মানুষ? একটি মেয়ে মরে যাচ্ছে আর আপনারা— তাঁর কথা শেষ হয় না, ঝটকায় ডাক্তারের গাড়ি এবড়ো-থেবড়ো পথ ভেঙেচুরে সদরের দিকে রওয়ানা দেয়। কেউ আর তাতে আপত্তি করে না, বিষয়টা ততক্ষণে সবাইকে ক্লান্ত করে তুলেছে।

আবদুল খালিক কাঁপতে কাঁপতে মসজিদে গিয়ে সিজদায় পড়ে যায়। সব ধুলোঘূর্ণি, নাজুক দুঃসহ স্মৃতিসব, আর কিছুক্ষণ আগে ঘটে যাওয়া ঘিনঘিনে বাস্তবতা থেকে বেরিয়ে

বাড়ি ফেরার পথে জাহিদ অস্পষ্ট কণ্ঠে উচ্চারণ করে, সন্দীপন আজ তুমি মস্ত এক সাহসের কাজ করেছ, আমি অভিভূত। ওর মুখও ঘর্মক্লান্ত, দাঁতে নখ খুঁটে বলে, আপনেই তো আমারে ধাক্কাটা দিলেন, নাইলে...।

নিশি আগেও তোমাকে দেখেছি, কেমন প্রাণহীন, শুধু যেন দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছ, তাও তোমার একটা ধরন ছিল, কিন্তু ক'দিন থেকে তোমাকে আমি আর চিনতে পারছি না। তুমি কেমন বদলে যাচ্ছ।

আফজালের গ্লাসের বাসন্তী জলে ফটাস বরফ টুকরোর পতন ঘটে, শোন্ রেজা আজ তুই বাড়বি না। আমি রাক্ষসের মতো খেতে পারি না।

রেজা বলে, দু'পেগেই অমন গেরো দেয়া কথা শুরু করলি?

তো যা বলছিলাম, আফজাল পুনরায় নিশিকে বিদ্ধ করে, বদলে যাচ্ছ, কেন? দু পেগে নিশি ভালোই আন্দোলিত হয়, জিনিসটার প্রতি একটা নিষিদ্ধ নেশা আছে তার, আফজালই যখন বছরে দু একবার খায়, তার আর হয় না, সেই দু'একবারও সে নিশিকে প্রশ্রয় দেয় না। দীর্ঘ গ্যাপ হলে আবার আপত্তি করে না।

নিশি অনুভব করে, সবুজ কার্পেট থেকে তার দেহটা ওপর দিকে ঠেলে উঠতে চাইছে। এখন প্রকাশ্যে আফজাল ওর ঘাড়ে হাত রাখুক, চুমু খাক, তাহলেই সব অনির্বচনীয় হয়ে উঠবে। ঠিক এই সময় বদলে যাওয়ার ফিরিস্তি দিতে ইচ্ছে করছি না। স্বাতী গ্লাস বাড়িয়ে দেয়, আরেকটা।

রাক্ষসের বউ রাক্ষস, রেজা খুব জোরে হাসে, এই না বললে এর গন্ধ অসভ্যের মতো?

নাক চেপে খেয়ে নেবো। ঠিক মুড আসছে না।

নিশি তুমি বদলে যাচ্ছ।

দেখো না প্রকৃতি কেমন বদলায়? আমি প্রকৃতির মতো।

হেঁয়ালি করো না, তোমার আচরণ আমার কাছে অস্বাভাবিক লাগছে।

সেসব কথা এখনই, রেজা ভাইদের সামনে তুলতে হবে?

রেজা বুদ্ধিমান লোক, দ্রুত অন্য পথে এগোয়, আজ কি একটা দৃশ্য দেখলাম জানিস? এক ট্রাক রসমালাই রাস্তায় উল্টে পড়েছে, ওরা সেসব ওপর থেকে খাবলে তুলছে, নিচেরগুলো চেটেপুটে খাচ্ছে এক জঙ্গল পোলাপান। রাবিশ! আফজাল আচ্ছন্নের মতো উচ্চারণ করে, এই ফকিন্নি দেশে এজন্যই থাকতে ভাল্লাগে না।

তোমাকে আরেকটু বরফ দিই? নিশির দিকে তাকায় রেজা। আফজাল বাধা দেয়, ওকে আর দিও না। বরফ দিলেই আরেক পেগের নেশা বাড়বে। আমার বউয়ের তো আবার গন্ধ বাতিক নেই।

নিশি হাঁফ ছেড়ে স্থির তাকায় দেয়ালের দিকে। শেড ল্যাম্পের বিচ্ছুরিত ছায়া পড়েছে, নিশি নিজেকে সেখানে দেখে একরঙে, রক্ত নেই, মাংস নেই, ছাই আকৃতি, তবুও বড় অদ্ভুত ঠেকছে, হাতের গ্লাস বড় হয়ে উঠেছে, মনে হচ্ছে হেমলকের পেয়ালা। নিশি রোমাঞ্চ বোধ

করে, যদি তাই হতো, এখনকার মৃত্যু হয়ে উঠত অভিনব। এই উত্থানহীন-পতনহীন সংসার থেকে ছাপহীন ডুবে যেত পাতালে। আফজাল কিচ্ছু বুঝত না, এক বিছানায় এত একাকার করে শুয়েও কী কষ্ট ছিল ওর বুকে, জাহিদকে কেন্দ্র করে কতকাল ধরে কতটা বিষ, সাজিদুলের জন্য কতটা অপরাধবোধ! কী রকম দক্ষ মিথ্যুক হয়ে উঠেছিল নিশি, কী করে সবার প্রশ্নবোধক দৃষ্টির সামনে সে-ই হয়ে উঠত মূল অপরাধী।

নিশি ছটফট করে হাঁটুর ভাঁজে মুখ চেপে ধরে।

তোমার খারাপ লাগছে? আফজাল সিগ্রেট ধরাতে গিয়েও থেমে যায়। নিজের গ্লাসে শব্দ করে জল মেশাচ্ছে রেজা।

না, না ঠিক আছে, জানো, আজ কী হয়েছে, নিশি আচ্ছন্ন গলায় বলে, হাসিকে মনে পড়ছে, অনেক ছোট ছিলাম তখন, কাঠগোলার নিচে চাপা পড়ে—।

অথচ আমার ভীষণ হাসি পাচ্ছে, স্বাতী বলে, কিন্তু আমি হাসব না, কাল এটা নিয়ে রেজা মজা করবে। ভাববে আমি মাতাল হয়ে গিয়েছিলাম।

নিজেকে ছেড়ে দাও, দরাজ কণ্ঠে রেজা বলে, খেয়েই যখন ফেলেছ, তখন আর গুটিয়ে থেকে লাভ কী! মাঝখান থেকে মজাটা পাবে না। কাল আমি কী বলব কি এসে যায় তাতে?

না ছেড়েই-বা কী করব? আমি তো চব্বিশ ঘণ্টা জলের মধ্যেই বাস করি।

হোয়াট? আর ইউ ফিস? রেজার চড়া গলা শুনে নিশি চাপা স্বরে বলে, আস্তে বলুন রেজা ভাই, বাড়িঅলা শুনবে।

খোঁজ করে দেখো, তলে তলে ও ব্যাটাও খায়। আমরা তো শালা হিপোক্র্যাট। নিজে লুকিয়ে খাব,অন্যের সময় ছি-ছি করব! তুই জানিস না আফজাল এই যে ফকিন্নি দেশ বললি, এই দেশেও এটা ঘরে ঘরে স্বাভাবিক হয়ে আসছে, লুকিয়ে খায়, স্ত্রীরা বলে, বিয়ার খায়, আমার স্ত্রীও এভাবেই আমাকে জনসমক্ষে রক্ষা করে আসছে। আরে চোদ— বিয়ার কি শালা মদ না?

দেখুন, নিশির আচ্ছন্নতা কেটে যেতে থাকে, আপনার কিন্তু শুরু হয়ে গেছে রেজা ভাই। এক্ষুণি সামাল দেন, নইলে ওটা কান্নাকাটিতে গিয়ে ঠেকাবেন।

আরে ওর কথা বাদ দাও, স্বাতী হাসতে থাকে, চিল্লিয়ে কথা না বললে ওর মুডই খোলে না। শোনেন আফজাল ভাই, জলে বাস কেন বলেছি, মাসের তিরিশ দিনে একদিনও বাদ যায় না। পৃথিবীর কোনো বাধাই বাধা না এ কম্মোটার সময়। কিন্তু মজাটা কি জানেন, অবচেতন বাধাটা ওর ভেতরেই আছে। যেটাকে ও ছাড়িয়ে উঠতে পারে না। আজ শরীর খারাপ লাগছে, খাব। আজ শরীর ভালো লাগছে, খাব। আজ বৃষ্টি হচ্ছে,আজ ভীষণ গরম লাগছে, আজ মন ভালো নেই, আজ ভালো, আজ ভালো না মন্দ বুঝছি না, এ জন্য খাব, কত যে অজুহাত, কে যে তাকে বাধা দেয়, তবুও রোজ ছুঁতো তৈরি করবে।

আফজাল হাসতে থাকে।

এই হাসিটা বড় ভালো লাগে নিশির, মনে হয়, কোনো বিপদ নেই, চারপাশে সব স্বস্তিকর, হাসপাতালে কেউ পড়ে নেই, তার সংসার আগের মতনই আছে। তার যা কিছু

স্মৃতি, যা কিছু কষ্ট, সব তার নিজস্ব। এ দিয়ে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না। কেউ তাকে সন্দেহ করছে না।

রেজা জোর করে আরো আধা পেগ নিশির গ্লাসে ঢেলে দেয়, তাতেই কাজ হয়, পলায়নপর ঘোরটা পুনরায় সঞ্চারিত হচ্ছে কোষে— না, আমি মাতাল হবো না, আফজাল বুঝুক, এ আমার কাছে কোনো বিষয়ই নয়, ছায়া এত সুন্দর, তার চেয়েও সুন্দর আয়না, নিশি জায়গা বদল করে টুল টেনে বসে— ওই তো দেখা যাচ্ছে ছবিগুলো, কাঠগোলা, নারকেল পাতার বাঁশি, ওই তো তার দেহ, সব কৃত্রিমতা খসে পড়ছে, ভেসে উঠছে সৃষ্টির অনাদি রহস্য। কোনো এক মফস্বল, যেখানে রেল লাইন আসমানে গিয়ে মিশেছে, ওই তো সাপচোখ, নির্ভয়ে ওর মধ্যে পেঁচিয়ে গেল নিশির দেহ, কী সবুজ রস ওই বিষে, কী স্বপ্নময়... জাহিদ... জাহিদ... ভেতর থেকে কান্না ঠেলে ওঠে, ওইতো লাল ঘুড্ডি, ঘিঞ্জি গলি ছাপিয়ে উর্ধ্বাকাশে উড়ছে, সমুদ্রের ওপারে ঘোড়াদের হ্রেষাধ্বনি, ওই তো জাহিদের কবিতা 'আমরা বায়ু চালিত'— তারপর কি, স্পষ্ট হচ্ছে না। ওই তো বাবার সাইকেলের ঘন্টি, রিনির প্রথম রক্তপাত, হাসপাতালে অর্ধমৃত চোখ, জীবনের প্রথম শারীরিক সম্পর্ক, সাজিদুলের দেহ শিখার মতো চাগিয়ে উঠছে। মমতাদির বিছানায় সমুদ্রের স্রোত, হেই কাক তোরা দল বেঁধে আয়, আমি ডাইনি বুড়ি, আমার কোনো সত্য নেই, আমার কলজে খুবলে খা, হায়, আমি চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়েছি। কী রকম জলভাঁজ পড়েছে বদন মণ্ডলে, আফজাল আমাকে টানবে তুমি ? ফেলে যাবে না ? আমি সব মৃত্যু চাপা দিয়ে আবার দাঁড়াব, কোন চিলের ঠোঁটে আমার সত্য খুঁজব! এত ভয় লাগছে, এত বরফকুচি রক্তে! নিশির ভেতর থেকে তরঙ্গ ঠেলে ওঠে। সে আফজালের হাত চেপে ধরে।

স্বাতী বলে, বমি লাগছে।

এই যে সাত নম্বর, এটাই শেষ, এটা খাচ্ছি আমি মোটেই উল্টোপাল্টা করি নি, এজন্যে। বলতে বলতে রেজা গ্লাসে বরফ টুকরো ছেড়ে দেয়, আবছা আলোয় অভিনব লাগে দৃশ্যটা, লালচে জলে শাদা বরফ টুকরো এমনভাবে পাক খেলো, মনে হলো, একটা ছোট রূপচান্দা সাঁ শব্দে ঘাই দিয়ে উঠল।

তুমি প্রথম পেগ নিয়ে বলেছ চিয়ার্স, স্বাতী টান হয়ে ওঠে, দ্বিতীয় পেগ নিয়ে বললে দু'নম্বরটা জমে ওঠার জন্য, তিন নম্বর, জমে উঠেছে বলে, চার নম্বর নিলে আফজাল ভাইয়ের সৌজন্যে, পাঁচ কী বলে যেন ?

ওরে বাপরে! এ দেখি হুবহু রেকর্ড হয়ে গেছে, রেজা চিল্লাতে থাকে, কীরকম জাঁহাবাজ মহিলা দেখ আফজাল, চাকরিজীবী বউ ভাই খুবই বিপজ্জনক, চোখ-কান কেমন খোলা।

নিশি তুমি প্রায়ই বাসায় থাক না, আফজাল কেমন ঝিমুনো কণ্ঠে বলে ওঠে, কোথায় যাও, কী কর ?

তুমি আমাকে সন্দেহ করছ আফজাল!

সন্দেহ নয়, জানতে চাইছি।

আমার সারাদিনের হিসেব তোমার নখদর্পণে থাকতে হবে ? আমি কি অপরিণত কেউ ?

তা নয়,কোথায় যাও, কী কর, শান্তি পাচ্ছি না। আফজাল জড়িয়ে যেতে থাকে।

স্বাতী বলে, এভাবে বলছেন কেন ? কী করে মানে ? প্রশ্নটা আপত্তিকরভাবে করছেন কেন ? এই যে আমি চাকরি করি, সকাল থেকে রাত অব্দি কী করি, রেজা জানে ?

মেঝেতে বসেছে সবাই। খাটের কোনায় আফজালের মাথা ঢুলে পড়ছে। নিশি অনুভব করে, ভীষণ মাথা ধরেছে। স্বাতীর বমি বোধ তার মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে। জিভে লেবুর রস চিপতেই রেজার উচ্চকণ্ঠ শোনা যায়, দেখছ তোমাকে আমি কত স্বাধীনতা দিয়েছি। স্বাতী ততক্ষণে ঝাঁঝালো হয়ে উঠেছে, এই যে আমার স্বাধীনতা, সেটা তুমি দিয়েছ, সৃষ্টিকর্তা নয়, আমার যোগ্যতা নয়, আমার ব্যক্তিত্ব নয়, আমার স্বাধীনতার দড়ি তোমার হাতে বাঁধা, তুমি তা ছেড়ে দিয়ে অহঙ্কার করছ, এটাই আমার কষ্ট।

রেজা বলে, মেয়েরা দু'চার লাইন কবিতা লিখতে জানলে এই এক সমস্যা। কথার কারসাজির সাথে পেরে ওঠা মুশকিল।

আফজাল বড় আন্তরিক গলায় বলে, আমাদের স্বাতী তো আবার এ বিষয়ে নিভৃতচারী।

রেজা হাসে, ধুর! ওতেও ওর যথেষ্ট মন নেই, অন্য অনেক কিছুর মতো একটা বাড়তি শৌখিনতা। যাকগে, স্বাতী তোমাকে আবার ধরতে শুরু করেছে, রেজা বলে, চল, বাসায় চলো। ছেলে দুটো নিশ্চয় এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে।

না, বিষয়টা তা নয়, জানো একেক সময় মনে হয়, এই শহরের গণ্ডি পেরিয়ে অনন্ত পৃথিবীর পথে বেরিয়ে পড়তে পারতাম! এমন হয়, কিচ্ছু ভালো লাগে না।

আফজাল বলে, আমার যদি একটি বাচ্চা থাকত। ওহ্ বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর পৃথিবীর কাছে আর—।

নিশি কেঁপে ওঠে, আলোছায়ার বায়ুচক্রে একটি নবজাত শিশু ঢেউ খায়। একসময় সে হামাগুড়ি দেয়, নিশির ভেতর থেকে ঠেলে ওঠে কান্না, কিন্তু এক সময় সেই ঘোর সে কাটিয়ে ওঠে।

ওর কণ্ঠ হয়ে ওঠে মরুভূমির মতো শুষ্ক, আর আমি ? আমি কিচ্ছু চাই না, কিচ্ছু না, এই শহরে সন্ধ্যার ওভার ব্রিজে দাঁড়িয়ে একদম একা যদি স্বাধীনভাবে শ্বাস টানতে পারতাম, আমার কোনো ক্ষতি হয়েছে এই ভয়ে কেউ খুঁজতে না বেরোতো আমাকে, শুধু একটি সন্ধ্যা আমার নিজস্ব হতো, আমি কোথায় আছি না জানতে চাইতে কেউ, আর কিচ্ছু না... কিচ্ছু না—।

পরদিন কলেজের কথা বলে নিশি হাসপাতালে যায়।

সেদিন বাবার বাড়ি থেকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ব্যাংকে গিয়েছিল সে। বিয়ের প্রথম থেকেই আফজালের সাথে নিশির বড় ভাইজানের ছুরি-কাঁচি সম্পর্ক। ভীষণ ঝগড়া হয়েছিল দু'জনের মধ্যে। ওরা খুলনা থাকায় নিশি রক্ষা পেয়েছে। নইলে আফজাল কস্মিনকালেও ওর বাবার বাড়ি যেত না।

ব্যাংকে গিয়ে সেটাই কাজে লাগিয়েছিল, বড় ভাইজান, ভাবি এসেছে খুলনা থেকে। ঢাকায় ওর কী কাজ পড়েছে। এজন্যই যেতে না করেছিলাম, অথচ তুমি ফোনে এমন ব্যবহার করলে!

আফজাল বিরক্ত, এজন্য ব্যাংকে আসতে হবে?

তোমার অফিসে আমি আসতে পারি না? তুমি কিছু না বুঝে সেখানে গেলে কেমন একটা অস্বস্তিকর অবস্থা হতো, অথচ এখন উল্টো অপমান করছ।

আসলে তুমি নিজেই চিন্তা করে দেখ কেমন উল্টোপাল্টা কাজ করছ। আফজাল ম্লান কণ্ঠে বলে, আমার একেবারে শান্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

এত তাড়াতাড়ি তোমার শান্তি নষ্ট হয়, চেয়ারে এলিয়ে পড়তে চায় নিশির দেহ। এই তোমার বিশ্বাসবোধ?

রিনি কেমন আছে?

ভালো। যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিল।

তোমার ছোটলোক ভাইজান নিশ্চয়ই ক'দিন থাকছে?

তুমি তার সম্পর্কে এভাবে বলবে না।

শুকিয়ে মরাটে হয়ে উঠেছে সাজিদুল। টেনে কথা বলে, মনে হয় দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। বলে, মৃত্যুর ওপারটা দেখে এলাম।

যাহোক, নিশি হাসে, একজন অন্তত পাওয়া গেছে, যে মৃত্যুর পরের পৃথিবী সম্পর্কে মানুষকে চাক্ষুস বলতে পারবে।

মমতাদি এখনো আসেন নি। সাজিদুলের মুখ নিঃসৃত উষ্ণ ভাপ নিশির মুখে লাগে, সে বলে, বাঁচতে ভালো লাগছে?

তুমি আগের মতনই আছ।

তাহলে তো তোমার কোনো সমস্যাই রইলো না, নিশি শ্লেষ মেশানো স্বরে বলে, সেরে ওঠো, তারপর এ বিষয়ে মন্তব্য করো। সাজিদুলের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে, আহ্ শরীরে এত কষ্ট।

শুধু শরীরে? বলেই নিশি অনুভব করে একজন মৃতপ্রায় মানুষের সাথে এভাবে এগুনো ঠিক হচ্ছে না। নিজের এই স্বভাবের প্রতি ওর ভীষণ রাগ হয়। সে বলে, দুধ বানিয়ে দিই?

সকালে খেয়েছি। যা খাই উগরে আসে। স্টমাকটা বিষাক্রান্ত হয়ে গেছে। সাজিদুল চোখ বোজে। নিশি অবাক হয়ে তার নিস্পৃহতা পর্যবেক্ষণ করে। এমন এক সময় ছিল, যখন নিশি কোথাও দেখা করবে বললে উপোস দিয়ে সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকত। নিশি তার এই স্বভাব জানত বলেই বাসায় আটকে গেলে সারাদিন পার করে হলেও, যেত। তাতেই সাজিদুলের চোখ-মুখ এমন উৎফুল্ল হয়ে উঠত! একটুও ক্রুদ্ধ হতো না। অভিমান দেখাত না, এই করেই সাজিদুল দিনের পর দিন নিশির কাছে বড় সহজলভ্য, মামুলি হয়ে উঠেছিল। নিশি জানতোই, সে ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত সাজিদুল অনন্তকাল দাঁড়িয়ে থাকবে। নিশি দশ

বছর সংসার করেও যদি তার কাছে যায়, তবে সে এমনই উদ্ভাসিত হবে, যেন, মাত্র গতকাল তারা বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। বিষ, মৃত্যু-যন্ত্রণা, নিশির উপস্থিতির কাছে এসব কিছুই না। সেই মানুষ গত কয়েকদিন নিশির দিকে এমনভাবে তাকিয়েছে, মনে হয়েছে, নিশি স্রেফ তার পরিচিত একজন। একটু কথা বলেই সে দীর্ঘ সময়ের জন্য চোখ বন্ধ করে রেখেছে। এ নিশির কাছে অবিশ্বাস্য লাগে, তার প্রচণ্ড জেদ হয়। এই সহজলভ্য মানুষটির প্রতি প্রবল কোনো আকর্ষণ ছিলো না তার। তবুও তারা ঠিক করেছিল বিয়ে করবে, জাহিদের প্রতি দুর্নিবার প্রেম তার মধ্যে তৈরি করছিল সীমাহীন নিঃসঙ্গতা। অনেকটা এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যই সে যুক্ত হয়েছিল সাজিদুলের সাথে। দু'বছর তারা স্বামী-স্ত্রীর মতো ঘুরেছে। সাজিদুলের চাকরির আয় মন্দ ছিল না। নিশির পরিবার থেকেও এ ব্যাপারে কোনো বাধা আসে নি। সে সকাল থেকে রাত অব্দি এই নিবেদিত মানুষটির ওপর নির্ভরশীল ছিল। নিজের নিস্পৃহতার সঙ্গে এজন্য তার চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব চলত। সে ভয় পেত, যে যুবকটির প্রতি সে রোমাঞ্চ অনুভব করে না, বিয়ের আগেই যার সাথে তৈরি হয়েছে স্রেফ দাম্পত্যিক অভ্যাস, তাকে নিয়ে কি করে সে জীবনের বাকিটা সময় পার করবে ? কিন্তু এতদূর চলে গিয়েছিল তারা, হুট করে সেখান থেকে চলে আসা মানে একটা বিশ্বাসহীন পৃথিবীর অপার মৃত্যুর দিকে সাজিদুলকে ঠেলে দেয়া। নিশির অস্থিরতা এক্ষেত্রে পরাজিত হতো। এই পৃথিবীতে আসলেই সাজিদুলের কেউ নেই। মার মৃত্যুর পর ওর বাবা আবার বিয়ে করে। এক সময় দ্বিতীয় মার প্ররোচনায় বাবা তাকে ঘর থেকে বের করে দেয়। মমতাদি ওর দূর সম্পর্কের দাদি হয়। লতাপাতা আত্মীয়, তবুও চাকরির সুবাদে কয়েকমাস মমতাদি যশোরে ওদের বাড়িতে থেকেছিলেন। তখনো বেঁচে ছিলেন সাজিদুলের মা। মমতাদির ভাষ্য, সেই মহিলার কাছ থেকেই তিনি মানুষকে প্রবলভাবে ভালোবাসার গুণটি শিখেছেন। সাজিদুল ঘরছাড়া হয়ে তাঁর ওখানেই গিয়ে ওঠে। নিজের ছেলেমেয়েদের পাশাপাশি তিনি সমান সম্মানে ওকে নিজের বাড়িতে রেখেছেন। এক মেয়ে দেশের বাইরে থাকে। স্বামীর মৃত্যু হয়। দুই ছেলে আলাদা হয়ে যায়। এছাড়া তার সবার ছোট ছেলেটি, ও-ই ছিল মমতাদির সবচেয়ে গোপন গভীর ক্ষত, পাগল হয়ে সে পাবনা আছে। এই একটি ব্যাপারে মমতাদির এতোটাই স্পর্শকাতুরে কৌতূহল থাকা সত্ত্বেও তার সম্পর্কে নিশি কোনো কথা তুলত না। এছাড়া সাজিদুল— সে-ই ছিলো মমতাদির শেষ সম্বল।

নিশিকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে সাজিদুলের মায়ায় তিনি কাছে টেনে নেন। ফলে ওরা যখন জানাল, গোপনে বিয়ে করে ফেলেছে, তখন প্রচণ্ড অভিমান নিয়েও ওদেরকে ক্ষমা না করে পারেন নি।

এই মিথ্যে নিশিকে পরবর্তী জীবনে দুঃসহ যন্ত্রণার মতো তাড়া করে বেরিয়েছে। এই মিথ্যের সুযোগে ওরা মমতাদির খালি ঘরে অবাধ থাকার সুবিধা পেয়েছিল। নিশি কলেজ থেকে সোজা ও বাড়িতে চলে যেত। সাজিদুল কাজ করত ফিল্ডে। ফাঁক বুঝে সেও আসতো। তখন শরীর আবিষ্কারের মজাটাই নিশির কাছে অদ্ভুত লাগত। সাজিদুলের স্পর্শের পুরোটাই ছিল নিখাদ প্রেমে পূর্ণ। এ জন্য তার মনকে গ্লানি স্পর্শ করার সুযোগ পেত না। এছাড়া যত দ্বন্দ্বই থাকুক, সে যেহেতু জানতই, যে কোনোভাবেই হোক সাজিদুলকেই বিয়ে করতে হচ্ছে, তখন ভেতর থেকে উত্থিত সংস্কারকে হাত-চাপা দিতে সময় লাগত না।

সেই মানুষ, যে চাকরির বেতন তুলে দিত নিশির হাতে, সারামাস তুমি আমাকে চালাও। যে নিশির অসুস্থতার সময় তার পিরিয়ডের ন্যাপকিন পর্যন্ত বদলে দিয়েছে, নিজের হাতে খাবার তুলে খাইয়েছে নিশিকে, সিগ্রেটের পয়সা বাঁচিয়ে ওর পছন্দের কসমেটিক পর্যন্ত কিনে এনেছে, সেই সাজিদুল যে অন্ধ ভিখিরি দেখলে রিকশা দাঁড় করিয়ে পয়সা দিত, একটা অফিসের চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল বস তাকে দু'নম্বরি করতে বলেছিল বলে, অবাধ সুযোগ থাকতেও একটা টাকাও সে বাড়তি উপার্জন করত না, তার কাছ থেকে কেউ লোন নিলে ফেরত দেয়ার কথা ভাবত না, আর তারই কী-না ছবি উঠল পত্রিকায়! সে অফিসের দু'লাখ টাকা মেরে দিয়েছে!

নিশির বাড়িতে বিস্ফোরণ হলো, এক সময় তার ধাক্কায় নিশি ছিটকে পড়ল বহু দূরে। তার আগে সে হামলে পড়েছিল সাজিদুলের ওপর, কী করেছ টাকা?

সাজিদুল নিরুত্তর।

টাকা তুমি মেরেছ, সেটা সত্যি?

হ্যাঁ।

কী করেছ?

নিরুত্তর।

বিছানা, বালিশ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোলপাড় করেও নিশি এর কারণ উদ্‌ঘাটন করতে পারে নি। এরপর কতকিছু, সাজিদুল উকিল ধরল না, কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে স্পষ্ট বলল, আমি চুরি করেছি। নিশি ওর বসের কাছে গিয়ে ভেঙে পড়েছিল, ওকে ক্ষমা করে দিন।

আপনি ওর কে?

স্ত্রী।

স্ত্রী হয়ে বের করতে পারছেন না, টাকা কী করেছে? এক দু'টাকার ব্যাপার?

আমি ওকে এতদিন ধরে জানি, এরকম কিছু ভাবতেও পারছি না। আর কী আশ্চর্য দেখুন, ও যে বিয়ে করেছে, এটাও অফিসে কাউকে জানায় নি। এ রকম মানুষই ভেতরে ভেতরে ডেঞ্জারাস হয়।

এ সমস্ত ব্যাপার নিশির অস্থিরতার পক্ষে গেল। সে সাজিদুলের সাথে অনন্ত জীবন হাঁটার একঘেয়েমি থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পেল। নিশি অনুভব করল, বিবেকের কাছে সে মুক্ত। জেলবন্দি সাজিদুলের পথ চেয়ে থাকার এ ক্ষেত্রে আর প্রশ্নই ওঠে না।

'হে আমার ক্রমঘনায়মান রাত্রি'

দীর্ঘমাস পর রাতে নিশি আচমকা নিজের ওপর আছড়ে পড়েছিল। মমতাদি, আমার পরিবার, সমাজ সবকিছুর সামনে আমার সিদ্ধান্তে কোনো অন্যায় ছিল না, এমনকি সাজিদুলের কাছেও, যে জানত আমার সমর্পণে বিন্দুমাত্র পাপ ছিল না, সে দুঃসহ জেলের দিনগুলিতে প্রতি মুহূর্তে আমাকে স্মরণ করেছে, আমাকে বলেছে, তুমি যথার্থ কাজ করেছ— হে অন্ধকার, নিভন্ত শামার শিখা, কেন এরপরও আমার স্বস্তি নেই? কেন সাজিদুলের এই

ঘটনায় আমার স্বপ্ন ভঙ্গ হয় নি? যেন অনেকদিন ধরে এ-ই ঘটুক, আমি চাইছিলাম। আমি একটা অবস্থার পাঁক থেকে বেরোনোর কী অনাবিল রাস্তাই-না খুঁজে পেয়েছিলাম!

নিশি রাতভর ছটফট করেছে, কেন সবার মতো আমিও ভাবি, আফজালের সঙ্গেই আমার প্রথম সংসার? বিছানায় ফুল বিছিয়ে, দু'জন হাত চেপে বলেছিলাম, এই আমরা একত্র হলাম, আজ থেকে আমাদের বিয়ে হলো— কেন এসবের কোনো অর্থই আমার কাছে থাকে নি? দু'জন সাক্ষীর সামনে দাঁড়িয়ে দু'এক মিনিট ব্যবধানের একটি সম্মতিই কি জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে গেল?

মমতাদির চোখে ভুতুড়ে ছায়া নেমেছিল, তোমরা বিয়ে কর নি?

করেছিলাম।

কাগজপত্র কই? বিচ্ছেদ না করে তুমি অন্য সিদ্ধান্ত কিভাবে নেবে?

আসলে এ ঠিক বিয়ে ছিল না।

নিশি তুমি এসো, আমার পক্ষে তোমাদের আর কোনোকিছু সহ্য করা সম্ভব হচ্ছে না।

তীক্ষ্ণ অস্বস্তি, যন্ত্রণা, গ্লানির পাঁকে নিশি ডুবে যাচ্ছিল। সেসব দৃশ্য মনে করে নিজের ওপর তার ধিক্কার জন্মেছে, আফজালকে শিশুর মতো আঁকড়ে ভাবতে চেয়েছে, এই প্রথম, আমি সদ্য ভূমিষ্ঠ হয়েছি। আমাকে তুমি বুকের কোথাও লুকিয়ে রাখ। আমার সারা অস্তিত্বে, অন্তরাত্মায়, আমার ভূমণ্ডলে জাহিদের তৃষ্ণা নিয়ে আমি ইচ্ছেমতো গড়িয়ে পড়েছি, গড়াতে গড়াতে আমার হাত গেছে, পা গেছে। অবশ দেহ ইচ্ছেমতো আটকে গেছে কাঁটাঝোপে, আমি চলৎশক্তি হারিয়েছি। তুমি আমাকে টেনে তোলো। আফজাল, তুমি আমার কবর-বন্ধু হও।

হ্যাঁ, আমি বিপথগামিনী, মিথ্যাচারী, কিন্তু একজন আসামি, যে তার খুনির চেয়ে ভয়ঙ্কর চেহারা লুকিয়ে আমাকে তার মোহে টানতে চেয়েছে, আমি সেই অসুস্থ পাপ মাড়িয়ে এসেছি। এরপরও যতটুকই জানে আফজাল, ওর নাম নিতেই যখন উচ্চারণ করে 'চোর', অক্ষম ক্রোধে লাফিয়ে ওঠে আমার সমস্ত অন্তরাত্মা। সাজিদুলের প্রতি অপার মমতায় ভেতরটা পূর্ণ হয়ে ওঠে। আফজালকে মনে হয় বড় সঙ্কীর্ণ, দূরবর্তী কেউ। আমি সেই নাজুক বিষয় নিয়ে কোনোমাত্র তর্ক না করে বুঝি, অস্থির, সিদ্ধান্তহীন ভুলে যে পতিত হয়, তার পতনের কোনো ক্ষমা হয় না, তার মতো নিঃসঙ্গ লোক পৃথিবীতে আর একজনও থাকে না।

সাজিদুল চোখ মেলেছে।

নিশি বলে, আমি যাচ্ছি।

ওর চোখে ঘোর কুয়াশা। দু'হাতে সেই ছায়া সরাতে সরাতে উষ্কো কণ্ঠে নিশিকে বলে, তুমি কখন এসেছ?

নিশি বলে, তুমি আবার গোলমাল লাগাচ্ছ, ঘুমোলেই তুমি অন্য জগতে চলে যাও, তোমার সাথে না কিছুক্ষণ আগে আমার কথা হলো!

হয়েছিল বুঝি? সাজিদুলের অবশ দেহ পুনরায় শাদা স্রোতে তলিয়ে যায়।

বৃদ্ধা বলে, সেদিন সন্ধ্যা থেকেই হারিকেনের শিখা দপদপ করছিল। আমার মনে তখনই ধাক্কা দিয়েছিল, বিপদ আসছে। হুগলিতেও, আমি তখন ছোট, এরকম বাতির শিখা দপদপ করছিল। সে রাতেই আমাদের বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল। মেয়েটাকে নিয়ে একা থাকি। গ্রামে দু'মাথার অজগর উঠেছে। সমাবেশ করে আবদুল খালিক সবাইকে সাবধান থাকতে বলেছে। বলেছে, ধর্মের দিকে মনোযোগী হতে, অজগর তার মায়াবলে নানা রূপ ধরে যখন যেখানে খুশি হামলা করতে পারে। সবার মতো আমিও বাড়ির চারপাশে তাবিজ পুঁতে রেখেছি। আমার এই মেয়েটা, ওর হাসির গমকে এই মরা দালানে উৎসবের ঢেউ বয়ে যেত। তোমাকে কী আর বলব, হারিকেনের শিখার কাঁপুনি দেখে সে রাত আমার সারা বুকে কী ধড়ফড়ানি! শেষ রাতে ঝিমুনি এসেছে, হঠাৎ শব্দ, চোখ মেলে দেখি, ডাকাতের মতো অন্ধকার। আমার বুকের জল শুকিয়ে এলো, এইতো এখানে হারিকেন ছিল, আমি কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসি, হা আল্লাহ, পাশে আমার মেয়েটা নেই। হীরা, হীরা... বলতে বলতে বৃদ্ধার স্বর ভেঙে আসে। চুলোর আগুন নিভে যাচ্ছে, জাহিদ চোঙা দিয়ে ফুঁ দেয়। গনগনে কয়লা চাগিয়ে ওঠে, ভাত ফুটছে, সবজি কুটতে গিয়ে দা মাঝখানে রেখে বৃদ্ধার হাত থেমে আছে, আমি ডাকছি হীরা... হীরা..., আবারো কান্নায় কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে আসে, হাতড়ে হাতড়ে বারান্দায় গিয়ে দেখি, কতগুলো ভুতুড়ে ছায়া, ওদের ছায়ার তলে কাটা মুরগির মতো ছটফট করছে আমার মেয়ে, জানো, আমি তখনো আমার মেয়েকে চিনি নি। চোখের জড়তা তখনো কাটে নি, আকাশ ফরসা হয়ে আসছিল; কিন্তু বারান্দার অন্ধকার তখনো কাটে নি। সবচেয়ে তাজ্জব বিষয়, প্রত্যেকটি ছায়া একই রকম, যেন পাঁচ-ছ'জন যমজ ভাই। আমি চিৎকার দিতেই ওরা আমার মুখ বেঁধে ওই যে বারান্দার খাম্বা দেখছ, ওটার সাথে দড়ি দিয়ে আমাকে বেঁধে রাখল। তারপর আমার চোখের সামনে আমার কচি মেয়েটাকে, যার তখনো পর্যন্ত শরীর খারাপ হয় নি...।

বৃদ্ধার কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে আসে।

আপনি গ্রামে কারো কাছে বিচার নিয়ে যান নি?

কাদের বিরুদ্ধে বিচার চাইব?

কাউকে চিনতে পারেন নি?

সবার চেহারা এক রকম। এলাকার চেয়ারম্যানের বাড়ি আরো দু' গ্রাম পর। আবদুল খালিকের কেরামতির কারণে এই গ্রামে তার প্রভাব বিশেষ খাটে না। তবুও সন্দীপন বুদ্ধি দিল, যান। আবদুল খালিক বলল, আপনি বলছেন সবার চেহারা এক রকম। এখন নিজের বুদ্ধি দিয়েই বুঝুন, এটা মানুষের কাজ কী-না। আমার মনেও সন্দেহ আসল, তাই তো! আমি বাড়ির চারপাশটা পরীক্ষা করে দেখেছি, ওরা যে পথে মিলিয়ে গিয়েছিল, সেই জায়গাটার তাবিজগুলো কেউ খুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। হীরা তখন ক্লাস ফাইভে পড়ত। আবদুল খালিক তাকে স্কুল ছাড়ানোর বুদ্ধি দিয়ে বলল বছরে অন্তত ছ'বার কোরআন খতম করতে, ওর শরীর শয়তান এসে নষ্ট করে দিয়ে গেছে। এতে করে সে তার পাপ থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি পেতে পারে।

হীরার আবার পাপ কী?

নিশ্চয়ই কোনো পাপ ছিলো ওর, মনের অজান্তে করেছিল, নইলে ওর দেহ শয়তানরা নষ্ট করবে কেন?

পৃথিবী উজাড় করে পূর্ণিমার ঢল নেমেছে। দূরের ঘন বৃক্ষের সারি, সবুজ শস্যের মধ্য দিয়ে বয়ে যাচ্ছে উন্মাতাল বাতাস। শাঁ-শাঁ শব্দের এমন মাদকতা যেন মহাশূন্যে বসে বাঁশি বাজাচ্ছে কেউ।

জাহিদের করোটিতে ঝনঝন শব্দ বাজে, সে দাঁড়ায় অকৃষ্ট পথটির মাঝখানে। এই অহিংস্র রাত, জোছনার সফেন জল, মহীরুহ বটবৃক্ষ জাহিদকে টেনে নিয়ে চলে অজানা রূপকথায়, সে হাঁটতে থাকে। হীরা— খর জিহ্বায় তিতকুটে স্বাদ ওঠে, থুথু ফেলে ফের হাঁটে। রোজেলিন বলে, ডেঁপো ছেলে। বাবা পুতুলের স্বরে বলে ওঠেন, পাঁনি খাঁবো। অজস্র কেশভারে নুয়ে আছে বৃক্ষ, বাঁক ঘুরলেই পুরনো গোরস্থান, যেন স্বপ্ন থেকে নেমে আসছে কুমারী কন্যারা। কুমারী, অনাঘ্রাতা— নিশিকে ছুঁতেই ও কেমন কুঁকড়ে উঠেছিল। জাহিদ দেখত, কথা বলছে, কিন্তু তার বুড়ো আঙুল কাঁপছে। ওই কম্পন দেখতে ভালো লাগত।

নিশি বলেছিল, আমার একটাই সমস্যা, কাউকে অপমান করতে পারি না। আমাদের পাশের বাসার একটি ছেলে, জানো, একদম পাত্তা দিই না, ক'দিন ধরে এমন ভয় লাগছে, মনে হচ্ছে, ও আত্মহত্যা করবে। কেমন উস্কো চোখে তাকায়, মনে হয়, জীবনের প্রতি মায়া নেই। জাহিদ হেসে বলেছিল, শুধু নিজের একার ভালোবাসার ভারে কেউ মৃত্যুর পথ বেছে নেয় না। যেভাবেই হোক, সে তোমার প্রশ্রয়ও পাচ্ছে, ওই যে বললে, অপমান করতে পার না, কোনো-না-কোনোভাবে তুমিও তার প্রতি সস্নেহ ছিলে, নিশি জাহিদের সাথে এগুতে পারত না, ওর মুখ লাল হয়ে উঠত, জড়িয়ে যেত সব, বলেছিল, বিশ্বাস কর, আমার জীবনে এই প্রথম—। এরপর রোজলিন, জীবনে প্রথম— জাহিদের চোখ ছায়া হয়ে আসে, শুনিয়েছিল মৃত্যুদূতের গল্প। নরক থেকে নেমে এসেছে মৃত্যুদূত, একটি মেয়ের কাছে। নেমেই স্তব্ধ হয়ে গেল তার রূপ দেখে, তার স্নায়ু অবশ হয়ে আসল, যেভাবেই হোক একে জীবন্ত অবস্থায় নিয়ে যেতে হবে আমার সঙ্গে, পরক্ষণেই প্রাণে আতঙ্ক জন্মাল, আমার বাস নরকে। এই অপাপস্নিগ্ধ মুখ, এই রূপ মাধুর্য, একে আমি কীভাবে সেই জায়গাটায় রাখি? রাক্ষসের মতো চেহারা যার, সেই নিষ্ঠুর মৃত্যুদূত তার প্রথম প্রেমের কাতরতায়, অক্ষম আক্রোশে শিশুর মতো কাঁদতে লাগল।

জাহিদ বলেছিল, নিশি আমাকে নিয়ে কোনো স্বপ্ন দেখো না। এসব কিছুর জন্য কখনো আমার মধ্যে কোনো প্রস্তুতি তৈরি হবে না।

জীবন কী? প্রশ্ন করেছিল নিশি, জীবন তবে এই, আমি যা সারাজীবন খুঁজে পেয়েছি, তা হারাতে হবে?

জাহিদ হেসেছিল, বিস্তৃত রেল লাইনে ছিল বাতাস, ওর কণ্ঠ সেই স্রোতে অস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। জীবন কী, এর কোনো নিশ্চিত উত্তর দেয়া সম্ভব? একজন শিল্পী এই প্রশ্ন নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল পথে, কেউ বলে, জীবন মানে ভূমিষ্ঠ হওয়ার একটা দুর্ঘটনা। কেউ বলে, জীবন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া একটা পথ মাত্র।

কেউ বলে, জীবন হলো সমুদ্র, যতই তল খোঁজো, ততই জল অথবা পৃথিবীর মতো, শেষ প্রান্ত খুঁজতে খুঁজতে এসে দাঁড়িয়েছে সূচনা-বিন্দুতে। কেউ বলে, সম্ভোগ, কেউ রহস্য, কেউ অর্থ, প্রখর রোদের চাষী সবুজ শস্য দেখিয়ে বলে, এই।

হীরাকে যদি প্রশ্ন করা হয়, বলবে যমজ ছায়া। বিড়ির ধোঁয়া পূর্ণিমার নহরের মধ্যে ঢুকে পালাতে থাকে। খেতের অংশে বারংবার ধাক্কা খায় জাহিদ, নিজেকে সামলে সে দাঁড়ায় ইটখোলার সামনে।

এ ইটখোলার চিহ্নমাত্র, কেবল গাছ। সারা গ্রামে মাঝেমধ্যে প্যাঁচার অকস্মাৎ ডেকে-ওঠা ছাড়া কোনো শব্দ নেই। আমি কোত্থেকে এসেছি ? উন্মাদপ্রায় আলোর ঘূর্ণির নিচে দাঁড়িয়ে জাহিদ নিজেকে প্রশ্ন করে। সেই প্রশ্ন তাকে এত ফাঁপা আর বায়বীয় করে তোলে যে, সে কাতর বোধ করে। সে ডেঁপো, ইনোসেন্ট অথবা পরমহংস শিশু, সে আজন্ম মন্ত্রমুগ্ধ, বালক বয়সের রাতপাখি তাকে চিরনিদ্রা পাড়িয়ে গিয়েছে, তার পায়ের নিচের রুপোর কাঠিতে কালসিটে দাগ পড়েছে, কে বদলায় ? এরপর বাবা, কাটা মোরগ যেন, অস্ফুট কণ্ঠে গোঙাতেন, আমাকে বিষ দে। ফিসফিস করতেন, এই যে ইনজেকশন পুশ করতেছিস, এ দিয়া শেষ কইরা দে, সত্যি বলতেছি আমি মৃত্যুর পর সব দায় আমার মাথায় তুইলা নেব, তোর বেহেশত হবে।

রোজলিনের বদলির খবর পেয়ে জাহিদ কাচের টুকরো দিয়ে হাত কেটে তার সামনে দাঁড়িয়েছিল, টপ টপ করে রক্ত ঝরে পড়ছে, কী কঠিন মুখ রোজলিনের! বলল, আমার ব্যাগে ব্যান্ডেজ আছে, বেঁধে নাও, অথচ বেড়ালের ঠ্যাং ভেঙে দিয়েছিল দস্যি ছেলেরা, তাকে জড়িয়ে ধরে রোজলিনের সে কী কান্না, এ কোনো মানুষের কাজ ?

জাহিদ অন্ধকারে তলিয়ে গিয়েছিল, ঈশ্বর, আমি কেন বেড়াল হলাম না ?

বাঁয়ে গর্ত, পুরো জোছনা শুষে নিয়ে জল হয়ে উঠেছে রহস্যময়। কুয়াশার মতো ধোঁয়া উড়ছে কোথাও। এখন এই স্তব্ধ জোছনায় সত্যিই যদি উঠে আসে অজগর— কেমন শীত লাগে জাহিদের। পরনের নীল শার্ট উর্ধ্বমুখী উড়তে উড়াতে স্তব্ধতা কাটায়। তারপর দাঁড়ায় গোরস্থানের সামনে।

যে রকম জাঁকালো জঙ্গল, তাতে বিষধর সাপের বাস বিচিত্র নয়। যেন কয়েক শতাব্দী ধরে মানুষের পা পড়ে না এখানে। অবাধ স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী ঘনঝোপ বিটকেলে ভঙ্গিতে গ্রামবাসীকে ভয় দেখাচ্ছে।

গর্ত থেকে শেয়াল উঠে এসেছে। ফকফকে জ্যোৎস্নায় একজন জ্যান্ত মানুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শেয়ালের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে। জাহিদ প্রশ্ন করে, অনেকদিন তো গোর হয় না। হাড্ডি খেয়েই আছেন ?

শেয়াল ভাবে, ভুল দেখছি বুঝি। এরপর চোঁ-চোঁ দৌড় দেয়।

কবরস্থানে দাঁড়িয়ে জাহিদের চোখে অস্পষ্ট ভাসে গোর খাদকের মুখ। মৃতা নারীর সামনে মাথা নত করে দাঁড়িয়েছিল রোজলিন। বলেছিল, গির্জায় মাঝেমধ্যে দেখা হতো, আহা বেচারি! মৃতার হাতে ঝলসে উঠেছে আংটি। রোজলিন বলেছিল, ওর শেষ ইচ্ছে, এই আংটিসহই সে সমাধিস্থ হবে। তুমি দেখেছ জাহিদের কাজ ? আমি পৃথিবীর কোথাও আংটির এমন ডিজাইন দেখি নি। বেচারি একদিন এটি আমাকে পরতে দিয়ে বলেছিল, রোজলিন তোমার আঙুলগুলো আমাকে দাও, বলতে বলতে রোজলিনের চোখ ঝাপসা হয়ে উঠেছিল।

এরপর রাতে জাহিদ ছুটে গিয়েছিল সমাধির পাশে। সেখানেই গোরখোদকের বাড়ি। গোরখোদক বলল, আমরা আগেই পরীক্ষা কইরা দেখছি, এ মূল্যবান কোনো জিনিস না, স্রেফ রুপা। সাধারণত এইসব ক্ষেত্রে মূল্যবান জিনিস থাকে। হাজার হইলেও শেষ ইচ্ছা, গোরে রাইখা আত্মীয়রা চইলা গেলে দালালরা আসে। মূল্যবান কিছু হইলে খুঁইড়া বাইর করি, দালালগিরির মাধ্যমে ব্যবসা হয়। এই আংটি উদ্ধার করা মানে গোর খোঁড়ার কষ্টটাই জল। জাহিদ মরিয়া হয়ে উঠেছিল, আমি তোমাকে টাকা দেব।

তুমি বাচ্চা ছেলে, গোর খোদকের মুখ কেমন বুড়োটে, শিথিল চামড়ায় বড় বড় ক্ষতের মতো দাগ, ফ্যাসফেঁসে গলায় সে হাসে, তুমি টাকা পাইবা কই ?

আমার মাটির ব্যাংকে আছে, যা জমিয়েছি সব দেব।

মহাবিরক্ত গোরখোদক ধমকে উঠেছিল, তুমি এই দুই পয়সার জিনিস নিয়া কী করবা ? ঠিক আছে, আগে টাকা নিয়া আস। তারপর কথা কইও। পাগল!

এরপর স্তব্ধ রাতে গোর খোঁড়ার দৃশ্য। ভয়ে জাহিদের দাঁত লাগার উপক্রম। মনে হচ্ছিলো সব লাশ কবর থেকে উঠে এসে সশব্দে তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে। এত ভয় সে জীবনেও পায় নি। পুরো দৃশ্যটাকেই তার মনে হচ্ছিল কোনো হরর ছবির। সত্যিই যখন কবর খোঁড়া শেষ, জাহিদের অকস্মাৎ মনে হলো, আজ রাতেই তার মৃত্যু হবে। রক্তহীন শাদা চোখে ওই অবস্থায় প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে তাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল রোজলিনের মুখ।

এরপর সে নির্জন গলি ধরে পকেটে আংটি নিয়ে যখন রোজলিনের বাড়ির দিকে যাচ্ছিল, তার মনে হচ্ছিল, এর চেয়ে আর কোনো বড় পরীক্ষা দেয়া এ জীবনে কখনো সম্ভব হবে না। রোজলিন আজই সত্যিকার তাকে বুঝতে পারবে। তার এই দুঃসহ প্রেমও যদি রোজলিনের ভেতর থেকে বয়সের ব্যবধান মুছতে না পারে, তার জীবনে আর কিছু দিয়ে তাকে পাওয়া জাহিদের পক্ষে সম্ভব হবে না। অস্থিরতায়-উত্তেজনায় রক্তবর্ণ হয়ে উঠছিল তার মুখ। সত্যিই সে অসাধ্য সাধন করেছে।

দরজা খুলে দেয় ওর আত্মীয় মহিলা।

রোজলিন বিস্মিত ভঙ্গিতে বলে, কী ব্যাপার জাহিদ, এত রাতে ?

আমি একটা অঙ্ক বুঝছি না।

বিকেলেই না তোমাকে পড়িয়ে এলাম, তখন বলো নি কেন ?

তখন খেয়াল করতে পারি নি। অথচ কালই তো পরীক্ষা।

রোজলিন গম্ভীর মুখে টেবিলে বসে বলে, বই কোথায় ?

সত্যিই আপনি চলে যাচ্ছেন ?

এবার রোজলিনের মুখ কোমল হয়ে ওঠে। আমি কি ইচ্ছে করে যাচ্ছি বলো ? আমাকে যেতে হচ্ছে, ওখানেই আমার সবাই থাকে, এখানে অন্য বাড়িতে থেকে— তুমি এসব বুঝবে না।

আমাকে প্রাইভেট পড়াবে কে ?

রোজলিন হেসে ওঠে, তুমি সত্যিই পাগল। এখানে টিচারের অভাব আছে ? তা তোমার অঙ্ক বই কোথায় ?

আপনি কবে যাচ্ছেন ?

যখন যাব তোমাকে অবশ্যই বলে যাব।

পকেট থেকে টেবিলে আংটিটা রেখে জাহিদ উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে। পাঁশুটে আলোয় রোজলিনের মুখ হয়ে উঠেছিলো মরা মানুষের মতো। আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল তার চোখ, এ তুমি কোথায় পেলে ?

জাহিদ নিষ্পলক চেয়ে থেকে বলেছিল, এ আমি কবর খুঁড়ে এনেছি আপনার জন্য। মৃতার আঙুলে এটা মানাচ্ছিল না।

কী বলছ তুমি ? গোর খুঁড়ে এনেছ ? এরপর সে দাঁড়িয়ে জাহিদকে সশব্দে দরজার বাইরে ঠেলে দিয়ে বিকারগ্রস্তের মতো বলতে শুরু করেছিলাম এ ওর স্বামীর দেয়া ছিল। তুমি শিশু নও, ছদ্মবেশী শয়তান, হা ঈশ্বর, আমাকে রক্ষা কর।

আরেকটি শেয়াল উঠে আসছে, ফরফরে বাতাসে জাহিদের চুল ওড়ে 'কঠিনেরে ভালোবাসিলাম।'

পরদিন ভোর থেকে রোজলিনকে সেই শহরে আর দেখা যায় নি। জাহিদ মনে মনে অনেক খুঁজেছে তাকে, পথে-প্রান্তরে, অলিগলির বিভিন্ন স্কুলে, তার বয়েসী মেয়েদের মধ্যে, যুবক হয়ে ওঠার পর নিশির মধ্যে, পায় নি।

এরপর তার মধ্য থেকে রোজলিন মরে গেছে। তার আকর্ষণ মরে গেছে, একটি বয়সের প্রত্যাখ্যান তার মধ্যে যে মরণ ক্রোধ এনে দিয়েছিল, তার মধ্যেও ক্রমান্বয়ে মরচে ধরেছে। ফুটপাতে বসে কড়া চায়ে চুমুক দিয়ে ভেবেছে, এই মুহূর্তটাই জীবন। এই যে গোরস্থান, সত্যিই যদি সেখান থেকে বেরিয়ে আসতো কোনো রূপকথার সাপ, দর্শন করতে পারলে সহজ স্বাভাবিক চিরচেনা জীবনের বাইরে মুহূর্তের জন্য হলেও সে অন্য কিছু ভাবতে পারত। জাহিদ গোরস্থানের বাঁক ঘুরে, আঁকাবাঁকা আল মাড়িয়ে ভাবতে থাকে যমজ ছায়াগুলোর কথা। হীরার স্তব্ধ ফোঁপানো মুখে তারা ঠেসে দেয় পাশবিক মৃত্যু। জোছনার রঙ বিস্বাদ হয়ে ওঠে, মিহি আলোর স্রোত : পথে জ্বলে ওঠে অগ্নি। রাতের ব্রহ্মতালু ফেটে যায়। উত্তেজিত জাহিদ ছিটকে এসে দাঁড়ায় গ্রামের শেষ প্রান্তে। পরক্ষণেই চামড়া খুঁড়ে ঢুকে যায় মরা চন্দ্রালোক। পাঠশোলা ঘেরা কাঙ্ক্ষিত বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে সে অবসাদ বোধ করে।

ক্যাডা ? ভেতর থেকে কাশির গমক-মেশানো স্বর শোনা যায়। জাহিদ ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। দেউরির সামনে এসে দাঁড়ায় আবদুল খালিক। জাহিদকে দেখে তার দু'ভুরুতে বিস্ময় সঞ্চারিত হয়।

জাহিদ অবাক হয়ে জ্যোৎস্নার অপার্থিব আলোয় প্রত্যক্ষ করে আবদুল খালিকের রূপ। তার দীর্ঘ দেহ, দাড়িসজ্জিত মুখমণ্ডল— সেদিন রোদ এবং লায়লার রূপের কাঠিন্যে একে দেখা হয়ে ওঠে নি। সে কেমন অস্বস্তি বোধ করে, কিছুক্ষণ কথা বলতে পারে না, অতঃপর আবদুল খালিক জানতে চায় বৃত্তান্ত। অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে জাহিদ নিজের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরে জানায়, সে কোলকাতা থেকে ক'দিন হয় বোনের বাড়ি এসেছে। হীরার মা

সম্পর্কে তার খালাতো বোন, যা হোক, সে আবদুল খালিকের কাছে এত রাতে এসেছে একটি জরুরি কাজে। আবদুল খালিক অপেক্ষা করে।

জাহিদ বলে, আমি ঠিক করেছিলাম এই গ্রামে কিছুদিন থাকব। কিন্তু আজ সন্ধ্যার পর হঠাৎ তন্দ্রা আসে। স্বপ্নে দেখি দুই মাথা অজগর আমার দেহ বেষ্টন করে আছে। আমি তার পেটের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছি। এরপর থেকে নিজেকে নিয়ে আর স্বস্তি পাচ্ছি না। আমি আপনার কাছ থেকে একটা তাবিজ নিতে এসেছি।

বিস্তৃত জ্যোৎস্নার দিকে দৃষ্টি মেলে দেয়া আবদুল খালিকের চোখে অন্য এক ছায়া খেলা করে। সে ভীত বিহ্বল চোখে জাহিদের পায়ের দিকে তাকায়। ভালো মতন পর্যবেক্ষণ করার পর চোখ সুস্থির হয়ে আসে।

আহেন, বাইরে যাই।

ওরা কাচারির বেঞ্চে গিয়ে বসে। আবদুল খালিক অস্ফুটে যা উচ্চারণ করে তার সার কথা হলো, প্রাণের ভয় যার এত প্রবল, সন্ধ্যার স্বপ্নের পর যার এক রাতও অপেক্ষা সহ্য হয় না, সে কী করে এমন আজব জ্যোৎস্নার রাতে একা পথে এতো দূর আসে ? যে গ্রামে এমন রাতে ভয়ে ঝিঁঝির গলা থেকেও শব্দ বের হয় না ?

আমার পায়ে আপনি কী দেখছিলেন ?

জিন মানুষের বেশে আসে, তাগোর ধরনের একটাই উপায়, তাগোর পা থাকে উল্টা। সুস্থির হয়ে জাহিদ বিড়ি খাওয়ার অনুমতি চায় এবং জানতে চায়, তিনি কোন পদ্ধতিতে তাবিজ দান করে থাকেন। ব্যাপারটা জানলে জাহিদের পক্ষে সবকিছু সুবিধের হয়।

বিড়ি খাইবেন না, একটু তীক্ষ্ণ শোনায় আবদুল খালিকের কণ্ঠ, এসব বাজে গন্ধের রাস্তা ধইরাই অমঙ্গল আহে। এরপর সে রহস্যময় চোখে তাকায়, আপনের তো ডর-ভয় কিছু নাই, কিসের তাবিজ চান ?

আসলে আমি..., জাহিদ আবার পুরনো ছায়াগুলোর ঘোরে পড়ে যায়, তার ঘাড়ে পিতার লাশ, মনে হচ্ছিল, কী হাল্কা, আজ থেকে মুক্তি হলো, দু'রাস্তায় সার সার কৃষ্ণচূড়া, তার লাল ফেটে রক্ত ঝরছে। সেই রক্ত দু'হাতে মেখে অস্ফুট আত্মা চিৎকার করছিল, স্বাধীন!

এরপর অস্পষ্ট চোখ খুঁজতে থাকে নিশির জন্মদাগ। তার চোখ চলে যায় খাঁ-খাঁ শূন্য গ্রামে। অনেকগুলো বাড়ি পরিত্যক্ত, ভাঙা। কোনো বাড়ির শুধু চিহ্ন আছে, টিন, বেড়া নিয়ে গেছে জীবিতরা, কলেরা এসে একটি কোলাহলমুখর গ্রামের এই মরণদশা করে গেছে। ফতোয়ার কারণে বেশিরভাগ মানুষই খাবার স্যালাইন খায় নি, ওসব শয়তানের পানি, এইসব হ্যানোতানো বলে ওসব তারা বর্জন করেছে। ঘরে ঘরে পানি পড়া নিয়ে গেছে আবদুল খালিক। আসলে স্বপ্ন দেখার পর একটা ভয় তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে আপনার বাড়ি অব্দি, আমার জ্যোৎস্নার হিসেব ছিল না, বলতে বলতে জাহিদ পকেটে হাত ঢোকায়, আপনার কাছে তাবিজ আছে ?

দ্যাহেন, আবদুল খালিকের কণ্ঠ গম্ভীর, তাবিজ আমার তৈরি করা থাহে না। মানুষের রোগ বুইঝ্যা তয় আমি হেইডা তৈরি করি। আপনের বৃত্তান্ত বলেন, আমি হেই মতো...।

আমার বৃত্তান্ত ? জাহিদের বুক খালি হয়ে আসে চায়ের তৃষ্ণায়। এরপর চলে যায় রোজলিনের জন্মদাগে, তার কনুইয়ের ওপর দিকে ছিল সেটা, বলত, এ ইউরোপের মানচিত্র। তারপর নিশির সাথে মরণ যুদ্ধ, তোমার জন্মদাগ দেখব। আশ্চর্য, নিশিরও ছিল, কিন্তু সবকিছুতেই স্নায়ুচাপে ভোগা এই মেয়েটার ওই একটা ব্যাপারেই জোরদার জেদ ছিল। বলেছিল, সে তো অনেকেরই থাকে, আমারও আছে। তাতে হয়েছে কী ?

আমি সেটা দেখব।

নিশি রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছিলো, আমার দাগ যেখানে আছে, তোমাকে দেখানো যাবে না।

হু-হু হাওয়ায় জাহিদ কেমন হালকা হয়ে ওঠে, আপনার সম্মানী কত বলুন ?

যে যা দেয়, আবদুল খালিকও যেন অপার্থিব আলোয় বসে কেমন ভাবালু হয়ে ওঠে, কী আর করুম অর্থ দিয়া ? আল্লায় চাইছে, মরা গোরস্থানে পইড়া রইছি।

আবদুল খালিকের বেদনামেদুর শব্দের গুঞ্জরণে যেন এতক্ষণে মূর্ত হয়ে ওঠে তার জীর্ণ বাড়িটি। জাহিদ বলে, আপনি এখানকার শীর্ষস্থানীয় লোক, গ্রামের এক কোনায় পড়ে আছেন কেন ?

আবদুল খালিক হাসে, সবে আইছেন; ধীরে ধীরে বেবাকই হুনবেন, অন্দরে পরিবার একলা, আমার উডন লাগে।

পকেট থেকে বেরোয় চকচকে নোট, ধবল আলোয় আবদুল খালিকের চোখ কপাটি লাগার উপক্রম, পাঁচশো! এত ক্যান ?

আমার জীবন-রক্ষার তাবিজ দেবেন, আপনি একজন সম্মানী লোক, পাঁচশ' টাকা আমার জীবনের চেয়ে বড় ? জাহিদ হাসতে থাকে।

যে লোকটি কিছুক্ষণ আগেও অর্থ সম্পর্কে চূড়ান্ত অনীহা প্রকাশ করেছিল, মুহূর্তে সে-ই অসংলগ্ন হয়ে পড়ে, এই রহম কইরা আজকাইল আর কেউ বুঝে না। পরক্ষণেই অদ্ভুত স্থিরতায় নিজেকে সামলে নেয়, ঠিক আছে, আইজ আপনের গায়ে সুরা পইড়া ফুঁ দিয়া দিতাছি, আল্লাহর নাম লইয়া সোজা বাড়ির দিকে হাঁটা দেন, ইনশাল্লাহ আইজ রাইতে কোনো বিপদ আইবো না, আপনে একটু কষ্ট কইরা আগামী কাইল বাদ আছর আইসেন।

শেভ হয় নি কয়েকদিন। গালে হাত দিয়ে জাহিদ কেমন অস্বস্তি বোধ করে, এরকম দাড়ি সমেত আসার ব্যাপারটা অবশ্য আবদুল খালিকের পক্ষেই যায়, সে আরো কিছু বলতে চায় বিশেষত যমজ ছায়া প্রসঙ্গে, কিন্তু এত রাতে সবকিছু আবার অর্থহীন মনে হয়। কিছুক্ষণ পর তার কাছে সব হাস্যকর হয়ে ওঠে, ঠা-ঠা জোছনায় দাঁড়িয়ে সে হাসে, নিজেকে নিয়ে তবে কি তুরুপের খেলায় মেতেছি ? বহু বছর পর নিজেকে সে যেন নতুন করে আবিষ্কার করে, আমার এই গ্রামে আসার আসল উদ্দেশ্য কী ?

মাঝখানে মোমবাতি।

হঠাৎ হেলে পড়েছে। স্তূপীকৃত মোম পুনরায় ঠেসে দিয়ে স্পষ্ট করে তাকায়, টেবিলের ওপারে আফজালের মুখ অস্পষ্ট, খাবার নাড়ছে। নিশির স্নায়ুচাপ বাড়ে। দেরি করে ফিরেছে, ফিরেই কঠিন গম্ভীর মুখ, বারংবার প্রশ্ন করেও উত্তর মেলে নি। টেবিলে সব

অসংলগ্ন, গেলাস একটা, ঠাণ্ডা বোতল দেয়া হয় নি, বোন প্লেট নেই, এছাড়া দু-তিনটা উটকো কাপ। বাতি চলে গেল। কী বিচ্ছিরি গরম, এর মধ্যে আফজালের হিম মুখ।

ক্রমশ পায়ের পাতা জমে যাচ্ছে। নিশির এরকম হয়, বাতি চলে গেলে, যখন খণ্ডবিখণ্ড আলো, তখন সামান্য কারণে আতঙ্ক বাড়ে। ছেলেবেলায় কেউ কানের কাছে ফুঁ দিলে সে অজ্ঞান হয়ে যেত। ছিরিবিরি আলোয় স্নায়ুতলে ভয় জমে, মনে হয়, অজানা জিঘাংসা নিয়ে ওর সমস্ত অস্তিত্বের ওপর লাফিয়ে পড়বে কেউ। সে ছুরিতে শান দিচ্ছে। হাতের ভাত শুকিয়ে যায়। পেট ফুঁড়ে ফাঁপা ঢেকুর ওঠে, এরপর হেঁচকি। এই সময় বিশেষত হাসিকে তার মনে পড়ে, এরপর জাহিদ— এই নামের শব্দেই কেঁপে ওঠে; যেন আফজালের হাত থেকে চামচ পড়ে গেল। কিছু পড়ার শব্দ নয়, তার ভেতর থেকে উত্থিত নামটি শব্দাকারে শোনা গেল, তার ধাক্কাতেই আফজালের হাত থেকে চামচ পড়ে গেছে। সে হাতড়াতে থাকে।

নিশি বলে, বাতি আসুক।

তারপর স্তব্ধতা।

দেয়ালের ছায়াচিত্রমালা একেকটা মুণ্ডু হয়ে উঠেছে, মানুষের, জীব-জন্তুর। সে লোডশেডিংয়ের যন্ত্রণা নিয়ে দু'একটি কথা বলে। পুরো পরিস্থিতিতে যা অর্থহীন হয়ে ওঠে। হেঁচকি থামাতে পানি খায়, মাঝপথে আটকে আটকে বলে, রাস্তায় এত ফকির, একজন কাজের মানুষ পাচ্ছি না, আমি একা একদম পারছি না।

এতক্ষণে তরঙ্গ ওঠে, ঠাণ্ডা গলায় আফজাল বলে, বাইরে তোমার অনেক কাজ, অসুবিধা তো একটু হবেই।

যাহোক সূত্র পাওয়া গেল, নিশি সোচ্চার হয়, স্পষ্ট করে বলো।

আজ অফিসে লিপি এসেছিল একাউন্ট খুলতে, আফজাল মাঝখান থেকে বাতি সরিয়ে নিশির দিকে তাকায়, বলল, গত এক মাস যাবৎ তোমার কলেজ বন্ধ।

সাজিদুলের আধমরা মুখ ঢেকে যায় ক্লোরোফর্মে, যেন-বা রোমশ জন্তু দাঁড়িয়েছে সামনে, নিশির করোটিতে ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ হয়, তার মানে তোমার প্রশ্ন, কলেজের নাম করে আমি কোথায় যাই?

আফজাল হাসে, গ্রেট ভণ্ড তুমি, নিজেই প্রশ্নটা করে পুরো বিষয়টাকে হালকা করে তুলতে চাইছ। ভয় পেয়ো না, আমি কোনো কৈফিয়তও চাইব না, তুমি নিজেই স্থির কর, তোমার কী করা উচিত?

তুমি কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বলছ?

এ বিষয়ে তোমার নির্বিকারত্বও চমৎকার, আমি এত বছরে তোমাকে চিনি নি, কী মূর্খ আমি! নিজেকে নিয়ে আমার দুঃখ এইটুকুই।

আফজাল টেবিল ছেড়ে দাঁড়ায়, নিশি কঠিন কণ্ঠে বলে, সব বাদ দিয়ে একটা কথা শুধু বলো, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর কী না?

নিশি, এরকম প্যানপ্যানানি অসহ্য ঠেকছে, আর একটি শব্দ যদি উচ্চারণ কর, তুমি জানো আমার একটা অসভ্য রূপ আছে...।

সেই রূপ আমি চিনি, বলেই নিশি অস্পষ্ট আলোয় আফজালের চোখ দেখে ভীত হয়ে ওঠে, সম্পূর্ণ ফাঁকা বাড়ি, নিশির কেউ নেই। সামনে যে, তার চোখ গনগনে কয়লার চেয়েও ভয়াবহ, নিশি একে ঠিক চেনে না। সে সন্তর্পণে চুপ মেরে যায়। বেসিনে হাত ধুয়ে আফজাল শুয়ে পড়ে।

ঘুটঘুটে বারান্দায় সহস্র মশা। নিশি দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে। যেন রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছে কার্নিশ বেয়ে। নিজেরই রচিত ক্ষতস্থানের দিকে একঠায় চেয়ে থাকে। এক সময় পট্টি লাগিয়ে বিছানায় এসে বসে, জানো, কাচে পা কেটে গেছে।

আফজাল নড়ছে না। দপদপ করছে মোমবাতি, নিশি বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে, আমার একটা বাচ্চা হয় না, কতোদিন হয়ে গেল। আমার জীবনটা কী করে যায়? ধর বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফুটপাতে ঘুরি, ধর সেফটিপিন কিনতে যাই, তুমি কিচ্ছু না জেনে কিচ্ছু না দেখে— এই বিশ্বাসে মানুষ স্ত্রীর সঙ্গে বাস করে? তার গর্ভে নিজের ভ্রূণ রাখতে চায়? এরপর একটি শিশুর হাহাকার নিশিকে স্রোতোময় করে তোলে, সে কাঁদতে থাকে দীর্ঘ টানা রাত ধরে। আফজালের স্তব্ধতা কাটে না। এক সময় নিশি থিতিয়ে যায় নিজের মধ্যে, এই পৃথিবীতে আমার কে আছে আমি ছাড়া? খরতরঙ্গের ঢেউ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, সে ভাসতে ভাসতে বলে, হেই হাঙর, আমাকে খেয়ে ফেল।

হাঙর বলে, তুই খুব তেতো!

মা, মা আমি বুঝি তেতো?

ভাইজান বলে, তুই যে জেদ করে হাঙরকে ডাকলি সেটা বুঝি দোষ নয়? ছেলেবেলা আসে। বানরঅলার পেছন পেছন চলে যাচ্ছে অনেকদূরে, পথ হারিয়ে ফেলছে। মা মাগো, আমাকে রাক্ষসেরা খেয়ে ফেলবে। প্রাণের ভয় জন্মাবধি, প্রতি মুহূর্ত তাকে তাড়িয়ে ফিরেছে, বিকেলে বাবা হয়তো প্রশ্ন করছেন, কী করছ নিশি? নিশি আচমকা লুডু ফেলে দাঁড়াল, পড়ছি।

সাপলুডুর অজগর বারবার ওকে খেয়ে ফেলে, নিশি বারংবার লেজে চলে আসে। বাঁচার সেকী প্রাণান্তকর চেষ্টা! এর মধ্যে জাহিদের রূপকথা, শুধু বিষাদ! সেই গল্প, রাজকুমারীকে ভালোবাসত দু'জন, একজন রাজপুত্র, একজন বাঁশিঅলা, রাজকুমারীর জন্মদিনের উৎসবে রাজপুত্র এলো, রথ ভর্তি হীরে-জহরত নিয়ে। সেই বাঁশিঅলা পাঠাল তার হৃৎপিণ্ড। যে ছেলেটি বয়ে নিয়ে এসেছিল তাকে দেখে রাজকুমারী ছটফট করে ওঠে, এ দেখছি রক্তে ভরে আছে! কী দুর্গন্ধময়! সরাও সরাও। ছেলেটি বিস্তারিত বললে রাজকুমারী হতাশ কণ্ঠে বলে, ও-ই বুঝি বাজাত? চমৎকার সুর ছিল। হায়! আর শুনতে পাব না।

সেই জাহিদ, আজব করুণ মুখ ছিল যার। নিশি যার সামনে গেলে দেখত আলোকিত ফেনা শুধু, স্পর্শ করলেই শূন্যতা। তৃষ্ণা প্রবল হতো, সেই নির্বিকার ছেলেকে আর সব পুরুষের মতো সাধারণ ভূতে ধরল? নিশি স্বপ্নের মধ্যে আঁতকে ওঠে, এ ছিল ওর জন্মদাগ দেখার ছলে আসলে শরীরে যাওয়ার ইচ্ছে। এইরকম স্বপ্নের মতো মানুষও এই একটি ব্যাপারে কী পরিমাণ হাস্যকর হয়ে উঠেছিল! অথচ এক সময় নিশির মনে হতো ওর সাথে শরীরে যাওয়া মানে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত ছুঁয়ে ফেলা। কিন্তু যে ছেলে দিনের পর দিন নির্জনে

পেয়েও শুধু কথা বলে যেত, তৃষ্ণায় নিশির অস্তিত্ব ফেটে গেলেও হাত পর্যন্ত ছুঁতো না, সে-ই কী না জন্মদাগের ছল করে এক সময় এমন ক্ষেপে উঠল! নিশির সব তৃষ্ণা ধীরে ধীরে মরে গেল। এই একটি বিষয় নিশিকে এ্যাদ্দিন বাঁচিয়ে রেখেছে, নইলে জাহিদ তার কাছে যা ছিল, নিশির জীবনে তখন চূড়ান্ত কোনো দুর্ঘটনা ঘটাটাই একটা স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। এক সময় এ বিষয় থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে। নিশি সেই দুঃসহ স্মৃতির পাক ফুঁড়ে বেরিয়ে দেখে ফ্রক পরা রিনি, বলছে, নিশি তোর বিয়ে হবে কার সাথে?

আমার? চানাচুরঅলার সাথে।

সত্যিই ভীষণ স্বপ্ন ছিল তার। ওর সঙের সাজ, ঝুনঝুন শব্দ, পেছন হাঁটতে নিশির নেশা লাগত। একদিন পেছন হাঁটতে গিয়ে ড্রেনে পড়ে হাত কেটে গেল, রিনিকে বলল, মাকে বাসায় জানাবি না।

তাহলে আমাকে ভাঙা চুড়ির টুকরো দিবি, আগুনে পুড়িয়ে মালা বানাবো।

তুই সে মালা আমাকে পড়তে দিবি?

একবার দেব।

কিন্তু মা যে কাটা দেখে ফেলবেন? কী করে লুকোই?

লুকোতে লুকোতে এ্যাদ্দুর, ওর জীবনের বেশিরভাগই জানে না এমন একজনের সঙ্গে প্রতিদিনের দাম্পত্য জীবন। নিশির ছেলেবেলায় ওর আগ্রহ নেই। কিন্তু যৌবনের প্রেম বিষয়ে দুর্নিবার কৌতূহল। কিছুটা বলেছিল সাজিদুল সম্পর্কে। তাতেই এমন তুলকালাম! ভদ্রতায় বাধছিল বলেই হয়তো সরাসরি কোনো জেদ প্রকাশ করে নি। বিকারগ্রস্তের মতো শুধু উচ্চারণ করছিল, তোমার সম্পর্কে আমার একটা অহঙ্কার ছিল। আশ্চর্য, ভেবে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়, একজন চোরের সঙ্গে তোমার...।

তুমি বুঝছ না কেন? আগে সে তা ছিল না। জীবনে একবারই, আমি জানি না কেন সে...।

আফজাল ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল, যে চোর, যে একদিন বড় রকমের চুরি করে ফেলে, তুমি কী মনে কর, চরিত্রের এরকম কুৎসিত দিক মানুষের মধ্যে একদিনে তৈরি হয়ে যায়? আর তা যদি তার মধ্যে আগে থেকেই থাকে, তার উচ্চতা সম্পর্কে তুমি জানবে না? সে নিজের এই বিশ্রী রূপ ঢেকে তোমার সামনে এসেছে বলেই অসাধারণ ভদ্রলোক মনে করে তার সঙ্গে তুমি মিশবে? জীবনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে চাইবে তাকে কেন্দ্র করে, যে সামনে এসেই তোমার চোখে ঘোর লাগিয়ে দিয়েছে? নিশি আমি ওই লোককে দোষ দিই না। আমি ভাবতাম প্রখর চোখ তোমার, সব বিষয়ে বিশ্লেষণেও তুমি দক্ষ। তোমাকে কেন্দ্র করে আমার যে স্বপ্ন ভঙ্গটা হলো...।

নিশি বুঝেছিল, পুরুষের ঈর্ষা বড় ভয়ঙ্কর। সে রেশম গুটির ভাঁজে নিজেকে যত লুকোতে থাকল, যত সে বিমূর্ত, তত আফজালের নেশালু মুখ ওর বুক ফুঁড়ে আত্মা ছুঁতে চাইল। নিশি তুমি সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। এইভাবে বিচ্ছিন্নতার মধ্যে আলাদা একটি পৃথিবী তৈরির মধ্যেই সে অনুভব করল সবকিছুর পরও আফজালের যে সাহচর্য, যে-রকম নিবেদিত সাংসারিক সে, ঘড়ির কাঁটা ধরে সন্ধেয় ফিরে যে সারাদিনের গল্প করে, তাকে ছেড়ে চলা নিশির পক্ষে অসম্ভব, তাই সন্দংশ ঘায়ে ছটফট করে, মিথ্যা ও সত্যের এক

অদ্ভুত চক্রের মধ্যে নিজেকে বারংবার হারিয়েও সে নিজেকে সংযত করে, ভীত হয় বিপর্যয়ের চিন্তায়। নিশি যে-কোনো মূল্যে নিজেকে আর ভিন্ন স্রোতে ভেসে যেতে দেবে না।

নিস্তব্ধ মধ্যরাত, নিশি ছটফট করে, স্ত্রীর প্রতি অবিশ্বাস, আগামীকাল জীবনের যে-কোনো রকমের সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে, এসব চিন্তার বাইরে গিয়ে কী করে আফজাল ঘুমোচ্ছে ? অনেক মানুষই বোধহয় এরকম, অফিসে অফিসের চিন্তা, ঘরে ঘরের, ঘুমের সময় ঘুমের। এসব মানুষ নির্ঘাত মগজ খুলে রেখে ঘুমোয়।

অথচ এই সংসারেই নিতান্ত আনাড়ি নিশি নিজেকে প্রতিটি কাজে ক্রমেই কীরকম দক্ষ করে তুলেছে। এমনও হয়েছে, টানাপড়েনের কারণে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে গিয়ে হুঁশ হলো, গ্যাস বিল জমা দেয়া হয় নি। আফজাল আজ-কাল করতে-করতে তৃতীয় সপ্তাহে অফিসে কারো কাছ থেকে টাকাটা জোগাড় করে নিশির হাতে তুলে দিয়েই খালাস। এসব ক্ষেত্রে যা ঘটে, যেদিন ব্যাংকে হাফ টাইম থাকে, দেখা গেল, বরাত দোষে সেদিনই টাকা জমা দেয়ার শেষ দিন। হন্তদন্ত হয়ে ব্যাংকের সামনে গিয়ে দেখে বিরাট লাইন। কাউন্টার থেকে ক্রল নাম্বার নিয়ে ওইসব ছাপোষা গিজগিজে মানুষের ভিড়ে অনিশ্চিত দাঁড়িয়ে থাকা। নিশির নাম্বার আসার আগেই হয়তো কাউন্টার বন্ধ হয়ে যাবে। বিচ্ছিরি গন্ধ, পানের পিক— এইসব ঠেলে কেউ হয়তো একটু কায়দা করে নিশির সামনে দাঁড়িয়ে গেল। প্রথমদিকে নিতান্ত আনকোরা ছিল বলে ঠ্যালাঠেলি খেতে খেতে একেবারে লেজের মাথায় পৌছে যেত। ক্রমে ঠেকে শিখল। কেউ কাঁধ খাটো করে হাত গলিয়েছে তো কোমরে আঁচল গুঁজে বাজখাঁই চিৎকার করে উঠত। এ নিয়ে খিস্তি পাল্টা খিস্তি। তারপরেও জরিমানার ভূত মাথায় নিয়ে অনেকদিন বিল জমা না দিয়েই বাসায় ফিরে আসতে হয়েছে।

ইলেকট্রিক, পানির বিলের ক্ষেত্রেও একই ঝক্কি। আফজালের বাড়ির চাপ প্রায়ই তার নির্দিষ্ট বেতনের মধ্যে একটা গোলমাল লাগিয়ে দিত। ভাড়াটে হিসেবে তাই তারা কোথাও বিশেষ সুনাম কুড়োতে পারে নি। এক মাসের ভাড়া গিয়ে ঠেকত পরের মাসে। কে যেন বলেছিল কথাটা, যে ছেলের পিত্রালয়ের অবস্থা করুণ, সেই সংসারে যাওয়া মানে তলফুটো নৌকোর ওপরে গিয়ে বসা। নৌকোর জল সাফ করতে করতেই জীবন শেষ হয়ে যায়। নিশি অনেক সময় অতিষ্ঠ হয়ে উঠত। কিন্তু আফজাল তাকে স্বার্থপর, ঈর্ষাপরায়ণ ভাববে বলে এসবের জোর প্রতিবাদ করা কখনো হয়ে ওঠে নি। কী এক অদৃশ্য মায়ায় ওর মনের অর্ধেকটা পড়ে থাকে বাড়িতে। সেখানে মা নেই, বাবা স্বার্থপর, ভাইবোনেরা যে যার মতো, তারপরও তাদের চিন্তায় রাতভোর সে ঘুমুতে পারে না।

চাকরির টাকা বিন্দু বিন্দু জমিয়ে, লোন করে এই দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে তারা একটা জিনিসই কিনেছে, মিনি আকারের একটা ফ্রিজ। তাও আফজালের চেহারা দেখে নিশির ভেতর থেকে ওটা কেনার উত্তেজনা ফুরিয়ে গিয়েছিল, আমার বাবা দু'বেলা খেতে পায় না আর আমরা শৌখিনতা করছি!

নিশি চেঁচিয়ে উঠেছিল, এমনভাবে কথা বলো যেন তোমার বাবা রাস্তার ভিখিরি। তার যা জমি আছে তাতে একটা পেট চলে না ? সব তো ঢেলে দেন মেয়ে আর নাতনিদের পেছনে!

বাজার করা, ঘর গুছিয়ে মুছে পরিচ্ছন্ন রাখা, রান্না করা, তাদের এতদিনের জীবনে এ বাড়িতে কোনো কাজের মানুষ রাখা হয় নি। আফজাল অফিসে, নিশি একা ঘরে জ্বরে ছটফট করতে করতে ট্যাপের নিচে মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছে। তার জীবন একঘেয়ে আনন্দহীন, তাও যাচ্ছিল বেশ। যখন থেকে সে পড়ার সিদ্ধান্ত নিল এবং কলেজে যেতে শুরু করল, আফজালের হিসেবের সুতো থেকে নিশি যেন একটু একটু বেরিয়ে গেল। যদিও এতে তার উৎসাহের কমতি ছিল না। তারপরও ক্লাস শেষে বান্ধবীদের পাল্লায় পড়ে ভার্সিটি এলাকায় গিয়ে ফুচকা খাওয়া, দুপুরে কেউ হয়তো নতুন কিছু রান্না করে দাওয়াত দিল, সদলবলে তার বাসায় গিয়ে হাজির হওয়া— নিশি যেন বহুদিন পর মুক্ততার সাধ পেল। তাতে যে অসুবিধা হলো, আফজালকে বলে যাওয়া, ছুটির হিসেব ঠিক থাকল না। কেননা সেসবের বেশিরভাগ প্রোগ্রামই হতো কলেজে যাওয়ার পর হঠাৎ হঠাৎ। নিশি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সব মিথ্যে বানাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে থাকল, রাস্তায় জ্যাম, ম্যাডাম পার্সোনালি আমাকে ডেকেছিলেন, সবাই মিলে হাসপাতালে অসুস্থ সহপাঠীকে দেখতে গিয়েছিলাম। সেই সূক্ষ্মতা গিয়ে ঠেকেছে আজ এমন এক জায়গায় ভুলেও যে জায়গাকে কেন্দ্র করে নিশি কাউকে একটি বেদনার ভাঁজও দেখতে দেয় নি। বেশ কিছুদিন আগে মমতাদির সঙ্গে যখন কথা হলো, তিনি বললেন, বুকে এমন ব্যথা হয় ওর, যন্ত্রণায় পাগল হয়ে সাজিদুল গলায় ছুরি পর্যন্ত চালাতে চায়। সেই থেকে ওকে নিয়ে ভয়! কিন্তু সেই ভয়ের ছায়ামাত্র কখনো আফজালকে দেখতে দেয় নি।

ভাবতে ভাবতে নিশি বালিশ খামচে ধরে।

এখন যদি ওকে ডেকে তুলি? নিশির মধ্যে এই ইচ্ছে প্রবল হয়, সব বলে দিই, জানতে চাই আমি আর কী করতে পারতাম?

ডেকে তুলতেই যদি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে? তখনকার মতো বীভৎস চোখ নিয়ে দাঁড়ায়? আত্মা খুলে বেরোনো নবজাত শিশুটিই ঘুমোলে পর হয়ে যায়। আর এত একটি পাতানো সম্পর্কের মানুষ। যে আমার কেউ ছিল না, যাকে চিনতাম না, তার সঙ্গে এক জীবন কাটাচ্ছি, তাকে জীবনের সব করেছি, অথচ ঘুম থেকে একটু জাগাব, এই চিন্তা করতেই তার ভয়ে কেঁপে উঠছি।

ভাবতে ভাবতে নিশি এক সময় আচ্ছন্নের মতো ঢলে পড়ে ঘোর ঘুমের তলায়।

স্পার্টাকাসের নামে মৃত্যুর পরোয়ানা এনে রাজার সৈন্যরা বিশাল জনারণ্যে এসে প্রশ্ন করল, তোমাদের মধ্যে স্পার্টাকাস কে?

ভিড়ের মধ্যে থেকে স্পার্টাকাস উত্তর দিল, আমি।

সাথে সাথে গুঞ্জন উঠল। অন্য একজন হাত তুলে বলল, আমি। আরেকজন, আমি। এভাবে অনেকেই আমি, আমি বলে নিজেদেরকে স্পার্টাকাস দাবি করতে থাকল। সৈন্যরা বিভ্রান্ত হয়ে ক্ষিপ্ত পদক্ষেপে চলে গেল। তারা চলে গেলে স্পার্টাকাস সবাইকে অভিভূত হয়ে জড়িয়ে ধরল—।

হীরা নিষ্পলক চেয়ে আছে। মোড়া টেনে বৃদ্ধা এসে বসেছে। জাহিদ বলে, একজন বড় মানুষের স্পর্শে সব পাল্টে যায়। স্পার্টাকাস মানুষের মধ্যে সেই বড়ত্ব তৈরি করেছিল, যে অন্যকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজের জীবন তুচ্ছ করে ফেলে— বলতে বলতে জাহিদ সিগ্রেট ধরানোর জন্য দেশলাই খোঁজে, বৃদ্ধা মাথা নাড়তে থাকে, মানুষ অনেক বড়! জাহিদ হাসতে থাকে, আবার সেই মানুষই এক সময় হিংস্র যমজ ছায়া হয়ে ওঠে।

হীরা দাঁড়ায়, আমি আপনার কথার অর্থ বুঝি না, কিন্তু যখন বলেন, এত ভালো লাগে!

শুনতে ভালো লাগলে শুনবে, জাহিদ ওর পিঠ চাপড়ে দেয়, আমরা বাঁশির শব্দ শুনি না? এর কি কোনো স্পষ্ট ভাষা আছে? তারপর ধর হিন্দি গজল শুনি, অর্থ বুঝি না। কিন্তু কী রকম ডুবিয়ে রাখে, এভাবেই শুনতে শুনতে বিমূর্ত জিনিসও এক সময় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বৃদ্ধা বলে, থাম, থাম, তোমার কণ্ঠ বাপু এত মধুর নয় যে, আমার মেয়েটাকে তুমি এই করে করেই একদিন শিক্ষিত করে ফেলবে।

সে তো শিক্ষিতই, প্রাইমারিতে পড়ে নি?

যেসব গল্প বলেন, সেসব আমরা এ জন্মেও শুনি নি। এ শিক্ষা সেই শিক্ষা, যা হোক তোমাকে বোঝাতে পারছি না। কিন্তু জানো, কি বুঝি না বুঝি সে কথা থাক, এসব গল্প আমারও শুনতে এত ভালো লাগে! আমরা অবশ্য অন্য কাহিনী পড়েছি, আনারকলির কাহিনী, সোহরাব রুস্তমের, এরপর ধর গিয়ে কারবালার ঘটনা। এসব হয়তো তুমিও জানো।

দরজায় শব্দ হয়।

সন্দীপন এসে বলে, তুমরা তো হাত-পা ছাইড়া দিছো মাসিমা, সুতার কাজ দেখি একেবারে বন্ধ কইরা দিলা।

জাহিদ হাসে, দেখো সন্দীপন, শিল্পীদের বিষয়টা তুমি বুঝবে না। তুমি কথা বলছ ব্যবসায়ীর মতো, শিল্পীদের এমন হয়, টানা ক'মাস খরা গেল। কিচ্ছু কাজ হচ্ছে না, মাথায় কিছু আসছে না। এক সময় দেখা গেল কোনোদিকে চোখ নেই, মাসের পর মাস ডুবে থাকছে সে কাজের মধ্যে।

সন্দীপন বলে, খাইতে অইবো না? খালি ভাব লইয়া কি পেট ভরে?

শিল্পীরাই অনাহারী জীবন কাটায়।

জাহিদের একথায় বৃদ্ধা হাসতে থাকে। সন্দীপনকে বলে, তুমিও তো বাবা নতুন কোনো ডিজাইন দিতে পারছ না। কতদিন ধরে বলছি।

ভালো ডিজাইন পাইতে অইবো তো? আগে যা করছেন, তাই করেন।

ওসব করতে করতে হাত-মাথা সব পচে গেছে।

পকেট থেকে জাহিদ কলম বের করে হীরার খাতায় কিসব আঁকিবুঁকি করে সবার সামনে মেলে ধরে, এই নকশায় চলবে?

দুই মাথা অজগর, একটার মাথায় মানুষের মুণ্ডু, সন্দীপন হেসে ওঠে। ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে বৃদ্ধার মুখ, সে আর্তনাদ করে ছবিটির ওপর এমনভাবে হামলে পড়ে, এমন ক্ষিপ্র হাতে তা ছিঁড়তে থাকে, জাহিদের সেই দৃশ্য মনে পড়ে যায়, 'হাঁউ মাঁউ খাঁউ' করে রাক্ষুসীরা ধেয়ে

আসছে। রাজপুত্র এক নিঃশ্বাসে ছিঁড়ছে প্রাণ ভোমরার হাত-পা-পাখা। সব শেষ করতে না পারলে বিকলাঙ্গ রাক্ষস এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার হাড় মাংস গিলে খাবে।

বৃদ্ধা চিৎকার করতে থাকে, এইসব কাগজ সরিয়ে নিয়ে তাবিজের সাথে পুঁতে রাখ। এই শহুরে ছোকড়া আমাদের সব্বোনাশ না করে ছাড়বে না দেখছি। জলে থেকে কুমীরের সাথে ইয়ার্কি ? না না, তোমাকে অলৌকিক কিছু ভাবার কোনো কারণই নেই, তুমি মানুষের জীবন-মৃত্যু নিয়ে মশকরা কর! এরপর বৃদ্ধা পাক খেয়ে খেয়ে সারাঘরে সূরা পড়ে ফুঁ দিতে থাকে।

জাহিদের হাই ওঠে।

সন্দীপন প্রশ্ন করে, আপনি যাচ্ছেন কবে ?

এ কথার উত্তর দেয়ার রুচি নেই, বিড়ি ধরায়, এরপর ঘূর্ণায়মান ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে জাহিদ।

এক সময় বেরিয়ে আসে।

আবদুল খালিকের দেয়া তাবিজটিতে শক্ত করে গেরো দেয়। বাঁশঝাড়ের তলার শুকনো পাতা সবেগে গুঁড়িয়ে একটা বেজি ছুট লাগায়। চারপাশে সর পড়া গাঙে সন্ধ্যার ছায়া আসন পেতেছে। জাহিদ বাঁশ-কঞ্চির নিচে দাঁড়িয়ে লম্বা শ্বাস টানে। হাট ফেরত লোকজন ত্রস্ত ভঙ্গিতে একটু দাঁড়ায়। জাহিদকে দেখে পরক্ষণেই চলে যায়। এসবের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে লায়লা, সেদিনের ভয়ঙ্কর দৃশ্যাবলি। ও ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছে, অথচ সেদিন মেয়েটি নিশ্চিত মৃত্যুর সঙ্গে দেখা করে এসেছে।

আবদুল খালিকের কাচারি ঘরে অনেক লোক। সে গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলছে। সেখানে গিয়ে ইতস্তত বোধ করে জাহিদ। আবদুল খালিকই সবকিছু সহজ করে দেয়, সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলে, ইনি হইলেন গিয়া এই গেরামের কুটুম, ওইপার থাইক্যা আইছেন।

সবাই চলে গেলে রাত্তির নামে।

সেদিন জ্যোৎস্নার আলোয় অপার্থিব হয়ে-ওঠা লোকটিকে পরদিন দিনের আলোয় বেশ সাধারণই মনে হয়েছিল। সে অবাক হয়ে ভাবছিল কী করে রাত এবং দিনের ব্যবধানে একজন মানুষের উচ্চতা পর্যন্ত পাল্টে যায়। সে সচেতনভাবে আজ নিজের সাথে আবদুল খালিকের উচ্চতা মেপে নেয়। কাচারিতে এখনো চাঁদ এসে পৌঁছয় নি।

কেন আসে ওরা ?

কতকিছুর জন্যে, আবদুল খালিক অসংলগ্ন বলে যেতে থাকে, কারো বাড়ি মিলাদ, কেউ অসুখে ভুগতাছে, কেউ কেউ খিদা ভুলনের তাবিজ চায়, আইজ এরা আইছিল অন্য কারণে। ঢাকা থাইক্যা সরকারি লোক এই গেরামে আইতাছে তদন্ত করতে, দুই মাথা অজগরের বিষয়ডা কী ? তারা জনে জনে জিজ্ঞাসাবাদ করবো। এর আগেও অনেকে আইছে। বিশেষ সুবিধা করবার পারে নাই। এই গেরামের দুরবস্থা দেইখ্যা তাগোর আবার টনক নড়ছে, এইবার জোরেসোরেই নামবো। বুঝলেন না, এনজিও-রা সুবিধা করবার পারতাছে না। জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সরকার কোনো সুবিধা করবার পারতাছে না। এদিকে চেয়ারম্যানেরও গায়ে ফোস্কা লাগতাছে। এই গেরামে তার বিশেষ প্রভাব নাই। সব

মিলায়া একটা জগাখিচুড়ি অবস্থা তাগোর। যাই হোক, এরা আইছিলো, শহর থাইক্যা তেনারা আইলে এরা কী কইবো, তাই নিয়া বুদ্ধি-পরামর্শ করনের লাইগ্যা।

জাহিদ দেখে, ক্রমশ চন্দ্র বিকশিত হচ্ছে। সে দ্রুত আবদুল খালিকের মুখের দিকে তাকায়। নাহ্, ছায়া। সেইসব ছায়াচক্র ভেদ করে তার নিষ্কম্প ঠোঁটজোড়া সন্তর্পণে নড়ে ওঠে, আইচ্ছা, গেরামের মইধ্যে এমন কোনো পরিবার আছে, যার পাঁচ-ছয় ছেলেই যমজ?

আবদুল খালিক হাসতে থাকে। মানুষের অতগুলো যমজ বাচ্চা অয়? অইলেও কোনোদিন বাঁচে? আপনি ভাইসাব কিসের বৃত্তান্ত জানতে চাইতাছেন?

পুনরায় অসংলগ্ন হয়ে ওঠে সব। সে এই প্রসঙ্গের দুর্বিপাক থেকে বেরোতে চায়, কোনোকিছু নিয়ে সে গোয়েন্দাগিরি করছে, যদি আবদুল খালিকের মনে এই সন্দেহ জেগে ওঠে?

নাহ্, আমাকে আরো সতর্ক হতে হবে। ভাবতে ভাবতে সে অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করে, আপনি তো এই গ্রামের সব খবরই জানেন, আমি কি ভাই সাহেব, এই গ্রামের পাপাচার সম্পর্কে কোনো তথ্য জানতে পারি?

আবদুল খালিক বলে, গেরামের আবার পাপ কী? পাপ করে মানুষে। কিন্তু আপনি সব বাদ দিয়া এই এইসব বিষয়ে আগ্রহী অইলেন কেন?

সেদিন, জাহিদ নিজেকে সংযত করে, ওই যে লায়লার যেদিন— অনেক কিছু শুনলাম। আমি খবর নিয়েছি এ অঞ্চলে ফলন ভালো হচ্ছে না। ছিন্নমূল হয়ে অনেক লোক শহরে পাড়ি দিয়েছে। হয় খরা, নয় বন্যা— এখানে একটা-না-একটা অনাচার লেগেই থাকে। মানুষের ঘরে চুরি হচ্ছে, ডাকাতি হচ্ছে, এসব নাকি আবার মানুষেরা করছে না, শয়তানে করছে। মানুষ নিজেকে কোনো মতে সুস্থির রাখার চেষ্টা করছে দু'মাথা অজগরের ভয়ে। ধরুন সেই অজগরই এসব করছে, সে-ই এই গ্রামের প্রধান পাপ, আপনি ক্রুদ্ধ হবেন না। আমি বলছি, ওপরে সৃষ্টিকর্তা আছেন, তিনি বলেছেন, পাপকে নির্মূল করতে। আপনারা তার বিনাশের কথা উচ্চারণ করতে পর্যন্ত ভীত হচ্ছেন। শয়তানকে নির্মূল করে মৃত্যুবরণের মধ্যে তো গৌরব আছে, কেন আপনারা সংঘবদ্ধ হয়ে আল্লাহর নাম নিয়ে তার বিনাশের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ছেন না?

জ্যোৎস্না ঘন হচ্ছে, বদলে যাচ্ছে আবদুল খালিকের চেহারা, 'অজগর ধ্বংস' এই জাতীয় শব্দের ছিটেফোঁটা পর্যন্ত প্রাণের মধ্যে আসলে সে এর আগে বারবার তওবা কেটেছে। কিন্তু কোত্থেকে এই ছেলে উড়ে এসে জুড়ে বসে এমন একটা প্যাঁচ কষেছে। সে বিমূঢ় হয়ে পড়ে।

এক সময় আবদুল খালিক অস্থির বোধ করে, সহসা কিছু বলতে পারে না।

জাহিদ সতর্কতার সাথে এগোয়, ঠিক আছে, অজগরের আবির্ভাবের পর গ্রামে পাপ, ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষ বেড়েছে, এর আগে এই গ্রামে কোনো পাপ সংঘটিত হয় নি?

শাণিত ছুরির মতো চকচক করে ওঠে আবদুল খালিক, আপনি কি এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ পোষণ করতাছেন?

জাহিদ মুহূর্তে বিচলিত বোধ করে নিজেকে সামলে বলে, এখানে সন্দেহের প্রশ্ন তুলে কেন আমাকে পাপের ভাগীদার করছেন? সাপ বিষয়ে আমার সন্দেহের প্রশ্নই আসে না।

আমি জানতে চাইছি এই সাপকেই আপনারা আপনাদের জীবনের চেয়ে বড় করে দেখছেন কেন ? সত্যিকার ধর্মের সামনে সাপের সাধ্য আছে দাঁড়ায় ? কেন ভাবছেন এই সাপের কারণেই সমস্ত বিপর্যয় এসেছে। এর আগে কি এই গ্রাম সুজলা সুফলা অনাচার শূন্য ছিল ? ভাই সাহেব, আমার কথায় বেয়াদপি নিলে আমি ভিন্ন জায়গার মানুষ, অপরাধ মাথায় নিয়ে রাতেই গ্রাম থেকে বিদায় নেব। কিন্তু আমি তো লেখাপড়া করেছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ধাপ অতিক্রম করেছি। শিক্ষা থেকেই মানুষের মধ্যে অন্বেষণের স্পৃহা জন্ম নেয়। সে তাড়নাতেই আমি একথা বলছি।

আবদুল খালিক হিমসিক্ত গলায় বলে, অধিক শিক্ষা মানুষকে শয়তানও বানায়।

জাহিদ বলে, আপনি কিন্তু আমাকে আঘাত করলেন। তাহলে আমি আগেই বলেছি এই প্রশ্নে যদি অন্যায় দেখেন, বলেন তো আমার জিহ্বাকে এরপর থেকে সংযত রাখব। যতোই উচ্চ শিক্ষা লাভ করি, আপনার মতো আমি সমাজের শীর্ষস্থানীয় লোক নই, আপনার যে অলৌকিক দৃষ্টি আছে, আমার তা নেই। সেই জন্যই আপনার কাছে ছুটে এসেছি। জানতে চাইছি বিভ্রান্তির কারণ।

আবদুল খালিক স্তব্ধ বসে থাকে। জাহিদ নিজের অজান্তেই প্রবেশ করছিল একটি বিপজ্জনক চক্রের ভেতর। কথাগুলো বলার সময় তার মনে হচ্ছিল, এ নিছক কথা, এ তার অস্তিত্ব থেকে উঠে আসা কোনো শব্দ নয় আর এ কারণেই সে ছিল ভাবলেশহীন। কিন্তু উচ্চারিত শব্দ হঠাৎ নিজের কানেই গ্রামের এইরকম পরিবেশে মারাত্মক শোনায়। সে অপেক্ষা করে। এইবার আব্দুল খালিকের তীব্র রোষানল তাকে ছাই করে দেবে। সে সেই পরিস্থিতি থেকে নিজেকে রক্ষা করার উপায় খুঁজতে থাকে। কিন্তু পর মুহূর্তে আবদুল খালিকের স্থিরতা তাকে বিপন্ন করে তোলে। সে অজগাঁয়ের এই অশিক্ষিত মানুষটাকে আর চিনতে পারে না। আবদুল খালিক বলে, আগামী জুম্মার শেষে মসজিদে বইসা আমি এই বিষয়ে আপনারে কইমু, মসজিদের দেওয়াল ছাড়া আর কুনো দেওয়ালেরেই আমার বিশ্বাস নাই, তার চাইতেও অবিশ্বাস করি বাতাসের কানরে। আপনে আমারে বড় মুসিবতের মধ্যে ফ্যালাইছেন, হেরপরেও দুনিয়ায় এমন কুনো প্রশ্ন নাই, যার কুনো না কুনো উত্তর মিলে না।

জাহিদ দেখে, ধবল জ্যোৎস্না। উল্টেপাল্টে বাতাসের বেগ বাড়ছে। সে নিজেকে ছেড়ে দেয় তার মধ্যে।

নিশি দেখে, গ্যাস বেলুন উড়ছে। সে রিকশা নেয় না, সেই সূত্র ধরেই ঘিঞ্জি ভিড় ঠেলে ঠেলে এগোয়, মাঝেমধ্যে মাথা তোলে, কার হাতে ছিল সুতো ? মহাশূন্যের কোন অতলে গিয়ে এর মাথা ঠেকবে! এরপর ভুলে যায়। রিকশায় উঠে বসে, কিছুক্ষণ জ্যামে আটকে থেকে আবার নেমে পড়ে। কিছু ছেলে লাঠিসোঁটা নিয়ে জ্যাম ছাড়াতে গিয়ে পরিস্থিতি ঝগড়াটে করে তুলেছে। নিশি রিকশার চাকা ঘুরিয়ে দু'হাতে স্রোত উজিয়ে এগোনোর মতো করে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় বাস স্ট্যান্ডে এসে দাঁড়ায়।

দুটো বাস মিস করার পর তিন নাম্বারে মরিয়া হয়ে ওঠে। মুহূর্তে শরীরটা কাগজের মতো চ্যাপ্টা হয়ে যায়। কোনোরকম জড়তার তোয়াক্কা না করে নিজেকে ওর মধ্যেই সেঁধিয়ে দেয়।

এমন এক জায়গায় দাঁড়ায়, যেখান থেকে এক চুল নড়ার মতো পরিস্থিতি নেই। হাতির মতো হেলেদুলে রওয়ানা দেয় বাস। কিন্তু নিশির পঞ্চইন্দ্রিয় স্তব্ধ করে দিয়ে ঘোলাটে অন্ধকার আসে। নিশি ছটফট করে অনুভব করে, বিষাক্ত গন্ধ। চারপাশে মানুষের কারাগার। এর মধ্যে কোন্ ফাঁক দিয়ে আসছে, না ঠিক বিষাক্ত নয় কিন্তু ভয়াবহ, যেন চাপ দিয়ে রাখা ম্যানহোলের মুখ হঠাৎ নাকের ঠিক সামনে উদোম করে দেয়া হলো। না, ম্যানহোলও কম বলা হলো, গন্ধটা যে ঠিক কিসের— নিশি নাক চেপে ধরার জন্যে হাত নামাতে চায়, কিন্তু ওপরের হ্যান্ডেলে হাত ঠেসে গেছে। কেমন অবশ হয়ে উঠেছে সর্বাঙ্গ। সে এই পরিস্থিতিতে তখন পাথর-মূর্তির মতো হয়ে যায়।

সামনের মানুষটির ঘাম জবজবে পিঠ তার সামনে। ওই কালসিটে পাঞ্জাবির নিচে কি ভয়ানক কোনো ক্ষত আছে? নিশি টের পায়, ভেতর থেকে বমি উগরে উঠছে। গন্ধের কী মর্মান্তিক শক্তি! দেখা যাচ্ছে না, বাতাস নেই, ঢেউ নেই, এমন মর্মান্তিক গন্ধে নিশির শ্বাস আটকে মরার দশা হয়। কী যে হট্টগোল! কন্ডাক্টরের খিস্তি। ধুম তর্ক লেগেছে দু'জনের মধ্যে। এই হলো বাঙালি কালচার! কার যেন শ্লেষ-মেশানো মন্তব্য শোনা যায়।

বাঙালি কালচার কী কন? আমরা এহন আছি জিটিভি, এটিএন এইসব হিন্দি কালচারের মইধ্যে।

দেশের গুষ্টি কিলাই।

আপনেরা থামলেন!

বুঝেছেন কিছু? এই হলো গিয়া—।

এইসব শব্দ বিচ্ছিন্নভাবে ভেসে আসে। দম-আটকানো গলায় নিশি প্রায় চিৎকার করে ওঠে, ভাই বাসটা থামান।

ওদিকে তর্কের স্রোত বাড়ছে। ইঞ্জিনের গর্জন থামিয়ে তাদের স্বর উচ্চ থেকে উচ্চ গ্রামে চাগিয়ে উঠছে। ভক ভক করে গন্ধের স্রোত বাড়ছে। নিজেকে উল্টোদিকে ঘোরানোর জন্য প্রাণান্ত মোচড় দিতেই কারো পায়ের ওপর নিজের স্যান্ডেল গেঁথে যায়। বিমূঢ় অবস্থায় কিছু বুঝে ওঠার আগেই কানে ভেসে আসে শব্দ, অসভ্য মেয়েলোক।

নিশি গন্তব্য স্থানে যায় না। অবসন্ন দেহে সবার বিস্মিত চেহারার সামনে ফুটপাতে নেমে উবু হয়ে বসে পড়ে।

সেদিনের সেই অলৌকিক গন্ধের কোনো উৎসই পরে সে আর আবিষ্কার করতে পারে নি। তীব্র কোনো গন্ধে এজন্যই নিশির ভয়। তার মনে হয়, পারফিউমের মুখ খুলে তার নাকে যদি ঠেসে ধরে কেউ?

তাহলেই সব আঁধার হয়ে উঠবে।

সেই রাতে ঝগড়ার পর শেষ রাতের দিকে আফজালের গায়ে হাত রেখেছিল। ও হাত সরিয়ে চকিতে শব্দ করে উঠেছিল, অসভ্য মেয়েলোক।

নিশি তীরের মতো তির্যক খাড়া হয়ে উঠেছিল। মুহূর্তে তার মনে হয়েছিল সেদিনের সেই শব্দটি তার ভেতর জীবাণুর মতো বাস করছিল। আজ হঠাৎ যেন গুটি বসন্তের মতো ফুটে বেরিয়েছে। সেই স্তব্ধ আঁধার ঘরটির দিকে সে বোকার মতো চোখ ঘোরাচ্ছিল। কোত্থেকে এসেছে সেই শব্দ ?

সব বন্ধ। ঘরে পিন পতনের শব্দ নেই।

ভেন্টিলেটারে চোখ গেঁথে গেলে অঝোরে কান্না এসেছিল। সেদিনকার বাসের লোকটির পাশেই সে এত বছর ধরে ঘুমিয়ে আসছে ? আফজাল জানে, সেদিনকার ঘটনা কী মর্মান্তিক হয়েছিল নিশির জন্য, আজ সে অচেতনতার সুযোগে মোক্ষম অস্ত্র ছেড়ে দিল ? তারপর কী নির্বিকার। যেন স্বপ্ন দেখছে। এই ভাবেই শ্বাস টানছে।

এরপর নিজেকে সে আর সংসারের মধ্যে গাঁথতে পারে না। কাঁচাবাজারে যায়, কুৎসিত ভিড়বাট্টা ঠেলে কাচকি মাছ, পটল এইসব কেনে। ঘরে এসে রান্না চড়ায়। এসবই করে শুধু অভ্যাসের বশে। শুধুই মনে হয়, যেভাবে জাহিদের ওখান থেকে, পরবর্তী জীবনে সাজিদুলের ওখান থেকে, বাবার ওখান থেকে তার পাট চুকে গিয়েছিল, এখানেও তার ঘণ্টা বাজছে, পাততাড়ি গোটাতে হবে। এ জন্য নিজের মধ্যে কোনো আয়োজন তৈরি হয় না। বড় অদ্ভুত লাগে, এই অচেনা লোকটির পাশে কী করে সে এত বছর কাটিয়ে এসেছে ?

কী রকম বানরের ছদ্মবেশে ছিল। নিশি সেই গল্প পড়েছে। বড় আপন বানরটির খোলস খুলে অচেনা রাজকুমার বেরিয়ে এলো। নিশি ছেলেবেলায় যত সুন্দরই হোক সেই অচেনাকে মানতে পারে নি।

সেই মানুষ এক সন্ধ্যায় এসে বলে, বাইরে খাব।

নিশি যায়।

আলো-আঁধারির রহস্য বড় বিচ্ছিরি লাগে। পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের অবস্থান খাপ খায় না। নিশি ঝাড়বাতিগুলো দেখতে থাকে।

বড্ডো চৌকশ সবকিছু, আসবাব, গেলাসের রুমাল, সসদানি, কার্পেট, স্বয়ংক্রিয় বেয়ারাগুলোও।

ম্যাডাম আপনিও দেখুন।

ওর হাতে তুলে দেয়। ওপাশে আফজাল দেখছে। অক্ষরগুলো যেন পোকা, কোনো আঠালো রসে আটকে আছে। নিশি তাকিয়ে থাকে।

আফজাল বলে, তুমি দেখেছ কিছু ?

নিশি তার মুখের দিকে চোখ মেলে ধরে।

অস্বস্তির সঙ্গে আফজাল অর্ডার দেয়। তারপর মুখোমুখি হয়, তোমার কী হয়েছে ?

নিশি গেলাস উল্টে দেয়। তারপর চামচ দিয়ে ওর মধ্যে টুকটুক শব্দ বাজায়।

তুমি বলবে না, কী হয়েছে ?

কিচ্ছু হয় নি। বলে কোক ঢেলে দেয় গ্লাসে, এত সশব্দে, ফেনা উপচে শাদা কাপড় ভেসে যায়।

আফজাল বলে, শহরে বাস করলে অন্তত এটুকু জানতে হয়।

নিশি হাসে, আমি তো অসভ্য, কী করে জানব?

অসভ্য কোনো বাজে শব্দ নয়। আফজাল নিজেকে সামলে নেয়। অসভ্য তাদেরকে বলে যাদের মধ্যে সভ্যতা পৌঁছয় নি। এক সময় আদিম মানুষেরা অসভ্য ছিল। তারা ভালো ছিল না?

অথচ সেদিন, যেদিন বাসের লোকটি বলেছিল, তোমার মাথায় রক্ত উঠেছিল। তুমি ক্ষিপ্ত হয়ে আমাকে দায়ী করেছিলে এরকম অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করার পর কী করে একজন মানুষ পার পায়? কেন তার গালে আমি স্যান্ডেল মারলাম না? এরপর নিশি মরিয়া হয়ে উচ্চারণ করে, আমি এখন যদি তোমার গালে তোমার সেই বাক্যেরই প্রয়োগ ঘটাতে পারতাম?

মুহূর্তে সব ছাই হয়ে যায়। চারপাশের সব আলো নিভে আসে। চামড়ায় ঢোকে বিষাক্ত শীত। কোক পরিণত হয় জলে। টেবিলে সুন্দর সাজানো খাবার থেকে উদ্গত ধোঁয়ার রেশ ক্রমশ থিতিয়ে নিস্তেজ হতে থাকে। আফজালের মুখ দেখে নিশি সিদ্ধান্ত নেয়, এখান থেকে পালাতে হবে। এবং এই ভাবনা তার মধ্যে এমন প্রবল হয়, সে অস্থির বোধ করে। চারদিকে সে বোরোনোর পথ খুঁজতে থাকে।

আফজাল কঠিন মুখে পিরিচে চামচ ঠুকছে। বেয়ারা আসে, আপনারা খাচ্ছেন না?

আফজাল চমকে ওঠে, এই তো খাচ্ছি।

একটা তীব্র স্রোত নিশিকে খাড়া করায়, আমি বাবার বাসায় যাচ্ছি।

নিশি তোমার স্পর্ধা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

আমাকে তুমি ছেড়ে দাও, নিশি অসহায়ভাবে উচ্চারণ করে, আসলে আমার এ-রকমই হবে, আমাকে দিয়ে তোমার হবে না।

আফজাল ঠাণ্ডা গলায় বলে, তোমাকে দিয়ে হবে কী না, সে সিদ্ধান্ত এখান থেকে যাওয়ার পর হবে। আপাতত যে খাবারগুলো এসেছে, সেগুলো খাও।

নিশি ধপাস বসে পড়ে। সে দেখে দেয়ালে পেইন্টিং, নর্তকী। তাকে ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে বাঁশিঅলা। নিশি সেই জঙ্গলের পথ ধরে ছোটে, কতদূরে পাহাড়, তার কাছেই তুলোর মতো উড়ছে বাঁশিঅলার দেহ। নিশি তাকে ছুঁতে যায়, হাতে শুধু জল লেগে যাচ্ছে, ছুঁলেই জল। সেই জল মুহূর্তে বাতাস শুষে নেয়। নিশি দেহ নয়, তার সুর ছুঁতে চায়, হায় অলৌকিক সুর, অনির্বচনীয় গন্ধের মতোই চৌদিকে মৃত্যু ডেকে আনছে। শূন্যতার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে। না, সেই শব্দ ছড়িয়ে যাচ্ছে বৃক্ষে-পল্লবে-মৃত্তিকায়, স্পর্শ মাত্র অদ্ভুত সুরে বেজে উঠছে। নিশি আর স্পর্শ করে না। টিলার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। হাসি বলে, এই আমার হাতে বাঁশি, তুই এখন যা, আমি মৃতদের জাগিয়ে তুলব।

আশ্চর্য, এ হাসির দেহ ছিল?

শোনো, আমার পয়সার দাম আছে, ঘরে বসে খেয়ে স্বামীর গালে অনায়াসে স্যান্ডেল মারা যায়, ভীষণ নির্বিকার শোনায় আফজালের কণ্ঠ। নিশি সেই গহ্বর থেকে নিজেকে টেনে তোলে। আফজাল বলে, তুমি কিন্তু এখনো খাচ্ছ না, এগুলো আমি পয়সা দিয়ে কিনেছি, আর তোমার মতো অসভ্য মেয়েলোককে অনুরোধ করছি এসব খাওয়ার জন্য।

হ্যাঁ অসভ্য, তাতেও কম বলা হয়। নিতান্ত ভদ্র ফ্যামিলিতে জন্মেছি বলে তুমি যা, আমার পক্ষে তা বলা সম্ভব হচ্ছে না। এখন যদি তুমি না খাও, আমি সবকিছু তোমার মুখে ছুঁড়ে মারব।

নিশি খেতে থাকে।

ঠাণ্ডা খাদ্যকণাগুলোর সবই যেন মৃত। নিশি খাদ্য নয়, একেকটা মরামুণ্ডু খায়। এরপর খুঁজতে থাকে বাঁশি, সশব্দে জেগে উঠুক খাদ্যকণাগুলো। এরা প্রত্যেকেই প্রেত রূপ ধারণ করে ঝাঁপিয়ে পড়ুক তার ওপর, যে পয়সা দিয়ে এদের কিনেছে, তার মুখ-কান-শরীর দুমড়ে মুচড়ে এক করে দিক, ভাবতে ভাবতে নিশির ক্রুদ্ধ-কম্পিত শরীর টানটান হয়ে ওঠে।

থিতিয়ে আসা বাতিগুলো দেখতে দেখতে সে কেমন এলিয়ে পড়ে। তখন ওই দোমড়ানো শব আমাকেই তো বহন করতে হবে। নইলে এই একের পর এক বিচ্যুতির চক্র থেকে কী করে নিজেকে উদ্ধার করব? স্রোতের নিঃসীমে ভেসে যায় তার দেহ, হ্যাঁ, আমি অপরাধী, আমি আফজালকে মিথ্যে বলেছি, না যদি বলতাম, তার চরিত্রের এইসব দিক উন্মোচিত হতো না। অবশ্য এর চেয়ে মারাত্মক পরিস্থিতি হয়েছে, তবে মেরুদণ্ডে এ-রকম আঘাত এই প্রথম। উল্টো আফজাল যদি ভাবে, নিশিকে যদি সন্দেহ না করতাম, তাহলে সে কতটা মিথ্যাবাদী করতে পারে, তা জানা হতো না?

যে যা খুশি ভাবুক, আমি আমারটাই বুঝছি, দিন শেষ... দিন শেষ!

সামনে রাখা খাবারগুলো বিচিত্র রূপ ধারণ করে। সেগুলোর বিচ্ছিরি নখ গজাতে থাকে। কেঁচোর মতো কিলবিল করে ওঠে। গলায় তুলতেই দম আটকে আসে। নিশির চোখ লাল হয়ে ওঠে, এখন এগুলো খেতে না পারলে, নিশি ঠিক জানে না সেই পরিস্থিতি কী রূপ নেবে! আফজাল মনে করবে, সে জেদ করে নিজের জায়গায় স্থির থাকার জন্য অভিনয় করছে।

পালাতে হবে! এই ভাবনাটাই সব ছাপিয়ে তাকে দুর্মর করে তোলে। যে করে হোক রাস্তায় বেরিয়ে একটা রিকশা নিয়ে সোজা বাবার ওখানে—।

ঠাণ্ডা চোখে চেয়ে আছে আফজাল।

নিশি সন্তর্পণে চারদিকে তাকায়। তারপর আচমকাই কাঁধে ব্যাগটা ঝুলিয়ে রেস্টুরেন্টের মানুষগুলোর বিস্মিত চোখের সামনে দিয়ে ছুটতে থাকে। নিশি নিজেও জানে না, এ কী করে সম্ভব হলো! যেন প্রবল একটা জোয়ার, আচমকা এক ধাক্কা দিয়ে তাকে রাতের হু হু পথের মাঝখানে নিয়ে ফেলে।

পাগলের মতো রিকশা খোঁজে।

পেছনে আফজালের ডাক শুনে নিশি বিকারগ্রস্তের মতো হয়ে ওঠে, আমাকে ছেড়ে দাও।

মৃতের মতো পাংশু হয়ে উঠেছে তার চেহারা, নিশি, তুমি কি করছ তুমি জানো?

দোহাই, আমাকে ছেড়ে দাও।

তুমি বাসায় চল। যা বলার সেখানেই বলবে।

না! না! নিশি ছটফট করে ওঠে, আমি ওখানে যাবো না। তুমি আমাকে মারবে!

নিশি এটা রাস্তা, এখানে সিন ক্রিয়েট করার পরিণতি ভালো হবে না। ক্রমশ আফজালের স্বর বিপন্ন হয়ে উঠতে থাকে, তোমাকে আমি মারব ? তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে ?

পিছু হটতে হটতে নিশি পাশের বিল্ডিংয়ের খোলা গেটের সামনে দাঁড়ায়। ভয়ে কান্নায় তার স্বর রুদ্ধ হয়ে আসে। আমি তোমাকে চিনি না ? তুমি আমাকে আজ মেরেই ফেলবে। তার চেয়ে আমাকে ছেড়ে দাও।

আমি তোমাকে মারি ? তুমি কী বলছ বুঝতে পারছ ?

মার না ? নিশি রক্তাভ চোখে তাকায়, একদিন কলেজ থেকে ফিরতে দেরি হওয়ায় আমার সাথে তর্ক; মনে আছে এরপর চুলের গোছা ধরে আমার মাথাটা এমনভাবে দেয়ালের সাথে বার বার ঠুকে দিয়েছিলে, এমনভাবে, উফ্ আল্লাহ, দেয়ালটা চাপচাপ রক্তে ভরে উঠল, আমার মা ছিল না, বাবা ছিল না, আমাকে বাঁচানোর জন্য কেউ ছিল না, আমি সেদিন তোমার যে চেহারা দেখেছি! এক সময়, আমার চোখ অন্ধকার হয়ে এলো। তোমার পায়ে পড়ি, আজ আমাকে ছেড়ে দাও।

নিশি যখন স্কুটারে, তখন পর্যন্ত সে হাউমাউ করে কাঁদছে। বাইরে যাতে শব্দ না যায়, সে জন্য হাঁটুর ভাঁজে মুখ চেপে। আফজাল ওর মাথায় হাত রাখে, আজ আর আমার কিছু রাখলে না তুমি। সেদিনের ঘটনা নিয়ে আমি কি কম দুঃখিত হয়েছিলাম! নিশি, তুমি একদম সরল নও। বুকের মধ্যে সব পুষে রাখ। নিজের বিচার-বুদ্ধি দিয়ে বোঝার চেষ্টা কর, আজকে যেটুকুর জন্য তুমি যা করলে তার সবই কতটুকু যুক্তিসঙ্গত হয়েছে ? তুমি যন্ত্রণাটাই মনে রেখেছ, অসুখের সময় রাত জেগে আমি যে তোমার সেবা করি, তোমার জন্য সারাক্ষণ উৎকণ্ঠায় ভুগি, সব তোমার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল! নিশি, আজ তুমি আমার মেরুদণ্ডে এমন আঘাত করলে—!

নিশি পরদিন হাসপাতালে যায়।

সাজিদুল অনেকটা সুস্থ। নিশিকে দেখে শ্লেষ-মেশানো স্বরে বলে, সব সামলে আসতে পেরেছ তাহলে ?

রাগে রি-রি করে ওঠে নিশির ভেতরটা, তোমার এখানে আসতেই হবে এমন দায় আমার মাথায় কেউ চাপিয়েছে ?

সাজিদুল মাথা নাড়ে, বড় কিম্ভূত লাগে এই ভঙ্গিটা, দায় চাপাবে কেন ? অসীম দয়াবতী তুমি, দয়া করে ভালোবেসেছিলে, এখন আবার মাঝেমধ্যে দেখতে আসছ।

মমতাদি টেনে নিশিকে বাইরে নিয়ে ওর জ্বলে উঠতে থাকা স্ফুলিঙ্গ নিভিয়ে দেন, ও আজকাল এভাবেই কথা বলছে, তুমি বরং আজ চলে যাও। তুমি ভাবতেই পারবে না কী রকম বদলে যাচ্ছে ও। আমাকে সকালে বলে, তোমার ছেলেমেয়েরা তো ভেগেছে, আমার মাথায় বসে খাওয়ার জন্য বুঝি আমার সেবা করছ ? তুমি বোঝো কেমন লাগে ? আমি ব্যাপারটা বুঝছি, সহ্য করতে পারব, তোমার সাথে লেগে যাবে, তাতে ওরই ক্ষতি হবে।

বারান্দার দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায় নিশি, ওকে নিয়ে কী করবেন এখন ?

আরে এ তো সারাজীবনের ব্যাপার নয়, ডাক্তার বলেছেন, এরকম হতে পারে। ওকে নির্ভরতা দিতে হবে, ধীরে ধীরে সব কেটে যাবে। আজ খুব মারকুটে হয়ে আছে। তুমি কাল

একবার আস, ধৈর্য ধরে কিছুক্ষণ তার পাশে বসো। তাতে ওর উপকারই হবে। আমি তো নির্ভরতা দিচ্ছিই। তারপরও তোমার বিষয়টা—।

টানা প্যাসেজ ধরে ওরা হাঁটে। লিফ্‌টে চাপ দিয়ে কয়েকজন বুড়ো মতন মানুষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে। এর মধ্যেও মমতাদি গলা বাড়ান, আমারও কলেজ খোলা। ছাত্রীদের পড়িয়ে এখানে এসে আবার মাস্টার সাজতে হয়। সকালে সময় দিতে পারছি না। এদিকে চব্বিশ ঘন্টা ওর পাশে কারো থাকাও দরকার। ডাক্তার বলেছেন, ও যে-কোনো সময় আবার সুইসাইডের এ্যাটেম্পট্‌ নিতে পারে।

নিশি মৃদুকণ্ঠে বলে, যে নিজেই নিজের শত্রু, কে তাকে পাহারা দেবে? আপনি কতক্ষণ তাকে দেখে রাখবেন? লিফটের আলোকোজ্জ্বল দরজা খুলে গেলে বুড়োরা হুড়মুড় ঢুকে যায়। ওদের ঢোকা হয় না। মমতাদি বলেন, চলো সিঁড়ি দিয়ে নামি।

আপনি কেন নামবেন? আমিই বরং যাই।

চল এগিয়ে দিই, এই সুযোগে একটু হাঁটা হলো, আমার একদম হাঁটা হয় না।

সিঁড়ি টপকে নামতে থাকে। রাতের চৌকশ আলো, বাঁশিঅলা, মৃতদের পুনর্জাগরণ তাকে বিহ্বল করে দেয়। নিশি চারপাশে কিছু দেখে না। মনে পড়ে সেই দৃশ্য, লবণদানির মুখ তুই ভেঙেছিস?

না।

ফের মিথ্যে বলছিস? তুই ভেঙেছিস?

না।

তাহলে পরীক্ষা হয়ে যাক। কাকিমার মুখ লাল, আমি মিথ্যে সহ্য করতে পারি না। কাকিমা দরজা আটকে রেখেছেন। ভয়ে নিশির প্রাণের শেষ প্রদীপটিও নিভে গেছে। চুলে ধরে বারকয়েক চক্কর খাইয়ে বলেন, এখানে বোস, এক চুল নড়বি না।

নিশি তখুনি শব্দ করে কাঁদতে পারে না। ফলে অন্য ঘরে মা বুঝে পাচ্ছিলেন না ভেতরে কী হচ্ছে।

তিনি কোরান নিয়ে আসেন, এটা ছুঁয়ে বল, তুই ভাঙিস নি, বল, যদি মিথ্যে বলে থাকি আমার অসুস্থ বাবা মরে যাবে।

বাবার তখন চাকরি ছিল না। এ্যাকসিডেন্ট করে টানা এক বছর বিছানায় পড়ে ছিলেন। ওদের ভারে কাকা-কাকিমার ত্রাহি অবস্থা। তখনো রিনির জন্ম হয় নি। এরকম অবস্থায় সামনে ধর্মগ্রন্থ। নিশির ভেতরে তখন সব ছাপিয়ে সোচ্চার হয়ে ওঠে ছোট্ট এই শব্দ দুটো, বাঁচতে হবে।

সে শপথ করে বলেছিল, বাবা মরে যাবে।

কাকিমার পৃথিবী ঘুরতে শুরু করেছিল, আমি নিজ চোখে দেখলাম। এ মেয়ে মানুষ না, ডাইনি।

রাতে প্রচণ্ড জ্বর নিশির। বাবার অসুস্থ মুখটার কথা যতবার ভাবে, ততবার উচ্ছ্বসিত কান্না, আমি ভেঙেছি। তোমরা বাবাকে বাঁচাও মা, দেখো, আমি মরে যাচ্ছি, ঠিক মরে যাচ্ছি।

সামনে এসে দাঁড়ায় বিস্তৃত জনারণ্য।

মমতাদি বলেন, নিশি তুমি কাল একবার এসো।

নিশি ফিসফিস করে বলে, জানেন, আমার পেছনে প্রায়ই একটা আজব ছায়া হাঁটে। এত ভয় হয়! এজন্যই, আমি জানি না আসতে পারব কি-না।

রাতে আফজাল বলে, একটা খবর জানো, রেজার সাথে স্বাতীর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে?

নিশি বিস্মিত হয়, এই সেদিন না আসল? ইয়ার্কি মারছ, একদম ছাড়াছাড়ি?

এতদূরে ওদের বাসা, চিন্তিত দেখায় আফজালকে, খবরটা শুনে খুব খারাপ লাগছে, ফোনে চেষ্টা করেছি, ওদের বাসায় কেউ ধরছে না।

নিশিকে সেই ছায়া আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে, নিজেকে সেই দুঃসহ রাহু থেকে সরাতে সে আফজালের ঘনসন্নিবিষ্ট হয়। মাঝখানে ফরফর উড়তে থাকে চায়ের ধোঁয়া। হারানোর ভয় যেন আফজালকেও পেয়ে বসেছে। সে নিশিকে সাগ্রহে চুম্বন করে, এই বিষয়টি এতদিন পরে ঘটে, নিশি অস্বস্তি বোধ করে। শারীরিক সম্পর্কের সময় ছাড়া ওদের মধ্যে চুম্বন হয় না। নিশি শাড়ির আঁচল প্যাঁচাতে থাকে। ধোঁয়ার চক্রে ঠোঁট ডুবিয়েছে আফজাল, নিশি,দাম্পত্য সম্পর্ক প্রতিদিনের নির্মাণের জিনিস, অথচ একেই আমরা সবচেয়ে বেশি অবহেলা করি।

নিশি চায়ে চুমুক দিয়ে অন্যকিছু ভাবতে থাকে।

আফজাল বলে, চল, কাল ওদের বাসায় যাই। ব্যাপারটা পরিষ্কার কিছু শুনি নি, তবে স্বাতী আলাদা কোথাও চলে গেছে এ রকম ভাসাভাসা কিছু শুনলাম।

হায় মানুষের সুখ! নিশি সাধারণ কণ্ঠে হতাশা ব্যক্ত করে, এবং এই 'সুখ' শব্দটি নিয়ে হেঁয়ালিপূর্ণ খেলায় মেতে ওঠে, কী বায়বীয় এই বস্তু, না? অথচ সমগ্র জীবন এরই জন্য— সুখ বড় অদ্ভুত শব্দ!

আফজাল হঠাৎ বলে, তোমার কি গভীর কোনো কষ্ট আছে নিশি, যা আমাকে বলতে পার না?

আমার যদি গভীর কোনো কষ্ট থাকত, নিশি নিজেকে গুছিয়ে নেয়, তাহলে আমি বেঁচে যেতাম। আমার কোনো কিছুতেই কোনো গভীর কষ্ট হয় না, সময়ের সাথে সাথে যে কোনো গভীর কষ্ট আমার ভেতরে থেকে ঝাপসা হতে হতে মিলিয়ে যায়। এজন্য নিজেকে খুব দরিদ্র মনে হয়। জানো, এদিক দিয়ে আসলে নিঃস্ব, আমার এমন কোনো মূল্যবান সংগ্রহ নেই, যা আমাকে সত্যি সত্যিই বেদনার্ত করতে পারে। আমার যা আছে, তা হলো অস্তিত্বের সংকট আর ভয়।

আফজাল মনোযোগ দিয়ে শোনে। তারপর বলে, তোমার আবার ভয় কিসের? কী অন্যায় করেছ তুমি?

এই যে আমার বাচ্চা হয় না, কখন কোথায় ভেসে যাই, পেছনে টান দেয়ার কেউ নেই, নিশি নিজের কাছেই কেমন অচেনা হয়ে ওঠে, তুমি কখন মুখ থুবড়ে পড়, এই যে আমরা

চুপ করে আছি এখন, এইসব নিঃশব্দতা কখন রাক্ষসের মতো মাথা ফুঁড়ে ওঠে। এই যে তুমি ভাবছ, একজনের ভয় পাওয়ার অর্থই হলো তার কোনো অন্যায় করা। তুমি তো আমার নিঃসঙ্গতা নিয়ে ভাব না, কত সন্দেহ কর, মানুষের একটা মূল জায়গা থাকে, যেটার মধ্যে তার সত্য বাস করে, আমরা কেউ কারো সেই মূল জায়গা ছুঁতে পারি না। বাইরের আচরণগুলো নিয়ে সন্দেহ করি, প্রমাণ না পেয়ে আবার জোড়াতালি দিয়ে তার সাথেই সংসার করি।

তুমি স্বাতীদেরকে দেখ, আফজাল ম্লান কণ্ঠে উচ্চারণ করে, ওরা দু'জনেই খুব স্বাধীন ছিল। শেষ পর্যন্ত দেখলে তো পরিণতি?

এ নিছক স্বাধীনতার একটা ভান ছিল, আমরা বাঙালি না? আমাদের রক্তের মধ্যেই এসব নেই। কেউ কারো স্বাধীনতাকে শ্রদ্ধা করতে পারি না। বাদ দাও এসব, আজ আমার শরীরটা খুব খারাপ। এখনো ভাত চড়ানো হয় নি, ইচ্ছেও করছে না।

দিনের তরকারি আছে?

হ্যাঁ।

তুমি শুয়ে থাক, আজ আমিই ভাত রাঁধব।

নিশি হাসে, এই মহানুভবতার জন্য তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ভাত তোমাকে রাঁধতে হবে না, দুটো চাল আমিই ফুটিয়ে নিচ্ছি। আফজাল টিভি-র সুইচ অন করে। নিশি ভেতরে যায়। ভাত চড়িয়ে ন্যাকড়া নিয়ে আসে শোকেসের গ্লাস মোছার জন্য। আফজাল বলে, একজন মানুষ তোমার দরকার, কতজনকে যে বলেছি। আমাদের ব্যাংকের দারোয়ানকে পর্যন্ত, তোমার মা একটা ম্যানেজ করতে পারেন না? ও বাড়িতে সবসময়ই তো একজন থাকে।

কোত্থেকে দেবেন? নিজেই কত ঠেলেঠুলে চালায়, সবাই আজকাল গার্মেন্টিসে যাচ্ছে।

অথচ ওখানে কী রকম শোষণ তা তুমি ভাবতেই পারবে না, আফজাল বলে, এক মিনিটও কাজে ফাঁকি দিলে পয়সা কাটা। বাথরুমে গিয়ে পাঁচ মিনিট বরাদ্দ সময়ের চেয়ে আধমিনিট বেশি কাটিয়েছ কি পয়সা কাটা। গর্ভবতী হলে কাজ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। গভীর রাত পর্যন্ত গাধার মতন খাটিয়ে মাসে বেতন দেয় পাঁচ থেকে সাতশো টাকা, ওরা তাও ওখানেই কাজ করবে।

নিশি হাসে, গার্মেন্টিস সম্পর্কে ভালোই জানো দেখছি, কীভাবে ওরা এরপরও কাজ করে বাঁচে সে হিসেবটাই আমি বুঝি না।

আমার মারও ছিল এমন জীবন, আফজাল কেমন বিষণ্ন হয়ে ওঠে, গ্রামের বাড়ির কাজ, ধানমাড়াই, চুলো ঠেলা সবকিছুর সঙ্গে মা থাকত। এরপরও সামান্য ভুল হলে বাবা যা মারত তাকে! আমরা নদী পার হয়ে ইস্কুলে যেতাম, বাবা বলত, পড়াশোনা করে কী হবে, অন্যের গোলামি করবে? তার চেয়ে নিজের জমিজমা বুঝে নে। এই একটি বিষয়ে মা ছিল মারমুখী, আমাদের জোর করে স্কুলে পাঠাত। মা'র দুঃসহ চোখের পানির মধ্য দিয়ে আমি এই জায়গায় এসেছি। আমার সবচেয়ে বড় কষ্ট কি জানো নিশি, সে বেঁচে থাকতে আমি যে দাঁড়িয়েছি, সেটা দেখে যেতে পারল না।

নিশি অদ্ভুত করে হাসে, তারপরও তুমি তোমার বাবাকে খুব ফিল কর, তোমার এই বিষয়টার সঙ্গে আমি এক হতে পারি না। তুমি দায়িত্ব পালন কর সে অন্য জিনিস, এমনভাবে অনুভব কর তাকে, আমি কিছুতেই আর মেলাতে পারি না।

আফজাল এলিয়ে পড়ে সোফায়, তারপরও বাবা তো! বাড়িতে অসুস্থ পড়ে আছে, ভাবতে ভালো লাগে না।

তুমি তাকে ঢাকায় আনতে চাও, সে এই বাড়িতে থাকবে, আমি তার সেবা করব, তুমি ভীষণভাবে এটা চাও। শুধু আমার সাথে তার সম্পর্কের ধরনটা ঠিক কী রকম হবে, সেটা ভেবে আনতে সাহস পাও না। এ নিয়েও তোমার মধ্যে একটা প্রবল দুঃখবোধ আছে।

সেটা কি আমার খুব বেশি কিছু চাওয়া?

বেশিই। যে মানুষটিকে আমি শ্রদ্ধা করতে পারি না, যার সাথে আমার না আত্মার, না নাড়ির কোনোই সম্পর্ক নেই। চব্বিশ ঘণ্টা তার সাথে আমাকে বাস করতে হবে শুধু দায়িত্বের কারণে? তুমি এসব বিষয়ে একটু বেশিই আশা কর।

দেখ, আমার উপার্জন আমার বাবা খাবে, এই চাওয়াকে তুমি খুব বেশি আশা করা মনে করছো? তুমি খুব সাধারণ মেয়ে আমার জন্য এটাই কষ্টকর।

আমি সাধারণ মেয়ে হলে তোমার কোনো সমস্যাই থাকত না। তুমি যেভাবে বেড়ে উঠেছ, যেভাবে চিন্তা কর তাতে তোমার তেমন একজন স্ত্রী হলেই ভালো হতো। তুমি নিজেই ভেবে দেখ গ্রাম্যসংস্কার এবং আধুনিকতা— দুটোর কেমন টানাপড়েন তোমার মধ্যে। গ্রাম্য সংস্কার নিয়ে মাঝেমধ্যে তুমি ফুঁসে ওঠো। তোমার উপার্জনই তখন তোমার কাছে সবচেয়ে বড় হয়ে যায়, তুমি আমাকে তুচ্ছ সব বিষয়েও সন্দেহ কর, কিন্তু আধুনিক মানুষটি আবার বেশিদূর তোমাকে এগুতে দেয় না, সন্দেহ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে দেয় না। স্ত্রীর কাজে সাহায্য করার জন্য ভাত চড়াতে চায়। দুটো সত্তা কোনোদিনই পাশাপাশি চলে না। তোমার ভেতর চলছে, এটাই অস্বাভাবিক। নিজের সাথে ভণ্ডামির কোনো দরকার নেই আফজাল; তুমি নিজেকে আগে চিনতে চেষ্টা কর। কোন্টা তোমার আসল সত্তা? যে লোকটি তোমার মাকে পেটাতেন, তোমার জীবনের এই জায়গায় আসার প্রধান অন্তরায় ছিলেন যিনি, তাঁর জন্য অসীম দুর্বলতা তোমার এবং আমাকেও বাধ্য করতে চাও তাঁকে শ্রদ্ধা করার জন্য। অথচ আর কারো একটি সাধারণ অপরাধের কারণেও তিনি তোমার মন থেকে পর্যন্ত মুছে যেতে পারেন। তুমি নিজেকে নিয়ে চিন্তা করে দেখ কী রকম স্ব-বিরোধী তোমার আচরণ।

আমার বাবা, পরিবারের কোনো দায়িত্বের প্রশ্নে তোমার যত লেকচার শুরু হয়, আফজাল বলে, কোনটা আমার আসল সত্তা তুমি চিনতে চেয়েছ? আমার এসব আচরণের ভেতরকার কারণ কখনো এক মুহূর্তের জন্যে হলেও তোমাকে ভাবিত করেছে?

বিষয়টা তোমার বাবা নয়, নিশি ঠাণ্ডা মাথায় এগোয়, বিষয়টা আমার সাথে তাঁর যোগাযোগ কেমন, সেটা। তুমি মোটা মাথায় আমার ওপর যাচ্ছেতাই চাপাতে পার না। আমার বিয়ের পর তোমার ভাগ্নে আমার এখানে ছিল। আমি তার জন্য কম করেছি? দু'দিন পর পর গ্রাম থেকে গাঁট বেঁধে তোমার আত্মীয়েরা আসে, ওদের শিশুপার্ক, ওদের চিকিৎসা, আমি ছুটি না? প্রাণ থেকে উঠে না আসলে ভান করে কারো সারাজীবনের দায়িত্ব নেয়া

যায় না। তোমার সাথে তোমার বাবার যা সম্পর্ক, আজ তোমার মধ্যে তোমার পুরুষ সত্তা, উপার্জন ক্ষমতা এইসব বোধ চাগিয়ে উঠছে বলে এই নিয়ে অপরাধ বোধে ভুগছ। তিনি যদি এখানে এসে থাকতে শুরু করেন, আমি যদি তাঁকে সসম্মানে মেনে নিই, তোমার মধ্যে অস্বস্তি শুরু হবে। সারাক্ষণ চোখের সামনে তুমিই তাকে সহ্য করতে পারবে না। তোমার যতটুকুই উপার্জন তার থেকে তাকে যথাসম্ভব দাও। আমার ভালোবাসাও কি তার জোরেই আদায় করতে চাও?

এদেশের বেশির ভাগ মেয়েই শ্বশুরদের বিষয়ে তোমার মতো, তুমি এর ব্যতিক্রম হতে পারলে না। আফজালের এই কথা শুনে নিশি উঠে দাঁড়ায়, তোমার সাথে তর্কে যাওয়ার মতো বোকামি আর কিছুতেই নেই। তুমি কখনো যুক্তির আসল সূত্রটা ধরতে পার না। বেশির ভাগ মেয়ে না পুরুষরাই ওরকম, স্ত্রীকে মনে করে তার বাপের কাছ থেকে কিনে আনা সম্পত্তি।

হ্যাঁ, যুক্তির সূত্র তো আমি ধরতে পারিই না। আমি তোমার মতো উকিল নই।

এরপর নিশি নিজের ক্ষিপ্ততা সামলাতে বারান্দায় দাঁড়ায়। সরু দেয়াল বেয়ে বড় আঁকুপাঁকু করে বারান্দা অব্দি মাথা বাড়িয়েছে সাবলীল কাঁটা ঝাড়। নিশি নাক বাড়ায়। এরপর মরে যায় সব ছায়া, সব তর্ক, সব ক্ষিপ্ততা, তার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসে, মনে পড়ে, আজ শিক্ষা সফর শেষ করে রিনির আসার কথা। ও যদি আবেগের আতিশয্যে বাবাকে বগলদাবা করে আজ রাতেই ওর বাসায় চলে আসে!

কিছুই ঠিক করা হলো না। সব এমন অসমাপ্ত, এমন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে আছে! যেখানেই হাত দেবে হয় কাচের টুকরো, নয়তো সুচের ডগা, নয়তো...।

বড় ভাইজান আসে নি, রিনি ঢাকায় ছিল না, কিছু জানে না আফজাল। এতগুলো ব্যাপার একই শহরে থেকে কোনো এক সময় জেনে ফেলা তার জন্য অসম্ভব কিছু? আর যদি জানে, নিশির গায়ে হিমতরঙ্গ, আফজালের প্রতি কিছুক্ষণ আগের ক্ষোভ মুহূর্তেই উবে যায়। সে শ্লথ পায়ে ঘরে আসে। শুয়ে আছে আফজাল, তার ঘন চুলে আঙুল ঢুকিয়ে বলে, আমার মাথায় যে কী হয়, কী থেকে কী সব বলতে থাকি।

নিশি নিজেকে তন্ন তন্ন করে ঘাঁটে, বিয়ের পর থেকেই শুরু হয়েছিল, সে পছন্দ করত আঁধার, ঘরের সবুজ বাতিও তার ঘুম নষ্ট করে দিত, আর আমি আলো ছাড়া পারতাম না, তাকিয়ে মনে হতো চোখ বুজে আছি। মনে হতো ঘর নয় গোরস্থান। সারারাত কুঁকড়ে থাকতাম। এ বিষয়ে চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব। তখনো তার সাথে আপোসের সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। সে আমাকে কঠিনভাবে প্রতিহত করল। বলল, আমি বাস্তববাদী লোক, ঘর কখনই গোরস্থান হয় না, এটা মানসিক রোগ, একে আমি প্রশ্রয় দিতে পারি না। এই বিষয় নিয়ে তর্ক একদিন প্রাণান্তকর হলে শীতের পুরোটা রাত সোফায় বসেছিলাম। সেই সারারাত আস্ত বিছানা জুড়ে কী করে যে অত নিশ্চিন্তির ঘুম দিল সে, দীর্ঘদিন এ নিয়ে আমার মধ্যে বিস্ময় ছিল। পরদিন সকালে কালোমুখে অফিসে, অফিস থেকে ফিরেও তার ভয়ঙ্কর অন্ধকার চেহারা।

অন্ধকারে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেলাম।

ভাবতে ভাবতে তন্দ্রাচ্ছন্ন নিশি কোল বালিশে নখের আঁচড় বসায়, এই তো শান্তির বিছানা। আর কী চাই আমার? কিন্তু এমন কান্না ঠেলে ওঠে, নিজেকে সে তখন আর চিনতে

পার না। সাত বছরের সংসারের দ্বিতীয় বছর থেকে দু'জনের মধ্যে সন্তানের কাজ্ক্ষা প্রবল হয়েছিল। এই একটি বিষয়ে দু'জন অকৃত্রিমভাবে এক হয়েছিল। বিপজ্জনক দিনগুলো গুনেগুনে পরিতৃপ্তির তোয়াক্কা না করেই তারা একত্রিত হতো। এরপর সারামাস প্রতীক্ষা। সেই প্রতীক্ষা এত প্রাণান্তকর ছিল, রক্ত দেখলেই নিশির পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যেত। একসময় এই বিষয়টি এমন প্রগাঢ় বেদনা হয়ে দেখা দিল, সে মাসের সেই সময়টায় অঝোরে কাঁদত। এরপর প্রতিমাসে সেই সংবাদ আরেকজন বুভুক্ষু লোককে জানানো, সে কাঙালের মতো সেই ভিখিরি মহিলাদের দেখত, যাদের স্তন চুষছে অনাথ শিশুরা। সে এই দেশে কচুরিপানার মতো বনে-জঙ্গলে জন্ম নেয়া লক্ষ লক্ষ শিশুর দিকে তাকিয়ে ঈর্ষায় জ্বলে যেত। ডাক্তার সব পরীক্ষা করে বললেন, কারো কোনো সমস্যা নেই। এরপর আরো ক'বছর। এক সময় আফজাল এ বিষয়ে সংযমী হয়ে উঠল। পরে এ নিয়ে আর কথা তুলত না। সেই একত্রে বাচ্চা চাওয়ার সময়টায় ছাড়া প্রথম থেকে এত বছর পর্যন্ত তারা কেউ কাউকে আর ছুঁতে পারল না। যদিও নিশির মনে হতো ওর কোঁচকানো লুঙ্গি পরার ভঙ্গিটিসহ তার প্রতিটি নাড়ির খবর আমি জানি। সার্বিকভাবে বড় সীমিত ওর স্তর। ঘরে ফেরা, ভাত খাওয়া, ঘুমুনো, বন্ধের দিন বেড়াতে যাওয়া, এই ছকের একবিন্দু বাইরে তার জীবন যায় না। কোনো রহস্য নেই ফলে তা ভেদ করার চেষ্টা থেকেও নিশি মুক্ত। কিন্তু একদিন তার সে ধারণাও পাল্টে যায়, ব্যাংকে আগত এক অতিথি মহিলাকে কিছু বোঝাচ্ছিল আফজাল, নিশি ঢুকেই একটু দূরে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, কী রকম অচেনা পরিমিত হাসি তার, কী রকম চৌকশ আর অভিনব হয়ে উঠেছিল তার মুখের ভঙ্গি। নিশি তাকে চিনতে পারে নি, অথচ এই মানুষ তার সামনে কেমন শাদামাটা, সহজ আর ঘরোয়া হয়ে ওঠে। নিশি বুঝেছিল, মানুষের ভেতর কিছু সহজাত সৌন্দর্য লুকিয়ে থাকে, তা কখনো কোনো ঘর্ষণে তার ভেতর থেকে ম্লান হয় না, এ জন্যই একঘেয়ে বদ্ধতার বাইরে গিয়ে কোনো-না-কোনো পরিস্থিতিতে নিশ্চিত তার প্রকাশ ঘটে।

মধ্যরাতে নিশির দেহ ঢেউ-সাঁতারের মতো পাক খায়, সারাক্ষণ ভয়, কিসের ভয় নিশি? যে কারো ক্রুদ্ধতাকে মৃত্যুর মতো ভয়, বাবার ক্রুদ্ধতা পর্যন্ত। কিন্তু বাবার রাগের চিরকালই একটা পরিমিত বোধ ছিল, তারপরও যতটুকু প্রদর্শন করতেন তার মুখোমুখি হওয়ার ভয়েই সে নিজের স্বকীয়তা হারাতে বসেছিল। বাবা যতক্ষণ বাসায় থাকতেন, নিশি আপাদমস্তক সুশৃঙ্খল, নিয়মমতো পড়তে বসছে, ঘুমুতে যাচ্ছে, জ্যামিতি বক্সের কাঁটা-কম্পাস ভেঙে গেলে ভয়ে আধমরা হয়ে একের পর এক চিন্তা করেছে বাবাকে এখন ঠিক কী বললে বাবা তার বিন্দুমাত্র ত্রুটি খুঁজে পাবেন না। তাকে বরাবরই রক্ষা করেছে মিথ্যা। এই মিথ্যার চর্চা করতে করতে তার বুদ্ধির সূক্ষ্ম দরজাগুলো খুলে যাচ্ছিল। বলেছিল, বাবা, আমাদের ক্লাসের টিচার আমাকে হাতে ধরে শেখাচ্ছিলেন অমনি তাঁর হাত থেকে পড়ে গিয়ে এই দেখেন অবস্থা, টিচার বলেছেন, আমাকে একটা কিনে দেবেন, কিন্তু আমি বারবার না করে এসেছি, কিনে দিতে হবে না। আমি কি ঠিক করেছি?

এইভাবে সংসারেও। নিশি এমন একজন মানুষ খুঁজেছে যার সমান্তরালে সে হাঁটতে পারে। দু'জন হবে যমজ, কেউ কাউকে ছাড়িয়ে যাবে না। সে খুঁজছিল এমন একজন মানুষ, যে তার সব অবিচার সহ্য করবে, তাকে বুঝতে পারবে, এবং ঠাণ্ডা মাথায় তাকে সংযত করবে। বিষয়টা হবে এমন সেই মানুষের মধ্যে ক্রুদ্ধতা থাকবে কিন্তু সেই ক্রুদ্ধতাকে নির্ভয়ে

ছাপিয়ে উঠবে নিশির কণ্ঠ। নিশি সেই ক্রুদ্ধতাকে ভয় পাবে না। নিশি সেই চেষ্টাই করে। তর্কে লিপ্ত হয় আফজালের সঙ্গে কিন্তু ওর মাত্রা বাড়তে থাকলে নিশি নাটাই গুটোতে থাকে। কী এক অজানা ভয়ে তার কণ্ঠ ক্রমশ আপোসমূলক হয়ে ওঠে। এর কারণ একটাই। প্রথম থেকেই সামান্য বিচ্যুতির কারণে কণ্ঠ উচ্চকিত করে নিশির সামনে আফজাল তার একটা ভয়ঙ্কর গোঁয়ার ভাবমূর্তি তৈরি করে ফেলেছে। ফলে সে সারাক্ষণ শান্ত সংহত থাকলেও নিশি সতর্ক থাকে। সে কখনোই বৃষ্টি হলে বলে না আমার ভিজতে ইচ্ছে করছে, মাসের বেতনের হিসেব নিশির জানা। তার বাইরে এখনো কিছু কিনতে ইচ্ছা হলেও এ বিষয়ে সে নিজেকে সংযত রাখে। শপিং করতে গেছে, এটা আফজালের কাছে কোনো অস্বাভাবিক বিষয় নয়, কিন্তু ওর মনে যদি প্রশ্ন জাগে, কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ শপিং কেনো, নিশি টাকা কোথায় পেল, সে শপিং থেকে ফিরে বলে, বাবার বাসায় গিয়েছিলাম, রিনি আমাকে এই লিপিস্টিকটা প্রেজেন্ট করেছে।

'মিথ্যুক মেয়েলোক।'

হ্যাঁ, আমাকে তাই বলতে পার। নিশি হেসে ওঠে, আমার মিথ্যা কারো ক্ষতি করে না, আমার মিথ্যা আমার চারপাশকে সুস্থির রাখে। আমি মিথ্যা করে আমার শ্বশুরকে বলেছিলাম, আপনার মতো বাবা পেয়েছি বলে আমার নিজের বাবাকে ফেলে আসার দুঃখ ভুলে গেছি। এটা শুনে তিনি খুশি হয়েছিলেন। কেননা তাকে আমি শ্রদ্ধা করি না, এই সত্যের প্রকাশ এখন আফজালের কাছে আমার সম্মান ক্ষুণ্ন করেছে। আমাকে যখন আফজাল বলে, মেয়েদের অলঙ্কারের প্রতি কত আকর্ষণ থাকে, তোমার নেই? আমি বলি, নেই। সে অভিভূত হয়, হ্যাঁ, আমার মিথ্যে সবার জন্য কল্যাণময়। শুধু আমি, আমি... নিশি কঁকিয়ে উঠে, ক্রমশ বিচ্ছিন্ন, পতনগামিনী হয়ে উঠছি।

নিশি উত্তেজিত হয়ে ওঠে, আমি সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করেছি, আমি কারো কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিই নি, আফজাল ক্ষিপ্ত হতে পারে আমি এমন কোনো প্রসঙ্গ তার সামনে উত্থাপন করি না, এর মধ্যে পতন কোথায়? সে ক্ষিপ্ত হতে পারে এমন কোনো জায়গায় যদি আমার কোনো স্বস্তি থাকে, আমি তা মিথ্যাচারের মধ্যে দিয়ে গ্রহণ করতে পারি, আমি করেছিও। কিন্তু ক'দিন যাবৎ কেমন বাঁধ খুলে যাচ্ছে। মরণোন্মুখ সাজিদুলের প্রতি এমন একটা অনুভব চাগিয়ে উঠছে যে, এজন্য নিজেকে কি রকম পাপী মনে হচ্ছে। স্বার্থপর মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে কিছুক্ষণ তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালে আমার হীনম্মন্যতার বোঝাটা ক্রমশ নেমে যাবে। হ্যাঁ, এখন যদি জাহিদের সাথে যোগাযোগ ঘটত এবং আমি কিছুতেই নিজের সঙ্গে না পেরে উঠতাম, তাহলে এই ক'দিন ধরে সংসারে যে অস্বস্তিটা শুরু হয়েছে, তা হতো না। আমি এক্ষেত্রে কৌশলী হয়ে উঠতাম। নিজের মধ্যে সারাদিন একটা দুর্বলতা ধুকপুক করত বলে আমি আমার সংসারের স্থায়িত্বের বিষয়ে বিচলিত হয়ে এমন সতর্কতার সাথে চলতাম, আমার আচরণে এখন যে অসংলগ্নতা আফজাল টের পাচ্ছে, তা সম্ভবত পেত না।

সাজিদুলের ওখানে যাওয়া, এসে মিথ্যে কৈফিয়ত দেয়া— এ যেন আমার মিথ্যে থেকে বেরিয়ে আসতে চাওয়ার একটা মর্মান্তিক প্রক্রিয়া। আমি বার বার ধরা পড়ছি। গত সাত বছরে যা হয়নি, উল্টোপাল্টা জোড়া লাগাচ্ছি কিন্তু তারপরও আমি অতটা বিচলিত হচ্ছি না, কেননা, আমার মনে হচ্ছে এখন আমি যা করছি এ একজন মানবিক মানুষের কর্তব্য। ওই মর্তুকাম মানুষটার জন্য আর কী-ইবা করতে পারতাম আমি! এবং খুব বিস্ময়কর,

আফজালের ক্ষেত্রে যা ঘটে না, এত বছর পর সে আমার এ রকম অসংলগ্ন আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে যথেষ্ট ধৈর্যের পরীক্ষা দিচ্ছে। অথচ সামান্য বিষয়েই দ্রুত উত্তেজনা প্রকাশ করা তার ধর্ম। তার সেই তাৎক্ষণিক প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশের অভ্যাসের কারণেই কোনো সন্ধ্যায় বাবার বাসায় যেতে ইচ্ছে করলেও এটা বলার স্পৃহাও আমার মধ্যে মরে যেত।

নিশি গভীর অন্ধকারের তলায় ডুবতে ডুবতে ভেসে ওঠে, হ্যাঁ, আমাদের দু'জনকে হয়তো এক জীবন পাশাপাশি চলতে হবে, যেহেতু মাঝখানে সন্তানের বন্ধন নেই, এভাবেই কেউ কাউকে গভীরভাবে অনুভব না করেই সংসার ভাঙার মতো বিপর্যয়ের বিষয়ে আমাদের দু'জনেরই যেহেতু সমান ভয়, সেহেতু কিছুটা মায়া, কিছুটা মিথ্যা, কিছুটা অভিনয়, এভাবেই, নিশি আবার ফাঁপা জলে ডুবে যায়, আমি আমার সুতোগুলো কাটতে চাই, আমি আমার সত্য নিয়ে শক্ত একটা ভিতের ওপর দাঁড়াতে চাই। ঠিকই বলেছিল জাহিদ, তোমার অনেক শেকড় নিশি, সেই শেকড় ইট-সুরকি ভর্তি মাটির এমন তলায় গেঁথে আছে যে, প্রচণ্ড ঝড়ে তোমার মাথা ভেঙে যেতে পারে। তারপরও দেখা যাবে দাঁড়িয়ে আছে জীবন্ত মোথা কেন ? কেন তুমি এরপরও ওপড়াও না ? সেই জংহীন মেয়েটাকে দেখে জাহিদ কী করে তার প্রবণতা বুঝতে পেরেছিল ? হ্যাঁ, আমি বারংবার মচকাই, ভেঙে পড়ায় আমার ভীষণ ভয়।

নিশি গভীর ঘুমে ডুবতে ডুবতে বিড়বিড় করে, ভয়, তোকে আমি আগুনে ঝলসে খাব!

বাদ জুম্মায় আবদুল খালিক এই গ্রামের পাপের বৃত্তান্ত বলে। বলে, হ্যাঁ, অজগর আবির্ভাবের আগে এই গেরামে পাপ আছিল, কিন্তু হেই পাপ কলেরা বসন্ত হয়া মানুষের মুখে ফুইটা উঠে নাই। পাপের কারণেই অজগর দেহা দিছে, হেরপর শুরু অইছে পাপের ফলভোগ, গেরামের পর গেরাম বিনাশ হয়া গেল।

জাহিদ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। যদিও তার মধ্যে খেলা করছিল অন্য স্রোত, তা তাকে ঠেলছিল, অস্থির করে তুলছিল। একটি ঘটনা, যার সূত্র খুঁজতেই মূলত সে এই গ্রামে এসেছে, আবদুল খালিকের পাপ-বৃত্তান্তের ভেতর দিয়ে যদি সেই সত্য আবিষ্কার হয়ে যায় ? অজগরে তার আগ্রহ নেই। কিন্তু মুখে স্থিরতা রেখে এর বিশ্লেষণই শুনে যেতে হচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে। এ ছাড়াও চিরকাল তার ক্ষেত্রে যা ঘটে, রওয়ানা দেয়, শেষ প্রান্তে গিয়ে উদ্দেশ্য ঠিক থাকে না। যেন শিশু, বেলুন দেখে চিৎকার করছে, হাতে ঝুনঝুনি তুলে দেয়া হলো, ভুলে গেল। এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটতে যাচ্ছে, যে দুর্মর একাগ্রতা নিয়ে ট্রেন, বাস করে এখানে এসেছে, আসার পরই বালিকার অগ্নিমুখ, বৃদ্ধার রহস্যময় চলন, তাদের সুচকর্ম এসবে মন গেঁথে গেল। তারপরই তার সব চিন্তা মোড় নিতে শুরু করল যমজ ছায়াগুলোর দিকে। আবদুল খালিক গ্রামের এত পতনের গল্প করছে কিন্তু তার কাঙ্ক্ষিত কোনো বিষয়ই সে স্পর্শ করছে না। অথচ কোন ধবল জ্যোৎস্নায় একটি কুকুর চিৎকার করে কাঁদছিল, কার জন্মের সময় সারারাত প্যাঁচা ডেকেছে, কার পাযুগল জিনের পায়ের মতো বাঁকা, কার অলুক্ষণে চোখ বেড়ালের চোখের মতো শাদাটে, এগুলোকে পর্যন্ত সে গ্রামের গুরুত্বপূর্ণ পাপ হিসেবে চিহ্নিত করছে।

সব কথার মর্মার্থ হিসেবে সে যা বোঝাতে চাইছে, জাহিদের কথায় ক্রুদ্ধ হওয়াটা তার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। এই গ্রামের কেউই বাইরের লোককে প্রশ্রয় দেয় না। কিন্তু জাহিদ এই গ্রামের আত্মীয়। এ ছাড়া সে শিক্ষিত হলেও ধর্মের বিষয়ে তার প্রবল অনুরাগ আবদুল খালিক লক্ষ করেছে। যথাযোগ্য সম্মানী দিয়ে সে তাবিজ কিনেছে। এ রকম একজন মানুষের বিভ্রান্তি দূর করা আবদুল খালিকের কর্তব্য। সে বলে, শয়তান দমনের বিষয়ে আমরা একজোট হইতাছি না ক্যান এইডাই তো আপনের জিজ্ঞাসা ? হ্যাঁ, এই বিষয় নিয়া মনের মধ্যে আমারও চিন্তা আইছে কিন্তু আল্লাহর মর্জি আমরা ক্যামনে বুঝুম ? আল্লায় ক্যান তারে পাডাইছে তার কী জানি আমরা ? ধরেন, আমরা তারে ধ্বংস করবার লাইগ্যা অস্ত্র ছুড়লাম কিন্তু রাক্ষসের কিচ্ছা শুনেন নাই ? এক রাক্ষসের রক্ত থাইক্যা হাজার রাক্ষস ? যদি তাই অয়, আমরা সামান্য মানুষ কই গিয়া খাড়াইমু ? আমরা অহন অপেক্ষা করতাছি। আল্লা অবশ্যই এই গেরামের কোনো নেক বান্দারে খোয়াবে এই বিষয়ে নির্দেশ দিবেন। তাঁর নির্দেশ ছাড়া ওই রহম আজগুবি সাপের লেঙ্গুরে পাও দিমু, কার কলিজায় দুইডা প্রাণ আছে ?

জাহিদ অসহিষ্ণু হয়ে এবার যমজ ছায়াগুলোর বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে, ভাইসাব, গ্রামের এত পাপ সম্পর্কে বললেন, আমাদের হীরা, যে নিষ্পাপ শিশু অবস্থা থেকে সবে জীবনকে চিনতে শিখছে, কতগুলো মানুষ তাকে এরকম নৃশংসভাবে অপমান করল আপনারা গ্রামের দায়িত্বপ্রাপ্ত বুদ্ধিজীবী হয়ে এ বিষয়ে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করলেন না ?

এইসব মানুষের কাজ ? আবদুল খালিক আর্তনাদ করে ওঠে, আপনি তাগোর মানুষ কইতাছেন ?

জাহিদ ধীর কণ্ঠে বলে, তারা মানুষ না, ধরলাম মানুষরূপী জানোয়ার।

জানোয়ারই ক্যান কইবেন ? এই কাজ তো জানোয়ার করে নাই, করছে জিনেরা। জিনদের মইধ্যেও প্রকারভেদ আছে, কামেল জিন, বদজিন। এইসব করছে বদজিনেরা। গেরামে অজগর আহনের পরে এই কাণ্ড ঘটছে, বিষয়ডা বুইঝা দেহেন ? মাইয়াডা কোন্ কালে কোন পাপ করছিল, হের প্রায়শ্চিত্ত করছে।

আপনি বলছেন এসব শয়তানের কাজ ? কোনো মানুষ এর সঙ্গে জড়িত নয় ?

আপনে কি সন্দেহ পোষণ করেন ? আবদুল খালিক বাঁকা চোখে তাকায়, শিক্ষিত মানুষরে নিয়া এই এক সমস্যা, কিছু বুঝাইতে গেলে অশিক্ষিতের মতন আচরণ করতে শুরু করে। শয়তান না অইলে কুনদিন ছয়মুখ এক লাহান হয় ?

এমন তো হতে পারে, জাহিদ তার স্থিরতা থেকে একবিন্দু নড়ে না, হীরার মা যেহেতু চোখে কম দেখেন, দু'জন কাছাকাছি বয়সের যুবককে রাতের আঁধারে এক রকম দেখেছেন ?

হেরও তো ভুল অইতে পারে, আবদুল খালেক গর্জে ওঠে, আপনি সীমা লঙ্ঘন করতাছেন, পাপিষ্ঠের মতো যুক্তির প্যাঁচ কষতাছেন। আমি আপনের সাথে আর কুনো কতা কইতে রাজি না। আপনে অহন যাইতে পারেন।

জাহিদ অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে, আপনি একজন বয়স্ক, বুদ্ধি-বিবেচনাসম্পন্ন লোক। হুট করে রাগ করা, মাথা গরম করা এসব তো যুবকদের ধর্ম। যুবকরাই ভুল করে, আপনি বুঝছেন না ওইরকম একটা কচি মেয়ের ওপর, যে জানে না তার পাপ কী, এমন জঘন্য

একটা অবিচার হলো, আমার তো নানারকম প্রতিক্রিয়া হতে পারে, আমি ভুলও বলতে পারি, আল্লাহ বলেছেন, ভুল বোঝা বা জানার আগে অন্বেষণ করতে। হয়তো আমারই ভুল হচ্ছে আর সবাই ঠিক বুঝেছে, সেই ভুল সংশোধনের জন্যই আমি অন্বেষায় বেরিয়েছি। তাতে কী এমন অন্যায় ?

আবদুল খালিক নতমুখে বসে থাকে।

জাহিদ বলে, মানুষকে সন্দেহ করলে কঠিন কোনো পাপ হয় না। সন্দেহ থেকেই সত্য বেরিয়ে আসে। বিশ্বাস করছি গ্রামে অজগর এসেছে। কিন্তু এরপর যা কুকর্ম ঘটবে সবই যে সেই কারণেই ঘটবে তার কী যুক্তি আছে ? তাহলে তো সমাজ ঠিক থাকবে না। সমাজের যারা অনিষ্টকারী লোক, যারা অজগর আসার আগেও অন্যায় করে মানুষের কাছে ধিক্কৃত হয়েছে, তারা এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করবে। তারা আর ধিক্কৃত হবে না। আপনি সমাজের দায়িত্ব মাথায় নিয়েছেন যে কোনো অন্যায়ের ক্ষেত্রে সন্দেহ পোষণ করে কোনটা মানুষের কাজ কোনটা শয়তানের, আপনারই বের করা উচিত।

আবদুল খালিকের মুখ লাল হয়ে ওঠে, দ্যাহেন, আমি আল্লাহর একজন ক্ষুদ্র বান্দা। আমারে অতসব কইয়া লজ্জা দিবেন না, আমি উপযুক্ত নই, হেরপরেও আমার উপরে সমাজের দায়িত্ব দেওয়া অইছে। এই দায়িত্ব বড় কঠিন। একদিকে সংসার-ধর্ম ঠিক রাখা, একদিকে সমাজের ভালা-মন্দ দেখা, আরেকদিকে আল্লাহর ধর্ম ঠিক রাখা বড় কঠিন। সমাজের কোন জিনিসটা নিয়া ঘাটাইতে গিয়া আল্লাহর ধর্মে আঘাত লাগে, কী থাইক্যা কী ক্ষতি হয়ে যায় এইসব ভাইবা আমার বড় ভয় করে।

জাহিদ বলে, আল্লাহর ধর্ম কি কাচের মতো হালকা জিনিস সামান্য আঘাতে ভেঙে যাবে ? আল্লাহর উদারতা আর ক্ষমা সম্পর্কে কে না জানে ? এই গ্রামের একজন বিধর্মী যদি মসজিদের সামনে দিয়ে হেঁটে যায়, আপনারা মনে করেন মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট হয়ে গেল। অথচ আল্লাহ বলেছেন, তোমরা একটি ভাঙা মন্দিরের ইট তুলে দাও, কিন্তু তা বিশ্বাস করো না। মানুষের মনে হাজার প্রশ্ন আসবে, হাজার সন্দেহ, আপনারা প্রশ্নের মুখ বন্ধ করে রেখেছেন। প্রশ্ন ছাড়া আল্লাহকেই-বা কোথায় খুঁজে পাবেন ? এই দুনিয়া কী ? ঘাস-লতা-পাতা-সমুদ্র এইসব কী ? মানুষ কী ? সৌরজগৎ কী ? কে এই অনির্বচনীয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করল ? তখনই আল্লাহর প্রসঙ্গ আসবে। ধর্ম বিশাল জিনিস, কোনোকিছুর অন্বেষায় এর গায়ে কোনো দাগ পড়ে না। সমাজকে সুস্থ-সুন্দর রাখার জন্যই এর জন্ম, অথচ একে ঠিক রাখার জন্য সমাজের পাপাচার সম্পর্কে আমরা চোখ ফিরিয়ে আছি। আমরা যা ঘটছে তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে আছি নিয়তির দোহাই দিয়ে, এই করে মনে করছি, ধর্ম ঠিক থাকছে। সমাজ শেষ হয়ে গেলে ধর্ম তখন কী করবে ?

আবদুল খালিককে বড় বিপন্ন দেখায়। অনুমান করা যায় সে এই জাতীয় পরিস্থিতির মুখোমুখি কোনোদিন সে হয় নি। এইসব প্রশ্ন উত্থাপন মাত্র সে কঠিন মুখে প্রতিহত করায় অভ্যস্ত। ফলে তার কাছে কোনোদিন এইসব প্রসঙ্গ বেশিদূর আগায় না, কিন্তু ছেলেটি বড় বিপজ্জনকভাবে অনেকদূর এগিয়ে এসেছে, আবদুল খালিকের এমন কোনো ভাষা জানা নেই যা দিয়ে সে তাকে ঠেলে সরাতে পারে। এ ছাড়া তার ব্যক্তিগত জীবনও বড় কন্টকময়। জাহিদও লক্ষ করেছে, সারাক্ষণ এক অদ্ভুত বিমর্ষতা গ্রাস করে থাকে আবদুল খালিককে। সেই সূত্র ধরেই জাহিদ যুক্তিতর্ক দিয়ে কব্জা-করা লোকটিকে ভিন্ন দিকে ঘোরাতে চায়, সে

আজ আর এ বিষয়ে বেশি এগুতে চায় না। তার কথা আপাতত আবদুল খালিককে চিন্তিত করেছে এই যথেষ্ট। সেই চিন্তা থেকেই সে বলে, ভাইসাব, আমি কি আপনার মনের যন্ত্রণা আরো বাড়িয়ে দিলাম? আবদুল খালিক চমকে ওঠে, কী বললেন?

না, তেমন কিছু না।

যদি বেয়াদপি মনে না করেন তো একটা কথা বলি। আপনার মুখ দেখে মনে হয় সারাক্ষণ আপনি একটা অশান্তির ভেতর আছেন। আমি কি সেই অশান্তির মাত্রা বাড়িয়ে দিলাম? আবদুল খালিক ঠাণ্ডা কণ্ঠে বলে, গ্রামে অজগররূপী শয়তান আইছে। অশান্তিতে না থাইক্যা উপায় আছে?

না ভাইসাব, আমার স্পষ্ট মনে হয় আপনার ভেতর এর বাইরেও অন্য অশান্তি আছে, যা আপনি কাউকে বলতে পারেন না। ছোট ভাইয়ের অন্যায় নেবেন না, শহরে আমি মনের বিজ্ঞানের ওপর পড়াশোনা করেছি, এজন্যই কিছুটা হলেও ধরতে পারি, মানুষের মনের অসুখ দেহের অসুখের চেয়েও মারাত্মক। একে বাড়তে না দিয়ে এর চিকিৎসা করা উচিত।

পড়ে আসতে থাকা দুপুরের দিকে তাকিয়ে ম্রিয়মাণ হয়ে ওঠে আবদুল খালিকের গলা, মনের কি কোনো চিকিৎসা অয়? মন কি দেহা যায় যে ধইরা-বাইন্দ্যা এর চিকিৎসা করন যাইব?

পাগলের চিকিৎসা হয় না? পাগলের রোগ কি দেখা যায়?

পাগল তো পাগলই, অর চিকিৎসা তো অইবোই।

আমাদের দেশেই এমন হয়, বদ্ধ পাগল না হওয়া পর্যন্ত চিকিৎসা হয় না। উন্নত দেশে মাঝেমধ্যেই সুস্থ মানুষও মানসিক কোনো চাপের কারণে ডাক্তারের কাছে যায়, মনের কত ব্যামো আছে, কেউ মাকড়সা দেখে ভয় পায়, কেউ শেয়াল, কেউ ভূত। এমন একজন রোগীর খবর জানি বিয়ের রাতে যে স্বামীর চেহারা দেখে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, তার বাবাকে যে খুন করেছে সে নাকি হুবহু তার স্বামীর মতো দেখতে। নিরপরাধ লোকটি স্ত্রীর এই ব্যামোর কারণে অনেকদিন তার সামনে পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়াতে পারে নি।

আবদুল খালিকের কোনো এক গোপন তন্ত্রীর মধ্যে নাড়া পড়ে, সে উন্মুখ হয়ে প্রশ্ন করে, শেষে স্ত্রীর রোগ ভালা অইছে?

অবশ্যই হয়েছে। মানসিক ডাক্তার তার চিকিৎসা দিয়ে সেই মনের রোগ সারিয়ে তুলেছেন।

মসজিদের টানা পরিচ্ছন্ন মেঝেতে জাহিদের কেমন শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। এর মধ্যে পরাক্রান্ত বাতাস। জাহিদ কেমন ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আবদুল খালিক চাপা স্বরে বলে, এই হক্কল কতা মসজিদের মইধ্যে বইয়া কওন ঠিক না। চলেন, মসজিদের বাইরে গিয়া কতা বলি।

মসজিদ থেকে বেরোনোর পথে আবদুল খালিক ভিন্ন প্রসঙ্গে কথা বলে, আপনাগোর কোলকাত্তায় নাকি কোরবানি ঈদে গরু জবাই নিষিদ্ধ করছে? জাহিদ নিজেও এ বিষয়ে শুনেছে। সে বলে, ওদের বহু বছর আগে প্রণীত একটা আইনে উল্লেখ আছে, কেউ প্রকাশ্য স্থানে কোনো প্রাণী জবাই বা হত্যা করতে পারবে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এতদিন এই আইন প্রয়োগের ব্যাপারে শিথিল ছিলেন। এখন যে কোনো কারণে হোক এক শ্রেণীর লোক

এই আইনের বিষয়ে সোচ্চার হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পড়ে গেছেন বিপাকে। বিষয়টি শুধু প্রকাশ্য স্থানে নিষিদ্ধ। আবদুল খালিক ঠা-ঠা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে বলে, আমরা এইখানে বইসা নানা কথা শুনি, উত্তেজিত হই, প্রশ্ন জাগে হের লাইগাই জিগাইলাম, ভাই আপনে মাগরিবের পরে আমার কাচারিতে কি একটু আইবেন ? কিছু বিষয় লইয়া কতা কওনের আছিল।

জাহিদ হেসে বলে, ঠিক আছে, আসব।

বাড়ি ফেরার পথে জাহিদ হাটে যায়। হাটের এক কোণে কদমা, ঝুনঝুনি, খই নানা জিনিসের সমাহার। বড় দরিদ্র হাট। কেনার মতো কোনো ভালো জিনিস পাওয়া যায় না। সারা বাজার খুঁজেও ভালো একটা মাছ পায় না সে। কিছু শিং মাছ আর সবজি কিনে ফেরার পথে সে আবদুল খালিককে নিয়ে ভাবে। এই লোকটি আর সব সাধারণ মৌলবাদীর মতন নয়, এর মধ্যে এখনো কিছু সরলতা আছে।

সে যখন গোসল শেষে টানা ঘুম দিয়ে সুস্থির হয়ে আবদুল খালিকের কাচারিতে পা রেখেছে, ততক্ষণে স্তব্ধ সন্ধ্যা নেমে আসছে চারপাশে। আবদুল খালিকের স্ত্রীর ছিল ফিটের ব্যামো। প্রায়ই সে দরজার সামনে, গাছের তলায় কিসের ছায়া দেখে অজ্ঞান হয়ে যেত। চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠত তার। একদিন ছাই হাতে কইমাছ চেপে ধরেছে। এর মধ্যে কী থেকে কী হলো, অজ্ঞান। গ্রামে কবিরাজ-ডাক্তার যারা ছিল তাদের সবাই পুরুষ। আবদুল খালিক কামেল মানুষ, তার স্ত্রীর কঠোর পর্দা। তার ঝাড়ফুঁকে কোনো কাজ হলো না। হাতে এঁটো ছাইসহ গোঙাতে গোঙাতে তার কোলেই স্ত্রীর মৃত্যু হলো। তার অসুস্থ দেহে কোনো পরপুরুষ হাত রাখে নি, সব কষ্ট ছাপিয়ে আবদুল খালিকের শান্তি ছিল এটাই।

এরপর বিয়ে করেছে বারো বছরের একটি মেয়েকে। তা-ও স্বপ্নে বাবা নির্দেশ দিয়েছেন, সে জন্য। বিয়া কর ব্যাটা, এইবার কচি বাচ্চা দেইখ্যা করবি। পাইলা পুইষা বড় করণের মাজেজাই আলাদা। তর মরণের সময় হে যুবতী অইবো। তার সেবা করণের তাগদ থাকবো শরীলে।

বিয়ে করেছে বেশিদিন হয় নি। এই দূর কবরখানার মধ্যে ভয়ে সিটিয়ে থাকে মেয়েটি। সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে বড় মোলায়েম কণ্ঠে সে ডাকে, সুফিয়া অ সুফিয়া। সুফিয়া নড়ে না। সারাদিন মেয়েটা বাছুরের মতো লাফায়। দিনে আবদুল খালিক বাড়ি থাকলে তার হাত-পা টিপে দেয়, দুনিয়ার গপ্পো করে। সন্ধ্যা হলেই আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটে তার। আবদুল খালিক নিজেই যেন দু মাথার অজগর, এমন ভঙ্গিতে সে ঘরের কোণে আশ্রয় নেয়। মেয়েটা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কই এখনো বুঝে উঠতে পারে নি। তার দাদি-নানিরা কি কিছুই শিখিয়ে দেয় নি তাকে ? গ্রামের মেয়ের তো মায়ের জঠরে থাকতেই স্বামীকে চিনে আসার কথা। আবদুল খালিকের অশান্তি বাড়ে। মেঝেতে ডেওয়ার বিচি ছড়ানো, সুফিয়া তোমারে ডেওয়া দিলো কে ? সুফিয়া মিনমিন করে, কুতুইব্যা।

অ কুতুবদ্দিন ? গেরামের হেই মাতা থাইকা হেয় আহে ? ওই ভাদাইম্যা ছোড়াডা তোমার ছোড, তুমি তার সম্পর্কে চাচি লাগো, হেয় তোমারে নাম ধইরা ডাহে ক্যান ?

এতে সুফিয়ার গাম্ভীর্যের বাঁধ খসে পড়ে। হি-হি হাসিতে সে মাটির ওপর গড়িয়ে পড়ে, আমি হের চাচি ? কী যে কন, কত ছোড আমি। আমাগো বাড়িতে যারা চাচি তারা কত মুরুব্বি।

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যেটা, দু'মাথা অজগর সম্পর্কে সে অবিশ্বাস পোষণ করে, একদিন বলে, হাচাই আপনে দেখছেন ? অজগরের মাতা আবার মানুষের মতো অয়নি ? আপনের মতো লোক মিছা কইলে আল্লায় মানবো ক্যান ? আবদুল খালিকের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে উল্টোপাল্টা লেগে যায়, সে সুফিয়ার মুখ চেপে বলে, তওবা কর, তওবা। এরপর উন্মুক্ত উঠানে এসে লম্বা শ্বাস টানে, হে আল্লাহ, দুধের শিশু, ক্ষমা কইরা দ্যাও।

এইসব প্রসঙ্গে জাহিদ তাকে প্রশ্ন করেছিল, আপনারা দু ভাই-ই অজগরটিকে স্পষ্ট দেখেছেন ?

আবদুল খালিকের চোখে জমেছিলো ছায়া, আমার বড় ভাইয়ের আমার প্রথম স্ত্রীর মতোই ব্যারাম আছিলো। আমরা গোরস্থানের ধার দিয়া যাইতাছি, হেয় আচমকা চিক্কোর দিলো, ওই দেহো খালিক দুই মাতা অজগর, ওই যে আব্বার মতো, ঠা-ঠা দুফরে আজব কাণ্ড, আমিও যেন দেখলাম বিরাট কি একটা মাতা তুলছে, আমরা কি আর থাহি ? চোঁ-চোঁ দৌড়, হের পরে ভাই মরল। কলেরা অইলো, এই যে গেরামের শেষ মাতায় আইছি, আগে এই হানে আছিলাম না, মসজিদের ইমাম সায়েব স্বপ্নে নির্দেশ পাইছেন যত বিপদআফদই হোক, আমাগোরে এই বাড়িতে আয়া উঠতে অইবো, নাইলে গেরামের বিপদ কাটবো না। এ বাড়িতে যে পরিবার আছিলো তারা কলেরায় নির্বংশ হইছে। এই হানে আইয়া আমার প্রথম স্ত্রী ইন্তেকাল করছেন।

আবদুল খালিকের চারপাশে ভর করে ছায়া, রাত হলেই মনে হয়, প্রথম স্ত্রী খড়ম পরে সারা বাড়িতে ঘুরছে। মাঝেমধ্যে সুপারি গাছের মাথায় সেই মুখ দেখে, লম্বা কেশর ঝুলিয়ে আবদুল খালিককে ডাকে। সে জানে, এসব শয়তানের বিভ্রম, ডাকে সাড়া দিলে নিশ্চিত মৃত্যু। সে মুখ ঘুরিয়ে রাখে। আচমকা ডেকে ওঠে নিশিপক্ষী, অন্ধকার ছিঁড়েখুঁড়ে কুপির আলো জেগে ওঠে, এর মধ্যে ভয়ে সুফিয়া তার পাঞ্জাবি খামচে ধরে। আবদুল খালিকের মধ্যে পিতৃসত্তা প্রবল হয়, অ সুফিয়া ফিতা লইয়া আসো, তোমার চুল বাইন্দা দেই। আবদুল খালিক তার চুলে বিলি কেটে ফিতে বেঁধে দেয়, তার গালে টুস্‌কি দিয়ে বলে, একটা গীত ধর তো।

কিছুক্ষণ পরই আবদুল খালিক স্বসত্তায় ফিরে আসে। তখনই বিপত্তি ঘটে। দীর্ঘ পিপাসার্ত আবদুল খালিক যতই তার গায়ে হাত বুলিয়ে স্বামী-স্ত্রীর রাত্রিকালীন সম্পর্কের মৌলিক, ধর্মীয় তাৎপর্য বোঝাতে চেষ্টা করে, ততো জোরে সে কেঁদে ওঠে, এইভাবে জীবন যায় ?

জাহিদের মধ্যেও এ বোধ প্রবল হচ্ছিল। এইভাবে জীবন যায় ? আসলে জীবন এভাবেই যায়, সে কিছুতেই একসূত্রে গ্রন্থিত হতে পারলো না, গিয়েছিল আগ্রায়, বেনাপোল হয়ে কোলকাতা, কত পথ-ঘাট-নদী, এরপর আগ্রায় ঘুরেছে, উল্টোপাল্টা ঘুমিয়ে থেকেছে। তাজমহল দেখে নি। যেতে যেতেই দেখার স্পৃহা মরে গিয়েছিল। পৃথিবীতে এমন আজব কিছু নেই, যা ওকে বিস্মিত করতে পারে, সে তাজমহলকে ছোট করতে চায় নি।

এখন এইখানে কেন এসেছি ? এই প্রশ্নে বারবার বিচলিত হয়ে ওঠে, নিজেকে হটাতে নিশির সামনে দাঁড়ায়, তোমার জন্মদাগ দেখব। যে রকম শিশিরের মতো মেয়ে, জাহিদ ভেবেছিল, মুহূর্তে এলিয়ে পড়বে। কী বুঝল মেয়েটা, এই এক প্রশ্নে তার আঙুলের কাঁপুনি থেমে গেল। জাহিদ যত বেপরোয়া, সে ততই কঠিন, শোনো নিশি, আমি শুধু দাগটা দেখব, দেখব সেটা ইউরোপ কি-না ?

নিশি কাঁদছিল, আমার সব শেষ হয়ে গেল।

তুমি ভীষণ সাধারণ নিশি, তুমি তোমার শরীরটাকে প্রাণের চেয়ে বড় করে দেখছ। তুমি উন্মোচিত হয়ে দেখো, যখন থেকে জানলাম তোমারও একটি দাগ আছে, তৃষ্ণায় আমার কলজে শুকিয়ে আছে। তুমি দেখো আমি কী করি, তারপর আমার আচরণকে বিচার করো।

নিশি মুখ ঢেকে সশব্দে বলেছিল, না।

এরপর এই একটি প্রসঙ্গ নিজের ভেতর থেকে বাদ দিয়ে, পুনরায় ওর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। ওদের কলেজের লাইব্রেরিতে নিয়ে গিয়েছিল নিশিকে, বন্ধুদের বাসায়, সিনেমায়।

নিশি বলেছিল, মফস্বল খুব সুন্দর। এদিক থেকে ঢাকা ভীষণ কর্কশ!

জাহিদের বাবাকে দেখে বলেছিল, মহাপুরুষের মতো চেহারা। নিশি আবার আগের মতোই লাজুক, কম্পিত হয়ে উঠছিল। জাহিদ, আমার হাত ছুঁতেও তোমার ইচ্ছে হয় না ?

এই যে ছুঁলাম, বলতে বলতে সে কেমন এলিয়ে পড়ত। মানুষকে কখনো ছোঁয়া যায় ? এ শুধু মানুষের স্বপ্নকে ছোঁয়ার দুর্মর চেষ্টা, এরপর লাইব্রেরির কয়েকটি বই সশব্দে আছড়ে পড়ে। বাইরে বাতাস ওঠে। জাহিদ বলে, একজন ঋষিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, নারীদেহ কী ? সে বলেছিল, এক প্রখর সূর্য, চোখ খুলে দেখেছ তো ছাই।

পতিতা পল্লী থেকে বেরিয়েছিল এক যুবক, প্রশ্ন করা হলো, সে বলল, এ এক চৌবাচ্চা, যেখানে সব ঝঞ্ঝাট ঢেলে সুস্থির হওয়া যায়। একজন বৃদ্ধকে প্রশ্ন করা হলো, সে বলল, ও শরীর ? ও মনকে ধারণ করার বাক্স মাত্র।

নিশি বলেছিল, একজন সুদেহী যুবককে প্রশ্ন করা হয় নি ?

তুমি বলতে চাইছো, আমার দেহ সুন্দর ?

নিশি রক্তাভ হয়ে উঠেছিল, তোমার সমস্যা এটাই তুমি যা বুঝে ফেলো তার মধ্যে কোনো আড়াল রাখো না। যে মানুষ তার প্রেমের প্রতি রহস্য বোধ করে না সে ক্ষেত্রেই এমনটা ঘটে থাকে। জাহিদ হেসে বলেছিল, আমি বলব, নারীদেহ তার জন্মদাগের আধার মাত্র। যে নারীদেহে জন্মদাগ নেই, সে অসম্পূর্ণ।

নিশি বাতির মতো কাঁপছিল। তার জন্মদাগ আছে। জাহিদের কাছে এখন সে আর সাধারণ কেউ নয়। অহঙ্কারে তার ওষ্ঠযুগল স্ফুরিত হয়েছিল, কিন্তু পরক্ষণেই জাহিদের ঠাণ্ডা চোখ তাকে স্থবির করে দিয়েছিল। এই সূত্র ধরেই জাহিদ যদি তাকে এই নির্জনতায় তছনছ করে ফেলে ? এক সময় ওর সব তৃষ্ণা মিটে গেলে তাকে সাধারণ ভেবে যদি শূন্যে ছুঁড়ে ফেলে ?

এরপর থেকে সেই জন্মদাগই নিশির কাছে তার প্রধান গুপ্তসম্পদ হয়ে যায়। এক সময় নিশির জন্মদাগ, তার কম্পন, তার প্রেম সবকিছু জাহিদের কাছে মরাটে হয়ে ওঠে। জাহিদ বিস্মিত হয়ে নিজের মুখোমুখি দাঁড়ায়, আশ্চর্য, ওই মেয়েটি কি ভেবেছিল, আমি ওর প্রেমে পড়েছি? সন্ধ্যার ধোঁয়া এক সময় ঘন হয়ে ওঠে, নিশি সরে গিয়ে সেখানে অদেখা সুফিয়ার ছায়া প্রতিভাত হয়। নিজের ভেতর থেকে বেরিয়ে সে আবদুল খালিকের গা ঘেঁসে বসে। বলে, ভাই আগেই বলেছি ধর্ম তো জঙ্গলের জন্য প্রবর্তিত হয় নি। জীবনকে সুন্দর করার জন্যই ধর্ম। আপনি সেই ধর্মকে রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছেন। অথচ দেখুন, জীবনকে সুন্দর করার রাস্তা খুঁজে পাচ্ছেন না।

আবদুল খালিকের দীর্ঘশ্বাস গাঢ় হয়। বলে, নিজের পরিবারের কতা বাইরে কওন গুনাহ। আপনে কইলেন মনের চিকিৎসা আছে, এই গেরামে একজনও নাই যার লগে নিজের সমস্যার কতা কওন যায়। তারা মনে করে, পীরের আবার সমস্যা কী?

আবদুল খালিক পুনর্বার নিজের ছায়াচ্ছন্নতার মধ্যে ডুবে যায়।

হারিকেনের আলো কাঁপছে; তার ওপাশে কাজল চোখের কম্পন, আকাশে ঘন বিদ্যুৎ, কণ্ঠনালীর ওপর চকচক করছে রুপোর আধুলি, সেই বিস্ফারিত চোখে কী মায়া, অবিন্যস্ত কাপড় উপচে ছড়িয়ে পড়ছে ঘন চুল, চোখে জল এলো আবদুল খালিকের, আমারে তুমি ডরাও ক্যা?

তার এ-রকম স্নেহমাখা উচ্চারণে মেয়েটির চোখে সরলতা জমে, তার কচি মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে থাকে, হাত বাড়ায় আবদুল খালিক।

সুফিয়া বলে, আপনের চেহারা এক্কেবারে আমার আব্বার লাহান। ঠিক একই মতন বুড়া, গালের মইদ্যে জঙ্গল, এক রহম দাড়ি। আব্বাও আপনের লাহান দাড়িতে মেন্দি দিত, আমারে ভাত তুইল্যা খাওয়াইত।

আবদুল খালিকের বুকের মধ্যে নাওয়ের লগির খোঁচা লাগে। অকস্মাৎ সে মেয়েটির গালে জোরে চড় কষিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। বুকের মধ্যে সীমাহীন অস্থিরতা, গিঁটে গিঁটে বাতের ব্যথা। মুহূর্তে তাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে বার্ধক্য। কী এক অস্থিরতায় রাতভোর বিছানায় ছটফট করে, গলা বেয়ে ওঠে লহু ওঠার মতো সীমাহীন যন্ত্রণা।

দক্ষিণের বাতাস ঘর কাঁপিয়ে ঢোকে। তন্দ্রার ভেতর থেকে ধড়ফড়িয়ে বেরিয়ে আসে আবদুল খালিক। চারদিকে বাতাসের তুমুল উন্মাদনা। চোখ মেলার পর দৃষ্টির সামনে ধোঁয়াশা। সেই কবে প্রথম স্ত্রী ডাহুকের গোশ্‌ত রান্না করে খাইয়েছিল,এত রাতে সেই গন্ধ নাকে আসছে। তবে কি প্রথম স্ত্রী এসেছে? আবদুল খালিক বিপন্ন হয়ে তাকে খোঁজে। মহিলার শরীরে হাড্ডিমাংস বলতে কিচ্ছু ছিলো না, কিশোরীর চপলতাও ছিল না, এর মধ্যেই কত স্বস্তির জীবন ছিল। ধোঁয়াশা ভেদ করে নারীদেহ মূর্ত হয়, তার সারা রক্ত ঠাণ্ডা করে দিয়ে মনে পড়ে, সে মৃত। তবে কি অজগর আমার দাওয়ায় পা রাখছে? চোখ ঘষে স্পষ্ট করে তাকায়, বিছানা ছেড়ে ঘরের এককোণে উপুড় হয়ে আছে সুফিয়া। চুলের ঘনত্বে ডুবে আছে তার ক্ষুদ্র অবয়ব। হাঁটুর নিচে ঠেসে আছে মুখ, হেঁচকি তুলে কাঁদছে। তারই একটানা বিষণ্ন শব্দ গুঁড়ো হয়ে বাতাসের সাথে মিশে যাচ্ছে। এই মাঝরাতে মেয়েটা কি তার আব্বাকে খোয়াবে দেখেছে? বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। কপালের কুঁচকিতে

বিরক্তি ঠেসে সে চারপাশের সঠিক সময়টি অনুধাবন করার চেষ্টা করে। বেড়ার ফাঁকে ঘন ছায়া। তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ার সময় কি পেরিয়ে গেল? বাতাস আর মেঘ মিলে সঠিক সময় গিলে খেয়েছে। তার চেয়েও সমস্যা, বালিকার কান্না। পিতা যে কি মুছিবতে ফেলে দিল তাকে! ধুলোমাটির খোলস খুলে সবে বেরিয়েছে মেয়ে, মুখে এখনো মায়ের দুধের গন্ধ লেগে আছে। প্রথম স্ত্রীর কণ্ঠ ছিল কী মৃদু। তারপরও বাইরে থেকে তার কাশির শব্দটুকু পর্যন্ত শুনতে পেলে সে মহা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত। ভয়ে স্ত্রী সিঁটিয়ে থাকত, সেই লোকের বালিকা স্ত্রীর রাতের কান্না গ্রামের ভিন্ পুরুষে শুনবে? পর মুহূর্তেই স্বস্তি ফিরে আসে, এ বাড়ির ত্রি-সীমানায় জনমানুষ নেই। কিন্তু বাতাস, সে তো শব্দ বহন করে নিয়ে যাবে, আবদুল খালিকের সব ভয় বাতাসকে।

কী অইছে সুফিয়া?

কমিয়ে রাখা হারিকেনের সলতে কাঁপছে। লুঙ্গি কুঁচিয়ে সে সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। বিহ্বল চোখে সুফিয়া তার দিকে তাকায়। সেই চোখে জনককে দেখে শ্রদ্ধা-মিশ্রিত ভয়। রাগে-ক্রোধে সে তার চুলের গোড়ালি চেপে ধরে, কী অইছে ক, ঘরে বইয়া ভাত খাস দুনিয়া টের পাস না, বাপের বাড়িতে তো মরবার বইছিলি।

মেয়েটি ভয়ে বাচ্চা পাখির মতো কাঁপতে থাকে।

তার সেই ভয়ার্ত মুখে স্পষ্ট তার প্রথম স্ত্রীর আদল ফুটে ওঠে। সেই কচিমুখ, পাতলা ঠোঁটে ভর করে পরিণত বয়সের স্ত্রী। সে মেয়েটিকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে। শরীরের মধ্যে তাপ সঞ্চারিত হচ্ছে। তার দীর্ঘদিনের খরা দেহ ক্রমশ বুভুক্ষু মানুষে রূপান্তরিত হচ্ছে কিন্তু তাকে প্রাণ্ড ধাক্কায় সরিয়ে মেয়েটি ঘরের কোনায় গিয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে।

হায়! কী অসহায় মানুষের জীবন, আবদুল খালিকের এই উচ্চারণ জাহিদকে গ্রাস করে। সে ভুলে যেতে থাকে যমজ ছায়াদের রূপ। একে কেন্দ্র করে রক্তের যে উল্লম্ফন ছিল তা অন্য এক বালিকার বেদনায় রূপান্তরিত হয়। কবরস্থান থেকে আংটি উত্তোলনের ঘটনা এতকাল তাকে বিষাদগ্রস্ত করে রেখেছিল। জন্মাবধি একটা মৃত্যুর মতো যন্ত্রণা তাকে তাড়া করে ফিরেছে, রোজলিনের এটা অন্যায়। কেন সে ভয় পেয়েছিল? একজন কিশোর তার ভালোবাসার প্রতিদানে এর চেয়ে আর কি কঠিন পরীক্ষা দিতে পারে? সেই কিশোরকে দেখে তার চোখ এমন হয়ে উঠেছিল, যেন সে কোনো ঘাতককে দেখছে। তার চেয়েও অপমানকর একজন কিশোরের ভয়ে তার পালিয়ে যাওয়া। সে তো পরিণত ছিল, সে কেন সঠিক বিষয়টি অনুভব করতে পারলো না? যত সে এ নিয়ে ভেবেছে রোজলিনের প্রতি খুনির বিদ্বেষ রক্তের মধ্যে ঢেউ তুলেছে, ভেবেছে, ওকে পেলে ওর কণ্ঠনালী চেপে ধরব, ওর নীল হয়ে ওঠা মুখে ছিটিয়ে দেব রক্ত। তারপর ওকে কাগজে মুড়িয়ে আমার বালিশের তলায় লুকিয়ে রাখব।

এরপর নিশি।

তার জন্ম দাগের খ্যাপামোতে এত ভয় পেয়েছিল তার মধ্যে সব উবে গিয়ে বাঁচার বোধ প্রবল হয়ে উঠেছিল। সেই ভীত চোখ জাহিদকে রাতের পর রাত আঙুল তাক করে দেখিয়েছে, তুমি অন্যকিছু, ভীতিকর কিছু। আজ সুফিয়ার চোখে সে সেই চোখগুলো দেখতে পায়, তার জংপড়ে যাওয়া ক্রোধে কেমন বাতাস লাগে। রক্তের তরলতা বাড়তে থাকে।

আবদুল খালিকের ঘন নিঃশ্বাসে উড়তে থাকে জাহিদের দেহ।

এর পরেই আবদুল খালিকের প্রাণের মধ্যে ভয় জমে। অবোধ এক কিশোরীকে বিয়ের কারণে প্রথম স্ত্রীর আত্মা অসন্তুষ্ট হয় নি তো ? তা না হলে কেন ওখানে তার ছায়া ভেসে ওঠে ? সেই ছায়া ঘরে আসে, বিছানায় এসে বসে। সেই ছায়া স্ত্রীর আকৃতি নিয়ে ফিস ফিস করে বলে, হাচাই আপনে অজগর দেখছেন ?

আবদুল খালিক কাঁপতে থাকে, প্রথম স্ত্রীর মধ্যেও সুফিয়ার মতো সন্দেহ ? আমি কি জানি অজগর কী না ? আমার ভাই মরণের সময় কইয়া গেছে অজগর আমি দেখছি। একটা বিরাট কী জানি আসমানের লাহান ঝিলিক দিল।

এরপর থেকে দম আটকে আসে। কী জঘন্য পাপাচারণ। স্বামীকে পিতার মতন মনে হয় ? এ অজগরেরই কারসাজি। কী করলে এর থেকে উদ্ধার পাবে সে ? সে কি দাড়িতে মেন্দি লাগানো ছেড়ে দেবে ? দাড়ি কেটে ফেললে কেমন হয় ? ছি-ছি, সামান্য মেয়ে মানুষের কারণে সে সুন্নত কেটে গুনাহগার হবে ? গ্রামের মানুষই-বা তাকে এজন্য ক্ষমা করবে কেন ? তারপর আছে গালের জরুল। অপারেশন করলে তা-ও হয়তো যাবে, কিন্তু সে যে তার বয়সের মধ্যে সেই বালিকার মৃত বাবার পূর্ণ আকৃতি ধারণ করে আছে, এর থেকে মুক্তির পথ কী ?

ফজরের সময় ঘুম ভাঙলে আবদুল খালিক টের পায়, রাতে তুমুল বৃষ্টি হয়ে গেছে। বাঁশঝাড়ের বাতাস সকালে স্তিমিত হয়ে এসেছে। সুফিয়া ঘরে নেই। সে খোলা দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে লম্বা করে শ্বাস টানে। নিমের ডাল দিয়ে দাঁত ঘষতে ঘষতে সে সারা উঠোনে সুফিয়াকে খোঁজে। গাভীর স্ফীত কুঁজে আদর বুলিয়ে ভিজে মাটির ওপর তেতো থুথু ঝাড়ে... সুফিয়া! কোনো শব্দ নেই। সামনের বিস্তৃত ধানী জমির ওপর তার কণ্ঠ ছড়িয়ে পড়ে। সাথে সাথে কণ্ঠ নিম্নগামী হয়, স্ত্রীকে চিৎকার করে ডাকছে সে, ব্যাপারটা খুবই লজ্জাজনক।

আমি ভাবলাম গোরস্থানের শয়তান অরে টাইন্যা নিয়া গেছে— বলতে বলতে আবদুল খালিকের গলা ভারি হয়ে ওঠে, আমার প্রাণের পানি শুকায়া গেল। আচমকা হুনি ঢেঁকিঘরে হি হি, আমার মাতায় রক্ত উইঠ্যা গ্যালো। উঁকি দিয়া দেহি কুতুবুদ্দিনরে ঘোড়া বানায়া হেয় লাঠির বাড়ি দিয়া হের লগে অবুঝের মতো খেলতাছে, না, খেলার বয়স তার নাই, এই বয়সেই গেরামের মাইয়ারা পোয়াতি অয়। হের হাসির আওয়াজ আমার বাড়ির সব পর্দা ভাইঙ্গা দিতে থাকলে আমার জ্ঞান থাহে না। কী মাইরডাই না মারলাম তারে—!

রাত ক্রমশ ঘুটঘুটে হয়ে ওঠে।

জাহিদ কোনো শব্দ করে না।

আবদুল খালিক বলে, আপনেরে সব কইলাম। জানি না কি কঠিন গুনাহ্ করলাম, হেরপরেও আপনে মনের বিজ্ঞানের উপর পড়ছেন। ডাক্তাররে সব কওন যায় বইলা কইলাম। আমার মনের কঠিন বোঝা কিছুডা নামল। ভাই, আপনে যমজ মানুষগুলান সম্পর্কে জানবার চাইছিলেন, আইজ আমার মন বড় দুর্বল, আইজ আমি একটা পরামর্শ আপনেরে দিবার পারি। আরেক গ্রাম পরে চেয়ারম্যানের বাড়ি, আপনে তার কাছে যান, তার কাছে গিয়া নালিশ করেন। দেহেন কিছু অয় কি না। কিন্তু আল্লাহর দোহাই, আমি তার কতা কইছি, এইডা তারে কিছুতেই কইয়েন না।

তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে।

বড় বিমর্ষ রেজার মুখ, তাদের দেখে মুখে একফোঁটা তরঙ্গ খেলে গেলো শুধু। ছেলে দুটোকে আসামির মতো দেখাচ্ছিল। ওদের দেখে একটুও কাছে ঘেঁষল না, বিচলিত মুখে দাঁড়িয়ে রইল।

রেজা ছেলেদেরকে বলল, ভেতরে যাও। সারা ঘর নিজ্‌ঝুম। কেউই প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে পারছিল না। নিশি খুঁজতে থাকে শুরু করার ভাষা। রেজার সিগ্রেটের ধোঁয়া শূন্য ঘরে মেঘের মতো উড়তে থাকে।

কী হয়েছিল ? আফজালই পরিস্থিতি সহজ করে তোলে।

অর্ধেক সিগ্রেট অ্যাসট্রের মধ্যে গুঁজে হতাশ স্বরে রেজা বলে, এ-কি একদিনের ঘটনা, কী হয়েছিল বলব ? অনেকদিন ধরেই ঘুণ কাটছিল, ব্যস ভেঙে গেল।

তবুও একটু শুনি।

কী হবে শুনে ? তার চেয়ে চা খা, কাঞ্চনী।

পরদার ওপাশ থেকে মুখ বাড়ায় তরুণী মেয়েটি।

চা।

এরপর নিজের মধ্যে আবর্তিত হতে থাকে, বলতে গেলে এর হাতেই এখন সংসার।

আফজাল অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে, চিরকালই তোর মধ্যে গোঁয়ার্তুমি দেখেছি। কোনো নিয়ম মানিস না, রাক্ষসের মতো মদ খাস।

নারী জাতির পক্ষই নিবি, এতো আমি জানিই, রেজা উত্তেজিত হয়ে ওঠে, আমার অনিয়মগুলো দেখা যেত, সেই সুবিধাতেই স্বাতী সবার সহানুভূতি কুড়িয়েছে। এসব বস্তাপচা প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতেও ঘেন্না হয়। আমি শুধু একটা কথা বলি, একজন মহিলা স্বামীকে ছেড়ে যাবার সময় তার সন্তানদের সাথে নিয়ে যাবে না ?

কী করে সম্ভব ?

ওকে শুধু এইটুকু দিয়ে বিচার কর, সারাক্ষণ বলত, সন্তানের বোঝা মাথায় চাপিয়ে আমি ওকে ল্যাংড়া করে রেখেছি।

নিশির মুখে ছায়া জমে। আফজাল রহস্যজনকভাবে চুপ হয়ে যায়। পুরো পরিস্থিতি নিশির জন্য অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে, আপনি এসব কী বলছেন ? আমার সাথে যতক্ষণ থাকত শুধু ছেলেদের গল্প করত।

ছেলেদেরকে জিজ্ঞেস কর, মেয়েদের মতো লোক দেখানো এসব তো আমি পারি না। কী কান্নাকাটি করল ওরা, সুটকেস নিয়ে বেরোনোর সময় ওই ইনোসেন্ট বাচ্চাগুলোকে কী বলেছে আফজাল জানিস ? বলেছে, তোরা তো বদমাশ বাপের রক্ত নিয়েই বড় হচ্ছিস, তোদের কারো ছায়া আমি মাড়াতে চাই না। আসল কথা ও ফেঁসে গিয়েছিল, আমি অনেকদিন ধরেই লক্ষ্য করছিলাম, যা হোক, যে চলে গেছে তার কাসুন্দি ঘেঁটে আর কি লাভ ? আমি বড্ড অসুবিধায় পড়ে গেছি, বাচ্চাদের জন্য ঠিকমতো অফিসও করতে পারছি না।

আফজাল বলে, এতদিন সংসার করলি, বাচ্চারা এতবড় হলো, ওদের দিকে তাকিয়ে বাকি জীবনটা তোরা... তুই স্বাতীকে বুঝিয়ে বল।

ও কি আছে যে ওকে বুঝিয়ে বলব ? রেজার কণ্ঠ ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, ও ওর বসের কাছে ফেঁসে গেছে। বুড়োটা প্রায়ই ওকে নামিয়ে দিয়ে যেত। ওর অনেক টাকা, আমার তা নেই, আমি বলতে চাই নি, রেজা ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে থাকে, তবুও বলছি। জানি না তোরা সুস্থ মনে ব্যাপারটাকে কিভাবে নিবি। আমার অমতে কয়েকদিন আগে সে অ্যাবরশন করেছে। আমি এজন্য কঠোর ভাষায় ওকে চার্জ করেছিলাম, ও চাপের মুখে বলেছে, আমি তোমার সন্তান নষ্ট করি নি যে তোমার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এ সন্তান অন্যজনের, হ্যাঁ, তুমি যাকে নিয়ে সন্দেহ কর, তার ; কিন্তু সে তোমার চেয়ে অনেক বড় মনের মানুষ।

রাজপথে নেমে আফজাল স্কুটার ভাড়া করে। দূরের পথ, সাধারণত বাসেই যায় ওরা। আজ কী হলো, আফজাল বাসস্ট্যান্ডের কাছে এসে স্কুটারে চেপে বসল। হু-হু হাওয়ার চাপড়ে নিশি কেমন অস্থির বোধ করে। তার লোমকূপে শিরশির করে অজানা ভয় ঢোকে। মনে হয়, স্বাতী নয়, এ সমস্ত অপরাধ নিশির। এই বোধ তাকে এমনই বিপন্ন করে তোলে, আফজালের সাথে গা লাগতেই সে চমকে ওঠে। আফজাল অস্ফুটে উচ্চারণ করে, ছি এ আমি কল্পনাও করতে পারছি না। স্বাতী এতটা নোংরা!

ও কথা বলায় নিশি প্রাণ ফিরে পায়। বাতাসে ওর কণ্ঠ মিলিয়ে যেতে থাকলে সে একটু জোরেই বলে, ওদের মধ্যে সব সময়ই লোক দেখানো ভান ছিল।

রেজারই দোষ, আফজাল বলে, স্ত্রীকে কখনই অতটা স্বেচ্ছাচারী স্বাধীনতা দেয়া উচিত না। কথাটা নিশিকে অসুস্থ করে তোলে। বিপর্যয় এড়াতে সে এর প্রতিবাদ করে না।

রাতে আফজাল নিশির সান্নিধ্যে উষ্ণ হয়ে ওঠে, বাদ দাও অন্যের সংসারের ভেজাল, বাতিটা নেভাও।

জানো, আমার ইচ্ছে হচ্ছে না, বড্ড জ্বর জ্বর লাগছে।

মানুষের প্যাঁচাল দিয়ে নিজের গায়ে জ্বর এনে লাভ আছে ? আমাদের সুখ, আমাদের আনন্দ আমাদেরকেই নির্মাণ করতে হবে। কারো জন্য কারো জীবন থেমে থাকে না। কারো জীবনের সাথে কারো জীবন মেলে না। তবুও ওদের বিষয়টা দুঃখজনক এবং এ থেকে আমাদেরও কিছুটা শিক্ষা নেয়া উচিত। বিষাদগ্রস্ত নিশি আরেকজনের তুমুল আনন্দের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেয়। সব যখন শান্ত, তখন তার অন্তস্থল থেকে ঠেলে ওঠে কান্না। নিশি বালিশের তলায় মুখ ঠেসে দেয়।

লিফ্‌ট বন্ধ।

নিজেকে টেনে ওপরে তুলে দেখে সাজিদুল ঘুমিয়ে আছে। টুল টেনে বসে থাকে অনেকক্ষণ। নার্স বলে, ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। যতই দিন যাচ্ছিল ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিল, তাঁর কাছে যে মহিলা আসেন, কাল তার মাথার গ্লাস ছুঁড়ে মেরেছে, অল্পের জন্য... ।

ভয়ে ছটফটিয়ে নিশি সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে। না, সাজিদুলের প্রতি তার এতটা মমতা নেই যে, সে তার জন্য জীবনের ঝুঁকি নেবে। তার এরকম বিকারগ্রস্ততা সহ্য করার মতো মানসিকতা বা অবস্থা কিছুই তার নেই। আজ থেকে হাসপাতালের পথ তার জন্য বন্ধ। যার জন্য সত্যিকার অর্থে তার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়, তার জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করে কী লাভ ?

বারান্দায় বসে নিশি সন্ধ্যা দেখে। সামনে ধূমায়িত চা, এই সময়টা নিশির জন্য যেমন বেদনার, তেমনি গভীর এক সুখের। চারপাশ বিষণ্ন হয়ে পড়ছে, ঘরে ফিরছে সব পাখি, যেন মৃত্যুপুরীর পাহারাদার আচমকা চেঁচিয়ে উঠল, দিন শেষ! এ সময়ের চায়ের সাথে মিশে থাকে সন্ধ্যার গভীরতা। চা হয়ে ওঠে অমৃত। নিশি এই একটা সময়ই কিছু ভাবে না, নিখুঁত চোখে সব দেখে। কিভাবে কাকেরা হুল্লোড় করে, আকাশের বাতি নিবতে থাকে। তার নয়নসুক আউলা হয়ে ওঠে। কলিংবেলে শব্দ। শ্লথ হাতে দরজা খুলে দেখে আফজালের ছায়াচ্ছন্ন মুখ। এসে কাপড় না ছেড়েই চেয়ার টেনে বসে।

কী হয়েছে? নিশির এই প্রশ্নে সহসা উত্তর মেলে না। এক সময় সে বলে, তুমি আজ হাসপাতালে গিয়েছিলে কেন? চায়ের জল ছলকে ওঠে। মুহূর্তে নিশি নিজেকে সামলে নেয়, আমি? হাসপাতালে? কে বলেছে তোমাকে?

আমাদের এক ক্লায়েন্ট বলেছে, সে তোমাকে চেনে। আমি তাকে বার বার বলেছি, সে ভুল দেখেছে, তুমি হাসপাতালে যাবে আমি জানব না? সে তার কথায় স্থির, তোমাকেই দেখেছে। বলেছে, আমি ভাবিকে চিনি না? ভুল হবে কেন?

নিশি বলে, কী জানি হয়তো দেখেছে।

তুমি গিয়েছিলে?

যদি গিয়েই থাকি তোমার মুখ এতটা ছাই হয়ে যাওয়ার কী আছে? সারাক্ষণ তুমি স্নায়ুচাপে ভোগো। এটা তা-ই প্রমাণ করে, নিশি বলে, আর আশ্চর্য, একটা জিনিস তুমি বুঝতে পারছ না সে আমাকে কোনো পার্কে বা রেস্টুরেন্টে দেখে নি যে, আমি অস্বীকার করবো। আমি যদি হাসপাতালে গিয়ে থাকি অস্বীকার করার কী আছে? আমি আজ সারাদিন বাসায়। কাল রাতে কী জ্বর। তুমি তো মড়ার মতো ঘুমিয়ে ছিলে; কিছু বলতেও পার না।

ব্যাটাকে কাল চোখের ছানি কাটাতে বলব, কাপড় বদলাতে বদলাতে আফজাল সহজ হয়ে ওঠে, জ্বর ছিল? সকালে কিছু বললে না যে? দিব্যি নাস্তা বানালে, আজব স্বভাব তোমার। আমি কি ঈশ্বর, তুমি না বললে বুঝব তোমার অসুখ করেছে? মুখের ভাবেও তো বুঝতে দাও না।

নিশি হাসে, অফিস যাওয়ার আগে এটা শুনলে তোমার ভালো লাগত?

ভালো লাগত কী না আমিই বুঝি। ঠিকই বলেছ, স্নায়ুচাপ, যখন ব্যাটা জোর দিয়ে বলল তোমাকে সে হাসপাতালে দেখেছে, এত অবাক হলাম, ভাবলাম তোমার গতিবিধির সব হিসেব থেকে তুমি আমাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছ। এরপর বাসায় ফোন করলাম, ফোন ঠিক আছে তো?

আছে।

দুপুরে করলাম, বেজেই চলল।

বাথরুমে ছিলাম, শব্দ শুনেছি, তাহলে তুমিই করেছিলে? এ বাড়িতে আমি মরে পড়ে থাকলেও তোমাকে দরজা ভেঙে ঢুকতে হবে।

আফজাল উচ্ছ্বাস-ভরা গলায় বলে, তোমার জন্যে একটা ভালো খবর আছে। একজন মানুষ পাওয়া গেছে। আমাদের অফিসের যে পিওন, ওরই গ্রামের মেয়ে। কাল এসে পৌঁছুবে।

নিশি বিষণ্ন কণ্ঠে বলে, আরেকটা খরচ বাড়ল। তোমার যা বেতন, তার মধ্যে বাড়তি একজন মানুষের বাজেট তো নেই।

আরে পৃথিবীতে এসেছি কেন ? যার যতটুকু সামর্থ্য তার ভেতর থেকেই আরাম খুঁজে নেয়ার জন্য। দরকার হলে আরেকটু কম খাব। আমাদের ছেলেপুলে হলে তারা খেত না ? এর মধ্যেই ওর হয়ে যাবে। একটা নতুন রান্না শিখেছি। এখন দোকানে যাব, সব কিনে এনে আজ রাতের জন্য তোমাকে মুক্ত করে দেব।

তুমি রান্না শিখলে আমার যন্ত্রণা বাড়ে। মানুষের কত রকম নেশা থাকে। তুমি যে কী একটা মানুষ হয়েছ, ম্যাগাজিন ঘেঁটে রান্নার জায়গাগুলো পড়। তুমি রাঁধতে গেলে আমি মুক্ত, যা একটা কথা বলেছ, গোলমরিচ গুঁড়ো কর, বেতনে পানি দাও। চাক করে পিঁয়াজ বানাও। তোমার চেল্লাচিল্লিতে আমার বারোটা বেজে যায়। আফজাল হতাশ কণ্ঠে বলে, নারীজাতি প্রতিভার এমন উল্টো মূল্যায়নই চিরকাল করে।

নিশি বলে, হয়েছে, বছরে একদিন রান্নাঘরে গিয়ে রান্নাটাকে উৎসব বানাতে হবে না। প্রতিদিন থাকতে এর মধ্যে, বুঝতে, আশ্চর্য মানুষ তুমি। কোন নেশা নেই, না সিগ্রেট, না মদ, না বন্ধুদের আড্ডা। হয়তো আমার জন্য স্বস্তিকর। তোমার কাছে একঘেয়ে লাগে না ? রোজ চাকরি করে ঘরে ফেরা, কোনো আনন্দ নেই, বিনোদন নেই।

আফজাল হাসে, সেদিন বললাম না, আনন্দ তৈরি করতে হয়। আমার সারাটা জীবন কষ্টে কেটেছে, সংগ্রামের ভেতর দিয়ে কেটেছে। টিউশনি করে নিজে পড়াশোনা করেছি, বাড়িতে টাকা পাঠিয়েছি। এখন চাকরি করছি, আমার একটা সংসার আছে, এ আমার অনেক বেশি পাওয়া। বছরে একবার রান্না! হ্যাঁ আমার শখ সেটাই। নতুন নতুন জিনিস রান্না করব, সবাইকে ডেকে খাওয়াব। টাকার বিষয়টা তখনই আমাকে কষ্ট দেয়।

নিশি ওর খসখসে গালে হাত রাখে, সকালে না সেভ করলে ? ছেলেদের দাড়ির জায়গাটা এত উর্বর ? শোনো, আমার সঞ্চয় থেকে তোমাকে কিছু দিচ্ছি, কাল যা শিখেছ তার জন্য যা দরকার, নিয়ে এসো, তোমার উৎসাহ নষ্ট করার জন্য ক্ষমা চাইছি।

আফজাল বলে, ক্ষমা আর চাইছ কেন ? এই অপরাধের জন্য সঞ্চয়ে হাত রেখেছ, তা তোমার বিশ্বব্যাংকে কী পরিমাণ সঞ্চয় আছে ?

এ আমি শুধু মরার আগে তোমার নামে উইল করে যাব। নিশির উচ্ছ্বসিত হাসির মধ্যে কী যেন খেলতে থাকে। তুমি যে হাত খরচ দাও তা থেকে অনেক কষ্টে কলেজে কিছু না খেয়ে সঞ্চয় করি। এ টাকা কি সহজ টাকা ?

রাতে বিছানায় তলিয়ে গিয়ে আফজাল প্রশ্ন করে, তোমার গাড়ল ভাইটা গেছে ? নিশি চমকে উত্তর দেয়, জানি না।

এরপর রুদ্ধচাপে নিশির সমগ্র সত্তা ফুলেফেঁপে ওঠে। গাড়ল! যেন অসংখ্য বিষপোকা পাক খেতে থাকে কানের কাছে। এরচেয়েও খারাপ কথা বলেছে আফজাল ওর প্রসঙ্গে। নিশি মন্তব্যহীন থেকেছে। আজ সেইসব আপোস হুল হয়ে নিশিকে বিদ্ধ করে, মাংসের

কাদায় কেউ ছেড়ে দেয় কুচি লবণ। নিশি ক্ষোভিত মাথা তোলে। সশব্দে এগিয়ে আসে ছেলেবেলা।

বুড়ি আমার ঘামচি কুচে দে, প্রতি ঘামচির জন্য চারআনা।

বুড়ি তোর ইস্কুলে গিয়েছিলাম, দেখলাম, তুই কান ধরে দাঁড়িয়ে আছিস, এত লজ্জা হলো, বোন বলে পরিচয় দিতে পারলাম না।

বুড়ি তোর মাথায় কাকের গু।

এই ছিল বড় ভাইজান। নিশির শৈশব-কৈশোরের সাথে তার আনন্দময়তার এমনই যোগ ছিলো। মানুষ বড় হয়, প্রত্যেকের জীবন কিভাবে আলাদা হয়ে যায়। তারপর ওই ছেলেগুলো, ওকে চারপাশ থেকে যারা ঘিরে ধরেছিল, একজনের হাতে ছিল ছুরি, কি ভয়ানক আবদার, আমাদের প্রত্যেকের গালে একটা করে চুমু দিতে হবে। নিশির ভয় এত সর্বগ্রাসী হয়েছিল, সে সামনে কালোরাত্তির ছাড়া কিচ্ছু দেখে নি। তার কাঁপুনি অব্দি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যেই সে মুখ বাড়িয়ে দিয়েছিল একজনের গালের দিকে।

বড় ভাইজান নেকড়ের মতন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ওদের সাথে পেরে ওঠার প্রশ্নই আসে না, লোক জড়ো হয়ে গিয়েছিল। ওরা পালিয়ে গেলে ভাইজানের শরীরে সে কী রক্ত!

দীর্ঘদিন সে হাসপাতালে ছিল।

সে আমার জন্য মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছিল, নিশি আর্তনাদ করে ওঠে, তার সাথে কী গণ্ডগোল হলো, আমার স্বামী তার ছায়া পর্যন্ত মাড়ায় না, যা ইচ্ছে তা-ই বলে তার সম্পর্কে। আর আমি আপোসকামী ভীতু নারী, এর কোনো তীব্র প্রতিবাদ করি না। আমার সংসার, এর শান্তি, এর রক্ষণাবেক্ষণ— এ-ই হয়ে উঠেছে আমার প্রধান সত্য।

বুড়ি তোর যে বর হবে, আমি তার কাছ থেকে কটকটি কিনে খাব।

ওর মাথা বামুনের মতো ন্যাড়া করে দেব।

ওহ্ তোর তো আবার চানাচুরঅলা পছন্দ, আমাকে বিনে পয়সায় দিবি না?

নিশির মনে হয় জন্ম থেকে মৃত্যু অব্দি একজন মানুষ মূলত তার শৈশবের মধ্যে বাস করে। জীবন থেকে সব খসে পড়লেও, শৈশব তার হৃৎপিণ্ড খামচে পড়ে থাকে।

নিশি ডুবে যায় আশ্চর্য এক বিষাদের মধ্যে, অন্ধকার রাতকে শুনিয়ে সে উচ্চারণ করে, আমি একা, ঘৃণিত আপোসকামী, আমার কোনো মেরুদণ্ড নেই।

১

সকালে মালিবাগ যায়।

রিনি বলে, তুমি তাহলে এসেছ, কী যে মজা হয়েছে, কতসব অভিজ্ঞতা! বলার জন্য আমার জান ফেটে যাচ্ছিল। কালই যেতে চেয়েছিলাম তোমার ওখানে, মা কিছুতেই যেতে দিল না। তোমার ওপর ভীষণ রাগ তুমি একদম আস না বলে। কথাগুলো শুনে নিশি হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। বলা হয় না তুই গেলে আমার সর্বনাশ হয়ে যেত। সোজা ভেতরে গিয়ে মাকে পেছন থেকে জাপটে ধরে। মা বলেন, তুই যে আমার মেয়ে এ আমার মনেই হয় না।

তা হলে তো শান্তিতেই আছ, একটা মেয়ের ঝক্কি থেকে বাঁচলে।

এরপর নানা প্রসঙ্গ, নিশি অস্থির হাঁটে শুধু, কোনো প্রসঙ্গেরই ভেতরে ঢুকতে পারে না। রিনি বলে, তুমি অনেক বদলে গেছ।

আমি ঠিকই আছি, নিশি দৃঢ়কণ্ঠে বলে, শুধু একটা ফ্যাসাদের মধ্যে পড়েছি, যা হোক মা, তুমি নিশ্চয়ই আমার ভালোটাই চাইবে ?

কী বলছিস তুই, মাথামুণ্ডু বুঝছি না।

একটা ঝামেলা হয়ে গেছে, স্বাতীকে তো তোমরা চেন, ওই যে রেজা ভাইয়ের বউ। বেশ কিছুদিন হয় ওরা আলাদা থাকছে, রেজা ভাই আফজালকে বলেছে, স্বাতী অনেক কুকাণ্ড করেছে, সে অনেক কথা। আসল বিষয় হচ্ছে, নিশি নিজের কণ্ঠকে একটুও কাঁপতে দেয় না, আফজাল আমাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে আমি যাতে স্বাতীর সাথে কোনো সম্পর্ক না রাখি। কয়েকদিন আগে তোমাদের এখানে এলাম না, তার আগে একটা ঘটনা ঘটেছে, ফোনে খবর পেলাম স্বাতী হাসপাতালে, বিষ খেয়েছে।

বলিস কী ? মা পুরো ঘটনার সঙ্গে মুহূর্তে একাত্ম হয়ে পড়েন।

আহ্ শোনোই না, মূল কথা সেটা না, আমি পাগলের মতো হাসপাতালে গেলাম, এরপর তুমিই বলো তার জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত কীভাবে আসি ? সন্ধ্যা পেরিয়ে গেল। বাড়ির ফেরার পর আমার হুঁশ হলো। এসবই আমি আফজালের অমতে করেছি। সে এমন কঠিন জেরা শুরু করলো, আমি বললাম, রিনির জ্বর, ওকে দেখতে গেছি। বাসায় এসে ভাবলাম তোমাদেরকে বুঝিয়ে বলব, এসে শুনি রিনি ঢাকার বাইরে গেছে, বলতে বলতে নিশির কণ্ঠ নেতিয়ে আসে, মা আমি হতচকিত হয়ে তাকে এই মিথ্যে বলেছি, এছাড়া সেদিন কোনো পথ ছিল না। স্বাতীর প্রতি ওর এত ঘেন্না, ওর লাশ দেখতে গেলেও আফজাল আমাকে ক্ষমা করত না।

কী সর্বনেশে কথা ? মা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন, রিনির জ্বর শুনে জামাই আসতে চায় নি ?

বাসায় রিনি নেই দেখে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল। আমি তাকে বলেছি, খুলনা থেকে ভাইজান এসেছে। এরপর জানোই তো ভাইজানের কথা শুনে..., আমি সবকিছু হজ্‌বজ্‌ করে ফেলেছি।

রিনি নিঃশব্দে ঘর থেকে উঠে যায়।

মা স্থির হয়ে বসে থাকেন, এই সময়টুকু দারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটে নিশির। সে বলে, এতগুলো মিথ্যা বলেছি, আমাকে খুব ঘৃণা হচ্ছে না ? মা আমি এসবই করেছি জঘন্য একটা পরিস্থিতি থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য।

এক মিথ্যার পথ ধরে হাজারটা মিথ্যে আসে। মা ক্রমশ সহজ হয়ে আসতে থাকেন, সত্যি বললে তোকে মরতে হতো ? তুই তো কোনো অন্যায় করিস নি।

নিশি মার হাত চেপে ধরে, ওর যা রাগ, একটা কেলেঙ্কারী হতো, আমি ওর রাগকে ভয় পাই, একা বাসায় থাকি। কখন কী হয় ?

এসব কী বলছিস তুই ? মা আকাশ থেকে পড়েন, আফজাল কিছুটা রগচটা বটে কিন্তু সে এমনকিছু করতে পারে জেনেও তোরা একত্রে বাস করছিস ? এ কোনো কথা হলো ? তুই অহেতুক অসুস্থতায় ভুগিস, ও ঠিক সেরকম ছেলে নয়।

নিশি টের পায়, সে ধরা পড়ে যাচ্ছে। ভেতরের তীব্র স্রোত তাকে ঠেলে খাড়া করায়, সে আমি মানিয়ে নিয়েছি বলে। সংসার ছেড়ে আসলে তোমাদের খুব সুখ হতো ? যতটুকুই জানুক সে আমার আগের দুর্বল বিষয়গুলো জেনেই আমাকে বিয়ে করেছে। ওসব নিয়ে সে যাতে আমাকে একবিন্দু কিছু বলতে না পারে, সেজন্য ওর মন যুগিয়ে চলি। এরপর আমাকে সংসার ভাঙতে হলে আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াব ?

মার মুখে অন্ধকার নেমে আসে। নিশির ভেতর অস্বস্তি শুরু হয়। খামোখাই নিশিকে নিয়ে মার এতদিনকার স্বস্তিটা সে এই মুহূর্তে নষ্ট করে দিল; কিন্তু মার সাথে যেভাবে সে এগুচ্ছিল তাতে সবদিক বাঁচিয়ে এগুনোর কোনো পথ ছিল না। নিজেকে ঝেড়ে সে দাঁড়ায়, আমি তোমাদের মেয়ে, আমাকে নষ্ট বলো, মিথ্যেবাদী বলো, তোমরা আমাকে ফেলতে পারবে না। কিন্তু ওর সাথে আমাকে সারাজীবন চলতে হবে। ও যদি আসে তোমরা আমার মতো করেই বলো, রিনির জ্বর, বড় ভাইজান এসেছিল, আমার সম্মান বাঁচানোর জন্য এটুকু মিথ্যে বলতে পারবে না ? মা বিচলিত কণ্ঠে বলেন, তার মানে তোর বাবাকেও এভাবে বোঝাতে হবে ? নইলে সে কখন বেফাঁস... ।

তুমি এটুকু পারবে না ? নিশি ক্রমশ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, আমি কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ করে ফেলেছি, অসুবিধায় না পড়লে তোমাদের সাহায্য চাই ? মা শান্ত হয়ে আসেন, ঠিক আছে বুঝেছি, আগ বাড়িয়ে কিছু তো আর বলতে যাচ্ছি না, আফজাল যদি আসে, যদি জানতে চায়, তবেই না। তোর বাবার সাথে আমাকে কম মিথ্যে বলতে হয়েছে ?

কেন বলতে ? সামান্য বিষয়ে পর্যন্ত, বাবা কি তোমাকে মেরে ফেলত ?

রাত্রির ভেতর জবুথবু পথ তৈরি হয়।

নিশি এগোতে পারে না। ক্রমাগত হাতড়ায় অন্ধকার হে, গ্রাস কর আমার চক্ষু।

কিন্তু ফরফর করে চিন্তাগুলো উড়তে থাকে। নিশি চোখ বোজে, তার হাত-পা অসাড় হয়ে আসে, কিন্তু মগজের শিরাগুলো ঠিক ঠিক জেগে থাকে। সেই পথে কলেজে কবে কে কী বলেছিল, সাজিদুলের ক্ষ্যাপামো, রিনির জ্বর, বাবার বেলুন, মার আতঙ্কিত চোখ, শ্বশুরের অভিশাপ, পরিচারিকার আগমন,আফজালের হিসেবের খাতা হারিয়ে ফেলা— সব স-ব উল্টোপাল্টা নিশির মগজে হাঁটতে থাকে। নিশির ভেতর থেকে চিৎকার ওঠে, আমি আর কিছু ভাবতে চাই না। কোলাহলরত ভাবনার ভয়ে সে আধমরার মতন পড়ে থাকে। একটা মুহূর্ত কি আসবে না, যখন আমার মগজ থাকবে কাগজের মতো শাদা ? ভাবনা থেকে মুক্তির জন্য সে বোবা দৃশ্য খুঁজতে থাকে। একটি লোক কল্পনায় ফাঁসির আগ মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে, নিশি সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে অবচেতনে ভেবে ওঠে, ধরা যাক আমি ঝুলছি, সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে কী করবে আফজাল ? এই ভাবনা তাকে রোমাঞ্চিত করে তোলে। তার মরা কোষগুলো পুনর্বার কাজ করতে শুরু করে।

না, আমি ভাবব না, নিশি মাথার শিরাগুলো কষে বেঁধে দুই, চার, ছয় এভাবে গুনতে থাকে। কিছুক্ষণ পর অক্ষরগুলো যেন দেয়াল হয়ে ওঠে। তার ওপর দিয়ে নিশির অজান্তে লতার মতো পেঁচিয়ে ওঠে চিন্তাগুলো, নিদ্রাহীনতাকে মৃত্যুর মতো ভয় নিশির। নানিকে

দেখত সারারাত জেগে থাকে, এক সময় কেমন উন্মাদপ্রায় হয়ে উঠেছিল। সারারাত উঠোন ধরে হাঁটত আর বিড় বিড় করত। নিশি বলত, প্রভু, আমাকে অন্ধ, বোবা, ল্যাংড়া করে দিও, তবু আমার ঘুম কেড়ে নিও না। অথচ ইদানীং তাই হচ্ছে। রক্ত থেকে নীল আলো বিচ্ছুরিত হয়। বাসা থেকে বেরোনোর মুখে রিনি বলেছিল, শিক্ষা সফরে গিয়েছি, এতবড় একটা বিষয় চেপে যাব ? তুমি জানো, আমি কখনই মিথ্যে বলি না।

বড় সরল আছিস এখনো, ভাবতে ভাবতে নিশির শরীর জ্বালা করে। বাড়ির সবার বিরুদ্ধে তোর যাওয়া হবে না জানি, তবে তোর এই সত্য বোধ অদ্ভুত বিষের মতো লেগেছে আমার কাছে। এই যে বললি, মিথ্যে বলতে জানি না, তোর এই সততা বড় নির্মম। আমাকে সেই একটি উচ্চারণই তোর কাছ থেকে সহস্র মাইল দূরে সরিয়ে দিল। নিশি বিছানা খামচে ধরে, আমি এইসব বিষয় ভুলতে চাই, চিন্তা থেকে মুক্তি চাই। নিশি এরপর বিছানা থেকে নেমে মেঝেতে সটান দাঁড়ায়, দেহকে বিছানার সাথে চাপ দিয়ে শুইয়ে রেখে কি লাভ ? রাত দুটো বাজছে, অথচ ভোরে উঠেই আমাকে নাস্তা তৈরি করতে হবে, তখন অবশ ঘুমে নেতিয়ে আসতে থাকবে আমার শরীর, আমার মাথা টন টন করবে। রিনি তুই কিভাবে মানুষকে দুঃখ দিতে হয় না, এখনো শিখিস নি, আমার হাড়-রক্ত এক করে দিলি। ভাবনা তাড়াতে নিশি নিঃশব্দে বারান্দায় এসে নিজেকে শোনায়, তোর বাপ ঘুমুবে! অক্ষম ক্রোধে সে লাফাতে থাকে ততক্ষণ, যতক্ষণ দরদর ঘামে অস্তিত্ব ডুবিয়ে বারান্দায় তার দেহ এলিয়ে না পড়ে।

এরপর গা ধুয়ে বিছানায়।

তিনটে বাজে।

অঘোরে ঘুমোচ্ছে আফজাল। ব্যথায় ফেটে যাচ্ছে সব হাড়, রক্ত, মাংস, শিরা সব। নিশি বিছানায় অবশ পড়ে থাকে। কি জানি পড়েছিলাম কবিতাটা ? "স্নান সমাপন করিয়া যখন কূলে উঠে নারী সকলে, মহিষী কহিলা"— মার মধ্যে ভয় ঢুকিয়ে দিয়ে এলাম। যাহোক অন্তত আফজালের কাছে আমি বাঁচলাম। ক'দিনের অনন্ত দগ্ধতা থেকে মুক্তির একটা পথ তৈরি করে রেখে এলাম। যদিও এতে করে আমার নির্দোষ মিথ্যা চারপাশে সঞ্চারিত হয়ে গেল, এছাড়া কী করার ছিল আর ? কিন্তু ব্রহ্মতালু ফেটে অমন রক্ত গড়াচ্ছে কেন ? নিশি বিচলিত হয়ে রাত্রির দিকে তাকায়। যন্ত্রণার মূলস্থান খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কলেজের ছন্দা একশো টাকা লোন নিয়েছিল। ছ'মাস হয়ে গেছে ; আর দেখা নেই। অথচ তার টাকার কোনো অভাব নেই। যাদের প্রচুর অর্থ তাদের কাছে অর্থটাই একটা হেঁয়ালি, হেঁয়ালি করেই হয়তো ভুলে গেছে। অথচ আমার এত কষ্টের টাকা—ভাবতেই ছটফট করে নিশি। না, চিন্তা ঘোরাতে হবে, ওই দেখো শুভ্র বিছানা, ওর ওপর শুয়ে আছে একটা শিশু। নিশির অসংবৃত দেহ শিথিল হয়ে আসে, ও হাত নাড়ছে, পা নাড়ছে, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, ওই আসছে মৃত্যু-দানো, ভাগ্। ওই আসছে ঘুম পরীরা, ডানাহীন, বস্ত্রহীন, বিচ্ছিরি তাদের চামড়া, আর ঘুম পাড়াতে এসে ওই দ্যাখো না কেমন কটমট চোখে তাকিয়ে আছে! আজব পরী তো ? নিশি যেন স্বপ্নের ঘোরে হেসে ওঠে।

কলেজ খুলেছে।

ক্লাস শেষে নিশি মমতাদির বাসায় নামে।

বিছানায় বসে আছেন, সামনে ছড়িয়ে আছে যাবতীয় কাগজপত্তর। নিশিকে দেখে উচ্ছ্বসিত হন, কিছুক্ষণের জন্য এইসব থেকে রেহাই পেলাম।

সারাটা ক্লাসে মাথা ধরে ছিলো। ক্লাসে কারো সাথে কথা বলতে ইচ্ছে হয় নি। ম্যাডামের হাত সঞ্চালন দেখেছে শুধু, কিছু মাথায় ঢোকে নি। খিদেটা মরে গেলে নিজের অজান্তেই রিকশা ঘোরায়।

মমতাদি বলেন, ভালোই হলো, দুপুরে একসাথে খাওয়া যাবে।

তখনই নাড়িভুঁড়ি উল্টে আসে। সে ছুটে বাথরুমের দিকে যায়। নিজেকে উজাড় করে মুখে জলছিটে দিয়ে সুস্থির হয়ে ফ্যানের নিচে বসে। মমতাদি হাসেন, কী-হে নিশি, অন্যরকম লাগছে বিষয়টা ?

প্রশ্নই আসে না, নিশি বলে, দু'দিন আগে সবে শেষ হয়েছে। এখনো সেভ টাইম!

তোমাদের ব্যাপার কী বলো তো, ডাক্তার দেখাও নি ?

দেখিয়েছি, নিশি সুস্থির হয়ে বিছানায় পা ছড়িয়ে বসে, তবে কি আমার নিজেরই এখন ইচ্ছে হয় না একটা সন্তান কোলে আসুক, তাকে বড় করা, পুরো যুবতী সময়টাই এর পেছনে খরচ হয়ে যায়। এটা আমার এক ধরনের অনুভবের কথা বললাম, আমার বাস্তবতা এর বিপরীত, আমি টেরই পাই না আমি এখন মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় অতিক্রম করছি, আমার তারুণ্য আছে, এর আলাদা কোনো মর্যাদা আছে। এ ক্ষেত্রে আমার সন্তান হলে মন্দ হতো না, আমি নিজেকে ভুলে ভুলে বার্ধক্যে পৌছুতে পারতাম।

মমতাদি সরস কণ্ঠে বলেন, নতুন করে কারো প্রেমে পড়ে দেখো, নিজেকে প্রতি মুহূর্তে মাপা হয়ে যাবে।

এ আপনি বিশ্বাস থেকে বলেন নি, আমার জীবনে সত্যিই যদি সে রকম কিছু ঘটে, আপনিই সেটা সহজ চোখে দেখবেন না।

এখানে আমার বিশ্বাসের কথা হচ্ছে না, নিজেকে মাপা, আবিষ্কার করাই তো সব না, এ দিয়ে তোমার প্রতিদিনের স্বস্তি নষ্ট হয়ে যাবে। তোমার চোখ বড্ড লাল দেখাচ্ছে, কী হয়েছে তোমার ?

কাল রাতে ঘুমুই নি, মনে হচ্ছে জ্বর উঠবে।

চল আগে ভাত খেয়ে নিই, তারপর কথা বলা যাবে।

মমতাদি উঠে যান। নিশি বিছানায় পড়ে থাকে। সেই ফ্যান, সাজিদুল বলতো প্লাস্টিক সার্জারি করে এর মুখের দাগটা সারাতে হবে। মাঝখানের চাকতিটার দাগ আরো প্রসারিত হয়েছে। এরপর সে প্রতিদিনের স্বস্তি নিয়ে ভাবে, এসব ছাড়াও কি আমার জীবন স্বস্তিময় ?

ছোট্ট প্যাসেজটায় টেবিল বসানো। ওখানেই মুখোমুখি বসে। এত খিদে, হাত-পা খুলে পড়তে চাইছে।

ভাত খেয়ে শক্তি হয়। দেয়ালে হেলান দিয়ে পুনরায় বিছানায় বসে মমতাদি কাগজপত্তর গুছিয়ে আরাম করে বসেন।

আমাকে কেউ দেখবে, আবিষ্কার করবে, তার প্রতি মুহূর্তের দৃষ্টির মধ্যে আমি যদি বাঁচার প্রেরণা পাই, নষ্ট করে দিক তা আমার স্বস্তি, এতে দোষ কোথায় ?

মমতাদি বলেন, তাহলে সংসার থেকে বেরিয়ে আসো, এ তুমি কিভাবে করবে ? তুমি যার সাথে সংসার করছ সে-ই-বা এটা মেনে নেবে কেন ?

সংসার থেকে বেরোনো মানেই তো বিপর্যয়, এরপর যার সাথে সম্পর্ক হবে তার সাথেও তো জীবন একই রকমের পুরনো ছন্দহীন হয়ে উঠবে। নিশি বলে, যার সাথে সংসার করছি, আমার সবকিছু তার নখদর্পণে থাকতে হবে, আমার একান্ত নিজস্ব সত্তা যদি কিছুতে প্রাণ ফিরে পায়, তাকে তা জানাতেই হবে, এমন দিব্যি আমাকে কে দিয়েছে ?

মমতাদি চায়ের কেটলি বসিয়ে ক্রুশকাঠি নিয়ে আসেন, দক্ষ হাত সঞ্চালন তাঁর কথায় ব্যাঘাত ঘটায় না। তিনি বলেন, এ কোনো আসবাব কেনার কথা হচ্ছে না,অথবা লুকিয়ে সিনেমা দেখা, তুমি হঠাৎ করে ফেলেছ, এ বিষয়ে কেউ কিছু না জানলেই-বা কি। মানুষের দাম্পত্য জীবনের কিছু দায়বদ্ধতা থাকে, তুমি তাকে এড়িয়ে তোমার দাম্পত্য জীবনের পাশাপাশি গোপনে আরেকটি সম্পর্ক রাখার বিষয়টাকে সাপোর্ট করছ, তুমি দিনের পর দিন এমন একটি অসম্ভব বিষয় গোপন করে যাবে ? তোমার কথা বাদ দিলাম, যার সাথে তোমার সম্পর্ক হচ্ছে সে-কি কোনো জড়পদার্থ ? তার রক্ত-মাংস-অনুভূতি থাকবে না, সে চাইবে না এ সম্পর্ক একটা পরিণতির দিকে যাক ?

সে যদি বিবাহিত হয় ? নিশি কোলে বালিশ টেনে নেয়, তার বিশ্বাসও যদি আমার মতনই হয় ? সংসারের একঘেয়ে খাঁচা থেকে বেরিয়ে সে-ও যদি মাঝেমধ্যে নিঃশ্বাস টানতে চায় ? আমি মনে করি কাউকে আঘাত দেয়াই পাপ, কাউকে কিছু না জানিয়ে, কারো কোনো ক্ষতি না করে আমি যদি কোথাও থেকে প্রতিদিনের বাঁচার প্রেরণা গ্রহণ করি, এতে অন্যায় কী আছে ?

তোমার স্বামী যদি একই কাজ করে ?

করতেই পারে, নিশি নির্বিকার কণ্ঠে উত্তর দেয়, এত বছরে আমিও তার জন্য ক্লান্তিকর হয়ে গেছি। সে আমাকে বলে, মানুষকে প্রতিদিন নতুন করে নির্মাণ করতে হয়। এটা কথা হিসেবে খুব সুন্দর। এ নিজেদেরকে সান্ত্বনা দেয়ার অস্ত্র মাত্র। মানুষ পাশাপাশি বাস করে ডাল, নুন, অভ্যাসের সহবাস, ঘাম, ডিসেন্ট্রি এসবের মধ্যে যে সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো যে তন্ত্রীর শব্দগুলো হারিয়ে ফেলে, এর কোন নির্মাণ হয় না। সংসার টিকে থাকে দু'জনের মায়ার ওপর। পুরনোর প্রতি মানুষের এই বিষয়টাই প্রবল হয়ে থাকে। কিন্তু মানুষের বয়সের স্রোতকে কি এ দিয়ে বেঁধে রাখা যায় ? আমরা আমাদের সমাজ ব্যবস্থার কারণে তা-ই বেঁধে রাখছি। আমরা বিয়ে করে একজন আরেকজনকে কিনে ফেলি, ফলে অবদমনের ভারে দ্রুত বার্ধক্যের দিকে হেঁটে যাই। হ্যাঁ, আফজাল যদি অন্য কারুর মধ্যে নতুনভাবে বেঁচে ওঠে, আমার কষ্ট হবে, তার প্রধান দায়িত্ব হবে, বিষয়টাকে আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা, যে গোপনীয়তার মাধ্যমে সে আমাকে, সংসারকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে দিল না, তাকে আমি কি করে পাপ বলব ?

ক্রুশকাঠির কাজ থেমে যায়। কেটলির ধোঁয়া বাষ্পীভূত হয়ে ঘরে ঢুকছে। মমতাদি ছুটে যান। নিশি অনুভব করে, বাসায় ফিরতে হবে। কোনো মানে হয় না। এসব জটিল প্রসঙ্গের চক্রে ঢোকার! এ-ও কি আমার বিশ্বাস থেকে উচ্চারিত ? এতেই মানুষ সার্বিকভাবে তার কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের নাগাল পাবে ? বাইরের দেশে তো মানুষ এসব বিষয়ে অনেক স্বাধীন,

তারা লিভ টুগেদার করছে, সমাজের সম্মতিক্রমেই কিছুদিন পর পর বন্ধু পাল্টাচ্ছে। তারা খুব সহজেই পুরনোর বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে চায়, এরপরও কি একজন নিবেদিত বন্ধুর প্রত্যাশায় ওদের ভেতরে হাহাকার ওঠে না ? আসলে কিসে মানুষের মধ্যে মানুষ আজন্ম সুন্দর থাকবে, কিসে তার আজীবনের তৃপ্তি নিহিত, এর আবিষ্কার এখনো হয় নি। এ জন্যই মানুষ যে যেভাবে পারে খুঁজছে, বয়সের শেষ প্রান্তে গিয়ে কেউ হয়তো এমন বস্তু পেয়ে যায়, যা তার যৌবনের কাঙ্ক্ষা ছিল।

ধোঁয়া উড়তে থাকে। চায়ে চুমুক দিয়ে মমতাদি বলেন, এইরকম একটা অসহ্য বিষয় মানুষ কতদিন লুকিয়ে রাখবে ? ধর সংসারের বাইরে তোমার জীবনে এসব ঘটল, সেটা কি করে তুমি বছরের পর বছর লুকিয়ে রাখবে ? এ সম্পর্ক কি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে ? প্রবাহিত হতে থাকবে, সেই প্রবহমানতার ছাপ তোমার মুখ-চোখে ফুটে উঠবে না ? তোমার স্বামীর সাথে তোমার যে বিশ্বাসের বন্ধন, ওর মধ্যে একটা অস্বস্তি তৈরি হবে না ? ধর, তারপরও নিজেকে অনেক কৌশলে গোপন করে দু'জন বয়সের শেষ প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালে, তখন যদি ভেতর থেকে অনুতাপ উঠে আসে, একজন আরেকজনকে এই বিষয়টি বলে মুক্ত হতে চাও, তখন মনে হবে না, একটা আস্ত জীবন মিথ্যের মধ্যে কাটিয়ে এলাম ? নিজেদেরকে অসহ্য ফাঁকিবাজ মনে হবে না ?

না, হবে না। সে যদি গোপন রাখে, শেষ বয়সেও তাকে তা রাখতে হবে। সারাজীবন যার মধ্যে ছিল তার প্রতি তার শ্রদ্ধা থাকতে হবে। শেষ বয়সে সে যদি অনুতপ্ত হয়,তবে এ তার দুর্ভাগ্য। বলতে হবে সে নিজের জীবনকেই ফাঁকি দিয়েছে। সারাটি জীবন আমার জীবনকে আঘাত না করার জন্য আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞই থাকব। আমি আগেই বলেছি, গোপনীয়তায় কোনো পাপ নেই। আমরা যদি আমাদের পোশাকগুলো খুলে হাঁটি, কেমন দেখাবে ? সাজিদুলের বিষয়টাই ধরা যাক, আমি যৎসামান্য যতটুকুই বলেছি, এই প্রসঙ্গটার সামনে কখনই আফজালের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারি নি। ওর প্রসঙ্গ আসলেই আফজালের সামনে সঙ্কুচিত হয়ে যাই। আমি যদি গোপন না করে পুরো বিষয়টা বলতাম, ওর সারা জীবনের শান্তি নষ্ট হয়ে যেত। আপনি হয়তো বলবেন, সত্য সত্যই, তা যত নিষ্ঠুরই হোক। এ তত্ত্বকথার মধ্যে বাস করা যায় না। এইসব নিষ্ঠুর সত্য আমার ছোট্ট জীবনটার সব শান্তি কেড়ে নেবে। এই সত্য আমাকে ক্রমশ ভীতু বিপন্ন করে তুলবে। সব সত্য নিয়ে সাহস করে দাঁড়ানো যায় না। তার চেয়ে এই ভালো, আমার সত্য আমার, আমার বিড়ম্বনা, জীবনে উড়ে যাওয়া কোনো স্ফুলিঙ্গ এ আমারই ? গোপনতার পোশাক দিয়ে আমি অনন্ত জীবন এইসব লুকিয়ে রাখলাম। নিশি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে, কেউ কিছু জানল না, কেউ আঘাতও পেল না, কোনো বিপর্যয় হলো না। আসলে মমতাদি কেন আমি এসব বলছি ? এ শুধু যুক্তির বুদ্বুদ, এসবের কোনো ছকেই জীবন চলে না। জীবনের হিসেব আলাদা, এই যে আমি দিন পেরোচ্ছি কোনো উদ্দীপনা নেই, স্বপ্ন নেই, এর মানে এই নয়, আমি এ জীবনের পাশাপাশি কিছু খুঁজছি! হ্যাঁ, একটা স্বপ্ন আছে, আমি নিজে যদি স্বাবলম্বী হতে পারতাম! যৎসামান্য যা-ই হোক, যদি রোজগার করতাম, বিশ্বাস করুন, নিজেকে অসম্ভব সুখী মনে হতো। আর সেই কাজের মধ্যে যদি উৎসাহ জোগাতো আমার স্বামী, বিশ্বাস করুন, অশান্তি করে কিছু অর্জন করতে ইচ্ছে হয় না। হ্যাঁ, সে আমাকে পড়াশোনা করতে সাহায্য করছে, কিন্তু এ যেন ঘরে একজন এমএ পাশ স্ত্রী থাকল, এই স্বপ্ন থেকে। আমার বাইরের কাজকে কখনই

সহজভাবে নেবে না সে। আহ্ মমতাদি, আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে অথচ বাসায় ফিরতে হবে এই চিন্তা আমার মাথা ব্যথা বাড়িয়ে দিচ্ছে। মমতাদি আমি জানি, আমার এসব কোনো বিষয়েই আপনি একমত হন নি। আপনার আরো কিছু বলার ছিল, আজ থাক। আরেকদিন এসে নতুন করে শুরু করা যাবে।

মমতাদি অস্ফুটে উচ্চারণ করেন, তুমি চিরকালই এই ছিলে, নিজের সত্য জানো না। যুক্তির প্যাঁচে পড়ে যেখানটায় এসে দাঁড়ানোর প্রশ্ন, সেখানেই সারেন্ডার করো, নিশি তুমি প্রচণ্ড ভীতু আর আপোসকামী। দুঃখ নিও না, তোমার যা স্বপ্ন, তা যদি শুদ্ধ সুন্দর হয়, তা অশান্তি করে হলেও তোমাকে অর্জন করতে হবে। যদি কেউ অনায়াসে সেই স্বপ্ন তোমার হাতে তুলে দিতো, তুমি আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে। একজন মেয়ের স্বাবলম্বী হওয়া, এ কোনো স্বপ্ন নয় নিশি, এ অপরিহার্য। আজ সংসারের চক্রে পড়ে তোমার কাছে তা-ই হয়ে উঠেছে স্বপ্ন। এ যদি তুমি আগে বুঝতে, নিজে অন্তত এম.এ-টা না করে কখনই বিয়ে করতে না। নিশি আজ তোমার শরীর খারাপ, অন্যদিন এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাবে, তুমি হাত-মুখ ধুয়ে নাও, তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আমি একটু হাসপাতালে যাব।

নিশির মাথার মধ্যে কাঁপা স্রোতের মতন মমতাদির কথাগুলো পাক খায়। সেই ঢেউ ফুঁড়ে চোখ মেলে নিঃস্বরে সে প্রশ্ন করে, সাজিদুলের অবস্থা কেমন?

সেই রকমই— বলে মমতাদি দ্রুত ব্যাগ গোছাতে থাকেন।

নিশি বলে, ওর পরিবর্তনটা অসহ্য লাগে। এক সময় আমাকে বলত, যার জন্য আমার গোটা জীবনটা উৎসর্গ করেছি, সে যদি আমার কষ্ট না বোঝে। মানলাম, আমি ঠিক ছিলাম না কিন্তু ওর বিশ্বাস, ওর অনুভূতি তো আমার প্রতিদানের দিকে তাকিয়ে তৈরি হয় নি। মানুষের এরকম সহজ বদল আমার পৃথিবীকে জানার বোধই বদলে দেয়।

মমতাদি মাথা আঁচড়ে বড় ধীর কণ্ঠে বলেন, তুমি তার বাস্তবতার বদলটা দেখবে না? ধর তুমি ওর জীবনের সমান, কিন্তু ও-তো তার জীবনের প্রতিই সমস্ত মায়া হারিয়ে ফেলেছে।

যদি একটা কেঁচোকে প্রশ্ন করা হয়, জীবন কী? সে বলবে, আমার দেহের মতনই বিরাট, ছায়াঘন, যার কোনো শেষ নেই।

বৃদ্ধার মসলা বাটা থেমে যায়।

নতুন চেয়ার-টেবিল কিনেছে জাহিদ। অপরপ্রান্তে বিস্ফারিত চোখ মেলে রেখেছে হীরা। জাহিদ বলে তুমি দিনেরপর দিন যদি এই বাড়ির অন্ধকারে বসে জীবনকে দেখ, একদিনের জন্য বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেই মাথাটা কেমন ঘুরে উঠবে। তোমার মধ্যে শুরু হবে চূড়ান্ত অস্বস্তি, মনে হবে ওখানে সব এলোমেলো, কোনো স্বস্তি নেই, আকাশটাকে মনে হবে ইয়া বড়, এই বুঝি সেই অসীমতা তোমাকে টেনে নিয়ে গেল, তোমার ভয় করতে থাকবে। মনে হবে তার চেয়ে এই ঘর বড় শান্ত, নিরুপদ্রব। হীরা, তোমাকে বেরোতে হবে, ওই যে তোমার মা, বড় ক্ষণস্থায়ী করে ফেলেছেন নিজের যৌবনকে। যুবতী বয়সের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন বৃদ্ধার খোলস। জীবনের বেশির ভাগ সময়ই তাকে বাঁচতে হবে বৃদ্ধ হয়ে, দেখছো

না, তার আচরণও কেমন থুত্থুড়েদের মতো ? অথচ আমি তাঁর বয়স হিসেব করে দেখেছি, চল্লিশ পেরিয়েছে কী-না সন্দেহ। এই বয়সেই সে কেমন জবুথবু সত্তুরে বৃদ্ধার মতো! আমার কথা তুমি বুঝতে পারছ ?

হীরা কথা বলে না।

তোমাকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে, আমি শিশুদের পড়িয়ে অভ্যস্ত না, তাদের ভাষা জানা থাকলে তোমাকে সবকিছু বোঝানো অনেক সহজ হতো। আমি বলছি, তোমার অবস্থাও তোমার মার মতো হবে, এই বয়সেই যেভাবে চল, পাঁচ বছর পর এসে দেখব, কিশোরী থেকে বৃদ্ধায় পরিণত হয়েছ।

চারপাশে শীতের আমেজ। সারারাত সবপাতা ভিজে থাকে। ঘন গাছের জঙ্গলে ঘ্রাণ কেমন নেশালু করে তোলে। অদ্ভুত রঙ খেলতে থাকে দিনগুলোর গায়ে। কেউ যেন কাঁচা রঙধনু কচলে দিয়েছে বিস্তৃত ঘাসের ডগায়। বৃদ্ধার ফ্যাকাসে মুখের চামড়ায় কী এক বিষাদ জমে। জাহিদ দেখে না, সে সরু দরজা দিয়ে বাইরের এক ফালি রোদ্দুর বুভুক্ষুর মতো গিলতে থাকে।

হেমন্ত এসেছে।

হলুদ শস্যের পাশবিক ঘ্রাণ ঘুম এনে দেয় চোখে। কর্মক্লান্ত মানুষের গতি দেখে মনে হয়, কিছুদিনের জন্য তারা সব ভুলে গেছে, সব ছায়া সব ভয় অন্তর্হিত। নতুন জীবন এসেছে।

হীরার চির নীল মুখাবয়বে লালাভা। চিল ওড়ে চক্রাকারে। তার শব্দে কেঁপে ওঠে হীরার চোখ। সে অস্ফুটে প্রশ্ন করে, আমাকে কী করতে হবে ? জাহিদ পরাক্রান্ত দিনের দিক থেকে চোখ ঘুরিয়ে স্পষ্ট চোখ মেলে ধরে হীরার দিকে, তোমাকে আবার ইস্কুলে ভর্তি হতে হবে।

কিন্তু ওর ভ্রূ যুগল কাঁপতে থাকে, আমাকে সবাই ভয় পায়, ক্লাসের শিক্ষক পর্যন্ত। আমি স্কুলে গেলে সব বন্ধ হয়ে যায়।

তোমাকে এইসব কিছুর সাথে যুদ্ধ করে এগুতে হবে, জাহিদ বলে, আমি তোমাদের স্কুলে যাব, সবাইকে বুঝিয়ে বলব, তোমার সবকিছু যাতে সহজ হয়, তার সব ব্যবস্থা করব। বৃদ্ধার বাঁকানো কোমর কেমন টানটান হয়ে ওঠে, জাহিদের কথার ধারে তার ন্যাতানো ফণা হঠাৎ উত্তোলিত হয়, পরক্ষণেই তা নিভে যায়। সে অকারণেই কাঁদতে থাকে, কেন আমার জীবন এইরকম হলো, কী পাপ করেছিলাম আমি ? একসময় তার ক্রন্দন নেতিয়ে আসে। দূরের জ্বলজ্বল করতে-থাকা সোনাচূড়া মেঘের দিকে সে একঠায় চেয়ে থাকে।

এমনই কোমল ঠাণ্ডা রোদ্দুর-ছাওয়া দিনের মাঝখান ধরে একদিন জাহিদ হাঁটতে থাকে। পায়ের মধ্যে ঘষা লাগে ধারালো ধান শিষের। সে মুঠো করে সেই গুচ্ছ সোনা হাতে নেয়, এরপর আঁকাবাঁকা আলগুলো পেরোতে থাকে সন্তর্পণে। যে হাটুরেদের ক'দিন আগে মনে হতো শববাহক, আজ খেতের কাজে তারা গভীর নিমগ্ন। পৃথিবীর দিকে তাকানোর সময় পাচ্ছে না। যুবতী লতাগুল্মে আজ বাহারী হাওয়া লেগেছে। চক্করত মেঘেরা জোট বেঁধে

এদিকেই আসছে। তুলোর মতো শাদা তাদের রঙ। বড় মন্থর গতি। চতুর্দিকে এক অসহ্য শিল্পের মেলা। ঘাসে, সূর্যে, মেঘে, দ্রাক্ষায়। জাহিদের মনে হয়, সে শত খণ্ডে ছড়িয়ে পড়ছে। এইসব কিছুর মাঝখানে সে সহসা আর নিজেকে খুঁজে পাচ্ছে না। উড়নচণ্ডী বাতাস তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেই আকাশের দিকে, যে আকাশের গল্প সে হীরার সাথে করেছিল। উদ্ভিদের বিচিত্র স্তূপে পড়ে থাকে তার খণ্ডাংশ।

এক সময় জ্ঞান হয়।

নিজেকে কষে বেঁধে সন্দীপনের দরজার সামনে দাঁড়ায়, চল, একটু চেয়ারম্যানের গ্রামে যাব। সন্দীপন চোখ বড় করে বলে, হেই গেরামে ক্যান যাইবেন?

কাজ আছে, তুমি শুধু আমার সাথে যাবে, কিছু প্রশ্ন করবে না।

না দাদা, চেয়ারম্যানের গেরামে যামু না। আমার ডর লাগে।

চেয়ারম্যান কি গ্রামে ঢোকার রাস্তায় চব্বিশ ঘণ্টা হাঁ করে থাকে। তুমি ঢোকামাত্র গিলে খাবে? আমাদের সুবিধা-অসুবিধা দেখার জন্যই সে চেয়ারম্যান হয়েছে।

হেইডা তো ভোটের আগের কতা, সন্দীপন বলে, হেইসময় এত শাদাসিধা মাটির মানুষ থাকে হেরা। নির্বাচন শেষ হইলে পরে রাক্ষসের রূপ ধারণ করে। হুনেন দাদা, তার গেরামে গিয়া কাম নাই, হের শাসন এই গেরামে চলে না, এই কারণে হেয় এই গেরামের উপরে বহুত চেতা।

তুমি কাপড় পাল্টে নাও সন্দীপন, জাহিদ বলে, সারাজীবন তো সবকিছু একভাবে চলে না। গিয়েই দেখি না কি হয়, তবে একটা কথা, তোমাকে সারাক্ষণ মুখ বন্ধ রাখতে হবে।

সেই গ্রামে পা রাখার পরই জাহিদ অদ্ভুত এক গন্ধ পায়। সন্দীপন বলে, এই গন্ধ শালুকের। ধান গাছের বিস্তৃত জমিনের মাঝে মাঝে শিরা-উপশিরার মতো আল। এবার ধান কেমন? প্রশ্ন করলে যে কোনো মানুষের অকৃত্রিম জবাবের সাথে মিশে যাওয়া যায়। কিন্তু সবার ওপরে শালুক সত্য, ধানের গন্ধ অব্দি ম্লান করে দিয়েছে। এখানে-ওখানে পুকুর, গাঙ, যেখানে জল সেখানেই মরণ কামড় দিয়ে পড়ে আছে শালুক। সন্দীপন উবু হয়ে কিছু শালুক তুলে জাহিদকে দেয়। আঙুল দিয়ে ভেঙ্গে কুচি গুঁড়োর আঁশটে স্বাদ মুখে নিয়ে জাহিদ চেয়ারম্যানের বিশাল ফটিক ঘরে পা রাখে।

চেয়ারম্যান আরো তিনজন বয়স্ক লোকের সঙ্গে বসে ফ্লাস খেলছিলেন। ওদের পোশাকআশাক দেখে বোঝা যায়, এরাও গ্রামের গণ্যমান্য লোক। সাধারণত চেয়ারম্যানের সাথে যারা দেখা করতে আসে, তারা কাচারির উঠানে বসে হয় ভেতরে খবর পাঠায়, নয়তো হাঁক দিয়ে নিজের উপস্থিতির জানান দেয়। সন্দীপনকে নিয়ে জাহিদ সরাসরি সেই ঘরে ঢুকে পড়ায় তিনি মাঝখানে কালির দোয়াত দিয়ে চেপে রাখা টাকার সামনে মহাবিব্রত বোধ করেন।

জাহিদ বলে, আমি কি ভেতরে এসে একটু বসব? না-না আপনাদেরকে খেলা বন্ধ করতে হবে না। আমি কলেজ-ভার্সিটি পড়া ছেলে। এই খেলার সাথে আমার পরিচয় আছে।

চেয়ারম্যানের ভুরু কোঁচকানো মেলায় না, তার মানে আপনি শহর থেকে এসেছেন?

হ্যাঁ।

কোথায় উঠেছেন ?

শুনলে তো ঢুকতে দেবেন না, সে জন্যই তো এত কাঁচুমাচু করছি।

কাঁচুমাচু আর করলেন কোথায়, বুক ফুলিয়ে একেবারে আড্ডার মাঝখানে এসে লাফ দিয়ে পড়েছেন।

জাহিদ ভণিতা রেখে এবার সরাসরি বলে, আমার বাবার নাম আশেক আলী মীর, আপনি সম্ভবত তাঁকে চেনেন। চেয়ারম্যানের ভুরুর ভাঁজ ছত্রখান হয়ে যায়, বিশাল দেহটা চক্রাকারে ঘুরিয়ে তিনি মুহূর্তে সীমাহীন আন্তরিকতা প্রকাশ করেন, তুমি আশেক আলীর ছেলে ? তাকে আমি চিনি মানে, আমরা এক আত্মা দুই প্রাণ ছিলাম। এসো এসো, ভেতরে এসে বসো। কলেজে দুই বছর ওই হারামজাদার সাথে এক ক্লাসে পড়েছি কিন্তু ওর মধ্যেই অনন্ত যুগের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। হারামজাদা বললাম কিছু মনে করো না, ওর সাথে আমার এমনই সম্পর্ক ছিল।

ঘরে সবার মধ্যে অস্বস্তি শুরু হয়, খেলার পরিস্থিতি খুব তুঙ্গে ছিল বোঝা যাচ্ছে। এর মধ্যে সন্দীপনের মুখ দেখার মতো, ঘটনার আকস্মিকতায় সে ভড়কে গেছে। তার কল্পিত রূপকথার রাক্ষস বুকে জড়িয়ে ধরেছে জাহিদকে ? সে থতমত খেয়ে ফ্যালফ্যাল চেয়ে থাকে।

চেয়ারম্যান বলেন, শুয়োরের বাচ্চা মানুষ ছিল না, জীবনে একবারই এসেছিল আমার বাড়ি। সারাদিন কত গল্প, বড়শি বাওয়া হলো, ধুমসে রান্নাবান্না হলো, এরপর শুনছেন মিনহাজ সাহেব, রাতে ওকে ফন্টিকে বসিয়ে ভেতরে গেছি, হারামজাদা হাওয়া। আকাশের অবস্থা খারাপ, এর মধ্যে সে বাস কোথায় পাবে, আমার তো মাথা খারাপ হওয়ার অবস্থা। সঙ্গে সঙ্গে বাসস্ট্যান্ডে লোক পাঠালাম। সারা গ্রাম তন্নতন্ন করে খুঁজলাম, শালারে যেন জিনে তুলে নিয়েছে। এর কিছুক্ষণ পরই শুরু হলো ঝড়। এত ঝড় আমি বাপের জন্মে দেখি নি। ওর চিন্তায় রাতভর আমার চোখের পাতা এক হয় নি। কিছুদিন পরে খবর নিয়ে শুনি খাটাসের বাচ্চা বহাল তবিয়তে অফিস করছে— কথার গমগমে দমকে চেয়ারম্যান হাঁপাতে থাকে। জাহিদকে বলেন, তুমি এখনো দাঁড়িয়ে আছ ? বসো বসো, তা আমার সেই জিনের মতন দোস্তটি এখন কেমন আছে ?

খাটের পাশে চেয়ার টেনে জাহিদ বসে। সন্দীপন ইতস্তত ভঙ্গিতে তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। চেয়ারম্যান সহযোগীদের দিকে তাকিয়ে বলে, আমার কার্ডটা ব্লাইন্ড ধরে তোমরা খেলতে থাক, কয় হাত আছে ?

এক হাত দেইখ্যা ফালায়া দিছে, তিন হাত আছে।

ঠিক আছে, ওই মতনই খেলো। দুই হাত আসলে আমাকে বইলো।

আপনি খেলেন, জাহিদ বলে, খেলতে খেলতেও কথা বলা যাবে।

তুমি আমার ছেলের মতো, চেয়ারম্যানের মুখে ঈষৎ রক্তাভা খেলে যায়, তোমার সামনে খেলতে একটু কেমন লাগে না ?

দেখেই যখন ফেলেছি তখন আর অস্বস্তি করে কী লাভ ? জাহিদ হেসে ফেলে। তাছাড়া আমি তো আর বাচ্চা ছেলে না, পরিণত যুবক, আমার কাছে এসব কোনো বিষয় না।

তোমরা শহরের ছেলে, চেয়ারম্যান হাসে, শুনেছি ওখানে বাপ-ব্যাটাও এক সাথে খেলে। তো তোমার বাবার কথা বললে না?

জাহিদ বলে, এক্সিডেন্ট করে তাঁর হাত-পা কেটে গিয়েছিল, এর মধ্যেই যার নাম মিনহাজ, সে বলে, তোমার দান এসে গেছে দোস্ত, কার্ড শো করে দেব?

তারপর? চেয়ারম্যান জাহিদের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

কয়েকমাস ঘরে পড়ে থেকে মাস কয়েক আগে তিনি মারা গেছেন।

ঘরের মধ্যে মুহূর্তে ছায়াস্তব্ধতা নেমে আসে।

চেয়ারম্যানের বিমর্ষ মুখের ছায়ায় বাকি সবাই আক্রান্ত হয়। জাহিদ অনুভব করে, কারো দুঃসংবাদ বা সুসংবাদ প্রথম দেয়ার মধ্যে অন্য এক রোমাঞ্চ আছে। এ জন্যই, শুনেছ অমুক মারা গেছে, অমুক না লটারিতে টাকা পেয়েছে, মানুষ উত্তেজিত হয়ে এসব খবর পরিবেশন করে। খবর পরিবেশনকারী যখন জানে, যাকে সে খবরটি বলছে, ঘটনা আগেই শোনা হয়ে গেছে তার, ভেতরে ভেতরে দমে যায়।

আমার প্রায়ই মনে হতো, চেয়ারম্যান নিজের মধ্যে কেমন সেঁধিয়ে যেতে থাকেন, যে রকম পাগল জীবন যাপন করত ও। সব সময় মনে হতো বড় কোনো বিপদে পড়ে যাবে ও। তবে কখনই এতটা মনে হয় নি। আহা! মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। ও মানুষ ছিল না, ফেরেশতা ছিল।

ফেরেশতা!

বাবার মার্বেলের মতো দেহটা জাহিদের চোখের সামনে আজব এক চক্কর মারে, এক সময় প্রবল বেগে তা ঘুরতে থাকে। এমনই তীব্র ঘূর্ণন জাহিদ সামনে তার ছায়া পর্যন্ত দেখে না। কেবল বাতাসের ঝাপটা। সম্মুখে বেড়ে ওঠে প্রাচীন জীবাশ্ম। বাতাস সরে যায়। সে খামচে ধরে, উঠে আসে সবুজ। সেই সবুজ সর্বগ্রাসী রক্ত হয়ে জাহিদকে ভাসিয়ে নেয়। সে দেখে, কুমিরের হাঁ, চারপাশে মুখরা জীবদের মচ্ছব। না ঠিক মাছ নয়। শত শত ক্ষুদ্র হাঁ, জলের নিচে এ-কোনো আজব জন্তু? ভাবতে ভাবতেই ঝড় ওঠে।

বাবা সেই তোড়ে পড়ে দিশেহারা। যেন বায়ু চালিত তার পা। অবিনাশী গগনবিদারী বজ্রপাতের মধ্যে ছুটতে ছুটতে পেরিয়ে যায় মাঠ-ঘাট-প্রান্তর। এরপর ধাক্কা দিয়েছিলেন এক দরজায়। জাহিদ লক্ষ করে অবাক হয়েছে, সেই একই গ্রামে, বাবার মতনই ঝড়ে পড়ে তাকেও অজানা এক বাড়িতে আশ্রয় নিতে হয়েছে। সে বাড়ি থেকে বের হয়েছিল চেয়ারম্যানের এখানে এসে ওঠার জন্য। ঝড় চেয়ারম্যানের এখানে এসে ওঠার উদ্দেশ্য পর্যন্ত বদলে দিয়েছে। যমজ ছায়াদের প্রসঙ্গ না থাকলে সে এখানে একবারের জন্যও আসতো কী-না সন্দেহ।

বাবার এক্সিডেন্টের খবর শুনে ক'দিন পর বাড়ি যেতেই জাহিদের ওপর কি জানি কী ভর করলো, মা-ভাইবোনদের সব উদ্বেগ ঠেলে সরিয়ে সে বাবাকে নবজাতক শিশুর মতো কোলে তুলে নিল। যেন এতকাল সে যে নক্ষত্রকে ঘাড় কাত করে দেখেছে, তার পতন ঘটেছে, এইমাত্র, জাহিদের হাতের মুঠোয়। সে জন্যই সেই সুদূরের অজানা জিনিসটিকে ঘুরিয়ে উল্টেপাল্টে একদম ভেতর থেকে দেখার সুযোগ ঘটবে। সে বাবাকে স্নান করানো

থেকে শুরু করে তাকে আদ্যোপান্ত পরিচ্ছন্ন রাখা, মুখে তুলে খাওয়ানো, চুল আঁচড়ে দেয়া, তাকে পোশাক পরানো সব দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল।

বাবাও ক্রমশ এসব কিছুতে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছিলেন, জাহিদ সামনে থেকে সরে গেলে শিশুর মতো চিৎকার করতেন। তেমন পরিস্থিতিতে তিনি ক্রমশ স্ত্রী এবং অন্য সন্তানদের চেহারা পর্যন্ত ভুলে যেতে বসেছিলেন। তাঁর সব অত্যাচার সহ্য করত অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে। তার মুখ থেকে হাসি, আলো কিংবা কোনোরকম ছায়া সব অন্তর্হিত হয়েছিল। তাকে যেটা বিরক্ত করত, আত্মীয়দের বিস্ময়। তারা চোখ বড় করে বলত, জাহিদুর যে বাপের এমন সুপুত্তুর হবে তা কে জানত? কে জানত সৃষ্টিকর্তা তার মনের এমন আশ্চর্য বদল ঘটাবে?

মা পর্যন্ত বলতেন, জাহিদ তোকে আমি আর তোকে চিনতে পারছি না। তবে তার অসুস্থ স্বামী তাঁর চেহারা পর্যন্ত ভুলে গেছেন। তিনি সামনে গেলে বিরক্তির সাথে চোখ বুজে থাকতেন। এই বিষয়টা মাকে প্রবলভাবে পীড়িত করত।

বাবা, পরকালের কথা ভাবলে ভয় করে?

পরকাল যেন সম্মুখে এসে দাঁড়ানো কোনো মুখোশে ঢাকা মুখ, কিম্ভুত দাঁত কেলিয়ে আছে, বাবা তিন বছরের শিশুর মতন আ... আ... শব্দে গোঙাতে থাকতেন। সেই খেলা থেকে বেরিয়ে জাহিদ যেত অন্য এক খেলায়, বাবা আপনার গল্প শুনতে ইচ্ছে করে? একটা গল্প বলি?

বাবা বড় বড় চোখে তাকাতেন।

জাহিদ গল্প শুরু করত, একজন বিকলাঙ্গ লোককে সৃষ্টিকর্তা প্রশ্ন করলেন, তুমি পরকালে স্বর্গ চাও, না এই জীবনে সুন্দরভাবে দু'টি সুস্থ পা নিয়ে ভোগ বিলাসের মধ্যে বাঁচতে চাও?

বিকলাঙ্গের অনেক যন্ত্রণা, কবে পরকাল হবে, সেই সুদূরের জীবনে হেঁটে যেতে হলেও তো দুটো পায়ের দরকার হবে। সে তার অশান্তি আর এক মুহূর্ত সহ্য করতে পারছিল না। তাই বলল, এই জীবনে আমি সুস্থ সুন্দর দুটো পা নিয়ে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে বাস করতে চাই।

সৃষ্টিকর্তা তাকে সুস্থ করে দিয়ে তার সামনে থেকে তুলে নিলেন স্বর্গে যাওয়ার পথ।

বাবা কাঁদতে থাকেন।

জাহিদ গভীর মমতায় তার চোখ মুছিয়ে দেয়। তারপর বাবার ক্ষীণকায় হয়ে উঠতে থাকা দেহে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে, বাবা, আপনি কি কল্পনাও করতে পেরেছিলেন জীবনের রূপ এমন হতে পারে?

বাবা বলেন, তোকে একটা বুদ্ধি দেই। আমি যখন ঘুমায়া থাকব তখন ঘুমের মধ্যেই আমারে মেরে ফেলবি। তারপর যেন কাউকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছেন, এমনভাবে চারপাশে সতর্কতার সাথে তাকাতেন, আমি যতটুকু পুণ্য করছি তা দিয়া তোরে পরকালে বাঁচাব।

তাহলে তো আপনি দোজখবাসী হবেন।

আমি তো দোজখেই আছি, তোর সাথে হিসাব হবে হাশরের মাঠে। এর মধ্যে কয়েকটা দিন শান্তিতে ঘুমাইতে চাই। এরপরই ঔষধের প্রতিক্রিয়া কমে আসায় তাঁর ব্যথা শুরু হতো। তার দেহটা স্বয়ংক্রিয় বলের মতো বিছানা থেকে কেঁপে কেঁপে ওপর দিকে উঠত। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতেন তিনি, আমারে বাঁচাও, বিষ আইনা দাও আমারে। তোমরা যে যা চাইবা দিব, আমি দিব, শুধু এক ফোঁটা বিষ।

মা অন্য ঘরে বসে অঝোরে কাঁদতেন, তিনি সামনে এলেই বাবা জাহিদের আঙুল চেপে ধরতেন, ও আমারে মারবে!

আপনি তো মরতেই চান।

প্রাণে মারবে না, ও আমার শত্রু, আমাকে বাঁচায়া রাইখা মারবে।

আপনি কি দোষ করেছেন, আপনাকে মারবে কেন?

আমি পাপ করছি, বাবার মুখ যেন জ্যৈষ্ঠের চৌচির মাঠ, একসময় অজানা অন্ধকারে ডুবে যেতে থাকত। ততক্ষণে তাঁর বাঁ হাত কষে ধরে ইনজেকশন পুশ করে দিয়েছে জাহিদ।

বাবা বিড়বিড় করতেন, ঐ যে দুর্ভিক্ষের ছবিগুলা, জয়নুল আঁকছিল, আমি বলেছিলাম, এতো স্পষ্ট কেন সব? আরো বিমূর্ত আঁকতে পার না?

সে বলেছিল, জীবন কি বিমূর্ত? হ্যাঁ, জয়নুল বলেছিল, ওহ আমি এইসব কি বলতেছি? আমি তো পাপ প্রসঙ্গে কথা বলতেছিলাম।

বাবার আঠালো দেহ ক্রমশ নীলচে হয়ে উঠছিল। কোনোদিন সৃষ্টিকর্তা, পরকাল নিয়া ভাবি নাই। পৃথিবীরে ঈশ্বর মনে করতাম। এখন স্বপ্নে এমন ভূতের মতন মুখ ভাসে, ওরা ভেংচি কাটে। বলে, তুই পাপিষ্ঠ ভণ্ড, তুই যদি এই থাইকা মুক্ত হতে পারিস তবেই তোর পা হবে, ডানা হবে। জাহিদ আমার তো এই একটাই জীবন, কী দুঃসহ, কী সাংঘাতিক দুঃস্বপ্নের মতন।

ঘরের আলো ছিল কমানো। চারপাশে তুমুল বৃষ্টি। জাহিদ তাঁর উষ্কো মুখের দিকে ঝুঁকে পড়ে ফিসফিসিয়ে প্রশ্ন করেছিল, কারো পেটে লাথি দেন নি, পুকুরচুরি করেন নি, কারো মনে কষ্ট দেন নি, কী পাপ করেছেন বাবা, যা আপনাকে তাড়া করে ফিরছে?

এরপর যন্ত্রণাদগ্ধ বাবা কখনো অস্ফুটে কখনো, কখনো উত্তেজিত হয়ে জাহিদের সামনে মেলে ধরেন তার জীবনের গভীর গোপন এক অন্ধকার দিক।

তখন ম্যালা রাত। চেয়ারম্যানের বাড়ি থাইকা বাইর হওয়ার পর তুমুল ঝড়। আমি সেই ঝড়ে দিশেহারা হয়া পাশের গ্রামের এক বাড়ির দরজায় সজোরে ধাক্কা দিতে লাগলাম। দরজা খুইলা দিল এমন এক রমণী যার বর্ণনা দেওয়া যায় না। তার হাতে ছিল কুপি, সেই আলোতেই দেখি তার বিধ্বস্ত রূপ। চোক্ষের নিচে কালি, কানতে কানতে মুখ এমনভাবে ফুইলা উঠছে, আমার ভয় করতে লাগল। সেই রমণী বলল, এমন ঝড়ের রাইতে পাগল না হইলে কেউ বাইরে যায়? এরপর সেই মেয়ে শাড়ির আঁচল টাইনা নেয় গায়ে। আঁচলের মাঝখানটা এমনভাবে ছিঁড়া কেউ যেন টাইনা ছিঁইড়া ফালাইছে। মোটকথা তার সারা শরীলের উপর একটা ঝড় বইয়া গেছে। তারে দেইখা আমার তাই মনে হইতেছিল। এক সময় আমারে কানতে কানতে সে বলে, আমি এখান থাইকা পালায়া যাব।

পাশের ঘর থাইকা নাক ডাকার শব্দ ভাইসা আইলো।

ঘরে ঢোকার পরেই এইরকম আলাপচারিতায় আমি বিব্রত বোধ করতে লাগলাম।

এরপর পর্যায়ক্রমে ঘটনাগুলো ঘটতে থাকে। আমারে মুড়ি আর গুড় খাইতে দিয়া সে মেইলা ধরে তার ইতিহাস। এক সময় সে যাত্রার দলে ছিল। সেইখান থাইকা তাকে ফুসলাইয়া নিয়া আসে একজন যুবক। বিয়া করার দুইতিন মাস পর থাইকাই তার সব নেশা উইবা যাইতে থাকে। সে সারাদিন মদের আড্ডায় পইড়া থাইকা রাত আইলেই যাত্রার মাগী বইলা তার উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। নাকে-মুখে-পেটে লাথি দিয়া রক্ত বাইর কইরা ফেলে। এই অত্যাচার সে রোজ রাইতেই করে। আইজও মাইর ধইর কইরা পাশের ঘরের মাটিতে পইড়া ঘুমাইতেছে। আপনি আমারে বাঁচান এই বইলা সেই মেয়ে আমার পায়ে পইড়া যায়।

কী মুছিবতে পড়লাম, নিজে বাঁচতে আইসা অন্যেরে বাঁচানোর দায়ের মধ্যে আটকায়া গেলাম। সে বলে, আমারে শুধু একবার ঢাকা পৌছায়া দিবেন, সেইখানে আমার এক বোন আছে।

এ পর্যন্ত বলার পর বাবার চোখ-মুখ বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল, ওই দেখ আজরাইল আসতেছে, ও সব্বোনাশ! হাতে কত বড় দাও। আমারে মাইরা ফেলল। বাবার বিকারগ্রস্ত দেহে ইনজেকশান পুশ করে জাহিদ স্থির করে দিয়েছিল।

এরপর যতবার এ প্রসঙ্গে উঠেছে, কথার ধারাবাহিকতা থাকে নি। বাবা বলেছেন, ওরে আমি গার্মেন্টেসে ঢুকাইয়া দিছিলাম। একদিন শুনি ও মইরা গেছে। না না মরে নাই, মাথা ন্যাড়া করছে তার, কারা জানি। না, এইডা তো অনেক পরে। প্রায় সপ্তাহেই ওরে দেখতে ঢাকা যাইতাম। চুম্বকের মতন আকর্ষণ ছিল তার। প্রথম থাইকাই আমার মাথাটায় গণ্ডগোল লাগায়া দিছিল। কী সেই টান, আমার ঘর গেল, সংসার গেল, সন্তান গেল। না না আমার স্ত্রী নিয়া আমি সুখী ছিলাম না, এই দোষ তার না। সে সরল সিধা গ্রাম্য মেয়ের মতন, আমার অতৃপ্ত মন খুঁজত ধার, সাপের মতন তেজ, এই সবই ওই নারীর ছিল। এরপর একদিন তার গর্ভে আমার সন্তান আসল। সে চাকরি ছাইড়া দিল। না না, তারে ছাঁটাই করা হয়। সে আমারে বিয়া করার জন্য চাপ দিতে থাকে।

বাবা হু হু করে কাঁদতে থাকেন, আমি পলায়া আসি।

সে এখন কোথায়? জাহিদ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে সমস্ত বিষয়টার সাথে একাত্ম হয়ে পড়ে।

অনেক পরে খবর নিছি, মেয়ে হইছে আমার। সেই মেয়েসহই এক রাজমিস্ত্রী তারে বিয়া করছে। পরে শুনছি সেইখানেও তার সুখ হয় নাই, এক হোটেলে কাজ নিছে সে। কত কী শুনছি। কানে আঙ্গুল দিয়া রাখছি। আবার শুনছি, একদিন তারে কে জানি এক সাহেবের সাথে গাড়িতে ঘুরতে দেখছে। সেইদিন ট্রেনে এক লোকের সঙ্গে দেখা যে তারে চিনত, আমারে বলল, সে তার গ্রামে ফিইরা গেছে। বাবার মুখ পুনরায় যন্ত্রণায় নীল হয়ে ওঠে, দম নেয়ার জন্য তিনি হাঁ করেন, এরপর বিড়বিড় করে বলেন, সন্তানের জন্য অনেক দুর্ভোগ পোহাইতে হইছিল তারে। তার মাথা ন্যাড়া কইরা দেওয়া হইছিল। শুইনা আমার মাথার মইধ্যে গোলমাল শুরু হয়ে গেল। কিছুদূরে যাওয়ার পরে দেখি, একটা বাস উল্টা দিক দিয়া যাইতেছে। ওই বাসটা যাইতেছিল যে জেলায় ওর গ্রাম সেই দিকেই। আমি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়া পড়ি, বাসটা ধরবার জন্য চলন্ত ট্রেন থাইকা লাফ দেই।

সব বাদ দিয়ে জাহিদের মধ্যে প্রবেশ করেছিল আশ্চর্য এক বোধ। পাশাপাশি বাস করেও বাবার জীবনে এতকিছু ঘটে গেল, যার ছিটেফোঁটা কিছুই মা জানেন না? যদি জানেন, তাহলে এই খণ্ডিত বৃদ্ধের প্রতি তার মনোভাব কেমন হবে? অদ্ভুত মানুষের জীবন! একঘরে এক শয্যায় জীবন পার করে দিয়েও দু'জন সম্পূর্ণ অচেনা মানুষ!

জীবনে কিছু জমাই নাই, ঢাকার একটা একাউন্টে আমার দশ হাজার টাকা গচ্ছিত আছে, বাবার ফিসফিস কণ্ঠ সারাঘরে ভুতুড়ে ছায়ার সৃষ্টি করে, সেই টাকা তুইলা তুই আমার ওই মেয়েরে দিয়া আসবি। জাহিদ, আমি পাপিষ্ঠ। এরপর বাবার সব অসংলগ্ন হয়ে ওঠে, কিসে আমার পাপমুক্তি হবে? তোর মা কই? ওরে ডাক, ওর পায়ে ধরি। এই যে সারা শরীরে গুটিগুটি পাপ। আহ্! আসমান এতবড় কেন? কী যন্ত্রণা! আমি তোদের অক্ষম বাপ। আমি মরলে আমার দেহটারে কলার ভেলায় ভাসায়া দিবি, জাহিদ, তুই আমার ছেলে না মেয়ে?

বাবার দেহ ক্রমশ নেতিয়ে আসতে থাকে। এরপর কয়েকদিন তার মধ্যে ঘোর নিস্তব্ধতা, একদিন সন্ধ্যায়, সবে ঘরে ঘরে বাতি জ্বলে উঠেছে, যেন ঘুমের মধ্যে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

জাহিদের মনে ছিল গ্রামের নাম, চেয়ারম্যানের নাম, কিন্তু বাবা কখনো সেই রমণীর নাম উচ্চারণ করেন নি। তারও কী এক ঘোরে আর সেই নাম জেনে নেয়া হয় নি।

অচিন্তপুর। মা'র এক দূরসম্পর্কের বোনের বাড়ি এসে উঠেছি।

ওই অসভ্য গ্রামটায় এসে উঠেছ? সর্বনাশ, মারা পড়বে! ওই গ্রামে তোমাদের আত্মীয় আছে তা তো তোমার বাবা কোনোদিন বলে নি!

বাবা তাঁর নিজের বোনের খোঁজ নিয়েছেন কখনো?

তা অবশ্য ঠিক, তোমার বাবা সম্পর্কে সে কথাটা সত্য বলে মানা যায়। যাহোক ওটা হলো পীর-ফকিরের গ্রাম। তুমি বেফাঁস কিছু বলেছ কি জান শেষ! ব্যাগপত্তর নিয়ে এখানে চলে আস। যতই আত্মীয় বাড়ি হোক, ওই গ্রামে তুমি দু'দিনও শান্তি পাবে না।

আমি বেশিদিন এখানে থাকছি না। যতদিন আছি নিশ্চয়ই আপনার এখানে আসব। মা আমাকে বিশেষভাবে বলে দিয়েছেন তার বোনের বাড়িতে ওঠার জন্য, তাই আর কী। আজ আসলে আমি গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে আপনার কাছে এসেছি।

সভা পণ্ড হয়ে যায়।

সবাই যার যার পথে চলে গেলে হুঁকোয় লম্বা টান দেন চেয়ারম্যান। সন্দীপনকে কাঁঠাল গাছের নিচে দাঁড় করিয়ে এসে জাহিদ যমজ ছায়াদের বিষয়টা উত্থাপন করে। বলে, যদিও ও গ্রামে আপনার প্রভাব খাটে না, তবুও সেটা আপনার অধীনে আছে। আপনিই-বা অত সহজে নিজের এলাকা ছেড়ে দেবেন কেন? প্রয়োজন হলে এ বিষয়ে আপনি সরকারকে চিঠি লিখবেন। আমি আপনাকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করব। পত্রিকা আছে আমার সাথে। ওইরকম একটা অবুঝ বালিকা, আপনি নিজেই চিন্তা করে দেখুন।

খুব সকালে ঘুম ভেঙে গেলে যা হয়, বিশেষ করে যখন একটা ঋতুর পরিবর্তন ঘটতে থাকে, শীত আসছে, সমস্ত ইন্দ্রিয় যখন অনুভূতি দিয়ে টের পায়, তখন যদি মাথা থেকে ঘুমগুলো সন্তর্পণে সরে যেতে থাকে, বুকের ভেতরটা হয়ে আসতে থাকে ঠাণ্ডা, তখন যদি সেই শাদা মগজ ঠেলে একদম ভেতরে ঢুকে যায় অশুভ চিন্তাগুলো, যখন মৃত্যু এসে দাঁড়াবে, কী করব তখন ? মৃত্যুর পর কী ? এরপর কৈশোরের কথা, গ্রামের কে যেন বলেছিল, এক মাসের মধ্যেই কেয়ামত হবে, সে স্বপ্নে দেখেছে, এ পর্যন্ত তার দেখা সব স্বপ্ন সত্য হয়েছে, নিশি যেন কাউকে না বলে সেই কথা। সেই একটি মাস, কী ভয়ঙ্কর! কী ভয়! এরকম হলে যা হয়, খুব নিঃসহায় আর বিপন্ন মনে হতে থাকে নিজেকে, নিশিরও তা-ই হয়।

নিশি কাঁথা টেনে নিয়ে ঘুমন্ত আফজালের বুকের মধ্যে বেড়ালের মতো মিশে যেতে থাকে। চারপাশের আঁধার কাটে নি। আফজালের উষ্ণতায় অহেতুক ছেঁকে-ধরা ভয়গুলো সরে যেতে থাকে। নিজেকে খুব সুখী মনে হয় নিশির। মনে পড়ে রিনিকে, গত সন্ধ্যায় এসেছিল, সে ঘরে প্রবেশমাত্র উচ্ছল হয়ে উঠেছিল আফজাল, জ্বর তা হলে সেরেছে! রিনিকে মনে হচ্ছিল সাক্ষাৎ শত্রু। নিশি দাঁড়িয়ে ছিল স্তম্ভিত হয়ে। তার অসম্ভব শীত লাগছিল! নিজেকে সহজ করতে সে খুব স্পিডে ফ্যান ছেড়ে কেমন ভাবলেশহীন তাকিয়ে ছিল রিনির মুখের দিকে। রিনি বলেছিল, একবার তো দেখতেও গেলেন না।

সাধে কি আর যাই নি, যে ডাকাতের মতো ভাই তোমার!

ভাই কি আপনাকে খেয়ে ফেলত ? জব্বর মানুষ আপনি!

নিশির জমাট রক্ত আচমকা শ্বাস ছেড়ে বাঁচে। তাকে ধাক্কা দিয়ে রিনি ভেতরে নিয়ে যায়। সেদিন যেভাবে চলে আসলে! এই দেখ, তোমার জন্য কক্সবাজার থেকে কত্তো ঝিনুক এনেছি, বলে ব্যাগে হাত রাখে, শুধু ঝিনুক না, ঝিনুকের অলঙ্কারও—

রিনি তার সামনে মেলে ধরে বিশাল সমুদ্রের স্রোত। রিনির এই অভূতপূর্ব ব্যবহারে ঝিনুকগুলো যেন প্রাণ ফিরে পায়, নিশি তার মধ্যে স্পষ্ট সমুদ্রের ডাক শোনে।

রিনি হাসতে থাকে, আমার পছন্দ খুব খারাপ ?

আজ ঘুম ভাঙার সাথে সাথে টের পেয়েছে কুয়াশার পদধ্বনি। এক সময় সেই ধ্বনি তাকে পাখির পালকের মতো ভাসিয়ে নিয়ে চলে এমন এক জগতে, যা রূপকথা, যা বাস্তব। রূপকথাকে তবুও স্পর্শ করা যায়, রূপকথা তবুও সম্ভব, ফেলে আসা পথে, যে পথে ফিরে যাওয়া সবচেয়ে কঠিন। দূরে দাঁড়িয়ে নিশি দেখে রিনির লুকিয়ে রাখা ঝিনুকগুলো। রিনি ছোট, বাবা এনেছিল রিনির জন্যই। অথচ ঝিনুকের প্রতি দুর্মর নেশা নিশির। স্কুল থেকে ফিরে জানালার কার্নিশে সেই ঝিনুক দেখে রিনি লুকিয়ে ফেলল। ভেবেছিল, বাবা নিশ্চিত এসব নিশির জন্যই এনেছে। আতঙ্কে ফ্যাকাসে রিনির মুখের দিকে সারাদিন তাকানো যাচ্ছিল না। সারারাত সেগুলো আগলে রাখার জন্য নিঃশব্দে ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে সে লুকিয়ে থাকল।

খুব ভোরে দেখা গেল কলসে হেলান দিয়ে পড়ে আছে সে, তার ঘুমন্ত এক হাত আলগোছে চেপে ধরে রেখেছে জামার ভেতর কষে বেঁধে রাখা ঝিনুকগুলো।

আজ ভোরে নিশির কি হয়, সে ডুবে যায় আশ্চর্য এক স্বপ্নের মধ্যে। অসহ্য আনন্দে তার চোখে জল এসে যায়। জাহিদ হয়ে ওঠে দেবশিশু, নিশি এক সময় যে স্বপ্ন দেখত, জাহিদ তাকে যে পৃথিবী দেখিয়েছিল, সব মস্ত হয়ে ওঠে এবং অদ্ভুত জীবন্ত, সেই টিলাভাঙা পথ, সেই কিচিরমিচির, সেই গেরুয়া রঙ গান, সব একটা বাঁশি হয়ে ওঠে, সেই বাঁশির একেকটা ফুঁ এত মিষ্টি, জিভ কেমন ভরে ওঠে জলে, কেমন খিদে পায়, সহস্র ঝিনুক গড়াতে থাকে, তারা এত কথা বলে, কেমন ঘুম নেমে আসে চোখে, সেই উথালপাথাল সুর সশব্দে জাগিয়ে তোলে সব, খুকুমণি ওঠোরে— সে নিজেকে আধো তন্দ্রা থেকে সজোরে বিচ্ছিন্ন করে বারান্দায় যায়। কী অদৃশ্য শীত, ঋতু আসে নি, দেখা যাচ্ছে না কিছু, কিন্তু কী আশ্চর্য এক শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, নিশি দেখে, পৃথিবী বদলে গেছে।

আজ একটি দিন আমি একফোঁটা ভান করব না। নিশি যেন স্বপ্নঘোরে বলে যায়, একটা মিথ্যে বলব না। এইভাবে একদিন করে নিজেকে বদলে দেখি, বাঁচা যায় কি-না?

পরিচারিকা এসেছে।

আজ মনটা এমনই দশটার ফোনের শব্দও হয়ে ওঠে অভিনব। যেন দূর থেকে ভেসে আসছে মহাজাগতিক ধ্বনি। হেথা নয়, হোথা নয়, কোথায় নিশি জানে না। পালকের মতো হালকা হয়ে উঠেছে রিসিভার; ওপাশে মমতাদির কণ্ঠ, তোমার জন্য একটা পথ খুঁজে পেয়েছি।

হ্যাঁ, আজ সব হবে, সব পথ খুলে যাবে, মমতাদির কণ্ঠেও বিষণ্ণতার বদলে উচ্ছ্বাস খেলবে, নিশি জানত, তার শরীর মিহি ওড়না হয়ে ওঠে, সহসা কথা বলতে পারে না সে।

পোশাকের কাটছাঁট ডিজাইন, ভালোই তো জানতে তুমি, মমতাদি বড় আন্তরিক কণ্ঠে বলেন, সেদিন উপার্জনের কথা বললে না, করছ না কেন?

আমার সেলাই মেশিন নেই, এরপর নিশি ফিসফিস করে বলে, গোপনে সঞ্চয় করছি, এ চিন্তা আমার নেই বলতে চান? রীতিমতো স্বপ্ন! আরো এক বছর লাগবে।

আমি যদি এক বছর কমিয়ে দিই?

কীভাবে?

আমার একটা পুরনো মেশিন আছে, কিচ্ছু কাজে লাগে না। তুমি শুধু সারানোর খরচটা দেবে, ভেতরে সামান্য একটু সমস্যা আছে।

নিশি ইতস্তত করে।

দেখ, আমার সব ছেলেমেয়েই আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, এ হয়তো আমারই দোষ, আমারই অক্ষমতা, কতটা কাঙাল আমি, কাউকে কিছু দিয়ে শান্তি পাওয়া থেকেও বঞ্চিত। নিশি তুমি এটা কর, দেখবে দিনগুলো কেমন ফুরফুরে হয়ে উঠছে। আমার বেশকিছু জানাশোনা আছে, আমি তোমাকে কাজ পাইয়ে দেব। নিশি তুমি এটা কর, পৃথিবীতে যে-কোনো মানুষের মুক্তির একটাই পথ, তার নিজস্ব একটা জায়গায় দাঁড়ানো, আর এটা একমাত্র সম্ভব তার কাজের মাধ্যমে।

নিশি রীতিমতো বিছানায় ডিগবাজি খায়।

হুররে— চেঁচিয়ে ওঠে।

হিরণ কণ্ঠ বাড়ায়, তার চোখ ড্যাবড্যাবে, নিশি গলা টেনে লম্বা করে বলে, চা...।

হিরণ এক আজব মেয়ে, কোনো কিছুতেই তার ভয় নেই। ভয় না থাকলে সাধারণত যা হয়, অসম্ভব ডানপিটে হয়, কিন্তু সেই বৈশিষ্ট্যের ছিটেফোঁটাও নেই ওর মধ্যে। কেমন ভাবলেশহীন চালচলন। গরম সসপেন নামায় খালি হাতে। সেদিন গ্লাস ভেঙে কী কঠিন দক্ষতায় তার ওপর দিয়ে হেঁটে ঝাড় আনতে গেল। একটুও পা কাটল না। নিশির ঘরে একজন মানুষ হয়েছে, সে সচল, কমবেশি অনুভব করতে পারে আরেকজনকে। নিশিকে যে আয়েশি ঘুমের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। নিশির আপাতত এটাই শান্তি। সে যখন কাজ করে কোনো শব্দ নেই। অন্য সময় মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে রাজ্যির কাল্পনিক গপ্পো বলে। এ যেন আরেক জাহিদ, পেট ভর্তি অবাস্তবতা। কিন্তু মুশকিল একটাই, আফজালের ওকে পছন্দ হচ্ছে না, বলে, সামনে মাথা উদ্ধত, উঁচু করে দাঁড়ায়। ওর মধ্যে একটা খুনি খুনি ভাব আছে।

পৃথিবীর সব মানুই কমবেশি মানসিকভাবে অসুস্থ। নিশি দর্শন ঝেড়ে দেয়, এ রকম একটা ভ্যাবলা মার্কা মেয়ে, ভয় কাকে বলে এই শিক্ষাই যে পায় নি, তাকে খুনি খুনি মনে হওয়ার কী কারণ থাকতে পারে ? তুমি এত বাস্তববাদী হয়েও এ রকম কথা যদি বলো।

সন্ধ্যায় ওকে রক্ষা করার জন্যই নিশির নিজের সাথে প্রমিজ ভেঙে মিথ্যে বলতে হলো, নতুন মেয়ে, মাতব্বরি করে আফজালের শার্ট ইস্ত্রি করতে গিয়েছিল। শার্টটা যদিও একটু পুরনো, তবুও, আফজাল জ্বলে ওঠার আগেই বলল, আমার হাতে পুড়েছে।

আশ্চর্য! এতদিনে ইস্ত্রি করাটাই শেখো নি!

শিখব না কেন ? এতোদিন আমি করি নি ? হঠাৎ কী করে যে ইস্ত্রিটার সাথে আঠার মতো লেগে গেল! টান দিয়ে ছোটাতেই রীতিমতো বোকা হয়ে গেলাম।

এরপর মেয়েটার প্রতি আফজালের যাতে অজানা বিদ্বেষ কমে আসে, সন্ধ্যায় চা খেতে বসে ওর সম্পর্কে বানিয়ে অনেক গল্প করে, জানো, ভীষণ কাজের ও, সব পারে। তোমার কথাও বলে। বলে, তুমি নাকি দেখতে ওর বড় ভাইয়ের মতন। সেই ভাই-ই ওকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে।

ঠিক আছে, মেয়েটি সরল এটা মানছি। কিন্তু তাকে ভদ্রতা, নম্রতা এসব তো তোমাকেই শেখাতে হবে, না কি ?

নিশির বুক থেকে যেন পাথর নেমে যায়। কিন্তু তারপরও ছায়ার মতো এক অসীম বেদনা বড় সন্তর্পণে, বড় নিভৃতে তাকে গ্রাস করে, আজ, এই একটি দিনও আমি নিজের সাথে পারলাম না ? হোক নির্দোষ মিথ্যা, তবুও আমি অবচেতনে সেই দিকেই হেঁটে গেলাম ?

মিথ্যা! রাতে নিশি মিথ্যা নিয়ে ভাবতে থাকে। এ এক মহান শিল্প! আমরা সত্যকে পর্যন্ত মিথ্যার ভেতর দিয়ে দেখতে পছন্দ করি, আমাদের সাহিত্য, শিল্পকলা, এসব তো সত্যেরই আরেক মিথ্যা রূপ।

না, এ সত্যেরই প্রতিচ্ছবি। নিশির মধ্যে ধুন্ধুমার তর্ক লেগে যায়, প্রতিচ্ছবি কি করে বলি, যে কাহিনী আমরা উপন্যাসে পড়ি, হুবহু সেই মানুষ সেই জীবন বাস্তবে কি আছে ? পেইন্টিংয়ে যে বিমূর্ততা, জীবন হুবহু তা-ই ? রঙের অদ্ভুত মিশেল দিয়ে সত্য ছবিটিকে মিথ্যার মধ্য দিয়ে আড়াল করে রাখা হয়।

আমি কি আজ মিথ্যে বলেছি ?

একটি নির্দোষ মেয়েকে ভর্ৎসনার হাত থেকে রক্ষা করার সামান্য মিথ্যেকে ঠিক মিথ্যে বলা ঠিক না, এরকমের পরিস্থিতিতে এধরনের কথার অন্য কোনো নাম আবিষ্কৃত হওয়া উচিত।

একদিন এইসব দিনের মধ্যে সেইসব আত্মীয় একেবারে প্রায় বিছানাপত্তর নিয়ে এসে ওঠে, যাদের সাথে কী এক কারণে না মানসিক, না আনুভূতিক কোনো সম্পর্কই নিশির তৈরি হয়ে ওঠে নি। নিশির সব আলো এক ফুঁয়ে নিভে যায়। তবুও সে মুখে উজ্জ্বলতা আনে, এতদিন পর আমাদের মনে হলো ? মনের অজান্তেই আরো কত কী হাবিজাবি বলে, রাতের রান্না হয়ে গিয়েছিল। সেসব ওদের খেতে দিতে গিয়ে সে টের পায় প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলে উঠেছে। আফজাল ছুটেছে নিজেদের খাওয়ার জন্য ডিম আনতে। ওর অকৃত্রিম আনন্দ ছিল দেখার মতো। যেরকম হিসেবের মাস তাদের, নিশির নিজের বাবা-মা এসেও যদি সাতদিন থাকতে চায়, নিশি অস্বস্তি বোধ করবে। সীমাহীন ঋণের মধ্যে পড়তে হবে জেনেও আফজালের মুখে যে আলোর উদ্ভাসন, নিশি অনুভব করে ওর কাছ থেকে অনেককিছু শেখার আছে। এতটা দিন তারা একত্রে সংসার করেছে, দাম্পত্য জীবনে একমাত্র অর্থ সংক্রান্ত বিষয় নিয়েই দু'জন একাত্ম হয়ে মশগুল থাকতে পেরেছে। কী করে আরেকটু ভালো বাসা ভাড়া করা যায়, কতটুকু খরচ কমালে ড্রয়িং রুমে একটা কার্পেট কেনা যায়, এইসব এইসব। আফজাল সিগ্রেট কমাতে চেয়েছে। তার থেকে যদি কিছু আসে, তাই দিয়ে তারা বছরে একবার ঢাকার বাইরে কিছুদিনের জন্যে—।

এইসব হিসেব কোনো মাসেই ঠিক থাকে না। একটা-না-একটা হজবজ লেগেই যায়।

বড় বোনের গায়ে মাংস নেই, এছাড়া তার যে রঙ-জ্বলা শাড়ি, হিরণ ওর চেয়ে অনেক চৌকশ আছে। কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে গেছে, কোটরের চোখে মৃত্যুর ছায়া, মরণের লাইগ্যা আইছি, যে হাঁপানির টান, মাইয়া দুইডারে আনছি, যদি তাগোরে মায়ের শেষ মুখ দেখতে হয় ?

নিশি তাকে আশ্বস্ত করে, এই রোগ ভোগায় বটে, তবে এতে আজকাল মৃত্যুর ভয় নেই। এসে যখন গেছেন, মনে জোর বাড়ান, নিশ্চয়ই ভালো চিকিৎসা হবে।

রাতে নিশির পাশে আফজালের বড় বোন মেয়ে দুটোকে নিয়ে আড়াআড়ি করে শোয়। বাইরের ঘরের ছোট খাটে শ্বশুর, নিচের মেঝেতে আফজাল আর তার ভগ্নীপতি। এক সময় সবাই শুয়ে পড়লে আফজাল নিশিকে ডেকে বারান্দায় নিয়ে যায়। ফিসফিস করে বলে, তোমার সঞ্চয়ে কত আছে ?

এক পয়সাও নেই।

কেন যে এমন কর নিশি, তোমার বাবা-মা হলে কী করতে ?

তারা তো আসেই, তাদের জন্য আমি কি করি ?

তুমি বিষয়টা বুঝছ না কেন। একটা অসুখ নিয়ে এসেছে, ব্যবস্থা করতে হবে না ?

তুমি ব্যবস্থা কর। তাছাড়া ওর স্বামী আছে না ? যার যার সংসারের ব্যবস্থা সে সে করুক।

ও তো একটা বাউণ্ডুলে। সব জেনেও তুমি যদি—।

তোমার যে অবস্থা আফজাল, এসব ক্ষেত্রে চোখ-কান বন্ধ করে যেভাবে চালতে চাও, তাতে তোমার আরো উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা উচিত ছিল, চাকরির বেতনে তোমার নিশ্চিন্ত থাকাটা ঠিক ছিল না।

আস্তে বলো, বুজান শুনবে। তারপর তার কণ্ঠ ঠাণ্ডা হয়ে আসে, তোমার কথায় মনে হয় আমি আমার ভেতরের উচ্চাকাঙ্ক্ষা তৈরি করলেই ঝুর ঝুর করে আমার পায়ের কাছে সবকিছু লুটিয়ে পড়বে। কাজের মেয়ের সেবায় ঘরে শুয়ে শুয়ে এমন অনেক কিছুই ভাবা যায়। যতোই রূঢ় শোনাক তোমাকে একটা কথা বলি, তুমি যে টাকাটা সঞ্চয় করেছ, সেটা কার উপার্জন থেকে? এমন ভাব করছ যেন টাকাটা তুমি নিজে গায়ে খেটে রোজগার করেছ। ঠিক আছে, এ নিয়ে আর একটি শব্দ উচ্চারণ করার রুচি আমার নেই।

তুমি যে এভাবেই বলবে, এর চেয়ে বেশি কিছু আমি তোমার কাছ থেকে আশা করি না। এ জন্যেই তো যে কোনো একটা কাজ করতে চাই। তখন বাধা দাও কেন? তোমার টাকা, ঠিক আছে তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি, এটা আমি আমার কোনো শৌখিন জিনিস কেনার জন্য জমাই নি। একটা সেলাই মেশিন অনেকদিনের স্বপ্ন ছিল আমার, যাহোক—।

মানুষ তো বিপদের জন্যই জমায়, আফজালও আপোসের স্বরে নেমে আসে। নিশি আমি তোমাকে এইভাবে বলতে চাই নি, তুমি এমন গোঁ ধরলে কার না রাগ হয়? সেলাই মেশিন কি মানুষের বিপদের চেয়ে বড়? কয়েকটা মাস যেতে দাও, আমিই তোমাকে সেটা কিনে দেব। তুমি তো তা-ও ভদ্রতা করে বলছ ওটা তোমার স্বপ্ন, অথচ যতই বিচ্ছিরি শোনাক, তুমি অনুভব করছ সেটা তোমার প্রয়োজন, আমি সবই বুঝি নিশি, কিন্তু—।

নিশি কলেজে গিয়ে নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচে।

ঘাসে বসে আছে সহপাঠিনীরা, কত গপ্পো তাদের, পৃথিবীর কত বিষয়ে খোঁজ, ইমরান জেমিমাকে বিয়ে করেছে, সমকামীদের উৎসব হয়েছে, অমিতাভ বচ্চনের ব্যবসার পদ্ধতি মাফিয়া চক্রের হাত থেকে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে রক্ষা করবে, ডিস এন্টেনা এ দেশের শিল্প-সংস্কৃতিকে কিভাবে গ্রাস করছে, আমাদের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির কীরকম করুণ দশা— কত রকম প্রসঙ্গ, নিশি নিঃশব্দে দু' আঙুলের চাপে বাদামের খোসা ভাঙে, ছন্দা বড় চোখ-ধাঁধানো সুন্দরী, বলে, তুমি কিছু বলছ না যে?

ছন্দাকে দেখে নিশির ভেতর উস্কে ওঠে, একশো টাকা। এমন সম্পর্ক, চাইতেও কেমন অস্বস্তি হয়, সে মরিয়া হয়ে উঠতে থাকা মনকে প্রতিহত করে বলে, শ্রোতাও তো কাউকে-না-কাউকে হতে হয়। এতো কম কথা বলো তুমি!

ছন্দা রোদের আলোয় কেমন ঝলসে উঠতে থাকে, কম কথা কিভাবে বলতে হয়, কিভাবে কথার মাঝখানে বড় একটা গ্যাপ তৈরি করতে হয়, বিশ্বাস কর, একদম জানি না। এরপর সে আচমকাই প্রস্তাব রাখে, নিশি তুমি মডেলিং করবে?

আমি? নিশি আকাশ থেকে পড়ে, আমি কি তোমার মতো রূপসী? আমাকে নিয়ে পণ্যদাতারা ডুববে নাকি?

সিরিয়াসলি বলছি, আমি কদিন ধরেই বিষয়টা ভাবছি, তোমাকে বলা হয়ে ওঠে নি। ছন্দা বলে, মানুষ নিজেও তার সব সম্পদের খোঁজ রাখতে পারে না, তোমার চুল অসাধারণ।

আমি এমনিতে দীর্ঘ চুল পছন্দ করি না, তোমারটা আলাদা, কেমন মেঘের কথা মনে পড়ে, এক সময়, ক্লাসে, বিশ্বাস কর, তোমার অজান্তেই ছুঁয়ে দেখতাম আসল কি-না।

এরকম প্রশংসায় নিশি রোমাঞ্চিত হয়ে পড়ে।

সে আগেও অবশ্য শুনেছে। বিয়ের পরে আফজালও বলেছে, কিছুতেই চুল ছোট করতে দিত না। তবে এ নিশির মধ্যে 'তোমাকে আমি বিয়ে করেছি তোমার ঘন মসৃণ চুলের জন্য' এই ধরনের তিক্ত বোধ এনে দিত বলে সে দেহের এই সুন্দর অংশটির বিষয়ে ক্রমশ নিস্পৃহ হয়ে পড়ছিল। ও বলত, এভাবেই বলত, প্রথমেই চুল চোখে পড়েছিলো। নিশি প্রথম প্রথম অভিভূত হতো। যতই জ্ঞান বাড়ছিল এ বিষয়টা তার জন্য যন্ত্রণাকর হয়ে উঠছিল। চুল দেখে বিয়ের স্পৃহা! কী বিচ্ছিরি! এরপর কখনো এ বিষয়ে সে কোনো কথা বলত না। বিশেষত আফজাল নিশির এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে আহত হয়ে বলেছিল, তাই বলে এমন কেন ভাবছ যে, ওই সুন্দর চুল না হলে তোমাকে আমি বিয়ে করতাম না ? আজ ছন্দা, না ওর মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা নেই, তবে দেহের একটা অংশ প্রদর্শন করে অর্থ উপার্জন ? নিশি এ বিষয়ে তীব্র আপত্তি প্রকাশ করে। ছন্দা বোঝায়, এ শিল্প, মানুষ মডেল হয় না ? নিজের সৃষ্টি বিক্রি করে উপার্জন করে না ?

নিশি হাসে, এই চুল কি আমার সৃষ্টি ? ছন্দা আমরা শিল্প জিনিসটাকে বড় হেলাফেলায় যত্রতত্র ব্যবহার করি, বাজার-গরম-করা ছবিতে অর্ধনগ্ন হয়ে একজন নারী বলে, শিল্পের জন্য করছি। অথচ সত্যিকার শিল্পের জন্যে যে নগ্নতা সেটাকে তখন আর নগ্নতা বলা যায় না, সেটা দেখে আমরা স্তব্ধ, অভিভূত হই। আমাদের মধ্যে শিস দেয়ার স্পৃহা জাগে না। এইসব অনেক বিশ্লেষণ হাজির করে ছন্দাকে ক্লান্ত করে তোলে।

শেষে নিশি নিজের আত্মার মুখোমুখি হয়, হ্যাঁ আফজালও যদি শোনে, তবে বলবে এ নিজেকেই বিক্রি করা, সে নিশির মতো আত্মোপলব্ধি থেকে বলবে না। সে কথা বলবে একটা রক্ষণশীল মানসিকতা থেকে, এতেই নিশির আপত্তি। সে ভেতরে উস্কে ওঠে। অসুবিধে কী ? তুমিও তো আমাকে দেনমোহরের দামে কিনেছ ?

কোরআনেও সেইরকমই আছে 'এবং নারীর মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সমস্ত সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তোমাদের জন্য এ আল্লাহর বিধান। উল্লিখিত নারীগণ ব্যতীত আর সবাইকে অর্থের বিনিময়ে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ হলো, তাদের মধ্যে যাদের তোমরা উপভোগ করবে, তাদের নির্ধারিত মোহর অর্পণ করবে।' ভাবতে ভাবতে নিশির নিজের অজান্তেই ভেতর থেকে কান্না ঠেলে ওঠে। আফজাল কি মোহরের বিনিময়ে আমাকে উপভোগ করে ? আর আমি ? তাহলে উপভোগ বিষয়টা কি পারস্পরিক নয় ?

আসলে সেদিন মমতাদির সাথে একপেশে তর্ক হয়েছিল। বিষয়টা এমন, দাম্পত্য জীবন বাবা-মার সংসারে থাকার মতনই আরেকটা জীবন। মানুষ ভেতরে খুব রোমাঞ্চ প্রিয়। দাম্পত্যজীবনের সবকিছু, এমনকি শরীরের সম্পর্ক পর্যন্ত অভ্যাসের মধ্যে চলে যায় বলে মানুষ সেসব স্পন্দন হারিয়ে একসময় নিজেদেরকে মায়ার চক্রে বাঁধতে থাকে। নতুনত্বের নেশা নিরন্তর তার মধ্যে এক অদ্ভুত হাহাকারের, শূন্যতার সৃষ্টি করে, বিপর্যয়ের ভয়ে মানুষ যা নিজের মধ্যে চাপ দিয়ে রাখে। সব যাতে ঠিক থাকে, কোনো বিপর্যয় না

হয়, সে জন্যই মানুষ নিজের স্ত্রী বা স্বামীর মধ্য দিয়ে ক্রমাগত স্পর্শ করে অন্য কোনো কাল্পনিক মানুষকে। এইভাবে তারা নিজেদের মধ্যে নতুন নির্মাণ করে, স্বস্তি পায়, ব্যভিচারী হয়, বাঁচে।

ছন্দা বলেছিল, তুমি আরেকটু চিন্তা কর। আমি যে অ্যাডের ওখানে কাজ করছি, ওরা আমাকে বলেছিল যদি চমৎকার চুলের মেয়ে পাই— তখুনি আমার তোমার কথাই মনে হয়েছিল। পৃথিবীর যে কোনো কাজই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে পাল্টে যায়, এই যে বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতা, এটাকে কেউ মনে করছে নারীর আরো একধাপ এগুনো, কেউ মনে করছে এ নারীকে জঘন্যভাবে পণ্যে রূপান্তরিত করা।

পরদিন ক্লাস শেষে নিশি হাঁটতে থাকে।

ঘিঞ্জি রাস্তায় বার বার পা হড়কে যায়। ফুটপাতে দোকান, রড, সিমেন্টের বস্তা। হাঁটা আর হয় না। বার বার আটকে যাওয়া। সকালে শ্বশুর বলেছিল, বিয়ের পরে মেয়েদের আবার কলেজ কী? ঘরে যাওয়ার স্পৃহা নষ্ট হয়ে যায়। সে প্রতিবন্ধকতাময় পথটার মাঝখানে উদ্দেশ্যহীনভাবে দাঁড়িয়ে পড়ে।

দায়িত্ব বড় কঠিন, এতগুলো মানুষ, তাদের খাওয়ানো, বাচ্চাদের বাথরুম ব্যবহার পদ্ধতি শেখানো, তাদের সুবিধে-অসুবিধের দিকগুলো দেখা, রাস্তায় দাঁড়িয়ে ধোঁয়া গিললে এর সমাধান হবে?

বিকেলে আফজাল নিয়ে যায় ডাক্তারের কাছে। ওর বোনের যে ভেরেণ্ডা ভাজা স্বামী, সে ছুটবে এইসব কাজের জন্য? ঝাড়ুর শলা দিয়ে দিনরাত দাঁত খোঁচায়, বলে আমার গিয়ে কী হবে?

আফজালের বিরক্তির মুখে নিশি ফিসফিসিয়ে বলে, আসলেই ওকে নিয়ে গিয়ে কি হবে, তিনজন গেলে খামোখা স্কুটার নিতে হবে।

চলে যাওয়ার পর সেই লোক দাঁত কেলিয়ে হাসে, বোনকে ফকিরের মতো রেখে বড় ভাই তাহলে রাজার হালেই আছে।

শ্বশুরের মুখের পর্দায় নানা রঙ খেলে যায়।

নিশি বলে, এই যে রঙিন টেলিভিশনটা দেখছেন, ওই যে বক্সখাট, আর শো-কেস, এসব বিয়ের সময় আমার বাবা দিয়েছেন। টেলিফোনটা বাড়িঅলার। তারা বিদেশ থেকে এলেই দিয়ে দিতে হবে। তাদের দয়ায় আমরা এর সুবিধাটা ভোগ করছি।

শ্বশুর বলেন, এই যে আমরা আসলাম তোমাদের খরচ হইতাছে না? আমরা না আসলে তো খোঁজই নেও না, এই টাকাটাই পাঠায়া দিলে তোমাদের কী অসুবিধা অইতো? ছেলেরে মানুষ করাইতে গিয়া আমাগোর সব জমি চইল্যা গেছে, অহন উল্টা তার কাছেই হাত পাততে হয়!

আফজাল এক কণা ধানের সাহায্যও পায় নি পড়াশোনার জন্য, তা ছাড়া আপনাদের জন্য এই যে করছি এ জন্য ঋণ করতে হচ্ছে আমাদেরকে। কি দুর্ভোগ পোহাতে হবে পরে, সে কেবল আমরাই জানি। কথাগুলো বলার জন্য তার কণ্ঠ উন্মুখ হয়, কিন্তু জামাইয়ের সামনে শ্বশুরের অপমান হবে বলে বলতে পারে না। শেষতক কথার আগুপিছু, যুক্তি-টুক্তি

সব হারিয়ে এক সময় তার বেয়াদবিটাই বড় হয়ে দাঁড়াবে, বিচ্ছিরি হয়ে উঠবে পরিস্থিতি, তাই নিজেকে কঠোর অবদমনে দমিয়ে সে ভেতরে আসে, হিরণ, কেটলিতে মেপে তিন কাপ পানি বসিয়ে দে, আমি এসে লিকার দেব।

দুটো হাড় জিরজিরে বাচ্চা, অপুষ্টিতে যাদের মুখে দাঁত ছাড়া কিছু দেখা যায় না, এসে বলে, আমরা কাইল শিশুপার্কে যাইমু।

নিশি বলে, শিশু পার্ক্ তোমরা চিনলে কীভাবে ?

আফজাল মামায় কইছে, কইছে রাইড্যের মজা ওইখানে।

নিশি শ্বাস টেনে বলে, অবশ্যই যাবে। তোমাদের মা একটু সুস্থ হয়ে উঠুক!

অন্ধকার বারান্দায় বসে নিজেকে কঠিনভাবে বিদ্ধ করে নিশি, কেন আমি এদের সাথে একাত্মবোধ করি না ? কেন কোনো কিছুই প্রাণ থেকে উঠে আসে না ? সে কি এজন্যেই, ওদের সারা অবয়বে শতচ্ছিন্ন দারিদ্র্য কটকট চোখ মেলে থাকে ? বড় বোনের কোল ঘেঁসে আফজালের যখন শিশুর মতো আকুতি ঝড়ে পড়ে, বুজান তুমি কি তেমনই লাড্ডু বানাইতে জানো, তখন কেন আমার সারা শরীর অসহ্য অস্বস্তিতে কাঁপতে থাকে ?

হতে পারে ভিখিরির চেয়ে অধম জীবন ওর ভাইবোনদের, তবুও ওর একটা শৈশব ছিল। তার কৈশোর, যৌবনের প্রতিটি ধাপের সঙ্গে এরা নানাভাবে মিশে ছিল। ভাইজানের সামনে গেলে নিশি নিজেই কি কম আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে ? ও যেভাবে নিশির বিষয়টা বোঝে না, ঠিক তেমনি নিশিও। না, এটা ঠিক না। একজনের শৈশব, কৈশোর থেকে ছিঁড়ে নিয়ে তাকে কখনই প্রাণের করা যায় না। তাকে বৃন্তচ্যুত করতে চাওয়া অন্যায়, যত পঙ্কিলময়, পূতিময় হোক তার শৈশব, আফজালকে প্রাণের করতে চাওয়ার চেয়েও এখানে মানবিক যুক্তিটা বড়। নিশির ভেতরটা ক্রমশ আর্দ্র হয়ে ওঠে। এই উপলব্ধি তাকে ব্যাপক করে তোলে। এদের আগমনের পর তার ভেতরে দানা বাঁধছিল যে অসহ্য বোধ, বাতাসের সাথে সেটা মিলিয়ে যেতে থাকে। নিশি নির্ভার হয়ে ওঠে।

এইভাবে দিনগুলো যাচ্ছিল।

এক সকালে কলেজে গিয়ে কী এক টানে নিজেকে ঠেলে নিয়ে চলে পুরনো ঢাকায়। ঘিঞ্জি, দম আটকানো যানজটের মধ্যে এক সময় গিয়ে দাঁড়ায় স্বাতীদের বাসার দরজার সামনে। সেদিন থেকেই কীটের মতো সারা অস্তিত্বে শিরশির হাঁটছিল এক বিষাক্ত অনুভূতি। বিষয়টা দু'দিক থেকে শুনে তবেই স্বাতীর ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসাটা ঠিক ছিল। বি.এ. পরীক্ষার আর দেরি নেই, এমনিতেই গ্যাপ দিয়ে পুঁচকে মেয়েগুলোর সাথে পড়তে হচ্ছে। তার মধ্যে এবার ডাব্বা মারলে... যথেষ্ট কলেজ ফাঁকি দেয়া হচ্ছে। তবুও স্বাতীর ব্যাপারটা, ভাবতে গেলেই মাথা ব্যথা করে। একটা দায়িত্ব বোধ ঢুঁ দিতে থাকে। অনেক আগেই ওর খোঁজ নেয়া উচিত ছিল।

দরজা খোলার পর স্বাতীর যে চেহারা হয়, তাতেই ঘিঞ্জি গলিগুলোর সব অন্ধকার মাথা থেকে সাফ হয়ে যায়। বাইরে থেকে এ বাড়িটাকে আবর্জনাময় আর ভঙ্গুর মনে হয়। ভেতরে ঢুকে অবাক হয়ে যায় নিশি, কী চমৎকার করে সাজানো, ড্রয়িং রুমে নানা রকমের

শৌখিন জিনিসপত্র, নিশিকে যা আকর্ষণ করে, গাছের গুঁড়ির ওপর বসিয়ে রাখা ছ'পেয়ে বেড়ালটি, কেমন লোমশ, গাটা ভল্লুকের মতো।

বেড়ালের কখনো ছ'পা হয় ?

এ আমিই বানিয়েছি, অনেকদিন শিখলাম না ? স্বাতী হাসতে থাকে, উদ্ভট একটা কিছু করার খেয়াল থেকেই ওর জন্ম। দ্যাখো না, মুখটাই শুধু বেড়ালের, লেজটা লক্ষ্য করেছ ? পাখির মতো। নিশি হাসে, অসীম গুণ তোমার, কবিতা লেখ, এর মধ্যে আবার এইসব শিল্পকর্ম।

কিছুক্ষণ পর চা আসে।

তুমি ভাত খেয়ে যাবে, স্বাতী সুস্থির হয়ে প্রথমে এই কথাটাই বলে।

বাড়িতে অনেক মানুষ, আমাকে বাজার করে ফিরতে হবে।

যা রাগ হয়েছিল তোমাদের ওপর। ভাবছিলাম, এই বুঝি মানুষের চরিত্র। সামনে গেলেই সব সম্পর্ক, তোমাকে অন্যরকম জানতাম, রাগের সময় সবার সাথে তোমাদেরকেও এক করে ফেলেছিলাম।

শুনলাম চাকরি ছেড়ে দিয়েছ ?

হ্যাঁ, কে বলেছে তোমাকে ? এখনো ঠিক ছেড়ে দিই নি, তবে যাচ্ছি না।

কে জানি বলল সেদিন, সেই ভরসাতেই এ সময় এসেছি।

ওরা বসেছে কার্পেটে।

দেয়ালে হেলান দিয়ে স্বাতী ক্রমশ অসংবৃত হতে থাকে, তার ওড়না সরে যায় বাতাসে, চুল আলুথালু হয়ে ওঠে, জানো, যখন ছেলে দুটোর কথা ভাবি, আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয়। এখানে সব আছে। বাবার ছায়া আগেরই মতন, কিন্তু বিশ্বাস করো, এ-কী আমি পেটে ধারণ করেছিলাম, কীরকম মৃত্যুর মতো মায়া। সারারাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারি না।

বহুতল ছায়া আষ্টেপৃষ্ঠে প্যাঁচাতে থাকে নিশিকে। সেই সব ছায়ার ধাপ কেটে এক পা করে এগোয়, তার কেমন ঠাণ্ডা লাগে, কীভাবে কি প্রশ্ন করবে বুঝে পায় না। এরপর সরল পথ ধরে, তুমিই নাকি ওদের আনো নি ?

ওহ্ মাই গড! ও তা-ই বলেছে ? স্বাতী এমনভাবে ফুঁসে ওঠে, তার চোখ দপ্ দপ্ করতে থাকে, ও বলেছে আমি আনি নি ? তুমি ওখানে গিয়েছিলে ?

হ্যাঁ। প্রথমে তো বুঝি নি। শুনেই ছুটে গিয়েছিলাম।

আমার ছেলেদেরেকে কেমন দেখলে ?

ওর আকৃতির মধ্যে কোনো ভান নেই, নিশির ভেতর কষ্ট জমে, সে বলে, বাচ্চাদেরকে ? খুব ভীত আর স্থির মনে হলো।

স্বাতী কাঁদতে থাকে, পৃথিবীতে এমন কোনো মা আছে যে সন্তানের বিষয়ে ব্যতিক্রম হবে ? তুমি ভাবতে পারবে না আমার বেরিয়ে আসার সময় ও কি করেছে, আমি ছেলেদেরেকে জাপটে ধরেছিলাম নিয়ে আসার জন্য, ও ছিনিয়ে নিয়ে বলেছে আদালতে যাওয়ার জন্য। এরপর ওরা যখন কাঁদছে ও ওদেরকে বলেছে, তোর মার পেটে অন্য মানুষের বাচ্চা ছিল, তোরা যাবি এমন নষ্ট মায়ের সঙ্গে ? এরপর আরো আজেবাজে কথা,

আমি কান চেপে পালিয়ে এসেছি। এখন ইচ্ছে হয় রক্তারক্তি করে ওদেরকে নিয়ে আসি। আমার বড় ছেলেটার বোঝার বয়স হচ্ছে, আমি ওদের সামনে দাঁড়াতেই পারছি না।

নিশি কফিতে চুমুক দেয়, ভাসমান ফেনায় তার ঠোঁট ভরে যায়, কেমন মরচে গন্ধ, গলা নামিয়ে বলে, কিন্তু তোমার প্রেগন্যান্ট হওয়ার বিষয়টা—।

আমি অত বাজে কথা মুখে আনতে পারব না। পৃথিবীর প্রতি, পৃথিবীর সব মানুষের প্রতি আমার বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে। অফিসে আমার বস হাতে-কলমে আমাকে কাজ শিখিয়েছেন। অফিসে আমি ভালো কাজ করছি, তার সঙ্গে আমার একটা আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠতেই পারে। নিশি, এই যে কফি ছুঁয়ে বলছি, আমাকে অদ্ভুত স্নেহের চোখে দেখেন তিনি। তার সুখের সংসার, তাঁর স্ত্রীও আমাকে যথেষ্ট পছন্দ করেন। এই ঘটনার পর ভদ্রমহিলার কাছে আমি সব খুলে বলেছি। তিনিই আমাকে চাকরি ছাড়ার পরামর্শ দিয়েছেন। আমি তাকে বলেছি, একটা মিথ্যের কারণে আমি চাকরি ছাড়ব কেন ?

শেষে তিনি বুঝিয়েছেন, আমার বস এতে খুব মানসিক আঘাত পেয়েছেন। আমার দিকে তিনি তাকাতে পারছেন না। আমার জন্য তিনি অন্যত্র চেষ্টা করবেন।

কিন্তু এমন একজন মানুষকে নিয়ে রেজা ভাই ক্ষেপল কেন, আমি সেইটাই বুঝে পাচ্ছি না।

এ একটা অজুহাত। একদিন হাসপাতালে আমাদেরই অফিসের একজন পেসেন্টকে দেখে ফেরার সময় তিনি আমাকে বাসায় লিফ্‌ট্‌ দিয়েছিলেন। সে পুরো বিষয়টাই বোঝে, বসের সাথে আমার সম্পর্ক, তাঁর চরিত্র, সব ব্যাপারে ঠিকই ধারণা আছে তার। নিজের কুকর্ম চাপা দেবার জন্য সে এই বিষয়টাকে অস্ত্র হিসেবে নিয়েছে। মানুষের অস্তিত্বের সঙ্কট বড় মারাত্মক, সেখানটায় ঘা লাগলে নিজের সন্তানও তার চরম শত্রু হয়ে উঠতে পারে।

নিশি চুপ করে থাকে।

এই স্তব্ধতা স্বাতীকে আরো এগুতে সাহায্য করে। তুমি নিজেই ভেবে দেখো, যার ওপর সে খবরদারি করছে, যাকে সে পায়ের তলায় রেখেছে, শুধু শরীরের আকর্ষণে তাকে সে আমার বিছানায় এনে ওঠাবে ? বিশ্বাস কর, বিছানায় কাঞ্চনীকে দেখে আমার পৃথিবী ওলোটপালোট হয়ে গিয়েছিল। ওর একটা অভ্যাসের কথা আমি আগে থেকেই জানতাম, সে পতিতালয়ে যায়। ব্যাপারটা তদন্ত করতে গেলে, ঘাঁটাতে গেলে নিজের কাছেই কেমন ঘেন্নার মনে হতো। মনে হতো, এসব আমার কাছে সে অস্বীকার করছে, সেটাই আমার জন্য স্বস্তির। কিন্তু রাতে ছোট ছেলেটার জ্বর ছিল, আমি ওর ঘরে গিয়ে ঘুমিয়েছিলাম। শেষ রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়— আমি আর বলতে পারছি না নিশি, স্লিপিং পিল খেয়ে পরদিন বিকেল অব্দি পড়ে থেকেছি।

স্বাতী আবার কাঁদতে থাকে, তারপর ওর সাথে জেদ করেই দু' মাসের ভ্রূণটা নষ্ট করেছি।

নিশি চেয়ে থাকে দেয়ালের দিকে। দেয়ালের মাঝখানটা এমনভাবে ফেটে আছে যেন কেউ ঢিল ছুঁড়ে ছত্রখান করে ফেলেছে মেঘ। সে নিজের মধ্যে গুটিয়ে যায়, কীভাবে উঠবে, ভাষা খুঁজে পায় না, বলে, রেজা ভাইয়ের ব্যক্তিত্বের সাথে এ একেবারেই মেলে না, নিশ্চয়ই খুব বেশি খেয়েছিল ?

সে বেশি খেয়ে এমন একটা কাজ করবে, আমি খাওয়ার অজুহাতে সেটা মেনে নেবো? আমি খাই না? এরকম অসভ্য চিন্তা তো স্বপ্নেও আমার মাথায় আসে না। কাল সে এসেছিল। এই অজুহাতেই আমাকে ফুসলিয়ে বলে গেছে, সেদিন বেশি খেয়েছিলাম, মাথা ঠিক ছিল না, কাঞ্চনীকে বিদায় করে দিয়েছি। যারা সেসব মুহূর্তে এসব করে তারা এই খাওয়ার বিষয়টাকে ব্যবহার করে ক্রমশ স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে, মনে করে তখন যাই কুকর্ম করুক, সব মাফ হয়ে যাবে। ধর, আমি সন্তানদের কারণেই আপোস করে ওখানে আবার ফিরে গেলাম, তাতে কি হবে? সারাজীবনের জন্য ও আমার ভেতরের একটি জায়গা থেকে সরে গেল না? এখন ওকে সহ্য করার পীড়ন অহর্নিশি আমাকে সহ্য করতে হবে।

নিশি বলে, তোমার এখানে এসে আমার ভালোই হলো, বুকের ওপর থেকে একটা বড় চাপ সরে গেল। কিন্তু কথাটা বললেও পরক্ষণই ভেতরটা বিচ্ছিরি এক অনুভূতিতে ভরে ওঠে। সেদিন স্বাতী সম্পর্কে রেজা ভাইয়ের উচ্চারণ, ছেলে দুটোর ভীত-বিমর্ষ মুখ—এর পরও এর মধ্যেই ওরা হয়তো আবার সংসার করবে। জীবনের এই রূপ ভালো লাগে না। নিশি যেন নিজের সামনেই নগ্ন হয়ে উঠেছে। হঠাৎ এই অসহ্য বোধ তাকে সটান দাঁড় করায়, স্বাতী, অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখন আমাকে যেতেই হবে।

তোমাকে একটা জিনিস দিচ্ছি বলে স্বাতী ভেতরে যায়। এসে একটা প্যাকেট এগিয়ে দেয়, টাঙ্গাইল শাড়ি। কাল সারাদিন ঘুরে কিনেছি, বড় আন্তরিকতা আছে এর মধ্যে, তুমি আপত্তি করো না। কেনার পরই মনে হয়েছিল কী হবে এসব পরে? আজ মনে হচ্ছে তোমাকে খুব মানাবে।

সন্ধ্যার পর বাইরের ঘরে বৈঠক বসে।

আফজালের জীবন যাপন দায়িত্ববোধ নানা বিষয়ে তাঁর বাবা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেন। আফজাল বলে, আপনি এখানে চলে আসুন। আমি তো কতবারই বলেছি।

জানোই তো আসুম না। তাই এইডাই বার বার কও। তুমারে যদি গ্রামে গিয়া থাকতে বলি থাকতে পারবা? আমার স্বস্তিটা দেখবা না? এই কারণেই এইবার গাছে নারিকেল হইছিল অনেক, আনি নাই, ভাবছি কুত্তা-বিলাই খায়া যাক, তুমগোরে দিয়া আমার কী লাভ?

মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে আফজালের মুখ। নিশির সামনে বড় বিপন্ন দেখায় তাকে। আপনি মনে করেন আমার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও পাঠাই না? আপনি জমির ঘাপলার জন্য যখন যা চেয়েছেন কষ্ট করে দিয়েছি। অসুখে-বিসুখে কখন না খবর নিয়েছি? বুজানের চিকিৎসার খরচ, অক্সিজেন সিলিন্ডার আমি কিনে দিই নি? আমি আর কয় টাকা বেতন পাই?

আমার মেয়েরে তোমার দয়া না করলেও চলবো, আমারে আর ভিক্ষার চাউল পাঠায়ো না। বেতন কত পাও সেই হিসাব আমারে না দিলেও চলবো। তুমরা খাও রুই মাছ আর আমরা পুঁটি মাছের ঝোল, তুমার সাথে আমার পার্থক্য এইডাই।

সমস্ত ঘরে বিশাল অস্বস্তির ছায়া নেমে আসে।

রাতের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আফজাল নিশির সামনে একেবারে ভেঙে পড়ে, বিশ্বাস করো, এই পৃথিবীতে আমার কেউ নেই।

এক সপ্তাহ্ থাকার পর তারা চলে যায়।

হিরণকে সাথে নিয়ে বাড়িঘর পরিষ্কার করতে করতে নিশি হাঁপ ছেড়ে অনুভব করে মাঝেমধ্যে এরকম চাপ না আসলে মুক্ততার স্বাদটা বোঝা যায় না। মনে শুধু একটা খচখচি রয়ে গেছে, স্বাতীর দেয়া টাঙ্গাইল শাড়িটা জবাবদিহির ভয়ে বুজানকে দিয়ে দিতে হয়েছে। সে জানে, স্বাতীর নাম উচ্চারণেই আফজাল ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে, সেদিন স্বাতীর সাথে কথা বলার সময় ও সামনে থাকলে ভীষণ ভালো হতো। এখন স্বাতী যা বলেছে তার কণামাত্র উত্থাপন করলেই সে বলে উঠবে, হ্যাঁ, সে তো নিজের সাফাই গাইবেই। এছাড়া বাড়িতে অতিথি রেখে সে স্বাতীর কাছে গেছে, বিষয়টা আফজাল কিছুতেই সহজভাবে নেবে না। এমন টানাটানির সময় সে নিজের জন্য শাড়ি কিনেছে, এটাও খুব বিচ্ছিরি দেখাবে। অতসব চাপাচাপির দরকার নেই বাপু, নিশি তাই বলেছে, কলেজের এক বান্ধবী বিক্রি করেছে, বু'জানের জন্য নিয়ে এলাম। টাকা পরে দিলেও চলবে। আফজাল নিশির এই আন্তরিকতায় অভিভূত হয়েছে।

যাওয়ার আগের দিন রাতে অবশ্য শ্বশুরের ব্যবহারে নিশির মনের অনেক মেঘ সরে গেছে। সে খুব রূঢ়ভাবে শ্বশুরকে বলেছিল, বাবা, আপনি গতবার একটা অভিশাপ দিয়ে গিয়েছিলেন, আপনার কষ্ট যতদিন আপনার ছেলে না বুঝবে, ততদিন আমাদের সন্তান হবে না। আপনি বাবা হয়ে কিভাবে একথা বলতে পারলেন ? ওর শুধু অশান্তি হয়, আপনার ওই অভিশাপের কারণেই ওর কোনোদিন সন্তান হবে না।

শ্বশুরের চোখ জোড়া পানিতে ভরে উঠেছিল, এ কি আমি প্রাণ থাইক্যা কইছি ? আমি কি পিশাচ ? আমার বংশের বাত্তি, কত রাইত খোয়াবে দেহি, আমি দাদা হইছি, বুড়া হয়া গেছি, মাতা ঠিক থাকে না, কখন কি কই, তোমাগোর একটা সন্তানের লাইগ্যা আল্লাহর কাছে কতো মোনাজাত করি, আমারে তুমরা মাফ কইরা দিও।

বেশ কদিন পর নিশি নিজেকে নিয়ে ভাবতে বসে। আয়নার সামনে চক্রাকারে ঘোরে, চুল তো বুঝলাম, আমার আর কী সুন্দর ?

আয়নার অনেক কাছে নিয়ে যায় মুখ, ব্রণটা নতুন হয়েছে, নাকের কোনায় ছায়ার মতো একটা দাগ পড়েছে, চোখের পাপড়িগুলো মনে হচ্ছে আরো ঘন, আরো সমান্তরাল। কেউ নিজেকে বিশেষভাবে দেখতে গেলে সে যেন অচেনা অন্য একজন হয়ে ওঠে।

যখন সাজিদুল অপসৃত, যখন জাহিদের ভূতের আছর থেকে নিশি চাঙ্গা হতে চাইছে, নতুন একজন মানুষ, যাকে সে দাম্পত্য জীবনের সঙ্গী করেছে, মাপতে চাইছে তাকে, কতটা রাগ তার, কতটা অনুভূতিপ্রবণ সে, তার সার্বিক প্রবণতা কি— এইসব করতে করতেই

নিজেকে একদিন আবিষ্কার করল অপার শূন্যতায়। কাউকে সে ভালোবাসতে জানে না, তাই তাকেও কেউ ভালোবাসে না। সর্ব অস্তিত্বে স্রোতের মতো প্রবাহিত হওয়া রোমাঞ্চ নিয়ে সে উবু হয়ে বসে পড়েছিল মেঝের ওপর। মনে হচ্ছিল, মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। দরজা-জানলা, ভেন্টিলেটারের সব ফুটো বন্ধ করে জ্বালিয়েছিল মোমবাতি। ক্যাসেটে ছেড়ে দিয়েছিল সেতার। তারপর ফিনফিনে পোশাকে দাঁড়িয়েছিল আয়নার সামনে। নিশি সেদিন প্রথম জেনেছিল নেশা কি জিনিস। মনে হচ্ছিল সব তরঙ্গ সব ছায়া আশ্চর্য এক আলো হয়ে তার হাড়-মজ্জায় ঢুকে গিয়ে তাকে নেশাতুর, ক্লান্ত করে তুলছে। নিশি আয়নার মেয়েটিকে চেনে নি, এতো অপূর্ব, এমন অনির্বচনীয়! ঈর্ষায় কাঁপতে কাঁপতে শাদা ওড়নায় আবৃত করেছিল মাথা। নিশির খিদে বেড়েছিল, লেলিহান জিভ গ্রাস করতে চাইছিলো সব সুর, বিচ্ছুরিত ছায়া। ফ্যানের তীক্ষ্ণ ব্লেডের ধাক্কায় উড়ে গেল মাথার পর্দা, যেন কম্পাস ছাড়া, যেন দিগ্বিদিক এরকম টাল খেয়ে মেয়েটির একদম সামনে! কী তার চোখ! স্রোতের মতো চুল! কী তার দেহের আকর্ষণ! নিশি চোখ বুজে বিড় বিড় করেছিল, হে আমার সামনে দণ্ডায়মান মৃত আত্মা তুমি আমা হতে অপসারিত হও।

নিশির চোখে দাউ দাউ চিতা।

তখন দরজায় শব্দ হয়, নিশি... নি শি।

কী পাগল ছিলাম! নিশি হাসতে হাসতে সন্তর্পণ আঙুলে ব্রণটায় চাপ দেয়। সেসব ভূত জীবনের ধাক্কায় কবে কোথায় ছিটকে গেছে। সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ফালা ফালা বাস্তবতা।

বহুদিন পর যখন মমতাদির কাছে সাজিদুলের বেদনা-বৃত্তান্ত শুনে অস্ফুটে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, চুপ! চুপ! তখন তিনি বড় অদ্ভুত ভঙ্গিতে বলেছিলেন, কেন তুমি সেসব স্মৃতি থেকে পালাবার জন্য দরজা-জানলার সব ফুটো বন্ধ করছ ? তুমি সেই বদ্ধতায় আরো তীব্রভাবে নিজের মধ্যে সেসবকে জীবন্ত দেখতে পাবে। তার চেয়ে তোমার যা ছিল তোমার যা আছে সব নিয়েই খোলা রাস্তায় হাঁটো। নিজেকে ছেড়ে দাও বাতাসে, দেখবে, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ স্মৃতির প্রকৃত রূপ। অনুভব করতে পারবে কখনোই তা তোমার প্রাণঘাতী নয়।

হৃদয় কি মস্তিষ্কের শাসন মানে ? এ কথাটাই কাউকে বোঝানো হয়ে ওঠে নি। আমি এর তাড়নায় দৌড়ুতে দৌড়ুতে এতদূর! কাচ স্ফটিকের সামনে আমি আজ বিচ্ছুরিত, আমি আজ অচেনা। আমি এই দর্পণের সামনে দণ্ডায়মান নারী অনুভব করছি, পরিবেশ তৈরি করে মানুষের ব্যক্তিত্ব, কাজ করে নির্মাণ। আমার কিচ্ছু হয় নি। আজ এই যে মুখ দেখছি এ কেবল হাড়-মাংসের মিশেলে তৈরি এমন একটা আকৃতি, যা আরো চৌকশ হলে, আরো ধাঁধানো হলে নিজেকে অর্ধনগ্ন করে কেবল সুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার যোগ্য হতে পারে। কেটেছেঁটে যার একটি মাপই কেবল তৈরি করা যায়, এছাড়া আর কিচ্ছু না।

গতকাল রাতে এক আজব স্বপ্ন দেখেছি। জাহিদ বলে, দেখি এক ন্যাড়া মাথা মহিলা তার শিশুকন্যাকে বাতাসের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে।

আবদুল খালিকের চোখ গোল হয়ে ওঠে, কী তাজ্জব কতা, এই স্বপ্ন আপনে দেখছেন ? আল্লাহর কি কারিশমা, ন্যাড়া মাতা মহিলা, হ আমাগোর গায়ে একজন পাপিষ্ঠ মহিলার মাতা

ন্যাড়া করা অইছিলো। মহিলা শহরে গিয়া গর্ভে অবৈধ সন্তান নিছিলো, তারে অনেক মাইরধর করা হইছে। জিগ্যাস করা হইছে, প্যাটের সন্তানের বাপ ক্যাডা ক। হে কয়, হে জানে না, তা ভাই আপনের স্বপ্নের মধ্যে হে ঠিক কেমনে আইছে? আমি জানতে চাইতাছি আপনে কি হেই নারীরেই দেখছেন?

কথা হচ্ছিল দিঘির সিঁড়িতে বসে। আবদুল খালিকের সঙ্গে জাহিদের সম্পর্ক অনেক সহজ হয়ে এসেছে। যেন অসম দোস্তি। আসলে কেউ নিজের দুর্বলতা কাউকে বলে ফেললে, যাকে বলে, সে তার অনেকটা জায়গা কিনে ফেলে। বিষয়টা অনেকটা সে-রকমই দাঁড়িয়েছে। ঢিল ছুঁড়ে শ্যাওলার মধ্যে তরঙ্গ তোলে জাহিদ, দেখলাম একজন পরহেজগার লোক সেই মেয়েকে বাতাস থেকে তুলে নিয়ে বলছে, শিশুর আবার পাপ কী?

আপনি এই দেখলেন? কেমন কেঁপে ওঠে আবদুল খালিক, আহারে বাচ্চাটার উপরেও অনেক অত্যাচার অইছে। আপনে কি গেরামে আইস্যা এইরহম কুন ঘটনা হুনছেন?

না, জাহিদ সন্তর্পণে এগোয়, তা ঐ নারীর নাম কী ছিল?

এইসব নাম মুখে আনতেও ডর লাগে। ও শহরে গেলে মাতাল স্বামীডা আন্ধারের মইধ্যে গর্তে পইড়া মইরা যায়। হেরপরে এই গেরামের উত্তরের কোনায় যে খেজুর গাছটা দেখতাছেন, ওইহানের ছাপড়ায় একটা বাউল থাহে, ওর সব বিচারের পর আমরা ওই বাউলের লগেই ওরে বিয়া দেই।

জাহিদ স্তব্ধ বসে থাকে। বিষয়টা নিয়ে আর আগ্রহ প্রকাশ করে না। পাছে স্বপ্নটা নিয়ে আবদুল খালিকের সন্দেহ হয়। তাই সে মুহূর্তে প্রসঙ্গ ঘোরায়, ভাইসাব, মানুষের কাসুন্দি ঘেঁটে কী লাভ? এখন বলুন, আপনার বিবিকে শহরে নিয়ে যাচ্ছেন কবে?

অরে নিয়া গ্রাম থাইক্যা বাইর হওনডাই যে বিপজ্জনক অয়া গেছে। লোকে নানা কতা কইবো।

আপনাকে একটা বুদ্ধি দেই, জাহিদ একটু চিন্তা করে বলে, কয়েকটা মাস ধৈর্য ধারণ করেন, স্ত্রীর সাথে আপনি কখনোই পিতার মতন ব্যবহার করবেন না। তার জন্য বাজার থেকে পছন্দের জিনিস নিয়ে আসবেন। আর যেটা সবচেয়ে বেশি করবেন, তার রূপের তারিফ। কাজে-অকাজে তাকে কাছে ডাকবেন। তার চুল, চোখ, গায়ের রঙ সবকিছুর প্রশংসা করবেন। জানেন তো প্রশংসায় মাটির মূর্তিও ধড়ে প্রাণ ফিরে পায়। মন থেকে আপনার সম্পর্কে তার ভয়টা তাড়াতে হবে। কিছু মনে নেবেন না ভাই, আমি মানসিক ডাক্তারের মতোই বলছি। আপনি কিছুতেই এই কয় মাস তাকে স্পর্শ করবেন না। দেখবেন সে ধীরে ধীরে আপনার কাছে সহজ হয়ে উঠবে। এমনিতেও আরো দুয়েক বছর গেলে সে নিজ থেকেই সব বুঝতে পারবে।

কী সজ্জন! অভিভূত হয়ে তাকায় আবদুল খালিক, ভাবে, শিক্ষিত মানুষের পরামর্শই আলাদা। এই বুদ্ধিটা দেয়ার মতো এই গ্রামে তার কে আছে?

সে রাতে আসমান বিদীর্ণ করে শীত আসার আগের শেষ বৃষ্টিটা হয়ে যায়। বৃদ্ধা অসুস্থ। বিছানায় পড়ে সারারাত কঁকিয়েছে। চারপাশের শ্রুতি ধ্বনি ছাপিয়ে জাহিদের সিগ্রেটের ধোঁয়া শেষরাত অব্দি আঁধার ঘরে পাক খেয়েছে। বৃষ্টি আর বিদ্যুৎ-চমকের মায়ামৃগ খেলা, হেলে পড়তে পড়তে জাহিদ ভেবেছে, শৈশবে ফেলে আসা বাউলের গেরুয়া

পোশাকটির কথা। মনে পড়েছে, বোষ্টমিকে। পঞ্চতপে ছটফট করে উঠেছে, ওর ভোঁতা চামড়ার আস্তরগুলো সরতে শুরু করেছে তাহলে। এতো যে সর্বংসহা ছিলাম, সব নিজের ওপর চাপিয়ে দেয়া ভান। হীরার মুখটা মনে পড়ে, কী নিষ্পাপ সুন্দর, অথচ রহস্যময়। নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা তাকে এই বয়সেই অনেক সংহত করেছে।

চেয়ারম্যান বলেছেন, খোঁজ নিয়ে দেখেছি, কেসটা বেশ পুরনো। থানায় যেহেতু আগেই ডায়েরি হয় নি, তাই কোনো কাজ হবে না। ও গ্রামের কোনো ঘটনার সাথেই আমাদের তেমন যোগ নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে খবরই আসে না। নইলে আগেই ব্যবস্থা করা যেত। যা হোক আমার একজন দক্ষ গুপ্ত দূত আছে, কারা এটা করেছে, আমি বের করতে পারব আশা করি।

কোত্থেকে উড়ে আসা ভুতুড়ে জলের ঝাপটায় সারা মুখ ভিজে যায়। এরপর সব শান্ত। সব শুকিয়ে গেলে আবার ঝাপটা। প্রকৃতির এই লীলাপরায়ণতার মাঝখানে জাহিদের মধ্যে প্রবেশ করে অন্য এক ছায়া, আমাকে সেই লাঞ্ছিত নারীর মুখোমুখি হতে হবে, আমি তাকে বলব, বাবা যে টাকা দিয়েছিলেন, তার কিছু ভেঙে ফেলেছি, এ আমাকে বাঁচার জন্যই করতে হয়েছে।

বাঁচার জন্য ? শ্লেষসিক্ত স্বরে জাহিদ বলে, এন্তার ফুটানি দেখিয়েছ এ দিয়ে, বৃদ্ধা আর একটি সরল মেয়েকে ক্রমশ লোভী করে তুলেছ, এখন্ এদের হাত অন্ধ হয়ে গেছে। সেলাই করতে পর্যন্ত ভুলে যাচ্ছে।

বুকের বাঁ পাশটা ব্যথা করছে। মাথার ভেতরের কোষগুলো চুলের কূপ ফুঁড়ে যে-যার-মতো বাইরে বেরিয়ে পড়ছে। এরপর জাহিদ নিজের সামনে দাঁড়ায়। এই যে আমি চলছি, আমার উদ্দেশ্য কী ? হাতড়ে পায় না। আজ মনের ভেতরটা কোনো কারণ ছাড়াই হাহাকার করে উঠছে। সেদিন সে বড় নির্বিকারভাবে আবদুল খালিককে বলেছিল, আমরা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অসুস্থ হলে বিচলিত হয়ে তার চিকিৎসা করি। শরীরের একেকটা অংশ কি এমন জীবনের ভার বহন করে ? অথচ একটি মনকে দেহের তো বটেই, পৃথিবীর সব ভার বহন করতে হয়, ভারবাহী পশুর চেয়েও তার অবস্থা করুণ, এর বিচ্যুতি তো হবেই। আমরা মনের চিকিৎসা করি না, সামান্য বিচ্যুতির জন্য নিষ্ঠুর শাস্তি দিই। আজ সেই কথাগুলো সর্বগ্রাসী জখম হয়ে তার আত্মায় চেপে বসে। স্মৃতিভ্রষ্ট মানুষের মতো অন্ধকারে তার আঙুল সাঁতরায়, অকস্মাৎ মাকে মনে পড়ে। আমার মায়ের মুখের কোন্ জায়গাটায় কাটা দাগ ছিল ? হায়, চির বঞ্চিত রমণী! এরপর নিজেকে সে ঠেসে ঘুম পাড়ায়, আমরা ঘুমের মধ্য দিয়ে প্রতি রাতে মৃত্যুবরণ করি, এইভাবে আমাদের মধ্যে মৃত্যুর অভ্যাস গড়ে ওঠে।

শেষ রাতে বৃষ্টিটা ধরে এসেছিল।

সকালে আবার শুরু হয়।

জাহিদের ঘুম ভাঙে বৃদ্ধার আধ ভাঙা বিলাপে। চারদিকে মরণ অন্ধকার। গলায় মাফলার জড়িয়ে এর মধ্যে কাঁপতে কাঁপতে হীরা মেঝে অব্দি আক্রমণ-করা-জল ঠেলে ঠেলে বের করছে।

ছোট্ট মোথা ঝাঁটা দিয়েই সে বার বার দরজার তলা দিয়ে জল ঠেলে দিচ্ছে, মুহূর্তে বাতাসের ঝাপটায় সেই জল ফিরে আস্ত মেঝে ভাসিয়ে ফেলছে। এ-ছাড়া মেঝের মাঝখানে গর্ত থাকায় সেখানকার কাদার থকথকে জলে বেচারি নিজেই ভিজে একশা, এর মধ্যে তক্তপোশে শুয়ে বৃদ্ধার টানা আহাজারি তার মাথা গরম করে দেয়। ধলপহর থেকে বৃদ্ধার এক আকুতি, শিং মাছের সুরুয়া দিয়ে গরম ভাত খাবে। হীরা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে, ঘরে চালই নেই, তার আবার গরম-ঠাণ্ডা!

চাল নেই ? শহরের পোলাটার জন্য তো তলে তলে ঠিকই রেখেছিস, ঘরে টেবিল-চেয়ার কিনে দিয়েছে, তোকে ব্যারিস্টার বানাবে।

হীরা বলে, তারটা খেয়ে খেয়ে তো তোমারই জিব লম্বা হয়ে গেছে।

কেন ঝগড়া করছিস ? বৃদ্ধার গলায় ফের আপসের সুর, এক ফোঁটা গরম ভাত, খিদেয় আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। মরে গেলে তখন তো আফসোস করবি, এক বুক খিদে নিয়ে মরলাম।

হীরা জল ঠেলে ঠেলে হাঁপায়। জাহিদের অসহ্য লাগে। চেয়ারম্যানের ওখান থেকে আসার পর সন্দীপনের বৃত্তান্ত শুনে এদের কাছে ওর কদর হাজার গুণ বেড়ে গেছে। সে আসমান থেকে পড়া অলৌকিক কেউ নয়, এ ব্যাপারটাই তাদেরকে অনেক স্বস্তি দিয়েছে। সন্দীপন সব বলেছে, ওকে চেয়ারম্যান তার ওখানে গিয়ে থাকতে বলেছে, কিন্তু হীরা আর বৃদ্ধার মায়ার কারণেই জাহিদ পাশ কাটিয়ে এসেছে সব। যা হোক, এরপর আজ তার সম্পর্কে এ ধরনের উচ্চারণে জাহিদ খুব বিব্রত বোধ করে। তবুও সে এদের এখানে আর এক টাকাও খরচ করবে না, বৃদ্ধা ভাতের খিদেয় মরে গেলেও। তার কেবলই মনে হয়, বৃদ্ধার কাজের চিন্তা করতে হয় না বলে সে বিছানায় পড়েছে। অন্তত তার রোগের ধরন দেখে সেটাই মনে হয়। যে মহিলা একশো পাঁচ ডিগ্রি জ্বর নিয়ে রাতের পর রাত সেলাই করে সেগুলো প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাঠিয়েছে, সেই না জ্বর, না মাথা ব্যথা, না কোনো কঠিন যন্ত্রণা, পিঠ মট মট করে বলে শয্যা নিয়েছে।

এদের ব্যবহারও ক্রমশ পাল্টাচ্ছে। এরা ধরে নিয়েছে জাহিদ এই পরিবারেরই উপার্জনক্ষম কেউ। সকালে নির্বিকারভাবে তার হাতে বাজারের থলে তুলে দেয়, হীরার জন্য ছেলে খুঁজতে বলে। বৃদ্ধা এই পর্যন্ত স্বপ্ন দেখছে, ঘরের চেহারাটা এবার পাল্টানো দরকার। সন্দীপনের সাথেও এদের সম্পর্ক অদ্ভুত। হীরার প্রতি দুর্বলতা ছেলেটা ঢাকতে পারে না, যেন নাক-মুখে ফুটে ওঠে। কিন্তু তার পক্ষে কখনো এই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা হয়ে ওঠে না। মুদি দোকান থেকে ফ্রি ডালের প্যাকেট, চিনি, ময়দা, বিস্কুট নানা কিছু এনে সে এমনভাবে হীরার হাতে তুলে দেয়, যেন তার হাতে গোলাপ তুলে দিয়ে প্রেম নিবেদন করছে, হীরার মুখের রক্তাভাও এ ব্যাপারটাকেই প্রকট করে তোলে। হয়তো এ-ই এদের নিবেদনের ধরন। সব মেনে নেয়া যায় কিন্তু সেদিন জাহিদ বৃদ্ধার দেহের প্রশংসা করায় সে যেভাবে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে এ জাহিদের কাছে প্রাণান্তকর ঠেকে। সেই থেকে বৃদ্ধা কেবলই প্রলাপ বকে চলেছে, মড়ার সংসার ঠেলে ঠেলে জীবন কালি করে দিলাম, নিজের শরীরের দিকে তাকালাম না। এরপর কাঠের তোরঙ্গে হীরার জন্য তুলে রাখা শাড়ি গায়ের সামনে মেলে ধরে বলে, এ আমাকে মানায় না ? তুমিই বলো জাহিদ, আমার বয়সের মহিলারা এসব পরে না ?

অকস্মাৎ জাহিদের কানের পাটাতনে সারসার কাচ যেন ভেঙে পড়ে— ওই বারো ভাতারি মাগী, গরম ভাত কি তোর ভাতাররে খাওয়াবি ? কানে বাতাস যায় না ? ভারি বাতাস লেগেছে শরীরে, সাধে কি শয়তান গতর-খেকোগুলো তোকে চুষে গেছে ?

হীরার হাত থেকে ঝাঁটা খসে পড়ে, সে আর্তনাদ করে ওঠে প্রায়, মা ?

জাহিদ তিন লাফে বৃদ্ধার ঘরে গিয়ে দাঁড়ায়, এসব কী বলছেন ? পেটে দৈত্য ঢুকেছে আপনার ? তলে তলে আপনাদের এই চেহারা ?

বৃদ্ধা ফিস ফিস করে বলে, তুমি বুঝছ না, ও বদলে যাচ্ছে, আগে ছিল সন্দীপন, ওইটুকু পুঁচকে ছুরি কি-না করেছে ওর সঙ্গে! এখন তোমাকে দেখে সামনে আর কিছু দেখছে না। দেখ না সারাক্ষণ লিপিস্টিক, সারাক্ষণ কাজল—।

জাহিদ স্থির হয়ে যায়। চারপাশের কনকনে হাওয়া ওর রক্ত বরফ করে তোলে। সে এমন কাতরোক্তি করে, যেন ঝাপটা হত। এরপরও মাথা ঠাণ্ডা রেখে বলে, ও স্রেফ শিশু, কেন ওর সম্পর্কে এইসব ভাবছেন ? এই বৃষ্টিতে কোথাও যাওয়ার জো আছে যে, ও ভাত দেবে ?

লুকিয়ে রেখেছে চাল। আমি ঘুমিয়ে গেলে চুপ করে ফুটিয়ে খাবে।

পানির তোড়ে চুলো ভেসে গেছে, লাকড়িও ভেজা, জাহিদ তীক্ষ্ণ স্বরে উচ্চারণ করে, সে রাঁধবে কী করে ? আপনি উঠে দেখুন তো ওর অবস্থা। আপনারা যা শুরু করেছেন, কালই আমাকে অন্য পথ দেখতে হবে।

পাটশোলার মতো আঙুল দিয়ে জাহিদের হাত খামচে ধরে বৃদ্ধা বলে, তুমি এই আখের ছোবড়ার কথা এত যদি ধর, তাহলে চলবে কী করে ? তুমি নিজের ভাই হলে কী করতে ? আমি যখন তোমার মুখ দেখে এ বাড়িতে ঢোকালাম সাত-পাঁচ হিসেব করেছি ? তোমার মতের বাইরে কখনো জানতে চেয়েছি তুমি কে ? কী তোমার বৃত্তান্ত ?

বৃদ্ধা ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে ভেতরে যায়, সব শয়তানের কাজ, নইলে এই ভরা হেমন্তে এমন মরা বৃষ্টি হয় ? এই গ্রামে একদিন ঠিক পশ্চিমে সূর্য উঠবে। এরপর সে শূন্যের উদ্দেশ্যেই যেন বলে, ওই শুয়োরের বাচ্চাগুলো আমাকে আটাদলা করে, আমার হাড়-মাংস গিলে তবে শান্ত হবে।

বৃষ্টি থেমে গেলে ঝকঝকে গ্রামের জল ভেঙে জাহিদ এগোয়। ভাগ্যিস বেশিরভাগ ফসলই কাটা হয়ে গেছে। যেসব ধান কাটা হয় নি সেখানে গলাঅব্দি জলে ডুবে আছে সতেজ শস্যগুলো। জলের ভেতর থেকে অজানা সুবাস উঠছে। ঝড়ের দাপট বেশি না হওয়ায় তেমন ভাঙচুর হয় নি, তবে সন্দীপনের ঘরের খুঁটি ছাপিয়ে মেঝে অব্দি ডুবে গেছে।

বড় রাস্তা থেকে বিসর্পিল আলগুলো পেরিয়ে জাহিদ অনন্ত হাঁটা দেয় সুদূর মরূদ্যানের দিকে। মনে হয়, এত কাছে, তবু এ যেন অনেকটা চাঁদের মতন, যত এগোয়, ততই সে দূরে দূরে সরে যায়। এমনি করে একসময় সে এসে দাঁড়ায় খেজুর গাছের পার্শ্ববর্তী পর্ণ কুটিরটার সামনে। উত্তেজনায় ঘেমে ওঠে জাহিদ, ভেতর থেকে বাউলের দোতরার শব্দ আসছে।

এই সাধারণ পর্ণ কুটিরটাই হয়ে ওঠে তার জীবনে দেখা সেরা রহস্য। সে এটা স্পর্শ করতে, উন্মোচন করতে, এর সামনে নিঃশ্বাস টানতেও ভয়ে জমে যায়। একে তো সকালের

খিদে, সত্যিই চুলোয় হাঁড়ি চড়ে নি। হীরার মুখটাকে দেখাচ্ছিল শাদা হাড়ের চেয়েও ফ্যাকাসে, মনে হচ্ছিল, ওর আর কিচ্ছু অবশিষ্ট নেই। সেই মুখখানাই নিচে ঠেসে সে একথালা পান্তা নিয়ে এসেছিল।

যাবতীয় খাদ্যের প্রতি জাহিদের আগ্রহ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বৃষ্টি থামলে সে নিঃশব্দে খিদে-জ্বলা পেটে পথে নেমে এসেছে। বাবার কাছ থেকে সেই কাহিনী শুনে পথঘাট পেরিয়ে অযাচিতভাবে একটা বাড়িতে এসে ওঠার পর, সেখানে নির্বিকার দিনাতিপাত করার পরও তার মধ্যে এ বিষয়টাকে কেন্দ্র করে তেমন কৌতূহল বা উত্তেজনা ছিল না। তার মনে হচ্ছিল এক জায়গায় কিছু অর্থ পৌছে দেয়া তার দায়িত্ব, এটা যে-কোনো সময় সম্পন্ন করতে পারলেই হয়ে যাবে। হীরাদের বাড়িতে এমন স্বতঃস্ফূর্ত আশ্রয় না মিললে পরদিনই হয়তো সে সেই নারীর খোঁজে তৎপর হয়ে উঠত এবং তা ঘটত নিছক দায়িত্ববোধ থেকেই। বাউলের এই বাড়ির সামনে দাঁড়াতেই তার চেতনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে একজন রক্ত-মাংসময় নারী, যাকে কেন্দ্র করে তার মৃত পিতার জীবন-মৃত্যু এক সমান্তরালে গেঁথে গিয়েছিলো। তার একটি নিজস্ব গড়ন আছে, চেহারায় হাজার রকম ভাঁজ আছে। আর অজানা একটি শিশু সন্তান, যে তারই পিতার আত্মজা, না, আবদুল খালিকের অসম্পূর্ণ বক্তব্যেও তার মধ্যে তীব্র কোনো প্রতিক্রিয়া হয় নি। কিন্তু এখন, সেই মানুষের মুখোমুখি হতে হবে ভেবে সে কেমন বিহ্বল বোধ করে। কেমন যেন জ্বর এসে যাচ্ছে গায়ে। আর ওই যে দোতরা বাজাচ্ছে গেরুয়া বাউল, যার ধ্বনি বৃক্ষে, বাতাসে, রৌদ্রে অদ্ভুত এক বিষাদ ছড়াচ্ছে, অথবা আনন্দই, তার সামনে তারই স্ত্রীকে কেন্দ্র করে পুরনো একটা বিষয় নিয়ে দাঁড়াতে জাহিদের তুমুল অস্বস্তি শুরু হয়। সে ভাবে, তার চেয়ে ফিরে যাই।

জাহিদের এই অনুভূতির ওপর দপ করে নিভে যায় সূর্য। যেন সশব্দে ঝরতে থাকে শিশির, দাঁত কাঁপুনি লাগিয়ে ছুট লাগাতে শুরু করে হাওয়া। প্রকৃতির এই লীলাপরায়ণতায় জব্দ জাহিদ ছিটকে কুটিরের ভেতরে প্রবেশ করে।

মাটিতে বিছানো কম্বল, তার ওপর বালিশ আর দু'পায়ের ভাঁজে বালিশ চেপে দোতরায় মগ্ন বাউল। অকস্মাৎ জাহিদের চৈতন্যে শিস দেয় কেউ, ক্যাডা?

ঘরে আর কেউ নেই।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচে জাহিদ। বলে, অনেক দূর থেকে এসেছি। আপনার দোতরা শুনে কী করে যে এখানে এসে দাঁড়িয়েছি, বলতে পারব না। না, বাউলের পরনে গেরুয়া কাপড় নেই, স্রেফ পাঞ্জাবি-লুঙ্গি, দাড়িও বেজায় হাল্কা, তবে হাসি বড় মনোরম, বলে, বুঝছি, আপনি ভাবের জগতেরই মানুষ। এই যুগে এমন মানুষের দেহা পাওয়া দুষ্কর। জাহিদ সহজ আলাপচারিতায় এগোতে চায়, এইরকম নির্জনে একা থাকেন?

একাই! এই দুনিয়ায় কোন্ মানুষটা একাধিক?

তা-ও ঠিক বলেছেন, জাহিদ ভেজা চুলে হাত ঘষে, এরপর আর এগোতে পারে না। বাউল বেড়ার মধ্যে গুঁজে থাকা গামছা ছুঁড়ে দিয়ে বলে, মাথাডা মুইছা এইহানেই বসেন, আপনি ভদ্দলোক মানুষ, আপনেরে আসন দেওয়ার মতন অবস্থা আমার নাই।

জাহিদ কম্বলের ওপর গুটিসুটি বসতেই টের পায় খড়ের চাল চুইয়ে পড়া টপটপ জলে তার মাথা ভিজে যাচ্ছে।

বাউল হেসে বলে, আল্লার পাঠানো শরবত।

এরপর সে দোতরায় টুং টুং ধ্বনি তুলে প্রশ্ন করে, অতিথি মনে হইতাছে শহরে বাস করেন ?

মাথা বাঁচাতে জাহিদ সিকার নিচে আশ্রয় নেয়, বাতাসে তার ওপরে ঝুলন্ত সানকিটাও ঘুরছে।

জাহিদ বলে, আমি ভাই পিঁপড়ে, আমার কাছে গ্রাম-শহর-দেশ-পৃথিবী সবই সমান, যেখানে মাটি আছে, সেখানেই আমার বাস।

এই কথায় বাউল যেন দ্রুত জাহিদের সাথে একাত্মবোধ করে। সে দোতারাটা পাশে রেখে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে, আপনি পিঁপড়া হয়া বাঁইচ্যা গেছেন, আমার জাত আবার পিপীলিকার, সামান্য আলো দেখলেই ঝাঁপ দেই। এমনই বোকা আমি, সূর্যের আলো দেখলেই ফাল দিয়া পড়ি। পরানডা শক্ত থাকায় এই কইরা কইরা আমার ডানা দুইডা খইসা গেছে, চোখ আন্ধা হয়া গেছে, আমি ল্যাংড়া হয়া গেছি, গলায় সুর আর পরানের ভিতরে দোতরা বাজানির লাইগ্যা কয়ডা আঙুল থাকায় এহনও বাঁইচা আছি।

সুন্দর কথা জানেন আপনি, জাহিদ অকৃত্রিম তারিফ করে, সুন্দর আপনার অনুভব, তা গায়েন, সবই কি আগুন ছিল, সেই আলোর এক কণার মধ্য দিয়েও কি আপনি জীবনের স্পষ্ট রূপ দেখেন নি ?

আপনার কতার লগি ধরতে পারলাম না ভাই।

আমি বলছি সেই আগুনে নারী, তার প্রেম, এসবের কিছুমাত্তর দেখা পান নি ?

নারী কি জীবনের পষ্ট রূপ ? এইডা কি বলতাছেন আপনি ? কোনো পুরুষ যদি আগুনে ঝাঁপ দিয়া আন্ধা হইয়া যায়, বিকলাঙ্গ হইয়া যায়, জানবেন সেই আগুন নিশ্চিত নারীর আগুন, দুনিয়ার সব যুদ্ধে জয়ী হওয়া বীরও সেই আগুনে ধ্বংস হয়া যায়, দুনিয়ার আর কোনো সংগ্রাম আছে যার লগে পুরুষ লড়তে পারে না ? কিন্তুক এ বড় বেকায়দার জায়গা, এর মইধ্যে ঠিক মতোন পড়লে জীবনের ষোলআনাই চইলা যায় এর মূল সূত্র ধরতে ধরতে—।

তাহলে আজীবন একাই আছেন ?

আপনি তাইলে আমার সম্পর্কে কিছুই জানেন না ? এই গেরামের বাতাস, মাটি, ঘাস, এমন কি পোকামাকড় এরাও জানে আমার বিত্তান্ত। বলে বাউল বিষণ্ন মুখে হাসে, আমার দোর পর্যন্ত আইসা পৌঁছাইছেন, আপনেরে বাতাসও কিছু বলে নাই ?

আপনি একা নির্জন গ্রামের একটা কোনায় পড়ে আছেন, সারাগ্রাম অস্থির হয়ে আছে অজানা অজগরের ভয়ে, আপনি যা ভাবছেন, সবাই আপনার বিষয় নিয়ে প্রশংসা কিংবা নিন্দায় লিপ্ত, তা মোটেও নয়, আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপনার বাড়ির পথে হেঁটে এসেছি, আসার পর কেউ আপনার সম্পর্কে আমাকে কিছু বলেইনি।

বাউল চুপ হয়ে বসে থাকে।

আশ্চর্য ব্যাপার, আপনি কি মাসভর এই কোনাটাতেই পড়ে থাকেন ? খাদ্যের জন্য আপনাকে গ্রামাঞ্চলে বেরোতে হয় না ?

বাউল হাসে, খাদ্য! এই যে টপটপ পানি পড়তাছে, গলা শুকায়া গেলে আমি তার নিচেই হাঁ কইরা থাহি, ওই যে সবুজ ঘাস দেখতাছেন, ওইসব লতাপাতা সিদ্ধ কইরা খাই। সারাদিনে যে-কোনোকিছু একবার খাইলেই অয়, বুঝলেন আমার এই স্বভাবে অতিষ্ঠ হয়া আমার পরিবার আমারে ফালায়া চইল্যা গেছে।

জাহিদের হৃৎকম্পন বন্ধ হয়ে আসে। চারপাশে বৃষ্টির তোড় থেমে এসেছে। সামনের ধান খেতের জল সশব্দে কাঁপিয়ে সারসার বক উড়ে যায়। তাদের আন্দোলিত ডানার বাতাস জাহিদের চামড়া কাঁপিয়ে দেয়, সে সন্তর্পণে এগোয়, কোথায় গেছে?

এই বিরাট পৃথিবীর কোন্ স্থানে সে গেছে, তা জানা কি আমার সাধ্য? এরপর জাহিদ চাগিয়ে ওঠা কৌতূহল থেকেই আর ভণিতা রাখে না। প্রশ্ন করে, আপনার কোনো সন্তান ছিল না?

বাউলের মুখে ছায়া জমে। এরপর সে দোতরা টেনে এক দুইটা টোকা দেয়ার চেষ্টা করে, জমে ওঠে না। তার মুখ মুহূর্তে এমন হয়ে ওঠে, যেন সাপের দংশনে নীল, পোড়াটে।

গায়েন, আমি কি অজান্তে আপনাকে কোনো কষ্ট দিয়েছি?

বাউল হাসে, যে আন্ধা, যে পক্ষীর ডানা নাই, তার কাছে কষ্টই হইল গিয়া স্বপ্নের কুহক। জি, আমার একটা কন্যা আছিল। আমি জীবনের মায়া কি চিনতাম না। হেই কন্যার হাসি, আধো বোল, তার কান্না, তার দুইডা হাত, কী মায়ায় যে আমারে জড়াইছিলো, আমার জীবনের ওই আগুনই আমারে চির পঙ্গু কইরা গেছে। অসুস্থ শিশু কন্যারে নিয়া আমার স্ত্রী চইলা যাওনের কিছুদিন পরেই খবর পাই, কন্যা মারা গেছে।

জাহিদের বুকের ওপর চেপে বসে বহুতল জাঁতা, তার ঘূর্ণন থেকে বোরোনো ধুলোকুয়াশায় তার চোখ আঁধার হয়ে আসে। সে দেখে, ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ছে বাবার দেহ, পা, ডানাহীন একটি বিন্দু হয়ে ওঠা মানুষের পাপ বোধের সীমাহীন যন্ত্রণা, সে দেখে মাকে, যার সারাটা জীবনের যোগফল অপার শূন্যতা, সে লম্বা করে শ্বাস টানে, গায়েন, জীবন কি তাহলে এই? খেয়ালি সৃষ্টিকর্তা এইসব দেখার জন্য মানুষকে এত যত্নে সৃষ্টি করেছেন?

বাউল অদ্ভুত শ্লেষ-মেশানো হাসি হেসে জাহিদকে চমকে দিয়ে বলে, সৃষ্টিকর্তা! না, আমারে তিনি সৃষ্টি করেন নাই। আমি তার অস্তিত্বে বিশ্বাসও করি না। বৃক্ষ লতার মতনই আমারে সৃষ্টি করছি আমি, হৃৎপিণ্ডের বিষ খায়া আমি নিজেরে তৈরি করছি, হের পরে একদিন এই মাটির তলায়ই বিলীন হয়া যাইমু।

এর মধ্যে কয়েকদিন জাহিদ চেয়ারম্যানের ওখানে গিয়েছে, নানাভাবে যমজ ছায়াদের বিষয়ে জানতে চেয়েছে, প্রথম ক'দিন তিনি এ বিষয়ে 'এই তো অনেক দূর এগিয়েছি, শুনেছি তারা অন্য গ্রামের যুবক', এইসব আশার কথাবার্তা বলে, শেষদিকে থিতিয়ে এসেছেন, তুমি শহরের ছেলে, কারা এইসব করেছে, জেনেই-বা তুমি কি করতে পারবে?

আপনি করবেন, এ দায়িত্ব তো আপনারই।

দেখো, এটা পুরনা কাসুন্দি— না আইন, না মজলিস— কিছু দিয়ে এর সুরাহা করা যাবে না, এইসব যারা করে, এদের চক্র বড়ো শক্ত, আমার মতো একজন চেয়ারম্যান তাদের কাছে নস্যি। তারা না চাইলে আমার পক্ষে চেয়ারম্যান হওয়াও সম্ভব নয়।

তার মানে আপনি জানেন, কারা এইসব করেছে?

তোমার বাবার এমন একটা মৃত্যু, ঠিকমতো কবরে ঘাস পর্যন্ত গজায় নি, তাকে বাদ দিয়ে তুমি কার-না-কার ভেজাল নিয়ে ক্ষেপে উঠেছ। তোমাদের মতো আধুনিক ছেলেদের আমি বুঝি না।

আমি সব বাদ দিয়ে বসে থাকলেই তো বাবা বেঁচে উঠতেন না। একজন কিশোরী, আপনি আন্দাজ করতে পারেন, তার সারাটা জীবন কেমন তছনছ হয়ে গেছে? আপনারা এই বয়সে পৌঁছেও কেন যে এমন একটি মেয়েকে নিজের মেয়ে ভাবতে পারেন না?

চেয়ারম্যান স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলেন, তোমার উদ্বেগের তারিফ করছি, তোমার মতন বয়সেই এইসব নিয়ে এ-রকমভাবে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা যায়, কোনোকিছু চিন্তা না করে ঝাঁপিয়ে পড়া যায়। কিন্তু আমি যেখানে বসে আছি, এ জায়গায় বসে এত সহজেই কোনো কিছু নিয়ে উত্তেজিত হওয়া যায় না, তুমি কাল আসো। কারা এসব করেছে সেটা জেনেই তো তোমার শান্তি? আমি সেটা জানার ব্যবস্থা করব। কিন্তু যে মামলা থানায় ওঠে নি, এ নিয়ে কোনো অ্যাকশান নেয়ার কথা আমাকে কিন্তু বলবে না।

রাতের তক্তপোশে জাহিদের দেহ খটমট করে ওঠে। আপাতত নামগুলো চাই, দিনের আলোয় শুধু সেই চেহারাগুলো একবার দেখব। যদি তারা সত্যিই মানুষ হয়, জীবন সম্পর্কে তা হলে নতুন করে চিন্তা করা যাবে। মাঝে এক সন্ধ্যায় সামনে শীত খড়ের ধোঁয়া লাফিয়ে উঠছিল, চেয়ারম্যান জাহিদের চোখের সামনে মেলে ধরেছিলেন এক অজানা জগৎ।

বাবার গল্প করেছিলেন।

ম্যালা কথা।

কলেজে পড়ার সময় বাবা টিউশনি করে একটি অন্ধ ছেলের চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, সেই ছেলেটি বাবাকে নিজের পিতা হিসবেই জানত। এই নিয়ে কলেজে কত হাসাহাসি, সবাই বলত ছেলের জন্য একটা মায়ের ব্যবস্থা কর না।

বাবার ছিল বেজায় ছবি দেখার শখ। বাবার তোশকের তলায় বইপত্রের মাঝে থাকতো মীনা কুমারীর ছবি। দাদা যাতে বুঝতে না পারেন সেজন্য কোল বালিশে কাপড় ঢেকে চলে যেতেন সেকেন্ড শো ছবি দেখতে, মধ্যরাতে দেয়াল টপকে সন্তর্পণে নিজের ঘরে এসে ঢুকতেন, সিনেমার নেশার কারণেই পড়শোনার ক্রমেই অবনতি হচ্ছিল, তারপরও মেডিক্যালে ভর্তি পরীক্ষায় চান্স পেয়ে বাড়ি থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিলেন। পাক্কা একমাস পরে ফিরে এসে আর বাড়ি যান নি।

চেয়ারম্যান বলেন, আমার ওখানে গিয়ে উঠেছিল, বলেছিল, এই পৃথিবীতে ডাক্তার হয়ে দম-দেয়া রুটিনের জীবনে মুখ গুঁজে থাকার জন্য আমার জন্ম হয় নি, আমি বিরাট বিরাট কিছু হাত চাই, আমার মধ্যে সে জিনিস আছে।

তোমার বাবা সিনেমার নায়ক হতে চেয়েছিল, বলল, কোলকাতায় সব ব্যবস্থা করে এসেছি, ওখানেই থাকব। এরপর প্রায়ই সে কোলকাতায় যেত। শেষমেশ এই করেই পড়াশোনা লাটে উঠল। বেশ ক'বছর পর আমার সাথে আবার তার দেখা হলো। কী বিধ্বস্ত তার চেহারা। আমি প্রথমে চিনতেই পারি নি। আমাকে বলল, জানি না আমার কি হবে!

জানিস কিছু পথ খুঁজে পাচ্ছি না। আমি একদিন পর খবর পাই মীনা কুমারীর জন্য সে উন্মাদপ্রায় হয়ে ঘুমের ট্যাবলেট খেয়েছে।

আমি হাসপাতালে তাকে দেখতে যাই।

দেখি বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। আমাকে ফিসফিস করে বলল, ছবির মীনা কুমারী না তবে ভাবতে পারবি না হুবহু এক মুখ। এতদিনে আমি হয়তো একটা স্থিরতা খুঁজে পেলাম। মেয়েটার মাথার ওপর কেউ নেই। এক বড় ভাই, সেও ভীষণ অত্যাচার করে। আমার সাথে সম্পর্ক হওয়ার পর সেই মেয়ে মুসলমান হয়েছে। আমি তাকে কথা দিয়ে এসেছি এখান থেকে বাবাকে নিয়ে গিয়েই তাকে বিয়ে করবো। বাড়ি গিয়ে তোমার দাদার সাথে সেকী যুদ্ধ! শেষে এই ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে সে তোমার দাদার সম্মতি আদায় করে। তোমার বাবার সেই আশ্চর্য উজ্জ্বল সুখী মুখের কথা আমি জীবনে ভুলব না।

শেষে তোমার দাদা বিট্রে করলেন, মৃত্যুর সময় তার বুকে হাত রেখে ওয়াদা করালেন তোমার বাবাকে, যেন তাঁর পছন্দ করে রাখা মেয়েকেই তিনি বিয়ে করেন।

আমিও বুঝেছিলাম, সে জীবনে স্থিরতা খুঁজে পেয়েছিল, তোমার দাদার সেই আঘাতই তার স্থিরতার মূল মেরুদণ্ডটি ভেঙে দেয়। আমি জানি না তোমার মাকে নিয়ে সে সুখী হয়েছিলো কী না। যখনই দেখা হয়েছে, সংসার বিষয়ে তেমন কিছু বলত না। আমাদের গ্রামে এসেও পকেটে যা পয়সা থাকত, গ্রামের মানুষদের বিলিয়ে দিয়ে যেত। এ ছিল তার এক বিরাট আনন্দ, বলত, অনেক বড় হওয়ার কথা ছিল, যদি হতাম এসবই অন্যরকমভাবে করতে পারতাম। ভাগ্যের কী অদ্ভুত ঠাট্টা, হয়ে গেলাম কেরানি।

আমি ভয়ে তার সাথে কোলকাতার সেই মেয়ের প্রসঙ্গ তুলতাম না। কিন্তু একদিন সে-ই তুলল। বলল, আমি পাপিষ্ঠ, বেঈমান, এই জন্যই অন্ধের মতো চিরকাল আমাকে শুধু সুখ হাতড়ে বেড়াতে হবে, সুখ আমার কোনো জন্মেও হবে না।

সবচেয়ে বেশি বলত তোমার কথা।

জাহিদের শূন্য পতন হয়েছিল, আমাকে বাবা কোনোদিন চেয়েও দেখেন নি। আমার কথা বলতেন?

তোমার সব তিনি জানতেন, বলত, ও পড়াশোনায় ভালো হবে না। ওর আশ্চর্য দুটো চোখ আছে। সেই চোখে আস্ত পৃথিবীটা দেখা যায়, ভয়ে-আনন্দে আমি ওর দিকে তাকাই না, আমার অক্ষমতার ওপর পা রেখেই ও একদিন বিশাল হয়ে দাঁড়াবে।

জাহিদের কেমন চোখ ভিজে ওঠে।

প্রচণ্ড তৃষ্ণা পায়। অন্ধকার হাতড়ে মাঝের ঘরে এসে দেখে, পড়ার টেবিলের ওপর মাথা রেখে শুয়ে আছে হীরা।

তুমি ঘুমোও নি?

হীরা সটান মাথা তুলে সলতে বাড়িয়ে দেয়। পশ্চাৎপটে তৈরি হয় বিচিত্র কারুকাজ, এর মধ্যে হঠাৎই হীরা যেন শিশুর খোলস ভেঙে পূর্ণ নারীতে রূপান্তরিত হয়ে তার সামনে দাঁড়িয়েছে।

জাহিদ বলে, তোমার স্কুলে গিয়েছিলাম, মাস্টারদের কাছে তোমার অবস্থা বুঝিয়ে বলেছি। হেডমাস্টার বলেছেন, অ্যাসেম্বলিতে সব ছাত্রছাত্রীকে তোমার প্রতি সহানুভূতিশীল হতে বলবেন।

হীরার মুখ গম্ভীর এবং আশ্চর্য পরিণত, বলে, এতসব পেয়ে আমার কী হবে ? মার চোখে আমি বিষ হয়ে গেছি।

আচ্ছা, ব্যাপারটা কী তুমি বলো তো ? আমার কিন্তু তাকে সব মিলিয়ে খুব সুন্দর মনে হতো, হঠাৎ এমন বদলে গেলেন যে ?

আপনার টাকা, তাই দেখেই তার মাথা ঘুরে গেছে।

সে আর এমন কী! মাত্র কয়েকটা টাকাই তো খরচ করেছি।

মা মনে করেন আপনার টাকার খনি আছে, তাছাড়া...।

তাছাড়া কী ?

আমি সেটা বলতে পারব না।

তোমাকে দিয়ে আমাকে সন্দেহ করেন ?

না, তাও না, আপনার মধ্যে কেমন যেন একটা জাদু আছে, হীরা টেবিলে মাথা রেখে কেঁদে ওঠে। দোহাই আপনি আমার মায়ের ফাঁদে পড়বেন না। ওপরে শাদাসিধে, ভেতরে সে ভয়ঙ্কর, আমার বাবাকে সে গিলে খেয়েছে।

সারাপথ কেমন একটা আচ্ছন্নতার মধ্যে কাটে, ভেতর থেকে তাগিদ উঠছে, পালাও জাহিদ, পালাও, বাঁশ ঝাড়ের তলা মাড়িয়ে, লোলিত বাতাসের গন্ধ নাকে লটকে বিস্তৃত খেত পার হয়ে যে বাড়িতে গিয়ে ওঠে, সে বাড়ির বৃদ্ধ কৃতজ্ঞতায় অবনত হয়।

আপনে আমার মাইয়ারে বাছাইছেন।

গাভীর ওলানের তলা থেকে বেরিয়ে আসে মেয়ে, মাংস থেকে অনেক আলো খসে পড়েছে, কিন্তু লাবণ্য হারায় নি।

হাসপাতাল থেকে কবে ছাড়া পেয়েছে ?

তীব্র সংকোচে মেয়েটি মাথা তোলে না, তার বাবা বলে, হাসপাতালে গেছে বইল্যা মসজিদের ইমাম কত ফতোয়া দিল। এই বাড়িত কেউ আর আহে না।

আবদুল খালিক কী বলেছে ?

হেই জানি কেমুন অয়া গেছে, আগের তেজ নাই, মজলিসে বইয়া মাতা লাড়াইলো, আফনেরা যা ভালা বুঝেন।

এই মেয়েটিকে দেখলে জাহিদের মধ্যে রোজলিনের ছায়া প্রলম্বিত হয়। কোথায় যেন একটা খোঁচা লাগে। সেদিন অজ্ঞান অবস্থাতেও কোথায় যেন একটা মিল খুঁজে পেয়েছিল, ভেতরে অজান্তেই জেগেছিল কম্পন। নিজের এমন অবস্থার সাথে জাহিদ দীর্ঘদিন পরিচিত না, মেয়েটির শরীর বড় অদ্ভুত। কেমন ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলার স্পৃহা জাগে। তোমার নাম লায়লা না ?

আপনের মনে আছে ? সারল্যে ভরে ওঠে ওর মুখ। না এই সরলতার সাথে আগের নত মুখ মেলে না, এই যে একটু হেসেছে এর সাথে না রোজলিন, না অন্যকিছুর সঙ্গে মেলে না। তাহলে কি আমি কতক্ষণ আগে অচেনা এক জন্তু দ্বারা তাড়িত হয়েছিলাম ?

ওর একটা বিশেষ ভঙ্গি যেটা অজ্ঞান অবস্থাতেও ছিল, তার প্রতিই ছিল আমার তীব্র আকর্ষণ, আর সেইখানটার সাথেই রোজলিনের একটা গভীর মিল ছিল। একগাদা আণ্ডাবাচ্চা দাঁড়িয়েছে পেছনে। সব ক'টার হাড্ডিসার, চিমসানো শরীর। একটার চোখ ঠিকরে বেরোচ্ছে। তার কান্না ঠোঁটের ভাঁজে গোঙাতে থাকে, কয়দিন যাবৎ হাগতে হাগতে...

খাবার স্যালাইন দেন নি ?

ওইসব এই গেরামে চলে না। তাবিজ পড়া পানি দিছি।

আপনাদের আর চিন্তা কী ? মানুষকে নিয়েই তো ভাবনা। তারাই যখন আসা বন্ধ করে দিয়েছে, এক মগ টিউবওয়েলের পানির ব্যবস্থা করুন, বাকিটা আমি দেখছি।

বিস্মিত হয়ে ওঠে লায়লার মুখ, জাহিদের অদ্ভুত চাউনিতে পরক্ষণেই তা রক্তাভ হয়ে ওঠে।

ওর আশ্চর্য দুটো চোখ আছে— ঘরে ফিরে ছায়ার মধ্যে নিজের সম্পর্কে এই শব্দগুলোই জেগে ওঠে। অনেকেই বলেছে, তবে বাবার বলা জাহিদকে রোমাঞ্চিত করে। মনে হয় কেউ কোনোদিন বলে নি, আর সবার বলার মধ্যে মিথ্যে ছিল, বাবার সেই মীনাকুমারী, আজীবন মাকে সহ্য করে যাওয়া, মার অসহায়ত্ব। আরো একজন নারীকে কেন্দ্র করে ট্রেন থেকে বাবার অতৃপ্ত আত্মার ঝাঁপিয়ে পড়া, সব কেমন অসহায় করে তোলে জাহিদকে। এরপর যমজ ছায়া, যে মেয়ে নিজেই তার জ্বালা ভুলে গেছে, তার পেছনে ছুটে কী লাভ ? এরচেয়ে বড় বাবার স্বপ্ন, আমার অক্ষমতার ওপর একদিন সে— এ বাবার নিজেকে ভোলানোর খেলা। এই বিশাল শব্দ দিয়ে বাবা নিজের অতৃপ্তি ঢাকতে চেয়েছেন। আসলে তিনিও ভালো করে জানতেন জাহিদের দৌড়ের সীমাবদ্ধতা। সে দৌড়ে যা ধরতে চায়, নাগালের কাছাকাছি গিয়ে তার হাঁটার স্পৃহা ফুরিয়ে যায়। একাগ্রতা, স্পৃহা এইসব ছাড়া বিশাল বিষয়কে আয়ত্ত করা ? কী যে বাবার বিবেচনা! বহু জায়গায় ঘুরেছেন, কম্বল জড়িয়ে স্টেশনে সমুদ্রের পাড়ে ঘুমিয়ে থেকেছেন, মানুষের নানা রূপ দেখেছেন কিন্তু সন্তানের ব্যাপারে ঠিকই আর সব পিতার মতনই অন্ধ। তবে তাঁর দারুণ উদাসীনতার মধ্যেও জাহিদকে তিনি লক্ষ্য করেছেন, বহুদিন পর বাবার সামনে সে সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। সে এই লোকটিকে আর চিনতে পারে না। তার ভেতরে কান্না ঠেলে ওঠে।

এসবের মধ্যেই বৃদ্ধাকে জাগাতে চায়, কতদিন সুতোর কাজ করেন না। এইভাবে শিল্পীসত্তা বেঁচে থাকে ?

বৃদ্ধা হতাশ কণ্ঠে বলে, আগে তো জীবন, হিসেব করে দেখেছি, নিজের বাসনা, স্বপ্ন এসব কিছু ছাইচাপা দিয়ে দেহকে বৃদ্ধার খোলস পরিয়ে রেখেছি, তুমি যেদিন চোখে আঙুল দিয়ে দেখালে, বিশ্বাস কর, আমার আবার বাঁচার ইচ্ছে জাগছে।

এইভাবে বাঁচবেন ? হাত পা গুটিয়ে ? আমিও আর ক'দিন, সময় আমাকে ডাকছে, আর যা-ই করেন, আর যাই করেন আঙুলে শ্যাওলা পড়তে দেবেন না।

এরপর একটানে জাহিদ চলে যায় খেজুর গাছের তলায়, বাউলের চোখ নেশাক্রান্ত, আগুনে ব্যাঙ ঝলসে নিচ্ছে।

এটা খাবেন ?

বাতাসের অনেক রঙ, কখনো দেখছেন ?

ব্যাঙ খেলে দেখা যায় ?

টলতে টলতে দাঁড়ায় বাউল, 'মন তুই ভাঙ্গা একতারা' এই জাতীয় সুর কণ্ঠে তুলে কলকে এগিয়ে দেয় জাহিদের সামনে।

খুব কি কড়া ? জাহিদ ইতস্তত করে, আমি কিন্তু খাই নি আগে।

প্রথমে খুব কাশি হইবো, কুয়াশার মতো ঠাণ্ডা নরোম হয়ে ওঠে বাউলের কণ্ঠ, হের পরের অনুভূতির সাথে কিসের তুলনা দেই ? পাওয়া গেছে, যে নারীর প্রতি প্রবল প্রেম, তার সাথে শরীরে মিলনের মতো।

শরীরের মিলনে প্রেম থাকা-না-থাকায় কি এসে যায় ?

আমার অবাক লাগতাছে এই বয়সেও আপনে সেই অভিজ্ঞতা থাইক্যা বঞ্চিত। যাইহোক, দুইটার তফাৎ হইলো, যেইটাতে প্রেম আছে সেই মিলনেও সুখ, মিলনের পরেও সুখ, যেইটায় প্রেম নাই, সেইটার মিলনে ঠিকই সুখ, পরে ঘিন্না, পরে অনুতাপ। মানুষের মিলন আর কয় মুহূর্ত ? পরের সময়টাই তো সারাজীবন।

জাহিদ ধীরে টান দেয়।

বাউল বলে, সব ভেদ মুইছা যাইবো, জাত-কুল, মাছ-ব্যাঙ, জীবন হয়া যাইবো কাঁচা কঞ্চির মতন সরল। আর পরানের যে বিষ, নিত্য দপদপ করে, এই অমৃত-ধোঁয়া সেই বিষ গিইল্যা খাইবো— দেহ তুমার মন্দির গো সোনা, চরণ তার সিঁড়ি... ডুং ডুং দোতরা বাজতে থাকে, সত্যিই বেদম কাশি ওঠে। জাহিদ টের পায় বুকটা জ্বলে যাচ্ছে। সামনের ধান খেত, বাতাস সব কেমন দুমড়েমুচড়ে যাচ্ছে, কী এক জেদে সে এরপরও টান দেয়। নিশি কেমন নগ্ন, না, স্পর্শের ইচ্ছে জাগছে না, ওর জন্মদাগ বীভৎস, যেন কুষ্ঠ। জাহিদের দম আটকে আসে, আহ্ সবকিছু এমন সশব্দে এগিয়ে আসছে, সামনের ঝাঁকড়া-চুলো খেজুর গাছটা যেন দৈত্য, কী লম্বা নখ, কেমন বমি উঠে আসে, কে আছেন হাতটা ধরুন, আমি মরে যাচ্ছি!

বাউল তার মুখে জলের ঝাপটা দেয়। এই যন্ত্রণার পরেই আসল মুক্তি, ও মন পবন, তোর দেহ নৌকা কই ?

ডুং ডুং ডুং...।

শিঙ্গা ফুঁকছে কে ? ওই যে কেয়ামত! লায়লা, ওই তার ত্যানার মতন শাড়ি। ওর ভেতর থেকে দাউ দাউ আগুন উঠছে। জাহিদ পাটির ওপর শুয়ে পড়ে, আমাকে চেপে ধরুন। দেখছেন না কেমন ঠোঙার মতন হয়ে গেছি। উঃ বাবা, তুমি আমার হাতের ওপরই স্থির হয়ে গিয়েছিলে। কোনো মায়া ছিল না, কোন অনুভূতি না, নিজের সাথে অক্ষম জেদে তোমার সেবা করেছি। এতদিন পর তুমি আমাকে এমন তুচ্ছ করে দিলে ? আমাকে চেপে ধরুন! কী বাজাচ্ছেন ? একেবারে কান পচে যাচ্ছে।

বাউল সস্নেহে ভেজা কাপড়ে জাহিদের মুখ মুছিয়ে দেয়, এরপর তালপাতার পাখা দিয়ে বাতাস করে মাথায়, মশাই, এত দুর্বল আপনি, দিলেন তো আমার নেশা ছুটায়া।

দীর্ঘ সময় পর সুস্থির হয়ে জাহিদ বলে, আমার কাছে কিছু টাকা আছে, নেবেন ?

বাউল হাসে, কী করব ওই কাগজের নোট নিয়া ? এই যে আমি মুক্ত, স্বাধীন বিহঙ্গ, এই যে আমার দরজা-জানালাহীন স্বর্গ, ওই কয়টা নোট আইসা আমার সব কাইড়া নিবো, তস্করের ডরে আমার জীবন হইয়া উঠবো বিষময়। এই যে ঘাস খাই, লতা খাই, পোকা-মাকড়সা খাই, দোতরা বাজায়া গান বানাই, এর চাইতে শ্রেষ্ঠ সুখ এই দুনিয়ায় আছে ?

ধীরে ধীরে কুয়াশা সরে যাচ্ছে। মাথাটা কেমন হালকা লাগছে, মনে হচ্ছে, বহু বছর মাটির নিচে ছিল, এই প্রথম ঘাস দেখছে, বাতাস দেখছে। সব ফেনা সরিয়ে সে মনের জোরে মাথা তোলে, বড় আজব জিনিস, কোনোকিছুই স্থির নেই, সব ঢুলছে। সবচেয়ে বিচ্ছিরি এর গন্ধ।

এ না খাইলে কণ্ঠে সুরই আসে না, পয়লা দিন এমনুই লাগে, এর মজা হইল ধীরে ধীরে।

কী এক টানে পরদিন জাহিদ আবার এখানে আসে।

বাউল, সব তো শুনলাম, আপনার শরীরের খিদে মেটে কী করে ?

বাউল অদ্ভুত চোখে তাকায়, সৃষ্টিকর্তা সেই ব্যবস্থাও রাখছে। এই যে দেখতাছেন হাত, এই দিয়া।

যে একবার নারীর শরীর চেনে, হাতে কি তার মুক্তি হয় ? এ-তো বিকল্প ব্যবস্থা মাত্র।

বাউল হাসে, আমার জীবনডাই এই রহম, কোনো ভেদ নাই, আমি অনায়াসে হস্তরেই নারীর দেহ বানাইতে পারি। এতে কুনো গ্লানি নাই, যন্ত্রণা নাই। এ বড় বিশুদ্ধ।

সৃষ্টিকর্তায় তো আপনের বিশ্বাস নাই বাউল, এই গ্রামে টিকে আছেন কীভাবে ? জাহিদের এই প্রশ্নে বাউল হাসে, এইডা কি ঢোল বাজায়া জানানোর বিষয় ? আমার বিশ্বাস আমার একলার, নিজস্ব। তা-ও এই যে আজন্ম অভ্যাস, কইলাম, সৃষ্টিকর্তা হেই ব্যবস্থাও রাখছে, এইসব থাইক্যা বাইর হওয়া কঠিন।

জাহিদ দেখে, রেল লাইন, তার দেহ কুঁকড়ে ওঠে, আমার অশরীরী ছায়া, বৃদ্ধা এবং তার স্নেহময়ী কন্যার মধ্যে বিষ ঢুকিয়ে দিচ্ছে, আমি নিজেই দেখেছি দু'টি সত্তা কেমন এক হয়েছিল, তারা ক্রমশ শত্রু হয়ে উঠছে, অতঃপর, আর নয়,

জাহিদ, তল্পি গোটাও।

ক'দিনের অস্থিরতায় নিশির চোখের নিচে কালি জমতে শুরু করেছে। এর মধ্যে আফজাল আর আসে নি। নিশির জেদ হয়েছে, এই তো স্বাধীনতা, যেখানে খুশি ঘুরতে পারি, পরক্ষণেই ভেতরটা নিভে এসেছে। কোনোসময় আফজাল যদি আসে। এসে যদি দেখে সে নেই, বিষয়টা আরো জটিল হয়ে উঠবে।

নিশি চতুষ্কোণ আয়নায় চোখ স্থাপন করে।

আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াব ?

মা বলেন, মাঝখানে একটা বাচ্চা থাকলে অনেক সমস্যা মিটে যায়, স্বামী-স্ত্রী-র মাঝখানে সে সেতু হয়।

আমি কি আকাশ থেকে বাচ্চা বানাব ? নিশি বিচলিত কণ্ঠে বলে, একটা বাচ্চাকে মাঝখানে রেখে তবেই আমাদেরকে সংসার টেকাতে হবে ? স্বামী-স্ত্রী-র মনের মাঝখানে কোনো সেতু তৈরি হতে পারে না ?

তবুও, মা নিজের যুক্তিতে অটল, সন্তান তো তোদের দু'জনেরই হবে, মানুষকে এক জায়গায় দাঁড়াতে হলে অনেক শেকড় তৈরি করতে হয়, সন্তান হলো সেই শেকড়। এখানকার বড় কোনো ডাক্তারের কাছে তুই যা, আরেকবার চেষ্টা করে দেখ।

মা, বড় ডাক্তারের ভিজিট অনেক। এ ছাড়া কত রকম টেস্ট দেবে! ক'দিন আগে বাসায় বাড়ি থেকে এত লোক এসে গেল। সেই ঋণই শোধ করতে পারছি না।

মা বলেন, তাই বলে জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টাকে উপেক্ষা করবি ? আমার কিছু সঞ্চয় আছে, একটু খোঁজ করে দেখ কাকে দেখালে ভালো হয়, আমি না হয় কিছু হেল্‌প্ করলাম ?

সারা জীবন প্রাইমারি স্কুলে পড়িয়েছ, তোমার আর কত সঞ্চয় আছে ?

যত কমই হোক, কিছু তো সঞ্চয় করেছি। ডাক্তারে আর কত যাবে ? আগে দেখি না, সমস্যাটার কথা কী বলে ?

নিশি মনের ভেতর থেকে শক্তি পায় না। সংসারই যখন বিপন্ন, তখন জীবনে অহেতুক একটা সন্তানের ভার বাড়িয়ে কী লাভ ?

মমতাদি আসেন। নিশির ভেতর অদ্ভুত তরঙ্গ বয়ে যায়, ঠিকানা পেলেন কোথায় ?

তোমার বাসায় ফোন করেছিলাম, যা-ই বলো বড় একজন ভদ্রলোককে বিয়ে করেছ, খুব সুন্দর ব্যবহার করেছে আমার সঙ্গে।

আপনি কে, প্রশ্ন করে নি ?

আমি বলেছি তোমার কলেজের টিচার, এরপর অভিযোগ করল, নিশির খোঁজ নেয়ার মতো কলেজে এমন একজন টিচার আছেন, এ কথাও তো আমাকে কখনো বলে নি, ও ভারি চাপা স্বভাবের মেয়ে। আফজালের এই প্রশংসায় নিশির গতি শ্লথ হয়ে আসে। আফজালের প্রতি মমতায় ভেতরটা ভরে যায়। পরক্ষণেই হিসহিসে জেদ তা ধুয়ে নিয়ে যায়, সেদিনের পর থেকে একবারও এলো না ? আমার মৃত্যু হয় নি, এতেই হয়তো ওর স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে।

বাবার সাথে পরিচয় হয় মমতাদির। বাবা বলেন, আমার পাগলা মেয়েটাকে একটু বোঝান, দু'দিন পর পর কী সব গণ্ডগোল করে!

মমতাদি উৎকণ্ঠিত স্বরে বলেন, ওর নাকি এক্সিডেন্ট হয়েছিল ? শুনে তো আমার মাথা খারাপ, পরে শুনলাম, অল্পের জন্য বেঁচে গেছে। এইসব দুর্ঘটনার মধ্যে সংসারে আবার কি গণ্ডগোল হলো ?

হিরণ চা দিয়ে বলে, বিকালের ওষুধটা খাইবেন না ?

নিশি বলে, মাথার সব সুতো ছিঁড়ে গেছে, ঔষধ খেয়ে কী হবে ?

হিরণ পায়ের কাছে বসে। চলেন বাসায় চইল্যা যাই। ভালাই তো হয়া গেছেন।

এই বুঝি তোমার ফোন ধরে ? মমতাদি চায়ে চুমুক দেন, ভারি মিষ্টি মেয়ে।

সেই দুর্ঘটনার দিন থেকে এখানে আমার সাথেই আছে।

সবাই চলে গেলে বারান্দায় নিশি নিভৃত কণ্ঠে প্রশ্ন করে, সাজিদুল কেমন আছে ?

নিশি, তুমি ওর প্রসঙ্গটা ভুলে যাও, মমতাদি আন্তরিক কণ্ঠে বলেন, আমার মনে হয় এতে তোমার ঝঞ্ঝাটই বাড়ছে। যখন সত্যিই তোমার কিছু করার ছিল তখন যেহেতু পারো নি, এখন তার খেসারত দিয়ে নিজের বাকি জীবনটা বিপন্ন করাটা অর্থহীন, এতে ক্ষতি ছাড়া আমি লাভ কিছু দেখছি না।

নিশির স্বর কাঁপতে থাকে, জীবনের সবকিছু হিসেব করে হয় মমতাদি ? আমার মধ্যে অসহ্য এক বিবেকের পীড়ন, পিশাচের মতো তাড়িয়ে ফেরে, কি করলে যে কী হবে, আমি কিছু বুঝে পাই না।

কিন্তু তুমি যা করছ তা কোনো সমাধান নয়, এ মুক্তি পাওয়ারও কোনো পথ নয়। তুমি ভুলে যাচ্ছ, পতনের সূত্রপাত করেছিল সাজিদুলই, তুমি নিশ্চয়ই তাকে চুরি করতে বলো নি ? নিশি তুমি স্থির হও, আমার আর কিছু চাওয়ার নেই।

মমতাদি চলে গেলে গভীর অবসাদে ঢলে পড়ে নিশি।

প্রতি সকালেই তার মনে হয়, সূর্য ওঠার পরপরই, অফিস যাওয়ার আগেই বাসায় গিয়ে আফজালের পথ রোধ করে দাঁড়াবে। অথবা সন্ধ্যায় সটান গিয়ে ভেতর বিছানায় শুয়ে থাকবে। কিন্তু মাথার চিনচিনে আঘাতটা যখন ফুঁস করে ওঠে, তখন আফজালের প্রতি বিদ্বেষের সীমা থাকে না। সে স্বামীকে না জানিয়ে ফল নিয়ে কোথাও যাচ্ছিল, এইটুকুই তো তার দেখা ? এ দিয়েই সে জীবনের সব সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে চাইছে ?

নিশি সব উৎসাহ হারিয়ে ফেলে।

মা এরি মধ্যে নিজেই তৎপর হয়ে সব খোঁজখবর নিয়েছেন। একদিন দুপুরে বলেন, তুই তৈরি হয়ে নে।

নিজের মনের বিরুদ্ধে এ এক অসীম যাত্রা। পথ ফুরোয় না। রিকশা জ্যামে আটকে গেলে মা প্রশ্ন করেন, তোদের আসল সমস্যাটা কী, আমাকে বুঝিয়ে বল তো ?

নিশি উত্তর দেয় না। সামনের লাল বাতির দিকে স্থির চোখে চেয়ে থাকে।

মা তোমার মনে আছে, তালের শাঁস আমি কেমন পছন্দ করতাম, বাসায় আনলে আমি, ভাইজান, রিনি ভাগাভাগি করে খেতাম। আমার কিছুতেই তৃপ্তি হতো না। ইস্কুলে তোমার জীবনের উদ্দেশ্য কি এই রচনায় লিখেছিলাম, তালের চারটে শাঁস যদি একা খেতে পারতাম। জানো, এখন ওসব একদম ভাল লাগে না। কী রকম পিচ্ছিল!

তুই কথা ঘোলাচ্ছিস নিশি, আফজাল তো ভালো ছেলে, তাহলে এসব হচ্ছে কেন ? সত্যিই সে আমাদের এখানে তোকে আসতে দিতে চায় না ?

রিকশার জট খুলে যায়।

আসন্ন শীতের বড় ছায়াচ্ছন্ন, বড় ধূলিময় হাওয়া। নিশি রিকশার হুড ফেলে দেয়। এরপর বলে, বিষয়টা ঠিক ওরকম নয়। ও নিজের ফ্যামিলির প্রতি যতটা মমতাবান, আমার

ফ্যামিলির প্রতি ততটাই উদাসীন। মা বলেন, প্রত্যেক মেয়েরই মনে হয় তার স্বামী বেশি করছে তার নিজের ফ্যামিলির জন্য। এটাতো অন্যায় না, ওইটা তার শেকড়, সে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়টা কাটিয়েছে ওখানে—

নিশি কথা টেনে নেয়। একটি মেয়ে যখন তার পরিবারের জন্য ভাবে, এই ভাবনাটা পর্যন্ত একটি ছেলে বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারে না। তোমাদের চিকিৎসা, খাদ্য কোনো কিছুর মধ্যে আমি থাকি ? সে মনে করে, এটাই নিয়ম, এর বাইরে যেতে চাওয়াটাই আমার উচ্ছৃঙ্খলতা। তোমাদের ওখানে বেশি যাই বলে একদিন কী ঝগড়া, বলে মেয়েদের এতে দাম কমে যায়। শ্বশুর বাড়ি কাছে থাকাটা পুরুষদের জন্য সবচাইতে যন্ত্রণার। কী অবিশ্বাস্য যুক্তি! তোমরা আমার শেকড় না ? আমি জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়টা তোমাদের সাথে কাটাই নি ? এখন তোমাদের সাথে আমার দাম বাড়া-কমার সম্পর্ক হয়ে গেছে ? এটা কী ধরনের ঈর্ষা ? রিনিকে নিয়ে পর্যন্ত একটা ভাবনার কথা বলা যাবে না। বলে, আমি আবেগপ্রবণ, বাস্তব বোধহীন, আমার সবকিছুই বেশি বেশি।

রিকশা একটা ক্লিনিকের সামনে থামলে মা হেসে বলেন, তুই নিজের পরিবর্তনটাও দেখ, তোর বাবার বাড়িকে বলছিস তোমাদের বাড়ি, তোমাদের ওখানে, তুই আমার বলতে তোর নিজের সংসারটাকেই বুঝছিস। এরপর মা রিকশা ভাড়া মিটিয়ে গেটের ভেতর ঢোকেন, আমরা এভাবেই বড় হই, খুব অবচেতনভাবেই এইভাবেই সবকিছু রপ্ত করে ফেলি। হঠাৎ করে কিছু হয়ে যাবে না, এই উপলব্ধি তৈরি হতে হবে একদম ভেতর থেকে।

নিশি আর কথা খুঁজে পায় না।

ভেতরে পর্যাপ্ত বসার ব্যবস্থা আছে। নাম এন্ট্রি করাতে পাঁচশো টাকা জমা দিয়ে মা নিশির পাশে এসে বসেন। বন্ধ্যাত্ব নিরোধ ক্লিনিকে যারা আসে, সবার বেদনার মধ্যে একটা মিল আছে। নিশি সেই মুখগুলো দেখে। এখানে নিশির মতো আরো অনেক মহিলা ভিড় করেছে। নিশির নাম্বার হয় একশো পাঁচ।

এরপর অনন্ত অপেক্ষা। এই ক্লিনিকের মূল দায়িত্বে যে ডাক্তার, তিনি বিদেশে আছেন। যে লেডি ডাক্তার নিশিকে দেখবেন, তিনি তাঁরই এসিস্টেন্ট। তাঁর আসার সময় বারোটায়, কিন্তু দুটো বেজে গেলেও তিনি যখন আসেন না নিশির ভেতর থেকে সব স্পৃহা মরে যেতে থাকে।

অবশ্য সে তাঁরই মতো সমস্যায় আক্রান্ত রোগীদের দেখে ভরসা পায়, এই জনবহুল দেশে এই বেদনা আমার একার না। তারপরই তার তন্দ্রাচ্ছন্ন মাথাটা ঢলে পড়তে চায়।

মা বলেন, রাতে তো ঘুমোস না, চেহারার যা হলে করেছিস।

তোমাকে কে বলেছে ঘুমাই না ?

আমি টের পাই।

তাহলে তুমিও জেগে থাক ?

বয়স হচ্ছে না! তোদের বয়সের ঘুম কি আমার হবে ?

এইসব কথার মধ্যেই ডাক্তার আসেন। নিশি প্রাণের মধ্যে অসীম আরাম বোধ করে।

নিশির আগে অনেক সিরিয়াল। তাই দেখে পরমুহূর্তে ডাক্তার-উপস্থিতির আরামও ফুরিয়ে যেতে থাকে, সে সম্মুখে তাকায়— হু-হু দেয়াল। কত বছর পর অনন্তদাকে মনে

পড়ে। হাসির মতনই, অকস্মাৎ এমন করে মনে পড়ে নিজের মধ্যেই সন্দেহের উদ্রেক হয়, আসলেই কি এই নামের কেউ ছিল? নাকি কেউ তার সম্পর্কে নিশির কাছে গল্প করেছিল? উপন্যাসে পড়া কোনো চরিত্র? নিজের মধ্যে এই নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। অনন্তদা, নামটি যেন শৈশবে শোনা ইস্টিমারের ভোঁ। কবে কোন্‌কালে বেজেছিল, শোনার পর রেশ রয়ে গিয়েছিল ভেতরে। সেই রেশ হাওয়ার মতো এই শাদা দেয়ালের মধ্যে অজানা সুবাস এনে দেয়।

শাদা দেয়ালের সাথে ওর নাম মনে পড়ার কী সম্পর্ক?

অনন্তদা ছিলেন বিশালদেহী রোমশ পুরুষ। নিশি বলত, তোমাকে জন্তুর মতো দেখায়। নিশির ছোট্ট ক্ষুদ্র দেহটাকে নিমিষে শূন্যে তুলে সে হাতির মতো গর্জমান কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিল, সিংহের মতো?

সেই মানুষ একদিন কী হয়ে গেল!

তখন ওরা কাকার বাড়িতে থাকে। সেই মর্মবিদারক পরজীবী জীবনে অনন্তদা ছিল উদ্দাম হাওয়া। ট্রেনের হুইসেল শুনলে নিশির প্রাণ কেঁপে উঠত। দূর থেকে যখন দেখত ট্রেন আসছে, সে কানে আঙুল দিয়ে রাখত। ট্রেনটা কাছে আসলে চালক তার এই অবস্থা দেখেই যেন হাসতে হাসতে হুইসেল বাড়িয়ে দিত। পেছনে থেকে অনন্তদা নিশির কান থেকে সজোরে হাত সরিয়ে দিয়ে বলত, সহ্য কর। একদিন এক ভিখিরি তাদের দু'জনকে একত্রে দেখে বলেছিল, তোদের বিয়ে হবে, আমি দিব্যি দেখছি।

এ ধরনের অসম কল্পনা নিশির চেতনার মধ্যে আসে নি। সে ক্লাস ফাইভে পড়া এক ছোট্ট কিশোরী। আর অনন্তদা যেন বাবার মতো যুবক, ভিখিরিকে ঝেটিয়ে অনন্তদার সেকী বেদম হাসি। রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছিল নিশি। অনন্তদা বলেছিল, কী এমন অন্যায় বলেছে? আমার বাবার বয়স যখন পঁচিশ, মার তখন দশও হয় নি, তাদের হয় নি?

দারুণ অনুভূতি হয়েছিল।

এ ছিল তার নিদারুণ ঠাট্টা। যখন তার যক্ষ্মা হলো, দিনের পর দিন গার্ড রুমে পড়ে রইলো মড়ার মতো, তখনো ঠোঁটে হাসি। ঘুংড়ি কাশির মাঝখানে বড় মর্মান্তিক দেখাতো হাসিটাকে— একটাই আফসোস রে নিশি, ভিখিরিটা দিব্য চোখে এমন ভুল দেখল? আমার স্বপ্ন ছিল তুই বড় হবি। ততদিন আমি এই বয়সেই ঠায় দাঁড়িয়ে থাকব।

একশো পাঁচ।

হিমতন্ত্রী ছিঁড়ে যায় নিশির, সামনের ভিড় কমে এসেছে। আয়ার ডাকে যেন সে দাঁড়ায়। এরি মধ্যে কেস হিস্ট্রি লেখানো হয়েছিল। ডাক্তার সব পড়ে তাকে কয়েকটা টেস্ট করতে দেন। আফজালকেও একটা টেস্ট করার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, সব করে রিপোর্ট নিয়ে তারপর আসুন।

সারাপথ অনন্ত দা, নিশির এমন হয়, এক জীবন ভুলে থাকা কোনো বিষয় যদি সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন সেটাই হয়ে ওঠে নিকটবর্তী, সবচাইতে জীবন্ত। নিশিকে সে বলেছিল, জানিস প্রথমে কাশিতে শুধু শব্দ হতো, এখন আমার কাশির সাথে রক্ত আসে। কেউ দেখে নি। সেই দলাদলা রক্ত দেখে এমন মৃত্যুর সাধ জাগে, মনে হয়, ঘটা করে স্বর্গে চলেছি। আমার এক বন্ধু রাজনৈতিক কর্মী ছিল, তার ফাঁসির হুকুম হলে সে আমাকে চিঠি লিখে

জানিয়েছিল, তার স্থির বিশ্বাস, গলায় দড়ি ঝোলবার আগ-মুহূর্তে এই হুকুম বাতিল হয়ে যাবে, কেননা, তার জীবনের বেশিরভাগ কাজ সে অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফেলে এসেছে।

যখন ভোঁ হুইসেল দিয়ে ট্রেন আসছে, গুমটি ঘর থেকে বেরিয়ে গার্ড গেট বেরিয়ার লাগিয়ে দিচ্ছে। তখন সে তার ক্ষীণ হয়ে আসা দেহ, পাণ্ডুর মুখ টান করে বলেছিল, এই ট্রেনের শব্দ যখন শুনি, বড় বাঁচবার সাধ হয়। হাজারো কীট-পতঙ্গের মতো আমি মরছি, অথচ জীবনে কতকিছু করার স্বপ্ন ছিল। এই পৃথিবীতে আমার জন্য চোখের জল ফেলবার মতন একজন মানুষও নেই, নিশি, এই মৃত্যু বড় দুঃসহ!

সব মনে পড়ছে নিশির, গুমটি ঘরের গার্ড, যে অনন্তদা-র ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল, সে তার এই রোগ টের পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠল। বন্ধুর সেই অনুভূতি টের পেয়েই কী-না সেদিন রাতেই প্রচণ্ড শারীরিক যন্ত্রণা নিয়ে অনন্তদা সেখান থেকে কোন দূর পৃথিবীর পথে পালিয়ে যায়। নিশি কোনোদিন আর তার চিহ্ন খুঁজে পায় নি।

হাসির মৃত্যুর পর জীবনে আরেক কষ্টের ভার। নিশি ক্রমশ নুয়ে পড়েছিল। পৃথিবীটা মুহূর্তের জন্য অর্থহীন হয়ে উঠেছিল। ঠিকই বলেছিল অনন্তদা, এইসব মৃত্যু বড় সাধারণ। পরদিনই ঘাসে ঢেকে যায় সব! নিশি ভেঙে পড়তে গিয়েও মাথা খাড়া করে দাঁড়ায়। পরক্ষণেই তার কাছে সব ছাপিয়ে প্রধান হয়ে ওঠে বাবার অসুস্থতা। নিশি বাবাকে নিয়ে কোনো আঘাত সহ্য করতে পারবে না। বাবা যখন সেরে উঠলেন তাদের আবার আলাদা বাসা হলো। সেই আনন্দের তোড়ে নিশির জীবন থেকে ভেসে গেল সেই অসুস্থ স্মৃতিগুলো। আজ ঢেউয়ের মতো, বাতাসের মতো কোত্থেকে ভেসে আসছে সেইসব স্মৃতি। কোনো এক জীবন-জোয়ারে ভেসে যাওয়া বেদনা খণ্ড স্মৃতিময় ভাটার টানে ফিরে এসেছে। কিছুতেই সেই মানুষটার মুখ স্মরণ হয় না। কেবল লোমশ জন্তুর ক্ষীণ হয়ে আসা দেহটা চোখের সামনে ঝুলতে থাকে।

মা বলেন, আফজালকে কী করে খবর দেয়া যায়? ডাক্তার তো তাকেও টেস্ট দিয়েছে।

নিশি সেইসব স্বপ্ন থেকে নিজেকে টেনে ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, আমিও তো তাই ভাবছি, ওতো একদমই আসছে না। রিকশা মৌচাক ছাড়িয়ে যায়।

মা বলেন, আমি বলি কি তুই একবার যা।

মা, আমার এক্সিডেন্ট হয়েছিল, মারাত্মক কিছু হয় নি, এটাই কি আমার অপরাধ? তার কাছে এটা কোনো বিষয় না? এরপরও তুমি আমাকে আপোস করতে বলবে?

এইসব জেদ থেকে বড় কিছু হয়ে যেতে পারে, সবাই নিজের ভুল বুঝবে, এটা আশা করা ঠিক না। মা বলেন, সবার আগে বিবেচনা করা উচিত এর থেকে কতটা ক্ষতি হতে পারে! সেই ক্ষতি মেনে নেয়ার মতো অবস্থা আমাদের আছে কি না।

তুমি সারাজীবন চাকরি করেছ, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে ছাত্রদের কত শিক্ষা দিয়েছ। অথচ এই এখানটায় এসে তোমার মাথা নেমে যাচ্ছে, তুমি আত্মসম্মান, এমনকি জীবনের চেয়েও বড় করে দেখছ এই বিষয়টাকে।

আমিও সারাজীবন তাই করেছি, মা বলেন, চাকরি করি বলে তোর বাবা কোনোদিন এক গ্লাস পানি আমার হাতে তুলে দিয়েছে? ঘর-বার সবটাই সামাল দিতে হয়েছে আমাকেই। তোর জীবনে অন্যকিছু ঘটলে রিনির জীবনটা থমকে যাবে। আমাদের সমাজের

ধরনটাই এমনি। এমন অপমানকর কিছুই হয় নি তোর জীবনে, যার জন্য তুই এরকম কোনো পরিস্থিতির দিকে নিজেকে ঠেলে দিবি। আগে তুই তোর নিজের ভেতরের সমস্যা থেকে বেরিয়ে আয়। অনেকদিন যাবৎই তোকে দেখছি, তোর ভেতর থেকে সরলতাগুলো কেমন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে নিশি, কেন এমন হবে? পরিষ্কার হয়ে নিজের সামনে দাঁড়া, আগে তুই নিজেকে বুঝতে চেষ্টা কর, দেখবি সব ঠিক হয়ে যাচ্ছে।

রাতে ঘুমের বড়ি খায়।

না, আমার কোনো সন্তান চাই না। আমার জীবনে হাসি আছে, অনন্তদা আছে, ওই লাল গুমটি ঘর আছে। অনন্তদাকে বলা যেত, যুগ যুগ ছাইচাপা হয়ে পড়ে থেকেও তুমি তো একজন মানুষের মনের মধ্যে একদিনের জন্যে হলেও জেগে উঠেছ। এতো বছর বেঁচে থেকে, এত মানুষের মধ্যে পথ হেঁটে, কী হতভাগ্য আমি, এতটুকু ছাপও কারো মধ্যে ফেলতে পারি নি। এক ছিল সাজিদুল, সেও বদ্ধ জেলখানায় আমার দাগ ধুয়ে-মুছে এসেছে। নিশির চোখ ঝাপসা হয়ে আসে, অথচ মানুষের মনের মধ্যে বেঁচে থাকার কী অসীম কাঙাল আমি! নিজের যন্ত্রণা, বিরক্তি চেপে আত্মীয়, পরিচিতদের কতরকম চাপ সহ্য করেছি, কাউকে নিজের কপালের একফোঁটা ভাঁজ দেখতে দিই নি। তুমি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এসব প্রাণ থেকে কর নি, নিশি নিজের মুখোমুখি হয়। এ জন্যই বিরক্তি চাপতে হয়েছে, কৃত্রিম হাসি দিয়ে কপালের ভাঁজ মুছতে হয়েছে, এমনটা করার মধ্যে তোমার কোনো সততা ছিল না।

নিশি অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। ওদের ওইসব কাজ আমার ভালো লাগতেই হবে এমন দিব্যি কে দিয়েছে? আমি মহামানব বা সন্ন্যাসী নই, যে কোনো চাপে যে-কোনো কাজে আমি অনাবিল শান্তি লাভ করব! আমি আমার অসহিষ্ণুতা চেপে রেখেছি, হাসিমুখ প্রদর্শন করেছি, এর কোনো মূল্যায়ন হবে না? মোট কথা কাউকে দুঃখ না দিয়ে আমি তাদের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে চেয়েছি।

নিশি ক্রমশ ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যায়, সত্যিই যদি আমার গভীর নিঃশব্দতায় কোনো ভাঙন ধরে সেই ক্ষতি মেনে নেয়ার মতো মনের জোর আমার আছে? আফজালকে সত্যিই আমি আর চিনতে পারছি না। সে কি একলা-একা থাকায় ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে উঠছে? নিশির ভয় করতে থাকে, সে নিজেই কি চরম কোনো সিদ্ধান্ত নিচ্ছে? মাকে বলেছিলাম, তোমার মাথা নেমে যাচ্ছে, আমার নিজের মাথা-ই কি কম আনত? আমার সাথে আফজাল যেরকম ভদ্রোচিত ব্যবহার করে, দু'জনের মাঝখানে প্রেমের অস্তিত্ব নিয়ে ভাবি না, স্ত্রী হিসেবে যতটুকুই মর্যাদা দেয়, এ-না করে যদি সে আমার সাথে কুশ্রী, অশ্লীল ব্যবহার করত, তাহলেও কি আমি ওই সংসার থেকে বেরিয়ে আসার কথা ভাবতাম? রিনির ভবিষ্যৎ, বাবার ভালোমানুষী, মার শিক্ষক ইমেজের দিকে তাকিয়ে মাথা গুঁজে সব সহ্য করতাম না? চোখের শিরা দপদপ করে, হ্যাঁ, সন্তান মাঝখানে থাকলে সেতু তৈরি হবে। তার চেয়েও বড় কথা আমার সারা অস্তিত্ব জুড়ে খাঁ-খাঁ করে যে নিঃসঙ্গতা, তার উপশম হবে। গুরুত্বপূর্ণ অভিভাবক হিসেবে এই পৃথিবীতে আমার মর্যাদা তা-ই থাকুক— একে আমি গর্ভে ধারণ

করব। আমার অস্তিত্ব, আমার চিন্তা, রক্ত-মাংশের ভেতর দিয়ে এর বৃদ্ধি হবে। এখন যে কোনো উপায়ে আফজালকে বিষয়টা বোঝাতে হবে, আমি সামনে গিয়ে দাঁড়ালে তার ক্রুদ্ধতা কতটা কুৎসিত হবে, তার চেয়েও বড় কথা চরম কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার মতো পরিস্থিতি আদৌ হয়েছে কি-না, সে জন্য আমাকেই না হয় একটু নামতে হলো!

পরদিন সোজা তার অফিসে।

আফজালের সামনের চেয়ারটাতে বসলে সে হতচকিত তাকায়। চারদিকে অনেক কথাবার্তা। নিশি কোনো ভূমিকা না করেই গলা নামিয়ে বলে, দু'দিনের বিচ্ছেদেই মেয়ে নিয়ে ঘুরতে শুরু করেছ?

আফজাল হতভম্ব। পাশে ঢাউস খাতাখানা সরিয়ে রেখে তীক্ষ্ণ অথচ চাপা কণ্ঠে বলে, কী বলছ?

কী বলছি বুঝছ না? কাল সন্ধ্যায় কাকে নিয়ে চায়নিজে গিয়েছিলে?

তোমার মাথা সত্যিই খারাপ হয়ে গেছে, তুমি বাসায় যাও। এসব ফালতু কথা বলার জায়গা এটা নয়।

আশেপাশে সবাই তাকাচ্ছে, কেউ কেউ প্রশ্ন করছে— কী ভাবি, ভালো? নিশি ভিজে-ওঠা চোখ সামলায়, আমার জীবনটা পচে গেছে। এইসব করতে করতেই একদিন মরে যাব, কার বাসায় যাব আমি? তুমি তো সেই জায়গা পূরণ করতে শুরু করেছ। বিশ্বাস কর, আমি আসতাম না, শুধু তোমার মুখ থেকে জানতে এসেছি, তুমি আসলে কী চাও?

নিশি প্লিজ, আফজালকে বিপন্ন দেখায়, এখন বুঝছি, কেউ লাগিয়েছে, তুমি বাসায় নেই, ক'দিন কি অবস্থা। তুমি বাসায় যাও, যা কথা বলার সেখানেই বলো, এটা ব্যাংক কোনো নাটক করার মতো পরিস্থিতি এখানে নেই।

নিশি প্রথমে মালিবাগ, এরপর হিরণসহ কাপড়চোপড় গোছগাছ করে মা'র উচ্ছ্বাসভরা চোখের সামনে দিয়ে সম্রাজ্ঞীর ভঙ্গিতে বেরিয়ে আসে।

হিরণ কাঁচুমাচু হয়ে বলে, ভাইজানের রাগ পড়ছে?

নিশি হাসে, আরে আমার হাতে জাদুমন্তর আছে না? দিয়েছি তার কাঠি ঘুরিয়ে।

বাসায় রাজ্যির আবর্জনা।

এমনিতে আফজাল খুব গোছানো স্বভাবের, নিশির অনুপস্থিতিতে তার ব্যতিক্রম তাকে মহাস্বস্তি দেয়। আমি উল্টো তাকে আসামি করেছি, নিজেকে রক্ষা করার এ-ই এখন একমাত্র পথ, ভাবতে ভাবতে নিশির চোখ ঝাপসা হয়ে আসে, আমাদের একটা সন্তান চাই, এখন বিকেলের অভিনয়টা দক্ষতার সাথে করতে পারলে এ যাত্রা রক্ষা।

সেভলন মেশানো জল দিয়ে শোকেসের গ্লাস মুছতে গিয়ে নিশি ফুটন্ত ভাতে ডিম লাফানোর শব্দ পায়। খিদে মরে গেছে, উড়ন্ত ধোঁয়ার ঘ্রাণ তাকে টেনে নিয়ে যায় অজানায়। যদি আজ স্বাতীরা আসত? সে জেনেছে ওরা আবার একত্রে সংসার করছে। যদি আজ রাতে বরফ সাঁতরে উঠত গ্লাসের খয়েরি জলে? কতদিন হয় না। যদি প্রশস্ত কামরাময় বাসাবাড়ি আর প্রচুর টাকা থাকত আফজালের? সহপাঠী রেজা ওর রক্তের মধ্যে ঢুকিয়ে

দিত উদগ্র, উন্মাতাল নেশা? তাহলে সেসব বোতল থেকে ঢেলে ঢেলে নিশিও জীবনকে দেখতে পেত ঘুরন্ত। যদিও নিশির বিষয়ে প্রবল আপত্তি আফজালের, তবুও রেজা আর স্বাতীর ধাক্কায় সেই কৃষকের ছেলেও তো মাঝেমধ্যে তার ব্যাপারে নমনীয় হয়েছে? সব যদি তেমন চৌকশ থাকত, আফজালও নিশ্চয়ই এই বিষয়ে আরেকটু উদার হতো।

তৃষ্ণায় নিশির ভেতরটা ছটফট করে ওঠে, আজ বিকেলেই যদি ওরা আসত! দুঃসহ কিছু অনুভূতি থেকে অন্তত মুক্তি পেতাম! বাড়িতে মেহমান আসলে ছেলেবেলায় কত অপরাধ মাফ হয়ে যেত। আজ যদি তেমন করেই বিকেলের পরিস্থিতির নাটকীয়তা থেকে রক্ষা পেতাম! নিশি কাঁচামরিচ খুঁজে পায় না। ডিম ভর্তায় পোড়া মরিচ ভেজে দেয়। আসলে আমার একটা কাজ চাই। সেলাই মেশিনটা এনে নিজেকে উপুড় করে দিতে হবে তার ওপর। কিন্তু আমার পড়াশোনা? নিশির হাত শ্লথ হয়ে আসে, হিরণ দোকান থেকে কিছু শুকনো বাজার এনে ওর সামনে ঢেলে দেয়। নিশি দেখে, পেঁয়াজ, ডাল, এক লিটার সোয়াবিন... পরীক্ষা নাকের ডগায় ঝুলছে। ফরম্ ফিলাপের টাকা লাগবে। সন্তানের চেষ্টা বাদ দিয়ে মা'র দেয়া টাকাগুলো দিয়ে যদি এইসব ফুটো বন্ধ করা যায়? নিশির নিস্তরঙ্গ আত্মায় ঝিরঝির কাঁপুনি নামে। আমার অনেক দিনের স্বপ্ন, একটা অ্যাকুরিয়াম, লাল নীল কত মাছ, ওরাই আমার সন্তান হবে। আমি হবো ক্ষুদে মাছের মা। নিশি হেসে উঠতে চায়। পর মুহূর্তেই স্বামীর শ্লেষময় চোখ তাকে বিদ্ধ করে। মরা খিদে হা-হা করে উঠলে নিশি শুকনো পাউরুটি জলে ভিজিয়ে খায়। আর তখন মেঘেদের মতন নেমে আসে ঘুম। কীসব আধিদৈবিক ঘটনা ঘটতে থাকে চোখের সামনে! সাজিদুলের মাথা দশ খণ্ড হয়ে যায়। মমতাদির শুকনো ঠোঁটে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল। নিশি দেখে, দীর্ঘ বছর পর তার চুলে আফজালের সস্নেহ আঙুল। কী এক গোলক ধাঁধার চক্করে পড়ে নিশি বিছানায় ছটফট করে। তার আঙুলের শুকনো ডিমকুসুম ততক্ষণে গুঁড়ো হয়ে নিচে পড়তে শুরু করেছে।

জাহিদ বলেছিল, সব প্রাণীরই কিছু জন্মগত ট্রাজেডি থাকে, কেঁচো, উইপোকা এরা জন্মান্ধ, এত বিষাক্ত সাপ, তারও কান নেই, শিশু মাকড়সা মাকে গিলে খায়, শৈশব অতিক্রম করার পর প্রাণী হারায় ভেদ, মোরগ উপগত হয় সন্তানের ওপর, বাঘ তার শিশু বাচ্চা খেয়ে ফেলতে চায়— ভাবতে ভাবতে নিশি কাগজে আঁকিবুঁকি করে, সে বলেছিল, এত নির্দোষ কেঁচো, দেখলেই গা ঘিন ঘিন করে ওঠে না? মানুষের আছে অনেক ট্র্যাজেডি, আমার কাছে যে প্রাকৃতিক ট্র্যাজেডিটা প্রধান মনে হয়, মানুষ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে নিজেকে। যাকে মানুষ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে, তাকে সারাক্ষণ সামনে দেখতে চায়, দেখতে চায় তার নিটোল সত্য রূপটি। ট্র্যাজেডিটা এখানেই, মানুষ নিজেকে দেখতে পায় না, কোন্ মুহূর্তে সে কেমন হয়ে উঠছে, জানে না। তার স্বতঃস্ফূর্ত হাসি-কান্না-ক্রুদ্ধতা এসবের প্রতি মুহূর্তের রূপ কেমন, সে জানে না। এমনই দুর্ভাগ্য মানুষের, নিজের চেহারা পর্যন্ত সে স্মরণ করতে পারে না। আয়নায় যাকে দেখে, সে তারই উল্টো রূপ।

নিশির মাথা নুয়ে আসে টেবিলে। ইদানীং সন্ধ্যায় দেরি করে ফিরছে আফজাল। বলে, ব্যাংকে চাপ বাড়ছে। সারাটা ক্লান্তিকর সন্ধ্যা নিশিকে আচ্ছন্ন করে রাখে জাহিদের ফিনফিনে শরীর, দাড়ি-না-কামানো উস্কো মুখ, ফিনফিনে পাঞ্জাবি। তোমার জীবনের পতনের

সূত্রপাতও কি আমিই করেছি জাহিদ ? তোমার বন্ধু জুবায়ের একদিন বলেছিল, তুমি কেমন রুক্ষ পাগলাটে হয়ে গেছ। অথচ তোমার সমস্ত অস্তিত্ব স্পর্শ করেছিল আমার আত্মা, সেই তৃষ্ণা এত প্রবল, এই জীবনে আমি আর অন্য কিছু ছুঁয়ে সুখ পেলাম না। আমার দেহ-আত্মা-মাংস, আমার রক্তের স্পন্দন সব চির-বুভুক্ষু হয়ে থাকল। হ্যাঁ, সেটা আমাদের ট্র্যাজেডি, আমরা দু'জনই মৃত্যুর মতো প্রেম নিয়েও এক হতে পারলাম না।

এত মানুষের মধ্যে এতরকম স্বাভাবিক কাঙ্ক্ষা, কেন জাহিদকে জন্মদাগের মতো এমন একটি অস্বস্তিকর বিষয়ের খ্যাপোমোতে পেয়েছিল ? দীর্ঘদিন পর নিশি জাহিদকে নতুনভাবে বিশ্লেষণ করে, সে আমার চেতনার বিকাশ ঘটিয়েছিল, সে কথা বলত সন্ন্যাসীদের মতো। তার চোখে এক মুহূর্তের জন্যও লোভ দেখি নি, ভয় কাকে বলে সে চিনত না। অনেকটা হিরণের মতো, ভয়ের সাথে পরিচয় হয় নি। নিজের জীবন নিয়ে কিচ্ছু বলত না। অসম্ভব প্রিয় কিছু হারিয়ে গেলেও তাকে বিন্দুমাত্র বিমর্ষতা গ্রাস করত না, তাকে দেখে মনে হতো পৃথিবীর পার্থিব কিছুই ওর কাঙ্ক্ষিত নয়। কেবল পৃথিবীর কোথায় আছে রহস্য, খুঁজত এবং বলতো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিস্মিত হওয়ার মতো কিচ্ছু নেই।

সে সামান্য জন্মদাগ— এ কী শুধুই আমাকে স্পর্শের অজুহাত ? আমি তো নতজানুই ছিলাম। সেটা কি সে অনুভব করত না ? আমাকে স্পর্শ করার জন্য তার তো কোনো ছলনা করার প্রয়োজন ছিল না।

এই ভাবনার ভয়াবহতায় নিশি কাঁপতে থাকে। তা হলে আমারই অনুভবে বিরাট কোনো ফাঁক ছিল ?

এ অসহ্য।

এ আমি ভাবতে চাই না, নিশি পাঠ্যবইয়ের স্তূপে মাথা ঠেসে দেয়। একের পর এক ভুল করেছি, একজনের প্রেমের যন্ত্রণা কি অন্য কারো পৃথিবী বিলিয়ে দেয়া প্রেমেও মোছে ? অথচ আমি ওকে ভুলতে জীবনে জড়িয়েছিলাম আরেকজনকে। আমার কাছে আমার ভোলার খেলাটাই বড় ছিল, আমি ভুলে গিয়েছিলাম সবকিছু; বিস্মৃত হওয়ার খেলায় যাকে আমি ব্যবহার করছি, সে রক্ত-মাংসের অনুভূতিসম্পন্ন একজন মানুষ।

হ্যাঁ, তারপর প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছিলাম। সাজিদুলকে বলেছিলাম, জাহিদের জন্মদাগ বৃত্তান্ত, শুধু চেপে রেখেছিলাম আমার দুর্মর অনুভূতির কথা, যা কাউকে বলে অনুভব করানো যেত না।

জাহিদ সম্পর্কে তার বিশ্লেষণ প্রকাশ পেয়েছিল একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণের ভেতর দিয়ে, পাগল!

জাহিদকে তার এই বিশেষণে আখ্যায়িত করার ভঙ্গি আমাকে টেনেছিল। আমি তার আরো নিকটবর্তী হয়েছিলাম। কিন্তু তার অপরাধের সুযোগ নিয়ে আমি যখন সরে এসেছি, আমি যখন চিৎকার করে বলছি, তুমি চোর, তুমি নিকৃষ্ট, তখন সেও তো অসভ্য হয়ে উঠতে পারত, বর্বর হয়ে উঠতে পারত। বলতে পারত, জীবনে এত ক্ষত চিহ্ন নিয়ে কার কাছে যাবে তুমি ? কী করে এরপর বাঁচবে ? আমি সব বলে দেব তাকে, হ্যাঁ, বলে দেব জাহিদের জন্মদাগ বৃত্তান্ত, আমার সাথে অলিখিত দাম্পত্য সম্পর্কের কথা— আমি জানি, তুমি সব গোপন করে নিজেকে ভুলতে আরেক স্রোতে গা ভাসাবে। আমি চাই আর ফাঁকি না, আমি

জাহিদ না অন্য কেউ, তুমি পরিষ্কারভাবে জীবনে একজনকে স্থায়ী কর, আমি সব বলে দেব তাকে, যাকে বিয়ে করে সতীসাধ্বী স্ত্রী হয়ে উঠতে চাইবে তুমি, সবাই যেভাবে বলে— তাহলে সাজিদুলকে আমি জীবনের জন্য ভুলতে পারতাম।

সে-তো সাধারণ মানুষই ছিল। কেন একবারের জন্যও উচ্চারিত হয় নি এইসব শব্দ। কেনো মমতাদিকে বলে গিয়েছিল, নিশির জীবনের এক বিন্দু অশান্তি আমাকে কবরেও শান্তিতে থাকতে দেবে না। ওর দাম্পত্যজীবনে আমাকে কেন্দ্র করে যদি তিল পরিমাণও বিপদের সম্মুখীন হতে হয়, মমতাদি, আপনি গিয়ে দাঁড়াবেন ওদের সামনে।

নিশির কোনো বিপর্যয় কোনো অশান্তির সময় গভীর শান্ত কণ্ঠে বলত, আল্লাহ্‌কে ডাক, তিনিই তোমাকে অসীম শান্তি দেবেন। সেই ঘোর ঈশ্বরগতপ্রাণ লোকটির মাথায় কোন্ ভূত ভর করেছিল, জীবনে এমন পরিণতি নেমে এলো?

এই জন্যই হাসপাতালে যাই, ওর অসাধারণত্ব আমাকে দিনের পর দিন এত তুচ্ছ করে তুলেছে যে, আমি ওর বুকের কাছটায় একবার হলেও দাঁড়াতে চাই, যেখানটা আমি শুধু মিথ্যে আর ফাঁকি দিয়ে ভরিয়ে রেখেছিলাম।

মেঝেতে এসে বসেছে হিরণ।

নিশির চোখ রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে, আমার তাচ্ছিল্য, অপমানের জবাবে সে শুধু নিজের ধ্বংসের কথা বলেছে। বলেছে, এই পৃথিবীতে আমার আর কোনো চিহ্ন রইল না। নিশি তুমি বিশাল, আমাকে যতটুকু স্পর্শই দিয়েছ, আমি তার অযোগ্য। তোমার উদারতা আমার চিরদিন মনে থাকবে। এ কী ধরনের অনুভব, এ যেন প্রেম নয়, এক মহৎ করুণার ভেতর দিয়ে দু'জনের একাত্ম হওয়া, এবং এটা অনুভব করেও তার কোনো দুঃখ নেই, সে কৃতার্থ। অন্য কেউ এভাবে বললে, বিশেষত জাহিদ, এভাবে আমার উত্তাপহীন ভালোবাসায় ধন্য হয়ে গেলে আমার বুক ভেঙে যেত। কিন্তু সাজিদুলের ধরনটাই ছিল এমন, প্রচণ্ড রাগেও তার কোনো বিপরীত প্রতিক্রিয়া ছিল না। সে আমাকে অনুভব করত, এর মধ্যে তীব্র রোমাঞ্চ না থাকুক, থরথর কম্পন না থাকুক, একটা প্রবল মায়া ছিল, যে মায়ার বিন্দুমাত্রও আমাদের সাত বছরের দাম্পত্য জীবনের পরও আমার আর আফজালের মধ্যে তৈরি হয় নি। আমি না থাকলে আফজালের জীবনে বড় কোনো ছন্দপতন হবে না। সে সামলে নেবে, নতুন করে সংসার করবে। তার জীবন চলতে থাকবে সেই একই নির্দিষ্ট ছকের মধ্যে। আমার জীবন থেকে সে আমূল বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর আমি আর দেরি করি নি। একটা অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে সাতদিনের পরিচিত একজন লোককে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। তখন সাজিদুলের জেলে যাওয়ার এক বছরও পূর্ণ হয় নি। হ্যাঁ এও ছিল আমার আরেক ভোলার খেলা, আমি আমার গ্লানি ভুলতে চেয়েছিলাম। এর পর থেকেই আমি অস্থিমজ্জা দিয়ে সাজিদুলের সেই মায়া, সেই মহানুভবতাকে অনুভব করতে শুরু করেছিলাম। তখন থেকেই এক অদ্ভুত যন্ত্রণায় আমার জীবনের স্বস্তি নষ্ট হয়ে যেতে শুরু করেছিল। ও জেল থেকে বেরোনোর কিছুদিন পর মমতাদি যখন বলল, বুকে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হয় ওর, এত যন্ত্রণা যে, মুখে গ্যাজলা উঠে যায়। জেল থেকে এ এক কষ্টকর অসুখ নিয়ে এসেছে সে। ব্যথা সহ্য করতে না পেরে একদিন আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে চেয়েছিল— সব শুনে আমি হিম স্থবির, রক্তাক্ত হয়ে উঠেছিলাম, তবুও তাকে দেখতে যাই নি।

সেই আমি একসময় গেলাম, একজন মৃতপ্রায় মানুষের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে নিজের অপরাধবোধের কাছ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। শেষ পর্যন্ত কি করেছি ? তার উন্মাদপ্রায় হয়ে ওঠার খবর পেয়ে আবার জীবনের জন্য পালিয়ে এসেছি।

হিরণ বলে, হেইদিন সিন্দুক থাইক্যা যমদূত বাইর হওনের কিচ্ছা কইলাম না ? আইজ একটা হাচা ঘটনা শুনেন।

নিশি মাথা ওঠায়, এই মেয়েটার ভেতরে যতসব আজগুবি জিনিসের রাজত্ব। সেদিন বললো, তাদের গাঁয়ের এক মহিলা লাইগেশন করার কয়েকদিন পরই তার শরীরে বাউরি বাতাস লাগে, সঙ্গে সঙ্গেই সে মুখে রক্ত উঠে মারা যায়। সেই বাউরি বাতাস আসছে দূরের এক পাহাড় থেকে, আর গ্রামে যখন এ ধরনের ঘটনা ঘটে তখনই সেই বাতাস আসে— সেদিন সে এই উদ্ভট প্রসঙ্গ আর এগোতে দেয় নি। আজ যেন নিজের কাছ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যেই সজোরে হিরণের সামনে নিজেকে স্থাপন করে, তোর তো সবটাই হাচা ঘটনা। সেদিন বললি বাউরি বাতাস আসে, যখন তোদের গ্রামে মহিলাদের দশ-বারোটা বাচ্চা খিদেয় কিলবিল করে কাঁদে, তখন বাউরি বাতাস তাদেরকে খাবার এনে দেয় না ?

হিরণের মুখ পাণ্ডুর হয়ে ওঠে, আপনে এইসব অবিশ্বাস করেন ? এইডা কি মানুষ যে খাওন দিব ? ওইডা হইলো গিয়া বদ-বাতাস, যার গায়ে লাগে—।

নিশি এইসব কথা থেকে পুনরায় ডুবে যায় ভাবনার আঁকিবুঁকির মধ্যে, ইদানীং সেটাই হয়ে উঠেছে আজব এক সুখ। সে ভাবে, সাজিদুলকে আমার দেখতে যাওয়া উচিত, ওর অনেকটা ভার এখন আমাকেই বহন করতে হবে। এ-ই সুযোগ, এতে যদি আমার সংসার ভাঙে, আরো বড় কোনো ক্ষতি হয় হোক, এছাড়া কি আর করার আছে আমার ?

একদিন ভাইয়েরে লইয়া গেছিলাম পাহাড়ে। হেইখান থাইক্যা আওনের পরে আমারে কী অসুখে ধরল, হিরণ চুড়ো করে খোঁপা বাঁধে, খালি রক্তবমি। অনেকদিন ব্যারামের পরে যহন সাইরা উঠছি, মায় কইলো শহরে যা, বাতাসের চোখ এর উপরেও পড়ছে।

'সবুজ পাতাকে ছিঁড়ে ফেলেছ। ফুলেতে আগুন তুমি জ্বেলেছ।'

ফুলেতে আগুন! ওই তো আগুন পাকিয়ে উঠছে, ওইতো বিচ্ছুরিত ধোঁয়া! জাহিদের মন্তব্য ছিল, ফুল কী পবিত্র ? নানারকম মৌমাছি এর সাথে সম্ভোগে মেতে ওঠে। মানুষের যদি এই চরিত্র হয় ? আমরা ব্যভিচারী নষ্ট বলে তাকে ফেলে দিই। অথচ মানুষের পবিত্রতার তুলনা দিই ফুলের সাথে। আসলে পৃথিবীর কিছুই অপবিত্র নয়, অপবিত্র যদি কিছু কখনো হয় তবে তার আত্মা, যার কাছ থেকে বোধবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ পালাতে পারে না। জাহিদের কথাই যদি ঠিক মানি, তবে এই যে আমি পালাতে পারছি না, আমিও তাহলে বোধবুদ্ধিসম্পন্ন ?

কেন সাজিদুলের এই পতনের জন্য অহর্নিশি নিজেকে দায়ী মনে হয় ? পতনের সূত্রপাত তো সে নিজেই করেছিল—কেন এই যুক্তিতে নিজেকে সুস্থির করতে পারি না ?

জানেন আপা, রাইতে যখন ঘুমাই স্বপনে দেহি জানালা দিয়া হেই বাতাস আইছে, আমারে ডাকতাছে, কী লম্বা, কী কালা, কী ভূতের মতন চেহারা—

নিশি চোখ প্রসারিত করে, তোর মধ্যেও তাহলে ভয়-ডর আছে ? যেভাবে তেলাপোকা পা দিয়ে কচলে দিস, তোকে তো আমি রীতিমতো ভয় পেতে শুরু করেছিলাম।

হি হি, সামাইন্য তেলাপোকারে আপনে ডরান? হিরণ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, আপনি জীবনে তাইলে ডরের কিছুই দেহেন নাই!

পরদিন নিশি নতুন উদ্যমে হাঁটে।

সেলাই মেশিনের বিষয়টা পরিষ্কার হওয়া দরকার। সে আর মমতাদি যদি যৌথভাবে একটা কিছু করতে পারে, তাহলে সংসারের চিরকালের হিসেবের বাইরে আরো কিছু উপার্জন। ভাবতেই নিশির সর্ব-অস্তিত্ব রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। এ ছাড়া সাজিদুলের জন্য হাসপাতালে কীভাবে কী করা সম্ভব, মমতাদির সঙ্গে পরামর্শ করে—।

কলেজে না গিয়ে নিজেকে সেঁধিয়ে দেয় মমতাদির ছায়াচ্ছন্ন সিঁড়ির মধ্যে। আর তখুনি তার মনে হয়, এ সময় মমতাদি নিশ্চয়ই ক্লাসে গেছেন। তার সমস্ত উদ্দীপনা এক ফুঁয়ে নেভার সময়টাতেই দরজা খুলে যায়।

নিশির শরীর একটা তীব্র ঝাঁকুনি দিয়ে স্থির হয়ে যায়। দরজার ওপারে দাঁড়িয়ে আছে বিমর্ষ ক্লিষ্ট সাজিদুল।

নিজেকে বিন্যস্ত করতে গিয়ে সে অসংলগ্ন হয়ে ওঠে, আশ্চর্য, তুমি! হাসপাতাল থেকে কবে?

বাইরে দাঁড়িয়েই কথা বলবে?

এর মধ্যেই নিশি ওর চিরকালের কণ্ঠ চিনতে পারে। সে গভীর আশ্বস্ত বোধ করে, যা হোক ওর মাথায় ভর-করা ছিটগ্রস্ততা তা হলে গেছে।

সে ভেতরে ঢুকে চেয়ার টেনে বসে, মমতাদি নেই?

মন্থর পায়ে যেন নিজেকে অনেক কষ্টে হেঁচড়ে সাজিদুল বিছানায় গিয়ে বসে। সে তো কলেজে। এ সময় আমি স্বপ্নেও তোমাকে আশা করি নি।

অন্য সময় কখনো আশা করেছিলে?

সাজিদুল দেয়ালে হেলান দিয়ে লম্বা শ্বাস টানে, না।

না, কেন?

আমার মনে হয়েছিল আবার তুমি ভয় পেয়েছ, দাড়ি গোঁফের জঙ্গলে সাজিদুলের হাসির ধরনটা ঠিক শনাক্ত করা যায় না। আমার যখন জেল হলো, কী ভয়টাই না পেয়েছিলে, এরপর তোমার ছায়া পর্যন্ত দেখি নি। এবারও তা-ই মনে হলো, পরে নিজের ওপর এত রাগ লেগেছে, কেন যে মেজাজ অমন খিটখিটে হয়ে উঠেছিল! মনে হচ্ছিল, আমি শুধু তোমাকে ভয় দেখাতেই জন্মেছি।

নিশি চুপ করে বসে থাকে।

সাজিদুল বলে, চা খাবে?

কী যে ভদ্রতা কর! নিশি অকৃত্রিম আন্তরিকতা প্রকাশ করে, তোমার শরীর এখন কেমন?

খুব ভালো। কিন্তু এতটা ভালো যে আমার সহ্য হয় না!

সোজা হয়ে এবার একটু দাঁড়াও, নিশির কণ্ঠ উচ্চকিত হয়, মানুষ যুদ্ধ থেকেই জীবনের যা কিছু অর্জন করে। এত যুদ্ধ করলে, নিজেকে এত কষ্টের মধ্যেও টিকিয়ে রাখলে, এর পরিণতি যদি হয় পতন, তা হলে সবইতো অর্থহীন হয়ে গেল।

এ-কথাটা তুমি নিজেকে শোনাও, সাজিদুলের পরিবর্তনটা এবার আরো কিছুটা আঁচ করে নিশি, তুমি নিজেই এত অল্পে ভেঙে পড়, সামান্য কিছুতেই এত ভয় পাও, আসলে যে-কোনো কথাই অন্যকে খুব সুন্দর করে বলা যায়।

এরপর কথা এগোতে চায় না।

কেমন অস্বস্তি তৈরি হয়। সাজিদুল দেয়ালে ঠেস দিয়ে ক্লান্ত, ক্ষুব্ধ আর কেমন ধোঁয়াশে হয়ে ওঠে।

জেলখানা।

সে এক আশ্চর্য পৃথিবী।

প্রথম দিকে বাইরের রোদ্দুর, বাতাস, নিশির দেহের মাংস, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের শব্দ সাজিদুলকে মৃত্যুকাতর করে তুলত। তারপর ধীরে ধীরে সব খসে পড়ে, নিজের এই অবস্থার জন্য আর দীর্ঘশ্বাস উঠত না। আর মনে হতো না জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল— ঠাসাঠাসি কয়েদিদের মাঝখানে ঘোড়ার মতন শ্বাসরুদ্ধ দাঁড়িয়ে ঘুমুতে হতো কখনো, কখনো হয়তো শোয়ার জন্য এক চিলতে জায়গা মিলল, তখন কারো ছায়া না, কোনো ছবি না; অবশ দেহ নেতিয়ে আসত অসাড় ঘুমে। মধ্যরাতে হয়তো দেখা গেল, মাথা ভিজে যাচ্ছে উষ্ণ জলে, চোখ মেলতেই গন্ধ। ছরছর শব্দে পেশাব করছে কেউ, ম্যাচের কাঠির মতো সমান্তরাল শুয়ে থাকা মানুষগুলোর মধ্যে এই ভেজা বারুদ কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করতো না।

শুধু একটা জিনিসের প্রতি সর্বগ্রাসী আকর্ষণ ছিল। নিশির কামিজ থেকে খুলে যাওয়া একটি সেফটিপিন। ওরা যখন উন্মত্ত, কামিজে বোতাম ছিল না, সেফটিপিনের ডগা নিশির পিঠ বিদ্ধ করেছিল। সেটা খুলে রেখে সাজিদুল মমতাদির বাক্স থেকে সুই-সুতো এনে নিশির কামিজের দু'মাথা জোড়া লাগিয়ে দিয়েছিল। এরপর থেকে মানিব্যাগের একদম তলায় সেফটিপিনটা আশ্রয় নেয়। দীর্ঘদিন সেটা সাজিদুলের কাছে ছিল।

সেলে প্রবেশের আগে যখন সে লাইনে, গুনতির মধ্যে নগ্ন সার্চ চলছে, তখন সে ওটা জিভের তলায় লুকিয়ে রেখেছিল। তার নামে খাতা খোলা হলো— ঘড়ি, চশমা, বাড়তি সব জিনিস ওরা রেখে দিল। সাজিদুল তাদের প্রশ্নের জবাব অত্যন্ত সন্তর্পণ জিভ সঞ্চালনের মাধ্যমে সারল। সেলে যাওয়ার পর সেই সেফটিপিনটাই হয়ে উঠল সাজিদুলের একমাত্র স্বপ্ন। এর ডগায় আছে নিশির রক্ত-চিহ্ন, এর অস্তিত্বে আছে নিশির দেহের ঘ্রাণ। সেই ছোট্ট সেফটিপিন যেন জাদুর আয়না, এর মধ্যে দিয়েই সে এই শহরে একা শূন্যে হাঁটতে থাকা নিশিকে দেখতে পেত। তার মনে হতো, ক্লাশের নোট কপি করে দেয়া থেকে শুরু করে অ্যাডমিট কার্ড জোগাড় করা, তার হাতখরচ, শপিং—এসব কিছুতেই নিশি তার ওপর যে পরিমাণ নির্ভরশীল, সেই মেয়েটি এখন চলছে কেমন করে? সাজিদুলের চোখ ভিজে আসত।

যত বেশি বদ্ধতা, তত বেশি স্বপ্নের বিস্তার। সেই ফুল, সেই সুশোভিত শয্যা, তার মনে হতো নিশি পরী, নিশি জননী, সে বৃদ্ধ হয়েও যদি একদিন জেল থেকে বেরোয়, নিঃসঙ্গ ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে নিশি তার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে।

তারপর মনস্তাপে পুড়ে যেত সব। নিশিকে মনে হতো রহস্যময় স্বর্ণলতার মতো। অনেকটা বিস্তার করে থাকে, কিন্তু শেকড় খুঁজে পাওয়া যায় না।

এ এক অদ্ভুত খেলা, নিজের মধ্য থেকে বিযুক্ত হয়ে যেন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ, কারো কাছ থেকে নিজের সম্পর্কেই কিছু শোনা। মমতাদির বদ্ধ ঘরে বসে নিশির কম্পন থেমে যায়, ভাবলেশহীন হয়ে ওঠে চোখ, সে যেন কোনো রূপকথা শুনছে। ছেলেবেলায় যেমন হতো, মা একটা বাস্তব কাহিনী বলছেন রূপকথার ঢঙে, দেখা গেল, রাজকন্যা একদম নিশির মতোই। ভর সন্ধ্যায় তার চোখে ঘুম আসে, তেলাপোকা দেখলে ভয় পায়। আধো ছায়ায় সামনের মুখটা স্পষ্ট হয় না। যেন কেউ কিছু বলছে না, নিশির ভেতর থেকেই উচ্চারিত হচ্ছে কিছু শব্দ, যা বিচ্ছিন্ন, যা স্পর্শের অতীত, যা বায়বীয়। নিশি একজন কয়েদির দুঃসহ স্বপ্নের সাথে একাত্ম হয়ে ভাবে, আহা! তার প্রেমিকাটির শেষ পর্যন্ত কী হলো ?

কয়েদিদের মধ্যে সাজিদুল ছিল শিক্ষিত। ধীরে ধীরে তার নীরবতা, নির্বিকারত্ব দিয়ে অশিক্ষিতদের মধ্যে সে নিজের একটা আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করে ফেলতে থাকে। সে সশ্রম কয়েদিদের সুতো বোনা, জল তোলার কাজে সাহায্য করত। হাবিজাবি নোংরা আবর্জনাময় চোর-ছ্যাঁচড়দের মাঝখানে শুয়ে সে নিজেকে মনে করত তাদেরই একজন। শুধু ওই সেফটিপিন, সন্তর্পণে যখন সে বের করত, সেটা নানা রঙে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। ওই ছোট্ট জিনিসটার মধ্যে যেন ছিল এক অলৌকিক প্রাণ, যা দিয়ে সে আস্ত নিশিকে নিচের তলায় জীবন্ত দেখতে পেত।

না, নিশি কখনো আসে নি।

এ ব্যাপারে সাজিদুলের মধ্যে কোনো প্রতীক্ষাও ছিল না। নিজেকে ক্রমশ সে ওই ছাঁচে তৈরি করে নিয়েছিল। নিজের পরবর্তী জীবনের দিকে তাকালে শুধু দেখত একটা এঁদোগলি ধরে একদম একা একজন মানুষ হেঁটে যাচ্ছে। সেই মানুষ কখনো যুবক, কখনো মাঝবয়সী, কখনো পিঠ কুঁজো হয়ে আসা বৃদ্ধ। কখনো সাজিদুল নিজেকে যৌথ দেখতে পায় নি। নিশির জায়গায় অন্য কোনো রমণীকে স্থাপন করা দুঃস্বপ্নের মতো মনে হতো। মনে হতো এর চেয়ে অসাধ্য কাজ পৃথিবীতে দু'টি হয় না। যদি সেই রমণী মধ্যরাতে সাজিদুলের দীর্ঘশ্বাসের শব্দে আঁতকে ওঠে ? সে তো ভান জানে না। এই একটা ব্যাপারে নিজেকে লুকোতে জানে না, তখন কী হবে ?

জেলে যে পরিমাণ খাবার তাদেরকে সরবরাহ করা হতো তাতে সাজিদুলের চলে যেত। কিন্তু অধিকাংশ কয়েদিই খিদেয় হাপিত্যেশ করত। এর মধ্যে ওদের ওপর ছিল মেটদের অত্যাচার। সাজিদুলের মনে পড়ে গ্রাম থেকে আসা এক বালক, সরল কালো চেহারা, ওই সংক্ষিপ্ত ভাত খেয়ে তার খিদে যেন তারও তিনগুণ তেতে উঠত। সে শুধু কাঁদত। এর মধ্যে মেট একদিন তাকে সমকামিতায় বাধ্য করতে চাইলে তার সে-কী উদ্ধত, ক্রুদ্ধ চেহারা! শুরু হলো হুলুস্থুল। শেষ পর্যন্ত শাস্তি হলো সরল বালকটিরই।

আইড়া বেড়ি দিয়ে দিনভর তাকে ঝুলিয়ে রাখা হলো।

ক'দিন পর সে ক্ষুধার যন্ত্রণা, নানাবিধ অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে সুইপারদের খাতায় নাম লেখাল। একমাত্র সেখানেই খিদে অনুপাতে পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ করা হয়। একদিন তাদের সেলে এসে ঢুকল টগবগে এক প্রাণবন্ত যুবক। যেন হাজার বার এখানে এসেছে-গেছে, এমনই বিকারহীন তার চেহারা।

অন্য কয়েদিরা জড়ো হয়ে তাকে প্রশ্ন করে, আপনে কোন্ কেইসে ফাঁসছেন ভাই ?

সত্য বলার অপরাধে— বলে যুবকটি মেটকে প্রশ্ন করে, দেখুন আমার চশমাটা রেখে দিয়েছে, পড়াশোনা ছাড়া আমি এক মুহূর্ত থাকতে পারি না, কি করে ওটা পেতে পারি ? মেট তার পাছায় কষে এক লাথি দিয়ে সবার হতবাক-করা মুখের সামনে দিয়ে গট গট করে বেরিয়ে যায়।

এর আগে এখানে এসেছেন ?

সাজিদুলের এই প্রশ্নে সেই যুবক বলে, না। কিন্তু আমার কাছে পৃথিবীর কোনো জায়গাই কুৎসিত কিংবা আবাসের অযোগ্য নয়। আমি সারারাত নর্দমায় পড়ে থাকলেও আমার কাছে সেটা বিন্দুমাত্র কষ্টকর হবে না। এই যে জীবন দেখতে এলাম, মানে আসতে বাধ্য হলাম, এর চেয়ে যে জীবনে ছিলাম সে আরো ভয়াবহ আরো নোংরা, মৃত্যুর পর দোযখেই যেহেতু যাব, তার অভ্যেসটা আগেভাগেই করে রাখি। কথাগুলো বলে সেই যুবক সেলে শুয়ে গলা ছেড়ে গান ধরে। সবার উদ্দেশে অগ্নিময় বক্তৃতা ঝাড়ে। সাজিদুলকে বলে, এই যে থালাটা দেখছেন, বড় আশ্চর্য এই জেলের জীবন। পুরো দিন রাত্রি এই থালার মধ্যে ঘুরছে, সকালে উঠে রুটি খাচ্ছি, থালায়। সকালে সেভ করছি থালায় জল রেখে। দুপুরে খাচ্ছি, থালায়। বিকেলে এই যে ধিনাকধিনাক তবলা বাজাচ্ছি, তা-ও থালায়। রাতে আবার এই থালাকেই বালিশ বানিয়ে তার ওপর মাথা রেখে ঘুমুচ্ছি।

যুবকটির নাম ওসমান, যে এই পৃথিবীতে নরক বাসের শিক্ষা গ্রহণ করছে, একদিন আপনা থেকেই নেতিয়ে এলো। কারো সাথে কথা বলে না, খাওয়া সামনে পড়ে থাকে। বন্ধ ঘরে শুয়ে ভাবলেশহীন চেয়ে থাকে শূন্যে দৃষ্টি মেলে দিয়ে।

সাজিদুল বলে, জীবন কেমন ওসমান সাহেব ?

ওসমান ফিসফিস করে বলে, পালাতে হবে।

সাজিদুল হাসে, এই নরকের বেড়ি বড় শক্ত হে, তোমার মতো এমন চিন্তা এখানকার সবাই সারাক্ষণ করছে।

এর মধ্যে সাজিদুলের একদিন গা-কাঁপিয়ে ভীষণ জ্বর। এরকমের জ্বরকে এখানকার কেউ গ্রাহ্য করে না। থেকে থেকে কাঁপুনি। রুটি গলায় দিলে উগরে আসে। মেট এসে বলে, এটাকে বাইরে ফেলে দিয়ে আয়। সেলের সবার মধ্যে রোগ ছড়াবে।

জেল হাসপাতালে নিয়া যাই ? কেউ একজন বলে।

এই টোটকা অসুখের রোগীরে হাসপাতালে নিয়া কী লাভ ? এই যে বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত মানুষ, খাতায় তো দেখলাম চুরি কইরা জেলে আইছেন। জীবনে এত অভিজ্ঞতা, সামান্য জ্বরে এক্কেবারে ক্যালায়া গেলেন ? খাড়া হন, খাড়া হন! আর এই যে খাবার গুলান বমি

কইরা ফালাইতাছেন, এইগুলার দাম জানেন ? এরপর সে হুকুম দেয়, যে কয়দিন সাজিদুলের জ্বর না সারছে, সেই কয়দিন তার বরাদ্দ খাদ্য যেন মেটকে সরবরাহ করা হয়।

এক সময় কী রকম ইনোসেন্ট ছিলাম!

নিশি যেন চোরাবালির অতল থেকে মাথা ওঠায়! কোন্ ক্লাশে পড়ি তখন ? সেভেনে ? একটি ছেলে রোজ দাঁড়িয়ে থাকত স্কুলে যাওয়ার পথে। কী যে দেখত রোজ অমন উদাস করুণ চোখে! একদিন হঠাৎ আমার সামনে এসে দাঁড়াল। পাথর ছুঁয়ে বলল, সে আর বাঁচবে না। এই একটি কথার কত অর্থ হয়! আমার ঘুম নষ্ট হয়ে গেল অর্থ উদ্ধার করতে গিয়ে। তার কি কঠিন কোনো অসুখ করেছে ? ডাক্তার কি তাকে শেষ কথা বলে দিয়েছে ? ওকে নিয়ে এইভাবে ঘাঁটতে ঘাঁটতেই একসময় আমার প্রাণের মধ্যে ওর মুখটা গেঁথে গেল। এরপর ওকে যত দেখতাম ততই সেই কথার আক্ষরিক অর্থ পাল্টে যেতে থাকল। বিশেষত ওর আচরণে, শীত, গ্রীষ্ম, ঘোর বর্ষা সব উপেক্ষা করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতো। শুধু এটুকুই বলা হয়েছিল জাহিদকে, সে বলেছিল, শুধু নিজের প্রেমের ভারে কেউ মরে না। আমি কেঁপে উঠেছিলাম।

হ্যাঁ, ওর সেই প্রগাঢ় প্রেম আমাকে ভীত অস্থির বেদনার্ত করে তুলেছিল। আমি রাতভর কাঁদতাম। কী অসহ্য নিষ্পাপ ছিল সেই চোখের জল। আমার সারা শরীরে জ্বর লেগে গিয়েছিল। আমি একেবারে অসুস্থ হয়ে পড়লাম। আমার কেবলই মনে হতো এই যে আমার মনে এসব ছায়া ভর করেছে, আমার কঠিন পাপ হচ্ছে।

মা-কে সব বললাম।

তিনি কী ব্যবস্থা নিলেন, ছেলেটিকে আর দেখি নি। এটাই কি ছিল আমার প্রথম প্রেম ? কিন্তু তখন পর্যন্ত মনের শিরা-উপশিরায় কোনো দাগ পড়ে নি। সবকিছু অনেক গভীর, অনেক সৎ ছিল। তারপর পর্যায়ক্রমে, হ্যাঁ, আমি আমার সত্য হারিয়ে ফেলেছি। আমি এর চিবুক, ওর কাঁধ, আরেকজনের মনের বিস্তৃতি এইসব খণ্ড করে করে ভালোবাসতে শুরু করেছি। মমতাদি বলেছিলেন, একজন মেয়ে একজন পুরুষের মধ্যে তার চাহিদার অর্ধেকও খুঁজে পায় না। এ-ও হতো সত্য, আমি জাহিদের চিন্তার বিস্তৃতি এবং সাজিদুলের ভিখিরির মতো নিবেদন, দুটোকে একসাথে চাইতাম। তাদের ওপর আরোপ করতাম আমার দেখা যে-কোনো সুদেহী পুরুষকে। এরপরও যেহেতু হৃদয়ের যুক্তি মস্তিষ্কের শাসন মানে না, আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে একমাত্র জাহিদকে দেখেই রোমাঞ্চ অনুভব করতাম, তার ছায়াই এই জীবনে আমার কাছে সবচেয়ে প্রগাঢ় হয়ে রইল।

এই যে একজন কয়েদি, কী দুর্বিষহ অভিজ্ঞতার মধ্যে এখানে এসে দাঁড়িয়েছে! সে এই মর্মান্তিক অবস্থাতেও তার প্রেমের জায়গাটায় একজন ইনোসেন্ট বালকের মতোই সৎ এবং গভীর ছিল, সে স্বপ্নে দেখত তার প্রেমিকা দাঁড়িয়ে থাকবে ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে।

সেই প্রেমিকার কষ্ট-বেদনা-স্বপ্নের রূপ কেমন ছিল ? নিশির চোখ ক্রমশ ঝাপসা হয়ে ওঠে।

ওসমান কানে কানে বলে, আমি পথ বের করেছি, পালাতে হবে।

সাজিদুলের অলস দুটো চোখ অপলক দেখে বেতের নিপুণ কাজ, দু'হাতের অপরূপ সঞ্চালন, মোটা গোছাগোছা আঙুল, কাঁকড়ার মতো কিলবিল পাক খাচ্ছে। জ্বর ছেড়ে ওঠা তেতো জিভে আঁশটে স্বাদ। সারা রাতের বেঘোর জ্বরে এগিয়ে এসেছিল নিশি। বলেছিল, আমি তোর মা, এই তোর মুখে স্তন তুলে দিলাম। খা বাছা, খা।

স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে এরি মধ্যে।

অন্য কয়েদিরা ফিসফিস করে বলে, ওই যে ওসমান ভাই, তার খাতা দেখছি, রেপ কেইসের আসামি, কয় কি-না 'সত্য বলার অপরাধে।' হালার ফুটানি কী?

মেট আসে। দাঁত কেলিয়ে হাসে, সাজিদুলকে বলে, ভালোই তো হয়া গেছেন, কুয়া থাইক্যা এক বালতি পানি তুইল্যা দেন তো! আমার হাতটা কেমন টনটন করতাছে।

সবার মধ্যে চাপা গুঞ্জন। তখন পর্যন্ত সাজিদুলের মাথা-ঝিমঝিম ভাবটা কাটে নি, তার যে ক'টা রাত এমন ঘোর জ্বর গেছে, মেটের কল্যাণে জেল কর্তৃপক্ষ সেটা জানতে পারে নি। এদিকে পেটে দাউ দাউ খিদে। হাতের কাজ থামিয়ে একজন বলেছিল, আপনের মাথা টিইপ্যা দেই?

সাজিদুল সন্তর্পণে উঠে দাঁড়ায়। মেটকে অনুসরণ করে হাঁটে। পেছন থেকে কে যেন বলে ওঠে, হালার হিয়ালের জীবন!

বদ্ধ কুয়োর দিকে তাকিয়ে মাথাটা এমন টলে ওঠে, মনে হয়, সেই অন্ধকার জলে কিলবিল করছে নানা আকৃতির সাপ।

এরি মধ্যে কেউ কেউ জল তুলে থালায় রেখে তার মধ্যে তাকিয়ে দেখছে নিজেদের হারিয়ে যাওয়া চেহারা।

বালতি ক্রমশ নিচের দিকে নামছে। সাজিদুলের কেবলই মনে হচ্ছিল এই বুঝি দড়ি খসে পড়ে হাত থেকে। না, ভেতরের সবটুকু শক্তি দিয়ে এক সময় সে পানি ভর্তি বালতি ওপর দিকে টেনে তোলে। মেট হা-হা করে হাসে, সাবাস! আজ তোকে ভাত একটু বেশি দেবো। তখুনি ঘটে যায় ঘটনাটা। বালতি ভর্তি জল সাজিদুল মেটের মুখের ওপর ছুঁড়ে মারে।

আতঙ্কিত কয়েদিরা সশব্দে দূরে সরে যেতে থাকে।

এগিয়ে আসে অন্যান্য সেলের মেট।

তারা সাজিদুলকে চারপাশ থেকে ঘিরে মুহূর্তে তার হাড়-মাংস এক করে দেয়।

জেল হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর সে এখানে এসে দেখে, ছিঁচকে কয়েদিদের মাঝখানে তার কদর অনেক বেড়ে গেছে। আমরা মনে করতাম, আল্লায় আপনেরে সব দিছে কেবল একটা জিনিসই দেয় নাই, গোস্‌সা!

যাই হোক, এরপর ক্রমশ ওসমানের সাথে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। এক রাতে ওসমানের সাথে তার অনেক কথা হয়। ওসমান তার বিচিত্র জীবন-কাহিনী বর্ণনা করে। তার প্রেমিকা তাকে না জানিয়ে অন্য একজনকে বিয়ে করে ফেলে। তারপর থেকেই ওসমানের রক্তে বিষ। প্রেমিকাকে তার ছবি, চিঠি ফেরত দেবে বলে এক জায়গায় এনে সে ধর্ষণ করে। তারপর নিজেই তার স্বামীকে ফোন করে জানায় সেই তথ্য।

সাজ্জিদুলের মাথা খারাপ হয়ে যায়। এ কি কোনো প্রেম ? তার জীবনটা নষ্ট করে কি লাভ হলো তোমার ?

আমার জীবন নষ্ট করে তার কী লাভ হয়েছিল ? ওসমান হো-হো করে হেসে উঠেছিল। আমি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সত্য স্বীকার করেছি। তাকে কোনো ভোগান্তির মধ্যে ফেলি নি।

ধর, তোমার ওপর থেকে তার মন সরে গিয়েছিল, সাজ্জিদুল যুক্তি দেয়, এরপর সে তোমাকে করুণা করে যদি বিয়ে করত, দু'জনেরই সারাটা জীবন নষ্ট হয়ে যেত। এরচেয়ে যত নিষ্ঠুর দেখাক, যত কষ্টেরই হোক, সে ভণিতা না করে সরে গেছে। সেটা কি খুব অন্যায় হয়েছে ? সারাটা জীবনের জন্য তুমি তার কাছে ঘৃণ্য কীট হয়ে গেলে। না, ওসমান তোমাকে আমার খুব বাজে লোক মনে হচ্ছে। আমি এভাবে কিছু মানতে পারি না।

ওসমান কেঁদে ফেলে, একজন মানুষের মন কেন এমন বদলায় ? আমার জীবন নষ্ট হয় নি ? এই যে দোযখ বাসে এসেছি, তিলে তিলে এখানে শেষ হয়ে যাব না ? আমার কোনো গ্লানি নেই। সে সুখে থাকলে কি আমাকে একবারের জন্যও স্মরণ করত ? এখন ঘৃণা ভরে হলেও করবে।

এরপর ক'দিন কী হলো, সাজ্জিদুলকে শীতের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে কাবু করে ফেলতে থাকল নিশির ছায়া। জেলের বাইরে থাকতে যাকে সেইভাবে দেখা হয়ে ওঠে নি, তার প্রথম দিককার রোমাঞ্চে চমকে উঠতে থাকা মুখ, তার চাহনির কাঁপুনি, নিজের সুন্দর অভিব্যক্তিগুলোর প্রকাশ, তারপর ক্রমেই তার অন্ধ নিবেদনের সামনে নেতিয়ে আসতে থাকা নিশির অস্তিত্ব শেষদিকে এমন হয়েছিল, মাথা পর্যন্ত ঠিকমতো আঁচড়াত না। যে নিশির টিপ ছিল অপরিহার্য, সেটা তো সে দিতই না, ইস্ত্রিহীন কাপড় পরে পর্যন্ত সাজ্জিদুলের সাথে বাইরে বেরিয়ে যেত।

হাঁটুর দু'ভাঁজে মুখ রেখে সাজ্জিদুলের মনে হয়, আমি ভেবেছিলাম, আমার ভেতর থেকে ওকে কেটে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি। না, কাটা হয় না, গোড়া থেকে গজিয়ে ওঠে নতুন ডগা, নতুন লতাপাতা। আমাকে চারপাশ থেকে চেপে, খুঁড়ে একেবারে অন্ধ করে দেয়।

ওসমান বলে, সব ব্যবস্থা পাকা, আমাকে শুধু অনুসরণ করুন।

সাজ্জিদুলের কাছে ক্রমশ দুর্বিষহ হয়ে উঠছিল সেখানকার জীবন। সে কি এক ঘোরে কিচ্ছু চিন্তা না করেই ঘুটঘুটে রাতে ওসমানকে অনুসরণ করে।

সেন্ট্রি ঘুমোচ্ছিল।

ওসমানের পাকা ব্যবস্থা সেই পাহাড়ের উঁচু দেয়াল পর্যন্ত ঠিক থাকে। সে ফিসফিস করে বলে, আপনি আমার ঘাড়ে পা রাখেন, আমি দেয়াল বাইতে জানি।

তখুনি পেছন থেকে আলোর ফোকাস।

বেজে ওঠে পাগলাঘণ্টি।

মৃতপুরী এক ঘায়ে সশব্দে জেগে ওঠে।

মমতাদি যখন সাজ্জিদুলকে দেখতে আসেন ওর পায়ে তখন ডাণ্ডাবেড়ি পরানো। ডেপুটি জেলার এসেছিলেন। বিচারের পর ওসমানকে প্রথম ঝুলিয়ে রাখা হলো শূন্যে।

আর ব্যাঙের মতো থপথপ সাজ্জিদুল এগিয়ে গেল মমতাদির কাছে।

এই প্রথম এই মহিলার কান্না দেখল সে, তোকে যদি চিড়িয়াখানায় বদলি করে নিয়ে যাওয়া হতো পশুপাখির মাঝখানে, আমি অনেক শান্তিতে ঘুমুতে পারতাম।

শাস্তির পর ক'দিন গুম মেরে পড়ে থাকল ওসমান। তারপর চৌকো থেকে জোগাড় করা কেরোসিন গায়ে ঢেলে এক ফকফকা দুপুরে দাউ দাউ আগুনে পুড়ে আত্মহত্যা করল সে।

নিশিদের বাবার বাসার পাশে এক বৃদ্ধ আর বৃদ্ধা থাকতেন। তাদের দু'টি জোয়ান ছেলে জলে ডুবে মারা যায়। একমাত্র মেয়েটি ঘটনার ক'দিন পরেই প্রচণ্ড জ্বরে পড়ে। হাসপাতালে গিয়ে সে-ও মারা যায়। এতসব মৃত্যুর আগে বৃদ্ধের চাকরিটা চলে গিয়েছিল গণছাঁটাইয়ের মধ্যে পড়ে। তারপর কেউ যদি তাদের কাছে এসে বলত, সুসংবাদ আছে, ভয়ে-যন্ত্রণায় কেঁপে উঠত তারা।

মা বলতেন, জীবন এরকমই। এজন্য যে-কোনো খারাপের জন্য মানসিক প্রস্তুতি রাখতে হয়। কিন্তু আমার গায়ে ফোস্কা লাগার আগ পর্যন্ত কি আমরা সামনের বাসার দুর্বৃত্তের হাতে পিটুনি খেয়ে আধমড়া হয়ে যাওয়া ছেলেটির খোঁজ দ্বিতীয় দিন নিতে যাই? সারাশহর যখন অপহরণ-আতঙ্কে অস্থির, আমরা তখন সারাক্ষণ নিজেকে নিয়ে অস্থির, ভাগ্যিস, আমি এখনো অপহৃত হই নি।

মা, জ্যোতিষী আমার হাত দেখে বলল, আমার এগারোজন ছেলেপুলে হবে, আমি ওদের কীভাবে বড় করব মা? এক রাতও তো ঘুমোতে পারব না!

ঘুম! শ্লেষ-মেশানো স্বরে কথাটা উচ্চারণ করে নিশি অস্ফুটে হেসে ওঠে। সমুদ্রের মতো ধু-ধু শয্যা। কেবল ঢেউ সাঁতারের মতন করে পাক খাওয়া। এরপরেও সব যখন হারিয়েছি, নিশি কেমন উদ্ধত হয়ে ওঠে, যাবতীয় তন্ত্রী, জীবনের রূপ, স্পন্দন সত্য সব, তখন অন্তত নিজেকে সুন্দরভাবে বাঁচানোর একটা-না-একটা পথ তো বের করতেই হবে। অন্যকে সুখী করা যখন সম্ভব হচ্ছেই না, তখন অন্তত নিজেকে। তাহলে তো বলা যাবে অন্তত এই পৃথিবীর একজন মানুষের উপকার আমি করেছি!

সাজিদুল কেমন দেয়ালের গায়ে এলিয়ে পড়ে। এক সময় সে বালিশের তলায় মাথা ঠেসে দেয়। নিশি বলে, সাজিদুল তুমি ঘুমোও, আমি যাচ্ছি।

কী এক ক্রুদ্ধতায় নিশি বিছানায় এসে, যেন সদ্য ডিমভাঙা কুসুম, এইভাবে নিজেকে ছেড়ে দেয়, অস্ফুটে আফজালকে প্রশ্ন করে, প্রতিদিন আমাকে তোমার একঘেয়ে লাগে না? আফজাল কেমন ঘোরাক্রান্ত, আমি এই একই জিনিসে প্রতিদিন নতুন খুঁজে পাই। নিশি হিসহিস করতে করতে ভাবে, মেয়েদের চূড়ান্ত তৃপ্তি দেহ এবং মনের ঠিক কোন্ জায়গাটায়? সে শিরা কেটে কেটে সেই জায়গাটা খুঁজে পায় না। সে আফজালকে বলে, তোমরা দেহসর্বস্ব মানুষ, এজন্যই সারাজীবন এক জিনিসে আকর্ষণ বোধ কর। তোমাদের দেহের তৃপ্তির সাথে মনের কোনো যোগ না থাকলেও চলে। এরপর দুর্মর কান্না থেকে সে নিজেকে সরাতে চায়। আজ সাজিদুলের অস্ফুট ধ্বনি, শেষ পর্যন্ত তীব্র তাচ্ছিল্যে তার ঘুমিয়ে পড়া, নিশিকে একেবারে স্থবির করে দিয়েছে।

এ-কি তার সত্যিই ঘুম, না নিশির প্রতি চরম অনীহা ?

জেলের জীবন সাজিদুলকে এতটা শক্তি দিয়েছে ? সাজিদুলের সাথে জড়ানোর পর নিশি যখন অনুভব করল, এটা তার কাঙ্ক্ষিত স্থান নয়, কত ভাবে সরে আসতে চেয়েছে, ধর্মগ্রন্থ ছুঁয়ে বলেছে, তোমার স্পর্শে নিজেকে আমার ওদের মতো মনে হয়, যারা দেহ বিক্রি করে, হ্যাঁ, ওদের মতো, তুমি সরে যাও।

সাজিদুল ভাবত এসবই নিশির সাময়িক ক্রুদ্ধতা, সে চলে যেত। সন্ধ্যায় আবার এসে হাজির হতো তার বাসায়। কিছু যে হয়েছে কোনো ভাবান্তর নেই। নিশির অসহ্য লাগত, মায়াও লাগত। সে ভাবত কাউকে প্রত্যাখ্যান করা মানে তার ব্যক্তিত্বকে আঘাত করা। তার মেরুদণ্ডের মাঝখানটায় বাড়ি মারা। কিন্তু এ কোন্ সাজিদুল ? নিজের প্রাণঘাতী প্রেমকেই সে তার ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত করেছে। নিশির প্রচণ্ড মায়া হতো, আর কেবলই অসহ্য অনুভূতি ঠেলত তাকে। এই মায়াকে সম্বল করেই সাজিদুলকে সারা জীবনের জন্য গ্রহণ করতে হবে ?

সেই সাজিদুলই এক সন্ধ্যায় কী ফিসফিস, তুমি কি সত্যিই নিজেকে তাই মনে কর ?

আসলে শরীরের আনন্দে থাকছি, মনের কোনো তল খুঁজে পাচ্ছি না। মেয়েদের দুটোর সমন্বয় ছাড়া হয় না। এ ছাড়া আর কী ভাবতে পারি নিজেকে ?

এভাবে ভাবতে নেই, সাজিদুল পরম মায়ায় ওর হাত তুলে নিয়েছিল নিজের হাতে, মানুষের মনের মধ্যে হাজার জটিলতা থাকতে পারে, সে কারণে নিজের সম্পর্কে এরকম সিদ্ধান্তে চলে আসা ঠিক নয়, এরকম ভাবাটাই পাপ। তুমি ওই শব্দের অর্থ জানো ? তোমার সাথে কি আমার তেমন লেনদেনের সম্পর্ক ?

তুমি তো কঠিনভাবে সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস কর, নিশি বলেছিল, পাপ-পুণ্যের যুক্তি তুমি নিজের মতো করে বানাতে পার না। এই যে আমরা বিয়ে বহির্ভূত থাকছি, এতে পাপ হচ্ছে না ?

সাজিদুল বিষণ্ন হয়ে উঠত, কী জানি, হয়তো হচ্ছে। এত আমি ইচ্ছে করে করছি না, অকৃত্রিমভাবে প্রাণের চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে তোমার আকর্ষণ, নিজের ওপর তো নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারছি না।

এই জায়গাটাতেই সাজিদুল নিশির কাছে অসাধারণ হয়ে উঠেছিল, তাকে যারা চাইত, তার যে দু'একজন বন্ধু ছিল, পারস্পরিক মিলনে কেউ পাপ খুঁজে পেত না। জাহিদ পর্যন্ত বলত, দু'জনের সমান সম্মতিতে পুণ্য হয়।

জাহিদ ছাড়া বাদবাকিরা, অন্য অনেক বিষয়ে সীমাবদ্ধ ধর্মের অনেক নিয়ম-তাড়িত হলেও, নিজেদের এ জাতীয় ইন্দ্রিয় সুখের ব্যাপারে তারা পাপ-পুণ্যের যুক্তি নিজের ইচ্ছে মতো তৈরি করত। সাজিদুলের এই সরলতা পাপের বিষয়ে নিশিকে ভীত করে তুলত। কিন্তু তার মধ্যে যে কোনো ভণ্ডামি নেই, নিশির জন্য এ অনেক স্বস্তির ছিল।

সাজিদুলের বদলে যাওয়া, নিজের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে যাওয়া, নিশির মধ্যে জীবনের প্রথম তার প্রতি তীব্র আকর্ষণ তৈরি করে। তার ভেতরটা ওর জন্য হাহাকার করে ওঠে। মনে হয়, হোক সাজিদুলের একতরফা, তবুও তার প্রচণ্ড প্রেম, প্রচণ্ড আনুগত্যের কারণে নিশির ভেতরে একটা শক্তি ছিল। আজ মনে হলো, সেসবই অতীত। জাহিদের অস্ফুট ধ্বনি

কোনো মৃত রমণীর কথা বলেছে, যে এখন আর কোনোভাবেই তার জীবনে নেই। নিশি যেন এক মুহূর্তে তার এতদিনকার গচ্ছিত সম্পদ আজ হারিয়ে এসেছে। রাতের বিছানায় আফজালের কণ্ঠ ঘুমকাতুরে হয়ে ওঠে, নিশি আমি একজন ডাক্তারের সাথে কথা বলেছি।

কী বিষয়ে ?

আমাদের সমস্যা বিষয়ে। বিশ্বেস কর, আমার একটা সন্তান থাকলে, যা হোক, আমরা আবার চেষ্টা করতে পারি না ? এরপর ওর চুলে সস্নেহ আঙুল ঢুকিয়ে দেয়, তোমার কষ্টও আমি বুঝি। এবার বেতন পেয়েই যাব। একদম শেষ চেষ্টা। তারপরও যদি না হয় তখন না হয় জীবনের ছক অন্যভাবে তৈরি করব!

নিশি ভেতরে একেবারে ভেঙে পড়ে, কেন এই অজুহাতে আমাকে মাড়িয়ে যাও না ? তুমি যদি যেতে, কোনো দোষ হতো না আমার, কোনো বদনামও না। আমি নিজের কাছে বেঁচে যেতাম। এই সংসারের কী অর্থ আছে ?

ঘুম ভাঙলে মনে পড়ে, আজ মাসের পেনশন স্কিম জমা দেয়ার শেষ দিন।

ঘর থেকে বেরুবার সময় আফজালও বলে যায়, কলেজে যাওয়ার সময় দিয়ে যেও।

নিশির ভেতর থেকে তরঙ্গ ওঠে। বিষয়টা প্রায়ই তার মনে পড়ত, কিন্তু আজ সেই মনে হওয়া সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করে। যখন সাজিদুলের সাথে বিয়ের কথাবার্তা চলছিল, তখন নিশির নামে সে এই একাউন্টটা খুলেছিল। সাজিদুলের ইচ্ছে ছিল পাঁচশ, কিন্তু নিশির দুর্মর পীড়াপীড়িতে তা দুশোয় খোলা হয়েছিল। নিশি বলেছিল, পাঁচশ দশ বছর ধরে পারব, কী গ্যারান্টি ?

এক বছর সাজিদুল নিজেই সেই একাউন্ট চালিয়েছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে দেখে দূরায়ত রাস্তায় হাজার হাজার মানুষ। সে সেইসব যন্ত্রযান, গিজগিজে মানুষের ভিড়ে নিজেকে ঠেসে দিয়ে ভাবে, এই করে যদি নিজের মধ্যে থেকে পালানো যায় ?

সাজিদুলের সেই দুঃসহ অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়তেই বুকের ভেতরটায় খড়িশ ছোবল দেয়। সে দুশো টাকা দিয়ে বিভিন্ন রকমের ফল কেনে। আগামী মাসে যে করেই হোক দু'শো টাকা জমিয়ে জরিমানা দিয়ে ব্যাংকে রাখা যাবে। ওর কাছে কত যে ঋণ আমার। ওযে আংটি আমাকে দিয়েছিল, সেটা ভাঙিয়ে মা আফজালের জন্য বিয়ের আংটি গড়েছিলেন। মা বলেছিলেন, বিয়ের আগে মেয়েদের আংটি থাকতে নেই।

হ্যাঁ, নিশির বিয়ের ভিত্তিও এমন একটা স্পর্শকাতর বিষয় দিয়েই রচিত হয়েছিল। নিশিকে হাজার মানুষের ভিড়েও এইসব এখনো রক্তাক্ত করে তোলে। চারপাশের শীতালো ফরফর হাওয়া রোমকূপ দিয়ে বিষ হয়ে ঢোকে। একদিন আফজালকে ঠিক বলব, তুমি যদি আমার মধ্যে একবিন্দু সত্য খুঁজে পাও আমাকে রাখ, নয়তো ফেলে দাও। দেখ এই করে করে আমি আমার প্রাণ হারাতে বসেছি। আমি আমার সত্য খুঁজে পাচ্ছি না।

যদি ফেলে দেয়, কোথায় গিয়ে দাঁড়াব ?

না, আমি আর আমার অস্তিত্ব নিয়ে ভাবব না। কাল ভেবেছিলাম, নিজেকে রক্ষা করব। আমি যা ছড়িয়ে রেখেছি তার কিছু না গুছিয়ে কী করে নিজেকে বাঁচাব? এই যে রকমারি ফলের সজ্জা, ঢেলে দেব সাজ্জিদুলের সামনে। আমার এই আন্তরিকতাতেও কি তার ঘুমন্ত মুখ স্ফুরিত হয়ে উঠবে না?

রিকশা ছুটছে বিস্তৃত পথ ধরে,

অকস্মাৎ সিঙ্গার ফুঁ।

নিশি দেখে মুহূর্তের জন্য কী এক ভয়াল ঠাণ্ডা আঘাতে মাথাটা যেন দু'ফালি হয়ে গেছে। নিশি দেখে এক ফুঁয়ে নিভে গেল রোদ, প্রচণ্ড কোলাহলরত জনপদ এক মুহূর্তের জন্য চোখের সামনে থেকে গভীর গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে। এরপর মৃত্যু।

যখন চোখ মেলেছে, সামনে অসংখ্য মুখ। কিচ্ছু স্মরণ হয় না। সে যে নিশি, এটা পর্যন্ত না। সে ভাবলেশহীন চেয়ে থাকে সেইসব মুখের দিকে। বাবা বলেন, তোর কিচ্ছু হয় নি। রিকশাটা উল্টে গেছিল শুধু।

নিশির বিছানায় এঁটে থাকা দেহ কিছুটা শিথিল করা হয়। সে মাথা ওঠায়। ডান দিকটায় প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে। নিশি আফজালকে খোঁজে। ডাক্তার বলেন, রাস্তায় যে-রকম মারাত্মক জায়গায় এ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছিল, যা হোক বেঁচে গেছেন। আপনার শরীরে তেমন কোনো অসুবিধা নেই। ভয়ে জ্ঞান হারিয়েছিলেন।

কোত্থেকে কান্নার শব্দ ভেসে আসে। চারপাশের ঝকঝকে শয্যা দেখে নিশি আন্দাজ করে, এটা ক্লিনিক।

জ্ঞান ফিরেছে, বাবার কণ্ঠ শোনা যায়। কান্নার কী আছে? মেয়ের কি তোমার কোনো ক্ষতি হয়েছে?

রিনি নিজের উষ্ণ হাতে নিশির আঙুল টেনে নেয়, দুলাভাই আমাদের পাশের বাসায় ফোন করেছিল। তারপর নিশির সবকিছু অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভয়ে পাণ্ডুর হয়ে ওঠে মুখ, আমার ব্যাগ?

ওটা দুলাভাইয়ের কাছে। তোমাকে কয়েকজন লোক ধরাধরি করে এখানে নিয়ে এসেছে। তোমার ব্যাগে দুলাভাইয়ের ব্যাংকের কার্ড ছিল।

ও কোথায়?

নিচে গেছে ঔষধ আনতে।

মার ফোঁপানো কান্নার জলে নিশি ভিজে ওঠে। কিন্তু জ্ঞান ফেরার পর বেঁচে আসার বোধের চেয়ে প্রধান হয়ে ওঠে ভয়। তার ব্যাংকে যাওয়ার কথা ছিল, রাস্তায় ফলমূল ছিটকে পড়েছে। এ ছাড়া যে পথে মমতাদির বাসা সেটা ব্যাংকে যাওয়ার সম্পূর্ণ উল্টো পথ। সে রিনির কানে ফিসফিস করে প্রশ্ন করে, ও কিছু বলেছে?

খুব টেনশানে আছে, এ ছাড়া বারবার বলছিল, ওর নীলক্ষেতে এক্সিডেন্ট হলো কীভাবে?

নিশি আর শুনতে চায় না। ব্যথায় মাথার সব রগ ছিঁড়ে যাচ্ছে। তার দেহ, হৃৎপিণ্ডের সব কোষ কেমন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। সে কিছুতেই সবকিছুকে একত্রে কাজ করাতে পারছে না। নিশি আঁচল খুলে দেখে, শূন্য। না, বুদ্ধি লোপ পাচ্ছে। কী বলবে আফজালকে?

ব্যাগে দুশো টাকা নেই, এও নিশ্চয়ই ওর দেখা হয়ে গেছে। এ ছাড়া এতগুলো ফল! নিশ্চয়ই রাস্তায় ছিটকে পড়েছে। টাকা ভাঙিয়ে এতগুলো ফল, কার জন্য ? কী উত্তর দেবে এর ? নিশি মাকে বলে, আমি তোমার সাথে থাকব, আমাকে তুমি জায়গা দেবে না ?

মা চোখ কপালে তোলেন, বাসায় যাবি ভালো কথা, কিন্তু এ কী ধরনের কথার ছিরি ? এদিকে জামাই টেনশানে আধমরা!

নিশির ডানপাশটা ব্যথায় অবশ হয়ে যায়। চারপাশ ছায়া হয়ে উঠতে থাকলে সে অস্ফুটে মা-কে বলে, এ ওর ভান। কত নাটক জানে ও। আমাকে তোমাদের ওখানে যেতে দেয় না, তা জানো ?

মার মুখ ছাইবর্ণ হয়ে উঠলে নিশি অনুতাপে পুড়ে যায়, এ-কী করছি আমি ? আমার ভয় আফজালের ব্যাপারে আমাকে এতোটাই ক্ষিপ্ত করে তুলেছে যে আমি মার শান্তি পর্যন্ত নষ্ট করে দিতে চাইছি ? আফজালের শব্দ পেয়ে নিশি সশব্দে চিৎকার করে ওঠে, আমার মাথা এমন চক্কর দিচ্ছে কেন ? রিনি আমার হাত কই ? খুঁজে পাচ্ছি না কেন ? উহ্ আল্লাহ! আমি নানিকে দেখতে পাচ্ছি। আমাকে ডাকছে...।

ডাক্তার ছুটে আসেন। নিশির পাল্স দেখে ইনজেকশান পুশ করেন। মাথায় একটু চোট পেয়েছে। কিন্তু এত ভেঙে পড়ার কী আছে ? মেয়েটার নার্ভ বড় দুর্বল। প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে। বাসায় নিয়ে যান, দু'একদিন রেস্ট নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।

নিশি কেমন ঘুমিয়ে যেতে থাকে, সেই পৃথিবী বড় নেশাতুর বড় ভয়শূন্য। সে তার সব প্রসঙ্গ মেলে দেয় সেই হাওয়ায়, না, কোনো সন্দেহসিক্ত কঠিন মুখের সামনে জবাবদিহি নেই। এখন কেবল ঘুম।

দীর্ঘদিন পর রাতে বাবার বাসায় থাকা হয়।

আফজাল ঠাণ্ডা মুখে নিশির সমস্ত সেবাযত্ন করেছে। রাতে যাওয়ার সময় নিশি ওর হাত চেপে ধরলে বলেছে, না, এখানে থাকব না। তুমি থাক, যতদিন তোমার ভালো লাগে।

আমি এখানে থাকি, তুমি চাও না ?

নিশি আজ আমি কিছু বলতে চাই না। তুমি সুস্থ হয়ে ওঠো, তারপর এসব নিয়ে বলা যাবে।

আমি অসুস্থ এটা জেনেও তুমি আমার সাথে একটা রাত এখানে থাকবে না ?

তোমার সাথে আমার রাতে একত্রে থাকার সম্পর্ক না, আমি তোমার একজন পরিচিত মাত্র, তোমার সাথে এক বিছানায় ঘুমিয়েও আমি তোমার দিন-রাতের কিছু হিসেব জানি না। শোনো, তুমি এখন কথা বাড়িয়ো না, খামোখা উত্তেজিত হয়ে যাব।

আমার বান্ধবী ছন্দা, ওর অসুখ হয়েছে শুনে— নিশি অস্ফুটে উচ্চারণ করে। তুমি এসময় আমার সাথে এরকম আচরণ করছ, বিশ্বেস কর...।

তুমি ব্যাংকে যাওয়ার পথে দেবদূত এসে খবর দিয়েছে ছন্দার অসুখ ?

তুমি কি ভাবছ, নিশি মরিয়া হয়ে আফজালের হাত চেপে ধরে, আমার হাতে ফল ছিল, কোনো নিষিদ্ধ জিনিস না। আমার এ্যাক্সিডেন্টটা কোনো হোটেলের রুমে হয় নি।

গলা নামিয়ে কথা বলো, আফজাল ক্রমশ কর্কশ হয়ে ওঠে, বাবার বাড়ি এলেই গলার তেজ বেড়ে যায়, না? তুমি ব্যাংকের শেষ দিনে টাকা জমা না দিয়ে সেই টাকায় ছন্দার জন্য ফল— ছন্দা কে? এত সুহৃদ সে, কখনো তো নামটা ঠিকমতো শুনি নি। তোমার পৃথিবীর কোনো কিছুর সাথেই আমার পরিচয় নেই। এটাই আমার জন্য যথেষ্ট। এই সংসারে থেকেও তোমার একটা আলাদা জীবন আছে। যে জীবন আমার অজানা অচেনা।

নিশি বলে, আমার দুর্ঘটনা, আমার মৃত্যু এই সবের চেয়ে বড় তোমার সন্দেহ?

যে অল্পতে তুমি উত্তেজিত হয়ে ওঠো, আমার প্রতিদিনের শূন্যতা, আমার দিন-রাত্রির গল্প তোমাকে করার মতো নির্ভরশীলতা তুমি আমাকে দিয়েছ? কেন আমি ফিরে এলাম? কেন রাস্তায়ই মরে গেলাম না?

আমি যাচ্ছি, আফজাল দাঁড়ায়, তুমি সুস্থই আছ, ডাক্তার বলেছে, সামান্য আঘাত পেয়েছ। সুস্থ হলে যেদিন মন চায় বাসায় চলে এসো। আমি আজ এসব কিছু বলতে চাই নি, তুমিই খোঁচাচ্ছ।

যেদিন মন চায় বাসায় যাব? উদারতা দেখাচ্ছ?

উদারতা! না, ওই চিজ আমার মধ্যে নেই। আফজাল দরজায় পা রাখে। তোমার সাথে আর একটা শব্দ উচ্চারণেও আমার রুচি নেই। তুমি সুস্থির মতো এখানে থাক, আর চিন্তা করে দেখ তুমি আসলে কী চাও?

হে রাত্রি।

নিশি প্রার্থনা করে।

আমাকে দুটো উজ্জ্বল ডানা দাও। কোথায় রে আলাদীন? জ্বলে উঠুক প্রদীপ, আমি এইসব চক্র থেকে বেরিয়ে যাই। আমার যে রক্তের মধ্যে ভীতির গুঁড়িগুঁড়ি লাল কণিকা, তার মধ্যে সঞ্চিত হোক সীমাহীন তাকত, আমার জীর্ণ হাড় অদ্ভুত শক্তিতে জেগে উঠুক।

নিশি কাঁদতে কাঁদতে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

এইরকম নিস্তরঙ্গ দিনের মধ্যে ঘুটঘুটিয়ে শীত নামতে থাকে। জাহিদ মফস্বলের বাজার থেকে সস্তায় পুরনো গরম কাপড় নিয়ে আসে। এরি মধ্যে সন্দীপনের বিয়ে হয়ে গেছে। বিয়ের আগের দিন সে এসেছিল। জাহিদের হারিকেন জ্বালানো ছোট্ট ঘরটায় এসে দাঁড়িয়েছিল নতমুখে। ওর সেই মুখ ছিল দেখবার মতো, টাটকা রুটি হঠাৎ ঝলসে গেলে যা হয়। জাহিদ সেই মুখের দিকে তাকিয়ে সহসা কথা বলতে পারে না। সন্দীপন সেরকমই কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে এক সময় হাউমাউ কান্নায় ভেঙে পড়ে, যদি ভিন্ন ধর্মের না হইতাম দাদা, যুগ যুগ আমি অপেক্ষা করতাম।

সেই রাতে জাহিদ দেখছিল হীরার মুখ। ওর মুখের আলোটুকু কী রকম কালো বর্ণচ্ছটা বুঁজছিল। এ এক ছেলেমানুষী কৌতূহল। মেয়েটার মধ্যে কোনো বিকার নেই। সে পড়ার টেবিলে বসে জাহিদের দিকে নিষ্পলক তাকিয়েছিল। জাহিদের পাটীগণিতে সমস্যা হয়ে যায়। অস্বস্তি নিয়ে সে প্রশ্ন করে, তুমি কিছু বলতে চাও?

হীরা ফিসফিস করে বলে, মা কি স্বপ্ন দেখে জানেন? আপনার হাত ধরে এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবেন। জাহিদের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। বই ভাঁজ করে টেবিলে কনুই

ঠেসে মাথা চেপে ধরে। তারপর মুখ তোলে, এ তোমার এক ধরনের বিকার হীরা, তিনি মোটেই তেমন কিছু ভাবছেন না। আমি তোমাকে অন্যরকম জানি, তুমি তোমার ভেতর থেকে এসব ঝেড়ে ফেল। তুমি ভুলে যাচ্ছ, শুধু তোমার জন্যই তিনি তাঁর সারাটা জীবন ক্ষয় করেছেন। হীরার মুখ ক্রোধে নীল হয়ে ওঠে, তিনি মোটেই এমন কিছু করেন নি। আবদুল খালিকের সঙ্গে তার অনেক দিনের সম্পর্ক। আপনি কিছু জানেন না তাই এসব বলছেন, ওই যে কোনার ছোট্ট ঘরটা দেখছেন, হাদিস সম্পর্কে জানার নামে কী-সব গুজুর ফুসুর, ভেবেছিলেন— আমি ছোট্ট, কিচ্ছু বুঝব না। তারপর তার রক্তাক্ত ওষ্ঠযুগল কাঁপতে থাকে, সন্দীপনের দিকেও এক সময় তিনি চোখ দিয়েছিলেন।

জাহিদের ইচ্ছে হয় মেয়েটার গালে কষে চড় বসায়। তার চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। এতো শান্ত স্নিগ্ধতার মধ্যে এইরকম বিষ! ঘেন্না লাগে। ততক্ষণে হীরা কাঁদতে শুরু করেছে, আপনি আমাকে এখান থেকে নিয়ে যান, আমি আপনার সঙ্গে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরব, ঘাস লতাপাতা, যা খেতে দেন খাব...।

তাই বলে তুমি তোমার মা'র নামে এইভাবে কথা বলবে? জাহিদ সটান দাঁড়ায়, তুমি জানো তোমার বয়স কত? কী বলেছ তুমি বুঝতে পারছ? তোমার সাথে আমার বয়সের আসমান-জমিন তফাৎ। এ ছাড়া এইসব স্বপ্ন দেখার মতো বয়সে যেতে তোমার এখনো ঢের দেরি।

তা-ই যদি হবে তবে অতগুলো যুবক কীভাবে আমাকে...? হীরা ফুঁসে ওঠে, তারা জানত না আমার বয়স হয় নি? আমি এখন পৃথিবীর সবকিছু চিনি। আপনি আমাকে বিশ্বাস করছেন না, আমাকে খারাপ ভাবছেন? হীরা বিকারগ্রস্তের মতো হয়ে ওঠে। আমি নিজের চোখে দেখেছি আবদুল খালিক মাকে, ওই যে কোনার ঘরটা, ওখানে...।

দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে বৃদ্ধা, তার মুখ মৃতের মতো ফ্যাকাসে, রক্তহীন, সদ্য কাজলঠাসা চোখ বাঁশপাতার মতো কাঁপছে।

ব্যাগ কাঁধে নিয়ে জাহিদ ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। বাউলের ঘরের ফোঁকর গলিয়ে শীত কটমট করে তাকায়, জাহিদ দরজায় বসে দেখে বিশাল গ্রাম ডুবে আছে অদ্ভুত কুয়াশায়, কে বলবে দু'মাস আগে সারাগ্রামে নদীর মতো ঢল নেমেছিল? সারাদিন সারারাত ঘোর বর্ষা, সেসব জল রূপান্তরিত হয়েছে কুয়াশায়। কেন আমি ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে শহরে চলে যাই নি? নিজেকে এইরকম প্রশ্ন করার পরই অন্য এক বোধ, অন্য এক শীত কাঁপুনি তাকে অসাড় করে তোলে। এরি মধ্যে সে বার কয়েক লায়লাদের বাড়ি গিয়েছে। তার কাছে অবশিষ্ট যা-কিছু টাকাকড়ি ছিল তার বেশির ভাগই ওই পরিবারে ঢেলে ক'দিনের ব্যবধানে নিজেকে সে তাদের কাছে মহামানব করে তুলেছে। মেয়েটির গ্রাম্য চাউনি, ফরসা ত্বক, উন্নত বুক, জাহিদের মধ্যে রোজলিনের চেয়েও প্রগাঢ় এক অনুভূতির জন্ম দেয়। মনে হয় সেটা ছিল অল্প বয়সের মৃত্যুময় আবেগ। আর এ একেবারে যৌবনের অপরিহার্য কাঙ্ক্ষা। জীবনে তার নারী সঙ্গমের অভিজ্ঞতা নেই। নিশিকেও স্রেফ চুম্বন পর্যন্ত, এর কখনো সে সাহস করে উঠতে পারে নি। নিষিদ্ধ এলাকায় যাওয়ার ব্যাপারে ছিল আরো দুর্মর ভয়, মনে হতো, ওদের সারা শরীরে গিজগিজ করছে অসুখ—। যে জাহিদের এত সহনশীলতা, সে কিনা একটি গ্রাম্য মেয়েকে দেখে এইরকম যন্ত্রণাময় অনুভূতির

টানাপড়েনে বিপর্যস্ত ? কখনো মনে হয় এটা প্রেম। ওর মধ্যে যুক্তিতর্কহীনভাবে এই বিষয়টাই বাসা বাঁধছে। কখনো মনে হয়, এ স্রেফ ওকে কেন্দ্র করে এক জাতীয় দৈহিক তৃষ্ণা। নিজেকে কোনো বিন্দুতেই সে স্থির করতে পারে না।

মেয়েটাও দিনদিন কেমন লীলাপটু হয়ে উঠছে। অন্যের চাউনিতে ভীরুতা লক্ষ করলে মেয়েদের যা হয়। তাকে যেন বেশ একটা কায়দামতো পাঁকের মধ্যে পাওয়া হয়ে যায়। এখন তার মাথার ওপর ঝপাৎ করে পলো ফেলে শুধু হাত ঢোকানোর অপেক্ষা। মেয়েটার গ্রাম্য শীতল চাউনি ক্রমশ রঙ ছড়াচ্ছে। হাঁটার ভঙ্গিও হয়ে উঠছে কেমন আধো আধো, মাথায় ফিতে বাঁধতে গিয়ে এমনভাবে উর্ধ্বমুখী হাত তোলে, এমন প্রখর সচেতনতার সঙ্গে তার আঁচল খসে পড়ে, জাহিদ নিজেকে নিয়ে বেশ একটু মুসিবতের মধ্যে পড়ে যায়।

এক সময় সে মাকড়সার ফাঁদ থেকে সবেগে মাথা তোলে,আমাকে খুব শিগ্গিরই এই গ্রাম ছাড়তে হবে। এমন সিদ্ধান্তের পর সে চেয়ারম্যানের বাড়ি যায়। কেন ওর পেছনে লেগেছ তুমি ? জাহিদ নিজেকে প্রশ্ন করে, কতটুকু শক্তি আছে তোমার ? ছায়াগুলোকে খুঁজে পেলে তোমার অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। তাছাড়া যে কিশোরী নিজেই মেনে নিয়েছে তার অদৃষ্টকে, তার জন্য তোমার গলদঘর্ম হয়ে কি লাভ ?

একটি মেয়ের সরলতার মধ্যে ওরা বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছে, জাহিদ দাঁতে দাঁত পেষে, ওর জীবনের শুরুটা নষ্ট হয়ে গেছে। কিছু করতে পারি কি-না, সেটা পরের বিষয়, অন্তত গ্রামবাসীর সামনে উন্মোচিত হোক এ অজগর নয়, মানুষের কাজ।

চেয়ারম্যানের গলার টনসিলটা ফুলেছে। কষে মাফলার বেঁধে মুখে পানের দুটো পুরুষ্টু খিলি ঢুকিয়ে এরি মধ্যে তিনি দহলিজে আসর বসিয়েছেন। জাহিদকে দেখে উচ্ছ্বসিত হন, আরে এসো এসো, দেখো কী কাণ্ড, তুমি তো আবার পত্রিকার মানুষ। জাহিদ দেখে, মান্দার গাছের সাথে বাঁধা ঘোড়ার টগবগে একটা বাচ্চা। সে প্রশ্ন করে, বাহ্, ঘোড়াটা তো বেশ! কিনেছেন বুঝি ?

আরে না, ঘোড়া কেনার মতো ঘোড়ারোগ আমার নেই। এ এক জবরদস্ত ঘটনা। সেইটাই ওদের বলছিলাম। তুমি বসো, পুরো ঘটনাটা আমি বলি। মুখে আবারো মস্ত আকারের একটা খিলি ঠেসে চেয়ারম্যান শুরু করেন, আমার বড় সম্বন্ধি শহরের পৌরসভার চেয়ারম্যান। ঘোড়াটা নদীর ওপার থেকে কীভাবে জানি শহরের মধ্যে এসে পড়ে। বেওয়ারিশ ঘোড়া, ওখানকার ওসি ওটাকে নিয়ে নিজের বাড়িতে বেঁধে রাখে।

জাহিদ মোড়া টেনে বসে। উপস্থিত শ্রোতারা নিশ্চয়ই এর আগেই কাহিনীটা শুনেছে, কিন্তু তাদের মনোযোগের বহর দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে ভাষণ দিচ্ছেন। কথার মাঝখানে সামান্য রসালো বিরতি দিয়ে চেয়ারম্যান ফের শুরু করেন, এই খবর ডিসি-র কানে গেল। বুঝতেই পারছ অবস্থা, ওসি-কে জরুরি তলব পাঠানো হলো। ওসি তলব পেয়ে ঘোড়াসহই হাজির হয়ে জানায়, এর মালিক মিলছে না। আমি একে নিজের কাছে সাময়িক হেফাজতে রেখেছিলাম। এদিকে ঘোড়ার বাচ্চাটাকে দেখে তো ডিসি-র জিভে জল এসে গেল। তিনি ওটাকে নিজের কাছে রেখে বললেন, বেওয়ারিশ ঘোড়া, আপাতত আমার হেফাজতেই থাকুক।

কথায় আবার বিরতি। সবাই উন্মুখ চেয়ে আছে। এইবার চিবুনো পান পিকসহ গিলে চেয়ারম্যান হাসতে থাকেন, ব্যাটা ঘোড়া পেয়ে একেবারে ঘোড়ার বাপ হয়ে গেল। সে ওটাকে নিজের হাতে গোসল করায়, ভালো খাবার খেতে দেয়। এভাবে এক হপ্তা যাওয়ার পর আমার সম্বন্ধির টনক নড়ে। সে ডিসি-কে ফোন করে বলে, পৌরসভার ভেতরে এসে পড়া ঘোড়া মালিক না পাওয়া পর্যন্ত থাকবে চেয়ারম্যানের হেফাজতে। আপনি তাকে রেখেছেন কোন আইন বলে ? ডিসি ঘোড়াটির প্রতি তার সীমাহীন ভালোবাসার কথা জানায়। আর বলে, আমি এক হপ্তা ওটার পেছনে অনেক খরচ করে ফেলেছি। সে টাকা আমাকে কে দেবে ?

যাই হোক, ঘোড়া যথারীতি পৌরসভার চেয়ারম্যানের বাড়িতেই এলো। আমার সম্বন্ধি ডিসি-কে বলল, কোনখাতে কতটাকা খরচ হয়েছে, তার একটা হিসেব পাঠিয়ে দিতে। এর পরের দিন ডিসি এসে একেবারে ভেঙে পড়ে, মালিক চলে আসলেই তো আপনি ঘোড়াটাকে দিয়ে দেবেন। ততদিন আমি ওকে আমার কাছেই রাখতে চাই। এদিকে আমার সম্বন্ধিও একটুখানি দোটানার মধ্যে ছিল— মালিক যদি ঘোড়াটাকে খুঁজতে খুঁজতে জায়গা মতো এসে হাজির হয়, তাহলে ওর পেছনে খরচাপাতির সবটাই নির্ঘাৎ জলে যাবে। তাই ডিসি-কে এই শর্তে ঘোড়াটি দিয়ে দিল যাতে তিনি সুন্দরভাবে তার রক্ষণাবেক্ষণ করেন। মজাটা শোনো জাহিদ, ডিসি ব্যাটা ঘোড়াটা নেয়ার পনেরো দিনের মধ্যেই তাকে কাজে লাগিয়ে দিল। তো বাচ্চা ঘোড়া, সারাদিন মোট বইবার শক্তি তার আছে ? ঘোড়াটা ক'দিন পরই রুগ্ন আর অসুস্থ হয়ে পড়ল। আমার সম্বন্ধির তো মাথায় রক্ত উঠে গেল। সে লোক পাঠিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটার চিকিৎসার ব্যবস্থা করল। চিকিৎসা পেয়ে ব্যাটা সুস্থ হয়ে উঠলে আবার সে ডিসির মুণ্ডু চটকে ঘোড়াটাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলো।

জাহিদ হাসে, তা ওটা আপনার এখানে এলো কী করে ?

কপালের জোরে, চেয়ারম্যানের দরাজ হাসি, আরে আসল মজাটাই তো সেখানে। তিন মাস পার হওয়ার পর মালিক না আসায় মানুষের মধ্যে ফুসুর ফুসুর শুরু হয়ে গেল। আমার সম্বন্ধি এরপর ব্যাটাকে আমার এখানে পাঠিয়ে দিল ওর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। আর সবাইকে বলল, এটা সরকারি সম্পত্তি। তার জন্য যা যা করা দরকার সবই সে করছে। সে ভেবেছিল কয়েক মাস ঘোড়াটা আমার এখানে থাকলে সবাই তার কথা ভুলে যাবে। তার আরো সুবিধা হলো ডিসি অন্য জেলায় বদলি হয়ে যাওয়ায়। কিন্তু শ্বশুরের ব্যাটা সম্বন্ধি আমাকে তো চেনে নি, এই জিনিস কি তাকে আমি আর দেই ? বিয়ের সময় সে তার বোনকে একটা ষাঁড় যৌতুক হিসেবে দিতে চেয়েছিল। ব্যবসায় লস যাওয়ায় সেই প্রতিশ্রুতি আর পূরণ করতে পারে নি। ব্যাটা পরে ধনী হয়েছে। কিন্তু আমি কি আর সেই প্রতিশ্রুতি ভুলি ? কায়দা মতন তাকে ধরতে পারছিলাম না। ষাঁড় না দিলি, না হয় বোন জামাইকে একটা ঘোড়ার বাচ্চাই দে, তাও যদি সেটা তোর নিজের টাকায় কিনতে হতো, আমার সাথে ফেরেববাজি ? বোঝো এখন ঠ্যালা... হা-হা-হা।

এরপর পরিস্থিতি যেরকম সরগরম হয়ে ওঠে, এরকম একটা স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে জাহিদ কোনো কথা বলারই সুযোগ পায় না।

সে যখন গ্রামের পথে নেমে আসছে, দেখে, কার যেন ছায়া গাছের নিচের পথটা ধরে চেয়ারম্যানের বাড়ির দিকেই আসছে। জাহিদের কপালে গভীর চিন্তার রেখা, আশ্চর্য,

আবদুল খালিক! এই গ্রামে আবদুল খালিক কেন? জাহিদকে দেখে সে অন্যমনস্কভাবে মুখ ঘুরিয়ে রেখেছে। সে গাছের আরো আড়ালে চলে গেলে জাহিদ সত্যিই অবাক হয়। সে-তো চেয়ারম্যানের এখানে আসে না, আজ এসেছে কেন? তার এই ভাবনার ওপরই ঝপ করে চার পাশ ঘিরে অন্ধকার নেমে আসে।

নারদ বললেন, 'সুন্দরী স্ত্রী জাতির স্বভাব তা আমি তোমার কাছে শুনতে ইচ্ছা করি। পঞ্চচূড়া বললেন, আমি স্ত্রী হয়ে স্ত্রী জাতির নিন্দা করতে পারব না, এমন অনুরোধ করা আপনার উচিত নয়। নারদ বললেন, তোমার কথা যথার্থ কিন্তু মিথ্যা বললেই দোষ হয় সত্য কথায় দোষ নেই। তখন চারুহাসিনী পঞ্চচূড়া বললেন, দেবর্ষী নারীদের এই দোষ যে তারা সদবংশীয়া রূপবতী ও সধবা হলেও সদাচার লঙ্ঘন করে। তাদের চেয়ে পাপিষ্ঠ কেউ নেই, তারা সকল দোষের মূল। ধনবান রূপবান ও বশীভূত পতির জন্যও তারা প্রতীক্ষা করতে পারে না। যে পুরুষ কাছে নিয়ে কিঞ্চিৎ চাটুবাক্য বলে তাকেই কামনা করে। উপযাচক পুরুষের অভাবে এবং পরিজনদের ভয়েই নারীরা পতির বশে থাকে। তাদের অগম্য কেউ নেই পুরুষের বয়স বা রূপ তারা বিচার করে না। রূপ যৌবনবতী সুবেশী স্বৈরিণীকে দেখলে কুলস্ত্রীরাও সেইরূপ হতে ইচ্ছা করে। পুরুষ না পেলে তারা পরস্পরের সাহায্যে কামনা পূরণ করে। সুরূপ পুরুষ দেখলেই তাদের ইন্দ্রিয় বিকার হয়। যম পবন মৃত্যু পাতাল বাড়বানল ক্ষুরধারা বিষসর্প ও অগ্নি এইসবই একাধারে নারীতে বর্তমান।'

গতরাতটি ছিল অভিশপ্ত। জাহিদ যেন ধবধবে আলোতেও স্বপ্নের ঘোরে কেঁপে ওঠে। অথচ এ প্রসঙ্গেই জাহিদ একদিন জুবায়েরকে বলেছিল, চিরকাল এইভাবেই বিশ্লেষিত হয়েছে নারীরা। অথচ মুহুর্মুহু স্খলন ঘটে পুরুষের। এ স্বাভাবিক, এ যেন তার সহজাত সুন্দর স্বভাবের আরেকটি অংশ মাত্র। এজন্যই তাদের নিয়ে পুস্তক রচনার প্রয়োজন হয় না। আমার শাদা মাথায় যতদূর বুঝি, যেখানে যত বেশি দেয়াল, সেখানে ততবেশি অনাচার। জন্মের পর থেকেই একজন নারী নিজেকে সেই দেয়ালের মাঝখানে দেখতে পায়। অবদমন আর মুক্তির স্পৃহা তার মধ্যে সীমাহীন তৃষ্ণার জন্ম দেয়। তার শরীর বন্দি হয় কিন্তু চিন্তা আর কল্পনার অভাবনীয় বিস্তৃতি ঘটতে থাকে। সে হয়ে ওঠে রহস্যময়ী, এ তার নিজেকে প্রতি মুহূর্তে পুরুষের রচনা করা যে-কোনো পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারের অস্ত্র মাত্র। পুরুষ পৃথিবীর সমুদয় নারীর ওপর প্রভুত্ব করে, আর নারী দুর্বোধ্যতার জাল বিস্তার করে ঢুকে পড়ে পুরুষের দুর্বল জায়গাগুলোর ভেতর। তারপর প্রভুত্ব করে পুরুষের মগজের ওপর।

আজ জাহিদের মনের অবস্থা এমন যে, এ সম্পর্কিত তার যাবতীয় বিশ্বাস, চিন্তা, যুক্তি সবকিছুর মধ্যে যেন একটা ভয়ঙ্কর পাক লেগে গেছে। তার আজকের বোধটা এমনই, কোনো একজন পুরুষের বিশ্বাস ভঙ্গের কারণে যেভাবে একজন নারী পৃথিবীর তাবৎ পুরুষ জাতি সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে চলে আসে, গতরাতের দুঃস্বপ্ন তাকে নারীর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তেমনই একটি তাৎক্ষণিক বোধ এনে দেয়।

বাউলের তার বেয়ে রক্ত ঝরছে— তারই একটানা শব্দ, একটানা গতি জাহিদকে নিথর করে তোলে, কী যে হয়েছে তার! দূরের গ্রামে গিয়েছিল গান গাইতে। ফিরে এসে বাজারের

থলেটা ঘরের কোণে ছুঁড়ে ফেলে টেনে গাঁজা টানে। তারপর হঠাৎ করেই জুড়ে দেয় হু-হু কান্না। জাহিদকে বলে, বাঁচতে আর ভালো লাগে না। তারপর কোলে তুলে নেয় দোতরা।

মাটির সিঁড়িতে বসে শীতে কাঁপতে কাঁপতে জাহিদ দূর আঁধারময় গ্রাম দেখতে দেখতে তার হারিয়ে ফেলা কবিতা খুঁজতে থাকে। যেন দীর্ঘদিন পর জল থেকে উত্থিত তার চোখ দেখে, আমারও আকাশ ছিল। বুক ঠেলে কান্না ওঠে। সাথে সাথে বাবার শিশুমুখ, আবার শোনাও তো কবিতাটা, আবার। জাহিদ শোনায়, 'অন্ধলোক, তবু তার দূর দৃষ্টি ছিল। হঠাৎ হাত ফসকে পপাত বাইনোকুলার যেন সব শেষ, যেন দ্বিধায় জীবন্মৃত যেন থেমে আছে, মুহূর্তে পাথর থেকে ধার করে গতি।' এর চেয়েও গ্লানির, যন্ত্রণা আর অসহ্য লজ্জার ছিল গত কালকের রাত। জাহিদ সারাটা অলস দিন ঘটনাকে মেলাতে পারে নি— আদৌ বাস্তবে ঘটেছে, না কি স্বপ্নে ? লায়লার প্রতি সবে অনুভূতিটা প্রগাঢ় হয়ে উঠছিল। এ তাকে ফুলিয়েফাঁপিয়ে ব্যাপক করে তুলতে পারত। সেই মেয়ে কী না স্তব্ধ কুয়াশা ফুঁড়ে ঠা-ঠা রাত্তির মাথায় নিয়ে ভূতের মতো আবির্ভূত হলো ? ভূত হলেও কিছু বলার থাকত, এ যে স্রেফ জল, পুরোটা যৌবন নিয়ে ঢলে পড়ল জাহিদের ওপর ? ওর শরীর মোড়ানো ছিল কালো চাদরে। বাড়িতে বাউল ছিল না। গা থেকে সব খসিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে কাঁপতে কাঁপতে বলছিল, আমি জানি, এইডা পাপ, ফের আমারে অজগর টাইন্যা নিব, কিন্তু তার চাইতেও সর্বনাশা আগুনে পুইড়া খাক হয়া যাইতাছি। জাহিদের প্রথম অভিজ্ঞতা, কিভাবে নিজেকে বিন্যস্ত করতে হয় সে জানে না, বিস্ময়ে ভয়ে সে স্তব্ধ, তুমি, এত রাতে!

আমি বাঁশঝাড়ের ওই পাড় দিয়া ঘুইরা আইছি, আমি জানি না কিসে আমারে টাইন্যা আনছে।

বুঝছি নারী, তুমি দেবদাস পড়ছ, ভাবতে ভাবতে ওর তপ্ত শরীর স্পর্শ করে জাহিদের ভেতর হিম তরঙ্গ বয়ে যায়, তার কাছে কোনো ব্যবস্থা নেই, এ যদি গর্ভবতী হয়ে পড়ে ?

কাঁথার ওপর জাপটাজাপটিই সার হলো। ভয়ে-উত্তেজনায় জাহিদ ওকে ঠিক মতো রপ্ত করার আগেই স্খলিত হয়ে গেল। পরক্ষণেই লায়লার অতৃপ্ত গনগনে মুখ অন্ধকারেও ছুরির মতো ঝলসে উঠল, তুমি কি পুরুষ ?

এরপর যেন কর্পূরের মতন মুহূর্তের মধ্যে কুয়াশার ভেতর তার ছায়া মিলিয়ে গেল, আর জাহিদ ?

'অনন্ত ধিক্কার ওঠে চরাচরে, কষ্টের ভাষাকে লিখি ক্লীবলিঙ্গে, অনুবাদ করি নিজ বীর্যতত্ত্ব, পুরুষত্বহীনতার বোধ।'

সারসার ধান, দুধসুবাস, জাহিদ শ্বাস টানে, এ এক ভয়ানক স্বপ্ন ছিল, কখনই বাস্তবে ঘটে নি। বেদনার জায়গাগুলো ক্রমশ কেমন ধোঁয়ার মতন ঢেকে যেতে থাকে। এরপর ওঠে মৃদু বাতাস, অনড় ঠ্যাং বেয়ে পিঁপড়ে ওঠে। নিস্তরঙ্গ রক্ত চলাচলে তাদের সঞ্চারণ টের পাওয়া যায় না। কারো গলা খাঁকারির শব্দ, জাহিদ তরঙ্গহীন চোখে দেখে, খেজুর গাছটার নিচে এসে পাখির মতো দু'হাত ওপরে তুলে আবদুল খালিক গা থেকে কম্বল খুলছে।

খুলছেন কেন ? এখানে প্রচণ্ড শীত, কোনো আপ্যায়নহীন, কৌতূহলহীন, জাহিদের এ রকম কথায় কিঞ্চিৎ হতাশ আবদুল খালিকের কাশির বেগ বেড়ে ওঠে, ভিতরে বইতে পারি ?

আসেন।

মনে অয় বাউল আছে ?

শব্দে বুঝছেন না ?

আপনের সাথে কতা আছিল, চলেন, ওই খেজুর গাছের নিচে গিয়া বসি। বাতাসের সাথে সাথে মৌমাছির হুল ফোটাচ্ছে শীত। খেজুর গাছের নিচের ভেজা ঘাসে বসে জাহিদ দূরের চলন্ত বাতি-খণ্ড দেখে।

লায়লাকে অজগরে ধরার পর এই গ্রামের মাঠে মসজিদের ইমামের তত্ত্বাবধানে বিরাট এক নামাজের মহফিল হয়। গ্রামের প্রায় সমস্ত পুরুষ এই নামাজে অংশগ্রহণ করেছিল। সেই মহফিলে ইমাম ঘোষণা করেন, অজগর চইল্যা গেছে। আমি গতরাইতে খোয়াবে দেখছি, আর ডর নাই। গেরামের বিপদ কাইট্যা গেছে। সূর্যরে গ্রাস করে না রাহু ? ভাইসব, অত তেজী সূর্যরে গ্রাস করনের পরে কি রাহু তারে ধইরা রাখতে পারে ? পারে না। এই সাপ এই গেরামে তেমনই এক রাহু হইয়া আইছিল।

মাহফিলের পর আর কেউ অজগর দ্বারা আক্রান্ত হয় নি। স্বপ্নে আদেশপ্রাপ্ত ইমাম সাহেব গোরস্থানের জঙ্গল পরিষ্কার করেছেন। গোরস্থানকে কেন্দ্র করে গ্রামের মানুষের ভেতর থেকে ভীতি ক্রমশ অন্তর্হিত হয়ে তার পরিবর্তে জন্ম নিতে শুরু করে ইমামের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি। যে-কোনো সমস্যায়, অসুখে-বিসুখে মানুষ তার কাছে ছুটতে শুরু করল। ফলে দিনে দিনে কমে যেতে থাকল আবদুল খালিকের কদর। ঘটনাগুলো এত দ্রুত ঘটল, এত দ্রুত পাল্টে যেতে শুরু করল গ্রামের বাস্তবতা আবদুল খালিক রীতিমতো হতবাক হয়ে গেল। সংসার-জীবন বিপর্যস্ত। এর মধ্যে গ্রামের মানুষের তার প্রতি ভক্তি কমে আসতে থাকায় তার চেহারার দিকে আর তাকানো যায় না। সে খেজুর গাছের নিচে বসে ফিসফিস করে, যেন আজব এক খবর দিচ্ছে এমনভাবে বলে, অহনও অজগর আছে।

লোকটার জন্য জাহিদের মায়া হয়। কিন্তু এ রকম কনকনে বরফের মধ্যে বসে এই জাতীয় বুজরুকি আলাপ আর ভালো লাগছে না। সে এসব থেকে নিজেকে বিচ্যুত করতে দু'হাঁটুর ফাঁকে মুখ গোঁজে। সব অন্ধকার। এরপর নিশিকে মনে পড়ে, আমি অনুভব করতে পারি নি, আমি আসলে সর্বান্তঃকরণে তাকেই চেয়েছি এতকাল! অনুভূতি তাকে বিক্ষত করে তোলে। এরপর অস্তিত্ব-সঙ্কট প্রবল হয়, আমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। তারপর ? তারপর কী খাব ? কীভাবে বাঁচব ? কী হবে আমার পেশা ?

গেরামের গুঞ্জন হুনছেন ?

নতুন করে আবার কিছু হয়েছে নাকি ?

তাজ্জব মানুষ আপনে, আবদুল খালিকের কাশির বেগ বাড়তে থাকে, কেউ আপনারে কিছু কয় নাই ?

আমি গ্রামের এক মাথায় থাকি। আজ সারাদিন ঘর থেকে বের হই নি, কী করে জানবো ?

কারো মৃত্যু-সংবাদও প্রথম দেয়ার মধ্যে একটা উত্তেজনা থাকে, তেমনই এক বোধ আবদুল খালিকের কণ্ঠকে নাটকীয় করে তোলে, লায়লার সাথে গতরাইতে কি হইছিল আপনের ? হিং টিং ছট কতগুলো বল জাহিদের জমাট রক্তের মুখ খুলে দেয়, চলতে থাকে খেলা। সে শব্দহীন বসে থাকে এবং অপেক্ষা করে।

আপনে তারে বিবাহের প্রলোভন দিয়া, ছি ভাইসাব, আপনেরে আমি বড়ই শ্রদ্ধা করতাম!

কে বলেছে এসব ?

কে আবার ? লায়লা নিজেই। গেরামের মুরুব্বিগোর কাছে আইজ মাগরিবের ওয়াক্তে হেয় কইছে, গতরাইতে আপনে কাজির অফিসে গিয়া বিয়া করবেন, এই কতা কইয়া তারে বাড়ি থাইক্যা বাইর কইরা আনছেন, হের পরে এই বাউলের ঘরে...।

আবদুর খালিকের মুখ নিঃসৃত গরম ভাপে সামনের শীত সরে যায়। লায়লার সতৃষ্ণ দেহ না পেয়ে জাহিদের মাঝে মাঝে এ রকম হয়, বাবার রক্তবর্ণ মুখ মনে পড়ে, আমি পাপী পাপী।

কাইল ইমাম সাইব আপনেরে ডাকবো, সারা গেরাম জোট বানতাছে, বাদ জোহর আপনেগোর দুইজনেরই মাথায় পাথর মারা হইবো, হেই প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইলে পরে আপনি লায়লারে বিবাহ করবেন।

পাথর খণ্ড নিক্ষেপের পর বিবাহ ? জাহিদের হাসি আবদুল খালিককে সহসা ভীত করে তোলে, সহমরণের পরে পরকালে বিবাহ ?

প্রাণের মধ্যে চেপে বসেছে দুর্ভর ঠাণ্ডা, যেন ঠাণ্ডা নয়, মেঘের মতন বিশালাকৃতির পাথর। তারপর জাহিদের মাথা গরম হয়ে ওঠে, মেয়েটার মগজে এতটাই ফাঁপা বুদ্ধি ? ভেবেছে, শহরের ছেলে ফুর্তি করে যদি পালায় ? এই ভাবে তাকে কব্জা করে বিষয়টাকে বিবাহের দিকে নিয়ে যাওয়া ? এটা কোনো পথ ? তাকে এই গ্রামে বাস করতে হবে না ? অথচ ওকে কেন্দ্র করেই কীনা জাহিদের ভেতরে-বাইরে ক'দিন ধরে আকাশ-জমিন জ্বর! মনে হচ্ছিল দুর্লভ, সবচেয়ে বুদ্ধিমতি, সবচেয়ে রহস্যময়ী। এখন আবদুল খালিক কী চায় ? সে সহমর্মী হয়ে সমবেদনা জানাতে এসেছে, নাকি শুধু ঘৃণা প্রকাশ করার জন্য এমন ভয়াল শীত মাথায় করে তার এতদূর আসা ?

পুরুষদেরই বিচ্যুতি হয়, আবদুল খালিকের কণ্ঠ ক্রমশ অন্যদিকে মোড় নেয়। ব্যভিচারী নারী, তুই মাইয়া মানুষ হইয়া নিজের মুখে এই পাপ কথা হগ্গলের সামনে প্রচার করলি ? মাইয়া মাইনসের শরীল একবার কেউ ছুঁইলে সেই শরীলের জুড়া হাজার কাশ্মিরি সাবান লাগাইলেও সাফ অয় ? সে আপনের কতা কেউরে কিছু না কইয়া যদি পোয়াতি হইয়াও পড়ত, তাইলেও হেইডা আপনের পাপ হইতো না, এই কতাই ইমাম সাহেবের লগে হইতাছিল। সে যেহেতু হগ্গলের সামনে আপনেরে জড়ায়া এই কতা কইছে, তার পাপের ভাগীদার আপনেও অইছেন। আপনেরে এর শাস্তি ভোগ করতেই অইবো।

ইমাম সাহেব কী বললেন ?

তিনি কইলেন, গেরাম থাইক্যা যেহেতু অজগর দূর অইছে, সেইহেতু আসমানের দিকে তাকায়া এর শাস্তির অপেক্ষা কইরা লাভ নাই। নিজের হাতেই এই পাপের বিচার করতে অইব। আমি কইলাম, অজগর দর্শন করছিলাম আমি। সে যে দূর অইছে এমন কোনো বিষয় আমি স্বপ্নে পাই নাই, আমি মনে করি সে অহনও গোরস্থানে আছে, সময় মতন আবার দর্শন দিব।

শীত জর্জরিত আবদুল খালিকের দাঁতে দাঁতে ঠোক্কর লাগে, সে দাঁড়ায়, এই নিয়া বুঝবারই পারেন ইমাম সাহেবের কী রাগ! তার চোখ ফাইট্যা রক্ত ঝরতে লাগলো। আমিও সমান তেজে কইলাম, গোরস্থানে হাত দেওনের শাস্তি আপনে পাইবেন। হের পরে গেরামের মানুষ পড়লো বেকায়দায়। একদিকে ইমাম সায়েবের কতার উপরে তাগোর বিশ্বাস, অন্যদিকে অজগরের ডর, কুন দলে যাইব তারা, বুইঝ্যা উঠবার পারল না। বিষয়ডা আপনে আর লায়লারে দিয়া শুরু অইছিল, আমি এই কতা কওনে আপনেগোর উপরে থাইক্যা অন্যদিকে গড়ায়া গেল। কিন্তুক হেয় ঠিকই কাইল আপনারে ডাকবো। মাইনসের সামনে নিজের শক্তি দেহাইবার লাইগ্যা বেইজ্জত করব আপনারে। আপনে পুরুষ মানুষ। হিম্মত লইয়া বেবাকের সামনে খাড়াইবেন। বেইজ্জত হইব সেই কমিন নারীর, যে বেশরম নিজের মুখে পাপ প্রচার করছে। পুরুষের আবার লজ্জা কী?

পুরুষ! আরেকবার শুনল শব্দটি। এর আগে লায়লার মুখে শুনেছিল 'ছি পুরুষ'—এই উচ্চারণ। যেন এই একটি বিষয়ের মধ্যেই পৃথিবীর সার্বিক পুরুষত্ব নিহিত। এই ক্ষমতা তো রাস্তার একটি পাগলেরও থাকে। তবুও একটি নারীর কামনার মুখে পুরুষের ওইরকম বিপর্যয় তার অর্জিত পৃথিবীর সব শিক্ষা, সব ক্ষমতা পায়ের নিচে লুটিয়ে দেয়। তার নিজেরও তাই হয়েছিল, নিজেকে মনে হচ্ছিল ফাঁপা, অর্থহীন, অন্তঃসারশূন্য, সবচেয়ে বেশি ভীত। তারপর একটি মেয়েকে ছুঁতেও তার ভয় হবে। এইরকম দুর্বিপাকের মধ্যে পড়ে নিজেকে তার জানা হয়ে উঠল না। সত্যিই কি সে অক্ষম?

রাত গভীর হচ্ছে।

দোতরার শব্দ থেমে গেছে। আবদুল খালিককে বলার নেশায় পেয়েছে, সে দাঁড়ানো অবস্থা থেকে আবার নিচে এসে বসেছে। পাছার নিচের লুঙ্গি ভিজে একসা, কাশি ঠেকাতে কষে বাঁধছে মাফলার, কোরআন হাদিসের নানা উদ্ধৃতি দেয়ার পর সে বলে, ভাইসাব, নারীর যৌবন বড় মারাত্মক। দুনিয়ার বেবাক পুরুষ এইখানে বড় অসহায়। দুনিয়াডা এই এক কারণেই নানা পাপে জর্জরিত।

আঙুলে ফুটিয়েছি বিষদাঁত।

পাণ্ডুর নারী-মুখ শুষে নিলো রস, ফুটে উঠলো যৌবন— না জাহিদ, এ কোনো কবিতা নয়, তুই রবীন্দ্রনাথ পড়, জীবনানন্দ পড়— বাবার কথায় থেমে যায় হাত, শুধু নিশির উন্মুখ চেহারা ভেসে ওঠে, তুমি লেখ, তুমি সৃষ্টি করতে জানো, এই বিষয়টাই আমাকে তোমার প্রতি মোহগ্রস্ত করে তোলে, জাহিদ ঠাণ্ডা রাত্রির মাঝখানে বসে একসময় কম্পন হারিয়ে ফেলে, এ কিসের মধ্যে আমি এসে পড়লাম? কী সিদ্ধান্তে আসব লায়লা সম্পর্কে— ডাইনি? নির্লজ্জ? বিপত্তারিণী?

চলেন— যেন ঐশীবাণী নেমে আসে অন্ধকারে। আবদুল খালিকের দেহ স্তূপীকৃত বরফ থেকে যেন একটা আকৃতি নিয়ে ঝেড়েঝুড়ে দাঁড়ায়। জাহিদ মাথা তোলে, কোথায়?

প্রশ্ন করবেন না, কেমন অচেনা হয়ে ওঠে আবদুল খালিকের কণ্ঠ, বিপদরে আপনে ডরান না, যেদিন আপনের পয়লা দেখছি, সেইদিনই আমি আপনের চক্ষে দেখছি অবিশ্বাস। জিন, ইনসান, আল্লা কিছুতে আপনের বিশ্বাস নাই, আপনের ডর কী? আপনে আমার লগে চলেন।

এরপর আবদুল খালিক ক্রমশ বিমূর্ত হয়ে ওঠে। মুখের চামড়ায় কতটা তরঙ্গ, কী পরিমাণ ছায়া অথবা ক্রুদ্ধতা, অন্ধকারে ঠাহর করা যায় না। তবে কণ্ঠের ভারে ধারণা করা যায়, তার চোয়ালের হাড় শক্ত হয়ে উঠেছে। লোকটির মতলব কী ? জাহিদের শাস্তিই যদি তার কাম্য, তবে তার সিদ্ধান্ত তো হয়েই গেছে, নাকি সে ভয় পাচ্ছে জাহিদ পালাতে পারে। এ জন্যই কি সে তাকে সারারাত পাহারায় রাখতে চায় ?

কিন্তু তাকে সারারাত বেঁধে রেখে শাস্তি দেয়ার মতো ক্ষোভ কিংবা তীব্র ঘৃণা কোনোটাই তো তার মধ্যে লক্ষ করা যায় নি।

তখন আকাশে চাঁদ ওঠে। কুয়াশা ফুঁড়ে বড় তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে তার বিস্তার। এমনিতেই জাহিদ চন্দ্রাহত, জ্যোৎস্না তাকে বড় ঘোরে ফেলে দেয়। আর তা যদি হয় অবারিত গ্রামের, শীতের রাতের, তবে তো জাহিদের আর নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকার প্রশ্নই আসে না। কেমন ভীত হয়ে সে বলে, আপনি আমার সম্পর্কে সঠিক বলেন নি, সৃষ্টিকর্তায় আমার বিশ্বাস আছে।

চলেন— বলে হাঁটতে থাকে আবদুল খালিক। উর্ধ্বমুখী কব্জি তুলে জাহিদ ঘড়ি দেখার চেষ্টা করে, কিন্তু চন্দ্র আর কুয়াশা স্তূপ করে রেখেছে কাঁটা, অস্পষ্ট সব। জাহিদ নিজের অলক্ষ্যেই তার অনড় পা বাড়িয়ে দেয় আবদুল খালিকের পেছনে। সে ব্যভিচার করেছে, এই সূত্র ধরেই আবদুল খালিক অজান্তেই তাকে বীরের সম্মান দিয়েছে, বলেছে, কিছুতে আপনার ভয় নেই। কিন্তু দীর্ঘ বছর পর আজই তার ভয় হচ্ছে। আবদুল খালিকের রহস্যময়তা তার প্রাণের মায়া বাড়িয়ে দিচ্ছে। এই গ্রামের বাতাসে এত তুষ পোড়ার গন্ধ! শ্বাস রুদ্ধ করে জাহিদ হাঁটে। সামনে মাঠ নয়, খেত নয়, খুলে যাচ্ছে লম্বা সরণি। ঝিঁঝি পোকার দল যেন জাত হুনুরী, আলোকোজ্জ্বলতায় অপূর্ব করে তুলছে ঝোপকাঁটা। মধ্য গ্রামে দাঁড়িয়ে কুয়াশায় ভিজে ওঠে জাহিদের গোটা দেহ, সে ভেতরে দুর্বলতা চেপে কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন করে, আমরা কোথায় যাচ্ছি ?

আবদুল খালিক ঘুরে দাঁড়ায়। কুয়াশাটুপি খুলে মুখের জল মোছে। ঠা-ঠা জ্যোৎস্নায় মনে হয় তার দেহ আরো দীর্ঘ হয়ে উঠেছে। কী রকম কালো আর জাঁকালো হয়ে উঠছে তার সমস্ত অবয়ব। তার যে চোখ বদ্ধ ডোবার মতো, সেটা ফুঁড়ে আজ আগুন বেরুচ্ছে। চারপাশে মৃত্যুর স্তব্ধতা। ভয়ে জাহিদের বুকের স্পন্দন থেমে যায়। আবদুল খালিক ঠাণ্ডা স্বরে বলে, আইজ আপনেরে দুই মাতার অজগর দেখাইমু।

এতক্ষণের ভয়াবহ রহস্যময়তা মুহূর্তে হাস্যকর হয়ে ওঠে। কী বিচ্ছিরি নাটকীয়তা, জাহিদের বিরক্ত লাগতে থাকে।

কী রকম অন্ধকারের মধ্যে এরা আছে! এরপরই একটু স্বস্তি বোধ করে এই ভেবে, এ ব্যাটার ক্ষতিকর কোনো মতলব নেই। এতক্ষণ মাথার মধ্যে লায়লার বিষয়টাই পাক খাচ্ছিল। নিশ্চয়ই এই বিষয়কে কেন্দ্র করেই তার সামনে ভয়ঙ্কর কিছু দাঁড় করিয়ে রেখেছে আবদুল খালিক। না, সে এই বিষয় থেকে সরে নিজের অস্তিত্ব সঙ্কটের মধ্যে পড়েছে। কিন্তু দুই মাথা অজগরের প্রতি জাহিদের বিশ্বাস এনে আবদুল খালিকের কী লাভ ? যে লোককে কাল জনসমক্ষে দোররা মারার প্রস্তুতি চলছে সে চিৎকার করেও যদি জনতাকে দুই মাথা অজগরের বৃত্তান্ত জানায়, তাতে কি কোনো ফল হবে ?

এদের চিন্তার সূত্র ধরা বড় কঠিন। এদের সরলতার মধ্যেও এত প্যাঁচ, এত রাজনীতি, দুনিয়া দেখা মানুষও সেই জল-পাঁকের মধ্যে পড়ে মুহূর্তে টাসকি মেরে যেতে পারে। আপাতত আবদুল খালিককে বিরক্তিকর রকমের বোকা মনে হচ্ছে। শালা ভাব দেখিয়ে নিজেকে অসাধারণ কিছু করে তুলতে চাইছে জাহিদের কাছে!

জমাট রক্ত ছেড়ে দেয়ায় জাহিদ আরাম বোধ করে। কেমন ফুরফুরে হয়ে ওঠে সব, মুঠোর ভেতরে ছিল প্রাণ, শূন্যে উড়িয়ে দিয়েছি। ভেতরে মাংশ নেই, আত্মা নেই, হাড় নেই, স্রেফ ফাঁপা বেলুন, উড়তে উড়তে জাহিদের প্রশ্ন জাগে, আমি কে? কোত্থেকে কোথায় এসেছি? কোথায়ই-বা চলেছি?

চলেন, আবদুল খালিকের গম্ভীর কণ্ঠ এখন জাহিদের কাছে শিশুর মতো হয়ে ওঠে। সে হাসতে হাসতে বলে, আপনি চাইলেই তার সাক্ষাৎ পেতে পারেন? আবদুল খালিক লম্বা পা ফেলে নিঃশব্দে হাঁটতে থাকে। এ কথার উত্তর দেয় না।

এত দিন তো জানতাম অজগর যখন খুশি নিজের উদ্যোগে দেখা দেয়, আজ আপনি চাইলেই সে চলে আসবে?

দেহেন, আবদুল খালিক এবার কণ্ঠের ক্রোধ চেপে রাখতে পারে না, আপনে সীমা লঙ্ঘন করতাছেন।

তাহলে আমাকে কেন, গ্রামের সবাইকে ডেকে দেখান, তাইলেই তো ইমাম সাহেবের সব কেরামতি ভণ্ডুল হয়ে যায়।

জনসমক্ষে অজগর দেহা দেয় না, আবদুল খালিকের কণ্ঠ উত্তরে বাতাসে কাঁপতে থাকে, নির্জন চান্দ রাইতে কেউ তারে খাস দিলে ডাকলেই সে আসে। এই গেরামের কয়ডা মানুষের বুকের পাটা আছে, নিজে থাইক্যা তার লগে দেহা করতে চাইব? সেই শক্তি ইমাম সায়েবেরও নাই। তার কুকীর্তির কতা কে না জানে? বন্ধ্যা রমণীরে দরজা বন্ধ কইরা সন্তান লাভের তাবিজ দেয়, তওবা তওবা এইসব কতা আমি উচ্চারণ করবার চাই না, অন্যের গিবত গাওয়া মরা ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সমান। আইজ আমি পবিত্র দিল নিয়া বাইর হইছি, আপনে অহেতুক কতা বাড়াইতাছেন ক্যান?

জাহিদ উবু হয়ে বসে খাবলা দিয়ে তোলে সাজিমাটি, শূন্যে ছুঁড়ে দেয়, অহেতুক। তার হাত খসখসে হয়ে ওঠে। আকাশের আলোকোজ্জ্বল এক চক্ষু কটমট করে তার দিকে তাকায়, মধ্যরাত্রে আমি জেগে থাকি একা, নিঃসঙ্গ রাত সমুদ্র হয়ে ডাকে, একা? ওই যে আবদুল খালিক পিশাচের মতো তাকাচ্ছে, আর কতদূর নিয়ে যাবে হে? এত যে হাঁটছে, গ্রামও শেষ হয় না, গোরস্থানের নাগালও মেলে না।

জাহিদের হৃৎপিণ্ডে জলস্রোতের মতো পুনরায় ঢুকতে থাকে ভয়। সামনে খাদ, পাশ ঘুরে যেতেই বাঁশঝাড়। জাহিদ বিপন্ন কণ্ঠে বলে, আশ্চর্য, আজ আমি গোরস্থানের পথটা চিনতে পারছি না। আপনি এত ঘুরে আসছেন কেন?

হনহন হাঁটছিল আবদুল খালিক, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায়, এইডাই পথ। জাহিদ হাঁপাতে থাকে, সারাদিন কিছু খাই নি, সন্ধ্যায় খালি পেটে ভাত খেতেই কেমন উগড়ে এলো, আমি আর পারছি না।

এইডা হইছে আপনের রোজা না রাখনের অভ্যাসে, আপনের কপালে অনেক দুঃখ আছে, আপনি খোদার অসভ্য বান্দা।

জাহিদ ঘাসের ওপর বসে পড়ে, এখন আপনি ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন, আমি আল্লাহর কেমন বান্দা, সেটা আল্লাহ নিশ্চয়ই আপনার কাছে ওহি পাঠিয়ে জানিয়ে যান নি, এ সম্পর্কে আপনি কিছু না বললেই ভালো। বাদ দেন আপনার দু'মাথা অজগরের বুজরুকি। ওসব দেখার খায়েশ আমার নেই, আমি বাড়ি যাব।

বাড়ি ? হা হা করে হেসে ওঠে আবদুল খালিক, কোন্‌ডা আপনের বাড়ি ? বাউলেরডা, নাকি হীরাগোরডা ? বলে হু হু বাঁশঝাড়ের সামনে শাদা পাঞ্জাবি উড়িয়ে প্রেতের মতন দাঁড়ায়, ক্যাডা আপনে ? কোইলকাত্তা থাইক্যা আইছেন, এই মিছার কী দরকার আছিলো ? খালি হীরার মায়ের অনুরোধে এতদিন আপনেরে গেরামের মইধ্যে রাজা-বাদশার মতো ঘুরতে দিছি, নাইলে এই গেরামের মানুষজন শকুনের মতো আপনেরে ছিঁইড়া খাইতো।

ভয়ে কেঁপে ওঠে জাহিদ, মনের দুর্বলতা চাপতে শাণিত করে কণ্ঠ, কেন, আমি কি অপরাধ করেছি ?

খুন কইরা শহর থাইক্যা পলায়া আইছেন।

ক্রোধে বিহ্বল জাহিদের শরীর কাঁপতে থাকে, শালার বৃদ্ধ ভণ্ডপীর, জাহিদের জোয়ান হাতের এক ধাক্কায় এখনই নিচে পড়ে টাসকি মেরে যাবে! আর সেই জোরেই চক্ষু গরম করে, আমি না হয় খুন করে এসেছি, আপনি খোদার নেক বান্দা হয়ে হীরার মায়ের অনুরোধে আমাকে আগলে রাখলেন কেন ? তার প্রতি এই আলাদা দরদের অর্থ কী ? তার বাড়িতে তো আপনাকে আসতে দেখি নি, কখন যোগাযোগ হয় তার সঙ্গে ?

স্তব্ধ রাতে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে আবদুল খালিকের কণ্ঠ, জারজের বাচ্চা! একদম চুপ! আর একটা কথা কইছস তো— তখনি ঘটে যায় ঘটনাটা। জাহিদ সবেগে আক্রমণ করে বসে তাকে। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ভূপাতিত করতে চায় আবদুল খালিককে, তারপরই কি এক ঘোরাক্রান্ত ঘ্রাণ! মুহূর্তে আবদুল খালিকের দেহ যেন রূপান্তরিত হয় ইস্পাতে, হাতটা শুধু ঘোরাতেই তিন পাক খেয়ে জাহিদ কয়েক গজ দূরে ছিটকে পড়ে। চারপাশে এমন নেশাতুর ঘ্রাণ, এমন বদ্ধ কুয়াশা, জাহিদ সব ঝাপসা দেখে। প্রচণ্ড শীতে ঘেষটে উঠতে উঠতে সে টেনে চোখ খোলে, আশ্চর্য! আবদুল খালিকের আকৃতি ক্রমশ লম্বা হয়ে উঠছে কিন্তু তার চোখ হয়ে উঠছে আশ্চর্য রকমের শান্ত। যেন অলৌকিক কণ্ঠ বেজে ওঠে, চলেন।

পৃথিবীর সবকিছু ভুলে জাহিদ আবদুল খালিকের পা দেখে, উল্টো নয়তো ? প্লাস্টিকের জুতোয় ঠেসে আছে গোড়ালি, জাহিদ মোহগ্রস্তের মতো তার পেছন পেছন হাঁটে।

অনেক উথালপাথাল পথের পর, যেন সারারাত ধরে হাঁটার পর, জাহিদের শেষ প্রাণশক্তিটুকুও যখন ভেঙে পড়ছে, তখন তারা গোরস্থানের সামনে এসে হাজির হয়। জাহিদ ধারণা করে, এতোক্ষণে নিশ্চয়ই চারপাশে ভোর নেমে আসছে। চাঁদটাও গা ঢাকা দিয়েছে মেঘের ভেতর, নাকি সে শুয়ে পড়েছে পশ্চিমে। চারপাশে না ঘুটঘুটে অন্ধকার, না পর্যাপ্ত আলো, মায়ের মুখ মনে পড়ে, কী নিপুণ সুচের ডগায় ছোটবোনের জামা রিপু করছে, মা ছিলো বাবুই পাখি, লবণ খেয়ে পড়ে থাকলেও অন্য কোনো বাড়ির দাওয়াতে উচ্ছ্বসিত হতো

না আর বাবা চিরকাল চড়ুইয়ের মতন, এখানে-ওখানে উড়াল শেষে ডানা ভেঙে পড়ে গিয়েছিলেন বাবুইয়ের সংসারে।

গোরস্থান যেন আজগুবি দাড়ি-গোঁফ ছেঁটে সুনসান ভদ্রলোক হয়ে উঠেছে। এই পরিচ্ছন্নতায় জাহিদের ভেতরের অন্ধকার অনেকটা কেটে যায়। কিন্তু চাঁদ উঠেছে এবং তা মধ্য আকাশেই। জাহিদের শরীর হিম হয়ে আসে। এত দীর্ঘপথ এত দীর্ঘ সময় পেরোনোর পরও চাঁদ তার জায়গা থেকে এক চুল নড়ে নি। নাকি সময় অল্পই অতিক্রান্ত, কেবল মানসিক ভাবেই সে হেঁটেছে গোটা রাত্রি। এ যেন স্বপ্নের মতো। সারারাত হাজার ঘটনা ঘটার পর সকালে শোনা গেল, স্বপ্নের স্থায়িত্ব মাত্র কয়েক সেকেন্ড।

যেন কেউ নাকে গুঁজে দিয়েছে নিশিগন্ধা রুমাল। শীতে অবসাদে নুয়ে আসতে থাকে তার দেহ। লায়লা, তোমাকে আরেকবার চেষ্টা করা যেত?

সারসার কবর মনের মধ্যে কেমন বিষাদ এনে দেয়। খুঁড়লেই বেরিয়ে আসবে অসাড় কঙ্কাল, যার একদিন প্রাণ ছিল, রক্তমাংস ছিল, যার একটি মুখরিত পৃথিবী ছিল, আনন্দ, বেদনা— আবদুল খালিক কই?

জাহিদের মাথা ক্ষিপ্র গতিতে ঘোরে। চারপাশে মর্গের স্তব্ধতা। না, কোথাও আবদুল খালিকের ছায়া পর্যন্ত নেই। তবে কি ঝোপের ওপাশে পেশাব করতে বসেছে? ওই ঝোঁপ পর্যন্ত পথ হাঁটার মতনও শক্তি নেই দেহে, এখন কবর ফুঁড়ে ব্যাটা অজগর বেরিয়ে আসলেই তার কাজ শেষ হয়। গোরস্থানের এ পাশে টিলার ওপর বসে জাহিদ অপেক্ষা করে। ভয় কেটে যাচ্ছে প্রহর এবং যতই তা কাটছে, ততই যেন নিজেকে আরেকবার আবিষ্কার করা হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর যাবতীয় কঠিন বিষয়, অলৌকিকতা, মৃত্যু, আতঙ্ক এইসব বিষয়ে আসলেই সে উদাসীন। কিছুক্ষণ আগের আতঙ্ক তাকে নিজের কাছে প্রায় পরাজিত করে ফেলেছিল। অথচ এখন আবদুল খালিকের সব আচরণ হাস্যকর মনে হচ্ছে। তাকে সরল-সোজা মনে করে ব্যাটা নিশ্চয়ই ঝোপের আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে আছে। সে একা একটি কবরস্থানের সামনের টিলার ওপর বসে মহা বিরক্ত বোধ করে। আগামীকাল যদি সত্যিই তাকে জনসমক্ষে দোররা মারা হয়, তবে জীবনের আরেকটা রূপ চেনা যাবে, যা কোনোদিন তার স্মৃতি বা কল্পনাতে ছিল না। এই গ্রামে সে অপমানিত-লাঞ্ছিত হলেই-বা কি? এখানে এমন কে আছে যার সামনে নিচু হলে তার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যাবে? কে তাকে চেনে? যার সামনে সত্যিই তার বীরত্ব দেখানোর ছিল, এই অপমানে সে-ই হবে তার সহযাত্রী। এই জীবনে এই প্রথম সে যথার্থ অর্থে যুগল হবে। একটি রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে একজন নারী তার সাথে একই সঙ্গে জনসম্মুখময়..., একেই হয়তো বলে রোমাঞ্চময় রক্তপাত। সেই রক্তিম মুখটাকে দেখবার বড়ো সাধ হচ্ছে। যে নারী ইন্দ্রিয় বিকারের তাড়নায় মধ্য রাতে তার কাছে আসে। সে আদৌ পুরুষ কিনা সেই বিষয়ে সন্ধিহান হয়েও তার কামনায় নিজেকে এ রকম চরম সঙ্কটের মধ্যে ছেড়ে দেয়। তার সম্পর্কে আরেকবার কৌতূহল জাগে জাহিদের। কিন্তু সেই পাথর নিক্ষেপে যদি দু'জনকেই মৃত্যুবরণ করতে হয়?

নির্জন মধ্যরাতে এই ভাবনাটাই কিছুক্ষণের জন্য জাহিদকে বিপন্ন করে তোলে, না, প্রাচীন কালের শাস্তির পন্থার কিছুটা বদলে ঘটেছে, এখনকার দোররার অপমানটাই বড়। থানা-পুলিশের ভয়ে কেউ বড় রকমের রক্তারক্তির মধ্যে যায় না। বদ্ধ গ্রামের কিছু

কাঠমোল্লা আইন-শাসনের তোয়াক্কা না করে দোররাকে টিকিয়ে রাখছে। এখন অনেক গ্রামেই ব্যভিচারের শাস্তি মাথা ন্যাড়া করা, জুতো মারার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দোররার অসুবিধা একটাই, এক্ষেত্রে নারীরা লজ্জায়, বেদনায় আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় বলে বিষয়টা ফলাও করে পত্রিকায় চলে আসে, তারপরও এরা সাহস করে এই পদ্ধতিই বেছে নিয়েছে ?

আচমকা জাহিদের হাত-পা শিথিল হয়ে আসে, এই ব্যাপারটিও যদি পত্রিকায় চলে আসে ? 'সতত সতর্ক থেকে তবু যেন কেউ ভয়াবহভাবে পড়ে গেছে জলে।' জাহিদ নিজেকে জানাতে চায়, এসবে তোমার কিছু যায়-আসে না। পৃথিবীর সবরকম সামাজিকতার বিষয়ে তুমি চিরকালই নির্বিকার। না, ঘাবড়ে যাচ্ছে প্রাণ, কেমন কুচি কুচি অপমান জমা হচ্ছে, আমি কি আসলেই সতর্ক ছিলাম ? হ্যাঁ, রোজলিনের পরে অন্তত নারী বিষয়ে আমার মধ্যে অবচেতন সতর্কতা ছিল।

পায়ে ঝিঁঝি ধরে গেছে। কুট্‌কুট্ পোকা কামড়াচ্ছে। বিশ্বজগৎ থেমে আছে রাতের একটি প্রহরে। জাহিদ ভাবে, লায়লার কী হবে ? সারাটা জীবন কীভাবে বাঁচবে সে ? এই অপমানে সেও যদি আত্মহত্যা করে ? যে মেয়ে নিজের রাত্তিরের অভিসার জনসমক্ষে প্রচার করে, তার আত্মহত্যাই-বা কতটা যুক্তিযুক্ত ? হঠাৎ সতর্ক হয়ে ওঠে ইন্দ্রিয়, লায়লা নিজেই যে এটা প্রচার করেছে, এ ব্যাপারে সে কী করে নিশ্চিত হলো ? এটা তো আব্দুল খালিকের বানানো গল্পও হতে পারে। হয়তো কেউ তাকে রাতে বাউলের শূন্য বাড়িতে আসতে দেখেছে। পুরো বিষয়টা গ্রামে প্রচার হয়ে গেলে হয়তো লায়লাকে চাপ দিয়ে— প্রচণ্ড শীতেও ঘেমে উঠতে থাকে জাহিদ। এবং এটাই স্বাভাবিক। সে মেয়েটার প্রতি গভীর দায়িত্ব অনুভব করে। তাহলে কি এরা সবাই মিলে এই মেয়েটার সুন্দর জীবনটাকে নোংরা, কদর্য করে তোলার খেলায় মেতে উঠেছে ?

কোথায় গেলিরে তুই অজগর পুত্র আবদুল খালিক ? পেশাব করতে মানুষের এত সময় লাগে ? জাহিদ দাঁড়ায় এবং সেই মুহূর্তে তার অদ্ভুত এক অনুভূতি হয়। তার দেহটা নিচ থেকে নিশ্চল হয়ে গেছে। সে যেন পরিণত হয়েছে প্রাগৈতিহাসিক জীবাশ্মে। তার ভাবনা লুপ্ত হতে থাকে। সেই ক্রমবিলীয়মান ভাবনার মধ্যে অস্পষ্টভাবে মূর্ত হয় একটি রূপকথা, সার সার মানুষের কোমর থেকে পায়ের পাতা অব্দি পাথর হয়ে গেছে। নিজেকে পরীক্ষা করতে সে লাফাতে চায়। না, নিচের অংশ সক্রিয় হচ্ছে না। হাত দিয়ে সে পায়ে আঁচড় বসায়, নখ গিয়ে ঠেকেছে পাথরে। জাহিদের আঁত কেঁপে ওঠে। সে সরু চোখে তাকায় সামনের গোরস্থানের দিকে। সেখানে জমেছে রাত্তির কুয়াশা। তবে কি আবদুল খালিক কোনো জাদুমন্ত্র পড়ে হাওয়ায় উবে গেছে ? সামনের উড়ন্ত তুলো ভেদ করে হয় চন্দ্রালোক, নয় রক্তের নহর— কী যেন একটা ঝল্‌সে ওঠে! এর ভেতর থেকে এক্ষুণি যদি বেরিয়ে আসে প্রকাণ্ড এক অজগর ? জাহিদ পালানোর জন্য ক্ষিপ্রগতিতে মাথা ঘোরায়। রাস্তায় দেখা এক বৃদ্ধের চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে। তার পলকহীন চাউনি ছিল অসম্ভব মৃত, তার ঠোঁট-কোঁচকানো-কান্নাকে হাসি বলে ভ্রম হতো। তার পায়ের তলায় ছিল চার চাকার তক্তা, সে হাত দিয়ে চালিয়ে চালিয়ে রাস্তার পর রাস্তা ঘুরত। একদিন ভিখিরি ধরার অভিযানে পুলিশের লাঠি এগিয়ে এলে মুহূর্তে গজিয়ে উঠল পা। তক্তা ফেলে দৌড় দৌড় দৌড়!

জাহিদ নিজেকে বরফ থেকে মুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টায় লিপ্ত হতেই ঘটনাটা ঘটে, ঝোপের ওপাশ থেকে হুড়মুড় করে কারা যেন বেরিয়ে আসে। শীত এবং রাত্রির অন্ধকারে তাদেরকে বুঝে ওঠার আগেই সে নিজের দেহকে মুহূর্তে শূন্যের ওপর ঝুলতে দেখে। তার কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যায়, সেই কালো হাতগুলো, যারা তাকে ঝুলিয়ে রেখেছিল, তারা নিচ থেকে তার কাপড় খুলে নেয়। তারপর ছোট্ট বাচ্চাকে হাফপ্যান্ট পরানোর মতো করে গলা অব্দি ঢুকিয়ে দেয় একটি চটের বস্তা। কি হচ্ছে কিছুই বুঝতে না পেরে জাহিদ বিচলিত চোখ ঘোরায়। চাঁদ ঢুকেছে মেঘের তলায়। যেন মানুষ নয়, সমান আকৃতির এক রকম ছুলের কয়েকটি ছায়া। জাহিদের দু'চোখ হাঁ হয়ে আসে, যমজ ছায়া ? তাহলে এক্ষুণি অজগর উঠে আসবে ? এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে গিয়ে জাহিদের গায়ের লোম টান হয়ে ওঠে, হা ঈশ্বর, এসব কী হতে চলেছে ?

তার মৃতপ্রায় কণ্ঠ খরখরে হয়ে ওঠে, তোমরা কে ?

মুহূর্তে তার দেহ উড়তে উড়তে মাটিতে পতিত হয়, ছায়াগুলো বৃত্তাকারে ঘুরতে ঘুরতে তার শরীরে উপর্যুপরি আঘাত করতে থাকে। এমন আঘাত, না রক্ত না বেদনা, না কোনো চিহ্ন, জাহিদের দেহ অসাড় হয়ে উঠলে একটু থেমে পুনরায় আঘাত, এবার যেন ঠিক মেরুদণ্ডে। মার মুখ মনে পড়ছে, সমস্ত শরীরে আগুন ধরে গেছে, এরা তার দেহটাকে নিয়ে লোফালুফি খেলে যেন একবিন্দু ভার নেই, শরীরটা পাখির। এরপর আবার ফেলে দেয় নিচে। 'মানুষকে মানুষের হত্যা করার অর্থ মানুষের আত্মহত্যা করা'— কোথায় পড়েছিল সে ? এবার স্পষ্ট হয় দৃশ্য, কবর থেকে লতিয়ে উঠছে কোনো প্রাণী, তার প্রকাণ্ড দু'টি হাঁ, চেতনালুপ্ত হওয়ার আগে তার একটির মধ্যে আমূল ঢুকে যায় সে।

সামনে পরীক্ষা। নিশি নিজেকে ঢেলে দিয়েছে পাঠ্য-বইয়ে। আফজাল ফিরলে বারান্দায় বসে চা খেতে খেতে কত গপ্পো, দু'জনের ছেলেবেলা, যাবতীয় কষ্টের স্মৃতি, যা আজ স্মরণের মধ্যেও মধুময় হয়ে উঠেছে। এসব স্মৃতিচারণের অর্থ তার ভেতর দিয়ে পরস্পরের আরো কাছাকাছি আসা, দু'জনের মধ্যে আরো গভীর সহমর্মিতা। দাম্পত্য সম্পর্ক! বড় আজব এই চিজ। মনে হয় এই বুঝি ভেঙে দু'খান হয়ে গেল। পরক্ষণেই এত নিখুঁত কিছুক্ষণ আগের দাগটি পর্যন্ত ধুয়েমুছে একশা। রাতের বিছানায় দু'জনের যে সম্পর্ক হয়ে উঠেছিল বিস্বাদটা অভ্যাসের, যার মধ্যে না ছিল স্পন্দন, না উত্তেজনা, তা-ই আবার দু'জনের পারস্পরিক সহমর্মিতায় রোমাঞ্চময় হয়ে ওঠে। নিশি আফজালকে বোঝায়, প্রতিটি বিষয়ের আয়োজনটাই সবচেয়ে বড়। ভ্রমণ, সুস্বাদু খাদ্য, সাজসজ্জা— এর জন্য কত পরিশ্রম, কত জোগাড়যন্ত্র। অথচ আমরা বিছানায় গিয়ে কী করি ? এই আয়োজনটাকেই এড়িয়ে গিয়ে একদম পশু-পাখির মতো অভ্যাসের সহবাস করি। দাম্পত্যজীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টাকে সবচেয়ে অল্প সময়ের মধ্যে সেরে ফেলতে চাই। নিশির এই অনুভূতি আফজালের মধ্যেও একসময় সঞ্চারিত হয়, বাতি নেভানোর আগেও দীর্ঘসময় নিশির চুলে হাত বুলিয়ে সে বলে, এই কিছুদিন আগেও তুমি আমার জীবন থেকে কতটা দূরে ছিটকে গিয়েছিলে, এখন সেটা ভাবলেও অবিশ্বাস্য লাগে। বিশ্বেস কর, সন্দেহ মানুষকে অন্ধ করে দেয়। আমার যখনই মনে হচ্ছিল তুমি আমার কাছে কিছু লুকোচ্ছ, তখন থেকেই তোমার একটা সাধারণ আচরণও আমার কাছে রহস্যজনক মনে হতে শুরু করেছিল।

নিশি ঘর থেকে পারতপক্ষে বেরোয় না। ফরম্ ফিলাপ হয়ে গেছে। কলেজে ক্লাস নেই। হাঁপ ধরে গেলে টেলিফোনে স্বাতীর সাথে কথা বলে। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়, পড়া উপন্যাসের প্রিয় জায়গাগুলো বারবার পড়ে। রাতের বিছানায় একসময় আফজাল-নিশি কেউ কথা খুঁজে পায় না। নিঃশব্দ সময় কাটে, নখ খুঁটতে খুঁটতে নিশি বলে, কিছু টাকা জমলে ঢাকার বাইরে যেতাম, জীবনটা বড় বদ্ধ হয়ে গেছে।

এই বদ্ধতার মধ্যেই পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য কাজগুলো হয়, এই ধরো, সহমিলন, সন্তান উৎপাদন— কী বিচ্ছিরি সব কথা বলো! নিশির এই তিরস্কারে আফজাল হাসে, আমার সাথে যা করো তা উচ্চারণ করলেই বুঝি বিচ্ছিরি? তারপর হাত বাড়ায়, চুলোয় তাওয়া বসিয়েছি, এবার রুটি সেঁকব— কথা ক্রমশ পতনগামী হতে থাকে। দু'জনেই এ প্রসঙ্গে এমন সব শব্দ উচ্চারণ করে, দাম্পত্যজীবনে যা নিতান্ত স্বাভাবিক, অন্য যে কারুর কাছেই অশিল্পিত, জঘন্য রকমের অশ্লীল।

নিশির ভেতর থেকে এক সময় টানা দীর্ঘশ্বাস ওঠে, মনে হয়, এই স্বস্তি বড় স্বল্পস্থায়ী, শুধু এ জন্যই তার জন্ম হয় নি। আরো অনেক কিছু করার ছিল। সে কী-না সেই বিস্তারিত পথের সূচনা-বিন্দুতে পা না রেখে নিজেকে এই বদ্ধতায় বেঁধে সুখ কিনতে চাইছে? মমতাদির সেলাই মেশিনটা আনা হলো না। ও বাড়িতে যাওয়া মানেই সাজিদুল, সব মিলিয়ে চরম অস্বস্তিকর পরিবেশ। ফোনে কথা হয়েছে মমতাদির সঙ্গে। বলেছেন, তোমার মনোবল স্ফুলিঙ্গের মতো, এই ঝলসে ওঠে, এই নেতিয়ে যায়। কিছু যদি করতেই চাও নিজেকে কষে বেঁধে আগে গ্র্যাজুয়েট হও। সাজিদুল প্রসঙ্গে দু'জনের কেউই আর কথা বলে না।

এরি মধ্যে বন্ধ্যাত্ব-নিরোধ ক্লিনিকে আফজালকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল নিশি। ডাক্তার ওর স্পারম্ পরীক্ষা করে অত্যন্ত আশান্বিত হলেন। বললেন, চমৎকার রেজাল্ট এসেছে। নিশিকে দিয়েছিলেন হাজারটা টেস্ট। সব জমা দেয়ার পর নিশির পা থেকে মাথা পর্যন্ত সে কী কম্পন! ডাক্তার বললেন, নিশিরও রেজাল্ট মন্দ নয়, তবে ইনজেকশন দিয়ে ওর শরীরে কিছুটা হরমোন বাড়াতে হবে।

তারপর?

আলট্রাসনোগ্রাম করে দেখতে হবে নিশি সন্তান ধারণের জন্য উপযুক্ত কি না। সব ঠিক থাকলে পিরিয়ডের এগারো দিন পর নিশির যোনিপথ দিয়ে টিউবের সাহায্যে আফজালের স্পারম্ পুশ করতে হবে। ডাক্তার এমনিতেই স্বল্পভাষী, গম্ভীর। নিশি সীমাহীন কৌতূহল থাকা সত্ত্বেও এ বিষয়ে আর কিছু প্রশ্ন করতে পারে না। বাসায় এসে ওর সে-কী উত্তেজনা, টিউবে স্পারম্ পুশ করে দিলেই আমি মা হয়ে যাব? কী অবিশ্বাস্য! এ কখনো হয়?

আফজাল বলে, বিজ্ঞান অনেক দূর এগিয়ে গেছে। কিন্তু যাই বলো নিশি, বিষয়টা এতো সহজ, আমার সেটা মনে হচ্ছে না। নিশির আলট্রাসনোগ্রাম, ব্লাড টেস্ট সব হয়। ডাক্তার সব দেখে বলেন, হরমোনের কিছু ঘাটতি এখনো আছে, ইনজেকশান পুশ করে এর পরিমাণ বাড়িয়ে ফের আলট্রাসনোগ্রাম করে দেখতে হবে, সব ঠিক এসেছে কী না। এদিকে পাঁচ হাজার টাকা পরিণত হয়েছে পাঁচশোর একটা অসহায় নোটে। কয়েক দফা আলট্রাসনোগ্রাম করেও ডাক্তার নিশির দেহের সন্তান ধারণের সঠিক অবস্থাটি খুঁজে

পাচ্ছিলেন না। স্পারম্ পুশ করতে লাগবে দু' হাজার টাকা। নিশির মধ্যে নয়-ছয় শুরু হয়ে যায়। তার নিজস্ব যা সঞ্চয় সব ঢেলে দেবে। বিষয়টা তার কাছে একসময় এমন হয়, সে একটি সন্তান নিতে পারার বিনিময়ে যদি সর্বস্বান্তও হয়ে যায়, তাহলেও যেন বেদনার কিছু থাকবে না। সমুদয় রিপোর্ট নিয়ে যাওয়ার পর ডাক্তার সবশেষে বলেন, হ্যাঁ, আপনার হরমোন যথেষ্ট বেড়েছে, আশা করা যায় আরেকটা ইনজেকশানের পর এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা যাবে।

নিশিকে ইনজেকশান পুশ করার পর ফের আলট্রাসনোগ্রাম করতে হবে। রিক্শা নিতে এসে নিশির গতি শ্লথ হয়ে হতে থাকে, দুটো টেস্টে কম করে হলেও পনেরশো টাকা যাবে, কী করা যায় ?

এরপর মাথা রিমঝিম ঠাণ্ডায় শীতল হয়ে একটি সুস্থির চিন্তায় কেন্দ্রীভূত হয়, এ ব্যাপারে একমাত্র স্বাতীর সাহায্য নেয়া যায়। এবং এই মহিলার কাছ থেকেই কিছু নিতে তার কোনোমাত্র অস্বস্তি হবে না। বিছানায় শুয়ে অপূর্ব প্রত্যাশায় নিশির সর্বঅস্তিত্ব রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। তার শূন্য ফাঁপা পেটে হাত রাখতেই সেটা যেন হয়ে ওঠে অভিনব একটা জাদুর বাক্স, যার মধ্য একটি ভ্রূণ বিস্ময়করভাবে জীবন্ত এক শিশুতে পরিণত হচ্ছে।

এক সন্ধ্যায় হুলুস্থুল করতে করতে প্রবেশ করে স্বাতী। রেজার হাতে মোটা পলিথিনের ব্যাগ, নিশির বড্ড ভালো লাগে এই উচ্ছ্বাস, সুখবর আছে, বলতে বলতে রেজা সোফায় গা ছেড়ে দেয়।

সে তো ভাব দেখেই বুঝছি, আফজাল হাসে, সুখবরটা কী, তুই আবার বিয়ে করছিস নাকি ?

ট্যারা চোখে তাকায় স্বাতী, ওকে বিয়ে করবে কোন্ আহাম্মক, নতুন জুতো খচখচ করে বলেই না স্রেফ অভ্যাসের কারণে একসাথে বাস করছি।

দেখছিস, জুতোর সাথে তুলনা দিলো, রেজা এমন একটা হালকা ক্ষোভ প্রকাশ করলো, সেটা নিছক ঠাট্টা, না মন থেকে উঠে আসা চিকন রাগ, বোঝা গেলো না। আমাদের বাবাদের যুগটাই ভালো ছিল, স্ত্রীরা স্বামীদের কত ভক্তি-শ্রদ্ধা করত!

স্বাতী বলে, তা তো ভালো লাগবেই, দিনের বেলা স্বামীকে বাপের মতো ভক্তি-শ্রদ্ধা করত আর রাতে তার সামনেই বিছানায় উদোম হয়ে যেত।

রেজার চোখ থেমে যায়, এ কোনো ভাষা ? যাই বলো স্বাতী, তুমি একদম শিল্পবর্জিত।

আফজাল দ্রুত প্রসঙ্গটা ঘোরাতে চায়, সুখবরটা কী, একেবারে বোতল নিয়ে হাজির ?

সরল হাসিতে বিকশিত হয়ে ওঠে রেজার মুখ, আমি অফিস থেকে ছ'মাসের জন্য জাপান যাচ্ছি, একটা ট্রেনিংয়ে এবং সেটা আগামী মাসেই।

নিশি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, তাহলে আর আপনাকে পায় কে ? কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ? নিশ্চয়ই অনেক আগে থেকেই কথাবার্তা হচ্ছিল।

নিশ্চিত হওয়ার আগে কী করে বলি! নিশি ফ্রিজে বরফ আছে তো ? বলতে বলতে রেজা এক টানে ভদকার বোতলের মুখটা খুলে ফেলে, তো যা বলছিলাম, আজই নিশ্চিত হলাম এবং তারপরই— আফজাল বলে, তোর পৃথিবীতে আনন্দ প্রকাশের ভাষা তো এই একটা জিনিসের ভেতর দিয়েই। কিন্তু অরেঞ্জ জুস ছাড়া কি ভদকা জমবে ? আমার শরীরে

আজকাল এসব একদম স্যুট করে না, খাওয়ার পর সারারাত ঘুমের মধ্যে বাজে ঢেকুর ওঠে, সকালে অফিসে যেতে ইচ্ছে করে না।

শালা, ম্যাদা মার্কা কথা বলিস না, তোদের কাজের মেয়েটার নাম জানি কি, ও হিরণ, হিরণ—

মেয়েটা ভয়ে ভয়ে পর্দা তুলে উঁকি দেয়। রেজা বলে, চারটে গ্লাস ধুয়ে নিয়ে আস। চকিতে হিরণের মুখ সরে যায়, নিশি বরফ আছে তো ? শুরু না করে কোনো কথা বলে মজা পাচ্ছি না।

নিশি ইতস্তত করে, ও জিনিসটাই ফ্রিজে রাখতে মনে থাকে না। বাচ্চা ফ্রিজ, দুটো মাছ রাখলেই ভরে যায়, তা ছাড়া আমরা তো ওসব খাই না। তবে একটা ব্যবস্থা আছে, ওপর তলার ভাবির বাসা থেকে আনা যেতে পারে।

আফজাল বলে, কী বলছ তুমি ? বরফ চাইলে সন্দেহ করবে না ? এটা তো আর গরমের সিজন না।

নিশি বলে, হিরণকে শিখিয়ে দেব, গিয়ে বলবে আমি হাতে ব্যথা পেয়েছি, তারা তো আর কেস খুলে একটা বরফ তুলে দেবে না।

তোর বউয়ের বুদ্ধি, বলতে বলতে রেজা হাসে। নিশি দাঁড়ায়, গ্লাস আমিই আনছি। কাজের মেয়েটা এসব বোঝে না, একবার বুঝলে এ বাড়ির চাকরিই হয়তো ছেড়ে দেবে।

তারপর শুরু হয়।

নিশির পৃথিবীটা আবার অদ্ভুত তরঙ্গময় হয়ে ওঠে, মনে হয়, জীবনে বিচিত্রতা আছে। জীবন শুধুই একঘেয়ে নয়, সে ক্যাসেটে সন্তুর ছেড়ে দেয়। রেজা বলে, বোগাস, এটা কি টুং টাং গিটার শোনার সময় ?

নিশি বলে, এটা গিটার নয়, ধৈর্য ধরে শুনে দেখুন। এর ভেতর ঢুকে পড়লে আর বেরোতে পারবেন না। যাকে বলে মাকড়সার ফাঁদ।

তুমি যাই নাম দাও এর, রেজা ফের গ্লাসে চুমুক দেয়, এ গিটারই। না হলেও ওর যমজ ভাইটাই হবে। এইসব স্লো মিউজিক আমার একদম ভাল লাগে না, স্বাতীর কারণে রবীন্দ্র সঙ্গীতটা কষ্ট করে শুনি। একটা শোনার পর কেমন নেতিয়ে পড়ি, বুঝলে নিশি, জীবন অনেক ফার্স্ট হয়ে গেছে, গায়ে পড়ে কেউ নেতিয়ে পড়তে চায় ?

নিশি ক্যাসেট বন্ধ করতে চাইলে স্বাতী বাধা দেয়, ঠিক আছে বাজুক, এখন তো তুমি খাচ্ছো, চাইলেও এখন নেতিয়ে পড়তে পারবে না।

নিশি কেমন বিমর্ষ হয়ে ওঠে। আফজাল বলে, স্বাতী তুমি নাকি ফের নতুন উদ্যমে কবিতা লিখতে শুরু করেছ ?

স্বাতী কার্ডিগান টেনে বোতাম লাগিয়ে ঠকঠক কাঁপে, এও রাষ্ট্র হয়ে গেছে ? তারপর লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসে, ছোটবেলা থেকেই লিখতাম, জানেনই তো আমার কাছে এ ছিল অনেকটা ডায়েরি লেখার মতো, খুবই নিভৃত ব্যাপার। ইদানীং ভাবছি পত্রিকায় দেব। রেজা হাসতে হাসতে বলে, এ ওর নেশা নয়, অনেকগুলো সৌন্দর্যের সাথে বাড়তি আরেকটার সংযোগ, এবার একটা বইও করছে। যাই বলো স্বাতী, তোমার মধ্যে বেশ একটা ককটেল আছে। একদিকে কবিতা, অন্যদিকে ঐশ্বর্যের প্রতি আকর্ষণ।

সিগ্রেটে টান দিয়ে আফজাল বলে, কবিতা লিখলে কি ঐশ্বর্যের প্রতি আকর্ষণ থাকতে পারে না ? যাইহোক, বই হচ্ছে। কত টাকা দিচ্ছে ওরা ?

স্বাতীর উৎসাহ নিভে যায়।

নিশি ছটফট করে ওঠে, তোমার সবতাতেই টাকার প্রসঙ্গ। তুমি কবিতার বই কেন ? রেজা ভাই কেনে ? তবে ? বই বিক্রি হলে না টাকা আসার প্রশ্ন।

আফজাল কেস থেকে চেপে বরফ বের করে, পটাং করে একটি টুকরো লাফিয়ে নিশির গায়ে পড়ে। সেটা তুলতে তুলতে আফজাল বলে, বরফে স্ত্রীর শরীরের স্পর্শ মিশিয়ে খাচ্ছি। তো যা বলছিলাম, বুঝলাম না নিশি, তুমি এমন ক্ষেপে উঠলে কেন ? আমরা যদি কেউ কবিতা নাই পড়ি, নাই বই কিনি তাহলে এটা প্রকাশ করে কোনো লাভ আছে ? বাজারে ছাড়ার জন্যই একটা জিনিস তৈরি করা হলো অথচ দেখা গেল বাজারের কেউ সেটা কিনল না ?

কী এক জেদে স্বাতী এক চুমুকে গ্লাস শেষ করে ফেলে, তার চোখ লাল হয়ে ওঠে। সে কাঁপতে কাঁপতে বলে, আফজাল ভাই, এ ঠিক কোনো দ্রব্য বা জিনিস নয়, এ শিল্প। এ মানুষ নিজের জন্য সৃষ্টি করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এর মূল্যায়ন হয় না।

পর্দা সরিয়ে আফজাল জানালার গ্লাস টেনে লাগায়। তারপর বিব্রতকর ভঙ্গিতে বলে, তুমি মিথ্যেই উত্তেজিত হচ্ছো স্বাতী। নিজের জন্যই যদি রচনা তবে তা ডায়েরিতে থাকুক, টাকা খরচ করে বই করতে যাচ্ছ কেন ?

নিশি প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, একজন শিল্পীর গ্রন্থ মানে তার সৃষ্টির পরিপূর্ণ প্রকাশ, আমরা ঘরে নিজের ছবি বাঁধিয়ে রাখি না, আমরা তো আছিই, ছবি বাঁধানোর দরকার কী ? আগের দিনের রাজা-বাদশারা গাঁটের পয়সা খরচ করে মূর্তি, ইমারত তৈরি করে রাখতো। তার থেকে কি আর্থিক লাভ হতো তাঁদের ? আফজাল, আমাদের নিজস্ব কী আছে ? রাস্তার ফুটপাতে ঘুমনো লোকটার সাথে তোমার আমার কোনো পার্থক্য আছে ? সে মরলে যা হবে, আমরা মরলেও তাই হবে। কবরের ওপর একদিন পরই সবুজ ঘাস গজাবে। একজন শিল্পীর সৃষ্টি তার নিজস্ব। এ কেউ না কিনুক, না পড়ুক, মূল্যায়ন না হোক ; তবুও এটা তার একান্ত একার, যা সে পৃথিবীতে রেখে যাবে তার বেঁচে থাকার চিহ্ন হিসেবে।

স্বাতী কেঁদে ফেলে।

পরিস্থিতি কেমন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। সে শুধু অস্ফুটে উচ্চারণ করে, কেউ এভাবে বলে নি, আমি যাচ্ছেতাই লিখি, বাজে লিখি, লজ্জায় এ জন্য কাউকে দেখাই না, তবু নিশি, তুমি আজকে যা বললে, আমাকে একেবারে কিনে ফেলেছ।

সারা ঘরের ঠাণ্ডা শুষে নিয়েছিল যাবতীয় জল। নিশির রোমকূপ কেমন উষ্ণ হয়ে ওঠে। রেজা অনাহূতভাবেই বলে, শালা আফজাল আমাকে বলে, অরেঞ্জ জুস ছাড়া কি করে ভদকা খাবো ? ভেবেছিল, এইসব আমি জানি না। এসব ব্যবস্থা ছাড়াই আমি এসেছি ? আমি তোর মতো ফুটো বৈরাগী, সো-কল্‌ড্ আধুনিক ? এক চিমটি মদের সাথে এক গ্লাস জুস মেশাচ্ছে। শালা জুসই না হলে খা। আমার সাথে তোকে তাল দিতে কে বলেছে ? তারপর রেজা অন্যদিকে ফেরে, যাই বলো স্বাতী, তুমি বেশি ইমোশনাল হয়ে পড়েছ।

আরেকবার ঢোক গিলে আফজাল বলে, যাই বলিস রেজা, আমি নিশির এইসব খাওয়া পছন্দ করি না, স্বাতী তুমি অন্যভাবে নিয়ো না, আজ আমি মন ঝেড়ে কথাটা বলে দিলাম, কোথায় যেন আমার সংস্কারে লাগে। প্রথম দু'একদিন পরীক্ষা করার জন্য মজা করে চাইলো, না করি নি। কিন্তু খেয়ে এই যে ওর একদম টানটান থাকা, ভেতর থেকে বমি না ওঠা, মোটেই সরল মনে হয় না ওকে। হয়তো আউট হয়ে পড়লে তার চাইতে বেশিই বিরক্ত হতাম, আমি ঠিক বিষয়টা বোঝাতে পারছি না। কিন্তু তারপরও এই যে ও আউট হচ্ছে না, মনে হচ্ছে, এসবে ও ভীষণ পাকা, খুবই দক্ষ। এ ব্যাপারটাই আমার ভালো লাগে না।

গভীর স্তব্ধতা নেমে আসে ঘরে।

নিশির শ্বাস আটকে আসতে থাকে। এই একটি বিষয়েই সে আফজালের কাছ থেকে সামান্য মুক্ততা পেয়েছিল। হোক সে বছরে একদিন, তারপরও, তার এই টানা বদ্ধ জীবনে, যেখানে এক ঘণ্টার জন্য মার্কেটে গেলেও কৈফিয়ত দিতে হয়, যেখানে আফজালের মুখের রেখা মেপে মেপে তাকে কথা বলতে হয়, যেখানে তার কণ্ঠস্বর একগ্রাম উঁচুতে চড়লে দেখতে হয় আফজালের কুৎসিত ক্রুদ্ধতা, নিশিকে ভয় দেখাতে সে আছড়ে ফেলে কাচের অ্যাশট্রে, যেখানে প্রতিদিন নির্দোষ থেকেও তাকে মিথ্যে আর আপোসের ভেতর দিয়ে সংসারকে সুস্থির রাখতে হয়, সেখানে আফজালের এই একটি জায়গায় সংস্কারহীনতা তাকে এতদিন স্বস্তি দিত। না, এ নিয়ে সে তর্কে যায় না, গলা চড়িয়ে যুক্তি প্রদর্শনও করতে যায় না, শুধু ঠাণ্ডা মেজাজে বলে, আজকেই শেষ দিন, আমি আর কোনোদিন এসব খাব না।

তুমি বুঝছ না নিশি, জিনিসটা স্বাস্থ্যকর নয়, একটা বাজে নেশা, আমাদের যা প্রেক্ষাপট, তাতে এ নিছক ফ্যাশান, তুমি আমাদের বাপ-দাদার ঐতিহ্য দেখ? মাতাল মেয়েলোক, ভালো শোনায়?

প্রসঙ্গ এরপর নানা আবর্তে পাক খেতে থাকে, ক্রমেই বেসামাল হয়ে উঠতে থাকে রেজা। আর স্বপ্নের মধ্যে হাসতে থাকে স্বাতী, তার সাথে অহেতুক তর্কে লিপ্ত হয় আফজাল, তাদের আড্ডার বিষয়বস্তু অমিতাভ বচ্চন শ্রেষ্ঠ নাকি দীলিপ কুমার। স্বাতী বলে, নিশি, ইলেভেন নাইট ইলেভেন ডে দেখেছ? আরে, আমি আর রেজা দেখেছিলাম, একসাথে। এমনিতে আমি খুবই কম ছবি দেখি; কিন্তু ওই অসম্ভব সুন্দর নায়িকা, কী তার দেহের অ্যাপ্রোচ! ভেতরে কেমন জ্বলে যাচ্ছিলাম। তারপর মজাটা কী হলো জানো? সম্ভবত রেজার আমার চেয়েও তীব্র হয়েছিল এই বোধ, অনেকদিন আমাকে ছুঁয়ে সে একদম সুখ পায় নি।

সাথে সাথে রেজা আপত্তি করে, এই কথা তুমি উইথড্র কর। আমার সমস্যাটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তোমরা মেয়েরা সবকিছু এত বাঁকা করে বোঝো, কি নিশি, তুমি যে চুপ! ওই গাড়ল আফজালের কথা একদম ধরো না, শালা লেজে পাখি, ডানায় হনুমান, আমি তো ওকে চিনি!

নিশির শীতার্ত হাত আঁটো হয়ে ছিল ঠাণ্ডা গ্লাসে। তার ভেতর থেকে শিখার মতো জ্বলে উঠছিল জাহিদের মুখ। না, সে ঠিক স্বাতীর জন্য তর্ক করে নি। কবিতা লিখত জাহিদ। ওর মতন চোখ, হৃদয়ের প্রসারতা এই জীবনে দেখা হয়ে ওঠে নি। তার কবিতা,

তার সেই অদ্ভুত সৃষ্টি তাকে নিশির মধ্যে অভিনব করে তুলেছিল। ততক্ষণে ক্যাসেটের সন্তুরে মিশেছে হাজার কাচের টুকরো। কী তার বেগ! কী তার সঞ্চারণ! যেন হাজার হাজার ঘোড়া ছুটছে। স্বপ্ন আর বাস্তবের গোলক ধাঁধায় পড়ে চক্কর খাচ্ছে স্রোত! যেন সহস্র সোনালি হাঁস, তাদের ওড়ার শব্দ। বিচ্ছিরি গন্ধ লাগছে মদে। এর মধ্যেও যেন আলখাল্লা খুলে আচমকা দাঁড়িয়েছে স্বপ্নের মতো সুন্দর কেউ, যেন কঠিন শীত ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে ধোঁয়ার মতন বাষ্প, যেন কেউ নাচছে, তবলার ওপরের হাত ফেটে রক্ত ঝরছে, যেন কেউ হাসতে হাসতে হৃৎপিণ্ডে বসিয়ে দিয়েছে ছুরি! কী সবুজ রক্ত! সেখান থেকে জন্ম নিচ্ছে অজস্র বৃক্ষ।

যাই বলো, জড়িয়ে উচ্চারণ করে রেজা, বড্ড বাজে এইসব মিউজিক। হ্যাঁ, অলস মস্তিষ্কের লোকেরা শোনে, কথা নেই, ভাষা নেই, ল্যাংড়া পায়ে ঠেলতে ঠেলতে হেঁটে কেউ যেন হঠাৎ দৌড় তে শুরু করল। কী বলো নিশি, এ স্রেফ মিউজিক, কী ভাষা আছে এর ? কী কী বোঝতে চাইছে এ ? একজন বোবা মানুষের আ... আ...। কিন্তু তারপরও ভেতরটা এমন ছিঁড়ে যাচ্ছে কেন ? কেমন জানি রশি দিয়ে বেঁধে রেখেছে আমাকে, যেন এটা বন্ধ হলে সমস্ত পৃথিবী স্থবির হয়ে যাবে। না, কী যেন একটা আছে এর মধ্যে, যার চক্র থেকে আমি চাইলেও নিজেকে মুক্ত করতে পারছি না।

ঠিক সেই মুহূর্তে ঘাই দিয়ে মাথা তোলে স্বাতী, রবীন্দ্রসঙ্গীতও অনেকটা ও-রকম, তুমি তো শুরুটা শুনেই নেতিয়ে পড়, একটু ধৈর্য ধরে শুনে দেখতে, এরচেয়েও গভীর মর্মস্পর্শী, কী বলব, এরচেয়েও—

আফজাল বলে, বিচ্ছিরি সব প্যানপ্যানে আলোচনা হচ্ছে। নাহ্ আজ আর এক পেগও নেবো না। তোর তো আটটা হয়ে গেছে রেজা, না ? আমি তোর অর্ধেকেরও কম, যদিও ও-ই আমার জন্য যথেষ্ট, তবুও কেমন যেন জমে উঠছে না। আর এই যে কী একটা মিউজিক বাজছে ,আমার মাথা ধরে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে মাথা থেকে কেউ কচলে ঘিলু বের করে নিতে চাইছে, অসহ্য! সবচেয়ে বিচ্ছিরি লাগছে তুই আবার ওটার তারিফ করতে শুরু করেছিস।

নিশি গ্লাস রেখে দেয় টেবিলে, তারপর দাঁড়ায়, কেমন টলে উঠছে পা। না, এ সময় কারো সাথে ভদ্রতার কিছু নেই, সটান গিয়ে শুয়ে পড়লেও কেউ কিছু মনে করবে না। মাথা ঝিমঝিম করছে। কমোডে হড়হড় বমি ছেড়ে মুখে জলের ঝাপটা দেয়। অরেঞ্জ জুস ঠেলে ভদকার গন্ধটাই প্রকট হয়ে উঠছে। বিছানায় শুয়ে ঘূর্ণায়মান ফ্যানের দিকে তাকায়, অনন্তদা, তুমি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন বাতাসের সাথে মিশে গিয়েছ ? তোমার চেহারাটা মনে করতে পারছি না। কেবল নাক, কেবল চোখ, সব মিলিয়ে আবছায়া পাণ্ডুর আকৃতি। এই ভগ্ন নিশির কোন অতলে তোমাকে খুঁজে পাব ?

মনে হচ্ছে, পিঠের নিচে শয্যা নেই, ফাঁপা বাতাস। কেন আমি এই ছেলেটাকে বিয়ে করেছিলাম ? নিশির নীরস ঠোঁট জোড়া কেঁপে ওঠে, কে আমাকে দায় দিয়েছে, যার সাথে আমার সূক্ষ্ম নাড়ির কোনো যোগ নেই, সেই মানুষটার সাথে সারাজীবন একঘরে বাস করার ? আজ যদি বেওয়া নারী হয়ে এই শহরে ঘুরি, কতটা দুঃখ হবে আমার ? পরক্ষণেই ছটফট করতে করতে নিশি বালিশ খামচে ধরে, এসব আমি কি ভাবছি ? তার মৃত্যুও আমার জন্য পর্যাপ্ত বেদনার নয় ? সে কি ক্ষতি করেছে আমার ? নিশি বিছানার মধ্যে পাক

খায়, ওই যে বৃত্তাকার জন্তুমুখের মানুষগুলো, যারা আমাকে ঘিরে উল্লাস নৃত্য শুরু করেছিল, তাদের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে রক্তাক্ত হয়ে উঠেছিল আমার বড় ভাই, যদিও আমি তাকে চিনি না। বাবা-মা কেন, তাদের কুল-গুষ্টির কাউকে চিনি না। অথচ সে অস্তিত্ব একদম প্রাণের কাছের নয়, তার সাথে আমাকে জুড়ি বেঁধে দেয়া হলো, সে-ই অস্তিত্ব সব হয়ে উঠল। একটা সময় মা যদি বলত, আমি অনেকদূর চলে যাব, আমাকে জুজুবুড়ি ধরে নিয়ে যাক, মৃত্যুযন্ত্রণায় কেঁপে উঠতাম। এক বিছানায় ঘুমুতাম আমরা তিন ভাইবোন, মনে হতো, জীবনের বিনিময়েও বৃন্তচ্যুত হওয়ার কথা ভাবা যায় না। আমরা একত্রে জন্ম নিয়েছি, একইজল-হাওয়া খেয়ে বড় হচ্ছি, মৃত্যু পর্যন্ত এভাবেই থাকব। আজ কোথায় আমরা? তাদের প্রতি আমার মমতা প্রকাশ করাটাই এখন বাড়াবাড়ি। আমিও তাকে দূরে রাখতে নিজেকে কঠিন করে তুলছি। নিশি ডুকরে কেঁদে ওঠে, অথচ সেদিন, সন্তান-কাঙ্ক্ষায় যখন আমি নিরন্তর দৌড়চ্ছি ডাক্তারের কাছে, আফজাল বলল, যদি সত্যিই এ পরীক্ষা সফল হয়, আমার বংশের উত্তরাধিকার হবে সেই শিশু। বলা যায় নতুন করেই কেঁপে উঠেছিলাম আমি। দৌড়ঝাঁপ করে, বুকের হাড়-মাংস কেটে যার জন্ম দেব, যার মুখে তুলে দেব নিজের স্তন, পৃথিবীর কোথাও অভিভাবক হিসেবে তার জন্য আমার নামটি পর্যন্ত থাকবে না? আমি কেবল সেই সন্তানের পালনকারিণী? আমি যদি প্রসব করি, সেই সন্তানের জন্য আমার পরিবার যদি রক্তক্ষয় করে ফেলে, তারপরও আফজালের সেই সুদূর গ্রামের ভিটে, যেখানে হয়তো কোনোদিন আমার সন্তান একরাত ঘুমুতেও যাবে না, সেটাই হবে তার বাড়ির পরিচয় আর সংযোগ-সূত্রের একমাত্র স্থান? পৃথিবীর যে-কোনো জায়গায় আফজাল তার ভ্রূণ ছিটিয়ে ফেলুক, নিশি অকস্মাৎ ফুঁসে ওঠে, একটি ভ্রূণের যদি এতই ক্ষমতা, তবে আমি আর নিজের অস্তিত্ব বিপন্ন করে অন্যের সন্তানের মা হবে না এই ভাবে, স্রেফ এই ভাবেই আমার জীবন যাবে। নিশির শিথিল হাত-পা শক্ত হয়ে ওঠে সর্বঅস্তিত্ব ছেঁকে ধরা ঘোর তরল হয়ে ওঠে। তারপর সে ঘুমিয়ে পড়ে।

মমতাদির সঙ্গে দেখা হলো পরদিন। তাঁর কলেজে।

নিশিকে দেখে আন্তরিক উদ্ভাসনে এগিয়ে এলেন, বললেন, আমার আর একটা ক্লাস আছে। তারপর আমি ফ্রি, কিন্তু ততক্ষণ তুমি বসে থাকবে?

নিশি হাসে, আমি না হয় পেছনে বসে আপনার লেকচার শুনলাম!

তা মন্দ বলো নি, মমতাদি বারান্দা ধরে হাঁটেন, যদিও আমি খুব বাজে পড়াই, তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়বে, কিন্তু কি আর করা যাবে, তবে এরপর আমরা কোথাও গিয়ে বসব, খুব মজা করে আড্ডা দেয়া যাবে।

ক্লাসে গিয়ে মমতাদি সব ভুলে মুহূর্তে ডুবে গেলেন তার সাবজেক্টের গভীরে। কী চমৎকার, কী মনোরম তাঁর বলার ভঙ্গি, নিশি আর তাঁকে চিনতে পারে না।

দুপুরে দুটো খেয়ে বন্ধ্যাত্ব-নিরোধ ক্লিনিকে গিয়েছিল নিশি। ডাক্তার সব দেখে বললেন, রেজাল্ট একদমই ভালো বলা যায়। আপনারটা করা হবে আর পাঁচ দিন পর, এর আগে আর একবার ইনজেকশন নিলেই আশা করা যায় একটা ফাইনাল সিদ্ধান্ত নেয়া হবে

এরপর শেষবারের মতো আলট্রাসনোগ্রাম করে জরায়ুর অবস্থাটা বুঝে সব মিলিয়ে এগারো দিনের মাথায় আমরা কাজটা করে ফেলব। বলে, ডাক্তার ঘচঘচ করে কী সব লিখে দিলেন প্রেসক্রিপশানে। নিশির ঝাপসা চোখ সেটা আর দেখতে পেল না।

রাস্তায় বেরিয়ে রীতিমতো কান্নাই পাচ্ছিল। স্বাতীর কাছ থেকে লোন করার পর পরবর্তী টেস্টে সব টাকা বেরিয়ে গেছে। এখন বাকি আরো টেস্ট— নিশির চোখ ঠেসে যায় রিকশার গিজগিজে ভিড়ে। গতরাতে কী সীমাহীন তিক্ততায় বুকটা ধরে আসছিল সন্তানের প্রতি। সকালেই উন্মুখ শূন্যতায় ভরে উঠল বুক। পৃথিবী স্বীকৃতি না দিক, তারপরও আমার অস্তিত্ব ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা সন্তানের আমিও সমপরিমাণ অভিভাবক। এত আমি নিজে জানব। ঠিক আছে তার জীবনে অভিভাবক হিসেবে মাতৃপরিচয় থাকবে না, কিন্তু সেই শিশুটির সাথে আমার হবে শ্রেষ্ঠতম নাড়ির সম্পর্ক। সেই নাড়িও কি সেই স্বীকৃতির জন্য কাঙাল হয়ে থাকবে?

রেস্টুরেন্টে বসে মমতাদি বলেন, চায়ের সাথে আর কিছু?

স্রেফ চা।

তারপর স্থবিরতা। নিশি উশখুশ করে বাইরের দিকে তাকায়, নিস্তেজ হয়ে আসতে থাকা রোদের নিচে মানুষের কী বিচ্ছিরি ভিড়। নিশি বলে, মমতাদি আমি মেশিনটা নিতে চাই, কিন্তু—।

মমতাদি হাসতে থাকেন, এ তো ভালো খবর, তুমি এতো অস্বস্তি বোধ করছ কেন? আমিই তো তোমাকে বলেছিলাম। নিশি হুট করে গরম চায়ে চুমুক দিয়ে বসে, নিজেকে সামলে পিরিচে ছলকে-পড়া-চা পুনরায় কাপে ঢেলে বলে, শুরু করতে হলে কিছু কাপড়, লেস এসব তো কিনতে হবে? মানে, আমি বলতে চাইছি, আমার সেরকম প্রস্তুতি নেই, তারপর দোকানে দিলে বিক্রি হবে তো?

মমতাদির হাসি রহস্যময় হয়ে ওঠে, তুমি তো টাকার জন্য শুরুই করতে পারছ না, বিক্রির প্রশ্ন তো পরের ব্যাপার।

নিশির মুখ লাল হয়ে ওঠে। সে মাথা নিচু করে টেবিলে আঙুল ঠুকতে থাকে, এসব কারণেই আমার কিছু হচ্ছে না, হবেও না।

মমতাদি বলেন, নিশি, আগেই বলেছি এ বিষয়ে আমিও তোমার সঙ্গে থাকতে চাই। আমার পরিচিত দোকান আছে, তাদের পছন্দ সম্পর্কেও আমি জানি। কাপড়, লেস, ডিজাইন সম্পর্কে ধারণা আমি তোমাকে দেব। তুমি শুধু তৈরি করবে। কেবল আমার সঙ্গে আর কখনো ভদ্রতা করো না, আমার ভালো লাগে না।

নিশি মমতাদির হাত চেপে ধরে, তার চোখ ভিজে ওঠে, এরপর সে অসংলগ্ন হয়ে ওঠে, বড্ড নিঃসঙ্গ আমি, আপনি কল্পনাই করতে পারবেন না, মনে হয়, আমার সমস্ত অস্তিত্বের বিনিময়ে আমি যদি একটি সন্তানের মা হতে পারতাম! এখন আসলে এ জন্য হলেও কিছু উপার্জন করা দরকার। আপনি বুঝতে পারবেন না, কোনো কিছুতে আমি প্রেরণা পাই না।

নিশি, সমস্যাটা কার?

ডাক্তার বলেছেন আমাদের দু'জনের কারুর না।

তাহলে অপেক্ষা কর। এরকম অনেকেরই হয়। তাছাড়া, মমতাদি বিমর্ষ হয়ে ওঠেন, আমার জীবন তো দেখছ, নাড়ি ফুঁড়ে বের হয়ে আসা সন্তানেরা আমার হৃৎপিণ্ডে যেন আজন্ম এক ছুরি ঢুকিয়ে রেখেছে। কত রাত মনে হয়, আমি নিঃসন্তান হলে সুখী হতাম।

সামনের চা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

দীর্ঘ সময় পর অত্যন্ত ধীর ম্লান কণ্ঠে নিশি প্রশ্ন করে, আচ্ছা সাজিদুল, ও কি পুরোপুরি সেরে উঠেছে?

তোমাকে তো বলাই হয় নি, ও একটা চকলেট ফ্যাক্টরিতে কাজ পেয়েছে, এখন অনেকটা সুস্থ।

সন্ধ্যায় আফজাল বাসায় ফেরে নি। রেজার সাথে কোথাও গিয়েছে। চাকরির বাইরেও একটা কিছু করা যায় কি-না, সে খুঁজছে। খুব ভদ্র ফ্যামিলিতে দু'ঘণ্টার জন্য একটা টিউশনি হলেও। বাড়িতে ওর বাবার শরীর খারাপ, আফজালকে লিখেছেন, দেখে আসার জন্য।

হিরণ রান্নাঘরে। নিশি ঘরের ঝুলকালি পরিষ্কার করে কুসুম গরম পানিতে হাত-মুখ ধোয়। সামনের ছোট বারান্দাটার বালব্ ফিউজ হয়ে গেছে। ঘরের বাতি জ্বালিয়ে দরজা খোলা রেখে সে এক কাপ চা নিয়ে সেখানেই এসে বসে। চারপাশে স্রোতের ফেনার মতো কুয়াশা, সামনের বিল্ডিংয়ের কাজ চলছে, মাথা ফুঁড়ে না ওঠা পর্যন্ত এখনো এক ফালি আকাশ দেখা যায়। শীতের কাকেরা ক্যাচম্যাচ করছে আমগাছে।

দরজায় শব্দ।

চেয়ারে কাপ রেখে নিশি খুলে দেয়। ঝোলা প্যান্ট, গায়ে সোয়েটার চাপানো খোঁচা খোঁচা জঙ্গুলে দাঁড়িতে মুখ ঢাকা একজন যুবক দাঁড়ানো। ছায়ায় মুখটা স্পষ্ট হয় না। নিশির রক্ত স্তব্ধ হয়ে আসে, জিজ্ঞেস না করে দরজা খোলা ঠিক হয় নি। পাল্লায় হাত চেপে কম্পিত কণ্ঠে সে প্রশ্ন করে, কার কাছে এসেছেন?

যেন কুয়াশা ফুঁড়ে মুখ বাড়ায় সে, আমাকে চিনতে পারছ না?

পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে হিরণ।

নিশি যেন বল পায়। মুহূর্তে তার বুকটা ধড়াস করে ওঠে। ভীষণ চেনা কণ্ঠ! সে তীক্ষ্ণ চোখে মুহূর্তে ছায়া-মুখটা পর্যবেক্ষণ করে।

বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখবে? কেমন কম্পিত আর বিধ্বস্ত শোনায় তার কণ্ঠ।

নিশি শিথিল পায়ে পথ ছেড়ে দেয়।

উজ্জ্বল আলোয় লোকটি সোফার মধ্যে ঢলে পড়ে। নিশির সর্বঅস্তিত্বে থর-কাঁপুনি শুরু হয়, জাহিদ, আশ্চর্য! এই চেহারা হয়েছে?

গঞ্জের হাসপাতালের চামড়া উঠে যাওয়া খটখটে তোশকে কোনো রকমে বেছানো ছিল কালসিটে-দাগ-পড়া শাদা চাদর। হাসপাতালে কিচ্ছু নেই। অবহেলায় পড়ে আছে কয়েকটি শয্যা। পান-চুনের পিকে মেঝের দিকে তাকানো যায় না। এরকম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে

কয়েকদিন থাকার পর বিচ্ছিন্নভাবে ডিউটিরত ডাক্তারদের চিকিৎসায় জাহিদ বেঁচে উঠেছে ঠিকই; কিন্তু হাড়ের কোথায় যেন তার প্রচণ্ডভাবে ভেঙে গেছে, মরাটে হয়ে উঠেছে চেহারা।

সেদিন রাতের গোরস্থানের পর কিচ্ছু মনে করতে পারে না সে। নিজেকে আবিষ্কার করে হাসপাতালে। প্রতিদিনই খোঁজ নিয়ে গেছে বাউল। হীরাকে নিয়ে বৃদ্ধাও এসেছিল দু'দিন, বাপু, শয়তানের ওপর পোদ্দারি দেখাতে চাও ? সাধ করে বীরত্ব ফলাতে রাতে গোরস্থানে গিয়েছিলে ? জাহিদের মাথায় কিচ্ছু ঢুকছিল না। শাদা চোখে শুধু খরখরে ছাদের দিকে চেয়েছিল।

বাউলের মুখে শুনেছে এই ঘটনায় আবদুল খালিকের জব্বর লাভ হয়েছে। ইমাম বলেছিল, গ্রাম থেকে শয়তান চলে গেছে তার এই ঘটনার কারণে। এই বিষয়টা মিথ্যে প্রমাণিত হওয়ায় গ্রামবাসীর সামনে তার মুখ পাংশু হয়ে গেছে। একেবারে কোণঠাসা হয়ে গেছে সে। জাহিদ হাসপাতালে পড়ে আছে, শরীরের ব্যথায় খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারছে না, দফায় দফায় এসব খবর গ্রামে যাচ্ছে। একজন মানুষ এমনিতে অজ্ঞান হয়ে গেলে তাকে এতদিন হাসপাতালে পড়ে থাকতে হবে কেন ? তাও তার শরীরে যদি কোনো অত্যাচারের দাগ থাকত।

জাহিদের অস্ফুট চোখ সব ছায়া ভেদ করে চলে যায় চেয়ারম্যানের বাড়ির কাঁঠাল গাছের নিচে, শেষ দিন সেখানে সে আবদুল খালিককে থমকে দাঁড়াতে দেখেছিল। সে যেন আশা করে নি জাহিদের সাথে তার দেখা হয়ে যাবে। জাহিদ বিস্মিত হয়েছিল। সে বরাবর জানত, চেয়ারম্যানের সাথে আবদুল খালিকের চির-শত্রুতার সম্পর্ক। সেই সম্পর্ক কবে আবার আপোসের দিকে গেল ? সে যমজ মুখগুলো খুঁজছিল, ফলে ক্রমশ অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল চেয়ারম্যান। তবে কি এসব কিছুর পেছনে চেয়ারম্যানেরও হাত আছে ? ইলেকশনের আগে আবদুল খালিকও তার সাথে হাত মিলিয়ে— ?

মাথায় কিচ্ছু ধরে না। গ্রামের এই জাতীয় মানুষগুলোর রাজনীতির কাছে তার শিক্ষার দৌড় নিতান্ত হাস্যকর। তাকে বস্তায় ভরে পেটাচ্ছিল যে মানুষগুলো, হ্যাঁ, তাদের আকৃতি একই রকম। ওরা কি সব মানুষের মুখোশ পরে এসেছিল ? আবছায়া আলোয় মুখগুলোকেও মনে হচ্ছিল এক। বেদম মার খেয়ে কি তার মস্তিষ্ক বিভ্রম ঘটেছিল ? তবে যে স্পষ্ট দেখল দু'মাথার অজগর মুখ বাড়িয়ে তাকে গিলে খেতে চাইছে ?

এইসব যোগসূত্রের ব্যাখ্যা খুঁজতে খুঁজতে তার মাথার সুস্থ শিরাগুলো অসাড় হয়ে পড়ে। ডাক্তারের কথাগুলো তাকে আরো বিমর্ষ, আরো শীতল করে তোলে, এ ধরনের অত্যাচার জেলখানায় হয়, কোনো চিহ্ন থাকে না, ক্ষত থাকে না। আজকাল বড় ধুরন্ধর হয়ে উঠেছে গ্রামের লোকেরা।

লালাস্রাবে ভরে যায় জাহিদের মুখ, বেদনার্ত শরীর ঠেলে বমি ওঠে। ডাক্তার বাউলকে বলে, আমরা প্রাথমিক কাজটা করলাম। একে পুরোপুরি ভালো করতে হলে শহরের হাসপাতালে নিয়ে যান, এখন তো কথাবার্তা বলছে, বাসে নিয়ে যেতে খুব একটা অসুবিধা হবে না।

তারপর থেকেই জাহিদ স্রোতের টানে ভেসে চলেছে।

কখনো শহরের হাসপাতালে, কখনো ফুটপাতে, কখনো পুরনো বন্ধুদের মেসে। মনে আছে, যেদিন শহরের হাসপাতাল থেকে রিলিজ পায় রাজধানীর আকাশটা এত ছোট লাগছিল! কী যেন একটা খুলে পড়েছে মাথা থেকে, অতিরিক্ত ভয় পাবার কারণেই হয়তো, সুশৃঙ্খলভাবে কিছু ভাবতে পারত না। মনে হতো বাবার খণ্ড লাশ, হীরার শাণিত চোখ, লায়লার উড়ন্ত ডানা, বৃদ্ধার যুবতী দেহ, সেই গ্রাম, বাউলের দোতরা, ধোঁয়ার মতো পাকিয়ে-উঠতে-থাকা অজগরের মুখ— সব স্বপ্ন, সব বিভ্রম। এরপরও বড় কাঙ্ক্ষা ছিল, একবার লায়লা তাকে দেখতে আসবে, অপেক্ষা করতে করতে আবারো নিজের মধ্যে নেতিয়ে পড়েছে, কী হাস্যকর এইসব প্রতীক্ষা!

প্রচণ্ড খিদে নিয়ে টিউবওয়েলের জল খেতে বসেছিল ফুটপাতে। এইভাবে মাথার ওপর রাত নেমে এসেছিল। কেন আমি বাড়ি যাচ্ছি না? নিজেকে এই প্রশ্ন করতেই মার চোখের সামনে জবুথবু দাঁড়ায় বাড়ি থেকে বাবার মৃত্যুর পর পালিয়ে যাওয়া মেরুদণ্ডহীন এক ভঙ্গুর যুবক। যে পিতার মৃত্যুর পর পরিবারের ন্যূনতম দায়িত্ব নেয়া তো দূরের কথা, উল্টো ভারবাহী হয়ে তার ওপর ঝাপৎ করে নিজেকে ফেলে দিতে চাইছে।

যখন শরীর টলে উঠছিল, বসে থাকতে থাকতে শরীরের রক্ত চলাচল আসছিল রুদ্ধ হয়ে, নিজেকে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে এক সময় সে ফুটপাতে ঘুমিয়ে থাকা ভিখিরিদের ভিড়ে শুয়ে পড়েছিল। কী বিষাক্ত মশা, মানুষ এর মধ্যেও ঘুমুচ্ছে! রাত্তিরের আঁধার নক্ষত্র দেখতে দেখতে ভেবেছিল, জীবন আসলে এই, এই যে মশাগুলো, অনেকটা এদের মতো। এই নিঃসাড় নির্বিকার দেহের মানুষগুলোর রক্ত লাগামহীন হুল দিয়ে টানতে টানতে এক সময় শরীর ফেটে নিজেই ঢলে পড়বে মৃত্যুর কোলে। হ্যাঁ, জীবন এই ভস্মীকৃত রাত, যেখানে সোডিয়াম বাতির নিচে উড়ছে অন্ধকার ছাই, আমার ফাঁপা পেটে ছলছল করে উঠছে জলের তরঙ্গ আর আমি দেখছি ধু-ধু ছায়াময় রাত্তিরের পুরো ভূমি। মিরপুর রোড ধরে শত শত রাত্তিরের গরু মৃত্যুর দিকে হেঁটে যাচ্ছে। আমি দেখছি, কী অলস ভঙ্গিতে সারাদিনের কর্মক্লান্ত কুকুরটি লেজ গুটিয়ে নিঃশব্দে আমার পাশে শুতে এসেছে। আউট সাইডার! নিজেকে শ্লেষ-মেশানো কণ্ঠে গাল দিয়ে জাহিদ এইসব আলুথালু পূতিময় পরিবেশের মধ্যেই একসময় ঘুমিয়ে পড়ে।

সমস্ত রাজধানী অদ্ভুত বিমর্ষতায় ডুবিয়ে যখন ধ্বনিত হচ্ছিল আজান, শরীর থেকে শ্যাওলাগুলো খসিয়ে জাহিদ হাঁটতে শুরু করেছিল।

পুরনো ঢাকায় তার এক ক্লাসমেটের দোকান ছিল। তার উদ্দেশ্যেই হাঁটতে হাঁটতে দেখছিলো সামনের গলিটা কী সরু। ক্ষুধা এত লেলিহান হতে পারে! জাহিদ কম্পিত পায়ে টাল সামলে হাঁটছিল। চারপাশের দোকান বন্ধ। মাথার ওপর প্যাঁচঘুচে ইলেকট্রিকের তার। রাস্তার যে খাবারগুলোর পাশে হুল্লোড় করছিল কাক, তার নিজেরও ভয়ানক ইচ্ছে হয়েছিল ছুঁ মন্তর পড়ে রূপান্তরিত হয় সেই প্রাণীতে, এতটা বিপন্ন, এতোটা অসহায় জাহিদ নিজেকে আর কখনো অনুভব করে নি।

সে হাঁটছিল অলস পায়ে, গলির মাঝখানে পড়ে থাকা কাঁচা ডাবের খোসা লাথি দিয়ে সরিয়ে, চন্দ্রবিন্দু লেজের কুকুর সামনে এসে তার দিকে জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়েছিল— কী হে?

জাহিদ বলেছিল, আমি এই পথের শেষটা খুঁজে পাচ্ছি না, একটা গলি শেষ করলে আরেকটা বেরিয়ে যায়, আমি এখন পুরনো ঢাকা থেকে বেরুতে চাই, তুমি তো এই এলাকারই, আমার সঙ্গে একটু যাবে?

জাহিদকে দেখে নিশির মধ্যে যন্ত্রণা, ভয়, বিস্ময়— এতকিছুর সমন্বয় একসঙ্গে এমনভাবে ঘটে যে প্রথমে অনুভবই করতে পারে না, বিষয়টা আসলে বাস্তবে ঘটেছে। সে কোত্থেকে ঠিকানা পেলো, এরকম দুরবস্থায় পথ খুঁজে নিশির বাড়িতেই কেন এলো, মাথার মধ্যে এসব ভাবনা চক্কর খেলেও ওর চেহারার দিকে তাকিয়ে সে বাকস্তব্ধ হয়ে পড়ে। সবচেয়ে বিপজ্জনক যা, কঠিন জ্বরে সোফায় বসে ঠকঠক করে জাহিদ কাঁপছিল। হাত দিয়ে নিশি টের পায় ওর সর্বঅস্তিত্বে আগুন ধরে গেছে। এরকম জ্বর নিয়ে বাড়ি খুঁজে এ্যাদ্দুর আসা জাহিদের পক্ষেই কেবল সম্ভব! প্রগাঢ় স্নেহে ওর ভেতরটা ভরে ওঠে, না, জীবনে নিশি পরাজিত হয় নি, চরম বিপন্নতায় জাহিদ তার কথাই স্মরণ করেছে।

ড্রয়িং রুমের চিলতে খাটটায় ওকে শুইয়ে সে যখন জলপট্টির ব্যবস্থা করছে তখুনি তার সারা দেহ অসাড় করে দিয়ে নিজের অবস্থানের কথা মনে পড়ে। রাতে আফজাল ফিরে আসবে, জাহিদ কে? এর কোনো ব্যাখ্যাই সে দিতে পারবে না।

এই ভয় নিশিকে এতটাই বিপন্ন করে তোলে, মুহূর্তে জাহিদের প্রতি সে ন্যূনতম সহানুভূতি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে। কেন এই মরাটে আকৃতি নিশিকে দেখাতে আসা? নিশির ভেতর যে জাহিদের গ্রীবা ছিল রাজহাঁসের মতো সমুন্নত, কেন সে তার করুণা-কাতর সময়ে নিশির সেবা নেয়ার জন্য তার পায়ের কাছে এসে লুটিয়ে পড়েছে?

কপালে জলপট্টি দিতে গিয়ে নিশির সারা শরীর কাঁপতে থাকে। চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় শব্দে কিছু বলছে জাহিদ। আফজাল আসার আগেই কী করে একে বিদায় করা যায়?

ধরা যাক, সে বানিয়ে জাহিদের পরিচয় সম্পর্কে কিছু বলল। সকালে সুস্থ হওয়ার পর জাহিদের সাথে আফজালের যদি কথা হয়? নিশি এইসব বিষয় নিয়ে আর কত বিপর্যস্ততার মুখোমুখি হবে? এ ছাড়া একজন উটকো লোক এভাবে অসুখ নিয়ে তাদের ঘাড়ে এসে পড়বে, আফজালকে তো নিশি চেনে, এ কিছুতেই সে সহ্য করার লোক না।

অসংলগ্ন, কান্নাজড়িত কণ্ঠে কি সব বকছে জাহিদ, নিশি আমার বাবাকে, জানো আমার বাবাকে, হ্যাঁ আমিই ইনজকেশন পুশ করে, কী ছোট্ট শিশু সে, তাকে ইনজেকশন পুশ করে, নিশি দ্যাখো এই হাতে রক্ত, হ্যাঁ, খুন করেছি আমিই।

মগ থেকে কাপড় বদলে বদলে নিশি অসাড় হাতে জলপট্টি দেয়, হে আল্লাহ! একে সুস্থ করে তোলো। আফজাল আসার আগেই সে এ বাড়ি থেকে চলে যাক। যে জাহিদ তার স্বপ্নের, তার একান্ত নিজস্ব লুকোনো শ্রেষ্ঠ সম্পদ, যে চিরকাল সুদূরের, তাকে কেন্দ্র করে আফজালের বিরক্তি, রাগ কিচ্ছু আমার সহ্য হবে না। এ ছাড়া বাবাকে খুন, হত্যা এসব কি বলছে জাহিদ? ঘরে ঢোকার সময়ও তো তার অবস্থা এতটা খারাপ ছিল না।

কলিং বেলে শব্দ হয়।

নিশির স্বয়ংক্রিয় হাত জাহিদের কপাল থেকে সরে যায়, হিরণ, হিরণ, আমি দরজা খুলছি, তুই ওর কপালে জলপট্টি দিতে থাক।

তারপর নিশির দেহ জ্যোতিশ্চক্রে ঢেউ খায়, যা সাবলীল, যা সহজ, তা-ই উপস্থাপন করে জটিল ভঙ্গিতে। নিশি সরল মিথ্যে বলে, আমার নানা বাড়িতে জাহিদ মানুষ হয়েছে। তাঁদের মৃত্যুর পর মামারা যখন যে যার মতো, তখন এ জানি কোথায় চলে গিয়েছিল। আজ কোত্থেকে ঠিকানা যোগাড় করে, দ্যাখ তো কীরকম ঝামেলায় পড়েছি, ঠিকমতো আমি চিনতেও পারি নি। তার মানে একজন আশ্রিত, আফজালের বিশ্লেষণ ছিল এরকম, তোমাদের আত্মীয় কেউ নয়। এসে যখন পড়েছে কী আর করবে, সেবা কর।

কিন্তু নিশির ভেতরের খচখচি যায় না। যেন আফজাল স্পষ্ট দেখে ফেলেছে সব, স্বচ্ছ কাচের মতো হয়ে উঠেছে নিশির সারা অস্তিত্ব। নিশির তপ্ত দীর্ঘশ্বাস, যা আফজালের কাছে ক্রমেই তাকে সন্দেহাতুর করে তুলছিল, তার উৎস আবিষ্কার করে ফেলছে সে।

তোমাকে এমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে কেন ? আফজালের এই প্রশ্নে মুখে ভাত তুলতে গিয়ে থেমে যায় হাত, নিশির খিদে নষ্ট হয়ে যায়, কেমন জ্বর জ্বর লাগে। সে বলে, কী করি এই অসুস্থ লোকটাকে নিয়ে। সকালে উঠেই বিদেয় করে দিই কী বলো ?

খুব জ্বর দেখলাম, আফজাল বলে, ঘাড়ে এসে পড়েছে, যন্ত্রণা একটু সহ্য করতে হবে। ওর কাপড়-চোপড়ের যা দশা! সাথে নিশ্চয়ই আর কোনো কাপড় আনে নি ?

এসেই এমন টাল খেয়ে পড়ল, পানি খেয়ে নিশি সুস্থির হয়, হাতে কোনো ব্যাগ ছিলো না।

কিছু খাইয়েছ ?

সে সুযোগ পেলাম কোথায় ? বাথরুমে গিয়ে বমি করেছে, আমি যে কী খেতে দিই!

রাতের খাবার খেয়ে আফজাল জাহিদের কাছে যায়, এইসব নোংরা কাপড়, উস্কো দাড়ি, পাংশু মুখের মাঝখানেও তার চেহারার যে তীক্ষ্নতা, তার হঠাৎ জেগে ওঠা সাপের মতোন চোখের আকর্ষণ— নিশির কেবলই মনে হয়, এর থেকেই আফজাল বুঝে ফেলবে, এ গ্রামে বেড়ে-ওঠা হাবাগোবা উটকো কোনো মানুষ নয়। তার পায়ের পাতা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। আফজাল জাহিদের কপালে হাত রাখে, এই তো জ্বর কমে আসছে। হিরণ, আধঘণ্টা পর একে কিছু খেতে দিয়ে মশারি টাঙিয়ে দিস।

হাঁপ ছেড়ে নিশি আফজালের সাথে বিছানায় শুতে যায়।

রাত গভীর হয়।

নিশির মাথার মধ্য দিয়ে কলশব্দে জলস্রোত প্রবাহিত হয়। সেই স্রোতের এত বেগ, এত শোঁ-শোঁ, দু'পাশের শিরা টান হয়ে থাকে। না, আফজালের মুখে কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সকালে সেই মানুষটির মুখোমুখি হবে সে। তখনই সে জানবে, নিশির তার সম্পর্কে বিবরিত তথ্যের সবটাই ভুয়ো। আফজালের মনে তীব্রভাবে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক, এক্ষেত্রে এতগুলো মিথ্যের আশ্রয় কেন নিশি নিল ?

জাহিদের এ রকমভাবে সামনে এসে দাঁড়ানোটা নিশির কাছে এতো বেশি অপ্রত্যাশিত, এতো বেশি অকল্পনীয়, সেই সন্ধ্যা থেকে এই টানা রাত অব্দি নিজেকে সে এক মুহূর্তের জন্যও সুস্থির রাখতে পারছে না। জাহিদ সংক্রান্ত মিথ্যা বর্ণনাকে বাস্তব রূপ দেয়ার জন্য দীর্ঘ বছর পর বিছানায় শুয়ে সে স্মরণ করেছে নানা বাড়ির বিস্তৃত গ্রামকে, সেখানকার আকাশ, সেখানকার হলদে সরষে ফুল, মৃত নানার কবরের পাশে মূর্তির মতো বসে থাকা নানি, কতো যে শিমুল ফুল, থোকা থোকা রক্তের মতো। যখন ধান মাড়াই হতো, কাঁচা ধান টিপলে দুধের মতো রস বেরোতো, ইটখোলা পার হয়ে তারা দৌড়ে যেত মাটির টিলার কাছে, সেই মাটি খেতে কী যে সুস্বাদু ছিল! সব, সবকিছু তখন অর্থবহ ছিল, এক বাটি ধানের বিনিময়ে কুঁজো বুড়ির বাড়ি থেকে মিলত এক বাটি মুড়ি, সেই মুড়ির স্বাদের সাথে পৃথিবীর কোনো খাবারের তুলনা চলে না।

নিশি ছোট থাকতেই নানি মরে গেল। এখনো তার ছায়া মানে নিশির কাছে কোল বালিশের মতো কাফনে-মোড়া একটা আকৃতি।

শিমুলতলায় বসে নিশি ভাবত, একদিন এখানে আমার কবর হবে। এইসব শুনতে শুনতে হাই তুলে আফজাল ঘুমের তলায়।

এখন যদি ওই বাইরের ঘরে গিয়ে ওই জ্বরতপ্ত লোকটাকে গিয়ে বলি, আমি যা বলেছি, সকালে হুবহু আফজালকে তাই বলো!

আড়ষ্ট হয়ে ওঠে নিশি। তার কাছে আমি ভীত ক্ষুদ্র একটা কীটে পরিণত হবো! কেন ও এখানে এলো? ঘৃণায় বিষিয়ে ওঠে নিশি। এতকাল মাথা উঁচু করে বিপন্ন অবস্থায় সাহায্য নিতে এসেছে? না, ওই বিছানায় কোঁকাতে থাকা মানুষটার প্রতি নিশির কোনো মায়া নেই। কী স্বপ্ন ছিল তার— এই পৃথিবীতেই একদিন জাহিদের সাথে তার দেখা হবে, সে এসে দাঁড়াবে তার সামনে। তার মুখ থেকে বেরোতে থাকবে অপূর্ব বর্ণচ্ছটা। আরো তীব্র, আরো আকর্ষণীয় সেই রূপ!

নিশির জীবনে স্বপ্ন বলে আর কিছু রইলো না।

বালিশ খামচে নিশি নিজেকে স্থির করতে চায়। লেপের নিচে এই শীতেও ঘেমে উঠছে শরীর। কী করে আমার রাত যাবে? নাহ্, আমি ঘুমুতে চাই না। সারারাত পাহারা দেব, খুব ভোরে আফজাল যাতে আমার ঘুমের সুযোগে বাইরের ঘরে গিয়ে জটিল ধাঁধায় না পড়ে। কিন্তু আমি সামনে থাকলেই-বা কী! জাহিদকে ইশারা করব? ও যে ধাঁচে গড়া মানুষ, সেখানে তার প্রেমিকা কারো সাথে শুয়ে এসেও যদি তাকে বলে দেয়, তার কাছে সেটা অনেক স্বাভাবিক অনেক অকৃত্রিম ব্যাপার। সে মনে করে, যার সাথে মানুষ একত্রে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নেয়, তার সাথে মানুষের আত্মিক মিলের প্রথম শর্ত এটাই হওয়া উচিত যে, আমাদের মধ্যে গোপন কিছু থাকবে না। নিশি তর্ক করেছিল, তাহলে মানুষের ব্যক্তিগত বলে কিছু থাকবে না? নিজস্ব কিছু না থাকলে সে-তো সবার মধ্যে নিজেকে এক করে দিল।

জাহিদ বলেছিল, যা নিয়ে দু'জনের মধ্যে দ্বন্দ্ব হতে পারে, একজনের যে কাজ অন্যের কাছে অন্যায় মনে হতে পারে, সে বিষয়ে দু'জনের অকৃত্রিম থাকাই ভালো। তুমি কাউকে ভালোবেসেছিলে, তুমি কাউকে তোমার সবকিছু স্পর্শ করতে দিয়েছিলে, এটা তোমার কাছে

যদি গ্লানির না হয়, তবে কেন তুমি যার সাথে সারাজীবন বাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছ, তার কাছে সেটা গোপন করবে ? সে যদি এটা অন্যায় মনে করে, এ বিষয়ে সে যদি উদার না হয়, সেক্ষেত্রে নিজের মূল অস্তিত্বকে গোপন করে তার সাথে বাস করার সিদ্ধান্ত নেয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না।

জাহিদ এসব তত্ত্বকথা, এ দিয়ে চমৎকার বাক্য নির্মাণ করা যায়, নিশি বিড়বিড় করে, জীবনের প্রতিটি দিনের হিসেব বড় কঠিন। হ্যাঁ ভেঙে দেয়া যায়, লাথি দিয়ে বের হয়ে যাওয়া যায় পথে, কিন্তু কোন যুক্তিতে যাব ? কেউ আমাকে মারধর করেছে ? যৌতুকের জন্য কোণঠাসা করেছে ? আমাকে অবহেলা করে বাজে আড্ডায় পড়ে থেকেছে ? তুমি এই তৃতীয় বিশ্বের রূপ চেন না ? সে তুলনায় তো অনেক স্বস্তিতে আছ। হ্যাঁ, আমার একা চলার স্বাধীনতা নেই, নিজের জীবন সম্পর্কে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার পরিস্থিতি আমার নেই, আমার বন্ধু নেই, শ্বাস নেয়ার মতো কোনো জায়গা নেই। আমার গর্ভে যদি কোনো সন্তান আসে, তার জীবনের কোথাও আমার পরিচয় থাকবে না। আফজাল অসহিষ্ণু, যে-কোনো অসঙ্গতিতে চিৎকার করে ওঠা তার স্বভাব। এ জন্যই আমি নির্দোষ, কাজেই মিথ্যে বলে তাকে সুস্থির রাখি, আমার নিজস্ব কোনো উপার্জন নেই— এসব সমস্যা এই সমাজের কোন্ নারীটির নেই ? আমি যদি এই ঘর থেকে বেরিয়ে যাই, কুত্তা-বেড়ালেরা আমাকে ছিঁড়ে খেতে চাইবে না ? তুমি আমাকে নিশ্চিন্তে বাঁচার প্রতিশ্রুতি দিতে পারবে ?

তারপরও কথা আছে।

আমাকে আফজাল ভালোবাসে। বড় বিচিত্র এই চিজ। মনে হবে চিন্তার মিল নেই, মনে হবে দু'জন দুই মেরুর, তারপরও দীর্ঘদিন এক শয্যায়। কোনো নিগূঢ় একটা সমঝোতা না থাকলে, কী করে আমরা একত্রে বাস করছি ?

ওই যে ভোর হচ্ছে।

কী বৃষ্টি! নানি কোরআন তেলওয়াত করছিল! কী মিষ্টি সে সুর। সমস্ত পৃথিবীতে পবিত্রতা ঝরে পড়ছিল। বাতাসের লেলিহান শনশন। নানি রেহেলে কোরআন রেখে ডাকছিল, মতি... অ মতি, আম কুড়ায়া লইয়া আয়, অ মতি...।

নিশি চোখ মেলে।

হলুদ মশারি, মনে হচ্ছে মাকড়সার জাল। আমার ভেতরে কাঁপুনি হচ্ছে, অসহ্য ভয় হচ্ছে, শুকিয়ে আসছে কণ্ঠ, কিন্তু তারপরও ঘরে ঢোকার পর জাহিদের যে চোখ আমি দেখেছি, তার ওপর থেকে কেউ যেন তুলে নিয়েছে মাখন, সে চোখ ভিখিরির, সে চোখ আশ্রিতের, তাকে কেন্দ্র করে আজ থেকে আমার হৃৎপিণ্ডের জখম শুকিয়ে গেল।

নিশি নিঃশব্দে পর্দা উঠিয়ে দেখে, ঘরের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়া শাদা ছায়া, এ শুধু তার দৃষ্টির বিভ্রম। বাইরে এখনো রাত। হলুদ মশারি ভেদ করে দেয়ালের ঘড়ির কাঁটা স্পষ্ট হচ্ছে না। একটু যদি ঘুমুতে পারতাম, তাহলে এইসব বীভৎস থর-কাঁপুনি থেকে আজ রাতের জন্য হলেও মুক্তি পাওয়া যেত।

আমি এমন বিপর্যস্ত ছিলাম, আফজাল ফিরে এলে জিজ্ঞেস পর্যন্ত করা হয় নি, ওর অন্য কোনো কাজের ব্যবস্থা হলো কি-না। নিশি নিঃশব্দে শুয়ে পড়ে ঘুমুনোর সময় ও বলছিল, এই আপদ কালই বিদেয় কর, জ্বর কমলেই, খুব বেশি খাতির করার দরকার নেই।

নিশি সায় দিয়েছিল, আপদই, বেড়ালের মতো পথ খুঁজে অসুখ নিয়ে আত্মীয়ের বাড়ি এসে উঠেছে। সত্যি সত্যি আত্মীয় হলেও একটা কথা ছিল। না, নিশির কণ্ঠ কাঁপে নি। সে এই নিয়ে বিন্দুমাত্র গণ্ডগোলে যেতে চায় নি। আজ আফজাল টিউশনি খুঁজছে অথচ নিশি একবার একটা চাকরি পেয়েছিল, বেইলি রোডে শাড়ির দোকানে, মেয়েদের জন্য কত চমৎকার সেই চাকরি। আফজাল ঠোঁট উল্টে বলেছিল, সেল্‌স্‌গার্ল! তার সেই উচ্চারণ ভঙ্গিতে 'সেল্‌স্‌' শব্দটি রূপান্তরিত হয়েছিল 'কল'-এ। নিশি উচ্চবাচ্য করে নি, শুধু বলেছিল, তুমি গিয়ে দেখো কী সুন্দর পরিবেশ।

ওখানে বুঝি কোনো পুরুষ ক্রেতা যায় না?

আফজালের এই প্রশ্নের পর নিশির মধ্যে আর কাজ করার স্পৃহা জাগে নি। সে নিজেকে তন্ন তন্ন করে ঘেঁটেছে আসলে আফজালের কাছে তার চাইবার কিছু নেই। একত্রে বাস করার জন্য যতটুকু সমঝোতা, শান্তির দরকার সেটুকু রক্ষা করার জন্যই সে কোনো বিষয়ে আর কোনো দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে চায় না। যার প্রতি সে তীব্র একটা অধিকার অনুভব করে না, তাকে নিজের ক্রুদ্ধতা, ক্ষিপ্ততা দেখিয়ে কী লাভ? রাত্তিরে নিশি এক পর্যায়ে ঘুমের ওষুধ খোঁজে। আলগোছে মশারি উঠিয়ে মেঝেতে নেমে মনে পড়ে কয়েকটা ট্যাবলেট তার হাতব্যাগে রয়ে গেছে এবং সেই ব্যাগ রয়ে গেছে ড্রয়িং রুমের শোকেসের ওপর। কী যে মনভোলা আমি! নিজের ওপর নিশির রাগ হয়। এত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে রাত! না, ওষুধ খাওয়া ছাড়া কোনো পথ নেই। এক রাতেই সে অর্ধ উন্মাদে পরিণত হবে।

সে শীত টের পায় না, বাতাস টের পায় না, নিঃশ্বাস আটকে তার মনে একটা প্রশ্নই উত্থিত হয়, স্লিপিং পিলের জন্য এখন দরজা খুলে আমি যদি বাইরের ঘরে যাই, আফজাল টের পেয়ে আমার ড্রয়িং রুমে যাওয়ার মধ্যে যদি কোনো সন্দেহ খুঁজে পায়? সবকিছু বড় এলোমেলো হয়ে গেছে। আমরা কী-না এইরকম অবিশ্বাসের ভেতর দিয়েই মাঝখানে সন্তানের সেতু তৈরি করতে চাইছি?

কাঁপতে কাঁপতে নিশি মেঝের ওপর উপুড় হয়ে বসে পড়ে।

ভোরে আফজাল জেগে ওঠার আগেই নিশি সন্তর্পণে দরজা খোলে। সারারাতের অস্থিরতায় তার চোখের নিচে কালসিটে পড়েছে। চেহারা হয়ে উঠেছে কোঁকড়ানো কাগজের মতো। ঠিক কী রকম ব্যবহার করলে জাহিদ নিজের থেকে চলে যাবে? এই সকালেও যদি সে জ্বরের ঘোরে বেহুঁশ হয়ে থাকে? সৃষ্টিকর্তা! তা-ই যেন হয়। সকালের ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে তবে আমি নিষ্কৃতি পেতাম! তারপর আফজাল অফিসে গেলে সারাদিনে মাথা থেকে কত বুদ্ধি বেরুবে!

ঘর থেকে বেরিয়ে দেখে বিছানা খালি।

হিরণ রুটি বেলছে। সুস্থ হয়ে উঠেছে নিশ্চয়ই? বাথরুমে গেছে? এইসব অসলগ্ন ভাবনা নিয়েই নিশি হিরণের দিকে স্থির চোখে তাকায়।

নিশির সারারাতের দুর্ভর যন্ত্রণাময় হৃৎপিণ্ড অবশ, নিঃসাড় করে দিয়ে হিরণ জানায়, সূর্য ওঠার আগেই কাউকে কিছু না বলে দরজা ভেজিয়ে রেখে জাহিদ চলে গেছে।

সন্ধ্যায় নিশিকে সেলাই করতে দেখে আফজাল অবাক, এতসব কাপড়চোপড়, সেলাই মেশিন, বিষয়টা কী নিশি?

নিশি নিজেকে প্রাণপণে উদ্ভাসিত করতে চায়, রহস্য আছে, তোমাকে বলা যাবে না।

নিশি মেঝেতে চাদর বিছিয়ে বসেছে। নিজেকে নির্বিকার, সহজ রাখতে সে পুনরায় মেশিন চালু করে।

কী আশ্চর্য! আফজাল জুতোসুদ্ধ বসে পড়ে, রহস্যটা কী? প্রদীপ পেয়েছ নাকি?

দেখ, সব ফিরিস্তি দিতে গেলে আমার কাজের নেশাটা ছুটে যাবে, হাতে এইটুকুন লেস দেয়া বাকি আছে, শেষ করে তারপর বলছি।

আফজাল বিছানায় গিয়ে বসে। নিশি হাতের কাজ শেষ করে বলে, আমি গতকাল বলেছিলাম না, মার ওখানে যাব?

বলেছিলে।

আজ গিয়েছিলাম, তুমি অফিসে যাওয়ার পরই। গিয়ে দেখি, মা শস্তায় কার কাছ থেকে জানি এই সেকেন্ডহ্যান্ড মেশিনটা আমার জন্যে কিনে রেখেছেন। আমার যে সেলাইয়ের খুব শখ, সেটা মার চেয়ে আর কে বেশি জানে? আমার তো মহাআনন্দ। সারা রাস্তা একদম একা কোলে করে এনেছি, এতটা পথ, বিশ্বেস কর, আমার একদম কষ্ট হয় নি! আমার কিছু সঞ্চিত টাকা ছিল, তুমি তো জানো, যদিও সবই প্রায় খরচ হয়ে গিয়েছিল, তবুও মেয়েদের কিছু জাদু জানা থাকে, কিছু-না-কিছু তারপরও থেকেই যায়, না অহঙ্কার করছি না, যা সত্যি, তাই বলছি, আমি মেশিনটা বাসায় রেখে, বুঝলে, একদম ধৈর্যে কুলোলো না, সোজা মার্কেটে, কিছু গজ কাপড়, কিছু লেস...।

আরে আরে, দম ছেড়ে কথা বলো, আফজাল নিশিকে থামিয়ে দেয়, তো এইসব কাপড় দিয়ে জামাটামা বানিয়ে কী হবে?

আমার যে একজন ম্যাডাম ছিলেন, ওই যে মমতাদি, তোমাকে একদিন ফোন করেছিলেন না, তিনি একদিন বলেছিলেন, আমি অবসর সময়ে এই কাজটা করতে পারি। বানিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমার, বিক্রি তিনি করবেন, তাঁর কি সব গার্মেন্টিস দোকানের সাথে যোগাযোগ আছে। আফজাল জুতো খুলতে খুলতে হাসে, তুমি কি মনে কর খুব একটা লাভ হবে এতে? পৃথিবী এত সহজ?

নিশি দমে যায়, জীবনে কোনো কাজে তোমাকে উৎসাহ দিতে দেখলাম না, তুমি কিচ্ছুতে স্বপ্ন দেখতে জানো না।

নিশি তুমি কি আশাবাদী? আফজালের প্রশ্নের ধরনটা সহসা নিশি ধরতে পারে না। সে শ্বাস আটকে বলে, অবশ্যই।

তাহলেই আমি আনন্দিত, নিশিকে সস্নেহে জড়িয়ে ধরে আফজাল বলে, এই যে, এই বিষয়টা নিয়ে তুমি খুশি হয়ে উঠেছ, এটা দেখতেই আমার ভালো লাগছে, লক্ষ রেখ, এসব করতে গিয়ে পরীক্ষার যেন ক্ষতি না হয়।

আমার পরীক্ষা নিয়ে তোমাকে না চিন্তা করলেই হবে, আমার সব হিসেব ঠিক আছে।

তা তো বুঝলাম নিশি, একটা বিষয় যে আমার কাছে অস্বস্তিকর লাগছে!

সেটা কী?

সেদিন বাচ্চা বাচ্চা করে পাঁচ হাজার আনলে, আজ সেলাই মেশিন। আমি কি সারা জীবন ধরে এইভাবে তোমার মার কাছ থেকে যৌতুক নিতে থাকব?

নিশি অদ্ভুত এক ভঙ্গি করে ঠোঁট বাঁকায়, এটা তো তুমি আনো নি! এসব আমার মার কাছ থেকে আমি এনেছি। আমার কিছুর ওপর তাঁর অধিকার না থাকতে পারে, তাঁর সবকিছুর ওপর আমার আজন্ম অধিকার থাকবে।

ঘুমুতে যাওয়ার সময় মশারি গুঁজতে গুঁজতে আফজাল বলে, তোমার ওই নানাবাড়ির ভূতটা দিনে এসে আবার হামলা করে নি তো?

না।

এইটাই আশ্চর্য! আমি সারাদিন নিশ্চিত ছিলাম, এই জাতীয় মানুষের তো সহজে নিষ্কৃতি দেয়ার কথা না।

নিশি চুপ করে থাকে।

যাই বলো, বড় অভদ্র, শিক্ষা না পেলে যা হয়, এইভাবে কেউ যায়? একটু কৃতজ্ঞতা পর্যন্ত জানাল না।

নিশি কঠিন কণ্ঠে বলে, ও এ বাড়ির জল পর্যন্ত স্পর্শ করে নি, তুমি ওর কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা আশা করছ কোন যুক্তিতে?

নিশি, বুঝলাম না, তুমি আবার হঠাৎ ক্ষেপে উঠলে কেন?

নিশি বলে, এইটুকু কথা বলাটাকে যদি তুমি ক্ষেপে ওঠা বলো, তাহলে বলো কিভাবে কথা বললে তোমার কাছে সহজ মনে হবে, আমাকে শিখিয়ে দিও।

বিছানায় শুয়ে গম্ভীর হয়ে ওঠে আফজাল, যাই বলো নিশি, আমি কিন্তু এই এখন তোমাকে বুঝতে পারলাম না।

আমাকে বোঝার তোমার দরকারটার কী? দিব্যি তো চলে যাচ্ছে সংসার।

নিশি বাথরুমে যায়।

সশব্দে শাওয়ার ছেড়ে সে অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়ে। আমি পরাজিত। এত তুচ্ছ, এত নোংরা নিজেকে আর কখনো মনে হয় নি। জাহিদ, এ্যাদ্দিন পর এত কাছে এসে, ছিঃ, তুমি এ কাকে দেখে গেলে? আমি এখন কীভাবে বাঁচব? আমার মাথাটা তোমার কাছে চিরদিনের জন্য নিচে নেমে গেল। আল্লাহ্, সব সহ্য করা যায়, যার কাছে আমি স্বপ্ন হওয়ার জন্যে এতটা দিন কাঙালের মতো অপেক্ষা করেছি, তার কাছে আমি যা ছিলাম তার চেয়েও মামুলি, তার চেয়েও চরম সাধারণ হওয়ার মতো যন্ত্রণা পৃথিবীতে আর কিছু কি আছে? কেন আমার কোনোখানেই সৎ সাহস নেই? আমি নর্দমার কীট, হ্যাঁ, তার চেয়েও অধম, মেরুদণ্ডহীন, বস্তাপচা, যাচ্ছেতাই।

নিশির সব যখন ঠিকঠাক, পিরিয়ডের একদিন পর খুব ভোরে ঘুম ভাঙার পর আফজালের হাত চেপে ধরে, কী উষ্ণ, কী উত্তেজক সেই হাত, আজ তোমার ভ্রূণ টিউবে করে আমার ভেতর...। বিশ্বাস কর আফজাল, এ আমি কল্পনাই করতে পারছি না, এরপরই আমি অন্তঃসত্ত্বা হবো!

আফজাল হাসে, এই ব্যবস্থাটা আমাদের এখানে নতুন, আমি নিজেও বুঝছি না বিষয়টা ঠিক কীরকম। ঠিক আছে, ব্যাংক থেকে ছুটি নিয়ে দুপুরে আমি আসব, তুমি ঠিক সময়ে চলে যেও।

নিশির সারাটা সকাল কাটে অস্থিরতার মধ্যে। প্রতিদিন টেস্ট, আলট্রাসনোগ্রাম এইসব করে স্বাতীর কাছে, মমতাদির কাছে এত লোন হয়ে গেছে, এসবের খবর আফজালও জানে না। তারপরও পেট খুলে বাচ্চাটাকে যখন সে ঢেলে দেবে আফজালের সামনে, এই তুচ্ছ টাকা নিয়ে কী আফজাল সামান্য মাত্র ভাবিত হবে? নিশির শরীরে কখনো তুমুল ঠাণ্ডা, কখনো উষ্ণ ঘাম! সে হাঁটে, ঘরময় ছন্দময় হাঁটে, হিরণ! হিরণ! আমাদের ঘরে যদি বাচ্চা আসে, তুই সামলাতে পারবি তো?

যেন অপারেশন থিয়েটার।

চোখের ওপর সশব্দে জ্বলে ওঠে বাল্‌ব্‌। খণ্ড খণ্ড অনেকগুলো সূর্য। নিশি শুয়ে থাকে। লেডি ডাক্তার বলেন, আপনার হাজব্যান্ডের স্পার্মের রেজাল্ট খুব ভালো।

সে কোথায়?

বাইরে বসে আছে।

কতক্ষণ লাগবে আমার?

পুশ করার পর মিনিমাম তিন ঘণ্টা, একভাবে শুয়ে থাকুন, নট নড়নচড়ন।

তাহলে ওকে চলে যেতে বলুন। বিকেলে এসে যেন আমাকে নিয়ে যায়।

নার্স বেরিয়ে গেলে নিশি ফিসফিস করে, অনেকটা অবিশ্বাস-ভরা কণ্ঠে ডাক্তারকে নিশি বলে, তাহলে এই মাস থেকেই আমি মা হচ্ছি?

লেডি ডাক্তার তার জিনিসপত্তর ঠিকঠাক করতে করতে হাসেন, নিশ্চিত করে কি কিছু বলা যায়? আল্লাহ চাইলে হবেন।

তার মানে না-ও হতে পারে?

তা তো হতেই পারে। আমাদের এখানে যারা আসে তাদের কারোর এক মাসের চেষ্টাতেই হয়ে যায়, কেউ আবার প্রতি মাসে চেষ্টা করতে করতে দশ-এগারো মাসের মাথায় সফল হয়। কেউ হয়তো হয় না, চেষ্টার পরেও ভাগ্য বলে তো একটা কথা আছে।

নিশির সারা অস্তিত্ব অবশ হয়ে পড়ে। চোখের সামনের একচক্ষু আলোগুলো কী প্রকট, কী সশব্দে বিচ্ছুরিত। তারপরও নিষ্প্রাণ অন্ধকারে ঢেকে যায় সব। সে হতাশ কণ্ঠে বলে, তাহলে আমার হবে না।

আপনাদের রেজাল্ট তো ভালো। তারপরও কিছু বিষয় প্রাকৃতিক, এর ওপর কি হাত আছে কারো? আমরা কেবল চেষ্টা করে দেখতে পারি, হ্যাঁ, পা দুটো ওপরে ওঠান। কোনো অস্বস্তি করবেন না, একদম টানটান— তারপর টিউবে কী সব পুশ করেন ডাক্তার, কী সব বলেন, এইভাবে শুয়ে থাকুন, নড়লে ক্ষতি হবে, আগামী পুরোটা সপ্তাহ একদম বেড রেস্ট, আগামী মাসে হলেও, না হলেও আবার আসবেন— কিছু কানে যায় না নিশির। সার্বিকভাবে সে হতাশাবাদী, তার অনেক স্বপ্নের, অনেক অর্থের ক্ষতি হয়ে গেলো। চোখ বুজে পড়ে

থাকে সে, তাকে একা একটা কলকজাময় ঘরে রেখে লেডি ডাক্তার চলে যেতে যেতে বলেন, আপনার ব্যাপারে আমি আশাবাদী, সব রিপোর্ট ভালো, নিরাশ হওয়ার তো কোনো কারণ দেখছি না।

একঘেয়ে ক্লান্তিকর দিনগুলো।

বিছানায় শুয়ে, ঘরময় নিঃশব্দ পায়চারি করে, চিলতে বারান্দায় বসে, নিঃসঙ্গ কাপে চুমুক দিয়ে নিশির মধ্যে একটাই কাঙ্ক্ষা ঠেলে ওঠে, সত্য হোক!

তার হিম ত্বক বেয়ে শিরশির হেঁটে যায় পোকা, সশব্দে গড়াতে থাকে অফুরন্ত নুড়ি। সেলাই বন্ধ, বাইরে যাওয়া বন্ধ, কেবল পাঠ্য বইয়ে চোখ ঠেসে রাখা। এই বিচ্ছিরি, অলস মুহূর্তগুলোতে যাবতীয় অপয়া বিষয় ভর করে, এর কোনোটাই সুন্দর বা আশাপ্রদ নয়। নিশি ঘন্টার পর ঘন্টা একঠায় বসে থাকে।

সন্ধ্যায় বাতি চলে যায়।

বিছানায় বসে নিশি নিষ্পলক দেখে পিলসুজ থেকে জেগে উঠছে আলো, চার পাশের আঁধার থেকে কখনো কাঁকড়ার মতো, কখনো মাকড়সার মতো পিট পিট বেরিয়ে আসে বিভিন্ন রঙের ভাবনা। এই শহরে থেকে কতদিন পর পর মার সাথে দেখা হয়। সেদিন মা এসেছিলেন। নিশির সেলাই দেখে উচ্ছ্বসিত, তোর হাত নিখুঁত, তাহলে একটা কিছু করছিস! নিশিকে ডাক্তার রেস্টে থাকতে বলার পর আরেকদিন, গত পরশু, মা-বাবা দু'জনই এসেছিলেন। বাবা বললেন, মেয়ে মানে অন্যের আমানত। অন্যের হাতে তুলে দেয়ার জন্য পেলে-পুষে বড় করা।

আপনার ছেলে যেন কত আপনার কাছে থাকছে!

সেতো এই শহরে থাকে না। তুই একটাবার যেতে পারিস না?

বাবাকে ড্রয়িং রুমে বসিয়ে ভেতরে এসে মা জিজ্ঞেস করেন, আমি ভেবেছি মস্ত বড় অপারেশন। আমাকে তুই জানালি না পর্যন্ত? সব জানলাম আজ পাশের বাসায় আফজাল ফোন করলো বলে, যাই বলিস, গতকাল তোর পাশে আমার থাকার দরকার ছিল না?

মা, এটা ঠিক অপারেশন না, নিশ্চিত কিছু হবে তারও গ্যারান্টি নেই।

আল্লাহর ওপর ভরসা রাখ, তোকে অজ্ঞান করে নিয়েছিল বুঝি?

বললাম তো, এটা তেমন কিছু নয়, জাস্ট একটা টিউবে, কিচ্ছু ব্যথা না, শুধু একা একটা ঘরে তিন ঘন্টা শুয়ে থাকতে বড্ড কষ্ট হয়েছে।

আমি পাশে থাকলে তোর সাথে কথা বলতে পারতাম।

আসলে মা ব্যাপারটা ঠিক কিভাবে হবে, হওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা কেউ জানতাম না।

চাঁদের আলোর মতো গলে পড়ছে মোম।

আজ যে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম, তোর বাবাকে বলিস না,— ছিন্ন বিচ্ছিন্নভাবে নিশির ছেলেবেলা এগিয়ে আসে,— তোর বাবা যদি জিজ্ঞেস করে, শোকেসের গ্লাস কে ভেঙেছে, বলবি তুই উল্টে পড়ে গিয়েছিলি।

কেন, মামা ভেঙেছে বললে কী হবে ?

তাহলে ওকে আর তোর বাবা এ বাড়িতে আসতে দেবে না, মা নিশিকে সস্নেহে বুকে টেনে ধরেছিলেন, তোকে কিছু বকবে না। আমি বলবো, এ জন্য তোকে মেরেছি।

নিশি, তোর বাবা এসেছে, টেবিল থেকে এক্ষুণি জঞ্জালগুলো সরিয়ে রাখ, আমি যে তোর নানাকে টাকা দিয়েছি তোর বাবাকে কিন্তু বলবি না, এই যে শাড়িটা কিনেছি যদি তোর বাবা প্রশ্ন করে আমি বলব তোর নানা এনেছে, তুই আবার বেফাঁস কিছু বলিস না।

মা, তুমি বাবাকে এত ভয় পাও ?

শুধু ভয় পাই বুঝি ? ভালোও তো বাসি কত।

চাচারা এলে তুমি মন খুলে কতকিছু কর, কত রান্না, কেনাকাটা, নানা-নানু এলে এমন গম্ভীর হয়ে যাও কেন ?

নিশিকে বুকে চেপে মার সে-কী কান্না, গম্ভীর হয়ে যাই বুঝি ? কেমন একটা অস্বস্তি কাজ করে, মনে হয় ওরা এলে তোর বাবার খুব অসুবিধে হচ্ছে। তোর চাচারা অনেক বড় বংশের, তোর বাবার খানদানের কাছে আমরা কত ছোট। এছাড়া দেখিস না, ওদের জন্য আমি করলে তোর বাবা কত খুশি হয়।

অথচ এই মা ছিলেন শিক্ষিত, নিজের উপার্জন স্বামীর হাতে তুলে দিয়ে কী সুখ তার! হ্যাঁ, এর মধ্যেও তাঁদের প্রেম ছিল, দুপুরে তিন ভাই-বোনকে ঘুম পাড়িয়ে তাঁরা সিনেমা দেখতে যেতেন। একদিন মনে পড়ে, সে বাবা-মার রিকশার পেছন লটকে অনেক দূর পর্যন্ত গিয়েছিল। রাস্তায় বাবা ওকে দেখতে পেয়ে সে কী বকা!

একরাম কাকু কেন পাগল হয়ে গিয়েছিল মা ?

পাগল হওয়া একটা রোগ, মানুষ যখন কোন কারণে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে তখন এই রোগ হয়।

অথচ সেদিন যখন এই প্রশ্ন করেছিলাম, তখন বলেছিলে, তার অনেক দুঃখ ছিল। তার সুন্দরী বউকে দাদা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, কাকু দাদার ভয়ে তার বউকে বাপের বাড়ি থেকে আনতে পারে নি।

মা বলেছিলেন, এসব জেনে তোর কী কাজ ? সব বিষয়ে এত কৌতূহল তোর!

গত পরশু বাবা যখন বাইরের ঘরে বসে টিভি দেখছেন, অকস্মাৎ মাকে স্তব্ধ করে দিয়ে নিশি ফিসফিস করে বলে, একরাম কাকু কেন পাগল হয়েছিল আমি জানি। মার চোখ স্থির। কঠিন হয়ে উঠেছে চামড়া, কী জানিস ?

দাদা একরাম কাকুর স্ত্রীকে রেপ করেছিল। আমি সব জানি মা, সারাজীবন তোমরা লুকিয়েছ এসব। আমার যে কিচ্ছু হয় না, এ আমার পূর্ব পুরুষের পাপ!

হে অলস রাত, নিঃশেষিত হয়ে আসা মোম, আমার ঘুম পাচ্ছে। আফজাল, তুমি এসে আমার হাতটা ধর, আমার কেমন শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। এই কঠিন পৃথিবী, ঘর থেকে বেরোলেই সাপের ছানা, কিলবিল পোকা, ঘরের বিছানায় রক্তখেকো ছারপোকা, এইসব থেকে বেরিয়ে আমি এক প্রহরের জন্য হলেও বিশুদ্ধ বাতাসের নিচে দাঁড়াতে চাই।

শামাদানে আলুথালু হয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে শেষ শিখাটি।

এইতো নিকষ অন্ধকার, স্পষ্ট হচ্ছে জাহিদের মুখ। নিশি উন্মুখ হয়ে তাকায়, না সেদিন জাহিদ আসে নি, পুরোটাই তার স্বপ্নে ঘটেছে। অথবা এ তার বিভ্রম! এইভাবে এসে কোনো মানুষ এইভাবে মিলিয়ে যায়? জাহিদের মতো ছেলে, যে কাউকে কখনো নিজের দুর্বলতা দেখাতে জানে না! অথচ আমি আমার সৌন্দর্য দেখিয়ে তাকে চিরকালের মতো দগ্ধাতে চেয়েছিলাম। এত স্পর্শকাতর ছেলে! আমি তাকে আপদ বলেছি, বেড়াল বলেছি, নিশ্চয়ই আমার দুঃসহ উচ্চারণগুলো তার কানে গিয়েছে। এই শহরের কোথায় তাকে আমি খুঁজব? আমি তাকে জানাতাম, ওইসব উচ্চারণে আমি আমার বুকের কষ্ট নিংড়ে বের করেছিলাম। নারীদের সম্পর্কে কত বিশ্লেষণ তার, সে নিশ্চয়ই আমার সত্য বুঝত। মনে পড়ে একদিন বার্নার্ড শ'র একটি উদ্ধৃত করেছিল সে, "একজন নারী যদি বলে 'না' ধরে নিতে হবে 'হয়তো'। যদি বলে 'হয়তো', ধরে নিতে হবে 'হ্যাঁ'। যদি বলে 'হ্যাঁ', তবে সে নারীই থাকল না।"

নিশি বলেছিল, এবার তাহলে আমি পুরুষ সম্পর্কে আমার বিশ্লেষণ বলি? একজন পুরুষ যদি বলে 'হ্যাঁ', তাহলে ধরে নিতে হবে 'হয়তো'। যদি বলে 'হয়তো', তাহলে ধরে নিতে হবে 'না'। যদি বলে 'না', তাহলে সে পুরুষই থাকল না।

তুমি বলতে চাও পুরুষ কাউকে প্রত্যাখ্যান করতে জানে না?

অর্থটা তাই দাঁড়াচ্ছে।

নিশি, তোমার দুর্ভাগ্য, তুমি পুরুষের প্রত্যাখ্যান দেখো নি।

তুমি যদি তাই কর, সেটা হবে তোমার আরোপিত। এই যে আমি তোমার সঙ্গে আছি, তুমি 'হয়তো'র মধ্যে আছ, স্পষ্ট করে 'না' করছ না।

নিশি, এ আমার নিজেকে নিয়ে বিভ্রম, তোমার সাথে এই একটা পয়েন্টে যুদ্ধ করে রক্তারক্তি করা যায়, কিন্তু সব মানুষ কি নিজেকে বুঝতে পারে? কারো কারো হয়তো বুঝতে অনেক সময় লাগে, এমনওতো হতে পারে, আমি জীবনের শেষ প্রান্তে গিয়ে বুঝলাম, তুমি আমার জীবনে রক্তস্রোতের মতো, নিঃশ্বাসের মতো অপরিহার্য ছিলে! অন্ধকারে নিশির চোখ ঝাপসা হয়ে আসে, জাহিদ কি সেই উপলব্ধি নিয়েই সেদিন এসেছিল?

অথচ আমার অস্তিত্ব এতটাই প্রাণ ছাপিয়ে উঠেছিল, আমি আমার সত্যকে, আমার সহজাত সৌন্দর্যকে রূপান্তরিত করেছিলাম ঘিনঘিনে গোবরে, হে আমার আকাঙ্ক্ষিত ভ্রূণ, তুমি একটা রূপ নাও। আমার রক্ত-মাংস ফুঁড়ে বেড়ে ওঠো শালপ্রাংশুর মতো, আমি শেকড়ের তলায় বসে আমার জন্মের গ্লানি ভুলি।

দরজায় শব্দ হচ্ছে।

নিশি বলে, হিরণ, হিরণ, ঘুমিয়ে পড়েছিস? আচ্ছা ঝামেলা হলো। এই অন্ধকারে আমি কোথায় মোমবাতি খুঁজে পাই!

নিশির জীবন যখন এই রকমভাবে প্রবাহিত, তখন পরিশ্রমের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে আফজাল। অফিস থেকে রেজার সাথে ঘোরে কিছু একটা করার ধান্দায়। এরি মধ্যে অফিসিয়াল পলিটিক্সে পড়ে রেজারও জাপান যাওয়া ক্যান্সেল হয়ে গেছে। বেচারাও মরিয়া হয়ে উঠেছে একটা কিছু করার জন্যে। নিশির তৈরি পোশাকগুলো পছন্দ করছে গার্মেন্টিস দোকান, মমতাদি বলেছেন, তোমার আর আমার সপ্তাহান্তে হলেও এ কাজের জন্য একবার কোথাও বসা দরকার। নিশির পরীক্ষা শেষ হয়েছে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন, কয়েকটা গৎ-বাঁধা প্রশ্ন মুখস্থ করে নিয়েছিল, প্রায় প্রত্যেক সাবজেক্টে সিলেবাস তাকে দারুণভাবে সাহায্য করেছে। এইরকম যখন সবকিছু গুছিয়ে আসছে, তখন নিশির জীবনে ঘটে এমন একটা ঘটনা, তাকে যা মুহূর্তের জন্যে হলেও বিমূঢ় করে দেয়।

কলেজ থেকে ফেরার পথে রিনিকে জনাকয় মাস্তান টাইপের ছেলে অপহরণ করে। এই ঘটনায় বাবা এতো আঘাত পান, একেবারে স্ট্রোক করে বিছানায়। যন্ত্রণায়-ভয়ে মা একেবারে স্তব্ধ! বাড়িটা মুহূর্তে মৃতপুরীর মতন হয়ে ওঠে। থানা-পুলিশ করার আগেই বিষয়টার জট নানাভাবে খুলতে থাকে। অপহরণটা নাকি একটা নাটক, একটা ইন্টারমিডিয়েটে পড়া মাস্তান টাইপের ছেলে কয়েকদিন ধরে রিনির পেছনে লেগেছিল, এখন বন্ধুদের সাহায্যে তাকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে পিস্তলের মুখে রিনিকে বিয়ে করেছে।

নিশির মাথায় রক্ত চড়ে যায়, জোর করে বিয়ে? তাহলেও তো থানায় ডায়েরি হতে পারে, সবগুলোকে হাজতে ঢুকিয়ে...।

আফজাল তার কম্পিত হাত চেপে ধরে, তাতে তো তুমি বিয়েটা উইথড্র করতে পারছ না। ওর জীবনে যা ক্ষতি হওয়ার, তা তো হয়েই গেছে।

একে তুমি বিয়ে বলছ? দু'জনের মত ছাড়া বিয়ে হয়? যদি হয়েও থাকে এ বিয়ে অবৈধ।

তারপর সে বেরিয়ে পড়ে।

নিশি নিজেও ভেবে পায় না, নিজের যে-কোনো বিষয়ে তার ভীরুতার কোনো সীমা-পরিসীমা থাকে না, সেই তার মধ্যে ভর করছে এমন পৈশাচিক শক্তি, মনে হচ্ছে, সব ক'টি ছেলের হাড়-মাংস সেদ্ধ করে খেয়ে তাকে যদি মরতে হয়, তাতেও তার উত্তপ্ত আত্মা শান্তি পাবে।

এ শহরের কে তাকে ব্যাপারটায় সাহায্য করবে?

খবর শুনে ভাইজান আসে খুলনা থেকে। সে বলে, আমি দেখছি, তুই গিয়ে কী করবি? থানায় তো ডায়েরি করা হয়েছে, একটু স্থির হ।

তাহলে পুলিশ ওদের ধরছে না কেন?

তুই আমার সাথে থানায় যাবি?

রিকশা রাজপথ বেয়ে ছুটতে থাকে। কতকাল পরে ভাইজানের সাথে এক রিকশায় যাওয়া, এমন এক সময়ে, যখন দু'জন একই বেদনায় মুহ্যমান।

ভাইজান বলে, এত ভালো ছাত্রী ছিল, ওর কেরিয়ারটা নষ্ট হয়ে গেল।

তোমার কি মনে হয় ওরা রিনিকে টর্চার করছে?

বিয়ে হয়ে গেছে, টর্চার আর কী করবে ? ওরা এখন আছেটা কোথায়, তাই তো বুঝছি না।

থানায় গিয়ে সশব্দে আছড়ে পড়ে নিশি, আপনারা এই শহরে কী করার জন্য আছেন ? কয়েকটা পুঁচকে পাতি মাস্তানকে ধরতে পারছেন না ?

পানদন্ত বিকশিত করে হাসে ইন্সপেক্টর, সে কি আমরা ধরতে যাই নি ? আপনার বোনের বয়স আঠারো পেরিয়েছে, পারস্পরিক মত আছে। এখানে আমরা কি করতে পারি ? আপনার বোন ফ্যামিলিতে বলতে সাহস পায় নি, বুঝলেন, পুরোটাই সাজানো একটা নাটক, ছেলের বাড়ির অবস্থা তো ভালো, এত ভাবছেন কেন ?

এসব কী বলছেন আপনি ? নিশির চড়ে ওঠা কণ্ঠ কেমন মিইয়ে আসতে থাকে, এ কী করে হয় ? রিনিকে আমি চিনি, আপনারা পারছেন না, তাই একটা অজুহাত দেখাচ্ছেন।

ইন্সপেক্টর হাসে, ম্যাডাম, নিজের বোনকে আপনি চিনবেন না তো রাস্তার মানুষ চিনবে ? সময়টাই এরকম, চেনার মধ্যেও কেমন যেন একটা গণ্ডগোল লেগে যায়। এই যে আমি, কী রকম কঠিন পোশাক পড়ে আছি, আমার মেয়েকেও আমি চিনতাম, যখন দেখলাম আমি নিজের হাতে যাকে একদিন জেলে পুরেছিলাম, সেই ছেলের হাত ধরে সে পালিয়ে গিয়েছে, মেয়েকে আর চিনতে পারলাম না। দুনিয়াটা এই রকমই বুঝলেন, চেনার মধ্যে অচেনা।

ভাইজান ঠাণ্ডা কণ্ঠে বলে, ওরা এখন কোথায় আছে ?

এই যে ঠিকানা লিখে দিচ্ছি, খোঁজ নিয়ে দেখুন। অবশ্য আপনাদের বোন সেখানে নেই, সে সম্ভবত এখন স্বামীর সাথে হানিমুনে। এর আগেই তার সাথে আমার কথা হয়েছে। মিটিয়ে ফেলুন, এক মেয়ের জীবনে ক'বার বিয়ে হয় বলুন ?

ঘরে সন্ধ্যার ছায়া নেমে এসেছে। নতমুখে বসে আছে আফজাল। ভাইজান অসহিষ্ণু পায়চারি করছে। বিছানায় শোয়া বাবা সটান উঠে বসেন, মা তেমনই বাকরুদ্ধ, তারই উদ্দেশে বাবার চোখ রক্তাভ হয়ে ওঠে, কোন্ পূর্ব পুরুষ যে আমাদের শাপ দিয়েছিল। আমার বাবা মরেছেন কুষ্ঠ হয়ে, আমি বিছানায় পড়েছি, হ্যাঁ, এরপর তোমার মেয়ে বাজারের বেশ্যা হবে।

ভাইজান চিৎকার করে ওঠে, বাবা!

মা একদম আছড়ে পড়েন মেঝেতে, ওভাবে বলো না, ও শিশু, ভুল করেছে!

শিশু! বাবা শ্লেষ-মেশানো কণ্ঠে হাসেন, বদমায়েশ ছেলের শয্যাসঙ্গিনী হতে যায় যে মেয়ে, সে শিশু ? এইসব তোমার প্রশ্রয়, আমি পঙ্গু হয়ে ধুঁকে ধুঁকে তোমার সামনে মরব, মার যন্ত্রণা প্রলম্বিত হতে দেখে বাবার স্বর উচ্চকিত হয়, তুমি বিধবা হয়ে পথে পথে ঘুরবে, বুড়ো তো হয়েছ, ক'দিন থাকে দেখব চাকরির ফুটানি।

বাবা এমনভাবে হাঁপাতে থাকেন, তার বুকের পাঁজর সন্ধ্যার ছায়ায় এমন প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, এমনভাবে ঠিকরে বেরোতে থাকে চোখ, নিশি তার চিরদিনের চেনা বাবাকে আর চিনতে পারে না।

খুব ভোরে রেস্তোরাঁয় বসে চা খেতে খেতে জাহিদ দেখে এক মজার দৃশ্য। রাস্তায় তখনো ভিড় বাড়ে নি, ঘুটঘুটে কুয়াশা সবে কাটতে শুরু করেছে। সে দেখে, রাস্তার ওপারে ম্যানহোলের ঢাকনার ওপরে একটা কাক মরে পড়ে আছে। খবর পেয়ে চারদিক থেকে ছুটে আসছে আরো অসংখ্য কাক। সবচেয়ে অদ্ভুত যেটা, এরা নেমেই চ্যাঁচামেচির বদলে মৃত কাকটার সামনে এসে গম্ভীর দাঁড়িয়ে পড়ছে। একে তো কাকদের পোশাক কালো, তার ওপরে নেমেই সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ার দৃশ্য দেখে জাহিদের মনে হয়, সবাই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিচ্ছে। তার কাছে বিষয়টা এমনই অভিনব ঠেকে, গরম ধোঁয়ায় তার মুখ ভিজে উঠতে থাকলেও সে কাপে চুমুক দিতে ভুলে যায়।

সে নিজের এই বিস্ময় অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করার জন্য বেয়ারাকে ডেকে বলে দেখেছ কাণ্ড!

কী?

ওই যে।

বেয়ারা দাঁত বিকশিত করে, ওহ্ কাউয়া? আগে দেহেন নাই? হালারা সাত সকালে হুজ্জোত লাগাইছে, বলেই নিজের বীরত্ব দেখাতেই যেন সামনে পড়ে থাকা ইটের একটা ঢেলা ওদের দিকে ছুঁড়ে দেয়। ফলে ওদের ভাবগম্ভীর পরিবেশটাই ভেস্তে যায়। ওরা এমন কা-কা শুরু করে, যেন এতক্ষণ প্রবল শোকে কাঁদতে পারছিল না, কেউ অনুভূতিতে আঘাত দিতেই হয় বেদনায়, নয় প্রতিবাদে, না হয় প্রচণ্ড আহত হয়ে একেবারে সশব্দে ভেঙে পড়ে। জাহিদ বলে, তুমি ঢিল ছুঁড়লে কেন?

হ্যারা বুঝি আপনের আত্মীয় হয়?

জাহিদ নিঃশব্দে দাঁড়ায়, কাপের চা ততক্ষণে জলে রূপান্তরিত হয়েছে।

না, সহজে ক্রুদ্ধ হওয়া তার ধাতে নেই। তার বদলে তার মধ্যে এমন এক বিশ্রী অনুভূতি হয়, যাকে সে নিজেও শনাক্ত করতে পারে না।

চা-টা নিঃশব্দে টেবিলে ঢেলে সে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে আসে।

পরদিন আবার সেই একই রেস্তোরাঁয়। ম্যানহোলের ওপরের হাওয়া পরের দিন কেমন, স্রেফ তাই পর্যবেক্ষণ করতে আসা। কাকেরা জাগতিক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মৃত কাকটাও নেই। সৎকার হয়ে গেছে হয়তো।

বেয়ারা বলে, কাইল্ তো জবর মাস্তানি দেহাইলেন। চায়ের বিল না দিয়া গেলেন গা।

চা কি আমি খেয়েছি?

চা আপনে খাইছেন, না আপনের কাউয়ারা খাইছে, তার আমরা কী জানি? আমরা আপনেরে চা দিছি, আমাগো খরচ হইছে, আপনি বিল দিবেন।

দোকান চালাতে হলে খালি চা দিলে হয় না। তার সাথে চিনির মতো ব্যবহারটাও মিশিয়ে দিতে হয়, ওই যে তোমার বাপ-দাদারা, চা-ও খায়, উল্টো চান্দাও নিয়ে যায় কেন? হিসেবটা সেখানে কেমন? আজ আর একটা কথা বলেছ তো, কাল ঠাণ্ডা চা টেবিলে ঢেলেছিলাম, আজ গরমটা—।

বেয়ারা চোখ বড়ো বড়ো করে তাকায়, মাপতে চেষ্টা করে জাহিদকে, আসলেই শতচ্ছিন্ন পোশাকের ছদ্মবেশে তেমন বাপ-দাদাদের কেউ আসল কি-না।

খাটিয়া আকারের একটি ঘর।

কোনোরকমে নিজেকে সেঁধিয়ে দেয়া চলে। এর মধ্যে দু'জন থাকতে গেলে গ ঘষটাঘষটি, নিঃশ্বাসে জড়াজড়ি। সুরুজ মিয়ার সাথে এভাবেই রাত্রি যাপন জাহিদের দু'জনের বদঅভ্যাস থাকলে এ্যাদ্দিনে ইন্দ্রিয় সুখকর একটা সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারত। ব ভালো মানুষ এই সুরুজ মিয়া। রেস্তোরাঁয় কাক নিয়ে কথা বলতে গিয়ে পরিচয়। ক্ষীণকা দেহ, এমনিতে বেজায় রসিক, মেয়ে দেখলেই সারা শরীর ফ্যাৎনার মতো কাঁপে। নি করে একটা প্রেসে কম্পোজিটরের কাজ, তার ওপর গায়ে পড়ে জাহিদের দায়িত্ব নেয়া ডিউটি বেড়ে গেছে আরেকটা, জাহিদের জন্যে কাজ খোঁজা।

আপনে তো আবার শিক্ষিত মানুষ, এইডাই হইছে গিয়া মাইনাস পয়েন্ট, আমি লাইনে ঘুরি, হ্যারা এমএ পাসরে ডরায়।

কুচিকুচি টিনের ছাপড়া। কত জাতের যে মানুষ থাকে, মিস্ত্রি, ছুতার থেকে শুরু ক রাতের বেশ্যা পর্যন্ত। সারাক্ষণ হট্টগোল, খিস্তি-খেউর। কিছু দূরেই শহরের রাজ্যি আবর্জনা ফেলা হয়। সেখান থেকে উড়ে আসা বাতাসের সে কী বিষাক্ত জেদ! নিঃশ্বাসে কাছে এসে খামচে-খিচড়ে এক করে ফেলে সব। জাহিদের একটাই সুবিধা, যতক্ষণ খাটিয়ায়, ততক্ষণ লাশ।

ছিটকাপড়— বস্তি থেকে বেরোনোর মুখেই টানা গলায় ডাকতে শুরু করল কোনে ফেরিঅলা, আরেকটু দূরে গিয়েই শুরু করা যায়, কিন্তু অভ্যাস, ঘাড়ে বোঝাটা নিতেই অবচেতন কণ্ঠ ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে।

জাহিদ চরের জীবন দেখেছে, শীতকালে বাসা বেঁধে কী নিশ্চিন্ত, গোছানো জীবন লাউয়ের মাচা তৈরি করছে, হাঁস-মুরগিকে খাবার দিচ্ছে, বর্ষা আসার সঙ্গে সঙ্গে পাততাড়ি গোটাও, মানুষের জীবনের এই বিচিত্রতার সাথে নিজেকে মুহুর্মুহু মানিয়ে চলার সংগ্রামটাকে তার কাছে বিস্ময়কর মনে হতো। আজ সে যেখানে এসে উঠেছে, এও অনেকটা শহুরে চর। খাটিয়া টাইপের কয়েকটা ছাপড়া তুলে এই জায়গার মালিক জায়গাটাকে দখল করে রেখেছে। সে থাকে বিদেশে। তার ইচ্ছে ছিল একটা ঘর তুলে একজন মানুষ বসানোর। কিন্তু তার কাছের যে আত্মীয় জায়গাটার দায়িত্ব নিয়েছে, সে মওকা বুঝে টিনের একটা ঘরের সাথে ঘুপচি কয়েকটা ঘর তুলে রীতিমতো ভাড়া আদায় করতে শুরু করেছে।

এর মধ্যেই শিম লতার গাছ উঠেছে, পুরনো পানের পিকের স্থায়ী দাগ বসে, মরচে পড়া লোহালক্কর পড়ে থেকে, ফ্যাক্টরির ধোঁয়ার কালচে দাগ সারা ঘরের দেয়ালে বসে গিয়ে এমন অবস্থা হয়েছে জায়গাটার, যেন এরা এখানকার যুগ যুগের বাসিন্দা। মাঝে-মধ্যে কার ঘরের বাচ্চা খুব ভোরে কার ঘরের সামনে হেগেছে— তাই নিয়ে রমণীতে রমণীতে এমন তুলকালাম কাণ্ড লাগে, জাহিদ স্তম্ভিত হয়ে যায় এদের শক্তি দেখে। এমনই এদের ধার, যে কোনো বীর পুরুষও যদি সেই মুহূর্তে সেই নোড়ার সামনে দাঁড়ায়, মরিচ পেষা হয়ে যাবে।

আর খিস্তি-খেউর, এইসব শব্দ তৈরি করার এমনই এদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা, সব জড়ো করলে বাংলা ভাষায় নতুন শব্দের সংযোজন ঘটে সেটা নিশ্চিতই সমৃদ্ধ হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রতিদিনই এখানে নতুন মানুষের আবির্ভাব, নতুন নতুন আবাসের বাড়বাড়ন্ত। একটা বড় সাইজের পাইপ ঠেলতে ঠেলতে এখানে এনে তার মধ্যেই শুরু করল কেউ জীবন। চারটা বাঁশ খাড়া করিয়ে তার ওপর পলিথিন চাপিয়ে বসবাস করতে শুরু করল আরেক দম্পতি। এর মধ্যেই সন্তান উৎপাদন, খাওয়া-ঘুমনো সব। মাস শেষে জায়গার রক্ষাকর্তা এইসব দেখে প্রথমে রুদ্রমূর্তি, তারপর পঞ্চাশ, ষাট যা হোক তাদের কাছ থেকে বাগিয়ে জায়গাটাকে দস্তুরমতো বস্তিতে পরিণত করতে সাহায্য করেছে।

এসবের মাঝখানেই ক'দিন যাবৎ কী হয়েছে জাহিদের, পৃথিবীর যাবতীয় কাকের ওপর তার অদ্ভুত মমতা বেড়ে গেছে। হাসপাতালে পড়ে থাকতে মাথার মধ্যে বনবন ঘুরত গ্রাম, সেখানকার মানুষ। তার শিরা লটকেপটকে জড়িয়ে ধরত দু'মাথার অজগর, আর সেই যমজ মুখ, জ্যোৎস্নার অদৃশ্য বেত্রাঘাতে যারা তার পিঠের হাড় ভেঙে দিয়েছে। ভয়ে-আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে ঘুম থেকে জেগে উঠত। সেই আবদুল খালিক, কিশোরী স্ত্রীকে নিয়ে যার মনোবেদনা, তার আত্মা স্পর্শ করেছিল। মানুষের এইসব রূপ বদল তাকে হতোদ্যম, বিমূঢ় করে তুলেছিল। এরপরই সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, বাতাসের মতো উড়তে উড়তে যদ্দিন বাঁচা যায়, বাঁচব; হীরা, বৃদ্ধা, লায়লা, হ্যাঁ রোজলিন রোজারিও, সবাই—এই দেখা যাচ্ছে পল্লবিত, এই নিষ্প্রাণ মরা গাছ। এই পৃথিবীতে সে একটিই সুন্দর মমতাময় দৃশ্য দেখেছে, মৃত কাকের শোক উৎসব। এই দৃশ্যে চোখ রেখে জাহিদ ভেতরের কাঁচা হয়ে উঠতে থাকা জখম ঢাকে। এর মধ্যে একমাত্র নিশিরই, হ্যাঁ নিশির রূপ বদল ঘটেছে। যে নিশি তাকে স্পর্শ করতে দিত না, নিজের কম্পন আড়াল করে টান করে রাখত ঘাড়, সে-ই অনেকখানি ছায়া ফেলেছে জাহিদের ওপর। ঘুমের মধ্যে, স্বপ্নের মধ্যে, নারকেলের খোসা পায়ে ঠেলে সে কুকুরটার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে এসে দাঁড়িয়েছিল রাজপথে।

সেই ঘোরাক্রান্ত পথই তাকে নিয়ে গিয়েছিলে নিশির দরজায়। আবছায়া আলোয় তার সেই মুহূর্তের চোখ দেখে জাহিদের মনে হয়েছিল, জীবনের সবটাই তার অপচয় হয়ে যায় নি, এখনো কোথাও সে আছে। না, সেই মুহূর্তে নিশি তার সেবায় নিজেকে উপুড় করে দিলে সে পরিণত হতো চিরন্তন নারীতে। জাহিদ কেমন চেতনা হারাচ্ছিল, পুনরায় জেগে উঠছিল, তখনই টের পাচ্ছিল তার কপালের জলপট্টির মধ্যে থেকেও নিশি নিজেকে সন্তর্পণে সরিয়ে নিচ্ছে কী এক যন্ত্রণাকর অস্থিরতার কারণে।

স্বামীর আগমনের পর জাহিদকে কেন্দ্র করে নিশির চাপা বিরক্তি, ছিন্নবিচ্ছিন্ন উচ্চারণের পর জাহিদের মনে হয়েছে, কী বিপন্ন, কী অসহায় এই নারী! নিশির প্রতি প্রবল মায়ায় তার সারা অস্তিত্ব শিথিল হয়ে আসছিল। ভেতরের আগুন, ভেতরের গনগনে তুষ চাপতে এই নারী উল্টোপাল্টা ঘুরছে, যখন যা হাতে পাচ্ছে, ময়দা, কুঁড়ো, হ্যাঁ, সুগন্ধি পাউডার পর্যন্ত কপালের ভাঁজ আর শিরাতে লেপটে দিচ্ছে। এর ভেতর থেকে সত্যিকারভাবে তাকে আবিষ্কার করে তেমন কোনো দক্ষ চোখ নেই বলে, মেয়েটা তার সেই চরম রূপটাকেই ক্রমশ নিজের মধ্যে বাস্তব করে তুলছে। সেই স্বল্প সময়ের ব্যবধানে নিজের তপ্ত জ্বরের ঘোরে নিশি সম্পর্কে সে এই বিশ্লেষণে এসেছে। ঘরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাকে দেখে নিশির প্রতিক্রিয়া, পরক্ষণেই পাল্টে যেতে থাকা তার মুখ দেখে সে বলেই

সম্ভব হয়েছে তার আসল অবস্থাটি এক রাতের মধ্যেই অনুধাবন করার। জ্বর ছেড়ে গেলে জাহিদ রাত্তিরে ওদের বারান্দায় গিয়ে বসে থেকেছে, সে নিশ্চিত ছিল শ্বাস আটকে মরে গেলেও মাঝখানের দরজা খুলে নিশি একবারের জন্যও তাকে দেখতে আসবে না। নিশি সেই নারী নয়, সেবায় নার্স, স্নেহার্দ্রতায় মা, প্রেমে প্রেয়সী, তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য সে জিভ দিয়ে হলেও স্মৃতির বিষাক্ত দাগ তুলে নিতে পারে।

ওই যে নাচতে নাচতে এগিয়ে আসছে একটা কাক, মনে হচ্ছে এ-ও সেই মৃত কাকের আত্মীয়। সস্নেহে সে পাউরুটির একটা টুকরো ছুঁড়ে দেয়, এমন কোনো পন্থা যদি জানা থাকত, যার কল্যাণে এই শহরের সমস্ত কাক হয়ে উঠত তার আত্মীয়, তবে সে কোনো মানুষের সাথে আর চলাচল করত না। জাহিদের এই ভাবনার কথা শুনলে তাকে নিশ্চিতই পাগল ঠাউরাবে সবাই। এখানেও কেবল নিশিই ব্যতিক্রম, সে জাহিদের এই চিন্তার সাথে একাত্ম হয়ে হয়তো গবেষণার গভীরে ডুবে যেত। কিভাবে কাকদের কাছে নিজেকে নির্ভরশীল করা যায়, কী করে এদের ভাষা শেখা যায়!

রাত্তিরে সুরুজ মিয়া এসে বলে, আপনের একটা হিল্লা হয়া গেছে।

জাহিদ সন্তর্পণে উঠে বসে, কাক সম্পর্কে কিছু?

মিয়া ঘাড়ে বইসা খাইতাছেন, দুনিয়া টের পান না। চাকরি! প্রুফ রিডারের, এইসব তো আবার শিক্ষিত লোকের কাম। কাইল থাইক্যা লাইগ্যা যান।

মমতাদি বলেন, ক্যাটালগ খুঁজে আমি বেশ কিছু ডিজাইন বের করেছি, এগুলো দোকানে দেখিয়েওছি, ওরা এর ভেতর থেকে কয়েকটার অর্ডার দিয়েছে। আমি চাই এখন থেকে তুমি নিজে গিয়ে কাজগুলো বুঝে আস।

নিশি বলে, এখন মনে হয় বিয়ের আগে সেলাইয়ের কোর্সটা করে রেখে কী ভালোই না করেছিলাম। বিয়ের পরে আর করা হতো না। আফজালেরও ব্যস্ততা বেড়েছে, কাজ করতে আমার কোনো অসুবিধা হয় না। সেদিন নিজের কিছু উপার্জন ওর হাতে তুলে দিয়েছিলাম, কী যে অদ্ভুত অনুভূতি মমতাদি, আমাকে বলল, প্রথম উপার্জন খাওয়াতে হয়। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই শুধু ওকে আমি খাওয়াবো, যা খরচ হয়, একদম কিপটেমি করব না। আমার কী ইচ্ছে হচ্ছে জানেন, শেরাটনে গিয়ে খাই, কোনোদিন ওখানে যাই নি।

যা আবেগপ্রবণ তুমি! মমতাদি হাসেন, শোনো, ব্যবসা অত আবেগ দিয়ে হয় না। তোমরা বাইরে গিয়ে খাও, ঠিক আছে, কিন্তু আমরা যেটা প্রধান সমস্যা বলে মনে করছি, সেটা হলো পুঁজির অভাব। আমিও তো জীবনে কিছু জমাতে পারি নি। কাপড় দেয়ার পর ওরা যা অগ্রিম দেয়, তা দিয়ে আর ক'টা জামা বানানো যায়? একটাই সুবিধা, বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। ভাবছি এখন ডিমান্ড বাড়াবো, আমাদের কাছ থেকে সরাসরি তারা কিনে রাখবে, ডিজাইন তো আগেই তাদের দেখাচ্ছি, কী বলো? কিন্তু নিশি, তোমাকেও নামতে হবে। একটা কাজ করবে, তার আদ্যোপান্ত কিছু জানবে না?

কাপড় নিয়ে আমি সরাসরি দোকানের সাথে ডিল করি জানলে বিষয়টা আফজালের পছন্দ হবে না, নিশি বলে। এখুনি সেলাই মেশিনের খটখটে একঘেয়ে আওয়াজে ওর মাথা

ধরে যায়। ও ঘরে ফিরলে আমি কাজ বন্ধ রাখি। যা হোক, ওকে বিগড়ে এখন কিছু করতে চাই না, তাতে আমার দাঁড়ানোটাই হবে না।

কিন্তু এভাবে যে তুমি দাঁড়াতেই পারবে না, মমতাদি বলেন। ঘরে বসে শুধু সেলাই করবে, আমি ঘুরে সাপ্লাই দেব, মূল কাজটা নিশি তোমার। তুমি তো অন্যায় কিছু করছ না। তুমি এমন করে কথা বলো যেন তুমি তোমার দাদা-দাদির যুগে বাস করছ। তুমি বিষয়টা বুঝিয়ে বলো তোমার স্বামীকে, সে শিক্ষিত ছেলে, কাজটার পরিচ্ছন্নতা বুঝবে না?

নিশি নখ খুঁটতে থাকে।

মমতাদি বলেন, আমার মনে হয় তোমাদের দু'জনের মধ্যে একটা মস্ত এক ব্যবধান আছে, একে পাশ না কাটিয়ে কমানোর চেষ্টা কর। তাতে রক্তপাত হয় হোক, দ্বন্দ্ব হয় হোক। নইলে আর একসঙ্গে বসবাস করার অর্থটা কী?

ঘটনাটা ঘটেছিল বিয়ের চার-পাঁচদিন পর, যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে টাটকা উষ্ণ অকৃত্রিম রোমাঞ্চ থাকে! সবটাই থাকে শিল্পিত, ঘুমনোর সময় অভ্যাস থাকলেও পুরুষের হাঁটুর ওপর লুঙ্গি ওঠে না, মেয়েরা ঘুম থেকে উঠে স্বামী তাকে দেখে ফেলার আগেই হালকা প্রলেপে নিজেকে সাজিয়ে নেয়, দু'জন দু'জনের পরিবারের প্রতি একান্ত মমতা প্রকাশ করে, সবাই যতদূর সম্ভব যার যার বদ অভ্যাসগুলো লুকিয়ে রাখে। বিয়ের ছবি-বন্দি ক্যামেরাটা বের করে নিশি বলে, মনে হয়, আরো কয়েকটা স্ন্যাপ আছে।

আফজাল বলে, ও মাই গড! এটা তো ওয়াশ করা হয় নি, এমন আড়ম্বরহীনভাবে সবকিছু হলো, কিচ্ছু মনে নেই।

নিশি আফজালের মুখ তাক করে ক্যামেরার কোথায় না কোথায় চাপ দিল, অমনি ফটাস করে আলো জ্বলে কেমন একটা চিড়-ড় শব্দ করে আচমকা ক্যামেরাটা থেমে যায়। উদ্বিগ্ন আফজাল এগিয়ে আসে, করেছ কী? বলতে বলতে ফিল্মটা বের করার চেষ্টা করে, না, কোথায় যেন আটকে গেছে ফিল্মটা। কিছুতেই বের হচ্ছে না। আফজালের মুখ ক্রমশ গম্ভীর হয়ে উঠছে, পুরো ফিল্মটা জ্বলে গেছে।

নিশি বোকা হয়ে যায়, আহতও হয়। কেমন বিমূঢ়তায় পেয়ে বসে তাকে, আমাদের বিয়ের ছবিগুলো, জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটা স্মৃতি, তুমি নিশ্চিত, জ্বলে গেছে?

আফজাল ক্যামেরাটা নিয়ে উল্টেপাল্টে নানাভাবে চেষ্টা করে, এমন আহম্মকের মতো কাণ্ড কেউ করে? তুমি কোথায় চাপ দিয়েছিলে? এখন দশাটা এমন ফিল্ম বাঁচাতে গেলে ক্যামেরা ভাঙতে হবে, ক্যামেরা বাঁচাতে গেলে ফিল্ম!

নিশি স্তব্ধ হয়ে যায়, আফজালের বলার ভঙ্গির মধ্যে নিশি গিয়ে দাঁড়ায় সেই পর্যায়ে, যেন ডাক্তার এসে দাঁড়িয়েছে সামনে, হয় সন্তান, নয় মা!

তুমি এটাকে স্টুডিওতে নিয়ে যাও না, নিশি বিব্রত কণ্ঠে বলে, নয়তো কোনো ইলেক্ট্রনিক্সের দোকানে?

আফজাল ক্যামেরাটা নাড়তে নাড়তে ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে, কখনো এর শাটার টানছে, কখনো ফ্লাশ টিপছে, সবচেয়ে অস্থিরভাবে যা করছে, শক্ত আঙুলে চাপ দিচ্ছে সুইচে।

নিশি বলে, আমার কথা তোমার কানে যাচ্ছে ?

দোকানে নিয়ে গিয়ে কী হবে ? আফজাল তার চড়ে উঠতে থাকা রাগ সামলাতে পারে না, তুমি ভাবছ ক্যামেরার কিছুই আমি বুঝি না ? এর সব শেষ হয়ে গেছে, এ কথা আমাদের মানতেই হবে।

নিশির ভেতর থেকে কান্না উঠে আসে। বিয়ের ছবি, কতরকম করে ওঠানো! গায়ে হলুদ থেকে শুরু করে বিয়ের কান্নাবিজড়িত বিদায় পর্যন্ত আফজাল রেজা ভাইকে দিয়ে পরিকল্পিতভাবে ছবিগুলো উঠিয়েছে। সবচেয়ে বেদনার যা, নিশিদের পক্ষ থেকে ভাইজানের ক্যামেরায় যে ছবিগুলো ওঠানো হয়েছিল, পরদিন সে গিয়ে শোনে কী এক কারিগরি সমস্যায় তার একটা ছবিও ওঠে নি, ভেতরে আস্ত ফিল্ম রয়ে গেছে।

কিন্তু এখন সেই বেদনাকে ছাড়িয়ে গেছে অপরাধবোধ, আফজালের সামনে কী বোকামিটাই না সে করল! আর তার ওপরেই নুন ছেটাচ্ছে আফজাল, বড় সন্তর্পণে, কাজের মধ্যে নিমগ্ন থেকে, না হয় ছবিই জ্বলে গেছে, অসুবিধেটা কী ? আমরা তো বেঁচে আছি। কিন্তু শালার রিলটা বেরোচ্ছে না কেন ? কথাটা বলে মেঝেতে বসে থাকা অবস্থাতেই ক্যামেরাটা সে এমনভাবে আছড়ে দেয়, নিশি আজও বলতে পারে না তার জোর কতোটা ছিলো, কেননা, পরে ইলেক্ট্রনিক্সের দোকানে ক্যামেরা নেয়ার পর ক্যামেরা ফিল্ম দুই-ই বেঁচেছে, কিন্তু সেই আছাড় নিশির বুকের মধ্যে এমনভাবে চেপে বসল, আজ পর্যন্ত তার ভয়াবহতা থেকে সে বেরুতে পারে নি।

মমতাদি, আমি আসলে জানি না, দূরত্ব কিভাবে তৈরি হয়েছে, আদৌ দূরত্ব আছে কী-না, থাকলেও কিভাবে কমাতে হয়।

নিশি, তোমার ট্র্যাজেডি কি জানো, তুমি কাউকে ভালোবাসতে জানো না, মমতাদি বলেন, এ জন্যই জানো না কী করে সেটা অন্যের কাছ থেকে পাওয়া যায়। প্রগাঢ় প্রেম তোমার শ্বাস আটকে দেয়। এ জন্যই ধীরে ধীরে তোমার কাছে সহজলভ্য সেই প্রেমিক এক সময় পরিত্যক্ত হয়ে ওঠে। মানুষ প্রতিদিনের রোমাঞ্চে বাঁচতে পারে না, অথচ তোমার চাহিদা সেটাই। তুমি চাও প্রথম প্রেমের অনুভূতি দু'জনের মধ্যে সারাজীবন থাকুক। এ জন্যই না বাতাস, না মাটি, তুমি কোথাও নেই। কখনো তোমার প্রাণের চেয়েও বড় হয়ে ওঠে তোমার বিবেক-বোধ। আমার দুঃখ কোন্‌টা জানো, যে সাজিদুল আমার প্রবল মায়ার মধ্যে মিশে আছে, সেই বিবেকের কারণে তাকেও তুমি করুণা করতে তার কাছে যাও। নিশি, আমার কথায় মনে কষ্ট নিও না, তুমি আসলে বড় দুর্ভাগা।

নিশির কথা ফুরিয়ে যায়, সে কোনো তর্ক করে না, কিচ্ছু প্রতিবাদও করে না। শুধু বলে, মমতাদি, আমার ঠিক এই জায়গাটায় দাড়ি টানতে পারলে নিজের সম্পর্কে তাও একটা সিদ্ধান্তে আসা যেত। আমার সম্পর্কে আপনি যা বললেন তার সবটা সত্যি নয়। এর বাইরেও কিছু আছে, যার দ্বারা আমি তাড়িত, দগ্ধ, কিন্তু আমি নিজেও সেটা আবিষ্কার করতে পারছি না।

সেই উনিশটি দিন।

স্পার্ম্ পুশ করার পর কী সাবধানতা, কী ভয়! সামান্য বিচ্যুতির কারণে বড় কোনো ক্ষতি যদি হয়ে যায়! প্রথম সাতদিন তো রীতিমতো জন্ডিস রোগীর মতো। বিছানাতেই বেশিরভাগ সময় কাটাতে হয়েছে। হিরণও এমনভাবে সেবা করছিল, নিশি যেন প্রসূতি, কিচ্ছু না জিজ্ঞেস করেই গেলাস ভরে দুধ নিয়ে আসত। সে বেচারি অত কি আর বোঝে, ধরেই নিয়েছিল সন্তান আসছে, চোখ বড় করে বলেছিল, এতদিন পরে যদি মাইয়া অয়?

নিশি হেসেছিল, তাতে অসুবিধে কী?

অত কষ্টের ফসল, মাইয়া অইলে ভাইজান হেই মায়ার মুখ দেখব? নিশি হাসতে থাকলে হিরণ বলে, আমাগোর গেরাম অইলে বউরে ছাইড়া দিত।

চরম হতাশার মধ্যেও বুভুক্ষুর মতো ডালপালা মেলছিল স্বপ্ন, এ যেন নিজের সাথেই চরম জেদ। যেন নিজের হৃৎপিণ্ড টুকরো করে হলেও সে মাসেই গর্ভে একটি সন্তান সে তৈরি করবেই। মানসিকভাবে হাজার বিপরীত প্রস্তুতি থাকলেও সব ছাপিয়ে এমন মৃত্যুর মতো মাথা তুলছিল কাঙ্ক্ষা, মনে হচ্ছিল, এর ব্যতিক্রম কিছু হলে সে বাঁচার স্পৃহা হারিয়ে ফেলবে।

এ আরো চরম রূপ ধারণ করে।

নির্দিষ্ট দিনে পিরিয়ড না হয়ে আরো তিনদিন পর হওয়ায় নিশি রীতিমতো কাঁপছিল। উত্তেজনা-উৎকণ্ঠায় ক'রাত তার ঘুম হয় নি।

আফজালের মধ্যেও এই স্বপ্ন ত্বরান্বিত হয়েছিল, নিশি, সত্যিই যদি হয়? জানো, আমার আশা করতেও ভয় লাগছে।

পরদিন সকালে আফজাল অফিসে যাওয়ার পর সারা অস্তিত্ব প্লাবিত করে রক্ত রক্ত...।

নিশি আর সেই ক্লিনিকে যায় নি।

আমি ঢাকার বাইরে যাচ্ছি, মমতাদি বলেন, তার আগেই তোমাকে সেই গার্মেন্টস দোকানের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব। নিশি, কাজের মধ্যে ডুবে যাও। তোমাকে এত কথা বলছি অথচ আমি যে কিসের মধ্যে বেঁচে আছি এ তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। আমারও মুক্তির রাস্তা একটাই, কাজ। তুমি আরো সিরিয়াস হও।

মাথাটা এত ধরে থাকে, সব ঝাপসা লাগে। নিশি বলে, চোখেও বড্ড ব্যথা করে, ডাক্তার দেখাব ভরসা পাই না, কী সব টেস্ট করবে, তারপর চশমা। এ জন্যই একটু গ্যাপ দিয়ে দিয়ে সেলাই করছি। আফজাল তো দিনে থাকে না, আমি সময় করে দু' একদিনের মধ্যেই আপনাকে ফোন করবো, কাজটা যে সত্যিই লাভজনক, অসম্মানের নয়, সে আমি তার কাছে এক সময় প্রমাণ করবই।

তার কাছে প্রমাণ করার জেদ থেকে তুমি কাজ করবে কেন? মমতাদি হাসেন, আমাদের, বাঙালি মেয়েদের এই এক সমস্যা। বিয়ের পরেই আমরা নিজেদের স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলি। হয় আপোস করে স্বামীর সংসারে নিজের সবটাই বিকিয়ে দিই, নয়তো জেদ করে স্বাবলম্বী হয়ে একটা কিছু করে স্বামীর কাছে নিজেকে জাহির করতে চাই। আমি বলতে চাইছি, স্বাধীন পরাধীন সব নারীরই প্রধান অবসেশন তার স্বামী। সে সুস্থ সুন্দরভাবে নিজের জন্য কিছু করতে চায় না। এ কাজ করে তোমার যদি উন্নতি হয়, সেই সাফল্যের

আনন্দ তোমার স্বামীও ভোগ করবে ; কিন্তু যখন তুমি কাজটা করছ, তখন তার মধ্যে কেবল তুমিই থাকবে। জেদ আর ঔদ্ধত্য দিয়ে তুমি কাজের নির্মল আনন্দ কিংবা সত্যিকার সম্মানটাকে নষ্ট করো না। সে যদি মনে করে এ কাজ অসম্মানজক, তাহলেও তুমি সংসারের কেওয়াস এড়াতে সব ছেড়েছুড়ে হাত গুটিয়ে বসে থেকো না। এখানে পুরো কাজটা তোমাকেই করতে হবে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে।

হ্যাঁ, এইভাবে আমাকে বলবেন! নিশি উদ্দীপিত কণ্ঠে বলে, আমি একটা ভীত ঘৃণ্য কীট, আমাকে এইভাবে সাহস দেবেন। দরকার হলে এমন আঘাত দেবেন, যাতে আমার নেতিয়ে আসা মেরুদণ্ডে সত্যি সত্যি আঘাতটা লাগে। আমি সব খুইয়ে বসে আছি। মমতাদি, আপনি ঠিকই বলেছেন, আমি বড় দুর্ভাগা। আমাকেই সবার করুণা করা উচিত।

স্বাতী আবার বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।

নিশির দেহ হিমবরফে ডুবিয়ে এইবার সে গিয়ে উঠেছে এক অত্যাধুনিক ফ্ল্যাটে। সেই বস, যে চাকরি ছেড়ে কীসব আসমান-জমিন ব্যবসা করছে, সেখানে ও তার তত্ত্বাবধানেই আছে। খবরটা আফজালের মুখে শুনে নিশি চুপ মেরে যায়।

এ অবিশ্বাস্য! সে অস্ফুটে উচ্চারণ করে।

তোমরা মেয়েরা, কী এক যন্ত্রণায় আফজালের কণ্ঠও জড়িয়ে আসে, কিছু মনে করো না, আমাকে এভাবেই বলতে হচ্ছে, যেখানে টাকা, সেখানেই পা-চাটা কুত্তার মতো অশ্লীল।

আফজালের উচ্চারিত কাটা-কাটা শব্দগুলো নিশির সর্বঅস্তিত্বে বিষাক্ত হুল ফুটিয়ে দেয়। শুধু আফজালের এই উচ্চারণের কারণে প্রচণ্ড জেদে নিশি স্বাতীর সাহসকে স্বাগত জানায়। সে টের পায়, আফজালের এই উচ্চারণ উঠে এসেছে সেখান থেকে, যেখানে সে নিজেকে মনে করে হীন, বিপন্ন। ব্যাপারটা নিয়ে আর কোনো তর্ক না করে নিশি পাশ ফিরে শোয়।

অন্ধকারে জ্বলজ্বল জেগে থাকে চোখ।

মমতাদির ফোন কি নষ্ট ?

নিশি প্রায় এক ঘন্টা চেষ্টা করার পর শাড়ি পাল্টায়। কাল সকালেই কিছু পোশাক তার সাপ্লাই দেয়ার কথা, অথচ আজ মমতাদি কিছু বোতাম কিনে নিশির সঙ্গে যোগাযোগ করবেন বলেছিলেন। এগুলো রাত্তিরে লাগাতে পারলেই নিশ্চিন্ত। অথচ সারাদিন পেরিয়ে যাচ্ছে মহিলা লাপাত্তা!

সে আফজালকে ফোন করে, তুমি কি শিগ্‌গিরই আসছ ?

কেন ?

না হলে আমি একটু মার্কেটে যেতাম।

তুমি ব্যবসায়ী মানুষ, মার্কেটে যাবে, আমার আসার সাথে তোমার সম্পর্ক কী ?

দেখ আফজাল, সহজ করে কথা বলো। তুমি সিরিয়াসলি না চাইলে এর কিছুই আমি করব না।

এটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না?

নিশি এরপর আর কিছু বলে না।

আফজাল বলে, আমি অফিস থেকে রেজার ওখানে যাব, তুমি তোমার মতো কাজ করে যাও।

কিন্তু আমাদের যে কথা ছিলো রাতে বাইরে খাব!

ও, তোমার সেই ব্যবসার টাকায়? কথাটা শেষ করেই আফজাল হেসে ফেলে, খোঁচা দিচ্ছি না, মজা করলাম। তা আজই খেতে চাও?

তুমি তাড়াতাড়ি এলে আজই।

শোনো নিশি, আফজাল কণ্ঠ নামিয়ে প্রায় ফিসফিসিয়ে বলে, এ্যাদ্দিন দৌড়ঝাঁপ করলাম না, খবর আছে, তুমি শুধু মানসিক প্রস্তুতি রেখো, আমরা বড়লোক হয়ে যাচ্ছি।

এই এক স্বভাব আফজালের, কিছু ঘটলে স্থান-কাল চিন্তা করে না। কথাটা কি অফিস থেকে ফোনে বলার মতো? এ ধরনের আবেগিক কাণ্ড কমই ঘটেছে নিশির সংসারে, যদি ঘটত নিশির জীবনটা অন্যরকম হতো। আফজালের এই স্বভাবটা ভালো লাগে নিশির। একবার অফিসের কে প্রস্তাব দিল, ভালো একটা সুযোগ আসছে, একদম সস্তায় সস্ত্রীক বিদেশ ভ্রমণ, গেলে কি কেউ ফিরে আসে?

সেই কথাটাও সঙ্গে সঙ্গেই ফোনে, যদি হয়, বিদেশে গিয়ে থাকতে পারবে?

তারপর সেও যখন দেখেছে জীবন একঘেয়ে, একরকম বেতন, জোড়াতালি, কোনো ছন্দ নেই, নিজেকে সামলে নিয়েছে। আজ বহুদিন পর, এও কি তেমন কোনো উড়ন্ত স্বপ্ন থেকে উচ্চারিত? রেজার সাথে ঘুরে সে কী একটা নিশ্চিত স্বপ্নের সন্ধান পেয়েছে? জীবন কি এতই সহজ? রেজার নিজেরই কি শক্ত কোনো ভিত আছে? কী জানি! মাঝে বাবার বাসায় গিয়েছে। ওখানে গিয়ে আর বসা যায় না।

রিনি মৃতপায় হয়ে এসে উঠেছে বাসায়। ক'দিন হানিমুন করতে গিয়ে ছোকরা স্বামীর টাকা, নিজের ঘড়ি, চেইন সব খুইয়ে প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে এসে উঠেছে বাবার এখানেই। এই প্রচণ্ড জ্বরের মধ্যেও বাবা তাকে কী কাপড় কাচাই না কাচলেন।

মা দরজা বন্ধ করে খাওয়া-বিশ্রাম বাদ দিয়ে তার সেবা করছেন।

এদিকে ছোকরা স্বামীর জন্য এ বাড়ির দরজা বন্ধ। সন্তানহারা কাকের মতো সেই ছেলে এ বাড়ির চারপাশে হোন্ডা দিয়ে বোঁ-বোঁ চক্কর খায়, সারা পাড়া ফাটিয়ে চিৎকার করে ডাকে, রিনি... রিনি...।

রিনি সেই ডাকে যেন মৃত্যুর ভেতর থেকে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে, ভয়ার্ত শরীরে কাঁপতে কাঁপতে মাকে বলে, শুধু একবার দেখব ওকে, একবার।

মা বলেন, এতই পাগল যদি তোর জন্য, ও কেন ওর মা-বাবাকে বোঝাতে পারছে না?

ওরা মস্ত ধনী, ধনীদের তুমি চেন না মা, ও ওর মা-বাবাকে ঘৃণা করে।

ব্যাপারগুলো যখন এমনই ফিল্মি পর্যায়ে, তখন নিশি সেখানে ভাবলেশহীন বসে থাকা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না।

বাবা বলেন, মা, তুই মাঝে মাঝে আসিস, এ বাড়িতে এখন আমার শ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

রাস্তায় জ্যাম।

শীতের মরতে থাকা দুপুর দেখলে মনে হয়, বিকেল নয়, রাত এগিয়ে আসছে। রিকশার হুড ফেলা আকাশে কোত্থেকে যে উড়ছে ঘুড়ি। দুটো ঘুড়িই ফর ফর করে একটি আরেকটিকে কাটবার চেষ্টা করছে। ছেলেবেলাকার কথা মনে হয়। ভাইজান কাচের গুঁড়োর সাথে কী কী যেন মিশিয়ে সুতোয় মাঞ্জা দিত। তাকে সবচেয়ে অবাক করত যা, পয়সা দিয়ে কেনা এই জিনিসটারই সত্যিকার মালিক কেউ হয় না। ভোঁকাট্টা হয়ে যাওয়া ঘুড়ি যখন যে বাড়িতে গিয়ে পড়ে, যে সেটা ধরতে পারে, সে-ই তার মালিক।

এই ছিঁড়ে আসা ঘুড়িই ছিল জীবনের চেয়েও মূল্যবান কিছু। একবার একটা নারকেল গাছের মাথায় এসে পড়েছিল, সশব্দে ছুটে আসছিল অন্য ছেলেরা, ভাইজান তড়িঘড়ি উঠতে গিয়ে এমন আছাড় খেয়ে নিচে পড়েছিল!

চারপাশে ধুলো, গ্যাঞ্জাম, এর মধ্যেও ছায়া-আলোর আশ্চর্য বর্ণ বিকিরণ। রিনির ব্যাপারটার সময় আফজালের সাথে কথা হয়েছে ভাইজানের। ব্যাপারটা যে কী স্বস্তি দিয়েছে নিশিকে! নিশি উন্মুখ হয়ে তাকিয়েছে আফজালের দিকে, খুলনায় যাবে? এই শীতে?

অস্বস্তি নিয়ে উত্তর দিয়েছে আফজাল, বেশি কাছে গেলে আবার যদি লাগে?

মমতাদির দরজায় টোকা দিলে সাজিদুল খুলে দেয়। নিশি এতে এত অপ্রস্তুত হয়, কী বলবে গুছিয়ে উঠতে পারে না। সাজিদুল যেখানে কাজ নিয়েছে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সেখানে কাজ করতে হয়, এ সময় তার বাসায় থাকার কথা না।

সাজিদুল বলে, মমতাদি পাবনা গেছেন।

কী আশ্চর্য! তাঁর তো আরো একদিন পরে যাওয়ার কথা ছিল।

রাতে কী সব স্বপ্ন দেখে ভোরের বাসেই চড়েছেন।

নিশি এরপর কথা খুঁজে পায় না।

তুমি কি বাইরে দাঁড়িয়েই কথা বলবে? সাজিদুলের প্রশ্নে বিহ্বলতা ভাঙে। সোফায় বসে অসংলগ্ন বলতে থাকে, কী রকম মুশকিলে পড়লাম! আমার ভীষণ অসুবিধে হয়ে গেলো, আচ্ছা, তাঁর এই ছেলেটা কখনো ভালো হবে না? সারাজীবন পাগলাগারদেই থাকবে? তারপরই হুঁশ হয়, কথার ধরনটা ঠিক হচ্ছে না। বলে, মানে আমি জানতে চাইছি, ডাক্তার এ ব্যাপারে কী বলেছেন?

সাজিদুল বলে, তুমি কি চা খাবে?

আমি কি জানতে চাইছি, তুমি শোন নি?

যে বিষয় নিয়ে মমতাদি কথা বলতে বিব্রত বোধ করেন, সে ব্যাপারে আমি তাকে কোনো প্রশ্ন করি না। তুমি তো জানো, ওকে নিয়ে মমতাদি কারো সাথে কিচ্ছু বলতে চান না। এখন বলো, কেমন আছ তুমি? শুনেছি পরীক্ষা ভালো হয়েছে?

এসব কথা নিশির কানে যায় না। 'বড়লোক হয়ে যাচ্ছি' অকস্মাৎ আফজালের উচ্চারিত এই ক'টি শব্দ তার ইন্দ্রিয় স্তব্ধ করে দেয়। যেন আফজাল কোনো সুসংবাদ দেয় নি, বিকট এক পৃথিবীর সামনে মুহূর্তে তাকে দাঁড় করাতে চাইছে। সে কি স্বাতীর এই কাজে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে? নিশিকেও সেই মানদণ্ডে মেপে... ? কিন্তু হুট করে অর্থের মালিক হওয়া সম্ভব? ওর উচ্ছ্বাসে তো কোনো কৃত্রিমতা ছিল না। না, এই সহজ জীবনই ভালো, আফজালের কাছ থেকে সে আর্থিক-জীবন পরিবর্তনের কোনো খবরই শুনতে চায় না। তাহলে তার সঙ্গে বাস করা নিশির পক্ষে দুঃসহ হয়ে উঠবে, সে নিশির হাসি-আনন্দের সবটাই মাপতে থাকবে অর্থ-কড়ির দাড়িপাল্লা দিয়ে।

তুমি দরজা বন্ধ করছো কেন? নিশি যেন গহ্বর থেকে উঠে আসে।

সাজিদুল বলে, ভদ্রলোকেরা দরজা হাট করে খোলা রেখে কথা বলে না।

নিশি আবারো অস্বস্তির মধ্যে পড়ে, তুমি আজ অফিসে যাও নি?

আমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছি!

সে-কী! কবে?

সাজিদুল তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে থাকে নিশির দিকে। না, নিশি এই চোখ চেনে না। মানুষ নিজের পরিচিত ইন্দ্রিয়তেই প্রতিদিন স্থাপন করতে পারে নতুন ছায়া, নতুন রঙ, সাজিদুল কখনো এইভাবে তাকাতে জানত না, চিরকাল তার দৃষ্টি ছিল নমনীয়, নিবেদিত।

নিশি ঘরের বন্ধ হাওয়া হালকা করতে চায়, এই চাকরিটাও ছেড়েছ? চিরকাল তোমার এইভাবে যাবে?

সাজিদুলের দৃষ্টি ক্রমশ তীক্ষ্ণ হচ্ছে। এমন আজব হয়ে উঠছে চেহারা, বিব্রত নিশি সশব্দে উঠে দাঁড়ায়, তোমাকে সুস্থ মনে হচ্ছে না। আজ আমি যাচ্ছি।

সাজিদুল নিশিকে এক ধাক্কায় ড্রয়িং রুমের ছোট্ট খাটটার ওপর ফেলে দেয়। তারপর ওর শরীরের ওপর নিজের শরীর কঠিন চাপে ঠেসে দু'হাত দিয়ে নিশির চুল খামচে ধরে।

নিশি ঘটনার আকস্মিকতায় এমনই বিমূঢ় হয়ে যায়, কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারে না। তারপরই ভেতর থেকে চাগিয়ে ওঠে পুরনো ক্রোধ, তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে কণ্ঠ, সাজিদুল, ভালো হচ্ছে না, তুমি আমাকে অপমান করছ।

নিশির শুকনো ঠোঁটে চুম্বন করে সাজিদুল ফিসফিস ক্রোধে বলে, আমার এই চেহারাটাই তোমার দেখা হয় নি, বড় আফসোস হতো, একজন মানুষের অসম্পূর্ণ রূপ তুমি দেখলে। শোনো, আমি অন্যায় কিছু করছি না। তুমি নিজেকে প্রশ্ন করে দেখ, এই তুমি চাও। এই যে দেখতে পাচ্ছি তোমার সব তৃষ্ণার্ত, এই যে, বলে বুকের আঁচল খামচে ধরে, সব চাইছে কেউ তোমাকে জড়িয়ে ধরুক, জোর করে, কেননা দাম্পত্য জীবনে তুমি সুখী নও অথবা অরুচি এসে গেছে তাতে। আত্মার কাছে প্রশ্ন করো, এই তুমি চাও, যাতে তোমার গ্লানি না হয়, তুমি নিজের থেকে এ চাইলে, করলে কত না মনোযন্ত্রণা হতো, আমি তোমাকে ঠিক চিনেছি, না?

ওর তপ্ত নিঃশ্বাসে নিশির মুখ ভিজে উঠেছে। সে ঠাণ্ডা চোখে তাকায়, তুমি এখন কী করতে চাও?

তোমার অতৃপ্তি, তোমার তৃষ্ণা ঘোচাতে চাই, বলতে বলতে সাজ্জিদুল এত কষে নিশির চুলের গোড়া ঠেসে ধরে যে, সে প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে। সাজ্জিদুল হিসহিসে কণ্ঠে বলে, আর তা ঘোচাবো মর্মান্তিকভাবে, তুমি জানোই না, জেলে বসে প্রতিটি প্রহর আমি অপেক্ষা করেছি এই ক্ষণটার জন্য। নিশি কম্পিত, ক্ষিপ্ত বসে আছে সোফায়। সাজ্জিদুল তাকে ছেড়ে দিয়ে টুল টেনে মুখোমুখি বসেছে।

এসবই তোমার ভান! নিশি জড়ানো কণ্ঠে উচ্চারণ করে, সমপরিমাণ প্রতিদান না পেলেই প্রেম পরিণত হয় কুৎসিত প্রতিরোধে, অথচ তোমার বিষয়টা চিরকাল আমার কাছে অন্যরকম ছিল।

এ জন্যই বুঝি কিছুদিন পরই, আমার স্পর্শের-গন্ধের দাগ মুছে যাওয়ার আগেই ফের বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলে ? সাজ্জিদুল চিবিয়ে উচ্চারণ করে। সাবধান একচুল নড়বে না, এই জন্যই বুঝি নতুন রোমাঞ্চে ডুব দিয়ে নিজের সবকিছু ধুয়ে-মুছে ফেলতে চেয়েছিলে ?

ফের বলছো কেন ? নিশি উদ্যত মাথা তোলে, আমি দ্বিতীয় বিয়ে করি নি, তোমার সাথে আমার সেই অনুষ্ঠান কি বিয়ে ছিল ? যদি আমাদের দু'জনের সম্পর্ককে বিয়ে নামের প্রথায় রূপ দিতে চাও তবে সেখানে কাজি ছিলো কই ? সাক্ষী ছিল কই ? তুমি কেন মনে করছ না একটা সম্পর্ক বিয়ের চাইতেও বড় কিছু হতে পারে। বিয়ের মতন কিছু একটা করে সেই সম্পর্ককে একটি ছকে ফেলতে চাওয়ার অর্থ নিজেদের প্রতি বিশ্বাসহীনতা, বিয়ে করলে ইচ্ছে-স্বাধীন সেই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে যাওয়া যায় না, এ নিজের ওপর চাপিয়ে দেয়া একটা দায়, যা দিয়ে অন্যকে দায়ী করা যায়, চার্জ করা যায়। আমি বলছি না আমাদের সেই সম্পর্ক বিয়ের চেয়ে বড় ছিল। কিন্তু তুমি তা মনে করতে, অথচ আর সবার মতো আমাকে আসামী করার জন্য তুমি একটা সুন্দর আয়োজনকে বিয়ের রূপ দিতে চাইছো।

এত কথা জানো তুমি নিশি, ফাঁপা রাজনীতিকের মতো, অথচ সেই বিয়েই তুমি করেছ। বিয়েকে মনে করেছ প্রথা, বৃত্তে বন্দিত্ব, অথচ সেটা করার জন্যই তুমি আমার অনুপস্থিতির পর ক্ষেপে উঠেছিলে ?

এবং সেই বৃত্ত থেকে আর বেরোতে পারছি না, নিশি বলে, অথচ তুমিও কিন্তু সেই বিয়েই করতে চেয়েছিলে, চেয়েছিলে সেই ফুল, সেই শয্যা। তুমিও আসলে তখন তাকে বিয়ে মনে কর নি, অথচ সেদিন বলছিলে, এই আমরা বিয়ে করলাম। জেলে যাওয়ার কিছুদিন আগেও, যখন পর্যন্ত ওই জঘন্য কাণ্ডটা তুমি কর নি, বলেছিলে, আগামী শীতে আমরা বিয়ে করব। অথচ আজ, সেই ঘটনাটাকেই বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে আমাকে অধিকার করতে চাইছ ? সাজ্জিদুল, আমি যার সাথে সম্পর্ক করেছিলাম, তার মধ্যে নিজের অস্তিত্ব বিলিয়ে দিয়েছিলাম, সে চোর ছিল না, নিশি সবেগে দাঁড়ায়, আমি এখন যাব, বাইরে রাত হয়ে আসছে।

নিশিকে সোফায় চেপে বসায় সাজ্জিদুল, বৃত্ত ভাঙার কথা বলছিলে না ? চিরকালই তুমি এই, আমার বুঝতে অনেক সময় লেগেছে, মনের বিরুদ্ধে এক জায়গায় এমনভাবে বাস করো যেন সেখানে সবটা মন উপুড় করে ঢেলে বসে আছ। আজ রাতটা আমার কাছে থাকো। দেখো, বৃত্ত ভাঙা যায় কি-না! নিজে কষ্ট করে পারছিলে না, আমি তোমাকে সাহায্য করলাম! চোর! সেও অনেক ভালো অনেক স্পষ্ট সে, তার মধ্যে তোমার মতো ভণ্ডামি নেই।

এ কণ্ঠস্বর কি সাজিদুলের ? যে জীবনের সবকিছু বুঝত সরলভাবে, সে আজ নিশিকে এইভাবে বিশ্লেষণ করছে ? আসলে হয়তো যে যত বেশি বদ্ধতায় থাকে, তার মগজের কোষগুলো তত বেশি জটিল হয়ে উঠতে থাকে। নিশির সামনে থেকে যে নিশিকে তার দেখা হয়ে ওঠে নি, সেই অপরিসীম অন্ধকার খাঁচায় বসে সে নিরন্তর তাকেই বিশ্লেষণ করেছে। তাতে করে হয়তো নিশির প্রতি তার সরল অনুভূতিগুলো ক্রমশ নষ্ট হয়ে গেছে। নিশির ভেতর থেকে কান্না ঠেলে ওঠে। তারপরও তীব্র এক ক্রুদ্ধতা থেকে চাপা কণ্ঠে উচ্চারণ করে, তুমি বলছিলে আমি দেহের তৃষ্ণায় ভুগি, গ্লানি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমি তোমার বলপূর্বক সান্নিধ্য চাই। সাজিদুল, নিজেকে অনির্বচনীয় ভাবার মধ্যে একটা সুখ আছে, কিন্তু তারও একটা সীমা থাকলে ভালো হয়। যে তুমি আমার মধ্য থেকে মরে গেছো, যে তুমি জেলে যাওয়ার পরপরই আমি অন্য একজনকে জীবনসঙ্গী করে নিয়েছি, তুমি মনে করছ তোমাকে কেন্দ্র করে তারপরও আমার দেহে টাটকা রোমাঞ্চগুলো জীবিত রয়েছে ? আজ সত্যি স্বীকার করছি, তোমাকে কেন্দ্র করে আমার মধ্যে অপরিসীম এক স্নেহ ছিলো। এরপরও তখন শরীরের সুখ পেতাম সে কেবল ওই সম্পর্কটা নিষিদ্ধ ছিল বলেই। তোমাকে বিয়ে করলে আমার সেই অনুভূতি মরতে বেশিদিন সময় লাগত না। আমার স্বামীকে কেন্দ্র করে আমার অতৃপ্তি আমি তোমার কাছে মেটাতে আসব ? এই ভঙ্গুর ক্ষয়িষ্ণু সাজিদুলকে শুধু মায়া করা যায়, যত রূঢ়ই শোনাক, এটাই সত্যি, তাও হয়তো আমি বলতাম না কিন্তু আজ তোমার আচরণ ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে বলেই বলছি।

সাজিদুল কষে একটা চড় বসায় নিশির গালে।

নিশি হতভম্ব হয়ে যায়।

আমাকে করুণা করতে আস ? তুমি জানো না আজ তোমার জন্য কী অপেক্ষা করছে! সাজিদুলের চোখ খুনির চোখের মতো হয়ে ওঠে, তুমি জানো আজ তোমার কবর তুমি নিজ হাতে খুঁড়ছ। যে নরম, যে নিবেদিত তাকে তুমি মায়া করো, যাকে মনে কর তোমার চেয়ে শক্তিশালী, তাকে করো ভয়। নিশি, আবার তুমি কাকে করুণা করবে, যে তুমিই রাস্তার ভিখিরির চেয়েও দরিদ্র ? তুমি ভালোবাসো কাকে নিশি ? না না চোখ গরম করো না, এ আমি অনেক দেখেছি। নতুন কিছু করো, দেখে একটু চোখ দুটো জুড়াই। তোমার দুর্ভাগ্য কি জানো নিশি, আজ আমি তোমাকে করুণা করছি কিন্তু তারপরও আমি তোমাকে মুক্তি দিতে পারছি না। যাকে তুমি এ্যাদ্দিন মায়া করে এসেছ, তার শক্তির চিহ্ন আমি তোমার শরীরের পরতে পরতে রাখতে চাই।

নিশি ছটফট করে ওঠে, তখন আমার ভেতর যাই ছিল সাজিদুল, আমি বিয়ে করতে চাই নি। সে সময় আমার জীবন নিয়ে খেলার কোনো অধিকারই তোমার ছিল না। আমি তো তোমার সাথে সংসার করারই প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম তখন তুমি ওকরম একটা কাণ্ড না করলে, থাক এখন আমি কিছু শুনতে চাই না, আমাকে যেতে দাও, বিশ্বাস কর, আমার ভীষণ ক্ষতি হয়ে যাবে।

সাজিদুলের চোখ রক্তাভ, সে ড্রয়ার খোলে। তারপর ক্ষিপ্র হাতে তুলে আনে কী যেন। নিশির চোখের সামনে সেটা মেলে ধরে বলে, এটা কি চিনতে পারছ ?

সেফ্‌টিপিন।

অত স্পষ্ট করে এর নাম উচ্চারণ করো না, ধীরে ধীরে বুঝতে চেষ্টা কর এটা কী?

তুমি আমাকে নিয়ে মজা করছ? সাজিদুল, এর পরিণতি খুব খারাপ হবে। আফজাল বাসায় আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

এই যে সেফ্‌টিপিন দেখছ, আমি এর ডগায় মিশিয়ে দিয়েছি এমন এক বিষ, কেমন হিংস্র, ঘর্মাক্ত হয়ে ওঠে সাজিদুলের চেহারা, এ দিয়ে আমি একটু একটু করে তোমার মাংস ফুটো করব। নিশি দাঁড়াতে চায়, মুহূর্তে সাজিদুল তাকে এমন জোরে ধাক্কা দেয়, টাল সামলেও সে মেঝেতে আছড়ে পড়ে।

তুমি সোফায় গিয়ে বসো, সাজিদুলের কণ্ঠ সংহত, ঠাণ্ডা, আমার কাছে ছুরি আছে, তুমি বাধ্য করো না, আমি তোমাকে হত্যা করি।

ওর মুখ, প্রতি মুহূর্তের পাল্টে যাওয়া কণ্ঠ থেকে এবার নিশি সত্যিকার ভয়টা পায়। সে ধীর পায়ে সোফায় গিয়ে বসে, সাজিদুল, তুমি আমাকে ভালোবাসতে, তুমি কখ্‌খনো এমন নও।

তুমি তোমার সমস্ত পোশাক খোল।

আমি বিবাহিতা, তুমি অন্তত এইটুকুর মর্যাদা দাও, ভীত-সন্ত্রস্ত নিশি খেই হারাতে থাকে। এখন তুমি এটা পার না, তাছাড়া একজনের ইচ্ছের বিরুদ্ধে—।

তুমি আমার সামনে নগ্ন হও।

আমি চিৎকার করব।

তুমি তা কখনোই করবে না। তুমি চাইবে না লোক জড়ো হোক।

তুমি কী করতে চাইছো?

আমি তোমার সবকিছু স্পর্শ করতে চাই। যে আমি তোমার ঠোঁট খুললেই বুঝতাম তুমি এখন কোন্ প্রসঙ্গে কথা বলবে, আমি যাকে তন্ন তন্ন করে চিনতাম আজ তার কণ্ঠে অন্য সুর। তোমার ভেতর আমি সেই তাকে খুঁজব আজ। আমি যেসব স্মৃতি ভুলে গেছি, সব, সব আবার স্মরণ করতে চাই। নিশি, তুমি আর একটি কথাও যদি খরচ কর, আমি তোমাকে শ্বাসরুদ্ধ করে মারব, তোমার সেই বিস্ফারিত চোখ দেখার জন্য আমার রক্তের মধ্যে যে কী হচ্ছে!

নিশির বাক স্তব্ধ হয়ে আসে, সে শাদা চোখে তাকায় দেয়ালের দিকে, একটি ছবি, সুসজ্জিতা রাজকুমারীর হাতে অসংখ্য মণিমুক্তো, তার ওপর দণ্ডায়মান ঘোড়াকে রাজকুমারী ফুঁ দিচ্ছে। উড়ে যাচ্ছে ঘোড়া, দূরের গোলাপি পাহাড়ের দিকে...। নিশির লাশ পড়ে থাকবে এ ঘরে, পত্রিকায় ছাপা হবে প্রাক্তন প্রেমিকের সাথে ডেটিং করতে গিয়ে, না না, এই ঘর থেকে বেরোনোর পর রাস্তায় আমার মৃত্যু হোক, আমি ট্রাক চাপা পড়ি, তবুও এই অবস্থা থেকে যেভাবে হোক, নিশির ভেতর থেকে ঠেসে কান্না ওঠে, আমাকে বেরোতেই হবে, হায় আল্লাহ! রাত হয়ে আসছে। আমাদের আজ বাইরে খাওয়ার কথা। সে কম্পিত হাতে পোশাকগুলো খুলতে থাকে, আমি তোমার কাছে ভিক্ষে চাই সাজিদুল। আমাকে দয়া কর।

এই শরীর তো আমি ছুঁয়েছি হাজারবার, সাজিদুল বলে, তোমার স্বামীর স্পর্শে নিশ্চয়ই সবকিছু শুদ্ধ হয়ে ওঠে নি? অথচ এমন ভাব করছ যেন তোমার সতীত্ব নষ্ট করছে কেউ!

তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে সাজিদুল, তুমি পাগল হয়ে গেছ, এই যে আমি সব খুলে ফেলছি, তোমার যা ইচ্ছে কর, তারপর আমাকে ছেড়ে দাও—।

নিশি উন্মাদের মতো পাক খেতে খেতে খুলতে থাকে পোশাক, শেষ বস্ত্রখণ্ডটি খসে পড়া পর্যন্ত সে বিকারগ্রস্তের মতো চ্যাঁচাতে থাকে, এই যে খুলেছি, তোমার যা ইচ্ছে এখন কর।

সাজিদুল পুনরায় নিশির চুলের গোড়া ঠেসে সোফায় বসায়, শান্ত হয়ে বসো, একদম শান্ত হয়ে, একদম শব্দ করবে না।

কণ্ঠ শুকিয়ে কাঠ।

নিশির বস্ত্রহীন দেহে তখন রাক্ষসের মতো নিরন্তর কামড় বসিয়ে চলেছে শীত। মৃত্যুভয় তাকে স্থির রাখে। সে নগ্ন, কম্পিত, হাস্যকর এক ভঙ্গিতে জবুথবু বসে থাকে সোফায়। এই মানুষকে সে চেনে না, আজ সে পড়েছে এক ভয়াল হিংস্র খুনির খপ্পরে। তার ভেতরটা ভেঙে গুঁড়িয়ে ছত্রখান হয়ে যাচ্ছিল। নিজেকে ঘৃণায় ধিক্কারে থুথু দিতে ইচ্ছে করছিল। এইরকম একজন মানুষের সাথে একদা সে জীবনের সব সম্পর্ক গড়েছিল। মাথার মধ্যে বোঁ-বোঁ উড়তে থাকে ধোঁয়া। অনেক রাত হয়েছে। সামনে বসে কী সব বকে যাচ্ছে সাজিদুল, সে নড়লেই, বেদনা প্রকাশ করলেই অশ্লীলভাবে লাফিয়ে উঠছে। সেই ধোঁয়ার মধ্যে উড়ন্ত আফজালের মুখ, তার তুলোর মতো ফাঁপা উচ্চারণ, বড়লোক হয়ে যাচ্ছি...। আজ আমার সব শেষ হয়ে গেল এবং এই বোধ থেকেই সে সটান দাঁড়ায়, না আমি দরজার দিকে যাচ্ছি না। একটু বাথরুমে, বলে চিৎকার করে বসে পড়ে। সমস্ত গিঁটে এত ব্যথা, দাঁড়াতেই যেন সাপে ছোবল দিয়েছে। সাজিদুল তাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে বাথরুমের সামনে ছেড়ে দেয়, সাবধান! দরজা বন্ধ করবে না, আমার সামনেই...।

নিশি অবসন্ন চোখ তুলে সাজিদুলের দিকে তাকায়, তার শুকনো ঠোঁট স্ফুরিত হয় অদ্ভুত হাসিতে।

এইবার সাজিদুল যেন ভয় পায়, হাসছ যে?

নিশি এই শিথিলতার সুযোগে ওর মুখের ওপর দড়াম করে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দেয়।

তারপর রেজর থেকে ব্লেড খুলে উন্মত্তের মতো কাটতে থাকে নিজের হাত, স্তন, উরু। দরজায় অবিশ্রান্ত ধাক্কা দিচ্ছে সাজিদুল, নিশি... নিশি...।

নিশি দরজা খুলতেই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে রক্তাক্ত, যেন পাইন গাছের মতো বিশাল এক নারীদেহ।

নিশি, নিশি এ তুমি কী করলে? যেন এতক্ষণ স্মৃতিভ্রষ্ট ছিল সাজিদুল। সে ওর টলমান শরীর আঁকড়ে ধরে। নিশি বরফ-ভাঙা কণ্ঠে কঁকিয়ে ওঠে, এই যে, হ্যাঁ, তুমি যেসব জায়গা স্পর্শ করেছিলে, যেখানে প্রবেশ করেছিল তোমার অশুভ, ঘৃণ্য, নর্দমার পোকার মতন শরীর, সব আমি কাটছি— বলতে বলতে নিশি যেন নিজের দেহে নয়, বরফে ব্লেড চালায়।

প্রচণ্ড শীতে এমনিতেই শরীরে জমাট বেঁধে ছিল রক্ত, নিশির আঁচড়ে সেসব চাপ চাপ ভেসে ওঠে, আছড়ে পড়ে না। সাজিদুল কঠিন হাতে ব্লেড ছিনিয়ে নেয়। তারপর দ্রুত ড্রয়ার

খুলে বের করে মলম, তুলো, নিশি আমাকে ক্ষমা কর। আমি ঘৃণ্য, জঘন্য। আমি মানুষ না।

সাবধান, আমাকে ছোঁবে না। হিস্টিরিয়া রোগীর মতো কাঁপতে কাঁপতে নিশি মেঝেতে আছড়ে পড়ে। ওই পাপ-ক্লিন্ন হাত, যা আমাকে একদিন ছুঁয়েছিল, সেই হাত দিয়ে আমাকে আর একবার ছুঁয়েছ কি তোমার জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব। তারপর কাশির বেগ ওঠে, নিশি হাঁপাতে থাকে, আমার জীবন নষ্ট করতে চেয়েছিলে ? হ্যাঁ, আমি বাজারের বেশ্যা হবো, তবুও তোমার মতো অসভ্য কুত্তাকে আমি আমার এই দেহ শুঁকতে পর্যন্ত দেব না।

নিশি, নিশি, ক্ষমা কর, আমি জানি না কেন আমার এমন হয়েছিল। লক্ষ্মী সোনা, এ কী করেছ, তোমার... ?

থু।

নিশি সাজিদুলের মুখে দলা দলা থুথু ছুঁড়ে দেয়। হে আল্লাহ, এর মতন একজন মানুষের সাথে সম্পর্ক করে আমি পাপ করেছিলাম। এ-সবই আমার প্রায়শ্চিত্ত। আমাকে মৃত্যু দাও।

সাজিদুল সেই থুথুর বর্ষণ উপেক্ষা করে নিশির সারাদেহে ঔষধ লাগিয়ে যেতে থাকে। আর নিশি— আমাকে ছোঁবে না... ছোঁবে না... বলতে বলতে কার্পেটের ওপর ঢলে পড়ে।

দীর্ঘদিন পর মাকে চিঠি পোস্ট করে জাহিদ গিজগিজে ফুটপাত ধরে হাঁটে। দেখে ফেরিঅলা, ভিখিরি মানুষের বেঁচে থাকার নানান ধান্দা।

হাঁটতে হাঁটতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে।

একটি লাশ, চারপাশে আগরবাতি, গলা অব্দি শাদা কাপড়ে ঢাকা, নাকে তুলো গোঁজা— চারপাশে টাকা-পয়সা ছিন্নবিচ্ছিন্ন ছড়িয়ে পড়ছে। পাশে বসে আছে এক বিষাদময় বৃদ্ধা। আজকাল জাহিদের বড় মাথা টনটন করে। প্রুফ দেখতে দেখতে টের পায় অক্ষরগুলো ক্রমশ রূপান্তরিত হচ্ছে এক একটা কালো পিঁপড়ায়, এ রকম একটা সূক্ষ্ম কাজ, শব্দ, বানান ঠিক রাখা, এমন সব ছাপোষা অশিক্ষিতেরা করে! জাহিদ বিস্মিত হয়, বেতনও নাম মাত্র, মর্যাদাও তেমন নেই, অথচ এই কাজে নিযুক্ত হওয়া উচিত বাংলায় ক্লাস পাওয়া মানুষদের। জাহিদ নিজেকেও এর যোগ্য মনে করে না, এ কাজ করতে গিয়ে সেও প্রেস ম্যানেজারের কাছে আর দশজন কেরানিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

বিনিময়ে যা মেলে তাতে মনে বিষণ্নতা জমে। না, এই জীবনে উড়ন্ত বস্তি ছেড়ে ভালো কোনো জায়গায় যাওয়া আর কোনোদিন হবে না।

লাশটাকে এইরকম ব্যবহার করতে দেখে বিকেলটা আরো ধূসর হয়ে ওঠে। মনে পড়ে ভাওয়ালের রাজার কথা, স্ত্রী ডাক্তারের সাথে প্রণয় করে তাকে বিষ খাওয়ালে সবাই নিয়ে যায় চিতায় পোড়াতে। আর তক্ষুণি শুরু হয় তুমুল বৃষ্টি। লাশ ফেলে সবাই পালিয়ে যায়। কেউ জানতেও পারে নি রাজা তখনো জীবিত। সেই লাশ জীবন্ত হয়ে সংসারের প্রতি মোহ হারিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যায়, বারো বছর পর রাজ্যে ফিরে এলে এলাকায় হুলুস্থুল পড়ে যায় মৃত রাজার পুনর্জন্ম ঘটেছে বলে।

ঠা-ঠা রাস্তার মাঝখানে এই লাশটিও যদি দাঁড়িয়ে পড়ে?
অন্ধকার সিঁড়ি।
শুধু তিন তলায় একটা বাল্‌ব্‌।
আলোছায়া হাতড়ে সেখানে পৌঁছে বেল টিপতে গিয়ে কপালে ঘাম জমে ওঠে।
ভদ্রলোক দরজা খুলে জাহিদকে চিনতে পারে না।
ওই যে জ্বর নিয়ে এসেছিলাম, জাহিদ বিব্রত ভঙ্গিতে হাসে। চিনতে পারছেন না?
নিশি এখানে থাকে না।
জাহিদ বাইরে দাঁড়িয়ে আর এগুতে সাহস পায় না।
আপনার জ্বর সেরেছে?
হ্যাঁ। ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি।
দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

ঘরে ফেরার পর মাথার কুয়াশা সরাতে সে মৃত মানুষটার গল্প ফাঁদে, সম্ভবত তাঁর স্ত্রী পাশে বসা, বুঝলেন সুরুজ মিয়া, চোখ শুধু পয়সার দিকে, সামনে যে একটা লাশ, কোনো বিকার নেই।

সুরুজ মিয়া হাসে, ব্যবসা করবেন?
কিসের ব্যবসা?
লাশের।

কী যে হেঁয়ালি করেন, জাহিদ পাশ ফিরতেই চিলতে বিছানাটা মটমট করে ওঠে, মহল্লার সরু রাস্তা দিয়ে একটা মিছিল যায়। তারপরই মাইকে একটি বাচ্চা হারানোর বিজ্ঞপ্তি। সুরুজ মিয়া বিড়ি ধরায়, ওই মহিলারে কি লাশের স্ত্রী ভাবছেন আপনি? এই গুলার বেশিরভাগই বেওয়ারিশ লাশ। আঞ্জুমানের লোকজনের লগে লাইন কইরা এক ধরনের ব্যবসায়ী দুই দিনের লাইগ্যা একটা টাটকা লাশ জোগাড় করে, এর লাইগ্যা আঞ্জুমান দুই একশ টাকা পায়। পুলিশের লগে হাত কইরা হের পরে হেই লাশ ফুটপাতে আইন্যা রাখা হয়, লগে যারা বইয়া থাকে হ্যারা অভিনেতা-অভিনেত্রী। কেউ লাশের স্ত্রীর ভূমিকায় থাকে, কেউ মাইয়ার। হ্যারাও সারাদিন বইয়া দশ-বিশ ট্যাকা রোজগার করে। দুইদিন পরে হ্যারা আঞ্জুমানরে লাশ ফিরায়া দেয়। বড় আজব এই দুনিয়া। সব শুনে জাহিদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয় এই বোধ, বড় আজব এই—। নিশি এখানে থাকে না, এর অর্থ কী? ভাবতে ভাবতে জাহিদ ঘুমিয়ে পড়ে।

ক'দিন পর ঘোর রাত্তিরে জাহিদ ঘরে ফিরে দেখে, ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। শালার ভিখিরির আবার দরজা, ভাবতে ভাবতে খিটখিটে মেজাজে ধাক্কা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে যায়, সুরুজ মিয়া খেঁকিয়ে ওঠে, দিলেন তো শুরুর মইধ্যে গিট্টু লাগাইয়া, সবে রোমান্সটা আইছিল—।

জাহিদের শরীরে রক্তস্রোত বয়ে যায়, ভেতরে একজন রমণী বসে আছে। ফ্যাকাসে আলোয় কালসিটে ঠোঁটের লিপিস্টিক এমন কটমট করে ওঠে, জাহিদ রীতিমতো ক্ষিপ্ত হয়ে যায়, ছি আপনাকে আমি অন্যরকম মনে করতাম!

কী রকম? সুরুজ মিয়ার মুখের গন্ধ সমস্ত ঘরে ভক ভক করে ওঠে। মনে করতেন আমি অসুস্থ? আমার মেশিন নাই?

জাহিদের কথা বলার আর রুচি হয় না। পাল্লাটা সশব্দে লাগিয়ে সে সামনের ডাবগাছটার নিচের বড় পাথর খণ্ডটার ওপর গিয়ে বসে। নাহ্, পেছনে কী হচ্ছে ভুলতে চাই— জাহিদ টানটান চোখে সামনের গলিটার দিকে চেয়ে থাকে। বেঢপ কণ্ঠে গান গাইতে গাইতে একটা মাতাল যাচ্ছে। জাহিদের কী হয়, সহসা জন্মের প্রতি ঘেন্না জমে। প্রেস ম্যানেজারের হাত-পা ধরেছে সে, তাকে পেটে-ভাতে রেখেও সে যেন তার একটা কবিতার বই বের করে দেয়। ব্যাটা এ কথা শুনে হেসেই মরে, প্রুফ দেখতাছেন ভালা কতা, ওই পর্যন্তই থাকেন, তা গ্রন্থের নাম কি হইবো, কাক বৃত্তান্ত?

আসলে আমারও ক্ষুধা কান্না আনন্দ বেদনা সব আছে, আমি আমার স্বতঃস্ফূর্ততাকে কৃত্রিম এক লেবাস পরিয়ে নির্বিকার করে রেখেছিলাম, ভাবতে ভাবতে শীতের রাতে বুকের ভেতরে হু-হু কান্না ওঠে জাহিদের, আমার বাবা, হ্যাঁ ইনজেকশনটা পুশ করার পরই, এই আমার হাতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল। আমি তাকে খুন করেছি। বদ্ধ আকাশটার দিকে তাকিয়ে জাহিদের শ্বাস আটকে আসে। এ মৃত্যুর কোনো সাক্ষী নেই, প্রমাণ নেই, পোস্ট মর্টেমেও ধরা পড়বে না। প্রতিটি ইনজেকশন পুশ করার সময় আমি চাইতাম, তাঁর মৃত্যু হোক। সবাই জানত মায়ের মমতায় আমি তাঁর সব ভার মাথায় তুলে নিয়েছিলাম। সবই আমার ভণ্ডামি। নিজেকে সব ক্ষেত্রেই আলাদা করতে চাওয়ার আজন্ম প্রবণতা থেকে এসবের জন্ম। সেই শেষ ইনজেকশন, তার মধ্যে আমি আমার হৃৎপিণ্ড নিংড়ে বিষ ঢেলে দিয়েছিলাম, মৃত্যু হোক, মৃত্যু হোক, তার সেই দুঃসহ কষ্ট আমার জন্য প্রাণঘাতী হয়ে উঠেছিল। সেদিন সে মারা না গেলে আমার মাথার যা অবস্থা হয়েছিল, আমি সত্যি সত্যিই তার শ্বাসনালী চেপে ধরতাম; আক্ষরিক অর্থেই খুন করতাম তাকে। আমার সেই বাবা, একাকী নির্জন রাতে, জাহিদ কেমন ফুঁপিয়ে ওঠে, আমাকে নিয়ে এই স্বপ্ন দেখত, তার সেই অক্ষমতার ওপর পা রেখেই একদিন বিশাল হয়ে দাঁড়াব আমি।

আর আমার জননী? আজ আমাকে দেখলে চিনতে পারবে কি-না সন্দেহ। আমি হয়তো তার কাছে হারিয়ে যাওয়া এমন কোনো মুখ যার নাক-চোখ-মুখ সবিন্যস্ততায় স্মরণ করতে গিয়ে তার প্রাণে রক্ত উঠে আসে।

নিশিও কি আমার মতনই প্রচণ্ড এক দুর্বিপাকের মধ্যে টাল খাচ্ছে? জাহিদ নিজেকে সুস্থির করে অন্যদিকে ধাবিত করে। একজন মানুষের মনের মধ্যে নিজের সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে, গভীর ছাপ ফেলতে অনন্ত সময় পার হয়ে যায়, আবার ঘটনার পাকে সেই মানুষের কাছেই ঘৃণ্য, হাস্যকর হয়ে উঠতে লাগে এক মুহূর্ত, আমাকে সেই চরম বিপন্ন অবস্থায় কে টেনে নিয়ে গিয়েছিল তার দরজায়? তার সেই ফ্যাকাসে বিবর্ণ মুখে দেখা হয়ে উঠল না আমি তার মধ্যে ঠিক কীভাবে বেঁচে আছি! মেয়েরা দীর্ঘ বছর পর তার স্মৃতিবদ্ধ কোনো মানুষকে অন্তত অর্থনৈতিকভাবে বিধ্বস্ত দেখতে ভালোবাসে না। এই রকম প্রত্যাশার জাগরতা খুবই স্বাভাবিক, তাতে করে তার স্বস্তি হয়, কিন্তু যা মরে যায়, সেটা তার দুর্মর

স্বপ্ন। স্মৃতির সেই অলৌকিক মানুষ মেয়েদের গভীর নিভৃতে লালন-করা এমনই এক সম্পদ, যাকে নিঃশব্দে মেলে ধরে, তার সামনে নিজেকে দাঁড় করিয়ে সে হাসে, বেদনার্ত হয়। তার গতানুগতিক জাঁতাকলে-পিষ্ট-জীবন কিছুক্ষণের জন্য হলেও অন্য এক স্বপ্ন দ্বারা আক্রান্ত হয়।

জাহিদ কেন একজনের এমন স্বপ্নহীন জগতে গিয়ে এক মুহূর্তের জন্যে আশ্রিত হতে গিয়েছিল ? সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তার গ্লানির কোনো অন্ত ছিল না। এই এখন তার মনে হয়, নিজের সত্য ঢেকে অন্যের কাছে কৃত্রিম, স্বপ্নময় হয়ে থাকার মধ্যে ভণ্ডামি থাকতে পারে কিন্তু সততা নেই। জাহিদের কিছু ভালো লাগে না। সব ছাপিয়ে নিশির বিষণ্ণতা তাকে কাতর করে তোলে। এই শহরের কোথায় সে আছে ? সে কি স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করছে ? পর মুহূর্তেই শীতের রাত তাকে কুঁকড়ে দেয়। হায়! এই পৃথিবীতে কে কাহার ?

কিন্তু ওই বদমাশটা এতক্ষণ ঘরের মধ্যে কি করছে ? দমকা শীতে জাহিদের প্রাণ বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়। সে এক লাফে দাঁড়িয়ে টান দিয়ে খোলে দরজার পাল্লা। যেন ঘরের বউ, কাজ শেষে তক্তপোশে শুয়ে এমন ভঙ্গিতে সুরুজ মিয়া মহিলার সাথে গল্প করছে। ওকে এক্ষুনি বিদায় করেন, মহিলার সামনে জাহিদ কথার আব্রু রাখে না। কী বিচ্ছিরি অসুখ হচ্ছে চারপাশে, আপনার মিয়া কোনো রুচি নাই!

সুরুজ মিয়া টলছে, অসুখ ? হা-হা, শিক্ষিত মানুষ এর চিকিৎসা জানেন না ? আমি বাইরে গিয়া অপেক্ষা করি, আপনি শুরু করেন— এই যে চিকিৎসা। বলে সে একটা কনডমের প্যাকেট জাহিদের হাতে গুঁজে দেয়, মিয়া, রোগের ভয়ে জীবনের সাধ-আল্লাদ ছাইড়া দিবেন ?

জাহিদের চোখের সামনে ঘাই দিয়ে ওঠে লায়লার দেহ, সে ঠাণ্ডা হয়ে আসে, এরপর সেই বিশালাকৃতির সাপ, যমজ মুখ... জাহিদের ভেতর থেকে বমি উঠে আসে, সে কর্কশ কণ্ঠে বলে, একে বের করুন ঘর থেকে! এক্ষুনি! নইলে পুলিশ ডাকবো!

সুরুজ মিয়া খেঁকিয়ে ওঠে, ঘর কি আপনের বাপের ? আছিলেন তো মিয়া রাস্তার ফকির, দয়া কইরা—।

তারপর এ বাড়ির পাটও চুকে যায়।

কাঁধে ব্যাগ নিয়ে জাহিদ ঘুটঘুটে রাতের শূন্য রাস্তায় নেমে আসে।

হাঁটতে হাঁটতে নিশি দেখে সূর্য আকাশ থেকে হেলে পড়েছে, ফটাস ছিঁড়ে গেছে স্যান্ডেলের ফিতে, চারপাশে ঘনিয়ে আসছে ঘোর কুয়াশা, সে এসে দাঁড়িয়েছে এমন একটা মার্কেটের সামনে, যেখানে রাজ্যের পুস্তক। তবে সে কোনো গ্রন্থের দোকান নয়, সার সার পুস্তক নয়, ভাবলেশহীন চেয়ে থাকে ঝকঝকে গ্লাসের দিকে। স্যান্ডেলের দিকে তাকিয়ে সে অসম্ভব বিপন্ন বোধ করে।

একটি দোকানের সামনের রেলিংয়ে বসে চা খাচ্ছে একজন ভদ্রলোক। দোকানের সামনে ফুটপাত, ছিন্নবিচ্ছিন্ন ভিড়, তার মধ্যে থেকেই হাতে কাপ স্থির রেখে লোকটা নিশির দিকে তাকায়।

এখন ফিতে ছেঁড়া-খোঁড়া পায়ে কীভাবে হাঁটা যায়? নিশি স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে। ভাবে কিছুক্ষণ পর লোকটি নিজের কাজে ব্যস্ত হলে আরেকটু এগোবে।

কতকাল পর দেখছে রাতের আলোকোজ্জ্বল শহর, একা এইভাবে, কিন্তু সর্বঅস্তিত্ব উড়ন্ত, নির্ভার হয়ে উঠছে না। সামনের খণ্ড আলোর মাঝখানের ছেঁড়া কুয়াশাগুলো, যেন শাদা বর্ষোপল, জাঁকালো অন্ধকারের চাপ তার মস্তিষ্ক ভারি করে তোলে। সে পুনর্বার মাথা ঘোরায়, লোকটা এখনো চেয়ে আছে।

মুখে চাপ দাড়ি। লম্বাটে উস্কো চুল, ধবধবে ফরসা চামড়া, হাতে কাপ, বগলে দুনিয়ার বইপত্তর। এতকিছুর ভারে ন্যুব্জ হয়ে, এত ভিড়ে তার মনোযোগ নিশির দিকে, না আর পাত্তা দিলে চলে না, নিশি ফিতেটাকে পায়ের দু'আঙুলের ভাঁজে ঢুকিয়ে কায়দা করে এগোতে চায়।

এই যে শুনছেন, এখানে আশপাশে কোনো মুচি নেই।

নিশি আরেকটু এগোয়, আপনাকে খুব চেনা মনে হচ্ছে, কোথায় দেখেছি বলুন তো?

জুতোটা হাতে নিয়ে এখানে এসে একটু বসুন। কতক্ষণ যাবৎ দেখছি নিজেকে ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, লোকটি এবার দাঁড়ায়, বগল থেকে ঝুর ঝুর পড়ে যায় দু' একটা বই। উবু হয়ে তুলতে তুলতে সে বলে, চেনা মনে হচ্ছে? আপনাকেও আমার চেনা মনে হচ্ছে, ফুটপাতে বসার অভ্যাস নেই বুঝি?

না, তাতে অসুবিধে নেই, কিন্তু আপনি কে বলুন তো?

আমি? দেখুন এভাবে দাঁড়িয়ে কথা বলা যায়? চলুন ওই রেলিংটাতেই বসি, এই দেখুন চাটাও গেছে ঠাণ্ডা হয়ে, যাহোক, আমাকে চেনা মনে হচ্ছে এর একটাই কারণ, আমার, আপনার পরিচিতজনদের মতনই নাক-মুখ-চোখ আছে, আমি মানুষের মতো দেখতে, কতক্ষণ যাবৎ লক্ষ করছি, ছেঁড়া স্যান্ডেল নিয়ে কী ঝক্কির মধ্যেই না পড়েছেন।

নিশি বলে, হেঁয়ালি করবেন না, এর আগে কোথাও আপনার সাথে পরিচয় হয়েছিল?

সে তো হয়েছিলই, নইলে আমি আগ বাড়িয়ে কথা বলে জুতো খাওয়ার রিস্কে যাই? কিন্তু চিনতে যখন পারেন নি সেই পরিচয়ের কথা এখন তুলব না। আমি নিতান্ত একজন ভদ্রলোক কেবল সে কথা ভেবে কিছুক্ষণ এখানে বসতে পারেন।

নিশি বসে।

কিন্তু তার ভেতরে উল্টোপাল্টা খোঁচাখুঁচি চলে, কে এ? টিভিতে দেখা কেউ? অদ্ভুত লোকটার চেহারা, কথা বলার ভঙ্গি, কখনো পরিচয় হয়ে থাকলে ভোলার তো কথা না। কিন্তু যারা টেলিফোনে কিংবা দেখা হলে পরিচয় নিয়ে এরকম হেঁয়ালি করে তাদের ওপর নিশি ভীষণ বিরক্ত হয়। অন্য সময় হলে সে এই আবিষ্কারের মধ্যে এমন ন্যুব্জ হয়ে পড়ত, সহজভাবে কথা পর্যন্ত বলতে পারত না। এখন সেসব ঝেড়ে ফেলে। খোলা চোখে চেয়ে দেখে রাত্রির নগরী, যার ওপরে সশব্দে ঝরে পড়ছে আলোর কুসুমাসার। নিশির মাথায় কিছু নেই, কোনো ভার না, কোনো কুয়াশা না, সে জন্মের পর এখানে এসে বসেছে, মৃত্যুঅবধি বসে থাকবে।

চা খাবেন?

খাব।

আপনার কোনো তাড়া নেই তো?

না।

কিন্তু একা, এই রাত্তিরে?

নিশি উত্তর দেয় না, তার চোখে ভেসে ওঠে ল্যাম্পপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ছায়া, হ্যাঁ, সে-রাতে আফজাল মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে ছিল কুয়াশার মাঝখানে।

এর আগে সে যখন মমতাদির ঘরে ঢলে পড়েছিল, সেটা ছিল এই অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার ভান। নিশি তখনো জ্ঞান হারায় নি কিন্তু সাজিদুলকে বিপর্যস্ত করতে সেই অভিনয়ের আশ্রয়টুকু নিয়েছিল। কী করে সাজিদুল দ্রুত দরজা বন্ধ করে বাইরে গিয়েছিল, কী করে ফার্মেসি থেকে গজ-ব্যান্ডেজ এনে গভীর ছেঁড়া জায়গাগুলোতে লাগিয়ে তার চেতনাহীন ঢলে পড়া দেহে শিশুর মতন করে পরিয়ে দিয়েছিল সালোয়ার-কামিজ— সব বলতে পারে নিশি। যখন তার চোখে ক্রমাগত জল ছিটোচ্ছে সে, তখন চোখ মেলার পরও অনুভব করে, সত্যিই সে মাথা তুলতে পারছে না। এতক্ষণ বিপদে পড়ে সে সাজিদুলের প্রতিটি বিষাক্ত স্পর্শ সহ্য করেছে। ওকে তাকাতে দেখে সাজিদুল যখন উদ্ভাসিত, ঘৃণায় বিকৃত হয়ে ওঠা মুখ নিয়ে নিজেকে নিশি প্রাণপণে খাড়া করায়। সৃষ্টিকর্তা! আমার সারা শরীরে আগুন ধরে গেছে, এত যন্ত্রণা, যেন কেউ আমার শরীর সেদ্ধ করে তাতে মরিচ ছিটিয়ে দিয়েছে।

এই ওষুধটা খাও, যন্ত্রণা কমবে, সাজিদুলকে কাতর দেখায়, আমি তোমার যে ক্ষতি করেছি, বিশ্বাস কর আমার মধ্যে পিশাচের মতো করে ভর করেছিল ওসমান, জেলখানার ওই মৃত আত্মাটা।

নিশি ওষুধ খেয়ে শ্লেষ-ছাওয়া মুখে হাসে, তুমি যদি বেঁচে থাক, তবে আমার পরিণতি দেখবে, আমি আমার অশুদ্ধ দেহ ছুঁয়ে শপথ করে বলছি—।

সাজিদুল নিশির মুখ চেপে ধরে। তারপর সে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে, আমি কিছু শুনতে চাই না।

নিশি দরজার কাছে যায়।

এখন অনেক রাত নিশি। তোমার যাওয়াটা নিরাপদ হবে না, যা হওয়ার হয়ে গেছে, রাতটা এখানে থেকে যাও।

আমি যাচ্ছি, নিশি ঠাণ্ডা কণ্ঠে বলে, তুমি আবার কুত্তার মতন পেছন পেছন এসো না।

বিস্তৃত রাজপথে নেমে নিশি দেখে, পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে সাজিদুল, আমি শুধু তোমাকে তোমার বাসার সামনে দিয়ে আসব, এত রাতে রাস্তায় এ রকম করলে বিপদ হবে, নিশি ক্ষমা কর আমাকে, আমি, আমি কুকুরেরও অধম।

বিপদ! নিশি সাজিদুলকে ভীত করে অদ্ভুত হেসে ওঠে, বেশ্যার আবার বিপদ!

আপনার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে!

লোকটার কথায় নিশি ঘূর্ণায়মান ধোঁয়ায় মুখ ডুবিয়ে দেয়। চা শেষ হলে বলে, আপনাকে ধন্যবাদ, আজ তা হলে চলি।

আশ্চর্য মানুষ আপনি, কথাই তো হলো না আপনার সাথে।

ও, আপনার কি কিছু বলার ছিল ? পরিচয়ই তো দিলেন না, শুধু রহস্য করছেন।

দেখুন, আপনাকে খুব অসুস্থ মনে হচ্ছে, এমন ভেঙে গেছে আপনার চেহারা, অথচ সেদিন, মনে পড়ে, একসাথে খাট্টাপুরি খেয়েছিলাম ? ওই যে আমার ক্লাসমেট সাজিদুল, আপনার সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিল, তারপর খাট্টাপুরি, মনে পড়ছে ?

নিশি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, ওহ্হো, ফুচকা! আপনিই সেই ? তখন কিন্তু আপনার দাড়ি ছিল না।

কবেকার কথা! আপনাকে কিন্তু আমার মনে ছিল, কী তীক্ষ্ণ চেহারা আপনার! যা হোক, সামনাসামনি হয়ে যাচ্ছে। শুনেছিলাম ওর আপনার সাথে বিয়ে হয় নি, এইসব নাজুক প্রসঙ্গ তুলতে চাই নি, কিন্তু পরিচয়টা দিতে হলে ও প্রসঙ্গে আসতেই হয় কি বলেন, আমার কিন্তু ওর সাথেও যোগাযোগ নেই।

এখানে আপনি ?

বইয়ের পোকা, সন্ধ্যা হলে গন্ধ শুঁকে শুঁকে এখানেই চলে আসি, ওই একটাই নেশা। আর শূন্য কাপ তুলে ধরে বলে, চা।

নিশি পা বাড়াতে গিয়ে দাঁড়ায়, কি যেন নাম ছিল আপনার ?

এখনো আছে, মুসতাফা।

ওই যে নিস্তব্ধ নগরী।

আমার দেহ রূপান্তরিত হয়েছে তাতানো কুকুরের মাংসে, আমি সেই মাংস খাব, ঝুলতে থাকবে মুণ্ডু, সেই মুণ্ডু থেকে বেরিয়ে আসবে পিপাসাকাতর অনন্ত জিহ্বা, খা, তোরা সেইটা খা...। নিশি আধো ঘুমে কঁকিয়ে ওঠে, আয় খুকু আয়, ভয়ের মুণ্ডু চলে গেছে, তোর জন্য আমি পেট ফুঁড়ে রেখেছি, না, আমি ছেলে শিশু রাখব না। ওখানে চালাকি করে বাঁচবি তুই। লক্ষ্মী ক্ষুদে মেয়ে, একদম আমার মতো, নিজের কাছ থেকে পালাতে পালাতে...!

স্বাতী বলে, তোমার জীবনে যা কিছু ঘটেছে তার জন্য হয়তো তুমি নিজের জায়গায় ঠাঁই পাবে, কিন্তু তুমি আমার এখানে এসে উঠেছ, এ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত তুমি জীবন দিয়েও করতে পারবে না।

বালিশ খামচে নিশি অদ্ভুত রকমে হাসে, প্রায়শ্চিত্ত!

সাজিদুলের সাথে নিস্তব্ধ পথে তারই বিলোড়ন চলছিল। সে বলছিল, আমি বোঝাব তোমার স্বামীকে, দায়িত্ব আমার, যদি সে না মেনে নেয় যা প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, যা বলবে আমাকে...।

এই তো তুমি চেয়েছ, এরকম একটা অঘটন ঘটিয়ে নিজে ফায়দা লুটবে, সাপের মতো হিসহিস করছিল নিশি, ওই যে আমার গা ঘেঁসে বসেছ রিকশায়, আমার বমি আসছে, আমি এখানে সংসার করতে না পারলে তোমার কাছে যাব ? পরগাছা, ভিখিরি! একজন ভদ্রমহিলার দয়ার সুযোগে তার ঘাড়ে বসে খাচ্ছ, সেই তোমার কাছে যাব ? আমি ? ছো!

নিশি, যা ইচ্ছে বলো, আমাকে যা ইচ্ছে শাস্তি দাও, আমি স্বীকার করছি, আমি নিকৃষ্ট, দুর্ভাগা, কিন্তু একী করলাম আমি। যার জীবনের একবিন্দু বিচ্যুতি দেখলে আমার প্রাণ বেরিয়ে যায়, অথচ তার জীবন আমি... নিজ হাতে... কী করে বাঁচব এখন?

বাসার কাছে আসতেই ল্যাম্পপোস্ট।

নিশি তোমাকে ঘরে পৌঁছে দিই? সম্ভবত সাজিদুলের এই আহ্বানটাই কুয়াশায় স্তব্ধ দাঁড়িয়ে থাকা আফজালের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে। যেন গলির মুখে অনন্তকাল নির্বাক দাঁড়িয়েছিল সে।

নিশি রিকশা থেকে নিঃশব্দে নেমে আসে।

আমি কি যাব?

সাজিদুলের এই কথায় নিশি সটান ঘাড় ঘোরায়, তার চোখ থেকে ঠিকরে বেরোয় আগুন, রিকশা ঘুরে যায়।

আফজাল হন হন হেঁটে হেঁটে সিঁড়ি অব্দি পৌঁছয়।

এর মধ্যেও নিশি অসংলগ্নভাবে নিজেকে বাঁচানোর নানা পথ বের করতে চেয়েছে। দুর্ঘটনা, হাসপাতাল, শেষে এ পর্যন্ত। ভেবেছে, আমি ধর্ষিত হয়েছি। দোকান থেকে ফেরার পথে এই দেখো আফজাল ব্লেড দিয়ে কী করেছে ওরা!

কিন্তু সাজিদুল যে ওকে নামিয়ে দিয়ে গেল? কে জানত আফজাল একদম গলির মাথায় দাঁড়িয়ে থাকবে? নিশি আর ভাষা খুঁজে পায় না। নাহ্ অন্ধগলি, আমার আর পথ থাকল না!

মনে পড়ে, বাবার অসুখ ছিল, ভাইজান কী এক কাজে শহরের বাইরে। রাতে বেড়ে উঠল। মৃত্যু যন্ত্রণায় বাবা গোঙাচ্ছেন, মা অস্থির ড্রয়ার হাতড়াচ্ছেন, ওষুধ খুঁজে পাচ্ছেন না। নিশি সন্তর্পণে বেরিয়ে এসেছিল পথে। তখনো এমন শীতের রাত ছিল। কতটা রাত হয়েছে না বেরুনো পর্যন্ত হুঁশ ছিল না। গলির শেষ মাথায় বাঁক নিলেই ডিসপেনসারি। বেরিয়ে দেখে, রাতের কুকুরটি পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়েছে। গলির মধ্যে নেমে এসেছে মড়িঘরের স্তব্ধতা। ছুটতে ছুটতে নিশি সুরা পড়ে বুকে ফুঁ দিচ্ছিল। তার কেবলই মনে হচ্ছিল, এই বুঝি পাশের বাড়ির কোনো দরজা সশব্দে খুলে গেল, শরীরের ওপর এই বুঝি হামলে পড়লো রাতের নেকড়েগুলো।

সেই পথটা সে হৃৎস্পন্দন বন্ধ করে পার হয়েছিল।

দীর্ঘদিন পর সেই ভয় তার শ্বাস রুদ্ধ করে দেয়। সে আফজালের পেছন পেছন অবুঝ কিশোরীর মতো দোতলা অব্দি ওঠে।

তিনতলায় উঠে আফজাল এমন ভয়ানক শব্দে দরজা বন্ধ করে, সে শব্দেই নিশির সর্বঅস্তিত্বের বরফ ভেঙে-গুঁড়িয়ে শত টুকরো হয়ে যায়।

সিঁড়িতে বসে পড়ে সে দম আটকে, যেন কোথাও কোনো শব্দ না যায়, এইভাবে উপুড় হয়ে অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়ে।

স্বাতী বলে, জীবন বড় বিচিত্র নিশি, তুমি পথ ঘুরে আমার এখানে আসবে, এ আমার কল্পনারও বাইরে ছিল।

নিশি শুয়ে বিছানার পাশের টেবিল ল্যাম্প নেভায়, ফের জ্বালায়, এ আমার দুর্ভাগ্য। তোমার এখানেই আসতে হলো। বাবার ওখানে যাওয়ার মতো অবস্থা নেই আমার। রিনিকে নিয়ে এই ফ্যামিলিতে এমনিতেই অন্ধকার নেমে এসেছে। তুমি দুটো ছেলেকে ফেলে এই রকম একটা বুড়োর কাছে কিভাবে এলে, যার সম্পর্কে তুমি একদিন পিতার শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিলে? স্বাতী, তুমি আমাকে জায়গা দিয়েছ, আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু বিশ্বাস কর, এই লোকটার অর্থের কাছে, চাকচিক্যের কাছে তুমি নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছ, এটা ভাবলে আমি তোমার দিকে সহজভাবে তাকাতে পর্যন্ত পারি না।

স্বাতী ধৈর্যের পরিচয় দেয়। বিছানা থেকে নেমে সে নিঃশব্দে বাতি জ্বালায়। তারপর বলে, তুমি কি একটু উঠে বসবে?

কী শুনব তোমার কথা? নিশি ঠোকানো কণ্ঠে বলে, সবারই আত্মপক্ষ সমর্থন করার মতো যুক্তি থাকে— চোর-ডাকাত, সবার। এই লোকটি যদি অর্থবান না হতো, তুমি ছেলেদের যদি ফেলে না আসতে, তাহলে একটা কথা ছিল। বিশ্বেস কর, তোমার কথা শোনার ধৈর্য আমার নেই। তুমি বলতে পার তুমি স্বাধীন মানুষ, যে কোনো উপায়েই হোক তুমি যদি সুখ পাও, আনন্দ পাও, সেটাই বড় কথা, এখানে পায়ের তলায় কোনো প্রাণ পিষে গেলে কি এসে যায়? হ্যাঁ, তা যদি বলো, তবুও তোমার সত্য উচ্চারণের জন্য ধন্যবাদ দেবো, কিন্তু তোমার ছেলেদের নিয়ে সেদিনকার মতো দুঃখ প্রকাশ করো না। আমি শেষ পর্যন্ত লড়ে যাওয়ার পক্ষের লোক, কিন্তু কীভাবে লড়তে হয়, তা জানি না।

ঠিক আছে, আমি আমার কথা বলছি না, স্বাতী বলে, কিন্তু আসা অব্দি তুমি এমন রহস্যময়ী হয়ে আছ কেন? আমার কৌতূহল হওয়াটা কি বাড়াবাড়ি? তোমার হাত, মুখ, গলা, এসবে ব্লেডের আঁচড়! কে করেছে এইসব?

আমি নিজেই।

আফজাল ভাইয়ের সাথে জেদ করে?

হ্যাঁ।

কী এমন করেছিল সে, তুমি এমন মর্মান্তিক জেদ করলে? তারপর বাসা থেকে বেরিয়ে এসেছ। একেবারে শূন্য হাতে, সে তোমাকে আটকায় নি?

সে তখন অফিসে ছিল।

তার মানে ভোরে ঘটেছে কাণ্ডটা। তুমি আমার এখানে এসে ভুল করেছ নিশি, সে তোমাকে খুঁজবে, খুঁজে যখন জানবে সংসারটা তো তুমি করতে চাও না?

স্বাতী, আমার ভীষণ মাথা ধরেছে। জানো কিছু ভাববার ক্ষমতা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছি। ক'দিন আগে, যখন সব স্বাভাবিক ছিল, তোমার বিষয়ে সে-কী কৌতূহল, অনেক কায়দা করে তোমার মার কাছ থেকে জেনেছিলাম, তুমি কোথায় থাক? আজ এ অবস্থায় আসতে হয়েছে সেজন্য উল্টো সবকিছুর ওপর ঘৃণা লাগছে।

মা'র সাথে কথা হয়েছে? স্বাতী কেমন ঠাণ্ডা হয়ে যায়, কী অবস্থা তার?

তিনি বলেছেন, ও মরে গেছে। ওর ঠিকানা আজিমপুর গোরস্থানে। তুমি দুঃখ পেয়ো না স্বাতী, মেয়ে এরকম একজনের সাথে রক্ষিতার মতো তার প্রাসাদে বাস করছে, এ একজন মায়ের পক্ষে মৃত্যুর সমান। তবুও অনেক বুঝিয়ে তাকে বলেছিলাম, তুমি কেমন

আছো। তোমার সত্যিকার অবস্থাটা শুধু দেখার জন্য একবার তোমার কাছে যাব। শেষে সে-কী কান্না তার! আমি জানতাম, তুমি কোথায় আছ, সেই ঠিকানা, তিনি মা, তাঁর কাছে থাকবেই। কিন্তু এভাবে তোমার এখানে আসতে হবে, এ আমার কল্পনার বাইরে ছিল। এইরকম যন্ত্রণা নিয়ে, গলা-মুখ ঢেকে মনে হচ্ছিল, শুধু তোমার কাছেই আসা যায়। তুমি আমার যে সেবা করেছ এই ঋণ আমার মনে থাকবে, কিন্তু স্বাতী, একজন বুড়ো লোক, যার স্ত্রী তোমাকে এত সম্মান করত, এতই যদি অসহ্য ছিল সংসার, মার কাছে চলে যেতে, সবকিছু এভাবে নষ্ট করে ফেললে ?

অভিজাত ফ্ল্যাট।

সুসজ্জিত আসবাব। সবই নতুন, ঝকঝকে, অনুমান করা যায়, স্বাতীর সিদ্ধান্তের পরপরই এক সাথে সব কেনা হয়েছে। বড় নিখুঁত লোক ওই বুড়োটি। জুতোর স্ট্যান্ড, পাপোশ থেকে শুরু করে ডিপফ্রিজ, এয়ারকুলার সব কিনেছে। ড্রয়িং রুমেও খুঁত ধরার মতন জায়গা রাখে নি। নিশি একটু বিস্মিত হয়েছে।

এত আয়োজন স্বাতীর জন্য, অথচ নিশি এসেছে অব্দি একবারও তাকে এ বাড়িতে আসতে দেখে নি। এ রকম একটি ডুবে যাওয়া বিছানায় শুতে নিশির অস্বস্তি হয়। তবে তার যা মানসিক অবস্থা, তাতে যদি তাকে এখন গোয়াল ঘরেও শুতে হতো জায়গা সম্পর্কে তার কোনো বোধ থাকত কি-না, সন্দেহ। সারাক্ষণ দপদপ জ্বলছে মগজের বাল্‌ব্ আমার জীবন এখন কীভাবে যাবে!

স্বাতী গ্লাসে কোক ঢেলেছে, কেমন গলা শুকিয়ে আসছে, খাবে ?

ফ্রেস জল ?

আমরা যেটা খেতাম সেটা বুঝি ফ্রেস ছিল না ? স্বাতী খোঁচা দেয়, তুমি এমন আচরণ করছ, যাকে বলে হাস্যকর, একেবারে চূড়ান্ত রক্ষণশীল, অথচ তুমি যা না। তুমি স্বামীর ঘর ছেড়ে এমন একজনের কাছে এসে উঠেছ, যাকে তুমি ঘৃণা করছ। কারো এ রকম ভণ্ডামি একদম ভালো লাগে না।

আমি কাল এখান থেকে চলে যাব।

হ্যাঁ, সে কথা বলতে পার তুমি। যাও, আমি তোমাদের মুখ চেয়ে ও-পথ মাড়িয়ে আসি নি। শুনতে চাও না কিছু শুনো না। তবে তুমি যেভাবে মানিয়ে চলতে, সব জেনেও আজ কেন বেরিয়ে এসেছ, আমি জানি না, আমি কোনোদিন তা মানতে পারি নি, এ জন্য সবকিছু থেকে একটু একটু করে নিজেকে তুলে এনেছি।

সব জেনেও মানে ? নিশি সোজা হয়ে বসে, আমরা দু'জন এক হতে পারি নি আমাদের মানসিক দূরত্বের কারণে। ওর মধ্যে অনেক সমস্যা ছিল, তারচেয়েও বিস্তর ছিল আমার। আমি তাকে প্রতিদিন ভুল বোঝার সুযোগ দিয়েছি।

একজন মানুষ বেশ্যাপাড়ায় যায় জেনেও তার সাথে শুতে তোমার ঘৃণা হতো না ? স্বাতী ক্রমশ উত্তেজিত হতে থাকে, একজন মানুষের মনের কোথাও তোমার একবিন্দু ছাপ নেই, তবুও তার সাথেই এক বিছানায় আজন্ম বাস করার জন্য কী প্রাণান্তকর আপোসই না করেছ! নিজেকে কখনো এজন্য ছোট মনে হয় নি ?

নিশির শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসে। সতর্ক হয়ে ওঠে রোমরাজি, তুমি কার কথা বলছ ?

তোমার স্বামী তো আমার স্বামীরই বন্ধু ছিল। দুঃখিত, আমি তোমাকে এসব বলতে চাই নি। কিন্তু যার সঙ্গে বাস করবে, তার ভালো-মন্দ সবটাই তোমার জানা দরকার। আমি ভেবে আশ্চর্য হতাম, যে বিষয় নিয়ে আমাদের সংসারে প্রতিদিন খুনোখুনি চলত, সেই একই কাজ তোমার স্বামী করছে, তারপরও তোমরা কত সুখী!

মদ খেলে নিজের বিষয়ে রেজা যতটা সাবধান থাকত, অন্যের বিষয়ে থাকত ততটাই এলোমেলো। ও বলত, স্ত্রীকে বিছানায় আফজালের পুরনো লাগে, একঘেয়ে লাগে। এ জন্যই ও বিভিন্ন জায়গায় যায়, ওর সংসারে এ জন্য তো কোনো সমস্যা হচ্ছে না। তুমি তার চেয়ে কি এমন অসাধারণ নারী হয়ে উঠেছ! আমার প্রত্যেক কাজের মধ্যে গন্ধ খুঁজে বেড়াবে ? নিশি, তুমি ছিলে তার কাছে সতী নারীর আদর্শ। আমাকে বলত, বড় দুর্ভাগা আফজাল, এরকম একজন স্ত্রীর প্রতি তার কোনোমাত্র মোহ নেই।

ঢকঢক লাল জল গিলে স্বাতী কেমন ঘুমকাতুরে হয়ে ওঠে, তোমার সন্দেহই ঠিক। ওটা বিশুদ্ধ জল ছিল না। বড় চালাক মেয়ে তুমি, অথচ বার বার ধরা খাচ্ছ লেজে। একদম গ্রাম্য অন্ধ নারীর মতো স্বামী সময়মতো ফিরছে বলেই কী নিশ্চিন্ত থাকছ! দূরত্ব তৈরি করছো। অথচ কেন তা জানো না। হয় তুমি অন্ধ প্রেমিক, সারাক্ষণ নিজেকে ছাড়া কিচ্ছু চেনো না, নয় আহাম্মক। আমি, বুঝেছ, এইসব সস্তা ভণ্ডামির মুখে লাথি দিয়ে বেরিয়ে এসেছি। বড্ড ঘুম পাচ্ছে নিশি, কাল এ বিষয়ে কথা হবে। হ্যাঁ ?

নিশির চারপাশে অন্ধকার নেমে আসে। সে উন্মত্তের মতো খামচে ধরে স্বাতীকে, না এখন তুমি ঘুমুতে পার না। স্রেফ দু' কি তিন পেগ খেয়েছ। এত সহজে ঢলে পড়ার মেয়ে তুমি না। তুমি এইসব বলছ, তোমার অতৃপ্ত আত্মার অশান্তি থেকে। তুমি নিজে দাম্পত্যজীবনে সুখী হও নি বলেই আজ আফজাল সম্পর্কে যাচ্ছেতাই নোংরা...।

স্বাতী মাথা তুলে হাসে, এক সময় তুমি বলতে, আফজাল বড় ঠাণ্ডা, শারীরিক বিষয়ে ওর কোনো ক্রেজিনেস নেই, এবং এ জন্যই তুমি ওকে নিয়ে নিশ্চিন্ত। তখন বড্ড হাসি পেতো আমার। একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের উন্মাদনা থাকবে না ? যে পুরুষ স্ত্রীর শয্যায় কোল্ড, সে মোটেই নিরাপদ নয় বরং বাইরে সে ভয়ঙ্কর। আজ তুমি ও বাড়ি ছেড়ে এসেছ, তাই এসব বলছি, তোমার সুখ যদি আমার বিষ হতো, আগেই বলতাম। দুঃখিত আমি তোমাদের ওসব কামড়াকামড়ি সুখে বিশ্বাস করি না। তাইতো বললাম লাথি দিয়ে...।

হ্যাঁ লাথি দিয়ে এসে একজনের রক্ষিতা হয়েছ, নিশি দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করে, আমার বড় দুর্ভাগ্য, আজ তোমার মতো মেয়ের দয়া নিতে হয়েছে বলে।

স্বাতী বিছানা থেকে লাফ দিয়ে ওঠে। তারপর ছুটে যায় ফ্রিজের দিকে। নিশির যে শরীরে ছিল ছেঁড়া ঘায়ের যন্ত্রণা, সব অপসৃত হয়ে সেখানে জমা হয় কুচি কুচি বরফ। সে নিথর চোখে দেখে, কী বিশাল আকাশ, কেমন কুণ্ডলী পাকানো পিণ্ডে রূপান্তরিত হচ্ছে। তার মাঝখানে স্বাতী কি চৌকশ, যেন রাজকন্যা। ঢকঢক ফের সোনালি জল ঢেলে গেলাস হাতে এগিয়ে আসছে।

শোনো নিশি, তুমি বলেছিলে, আফজাল ভাই বলছিল বড়লোক হয়ে যাচ্ছি। এ রকম একটা ইঙ্গিত তোমাকে দিয়েছিল কিন্তু বিস্তারিত কিছু বলে নি। তুমি তার কয়েক মাসের চালচলন লক্ষ কর নি ? সে রাত করে ফিরত, বলত রেজার সাথে কাজের ধান্দা করছে।

না আমি এখনো সুস্থ আছি। তুমি ঠিকই ধরেছিলে, ওই ঘুমিয়ে পড়তে চাওয়াটা আমার ভান ছিল। দু'তিন পেগে আমার কিছু হয় না। আমি, ওরকম একটা বিষয় বলে ফেলার পর তোমার মুখের দিকে চাইতে পারছিলাম না। সে ব্যাংকে চাকরি করে, অন্য কাজের ধান্দা করে হঠাৎ বড়লোক হওয়া ? এত সোজা ? তুমি শিক্ষিত মেয়ে, সে বিষয়ে তোমার মনে কখনো প্রশ্ন আসে নি ? সে সন্ধ্যার পর থাকত আমাদের বাসায়। সারাক্ষণ রেজার সাথে রাজ্যির ফিসফাস। আমি তো কিছুতেই বুঝে পাই না ব্যাপার কী! শেষে একদিন খুব গিলে বেফাঁস, রেজা নিজেকে উগড়ে দিল। আফজাল ভাইদের ব্যাংকের ম্যানেজারের সাথে আঁতাত করে আফজাল ভাই, হাঁ রেজাও আছে ব্যাপারটার সঙ্গে, অবশ্য পরোক্ষভাবে, পার্টিদের লোন দিয়ে তার থেকে মোটা অঙ্কের কমিশন খাওয়া শুরু করেছে। পার্টি এসেছে রেজার সোর্সে। ভাগাভাগি করে যা থাকে। নিম্নবিত্তের বড়লোক হওয়া মানে বুঝতেই পার, লাখ টাকা হলেই মনে করে, হা-হা। এ কী, তুমি এমন শত্রুর মতো তাকাচ্ছ কেন ? চাকরি করবে না ঘরে বসে খাবে। স্বামীর ভারবাহী হয়ে থাকবে, অথচ তার কোনো খবর পর্যন্ত রাখবে না। আমি তোমাকে আরো প্রাকটিক্যাল বানাতে চাইছি। আমি না বললেই কি, একদিন তো জানতেই তুমি, নাকি, কতদিন আর লুকোনো থাকে এসব ?

ও পতিতালয়ে যায় তুমি নিশ্চিত ?

নিশির কণ্ঠের ক্ষুব্ধতায় স্বাতী হাসতে থাকে, স্বামী দালালি করছে, এ খবর তোমার মধ্যে বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া এনে দিল না ? হায় বাঙালি নারী, সে অন্য নারীর সাথে শুয়েছে কি-না, সেইটাই প্রাণের চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেল ?

শোনো স্বাতী, তুমিও এ কারণেই রেজা ভাইয়ের সংসার ছেড়েছ, যদি তোমার কথা সত্য বলে ধরতে হয়, তবে রেজা ভাইয়ের ওই একটি দোষ আজ তোমাকে এমন এক জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছে, যেখানে তোমার মান-সম্মান স্বকীয়তা সব বিকিয়ে দিতে হয়েছে। তুমি এখনো জানো না তোমার ভবিষ্যৎ কী ? স্বাতী এক টানে গিলে ফেলে, নিজেকে বিকোতে হয়েছে ? তুমি যাকে বুড়োটা বলছ, তার সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণাই নেই। সে আছে বলেই পৃথিবীতে আমার দেবতা দেখার ভাগ্য হয়েছে! তার ব্যক্তিত্ব, ধৈর্য, বিশ্বেস কর, পৃথিবীর পুরুষের প্রতি আমার যখন মৃত্যুর মতো ঘেন্না, তখন সে-ই আমাকে বাঁচালো। রেজার যাবতীয় কুশ্রীতায় সে যে কী বেদনাহত হতো! সন্তানদের দিকে তাকিয়ে আমি যাতে নিজেকে শক্ত রাখতে পারি, তার জন্য কী প্রেরণা তার। শেষে তার বুদ্ধিতেই রেজাকে অনেক বুঝিয়ে ছেলে দুটোকে হোস্টেলে দিয়েছি। বলেছি, আমাদের অশান্তির মধ্যে ওরা অমানুষ হয়ে বেড়ে উঠবে। এখন পর্যন্ত সেই মানুষটা চায় নি আমি সংসার ছাড়ি, তার প্রতিদিনের সহমর্মিতা আমার বাঁচার প্রেরণা। এদিকে সংসারে রক্তারক্তি, আমি টের পাই। এসব কারণেই সে আমার অস্তিত্বের একটা প্রধান অংশ হয়ে গেছে— কী প্রখর আত্মবিশ্বাস, সুখ, কী বলিষ্ঠ হাত, সে এখন আমার কাছে রক্তস্রোতের মতো। তুমি বারবার বলছিলে রক্ষিতা। আমাদের আইনে ডিভোর্সের তিন মাস না গেলে কাউকে বিয়ে করা যায় না। আমি সেই তিন মাস এখানে এখন যাপন করছি। আশা করি, এরপর তুমি এ বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে তোমার অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করবে না।

সে তোমাকে তিন মাস পর বিয়ে করবে, তার কী গ্যারান্টি ?

গ্যারান্টি ? এবার স্বাতী টলতে থাকে, এত স্থূল শব্দ তোমরা ব্যবহার কর। সে যদি আমাকে বিয়ে করে তবে এটা হবে তার বাঁচার সবচেয়ে সহজ রাস্তা। সে গ্লানিতে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে আমার মতন একজন নারীর সংসারে তাকে কেন্দ্র করে অশান্তি হওয়ায়। এ কারণে নিজেকে সে ক্ষমা করে পারছে না। তার কাছে আমি অসাধারণ, সুদূর নক্ষত্র। সে কিছুতেই খুঁজে পায় না ঠিক কি করলে আমার যথার্থ মর্যাদা হবে। এ সবই সে প্রকাশ করে অত্যন্ত সংহত ব্যক্তিত্বের সাথে। এই যে মদের গেলাস ছুঁয়ে বলছি, সে আমাকে এখনো স্পর্শ পর্যন্ত করে নি। বলেছে তিন মাস যাক, তারপর এই সম্পর্কটার সম্মান আমি রাখতে চাই। তুমি বলছিলে রেজার ওই একটি দোষের কারণে আমি সংসার ছেড়েছি। হ্যাঁ, আমি আবার কথার সূত্র ধরতে পারছি। এখনো টেঁসে যাই নি। না সেটা মূল কারণ না। রেজার কুশ্রী শিল্পহীন আচরণ ক্রমশ আমার মধ্যে এই মানুষটাকে অসাধারণ করে তুলেছে। না নিশি, তুমি মাঝখানে কথা বলতে চেয়ো না, আমি বলছি শোনো। হ্যাঁ আমি তার কাছ থেকে মরার সূত্র খুঁজে বের করতে শুরু করেছিলাম এক সময়। যাতে আমার মধ্যে অপরাধ বোধ না হয়, রেজা বড় হতভাগ্য, খুব তাড়াতাড়িই সে সেই ফাঁদে ধরা দিয়েছিল, আমি জানি এই প্রসঙ্গটিও তোমার জন্য অত্যন্ত বেদনার হবে। তারপরও শুরু যখন করেছিই, আমি আর ফিরতে পারছি না...।

তুমি কি আফজালকে কেন্দ্র করে আরো কিছু বলবে ? নিশির চামড়া টানটান হয়ে ওঠে, তবে এই মুহূর্তে থাক, আর কিছু শোনার মতো প্রস্তুতি আমার নেই।

শুনতে তোমাকে হবেই। আমাকে সবাই ঘেন্না করবে, উচ্চাভিলাষী বলবে, আমার নামে ঢিঢি দেবে, আমার সত্য জানবে না ? সবাই তুলসীপাতা ? খোলস-পরা ওই সব ময়দা মাখানো মুখ, রেজার মতো, মিনমিন করে অন্যের মায়া কাড়ে, আর তোমার মতো সো-কল্ড রক্ষণশীল, যে কয়েক পেগ গিলেও নেশা হয় নি এরকম ভান করে, স্বামীর কাসুন্দি শুনতে চায় না, অথচ তার কারণে নিজের হাত-পা কাটে, আমি এদের সবাইকে ঘৃণা করি। তোমাদের ভণ্ডামি দেখলে আমার বমি এসে যায়।

নিশি চাপা রোষে উঠে দাঁড়ায়, তুমি নিজেই বলেছ, তুমি ওখান থেকে আসার সুযোগ খুঁজছিলে, ভণ্ড কে স্বাতী ? কার মুখ ময়দা মাখানো ? তুমি এই লোকটির যাবতীয় কিছুর প্রেমে পড়েছিলে, এতই যদি তোমার সততা, তবে সুযোগ খোঁজার দরকার কী ছিল ? নিজের সত্যে ভর করে খাড়া মাথা নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারলে না কেন ? তুমি ঠিকই বলেছিলে, আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ক্ষতিটা হয়ে গেল তোমার এখানে এসে।

কেন, আফজাল ভাই বেশ্যাপাড়ায় যায়, এই সত্যটা জানিয়ে দিয়েছি বলে ? সংসার আজ হোক কাল হোক করবেই, মাঝখান থেকে জেনে ফেলে নিজের জীবনে ভয়ানক এক অশান্তি, ভয়ানক এক খুঁতখুঁতি ঢুকল বলে ? এবার স্বাতী মেঝেয় সশব্দে গ্লাস আছড়ে ফেলে, তুমি জানো, রেজা আমাকে কী করেছিল ? ওই মানুষটির প্রতি আমার যতই আকর্ষণ থাকুক ছেলেদের কারণে আমি শেষ পর্যন্ত সংসার টেকাতে চেয়েছিলাম। ও আমার বুকের আঁচল টান দিয়ে আমাকে হতবাক করে আফজালকে ঘরে টেনে এনেছিল, তখন দু'জনেই ঘোর মাতাল, আফজালকে আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, ওকে স্পর্শ করে দেখ্ তোর অনুভূতি হয় কি-না ? অন্যের বউকে নিজের বোনের মতন মনে হয় কি-না ? আমাকে প্রমাণ করে দেখা, ওর প্রতি তোর কোনো দুর্বলতা নেই। বড় বড় বাক্য ঝাড়িস আমার সামনে,

বাংলা সিনেমার হিরো আর কী! এর আগে বাইরের ঘরে আমাকে নিয়ে ওদের বিচ্ছিরি সব তর্ক হচ্ছিল। বিশ্বাস কর নিশি, আমি কানে আঙুল দিয়ে রেখেছিলাম। এরপর রেজা আফজাল ভাইকে ভেতরে এনে এমন একটা কাণ্ড করবে, এ ছিল কল্পনারও অতীত। স্বাতী মেঝেয় ছড়িয়ে-পড়া কাচের টুকরোগুলো তুলতে তুলতে কাঁদতে থাকে, এ আমি কী করলাম! সব ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলাম। নিশি বাকস্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। শাদা তুলোর স্তূপে এক সময় তলিয়ে যায় স্বাতীর দেহ। সব ছাপিয়ে নিশির মনে পড়ে সাজিদুলের ওখান থেকে ফেরার পর সেদিনের রাতের কথা।

মধ্যরাত অব্দি সেদিন নিশি সিঁড়িতে বসে ছিল।

সমস্ত শরীরে জ্বলুনি, ফোঁপানি কান্নায় ভেতরে এসেছিল অদ্ভুত এক অবশতা। বেশি রাত হওয়ার, সম্ভবত শীতের রাতের কারণেই সিঁড়ি দিয়ে আর কেউ আসা-যাওয়া করে নি। কুকুরের ঘেউ ডাকে শরীর কেঁপে উঠতেই মনে হয়েছিল, এ আমি কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি?

অন্য কারোর দরজায় ধাক্কা দেব? শরীরে যে রকম কাটা দাগ, কার্ডিগান চাপা দিয়েও লুকনো যাচ্ছে না। মাঝখান থেকে সবার সামনে আফজালের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে। নয়তো আমাকে নিয়ে কীসব কাহিনী ফাঁদবে! হে সৃষ্টিকর্তা, সকাল এনে দাও! এর কিছুক্ষণ পরই তিনতলায় দরজা খোলার শব্দ হতেই নিশির কী হয় ধনুকের ছিলার মতো টান হয়ে যায়। পাল্লা খুলে যাওয়ার আগেই সে দ্রুত পায়ে একতলার সিঁড়িটা টপকায়। তারপর সে প্রায় চেতনা রহিত হয়ে অন্ধকার পথে নেমে আসে। তার মনে হয়, পেছনে তীব্র জলোচ্ছ্বাস মৃত্যুর মতো গর্জন করে এগিয়ে আসছে। পথে বেরিয়ে জ্ঞান ফিরে আসে। ঢাকার মধ্যরাত হিংস্র বাঘের মতো হাঁ করে নিশিকে গিলে ফেলতে চায়।

নাইট গার্ডের দূরবর্তী ফুঁ নিশির মধ্যে স্পন্দন ফিরিয়ে আনে। এত কঠিন শীত, লেগে যাওয়া দাঁত কিছুতেই খুলছে না। মাথার ওপরের বাল্ব ভেঙে গেছে। ঝাঁকড়া নিমগাছটা কুয়াশা ফুঁড়ে বড় কষ্টে সঞ্চারিত হচ্ছে। যেন পাহাড় কেটে কেটে নগর চাঁদের আলো। নিশি কোনো কিচ্ছু চিন্তা না করে নিজেকে নিয়ে ছুটতে ছুটতে পাশের মসজিদে গিয়ে আশ্রয় নেয়। তেলতেলে পরিপাটি বিস্তৃত মেঝে। নিশির মনে হয় ধু ধু তেপান্তরের মাঠ।

সে চারপাশে কিচ্ছু দেখে না। না রাত্তির, না কুয়াশা, না মানুষ। আস্ত কার্ডিগানে নিজের ব্যান্ডেজ-জড়ানো শরীরকে কুণ্ডুলী পাকিয়ে ঢুকিয়ে সে ঘুমের তলায় ঠেসে যায়।

খুব ভোরে, তখনো অন্ধকার কাটে নি, পায়ের শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। নিশি চোখ মেলে দেখে একজন শাদা দাড়িঅলা, লম্বা পাঞ্জাবি পরা মানুষ। নিশি সভয়ে উঠে বসে।

তুমি কে মা? সেই মানুষটা কোমল কণ্ঠে প্রশ্ন করেন, এক্ষুণি আজান পড়বে, নামাজিরা আসতে থাকবে। তুমি কি জানো না, মসজিদে ঘুমনো নারীর জন্য নিষিদ্ধ?

ঠোঁট দিয়ে দেহের তীব্র যন্ত্রণা সামলে নিশি উঠে বসে। তার মাথা ঝিমঝিম করে। আবার চারপাশ অন্ধকার হয়ে আসতে থাকে। সে অস্ফুটে উচ্চারণ করে, তাতে কি এই মসজিদ অপবিত্র হয়ে গেছে?

সেই দীর্ঘ মানুষটি হাসেন, কিসে কী হয় সব কি আমরা জানি মা? আমরা শুধু ধর্মের কিছু নিয়মের কথা জানি, তুমি কি মা অসুস্থ?

নিশি পা ঘষটে সিঁড়ির কাছে এসে বসে, আমি পাপী, এই পৃথিবীর কোথাও আমার জায়গা নেই।

দীর্ঘ মানুষটি বলেন, কী করেছ তুমি মা ?

নিশি নিরুত্তর।

খুন ? ব্যভিচার ? পরধন লুট ?

না, এসবের কিচ্ছু করি নি। যেন নিজেকে উগরে হালকা করার জন্যই সে কী এক ঘোরে মন্ত্রমুগ্ধের মতো বলতে থাকে, তবে সত্য গোপন করেছি, আমার অতীত গোপন করে স্বামীর সাথে প্রতারণা করেছি।

দীর্ঘ মানুষটি বলেন, তাতে যদি সংসারের সুখ রক্ষিত হয়, কী এমন অসুবিধা ? অতীতে কী করেছ তুমি ?

নিশি যেন নিজের সাথে জেদ করে নিজেকে সশব্দে আঘাত করার জন্য উচ্চারণ করে, ব্যভিচার।

দীর্ঘ মানুষটি এবার স্থির কণ্ঠে বলেন, তুমি কি তা-ই গোপন করেছ ? পবিত্র কোরআন শরিফে আছে, "যদি না তারা (নারীরা) প্রকাশ্যে ব্যভিচার করে তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন করবে। তোমরা যদি তাদের ঘৃণা কর, তবে এমনও হতে পারে যে আল্লাহ্ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাকে ঘৃণা করছ।" শোন মা, তোমার এই দুর্দশা কে করেছে জানি না। যদি তুমি কোনো গোপন পাপ করেই থাক, তবে চারজনের সাক্ষী ব্যতীত এই শাস্তি তোমাকে কেউ দিতে পারে না। তুমি আমার কাছে কেন এসব কবুল করেছ ? তাহলে আমিও একজন সাক্ষী হয়ে যাব। ওই যে আজানের সময় হয়ে আসল, মানুষজন আসার আগেই তুমি এখান থেকে চলে যাও। তুমি যদি অনুভব কর তুমি পাপিষ্ঠা, তাহলে বুঝতে হবে তোমার আত্মা শুদ্ধ হয়ে উঠেছে। তুমি খোদাতায়ালার কাছে তওবা করো, তিনি অসীম করুণাময়।

স্বাতীর বাসা থেকে খুব সকালে নিশি বেরিয়ে আসে।

পুনরায় গন্তব্যহীন জীবন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিজেকে তার গ্যাস বেলুনের মতন মনে হয়। পরনে স্বাতীর পোশাক। ও সেদিন কিছু হাত খরচ দিয়েছিল। সেইটাই আজকের দিনের ভরসা। প্রায় প্রতিটি ধাপে মাথার ওপর ছিল কোনো-না-কোনো ছায়া, কখনো এইভাবে শহরের মাঝখানে ফেলে নিজেকে দেখা হয়ে ওঠে নি। রেস্টুরেন্টে পরোটা খেয়ে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে নিশি নগরীর জেগে ওঠার শব্দ শোনে। কী শ্রুতিময়, ওই যে সার সার গাড়ি, বিরাট অট্টালিকা, আঁটকুড়-এর ওপর পা ঘষটে ঢুকছে কচি রোদ্দুর। অদ্ভুত এক চিত্রকল্প যেন, নিশি নিঃশ্বাস টেনে ভাবে, এখন আমি কোথায় যাব ?

রাতে স্বাতীর জলস্রোতে পাক খাওয়া, তার বারংবার বদলে যেতে থাকা সুখের রঙ, এরপর বেঘোরে ঘুমিয়ে পড়া। আস্ত রাত নিশি তার উচ্চারিত শব্দগুলো নেড়েছে। কখনো বুদ্বুদ বানিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে শূন্যে, কখনো বিশাল এক পাথরে রূপান্তরিত করে বসিয়ে দিয়েছে বুকের একদম মাঝখানটায়।

সেই মধ্যরাতের সিঁড়ি, বন্ধ হয়ে যাওয়া দরজার শব্দ তার বুকের মধ্যে জমে থাকা ভয়কে ক্রমশ বাষ্প করে তুলেছে। তার মনে হয়েছে, সেসব কবেকার দেখা স্বপ্ন দৃশ্য। সেই

মানুষটা, যে তার বুকে-শরীরে কোনো দাগই না দেখে নিঃশব্দে জীবনের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। হোক সে সেই রাতের নষ্ট রমণী, হোক রোম ওঠা কুকুরের মতো ঘেন্নার, সে ছিল আহত— এ কি তার ভঙ্গি দেখে অনুধাবন করতে পারে নি কুয়াশায় অপেক্ষারত সেই মানুষটি ? তেমন একজন মানুষকে কিছু প্রশ্ন না করে তার মুখের ওপর পৃথিবীর দরজা বন্ধ করে দেয়া যায় ? মানুষের ক্রোধ-ঘেন্না এতটা লেলিহান হতে পারে ? এরপর স্বাতীর বর্ণনা, নিশি নির্ভার হয়ে ওঠে। সেও তো তার সবকিছু গোপন করেছে। আমার অসচেতনতার কারণে তাকে বারবার আমার কাছে মিথ্যে নিয়ে দাঁড়াতে হয় নি। বরং সে অনেক বেশি ঘৃণ্য, অসৎ। নিজে পঙ্কিলতায় ডুবে নিরন্তর শাস্তি দিয়ে গেছে উল্টো আমাকে। ব্যভিচার, তওবা, সেই মসজিদ, এও যেন স্বপ্নদৃশ্য, চিন্তার মধ্যে আরো কান্তিমান, আরো দীর্ঘ হয়ে উঠেছে সেই মানুষটির দেহ। নিশি সেদিন চূড়ান্ত বিপন্ন হয়ে নিজেকেই ভাবতে শুরু করেছিল নষ্টা। এরপর বিশাল পৃথিবীতে নেমে সে তার পাপ-পুণ্যের কোনো সূত্রই আবিষ্কার করতে পারে নি, কোন নির্দিষ্ট ইস্যুকে কেন্দ্র করে তওবা চাইবে সে ? তার মাথার ওপর কি আদৌ ঈশ্বর আছেন ? প্রায়শ্চিত্ত করার মতো সে কী করেছে ?

কিন্তু কাল রাত্তিরে, সবকিছুর পরেও স্বাতী বড় মর্মান্তিক ঘা দিয়েছে তাকে। কোনো একজন নারীর সাথে আফজালের সব সম্পর্কের কথা, এ শুনলে হয়তো ঈর্ষায় প্রাণ ফেটে যেতো, হোক তাদের দূরত্বের সম্পর্ক ছিল। দাম্পত্যজীবনে এরপরও দু'জনের মধ্যে একটা অদৃশ্য অধিকারবোধ থাকে, নইলে আর এক ঘরে সংসার করা কেন ? সেই অধিকার বোধ থেকেই সবকিছু ছাপিয়ে সূক্ষ্ম নাড়িতে এক জঘন্য আঘাত লাগে। কিন্তু বেশ্যাপাড়া ? না, আফজালের রুচির সাথে এ কিছুতেই মেলে না। আর এসব করে প্রতি রাতে একজন মানুষ এই রকম সুস্থিরতা নিয়ে তার সাথে ঘুমুত ? সে এতোদিন সংসার করে, তার এরকম কোনোকিছুর চিহ্নমাত্র দেখতে পেল না ? অথচ তর জিম্মায় কিনা সে হিরণকে ফেলে এসেছে ? নিশি নিজেকে ক্ষমা করতে পারে না। সত্যিই সে আত্মমুগ্ধ। অন্যকে চেনার ন্যূনতম ক্ষমতা তার নেই। তাহলে এখন মাথা টান করে তার সামনে দাঁড়ানো যায়, আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয়ার সাহস তুমি কোত্থেকে পাও ?

এরপর নাজুক প্রসঙ্গগুলো আসবে, আফজাল বলবে, আমি তোমারটা খাই না পরি ? শেষ পর্যন্ত একটা মীমাংসা হয়তো হবে। কিন্তু যে মেয়েগুলো প্রতিদিন নোংরা মাংস বিক্রি করে বেঁচে থাকতে বাধ্য হয়, তাদের দেহের সেই প্রাণঘাতী উত্তাপ নিয়ে আফজাল তাকে স্পর্শ করবে, তার ভেতরে সন্তানের ভ্রূণ স্থাপন করতে চাইবে ? রিকশায় বসে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে নিশি। অসম্ভব! এরপর নিজের সম্পর্কে সুস্থির একটা সিদ্ধান্তে আসা যায়, প্রয়োজন হলো একলা বাঁচার। নিজেকে সে সেই ধাঁচেই তৈরি করতে চায়, এবং এজন্য সবার আগে প্রয়োজন মার সাহায্য। শরীরের ঘা শুকিয়েছে। নিজের দেহে মানুষ আর কত গভীরভাবে আঁচড় বসাতে পারে ? আফজাল সম্পর্কে এইসব শোনার পর নিজেকে নিয়ে গ্লানির ভার কমে আসছে। এখন সে যদি আমার পথ না-ও মাড়ায়, আমার বাঁচতে কষ্ট হবে না। নিশি তিনটি সমান্তরাল বাতির দিকে চেয়ে ভাবে, এখন, সেই রাতের ধাক্কা সামলে আমি অনেকটা সুস্থির। যত কষ্ট হোক বাবা-মা'র, সন্তানের বিপর্যয়ের ভার তাদেরকেও কিছুটা সহ্য করতেই হবে। জীবনের সব কি ছক বেঁধে হয় ? রিনির জীবন ছকের বাইরে হবে বলে আমার জীবন ফিটফাট চৌকশ থাকবে ? অবশ্য বাবা ভেঙে পড়বেন। যাতে সে অবস্থা না

হয় তার জন্য একটু সাবধান হতে হবে। এগুতে হবে একটু বুদ্ধিমত্তার সাথে। রিনির এলোমেলো হয়ে থাকা জীবনটাকে ঠিক করার চেষ্টা করা যেতে পারে। তার ধনী শ্বশুরের কাছে গিয়ে, তাকে যতদূর সম্ভব বুঝিয়ে, না, কাঙালের মতন নয়, নিজেকে যথেষ্ট উন্নত রেখেই। সবই করতে হবে অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে।

রিক্শা যখন মালিবাগের পথে, নিশির সারা শরীর কাঁপিয়ে একটা প্রশ্ন ঘাই দিয়ে মাথা তোলে, সে রাতে রেজা ভাই ওই কাণ্ড করেছিল কেন ? আফজাল কি সত্যিই স্বাতীর প্রতি... ?

বড় বিচিত্র, বড় রহস্যময় মানুষের চরিত্র!

বাসায় ঢোকার সময় নিশির মধ্যে অদ্ভুত এক সাহস কাজ করে, একদিনের অসহনীয় অভিজ্ঞতা তার ভেতরে অন্য এক বোধের জন্ম দিয়েছে। এমন কি আর অপেক্ষা করতে পারে, যা আমার সহ্য হবে না ? সে নিশ্চিত ছিল, আফজাল পরদিন হিরণকে তাদের বাসায় দিয়ে গেছে। অথবা সেদিন রাত্তিরেই এবং তাই নিয়ে নিশ্চয়ই একচোট নাটক হয়ে গেছে এ বাড়িতে।

ঘরে ঢুকে দেখে অন্য দৃশ্য, বাবা আর মা পানের খিলি মুখে পুড়ে অনির্বচনীয় হাসিতে মেতে উঠেছেন। এই দৃশ্যে অভিভূত নিশির পা থমকে যায়। মা বলেন, নিশি, তুই ? অনেকদিন বাঁচবি। আজই তোর ওখানে যেতাম। তোর বাবা বলছিল এক্ষুণি তোকে ফোন করতে। গতরাতে, বুঝলি, বোস, কাছে এসে বোস, আমি রান্না ঘরে। বাড়ির সামনে দেখি গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। তোর বাবা তো অবাক, চশমা চোখে চাপিয়ে জানলা দিয়ে দেখে, মিষ্টি-টিষ্টি নিয়ে ওরা আমাদের বাড়িতেই ঢুকছে। বুঝলি, রিনিকে ওরা তুলে নিয়ে গেছে। এমন আচমকা ঘটনাটা ঘটল, আমি যে কী করি, কোথায় বসতে দিই। বিরাট বড়লোক, হলে কী হবে ফেরেশতার মতন মন...। নিশির ভেতরটায় ফুর ফুর করে অদ্ভুত এক বাতাস ঢোকে। সে মায়ের পায়ের কাছটায় বসে পড়ে, মা বড্ড ঘুম পাচ্ছে। কতদিন ঘুমাই না!

সেই সন্ধ্যায় সে আলোকোজ্জ্বল এক বইয়ের দোকানের সামনে যায়।

ঘুরতে ঘুরতে খোঁজে, জাহিদুর রহমানের কোনো কবিতার বই আছে ? ভেতরে অন্য ধাক্কা, বেশ মনে পড়ছে, ফুচকা খেতে খেতে সাজিদুল পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল, এ হচ্ছে মুসতাফা, ব্যবসা করে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে হট লাইন, আমার চাকরিটা ওর সোর্সেই হয়েছে।

সেদিন, সে যখন নিজেকে নিয়ে বিপর্যস্ত, তার প্রাণের আন্তরিকতা নিশির ভেতরটা ছুঁয়ে গেছে। জাহিদের বই, এ-ও নেহাত উপলক্ষ নয়। বইয়ের সাথে নিশির অনেককাল যোগযোগ নেই। জাহিদ এত ভালো লেখে! কবিতা নিয়ে তার এত উচ্ছ্বাস। কেউ তাকে চেনে না ? একটা বই পর্যন্ত বেরোয় নি ?

ঘুরতে ঘুরতে নিশি যখন রিকশার কাছে, ভদ্রলোক তখন গাড়ি থেকে নামছেন, আরে আপনি ?

নিশি বিব্রত মুখে হাসে, যেন সে তার কাছেই এসেছে আর সেটা যেনো ধরা পড়ে গেছে। সে নিজেকে ছাই চাপা দিতে গিয়ে বলে, অনেকক্ষণ ঘুরেছি, আসলে এদিকে আসা হয় না। একটা বই খুঁজলাম, পেলাম না। আপনি দেখছি রোজই আসেন?

এখানে আমার বইয়ের দোকান, আমি আসব না?

সে-কী, আপনার দোকান এখানে? আর আপনি ফুটপাতে বসে ব্যবসা চালান?

ভাড়া মিটিয়ে হাসতে হাসতে মুসতাফা বলে, এজন্যই তো সব চাঙ্গে উঠছে। ভাব আর ব্যবসা এক সাথে হয়? আমি অর্ধেক সময় ডুবে থাকি ভাবে, অর্ধেক সময় ব্যবসায়। তা কার বই খুঁজছিলেন?

বলে লাভ নেই। নিশি বলে, তাকে যে চিনবেন সে-রকম কিছু না সে, আমি মার্কেট ঘুরেই বুঝতে পেয়েছি।

আপনার কি খুব তাড়া আছে?

নিশির আবারও বিব্রত হাসি, কেন?

দোকানটায় একটু বুঝিয়ে দিয়ে এসে কোথাও চলুন বসি, না আজ ফুটপাতে বসব না। সেদিন থেকে আপনার ব্যাপারে দারুণ কৌতূহল। আপনার আপত্তি নেই তো?

না, না। ঠিক আছে, আপনি আসুন। আমি অপেক্ষা করছি।

অনেক বড় মাঠ।

তারপর নদী।

কালো জল সাঁতরে মাথা তুলতেই ঘুড্ডি, ঘুমের মধ্যে নিশি হেসে ওঠে। কারা যেন দৌড়োয়। প্রাণ ফাটিয়ে ছুটে পেছনে ফিরে দেখে। ওমা, এ যে বেড়াল! চামড়াটা তার এমন, যেন হরিণছানা। হেই... হেই, একটা বুড়ি বেড়ালকে খেদিয়ে কী সব হিবিজিবি শ্লোক বলে। সাঁকো পার হয়ে বুড়ির বাড়ি, সে পার হতে থাকে। কে যেন এসে হাত ধরে, ওই যে বেড়ালের বাচ্চা, এ বুড়ির গর্ভজাত, পালাই পালাই। তারপর শহর। রোদ্দুরে দেখে মুখ, এ কত চেনা! চাপ দাড়ি, ফরসা ত্বক। ধুর। তুমি শ্যামলা হলে না কেন?

সেই মুখ বলে, ফের কথা? ওই দেখো জুজুগাড়ি, পালাই পালাই।

কত যে দেয়াল টপকায়, ছাদ লাফিয়ে পেরোয়, পেরোয় কাঁটাবন, তারপর সেই মুখটিকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

ঘুম ভাঙলে নিশি দেখে, পর্দা গলিয়ে ঝাপসা আলো আসছে। আমি কোথায় ঘুমুচ্ছি? ভাবতে ভাবতে ফের ঢলে পড়ে।

আবার সেই স্বপ্ন।

ফুচকা খাচ্ছে নিশি। সেই মুখ, তুমি মুসতাফা না? আমার ঘুড্ডি চুরি করেছিলে। সে হাসতে হাসতে কী সব উড়িয়ে দিল, ঘুড্ডি হয়ে গেল। নিশিকে সে বলল, বন্ধুরা আমাকে প্রশ্ন করেছে, দুটো টিকেট কেটেছিস কেন? আমি বলেছি, বউকে নিয়ে ট্রেনে করে ঢাকা যাচ্ছি।

তুমি তো আমাকে বিয়ে কর নি। বউ বললে কেন?

ওই যে তোমার স্যান্ডেলের ফিতে ছিঁড়ে গেল, সেই মুহূর্তেই বিয়ে হয়ে গেল। প্রাণের মধ্যে যে সারাক্ষণ থাকে, সে-ই তো বউ, না?

চারপাশে সকাল।

অদ্ভুত এক বিমর্ষতা নিয়ে ঘুম ভাঙে নিশির। কিন্তু পাশ ফিরতেই আবার ঘুম, ফের প্রায় একই স্বপ্নের পুনরাবৃত্তি।

নিশি দেখেছ, কী জোরে ট্রেন যাচ্ছে!

আমার ভয় করছে।

দূর! ভয় কিসের। চলো দেশ ছেড়ে যাই। কী তীক্ষ্ণ চেহারা তোমার। আরে! আরে! ওই দেখো, কীভাবে এগিয়ে আসছে আরেকটা ট্রেন! কী সাংঘাতিক, নিশি পড়ে যাচ্ছি।

এবার মায়ের ধাক্কা, নিশি, ওঠ, বাইরে রোদ উঠে গেছে। এমন পাগলের মতো কেউ ঘুমোয়?

ধারাবাহিক স্বপ্ন। ঘুম ভাঙার পর জানলা দিয়ে ঠিক্‌রে আসা আলোকে মনে হচ্ছিল জ্বলন্ত জল। নিশির সমস্ত দেহের রোমকূপ ভিজে ওঠে। এরপর বিষণ্ণতা। বুকের মধ্যে আকুল হয়ে জেগে ওঠে মুসতাফার মুখ। আশ্চর্য! ওকে নিয়ে মনের মধ্যে কখনো তো কিছু হয় নি? আর এই আধভাঙা মনে এখনো কেউ এমনভাবে ছাপ ফেলতে পারে? স্রেফ একরাতের স্বপ্নের কারণে? এরকম ধারাবাহিক স্বপ্ন নিশি মাঝেমধ্যেই দেখে। যে জিনিস মনের কোথাও এক বিন্দু ছাপ ফেলে না, সারা রাতের স্বপ্নে সে-ও হয়ে ওঠে অনির্বচনীয়। সেই স্বপ্নও নিশি ঘুম ভাঙার পর আবার ঘুমিয়ে বারংবার দেখে।

কিন্তু ওই সন্ধ্যায়, সে তখন ছিল বিপর্যস্ত, মুসতাফার আন্তরিক আচরণ হয়তো নিশির কোথাও গভীর দাগ কেটেছিল। নরোম ক্ষত স্থানে ছাপ পড়ে দ্রুত, এ হয়তো অনেকটা এ কারণেই। নিশি টের পায় নি। আর নিজের কাছে সত্য বলতে দ্বিধা কী? সেই সন্ধ্যায় ফুটপাতে বসে অমন একজন চৌকশ সুন্দর মানুষকে চা খেতে দেখে নিশির ভেতরের বয়স উদ্বেলিত হয়েছিল। নিশি মোহগ্রস্ত হয়েছিল অজান্তেই। তখন অনুভব করে নি, যা তীক্ষ্ণ চেহারা আপনার! পরে নিজের মধ্যেই বিষয়টা সহজ হয়ে এসেছে, ফলে সরলভাবে নিশি পড়ে গিয়েছিল ধান্দায়, মুসতাফা যদি একটা কাজ, না, পরের দিনের আলাপচারিতার সময় কথা আর সঙ্কোচে বলা হয়ে ওঠে নি।

মা-কে সব বলেছে।

প্রায় সব, শুধু সাজিদুল ওকে নগ্ন করেছিল, ওই জিনিসটা বাদ দিয়ে, মার হয়তো সন্দেহ হবে, সাজিদুল নিশিকে সবটুকু স্পর্শ করেছে। সে বলেছে, মা, ছুরি দিয়ে আমাকে ভয় দেখিয়ে।

না না কিচ্ছু করে নি, বলেছিল, নড়লে মেরে ফেলবে। মা তুমি বাবার কাছে আমাকে সেইফ করো। আমি জানি না আমি কী করব?

মার মুখ অন্ধকার হয়ে এসেছিল, তাই তো, সেদিন রাত ন'টার দিকে আফজাল এলো। ভারি চালাক ছেলে। আমি বললাম, নিশিকে আনোনি কেন? বলল, এদিক দিয়ে যাচ্ছিলো, এখন বেশ বুঝতে পারছি। আসলে তোর খোঁজ নিয়ে গেছিল। কিন্তু তোর বাবাকে যে কীভাবে বোঝাই। সবে একটা ধাক্কা সামলে উঠেছে।

নিশির চোখে ট্রেন, মুসতাফার মুখটা বুকের একদম তলায় এমন বেদনা কাঁপিয়ে তুলছে, যেন বেদনা নয়, গুচ্ছ গুচ্ছ ফেনা। এরপর নিজের ওপর কেমন ধিক্কার জন্মে, কেন তোর স্বপ্ন মরে না? সব পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে কী করে মুহূর্তে জন্মায় নতুন ঘাস? কাউকে দেখার পর অভিভূত হয়ে যদি অন্য কোনো কারণে মৃত্যুবরণও তুই করিস, তাহলেও তার উপস্থিতিতে তোর শবদেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠবে, তুই এই-ই। আসলে এ জন্যই কোথাও তোর সুখ হয় না।

এ এক রাতের স্বপ্নের ঘোর। তারপর নিশি এলিয়ে পড়ে। একজন অচেনা মানুষকে স্বপ্ন তার মধ্যে তীব্রভাবে ফেনিয়ে তুলছে। সেদিন অবশ্য তাকে দেখে, সেই আবছা ফুটপাতে, জাহিদের আদল তার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। মুসতাফার অভিব্যক্তি, জাহিদের ছায়া সব মিলিয়ে বড় বিষণ্ন হয়ে উঠেছে দিন। এরচেয়ে মর্মান্তিক আফজাল সম্পর্কে স্বাতীর সেই সব বিশ্লেষণ! নিশি এসব ঘোর থেকে ছিটকে বেরোয়, মা যখন বলেন, তুই ওর কাছে গিয়ে ক্ষমা চা।

মা, তুমি কোনোকালে আমাকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শেখালে না, নিশি আবার গভীর গাড্ডায় ডুবে যায়, আমি কী অপরাধ করেছি? সেইরাতে কিচ্ছু না শুনে তার স্ত্রীকে সে মাঝরাতের রাস্তায় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল। মা, আমি যতই অপরাধ করি, অমন বিপজ্জনক একটা রাতে, মানুষ তার চরম শত্রুকেও এমন বিপদের মুখে ঠেলে পাঠাতে পারে? মা তুমি সারাজীবন চাকরি করেছ ঠিকই; কিন্তু...

নিশি, তুই একবার তোর বাবার কথা ভাব, এই মানুষটা যে মরে যাবে!

কেন মরে যাবে? নিশি উদ্ধত মাথা তোলে, আত্মসম্মানের ভয়ে? না আমার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল বলে?

তোর বাবা তোকে বড্ড ভালোবাসে নিশি। সে এসবের কিছুই সহ্য করতে পারবে না। আমি না হয় কিছুদিন সামলে ছিলাম। তোর দিক থেকে ভেঙে দেয়ার মতো কিচ্ছু ঘটে নি। আমি শাদা মাথায় সেটা বুঝছি। তারপরও বলছি, তুই ওর মুখোমুখি হয়ে দেখ। যদি ভাঙতেই চাস তাহলে আর ভয় কী, নিজের কাছে অন্তত পরিষ্কার থাকলি। না, আমি ঠিক এও ভাবতে পারছি না। নিশি, দেখ কী করা যায়! আসলে সংসার অনেক কঠিন জায়গা। একে অনেক কষ্টে গড়তে হয়। অনেক ক্ষতির বিনিময়ে একে টিকিয়ে রাখতে হয়।

তারপর ক্রমাগত আত্মানুসন্ধান, আসলে আমি নিজে কী চাই? এখনো তো ওই ঘরের আসবাব, সারাদিনের নিরাপত্তা, ওই ঘরের সুই পর্যন্ত, কোনোকিছুতে মায়া কাটাতে পারি নি। এখনো মনে হচ্ছে এ একটা সাময়িক অবস্থা। ওখান থেকে চিরকালের জন্য বেরিয়ে আসতে চাওয়ার মতো শক্তি আমার কই? আমি কি ন্যূনতম প্রস্তুত সেই যুদ্ধের জন্য?

নিশি পথে বেরোয়।

কঠিন জায়গা! আমি কি সেটা বুঝতে পারছি না? এখানে সহজভাবে থাকার জন্য কত কষ্ট করতে হয়! কত ভান-চাতুরীর আশ্রয় নিতে হয়। আমি আফজালের অনুভূতির শেষ জায়গায় আঘাত লাগার মতো কিছু করি নি। আমার মন এই দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে প্রচণ্ড শূন্যতায় হাহাকার করে উঠেছে। আমার স্মৃতি, আমার স্বপ্ন গহন নিভৃতে আমাকে ভেঙেছে, গুঁড়িয়েছে। নিজের যৌবনোচ্ছল সময়কে কখনো অভিসম্পাত করেছি কিন্তু তারপরও নিজেকে কোনো ভাসমান রোমাঞ্চে ছেড়ে দিই নি।

আমি আমার সমাজ ব্যবস্থার কথা জানি। দাম্পত্য সম্পর্কের কিছু মৌলিক চুক্তির কথা জানি। তারপরও আমার সর্বঅস্তিত্ব এক সঙ্গেই গ্রাস করেছে সন্ধ্যার সেই চাপ দাড়িঅলা লোকটি, নিজেকে বাঁচাতে পারলাম কই? সেই কুয়াশা, সেই আলো, তখন বুঝতে পারিনি কিন্তু এখন টের পাচ্ছি, অদ্ভুত এক বোধ তৈরি করছে আমার মধ্যে। নিজের এই অবস্থায় জেদ হচ্ছে— ভাসিয়ে দিই নিজেকে, আমার আর হারাবার কী আছে? হতে পারে এ নিছক আমার পাহাড় কেটে বানাতে চাওয়া স্বপ্ন, আমি চাইলেই কেন আমার পতনের, আমার সাথে একত্রে স্বপ্ন নির্মাণ করতে চাওয়ার সঙ্গী হতে চাইবে সন্ধ্যার সেই যুবক? এ-এক স্বেচ্ছাচারী জেদ, কিন্তু আমি তার চোখে আমাকে কেন্দ্র করে যে বিন্দু আলো দেখেছি, এ-কে প্রলম্বিত করার পথে এগিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু আমি সেসব বোধ জলাঞ্জলি দিয়ে সত্যিকারভাবেই তার কাছে চাইতে গিয়েছিলাম একটা কাজ।

যখন আমার দেহ-মন বিক্ষত, অন্ধকার পথে যখন আমাকে বেরিয়ে আসতে হলো, এই পৃথিবীর শুকনো পাতাটি পর্যন্ত যখন জানল না, কী করে একটি মেয়ে রাক্ষসের মতো হিংস্র শীত মাথায় নিয়ে বিস্তৃত মসজিদের মেঝেয় নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল। তখন আমি অন্ধ জেদে নিজেকে পতনের শেষ প্রান্তে নিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু আমার নিজের মূল্য আমার কাছে অনেক বেশি। অন্য যে কারুর অবিচারে একে কিছুতেই নষ্ট করার কোনো অধিকারই আমার নেই।

কেন আমি ক্ষমা চাইব?

রিকশায় বসে নিশি হুড খুলে দেয়। কোমল রোদে শিরশির করে ওঠে ত্বক। তারপর ট্রাফিক জ্যাম।

আমি মিথ্যা বলেছি। হ্যাঁ, তাকে আমার জীবনের বেশির ভাগই আড়াল করেছি। সে আমাকে এজন্য কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারে। কিন্তু আমার যা সত্য, আমার যা বাস্তবতা, সে যদি সেটা জানত? তার ভেতর থেকে সে কি নির্দোষ আমাকে বের করে নিতে পারত? এসব বিষয়ে তার যা মানসিকতা, তার যা সহ্যের দৌড়, আরো মারাত্মক হয়ে উঠত সবকিছু। সে নিশ্চিত হয়ে উঠত, সংসারের বাইরেও আমি পুরনো মানুষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে যাচ্ছি। বরং যা শাদা, যা স্পষ্ট, কল্পনা দিয়ে তার মধ্যে মেশাত হাজার রঙ, সে সেই জ্যোতিশ্চক্রে ঘুরপাক খেয়ে ভাবত, এ থেকে আসল জায়গাগুলোই আমি লুকোচ্ছি। নিশির শরীর কেঁপে ওঠে। আর সে নিজে? কী নিখুঁত অভিনয়ে, কী দক্ষ পারদর্শিতায় তার চরিত্রের এমন একটি দিক আমার কাছে আড়াল করে রেখেছে। তার এই মুখোশের রঙ আমার চেয়েও কারুকার্যময়, গভীর, কিন্তু সরল সুতো দিয়ে তৈরি। সময়মতো ঘরে ফেরে, কোনো বাজে

আড্ডায় না গিয়ে, কোনো বাজে নেশার প্রতি আসক্তি প্রকাশ না করে নিজের একটা ভালোমানুষী ভাবমূর্তি আমার সামনে বজায় রেখে আমার প্রতিটি দিনের হিসেব নিয়েছে, নিশি অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। স্বাতী হেসে বলছিল, এসব অভ্যেস যাদের থাকে, সময় বের করে নেয় এরা সাবধানতার সাথে। যারা বোকা, তারাই বেশি সময় বাইরে থেকে সংসারে নিজেদেরকে সন্দেহযোগ্য করার সুযোগ করে দেয়।

দুঃসংবাদ যে বয়ে নিয়ে আসে সে-ও তেমন অসহনীয় হয়ে ওঠে! সেই রাতের পর থেকে স্বাতী ও নিশি ভেতরে ভেতরে ক্রমশ পরস্পরের কেমন শত্রু হয়ে উঠেছে। স্বাতী তর্জনী তুলে দেখিয়ে বলেছে, আমি ঘর ছেড়েছি কিন্তু তোমাদের মতো ফাঁপা শূন্য আপোসকামী নই।

রিকশা বাঁয়ে ঘোরে।

আচ্ছা আমি আফজালের দিকটা ভাবছি না কেন ? ঠিক আছে, মানছি, সেই রাতে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয়াটা ছিল তার একটা অন্ধ ক্রোধের প্রকাশ। কিন্তু সে অতো রাত অব্দি দাঁড়িয়েছিল ল্যাম্পপোস্টের নিচে! বাচ্চা যখন লুকিয়ে থেকে মাকে চরম কষ্টে ফেলার পর সামনে এসে দাঁড়ায়, দুশ্চিন্তার আঘাতে তাকে মর্মান্তিকভাবে ভুগতে হলো বলে মা খুশি হওয়ার বদলে উল্টো চড় দেয় না তার গালে ? কে জানে কত জায়গায় ঘুরেছে আফজাল ? পুলিশ স্টেশন, হাসপাতাল, আমাদের বাসায়ও তো গিয়েছিল। রাতভর গলির মাথায় দাঁড়িয়ে কেউ যদি দেখে তার স্ত্রীকে অন্য কেউ নামিয়ে দিয়ে বলছে, তোমাকে ঘরে পৌঁছে দিই, তখন তার সেই অনুভূতি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হলে খুব কি দোষ দেয়া যায় তাকে ? নিশি অসহায় বোধ করে, বিষয়টা এভাবে সে ভাবতে চায় না। কিন্তু তারপরও এই প্রথম একটা উল্টো স্রোত তার মনের বিরুদ্ধেই তাকে এক অদ্ভুত যুক্তিতর্কের মধ্যে ফেলে দেয়। দীর্ঘ সময় পর এক পর্যায়ে দরজা খুলেছিল আফজাল। কী এক তীব্র ভয়, মর্মান্তিক অপমান বোধ আমাকে তখন নামিয়েছিল রাস্তায়। দরজা তো এক সময় খুলেছিল সে, হয়তো প্রাথমিক ক্রোধটা সামলে ওঠার পরই, নিশি অসাড় হয়ে ওঠে। হয়তো সে অনুতপ্ত হয়েছিল, কিন্তু উল্টো তাকে ভয় পেয়ে আমি দৌড়ে রাস্তায় নেমে এসেছিলাম। নিশি নখ খোঁটে, তা-ই যদি হবে, পরে সে আমার খোঁজ নিল না কেন ?

সাজিদুল! এখন ওই নামের মধ্যে দলা দলা বিষ। মনে পড়ে, অন্ধকার পথে রিকশায় যখন তাকে বলছিলাম, আমি আমার শরীর কেটেছি। আমার সর্বনাশ আমি করব। তুমি এমন কাপুরুষের মতো কাঁদছ কেন ?

সে ফুঁপিয়ে উঠেছিল, মানুষকে শাস্তি দিতে চাইলে এরচেয়ে বড় পদ্ধতি আর হয় না। এই ব্লেডের দাগ যদি আমার গায়ে বসাতে, নিজের সর্বনাশ না করে আরো থুথু দিতে আমার মুখে, আমি কিছুটা হলেও মুক্তি পেতাম। এখন আমি কী করে বাঁচব বলো ?

ওই খুনি হয়ে ওঠা মানুষটার পর মুহূর্তেই নেড়ি কুকুরে রূপান্তর, নিশির চোখ ভিজে ওঠে, হ্যাঁ এখন আমি ওকে এইভাবেই ভাবছি। ও আমার জীবনের জঘন্য এক রাহুগ্রস্ত অধ্যায়। হ্যাঁ, সে ওই প্রাণীতেই রূপান্তরিত হয়েছিল। যা ওর প্রতি আমার ঘৃণাকে আরো প্রবল করে তুলেছিল।

আর জাহিদ ? যখন টেনে জ্বর উঠল, বলছিল, আমার বাবাকে, নিশি, পৃথিবীর কেউ জানে না, একমাত্র তোমাকে বলছি, এত কষ্ট হচ্ছিল ওঁর, শুধু ওই অবস্থা থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য আমি ওর মৃত্যু চেয়েছি, জাহিদের চোখ ভিজে উঠছিল, কাউকে মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেয়া কি পাপ! সে কি এই স্বীকারোক্তির জন্যই আমার কাছে এসেছিল ? এত বছর পর আমাকে তার এমন পতন দেখতে হলো ? কেন সে এভাবে এসেছিল ? এই পৃথিবীতে আমার জন্য কোনো বৃক্ষছায়া নেই। আমাকে একা বাঁচতে দেখলে আঁউ মাঁউ করে এগিয়ে আসবে নেকড়েরা ? সাপ, ভল্লুক, সিংহ নয়, আমি তো ত্রিভুবনে ভয় পাই একমাত্র মানুষকেই। তাহলে দাঁড়াচ্ছে কী ?

খুলে যাচ্ছে অবারিত সিঁড়ি, কাচের মতো ঝকঝকে।

বড্ড অসময়ে আসা, তারপরও নিশি বেল টেপে। তার অন্যমনস্ক মাথায় ছায়া ফেলে প্রশ্ন, সত্যিই কি জাহিদ তার বাবাকে... ? না, এ ছিল ওর বিকারগ্রস্ততা। জানাও হলো না, দেবতার মতো ওই মানুষটার পরিণতি আসলে কী হয়েছে ?

চাচারা বদলি হয়ে আসার পর জাহিদদের শহরে তার তো আর যাওয়ারই সুযোগ ঘটল না। দরজা খুলছে না। আশ্চর্য! স্বাতী বাড়ি নেই! তাহলে তো তালা দেয়া থাকত! নিশি ফের বেল টেপে।

বেশ কিছুক্ষণ পর দরজা খোলে, স্বাতীই, বোঝা যায় কোনো একটা অবস্থা থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে নিশ্চিত পরিপাটি হয়ে এসেছে। কিন্তু নিশিকে দেখে বাইরের উচ্ছ্বাসটা দেখাতে ভোলে না। তুমি ? আমি অভদ্রলোককে ভেতরে ঢুকতে দিই না।

সেদিন না বলে গিয়েছিলাম, দুঃখ প্রকাশ করতে এসেছি।

ড্রয়িংরুমে বসে এরপর কেউ কথা খুঁজে পায় না। গ্লাসটেবিলে পড়ে আছে— 'বার্ধক্য রোধে পঞ্চাশটি উপায়।'

স্বাতী হাসে, যেন কৈফিয়ত দিচ্ছে এই ভঙ্গিতে, পুরনো একটা সংখ্যা দেখছিলাম। তারপরই কি এক অজানা কারণে সে ইতস্তত করতে থাকে। নিশি বলে, তোমার কাপড়গুলো ফেরত দিতে এলাম। মার সাথে মার্কেটে গিয়ে দু'সেট কিনে এনেছি।

মার কছেই আছ বুঝি ?

শেষ পর্যন্ত চলেই গেলাম। আর কোথায় যাব বলো ?

বিশাল পেইন্টিং, কত যে রঙের কারসাজি, ভেতরের সত্য আবিষ্কার করতে চোখে ঘোর লেগে যায়।

নিশি, আঙুলে ওড়না জড়িয়ে কিছু বলতে চায় স্বাতী, আমি আসলে কীভাবে যে বলব...। ওর এইরকম অস্বস্তির মাঝখানে হে হে করতে করতে ভেতর থেকে বেরিয়ে আসেন একজন ভদ্রলোক। মুহূর্তে নিশির মাথায় খেলে যায় স্বাতীর সেই মদের গেলাসের কসম, সে আমার আঙুলের ডগাও স্পর্শ করে নি— নিজেকে সামলে সে দাঁড়ায়। স্বাতী হাসতে হাসতে বলে, আশা করি পরিচয় দিতে হবে না!

আপনিই বুঝি সেই ঘর-পালানো... বলতে বলতে ভদ্রলোক কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসেন, আপনাদের মেয়েদের স্বভাবই বুঝি এই, এক স্বামীর ঘরে টায়ার্ড হয়ে পড়েন? কিছু মনে করবেন না, আমি কিন্তু এভাবেই বলি, মানে মেয়েদের সাইকোলজি বিশ্লেষণ করে আমি যা পেলাম... যাহোক সবকিছু সরাসরি বলাই ভালো। হে হে, সেটাই সবচেয়ে অকৃত্রিম, কী বলেন?

নিশি লাল হয়ে ওঠে।

ঘরের হাওয়া মুহূর্তে গুমোট হয়ে ওঠে। মাথায় মস্ত টাক, থুতনির দিকটায় চামড়া কেমন ঝুলে পড়েছে। বসন্তের দাগ ভর্তি নাক, সবচেয়ে বিশ্রী চাউনি। নিশির ভেতরে তৈরি হওয়া মূর্তির এত দ্রুত ভাঙন তার বাকরুদ্ধ করে দেয়। সহসা সে সহজ হতে পারে না। এই সেই স্বাতীর বিশাল ব্যক্তিত্ব! নিশি কী বলবে বুঝে পায় না। স্বাতী ছটফট করে দাঁড়ায়।

তোমার যেন কোথায় যাওয়ার ছিল?

বান্ধবী পেয়ে ভাগাতে চাইছ? তারপর তিনি নিশির দিকে ঘোরেন, ম্যাডাম, আপনি যদ্দিন ছিলেন আমি কিন্তু আপনাকে ডিসটার্ব করি নি। এসেছেন, ভালোই হয়েছে। দেখেন তো কী কাণ্ড! ঝোঁকের মাথায় কেউ ঘর-বাচ্চা ফেলে বাইরে বেরিয়ে আসে? আমি শুরু থেকেই জানি ব্যাপারটা, এখানে ওর জেদটাই বেশি কাজ করেছে, বান্ধবীকে আপনি একটু বোঝান তো! এদিকে আমার স্ত্রীও বিছানা নিয়েছে। যদি মরেটরে যায়! আপনাকে কী আর বলব, এই বয়সে, একটু ভয়ই করে। আপনার বিষয়টা আমি জানি না। এ নিয়ে মন্তব্যও করব না। কিন্তু সন্তানের জীবনের চেয়ে যে নিজের জেদকে প্রাধান্য দেয়...।

স্বাতী চেঁচিয়ে ওঠে, তুমি চুপ করবে! আমি চিরদিন তোমার এখানে থাকতে আসি নি।

ভদ্রলোক সোফায় আয়েস করে বসেন, তোমার সব রকম অধিকারই আছে। তুমি আমার এখানে এসেছ। আমি তোমাকে অপূর্ণ রাখি নি। তোমার জন্যই ভাড়া করেছি এই ফ্ল্যাট। তোমার যতদিন ইচ্ছে, থাকবে, আমাকে যদি অসহ্য ঠেকে, চলে যাবে। কিন্তু তুমি তোমার একলার জেদে এতগুলো জীবন নষ্ট করতে পার না। তোমার ছেলেদের জীবনের বিষয়টা তোমার। কিন্তু আমার স্ত্রী, এতদিনের দাম্পত্য জীবন, তার বিষয়টা দেখার দায়িত্ব আমার। আমি বলতে চাইছি, তোমার উচ্চভিলাষটা লাগামহীন না হলেই ভালো।

নিশির হাত ঠেসে যায় সোফার হাতলে।

ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে স্বাতীর মুখ। কিছুক্ষণ পর ভদ্রলোক দাঁড়ান, দুঃখিত আমি যদি আপত্তিকর কিছু বলে থাকি। আমি আগেই বলেছি, সবকিছু সরাসরি হওয়া ভালো, কী বলেন আপনি? বলে নিশির দিকে তাকান, এখন আপনাকে বলছি ম্যাডাম, মাথা থেকে ঘর পালানোর ভূতটা ঝেড়ে ফেলুন। একবার যে মেয়ে ঘর থেকে বেরোয় সমাজে তার কোনো মর্যাদা থাকে?

বিশাল ট্রের মধ্যে গড়াতে গড়াতে নাশতা আসে।

কাজের ছেলেটি সব টেবিলে নামিয়ে চলে গেলে সুসজ্জিত ড্রয়িং রুমে কবরের স্তব্ধতা নেমে আসে।

নিশি নিজেকে ছাপিয়ে হাওয়া পাল্টাতে চায়, তখন তুমি যেন কিছু একটা বলতে চেয়েছিলে?

স্বাতী এমনভাবে নিজেকে টেনে তোলে, যেন কচ্ছপ গ্রীবা বাড়িয়েছে। তার পাণ্ডুর ঠোঁট নড়ে ওঠে, তোমার সামনে কিছুই আর গোপন থাকল না। সবকিছু নিয়ে আর ভান করে কী লাভ বলো. বিশ্বাস কর, আমার ভীষণ কান্না পাচ্ছে। এরপর শ্বাস টেনে নিজেকে সামলে স্বাতী বলে, আমার প্রসঙ্গ বাদ দাও, সে রাতে তোমাকে একটা বিচ্ছিরি মিথ্যে বলেছিলাম। বলেছিলাম সবটাই সত্যি, শুধু একটা মিথ্যে। ওই যে আফজাল ভাইয়ের পতিতালয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা। ওটা রেজার অভ্যাস, আফজাল ভাইয়ের নয়। কী এক ঈর্ষা থেকে, যন্ত্রণা থেকে মনে হচ্ছিল, তুমিও যখন বেরিয়ে এসেছ, তোমার সংসারটাও ভেঙে যাক। বিশ্বেস কর, এরপর থেকে নিজেকে এতো নীচ মনে হচ্ছে! স্বাতী হু হু কান্নায় ভেঙে পড়ে, তুমি জানো না, এক সময় আমি তোমাদের কত কল্যাণ চেয়েছি। তোমাকে নিয়ে আফজাল ভাই অসুখী, আমাকে বলত। বলত, তোমার সাথে তার কোনো প্রাণের যোগ নেই. আমার প্রতি, আজ অকপটে সবটাই বলব, তার একটা অদ্ভুত দুর্বলতা জন্মেছিল, রেজা ঠিকই ধরেছিল কিন্তু আমি বিষয়টাকে এক বিন্দু এগুতে দিই নি। তোমাকে বলতে দ্বিধা নেই, আফজাল ভাইয়ের শুদ্ধতা আমাকে মুগ্ধ করত। তোমার ওপর ভীষণ রাগ হতো, এ রকম একজন সংযমী মানুষের কোনোই মর্যাদা দিত না বলে, সে বলত, তুমি সারাক্ষণ নিজের মধ্যে নিমগ্ন, তাকে প্রচণ্ড অবহেলা কর, আমি তার এই দুর্বলতার সুযোগ নিতে পারতাম, আমার নিজের জীবনে সুখ ছিল না, কিন্তু শুধু তোমার কথা ভেবে— নিশি, যাই হয়েছে, আফজাল ভাই এতোসব নষ্ট মানুষের ভিড়ে অনেক ভালো। তুমি সংসারে ফিরে যাও, আমার মতো তোমার ফিরে যাওয়ার পথটাও যেন বন্ধ না হয়।

সেই আলোকোজ্জ্বল প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসার পর নিশি দেখে শীতালো রোদের আশ্চর্য বর্ণ বিকিরণ! যেন রোদ্দুর নয়, ঘাই তুলছে ঊর্ণাজল। যেন ইঞ্জিনের অশুদ্ধ ধোঁয়া নয়, নগরীর কান ফাটানো শব্দ নয়, আঁস্তাকুড়ে ভিড় করা কিলবিল শিশুরা নয়, এই শহরে চলছে জীব স্পন্দনের অদ্ভুত মায়ামৃগ খেলা। নিশির বাঁচার ইচ্ছে ফুরিয়ে যায়, আউলা হয়ে পড়ে পা, দূর থেকে ডাকতে থাকে অজানা স্বপ্নের কুহক, এখনো রেডিও বাজে, এরাই বাঁচিয়ে রেখেছে পুরনোকে, কোনো কালে শোনা গান বাজছে, ‘গীতিময় সেইদিন চিরদিন’। পরক্ষণেই নিশি স্মৃতিভ্রষ্ট, পেছনে অন্ধকার। নিজেকে টেনে তুলে দেখে, সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ধুলো কিশোরীর নগ্ন দীর্ঘ হাত, অতএব হাঁটতেই হয়।

বাসায় এসে শোনে, আফজাল এসেছিল। নিশি ঠাণ্ডা হয়ে যায়। মা ঘরের ঝুলকালির স্তূপ থেকে নিজেকে টেনে তুলে বাবার সামনে থেকে নিশিকে সন্তর্পণে বারান্দায় নিয়ে আসেন। নিশি প্রশ্ন করার শক্তি হারিয়ে ফেলে।

মা বলেন, ম্যালা কথা হয়েছে ওর সাথে, সে-ও বলেছে অনেক কথা, শুনলে তোর মন খারাপ হয়ে যাবে। এখন বুঝতে পারছি, সংসারে প্রত্যেকদিন একটু একটু করে বেশকিছু জট পাকিয়েছিস তুই। যাহোক, আমি কি আর নিজের দুর্বলতা বুঝতে দিই ? তাকে বলেছি, স্বীকার করছি আমার মেয়ে তোমার কাছে মিথ্যে কথা বলে, কিন্তু কেন বলে ? তাকে তুমি নিজের চোখে এমন কিছু করতে দেখেছ, যার জন্য তার ওপর চড়াও হতে পার ? এমন কোনো কিছু করতে শুনেছ তার সম্পর্কে, যা আপত্তিকর ? সে ভালো কোনো কাজ, এই যেমন ধর সেলাই, হ্যাঁ তুমি পছন্দ কর না জেনে এ সম্পর্কেও মিথ্যে কথা বলে। তিনদিন দোকানে গিয়ে একদিনের কথা স্বীকার করে। কেন একটা ভালো কাজ নিয়েও তাকে

কোণঠাসা থাকতে হবে ? বুঝলি নিশি, প্রথম দিকে সে বেশ ক্রুদ্ধ ছিল, বলছিল, হিরণকে তার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। তুই যেন তোর জিনিসপত্রগুলো নিয়ে আসিস, শেষে আমিও এমন ডাট দেখিয়েছি, বলেছি, ভেবো না মেয়ে আমার পানিতে পড়ে গেছে, তুমি পছন্দ করো না বলে সে বাপ-মাকে পর্যন্ত ত্যাগ করেছে। সে মাসে ক'দিন আসে এখানে ? মানলাম আমার মেয়ে মিথ্যেবাদী, তুমিও কম নিষ্ঠুর নও।

মা যেন একটা ঘোরের মধ্যে বলে যেতে থাকেন, শেষে এলো সেই রাতের প্রসঙ্গে, আমি বললাম, কী দেখেছ সেই রাতে ? একজন লোক তাকে নামিয়ে দিয়ে গেল, তাতেই তোমার দুনিয়া এমন ঘুরে গেল, মেয়েটার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলে ? সে যদি কোনো অপরাধ করে ফিরত, অমন মর্মান্তিক অবস্থায় আমাদের এখানে না এসে তোমার কাছে যেত ? যে ঘর তার নয়, যে ঘরের সামনে গেলে তার দরজা বন্ধ হয়ে যায়, সেখানে সে কোন ভরসায় যেত ? সে-রাতে মেয়েটার সর্বনাশ হলে তুমি জীবন দিয়ে তার ক্ষতিপূরণ দিতে পারতে ? জবাবে আফজাল বলল, সর্বনাশ তো সে ঘটিয়েই এসেছিল। তাই শুনে আমি দ্বিগুণ ক্ষেপে জবাব দিলাম, কী সর্বনাশ ঘটিয়েছে তুমি আমাকে বলো ? তুমি তার প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছ, এই জন্যই তার নির্দোষ আচরণেও গন্ধ খুঁজে পাও। তুমি দেখেছ সে আহত, কাঁপছে, একবারও প্রশ্ন করলে না কী হয়েছে ? একথা শুনে আফজাল বলল, তুই যে আহত এটা সে অন্ধকারে লক্ষ করে নি। মেয়েটা যে তোর শরীর ঢেকেছিল, এজন্যই কোনো ব্যান্ডেজ ট্যান্ডেজ তার চোখে পড়ে নি, সে এত টেনশানে ছিল যে ওসব লক্ষ করার মতো চোখ ছিল না, ওর পেছন হেঁটে তুই যখন যন্ত্রণায় কান্নার মতন শব্দ করছিলি, সবকিছুকেই তার অভিনয় মনে হচ্ছিল।

এরপর আমি তাকে বললাম, এখন তুমি নিজেই চিন্তা কর, যার কাছে তার জীবনের নিরাপত্তা নেই, যে তার স্ত্রীর মৃত্যুর মতন যন্ত্রণাকে অভিনয় মনে করে তেমন অনাত্মীয়ের সাথে আমি কীভাবে মেয়েকে থাকতে দিই ? শেষে সে চুপ হয়ে যায়, আমি সেই সুযোগেই গলা নামিয়ে অত্যন্ত ভদ্রভাবে তাকে বলি, আমি কোনো কৈফিয়ত দিচ্ছি না, এরপরও তোমার জানা থাকা দরকার, সন্ধ্যায় ফেরার পথে সেদিন সে ছিনতাইকারীর কবলে পড়েছিল, ওর গলায় একটা চেইন আছে তা তো তুমি জানোই, সেটা দিতে বাধা দেয়ায় তারা ছুরির বাঁট দিয়ে আঘাত করার চেষ্টা করে, সে বার বার তাদেরকে প্রতিহত করায় আঘাত তেমন মারাত্মক হয় নি। বেশকিছু জায়গা ছড়ে গেছে শুধু, কিন্তু ঘটনার আকস্মিকতায় সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

পাশেই ফার্মেসিতে তার জ্ঞান ফিরলে সে আমারই এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়কে সেখানে দেখে। ভিড়ের মধ্যে নিশিকে দেখে সে-ই তাকে ফার্মেসিতে নিয়ে আসে। ডাক্তার তাকে বলে, আপনি বাড়ি যাবেন না ? নিশি দেখে, বাইরে গভীর রাত। তাছাড়া দোকান থেকে ফিরতে তার সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল, তুমি তাক চার্জ করতে পার, কেন সে দোকানে গিয়ে সন্ধ্যা করে ছিনতাইকারীর কবলে পড়ল, এই ভয়ে কিছু বলতে পারছিল না। তুমি তার এই কাজটা পছন্দ করো নি, সে সেটা বুঝতে পেরেছিল বলেই ও পরিস্থিতিতে বাসায় যেতে সাহস পাচ্ছিল না। সে আধমড়ার মতো অনেকক্ষণ সেখানে পড়ে ছিল। শেষে রাত বাড়তে থাকলে আমাদের সেই আত্মীয় জোর করে তাকে রিকশায় ওঠায়। তোমাকে ওই অবস্থায় ভয় পাওয়াটা তার অন্যায় ছিল বলো ? যাহোক...।

নিশি স্তব্ধ চোখে মার দিকে তাকিয়ে থাকে।

কথা বলতে বলতে মা হাঁপাতে থাকেন, এত কিছু বলার পর, সে ভদ্রলোক হলে আর কোনো রাস্তা, কোনো ডাক্তার যাচাই করতে যাবে না। আমি তাকে পুরো বিষয়টা বিশ্বাস করাতে পেরেছি। শেষে তাকে এত বিমর্ষ আর অনুতপ্ত মনে হলো... মার হাসি সন্ধ্যার আলোয় বড় করুণ হয়ে ওঠে, নিশি, জীবনের জন্য এইটুকু মিথ্যে, হ্যাঁ, আমাকেও বলতে হলো! আমার মধ্যে কী যে তখন কাজ করছিল, এতটা জোর দিয়ে কী করে যে কথাগুলো বললাম! তাতে কি, তুই তো আসলেই সেদিন নির্দোষ ছিলি!

রাতের তন্দ্রায় নিশির দেহ বাঁশপাতার মতন পাতলা ফিনফিনে হয়ে ওঠে। নিশি ভাবে, কী করব এরপর? কী করে সবকিছু জোড়া লাগাতে হয়? সাজিদুলকে প্রত্যাখ্যান করেছি, ছুড়ে ফেলেছি তাকে। এর আগে ও আমার অনেক অপমান সহ্য করেছে, তবে সত্যিকার আঘাতটা দিয়েছি সেদিনই। কিন্তু এটা তো সত্য, পৃথিবীতে এই একজন মানুষের মুখে থুথু দিয়েই আমি মাথা উঁচু করে ফিরে আসতে পেরেছি। এক সময় ওই মানুষটার শরীরেই স্যান্ডেল পর্যন্ত ছুঁড়ে মেরেছি। কতই না অত্যাচার করতাম তাকে। জাহিদের গল্প করতাম গভীর দুঃখ নিয়ে, সে বলত, তার প্রেমিকা অন্য কাউকে স্মরণ করছে, পুরুষদের এর চেয়ে অসহায় অবস্থা আর হয় না, কেমন একটা প্রতিযোগিতা চলে আসে জীবনে, স্বস্তি চলে যায়, প্রেমিকার সব আচরণ রহস্যময়, অচেনা হয়ে ওঠে। তারপরও শুনতে চাইত, আমার কষ্ট হচ্ছে, স্বীকার করছি, তারপরও তোমার ভার যদি কমে?

আমি সাজিদুলকে স্মরণ করতে চাই না, ও আমার জীবনের সব কিছু নষ্ট করে ফেলেছে। পর মুহূর্তে নিশি কাতরে ওঠে, ও আমার জন্য এত সহ্য করেছে, আমি তার একটা অপরাধ ক্ষমা করতে পারছি না? কিন্তু তাতে করে যে আমার সব ভেঙে তছনছ হয়ে গেল! সে রাতের পর থেকে মনে হচ্ছিল জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেছে, এরপর বেঁচে থাকা অর্থহীন। আজ মনে হচ্ছে, কীভাবে মাথা তুলে দাঁড়াব? কীভাবে নিজের মধ্যে তৈরি করা যায় ব্যক্তিত্ব, পায়ের তলার মাটি, যা দিয়ে জীবনের তুচ্ছ ভয়গুলোকে ছাপিয়ে ওঠা যায়! এক সময় একটা পাতলা দেহ, উস্কো মুখ নিজের মধ্যে সামনে এগুতে থাকে, নিশি তন্দ্রার মধ্যে চিনতে চেষ্টা করে, মুসতাফা! না, এ অন্য কেউ, ওইতো চোখ, তীক্ষ্ণ হচ্ছে, যা দিয়ে তাকে শনাক্ত করা যায়। আসলে সেই সন্ধ্যার চা পানরত লোকটার মধ্যেই লুকিয়ে ছিল এরই অবয়ব, আমি আজও এর ছায়া মাড়িয়ে যেতে পারি নি, তবে? এইসব ছাপ নিয়ে, সর্ব-অস্তিত্বে অন্য স্বপ্ন ধারণ করে ফের ফিরে যাব সংসারে? আর আফজাল? কখনো স্বাতীর প্রতি কোনো বিষয়ে সহানুভূতি পর্যন্ত প্রকাশ করে নি, অথচ নিজের শূন্যতা নিয়ে আছড়ে পড়েছিল তারই সামনে। এই তো মানুষের সত্য, নিশি নিজেকে সান্ত্বনা দেয়, আমিই-বা কতটুকু জানি আফজালের? তার ব্যক্তিগত বেদনাকে কতটুকু স্পর্শ করতে পেরেছি?

নিশি অন্ধকার রাতের দিকে চেয়ে ভাবে, সেই রাতে জাহিদ অসুস্থ হয়ে আমার কাছে এসেছিল। সীমাহীন প্রেম থাকা সত্ত্বেও বাস্তবতার ভয়ে আমিই তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি! সত্যি আমি আমার সত্যকে আর চিনতে পারছি না। সত্যিই কি সে আমাকে গ্রাস করে আছে, না কি আমার এই অনুভব তাকে স্পর্শ না করতে না পারার অতৃপ্তি থেকে?

'বড়লোক হয়ে যাচ্ছি'— নিশির রোমকূপ সতর্ক হয়ে ওঠে, আফজালের ওখানে যাওয়ার পর আমাকে পড়তে হবে নতুন স্রোতের মুখোমুখি। যখন টাকা ছিল না, হিসেব করতে করতে হাঁপিয়ে উঠতাম, বলত, ভেতরে ভেতরে তুমি বড় উচ্চাভিলাষী, অর্থ ছাড়া তোমার কাছে আমার কোনো মূল্য নেই। এখন বলবে, কী চাও আমার কাছে ? তোমাকে তো সব দিচ্ছি, এই আসবাব, এই অলঙ্কার, আমার দিন-রাতের পরিশ্রম— এইসব কার জন্য ? আসলে এসব কথার সামনে সূক্ষ্ম কোনো যুক্তি নিয়ে দাঁড়ানোই মুশকিল। তারপরও কথা থাকে এবং কোনো মানুষের জীবনে সেই কথাটাই তার জীবনের সমস্ত সত্যি, এ-কথা কে কাকে বোঝাবে ?

চারপাশে রোমশ সন্ধ্যা।

বাসা থেকে বেরিয়ে আসার পর থেকে নিশি দিন-রাতের প্রতিটি অক্ষর মনোযোগ দিয়ে পড়ে। বাইরের সন্ধ্যা, বাতাস, ছায়া-আলোর প্রতিটি স্পর্শ গভীরভাবে অনুভব করে, যেন দীর্ঘক্ষুৎপিপাসার্ত, এক সাথে সব গ্রহণ করতে চায়। সন্ধ্যায় তার বাইরে বেরুনো নিয়ে বাবার আপত্তি, নিশি জানে। তারপরও কেমন স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে মন, সে বিবাহিতা, বাবারও আপত্তি তীব্র হয়ে ওঠে না, শুধু বলে, বুঝলি, বয়স হচ্ছে, সবকিছুতে বড় ভয় লাগে।

কফির মরচে পড়া গন্ধ এই শীতে বড্ড নেশালু, নিশি বলে, বিল কিন্তু আমি দেব।

মুসতাফা সিগ্রেট ধরায়, খাওয়া শেষ হওয়ার আগে যে বিল মাথায় রাখে তাকে আমি কী বলব, কৃপণ না বেহিসেবি ?

ছায়া বিস্তার করা স্বপ্নের একটা নির্দিষ্ট সময় থাকে, সেটা কেটে গেলে, যখন নিজেকে নিয়েই হাসি পাচ্ছে, সব ছাপিয়ে উঠছে অস্তিত্ব-সঙ্কট, তখন সে পুনরায় এসেছে পুরনো ধান্দায়, এই শহরে কাকে সে চেনে ? মানুষের এইভাবেই হয়, চেনা-জানার সূত্র ধরে, কিন্তু কিছুতেই কথাটা বলা হচ্ছে না, আমার একটা চাকরি দরকার, এ যেন ভিখিরির আর্তনাদ হয়ে উঠবে। এই ভারবাহী শব্দ কটি বলার জন্য সে সাজিদুলের সেই সহপাঠীকে নিজের বিপন্ন অস্তিত্বের প্রায় প্রতিটি গল্পই বলে। অবশ্য তাও নাটকীয়ভাবে উত্থাপিত হয় নি। দেখা হওয়ার পরই নিশি স্পষ্ট করে বলেছে, আজ আপনার কাছেই এসেছি। সেটাও অস্বস্তির হয় নি, কেন আমার কাছে ? মুসতাফা তা জানতে না চাওয়ায়।

গ্লাস টেবিল মাঝখানে রেখে দু'জন বসেছে। পর্যায়ক্রমে এসেছে সাজিদুলের প্রসঙ্গ। নিশি এইরকম মাত্র দু'দিনের দেখা লোককে কী করে যে অকপটে সব বলে দিল! কথা শেষ হলে শূন্য কাপের দিকে চেয়ে নিশির মনে হয়, পুরো বিষয়টা অদ্ভুত এক বিভ্রমের ভেতর ঘটেছে। এক দুঃসহ ভার তাকে নিষ্ক্রিয় করে তোলে।

আমার সেদিনও মনে হচ্ছিল, আপনি সুস্থ নেই, মুসতাফা পরিবেশ হালকা করতে চায়, তারপর, সত্যিই কৌতূহল ছিল, আরেকদিন দেখা হলো, সত্যি বলছি, আমার মনে হচ্ছিল

আপনি ভান করছেন, নিজেকে লুকোতে অন্যকিছু খুঁজছেন। চা খেয়ে ভদ্রতার বিদায় সারলেন। সাজিদুলকে নিয়ে আমার অনেক প্রশ্ন ছিল, কেন সে এমন একটা কাণ্ড করল, তার মতো ছেলে, আমি তো তাকে চিনতাম। ভেতরে কত প্রশ্ন! তারপর জেলে গেল, তার সাথে যোগাযোগের সেইখানেই শেষ। আমিও দেশের বাইরে চলে যাই। এক সময় ওখানকারই একটা মেয়েকে বিয়ে করি, জীবন বইতে থাকে অন্য খাতে। আমার স্ত্রী ওখানে চাকরি নিয়ে ব্যস্ত, বেশ কিছুদিন পর দেশে আসি। টের পাই, এখানেই আমার শেকড় গেঁথে আছে। বাইরে গিয়ে এক মুহূর্তের জন্যও স্বস্তি পাই নি, এখানেই একটা কিছু করতে শুরু করলাম। ফোনে স্ত্রীর সাথে ঠাণ্ডা লড়াই চলছে, সে চায় আমি যাই, আমি চাই, ও আসুক। ওকেই-বা কী করে দোষ দিই ? প্রত্যেকেরই নিজের দেশের প্রতি একটা মায়া থাকে, যেমন আমার আছে। এই তো জীবন চলে যাচ্ছে! যাক, নিজের কথা বেশি হয়ে যাচ্ছে, এখন বলুন আপনি কী করতে চান ?

আমি ? নিশি যেন পাতাল থেকে ওঠে, তারপর যেটা ছিল তার জন্য সবচেয়ে জড়তার, সবচেয়ে ভারি, তাই খুব সহজে, এক শব্দে সেরে ফেলে, চাকরি!

সে জন্য আপনাকে অন্তত বি.এ-টা পাশ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। যদিও এ দেশে সেই ডিগ্রিও কিছু নয়, তারপরও ন্যূনতম হলেও...।

সন্ধ্যায় মমতাদি আসেন।

তার চোখের নিচে কালি পড়েছে। ক'দিনে বয়স যেন অনেক বেড়ে গেছে তাঁর। চায়ের কাপ হাতে শ্যাওলা-সিঁড়িগুলো ডিঙিয়ে দু'জন ছাদে গিয়ে বসে।

ডাব গাছের পাতা কেটে রোদ সরে যাচ্ছে। হুলুস্থুল করছে কাকেরা, চারপাশের অকালবাতি আকাশ শাদাটে করে তুলেছে।

নিশি সহসা কথা বলতে পারে না।

মমতাদি ধোঁয়া-ওড়া কাপে চুমুক দেন, আমি শুনেছি সব, তবে বড্ড দেরিতে। এর আগে তোমাকে করেছিলাম, রিং বাজে, কেউ ধরে না। গেছি পর্যন্ত, দেখি তালা। ভাবনায় পড়লাম, শেষে চিন্তা করলাম হয়তো আজকাল বেরোচ্ছো-টেরোচ্ছো। সাজিদুলকে ক'দিন যাবৎ সুস্থ মনে হচ্ছিল না। কাল রাতে সব উগরে দিল। নিশি, সারাদিন ধরে ভাবছি তোমার এই অবস্থায় কী করে তোমার সামনে এসে দাঁড়াই, সত্যিই আমি খুব হতভাগ্য, শেষ পর্যন্ত আমাকে পর্যন্ত এ-ও দেখতে হলো।

জুড়িয়ে আসতে থাকা জলে নিশি ঠোঁট ডোবায়, পরে অসহিষ্ণু মাথা তোলে, সবকিছু নিজের মাথায় টেনে নেন কেন ? আপনি কী করেছেন ?

তারপর মমতাদির ম্লান হয়ে আসতে থাকা মুখের দিকে চেয়ে নিশি সুর পাল্টায়, আপনি এসেছেন, আমি এই সময়টার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। আমার জীবনে এই ছিল। আমার সংসারটা ছিল চরকাবুড়ির, পুরোটাই একটা মিথ্যে গল্প, মিথ্যের সুতো দিয়ে বোনা। এক ধাক্কা খেয়ে সব মিথ্যে ভেঙে গেল, একদিক থেকে এ তো ভালোই হলো, কুঁড়েকে লাথি না দিলে সে কি দাঁড়ায় ? মমতাদি, আপনি আমার অনেক বড় শক্তি, আপনার বিষণ্নতা আমাকে দুর্বল করে দেয়।

আলোয়ানটা ভালো করে শরীরে টেনে দিয়ে মমতাদি কার্নিশে কাপ রেখে সামনের ঘুঁজিগলির দিকে তাকান, নর্দমাটা সন্তর্পণে লাফিয়ে পার হলো একটা বেড়াল আর শেষ পর্যন্ত ডুবেই গেল সূর্যটা।

কিসের ভারে যেন মুহ্যমান তিনি। নিশি চেয়ে থাকে তাঁর ক্রমশ ক্ষয়মান ত্বকের দিকে জমছে বিন্দু বিন্দু শীত, তিনি বলেন, তোমাকে কোনো সান্ত্বনা দেব না, এরকম পরিস্থিতিতে সাহস দেয়ার মতন মানসিকতা আমার নেই, আমি তৈরি করতে চেয়েছিলাম নিশি, সে এক টুকরো সেলাই সুতো দিয়েও হোক, কিন্তু নিয়তি! যদিও এ আমরাই নির্মাণ করি, তারপরও কথা থেকে যায়, আমরাই নির্মাণ করছি আমাদেরই ধ্বংসের জন্য ? এত আত্মহত্যার শামিল! তবুও তাই করা হয়ে যায়, তাই করা হয়ে যাচ্ছে। আমি নিজেই শক্তি হারিয়ে ফেলেছি, তোমাকে কী সাহস দেব ?

আকাশ থেকে পড়তে থাকা হিম জলছিটায় নিশির মুখ আর্দ্র হয়ে ওঠে এবং তারপরেই অকস্মাৎ কোনো কারণ ছাড়াই সাজিদুলের সেই রাতের ছুরিময় মুখ তাকে ভয়ার্ত করে তোলে। কী অবিশ্বাস্য! সেই ছুরির মুখে একজন মানুষ ঘণ্টা ঘণ্টা তাকে নগ্ন বসিয়ে রেখেছে। নিশির কাছে পুরো দৃশ্যটাই দুঃস্বপ্ন, এত তাকে ধর্ষণ করার চেয়েও মর্মান্তিক! সেদিন সে লাঞ্ছিত হয়েছে। একটি দেহে অন্য দেহ প্রবেশ করলেই শুধু সেই দেহ অপমানিত হয় ? সেদিন তার অধিক হয়েছে। ওই নিষ্ঠুর দৃষ্টির চাপে, ভয়ার্ত ছুরির ঝলকানিতে দীর্ঘ সময় ধরে নিশির দেহ কলুষিত হয়েছে। এখন হাসি পায়, নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করে, সে ভয় পেয়েছিল সাজিদুলকে ? ওই মানুষটার দৌড় তার জানা ছিল না ? তারপর পর্যায়ক্রমে মৃত্যুর মতো ভয়, সিঁড়িতে স্তব্ধ সময়, মসজিদে রাত্তির। নিশি তো পাগল হয়ে যেতে পারত, শরীরে জ্বর এসেছিল, ঘোরের মধ্যে খুঁজে বের করেছিল স্বাতীর আবাসস্থল। তারপর ওর সেবায়— নাহ্ এ দুঃস্বপ্ন! পুরোটাই ভয়ানক এক বিভ্রম।

চিরকাল নিজেকে আড়াল করে রেখেছি, মমতাদি অস্ফুটে উচ্চারণ করেন, এই যে দেখছ আমার আত্মবিশ্বাস, এই যে আমার হাসি। এ এক সময় আমার স্বতঃস্ফূর্ত ছিল, অন্তিমে জীবনের ধাক্কায় বিপর্যস্ত হয়ে, পিষ্ট হয় যখন দেখছি কিছুই আর থাকছে না, অকৃত্রিম স্পন্দনগুলো থেমে যাচ্ছে, তখন এই যে আমাকে দেখছ, এই আমাকে অনেক কিছুর আড়ালে ঢেকে আমি নতুনভাবে নির্মাণ করলাম। নিশি, এই জীবনে আমি কারো কাছে আমার কোনো কিছু উন্মোচন করি নি। তুমি জানো, আমার একটা ছেলে কত বছর ধরে পাগলা গারদে আছে। সাজিদুল হয়তো তোমাকে এ বিষয়ে কিছু ইঙ্গিত করেছে। এ জন্যই হয়তো তুমি নিজের থেকে তার সম্পর্কে কোনো কথা আমার কাছে জানতে চাও নি। নিশি, মানুষের ছেলেই পাগল হয়, অসুস্থ হয়, বিকলাঙ্গ হয়, এ সম্পর্কে কোনো উচ্চারণ পর্যন্ত সহ্য করতে পারব না— এত দুর্বল মন আমার কী করে হয় ? তোমার কখনো মনে হয় নি আমার সহ্য ক্ষমতা বড় কম, বড্ড বেশি স্পর্শকাতর আমি ?

চারপাশে ছায়া নামলেও এতক্ষণ আকাশটা ছিল শাদাটে, ধীরে ধীরে তার গায়ে ফুটতে থাকে কাঁচা নক্ষত্র। নিশি মমতাদির ছায়াবী হয়ে আসতে থাকা মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের বেদনা থেকে বেরিয়ে আসে, বলে, এ তো হতেই পারে, হয়তো সেই ছেলেটার প্রতি আপনার দুর্বলতা বেশি ছিল।

মমতাদি বলেন, তুমি এই জায়গাটা ঠিক ধরেছ, এই যে মানুষের একটাই দেহ, এর সব জায়গার আঘাতে কি এক রকমের প্রতিক্রিয়া হয়? কোনো জায়গায় সামান্য আঘাতে মানুষ মরে যায়, কোনো জায়গায় পেটালেও শুধু অবশ হয়। আমার অন্য সন্তান আর ওর মধ্যে ছিল বিস্তর ফারাক। ওর জন্মের পর থেকেই ও নিজের থেকে এই ব্যবধান তৈরি করেছিল। আর দশটা শিশুর মতো ও জন্মায় নি। ফোর্সেফ ডেলিভারিতে ওর জন্ম হয়। জীবনের সাথে মৃত্যুর যুদ্ধ করতে করতে আমি দেখি, ডাক্তার মুঠোর মধ্যে বাচ্চাটার পা দুটো নিয়ে ওপর দিকে ঝুলিয়ে তার পিঠে ক্রমাগত থাপ্পড় দিয়ে যাচ্ছেন। আমার চেতনা ফিরে এলে আমি লক্ষ করি, তাই তো, আমি নবজাতকের কোনো কান্নাতো শুনি নি? তাহলে কি ও মৃত? এই ভাবনার পর আমার চারপাশ অন্ধকার হয়ে আসে। জ্ঞান ফিরলে দেখি ও জীবন্ত, আমার পাশে শুয়ে আছে। ডাক্তার বলেন, অনেকক্ষণ পর সে কেঁদেছে। তবে অন্যসব বাচ্চার চেয়ে অনেক মৃদু সেই কান্না। যাহোক, ভয়ের কিছু নেই। বাচ্চা সুস্থ আছে। আমি উজ্জ্বল আলোয় বাচ্চাটিকে উল্টেপাল্টে দেখি, ওর মাথার পেছনটায় ছিল আঘাতের চিহ্ন। তাই দেখেই আমার ভয় শুরু হয়। আমি ডাক্তারকে বলি, এমন নাজুক জায়গায় আঘাত পেয়েছে কিছু ক্ষতি হবে না তো ওর? ডাক্তার আশ্বাস দেয়, ফোর্সেফ ডেলিভারিতে এরকম হয়েই থাকে। এ আঘাত সেরে যাবে। নিশি, তুমি কি বিরক্ত বোধ করছ হঠাৎ এরকম আমার ছেলের জন্মের কাসুন্দি ঘাঁটছি বলে?

আপনি বলুন, নিশি শীতল স্বরে বলে, বিষয়টা নিয়ে আমারও যথেষ্ট কৌতূহল ছিল। কিন্তু আপনি চাইতেন না বলে কখনো আগ্রহ প্রকাশ করি নি।

কার্নিশ থেকে নেমে ছাদের ওপর রাখা বেতের চেয়ার টেনে নিশি মমতাদিকে বসতে দেয়। মা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছেন, নিশি ছাদে ঠাণ্ডা পড়েছে। তোরা নিচে এসে বস।

মমতাদি হাসেন, এই তো বেশ লাগছে, ঢাকায় ছাদের কাছাকাছি থাকাটা ভাগ্যের ব্যাপার। বেশ শ্বাস নিতে পারছি। খুব ভালো লাগছে এখানে।

নিশি বলে, মা কষ্ট করে ওপরে আরো দু' কাপ চা পাঠিয়ে দাও না?

মা আর কাছে আসেন না, সেখান থেকেই চলে যান।

এরপর— বলতে বলতে মমতাদি কিঞ্চিৎ খেই হারিয়ে ফেলেন, ছেলেটি বড় হতে থাকে, ওহ্ ওর নামই তো তোমাকে বলা হয় নি, সাকিব। যাহোক, সবকিছুতেই সে আমাদের অসম্ভব ভোগাতে শুরু করে। প্রথমত দু'বছরের কাছাকাছি গিয়েও ও ঠিকমতো হাঁটতে পারত না, একটু হামাগুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁটতে গেলেই ধপাস পড়ে যেত। পা দুটো দেখলে মনে হতো ভেতরে হাড় নেই, ভয়ে-উৎকণ্ঠায় আমার সে-কী অবস্থা। এই করে করে সে আড়াই বছরের দিকে হাঁটল। তারপর সমস্যা দেখা দিল তার কথা না বলা নিয়ে। শব্দ শুনতে পেত, আ-উ করে অনেক কিছু বোঝাতে চেষ্টা করত কিন্তু তিন বছর পেরিয়ে গেলেও যখন সে কথা বলছে না আমার ফের মরণদশা। তখন একটা ঘটনা লক্ষ করলাম, ওর দিকে আমার মাত্রারিক্ত মনোযোগ, অহেতুক উৎকণ্ঠা এসব নিয়ে আমার অন্য ছেলেমেয়ে এবং তাদের বাবাও রীতিমতো আমার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ল। ওকে নিয়ে বাড়াবাড়িটা হয়তো আমার বেশিই ছিল। স্নান করানো থেকে শুরু করে ওর দুধ গরম করা, সব আমি নিজের হাতে করতাম। কলেজে ক্লাস করানোর সময়ও মাঝেমধ্যে কাজের মেয়ের কোলে দিয়ে

ওকে দরজার বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখতাম। আমার মধ্যে বিষের মতো ঢুকে গেছিল একটাই ভয়, এ ছেলে কোনো-না-কোনো দিক থেকে বিকলাঙ্গ হবে। সপ্তাহে দু'বার যেতাম ডাক্তরের কাছে, ওর সামান্য অসুখ হলে রাত জেগে বসে থাকতাম ওর পাশে। এ ছেলেকে ঘিরে ওর বাবার সাথে, অন্য সন্তানদের সাথে আমার অশান্তি বাড়তেই থাকল। তারা বলত, ও তোমার পেটের ছেলে, আমরা সৎ! এই ক্ষোভে ওরা কেউ সাকিবের ধার পর্যন্ত ঘেঁসত না। ওর বাবা একদিন ঠাণ্ডা মাথায় আমাকে বোঝাল, ছেলেটা যদি বিকলাঙ্গ হয় সে আমার কারণেই হবে। আমি ওকে মুঠোর মধ্যে ভরে বড় করছি। কিন্তু জানো নিশি, ও ছিল ভীষণ সেনসিটিভ। আমি কতক্ষণ চোখের আড়াল হলে এসে দেখতাম কেঁদেকেটে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে। কিন্তু ওইটুকুন শিশুর কান্নার শব্দ কেউ পেত না। এ-জন্যই ডাক্তার বলেছিলেন, সবদিক থেকেই যেহেতু ও সবার মতো না, আমি যেন ওর প্রতি বেশিই মনোযোগ দিই। এই কথাটাই বাসার কাউকে বোঝাতে পারলাম না। তাদের কথা হলো, মনোযোগ দেয়া মানে ওর ফুলো চোখ দেখে বুক ভাসিয়ে ফেলা না। ও কাঁদুক, মেঝেতে আছড়ে পড়ুক, অন্য সন্তানেরা যেভাবে বড় হয়েছে সেইভাবে বড় হোক। অবশেষে এ নিয়েই সংসারে বিভক্তি আসল। ওদের এই কথার পর আমার কী হলো আমি সাকিবকে ওদের মাঝখানে কখনো একা রেখে যেতে সাহস পেতাম না। রাতের পর রাত জেগে ফিসফিস করে কেউ যেন শুনতে না পায় এভাবে ওকে কথা শেখাতে চাইতাম। এইভাবে, একটু দেরিতে হলেও সে কথাও বলতে শুরু করল। বাড়ির সবাই হাঁপ ছাড়ল। একসময় ওকে স্কুলে ভর্তি করলাম, সেখানেও সমস্যা, কারুর সাথে নিজেকে মানাতে পারে না। সারা ক্লাসে বোবার মতো বসে থাকে, বন্ধুরা ওকে ভেংচি কাটত, বলত, হ্যাবলা এবং এ-সবকিছুর জন্য বাসার সবাই আমাকেই দায়ী করল।

ক্রমেই ছেলেকে নিয়ে এক সংসারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। এভাবে দিনগুলো পেরুতে লাগল। পরে যে যার মতো বড় হয়ে, কেউ বিয়ে করে, কেউ বিয়ের আগেই চাকরি নিয়ে এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। তখন একমাত্র সাজিদুল, যে ম্যাট্রিক পাস করেই আমার কাছে এসে উঠেছিল আত্মীয়পরিজন সব হারিয়ে, একমাত্র ও-ই আমার সেই ছেলেটাকে মানসিক সাপোর্ট দিত। ওর সাথে সময় কাটাত। বড় হওয়ার পর সাকিবের সমস্যা একটাই ছিল, সে কারুর সাথে মিশতে জানত না। পথে বেরোলে আড়ষ্ট হয়ে উঠত, একদম একা দরজা বন্ধ করে পড়ে থাকত। আমি তাকে রাজ্যির বই পড়তে দিতাম, ঋষিশৃঙ্গের মতো সে নারী বলতে একমাত্র চিনত আমাকে, শুধু নারীই-বা বলি কেন, সবকিছু বলতে বন্ধু ওই এক মা বাবা। এদিকে ওর বাবার শরীর ক্রমেই খারাপ হতে থাকল। শুধু দুঃখ করত আমার এই ছেলে ফি-বছর পরীক্ষায় ডাব্বা মারত বলে। বিশ্বেস কর নিশি, ওর দিকে আমার মনোযোগ হয়তো বেশি কাজ করেছে কিন্তু বাকিরাও তো আমার সন্তান, ও আমার স্বামী, আমি এরপরও ওদের জন্য যথাসম্ভব করেছি— ওদের পড়াশোনা, খাওয়া, ঘুম সব লক্ষ করেছি। ওরা বলত, আমাদের জন্য কর আয়ার মতো, ওর জন্য মার মতো। ওর বাবা পর্যন্ত বলতো, ডায়াবেটিসের ধাক্কায় আমার মরণদশা, তুমি একটু বাড়তি যত্ন করলে না আমার! নিশি, তখন এই ছেলেকে আমি যে কোথায় লুকোই! এক সময় সে হয়ে উঠল আমার প্রাণান্তকর আকর্ষণের নিষিদ্ধ দ্রব্য। ওর বাবাকে বোঝাতাম, আমি তোমার জন্য করি না ? এ তোমার অযৌক্তিক অপবাদ। ছেলেটার এই অবস্থা! এর মধ্যে তুমি ওকে হিংসে কর! ও তোমার

সন্তান না? ওর বাবা বলত, ও গেছে! তুমিই ওকে শেষ করেছ। অথচ একমাত্র আমিই জানতাম কী মেধাবী সে। আমার সাথে ফ্রয়েডের দর্শন নিয়ে কথা বলত, রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমালোচনা করত, বলত, ওঁর লেখায় তৃতীয় বিশ্বের আসল রূপই নেই, শুধু সুন্দর, শুধু ভাসমানতা, এ নিয়ে তর্ক হতো আমার সাথে। দস্তয়ভস্কির 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট' পড়ে ও কয়েক রাত ঘুমুতে পারে নি। এসব কিছু হতো শুধু হতো আমার সাথেই, ওইটুকু মাংসের দলা থেকে শুরু করে এত বড় আকৃতিতে রূপান্তর, এত আমার নিঃশ্বাসের সামনেই ঘটেছে। এই হাত দিয়ে বিন্দু বিন্দু করে আমি ওর চির অসুস্থ শরীরকে জীবন্ত দাঁড় করিয়েছি। ওর দেহের সব আমি চিনি। কোথায় তিল, কোথায় মেদ। বাড়ন্ত বয়সে যা যা রূপান্তর হয়, আকুল হয়ে সেসব নিয়ে আমাকেই প্রশ্ন করেছে। এসব কী, কেন হয়? কিন্তু কেউ সামনে এলেই সেই ছেলে এমন কুঁকড়ে যেত, কথা বলতে গিয়ে এমন তোতলাতে থাকত, আমি কাউকে বিশ্বাসই করাতে পারতাম না, ও সুস্থ। বাইরের সবাই জানত, এমনকি ওর বাবাও, 'ও আমাদের মানসিক ভারসাম্যহীন' ছেলে। এবং এই অবস্থাটাই দিনের পর দিন আমাকে অসুস্থ, ক্ষ্যাপাটে করে তুলতে থাকল। আমি ওকে একদিন ধাক্কা দিয়ে ড্রয়িং রুমের সব আত্মীয়ের সামনে ফেলে উদ্‌ভ্রান্তের মতো বলতে থাকলাম, যা যা পড়েছিস তুই বল! দেশের রাজনীতি তোর কাছে কেন অন্তঃসারশূন্য মনে হয়, বল্; রবিশঙ্করের সেতার শুনে কি মনে হয় বল। বল সবার সামনে, আমাকে যা-যা বলিস। ছেলে এতে ভয়ানক আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল। সে থরথর করে কাঁপতে শুরু করল। তার মুখ বেয়ে লালা ঝরতে শুরু করল। সে উবু হয়ে পড়েছিল নিচে। হাজার চেষ্টা করেও সবার সামনে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারল না। আমি হয়ে উঠলাম দ্বিগুণ হাস্যকর।

নিশির দাঁতে দাঁতে ঠোক্কর লেগে যায়। এক মুহূর্ত, তারপর গায়ে ভালো মতন চাদর টেনে নিষ্পলক চেয়ে থাকে। রাস্তা থেকে আসা ছিন্নবিচ্ছিন্ন আলোয় মমতাদির মুখ কারুকার্যময়।

চা আসে। তিনি যেন একটু নিঃশ্বাস ফেলবার সুযোগ পান।

ফের ধোঁয়া, নিশি চোখ বুজে মুখে সেই ভাঁপ নেয়।

মমতাদির কণ্ঠ ক্রমশ নিম্নগামী হতে থাকে, তারপর ওর অবস্থা আরো খারাপের দিকে যায়। টেনেটুনে কলেজ পর্যন্ত উঠেছিল। একদিন সেখানেও যাওয়া বন্ধ করে দেয়, সারাদিন দরজা আটকে পড়ে থাকে, আর জানলা দিয়ে দেখে বদ্ধ রাস্তার রিকশা, ফেরিঅলা। বলত, আমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। আমাকে সমুদ্রের ওপারে কোনো দ্বীপে ফেলে আসো, আমি সমুদ্রের সাথে থাকব। একদিন এইসব দেখে সাজিদুল আনল একটা ছবি। ছবিটা বিটোফেনের ওপর তৈরি। সেই শিল্পীর ছেলেবেলায় তার রাগী বাবা এক থাপ্পড়ে তার কান ফাটিয়ে দেয়, ফলে সে বধির হয়ে যায়। সেই বধির বেটোফেন কী একাগ্রতায় কী রকম জেদে কোনো শব্দ না শুনেই পিয়ানো হাতে নেয়, তৈরি করে পৃথিবী-বিখ্যাত সিম্ফনি... এইসব দেখতে দেখতে সাকিব কেমন স্তব্ধ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর তার জীবনে কখনো যা ঘটে না, শুনি, বিকট চিৎকার। আমি দৌড়ে যাই, দেখি তার বাবার ছবি ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড করে সে পায়ের তলায় পিষে মাথা ঠুকছে দেয়ালে, আর তাকে সামলাতে গিয়ে সাজিদুলের সে কী করুণ অবস্থা।

এই ঘটনার পর থেকে সে আরো নীরব হয়ে যায়। সর্বগ্রাসী ভয় ক্রমশ আমাকে উন্মাদপ্রায় করে তুলতে থাকে।

এরকমটা যখন চলছে, তখন সাকিবের বাবার অবস্থাও ভীষণ খারাপের দিকে যেতে থাকে। চারদিক থেকে বিপদ, এবার বোঝো আমার অবস্থা! হাসপাতালে ভর্তি হলো সে। রাতদিন সেবা করেও তাঁকে বাঁচাতে পারলাম না। মমতাদি লম্বা করে শ্বাস টানেন, ওর বাবার মৃত্যুর দিনও সাকিব সারাদিন বন্ধ ঘরে বসে ছিল, কারো ডাকাডাকিতে বাইরে আসে নি। এরপর আমার আর কারো কাছে ওকে লুকোবার কিছু থাকে না। আমি আমার পুরো সময়টা ওকে দেয়ার সুযোগ পাই।

সেই জানালা দিয়েই ওকে দেখতে দেখতে রাস্তার ওপাশের ছাদে ফুরফুর উড়তে থাকা একটি মেয়ে ওর প্রেমে পড়ে যায়। দেখতে শুনতে সাকিব সুন্দরই ছিল, একদিন মেয়েটি আমাদের বাসায় আসে। আমি যেন আস্ত পৃথিবীটা হাতের মুঠোয় ফিরে পাই। মেয়েটিকে ওর সম্পর্কে সবকিছু বলি। কাতর মিনতি জানাই, ও যদি তোমাকে অপমানও করে, অথবা তোমাকে দেখে কুঁকড়ে যায়, তবুও তুমি এসো। তোমার সাথে ও যদি মেশে ওর একটা আশ্চর্য সুন্দর রূপ আছে, যা তুমি দেখতে পাবে। মেয়েটি বয়সে তরুণ, চ্যালেঞ্জের মতো করে বিষয়টা গ্রহণ করে। এরপর আমি যখন কলেজে চলে যেতাম তখনই মেয়েটি আসতে থাকে। বিশ্বেস কর নিশি, কয়েক মাসের মাথায় সাকিবের আশ্চর্য পরিবর্তন দেখি, হাসছে, কথা বলতে গিয়ে লাল হয়ে উঠছে মুখ। টেবিলে এসে নাশতা করছে। এরপর যা কখনো হয়নি, নিজের হাতে সেভ করছে। আয়নায় দেখছে নিজেকে। আমি একদম আছড়ে পড়ি, হে আল্লাহ, এইভাবে সব ঠিক করে দাও।

কিছুদিন যাওয়ার পর একদিন কলেজ থেকে ফিরে দেখি মৃতের মতন ফ্যাকাসে ওর মুখ, চুল উস্কো, চোখ-মুখ অস্থির। আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে, আবার কী হলো ? সে আমাকে ভেতরে ডেকে সেই ছেলেবেলাকার মতো সরল কণ্ঠে বলল, মা, আমি ওসব পারি না। আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

কী সব ? আমার প্রশ্নের জবাবে সে ফিসফিস করে বলে, ও আমাকে শেখালো কীভাবে করতে হয়, কিন্তু ওকে আমি স্পর্শ করেছি, আদর করেছি, জানো মা আমার কিচ্ছু হলো না, আমাকে বলল, তুমি এখনো পুরুষ হয়ে ওঠো নি, বলেই ভীষণ অপমান করে চলে গেল।

এইবার হু-হু ঠাণ্ডায় কিংবা অব্যক্ত যন্ত্রণায় মমতাদির কণ্ঠ কাঁপতে থাকে। নিশির শক্ত হাত ধরে থাকে পিরিচ। খণ্ড আলোয় দেখা যায় ক্রমশ চর্মসার হয়ে উঠছে মমতাদির মুখ, নিশি, পৃথিবীর কেউ জানে না এই ঘটনা, তুমি হয়তো ভাবছ, তোমার এই দুঃসময়ে আমার বেদনার ভার দিয়ে আমি তোমার মাথা ভারি করে তুলছি, এ আমার ঠিক হচ্ছে কী-না! আমরা উপন্যাস, ছবিতে কঠিন রূঢ় জীবনের প্রতিফলন দেখতে চাই না, কেননা, আমাদের, নিজেদেরকেই প্রতিদিন বাস করতে হয় এসবের মধ্যে। যা জীবনে নেই, তেমন চৌকশ স্বপ্ন দেখে বা পড়ে সাময়িক আনন্দ হয়, এ অনেকটা ঘুমের ওষুধ খাওয়ার মতো; কিন্তু কঠিন যন্ত্রণার সময় সেসব দেখার চেয়ে সেসব পড়ার চেয়েও আরো কঠিন আরো রূঢ় জিনিসের সামনে দাঁড়ানো উচিত, তাতে জীবনের ভার কমে, নিজের যন্ত্রণা তুচ্ছ হয়ে আসে। এই আমাদের জীবনেই এমন কিছু ঘটেছে, ভাই হয়তো রেপ করেছে নিজের

বোনকে, মায়ের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে ছেলে। কিন্তু এক্ষেত্রে পারিবারিক দেয়ালগুলো পাথরের চেয়েও শক্ত, এসব ভেদ করে তা কিছুতেই বাইরে আসে না। এ হয়তো সমাজের জন্য কল্যাণকর, কিন্তু কোথাও ঘটছে না, তা তো বলা যায় না। আমার সেই ছেলে ততদিনে হয়ে উঠেছে আমার অস্তিত্বের সবচেয়ে নাজুক অংশ, যেখানে সামান্য আঘাতেই আমার মৃত্যু। ও আমার কাছে কোটিবার মুখস্থ করা একটি বই, যার প্রতিটি অক্ষরের হিসেব আমি জানি। আমি জানি সে সুস্থ, তার স্বপ্নদোষ হয়, সব সব। সাজিদুল যখন খবর দেয়, মেয়েটি দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে কোনো এক হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া করার জন্য, আমার মস্তিষ্ক বিকৃত করে দিয়ে একটা কথাই মনে হতে থাকে, এই আঘাতে আমার ছেলে নিশ্চিত মৃত্যুবরণ করবে। তারপরের ঘটনাগুলো দুঃস্বপ্নের মতো, কৌশলে মেয়েটিকে খবর দিয়ে আমি নিয়ে আসি। তাকে বোঝাই, তুমি এভাবে যেতে পার না, ও সুস্থ। সে কেমন উদ্ধত মাথা তোলে, তার সুস্থতা সম্পর্কে আপনি মা, আপনি কী জানেন?

আমি মেয়েটিকে অনেক বোঝাই, বলি, আমি মা। তোমাদের বিয়ে না হওয়া সত্ত্বেও তোমরা সম্পর্কের এই পর্যায়ে চলে গেছো, জেনেও তো কিছু বলছি না, বরং মেনে নিচ্ছি, তোমরা দু'জন দু'জনকে সবকিছুতে জানো, বোঝো আমি সেইটাই চাইছি, আমি ওর নাড়ি-নক্ষত্র চিনি, এ জন্যই বলছি। মেয়েটি বলে, তারপরও আমি যা বুঝছি আপনি তা বুঝবেন না, আমি আমার জীবনটা তো নষ্ট করতে পারি না!

এ-কথা শুনে আমি টানতে টানতে ওকে সাকিবের ঘরে নিয়ে গিয়ে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিই। আমার ছেলের সমস্ত পোশাক, লুঙ্গি, গেঞ্জি টেনে খুলে ওর ঝাঁকড়া চুল চেপে চুমু খাই মুখে। পাগলের মতো ওর শরীরের সমস্ত জায়গা স্পর্শ করতে থাকি আর প্রায় চিৎকার করে চলি, এইভাবে, এইভাবে একজন পুরুষকেও জাগাতে হয়, তুমি হয়তো তা জানো না, সে-ই শুধু স্পর্শ করবে তোমাকে? তুমি করবে না? এই দেখো এইভাবে...।

আমার ছেলে চিৎকার করে ওঠে, মা, তুমি এসব কী করছ? তুমি আমার মা, তোমার স্পর্শে কী করে আমার অনুভূতি হবে? এ কী সর্বনাশ করলে তুমি আমার! তুমি কী উন্মাদ হয়ে গেছ!

নিশির শিথিল হাত নিঃশব্দে নিচে নেমে আসে। ঠাণ্ডা কাপ মেঝেতে রেখে সে কেমন কুঁকড়ে ওঠে। তারপর মমতাদির কথা যেন ছায়ার মধ্যে, অদ্ভুত এক ঘূর্ণিপাকের মধ্যে তার করোটিতে ঝনঝন আঘাত করে, জানো, দেয়ালে ঠেস দিয়ে সেই মেয়েটি ভয়ার্ত কবুতরের মতো কাঁপছিল। কাউকে টেনেহিঁচড়ে খুন করার পর মানুষের যে অনুভূতি হয়, সেই ঘটনার পর আমার হয়েছিল সেই দশা। আমি দেখি দলা দলা রক্ত! যেন আমার সন্তানকে বটির আঘাত দিয়ে খণ্ড খণ্ড করে এইমাত্র আমি খুন করেছি! আমার বমি আসছিল, মাথা ঘুরছিল। মমতাদির দেহ ক্রমশ বেতের চেয়ারে আলুলায়িত, এই তো আমি বেঁচে আছি দিব্যি, আমার ছেলেটা ধীরে ধীরে, জানোই তো তুমি, আমি ডাইনির মতো প্রাণ খুলে তোমাদের সাথে হাসছি...।

ঝোলা নিয়ে নিশি দরজা পেরিয়ে দেখে, এঁদো গলিতে আশপাশের বাড়ি থেকে ঝপাঝপ ভোরের টাটকা ময়লাগুলো পড়ছে। সারারাতের ব্যথার পর মাথায় বিস্তারমান যন্ত্রণাটা সরে যেতেই নির্ভার হয়ে উঠেছে শরীর। দোতলার জানলা থেকে কেউ রোদের সমান্তরালে আয়না রেখে ঠিক নিশির চোখ টার্গেট করে। মুহূর্তে নিশির চোখ আতশী কাচ, ঝলসানো আগুনে বুজে আসে। কোন জানলা থেকে এই কাণ্ড, সহসা ঠাহর করা যায় না। ঘটনার আকস্মিকতায় নিশি হেসে ওঠে।

এই গলির ফাঁকে ফাঁকে অনেক আমগাছ, তার ফাঁকে ফাঁকে আবার রোদ্দুর, মুদির দোকান, এইসব পেরোতেই কোত্থেকে এক ঝাঁক জালালি কবুতর আছড়ে পড়ে সামনে। নিশি শিশুর মতো উচ্ছ্বসিত, ওদের ওড়াতেই, রিকশা।

সমস্ত পথঘাট নিখুঁত চোখে দেখে, ঠেলাঅলা, তার বাঁকানো মেরুদণ্ড, রুদ্ধশ্বাস মানুষ, ফুটপাতে পিঠা, সুসজ্জিত ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, কানা ভিখিরি, শরবতঅলা, উদোম শিশু আর কালো কাকেদের সমন্বয়, আলিশান অট্টালিকা...। বিভিন্ন দোকানের শিরোনামও পড়ে, আশ্চর্য! এখানে একটা ক্লিনিক, কতবার এসেছি-গেছি দেখা হয়ে ওঠে নি! নিশি জীবনের প্রথম একদম উদ্দেশ্যহীন ঘর থেকে বেরোয়। আবার কবে কোন দেশলাইয়ের মধ্যে ঢুকতে হবে, কে জানে! তার প্রস্তুতিই তো চলছে! বিশেষ করে সেদিনের পর থেকে মার যে মুখ— এখন তোর পা ধরে নিয়ে যাবে দেখিস!

কী ভয়ঙ্কর উনিদ্র রাত! নিশির তন্দ্রা পেয়েছিল। চিন্তার ঘায়ে তা আবার হয়ে গিয়েছিল শত টুকরো। ফালাফালা রোদ্দুরে মাথা ডুবিয়ে নিশি ভাবে, কী ছিল বিষয়বস্তু? হ্যাঁ, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সব খুলে বলব আফজালকে। হাসপাতাল থেকে শুরু করে যা যা ঘটেছে, সেদিনের রাতের কথাও। ভুল বুঝতে পারে আমাকে, ভাবতে পারে আমি পুরোটা বলছি না। সে যা খুশি ভাবুক, এইসব দুঃসহ মিথ্যের ভার থেকে, নিশির মাথা অসংলগ্ন হয়ে উঠছিল, এসব থেকে নিষ্কৃতি দরকার। একবার যখন বেরিয়ে আসতে হলোই, যখন বাবাকেও সহ্য করিয়ে ফেলছি আমার অবস্থাটা, তখন নিজেকে মেলে ধরে দেখি না কী হয়!

মুসতাফার আশ্বাস মতে বিএ পাশ করা পর্যন্ত এই মাটি কামড়ে থাকলাম। কিন্তু শুধু মুসতাফার ভরসায় কেন? তন্ন তন্ন করে অন্য কোথাও আমি নিজেও খুঁজব কাজ, সেলাই মেশিনটা আনিয়ে নেব, এ সবই নির্ভর করছে আমার সব সত্য জানার পর আফজালের প্রতিক্রিয়ার ওপর। মমতাদি খুব সন্তর্পণে আমার কোথায় যেন মস্ত একটা ঘা দিয়েছেন। বাঁচার সাহস বেড়ে যাচ্ছে আমার, মনে হচ্ছে, বড় দুর্বল আমার সহ্য ক্ষমতা। বাস্তবকে ভয় পাই বলে তার গায়ে নিরন্তর লাগিয়ে গেছি আলগা সোনালি রঙ! মা এতে ছোট হয়ে যাবেন, ফার্মেসি, ছিনতাইকারী— মা'র প্রতি তার শ্রদ্ধা নষ্ট হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে মার সম্মান বাঁচানোর দায়িত্ব আমার। আমি বলব, এভাবেই আমি মাকে বুঝিয়েছি। মা আমার কাছে যা শুনেছেন, তা-ই বলেছেন। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আফজালের আহত ক্ষুব্ধ মুখ আর তার চামড়ার রঙ বদলে যাচ্ছে। বিষয়টা যতই মর্মান্তিক হোক তার জন্য, আমি প্রমাণ করব সবকিছুর পরও সেই রাতে তার আচরণ অমানবিক ছিল।

নিশি প্রাসাদের গম্বুজের ওপর বিস্তারিত হতে থাকা রোদের দিকে চেয়ে ভাবে,

আমাকেও সে ভালোবাসতে পারে নি। আর এই সত্য লুকিয়ে সেও কি আমার সাথে অভিনয় করে নি ? আমি এইসব প্রসঙ্গ তুলব, বলব, যে স্বাতীর প্রতি তুমি প্রদর্শন করতে সীমাহীন ঘৃণা, তার প্রতি তুমি প্রবলভাবে আকর্ষিত হয়েছিলে। এই সবই বলব অত্যন্ত ভদ্রভাবে, তাকে বোঝাব, এ জন্য তোমাকে দায়ী করছি না, অস্বীকার, কৈফিয়ত কিচ্ছু করতে হবে না তোমাকে। এসব কথা এ জন্যই তুলছি, মানুষ নিজেও জানে না তার সত্যিকার বাস্তবতা কি, সেটা তাকে অজান্তে কোথায় নিয়ে দাঁড় করাতে পারে!

রিকশা থেকে নেমে নিশি পেস্ট্রিশপে ঢোকে। নানা রঙের প্লাস্টিকের চেয়ার। কোনার শূন্য টেবিলে বসে দেখে মানুষের নিভৃত আলাপচারিতা। সবাই যার যার সঙ্গীর সাথে মৃদু স্বরে কথা বলছে। যেন মুখোমুখি উপবিষ্ট আরেকজন, এমনভাবেই নিশির ভেতর থেকে প্রশ্ন উত্থিত হয়, এভাবেই কি সব ঠিক হয়ে যাবে ? আমার কথাটি ফুরোলো নটে গাছটি মুড়োলো ? তারপরও কি জীবন সত্য, সুন্দর আর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ভেতর অতিবাহিত হবে ?

স্রেফ এক গেলাস ঠাণ্ডা কোক! ওয়েটারকে বলে নিশি নিভৃতচারী মানুষজনের মুখগুলো দেখে। কত ভাঁজ, কত রঙ, এক জায়গায় বসে জীবনের কত বিচ্ছিন্ন বোঝাপড়া। দু'জন ছেলে রাজনীতি নিয়ে তর্ক করছিল, না সেই তর্কেও উত্তাপ নেই। নিশি লক্ষ করেছে, মানুষ ক্রমশ সারাজীবন এককভাবে কোনো দলকে সাপোর্ট করা ভুলে যাচ্ছে। বরং চোখ-কান খুলছে মানুষের, যে কোনো বিষয়ে অন্ধত্ব কেটে যাচ্ছে। ফলে খেলা হোক, রাজনীতি হোক, অন্ধ প্রেম থেকে যেসব রক্তারক্তি, যেসব মৃত্যু, এখন আর তেমন ঘটনা ঘটে না। এখন যেসব মৃত্যু হয়, তার পেছনে থাকে অন্য জিঘাংসা, অন্য কোনো বড় হাতের ইঙ্গিত। ছেলে দুটোর কণ্ঠেও সেই নিরপেক্ষতার সুর, তারা আচমকা কথা থামিয়ে নিশিকে দেখে।

নিশি ততক্ষণে ঠোঁট ডুবিয়ে দিয়েছে গেলাসে।

জীবনে ওইরকম একটা ঘটনার পর সাজিদুলকে কেন্দ্র করে মমতাদির আমাকে অতটা প্রশ্রয় দেয়া অস্বাভাবিক বৈকি! তার মুখ দেখে কখনো মনে হতো না এইসব বয়ে বেড়াচ্ছেন তিনি। বরং মানসিক প্রতিবন্ধী ছেলেটার জন্মের পর থেকে তাঁকে কেন্দ্র করে একের পর যেসব আতঙ্ক সেসবই তাঁকে শেষ পর্যায়ে অনেকখানি সুস্থির করে তুলেছে। সেই সন্তানের বদলে এক সময় ভর করেছেন সাজিদুলের ওপর। মানুষ জীবনে একজনকেই গভীরভাবে ভালোবাসে। পরবর্তী জীবনে তার ছায়া যেখানে যেটুকু দেখতে পায় তার ওপর নির্ভর করতে চায়।

ভবদুপুরে ফুটপাতের ভিড় ঠেলে রাজপথে দাঁড়াতেই একটা গাড়ি এসে থামে। কালো গ্লাস নেমে গেলে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে স্বাতীর মুখ, তোমাকে কত খুঁজছি, একটা খবর দেয়ার ছিল, ভেতরে চলে এসো।

এখানেই আমার জরুরি একটা কাজ আছে।

ওহ্ তাহলে তো রাস্তায় দাঁড়িয়েই বলতে হচ্ছে, আমরা বিয়ে করেছি, আগামী পরশু, আমার এদিকে তো কেউ নেই, তুমি থাকলে ভীষণ খুশি হবো।

নিশি হাসে, খবরটা শুনে খুশি হলাম! স্বাতী, তোমাদেরকে অভিনন্দন।

না, শুধু ওতে হচ্ছে না, তুমি সেদিন সকালেই আমার বাসায় চলে আসবে।

অন্ধকার সিঁড়ি টপকে আধাআধি তৈরি বাড়িটার পাঁচ তলায় গিয়ে দাঁড়ায়। রেলিংবিহীন চাতালের পাশে দাঁড়িয়ে হিমভয় জমে বুকে। নিচে আশ্চর্য খেলনা শহর। নিশি ছেলেবেলায় এখানে ছিল। তখন এত বড় রাস্তা ছিল না। সেই বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে নতুন মার্কেট হচ্ছে। মিস্ত্রিরা কাজ রেখে তার দিকে তাকায়, কাউরে খুঁজতাছেন?

নেমে আসে।

কচি কচি ডাব। নিশি দোকানের কাছটায় হেলান দিয়ে দাঁড়ায়, ধারালো ছুরির টানে খুলে গেল মুখ।

স্ট্র দিয়ে সেই জল টেনে ঘিঞ্জি রেস্তোরাঁয় বসে দেখে, এখানে সবাই পুরুষ।

বিপরীতে অভিজাত রাজধানী। কত যে বিল্ডিং হচ্ছে, মার্কেট হচ্ছে, গতকালকের দেখে যাওয়া জায়গাটাকে আজ নতুন করে আবিষ্কার করতে হয়। বিপদের জন্য সঞ্চয়— নিশি জন্মের পর থেকে এ কথাটা শুনে এসেছে। এই বোধ বেশিরভাগ মানুষকে বেহিসেবি হতে দেয় না। কিছু মানুষ আবার নিজের জীবনের ন্যূনতম বিলাস ত্যাগ করে, জমির পর জমি কেনে, বাড়ি তৈরি করে। মানুষ এসবই করে শেষ সময়ের সুখের জন্য, যে সময় তুলোর শয্যায় তলিয়ে থাকলেও ব্যথায় হাড় মটমট করে, ফলে তার যা মূল সময়, যৌবন, অবহেলায় খসে পড়ে।

ভিড় বাড়ছে। তার মুখোমুখি এসে বসেছে এক পানখেকো লোক। বিল মিটিয়ে নিশি বেরিয়ে পড়ে।

সন্ধ্যায় নিউমার্কেটের ভেতরকার লম্বাটে আসমান ইলিশের পেটের মতোন। সেদিকে চেয়ে সে দেখে, সব বাতি, সব ধোঁয়া ছাপিয়ে পৃথিবীতে ঘনীভূত হচ্ছে কমলা রঙের আলো এবং আকাশ সেই রঙকে পাকাটে করে তুলছে জমতে থাকা অদ্ভুত সব ছায়া দিয়ে।

নিশির ভেতর থেকে দীর্ঘশ্বাস ওঠে, আমি কি আসলে এই সন্ধ্যাই দেখতে চেয়েছিলাম?

স্নান সেরে নিশি ছাদের কার্নিশে বসে বিস্মিত হয়ে দেখে, গেটের সামনে রিকশা থেকে মুসতাফা এসে নামছে। ভেতরে সবাই ঘুমোচ্ছে। সে হাত উঁচু করে প্রায় চাপা কণ্ঠেই চ্যাচায়, ওপাশটায় সিঁড়ি, সোজা ওপরে চলে আসুন।

ছাদে এসে মুসতাফা হাসে, অবাক করে দিলাম তো?

আশ্চর্য আপনার ব্রেন! নিশি আন্তরিক তারিফ করে, সেদিন মুখে মুখে ঠিকানাটা বললাম, আমার মনে হচ্ছিল ভদ্রতা করে জানতে চেয়েছিলেন।

মানুষ সম্পর্কে শেষ ধারণা করতে নেই, খুব গম্ভীরভাবে কথাটা বলে মুসতাফা নিশির দিকে তাকায়, আমি নিশ্চয়ই ওই চেয়ারটায় বসতে পারি?

অবশ্যই! তো আপনার চার চাকা যন্ত্রটা কোথায়?

আপনি যেরকম গলির বর্ণনা দিয়েছিলেন! তাছাড়া বাড়ির সামনে ওরকম একটা উটকো পাহারাদার রেখে কোথাও কথা বলে স্বস্তি নেই। গলির ভেতরে এ সমস্যা বেশি, সবাই কটকট করে তাকিয়ে মেপে নিতে চায়, গাড়ির মালিক কে, কী জন্যে সে এ বাড়িতে এসেছে, এইসব হেনতেন। আসলে আমি আপনার সাথে সুস্থির কিছুক্ষণ গল্প করতে এসেছি।

বাব্বা, কী পরিমাণ হিসেব করে চলেন, তাই দেখছি।

না, এ ঠিক হিসেব না, আচ্ছা বাদ দিন তো উটকো প্রসঙ্গের কথা। আমি আপনাকে একটা প্রস্তাব দিতে এসেছি।

তো সেটা সেরেই, মনে হচ্ছে, পালাবেন! কোনো প্রস্তাব দেয়ার জন্য একটুখানি হলেও একটা পরিবেশ তৈরি করতে হয়।

এসব তো হচ্ছে ভদ্রতার কথা, দেখলেন তো, এ জায়গায় আবার আমার হিসেব ঠিক থাকছে না, মুসতাফা হাসে, আপনি একটা কাজ খুঁজছিলেন। সেদিন ওভাবে আপনাকে নিরুৎসাহিত করার পর আমার খুব খারাপ লেগেছে। আমার একটা বিশেষ গুণ আছে, আমি যাকে যা বলি, যার জন্য যা করতে চাই, সেটা করি আন্তরিকভাবে। সেদিন মনে হলো আর দশটা মানুষের মতো, আপনি গ্র্যাজুয়েট হন, সেটা বলে আমি যেন স্রেফ একটা দায়িত্ব এড়াতে চাইলাম।

না, না এ আপনার দায়িত্ব ছিল না, নিশি রক্তাভ হয়ে ওঠে, আপনি তো সেদিন ঠিকই বলেছিলেন।

দায়িত্ব শব্দটা এজন্যই বললাম, আপনি যে মুহূর্তে একটা প্রত্যাশা নিয়ে আমার কাছে গিয়েছিলেন, তখুনি কিছুটা দায় আমার ওপর বর্তে গিয়েছিল। পরে আমার মনে হয়েছে, আপনার সত্যিকার অবস্থাটি সূক্ষ্মভাবে আমার জানা দরকার ছিল। আমি একজন লেখকের কথা জানি, যে আত্মহত্যার আগের দু'দিন প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত ছিল। তার হাতে পয়সা ছিল না। যখন সে আত্মহত্যা করে তার কিছুক্ষণ আগে সে এক বন্ধুর কাছে গিয়ে কিছু টাকা ধার চেয়েছিল। বন্ধু তার মুখ দেখে বোঝে নি, সে ক্ষুধার্ত। সে লেখককে বলেছিল, পরদিন গিয়ে টাকাটা আনতে। না, আমি ও-খানটায় সঙ্গে আপনার অবস্থানের কোনোই তুলনা করছি না। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, কাজটা যদি এই মুহূর্তেই আপনার একান্ত অপরিহার্য হয়, গ্র্যাজুয়েট হওয়া পর্যন্ত আপনার যদি অপেক্ষা করা না চলে, সেক্ষেত্রে আমি একটু আন্তরিক চেষ্টা করে দেখলেই পারতাম।

নিশি সহসা কোনো কথা বলতে পারে না।

মুসতাফা চেয়ারে ঠেসে বসে, তো কি ঠিক করেছেন, আপনি কি সংসারে ফিরে যাবেন না?

আমি এই মুহূর্তে আসলে কিছু বলতে পারছি না। নিশি ইতস্তত করে বলে, কিন্তু আমার একটা কাজের সাথে ওখানে ফিরে যাওয়ার কি সম্পর্ক?

আপনি অর্ধেক বেলা আমার বইয়ের দোকানটার দায়িত্ব নিতে পারেন, মুসতাফা শব্দ করে লাইটার জ্বালায়। ফুটো আলো ভেদ করে যে ধোঁয়া উড়ন্ত, সেটা মুমূর্ষু রোদের সঙ্গে

এক হয়ে সামনে হালকা ছায়ার চক্র তৈরি করে। অবেলায় স্নান, নিশির শীত লাগে। ছাদে আছড়ে-পড়া মিহি বাতাসের স্রোতভারে সে নুয়ে পড়ে।

মুসতাফা টুসকি দিয়ে ছাই ঝাড়ে, এ জন্যই এত কথা! নিজের সংসারে ঠিক এই কাজটা কতটা অপরিহার্য হবে আপনার! আমি বলতে চাইছি, এটা এমন একটা কাজ, আপনি যা এই মুহূর্তের প্রয়োজনেই কেবল করতে পারেন। তা না হলে পড়াশোনা শেষ করে মানে একটা স্থায়ী কোনো কাজের চেষ্টাই করলেন, আমি কি বলতে চাইছি আপনি বুঝছেন ?

নিশি যেন অতল থেকে নিজেকে টেনে তোলে, আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ! বহুদিন আমাকে এভাবে কেউ অনুভব করে নি। আমার যে পরিস্থিতি, তাতে এখানে, আমার সংসারে সবখানেই আমার একমাত্র মুক্তি কাজের মধ্যেই। একটা বিষয় ঠিকই ধরেছেন আপনি, সংসারে গেলে ঠিক এই কাজটাই করতে চাইলে আমাকে একটা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে সেটা অর্জন করতে হবে। বিশ্বেস করুন, আমি স্বাধীনতা চাই না, আমি চাই আমার সংসারে তার সমান্তরালে দাঁড়াতে, এ আমার স্বাধীনতার বিনিময়ে হলেও।

এটাই আমাদের সমাজের বাস্তবতা নিশি, মুসতাফা ক্রমশ বিষণ্ন হয়ে ওঠে, পৃথিবীর সর্বত্রই এই। আপনি জানেন, ন্যুইয়র্কের একটা পার্কে আমি একজন বৃদ্ধ মহিলাকে অনেকক্ষণ লক্ষ করলাম। সে একা একটি বেঞ্চে বসে মুখের সামনে মেলে ধরেছিল আয়না। তার কম্পিত হাত বার বার চেষ্টা করছিল সঠিকভাবে লিপস্টিকটা লাগাতে। ফলে তার মাথা ঝুঁকে আসছিল, ছুঁচোলো হয়ে উঠছিল ঠোঁট। কিন্তু বয়সের ভারে সে এতো বেশি ন্যুব্জ, এত বেশি তার হাত কাঁপছিল, দেখে মনটা আমার ভীষণ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আপনার প্রসঙ্গের সূত্র ধরেই বলছি, আমরা সমাজের এমন একটা জায়গায় আছি, যেখানে যুক্তির প্যাঁচে দাম্পত্যজীবনে নিজেকে মানবিক করার প্রয়োজন পড়ে না। আমরা আমাদের মত, যা হয়তো একজন স্ত্রীর জন্য মোটেই স্বস্তির নয়, তার ওপর চাপিয়ে দিয়ে বলতে পারি, 'আমার ইচ্ছা'। কিন্তু সেই অযৌক্তিক দায় মাথা থেকে সরানোর জন্য একজন স্ত্রী আমাদের মতন স্পষ্ট কোনো অবস্থান নিতে পারে না। স্ত্রী সশব্দে এর প্রতিবাদ করে বলতে পারে না, না! তাকে এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য হতে হয় অনেক নমনীয়, ফেলতে হয় অনেক চোখের জল, নিতে হয় হাজার যুক্তির আশ্রয়। ভাঙনের ভয় স্বামী স্ত্রী দু'জনেরই প্রায় সমান থাকে, পুরুষ তার অহঙ্কারের চাপে সেই ভয় লুকিয়ে রাখতে পারে বলে স্ত্রীকে সেটা বহন করতে হয় উভয়ের চাপ। সেই চাপে ন্যুব্জ হয়েই সে নিজের ভয়টা লুকোতে পারে না।

এ যেন জাহিদের কণ্ঠ, নিশি অভিভূত হয়ে শোনে, এভাবে কেউ বিশ্লেষণ করলে নিজের মাথা থেকে অনেক ভার নেমে যায়। অথচ এই মুসতাফা, স্ত্রী তার সুবিধার জন্য বাইরে আছে, একে সে সম্মানের চোখেই দেখছে। সে নিজের জেদ চাপিয়ে দেয়নি তার ওপর। সেদিন এই প্রসঙ্গেই সে তার অভিমত প্রকাশ করেছিল, ধরা যাক, আমি আমার স্ত্রীর পূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, এরকম আরো অনেকেই হয়তো আছে, কিন্তু এ তো একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। সমাজের সার্বিক রূপকে এ দিয়ে কি যাচাই করা যায় ?

এসব প্রসঙ্গ টেনে জাহিদ বলত মানুষের সার্বিক প্রবণতার কথা। তার মত ছিল, মানুষ স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে। এর জন্য তার অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে ওঠে। পরাধীনতার বোধ তাকে পশুর চেয়েও অধম করে দেয়। কিন্তু যখন সে চূড়ান্ত স্বাধীন, তার মনে হবে এই

পৃথিবীতে তাকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো কেউ নেই, সে একা নিঃস্ব। মোদ্দা কথা, মানুষ নিজেই জানে না কোনটা তার সঠিক অবস্থা। তবে একটা কথা ঠিক, মানুষ নিজেকে শাসন করতে জানে না। তার অবচেতন মন এজন্যই একটা শাসন চায়।

নিশি সিঁড়ি টপকে নিচে নামে।

ততক্ষণে চারপাশ ছায়া হয়ে আসতে শুরু করেছে। নিশি মাকে বলে, নাস্তা পাঠাতে, বলে, আফজালের একজন বন্ধু! মা যেন একটা সমঝোতার স্বপ্নে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়েন, নিশ্চয়ই আফজলই তাকে পাঠিয়েছে।

সে ওপরে এলে মুসতাফা বলে, এখানে এসে খুব ভালো লাগছে। কিছুক্ষণ চুপ থেকে সে যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন কণ্ঠে বলে, একটা কথা বলি নিশি, এই যে আমাকে দেখছেন, স্ত্রীকে রেখে এদেশে পড়ে আছি, এর মানে এই নয় আমার স্ত্রীর ব্যাপারে আমার কোনো অনুভূতি নেই, ভালোবাসা নেই, বরং উল্টো, প্রচণ্ড আকর্ষণ ক্ষমতা তার, তার প্রতি আমার এমন প্রেম যে আমাকে এসময় আমার এক বন্ধু বলেছিল, তুমি প্রেমে পড়েছ, তোমার কাছ থেকে আর কিছু আশা করা যায় না।

নিশির বুকের কোথায় অদ্ভুত এক বেদনা হাহাকার করে ওঠে, নিজেকে ঢাকতে সে দু' হাত ওপরে তোলে। সাবলীল খোঁপা বাঁধে, তখন তার মধ্যে ভূতের মতো ভর করে মমতাদির ছায়া, এই রক্তাক্ত মহিলা, নিজের গুঁড়িয়ে যাওয়া অস্থিমজ্জা দিয়ে নিজেকে ফের নির্মাণ করেছে। কী অভিনব উপলব্ধি তাঁর, মানুষের জীবনে পাপ তার প্রাণের অস্তিত্বের মতোই অপরিহার্য। জীবনে পাপ আছে বলেই পুণ্য লাভের স্বস্তি আছে। পশুর সাথে তার পার্থক্য, মানুষ পাপী হয়। পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর সে, যে অনুতপ্ত। অথচ আফজাল, যুক্তির সরল সূত্র বোঝে না। নিশি যদি বলে, আমি কে? কী আমার অস্তিত্ব? আমার জন্মগ্রহণ এই পৃথিবী কতটুকু লাভবান হয়েছে? এই যে আমি দাঁড়িয়ে আছি, কিসের ওপর?

সে বলে, তুমিও দেখি নারীবাদীদের মতো কথা বলতে শুরু করেছ। মাথা থেকে ওসব ভূত ঝাড়ো।

নিশি যদি বলে, আমরা আরেকটু ভালো অবস্থায় গেলে, একটা সুন্দর খোলামেলা বাসা নেব।

সে বলে, বুঝেছি তোমাকেও স্বাতীর উচ্চাভিলাষ রোগে ধরেছে।

চারদিকে বাতি জ্বলে উঠেছে।

নিশি কেমন এলিয়ে পড়ে। আমি এখন কী করব?

মুসতাফা ব্যাগ খুলে শঙ্খ ঘোষের 'ঘুমিয়ে পড়া এ্যালবাম' বের করে। সেই অস্পষ্ট আলোতেই সেটা মেলে ধরে চোখের সামনে। তারপর তুমুল হেসে ওঠে, শুনুন, পল বলছে, কেন সেই সন্ধ্যায় আমার হয়ে কথা বললে না তুমি? কেন ওরা আমাকে অপমান করল?

হু আলি বলছে, আহ্ কী হচ্ছে পল! ওসব কথা ভোলো। এই দেখো, দেখো আবার আমরা কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছি।

পরদিন ভোরের আজানে নগরী যখন মুহ্যমান, লেপের নিচে নিশির তন্দ্রাচ্ছন্ন উষ্ণ দেহ ঠেসে যাচ্ছে, তখন দরজায় শব্দ।

মা ভয়ার্ত। নিশির কাছে আসেন, এত সকালে কে?

নিশি বাস্তব আর স্বপ্নের মাঝখানে গিয়ে সেই শব্দটা শোনে, বাস্তবের শব্দ স্বপ্নে একটা দৃশ্যের রূপ নেয়। যেন রিনি এসে দাঁড়িয়েছে, তার হাতে বাক্সপেটরা, ওরা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

এই স্বপ্নের ভয়াবহতা নিয়েই ঘুম ভাঙে।

মা দরজা খুলে দিয়েছেন।

মমতাদির মুখ মৃতের মতো ফ্যাকাসে। আরো শুষ্ক, আরো পাণ্ডুর তার সমস্ত অবয়ব। যেন তার যতটুকু রক্ত-মাংস অবশিষ্ট ছিল দু'দিনেই কেটে ঝুরঝুরে করে ফেলেছে নিভৃত কোনো করাত। হলদেটে আলোয় এই দৃশ্যকেও নিশির স্বপ্ন বলে ভ্রম হয়। মমতাদি মাথা নিচের দিকে নামিয়ে যেন ফিস ফিস করে নিশিকে বলেন, তোমাকে আমার সঙ্গে একটু যেতে হবে।

চারদিকে এত কুয়াশা, এক গজ সামনের কিছু দেখা যায় না। নিশির শীতার্ত দেহ ঠেসে থাকে রিকশার সাথে। রিকশার সামনের বাতি কুয়াশা ভেদ করার এক হাস্যকর চেষ্টায় লিপ্ত। নিশির ফাঁপা বুক ভেদ করে উদ্‌ভ্রান্ত প্রশ্ন উত্থিত হয়, কী হয়েছে? মমতাদি নিশির হাত ভয়ার্ত শিশুর মতো চেপে অস্ফুটে উচ্চারণ করেন, সাজিদুল আত্মহত্যা করেছে।

সামনের ছায়া ভেদ করে আচমকা চোখ অন্ধকার করে দেয় প্রাইভেট কারের তীক্ষ্ণ রশ্মি। রিকশা ব্রেক কষে। নিশি টের পায়, মুহূর্তে কেউ তার হাতের শিরা কেটে দিয়েছে। শরীর শিথিল করে সেই জায়গা থেকে গড়িয়ে পড়ছে অজস্র রক্ত, সেই রক্তের মাঝখানে বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দেয় একটি দৃশ্য, একটা করুণ কাতর মুখের ওপর জমছে দলা দলা থুথু। তারপর তার মাথায় আর কিচ্ছু কাজ করে না।

মমতাদি কী সব বলে যাচ্ছেন। কিছু কিছু তার কারণে আসে! এ জন্য আমি সব সময়ই প্রস্তুত ছিলাম। আমার জীবনে সে সেদিনই মরেছে, ওই যে হাসপাতালে, আমি তক্ষুণি নিশ্চিত ছিলাম, আরো কিছুদিন বাঁচল নিজের জীবন, সেই সঙ্গে অন্যের জীবনটা আরো তছনছ করার জন্য।

নিশির নিঃশব্দ পাঁজর ফুঁড়ে আর্তনাদের মতো প্রশ্নটা বেরিয়ে আসে, কখন?

কাল রাতে। লাশ নিয়ে গেছে পোস্টমর্টেম করার জন্য মেডিকেলে। চিঠিতে নিজের দেহ দান করে গেছে হাসপাতালকে। ক'দিন যাবৎই ওকে উদ্‌ভ্রান্ত মনে হচ্ছিল, আগেই বলেছিলাম না ও জীবনের প্রতি মায়া হারিয়েছে! নিশি, এবার আমি সবকিছু থেকে সত্যিকারভাবে মুক্ত, বলতে বলতে সেই চলন্ত রিকশায় দু'হাতে মুখ ঢেকে হাউ মাউ করে কেঁদে ওঠেন মমতাদি, বিশ্বাস কর নিশি, আমিই অস্পৃশ্য, যার গায়ে হাত দিই, যেখানে হাত দিই...।

নিশির চোখ ঝাপসা হয়ে আসে, আমি এখন কী করে বাঁচব? ও যে সারাজীবনের জন্য আমাকে দায়ী করে গেল!

মমতাদির পাঁজর ফুঁড়ে যেন বাতাসের মতো শব্দ বেরিয়ে আসে, এটা ও নিজের জন্যই করত। মৃত্যুটা ওর স্বপ্ন ছিল।

হাসপাতালের সিঁড়ির মধ্যে দু'জন নারী যখন জবুথবু হয়ে বসেছে, কুয়াশা ভেদ করে তখন সামনের বৃক্ষপল্লবে জমেছে রক্তের মতো রোদ। নিশি কোনোদিন কালো ভোরের ফুটফুটে রূপান্তর দেখে নি। আজ চোখে যখন স্পন্দন নেই, দেহে শুধু হাড্ডি, শুধু মাংস, দেখে, কীভাবে বিবর্তিত হচ্ছে সময়, কিছুক্ষণ আগের দেখা ছায়া ভেদ করে হীরক খণ্ডের মতো জ্বলজ্বল করতে থাকা তারাগুলো অপসৃয়মাণ। সশব্দে জেগে উঠছে নগরী, আর হুল্লোড় করছে হাজার হাজার কাক।

নিশি যেন ঘোরগ্রস্ত, এমন অস্ফুটে উচ্চারণ করে, তাই তো, সে তো সেদিনই মরে গিয়েছিল, না? প্রায় এক বছর আগে, মাঝখানের সময়টা দীর্ঘ একটা স্বপ্ন।

চন্দ্রলেখার জাদুবিস্তার

তার প্রাসাদটি কাঠের তৈরি। স্রোতস্বী নদীর জলে এ প্রাসাদের অর্ধেক ডুবে থাকে। দারুণ রূপসী সে। গলায় শাদা তসবির দানা, চামড়ায় দুধ ও রক্তের বিচিত্র মিশ্রণ। তাকে দেখে মনে হয় না, সে এই রাজ্যের নারী, তার ধবল দাঁতের স্ফুরিত আভায় যখন চতুর্পাশ ঝলসে ওঠে, যখন তার স্থির দৃষ্টির সম্মুখে সার সার নতজানু মানুষ, পবনের বেগে তার কণ্ঠ কাঁপতে থাকে, তখনই তার যথার্থ কাজের বিস্তার। তার মূল শক্তি, অদ্ভুত সম্মোহন ক্ষমতা। এ দিয়েই তার উত্থান।

তার নাম চন্দ্রলেখা। কথিত আছে নদী থেকে তার জন্ম। সে এক বিচিত্র উপাখ্যান। কাঠের পাটাতনের ওপর ভাসছিল তার দেহ। কাঠের কী মহিমা— গর্জনরত জলও তার নিঃশ্বাস স্পর্শ করতে পারে নি। এ কাহিনী সবাই জানে। সবাই জানে, জলে ভেসে আসা চন্দ্রলেখা মানুষের চেয়েও বড় কিছু। সব ধর্মের লোকই তার কপালে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে পায় প্রত্যেকের নিজস্ব ধর্মের রাজটিকা চন্দ্রলেখার কপালে জ্বলজ্বল করছে।

আর ঘুমের মধ্যে হেসে ওঠে চন্দ্রলেখা। নদীর ঢেউ কাঁপতে কাঁপতে পাহাড়ের দিকে ছুটে যায়। পাহাড়ের চুড়োয় বাস করে এক বাদুড়। রাতে চন্দ্রলেখার ছাদের ওপর এসে বসে।

দূর গ্রামবাসী স্পষ্ট দেখে নদীর ওপর দাঁড়িয়ে আছে যে প্রাসাদ, তার ওপর পায়চারি করে যে রূপসী নারী, তার আঙুলের ডগায় বাদুড়। আধ্যাত্মিক ভয়ে কম্পিত গ্রামবাসী সেজদা করে তাকে।

সারারাত জেগে থাকে ইদ্রিস। সবাই যখন নিস্তব্ধ ঘুমে অচেতন, ইদ্রিসের পেটে লুকিয়ে থাকা হা-হা খিদে তখন বিকট আকৃতি নিয়ে জেগে ওঠে। খিদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে তার রাত পার হয়। পরাজিত ইদ্রিস বিছানায় অবসন্ন দেহে শুয়ে শুয়ে গোল চাকতির মতো আসমান দেখে। এক সময় সে উঠে আসে। সারিবদ্ধভাবে সানকি বিছিয়ে বসে আছে পঙ্গপাল, ততধিক কৃশকায় মা। যার পরনে ঠিক শাড়ি নয়, কলাগাছের পাতলা আঁশ, কোটরে নিষ্প্রভ চোখ— ঝাঁকুনি দিলে সর্বাঙ্গে শুধু কঙ্কালের হাড়ের শব্দ, সে উনুনে জ্বাল দিচ্ছে।

নিমের ডাঁটায় দীর্ঘক্ষণ দাঁত গুঁতোগুতি করে অসহিষ্ণু ইদ্রিস লক্ষ করে, ডাইনির মতো টানটান মুখে মহিলাটি যেন অনন্তকাল ধরে ধোঁয়া গিলছে। সানকির ওপাশে কিচিরমিচির শুরু হয়েছে। ইদ্রিস টেনে ঢাকনা উদোম করে।

শূন্য জলে বুদ্বুদের মতো ধোঁয়া উঠছে।

ইদ্রিসের বাড়ির শূন্য সানকির বাতাস প্রথমে বিস্তৃত ধানী জমিতে গিয়ে পড়ে। এরপর মাখামাখি সবুজ নিয়ে উড়তে উড়তে যখন তা স্পর্শ করছে কাঠের প্রাসাদ, ফুলে উঠছে নদীর ঢেউ, কঙ্কতিয়ায় চুল বিন্যস্তরত দাসীকে চন্দ্রলেখা প্রশ্ন করে, বাতাসের প্রায় পুরোটাতেই ইঁদুরপোড়া গন্ধ অথচ মাঝে মাঝে সবুজ ঘ্রাণ আসছে কেন?

দাসী রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসে, এই হা-ভাতে বাতাস ইদ্রিসের বাড়ি থেকে আসা, কী বিকট গন্ধ! ধানী জমির কিছুটা পবিত্রতা গিলে তবেই সে পুণ্যবতী চন্দ্রলেখার কাছে এসেছে।

এরপর চন্দ্রলেখা ভাবতে বসে, ইদ্রিস কী করে হা-ভাতে হয়? কিছুক্ষণ পর দেহরক্ষী এসে উত্তপ্ত কণ্ঠে জানায়, অঞ্চলের এক চৌকস যুবক, যে দীর্ঘদিন শহরে লেখাপড়া করে সদ্য এ অঞ্চলে এসেছে, সে ইদ্রিসদের পেছনে রেখে চন্দ্রলেখার বিরুদ্ধে দল গঠন করছে।

মুহূর্তে জ্বলে ওঠে চন্দ্রলেখার চোখ। সুদর্শন দেহরক্ষী স্পষ্ট অনুভব করে, সব সবুজ ভস্ম হয়ে যাচ্ছে। বাতাসে কেবল পোড়া বারুদের গন্ধ।

সে পিছু হটতে থাকে।

মুহূর্তে চন্দ্রলেখা তার চিরদিনের আচরণে ফিরে আসে... দীর্ঘ ঘুমে ডুবতে ডুবতে আরক্ত ঠোঁট যুগল দিয়ে সে দেহরক্ষীকে আকর্ষণ করে, তার ঘ্রাণময় বক্ষ দেহরক্ষীর অবাধ বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়; কিন্তু চতুর্পাশের স্বপ্নঘোরেও চন্দ্রলেখার সাবধানী হাত চেপে রাখে খোঁপার তাবিজের মধ্যে বাঁধা দুর্লভ দ্রব্য, মৃত্যুর বিনিময়েও চন্দ্রলেখা যা হাতছাড়া করতে পারে না। তার উষ্ণ কণ্ঠ ঘোর অতলে ডুবতে থাকে— শহুরে ছেলেটা কি খুবই তেজস্বী?

সে এক অভিনব উপাখ্যান।

চৌদিক নদী-পাহাড়বেষ্টিত এই অঞ্চলে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর এবং চরিত্রহীন এক শাসক ছিল। দীর্ঘদিন তার শাসনে অভ্যস্ত মানুষ ক্রমেই চেতনালুপ্ত হয়ে পড়ছিল। তারা ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলছিল নিজেদের মেরুদণ্ডের শক্তি। নিঃশেষিত গ্রামবাসী যতই দিন যাচ্ছিল, ততই পতিত হচ্ছিল গভীর গাড্ডায়, তাদের খাদ্য ছিল না, বস্ত্র ছিল না, মাদুরে শিথিল শরীর বিছিয়ে দিয়ে তারা দেখত ফাঁপা ধোঁয়ার চক্কর, এমন অবস্থায় তাদের অবলম্বন হয়ে উঠছিল কেবল কুসংস্কার এবং ভয়।

এমনই এক সময়ে কাঠের পাটাতনে ভাসতে ভাসতে সে রাজ্যে আসে এক অচেতন নারী। সেই অচেতন রূপের বহুবর্ণ মহিমায় নদীর স্রোতে যেন অগ্নিখণ্ড ঝলসে ওঠে।

আসমানে মেঘ, অথচ রৌদ্রে আলোকিত নদী?

এই প্রশ্নে হাজার চোখ একত্র হয়। সে নারীর আলোক বিচ্ছুরণে আক্রান্ত গ্রামবাসী নদীর ধারে ভিড়ের মধ্যে এই ভয়াবহ রূপ পর্যবেক্ষণ করে স্তম্ভিত হয়ে যায়। ডাঙায় এসে জলসিক্ত নারীর যখন জ্ঞান ফেরে, নিজেকে সে আবিষ্কার করে শেকড়বিহীন, পরিচয়হীন এক ছিন্নমূল মানুষ হিসেবে।

চারপাশে হাজার মানুষবেষ্টিত চন্দ্রলেখা চোখ বন্ধ করে। ভিড়ের মধ্যে সহস্র কণ্ঠ ধ্বনিত হয়, কে তুই? কী তোর পরিচয়?

চন্দ্রলেখা স্তব্ধ।

জিন, পরি, ডাইনি, নানা মত গুঞ্জরিত হতে থাকে। চন্দ্রলেখা যখন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ঢলে পড়ছে তখন তার ক্ষিপ্র হাত চলে যায় কোমরের পুটলিতে।

খোয়া যায় নি? মুহূর্তে বিদ্যুৎচালিত শক্তি তাকে খাড়া করে। হতবিহ্বল মানুষগুলো তার এই আকস্মিক রূপান্তরে পিছু হটতে থাকে। তাদের সবারই দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হয় চন্দ্রলেখার চোখে। মুহূর্তে হা-ভাতে মানুষগুলো স্তব্ধ হয়ে যায়। চন্দ্রলেখার দেহের স্থানে দেহ নেই। বিষকাঁটালির গাছ। সটান মেলে থাকা চক্ষুতে গাঁজার ধোঁয়ার বিস্তার।

চন্দ্রলেখা সেই খোলা প্রান্তরে সহস্র মানুষের ভিড়ে প্রথম যে কথা উচ্চারণ করে, তাতে গ্রামবাসী স্তম্ভিত হয়ে যায়। 'আমি এই গ্রামেরই মেয়ে ছিলাম। তোমরা স্মরণ কর, বাহাত্তর বছর আগে কেশব চাটুজ্যের কনিষ্ঠা কন্যা, যে তখন নিতান্ত শিশু, নদীতে পড়ে মারা গিয়েছিল কি না!'

অত্যাচারী রাজার শাসনপদ্ধতির মূল পুঁজি ছিল জনগণকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা। এই অঞ্চলের শাসন ভার পাওয়ার পর সে নিজের প্রধান পেশা হিসেবে গাঁজার ব্যবসাকে গ্রহণ করেছিল। সাহায্যের প্রত্যাশায় বহির্বিশ্বের সামনে এ অঞ্চলের কঙ্কালসার মানুষ প্রদর্শন করত সে। তার এই মিশন ছিল অত্যন্ত সফল। ধনসমৃদ্ধ রাজ্য থেকে প্রচুর সাহায্য আসত। সে সব উদরস্থ করে দারুণ ফুলে-ফেঁপে উঠছিল সে। অন্যদিকে রমরমা গাঁজার ব্যবসা তো ছিলই।

মানুষ ধীরে ধীরে অন্ন খেতে ভুলে গেল, বস্ত্র পরতে ভুলে গেল। পেটের মধ্যে, মস্তিষ্কের কোষে কোষে ধোঁয়া। সেই ধূম্রকুণ্ডলীর ফাঁকে ফাঁকে রাজা টলমল হাঁটে। সিন্দুকের ঢাকনা খুলতেই লাফিয়ে ওঠে স্বর্ণখণ্ড। রাজা খপ করে তা ধরে ফেলে উল্টোপাল্টা নাচতে থাকে।

সেই রাজা বাইজির শরীরে যখন উপগত, যখন তার কণ্ঠে ধিনাক ধিনাক, চূড়ান্ত মৌজে মুখ নুয়ে এসেছে বাইজির উষ্ণ ঘন নিঃশ্বাসের প্রস্রবনে, তখন বাইজি তার চুনরাঙা জিভ নাড়িয়ে ফিসফিস করে রাজাকে চন্দ্রলেখার বার্তা জানায়। জানায়, সে আমার চাইতেও সহস্র গুণে রূপসী।

চন্দ্রলেখাকে উদ্ধার করে গ্রামের এক নবীন, সুদর্শন যুবক।

তখন পূর্বজন্মের নানা ফিরিস্তি দিয়ে যাচ্ছে সে, বলছে, তার জন্মের সময় যখন কলেরায় শত শত লোক মরছে... শুধু মৃত্যু, কঙ্কাল, সে কী বিভীষিকাময় পরিস্থিতি, তখন চন্দ্রলেখার বাড়িতেও সেই রোগ এলো। পিতা মরল, মাতা মরল। চন্দ্রলেখার দিকে যখন সেই মৃত্যু যম-হাত বাড়াবে, তখন এক শিশুসাপ চন্দ্রলেখার শরীর বেষ্টন করেছিল। যমের ছোবল গিয়ে পড়েছিল সাপটার ওপরই। মৃত্যুর বিনিময়ে সাপ তাকে প্রাণ দিয়েছিল। এই কাহিনী প্রবাহিত ছিল বহু দূর গাঁ পর্যন্ত। মৃত্যুর পর জলের তলায় চন্দ্রলেখার যার সাথে প্রথম পরিচয় হয়, সেই ওই গোখরো। সেই গোখরো এখন চন্দ্রলেখার সর্বক্ষণের সহচর।

এমনিতেই অধিকাংশ লোক থাকে ধোঁয়ার গন্ধে বিভোর। সেই বিভোরতার মধ্যেই চন্দ্রলেখার রূপ, কথার অনির্বচনীয় ভঙ্গি ইত্যাদি নিয়ে লোকগুলো গভীর গাড্ডার তলাতে গিয়েও দুরছাই করে— ডাহা মিছা কথা! বেবাকটাই ধাপ্পাবাজি।

এ সময় সেই যুবক আসে। সবার নেশালু চোখের সামনে সে ঝলসানো চাকু ঘোরায়। চন্দ্রলেখাকে আড়াল করে সে বিরাট আকৃতি নিয়ে দাঁড়ায়। এই যখন অবস্থা, তখন প্রাচীন বৃক্ষের নিচ থেকে গ্রামের সবচেয়ে প্রবীণ একশো বিশ বছর বয়সের বৃদ্ধকে ডেকে আনা হয়। তার চোখের পাপড়ি পশমের মতো শাদা। চোয়ালের গভীর গর্ত মাঢ়িতে গিয়ে ঠেকেছে। গায়ের ঝুলঝুলে চামড়া দেখে মনে হয়, ভেতরে মাংস নেই, শুধু জল।

বাঁকানো দু'পা ঠেলতে ঠেলতে সে যখন বিশাল বহরের সামনে উপস্থিত, চাকু-ভীত মানুষগুলোর মধ্যে নতুন শব্দ গুঞ্জরিত হয়। জোঁকের মুখে নুন হয়ে বৃদ্ধ যখন ক্রমেই এগোতে থাকে চন্দ্রলেখার দিকে, তখন ছেড়ে দেয়া রক্ত দেখার প্রত্যাশায় অধিকাংশ লোক হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

সব চুপ! চাকুওয়ালা ফের গগনবিদারী চিৎকার দিলে লোকগুলো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায়। টলমল শিশুর মতো হামাগুড়ি দিতে দিতে স্মরণ করতে চেষ্টা করে, ক্যাডা তুমি মাইয়া? কেশব চাটুজ্যে বইল্যা তো এই গেরামে কোনো মানুষ আছিল না!

বৃদ্ধের এই উচ্চারণে জনারণ্য প্রচণ্ড উষ্মায় ফেটে পড়তে চায়। চঞ্চল হয়ে ওঠে লোকজন। চিৎকার করে তারা চন্দ্রলেখার দিকে এগিয়ে আসতে চায়, ভাঁওতাবাজি মারো?

সটান দাঁড়ায় চন্দ্রলেখা।

তার চোখ ফেটে আগুন বেরোতে থাকে। দীর্ঘ চুল কাঁপতে থাকে বাতাসে। তীব্র সম্মোহন যখন তরঙ্গিত, যখন পুরো পরিস্থিতি চূড়ান্ত নাটকীয়, তখন আকাশের বাতাসে চড়ে হেলিকপ্টার আসে। তার পিঠ বোঝাই রিলিফে। সুরম্য প্রাসাদের ছাদে গিয়ে দাঁড়ায় অঞ্চলের রাজা। ক'দিন আগে আচমকা টর্নেডো এসে অঞ্চলের একাংশ গুঁড়ো করে দিয়ে গেছে। মানুষের পেট ফুঁড়ে ঢুকে গেছে ঝড়ো বাতাসের টিন। বজ্রাহত সারসার পোড়া গাছগুলো দণ্ডায়মান। পুরো অঞ্চলে অর্ধমৃত মানুষের আহাজারি। এখন মানুষ পরিস্থিতি সামলে নেয়ার চেষ্টা করছে।

রাজা প্রাসাদের ছাদ থেকে হেলিকপ্টারকে ডাকে, আয়... আয়...।

হেলিকপ্টার নেমে এলে রাজা চন্দ্রলেখার ভাবনায় ডুবে যায়। প্রাসাদের সমস্ত নারী তার কাছে বিষাক্ত হয়ে ওঠে।

এদিকে চন্দ্রলেখা তখন তার চোখের স্ফুলিঙ্গ দিয়ে বিদ্ধ করছে বৃদ্ধকে।

কম্পিত বৃদ্ধের কণ্ঠ থেকে মুহূর্তে অন্য উচ্ছ্বাস তরঙ্গিত হতে থাকে... হ, মনে পড়তাছে। কেশব চাটুজ্যে... সে ছিল গগন চাটুজ্যের পুত্র। আহারে! গেরামে কী কালারোগ আইছিল, আমার বয়স তহন কত?

এরপর চন্দ্রলেখার সর্পজনিত কাহিনী ছাড়াও বৃদ্ধ চন্দ্রলেখাকে শনাক্ত করে আরো বিচিত্র কাহিনী ফাঁদতে থাকে।

সে জানায়, চন্দ্রলেখার জন্মটাই একটা আশ্চর্যজনক ঘটনা। ছ' মাসে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল বলে স্বপ্নে দেখা দরবেশের নির্দেশে তাকে কয়েক মাস নদীর জলে কাঠের ওপর ভাসিয়ে দেয়া হয়েছিল। অদৃশ্য জিনেরা চন্দ্রলেখার রক্ষণাবেক্ষণ করত।

বৃদ্ধের এরকম বর্ণনায় পুরো পরিস্থিতি যখন কব্জাগত, শঙ্কাকুল মাছের মতো জনতা পিছিয়ে যাচ্ছে, চন্দ্রলেখা অভিভূত হয়ে বৃদ্ধকে পর্যবেক্ষণ করে, সে অনুভব করে, সব ক্ষেত্রে নদী এবং কাঠ তার জন্য কল্যাণকর।

জনতা যখন অপসৃয়মান— চন্দ্রলেখা লক্ষ করে, বৃদ্ধের চোখে জল নয়, জমজমের পানি। ফিসফিস করে কাঁদছে সে, তুই কে মা? আমি তরে রক্ষা করলাম... বেআব্রু হইতে দিলাম না। এরপর চন্দ্রলেখা রাজার নির্দেশে প্রাসাদে উঠে আসে।

চন্দ্রলেখা যখন স্মৃতির গভীরে নিমজ্জিত, তখন দেহরক্ষী আসে। তার মাথায় চিরকালের পর্দা। এ নারীর চুলেও আছে ঘনরহস্য। চিহ্নিত দাসীটির সাধ্য নেই তার খোঁপায় হাত দেয়। চূড়ান্ত রোমান্সে চন্দ্রলেখা যখন কম্পিত, তখনো দেহরক্ষী লক্ষ করেছে, সব পর্দা অন্তর্হিত হলেও চন্দ্রলেখার খোঁপার পর্দা খোলে না। কখনো আচমকা সেদিকে হাত পড়লে তার কণ্ঠ থেকে বিষ উদ্‌গারিত হয়েছে। তোমার দায়িত্ব শুধু দেহ পর্যন্তই...।

ঘোর আক্রান্ত দেহরক্ষী নির্দিষ্ট সীমায় বিচরণ করেছে। আর কোনো প্রশ্ন তার মধ্যে স্বপ্নেও উঁকি দেয় নি।

কিন্তু চন্দ্রলেখার মাথার পর্দা অকস্মাৎ তাকে বিমূঢ় করে তোলে। সে ভাবে, খোঁপার আব্রু নারীকে কমনীয় করে তোলে। তীব্র রূপের অপূর্ব মহিমায় সে কাঁপতে থাকলে চন্দ্রলেখা বিচিত্র কণ্ঠে বলে ওঠে, নিশ্চয়ই শহুরে যুবকের আন্দোলনের বার্তা নিয়ে এসেছ? আমার সৈন্যরা কোথায়? তারা কি কোনো ব্যবস্থাই নিচ্ছে না?

দেহরক্ষী ছায়া চক্রাবর্ত থেকে নিজেকে টেনে ওঠায়, আগের অত্যাচারী রাজা প্রতিবাদকারীদের ঘোড়ার খুরের তলায় পিষে মারত। সমস্ত প্রজা আপনার মোহে মুহ্যমান। তারা আপনাকে পুজো করে। এই অবস্থায় আপনিও কি রাজার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বিতর্কিত হতে চান?

চন্দ্রলেখার স্থির দৃষ্টি কঠিনভাবে দেহরক্ষীর চোখে নিবদ্ধ, তুমি প্রতিবাদী যুবককে আমার কক্ষে আমন্ত্রণ জানাও। আমি একা তার সাথে কথা বলব।

তখন বাংলাদেশে ঘোর দুর্দিন। বন্যার করাল গ্রাস থেকে বেরিয়ে আসার পর পুরো দেশের ডায়রিয়া পরিস্থিতি মারাত্মক। পোকামাকড়ের মতো মানুষ মরছে। এরশাদের বিরুদ্ধে মামলা এবং শাস্তির মেয়াদ ক্রমেই বাড়ছে। গ্রামে বাড়ছে ধর্ষণের ঘটনা এবং ডায়রিয়াজনিত কারণে ভয়াবহ পরিস্থিতিতে বাড়ছে শিশুমৃত্যুর হার। বাজারে চালের মূল্য কম। যেহেতু বাঙালি বাঁচে ভাতের ওপর, সেহেতু বিষয়টি অত্যন্ত সুখের হতে পারত; কিন্তু কৃষক তার প্রাপ্য মূল্যের কিয়দংশও পাচ্ছে না। ফলে সাধের ফসল নদীতে নিক্ষেপ করে কেউ আহাজারি-চিৎকারে বাতাস আর্দ্র করে তুলছে, কেউ করছে আত্মহত্যা।

ভার্সিটির ছেলেদের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে ছিনতাই প্রবণতা।

হাসিনা বলছে, খালেদা স্বৈরাচারেরই আরেক রূপ।

খালেদা বলছে, শুধু প্রতিবাদের জন্য প্রতিবাদ করাই হাসিনার স্বভাব।

এই রকম পরিস্থিতিতে প্রেসক্লাবে আকস্মাৎ সাংবাদিকদের ওপর হামলা হলো, পুরো পরিস্থিতিতে শুরু হলো নারকীয় নির্যাতন, তখন গভীর রাতে ঝমঝম... সমস্ত শহর ডুবিয়ে কুয়াশার মতো বৃষ্টি শুরু হলো। দূরে দেখা যাচ্ছে কোকাকোলার বিজ্ঞাপনের সবুজ বাতি, বৃষ্টির ঘোর ছায়া ছিন্ন করে সে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে কী অদ্ভুত কোমলতায়!

এমন সময় এদেশেরই একজন সাংবাদিক, মিস্টার কে. আলী বারান্দায় এসে দাঁড়ান। তার মাথায় সারাক্ষণ সংবাদের পোকা কিলবিল করে। বস্তুনিষ্ঠ সংবাদের আশায় তিনি সমস্ত বাংলাদেশের অণু-পরমাণু চষে বেড়ান। অত্যন্ত ডেসপারেট এই চিরতরুণ সাংবাদিক বিচলিত মুখে বারান্দায় এসে দাঁড়ান।

তার বিড়ির ধোঁয়া এবং বৃষ্টির ধোঁয়ায় বারান্দা একাকার হয়ে ওঠে, শেষে সাংবাদিকদের ওপর হামলা ? বাকস্বাধীনতার ওপর নগ্ন আক্রমণ ? আগামীকালকের প্রতিবাদের ভাষা কতটা তীক্ষ্ণ করা যায় ? রিপোর্টের ভাষা কেমন হলে সে খবরটি সত্য এবং ঝাঁঝালো হবে ?

গভীর রাত।

অর্ধেক সিগ্রেট ছুঁড়ে ফেলে তিনি প্যাড টেনে নিচ্ছেন। কখনো গভীর বৃষ্টির মধ্যে সে কাগজ ছুঁড়ে দিচ্ছেন, না, কিছুতেই মগজের কোষ সুস্থির হচ্ছে না। কোষগুলো যেন পাগলা ঘোড়া। বদ্ধমাথা থেকে বেরিয়ে দিগ্বিদিক ছুটতে চাইছে। হচ্ছে না একত্র। মিষ্টার এম. আলী কখনো বিছানায় উদ্‌ভ্রান্ত মাথা এলিয়ে দিচ্ছেন, কখনো ছুটে যাচ্ছেন খোলা বারান্দায়। ভাবছেন, নিঃসঙ্গ জীবন কুয়াশা ভেজা মধ্যরাতের কুকুরের মতো— নিজেকে সংযত করে সুইচ অন করতেই পর্দায় ছবি।

এত রাতে ছবি ? তবে সুইচ অন করলাম যে ?

আহ্ মাথাটা বিগড়ে গেছে, ভাবতে ভাবতে ছবিতে চোখ যায়, এক অপূর্ব সুন্দরী রমণীকে দেখা গেল কাঠের প্রাসাদে শায়িত। তার হাতে পানপাত্র, কপালে তিলক। কী অনির্বচনীয় তার ভঙ্গি, খোঁপায় বাঁধা পর্দায় কী অভিনব কারুকাজ!

দরজা খুলে যায়।

সে ঘরে প্রবেশ করে এক কান্তিমান যুবক। মুহূর্তে নারীর স্তব্ধ-চামড়ায় টান পড়ে। নিজেকে বিন্যস্ত করে জলার্দ্র কণ্ঠে নারী প্রশ্ন করে, একশো বিশ বছরের বৃদ্ধের কোনো খোঁজ পাওয়া গেছে ?

কান্তিমান যুবক তেজস্বী কণ্ঠে বলে, চন্দ্রলেখার রাজ্যের যে প্রান্তেই সে থাকুক, আমি তাকে হাজির করব, আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন রানী।

মিস্টার এম. আলী সুইচ বন্ধ করে শাদা কাগজের দিকে চেয়ে ভাবতে চেষ্টা করেন, সত্যিই তার মাথাটা বিগড়ে গেল কিনা ? না, মাথা ঠিক আছে। কেবল ঘোড়াগুলো ছুটতে চাইছে! কী ভাবছিলাম আমি ? ওহ্ কুয়াশা কুকুর। ওর সাথে এই দৃশ্যের সম্পর্ক কী ? অথচ গতকালই তো কাউকে বলছিলাম, নিঃসঙ্গতা আমার এত কাঙ্ক্ষিত, মাঝেমধ্যে নিজের উপস্থিতি আমাকে বিরক্ত করে। মিস্টার এম. আলী অনুভব করেন, না, সমস্যা কোথাও একটা হচ্ছে।

সেই গ্রামেরই উচ্চবিত্ত এক যুবককে চন্দ্রলেখার দেহরক্ষী হিসেবে নির্বাচন করা হয়। একদা নদী থেকে উত্থিত চন্দ্রলেখাকে যে যুবক উদ্ধার করার জন্য দাঁড়িয়েছিল জনতার মাঝখানে। এর আগে, অত্যাচারী রাজাকে পরাভূত করে চন্দ্রলেখার রানী হওয়ার ইতিহাস আরো চমকপ্রদ। নদী থেকে উত্থিত হওয়ার পর সে যখন রাজপ্রাসাদে উঠে গিয়েছিল, সৈন্যবেষ্টিত হয়ে অত্যাচারী রাজা তার মুখোমুখি হয়ে কম্পিত কণ্ঠে চন্দ্রলেখাকে প্রশ্ন করেছিল, তুমি আসলে কে ?

চন্দ্রলেখার স্বরে শ্লেষ, চোখে বিদ্রূপের কটাক্ষ, একজন নারীর কাছে আসতেও রাজার পেছনে সৈন্য রাখতে হয় ?

দেহরক্ষী প্রশ্ন করে, এত কী ভাবছ রানী ? নিজের বুদ্ধি এবং বীরত্বে অভিভূত চন্দ্রলেখা দেহরক্ষীর হাত টেনে বলে, ভাবছিলাম অত্যাচারী রাজার কথা, সে শুনে তোমার কাজ নেই— এবার চৈত্রসংক্রান্তির মেলায় তুমি সর্বত্র আমার বার্তা ঘোষণা করে দাও। মানুষের মনে চিরস্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করো আমাকে, জানিয়ে দাও, আমি কে ?

যেন ঘাস ফুঁড়ে দাঁড়িয়েছে মাটির আদম।

তার বরফ চোখ শীতল, ফিনফিনে পাতলা কান, চুল পশমের মতো। গায়ের রঙ এত কালো চাঁদের ছায়া না পেলে রাক্ষুসী অন্ধকার গিলে খেত। সে বৃহৎ বৃক্ষের গর্ভে দেহ সেঁধিয়ে দেয়। সেই কোটরে বসে সে গভীর নিস্তব্ধতায় এমন ঘাপটি মেরে থাকে, চারপাশে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত হয় না।

এদিকে আসমানের বিশাল কড়াইয়ে তখন মুড়ির মতো তারা ফুটতে শুরু করেছে। নিচে গুঁড়ি গুঁড়ি বালুর মতো কুয়াশা। মেঘখণ্ডের ফোকর গলিয়ে চাঁদবুড়ির এক চক্ষু দেখা যায়। স্তব্ধ হয়ে উঠেছে চারপাশ। অন্ধকার বৃক্ষের সাথে একাকার সেই একশো বিশ বছরের বৃদ্ধের দেহ কাঠ হয়ে আসতে থাকে।

হঠাৎ শব্দ—।

শুকনো পাতা পিষে কারা এগিয়ে আসছে।

বৃদ্ধের কোটর থেকে দু'টি নয়, যেন দশ চক্ষু বিস্ফারিত হয়। বেশ কিছুটা দূরে একটি শূন্য খাড়া মঠ, তারও পেছনে যতদূর দৃষ্টি যায়, ভাঙা মন্দির। মাটির মঠের পাশ ঘেঁসেই হাঁটছে মাটির মানুষেরা। আপাতত তারা রূপ নিয়েছে ছায়ায়। ছায়া জ্যোৎস্নার নিচে বিচলিত ছায়াগুলোর কেবল অস্থির নড়ানড়ি।

এদিকে খাঁচার মধ্যে বৃদ্ধের হৃৎপিণ্ড ধড়ফড় করে। রক্তের মধ্যে ভীত কণিকার কিলবিল নাচন। ছায়াগুলো আঁধার ভেদ করে টর্চ-আলোর টুসকি মারে। গঞ্জিকায় আসক্ত কোনো এক কণ্ঠের টানা উচ্চারণ, শালা হাওয়া হয়া গেল ?

এরপরেই ধুপ শব্দ।

টাল খেয়ে পড়ে গেছে কেউ। ছায়া ভেদ করে কিছু ছায়া মানুষ হা-হা হেসে ওঠে।

বিহ্বল বৃদ্ধের চোখে ভর করে চৈত্রসংক্রান্তির মেলা। আগামী দিন যেটা শুরু হতে যাচ্ছে। অকস্মাৎ তারার মতো চোখ ধুকপুক করে ওঠে। উর্ধ্বাংশে লুঙ্গি তুলে একজন খাড়া মানুষ ছরছর শব্দে পেশাব করছে এবং এটা এমনই সংক্রামক, টর্চ নিভিয়ে বাকি ছায়াগুলোও সমান্তরাল দাঁড়িয়ে একই কার্যে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

এই কাজ যখন সমাপ্ত, তাদের দেহ যেন নির্ভার অবশতায় টলতে থাকে। তারা কাছাকাছিই ঘাসের মধ্যে বসে পড়ে। বৃদ্ধের কলজেটা ঝপাৎ লাফিয়ে ওঠে। এরা কি এখানেই সারারাত কাটাবে ?

বৃদ্ধ যখন এমনই আতঙ্কিত, তখন কাঠের দোলনায় পাক খেতে খেতে চন্দ্রলেখা দাসীকে প্রশ্ন করে, এমন কোনো পন্থা তার জানা আছে কিনা, যাতে অনন্ত আয়ু লাভ করা যায় ?

দাসী জানায়, সে ক্ষুদ্র মানুষ, আয়ু বিষয়টা আসমানের চেয়েও দীর্ঘ, এ সম্পর্কে সে মহাজ্ঞানবতী চন্দ্রলেখাকে কী পন্থার কথা শোনাবে?

চন্দ্রলেখার দোলনার গতি স্তব্ধ হয়ে আছে, হায়! কী ক্ষুদ্র মানুষের ক্ষমতার সীমা!

দাসী জানায়, সে এক জটাবুড়োর কথা জানে, যে বাস করে গাঁয়ের শেষ প্রান্তের নতুন অশত্থ গাছের তলায়। সে মানুষের আয়ু সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ বলতে পারে।

চন্দ্রলেখা তড়িৎ গতিতে দাঁড়ায়, গম্ভীর কণ্ঠে জানায়, অতি দ্রুত তাকে যেন চন্দ্রলেখার বার্তা জানিয়ে দেয়া হয়।

ভোর হতেই বৃদ্ধ পুড়তে পুড়তে পুনরায় দৃষ্টি প্রসারিত করে। এরা ধবল আলোর পেট ফুঁড়ে বৃদ্ধকে টেনেহিঁচড়ে মেলার মধ্যে দিয়ে নিয়ে ফেলবে?

একশো বিশ বছরের বৃদ্ধের সমস্ত অস্তিত্বে দাউদাউ জ্বলতে থাকে অগ্নি।

এভাবে দীর্ঘরাত পেরোতে থাকে। পেরোতে থাকলে কী হবে?

পুবে মন্দির, সেখানে সহস্র ঝোপঝাড়, গোখরো সাপ বিষাক্ত ছত্রাক মেলে থাকে।

পশ্চিমে নদী— এক সময়ের সাঁতারু বৃদ্ধ এখন শিশু, লাফ দিলে সাক্ষাৎ তলায়।

উত্তরে পর্বত।

দক্ষিণের অরণ্যে সে এসে লুকিয়েছে। তার জ্বলন্ত চোখ ডিম-ঠাণ্ডা হয়ে আসে। দেখো না, এত রাত হলো, ছায়াগুলোর যদি একটুও ঝিমুনি আসে। সবগুলো কেমন নেড়িকুত্তার মতো হাই তুলছে। আর গল্প করছে যাবতীয় কুশ্রী প্রসঙ্গ নিয়ে, কার জীবনে কতবার নারী সঙ্গের ঘটনা ঘটেছে, এ ব্যাপারে কার পৌরুষ কত বেশি। হায়রে কী উদ্দীপক বর্ণনা, নারীদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চষে এরা রাত্রিকে কেমন উত্তপ্ত করে তুলছে।

এরকম বর্ণনা শুনে বৃদ্ধের দূর স্মৃতি ধরে হাঁটতে থাকে বড় চেনা নারী, তার স্ত্রী, সে কত বছর আগের ঘটনা? সেখানে পেরোতে হলে কতটি যুগের পর্বত অতিক্রম করতে হবে?

সে নারী চুলে বাঁধত রঙধনু ফিতে, কামিনী ফুল জড়ো করে ব্লাউজের তলায় রাখত সুরভি ছড়াবে বলে। ঠোঁটে ঘষতো শিউলির বোঁটা, জিহ্বা রঞ্জিত করত পানে, নখে বসাত মেন্দি— এতই রূপের নেশা ছিল, একদিন আঙুল কেটে পায়ে আলতা লাগিয়েছিল। সেই মেয়েটিকে বিয়ে করে তাকে উল্টেপাল্টে, ছিঁড়েখুঁড়ে সব রস শুষে নিয়ে বৃদ্ধ একদিন তাড়িয়ে দিয়েছিল।

এরপর ঘরে এসেছে আরো নারী, কেউ টেকে নি।

সেদিন জনারণ্যে চন্দ্রলেখাকে দেখে তার চোখে ভর করেছিল সেই প্রথম স্ত্রীর ছায়া। একই উদ্দীপ্ত চোখ, চরিত্রের একই শানশওকত! এরপর বৃদ্ধের যে কী হলো!

চন্দ্রলেখা এখন রাজদণ্ড হাতে নিয়েছে। তার নির্দেশে প্রজারা বৃদ্ধকে খুঁজতে বেরিয়েছে। এবারের মেলায় বৃদ্ধকে প্রদর্শিত করার ভার স্বয়ং রানী নিয়েছে— বৃদ্ধ নিরুদ্দেশ হয়েছে ভয়ে। যাদের হাতে রাজদণ্ড থাকে, তাদের খুব ভালো করেই চেনে সে। সে শুনেছে, এ বছর মেলায় যুক্ত হবে নতুন চমক। সেই চমকের ধরন কী হবে ? বৃদ্ধ ভাবতে থাকে, তার উদোম দেহটাকে বাঁশে পুঁতে যদি ওরা জনসমক্ষে প্রদর্শন করে ?

বৃদ্ধ ঘাসের মধ্যে দেহ ঘষটে ঘষটে এগোয়। বিস্তীর্ণ আঁধার বৃক্ষ তাকে ছায়া দেয়। হাঁটুর মধ্যে বিষ টাটানি। কম্পিত আঙুল খাবলে মাটির চাম উঠিয়ে নিতে চায়। অমসৃণ মাটি আর ছোট গাছ হাঁটু চেপে সে বুক দিয়ে এগোয়। তার ধূসর নিমীলিত চোখে ছাই জমতে থাকে। সারাক্ষণ ভয়, এই বুঝি বধির অস্তিত্ব বিদ্যুৎ হয়ে উঠল ছায়া চিৎকারে।

কিন্তু ওরা কাজ ফেলে তখনো নারী বর্ণনায় বিভোর। সেসব বর্ণনায় এক সময় চন্দ্রলেখার দেহ উপস্থিত হয়। তাদের বর্ণনায় চন্দ্রলেখা পরী হয়ে ওঠে, ডাইনি হয়ে ওঠে, লাল লাল মাংস, রসালো কমলা হয়ে ওঠে। নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে বৃদ্ধ হাঁফ ছাড়ে।

কিন্তু ফোঁস—

সম্মুখে মনসার মুণ্ডু। বৃদ্ধের ছত্রাক চামড়া ফুঁড়ে রক্ত ঝরছে। এদিকে দেখো না, চাঁদ কেমন অর্ধেক চোখ বুজে রয়েছে। ভীত বৃদ্ধ কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে পেছন হটতে হটতে ছিপের ফাতনার মতো কাঁপে। সে তার এই প্রাচীন দেহটা কোথায় লুকোবে ?

মুণ্ডুটা দুলছে।

বৃদ্ধের চোখের পুঁতিও শিমের দানার মতো সবুজাভ। সেই সবুজ আবরণ ফুঁড়ে কখনো কোনো ছায়া স্পষ্ট হয় না। প্রচণ্ড বেগে প্রসারিত করে দেখে, সাপ নয়, কোনো একটা লতানো গাছের ডাল।

ক্লান্ত বৃদ্ধ গায়ের কাপড় খুলে উষ্ণ ঘাম বাতাসের মুখে তুলে দেয়। তখন তাকে আমূল কাঁপিয়ে যৌবনের স্ত্রীটি আসে, যাকে এক সময় সে বুভুক্ষু জমিদারের হাতে তুলে দিয়েছিল।

না, আমি তুলে দিই নি, সজোরে নিজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে সে, তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম, পথের সম্পত্তি ভেবে ওকে জমিদার তুলে নিয়েছিল। এরপর যুগে যুগে জমিদার, রাজারা যা করে, যেভাবে পিষে রস খায় অসহায়ের, সেইভাবে তাকেও—।

এ তোমার পাপ, তুমি তোকে রাস্তার করেছিলে।

ওকে রাস্তার না করলেও, ও আমার স্ত্রী থাকলেও তাই ঘটতে পারত। তখন ঘরে ঘরে বৌ-ঝিদের এ-ই হতো, কেননা যুগের পর যুগ ধরে আমরা মেরুদণ্ডহীন কীটে পরিণত হয়েছিলাম।

বৃদ্ধ যখন এইসব ভাবছে, কাঠের গবাক্ষ দিয়ে চন্দ্রলেখা দূর বনের দিকে নিবদ্ধ রেখেছে চোখ। আঁধারে দেহরক্ষী চন্দ্রলেখাকে আকর্ষণ করে বলে, কী এত চিন্তা করছ ? তোমার সব চিন্তার ভার আমার ওপর অর্পণ কর রানী।

দেহরক্ষীর এরকম উচ্চারণের পর নিজের ঘরে ইদ্রিসের মা ডুকরে কেঁদে ওঠে, হায়, ইদ্রিস তোর চক্ষে ঘুম নাই ক্যান ? ছায়াপ্যাঁচা শেষ ডাক দিয়ে ওঠে, ঘুমকাতুরে কণ্ঠে দেহরক্ষীকে চন্দ্রলেখা বলে, আয়ুবুড়োকে খবর দিতে কেন এত বিলম্ব ? তোমরা সব কাজ কেন এত শ্লথ ? কেন আলস্য ?

দেহরক্ষী বলে, রাজধর্মে ধৈর্যের মূল্য অপরিসীম। আগে একশো বিশ বছরের বৃদ্ধের মামলার নিষ্পত্তি হোক, এরপরেই খবর দেয়া হবে তাকে। বন্দি রাজা চিৎকার করে বলে, তোমার সব বুজরুকি আমি ফাঁস করে দেব, শিগগির আমার দিন আসছে।

বৃদ্ধ শুনতে পায়, দূরে ছায়ামানুষগুলো দাঁড়িয়েছে। মাঝখানে দীর্ঘ ফাঁক। তাদের দাঁড়ানোর শব্দ বৃদ্ধকে এতটা দূরত্বে কী করে বিদ্ধ করে? ওদের কোনো অদৃশ্য দড়ি কি বৃদ্ধের কোমরে বাঁধা? অতঃপর বৃদ্ধ সব ভুলে শব্দের রূপ নিয়ে ভাবিত হয়— ধানী জমির ওপারে কারো হাত নাড়ার শব্দ কেমন? শত্রুর ক্রুদ্ধতার শব্দ? একশ বিশ বছরের বৃদ্ধের চামড়া ফাটতে থাকার শব্দ? বেণির ফিতেয় বাতাস লাগার শব্দ? ফিতে, রঙধনু রঙ—

হায়! কে না জানে পুরুষ বড় নিষ্ঠুর! কিন্তু কোনো নারীর বেদনা যদি সে দেখে ফেলে, তার জীবনে আর কোনো পথ থাকে না? এ জগতের কে না জানে এই কথা?

বড় দেরিতে আমি দেখেছিলাম আমার স্ত্রীর বিপন্নতা। সমস্ত জীবন অলিগলি চষেও আমার মুক্তি হলো না। সেদিন দেখলাম বিপর্যস্ত চন্দ্রলেখাকে। ভুল! বড্ড ভুল হয়ে গেছে। বৃদ্ধ হাঁপাতে থাকে।

ছায়াগুলো অপসৃয়মাণ। বৃদ্ধের ঝাপসা চোখ তাদেরকে খুঁজতে থাকে। না, তারা মঠের স্তব্ধ গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে। বৃদ্ধের ইচ্ছে করে শালাগুলোর পোঁদ বরাবর দড়াম লাথি দেয়। শালার চামচা, দু'দিন আগে অত্যাচারী রাজার মল খেয়েছ, এখন খাচ্ছ চন্দ্রলেখার। খা-ও, খা-ও, একশ বিশ বছরে কত দেখলাম!

নীল ডুমো দাগের মাছি নাকের কাছে চক্কর খাচ্ছে কেন? মরণ কি তবে এসে গেল? হাড় বজ্জাতগুলো আবার এদিকে আসছে। বৃদ্ধের চোপসানো গাল টানটান হয়ে ওঠে। জমিদারের ঘোড়ার সারসার শব্দ মগজ কর্ষণ করে।

বৃদ্ধ বুক দিয়ে হাঁটে।

কেন সবাই তার বয়সকে শনাক্ত করে ফেলল? এই জঙ্গলের হাজারো কুত্তা-বিড়াল, মানুষের মতো কেন তার বয়স পৃথিবীর অজানা রইল না? এ যে বছর ধুম কলেরা, গ্রামের সব মানুষ মরে ভেটকি মেরে গেল, তখন কেন এই একটি শিশু বেঁচে থেকে আজ ইতিহাসের নিষ্ঠুর পরিহাসে রূপান্তরিত হলো? কেন সেই মারাত্মক সালটা সবার মুখস্থ?

বৃদ্ধের দু'চোখ ভিজে ওঠে।

এ বছর মেলায় ওদের পরিকল্পনা, বৃদ্ধকে উলঙ্গ করে এই বয়সেও তার পুরুষাঙ্গ সচল কিনা সেই খেলাই জনসমক্ষে তারা দেখাবে। অঞ্চলের সবাই একথাই বলাবলি করছিল।

বৃদ্ধ ভাবে, চন্দ্রলেখার কি বাপ-ভাই ছিল না? রাজক্ষমতা মানুষকে এমনই অকৃতজ্ঞ করে তোলে? একজন বৃদ্ধকে বেআব্রু করে নাচিয়ে কত টাকা আর সঞ্চিত হবে রাজভাণ্ডারে? চন্দ্রলেখার আসল উদ্দেশ্য তাহলে কী? বৃদ্ধের কম্পিত শরীর থেকে শেষ বস্ত্রখণ্ড খসে পড়লে, পাতা, বল্কল এসবের ভাঁজে নিজেকে সে মিলিয়ে দিতে চায়।

ঠিক তখনই ঘাড়ের কাছটায় কেউ নিশ্বাস ফেলে।

ফাটা চামড়ার রক্ত চুষছে পিঁপড়েরা। চারপাশে আশ্চর্য উজ্জ্বল ছায়া, দূরের আসমানের লাল জড়ো হচ্ছে, এর মাঝখানেই টর্চের টুসকি তার মুখ আলোকিত করে তোলে। বৃদ্ধ টের পায়, সে ধরা পড়ে গেছে।

ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, ভয়ে জিভ লম্বা হয়ে আসতে থাকলেও বৃদ্ধ সর্বশক্তি প্রয়োগ করে দৌড়ুতে চায়—

পুবে সাপ মন্দির,

পশ্চিমে নদী,

উত্তরে পর্বত,

সম্মুখে জঙ্গল—।

বৃদ্ধকে টেনেহিঁচড়ে যখন চন্দ্রলেখার কাঠের প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বেচারার কণ্ঠ আসছিল ভেঙে, আমারে তুমরা মুক্তি দেও, দোহাই তুমাগোর।

সে প্রাসাদে এলে ক্রুদ্ধ দেহরক্ষী সামনে এসে দাঁড়ায়। তাকে যারা ধরেছে সেই ষণ্ডামার্কা লোকগুলোর সে কী ক্ষিপ্ততা, পানির মইধ্যে খালি হাত দিয়া মাছ ধরনের যে কষ্ট তার চাইতে হাজার গুণ কষ্ট হইছে এই বুইড়ারে ধরতে, এই বুইড়া মিলায়া যাওনের জাদু জানে।

দেহরক্ষী দাঁত কিড়মিড় করে বলে, তোর চামড়া দিয়া আমি ডুগডুগি বানাইতাম যদি রানী তোরে না খুঁজত।

বৃদ্ধের শুষ্ক চামড়ার শিথিলতা জমে। ছায়াচ্ছন্ন বাতাসে সে নিজের অবশ দেহ ছেড়ে দেয়, ভাবে, রাজধর্ম কী করে একজন মানুষকে বেইমান করে? চন্দ্রলেখা কি সব ভুলে গেছে?

বৃদ্ধ শ্লথ পায়ে চন্দ্রলেখার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, দেখে, সেদিন উন্মত্ত মাঠে মোহগ্রস্ত হয়ে উঠতে থাকা চোখ দুটোয় আজ শুধুই নরম ছায়া। এত বেশি ছায়া, বৃদ্ধ কেমন শীতে কেঁপে উঠতে থাকে। বনে-জঙ্গলে ঘণ্টার পর প্রাণান্তকর পালিয়ে থাকা বৃদ্ধের অস্থির প্রাণ কেমন স্থির হয়ে আসে, তার অসম্ভব ঘুম পায়।

চন্দ্রলেখা ধীর কণ্ঠে বলে, আপনি আমার পিতারও অধিক। আপনি কি ভেবেছেন অঞ্চল নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে অত্যাচারিত রাজার অঙ্গুলি নির্দেশে? কেন আপনি পালিয়েছিলেন?

বৃদ্ধের ওষ্ঠ স্ফুরিত হয় কিছু বলার জন্য। কিন্তু সম্মুখে দাঁড়ানো দেহরক্ষীর চোখ দপদপ জ্বলছে। ভয়ে তার মাথা নুয়ে আসে, আমারে ক্ষমা করবেন। আমি বুঝতে পারি নাই আপনের কৃপা পাইমু।

এখন আমি এসেছি, চন্দ্রলেখার কণ্ঠ উচ্চকিত হয়, আপনি সেই লোক, যে আমার জন্মকে শনাক্ত করতে পেরেছিলেন। আমার মাটি আছে, শেকড় আছে, আমি উড়ন্ত নই, আচমকা হয়ে-ওঠা কেউ নই, এই ইতিহাসের একমাত্র সাক্ষী আপনি। আপনাকে কোনোভাবেই বিলীন কিংবা নষ্ট হতে দেয়া যায় না। এখন বলুন, আমি আপনার কী সেবা করতে পারি?

কক্ষে উপবিষ্ট ছিল আরো অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি। তারা চন্দ্রলেখার বিনয়ে অভিভূত হয়ে নিচ দিকে মাথা নামিয়ে ফেলে।

বৃদ্ধ কাঁদতে কাঁদতে বলে, রাজার আচরণ এমন হইতে পারে আমরা এই প্রথম দেখলাম। মা আপনি দীর্ঘজীবী হন। আমার কুনো সেবা লাগবো না, আমি একটু শান্তিতে ঘুমাইতে চাই।

চন্দ্রলেখা প্রজাদের নির্দেশ দেয় বৃদ্ধকে শান্তিতে ঘুমাতে দেয়ার ব্যবস্থার করার জন্য।

সেলাম ঠুকতে ঠুকতে বৃদ্ধ প্রস্থান করার পর চন্দ্রলেখা অন্দরে আসে।

দেহরক্ষী চন্দ্রলেখাকে প্রশ্ন করে, রানীর এই বিপরীত আচরণের কারণ কী?

চন্দ্রলেখার ওষ্ঠ রহস্যে স্ফুরিত, রাজার চরিত্রে সর্প এবং ওঝা দুইয়ের অবস্থানই থাকা আবশ্যক। এই বৃদ্ধ জানল এবং এই জনপ্রিয় বৃদ্ধের মধ্য দিয়ে জনতা অবগত হলো, রানী সম্পর্কে বাইরের গুঞ্জন সব ক্ষেত্রে সত্য নয়। বৃদ্ধকে উলঙ্গ করে প্রদর্শন করা হবে, এই গুজব নির্ঘাত প্রতিপক্ষের শত্রুরা ছড়িয়েছে— এখন এই বিশ্বাসই জনতার মধ্যে বদ্ধমূল হবে।

তাহলে কি আমরা বৃদ্ধকে ব্যবহার করব না?

অপেক্ষা কর, সে এখন স্বইচ্ছায় ব্যবহৃত হতে আসবে।

কামরাঙা গাছের নিচে অনাবিল বাতাসে যখন বৃদ্ধের সর্বাঙ্গে ঝিরিঝিরি ঘুম নামছে, তখন গ্রামে আসা নতুন শিক্ষিত যুবক তাকে বলে, আমাদের একটা জরুরি সভা আছে, সন্ধ্যার সময় অবশ্যই আপনি দক্ষিণের জঙ্গলে আসবেন।

বৃদ্ধের কপালে বিরক্তির ভাঁজ জমে, কিসের সভা?

সে আপনি গেলেই বুঝতে পারবেন।

বৃদ্ধ আরামের ঢেঁকুর তুলে বলে, কুনো রাজাই তুমাগোর পছন্দ না। তুমাগো রাজনীতি হইল বিরোধিতার রাজনীতি, একশ বছরে কত দেখলাম। আমি তুমাগোর সঙ্গে নাই।

উচ্চবিত্ত দেহরক্ষী প্রশ্ন করে, তোমার আসল ইতিহাস কী? কে তুমি? তোমাকে একদম চেনা যায় না। দিনে তোমার কী প্রচণ্ড প্রতাপ। প্রায়ই আমার দিকে তাকাও নিষ্ঠুর অগ্নিদৃষ্টিতে। রাত বাড়তে থাকলে সেই চোখ খুলে যায় অন্যভাবে, সেই দেহ খুলে যায় অন্যভাবে, প্রাণ খুলে যায় অন্যভাবে, তোমার আসল পরিচয় কী? বলো, তোমার বৃত্তান্ত, বলো।

দেহরক্ষীর লোমশ বুকে মাথা রেখে ঘুম-ঘোরে চন্দ্রলেখা বলে, কী লাভ তোমার সেসব শুনে? দেহরক্ষী বলে, তোমাকে দেখে কেবলই মনে হয় তোমার পেছনে এমন এক অতীত আছে, যা তোমাকে নিরন্তর তাড়া করে। ক্রুদ্ধ, হতবিহ্বল করে। চন্দ্রলেখা বলে, তোমার আবিষ্কারের প্রশংসা করছি তবে এই রাজ্যে আমি নতুন কেউ নই। সেই ইতিহাস তোমাকে বলতে পারি কিন্তু কীভাবে বলব, আমার নিজেরও কি ঠিক ঠিক সব মনে আছে? শুধু এটুকু বলতে পারি, তোমাদের অত্যাচারিত রাজার সৈন্যরা আমাকে নিক্ষেপ করেছিল জলে। কেননা, প্রাসাদ ঠেলতে থাকা কিছু শ্রমিককে আমি বশ করে ফেলেছিলাম।

দেহরক্ষী আঁতকে ওঠে, কী বলছ তুমি ? অত্যাচারী রাজা ? সেজন্যেই তাকে তুমি কারাগারে ঢুকিয়েছ ? তবে ওই বৃদ্ধ তোমার জন্ম-বৃত্তান্ত সম্পর্কে যা বলল ?

তোমার এত প্রশ্ন ? চন্দ্রলেখা কেমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে থাকে, তুমি রাজনীতি বোঝ না, কী করে এত দায়িত্বশীল কার্যে নিয়োজিত থাকবে ?

আমায় ক্ষমা করো, দেহরক্ষী চন্দ্রলেখার পা স্পর্শ করে, আমি আর প্রশ্ন করব না। তবে তোমার বুদ্ধি ঈর্ষণীয় রানী। আমি এবং আমার সম্প্রদায় যতদিন তোমাকে সম্মান করব, ততদিন তোমার তিল পরিমাণ সর্বনাশ নেই।

আমি অসীম কৃতজ্ঞ তোমার কাছে, চন্দ্রলেখা হাসে, এখন আমার বৃত্তান্ত শোনো, সে বহুদিন আগের কথা, সেদিন বৃক্ষ ছিল প্রখর রোদে কাতর।

আচ্ছা।

সূর্য তার পাত্র থেকে উপুড় করে দিচ্ছিল প্রচণ্ড তাপ।

আচ্ছা।

উঁচু পর্বতশ্রেণীর তীর ঘেঁসে যে জল প্রবাহিত, তাতে আঙুল ডোবালেই খসে পড়বে, এমন বোধ হচ্ছিল। কেমন পাগলের মতো হয়ে উঠি। এর মধ্যে হঠাৎ হতবিহ্বল হয়ে দেখি, ধুধু শূন্যতার মধ্যে ইট প্রকাণ্ড পাথর এবং তার ওপর বসে আছে একজন নিটোল কালো মানুষ। বুকের ভেতরটা ধড়াস করে ওঠে। সাপের জিহ্বার মতো সরু তির্যক রোদ তার শরীর বিদ্ধ করছে। ঘামের সীমাহীন স্রোতের মধ্যে উবু হয়ে বসে আছে সে।

ধীর পায়ে এগিয়ে যাই।

ধু ধু চরাচরে এসে মনে হচ্ছিল, গায়ে অগ্নিবর্ম পরেছি। চারপাশের নিষ্ঠুর তাপ গলা টিপে আমার নিশ্বাস বের করে নেবে।

চমকে উঠি। লোকটি মাথা তুলেছে। এবং সটান দাঁড়িয়েছে। তার পেশি কঠিন দৃঢ়তায় ফুলে উঠেছে। আমি কেমন জমে উঠি। আচমকা সে আমার দিকে তাকায়। ভয়ে আমার লোমকূপ বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়; কিন্তু আশ্চর্য, তার দৃষ্টি সম্পূর্ণ ভাবলেশহীন। এমন বিশাল শূন্য পর্বত মাটির মাঝখানে কী করে একজন নারীর আবির্ভাব ঘটে, এইসব বিষয়ে বিন্দুমাত্র কৌতূহল না দেখিয়ে সে হাঁটা দেয়।

আমিও তার পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করি।

চন্দ্রলেখা নিশ্বাস নেয়ার জন্য দেহরক্ষীর বেষ্টন থেকে বেরিয়ে আসে। এরপর বাতি জ্বালায়। দেহরক্ষী উন্মুখ চোখ মেলে রাখে। চন্দ্রলেখা কাঠের দেয়ালে হেলান দিয়ে পুনরায় যেন পূর্ব অতীতে চলে যায়।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেলে আমি আমার অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হই। আমি কী করে এমন উত্তপ্ত পাহাড়, শিলারাশির মাঝখানে এলাম ? কিছুতেই মনে করতে পারছি না।

আগেই বলেছি, চারপাশে নিষ্ঠুর গরম। একবিন্দু বাতাস নেই। আমার চুল ওপচানো নোনতা জল জিভ স্পর্শ করছে। কেমন আঁধার হয়ে আসছে চারদিক।

সেই তামাটে লোক আমার উপস্থিতির ব্যাপারে নির্বিকার হয়ে দৃঢ় পায়ে হাঁটছে।

প্রশ্ন করি, এখানে বৃষ্টি হয় না ?

উত্তরে সে আমার দিকে তাকায় শুধু। এরপর চরম অনীহায় ঘাড় খাড়া করে হাঁটতে শুরু করে।

আমার ভেতর প্রলয়ঘূর্ণি। কী অসম্ভব ক্ষিপ্র তার পদক্ষেপ। অবিন্যস্ত চুল, তার দেহ, ভঙ্গি, পেশি এবং নির্বিকারত্ব... চমৎকার।

প্রশ্ন করি, এখানে কি প্রতিদিন সূর্য এমন প্রখর?

উত্তর নেই।

প্রশ্ন করি, আমি বাড়ি ফিরে যাব। পাহাড়ের মাঝ দিয়ে বেরোনোর কি কোনো পথ আছে?

উত্তর নেই।

কী অসম্ভব অভদ্রতা...

আক্রোশে নিজের চুলের গোড়া ঠেসে ধরি। উষ্ণ জল প্রবাহিত হচ্ছে পাথর খণ্ডের ভেতর দিয়ে। উঁচু-নিচু পথে বারবার হোঁচট খাই। সূর্য কি আমার চামড়া ছিঁড়ে মাংসে প্রবেশ করছে? আমি কী করে এখানে এলাম? নিজেকে প্রশ্ন করি, বিভ্রান্তির চরম ঘোরে নিজেকে হারিয়ে ফেলি। কোথায় আমি? এইরকম চক্রের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে ভাসতে ভাসতে এক সময় খোসা ভাঙা বাদামের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করি। যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি, মাঝখানে ক্ষুদ্র ভূমি এবং চারপাশে ঘনিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়ে আছে উঁচু পাহাড়।

চন্দ্রলেখা বলে, সে অনেক আগের ঘটনা, ঠিক ঠিক গুছিয়ে বলতেও পারছি না—আবার সেই লোক চলতে শুরু করে।

এখান থেকে বেরোনোর কোনো পথ নেই? আমি কাতর কণ্ঠে প্রশ্ন করি। মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে পুনরায় সে ছুটতে শুরু করে। আমিও পাশাপাশি মরিয়া হয়ে দৌড়তে থাকি।

এক সময় বিশাল পাহাড়গুলো পেছনে ফেলে একটি নির্জন দ্বীপের মতো জায়গায় উপস্থিত হই। ঘামতে ঘামতে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসছে। একটু জলের আশায় এদিকওদিক তাকাচ্ছি। কোথাও কোনো পাখির শব্দ নেই। কেমন ছায়া হয় আসে চারপাশ। এর মধ্যে হুবহু শিশুর মতো তাকে অনুসরণ করছি, আমাকে তার অস্তিত্ব থেকে তুলোর মতো ঝাড়তে ঝাড়তে পথ চলছে সে, অথচ আমি ঘামের তীব্র আঠায় বারবার তার গায়ে সেঁটে যাচ্ছি।

আমি জানি না আমার উৎস কোথায়? আমার বেড়ে ওঠা, ইতিহাস কোথায় কী—আমি সব হারিয়ে ফেলেছি। কিচ্ছু মনে করতে পারছি না। অথচ এইরকম আকৃতি নিয়ে সদ্য ভূমিষ্ঠ হয়েছি? কী করে তবে পাহাড় চিনছি, জল, নদী, সূর্য চিনছি?

এইরকম যখন ভাবছি, হঠাৎ দেখি বিশাল শূন্য ভূমিতে অনিন্দ্যসুন্দর একটি প্রাসাদ দণ্ডায়মান। খাঁজকাটা পাথরের ভেতর থেকে ঝলসে উঠছে কাচের টুকরো। রোদের তীব্র আলোয় টানা জমিনের ওপর পুরো বাড়িটা ঝলমল করছে।

প্রকাণ্ড সেই প্রাসাদ, তার দীর্ঘ প্যাঁচানো সিঁড়িগুলো বাইরে থেকেও স্পষ্ট, প্রান্তরের মতো খোলা তার বারান্দা, হাত বাড়ালেই যেন আকাশ নেমে আসবে। সেই বারান্দা উপচে ঝুলে পড়েছে হাজার ফুলের গুচ্ছ।

আমি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি।

ততক্ষণে আমাকে অতিক্রম করে যুবকটি সেই প্রাসাদের সামনে দাঁড়িয়েছে। এই বনভূমির সমস্ত সবুজ শুষে নিয়ে সেই প্রাসাদ দাঁড়িয়ে ছিল দীপ্র ভঙ্গিতে।

আমি মন্থর পায়ে সেদিকে এগিয়ে যাই।

দীর্ঘক্ষণ পর চোখে পড়ে, সেই প্রাসাদের নিচে অসংখ্য মানুষ। সেই ঘর্মাক্ত মানুষগুলো একটি অদ্ভুত কাজে লিপ্ত। তারা সবাই তাদের প্রাসাদের তুলনায় ভয়ঙ্কর ক্ষুদ্র আকৃতি নিয়ে সেই প্রকাণ্ড প্রাসাদটিকে ঠেলছে। আমি যে পুরুষের পাশাপাশি ছুটছিলাম, সেও গিয়ে দ্রুত গতিতে সেই প্রাসাদ ঠেলার কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং তার বদলে একজন ক্লান্ত, শ্রান্ত বৃদ্ধ লোক সেই কাজ ছেড়ে সম্ভবত বিশ্রাম নেয়ার জন্যই আমরা যে পথ ধরে হেঁটে এসেছি, সেই পথের দিকে হাঁটা দেয়।

এতটা পথ হেঁটে এলাম এত প্রকট রোদে, তারপরও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আমি নেতিয়ে পড়ছি না কেন ? এক সময় এমন ভাবনা দ্বারা তাড়িত আমি ভাবলেশহীন পুরো পরিবেশের দিকে শান্ত দৃষ্টিতে তাকাই। এরা সবাই পুরুষ, আমি কীভাবে এই রকম বনাঞ্চলে আকাশ ছিঁড়ে আবির্ভূত হলাম নারী— এদের এসব ব্যাপারে কোনোই আগ্রহ নেই। কী ভয়ঙ্কর বোকার মতো সেই অপূর্ব সুন্দর, যে প্রাসাদের চূড়ো আকাশ ছুঁয়েছে, সেটাকে ঠেলছে।

কী আশ্চর্য, প্রাসাদটিকে ঠেলছেন কেন ? কাছে গিয়ে আমি যেন বাতাসের উদ্দেশে প্রশ্নটি ছুঁড়ে দিই।

যথারীতি তারা বধির। জীবন বাজি রেখে যেন তারা সবাই প্রাসাদ ঠেলার কাজে লিপ্ত এবং এই কাজে তারা এতটাই মগ্ন, আমি দীর্ঘক্ষণ তাদের ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ি না। বলতে বলতে চন্দ্রলেখা যেন ঘোরের মধ্যে আঁৎকে ওঠে। দেহরক্ষী বলে, সে কবেকার ঘটনা ? হ্যাঁ হ্যাঁ আমার মনে পড়ছে, বেশ অনেক বছর আগে উত্তরের পাহাড় ভেঙে সেখানে প্রাসাদ তৈরি হয়েছিল। অত্যাচারী রাজার আমলে শ্রমিকরা নিষ্ঠুরভাবে শোষিত হতো। আশ্চর্য! তুমি কী করে সেখানে আবির্ভূত হয়েছিলে ?

চন্দ্রলেখা শাঁসাল কণ্ঠে বলে, কোনো ব্যাপারেই প্রশ্ন নয়, শুধু জেনে রাখো, একজন নারীকে পূর্ববর্তী রাজাদের সব ইতিহাস জানতে হয়।

দেহরক্ষী বলে, আমাকে ক্ষমা কর, হয়তো আমার নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে ফেলেছি।

চন্দ্রলেখা ফের শুরু করে— আকাশ মুচড়ে সূর্যের আলো পড়ছে। সেই মানুষগুলো কি সেই তাপের ঘোরে বিহ্বল ? শ্রান্ত ? তাদের সামনে কি সেই প্রাসাদ ছাড়া অন্য কোনো পৃথিবী নেই ? আমিই-বা কেন এমন একটা আজব পরিবেশ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করছি না ?

তাদের কঠিন বলিষ্ঠ হাতে চেপে আছে পাথরের দেয়াল। তাদের লৌহ শরীর কি ভীষণ বাঁকাচোরা। দেহ উপচে জল নয়, যেন রক্ত গড়াচ্ছে। কিন্তু মুখে কোনো শব্দ নেই। আমিও কী এক ঘোরে পড়ে আরেকটু এগোই। সে লোক তখন সব মানুষের মধ্যে মিশে যাওয়া একটি মানুষ। তার ভীষণ কাছে গিয়ে প্রশ্ন করি, এত অদ্ভুত সুন্দর একটি প্রাসাদ, তোমরা ঠেলছ কেন ?

কারো কোনো উত্তর নেই।

ক্ষিপ্ত হয়ে আমি তার স্ফীত পেশি চেপে ধরি, তোমাদের মধ্যে কি ন্যূনতম ভদ্রতাবোধ নেই?

একটি কিশোর, মাথায় পাগলাটে চুল, এতক্ষণে আমার দিকে তাকায়, তারপর প্রাসাদ ঠেলতে থাকা অবস্থাতেই আমাকে আলটপকা বলে, এটাকে আমরা ভেঙে ফেলছি।

আর্তনাদ করে উঠি। কী ভয়ানক কারুকাজ, যেন বেহেশতের জন্য স্থাপিত হয়েছে দীর্ঘ দালানটি, এরা ভেঙে ফেলবে?

কিন্তু কেন? বিস্মিত কণ্ঠে জানতে চাই।

এরপর আর কোনো উত্তর নেই। হঠাৎ যেন বিশাল শূন্যতায় একটি ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পাই।

মুহূর্তের মধ্যে সেই বিশাল মানুষের ঢল দ্রুত সেই প্রাসাদ ঠেলার কাজ ফেলে প্রকাণ্ড ভূমির ওপর যে যার জায়গায় আসন গ্রহণ করে। কাপড়ের গিঁট থেকে ত্রস্ত হাতে রুটি আর বোতলভর্তি জল বের করে তারা গলায় চালান দেয়। তাদের সেই খাবারের ভঙ্গি এত বীভৎস ছিল, মুহূর্তেই আমি আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা সব ভুলে এদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকি।

পুনরায় ঘণ্টাধ্বনি!

মুহূর্তেই সব মানুষ পড়িমরি করে সেই প্রাসাদের সামনে ছুটে যায়। তাদের ক্ষিপ্র হাত আবার প্রাসাদ ঠেলার কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

কেন এটাকে ভেঙে ফেলবে? চিৎকার করি।

ওপর থেকে হুকুম এসেছে, কিশোরটি বলে। এখানে এর চেয়েও সুন্দর প্রাসাদ হবে।

চন্দ্রলেখা বলে, আমি বোকার মতো সেই পাথরখচিত দীর্ঘ প্রাসাদের দিকে তাকাই।

এর চেয়েও সুন্দর?

কী সে? এরা নিজেরাও কি সেটা জানে? বিস্ময় আমার বাকরুদ্ধ করে রাখে। কী অদ্ভুত কর্ম এদের, কী অদ্ভুত খেলা! এরা কি এই কর্মের কোনো মানে জানে? গড়ো, হুকুম এলে গড়তে শুরু করে। সেই সুন্দর আকাশ স্পর্শ করলে হুকুম এলো, ভাঙো। এরা কি জানে এরা কোন প্রজাতি?

এরা কি চেনে রমণী কী? এদের কি পৃথিবীর কোনো ব্যাপারে কোনো কৌতূহল আছে?

তোমরা কি আমাকে কখনো দেখেছ? প্রশ্ন করি।

উত্তর নেই।

চন্দ্রলেখা বলে, আমি মৃদু ছন্দে বৃত্তাকারে ঘুরতে ঘুরতে সবার পাশে যাই, এরপর অদ্ভুতভাবে আমার উৎসের কথা মনে পড়ে, আমি বলতে থাকি— তোমরা কি সেই আশ্চর্য সরোবর দেখেছ, যেখানে অসংখ্য হাঁসের দল ডানার নিচে মুখ লুকোয়?

সেই মেঘপুঞ্জ দেখেছ, এক সময় যা চরাচর প্লাবিত করে?

আমার এ কথায় মুহূর্তের জন্য তারা থমকে যায়, আমার দিকে তাকায়। যেন রূপকথার গল্প— এমন অবজ্ঞায় তাকিয়ে তারা নিজেদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

দেখছ না, প্রাসাদ একচুলও নড়ছে না? তোমরা এটা কী করে ভাঙবে? কী হাস্যকর চেষ্টা তোমাদের!

তোমরা জানো, সহস্র শক্তি একজন রাজাকে মুহূর্তে পরাস্ত করতে পারে?

তোমরা দেখেছ তিনবেলা ভাতের সুন্দর ধোঁয়া?

এ তোমাদের নিয়তি নয়, তোমরা জানো? জানো, রাজা মানে ঈশ্বর নয়। তোমরা চেষ্টা করলেই এই চক্র থেকে বেরোতে পার।

জানো, তোমাদেরও আছে রাজা হওয়ার অধিকার?

চন্দ্রলেখা বলে, ওরা এরপরও নির্বিকার। এরপর আমি অন্য মানবিক বিষয় মেলে ধরি তাদের সামনে—

কী করে একটি নবজাত শিশু কেঁদে ওঠে, কতটা উদ্ভাবন সেই কান্নায়, চেনো?

তোমরা চেনো একটি নারীর শরীর কী? তীব্র রোমাঞ্চে তার সব পালক খসে পড়ে?

পায়ের পাতা থেকে চুল পর্যন্ত কতটা রহস্য তাতে?

এই কথায় সেই কিশোর পুনরায় তাকায়, এসব বিষয়ে আমাদের রাজা সব জানেন।

তোমরা অন্ধ থাকবে? আমি চেঁচিয়ে উঠি, তোমরা কিছুই জানবে না? একটি হলুদ পাতা খসে পড়লে বুকের কোন জায়গাটা ফুঁটো হয়ে যায়, জানবে না? কী করে মানুষ কাঁদে, কেন মানুষ শোষিত, এইসব ইতিহাস জানবে না?

ক্লান্ত ঘর্মাক্ত মানুষগুলো যেন বধির। ইস্পাতের ফলার মতো টানটান। আমার বাক্যের একাংশও তাদের স্পর্শ করে না।

কেমন কান্না পায়।

টান দিয়ে বুকের বসন খুলে চিৎকার করি, এই দেখো হৃৎপিণ্ড, বুকের কোথায় বাস করে দেখো, একটু চেনার চেষ্টা কর— আমার গলার স্বর হতাশায়, কান্নায় বন্ধ হয়ে আসে। আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়ি, চন্দ্রলেখা তখন স্তব্ধ, বিমূঢ়। তার চোখ ঠিকরে আগুন বেরুতে থাকে।

দেহরক্ষী বলে, সেই প্রাসাদ ভেঙে ফেলা হয়েছিল আরো সুন্দর নকশায় রাজার বাগানবাড়ি তৈরি করার জন্য। রাজা জানতেন শ্রমিকদের সাধ্য নেই এই প্রাসাদ ভাঙার। কিন্তু তিনি যুবকদের ওইভাবে ব্যস্ত রাখতেন যাতে তারা প্রতিবাদী এনে তা ভাঙা হয়েছিল। তুমি হয়তো জানো, বানানোর কিছুদিন পরই ভূমিকম্পে তা ধূলিসাৎ হয়েছিল। অনেক শ্রমিক তাতে মারা পড়েছিল।

চন্দ্রলেখা নিষ্কম্প ধীর গলায় বলে, জল-স্থল-অন্তরিক্ষের সব খবরই আমি জানি।

দেহরক্ষী প্রশ্ন করে, এরপর কী হলো রানী।

চন্দ্রলেখা বলে, এরপর আমি লক্ষ করি, সেই ভিড়ের মধ্যে পিন পতনের শব্দ নেই। আমার পতন যখন চূড়ান্ত, ম্লান চোখ বাড়িয়ে দেখি ভিড়ের মধ্যে জেগে উঠেছে সেই কিশোরের চোখ। মাথা টান করে কাজ রেখে বিস্মিত চোখে সে তাকিয়েছে আমার দিকে।

চারপাশে সূর্যের রঙ থিতিয়ে এসেছে। হঠাৎ লক্ষ করি, সেই প্রবল মানুষের ঘর্মাক্ত স্রোতের নিচে তলিয়ে যাচ্ছে কিশোরটির মাথা।

তার উদ্ভাসিত দেহ ক্রমশ লোহার মতো শক্ত পায়ের সম্মিলিত চাপে পিষ্ট হয়ে যাচ্ছে— এই ছিল তোমাদের সেই রাজার শাসনামল, চন্দ্রলেখা ফুঁপিয়ে ওঠে। আমার বয়স তখন

আর কত ? সবে কৈশোর পেরিয়েছি। সেই কিশোরের পিষ্ট দেহ দেখে আর দু'একজন শ্রমিক ঘোর-লাগা চোখে আমার দিকে তাকিয়েছিল।

এরপর রাজার সেপাইরা এসে আমাকে মুহূর্তে নিক্ষেপ করেছিল জলে। চন্দ্রলেখা ডুকরে কেঁদে ওঠে, সেই ইতিহাস বড় নিষ্ঠুর।

দেহরক্ষীর চোখ জলে ভরে ওঠে, দোহাই চোখের জল সংবরণ কর, আমি তোমার এই রূপ দেখে অভ্যস্ত নই।

চন্দ্রলেখা মুহূর্তে নিজেকে বিন্যস্ত করে শান্ত সমাহিত উচ্চারণে বলে, এখন বলো, কেন আমি তোমাকে আমার এই দীর্ঘ ইতিহাস শোনালাম ?

দেহরক্ষীর ত্বরিত জবাব, কেন অত্যাচারী রাজাকে আপনি এই শাস্তি দিয়েছেন, সে বিষয়ে আমাকে অবগত করার জন্য।

চন্দ্রলেখার বিচ্ছুরিত হাসি চৌচরাচরে আলো-আঁধারির সৃষ্টি করে, তোমার অনুমান সহজ; কিন্তু রাজকার্যে সহজ কোনো কিছুর জায়গা বড় কম। রাজার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল।

দেহরক্ষী প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, সঠিক ছিল ?

হ্যাঁ, চন্দ্রলেখা বলে, আমি তার শ্রমিকদের বশ করার কাজে লিপ্ত হয়েছিলাম। রাজা প্রতিপক্ষ শত্রুর ব্যাপারে কোনো ঝুঁকি নেন নি, যদিও আমি ছিলাম নারী, আমাকে তিনি প্রাসাদে নিয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু সাবধানতার ক্ষেত্রে রাজা কোনো আপোস করেন নি। এছাড়া আমি তোমাকে আরেকটি বিষয়ে অবগত করলাম, এই অঞ্চলে আমি উড়ন্ত নই, এই রাজাকে পতিত করার পেছনে আমার দীর্ঘ বছরের ত্যাগ আছে। অতএব, এই রাজকাজের একক অধিকারী আমি, এ-বিষয়ে কোনো বিতর্কের অবকাশ নেই। তুমি এই ইতিহাস রাজ্য জুড়ে প্রচার করবে, দেহরক্ষী, তোমাকে হতে হবে আরো তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, আমি এজন্যই তোমাকে রাজার আচরণ সম্পর্কে বিস্তারিত বললাম, এখন বলো, শিক্ষিত যুবকের বিষয়ে তোমরা কী ব্যবস্থা নিয়েছ ?

প্রাচীন অশথ বৃক্ষ। তার নিচে বসেছে চৈত্রসংক্রান্তির মেলা। বৃক্ষের ছায়া সত্ত্বেও শামিয়ানার চাকচিক্য, হ্যাজাক, পুতুল নাচের ঝুনঝুন শব্দ, আট দশ মাইলব্যাপী হাজার মানুষের কাফেলা মেলাকে বিচিত্র করে তুলেছে। ভেলভেটে মোড়ানো মাজারকে কেন্দ্র করে আরেক গুঞ্জন। গাঁজায় বিভোর সন্ন্যাসী চোখ টেনে দেখতে চায়, যাত্রার প্যান্ডেলে কোনো ছিদ্র আছে কিনা। বানর, সাপ বাইদানিদের রঙ্গরস, শব্দের ভিড়ে মেলার মধ্যে আরেকটা পুরনো দর্শনীয় জিনিস— একশো বিশ বছরের বৃদ্ধ। এই গাছ এবং তার বয়স সমান। গাছের বাকল ঘেঁসে সে দাঁড়ায়, হাত-পা আঁকাবাঁকা করে দর্শকদের সে তার পুরনো শরীর দেখিয়ে গত কয়েক বছর ধরে কিঞ্চিত অর্থ উপার্জন করে এসেছে। এই বৃদ্ধের কুঞ্চিত শরীরের একঘেয়েমিতে ক্লান্ত দর্শক এক সময় ধরেই নেয় এ ব্যাটা অনন্ত আয়ুপ্রাপ্ত হলেও আশ্চর্যের কিছু নেই।

চৈত্রসংক্রান্তির মেলার শেষ দিন নদীপথে সার বেঁধে বেদেনিরা এলো। তাদের ঝুড়িতে সাপ, দাঁতের পোকা মারার ঔষধ, সুগন্ধি সাবান। পুঁথি পাঠরত বৃদ্ধকে কেন্দ্র করে মেলার কাছেই জমে উঠেছে জটলা। রাতের যাত্রায় ক্লান্ত নটিনীরা বেঞ্চের ওপর অর্ধবিবস্ত্র দেহে ঘুমুচ্ছে।

যখন সন্ধ্যা ঘনায়মান, একশো বিশ বছরের বৃদ্ধ অসুস্থ দেহে কাঁপতে কাঁপতে অশথ গাছের নিচে দাঁড়ায়। উচ্চবিত্ত দেহরক্ষী তার নিয়ন্ত্রক। এই বৃদ্ধকে পুঁজি করে আগের কয়েকটি বছর সেও বেশ অর্থের মালিক হয়েছে। তখন অবশ্য সে রানীর দেহরক্ষী ছিল না। কিন্তু বৃদ্ধের বয়স যত বাড়ছে, তত বেশি তার পসার হবে, এটাই যখন স্বাভাবিক, তখন আশ্চর্যজনকভাবে লক্ষণীয়, যুগ পাল্টে যাচ্ছে, কুঁচকানো চামড়ার একঘেয়েমির মধ্যে দর্শকের মন বসছে না। রসালো মাংসের খোঁজে লোকজন যাত্রার গ্রিন রুমে, বেদেনিদের পেছন পেছন ছুটছে। মরিয়া দেহরক্ষী অশথ গাছের নিচে এসে খেঁকিয়ে ওঠে, শুধু বয়স দেখাইলে হইব না, নতুন কিছু কর, নতুন কিছু।

বৃদ্ধ ফ্যালফ্যাল চোখে তাকায়। দাঁতহীন মাড়ি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা জিভ দিয়ে সে শুকনো ঠোঁট ঘষে। এক সময় গাছের সমস্ত শক্তি দিয়ে গলায় শব্দ তোলে, অনেক অনেক বছর আগের কতা। সেই সময় এই গেরামে ঝড়ের সাথে উইড়া অনেক বড় বড় হাত্তি আইতো। একশো পনর বচ্ছর আগের কতা। হায়রে কী বিরাট হাত্তি! এককেটা হাত্তির ওজন আছিল একশ বিশটা জাহাজের মতো। হেরা যহন আইত, গেরামে কান্দনের ঢল নামত। হায়রে মানুষের কী ডর!

একবার যহন হাত্তি আইতে শুরু করল, চন্দ্রলেখার বাপ কেশব চাটুজ্যে দৌড়ায়া ঘর থাইক্যা টিন আইন্যা বাড়ি দিতে শুরু করল। হাত্তিরা টিনের আওয়াজে ডরায়, শুনেন ভায়েরা, চন্দ্রলেখার বিত্তান্ত বলি...।

চন্দ্রলেখা দেহরক্ষীকে বলে, আমি এখনো মনে মনে সেই পিষ্ট হতে থাকা কিশোরটিকে খুঁজি। আমার জীবনের সেরা সাফল্য, আমি সেই নিষ্ঠুর রাজাকে অপসারণ করেছি। যদিও সুরম্য প্রাসাদ ভেঙে নতুন কিছুর নির্মাণ, যদিও সুরা, ভোগ এসব কাজ রাজাদেরকেই মানায়। রাজারাই দ্রুত ক্লান্ত হয়, এইসব উদ্ভাসন এবং বিনোদনের মধ্যে সে প্রতিনিয়ত নিজের কর্মক্লান্ত অস্তিত্বকে ঠেসে দিতে চায়। কিন্তু তাকে অপসারণ করতে পারে যদি তার চেয়েও বড় শক্তি, তবে কেন সে তা করবে না? এরপর চন্দ্রলেখা রাজাকে অপসারণ করার সেই অনির্বচনীয় দৃশ্যের মধ্যে ডুবে যায়।

'একজন নারীর কাছে আসাতেও রাজার পেছনে সৈন্য রাখতে হয়?' সেদিন চন্দ্রলেখার এই শ্লেষমাখা প্রশ্নের পর রাজার পৌরুষ উচ্চকিত হয়ে উঠেছিল। সগর্জনে সমস্ত সৈন্যকে সেই ঘর থেকে অপসারণ করার পর রাজার নির্জন বাগানবাড়িতে দিনেরবেলাতেও সেদিন ছায়া নেমে এসেছিল। ঘরের কোণের পিতলের ধূপদান থেকে পাকিয়ে উঠছিল মিহি সুরভি। চন্দ্রলেখার এলোচুলে মেথির গন্ধ। তখনো চন্দ্রলেখা রানী হয় নি, তার মাথায় খোঁপা ওঠে নি, খোঁপার রহস্য কারোর মধ্যে প্রশ্নও তোলে নি।

সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত্রি আসতে থাকলে চন্দ্রলেখার দৃষ্টি ঘন হতে থাকে। তার গভীর দৃষ্টির সম্মোহনে স্থির বসে আছে রাজা। তখন টর্নেডো আক্রান্ত এক অনাহারী লোকের পায়ের ঘা থেকে বিষরক্ত ঝরছে। ইদ্রিস মিয়ার যুবতী বোনটা ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে পা বাড়িয়েছে শহরের অজানার দিকে। গ্রামের সাধারণ মানুষ এবং স্বয়ং রাজাকে নিয়ন্ত্রণ করছে যে

দেহরক্ষীর পিতা, সে রাজকর্মচারীদের সাথে গোপন বৈঠকে বসেছে দূর রাজ্যের রিলিফকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, কীভাবে কতটুকু স্পর্শকাতরভাবে নিজেদেরকে উপস্থাপন করলে সাহায্যের পরিমাণ বাড়বে, তাই নিয়ে।

ঠিক সেই সময় নিজের দেহের ওপর রাজাকে চন্দ্রলেখা আবিষ্কার করে। মুহূর্তে সে কোঁচড়ের হীরক খণ্ড পাহারারত সাপের দরজা খুলে দেয়।

ঝনাৎ শব্দে সেই দ্রব্য মাটিতে গড়িয়ে পড়লে সমস্ত ঘর যেন শ্বেতবর্ণ আলোয় ঝলসে ওঠে। সর্প দংশিত রাজার পায়ে শাড়ির গেরো দিয়ে চন্দ্রলেখা হীরকখণ্ড এবং সাপটিকে ত্রস্তহাতে বিশাল চুলের খোঁপার বাঁধুনিতে বেঁধে ফেলে। খোঁপায় পর্দা তুলে সে সম্রাজ্ঞীর মতো বিশাল সৈন্যবাহিনীর সামনে যায়, তোমাদের রাজা পরাস্ত, তাকে এক্ষুণি কারাগারে প্রেরণ কর।

চন্দ্রলেখার দৃষ্টি আক্রান্ত সৈন্যরা যন্ত্রচালিতের মতো প্রথমে খাড়া হয়। চন্দ্রলেখা রাজাসন ছুঁড়ে ফেলে যখন রাজপ্রাঙ্গণের বারন্দায় এসে বসে এবং ঘোষণা করে, এ প্রাসাদকে আজ বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করলাম, এর প্রতিটি ইটের বালুতে পাপ, আমি নেমে যাব আপনাদের মতো সাধারণ মানুষের সারিতে, আমার বাস হবে কাঠ কিংবা মাটির কক্ষে, তখন সমস্ত গ্রামে হুল্লোড় পড়ে যায়। বাতাসের সবুজে ধোঁয়া। নেশা আক্রান্ত হাজার মানুষ সেই ধোঁয়া ভেঙে সার বেঁধে রাজপ্রাসাদের সামনে আসতে থাকলে নিজের সবচেয়ে নিকটবর্তী রক্ষাকর্তা হিসেবে চন্দ্রলেখা সুদর্শন যুবক ধনাঢ্য দেহরক্ষীকে নির্বাচন করে।

দেহরক্ষী বলে, আমি আপনার পদতলে প্রতিদিন স্বর্ণদ্রব্য সমর্পণ করব। আমার শ্রেণী সহযোগীরা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আপনাকে সর্বদা সহায়তা করবে।

রানীর ওষ্ঠ যখন সেই দৃশ্য কল্পনায় স্ফুরিত, তখনই যাত্রার মঞ্চের শাঁসালো মাংসের ওপর এক যুবক হামলে পড়ে। চৈত্রসংক্রান্তি মেলার এককোণে এক ভিখিরি ডুকরে কেঁদে উঠে জানায়, এই গ্রামে একদিন তার জমিজমা সব ছিল শুধু আঙুলের কয়েকটি টিপসই তাকে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছে। হ্যাজাকের আলোয় একশো বিশ বছরের বৃদ্ধের শরীর মুচড়ে উঠছে। তার কণ্ঠ নিঃসৃত চন্দ্রলেখার বিচিত্র বিবরণে ভিড় বাড়তে থাকলে দেহরক্ষী ধাতানি দেয়, তুই নাচ বুড়া, নাচতে নাচতে বল।

কী এক জোশের মধ্যে পড়ে বৃদ্ধ এক সময় নাচতে শুরু করে। চন্দ্রলেখার জন্ম, বেড়ে ওঠা, জলে পতন, পুনরায় উত্থান, প্রাসাদ ঠেলতে-থাকা শ্রমিকদের চোখ খুলে দেয়া, পুনরায় জলে গমন, ইত্যাকার নানা প্রসঙ্গ বৃদ্ধের কণ্ঠে আবেদনময়ভাবে পাক খায়। তার ফাটা চামড়ায় ঘুঙুরের বেষ্টন, গলায় মালা, শরীরের এক অংশে ত্যানার মতো কাপড়। নাচতে নাচতে বৃদ্ধ হাঁপায়। তার স্বর স্তব্ধ হয়ে আসতে থাকে।

গলার লাল রুমাল খুলে দেহরক্ষী চ্যাঁচাতে থাকে, আরো জোরে। বৃদ্ধ আবার ফিরে আসে চন্দ্রলেখার উৎস বর্ণনায়... তারপর কিশোরী চন্দ্রলেখারে নদী ডাক দিল। পিতামাতাহীন এতিম চন্দ্রলেখা নদীর পানে হাইট্যা গেলো— বৃদ্ধের গলা শুকিয়ে জিভ বের হয়ে আসতে চায়। ভাঙাচোরা দেহ মাটির সঙ্গে নুয়ে আসতে থাকে। ক্রমেই ভিড় জমে ওঠে, বেড়ার ওপারে টিকিটের বিক্রি বাড়তে থাকলে দেহরক্ষী চ্যাঁচায়, আরো জোরে—

এক সময় মুখভর্তি ফেনা ওঠে। গালের কোঁচকানো চামড়ায় গ্যাঁজলা জমতে থাকে। ঘুঙুরের শব্দ শ্লথ হয়ে আসে।

চন্দ্রলেখা প্রশ্ন করে, বাইরে এত শব্দ কিসের ?

দাসী বলে, দেহরক্ষী কোন্ কাজে তার আসল দায়িত্ব রেখে অন্যত্র যায় ? কোনো গণ্ডগোল হলে রানীকে কে রক্ষা করবে ?

চন্দ্রলেখা বলে, ওই বৃদ্ধকে ও ছাড়া আর কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এখনো রাজ্যে সুস্থিরতা আসে নি, তাই দায়িত্বের ক্ষেত্রেও দেখা দিয়েছে বিশৃঙ্খলা। সেপাইরা কোথায় দাসী ? জরুরি মুহূর্তে ওদের কেউ কী পালন করতে পারে না দেহরক্ষীর দায়িত্ব ?

দাসী মুখ টিপে হাসে, রানীই না হয় তাদের ভেতর থেকে ভারপ্রাপ্ত কাউকে নির্বাচন করুন। চন্দ্রলেখা এরপর অদ্ভুত এক প্রশ্ন করে, দাসী, তোর শরীরের ক্ষিদে নেই ?

দাসী বলে, আমাদের তা থাকতে নেই।

কেন ? তুই কি মানুষ না ?

মানুষ, তবে দাসী মানুষ। আমাদের প্রকাশ্যে কিছু থাকতে নেই। আর রানী সেটা ভালো করেই জানেন।

শব্দ কিসের ? হঠাৎ কাঠের জানালা দিয়ে চন্দ্রলেখা চোখ প্রসারিত করে। দেখে, দেহরক্ষী বৃদ্ধের মৃত শরীর নিয়ে প্রায় উড়তে উড়তে চন্দ্রলেখার পায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। এরপর ফিসফিস করে সে জানায়, এই বৃদ্ধ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আপনার রূপকথা সারা অঞ্চলে ছড়িয়ে দিয়ে গেছে।

দক্ষিণের জঙ্গলে সমবেত হয়েছে নানা শ্রেণীর লোক। কেটে নেয়া গাছের গোল চাকতির গুঁড়িতে বসে শহরের যুবক বলে, আমি এই গ্রামেরই যুবক। অত্যাচারী রাজার শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে আমি দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছিলাম। দীর্ঘদিন অঞ্চলের বাইরে থেকে আমি নিজেকে যথেষ্ট শাণিত করেছি। ভেবেছিলাম, দেশে ফিরে আপনাদের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে অত্যাচারী রাজাকে অপসারণ করব। কিন্তু এসে শুনি কোথাকার কোন্ চন্দ্রলেখা, কোথেকে উড়ে এসে— ।

সভার একপ্রান্তে ঘুমে ঢুলছিল একজন কৃষক। সে চোখ টানটান করে প্রশ্ন করে, এখন তো দেশে অত্যাচারী রাজার শাসন নাই, আমরা ক্যান তবে এই রানীরে অপসারণ করতে চাইতেছি ?

আরেকজন বলে, এই রানী আমাদের মতো সাধারণ মানুষ। সে অত্যাচারী রাজার প্রাসাদ ছেড়ে মামুলি কাঠের দালানে এসে উঠেছে।

শহুরে যুবক অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে, আপনাদের চোখেও সে ঘোর লাগিয়ে দিয়েছে ? একশো বিশ বছরের বৃদ্ধের পরিণতি আপনাদের চোখে পড়ে নি ? তার একটি খোঁপার কাঁটা দিয়ে একজন কৃষক কয় মণ ধান কিনতে পারে আপনারা জানেন ?

কুচক্রার বৈঠকে বসে চন্দ্রলেখা বিজ্ঞ পারিষদের কাছে প্রশ্ন রাখে, অঞ্চলের পূর্ব দিকে প্রচণ্ড খরা। আমাদের গুদামে যথেষ্ট ধান সঞ্চিত নেই, এক্ষেত্রে আমরা কী করতে পারি?

বাইরের সাহায্য প্রয়োজন, বিজ্ঞ পারিষদ মন্তব্য করে। আমাদের সত্যিকার অবস্থার চিত্র পাঠাতে হবে দেশ থেকে দেশান্তরে। নইলে এই অবস্থা সামাল দেয়া যথেষ্ট কঠিন হয়ে পড়বে।

চন্দ্রলেখা বিজ্ঞ পারিষদবর্গের মধ্যে একজন ফরসা মতন টাক পড়া লোকের দিকে চেয়ে বলে, এই অবস্থায় আপনি খাদ্য মজুত করে অঞ্চলে কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টি করেছেন, সেটা কতটুকু সঙ্গত হচ্ছে?

ফরসা মতন লোক মাথা চুলকে বলে, আমি এমন কিছুই করছি না, যার দ্বারা রানী লাভবান হবেন না।

আপনাদের ওপর আমার যথেষ্ট আস্থা আছে, চন্দ্রলেখা বলে, আমি রাজকার্যে নতুন, রাজনীতির হাজার প্যাঁচ বুঝি এমন দাবি করি না। কিন্তু এজন্য প্রাথমিকভাবে আপনাদের সাহায্য আমার প্রয়োজন। কিন্তু আমার মেধা আর দক্ষতার প্রতি প্রবল আস্থা আমার। আমি বিশ্বাস করি, কেউ জন্ম থেকে শিক্ষক, চিকিৎসক কিংবা রাজা হয়ে জন্মায় না। জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা মানুষকে সমৃদ্ধ করে। আপনাদের সুচিন্তিত মতামত আমি শুনব, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই আপনারা আপনাদের সিদ্ধান্ত আমার ওপর চাপাবেন না। সর্বক্ষেত্রেই এই বিষয়টি আমি আমার কাছে রাখতে চাই।

বিজ্ঞ পারিষদ মাথা নাড়তে থাকে, তা বটে। তা বটে।

এখন বলুন, খরাপীড়িত অঞ্চলগুলোর জন্য আমরা ত্বরিত কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি? দেহরক্ষী বলে, আমরা অন্যান্য অঞ্চলের জনসাধারণের কাছে থেকে খাদ্যদ্রব্য, পুরনো কাপড়— এই সব সংগ্রহ করতে পারি।

বিজ্ঞ পারিষদের স্বরে অসহিষ্ণুতা, এই সব আলোচনায় মত প্রকাশ করে দেহরক্ষী তার দায়িত্বের সীমা লঙ্ঘন করছে।

চাপা উত্তেজনা ফুঁসে উঠতে থাকে।

চন্দ্রলেখা বলে, অত্যাচারী রাজার পতনের পর রাজদরবারে এখনো যথেষ্ট বিশৃঙ্খলা রয়ে গেছে। এক কৃত্রিম, যন্ত্রণাকাতর, স্বেচ্ছাচারী রাজত্বের অবসানের পর রাজ্যে এই অবস্থা বিরাজ করাটা বিচিত্র কিছু নয়। অঞ্চলটা রাজা-প্রজা উভয়ের সমান ক্ষেত্রে পরিণত হয়। বিজয়ের ভাগীদার সবাই সমানভাবে হতে চায়। এই অবস্থা কেটে যাবে। দেহরক্ষী, সম্মানিত সভাসদ, প্রজা— সবাই যার যার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হবেন। কিন্তু দেশের সঙ্কটের মুহূর্তে আমি যে কারো মুখ থেকে সমাধানের উপায় শুনতে চাই। এক্ষেত্রে আমি কোনো নিয়মের দূরত্বে রাজকার্যকে সরিয়ে রাখতে চাই না। সভা শেষে চন্দ্রলেখা অনুচ্চ স্বরে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক প্রশ্ন তোলে, দক্ষিণের জঙ্গলে কিসের এত লোক সমাবেশ, জানেন কিছু?

ঘরে ফিরে চন্দ্রলেখার অলস মন্থর দেহ গড়িয়ে পড়ে বিছানায়। আধো ঘুম আধো জাগরণের বিচিত্র তরঙ্গ তাকে স্বপ্নাতুর করে তোলে। এর মধ্যে তাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে কবুতর এসে বসে জানালায়। বিশাল কাগজের একটি ভাঁজ করা টুকরো ফেলে দিয়ে উড়ে

যায় শূন্যে। দেহরক্ষী ত্রস্তহাতে সেই কাগজ খুলে হতভম্ব হয়ে চন্দ্রলেখার সামনে মেলে ধরে। পুরো পাতা জুড়ে সেখানে লেখা,

'চন্দ্র

লেখার

খোঁপার

মধ্যে

কী ?— সর্বনাশ!'

চকিতে দেহরক্ষীর চোখ চলে যায় চন্দ্রলেখার খোঁপার দিকে। রানীর একান্ত ব্যক্তিগত সজ্জা নিয়ে এরকম রহস্যময় কাগজ ? সে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ভাবে, তাই তো, খোঁপার মধ্যে কী ?

চন্দ্রলেখার গালে রক্ত জমছে। দেহরক্ষীর সামনে সে হঠাৎ বিপন্ন বোধ করে। কাঠের প্রাসাদে কিছুক্ষণের মধ্যে ভর করে প্রেতচ্ছায়া।

মুহূর্তমাত্র।

এরপর চন্দ্রলেখা দেহরক্ষীকে প্রশ্ন করে, কবুতর কোন্‌দিক থেকে উড়ে এসেছে ?

দক্ষিণ দিক থেকে।

দক্ষিণে কী ?

গহীন অরণ্য।

এই কাগজ কিসের ইঙ্গিত বহন করছে ?

কিছু স্পষ্ট হচ্ছে না রানী।

ইদ্রিসের কি অক্ষরজ্ঞান আছে ?

না।

তবে কী ধারণা করা যেতে পারে এটা কার কাজ ?

ধারণা করা যাচ্ছে— দেহরক্ষী স্পষ্ট বলতে থাকে, তবে বুঝতে পারছি না, রাজনৈতিক বিষয় ছেড়ে অকস্মাৎ ব্যক্তিগত বিষয়ে পত্র-লেখক আগ্রহী হলো কেন ?

এটা অশিক্ষিতের রাজ্য, চন্দ্রলেখার কণ্ঠনালি বেয়ে বিষবাষ্প নির্গত হয়। এখানকার শিক্ষিতরাও তাই অশিক্ষিতদের দ্বারা প্রভাবিত।

কিছু স্পষ্ট হলো না রানী।

তোমার কাছে কিছু স্পষ্ট হওয়ার প্রয়োজন নেই, ঝাঁঝালো স্বরে রানী বলে, আমি কখনো কোনো কিছুর আসল সূত্র ধরতে পারছি না, তোমরা কেন শিক্ষিত যুবককে ধরে আনছ না ? কেন খবর দিচ্ছ না আয়ুবুড়োকে ? তোমাদের এই শিথিলতার আসল উদ্দেশ্য কী ?

দেহরক্ষী বলে, ক্ষমা করবেন রানী, কাউকে ধরে আনার শাসন আপনি প্রকাশ্য সভায় তুলে নিয়েছেন। তাকে জানানো হয়েছে আপনার আমন্ত্রণবার্তা, কিন্তু সে কোনোভাবেই আপনার সাক্ষাতে রাজি নয়। আয়ুবুড়ো দিন-কাল-ক্ষণ গণনা করে তবেই আপনার কাছে আসবে। এছাড়া সে নতুন বৃক্ষতল ছেড়ে এক পাও কোথাও নড়ে না।

চন্দ্রলেখা বলে, ঠিক আছে, বুঝেছি, তুমি এক্ষুনি সেপাইদের বলো কবুতরের উৎসস্থল সন্ধান করতে। এরপর প্রজ্বলিত আগুন নেভাতে চন্দ্রলেখা চৌবাচ্চায় দেহ ডুবিয়ে দেয়।

দক্ষিণের জঙ্গলে রাত ঘনিয়ে আসতে থাকলে, শহরের যুবক প্রশ্ন করে, আজ ইদ্রিস আসে নি ?

সভার ভেতর একজন জানায়, না, তার মতিগতি বোঝা যাচ্ছে না।

শিক্ষিত যুবক বলে, কৃষক সম্প্রদায়ও কি চন্দ্রলেখার জাদুর মোহজালে আটকা পড়েছে ?

আরেকজন বলে, সেদিন ইদ্রিসকে দেখলাম, আরো কয়েকজনকে সাথে নিয়ে কীসব ফিসফিস করছে।

শিক্ষিত যুবক বলে, সে কি আলাদা দল গঠন করতে চায় ?

জানি না।

আরে, ও একা কী করবে ? শিক্ষিত যুবকের কণ্ঠ উচ্চকিত হয়। এই সম্প্রদায়কে দু'মুঠো ভাত দিয়েই ঘুম পাড়িয়ে রাখা যায়। এই অবস্থার সুযোগই রাজতন্ত্র গ্রহণ করে। এখন যদি আমরা নিজেদের নেতৃত্ব আর ভাঙন নিয়ে ব্যস্ত থাকি, তবে অঞ্চলের সমূহ পতন ঠেকাবে কে ? ভাইয়েরা, আপনারা অনেকেই এখানে কৃষক ভাই আছেন। আপনারাই বলুন, রাজদরবারের উচ্চাসনে আসীন এমন কেউ আছেন যিনি আর্থিকভাবে দরিদ্র ?

সবাই সমস্বরে জানায়, না।

তাহলে দাঁড়াচ্ছে কী ? চন্দ্রলেখার রাজত্ব, বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজত্ব, শিক্ষিত যুবক বলে, বুর্জোয়া শ্রেণী, জোতদাররা কীভাবে আপনাদেরকে ঠকায় এর ছোট্ট একটা উদাহরণ দেই। আপনারা অভাবগ্রস্ত হয়ে তাদের কাছে ঋণ আনতে যান না ?

হ্যাঁ যাই।

যখন তারা আপনাদেরকে ধান ঋণ দেয়, তখন দেখবেন, ধান মাপার কৌটোটা বেশ ছোট। এরপর আপনারা যখন সেই ধান তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে যাবেন, তখন এর চেয়ে বড় কৌটো তারা বের করে। আপনি যদি প্রশ্ন করেন, আগের কৌটো কই, তারা বলবে, হারিয়ে গেছে। তাতে কী, এই কৌটো তো আগের কৌটোরই সমান। এরকম হরহামেশাই হয়। আপনি কী তাদেরকে অবিশ্বাস করার সাহস করবেন ? করবেন না। এর মধ্যে তবুও যথেষ্ট ভদ্রতা আছে। এ ছাড়াও বিপন্ন কৃষককে তারা আরো অশ্লীলভাবে নির্যাতন করে। সে যখন বুভুক্ষু, চরম বিপদগ্রস্ত তখন তারা ঋণের বিনিময়ে কৃষকের স্ত্রী, কন্যা বিনিময়ের প্রসঙ্গ তুলতেও পেছপা হয় না। এছাড়াও গোপনে প্রকাশ্যে তারা যে অত্যাচার করছে, খরাপীড়িত অঞ্চলের বিষয়ে উদাসীন হয়ে আপনার ঘাম, রক্ত শুষে বিলাসী জীবন যাপন করছে, এর কী জবাব দেবেন ?

কেউ বুক চিতিয়ে বলে, এর প্রতিকার চাই। কেউ-বা নেশার ঘোরে ঢুলতে ঢুলতে উঠে দাঁড়ায়। একজন বলে, অত্যাচারী রাজা কী সর্বনাশটাই না করে গেছে। সব মানুষের মধ্যে

নেশার অভ্যাস ঢুকিয়ে দিয়েছে।

শিক্ষিত যুবক বলে, তার চেয়েও মারাত্মক চন্দ্রলেখার নেশা।

ইদ্রিসের কঠিন চোখ বিদ্ধ করে আছে সামনের আলোছায়া। মৃত ভাইটার দাফন হয়ে গেছে। মৃত্যুর আগে এই ক্ষুদ্র শিশুটিকে এক দঙ্গল ভাইবোনের মধ্যে কখনো আলাদা করে চেনা হয়ে ওঠে নি। শুধু দেখত, একটি ছোট্ট বালক মজা পুকুরে ডুবের পর ডুব দিয়ে কী এক অজানা শামুক খুঁজছে। ভাইয়ের সাথে তার পরিচয় ওইটুকুই। গতকাল তার মুখে মা কী খাদ্য-অখাদ্য ঢুকিয়েছে— হালকা হতে হতে আজ ছেলেটি শেষ।

মায়ের ক্রন্দন যখন ধোঁয়ার মতো আসমানমুখী, তখন শূন্যতো ছিঁড়েখুঁড়ে পুব অঞ্চলের দিকে রিলিফ নিয়ে যাচ্ছে হেলিকপ্টার।

ওখানে কি চন্দ্রলেখা আছে? ইদ্রিস ঘাড় কাত করে দেখার চেষ্টা করে। না, চন্দ্রলেখা কাঠের দালানের বাইরে কোথাও যায় না।

কী এর রহস্য? ইদ্রিস যখন এরকম ভাবছে, তখন মিস্টার এম. আলী অপলক চেয়ে আছেন টিভি স্ক্রিনের দিকে, এটা কোন চ্যানেল? পর্দার কোনায় চ্যানেলের কোনো নাম নেই। তিনি হতশ্রী যুবকের দিকে অপলক চেয়ে থেকে ভাবেন, ওই মৃত শিশুটিই-বা কে?

এরপর চন্দ্রলেখার রাজত্বে দাউদাউ উড়তে শুরু করে বাতাস। পুবের ক্ষুধার্ত ছিন্নমূল মানুষ থালাবাসন হাতে সার সার জড়ো হয় চন্দ্রলেখার কাঠের প্রাসাদের সামনে। কারাগারে বন্দি রাজা বিকারগ্রস্তের মতো হাসতে থাকে, এবার ঠ্যালা সামলাও জননী। এরপর সে দেয়ালে কান পেতে জনতার কলধ্বনি শুনতে থাকে। প্রাসাদের অভ্যন্তরে বসে চন্দ্রলেখা সেপাইদের নির্দেশ দেয়, ক্ষুধার্ত জনতার জন্যে অঞ্চলের এক কোনায় লঙ্গরখানার ব্যবস্থা করতে।

চন্দ্রলেখা সতী... চন্দ্রলেখা পুণ্যবতী— ক্রমশ এই বিশ্বাস সমস্ত অঞ্চলে সঞ্চারিত হতে থাকে। শিক্ষিত যুবকের মায়ের মধ্যেও এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়। সে তার ছেলেকে বলে, পূর্বজন্মে পুণ্যবান না হলে পরজন্মে কেউ রানী হয়ে জন্মায়?

এসবই ভাঁওতাবাজি, যুবক অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে।

মা বলে, দুর্গা দুর্গা...।

এক সময় শিক্ষিত যুবক হতাশায় নুয়ে আসতে থাকলে, তার শিষ্য একজন এসে জানায়, ইদ্রিস আগে গাঁজা খেত, আফিম নিত, এখন নাকি সে তার হাতে সাপের ছোবল নেয় কিন্তু বিষাক্রান্ত হয় না।

ছোঃ, শিক্ষিত যুবক খেঁকিয়ে ওঠে, এই সব বুজরুকির গল্প ছাড়ো। পুরো অঞ্চলটায় শুধু অন্ধত্ব, কুসংস্কার, ভয়। ইদ্রিসকে ক্রমাগত কব্জা করে নিচ্ছে উচ্চবিত্তশ্রেণীর লোকেরা। ও টের পাচ্ছে না।

মা এসে বলে, এই অঞ্চলের একমাত্র শিক্ষিত তুই। কী লাভ হলো? ঘরের ধান যে ফুরিয়ে আসছে।

এখানে আমার কোনো উচ্চপদে কাজ হবে না, শিক্ষিত যুবক বলে, ভাবছি কৃষকদের সাথে ধান চাষ করব।

মা আঁতকে ওঠে, পিতৃপুরুষের ইজ্জত ডোবাবি? এর চেয়ে না খেয়ে দরজা আটকে পড়ে থাকা ভালো।

শিক্ষিত যুবক বলে, আপনার পুণ্যবতী চন্দ্রলেখাকে বলেন খাদ্য পাঠাতে।

মা বলে, রাজশত্রু হওয়া বড় মারাত্মক। বাবা, তুই আপোস কর।

এর মধ্যে হঠাৎ সেই অঞ্চলে আজব কাণ্ড শুরু হয়। এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে জোয়ান ছেলেরা উধাও হয়ে যায়। প্রথমে ব্যাপারটা কেউ আমল দেয় না। কিন্তু যখন উধাও হয়ে যাওয়া ছেলেদের আর সন্ধান মেলে না, তখন সেটা ভীতিকর অবস্থায় গিয়ে দাঁড়ায়। সমস্ত রাজ্যে ঢোল পিটিয়ে চন্দ্রলেখা জানায়, গ্রামে এসেছে অদৃশ্য জিন, যার শক্তি অপরিসীম। চন্দ্রলেখা তার অভিজ্ঞতা দিয়ে জানে, সমাজে অধর্ম, অসম্মান, অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পেলে এ ধরনের জিনের আগমন ঘটে। এই পরিস্থিতিতে মাথা সুস্থির রেখে সৃষ্টিকর্তার ধ্যান করা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই।

এর কয়েক বছর আগে এই অঞ্চলে জনগণ দেখেছে শেয়ালের প্রকোপ, তারা সন্ধ্যায় শিশুদের টেনে নিয়ে যেত। দেখেছে, শত শত হাতির আক্রমণ। কবর থেকে অদৃশ্য আত্মারা উঠে আসে, এই অঞ্চলের জনগণ এটা বিশ্বাস করে। অত্যাচারী রাজার আমলে একবার মহামারী আকারে আত্মারা উঠে এসেছিল। রাতে ওরা আক্রমণ করত, সকালে এর-ওর লাশ খালে-ডোবায় ভেসে উঠত। অদৃশ্য জিনের আক্রমণ এই প্রথম।

এক সাথে যেখানে অধিক নিঃশ্বাসের গন্ধ, সেখানেই অদৃশ্য জিন বেশি থাবা বিস্তার করে। জিনের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে চন্দ্রলেখা পুনরায় এই বার্তা জানায়, সবার মাঝখান থেকে একজনকে টুক করে উঠিয়ে নিয়ে যায়।

সমস্ত মানুষ হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। মুহূর্তে আড্ডা, সমাবেশ, গুঞ্জন সব বন্ধ। বন্ধ হয়ে যায় গ্রামীণ মেলা, উৎসব। মানুষ ক্রমেই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়তে থাকে। সারারাত সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে মস্তক নত করে পড়ে থাকে। সকালে খোঁজ পড়ে কোন আড্ডায় কে খোয়া গেল। শিক্ষিত যুবক দক্ষিণের জঙ্গলের গাছে একা হেলান দিয়ে বিড় বিড় করে, পিশাচি চন্দ্রলেখা, একদিন-না-একদিন তোর জাদুর খেলা আমি বন্ধ করব।

চন্দ্রলেখা দাসীকে প্রশ্ন করে, আজ আসমানের রং কেমন?

দাসী সহাস্যে বলে, চন্দ্রলেখার মেঘাক্রান্ত চুলের মতোই।

জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় শিক্ষিত যুবক। সমস্ত অঞ্চলে নেমে এসেছে অসীম স্তব্ধতা। সে ভিড় এবং সভার পক্ষের লোক, ইতোমধ্যে তার সভা থেকে দু'জন যুবক অন্তর্হিত হয়েছে, এসব কারণে ক্রমশ সে সমস্ত অঞ্চলের শত্রুতে পরিণত হচ্ছে। ঢেরা পিটিয়ে চন্দ্রলেখা জানিয়ে দেয়, জাতির জন্যে বাইরের শিক্ষার কোনো প্রয়োজন নেই। এই শিক্ষার ফলে মানুষের মানসিকতা হয়ে পড়ে বহির্মুখী। এর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যার যার পেশার ওপর যথাযথ দক্ষতার, যার মাধ্যমে নিজের নিজের সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। তাঁত বোনা, পুকুর খনন,

সেলাইকাজ, পাথরভাঙা, বৃক্ষরোপণ ইত্যাকার বিষয় এসব কাজের অন্তর্ভুক্ত। পরিশ্রমিক ছাড়াও এসব কাজ মানুষ করবে অঞ্চলকে ভালোবাসার স্বার্থে। এর বিনিময়ে সাধারণ মানুষের জন্যে চন্দ্রলেখা একবেলা করে নুন-চালের ব্যবস্থা করবে।

শিক্ষিত যুবকের সমস্ত শরীরে ছায়া ফেলে কারুকার্যময় পাতাগুলো। বিস্তৃত শূন্যতার ঢেউ তার বুক থেকে লাফিয়ে ছুটতে ছুটতে চারপাশ ম্রিয়মাণ করে তোলে। সে খড় বিছানো মাটিতে শুয়ে দেখে, সার সার বৃক্ষের ওপর দিয়ে অদ্ভুত রেশ ছড়িয়ে সূর্যের শেষ আলো। সে শহরে দেখেছে কী চৌকস সবকিছু— যানবাহন, মানুষজন। ক্লাসের শিক্ষক খুলে দিচ্ছেন সভ্য পৃথিবীর দরজা, পৃথিবী যখন এইভাবে এগোচ্ছে, তখন জিন-পরির বুজরুকির মধ্যে আবর্তিত চন্দ্রলেখা আসলে কে ?

শিক্ষিত যুবক সটান দাঁড়ায়। জঙ্গল থেকে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে সে বনের উল্টো দিকের মাঠটির ওপর গিয়ে থাকে। জিনের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু যেহেতু যুবকেরা, তাহলে— সে দেখে, এক দঙ্গল শিশু-কিশোর দল বেঁধে খেলছে।

যুবক ভাবে, এদের মাথা এখনো যথেষ্ট পরিষ্কার। সে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, হাত নাড়িয়ে বলে, প্রিয় শিশু-কিশোরেরা... ।

দেহরক্ষী বলে, রানী, প্রচুর সাহায্য আসছে। বাইরের পৃথিবীর ওরা বলছিল, যে অঞ্চলে খরায় মানুষ অমন কুৎসিত হয়ে ওঠে, সেই অঞ্চলের রানী কি স্বর্গ থেকে আগত কেউ ? কী করে সে ধারণ করে আছে এই অসম্ভব দেবীতুল্য সুন্দর ?

চন্দ্রলেখার ঠোঁটে বক্র হাসি ফুটে ওঠে, বিজ্ঞ পারিষদ তাহলে আমার ছবিও পাঠিয়েছিল ? এখন বলো, সাহায্যসামগ্রী কি সব তারাই উদরস্থ করছে ?

এ-কী অত্যাচারী রাজার শাসনামল ? দেহরক্ষী বলে, দেশ এখন চলছে পুণ্যবতী চন্দ্রলেখার কৃপায়। সব হিসেব তারা তন্নতন্ন করে আপনাকে বুঝিয়ে দেবে।

চন্দ্রলেখা কপাট বন্ধ করে উষ্ণ নিঃশ্বাসে সমস্ত কক্ষ আর্দ্র করে তোলে, আমার খোঁপার জন্য কাঁটা খুঁজতে বলেছিলাম, সন্ধান মেলে নি ?

রানী, জলে-স্থলে-অন্তরিক্ষে খোঁজ চলেছে। খোঁপার কাঁটা হীরের হয় না। এ উন্নত দেশ থেকে অর্ডার দিয়ে বানিয়ে আনতে হবে। এখন সেই ব্যবস্থাই হচ্ছে। এরপর চন্দ্রলেখা ডুবে যায় অদ্ভুত নেশায়, জানো, এত ভয় হয় মাঝে মাঝে, আয়ুবুড়োর গণনা কবে শেষ হবে ? চন্দ্রলেখার বুকের ওপর পড়ে থাকা লকেট থেকে উজ্জ্বল চকমকি স্ফুরিত হয়। ওর মগজ কর্ষণ করে হাজারো ঘোড়ার খুরের শব্দ। চন্দ্রলেখা নিজেকে তাদের তলায় পিষ্ট দেখতে পায়। তার চিবুকের তলদেশে নোনতা জলের ধারা নামলে দেহরক্ষী বলে, তোমার কি মনে পড়ছে অত্যাচারী রাজার আমলের প্রাসাদ ঠেলার দৃশ্যের কথা ? রানী, শান্ত হও। সেই অঞ্চলের প্রচুর বৃক্ষ লাগানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। সেখানেও তৈরি হচ্ছে সুরম্য কাঠের প্রাসাদ। চতুর্দিকে গান গাইবে সহাস্য পাখির দল। এসবই হচ্ছে তোমার শান্তির জন্য।

চন্দ্রলেখা বলে, সাবধানে থেকো তুমি, চারদিকে বড় বৃদ্ধি পেয়েছে অদৃশ্য জিনের থাবা। তুমি এত সুন্দর যুবক যে—

দেহরক্ষী মোমের মতো গলে পড়তে থাকে, এই কথা, স্বয়ং মৃত্যুরও সাধ্য নেই আমার কেশ স্পর্শ করে, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো রানী।

অকস্মাৎ বাইরে গুলির শব্দ। হতচকিত দেহরক্ষী চন্দ্রলেখার আবেষ্টন থেকে বেরিয়ে চকিতে দরজা খোলে। তার ছুটন্ত দেহের দিকে গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে চন্দ্রলেখা। উদ্বিগ্ন প্রহর পেরোয়।

কিছুক্ষণ পর চন্দ্রলেখার ঠাণ্ডা চোখের সামনে একটি রক্তমাখা কবুতর নিয়ে আসে দেহরক্ষী, বলে, এর মুখে চিঠি দেখে প্রহরী ওকে গুলি করেছে।

চন্দ্রলেখা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করে, আবার চিঠি? কেউ কি পড়েছে?

কার ঘাড়ে দুটো মাথা আছে?

চন্দ্রলেখা আশ্বস্ত বোধ করে। এরপর রক্তমাখা চিঠি দেহরক্ষীর হাত থেকে নিয়ে বলে, তুমি এটাকে বাইরে নিয়ে যাও এবং তদন্ত করে বের করার চেষ্টা কর, এটা কোন্ অঞ্চলের কবুতর? কাগজের পৃষ্ঠা মেলে ধরতেই সে দেখতে পায় কিছু সাঙ্কেতিক শব্দ—

'করবী,

সাপ,

জরুল,

আসন্ন মৃত্যু।'

চন্দ্রলেখার সর্বাঙ্গ শিথিল হয়ে আসে, জরুল?

স্ফটিক দর্পণে গ্রীবা উচ্চকিত করে সে একটানে খোলে খোঁপার পর্দা, হ্যাঁ, ওইতো ঘাড়ের তলায় জরুল। আমার জরুলের খবর? ওরা... ?

ইতোমধ্যে দাসী এসে অতি নিভৃতে জানায়, আয়ুবুড়োর গণনা শেষ হয়েছে। আসছে পূর্ণিমার রাতে চন্দ্রের আলোয় সে রানীর আয়ু সম্পর্কে বিস্তারিত পাঠ করে শোনাবে। কিন্তু রানী যদি রাজ গরিমায় অন্যান্যের মতো তার দর্শনপ্রার্থী না হয়ে বুড়োকে প্রাসাদে ডেকে নিয়ে আসেন, তবে যথার্থ গণনা থেকে তিনি বঞ্চিত হবেন। তিনি ওই জাতীয় জটিল গণনা বৃক্ষের নিচে কিংবা বিস্তৃত মাঠেই পাঠ করতে অভ্যস্ত। এছাড়া হাতের রেখা তিনি চাঁদের আলো ছাড়া দেখতে পান না। এরপরও রানী যদি চান, বুড়ো প্রাসাদে আসতে বাধ্য।

এটাও কি শত্রুর কোনো চাল? চন্দ্রলেখা ভাবতে থাকে। কেন রাতের অন্ধকারে আমাকে বৃক্ষের নিচে নিতে চাইছে ওই বুড়ো?

কে এই পত্র লেখক? সে কী করে এই জরুলের খবর জানে? আপেলে ক্রুদ্ধ দাঁত বসিয়ে চিত্রার্পিত চন্দ্রলেখা নিজেকে বিন্যস্ত করে, শান্ত হও।

দাসী চলে গেলে দেহরক্ষী ঘরে আসে, চন্দ্রলেখার ওষ্ঠ প্রচণ্ড আবেগে স্ফুরিত হয়। আচ্ছা, তুমি তো আমাকে আগে বলো নি, তুমি শহরের যুবককে চেনো?

দেহরক্ষী স্তব্ধ চোখ মেলে থাকে।

ঘাবড়ে যাবার কিছু নেই, রাজ দেহরক্ষী হিসেবে সবাইকে চেনা তোমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

আপনি কী বলতে চাইছেন রানী?

আমি এবারের চিঠিতে যা অবগত হয়েছি, তার সম্পর্কে ধারণা দিতে চাইছি রাজ দেহরক্ষীকে।

রানী, আমি ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছি।

দেহরক্ষী, আমি ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছি।

এরপর রানী শহরের যুবককে ধরে আনার শেষ আদেশ দিলে রাজ সৈন্যরা তুলোর মতো তাকে উড়িয়ে এনে ঝপাৎ চন্দ্রলেখার সামনে ফেলে দেয়।

প্রথম রাতের মিলনেই দেহরক্ষীর মাথা থেকে মগজ খুলে নিয়ে নদীর জলে নিক্ষেপ করেছিল চন্দ্রলেখা। এ মগজ নয়, আমাকে রক্ষা করবে শক্তি দিয়ে— এমন ভাবনায় আক্রান্ত চন্দ্রলেখার কাঠের প্রাসাদে সুরভির ঢেউ উঠলে নদীর জলে উত্তাল বাতাস বইতে থাকে। কাঠের নৌকার মতো প্রাসাদ দুলতে থাকলে শহর থেকে আসা তেজস্বী যুবকের দৃষ্টিতেও এক সময় ঘোর লাগে। চন্দ্রলেখা তেজস্বী যুবকের মাথা থেকে সেই একইভাবে মগজ খুলতে থাকে, ফিসফিস করে কাঁদে যুবক, না পারি ভিক্ষা করতে, না পারি প্রাসাদে বাস করতে।

বিস্তৃত জনারণ্যে একসময় সে সম্মোহিত যুবককে ঠেলে দেয়, ওদেরকে আয়ত্ত করা এখন তোমার দায়িত্ব।

তেজস্বী যুবকের ঘন মৃদু হাসি চন্দ্রলেখার বুকে নতুন স্পন্দন তোলে।

এইসব জটিলতার চক্রে গভীর রাত্তিরে চন্দ্রলেখা দেহরক্ষীর দলাপাকানো তুলোয় পরিণত হয়।

দেহরক্ষী বলে, এ কী প্রাপ্তি আমার! অসম্ভবের সাথে যার বসবাস!

চন্দ্রলেখা হাসে এবং জানায়, দেহরক্ষীকে সে ভালোবাসে।

বিভিন্ন রাজ্য থেকে উপঢৌকন আসছে। অন্যান্য রাজ্যের শাসনকর্তারা আসে। কাঠের প্রাসাদের ছাদ প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে বিস্তৃত নদীর দিকে তাকিয়ে তারা চন্দ্রলেখার ঘ্রাণ শুঁকে নিয়ে বলে, অপূর্ব! চন্দ্রলেখা মনে পড়ে, এ রাজ্যের শাসনভার নেয়ার আগে গ্রামের এক অঞ্চল থেকে পুরোহিত এসেছিল, প্রশ্ন করেছিল, আপনি কোন্ ধর্মের রানী মা ? পূর্বজন্মে যা ছিলেন এখনো কি তা বহাল আছে ?

চন্দ্রলেখার দৃষ্টির মহিমায় তার ললাটে পুরোহিত দুর্গার তৃতীয় চোখ দেখতে পায়। এরপর আসে মৌলভি, চন্দ্রলেখা উচ্চারণ করে, আল্লাহ একক, রসুল তাঁর নবী।

পাদ্রী এসে বসার পর চন্দ্রলেখা আকুতি জানায়, ঈশ্বরের পুত্র যীশু যেন তার মঙ্গল করেন।

যথারীতি হলুদ কাপড় পরিহিত ভিক্ষু এসে চন্দ্রলেখার সামনে উপবিষ্ট হলে চন্দ্রলেখার গম্ভীর চেহারায় বুদ্ধের ছায়া মূর্ত হয়ে ওঠে, চন্দ্রলেখা 'সব্বে সত্তা সুখিতা হন্তু' এ রকম উচ্চারণের পর নিজের মধ্যে বুঁদ হয়ে যায়।

চন্দ্রলেখা এরপর নিজের মুখোমুখি হয়, সব ধর্মের প্রতিই আমার সমান বিদ্বেষ, কেননা চূড়ান্ত বিনোদন কোনো ধর্মেই নেই।

কাঠের প্রাসাদের গভীর শয্যায় দেহরক্ষী যখন চন্দ্রলেখার আলিঙ্গনাবদ্ধ, তখন তার মগজহীন মাথায় উড়ন্ত চিঠিকে কেন্দ্র করে অদ্ভুত কৌতূহল ক্রিয়া করে— এ নারীর সর্বাঙ্গ থেকে সব খসে পড়ে কেবল খোঁপায় প্রতিনিয়ত কাপড় কেন ? কেন সেখানে স্পর্শমাত্র সে গনগনে আগুনের মতো প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে ? দূর পাহাড় থেকে জলের তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে কাঠের মাস্তুলে এসে বসেছে কালো বাদুড়!

জানালায় ভেসে আসা শীতে কুঁকড়ে উঠে চন্দ্রলেখা অনুভব করে, এ পুরুষের শরীরে আজ শুধু মাটির দলা। সমস্ত অনুভূতি ধাবিত হচ্ছে সেই তেজস্বী যুবকের প্রতি। এরকম যখন পরিস্থিতি, তখন পুরো অঞ্চলের মধ্যে একমাত্র ইদ্রিসই এসে চন্দ্রলেখার রাতের প্রাঙ্গণের দিকে থুথু ছুঁড়ে দেয়। যীশু হারানোর বেদনায় ডুকরে ওঠে তার মা। ডায়রিয়া আক্রান্ত কয়েকজন মানুষ চিকিৎসার অভাবে মারা যায়, গভীর উষ্মায় ফেঁপে ওঠে নদী, সার-সার কালো কবুতর রাতের আকাশ ছিঁড়তে থাকে। কৃষ্ণপক্ষের জলে কেবল ক্রুদ্ধতা। মিহি আতরের গন্ধে মাতোয়ারা দেহরক্ষী জীবনে প্রথম চন্দ্রলেখার খোঁপায় হাত ঢুকিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে খোঁপা খুলে বেরিয়ে আসে সর্প।

অতঃপর বিস্তৃত খোলা জানালার ওপাশের কালো নদীতে ঝপাৎ শব্দ। দেহরক্ষীর অস্তিত্বের ওপর নদী ফেনা বিস্তার করে।

অদৃশ্য জিনের কবলে পড়ে উধাও হয়েছে দেহরক্ষী— এমন গুজবের পর শহুরে তেজস্বী যুবক নতুন দেহরক্ষী হয়। এসে চন্দ্রলেখাকে বলে, মণিমুক্তো নেই আমার, কিছু পুঁথির বই এবং গুচ্ছ ফুল রাখব তোমার চরণতলে।

চন্দ্রলেখা নিশ্চিন্ত হয়, আর কোনো ভাসমান চিঠি তাকে বিভ্রান্ত করবে না। বিশ্বাসঘাতককে উপযুক্ত শাস্তিই প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষিত যুবককে চন্দ্রলেখা প্রশ্ন করে, তুমি কেন বিদ্রোহী হয়েছিলে ?

তোমার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য রানী।

তুমি আমাকে এর আগে কোথায় দেখেছ ?

দূর থেকে কাঠের প্রাসাদের ছাদে।

আমার কী সবচেয়ে সুন্দর ?

ক্রুদ্ধতা!

দূত এসে চন্দ্রলেখাকে জানায়, অত্যাচারী রাজার শাসনামলে যে জনতা ছিল ঘুমন্ত, তারা আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। উত্তর-দক্ষিণ সব এলাকাই এখন স্বাধিকারের দাবিতে সোচ্চার।

চন্দ্রলেখা প্রশ্ন করে, তাদের মধ্যে কে এই বোধ জাগরিত করছে ?

দূত বলে, চরম গোপন তথ্যেই জানা গেছে, ইদ্রিস নামের এক দরিদ্র যুবক, যার আছে দুর্দান্ত কূটবুদ্ধি, এর পেছনে তার ইন্ধনই কাজ করছে বেশি। প্রতিটি এলাকাই এখন আলাদাভাবে নিজ এলাকার উন্নতি চায়, খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান চায়।

প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত চন্দ্রলেখা ঘরের ভেতর এসে টানটান বসে থাকে। এরকম অবস্থায় সে অসম্ভব বিপন্ন বোধ করে। রক্তের মধ্যে কুচিকুচি বরফ কণা এত দ্রুত বেগে সঞ্চারিত হয়, মাথার দু'পাশের রগ এত দ্রুততার সাথে খসে পড়তে চায় যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করাই কঠিন

হয়ে পড়ে তার জন্য। সে বিশাল আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। নিজেকে বিন্যস্ত করার জন্য সম্মুখের অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তিটির দিকে তাকায়। দেখে, আয়নায় প্রতিফলিত চক্ষুযুগল থেকে বিষাক্ত ধোঁয়ার মতো নীলচে আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

চন্দ্রলেখা ভীত হয়ে পড়ে। এই মুহূর্তে কার কণ্ঠে বিষদাঁত বসালে আমার ভেতরটা শান্ত হবে ? আয়নার চক্ষুকে সে প্রচণ্ড আবেদনময় করে তুলতে চায়, ওই জাদুকরী চোখ যদি তাকে বশ করতে পারে ? ছাদের ওপর থেকে পত্‌পত্‌ শব্দে উড়ে যাচ্ছে সন্ধ্যার বাদুড়েরা। জলের শব্দ প্রচণ্ড বেগে বাড়ছে।

চন্দ্রলেখা কাঠের থামে প্যাঁচানো দড়ি খুলে তার মাথায় আগুন ধরায়। এরপর চেপে ধরে উরুর মধ্যে। বুকের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে, কিন্তু কেমন শান্ত হয়ে আসছে সব। নতুন দেহরক্ষী ছুটে এসে জাপটে ধরে চন্দ্রলেখাকে, এই অসহিষ্ণুতা দিয়ে তুমি করবে রাজ্যশাসন ? তোমার এই দুর্বলতার পথ ধরেই গোপনে প্রবেশ করবে তস্কর। তুমি শান্ত হও।

চন্দ্রলেখা শান্ত হয়ে আসে। এরপর ফিসফিস করে বলে, আমার একটাই সমস্যা, যথেষ্ট শিক্ষা নেই আমার। তুমি শিক্ষিত যুবক, এখন থেকে রাজ্যের যত পুঁথি আছে আমাকে পাঠ করে শোনাবে। আমি শিক্ষিত হতে চাই।

দেহরক্ষী বিগলিত স্বরে বলে, তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করব আমি।

ইতোমধ্যে পুরনো দেহরক্ষীর অন্তর্ধানের পর বিজ্ঞ সভাসদদের মধ্য নানা রকম গুঞ্জন, অহিষ্ণুতা বেড়ে উঠতে থাকলে সভায় বেশ কিছু রদবদল হয়। এতে করে তার শত্রুর সংখ্যা বাড়ছে এটা টের পেয়ে চন্দ্রলেখা আগামী জ্যোৎস্না রাতে আয়ুবুড়োর কাছে যাওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ইদ্রিসকে অনেকবার খবর দেয়া হয়েছে। চন্দ্রলেখা পেয়াদা নিয়ে তাকে ধরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর থেকে অঞ্চলে তার ছায়া পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

দাসী বলে, ইদ্রিস নিজেই অন্য এক জাতের জিনের বংশধর, সে তার ছায়ার মধ্যে লুকিয়ে হাঁটে।

ইদ্রিস সম্পর্কে এ জাতীয় মন্তব্যে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে চন্দ্রলেখা। বাদুড়কে বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে বলে, রাত্তিরে ওকে খুঁজে বের করা তোর দায়িত্ব। আঁধারে তার ছায়া পড়ার সুযোগ নেই, ছায়ার মধ্যে সে লুকোতে পারবে না।

এরপর একশো বিশ বছরের বৃদ্ধের সুরম্য মাজার, যা চন্দ্রলেখার নির্দেশে সজ্জিত, সেখানে গিয়ে নতুন করে বাঁচার প্রার্থনা করে চন্দ্রলেখা। তাকে যখন চূড়ান্ত রোমান্সে ভাসিয়ে নিয়ে চলছে নতুন দেহরক্ষী, যখন জীবন পুনরায় স্পন্দনময়, তাকে রাজা করে পুরো রাজ্য সুস্থির মতো চালিয়ে নিচ্ছে উপযুক্ত সভাসদ, তখন চন্দ্রলেখার রাতের শেষ প্রহরে চোখের কোণ ভিজে ওঠে পুরনো দেহরক্ষীর স্মৃতি কল্পনায়।

পেছনে ছায়ার মতো সৈন্যরা। চন্দ্রলেখার একেবারে নিঃশ্বাসের কাছ দিয়ে চলছে নতুন দেহরক্ষী। চারপাশে মোমের মতো জ্যোৎস্না ঝরছে। প্রাণ জুড়িয়ে দেয়া শীতল বাতাস চন্দ্রলেখাকে বিমোহিত করে তোলে। ঘোড়ার খুরের তলায়ও আজ অসম্ভব সাবধানতা, যেন ঠুলি পরানো হয়েছে সেখানে, পদসঞ্চালনে এমনই স্তব্ধতা।

চন্দ্রলেখা পর্দা ফাঁক করে দেখে, তার অঞ্চলের অনির্বচনীয় জ্যোৎস্না। দাসীকে সে বলে, দেখেছিস আমার অঞ্চলের রূপ ? কোথাও কোনো দুঃখ নেই।

দাসী বলে, এই রূপ চন্দ্রলেখার রূপের কাছে কিছুই নয়।

হু-হু বাতাসে চন্দ্রলেখার খোঁপার ঘোমটা খুলে পড়তে চায়। ফরফর কাঁপে ঘোড়াগাড়ির পর্দা। নিঃশব্দ বহরটা যখন অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এলাকার নতুন বটগাছের কাছাকাছি, তখন ইদ্রিস ছায়ার মতো প্রবেশ করেছে নিস্তব্ধ কাঠের প্রাসাদে। তার সতর্ক দৃষ্টি প্রাসাদের অলিগলি চষতে থাকলে বন্দি রাজা অসম্ভব জ্বর বোধ করে। সে টের পায়, এ ঠিক জ্বর নয়, শরীরের প্রচণ্ড তৃষ্ণা। এই তৃষ্ণা এতই ব্যাপক আকার ধারণ করে যে, উবু হয়ে বসে সে কেঁদে ফেলে। এক সময় প্রচণ্ড রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে কারারক্ষীদের সামনে প্রায় প্রকাশ্যেই কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করে।

রানী, আমার তসরিফ গ্রহণ করুন, আয়ুবুড়ো গম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারণ করে। চন্দ্রলেখার বহরের নিস্তব্ধ আলোকবিন্দু বুড়োর দীর্ঘচুল, ধবধবে শাদা দাড়ি, যা গিয়ে নাভিতে ঠেকেছে এবং তার কাঠের মালায় এমনভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে, পুরো মানুষটাই হয়ে উঠেছে বিচিত্র।

আয়ুবুড়ো হাতের ইশারায় বাতিগুলোকে অর্ধনমিত হতে নির্দেশ দেয়। জেগে ওঠে ফকফকে জ্যোৎস্না।

চন্দ্রলেখা তার ভাবভঙ্গি দেখে শ্লেষমাখা ঠোঁটে হাসে। কিন্তু প্রকাশ্যে সে সাধারণ ভক্তের মতো মাথা নামিয়ে রাখে। চোখের জাদুর বিচ্ছুরণ সঠিক আয়ু জানার ক্ষেত্রে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে, ফলে কথা বলার সময়ও সে পুরো মাত্রায় হয়ে ওঠে মামুলি।

আয়ুবুড়ো বলে, মা, আপনি হয়তো আমার ওপর আস্থা রাখতে পারছেন না।

চকিতে চন্দ্রলেখা ঘাড় খাড়া করে। জ্যোৎস্না প্লাবিত প্রচণ্ড নিস্তব্ধ অঞ্চল। রহস্যময় রাত্রি প্রগাঢ় হতে থাকে।

চন্দ্রলেখা বলে, আস্থার ব্যাপারে কেন আপনার এই ধারণা হলো ?

আয়ুবুড়ো এমন ভঙ্গিতে হাসে, তার হাসির মধ্যে এমন গমগমে বিচ্ছুরণ, যেন কেউ শিঙার মধ্যে ফুঁ দিচ্ছে। তার হাসি বিস্তৃত শূন্য মাঠে, সবুজ ঘাসে, ধুলোয়, বৃক্ষের পল্লবিত শাখায় দোল খায়। চন্দ্রলেখা যখন অসম্ভব বিরক্ত, তখন সেই নিস্তব্ধ রাতে ঠাস করে আয়ুবুড়োর হাতের তালু থেকে আগুন জ্বলে ওঠে। বুড়ো হাত মেলে রাখে, এই আগুন আমি জ্যোৎস্নার সাথে ঘর্ষণ করে জ্বালিয়েছি। এরপর সে খোলা জ্যোৎস্নার দিকে সেই হাত বাড়িয়ে দেয়। তালুর আগুন নীল শিখার মতো ধোঁয়ার বিস্তার ঘটাতে থাকলে চন্দ্রলেখা স্তম্ভিত হয়ে যায়।

এই তো দেখা যাচ্ছে রানীর আয়ু, আয়ুবুড়ো বলে, চাঁদ ঠিক মধ্য-আকাশে এসেছে। এখন এই শিখার সাথে চাঁদের সম্মিলন হবে।

চন্দ্রলেখা নিঃশব্দ ইশারায় দেহরক্ষীকে পেছনে সরতে বলে। ছায়ারক্ষীদের দেহ টানটান হয়ে ওঠে। আয়ুবুড়ো বলে, পুরনো বটবৃক্ষ কেটে ফেলতে হবে।

সে কী ? চন্দ্রলেখা বিস্মিত, এ-তো এ-অঞ্চলের ঐতিহ্য। একশো বিশ বছর বয়সের বৃদ্ধের সাক্ষী।

আয়ুবুড়ো গমগমে গলায় বলে, এই বটগাছ আপনার শনি। গ্রামে এখন নতুন বটগাছ হয়েছে, তার পল্লবিত শাখা চারপাশ সজীব করে তুলছে। এখন আর ওই সব অকল্যাণকর সাক্ষী রাখার কোনো প্রয়োজন নেই, এইতো দিব্য চোখে দেখা যাচ্ছে রানীর আয়ু, এই জাতীয় আরো কিছু কণ্টক সরিয়ে রানী হবেন অনন্ত আয়ুপ্রাপ্ত।

পরবর্তী বছর সে অঞ্চলে অসম্ভব ভালো ফসল হলো। মুহূর্তে পুরো এলাকার চেহারাই যেতে থাকল পাল্টে। ঘরে ঘরে উৎসব।

এসবই পুণ্যবতী চন্দ্রলেখার কৃপা, প্রাসাদের সামনে সার সার মানুষ ভক্তিভরে মাটিতে মস্তক ঠেকায়। সারারাত চলে নাচ আর গান। ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসেছে চিরকাল ঘরের অন্ধকারে বসবাস করা নারীরাও।

এইরকম উৎসবের মাঝখানে একদিন গ্রামে প্রবেশ করে নতুন আগন্তুক, অদ্ভুত তার পোশাক, মাথায় বিচিত্র টুপি, হাতে বাঁশি। অচেনা মানুষ হিসেবে প্রথমে তাকে কেউ আমল দেয় না। কিন্তু ক্রমেই তার আজব ক্ষমতা হর্ষোৎফুল্ল মানুষগুলোকে স্তব্ধ করে দেয়।

তার বাঁশিতে আছে সাতটি সুর।

সাতটি সুরের মধ্যে লুটিয়ে আছে সাতটি রঙ, সাত রকম ক্ষমতা। বিস্তৃত ধানী জমির সামনে দাঁড়িয়ে সে তার প্রথম সুরের ক্ষমতা দেখানো মাত্র সমস্ত মানুষ হতবিহ্বল হয়ে পড়ে।

সে চোখ বন্ধ করে বাঁশি বাজিয়ে যাচ্ছে। মুহূর্তে চতুর্পাশ ভয়ানক সবুজ রঙে ডুবে যায়। এত বেশি সবুজ, ক্ষেতের হলুদ ধানকণাগুলো মুহূর্তে অদৃশ্য। সমস্ত মাঠে খাঁ-খাঁ করছে শস্যহীন সবুজ গাছগুলো।

বাঁশির শব্দ থামাও, সবাই সমস্বরে চিৎকার করে ওঠে। বাঁশিঅলার হাত থেকে কম্পিত বাঁশি খসে পড়ে।

অকল্যাণ এসেছে, শয়তান এসেছে— এরকম উচ্চারণের পর জনতা যখন বেদম প্রহারে তাকে ভূপাতিত করছে, তখন চন্দ্রলেখা বার্তা পাঠায়, সে বাঁশিঅলার দর্শন প্রার্থী, অবিলম্বে তাকে প্রাসাদে পাঠানো হোক।

অত্যাচারী রাজার সামনে ফলমূল নিয়ে দেখা করে তার এক আত্মীয়। ফলের ঝুড়ি পরীক্ষা করে সেপাইরা তার কাছে দিয়ে গেলে দাঁত দিয়ে আপেল দু'ফাঁক করে রাজা দেখে, তার মধ্যে একটা চিঠি, আপনি যেভাবে বলেছিলেন, সেভাবেই এগুচ্ছি। বিজ্ঞ সভাসদদের একজন হিসেবে আমি রানীর অসম্ভব নিকটে চলে এসেছি।

জয় বাবা, জয় পীর, রাজার অট্টহাসি শুনে সেপাইরা ফিসফিস করে, লোকটা পাগল হয়ে গেছে।

চন্দ্রলেখা জাদুকরকে প্রশ্ন করে, অঞ্চলের একপ্রান্তের হলুদ শস্য কোথায় গিয়েছিল?

জাদুকর বলে, মুহূর্তে তা জমা হয়েছিল পাহাড়ের গভীর কোটরে।

এ জাদু তুমি কোথায় শিখেছ?

সেটা বলে দিলে জাদু তার কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে।

তুমি কে? তোমার আবাসই-বা কোথায়?

সেটাও বলার নিষেধ আছে।

আমি যদি এই মুহূর্তে তোমাকে গুপ্তচর হিসেবে বন্দি করি?

সেই ক্ষমতা আপনার আছে, বাঁশিঅলা বলে, আপনার সম্মোহন ক্ষমতা সম্পর্কে আমি জানি। আমি এও জানি আপনি আপনার কারণেই আমার কোনো ক্ষতি করবেন না।

কী সেই কারণ?

আমার জাদু, যা আপনাকে আকৃষ্ট করেছে। অত্যাচারী রাজার পতনের পর এ অঞ্চলের জনগণ সচেতন হয়ে উঠেছে। তারা যে নেশায় আগে ডুবে থাকত আপনি সেই ব্যবসা এ অঞ্চলে নিষিদ্ধ করেছেন জনতার কাছে নিজেকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য। এরপর অনুভব করছেন ক্ষমতায় টিকে থাকতে হলে জনতাকে ঘোরাক্রান্ত করে রাখার বিকল্প কিছু নেই, বাঁশিঅলা বলে, এই বাঁশির সপ্তম সুরে আছে সেই হলুদ রঙের বিচ্ছুরণ, যা সাতদিন বাজালে জনতা এত বেশি নেশায় অভ্যস্ত হয়ে উঠবে যে, এই জীবনে তারা কোনো ধরনের নেশা গ্রহণ ছাড়া বাঁচবে না।

চন্দ্রলেখা বলে, তোমার বুদ্ধি এবং ক্ষমতার তারিফ করছি। কিন্তু আমার বিজ্ঞ পারিষদবৃন্দ যদি এতে আকৃষ্ট হয়, তবে রাজ্য কে চালাবে?

তাদেরকে ওই সাতদিন কপাট লাগিয়ে ঘরে বসে থাকতে বলবেন। অথবা তাদের জন্য তৈরি করবেন এমন প্রাসাদ, যেখানে সাতদিন বাইরের আলো প্রবেশ করবে না। এরপর গোপনে পৃথিবীর সেরা লাভজনক ব্যবসার মালিক হতে পারবেন আপনি নিজেই, মানুষের যখন নেশা হয়ে উঠবে অপরিহার্য, তখন আপনি প্রকাশ্যেও যদি তা সরবরাহ করেন তারা আপনাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গ্রহণ করবে। যেহেতু তাদেরকে আপনি নেশায় অভ্যস্ত করছেন না, সেহেতু আপনার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগও উঠবে না।

চন্দ্রলেখা ঘামতে থাকে, তার পোড়াস্থান অকস্মাৎ টনক দিয়ে জ্বলে ওঠে। আধ শুকনো মাটি ফুঁড়ে প্রাসাদে প্রবেশ করে অজানা বাতাস। তার টুকটুকে গাল, কুচন্দন টিপ বিকেলের আবছায়ায় জ্বলজ্বল করতে থাকে।

ফিসফিস করে সে বলে, এসব জাদু আমি শিখব।

আমি নিশ্চিত ছিলাম, আপনি আগ্রহী হবেন, বাঁশিঅলা বলে, আমি আপনাকে শেখাব, তবে একটি শর্তে।

কী সেই শর্ত?

মানুষের মধ্যে মুহূর্তে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সম্মোহনী জাদু আপনি আমাকে

শেখাবেন। তাহলে আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাদুকর হিসেবে বিবেচিত হবো। এই একটি অসম্পূর্ণতার জন্য আমি পৃথিবী ঘুরে এই রাজ্যে এসেছি।

চন্দ্রলেখার রক্তিম ওষ্ঠ স্ফুরিত হয়, আমি রাজি।

এলাকার বিস্তৃত প্রান্তরের বাতাসের গন্ধও কেমন মরচে পড়া, আসমানে বৃদ্ধি পেয়েছে বাদুড়ের ওড়াউড়ি। খেজুর গাছ রেখে রানীর প্রিয় বাদুড় এখানে ওখানে ডানা মেলছে প্রকাশ্যে। প্রান্তরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এক লোক উদোম হয়ে উর্ধ্বদিকে লুঙ্গি ওড়াতে থাকলে একজন পথচারী প্রশ্ন করে, এসব কী হচ্ছে?

লোকটি বলে, চন্দ্রলেখার রাজ্যে আমরা যা ইচ্ছা তাই করার স্বাধীনতা পেয়েছি।

কিন্তু প্রত্যেক স্বাধীনতার একটা সীমা থাকা দরকার।

স্বাধীনতার কোনো সীমা থাকে না, লোকটি হাসে, বেশি বেড়েছ তো দেব পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে, কিচ্ছু বিচার হবে না। দেখছ না, অদৃশ্য জিন কেমন জোয়ান মানুষকে জলে ডুবিয়ে মারছে!

আর ঘুমের মধ্যে কেঁদে ওঠে চন্দ্রলেখা।

কারা আসছে? চতুর্দিকে ঘোড়ার খুরের শব্দ! তার দেহ ঘোড়াদের রতিপুলকের তলায় কেমন পিষ্ট হতে থাকে। একটি ঘোড়া, দু'টি ঘোড়া, অনেক ঘোড়া— আহ্!

নিজেকে সুস্থির করে চন্দ্রলেখা তার স্বপ্নের উৎস নিয়ে ভাবিত হয়। এই ভাবনা থেকে বেরিয়ে সে দাসীকে জানায়, অঞ্চলের সবচাইতে সুঠাম যুবকটিকে আজ রাতে তার চাই।

দাসী বলে, এলাকার সবচাইতে সুঠাম যুবক এখন রানীর নতুন দেহরক্ষী। এর চেয়ে সুন্দর যুবক এই অঞ্চলে নেই।

চন্দ্রলেখা বলে, তবে অন্য অঞ্চলে খোঁজ করা হোক।

দাসী বলে, এ কি খুঁজে আনার জিনিস? প্রকাশ্যে খোঁজ করবে কোন্ সে নির্লজ্জ? রানী ক্ষমা করবেন, কী কারণে বিভ্রান্ত বোধ করছেন? অত্যাচারী রাজার এইসব আচরণের কারণে তার পতন ত্বরান্বিত হয়েছিল। আপনাকে তো যথেষ্ট দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বলেই জানি।

চন্দ্রলেখা ক্রুদ্ধ হয়, সে দাসীকে জানায়, এরপর স্পর্ধার সীমা লঙ্ঘন করলে সে তাকে একচুল ক্ষমা করবে না।

পাহাড়ি অঞ্চলে অত্যাচারী রাজার প্রমোদ প্রাসাদ ভেঙে তৈরি হচ্ছে কাঠের রাজ দালান। অঞ্চলের প্রচুর দরিদ্রলোক সেই কাজে অংশ নিয়েছে। এবছর অঞ্চলে ফসল ভালো হয়েছে। মানুষের চিত্তের মধ্যে প্রবেশ করছিল তাই অলস চর্বি। এরকম অবস্থায় যখন শ্রমিক পাওয়া দুরূহ হয়ে পড়ছিল, তখন চন্দ্রলেখার মনের মধ্যে ঢেউ তোলে অন্য স্রোত— জাদুকরের বাঁশি বিস্তৃত ধানী জমির দিকে তাক করে ফুঁ দিলে সব ধান অন্তর্হিত হয়ে যায়, এবং যে

স্থানের কথা চিন্তা করে বাঁশিতে ফুঁ দেয়া হয়, সে ধান সেই স্থানেই মজুদ হয়। বাঁশিতে এমন সুর থাকলে হতো না, আমি ঠিক যতগুলো ধান চাইব ততগুলোই অন্তর্হিত হবে, বাকিগুলো জমা থাকবে গাছে ? ধান না থাকলে চাষীর চোখের সামনে কোনো স্বপ্নই যে থাকবে না।

জাদুকরকে সে এই প্রশ্নই করে। জাদুকর বলে, এসব জাদুতে মাঝামাঝি কিছু থাকে না। কিন্তু একটা সুবিধা আছে, বাঁশির সুরের শক্তি বড় জোর অঞ্চলের অর্ধেক সীমানা পর্যন্ত কার্যকর হবে।

চন্দ্রলেখা বলে, এই জাদু তো ততক্ষণই কার্যকর থাকে, যতক্ষণ সুর থাকে বাঁশিতে। বাঁশি থামলে তো পুনরায় চলে আসছে যথাস্থানে, এ তো তবে নিছক খেলা হয়ে গেল।

জাদুকর বলে, জাদু মানে তো একটা নিছক খেলাই। কিন্তু এই জাদু খেলার বাইরে আরো গভীর কিছু। যদি ধান মজুদ হওয়ার পর পাহাড়ের কোটরের মুখ বড় পাথরখণ্ড দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়, তবে বাঁশি থামালেও অর্ধেক অঞ্চল শস্যহীনই থাকবে।

চন্দ্রলেখা ভাবে, হায়! কোনো জাদুরই নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে চালিত করার মতো পরিমাপক যন্ত্র নেই।

এরপর সে নিরন্তর ডুবে যায় জাদু শিক্ষার অদ্ভুত খেলার মধ্যে।

ইদ্রিসের মা যখন ভোরের ঘুমে অচেতন, তখন তাদের ভাঙা বাড়ির কোটরে এসে বসেছে হাজারো জালালি কবুতর। যার যার এলাকার উন্নয়নের দাবিতে গতরাতে আসমানে উড়েছে চূড়ান্ত বিদ্রোহের ঝাণ্ডা। বেড়ার ফাঁক দিয়ে এইসব দেখতে দেখতে উধাও হয়ে যাওয়া ইদ্রিসের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে মাটিতে এলিয়ে পড়েছিল মহিলা। এর মধ্যে অভাগা ঘুম যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছিল!

ঘুম ভেঙে যায় কবুতরের পাখার শব্দে— ছেলেমেয়েরা হট্টগোল করছে। সশব্দে ঘরে প্রবেশ করে পিঁপড়ের পালগুলো কী নিয়ে যে হুজ্জোতে মেতেছে! ইদ্রিসের মা ঘুম থেকে সজোরে নিজেকে টেনে ওঠায়।

ছেলেমেয়েরা চিৎকার করছে, মা মা দেখ। বিস্মিত চোখে বেড়ার ফাঁকে চোখ রেখে মর্মঘাতী আর্তনাদ করে ওঠে মহিলা, হায় হায়! এইডা কী সর্বনাশ হইল গো!

সবাই দেখে, অঞ্চলের অর্ধেক ধান উধাও, সেখানে অক্ষত পড়ে আছে সতেজ গাছগুলি।

এমন সময় ফোন বেজে ওঠে মিস্টার এম. আলীর ঘরে। এত রাতে ফোন! বিস্মিত হয়ে ফোন ধরতেই ওপাশে ফরিদ কবিরের কণ্ঠ, শিল্পী সুলতান মারা গেছে শুনেছেন ?

তাই নাকি ? এম. আলী আঁতকে ওঠেন। আহা! অনেক বড় মাপের শিল্পী ছিলেন।

এরপর নানা কথা, এম. আলীর মাথায় পোকা, রিপোর্ট তৈরি করতে হবে। দেশ এখন গরম। খালেদা-হাসিনার মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে কেন্দ্র করে মরণ ঠাণ্ডা লড়াই চলছে।

গত বছর এমনি সময় পরিস্থিতি ছিল অন্যরকম। প্রেসক্লাবের হামলার ঘটনা গত এক বছরে মানুষ ভুলে গেছে। আরো অনেক বড় বড় ঘটনা মানুষ ভুলে গেছে। যেদিন ঘটে, তারপর দু'চারদিন উত্তপ্ততা। পাঁচ-ছ'দিনের মাথায় ঘাসে ঢেকে যায় সব। এখন রাজধানীতে দুর্দান্তভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে হত্যাকাণ্ড। আইনশাসনের অবস্থা এত বেশি ভঙ্গুর স্থানে পৌছে গেছে যে, বাদামের খোসা নিয়ে তর্ক বাধলেও হত্যা, যার অধিকাংশেরই কোনো সুরাহা হচ্ছে না।

এম. আলী বলেন, আমাকে আবার দু'একদিনের মধ্যেই ছুটতে হবে খরাপীড়িত অঞ্চলের দিকে। জানেন, মাথাটা প্রায়ই ধরা থাকে।

ডাক্তার দেখান।

এই আলুঝালু মাথা ডাক্তারকে দেখিয়েই-বা কী লাভ। আপনি কম লিখছেন, ব্যাপার কী?

কবিতা কেউ পড়ে না, এজন্যই ছাপতে দিচ্ছি না, যা কেউ পড়ে না, তা ছেপে লাভ কী? (এরপর হাসি) আসলে নানা কাজে ব্যস্ত আছি। আপনি তো ভাই ক্রিয়েটিভ সাংবাদিক। আপনার চিন্তা কী।

ক্রিয়েটিভ না, আলু সাংবাদিক। চাইলেই কি সব রিপোর্ট করা যায়?

এরপর অবিরত হাসি।

পুনরায় ফরিদ কবিরের বিষণ্ন কণ্ঠ, সুলতানকে ঠিক মতো বোঝার আগেই চলে গেলেন। ফোন রেখে এম. আলী ঘামতে থাকেন। প্রায়ই রাতে শরীর খারাপ করে। হাজারো কাজ, টেনশনের মধ্যে চ্যানেল ঘোরাতেই অদ্ভুত এক রাজ্যের ছবি তাঁর সামনে উদ্ভাসিত হয়। গত দেড়-দুই বছর যাবৎ এই ঘটনা ঘটছে। এটা কোনো সিরিজ? সবাই কি তাদের টিভি-তে এই সিরিজটি দেখে? কাউকে জিজ্ঞেস করা হয় নি।

খোঁপায় সাপ পোষে, ওরকম দুর্দান্ত কোনো মহিলা হতে পারে? চন্দ্রলেখা কী আদৌ কোনো মহিলা? একজন মহিলা শাসক এত অত্যাচারী হতে পারে?

শাসকের আবার মহিলা পুরুষ! এম. আলী এরকম ভাবতে ভাবতে ড্রয়ার খোলেন।

সেদিন তার তরুণ বন্ধু আশরাফুল নওশাদ নারীদের সম্পর্কে অদ্ভুত এক গল্প বলেছে। গল্পটি নাকি শ্রদ্ধেয় লেখক আহমদ ছফা কোনো এক আড্ডায় বলেছেন। পঞ্চপাণ্ডব যখন বনবাসে, তখন প্রচণ্ড ক্ষুধায় অস্থির হয়ে তারা গাছে ঝুলতে থাকা একটি টসটসে আপেল ছিঁড়ে ফেলে। সেই বনের বৃদ্ধ এটা দেখে চেঁচিয়ে উঠে বলে, সর্বনাশ করেছেন! এই আপেলটিকে এখানকার ঋষি দীর্ঘদিন তপস্যা করে মুকুল থেকে আপেলটি পরিণত করেছেন। এখন উনি এটা খাবেন বলে গাছে রেখে স্নানে গেছেন। সেই আপেল আপনারা ছিঁড়েছেন? সর্বনাশ করেছেন। তার অভিশাপে আপনারা ধ্বংস হয়ে যাবেন।

ভয়ে শুকিয়ে আসে পঞ্চপাণ্ডবের মুখ।

তারা বৃদ্ধকে বলে, হায়! এখন আমাদের কী হবে? ক্ষুধার্ত অবস্থায় আমরা না জেনে ছিঁড়ে ফেলেছি। আপনি মুক্তির পথ বলুন।

অনেব ভেবে বৃদ্ধ বলে, একটা পথ আছে।

কী সেই পথ? বলুন! বলুন!

আপনারা পাঁচ ভাই এবং আপনাদের স্ত্রী দ্রৌপদী, যদি এই ছয়জন ছয়টি সত্যি কথা বলেন, তবে এই আপেলটি আবার গাছের ডালে গিয়ে জোড়া লেগে যাবে।

এই কথা ? পঞ্চপাণ্ডব উল্লসিত হয়।

এরপর একজন একজন করে পাঁচটি সত্যি বলতে শুরু করলে মাটি থেকে আপেলটি ওপর দিকে উঠতে থাকে।

এক সময় সেটি গাছের ডালে গিয়ে যখন লাগবে লাগবে অবস্থা তখন দ্রৌপদীর পালা আসে। দ্রৌপদী বিষণ্ন কণ্ঠে বলে, এই বনবাসের পালা যদি শেষ হতো তবে বাড়ি গিয়ে শাশুড়ির সেবা করতাম।

অমনি আপেলটি বৃন্তচ্যুত হয়ে নিচের দিকে ধাবিত হতে থাকে।

সবাই হায় হায় করে ওঠে, দ্রৌপদী সত্যি বলো, সর্বনাশ হয়ে যাবে।

দ্রৌপদীর মুখ রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে। সে কাঁপতে কাঁপতে হতচকিত অবস্থায় বলে, আহা! কর্ণের মতো যোদ্ধা বীর যদি আমার ষষ্ঠ স্বামী হতো!

সঙ্গে সঙ্গে গাছে আপেল লেগে যায়।

এম. আলী হা-হা হাসতে থাকেন। আহমদ ছফার এই আড্ডার গল্প যদি নারীবাদীরা শোনে ? নিশ্চয়ই এর মধ্য থেকে সিরিয়াস কিছু বের করে ফেলবে। সিগ্রেট ধরিয়ে এম. আলী পেপার মেলে ধরেন, তত্ত্বাধায়ক সরকারের প্রশ্নে দু'দলের মধ্যে সমাধানের চেষ্টা করতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন বিদেশ থেকে আগত কমনওয়েলথ মহাসচিবের প্রতিনিধি নিনিয়ান। কোনো দলই স্ব-স্ব অবস্থান থেকে নড়ছে না।

মিস্টার এম. আলী মাথা চেপে সোফায় গিয়ে বসেন। এক সময় তার পৃথিবীতে রাত্রি বাড়তে থাকে।

লক্ষ লক্ষ মানুষে গিজগিজ করছে পুরো অঞ্চল। বুক চাপড়ে চিৎকার করছে কৃষকেরা। রাজার সেপাইরা এরকম পরিস্থিতির ওপর দপ করে ফেলে দেয় একটি লাশ।

মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে ওঠে সবগুলো মুখ।

উন্মুখ হয়ে সবাই দেখে, জাদুকরের নিস্পন্দ দেহে রক্ত জমাট বেঁধে আছে।

সেপাই বলে, রানী একে কারাগারে বন্দি করেছিলেন। কারাগারের শৌচাগারের ফাঁক দিয়ে সে বাঁশির মুখ বের করে এই কাণ্ড করেছে।

কেন রানী প্রথমেই তাকে রাজ্য থেকে বিদায় করলেন না ? জনতা চিৎকার করে ওঠে। সেপাই বলে, এর ব্যাখ্যা রানী দিতে বাধ্য নন। এ কোনো গুপ্তচর কি-না তাই পরীক্ষা করা রানীর উদ্দেশ্য ছিল। যে অন্যায় সে করেছে এর শাস্তি তাকে কীভাবে দেয়া হয়েছে, তা তো দেখেছেন আর কী চান আপনারা ?

হায়! হায়! আমরা এখন খাব কী ?

সেই চিন্তা রানীর, আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন।

কাঠের প্রাসাদের ওপর দাঁড়িয়ে চন্দ্রলেখা সন্ধ্যাতারা দেখে।

গতরাতে সে আয়ুবুড়োর প্রাসাদে গিয়েছিল তার আয়ুর ওপর কোনো নতুন বিপদ সঙ্কেত দেখা দিচ্ছে কি না, তাই জানতে। চন্দ্রলেখার কৃপায় নতুন সেই বটগাছের কাছে তার বিশাল বাড়ি হয়েছে। চারপাশে খোলামেলা প্রাঙ্গণ। অসংখ্য ভক্ত সেখানে রাত্রিযাপন করতে পারে। প্রাচীন বটগাছ কেটে সেখানে তৈরি হয়েছে মাঠ। আয়ুবুড়ো চোখ বুজে বলে, ধান সংক্রান্ত কাজটি চন্দ্রলেখার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থেকে উত্থিত হয় নি। চন্দ্রলেখার বড় শত্রু তার আকস্মিক আবেগ এবং হঠকারী সিদ্ধান্ত। এখন পরিস্থিতি বুঝে সামনে এগোলে আয়ুর আর কোনো শত্রু নেই।

এরপর চন্দ্রলেখার চোখ জলের ওপার ছাপিয়ে পাহাড়ের দিকে নিবদ্ধ হয়। প্রকৃতি ছিঁড়েখুঁড়ে উর্ধ্বমুখী মাথা তুলছে কাঠের প্রাসাদ। কী উদ্দেশ্যে তৈরি হচ্ছে তা, কৌতূহলী জনতা ঘর্মাক্ত শ্রমিকদের প্রশ্ন করে।

বজরায় করে দিনে এসে রানী এখানে রাজকার্য সারবেন। মাঝেমধ্যে হাওয়া পরিবর্তন করতে রাত্তিরেও ঘুমুবেন।

রানীর উন্মুখ চোখ বাদুড়ের পথ চেয়ে থাকে। জাদুকরের কাছ থেকে যদি এমন কোনো জাদু শেখা যেত, যাতে কে কোথায় আছে দর্পণে ভেসে উঠত? বাদুড় কী ইদ্রিসের সন্ধান পায় নি? কোথায় পালিয়েছে সে? চন্দ্রলেখা কী নিজেকে নিশ্চিত ভাবতে পারে?

অঞ্চলের শস্যহীন কৃষকদের কেউ কেউ কাঠের প্রাসাদ নির্মাণের কাজে নেমেছে। কেউ করছে সুঁচকর্ম, কেউ বুনছে জাল। কেউ অজানা রাজ্যের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাচ্ছে।

চন্দ্রলেখা তাদের এই সঙ্কটের মুহূর্তে ঘোষণা করেছে, ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের মানুষদের এ বছরের পুরোটাই যেহেতু চলবে বাইরের সাহায্যে, যেহেতু তারা অভ্যস্ত হোক চব্বিশ ঘণ্টায় এক বেলা খাওয়ায়। এইরকম সঙ্কটময় মুহূর্তে নিজেকে সতেজ রাখার জন্যই ইসলাম ধর্মে বছরের একমাস সারাদিন উপবাস করার নিয়ম প্রবর্তিত আছে। এরপর চন্দ্রলেখা ভক্তিভরে ইসলামের গুণকীর্তন করে।

এসব সত্ত্বেও অঞ্চলে লেগে যাওয়া ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ সে ঠেকাতে পারে না। অর্ধেক অঞ্চলের ফসলও পুরো অঞ্চলের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে না। একশ্রেণীর ব্যবসায়ী পুরো পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে। তারা ধান কিনে মজুদ করে এক সময় চড়া দামে তা পুরো অঞ্চলে বিক্রি করতে থাকে। চাষী, শ্রমিক, মজুর, চাকরিজীবী সারাদিন খেটে যা উপার্জন করে, তা দিয়ে সেই ধান কিনে এক বেলা ভাত খায়, কেউ খায় ভাতের ফেনা, কেউ উপোস করে, কেউ-বা গলায় দড়ি দেয়।

রাত বাড়তে থাকলে দরজা বন্ধ করে পোষা সাপটির মুখে দুধের বাটি তুলে দিয়ে চন্দ্রলেখা ভাবে, এই অবস্থায় জনগণ যদি প্রতিবাদী হয়ে ওঠে? সপ্তম বাঁশির কার্যক্ষমতা অনুসারে যদি সমস্ত মানুষকে নেশায় বুঁদ করে রাখা যেত? কিন্তু তখন রাজ্যের কাজ করবে কে?

কেন যে এইসব জাদুর ক্ষমতা এমন একমুখী থাকে? পাহাড়ে সঞ্চিত ধানের কিছু অংশ রিলিফ হিসেবে ছাড়লে কেমন হয়! নাহ্ বিজ্ঞ পারিষদদের সাথে পরামর্শ করে অন্য পন্থা বের করতে হবে।

চন্দ্রলেখার এমন ভাবনার পরই পাহাড়ের মাঝবরাবর কাঠের প্রাসাদের নির্মাণ কাজ শেষ হয়ে যায়।

বাতাসে যে ন্যূনতম সবুজ আছে তার মধ্যে এক সময় জং ধরতে থাকে। পুরো এলাকা থেকে গাঁজার বিস্তার কিছুটা সীমিত হলেও চন্দ্রলেখার শরীরে যে গন্ধ, যার মধ্যে না আতর, না ধূপ, না ঘাম, না সুগন্ধি— যে গন্ধের কোনো নাম নেই, সেই অজানা গন্ধ জং-ধরা বাতাসে ভর করে চলে যায় মনুষ্য এলাকায়। মানুষের মস্তিষ্কে সেই বায়বীয় বাতাস এমনই প্রভাব বিস্তার করে তারা আচমকা কিছু ভেবে ওঠার অবকাশ পায় না। এক সময় দুর্ভিক্ষ মহামারীর ঘা বাড়তে বাড়তে বাতাসের সবুজ গিলে ফেলতে থাকে। ইদ্রিসের হাঁড়ির বাষ্প বাতাসকে নোনা করে দিয়ে চন্দ্রলেখার নাকের ডগায় আছড়ে পড়ে, চন্দ্রলেখা আজ স্তনের ভাঁজে সাপটিকে লুকিয়ে রেখে দাসীর সামনে চুল মেলে দিয়েছে, হঠাৎ সেই গন্ধ তার চোখে তির্যক ঝাঁঝ এনে দেয়।

সে বিচলিত হয়ে দাসীকে প্রশ্ন করে, বাতাস থেকে সব সবুজ উঠে যাচ্ছে কেন? আর তা কেনই-বা এত নোনতা?

দাসীর গলায় চিরদিনের রঙ্গ, এসবই ইদ্রিসের যন্ত্রণা এবং ক্রোধের উষ্ণ ভাপ, চন্দ্রলেখা চাইলেই যার উৎসমুখ বন্ধ করে দিতে পারে।

চন্দ্রলেখা প্রশ্ন করে, তা কীভাবে সম্ভব?

দাসী হাসিতে ভেঙে পড়ে, রানীকে তা-ও বলে দিতে হয়? এই দুর্ভিক্ষকে পুঁজি করে ইদ্রিসের রাজনীতি চাঙ্গা হয়ে উঠছে। এরপরও রানী তার ব্যাপারে নীরব থাকবেন?

চন্দ্রলেখা পুনর্বার ইদ্রিসের কথা ভাবতে বসলে দ্বিতীয় দেহরক্ষী আসে। দাসীর অপসৃয়মানতার দিকে তাকিয়ে সে বাতাসের মতো ইদ্রিসকে উড়িয়ে দেয়, ইদ্রিস ছিল তারই পেছনের বিদ্রোহীদের একজন, এখন সে-ই যেহেতু রানীর নখের ডগায়, ইদ্রিসের মতো বিদ্রোহীদের বিষ-নিঃশ্বাস বাতাস থেকে অন্তর্হিত হয়ে তাতে যাতে সবুজ যুক্ত হয়, চন্দ্রলেখার জন্য সে ব্যবস্থা দেহরক্ষী করবে। ইদ্রিস লুকিয়েছে, এই অবস্থায় কিছু সময়ের প্রয়োজন মাত্র।

তুমি জানো, আমার সমস্ত অস্তিত্ব তোমার ওপর নির্ভর করে?

এ তো আমার দায়িত্ব।

আমি অনুভূতির কথা বলছি।

চন্দ্রলেখার সৌন্দর্যের পাকে আমার নিজের জীবনও মৃত্যুর মতো আটকে পড়েছে।

তুমি কি করতে পার আমার জন্য?

আমার নিজের নিঃশ্বাস রানীর হাতে সমর্পণ করে তার আয়ুকে প্রলম্বিত করতে।

এরপর দু'জন ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনাবদ্ধ হলে যখন চতুর্পাশে বিচ্ছুরিত ঘ্রাণ, তখন চন্দ্রলেখার স্মৃতির মধ্যে আবারও পুরনো দেহরক্ষীর স্পর্শের অভিনবত্ব ক্রিয়া করতে করতে তার গণ্ডদেশ নোনা জলে ভিজিয়ে দেয়। দ্বিতীয় দেহরক্ষী অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করে, এ কী চন্দ্র, জল?

আহ্ দেখছো না বাতাস কেমন নোনতা... বলতে বলতে চন্দ্রলেখা গভীর গাড্ডায় পতিত হতে থাকলে বন্দিশালা থেকে রাজা আর্তনাদ করে ওঠে, সৃষ্টিকর্তা এই অনাচারের বিচার করবে। আমাকে বন্দি করে দুর্বিষহতার মধ্যে রাখার শাস্তি অবশ্যই ভোগ করবে নতুন রানী।

চন্দ্রলেখা একসময় ছাদের ওপর দাঁড়ায়। সবুজ বাতাস টেনে নিঃশ্বাস গ্রহণ করার অভিপ্রায়ে নাসিকা উন্মোচন করে। তখুনি নদী এবং কাঠের দালানের সন্ধিস্থলে যে ফাঁক তার মধ্যে হঠাৎ সে পুরনো দেহরক্ষীর দুটো চোখকে সটান চেয়ে থাকতে দেখে।

এ দৃশ্যে কাতর হয়ে হাঁসফাঁস করে সিঁড়িতে পা রাখতেই দূর পাহাড়ের বাদুড় উড়তে উড়তে আসে, ত্রস্ততা কাটিয়ে সারা গ্রামে চন্দ্রলেখার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলে সে দেখে, কারো মস্তক উদ্ধত নয়, মানুষ এবং প্রকৃতির মাথা তার দিকে নুয়ে এসেছে... চন্দ্রলেখার গর্বিত ঠোঁট কেঁপে ওঠে—

বাদুড়ী তো রবাড়ি কই
রাতেরবেলা খাস কি ?
দিনেরবেলা ঘুমাস কি ?
কোনো খবর এনেছিস কি ?

বাদুড়ের হতাশ চক্ষু দেখার পর চন্দ্রলেখা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, এই অকর্মণ্য বাদুড় প্রতিদিন একরকম চোখ নিয়ে ফিরে আসছে। এর চোখে কি ছানি পড়েছে ? এ কি অতিরিক্ত বৃদ্ধ? তখুনি বাতাসে পুঁজের গন্ধ। মুহূর্তে চন্দ্রলেখার চোখ রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে। সৈন্যদেরকে বলে, এই আমার শেষ নির্দেশ। ছায়া ভেঙে হলেও, কবর খুঁড়ে হলেও ইদ্রিসকে চাই। এরপর সে সশব্দে কাঠের সিঁড়ি অতিক্রম করে।

এর ক'দিন পরই চন্দ্রলেখা রাতে নতুন প্রাসাদে থাকার পরিকল্পনা নেয়। প্রচুর সেপাই এবং দেহরক্ষীসহ ফলফুলে ভরপুর হয়ে সে প্রাসাদে উঠেই টের পায় বিদ্‌ঘুটে গন্ধ।

কিসের গন্ধ এটা ?

বিজ্ঞ পারিষদ হতচকিত হয় বলে, সংরক্ষণের অভাবে ধান পচে পাথরের ফাঁকফোকর দিয়ে গন্ধ বেরুচ্ছে।

সর্বনাশ! চন্দ্রলেখা আঁতকে ওঠে, সমাজের উচ্চশ্রেণীরা কী পরিমাণ ধান ক্রয় করেছিল ?

প্রচুর। তারাও সেসব সংরক্ষণ করে রেখেছে তারও দুর্যোগময় মুহূর্তের জন্য।

এখন আর কী করা যাবে ? চন্দ্রলেখা গভীর ভাবনায় নিমগ্ন হয়, এসব সস্তা দামে সাধারণের মধ্যে ছেড়ে দিন। বাকিগুলো ফেলে দিন নদীর জলে।

সভাসদ বলে, মানুষের হাতে শস্তায় কিনে খাওয়ার মতোও অর্থ যে নেই।

চন্দ্রলেখার ভুরু কুঞ্চিত হয়ে ওঠে, পুরো পরিকল্পনাটা বড় দূরদৃষ্টিহীন হয়ে গেছে। এখন যেভাবেই হোক এই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে হবে।

চন্দ্রলেখা যখন সব ঝেড়ে সহজ হতে চাইছে, তখন দ্বিতীয় দেহরক্ষী ঘরে এসে বলে, কাঠের দরজায় রঙিন ফিতে বাঁধা এই কাগজটা দেখলাম। এর ভেতর ক্ষতিকর কিছু থাকতে পারে ভেবে খুলে দেখি—

চন্দ্রলেখার
আয়ুশত্রু
তার
ঘাড়ের
কাছেই
নিঃশ্বাস
ফেলছে।

তীব্র ঘামে ভিজে ওঠে চন্দ্রলেখার সর্বাঙ্গ। ঘাড়ের কাছে নিশ্বাস ফেলছে? কে? কে? চন্দ্রলেখা ছটফটিয়ে চারপাশে তাকায়। আয়ুবুড়ো তবে তাকে কী বুঝে নিশ্চিন্ত করল? নিস্তব্ধ ঘরের চারদিকে সে তাকায়। নিঃশ্বাসের মতো স্রোত চতুর্পাশে ফোঁস-শব্দের এক অভিনব আবহ তৈরি করছে।

কোথায় শত্রু? চন্দ্রলেখা পাগলপ্রায় হয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ায়, আমার ঘাড়ের কাছে কে নিঃশ্বাস ফেলে? কে?

আয়ুবুড়ো নিস্তব্ধ রাতে তখন উপগত অজানা নারী দেহে, তুই মা হবি, নিশ্চিত হবি, আমার দরবারে এসে কেউ ফিরে যায় না। এ সন্তানের পিতা হবে তোর স্বামীই। কেন মিথ্যে কাঁদছিস তবে বল! শান্ত হ, মা, শান্ত হ।

দাসী নিজের কক্ষে শুয়ে অবাক হয়ে ভাবে, আয়ুবুড়ো আজকাল পীরের দায়িত্বও পালন করছে? সারা অঞ্চলে তার এত ভক্ত? তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করা যেত, আগামী জন্মে রানী হয়ে জন্মানোর জন্য এ জন্মে আমাকে কী কী পুণ্যের কাজ করতে হবে? সে সময় ক্রুদ্ধ সর্পিণীর মতো ফুঁসে ওঠে চন্দ্রলেখার নীলচক্ষু এবং তা প্রাণান্তকরভাবে বিদ্ধ করতে থাকে দ্বিতীয় দেহরক্ষীকে। সেই উদ্গীরিত ধোঁয়ার স্রোতে নতুন দেহরক্ষীর দেহ ছিটকে পড়তে থাকলে চন্দ্রলেখা এক ঝটকায় নিজেকে শান্ত করে, হায়! আমি কি তবে ভুল করেছিলাম? কেন জলে ভাসালাম প্রথম দেহরক্ষীকে? এসবের সাথে তবে তার কোনো সংযোগ ছিল না? সবকিছুর মূলে তবে এই শিক্ষিত বদমাশটা?

চন্দ্রলেখা কেঁপে ওঠে। তবে কি ও আদৌ বশীভূত হয় নি? এ কী করে হয়? না, চন্দ্রলেখা, আরো ধীর মাথায় তোমাকে সব বুঝতে হবে, নিজেকে শান্ত রাখ, স্থির রাখ এবং এগোও। চন্দ্রলেখার মুখ প্রদোষের মতো স্ফীত হয়ে ওঠে, সে দেহরক্ষীকে প্রশ্ন করে, এই চিঠির অর্থ তুমি অনুধাবন করতে পার?

দেহরক্ষী বলে, না রানী, এ বড় জটিল ইঙ্গিতময় চিঠি।

ইঙ্গিত কোথায় দেখলে? সবই স্পষ্ট।

রানীর রক্ষণাবেক্ষণ আমার দায়িত্ব, দেহরক্ষী বলে, আপনি শুধু বলুন এটা কোন্ তস্করের কাজ?

তাই তো খুঁজছি, বলতে বলতে চন্দ্রলেখা স্ফটিক আয়নার সামনে দাঁড়ায়, নিজেকে সুস্থির করে সে আত্মোপসনায় রত হয়।

শত্রুর সাথে মরণযুদ্ধে জয়ী মহারাজ যখন মহাসমারোহে অন্দরে ফিরে এলেন, আচমকা লক্ষ করলেন সমস্ত আঙিনা ফাঁকা, স্তব্ধ আঙিনার জল উদ্ভাসিত করত যে পদ্ম, তার কয়েকটি পাপড়ি ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। মহারাজার অন্তরাত্মার জল শুষে নেয় কেউ। তিনি সেই পাপড়ির চিহ্ন ধরে প্রাসাদের পেছনের কদম্ব তলায় আলুলায়িত রানীকে দেখতে পান।

বিস্মিত মহারাজার যখন শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা, তখন রানী কান্নায় ভেঙে পড়ে জানায়, জয় যখন অবশ্যম্ভাবী, শত্রুরা তাকে ধর্ষণ করে পেছন থেকে পালিয়ে গেছে। প্রিয়তমা স্ত্রীর এহেন উচ্চারণে মহারাজার চতুর্পাশে রাত্রির ছায়া নেমে আসে। বাগানের অপূর্ব সুরভি মুহূর্তে হয়ে ওঠে বিষাক্রান্ত। নদীর ঠাণ্ডা জলের যে বাতাসে রাজা বিহ্বল বোধ করতেন, তার তরঙ্গায়িত ফেনা মহারাজার রক্তের মধ্যে নুন ঢুকিয়ে দেয়।

এরপর নিথর রাত্রি। কঠিন অশ্রু সজোরে চেপে মহারাজা একখণ্ড হীরক তুলে দেন স্ত্রীর হাতে, এটা আমার মায়ের ছিল। বড় পয়মন্ত এই হীরকখণ্ডটি। এটা নিয়ে এই চতুর্সীমানা ছেড়ে পালাও, তোমার অপবিত্র চরণ কস্মিনকালেও আর আমার অন্দরে ফেলো না।

মুহূর্তে ফণা উত্তোলিত করে রানী, অপবিত্র চরণ ? যুদ্ধ শুধু তোমাদের ? জয় তোমাদের ? তোমাদের সমস্ত গৌরবের নিমিত্তে আমাকে শিকার হতে হয়েছে। অথচ আমিও এই সমস্ত সাফল্যের অধিকারী হতে পারতাম।

ছায়ারাতের মদিরতা ফুঁড়ে সলতের মতো জ্বলে ওঠেন মহারাজাও, নিজেকে রক্ষা করতে পারলে না ? চারপাশের উঁচু পাঁচিল ডিঙিয়ে কী করে প্রবেশ করে তস্কর ? কী করে তোমার সতীত্বে সে কলঙ্কচিহ্ন এঁকে যায় ?

রানীর রুদ্ধ গলা জমাট বাষ্পের মতো ফুঁসতে থাকে, আমার সতীত্বে কোনো কলঙ্ক চিহ্ন নেই। আমি এখনো সতী। তারা যা কর্ষণ করে গেছে, সে কিছু মাংসের স্তূপ। সেখানে আমার মন কোথায় ছিল ? আমি কোথায় ছিলাম ?

সে তোমারই দেহ, মহারাজ দৃঢ় কণ্ঠে উচ্চারণ করেন। তোমার মনের অতলান্তে শিথিলতা না থাকলে তারা কী করে উঁচু পাঁচিল টপকায় ?

বৃক্ষের পাতার কম্পনের শব্দে পুরো রাত্রি আর্তিময় হয়ে ওঠে। আসমানের চাঁদ-তারাকে সাপের মতো গিলতে থাকে মেঘ।

রানী ঘোরগ্রস্ত মানুষের মতো বলতে থাকে, ওরা এসেছিল ছদ্মবেশে। আমি শুধু শুনছিলাম ঘোড়ার খুরের শব্দ... ঠক্ ঠক্ ঠক্... ওদের দেহে ছিল এ দেশের স্বাধীন সৈন্যদের পোশাক। ওরা বলেছিল জয় আসন্ন, ওরা একবার রানীমার নিজ হাতে পরিবেশিত আহার্যে ধন্য হতে চায়। ওদের এই আকুতি এত মর্মস্পর্শী ছিল, দ্বাররক্ষীর পাষাণ বক্ষও গলে গিয়েছিল। এসব তোমাদের রাজনীতি। আমি অন্দরের লোক, ছদ্মবেশীর চাতুরী বুঝি, আমার সাধ্য কী ?

কিন্তু তুমি অপবিত্র। মহারাজার কণ্ঠে বিষাদ এবং ক্রোধ এক সঙ্গে ধ্বনিত, আমি রাজকক্ষে তোমাকে স্থান দিলে এই সমাজে আমার স্থান কই ? আমার জন্ম তো মানুষের জন্য, ব্যক্তিগত আবেগের স্থান এখানে কতটা যুক্তিযুক্ত ?

আমি পবিত্র। রানীর কণ্ঠেও সমান দৃঢ়তা। আমাকে যখন ওরা ধর্ষণ করছিল, তখন আমি আমার সমস্ত অস্তিত্ব খুলে পালিয়েছিলাম নিভৃত কক্ষে, আমি সেই কক্ষ থেকে বসে স্পষ্ট দেখেছি, কিছু নেকড়ে হুল্লোড় করে পচা মাংস খাচ্ছে। আমি সেই দেহ ছেড়ে পালিয়েছিলাম অন্দরে, আমার পবিত্র মন আমাকে এখনো সতী রেখেছে। তোমাদের যুদ্ধ, তোমাদের জয়, তোমাদের গৌরবের কারণে আমার দেহকে উৎসর্গ করতে হয়েছিল, এ তোমার অহঙ্কার হতে পারত। যা হোক, আমি তোমার কাছে এর বিনিময়ে কিছুতেই করুণা চাই না।

মহারাজা সস্নেহ হাত রাখেন রানীর মাথায়, প্রজাদের কাছে এই যুক্তি চলে ? তুমি তাদের বিশ্বাস আর সংস্কারের কাছে আমাকে ছোট দেখতে চাও ? আমার দুঃখ তুমি অনুভব করতে পারছ না ? এজন্য আমি এই প্রাসাদের সবচেয়ে মূল্যবান পয়মন্ত হীরকটি তোমার হাতে তুলে দিলাম। তুমি জানো, এটা আমার পরম যত্নের জিনিস ছিল। এটা সঙ্গে থাকলে তুমি উন্নতির শিখরে উঠতে পারবে।

এই হীরকখণ্ড রাজমাতার না হলে ছুঁড়ে ফেলে দিতাম, সৃষ্টিকর্তা তোমার মঙ্গল করুন, বলতে বলতে আলুলায়িত রাত্রির পথ ধরে কোঁচড়ে হীরকখণ্ড নিয়ে রানী নদীর পাশে এসে দাঁড়ায় এবং জলকে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানিয়ে বলে, বিভক্ত হও।

রানী নদীর জলে প্রবেশ করার কিছুদিন পরই, যখন তার ঝাঁপ দেয়ার ভাঁজতরঙ্গ জল থেকে মুছে যায় নি, এক রাতে রাজা দুর্বৃত্তদের হাতে খুন হন।

সেই ঘোড়ার খুরের শব্দ এখনো চন্দ্রলেখাকে কাতর, ক্ষিপ্ত করে তোলে। অপমানিত অস্তিত্বের দিকে তাকিয়ে চন্দ্রলেখা ক্রোধে-জেদে কাঁপতে থাকে। একসময় ছিলাম বাইজি, জাদুরূপকে পুঁজি করে একদা রানী হয়েছিলাম। এই যে নত হয়ে কুর্নিশ করছে পুরো অঞ্চল, কুর্নিশ তখনো করত, তাতে এত অহঙ্কার ছিল না— ভাবতে ভাবতে অর্ধঘুমাক্রান্ত চন্দ্রলেখা বিড়বিড় করে, কিন্তু তারপরও যদি কারো মৃত্যু আমার রক্তকে স্পন্দিত করে থাকে, সে আমার স্বামী। তার রক্তকণা চরণের বুড়ো আঙুলে স্পর্শ করতে পারলে আমি অমরত্ব লাভ করতাম।

নতুন বাড়ির সৌন্দর্যই আলাদা। এর অলঙ্করণ, নকশা, সবকিছু অভিভূত করে চন্দ্রলেখাকে। কাঠ দিয়ে যে এত অভিজাত অট্টালিকা বানানো যায়, চন্দ্রলেখার কল্পনাতেও ছিল না। যে কোনো নতুন চন্দ্রলেখাকে আকর্ষণ করে। এ বাড়িটি অন্য অঞ্চল থেকে আগত নামকরা শিল্পীর নকশা অনুযায়ীই তৈরি হয়েছে।

চন্দ্রলেখা হেঁটে হেঁটে নতুন কাঠের গন্ধ শোঁকে।

কিন্তু ফোকর দিয়ে প্রবেশ করা ধানের গন্ধ মুহূর্তে তাকে বিমর্ষ করে তোলে। দ্বিতীয় দেহরক্ষী দাঁড়িয়ে ছিল দরজার বাইরে। প্রতি রাতের মতো তাকে প্রিয় পানীয় সরবরাহ করতে বলে বিছানায় গা এলাতেই চন্দ্রলেখা শোনে, ঘরের অসম্ভব নিকটে একটি কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে।

চন্দ্রলেখার কান উৎকর্ণ হয়। কুকুরটির কণ্ঠে এমন শব্দ, যেন কোথাও আটকা পড়ে বেরোনোর পথ পাচ্ছে না।

দ্বিতীয় দেহরক্ষী পানীয় ঢালতে থাকলে চন্দ্রলেখা বলে, দেখে এসো তো কোথায় কুকুর ডাকছে? দ্বিতীয় দেহরক্ষী আদেশ পাওয়া মাত্র বাইরের দিকে ছুটে যায়। সেপাইদের বলে, তোমরা খুঁজে দেখো তো কোথায় কুকুরের শব্দ?

চন্দ্রলেখা অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে, আমি তোমাকে খুঁজতে বলেছি। তুমি আবার কাকে আদেশ করছ?

দ্বিতীয় দেহরক্ষী বলে, রানীর কাছ থেকে এরকম মুহূর্তে আমি সরতে পারি না। এ কোনো শত্রুর চাল হতে পারে।

চন্দ্রলেখা মুহূর্তে টানটান হয়ে ওঠে, তোমার দূরদৃষ্টির প্রশংসা করছি।

রানীর অসীম মেহেরবানি।

সেপাইরা এসে জানায়, সমস্ত প্রাসাদ তন্নতন্ন করে খোঁজা হয়েছে, কোথাও কোনো কুকুর আটকা পড়ে নি।

চন্দ্রলেখা নতুন প্রাসাদের ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে জলের ওপর ভাসতে থাকা তার দূরবর্তী আবাসস্থলটির দিকে চেয়ে থাকে। দূরের আয়ুবুড়োর প্রাঙ্গণে ঢোল-করতালের শব্দ শোনা যায়। মুহূর্তে বাতাস ভারি করে ভেসে আসে পচা ধানের কটু গন্ধ। চন্দ্রলেখা নাক কুঞ্চিত করতেই পুনরায় কুকুরের ডাক।

বাড়ির সমস্ত বাতি জ্বলে ওঠে। কঠিন পদক্ষেপে নিচে নেমে এসে চন্দ্রলেখা চিৎকার করে, কে কোথায় আছ, শুনতে পাচ্ছ না কুকুরের ডাক? এক্ষুণি ওটাকে বের করে আনো।

সেপাইরা পড়ে মহাফাঁপরে। তারা নিজেরাও শুনছে কুকুরের শব্দ, অসম্ভব নিকটেই মনে হচ্ছে, কিন্তু শব্দস্থল আবিষ্কৃত হচ্ছে না।

তারা জোর তৎপরতা চালায়। কেউ কেউ বলে, মনে হচ্ছে, সামনে আরো কঠিন দুর্ভিক্ষ এগিয়ে আসছে। বিমর্ষ চন্দ্রলেখা দাসীকে ডাক দেয়।

দাসী এসে কুর্নিশ জানালে চন্দ্রলেখা বলে, আমার সমস্ত দেহ সুন্দর সুরভিতে ঢেকে দাও। যেন সেই গন্ধের ফাঁক দিয়ে আমাকে কোনো দুশ্চিন্তা গ্রাস না করে।

সেপাইরা যখন কুকুরের সন্ধানে প্রাসাদের সমস্ত চত্বর উল্টেপাল্টে ফেলছে, তখন দাসী ফুলে ফুলে অপূর্ব সাজে সজ্জিত করে চন্দ্রলেখাকে বলে, রানী, দর্পণে নিজেকে দেখুন।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চন্দ্রলেখা প্রতিদিনের মতোই অভিভূত হতে গিয়ে শরীরে অনুভব করে সম্পূর্ণ নতুন এক অনুভূতি— সম্মুখের নারীকে দেখে সে দেহে বিপরীত এক বোধ কাজ করছে এবং সে বোধ একজন কামার্ত পুরুষের বলে অনুভূত হচ্ছে।

চন্দ্রলেখা কেঁপে উঠতেই দেহরক্ষী জানায়, সমস্ত প্রাসাদ চষে ফেলা হয়েছে। কুকুরটিকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না।

এরপর শুরু হয় হুলস্থুল। কুকুরটির অনবরত ক্রন্দনময় ডাকে অতিষ্ঠ সেপাইরা ঘরের সমস্ত আসবাব সরাতে শুরু করে।

চন্দ্রলেখার হতাশ মাথা পালঙ্কের ওপর নুয়ে এলে দাসী বলে, রানী বরং আগের প্রাসাদেই ফিরে যান।

আগে কুকুরটিকে খুঁজে বের করা হোক।

এক সময় কাঠের নতুন প্রাসাদে ভিড় বাড়তে থাকে। রাজপারিষদ, গ্রামবাসী সবার কলগুঞ্জনে রাতের বাতাস আর্দ্র হয়ে উঠতে থাকে।

না, কোথাও কুকুর নেই।

কিন্তু অত্যন্ত নিকট থেকে স্পষ্ট তার কান্নার শব্দ আসছে।

চন্দ্রলেখা চিৎকার করে ওঠে, এতগুলো মানুষ, এই সামান্য কাজটা—। সে দ্রুত বেগে ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়।

চন্দ্রলেখার গলার হারটি অভিনব। কাঠের হার, মাঝেমাঝে হীরের পুঁতি বসানো। অস্থির চন্দ্রলেখা হীরের অংশ বাদ দিয়ে পয়মন্ত কাঠের পুঁতি গুণতে থাকে এবং এই কাজে সে এত বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ে, দীর্ঘক্ষণ চারপাশের কোনো শব্দ তার কানে যায় না।

আমি পাপিষ্ঠ, অদৃশ্য শক্তির দিকে মাথা তুলে চন্দ্রলেখা ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে, কেন আমার কোনো সুস্থিরতা নেই ? কেন আমি এমন সব কাজ করি, যা প্রতিনিয়ত অকল্যাণকর ? আমি কুৎসিত, আমি জঘন্য, হে সর্বশক্তিমান, আপনার কাছে আমি শুধু সেইটুকুই ফেরত চাই, আমার যতটুকু সুন্দর। বাকি সবকিছুকে সুন্দর করার দায়িত্বও আপনার ওপর অর্পণ করলাম। আমাকে সমূহ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।

সমস্ত প্রাসাদের আসবাব, পাটাতন, জানালা সবকিছু উল্টোপাল্টে সুঁচ খোঁজার মতো খুঁজেও যখন কুকুরটিকে পাওয়া গেল না, তখন এলাকার সমস্ত লোক, যারা অদৃশ্য জিনের ভয়েও এতদিন আত্মবিশ্বাস হারায় নি, তারা ভয়ে ছাইয়ের মতো চুপসে গেল।

দেহরক্ষী বলে, রানী, আয়ুবুড়ো আপনাকে এই প্রাসাদ ত্যাগ করার পরামর্শ দিয়েছেন। বজরা প্রস্তুত, আপনি পুরনো প্রাসাদে চলুন।

চন্দ্রলেখা দীর্ঘক্ষণ উবু হয়ে পড়ে থাকা অবস্থা থেকে মাথা উঠিয়ে বলে, আমি এখনো স্পষ্ট কুকুরের ডাক শুনছি। সেপাইদের বলে দাও, ওটাকে বের করতে না পারলে রানী তাদের গর্দান কর্তনের নির্দেশ দিয়েছেন।

এরপর চন্দ্রলেখা দ্রুত বজরায় গিয়ে ওঠে।

রাত্রির শেষ প্রহরে জলের ওপর ভাসতে থাকা পুরনো প্রাসাদের ছাদে দাঁড়িয়ে চন্দ্রলেখা দেখে, কুকুরের ডাকের খোঁজে নতুন প্রাসাদটি ভাঙতে ভাঙতে সেপাইরা সেটাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিচ্ছে।

চন্দ্রলেখা অদৃশ্য শক্তিকে কুর্নিশ করে, আপনার অসীম কৃপা! নিশ্চয়ই ওই প্রাসাদ আমার জন্য অকল্যাণকর ছিল।

প্রতিদিনের সম্পর্কের অভ্যস্ততায় জড়তামুক্ত দ্বিতীয় দেহরক্ষীর মস্তিষ্কেও এক সময় কৌতূহল ক্রিয়া করে। উড়ন্ত চিঠিতে কী লেখা ছিল ? স্পষ্ট মনেও পড়ছে না। হ্যাঁ, চন্দ্রলেখার আয়ুশত্রু চন্দ্রলেখার ঘাড়ের কাছে, এ কিসের ইঙ্গিত ? ঘাড়ের কাছে কী ? কেন তার ওপর প্রতিনিয়ত পর্দা ? চন্দ্রলেখা যখন অচেতন, পদ্মের পাপড়ির মতো ওষ্ঠ প্রকম্পিত, এক সময় রাতের গভীরে তারও কৌতূহলী হাত চন্দ্রলেখার খোঁপা স্পর্শ করে!

মুহূর্তে ঝড়, বিশালাকৃতির খোলস খুলে বেরিয়ে আসে গোখরো, আসমানের তারা বিদীর্ণ করে মেঘপুঞ্জের গর্জন— স্রোতের নিচে তলিয়ে যায় দ্বিতীয় দেহরক্ষীরও দেহ।

মাজারের সামনে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে চন্দ্রলেখা। এ কি প্রাচীন বৃক্ষ অপসারণ করার পাপ? একশো বিশ বছরের বৃদ্ধের অদৃশ্য হাত তার চুল স্পর্শ করে, চন্দ্রলেখার অন্তরের কোষে সহস্র নখের আঁচড়। বেদনায় বিক্ষত সে অদৃশ্য বাতাসে রক্তের দাগ ধুয়ে নতুনভাবে বাঁচার প্রত্যাশা জানায়। চন্দ্রলেখা অনুভব করে, হাত নয়, তার চুল স্পর্শ করে আছে বৃদ্ধের হাতের বীভৎস শিরাগুলো। সন্ধ্যার আবছায়ায় চন্দ্রলেখার বুক হিম হয়ে আসে। তাকে ততধিক বিচলিত করে প্রকৃতি কাঁপিয়ে বৃদ্ধের হাসির হা-হা স্রোত শূন্যতার মধ্যে তরঙ্গায়িত হতে থাকে। কাঠ চন্দ্রের কল্যাণ। ছুটতে ছুটতে চন্দ্রলেখা কাঠের প্রাসাদ স্পর্শ করে।

বিজ্ঞ পারিষদ এবার চন্দ্রলেখার দেহরক্ষী নির্বাচনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। যে দেহরক্ষীর দায়িত্ব রানীর দেহের রক্ষণাবেক্ষণ করা, সে নিজেই শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে উধাও হয়ে যায়! এক্ষেত্রে আরো বলশালী, আরো সুঠাম এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন যুবকের প্রয়োজন। কিন্তু ধান-চালের সঙ্কটের মধ্যে সুঠাম যুবক পাওয়াও দুরূহ হয়ে পড়েছে। উচ্চবিত্ত শ্রেণীতে যা-ও কিছু যুবক আছে, আরামআয়েশে তাদের চামড়ার নিচের স্তরে বেঁধেছে চর্বি, ফলে বিজ্ঞ পারিষদ পড়ে মহাফাঁপরে।

দেহরক্ষীবিহীন অবস্থায় রানী এক মুহূর্ত নিরাপদ নয়।

চন্দ্রলেখার ঘর পাহারা দেয় শত প্রহরী। চারপাশে জলের প্রকোপ বাড়ছে। জলের মাথা এসে সশব্দে কাঠের প্রাসাদে ধাক্কা দেয়।

কম্পিত ঘরে টাল সামলে দাঁড়াতেই নিজ শরীরে আজব এক পরিবর্তন লক্ষ করে চন্দ্রলেখা। কী যেন হচ্ছে ভেতরে, শরীরে জমছে ঘাম। মুখমণ্ডলে হাত বুলিয়ে চমকে ওঠে সে। মুহূর্তে আয়নার সামনে দাঁড়ায়, বিস্ফারিত চোখে অবলোকন করে, ঠোঁটের ওপর দিকে ছোট ছোট গোঁফের মতো গজাচ্ছে। চন্দ্রলেখার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। ভয়ত্রস্ততায় সে মুহূর্তে চতুর্দিকে তাকায়। না, কেউ দেখে নি। এই জন্যই কি ইদানীং দাসীটিকে দেখে তার মধ্যে উদগ্র কামনা ভর করে? সে টের পাচ্ছিল শরীরের ভেতর কী যেন ঘটছে, কী এক পরিবর্তন, কিন্তু তাকে কোনো ভাষায় চিহ্নিত করতে পারছিলেন না। তবে কি পয়মন্ত হীরে তার কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে?

না, এ হতে দেয়া যায় না।

কম্পিত চন্দ্রলেখা বিকারগ্রস্তের মতো সারা মুখে পর্দা টানে এবং দাসীকে ডাক দেয়, শিগগির গ্রামের প্রবীণ কবিরাজকে প্রাসাদে আনার ব্যবস্থা করা হোক।

পাহাড়ের সামনে সমবেত হয়েছে অনেক মানুষ। বিকট গন্ধে সবার প্রাণ যখন ওষ্ঠাগত, যখন ক্ষুধার্ত মানুষের মধ্যে লোপ পেয়েছে বুদ্ধি-বিবেচনা, তখন বিজ্ঞ পারিষদ খুলে দেয় পাহাড়ের মুখ— পচে ওঠা লক্ষ লক্ষ টাকার ধান এমন হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে আসে, কাণ্ড দেখতে আসা অনেক লোকই তার তলায় চাপা পড়ে যায়। বাকিরা প্রাণান্তকর দৌড় দিয়ে

নিরাপদ স্থানে দাঁড়ালে বিজ্ঞ পারিষদ বলে,এ সবই শয়তান জাদুকরের কারিশমা। রানী যদি ঘুণাক্ষরেও জানতেন সব ধান এখানেওখানে লুক্কায়িত, তবে জনগণকে এরকম দুর্দশায় পড়তে হতো না।

জনতার মধ্যে গুঞ্জন শুরু হলে বিজ্ঞ সভাসদ বলে, আর ক'টা দিন অপেক্ষা করুন। আমরা আমাদের এইসব দুর্দশার চিত্র বাইরে পাঠাচ্ছি। পুরো অঞ্চলকে রানী দুর্গত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

অঞ্চলের ইত্যাকার পরিস্থিতির সবচেয়ে নির্মম শিকার হলো নারীরা। বৃদ্ধি পেলো তালাক, কন্যা সন্তান হত্যা, স্ত্রী হত্যা।

পুরুষদের যুক্তি জোরালো, এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বোঝা নারীই। এরা সন্তান পেটে নিয়ে বংশ বৃদ্ধি ঘটায়, স্বামীর উপার্জিত অর্থে অর্ধেক ভাগ বসায়। সব ছেড়েছুঁড়ে কোথাও পালিয়ে যেতে চাইলে লেজ টেনে ধরে। এরা ঘরে বসে বুড়ি হয়, বিয়ে দিতে কাড়ি কাড়ি খরচ করতে হয় এদের পেছনে, বিয়ের পর বাবা-ভাইদের কোনো কাজে আসে না।

নারীরা ফুঁসে ওঠে, সন্তান কে দেয় পেটে ? কেন তোরা বিয়ে করতে চাস আমাদেরকে ? আমরা খেটে খাই না ? একটা মুহূর্তও তোরা বসে থাকতে দিস ? আমরাও তোদেরকে পুছব না। দেখব, কী করে দিন চলে তোদের !

ফলে সংঘর্ষ, ফলে হত্যা। রাজ্যের বিশৃঙ্খলার কারণে যার কোনো বিচারই হয় না। ইদ্রিসের বোনেরা বলে, চন্দ্রলেখা ছদ্মবেশী পুরুষ, এজন্যই নারীর যন্ত্রণা বোঝে না।

কবিরাজের দেয়া ঔষধ ঘষতেই গোঁফ অন্তর্হিত হয়। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে সে জানালার কাছে গেলে ইদ্রিসের বোনদের কথা বাতাসে ভেসে আসে। সীমাহীন বিমর্ষতা মুহূর্তে চন্দ্রলেখাকে গ্রাস করে। নাক খাড়া করে সে শুধু চতুর্পাশে বিপদের গন্ধ পায়। মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, চন্দ্রলেখা কি সপ্তম বাঁশিতে ফুঁ দেবে ?

না, এ ঠিক হবে না। প্রথম বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে কী নিদারুণ ধান কেলেঙ্কারির মধ্যে নিজেকে জড়াতে হলো। এসব আরোপিত জাদু দিয়ে কিচ্ছু হবে না, শিগগির একটা সভার ব্যবস্থা করতে হবে। মুখোমুখি হতে হবে লক্ষ জনতার। তার যা নিজস্ব সম্পদ আছে, এই মুহূর্তে সেইটাই সবচেয়ে কার্যকর ঔষধ।

পুরুষ সঙ্গ চন্দ্রলেখার ভালো লাগে না। চন্দ্রলেখার চোখের দিকে তাকিয়ে অন্য এক গন্ধ পায় দাসী। ভয়ে সে দূরে সরে থাকে।

এমন সময় খিড়কি পথে যেন উড়ে এসে পড়ে একটি কাগজ। চন্দ্রলেখার সবকিছু স্বস্ত হয়ে আসে—

'চন্দ্রলেখার
আয়ু
রেখা
স্পর্শ
করেছে
মহাশক্তিমান
পুণ্য।'

কে ? কে তস্কর ? ছুটতে ছুটতে ঘর থেকে বের হয় সে, হায়, দ্বিতীয় দেহরক্ষীও তবে যুক্ত নয় এর সঙ্গে ? কোন সে ছিদ্রপথে তবে প্রবেশ করছে শত্রু ? সেপাইদের ডাক দেয়, চতুর্পাশে খোঁজ কর, কে এসেছিল খিড়কি পথে ?

দাসী পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে, রানী অনেকদূর এসে গেছেন। এভাবে এতদূর আসা রানীর জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক।

সত্যিই, এতক্ষণে চন্দ্রলেখার হুঁশ হয়, দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে সে কাঠের প্রাসাদ ছেড়ে একদম তোরণের কাছে চলে এসেছে।

কে ? কে তস্কর ? চতুর্দিকে উকুন খোঁজার মতো তন্নতন্ন খোঁজ পড়ে। চন্দ্রলেখা বিজ্ঞ পারিষদদের নিয়ে গোপন বৈঠকে বসে। তারা জানতে চায় উড়ন্ত কাগজের বক্তব্য কী ?

চন্দ্রলেখা বিচলিত বোধ করে, সেসব একান্তই আমার ব্যক্তিগত বিষয়।

কিন্তু রানী, আপনি সভা ডেকেছেন, বিজ্ঞ পারিষদ অভিমত প্রকাশ করে, আমরা কঠিন বিপদের গন্ধ পাচ্ছি। এরকম অবস্থায় কোনো বিষয়কে ব্যক্তিগত করে ফেললে সমাধান কী করে হবে ?

চন্দ্রলেখা প্রচণ্ড রোষে উঠে দাঁড়ায়, রাজ্যের আইন শাসনের শিথিলতা আজ আমাকেই বিদ্ধ করছে। আপনারা কী করছেন ? যত্তোসব ঘুমকাতুরের দল। তস্কর আমাকে প্রতিনিয়ত মৃত্যুর হুমকি দিচ্ছে, এর চেয়ে বেশি আর কী জানার থাকতে পারে ?

এরপর চন্দ্রলেখা আয়ুবুড়োর সামনে আছড়ে পড়ে, দেখুন, আমার আয়ু কী পরিমাণ বিপদগ্রস্ত! আয়ুবুড়ো দীর্ঘসময় গম্ভীর চোখে চিঠি পর্যবেক্ষণ করে বলে, মহাপুণ্যবান ?

তস্কর কি পুণ্যবান হয় ? এরপর হাসতে থাকে সে, আপনার আয়ু রেখা পরিষ্কার। কোনো বিপদ নেই। রানীকে বিভ্রান্ত করার জন্যই শত্রুর এ নিছক একটা খেলা মাত্র।

চন্দ্রলেখার এতেও শান্তি হয় না। সম্মুখে ধূপের ধোঁয়া পাকিয়ে উঠছে। অদ্ভুত নেশায় আক্রান্ত চন্দ্রলেখা প্রায় চেতনারহিত অবস্থায় অদৃশ্য শক্তির মুখোমুখি বসে, তবে কি বিপদ ঘনায়মান ? হে মহাশক্তিমান, আমাকে মুক্তির উপায় বলুন! আমি কি আয়ুবুড়োর আশ্বাসে ভরসা করতে পারি ? বলুন! তবে কি তস্কর আমারই ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছে ? কেন আমার আকাঙ্ক্ষা সব বিষবাষ্প করে দিতে চায় ?

কেন আমি স্থির হই না ? কেন এত প্রজ্বলিত অগ্নি ? হে মহাশক্তি, এই পৃথিবীতে এমন কেউ কি আছে, যে আমার যথার্থ মঙ্গল চেয়েছে ? আমাকে তবে তেমন একটি শীতল হস্ত দান করুন, যেখানে স্পর্শ মাত্র সব শান্ত হয়ে আসবে। বলুন, কী আমার পাপ ? আমি ঘোড়ার খুরের দ্বারা পিষ্ট হয়েছি, এই আমার পাপ ? জল হতে উত্থিত হয়ে নিজ বুদ্ধি বলে রাজক্ষমতা পেয়েছি, এই আমার পাপ ? হে মহাশক্তি, আমাকে বারংবার জলে পতিত হতে হয়েছে। সবে কৈশোর অতিক্রম করেছি, অত্যাচারী রাজা আমাকে জলে নিক্ষেপ করল। বরাবরই আমার আছে দু'টি অদৃশ্য জলডানা। মৃত্যুর গলা জড়িয়ে আমি উঠে আসছিলাম ডাঙায়। এরপর সব হারিয়ে গেল। অতীত, বর্তমান সব।

রাজবাইজি হলাম। প্রতিনিয়ত ভাগ্য ঘোরানোর জন্য কী সীমাহীন যুদ্ধ!

হে সৃষ্টিকর্তা! দেখিয়ে দিন আমার পাপ তবে কী ? আমাকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেছে আমার স্বামী, তবে কি সেইটাই আমার পাপ ? আমি বিশ্বাসঘাতককে মৃত্যু দিয়েছি,

এ রাজধর্মের নিয়ম। হে মহাশক্তি, অসীম পৃথিবী-রাজ্য পরিচালনার জন্য আপনি কি আশ্রয় নেন না বন্যা, খরা, দুর্যোগ মহামারীর ? সেই তুলনায় আমি তো তুচ্ছ কীট। আমার উচ্চাভিলাষ তবে আমার পাপ ? কোনো মানুষ আছে যার সব আচরণ সার্বিক মানবিক গুণসম্পন্ন ? এ যদি দোষ হয়েই থাকে, তবে আমার ভেতর মানবিক সব গুণ স্থাপন করা আপনারই দায়িত্ব। আমি আমার সমস্ত ভার আপনার চরণ তলে রেখে দিলাম।

চতুর্পাশে পরাক্রান্ত সন্ধ্যা। চন্দ্রলেখা উপুড় হয়ে কাঁদতে থাকে।

দীর্ঘ সময় পর সে মাথা উঠিয়ে দেখে ধূপের ধোঁয়া নিঃশেষ হয়ে কী এক অজানা গন্ধ ভর করেছে প্রকৃতিতে। চন্দ্রলেখা নিজের ভেতর এমন অদ্ভুত গন্ধ আর কখনো অনুভব করে নি। তবে কি এই সুবাস মহাপৃথিবী থেকে আগত ? আমার বাক্য কর্ণগোচর হয়েছে মহাশক্তিমানের ? চন্দ্রলেখা প্রচণ্ড উল্লাসে হাসতে থাকে, হা-হা...।

পর মুহূর্তেই ভেতরটা নিভে আসে, যদি মহাশক্তিমান তার ভেতর থেকে উচ্চাভিলাষ তুলে নেন, তবে চন্দ্রলেখার বাকি জীবন কী করে অতিবাহিত হবে ? যদি সবটা জুড়েই থাকে মানবিকতা, মায়া, তবে নিষ্ঠুরতার অদ্ভুত সৌন্দর্য, যা তাকে নিরন্তর বিকশিত করেছে, এ থেকে তাকে জীবনের জন্য বঞ্চিত হতে হবে ? চন্দ্রলেখা তো সন্ন্যাসী কিংবা কোনো নীতিবান শিক্ষকের জীবন চায় না। উচ্চাভিলাষ যদি না-ই থাকে, তবে সর্বাগ্রে হারাতে হবে স্বপ্নকে! চন্দ্রলেখা কি আর একটি পদক্ষেপও সম্মুখের দিকে বাড়াবে না ?

মিস্টার এম. আলী বাতি নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন।

মুহূর্তে বাঁশির ফুঁ। ধড়ফড় করে উঠে বসেন। রাতের রাস্তায় চোর-চোর বলে দৌড়াচ্ছে কারা! গেল ঘুমের বারোটা বেজে।

কী করা যায় এখন ? এমন নিঃসঙ্গ আর অসহায় মনে হচ্ছে নিজেকে, সেদিন নোবেল বিজয়ী জাপানি সাহিত্যিক ওয়ে কেনজাবুরো সম্পর্কে আলী আহমদ 'সংবাদ সাময়িকী'তে লিখেছিলেন, যন্ত্রণাবিদ্ধ রূপকার। ওয়েকে ফোন করা যেত ? জানা যেত এ-মুহূর্তে, এই মধ্যরাতে, যখন এ-দেশের একটি গলি ধরে চোর দৌড়ে যাচ্ছে— তিনি কতটা যন্ত্রণাবিদ্ধ ? কিংবা ফোন করা যেত ওই পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক আবুল হাসনাতকে ? মিস্টার এম. আলী দীর্ঘ বছর ধরে এই একটি সাময়িকী মনোযোগ দিয়ে পড়েন, এই কথাটিই গভীর রাত্তিরে ফোনে তাঁকে যদি জানানো যায়, তিনি কি এই পাঠককে পাগল ভাববেন ?

মিস্টার এম. আলী নিজের অবস্থান শনাক্ত করতে পারেন না। কাউকে তাঁর ফোন করে প্রাণের আন্তরিক বিচ্ছিন্ন অনুভূতিও জানানো হয়ে ওঠে না।

এম. আলী দেয়ালের ছায়ার দিকে তাকান। কী আশ্চর্য, ওই দাড়িঅলা আজব চুলের লোকটি কে ? ঘরের চারপাশে তাকান। অন্য কেউ নেই। টেবিলে, শেলফে আয়না খোঁজেন। এ কি আমারই আকৃতি ? এম. আলীর বুকের ভেতরটা দীর্ঘদিন পর ফুলে-ফেঁপে ওঠে। দূর পথ ধরে হেঁটে যাচ্ছে ও কে ? কী রকম কুয়াশায় ডুবে যাচ্ছে সেই নারী। সহস্র মাইল দূরের পথে আবছা হয়ে যাচ্ছে দীর্ঘ চেনা সুখ। ওই কি একসময় আমার স্ত্রী ছিল ?

নিজের স্ত্রী অন্যের হাত ধরে চলে যাওয়ার চেয়ে বেশি অপমান পুরুষের জীবনে আর কিছু কি আছে? দেয়ালের ছায়ায় অনেকদিন পর নিজের অচেনা আকৃতিকে আবিষ্কার করতে করতে তিনি ভাবেন, আমি কি মুগ্ধ?

চন্দ্রলেখা দেখে, পুনরায় গোঁফ গজাচ্ছে। ভেতরে অনুভূত হচ্ছে বিচিত্র সব শব্দ। এক সময় হতভম্ব হয়ে অনুভব করে তার বক্ষযুগল কেমন যেন চামড়ার সাথে মিশে আসছে। উদ্‌ভ্রান্ত চন্দ্রলেখা দ্রুত ঠোঁটের ওপর ঔষধ ঘষে প্রায় আর্তনাদ করে দাসীকে ডাক দেয়। বলে, শিগগির কবিরাজকে খবর দাও।

কবিরাজ এসে জানায়, এরকম আজব লীলা জীবনের সে দেখে নি। এর চিকিৎসা সে জানে না। চন্দ্রলেখা গভীর গহ্বরে ছিটকে পড়ে, আমার তবে উপায় কী হবে বলুন! কবিরাজ বিমর্ষ মুখে উঠে দাঁড়ালে চন্দ্রলেখা জ্ঞান ফিরে পায়। মুহূর্তে সে স্বস্থানে ফিরে এসে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, পৃথিবীর সেরা চিকিৎসার বই পড়ে আপনি এর উপায় খুঁজে বের করুন। নইলে জানবেন, রাজশাস্তি থেকে আপনার নিষ্কৃতি নেই।

কবিরাজের অন্তর্ধানের পর তুলো দিয়ে নির্মিত বক্ষবন্ধনী পরে বক্ষ পুরুষ্টু করে চন্দ্রলেখা নিজের মধ্যে প্রবল আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে চায়।

আয়ুবুড়ো বলে, কেবল আয়ু সম্পর্কে নিশ্চিত করাই আমার কাজ। আমি ঠিক এই রোগ সম্পর্কে কিছু বলতে পারব না। দাসীটির শরীরের গন্ধ চন্দ্রলেখাকে উন্মত্ত করে তুলতে থাকলে সে অন্য ভাবনায় নিজেকে ধাবিত করে, ওই সব উড়ন্ত চিঠি কি তবে অত্যাচারী রাজার গোপন চক্রান্ত?

দাসী, তোর গালে ওই তিল কবে জন্মাল?

সে তো আগেই ছিল।

স্বাস্থ্যও বেশ ভরাট হয়েছে। সেদিন বললি প্রকাশ্য কিছু থাকতে নেই, গোপন সম্পর্ক কার সাথে?

দাসী নিরুত্তর। শিক্ষিত দেহরক্ষী তোকে স্পর্শ করেছিল?

না রানী!

আমি যখন ঘুমিয়ে, সে আমার পাহারা ফেলে তোর গন্ধে—।

না রানী।

ছিঁড়ে দু'টুকরো করব তোকে। আহ্ তোর গন্ধ কী রকম বুনো! তোরা দু'জন মাঝে মধ্যেই পৈশাচিক খেলায় মেতে উঠতি না?

দাসী নিরুত্তর।

আয়, আমার কাছে, সেই খেলাটা খেলবি আমার সঙ্গে।

ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে দাসীর মুখ।

চন্দ্রলেখা হঠাৎ চেতনালোকে ফিরে আসে। দাসীকে বলে, তুই আমার চোখের সামনে থেকে সর।

দাসী উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

মস্তকের ওপর ঝুলছে উজ্জ্বল দীপাধর। ময়ূররঙা অঙ্গাবরণ চন্দ্রলেখার গায়ে বিচ্ছুরিত করছে প্রবল এক আভা। ভেতরের পুরুষ অনুভূতি নিয়ে সে দর্পণের কাছে হাত রাখে। স্পর্শ করে সেই নারীর ওষ্ঠ, স্ফটিক গাল, চিবুক। টের পায়, ভেতরটা ছিঁড়েখুঁড়ে বের হতে চাইছে অজানা জন্তু।

চন্দ্রলেখার শুচিশয্যা অবদমনের জলে ভিজে ওঠে। তার অস্থির রাত্রি অতিবাহিত হয় নতুন একটি হীরের অঙ্গুরীয়ের স্বপ্নে, যার আছে সাতটি পুঁতির মতো প্রকোষ্ঠ।

বন্দি রাজা জ্বরের ঘোরে কাঁপছে, অঞ্চলের দুর্ভিক্ষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমতাবস্থায় যখন বাতাসে বাড়ছে শকুনের সংখ্যা, চন্দ্রলেখা তার অনির্বচনীয় উপস্থিতিকে প্রকট করে কাঠের প্রাসাদে নতুন ভঙ্গিমায় দাঁড়াবে, কণ্ঠে থাকবে বিষবাষ্প, এই পরিকল্পনায় নিজেকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করে।

ডাগর চোখে সুরমার টান, ঠোঁটে জর্দার রঙ, বুকের মধ্যে কামিনী ফুলের স্তবক। সে এক জমজমাট সজ্জার মধ্যে নিজেকে গভীরভাবে নিপতিত করে চন্দ্রলেখা।

রূপবিশেষজ্ঞা গরম জলে চন্দ্রলেখার নখ ঘষতে ঘষতে পরামর্শ দেয়, তিনি যেন চূড়োয় দাঁড়িয়ে বক্তৃতার কণ্ঠকে অতটা উঁচুতে না চড়ান, যাতে চন্দ্রলেখার গালের ফেইস পাউডারে ছত্রাকের মতো ভাঁজ পড়ে যায়। এর মধ্যে অঞ্চলের দুর্ভিক্ষের খবরের পরিপেক্ষিতে বাতাসের মধ্যে হেলিকপ্টারের ছবি ভেসে ওঠে। চন্দ্রলেখার কাঠের প্রাসাদের ওপর তা চক্রাকারে ঘুরতে থাকে।

জ্বরাক্রান্ত রাজা কাঁপতে কাঁপতে নিজের সীমাহীন দুর্ভোগের বৃত্তান্ত বর্ণনা করে পদ্য রচনায় ব্যাপৃত হয়। হেলিকপ্টারের গর্জন তার কান বিদীর্ণ করলে হাহাকার করে সেসব পদ্য সে বদ্ধ কারাগারে উড়িয়ে দেয়। গ্রামের বুভুক্ষ মানুষ বিস্তৃত জমিনে ভিড় করে উর্ধ্বাকাশে তাকিয়ে থাকে। তাদের জড়ো হওয়ার ভঙ্গি দেখে মনে হয়, কতগুলো গোবরে পোকা পিলপিল উঠে আসছে নতুন শস্যের গন্ধ পেয়ে। এদিকে চন্দ্রলেখার সাজের প্রায় সমাপ্তি পর্বে ঘটে এক দুর্ঘটনা। চন্দ্রলেখা চৌকো দর্পণে নিজেকে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে অনুভব করে দর্পণে তার নয়, দ্বিতীয় দেহরক্ষীর জলজ্যান্ত চক্ষু জ্বলজ্বল করছে। এত বিরাটাকৃতির সেই চক্ষু, যা সমস্ত দর্পণের আলোকে আড়াল করে রেখেছে। চন্দ্রলেখা ভীত হয়ে পশ্চাতে দণ্ডায়মান দাসীর হাত চেপে ধরে, দাসী বিচলিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে, কী?

ওই যে চক্ষু!

চন্দ্রলেখার আচরণে হতবাক দাসী দর্পণের সামনে দাঁড়ায়, এক সময় সে হাসতে থাকে। সে দেখে, দর্পণে একটি বাদুড়ে মুখ, যেটা তার নিজের, প্রবল অর্থ-কষ্টের মধ্যেও একদিন যার মধ্যে সৌন্দর্য ছিল, হায়েনার মতো সেই মুখ দাসীকে বিদ্ধ করলে দাসী ডুকরে কেঁদে ওঠে। এবং এই প্রথম চন্দ্রলেখার অনুমতির অপেক্ষা না করে কক্ষ থেকে ছুটে বের হয়। এই সব কাণ্ডে হতবিহ্বল রূপ বিশেষজ্ঞা শব্দ হারিয়ে ফেলে।

সমস্ত কক্ষে অশরীরী ছায়া ভর করে।

চন্দ্রলেখা পুনর্বার দর্পণের সামনে দাঁড়ায়। সে স্পষ্ট দেখে, চক্ষু নয়, দ্বিতীয় দেহরক্ষীর মাংসহীন আঙুলে রক্ত এবং তা এগিয়ে আসছে চন্দ্রলেখার চুলের দিকে। ঠাস... মুহূর্তে চন্দ্রলেখা কাঠের হিল দিয়ে আয়নার বুক ফুটো করে দেয়।

এদিকে নিয়মমতো হেলিকপ্টারের মালপত্র কাঠের দালানের তলদেশে, জলের ভেতরকার কুঠুরিতে জমা হতে থাকলে বৃক্ষের শাখায় গান গেয়ে ওঠে জাতীয় পাখি। তার সুরে মোহগ্রস্ত চন্দ্রলেখা জেনে যায়, রাজ্যের সব প্রজা অত্যন্ত সুখে আছে, অঞ্চলে প্রচুর বৃক্ষের উদ্ভব হচ্ছে। কিন্তু চন্দ্রলেখা কিছুতেই ভেবে পায় না বাতাসের সব সবুজ তবে কোথায় গিয়ে জমা হয় ? করতলের ঘাম জিভের ডগায় স্পর্শ করতে করতে চন্দ্রলেখা গবাক্ষ পথে বাইরের পৃথিবী অবলোকন করে। সে দেখে, অসংখ্য উড্ডয়নক্ষম শিশুকাক জলের ওপর নতুন উড়ালে মেতে উঠছে, পাহাড়ের ওপরে জন্ম নিচ্ছে বাচ্চা বাদুড়। চন্দ্রলেখা প্রাণের মধ্যে স্পন্দন অনুভব করে। সে নতুন করে নিজেকে বিন্যস্ত করে ছাদের ওপর গিয়ে দাঁড়ায়।

ক্ষীণাঙ্গী মানুষগুলো মাঠের সমস্ত সবুজ আড়াল করে দাঁড়ালে চন্দ্রলেখা তার চোখ থেকে অজানা বিচ্ছুরণ ঘটাতে থাকে। মুহূর্তে ইতস্তত করতে থাকা লোকজনের কোলাহল কমে আসে। বক্তৃতার আগেই চন্দ্রলেখা রিলিফের একাংশ শূন্যের দিকে ছুঁড়ে মারে।

যেন-বা নিষিদ্ধ আপেল, মাটির ওপর আছড়ে পড়তে থাকা খাদ্যদ্রব্যের দিকে এমনই ভয়ে ভয়ে লোকগুলো তাকায়। এই অনুভূতি মুহূর্তের, তারপর কামড়া-কামড়ি... তারপর নখের আঁচড়... অগ্নিময়ী চন্দ্রলেখা স্ফটিক আভায় উজ্জ্বল হয়ে কণ্ঠকে শাণিত করে, ভাইসব!

যখন ঘরে ফিরে চন্দ্রলেখা খুলে ফেলছে হার, কণ্ঠে তার সুরেলা তরঙ্গ, চতুর্পাশে সদ্য জন্ম নেয়া বীভৎস গন্ধকে প্রতিহত করতে ঘরের কোণে জ্বলছে কাশ্মিরি ধূপ, যখন তার বুক হিম করে দিয়ে দুঃসহ অনুভূতি ঠেলে উঠছে— আমি কি ক্রমেই সম্পূর্ণ পুরুষে রূপান্তরিত হচ্ছি ? তখন তার শ্বাস রুদ্ধ করে আরেকটি উৎকট গন্ধের দমকা হাওয়া কক্ষে প্রবেশ করে।

চন্দ্রলেখা চকিতে পেছন ফিরতেই দেখে ইদ্রিস, যেন-বা কুলুঙ্গির ভাঁড় ভেঙে ইঁদুর নেমে এসেছে।

সে চকিতে দাঁড়ায়, কে তুমি ? কী করে এই প্রাসাদে প্রবেশ করেছ ?

ছায়ার মধ্যে লুকিয়ে।

চন্দ্রলেখা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে— তুমি ?

ইদ্রিসের মারমুখী ভঙ্গি কোনো সিদ্ধান্তে আসার ব্যাপারে চন্দ্রলেখার মূল্যবান সময়ের কিছুটা গ্রাস করে ফেলে। পর মুহূর্তে নিজেকে স্বাভাবিক করে চন্দ্রলেখা ঠোঁটের কোণে রক্তরস সঞ্চিত করে, তাহলে তুমি এসেছ ? আহা! তোমার পোশাকের এই অবস্থা কেন ?

মধ্যরাতে মিস্টার এম. আলীর চোখে ঢুলুনি এসেছিল। এক্ষুণি দৌড়াতে হবে অফিসে। কিন্তু মনে হয় শরীরে প্রচণ্ড জ্বর! কাল কি হরতাল হবে? এইরকম ভাবতে ভাবতে তিনি রিসিভারে হাত দেন। পরক্ষণেই ফোন রেখে সদ্য লিখিত রিপোর্টটি নিয়ে বসেন। সিগ্রেটের ধোঁয়া ঘূর্ণায়িত। পাশের খোলা পেপারে খালেদা জিয়া তর্জনী নাড়িয়ে যারা হরতাল করে, তাদেরকে জাতির শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করছেন। এদিকে হাসিনা বলছেন, এরশাদের আমলে জাতির শত্রুর কাজ খালেদা জিয়াও করেছেন।

যা হোক, বাস্কেটে পেপার ছুঁড়ে ফেলে রাতের পৃথিবীতে বেরোনোর প্রস্তুতি নিতেই মস্তিষ্কে জট। সারি সারি ঘাতক মুখ ঘিরে ফেলে এম. আলীকে। এম. আলী টাইয়ের গিট ঢিলে করতে গিয়ে জিভে তেতো বোধ করলে মধ্যরাতে রাস্তায় নাইট গার্ড ফুঁ দেয়। এম. আলী দরজা খোলার জন্য হাত বাড়াতেই ইলেকট্রিসিটি চলে যায়।

অন্ধকার হাতড়ে মোম জ্বালিয়ে দীর্ঘসময় স্থবিরতার মধ্যে ডুবে থাকেন। অকস্মাৎ বাতি আসতেই সামনে পর্দা... ছবি ভাসছে।

সুইচ অন করলাম কখন? মিস্টার এম. আলীর চোখ বিস্ময়ে হাঁ হয়ে যায়। পর্দায় তখন সুন্দরী নারীটিকে আলিঙ্গন করছে একজন ভিখিরির মতো যুবক। চকিতে সুইচ বন্ধ করে হাঁপাতে থাকনে এম. আলী। নিজে সুস্থ আছেন কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য হাতের পাল্‌সে চাপ প্রয়োগ করেন।

চন্দ্রলেখা তার সর্ব অস্তিত্ব, সর্বাঙ্গ দিয়ে স্পর্শ করে ইদ্রিসকে। বিকট গন্ধে সমস্ত কক্ষ ভ্যাপসা হয়ে উঠলেও চন্দ্রলেখা দমে যায় না। এ তার শেষ পরীক্ষা। এর মগজ চন্দ্রলেখার হস্তগত হলেই এলাকায় সব বিদ্রোহ শেষ।

প্রথমদিকের আকর্ষণেই অভাবনীয়ভাবে ইদ্রিসের হাত চন্দ্রলেখার খোঁপা স্পর্শ করে। যেন আদ্যোপান্ত চন্দ্রলেখাকে জেনেই এখানে তার আগমন। চন্দ্রলেখা ঝটিকায় হাত ছাড়িয়ে নির্নিমেষ চক্ষু দিয়ে ইদ্রিসকে বশে আনার চেষ্টা করে। কিন্তু ইদ্রিসের শক্ত হাত পুনরায় স্পর্শ করে সেই স্থান।

সঙ্গে সঙ্গে ঝড়—খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসে সাপ, চন্দ্রলেখার মুখ আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, পেন্ডুলামের মতো নড়তে থাকে চোখের পুঁতি, সেই ঝলসানো আলোয় মুহূর্তে তার হি-হি অট্টহাসি নদীর জলে তরঙ্গায়িত হতে থাকে।

কিন্তু এ কী! ইদ্রিসকে ছোবল দেয়ার পরও সে উঠে দাঁড়িয়েছে, তার গায়ে দ্বিগুণ শক্তি। চন্দ্রলেখাকে সে সজোরে আক্রমণ করে, কালনাগিনী, আমি সব প্রস্তুতি শেষ কইরাই আইছি। আমরা বিষ খাই, আবর্জনা খাই, তোর সাপের মুখের বিষ আমার কী করবোরে মাগি?

ত্রস্ত হাতে নিজেকে ছাড়িয়ে চন্দ্রলেখা পেছন হটতে থাকে। তার আলুলায়িত চুলে বাতাসের স্পন্দন। কপালের টিপ লেপটে গেছে। বিছানায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে গোখরা। সেটাকে বাঁ-হাতে পেঁচিয়ে এগোতে থাকে ইদ্রিস। চন্দ্রলেখা তার ভেতরের সমস্ত অনুভূতি চোখে সঞ্চারিত করে। সেই জাদু ছুঁড়ে দেয় ইদ্রিসের দিকে।

হা-হা হাসতে হাসতে ইদ্রিস এগিয়ে এলে ভয়ে চন্দ্রলেখার সমস্ত রক্ত জল হয়ে যায়। মরিয়া হয়ে সে প্রাসাদের কাঠ চেপে ধরে, তার অশরীরী অস্তিত্ব বাঁচার প্রত্যাশায় একশো বিশ বছরের অশথ বৃক্ষটিকে খুঁজতে থাকে।

ইদ্রিস চেপে ধরে চন্দ্রলেখাকে। তার চামড়ায় মরণ কামড় বসিয়ে চন্দ্রলেখা দ্রুত কাঠের সিঁড়ি ভাঙতে থাকে। তার খোঁপায় প্যাঁচানো তাবিজ খসে গেছে, তার থেকে হীরের টুকরোটি অকস্মাৎ নিচে গড়িয়ে পড়ে।

অর্ধবিবস্ত্র চন্দ্রলেখা ছুটতে ছুটতে গম্বুজের কাছে দাঁড়ালে ইদ্রিস তার আয়ত্তে আসা সাপটিকে ছুঁড়ে দেয় চন্দ্রলেখার দিকে।

প্রিয়তম সাপ চন্দ্রলেখার গলার কাছে ছোবল দিয়ে নেতিয়ে পড়ে কাঠের ছাদে। প্রিয়তম জল ফণা বিস্তার করে। কাঠের প্রাসাদে এক সময় ভাঙন ধরে। তার বৃহৎ টুকরোগুলো জলের স্পন্দন প্রতিহত করতে থাকলে অর্ধচেতন দেহ নিয়ে গহন নদীতে ঝাঁপ দেয় চন্দ্রলেখা।

ইদ্রিস যখন ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিয়েছে, তখন পেছন থেকে ধেয়ে আসতে থাকা উচ্চ সভাসদদের সশব্দ শক্তি সেই ঝাণ্ডাকে আড়াল করে দাঁড়ায়। তারা হাত নাড়ে, বাতাসের সাথে তাদের সম্মিলিত চিৎকার একাকার হয়ে যায়।

চন্দ্রলেখার প্রায়-বিবস্ত্র দেহকে এক সময় ঢেকে দিতে থাকে স্রোতস্বী জলের আব্রু।

স্বর্গলোকের ঘোড়া

'হে উত্তরীয় বায়ু, জাগো। হে দক্ষিণ বায়ু, আইসো। আমার উপবনে বহ, উপবনের বিবিধ সুগন্ধি প্রবাহিত হোক।' (পরমগীত, সোলেমান)

মিস্টার এম. আপনি তৃতীয়জন, যাকে আজ আমি ডানাওয়ালা বোরাকের গল্প বলছি। আমাদের বাড়ির পাশে একটা ছায়াঘেরা ঘরে একটা ছেলে ভাস্কর্য তৈরি করত। তখন আমি কোন ক্লাসে পড়ি? এই ধরুন ফোর কী ফাইভে? এই যে দেখুন, মানুষের সহজাত স্বভাবে আমি কাহিনীর শুরুতেই খানিকটা ভান করতে শুরু করেছি। কোন তারিখে একজন মায়ের সন্তান মারা যায়, নিজের মৃত্যুর আগ অব্দি কোনো মা সেই তারিখ স্মরণ করতে গিয়ে কিছুমাত্র ভাবিত হয়? অথবা গোয়েন্দা সংস্থার পুলিশ তার কোন ছেলেকে কত তারিখে বিনা অপরাধে ধরে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলে, সেই দিনটি স্মরণ করতে গিয়ে কোনো বাবা কি বলবে, এই ধরুন, একুশ কী বাইশ তারিখে?

অথবা অনেক আকাঙ্ক্ষার সুতো দিয়ে তৈরি রঙিন বলটি হাতে পাওয়ার পর এক স্বপ্ন বালকের হাত থেকে কোন ক্ষণে তা ছিটকে পড়ে নিঃসীম গহ্বরে, সেই ক্ষণটি স্মরণ করতে...?

পৃথিবীর প্রতিটি আত্মঅহঙ্কারী সংবেদনশীল মানুষের কাছে হয়তো তার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া গভীর প্রাণের মানুষের বিচ্ছেদের চেয়ে নিষ্ঠুর, চরম অপমানকর কোনো বিষয় অনেক তীব্র। আমি অনেক লেখককে বলতে শুনেছি, জীবনের শেষ প্রান্তে গিয়েও তার জীবনের সবচাইতে গূঢ় বেদনার অপমানের বিষয়টিকে তিনি কলমে ধারণ করতে পারেন নি।

একজন লেখকের বাবাকে তার সামনেই কিছু যুবক কুপিয়ে খণ্ড বিখণ্ড করে হত্যা করেছিল। সারাজীবন লেখক তার কোনো লেখাতেই সেই বিষয়টার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারেন নি।

বুঝলেন, জীবনে আমি প্রচুর মানুষের সাথে মিশেছি। আমার জীবনের একাধিক ঘটনা অনেক মানুষকে বলেছি। খুব সচেতনভাবে হিসেব করে যে বলা হয়েছে তা নয়। অনেক ক্ষেত্রেই জানেন, এমন হয়েছে কাকতালীয়ভাবে এক বেলার পরিচয়েই আমি কাউকে আমার এমন নিভৃত গোপন কাহিনী জানিয়েছি, যা অনেক বছর কারো সাথে চলেও বলার কথা ভেবে উঠতে পারি নি। অনেক ক্ষেত্রেই সাবধানতা কী জিনিস, আমি বুঝি না... আপনার কী আজকে প্রচুর সময় আছে? মূল গল্পটি করার আগে আমার নিজেকে স্থির করার জন্য আরো অনেক কথা বলতে হবে...।

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ।

বিশাল অফিস রুম। টেবিলে রাখা অপূর্ব কাচ-পাথরের পেপারওয়েট থেকে ধেয়ে ওঠা আলোছায়ার ঝিল্লি মিস্টার এম.-এর চশমার ওপর পড়ে মুখটাকে কারুকার্যময় করে তুলেছে। তিনি সন্তর্পণে ঘড়ি দেখেন, এবং বলেন, সময় আছে।

আমার জ্বলে উঠতে থাকা হারিকেনের সলতেটাকে কেরোসিনের মধ্যে বসে মরতে থাকা কোনো পোকা দাঁত দিয়ে টানতে টানতে একবারে নিভিয়ে ফেলে। তিনি আমাকে ডেকেছেন। আমার সম্পর্কে জানার দুর্মর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। বলেছেন, বাৎসরিক কনফারেন্স গতকাল শেষ হওয়ায় আজকে তিনি অফিসে ফ্রি। আমি তো ভদ্রতা করে

বলতেই পারি, আপনার কি প্রচুর সময় আছে ? সাথে সাথে ঘড়ি দেখে তাঁর সময় সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসতে হলো কেন ? তিনি কি কাট কাট কথায় আমার জীবনের দুর্বল অধ্যায়গুলো জানার প্রস্তুতি নিয়ে বসেছিলেন ?

[আমি আমার এই লেখায় কারো সত্যিকার নাম উচ্চারণ করব না। সবার ক্ষেত্রেই অন্য নাম ব্যবহার করব, কেননা যে চরিত্রগুলোকে নিয়ে আমার এই কাহিনীর বিস্তার তাদের প্রত্যেককেই আমি কথা দিয়েছি তাদের সম্পর্কে আমি যদি কাউকে কিছু বলি, যেন তাদের যথার্থ নাম না বলি। ফলে, মনে মনে আমি যদি তাদের নিয়ে কিছু ভাবিও, আমার নিজের জগতে তৈরি করে ফেলা সেই নাম নিয়েই তাদের সম্পর্কে ভাবি। আমার চেতন অবচেতনের পৃথিবীতে সেই নাম ছাড়া তাদের রূপ নেই। যদিও আমি আজ যার অফিসে এসেছি, তিনি নাম সম্পর্কে তেমন কোনো দায় আমার ওপর চাপান নি। তবুও, তিনি কিছু বলার আগেই, আমি তাঁকে আশ্বস্ত করতে পছন্দ করছি।]

দেখুন মিস্টার এম, আজ মনে হয় অনেক কথা শোনার মতোন মানসিক অবস্থা আপনার নেই। আমি বরং আরেকদিন আসি।

সে-কী! তিনি প্রায় দাঁড়িয়ে পড়েন। আমিই তো বললাম, সময় আছে, আমার প্রকাশের আন্তরিকতায় কি কোনো ভুল খুঁজে পেয়েছেন ?

না, না, তা-কেন ? ফের গদি আঁটা চেয়ারে বসি। চোখটা যে কেন কাচ-পাথরের ঝিল্লিটাকেই ভেদ করতে চাইছে ? আমি নিঃশব্দে বলি, এক গ্লাস পানি!

বেল টেপেন তিনি। যেন কোনো কক্ষ নয়, চারপাশে দেয়াল নয়, কোনো নির্জন ছোট গাছপালা ঘেরা মনুষ্যহীন দ্বীপে আমরা এতক্ষণ বসেছিলাম। যেখানেই যাই কোটি কোটি মানুষের চিৎকার মগজটাকে তপ্ত করে রাখে। এই কক্ষে আসার পর এই মানুষটির নিভৃত আশ্বাসে এসে মাথাটা এমনই ছায়াচ্ছন্ন ছিল, পিওনটা দরজা খুলতেই নিজের আহাম্মকির জন্য রাগ হতে থাকে। যেন অহেতুক পানি চেয়ে একটা পরিবেশের ধ্যান ভেঙে দিলাম। পিওনটি চলে গেলে, কাচ গ্লাসে নখ দিয়ে আঁচড় কাটি। আসলে কণ্ঠ ফুঁড়ে 'পানি' আসতোই না, তিনি যদি ঘড়ি না দেখতেন। মনে মনে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছি, আজ সেই ভাস্কর ছেলেটিকে কেন্দ্র করে আমার বোরাকের ঘোড়ার যে মূল গল্পটি, সেইটি করব না। বরং সেই গল্পটিকে কেন্দ্র করে আমার আর যা যা গল্প, আজ সেই পথেই খানিকটা হাঁটব।

মিস্টার এম. বাহ্যত অস্থির চরিত্রের, আমি বই বাজারে, গ্যাটে ইনস্টিটিউটে দেখেছি, সারাক্ষণ হা হা করে পরিবেশ মাতিয়ে রাখছেন। কিন্তু কথা শোনার সময় এমন চুপ থাকেন, মুখের দিকে না তাকালে বোঝা যায় না— আদৌ তিনি সামনে আছেন কি-না। মানুষতো কথা শোনার সময় 'হু হা' এসব অন্তত বলে। তিনি মনে হয় রীতিমতো নিঃশ্বাস আটকে থাকেন।

আপনার অফিসে কোনো অসুবিধে নেই তো ?

আমার এই প্রশ্নে ফাইলপত্তর পাশে সরিয়ে রেখে তিনি বলেন, নেই। আমার অফিসে সবাই আমাকে জানে!

এইবার শীত শীত করছে। 'অফিসে সবাই আমাকে জানে'— এর বহু অর্থ হয়। মানে— মহিলা বিষয়ে তিনি অহেতুক অনাগ্রহী, অর্থহীন কাজে তিনি কোনো মহিলাকে অনেকক্ষণ সময় দেন না। অথবা, এই ভালো চরিত্রের ম্যানেজারটি কোনো ভালো চরিত্রের

মহিলা ছাড়া কথা বলেন না। জানালাগুলো নীল গ্লাসে মোড়ানো। মনে হয় জলের বদলে এইবার তার কাছে একটু বাইরের বাতাস চাই।

যেন গ্রীষ্মে এসে পৌষ মাসে বসেছি। বাইরের রিকশায় যে চামড়াগুলোর রোমকূপগুলো পুড়ে যাচ্ছিল, সেগুলোই এখন শীতে কুঁকড়ে গুটিগুটি হয়ে উঠেছে। আমি এই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শীতের ঘোরে, যে শীত বাইরের সূর্যের দোর্দণ্ড প্রতাপকে কাঁচকলা দেখাচ্ছে— কথার সূত্র খুঁজে পাই না, কোত্থেকে ফের শুরু করা যায়!

বলুন! পিওন পানি দিয়ে চলে গেলে তিনি সাগ্রহে আমার দিকে তাকান।

কী বলব ? এইবার শিশুর সারল্যে হেসে ফেলি।

মিস্টার এম. শীতাতপ কক্ষেও সিগ্রেট জ্বালিয়ে বলেন, আপনি যা যা বলতে চান।

এইবার প্রাণের মধ্যে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে থাকে। ভাগ্যিস চট করে বলে উঠেন নি, কেন ? বোরাকের গল্প ?

তাহলে এই লোককে এই কাহিনী জীবনে বলা হয়ে উঠত না। আর আমিই বা জনে জনে এই গল্প বলার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছি কেন ? এর মধ্যে এমন কী চটক আছে যে কেউ শুনে রোমাঞ্চিত হবে ? অথবা এমন কী গভীর বেদনা আছে, যা ঢেলে ঢেলে প্রতিনিয়ত আমি নির্ভার হতে চাইছি ? কঠিন যন্ত্রণা আর স্বপ্ন চুরচুর হওয়া অপমানের এক বেলাকার শৈশব, যা আমি বছর বছর বয়ে বেড়িয়েছি, তার আগল কেন আমি খুলে দিয়েছিলাম, আমার জীবনে আসা প্রথম যুবকের কাছে ?

অনেক বছরে সে ছাড়াও অনেক পরিচয় হয়েছে, ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। কেন যেন আমার মনে হতো আমার হৃদয়ের যে তন্ত্রীটায় কোনো পুরুষের আঙুল খেলে যেতে পারে, তার মধ্যে দিনের পর দিন জমেছে অযুত নিযুত লক্ষ কুয়াশার স্তূপ। ওরা আমার বন্ধুই হতো, প্রেমিক হতো না।

আমি অস্ফুট কণ্ঠে মিস্টার এম.-কে বলি, ধরুন, ওর নাম অতীন। রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়'-এর অন্তু। ...আমার জীবনের প্রথম পুরুষ, যে শব্দহীন ফুঁয়ে বুকের কুয়াশা সরাতে জানে, জানেন, ওর সাথে পরিচয়ের দিনটা স্পষ্ট মনে আছে আমার, আমি চারুকলায় দাঁড়িয়ে জয়নুলের ভাস্কর্য দেখছিলাম... একদম বিমূর্ত কোনো ভাস্কর্য নয়, তবে এমন কেন, যার মধ্যে জয়নুলকে চেনা যায় না ?

খুব অবাক বিষয় কী জানেন, পাথর এবং জল আমাকে সমান ভাবে টানে। আমি কেবল পাথর আর জলের সামনে পড়লেই নিজের সত্তা থেকে বেরিয়ে এমন চুড়োয় উঠতে থাকি, যেখান থেকে আর বাস্তবকে স্পর্শ করা যায় না, আর এমন তরল গহনে তলাতে থাকি যেখান থেকে হাত বাড়ালে কেবল আকাশের মেঘপুঞ্জ স্পর্শ করা যায়, জলের ওপরকার উষ্ণ পৃথিবীকে নয়।

আমার স্বভাবই এই, কথা বলতে গিয়ে কথার চারপাশে ঘুরি। কিন্তু কাউকে ক্লান্ত করি না এটা ঠিক, কেননা আমি সবার সাথে কথা বলি না। আমি যদি টের পাই কেউ আমার অস্তিত্বের কোনো নাজুক অংশকে সন্তর্পণে স্পর্শ করে ফেলেছে, তখনই তার কাছে আমি নিজেকে খুলতে পারি। আপনি শুনলে অবাক হবেন, আপনার বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার আগে আমি সেই যুবক, যার নাম অতীন এবং একটি মেয়ে, যে দীর্ঘদিন আমার বান্ধবী ছিল, এই

দু'জনকে ছাড়া কাউকে আমার জীবনের এই সাংঘাতিক অধ্যায়টি বলি নি।

মিস্টার এম. অর্ধেক সিগ্রেট অ্যাসট্রেতে গুঁজে থিতু হয়ে বসতে চাইলে তাঁর চেয়ার ঘুরে যায়।

সরি... স্বভাবজাত ছটফটতায় তিনি দাঁড়িয়ে ফের বসে আঙুল ঠুকতে থাকেন টেবিলে, তারপর ?

ওইযে জয়নুলের মূর্তি, এক হাতে ইয়া মোটকা তুলির ডাটা, আরেক হাতের মোটা থালার ওপর মিছিমিছি রঙের কৌটো... কোথায় গিয়ে জয়নুলকে না পেয়ে ভেতরে বেদনা হচ্ছিল, আমি ছেলেবেলায় দেখেছি একজন নিপুণ ছোকড়ার হাতে কত বিচিত্র যে হতে পারে পাথরের রূপ... এই বিষয়টা যখন ভাবছি আর চোখ বুজে ছেলেটিকে স্মরণ করতে চাইছি তখন অতীন আমার পাশে এসে দাঁড়াল। আশ্চর্য! সে-ও একই কথা বলল, এত বড় একটা চারুকলা, এত গাছপালা, জানেন কোথাও জয়নুলকে খুঁজে পাচ্ছি না।

আমি ঝট করে তাকালাম।

স্থির ঠাণ্ডা চোখ তার। আমাকে দেখছে না। সে দেখছে মূর্তিটিকে।

পাথরের মুখোমুখি আরেক পাথর। ছেলেবেলায় এই বিভ্রম ঘটত, সেই ছেনি দিয়ে পাথর কাটতে থাকা ছেলেটা নিজের কাজে এতই স্থির নিমগ্ন থাকত, আমি কুটিকুটি পায়ে যতবার ওর জানালার ফোঁকড়ে চোখ রেখেছি, বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার এক সময় ততবারই মনে হয়েছে পাথরে তৈরি হতে থাকা বস্তুটি বুঝিবা ছেলেটিকে নির্মাণ করছে। উজ্জ্বল রোদের নিচে, সরু ঘন রাস্তায়, জনারণ্যেও ছেলেটিকে দেখলে আমার বুক হিম হিম করত। মনে হতো ও মানুষ নয়, মানুষের ছদ্মবেশে কোনো ভাস্কর্য হাঁটছে।

বহু বহু কাল পর এই ভাস্কর্যের সামনে দাঁড়িয়ে এই মানুষটাকে দেখে আমার অমন মনে হলো কেন, মানে কেন মনে হলো ইনি মানুষ নন, কোনো এক মূর্তি... পাথর... মানে অসম্ভব পজিটিভ অর্থেই আমি পাথরকে মিন করছি, যেহেতু এইসব ভাস্কর্যের পাথরকে আমার মনে হয় মানুষের চাইতেও তীব্র, রহস্যময়... বিশ্বাস করুন আপনাকে বোঝাতে পারব না।

আমি থেমে গেলে মিস্টার এম. একটি জরুরি ফোন রিসিভ করে কিঞ্চিৎ বিচলিত বোধ করেন। অফিসের অভ্যন্তরীণ ফোন। বাইরের কল তিনি বন্ধ রেখেছিলেন। তাঁকে বেশ বিপন্ন দেখায়। শ্বাসরুদ্ধকর কণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করেন, তারপর ?

আমি এইবার যথার্থই দাঁড়াই, মনে হচ্ছে আপনার অফিসে কোনো সমস্যা হয়েছে, মিস্টার এম., আমি ভীষণ কৃতজ্ঞ আপনার কাছে, আপনি নিজেকে এই মুহূর্তেও চেপে রেখে আমার কথা শুনতে চাইলেন, আমি আপনাকে বোঝাতে পারব না, আজ আপনি কতটা সম্মান আমাকে দিলেন। আমি এরপর দিন, ঠিক এই জায়গা থেকে আমার কাহিনী শুরু করব। আমার কথার তন্ত্রী আজ আপনার আন্তরিকতার কারণেই একটুও ছিঁড়ে যায় নি।

অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

শেষ পর্যন্ত যা মিস্টার এম.-কে বোরাকের কাহিনী বাদেও আর বলা হয়ে ওঠে নি, সে এক ভয়ানক কল্পজগতের কথা। আমি পাথর আর জলের কাছে গেলে কল্পলোকে বিচরণ করি। কিন্তু আমার নিজস্ব অনুভবে, চেতনায়, চর্চায় এ বাস্তব। আমি পাথরের সামনে দাঁড়িয়ে ক্রমে ক্রমে যখন হিমালয় স্পর্শ করি, এবং সেখানকার জগত নিয়ে আমার ভেতর একটা প্রেক্ষিত তৈরি হয়, ঘটনা তৈরি হয়, এ আমার কিছুতেই কল্পনার বিষয় নয়। আমি তাতে ভয়ানকভাবে জাগতিক উপস্থিত হই। মানুষ যখন ভাবনার মধ্যে দিয়ে পথ হাঁটে, কত কিছুই তো সে ভাবে, তার পাশে বসে থাকা লোকটিও কি সেই ভাবনার শব্দ শুনতে পায়? সেই ভাবনা কি শুধুই তার জাগতিক জীবনকে কেন্দ্রীভূত করে আবর্তিত হয়? কিন্তু তার ভাবনাটা তার কাছে, বাস্তব, সত্য, তা শত অলৌকিকতায় পূর্ণ হলেও। কেউ নিজেই এই অলৌকিকতাকে নিছক ভাবনা বলে উড়িয়ে দিতে পারে, বেশির ভাগ লোকই তাই করে, আমি সেই দলের নই।

সেদিন চারুকলায় শীতকাল।

বিকেলের বাতাসে নিঃসীম রৌদ্রের ধ্বনি। আমি একবার সেই পুরুষকে, একবার অচেনা জয়নুলকে দেখতে দেখতে হাঁটি। কত যে হাঁটি... সেই প্রাচীনকালের মানুষদের মতো, যারা হাজার রাত হাজার দিন পায়ে হেঁটে হাজার পথ পাড়ি দিত।

দূরবর্তী চুড়োপাহাড়ে পা রেখে তালের শাঁসের মতো ঝকঝকে ভোরে ঠিরঠির শীতে ফলশা পাতার মতো কাঁপতে থাকি। ওপরে পৃথিবীর মতো বিশাল আসমান। সামনে হিমালয়ের দুই স্তনের ভাঁজ গলিয়ে টকটকে শাদা সূর্যটা উঠবে, তারই মৃদু মৃদু আভায় ওপরের মেঘপুঞ্জে ছুটোছুটি লেগেছে। হায়! এত বড় পাহাড়ের চুড়োয় আমি একা, প্রকাণ্ড বরফ স্তূপের ওপর দিয়ে ঘাই দিয়ে উঠতে থাকা সূর্যটাকে আমি কী করে একা সামলাই! তার রূপের ঝাপটে ধাক্কা খেয়ে আমি পাহাড়ের ঘাসে মাটিতে ঠোক্কর খেয়ে খেয়ে যদি পাতালে তলিয়ে যাই? নিজেকে খামচে এই মহা পৃথিবীর অপার রহস্যের সূত্র কোথায় এই খুঁজছি আর দেখছি, সূর্যের মাড়ি দাঁত উঁকি দিল দিল, কাণ্ডটা এখানে থেমে থাকলে কথা ছিল, কে বলেছিল— ঈশ্বরকে নৈঃসঙ্গের মধ্যে পাওয়া যায়, আর উপভোগ করা যায় যৌথতার মধ্যে। নিজের মধ্যে তন্ন তন্ন খুঁজে মনে পড়ে ব্রহ্মপুত্রের ওপর সার সার পাখির বিস্তার দেখে আমারই মধ্যে এই বোধ জন্মেছিল। আমি যখন মহাশক্তির অপার সৌন্দর্যে কম্পিত, বিস্মিত, ভীত... তখনই অপরপাশে চোখ পড়ে। কেন কাঞ্চনজঙ্ঘা ঠিক সূর্যোদয়ের বিপরীতেই তার স্থান করে নিয়েছে? যখন সূর্যের টিপটিপ চোখ বাড়াচ্ছে তখন সে নিজে যত না সুন্দর তার চেয়েও অকল্পনীয় রূপ রস বহু বর্ণে অপার্থিব করে তুলছে অপর পার্শ্বের হিমালয়ের চুড়োর বরফখণ্ডের সারি সারি হাঁস বলাকাকে। সেই বরফ স্তূপকে আমার মনে হচ্ছে, এক্ষণি সৌন্দর্যের চাপে অস্থির হয়ে আকাশপথে উড়াল দেবে। আমি দেখি বিকটাকার ফালি ফালি তরমুজ তার রক্ত দিয়ে নিজেকে নয়, অপর পার্শ্বের কাঞ্চনজঙ্ঘাকে এমন অপূর্ব আলোয় উদ্ভাসিত করেছে, মেঘপুঞ্জগুলো এমন মুক্তোর মালায় ছুটতে শুরু করেছে, বেঁচে আছি কী মরে গেছি, ঠাহর করতে পারি না।

আপনি হয় সূর্যোদয় দেখুন, নয় কাঞ্চনজঙ্ঘা, বলতে বলতে আমার পাশে এসে দাঁড়ায় জয়নুলের সামনে দাঁড়ানো অতীন। আপনি সূর্যোদয় দেখছেন, সাথে সাথে মাথা ঘুরে যাচ্ছে আপনার অপর পাশের কাঞ্চনজঙ্ঘায়... একই সাথে নৈঃসঙ্গ... এবং যৌথতা উপভোগ করার এই আকুল চেষ্টা কেন করছেন বলুন তো?

আমি হতচকিত, ওর দিকে তাকাই।

যেহেতু সে সূর্যোদয় দেখতে দেখতে কথা বলছে, কাঞ্চনজঙ্ঘার লোভ সামলে আমিও সেই খেয়ে উঠতে থাকা রক্তকণিকার দিকে চেয়ে থাকি।

অতীন বলে, আপনি একটা বিষয় লক্ষ করেছেন কি-না জানি না, বহু লোকই খুব ঘটা করে প্রকৃতি দেখতে আসে, কিন্তু হাতে একদমই সময় নিয়ে আসে না। একটা জায়গায় এসে হুড়োহুড়ি করে তারা সেই জায়গাটার সবগুলো স্থান দেখে ফেলতে চায়। আমাকে যেটা সব চাইতে বিরক্ত করে, তারা ক্যামেরা নিয়ে আসে, এবং সেই জায়গাটা দেখার লোভকে পায়ে মাড়িয়ে সেখানে নিজেদের ছবি তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আমি বলছি না, তারা ছবি তুলবে না, মানুষই স্মৃতির মধ্যে তার দেখা সেরা জায়গাগুলো সঞ্চিত রাখতে চায়। কিন্তু ধরুন, আপনি হাতে কিছু সময় নিয়ে এলেই কিন্তু আপনার ভ্রমণের সমস্ত প্রাপ্তি নিয়ে ফিরে যেতে পারেন... এত অপূর্ব আলোকচ্ছটায় সূর্য উঠছে, আর আমি কথা বলে আপনার উপভোগ মাটি করছি, বুঝলেন, আমি যদি দেখতাম, আপনি হয় সূর্যোদয় নয় কাঞ্চনজঙ্ঘা দুটোর একটির মধ্যে গভীর ধ্যানে গেঁথে গেছেন, তবে আমার কথার সাধ্য ছিল না, আপনার কানে প্রবেশ করার। আমি বেশ ক'দিন এখানে এসেছি... বলা যায় তিন চার বার। ছবি তোলা তো পরের কথা, আমি রীতিমতো বাকরুদ্ধ হয়ে থেকেছি। একদিন আমার পেছনে একজন সূর্যটাকে দেখে এমন লাফ দিল, যেন সে খপ্ করে ওটাকে মুঠোয় ভরে ফেলবে। আমি রীতিমতো ছিটকে পাহাড়ের একপ্রান্তে পড়েও ঠাহর করতে পারি নি, আমি আদৌ ছিটকে পড়েছি, এমনই সূর্যধ্যান আমাকে পেয়ে বসেছিল... বুঝলেন, আজ আপনার প্রকৃতি দর্শনের বারোটা বাজিয়ে দিলাম, আপনি কাল আবার এসে নতুন করে শুরু করুন। আপনার চোখে আমি প্রকৃতির ধ্যান দেখতে পেয়েছি, আপনি কেন অন্যদের মতো আচরণ করবেন ? ওফ্ আপনার নামই তো জানা হলো না।

নন্দিনী!

বাহ্, অদ্ভুত ছন্দময় নাম তো! আমি স্বপ্নের মধ্যে যে নারীকে দেখি, তার নাম নন্দিনী।

সূর্যটা প্রসারিত হতে হতে মায়ের জঠর থেকে ছিটকে হলুদ বিচ্ছুরিত আলোয় তার সনাতনী চেহারায় রূপ নিয়েছে। এরকম একটা বর্ণচ্ছটা আয়োজন কথা বলে বলে কেউ ভেস্তে দিতে থাকলে আমি তার প্রতি রীতিমতো হিংস্র হয়ে উঠতাম। কিন্তু ওতো অতীন, যাকে দেখামাত্র মনে হয়েছে পৃথিবীর সব প্রকৃতির সৌন্দর্য ও নিজের মধ্যে ধারণ করে রেখেছে। ওর উপস্থিতি, সান্নিধ্য, ওর কথা আমাকে এমন আকুল করে রেখেছে, যেন আমি একই সাথে আমার এবং ওর চোখ দিয়ে সূর্যোদয়টা দেখলাম।

বুঝলেন নন্দিনী, আজ ক্যামেরাটা নিয়ে এলে ভালো হতো। আমার আর আসা হবে না। কোনো অপার্থিব সুন্দর জায়গাকে তিনদিনের বেশি দেখতে নেই, তাতে দেখার ঘোরটা নষ্ট হয়ে যায়, আমি একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলেছি, পরপর পাঁচদিন এখানে এসেছি।

আমাকে পেছন থেকে টান দিয়ে চারুকলার গোল চত্বরে নিয়ে বসায় কেউ। আমি তাকে ঝাপসা দেখছি। ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হয় ওড়না, মুখ, কপালের কালো টিপ। এই সেই মেয়ে, যাকে আমি বোরাকের ঘোড়ার গল্প বলেছিলাম। ওর সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল রমনার লেকে, ওর নাম সুশোভনা। ওর গল্পও আমি সেদিন মিস্টার এম.-এর কাছে করতে চেয়েছিলাম।

সুশোভনা অবাক স্বরে বলে, অত কী খুঁজছিলে জয়নুলের মধ্যে? আমাকে তোমার মনেই পড়ল না?

আমি তখন ধড়ফর করে নিজের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছি। বকুল তলার প্রোগ্রামে সুশোভনাকে আমিই আসতে বলে দিয়েছিলাম। কিন্তু আমার পাশে দাঁড়ানো অতীন ছিটকে আমাকে কোথায় কোথায় যে নিয়ে ফেলেছিল! আমার বুকের ভেতরটায় হিমহিম রক্ত বইতে থাকে। অচেতনের ঘোরে পড়ে অতীনকে কি আমি হারিয়ে ফেলেছি?

সুশোভনাকে ফেলে ছুটতে থাকি।

ঠিক গেটের কাছটায় গিয়ে দেখা হয়, যেন কতকালের চেনা, এই ভঙ্গিতে প্রশ্ন করি, আমাকে ফেলে যে চলে যাচ্ছিলেন বড়!

সে-ও বড় বেশি পরিচিতের আন্তরিক হাসি হাসে, আপনি ওই ভাস্কর্যের সামনে দাঁড়িয়ে যেভাবে আমাকে ভুলেছিলেন, জয়নুলকে আমার ঈর্ষা হচ্ছিল!

না, না জয়নুল নয়, আমি খেই হারাতে থাকি, আসলে যে-কোনো ভাস্কর্য আর মূর্তি আমাকে যে কী করে! মোটেও ওর মধ্যে জয়নুল ছিলেন না, আশ্চর্য! আপনি চলেই যাচ্ছিলেন! আমাদের আর দেখাই হতো না।

হতো! বলে মানুষের রঙিন হট্টগোল থেকে চোখ সরিয়ে অতীন আমার দিকে তাকায়। যা কিছুকে আমি আমার বলে বোধ করি তাকে কোনো ফর্মের মধ্যে বাঁধতে চাই না, সে ক্ষণিক পরিচয়ের কেউ হলেও! আপনি কে, কোথায় আপনার বাস, কিচ্ছু না জানলেও ঠিক এই শহরে একদিন আমাদের দেখা হতো... আমি এরকম ছেড়ে দেয়া স্বভাবে বাঁচতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। এবং ঘটেও তা-ই, আমি আমার সবচাইতে প্রিয় গ্রন্থটি পড়ে শেষ করে ট্রেনের বেঞ্চে রেখে নিচে নেমে এসেছিলাম। ইচ্ছে করলেই আবার উঠে আমি বইটি নিয়ে আসতে পারতাম। বইটিতে আমার মৃত বাবার স্বাক্ষর ছিল। আমি আর ফিরে যাই নি। ঠিক এক বছর পর বইমেলার ফুটপাতে আমি সেই বই পেয়ে দশ টাকায় কিনে নিয়েছিলাম... উফ! এত ভিড়! চলুন অন্য কোথাও গিয়ে বসি!

মিস্টার এম., অতীনের শৈশব সম্পর্কে কিছুই বলতে পারব না আমি, কেননা আমরা দিনের পর দিন আমাদের বোধ নিয়ে, অনুভব নিয়ে, শিল্প নিয়ে কথা বলেছি। কখনই সে নিজের শৈশব নিয়ে কথা বলত না, অথবা আমার জাগতিক জীবন সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করত না।

আপনি শুনলে অবাক হবেন, দীর্ঘ এক বছরের কথোপকথনে আমি ওর মৃত বাবা সম্পর্কে বা ওই গ্রন্থটিকে কেন্দ্র করে একটি লাইন বলা ছাড়া আর কিছু শুনি নি।

চিনে রেস্তোরাঁ।

লাল নীল আলোর চকমকি খেলা। এর মধ্যে মিষ্টার এম.-এর মুখ কখনো বিমূর্ত, কখনো স্পষ্ট। ওঁর সাথে কথা বলার মধ্যে গভীর সংকট এবং গভীর আনন্দ দুটোই আছে। যেহেতু তিনি একেবারেই নিঃশব্দে কথা শোনেন, স্থির মুখের ভাঁজ তরঙ্গ দেখে ঠাহর করা যায় না, কোন বিষয়টাকে তিনি কীভাবে গ্রহণ করছেন। কিন্তু নিঃশব্দ হলেও তিনি কথা শোনার ক্ষেত্রে খুবই মনোযোগী। সেই জন্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে মাঠের পর মাঠ কথা বলে যাওয়ার একটা দুর্মর আনন্দ নিজের মধ্যে কাজ করে।

আমি থেমে গেলে তিনি প্রশ্ন করেন, তাহলে অতীনের আগেই আপনার সুশোভনার সাথে পরিচয় হয়েছিল।

হ্যাঁ।

তার মানে আপনি আপনার জীবনের সেই বিশেষ অধ্যায়টি সুশোভনার সাথে বন্ধুত্ব হওয়ার পরও আগে তাকে বলেন নি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই, আসলে আমি সুশোভনার সাথে ঘনিষ্ঠতা হওয়ার পরও বোধ করি নি, ঠিক এই বিষয়টি নিয়ে কারোর সামনে দাঁড়াতে পারব। বলা যায় অতীন আমার সবকিছুর প্রথম বাঁধ ভেঙে দেয়। যে-কারোর বেদনার ক্ষেত্রে ও ছিল খুব স্পর্শকাতর। ওর চরিত্রের এই দিকটা আমাকে এক সময় এমন করে তোলে, আমার মনে হয়, একমাত্র ওর সামনেই যদি আমি আমার ভয়ঙ্কর জংধরা বাক্সের তালাটা খুলে দিই তবে হুহু বাতাসে আমার দমবন্ধকর ওই বিষয়টা সুদূর থেকে সুদূরে মিলিয়ে যাবে। যীশু সম্পর্কে একটা গ্রন্থে পড়েছিলাম, মানুষকে মোহগ্রস্ত করার এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তাঁর, তিনি স্পর্শ করা মাত্র অসুস্থ যে-কোনো রোগী সুস্থ হয়ে উঠত, এর মধ্যে কোনো অলৌকিকতা ছিল না। যে-কোনো রোগীই গভীরভাবে বোধ করত যীশু স্পর্শ করলে সে ভালো হয়ে উঠবে, সেই মনের জোরেই রোগীরা তার সামনে গিয়ে তাঁর হাতের স্পর্শ মাত্র সুস্থ বোধ করতেন। অতীনকেও আমার সেই মুহূর্তে সোডিয়াম বাতির নিচের আধো আলো ছায়ায় তেমন বোধ হয়েছিল। আমাদের বাঁ পাশে গাছপালা ঘেরা উদ্যানে, ডানদিকে বেশ কয়েকটি চটপটির দোকান, আমরা সন্তর্পণে নিজেদের বাঁচিয়ে একটা বেঞ্চে বসেছিলাম। আমাদের হাতে ছিল ফুচকার প্লেট।

আমরা ফুচকা খাচ্ছিলাম না। আপনি কি অধৈর্য বোধ করছেন মিস্টার এম., একটা ঘোড়ার অধ্যায়ের মুলো আপনার মুখের সামনে ঝুলিয়ে আমি যত্তোসব অহেতুক গল্প করছি?

মিস্টার এম. স্যুপের চামচে চুমুক দিয়ে ন্যাপকিনে দিয়ে হাত মোছেন... শুনুন, আপনি বিশেষ একটি গল্প আমার সাথে করতে চাইলেও আমি ঠিক ওই গল্পটা শোনার জন্যই অধীর হয়ে অপেক্ষা করছি— এটা ভাবলে আমাকে আপনার ভুল বোঝা হবে। আপনি যা যা বলছেন আমার কাছে সেইসব কথার গুরুত্বও কম নয়। আমার মনেই হচ্ছে অন্য অনেক কাহিনীর শ্যাওলা ভেতর থেকে না সরালে আপনি সেই বিশেষ অধ্যায়টায় আসতে পারবেন না। এ ছাড়াও আমি অতীন এবং সুশোভনার সম্পর্কে শোনার জন্যও আগ্রহ বোধ করছি।

অজস্র ধন্যবাদ আপনাকে... আমি যেন নিঃশ্বাস টেনে বাঁচি। এই বিশেষ অধ্যায়টি যাকে বলব বলে হটকারী ভাবেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আপনার নির্বাচন ভুল হয় নি, তিনি যেন এই কথায় তারই প্রমাণ দিলেন, আমি বলি, যীশু সম্পর্কেও প্রথম আমি অতীনের কাছ থেকেই অন্যরকম কাহিনী শুনি। ধর্মীয় গ্রন্থ বাদ দিয়ে আমরা অন্যগ্রন্থে যীশুর জন্মকাল থেকে শুরু করে পুরো তিরিশ বছর তার সম্পর্কে কিছু জানতে পাই না। যীশুর কোনো জাগতিক পিতা ছিল না, এটাও ঠিক নয়। দার্শনিক লুকের কথায় আমরা জানতে পাই, যীশুর বাবা জোসেফ যীশুর বাল্যকালে মারা যান, কমপক্ষে তার চার ভাইবোন ছিল, আর তার পরিবার কাঠের ব্যবসা করত। আর আপনি 'ঈশ্বর পুত্র' 'ঈশ্বর পুত্র' বলে তার শিষ্যরা যে বুলি আওড়াতো, তা তাঁকে সৃষ্টিকর্তার পুত্র মনে করে করত না। 'ঈশ্বর পুত্র' তখন ছিল সম্মানসূচক রাজকীয় পদবী মাত্র। দুর্দান্ত প্রবন্ধ লেখার হাত অতীনের। ওর প্রবন্ধ

কাব্যিকতাদোষে দুষ্ট ছিল। কবিতার গভীর অনুরাগী অতীন পঠন পাঠনের বিষয়ে ছিল সর্বভুক। ওর প্রবন্ধকে কাব্যিক বলে বেশির ভাগ সমালোচক উড়িয়ে দিলেও ওর কলমের শক্তিকে সবাই সমীহ করত।

মিস্টার এম.-এর মুখে কি একটু ছায়া পড়ল? আমি থেমে গিয়ে গভীর মনোযোগে পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করি। তিনি আমার বিষয়ে আগ্রহী। কোন আগ্রহী পুরুষ অন্য কোনো পুরুষ সম্পর্কে বাড়াবাড়ি মুখরতা পছন্দ করবে? আমি যেন কেমন আটকে যাই। কিন্তু পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিক জট লেগে গেলে সেটা সরাতে মিস্টার এম.-এর জুড়ি নেই। আগেই বলেছি নিজেকে আশ্চর্য প্রতিক্রিয়াহীনভাবে তিনি তৈরি করেছেন। ফলে আমার সূক্ষ্ম চোখে চট করে দেখে ফেলা ছায়াটা সরাতে তিনি মুহূর্ত মাত্র সময় নেন না।

তিনি বলেন, আপনারা কি প্রচুর সময় গল্প করার সুযোগ পেয়েছেন?

আমি নত মুখে বলি, না। আপনি হঠাৎ এই প্রশ্ন করছেন কেন?

মিস্টার এম. হেসে বলেন, কোথায় জানি ওর গল্প করার সময় আপনার মধ্যে ওকে যথেষ্ট না পাওয়ার একটা হাহাকার পাওয়া যায়। কিছু মনে করবেন না, আমি হয়তো আপনার স্বতঃস্ফূর্ততায় ব্যাঘাত ঘটাচ্ছি, আপনি আপনার সব গল্প ওর সাথে করে ভারমুক্ত হলে হয়তো আমার সাথে করার মতো কোনো গল্পই আপনার থাকত না।

স্যুপ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

আশেপাশে ছায়া মানুষ আর শাদা ওয়েটারদের হাঁটাহাঁটি। আমি স্থির স্বরে বলি, আপনি ঠিক কি ভুল বলেছেন সেটা আমি আর বলব না। অন্তত যৌক্তিকভাবে এই মুহূর্তে আপনার মুখোমুখি হয়ে বলছি, এমনও তো হতে পারে, একজনের সব গল্প আরেকজনের জানা হয়ে গেলে, সেই গল্পগুলো তার কাছে পুরনো হয়ে গেলে, সে তার সেই একই গল্প দিয়ে আরেকজনের কাছে নতুনভাবে আবিষ্কৃত হওয়ার লোভে নিজেকে ফের সেই একই কাহিনী দিয়ে খুলে ধরতে থাকে?

আপনি কিন্তু স্যুপ খাচ্ছেন না।

আপনি আমার প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছেন।

মিস্টার এম. হা হা শব্দে এমন ভাবে হেসে উঠেন, চারপাশের পুরুষ মহিলারা চমকে তাঁর দিকে তাকায়। তিনি কিছুকে তোয়াক্কা না করে বলেন, এক বছরের পরিচয়ে অন্তত প্রেমের সময় কোনো প্রেমিকার গল্প প্রেমিকের কাছে পুরনো হওয়া কঠিন, এক বছরে তো সবে গল্প শুরু হয়—।

পৃথিবীর সবাই খুব ব্যস্ত... চারুকলা থেকে বেরিয়ে একটা ছাপড়া মতোন রেস্তোরাঁয় বসে আমি প্রথমেই এই কথা বলেছিলাম অতীনকে— গতকাল চিনে রেস্তোরাঁয় বসে মিস্টার এম. একেবারে আমার নাভির সুতোয় টান দিয়েছেন। এরপর আর কথা এগোয় নি। আমাকে অতীনও বলেছিল, সত্যিই সবাই খুব ব্যস্ত। আমরা এত বেশি জাগতিক কাজে ব্যস্ত থাকি!

বিচ্ছিরি! আমি বলি, ভাবতে গেলে ভয়ে শিউরে উঠি, আমরা নিজের অজান্তেই একেকটা যন্ত্র হয়ে উঠেছি। আমার প্রধান সংকট কী জানেন, সারাদিন যদি আমাকে ইটও

ভাঙতে হয়, প্রাণের কেউ সামনে এসে দাঁড়ালে সেই মুহূর্তে পারলে সব কাজ বন্ধ করে দিয়ে তার সান্নিধ্যে আকুল হই। কিন্তু অন্যেরা যারা সারাদিন ব্যস্ত এই যেমন ধরুন গতকাল আমার ছেলেবেলার বন্ধুর অফিসে গেলাম, সে বহুকাল পর আমাকে দেখে ভীষণ উদ্ভাসিত হলো. পরক্ষণেই একগাদা কাগজে সই করতে করতে সে এমন চোখে আমার দিকে তাকাল, আমি যেন তার ব্যস্ততাকে ভুল না বুঝি। বুঝলেন, এই বিষয়টাই আমি বুঝি না, আমি বোধ করি, কাজটাকে মানুষের সবারই এমন নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিৎ যাতে সবার কাছে তার কাজটা অনান্তরিকভাবে প্রকট হয়ে না ওঠে। অন্তত নিজের প্রাণের জায়গাটা সামনে এসে দাঁড়ালে কাগজের সইগুলো আরেকটু পরে করলে কী হয় ? আমার এই জন্যই অতিরিক্ত দায়িত্ববান মানুষকে মেশিন মনে হয়।

আমার সাথে অতীন একমত পোষণ করে।

এরপর ওর যে ব্যস্ততা আমি দেখি, তাতে আমাকে হাড়ে হাড়ে জীবনকে নতুন বাস্তবতায় দেখার পরীক্ষা শুরু হয়। পত্রিকায় কাজ করে, এরপর রেডিও টি.ভি'তে ফরমাইসী গান লেখে, যেসব কারণে ওদিকেও তাকে ছুটতে হয়... সব মিলিয়ে মহাব্যস্ত অবস্থা।

আমি বলি, কী করে এত ব্যস্ত থাকো ? এত কাজ কেন কর ? সে অবাক হয়ে বলে, কোথায় এত কাজ ? আমি কিচ্ছু কাজ করি না।

পত্রিকা অফিসে নানা লোকজন। পাশের চেয়ার টেবিলটায়ও অন্য কেউ... ফলে কণ্ঠ নামাতে হয়, এই যে আমি তোমার সামনে, দয়া করে ফাইলপত্তরগুলো অন্তত পাঁচ মিনিটের জন্য পাশে সরিয়ে রাখবে ?

ওর অফডেতে দেখা হতো। বেশির ভাগই আউলফাউল রেস্তোরাঁয়। এই শহরে কারো সাথে এক চিলতে কথা বলার মতো জায়গা নেই। তবুও সেই সময়গুলো সমস্ত প্রতিবেশ ভুলে আমরা নিজেদের প্রেম, অনুভব, শিল্প নিয়ে মেতে উঠতাম।

একদিন ও আমাকে বলল, যে-কোনো স্কালপ্চার তোমাকে অন্য পৃথিবীতে উড়িয়ে নিয়ে যায়, আমি জয়নুলের দিনই দেখেছি, তুমি তোমার মধ্য থেকে সত্যিকার সত্তাটাকে কোথায় কোথায় নিয়ে গিয়ে একটা খোল হয়ে দাঁড়িয়েছিলে। জানো, আমি যদি স্কালপ্চার বানাতে পারতাম, তবে নিজের জন্মকে সার্থক মনে করতাম... অথবা ছবি আঁকতে... আমাকে যখন কেউ প্রশ্ন করে কেন প্রবন্ধ লেখেন, বড় বিরক্ত বোধ করি... নন্দিনী, তুমি একটু লক্ষ করলেই দেখবে, বেশির ভাগ যে ক্ষেত্রেই যে যে বিষয়ে খ্যাতিমান, শুরুতে সে সেই বিষয়ের দিকে নিজেকে ধাবিত করতে চায় নি। তার ছিল অন্য কিছু হওয়ার স্বপ্ন। এই ক্ষেত্রে আমি অবচেতন স্বপ্নকে খুব গুরুত্ব দিই... সেই স্বপ্নই তাকে সেই সার্থকতায় নিয়ে যায়, যা সে করতে চায় নি। এই যেমন ধরো, একটা ভাস্কর্যের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা চিরকালের চেনা হয়ে গেলাম। এসব কি নন্দিনী নির্মাণ দিয়ে সম্ভব... এ সৃষ্টি... এ হয়ে যায়, এ হয়ে গেছে... তোমাকে দেখার আগে এই গল্প কারো কাছে যদি শুনতাম তাহলে কণ্ঠ উঁচিয়ে বলে বসতাম এ টিনএজ আবেগ... অথবা এ বুড়োকালের ক্ষণিক মোহ... কিন্তু আমি এই সব শব্দের কোনো ছকেই নিজেকে ফেলতে পারছি না, কেননা তুমি একটা স্কালপ্চারের সামনে দাঁড়িয়ে হিমালয় দেখছিলে, তোমার বিড়বিড় উচ্চারণ বলে দিচ্ছিল তুমি কথা বলছিলে আমারই সাথে, আমার নিজেকে নিয়ে বড় ভয় হচ্ছে নন্দিনী, আমি তোমার সেই

হিমালয় প্রেমিকের প্রতিদ্বন্দ্বী নিজেকে ভাবতে চাই না, যে স্বপ্নের মধ্যে নন্দিনীকে দেখে। আমি ভীষণ নিঃসঙ্গ, ভীষণ একা... আমি সেই একাকীত্বের ফাঁদে এনে তোমাকে শ্বাসরুদ্ধ করে মারতে চাই না।

এরপর ঘড়ি দেখে তাকে ছুটতে হয় এসাইনমেন্টে। তাকে কেন্দ্র করে যে জায়গাটায় আমি সবচাইতে বেশি অসহায় বোধ করতাম, সেটা হলো যখন কোনো শিল্প সম্পর্কিত আলোচনা সবে জমে উঠল, অথবা সবে নিজেকে ভেঙেচুরে মরিয়া হয়ে নিজেকে বোঝাতে শুরু করেছি, তক্ষণি তাকে ঘড়ি দেখতে হতো। প্রতিদিনই গাদাগাদা এসাইনমেন্ট। শহীদ মিনারের সামনে যখন প্রতিবাদী বক্তৃতা চলছে, সে একমনে টুকে নিচ্ছে খবর, তখন আমাকে তার কানের কাছে ফিসফিস করে বলতে হয়েছে, আমার গলব্লাডারে স্টোন, কালই অপারেশন।

যথারীতি সেই তক্ষণ তক্ষণ এই বিষয়ে তার প্রতিক্রিয়া জানা যায় নি, পরে যখন তাকে কেন্দ্র করে সারারাত তৃষ্ণায় আমি আকুল হয়ে হাত পায়ে শক্তি পাচ্ছি না বলে হাঁটতে ভুলে গেছি, তখন হয়তো সে সেই অপারেশনের বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠল। আমাদের বাস্তবতা এমন ছিল, গভীর কথাগুলো, যখন কথা হচ্ছে তখন খুব গভীর, তখন আমরা তার মধ্যে আমূল ডুবে গেছি, পরমুহূর্তের বাস্তবতায় সেই কথাগুলো বাতাসে উড়ে যেতে বাধ্য হতো। আমাদের সম্পর্ক, প্রগাঢ় অনুভব এক বছর টিকেছিল একটা শক্তির জোরেই, আমরা অনুভব করতাম আমরা দু'জন দু'জনের ওপর নির্ভরশীল, কোনো কথাই বাতাসে উড়ছে না, শুধু বাস্তবতার পেষণে কোনো কথার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে দিক, সেই কথাগুলোকে কেন্দ্র করে পরবর্তী সময়ের বিশ্লেষণ, তা করা হয়ে উঠছে না। এই জন্যই মাঝে মাঝে আমার ওকে হত্যার লোভে পেয়ে বসত, আমি জানতাম পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওকে ছুটতে হবে, তক্ষণি এক ভয়ঙ্কর গল্প ফেঁদে বসতাম— যা আমার একান্ত নিজস্ব স্বপ্ন, বলা যায় সম্প্রতি, সম্ভবত সুশোভনার প্রভাবেই এই স্বপ্নকে আমি লালন করছি, মৃত্যুকে আত্মহত্যায় রূপ দেয়া। প্রথমে ভেবেছিলাম এই গল্পটা ওকে করব না, ও সাংঘাতিক আহত হবে, কিন্তু আমাকে তখন এমন ক্ষেপামীতে পেয়ে বসল, আমি হয়ে উঠলাম ওর পরবর্তী কাজের প্রতিদ্বন্দ্বী, আমি ধীরে ধীরে শুরু করলাম— জানো, আমার সবচাইতে প্রিয় ভাইটা দু' বছর আগে পুকুরে ডুবে মারা গেছে। তোমাকে বোঝাতে পারব না ও আমার অস্তিত্বের কতবড় অংশ ছিল। আমি থেমে পড়লে অতীন সন্তর্পণে আমার হাত ওর স্নেহহাতে তুলে নেয়।

এরপর আমার প্রায় একটা বছর গেছে অর্ধ-উন্মাদের মতো। প্রায়ই আমি আমি আমার পরিচিত মানুষদের চিনতে পারতাম না। আমার সেই ভাই ছিল আমার সেরা বন্ধু, ওর লাশ দেখে আমি জলে লাফ দিলাম— সেই জল আমাকে আমোঘ স্বপ্নে ভাসায়, ডুবায়, আমি হিংস্র হয়ে ওকে আঘাত করতে করতে অচেতন হয়ে পড়ি...

অতীনের মুখে কালো ছায়া নেমেছে। ঘড়ি দেখতে ভুলে গেছে সে।

এরপর যখন হোস্টেলে চলে আসি, তখন ও আমার পাশে এসে শুতো, জানালায় দাঁড়াতো, ঘরে হাঁটত... আমি ওর সান্নিধ্যের নেশায় রাত রাত জেগে কাটিয়ে একেক রাতে উন্মাদ হয়ে উঠতাম, কিন্তু জানো অতু, তখন একটা আশ্চর্য বিষয় ঘটত, যখন আমি হাতজোড় করে বলতাম, লক্ষী ভাইয়া, তুই আজকে চলে যা... যা যা, আমি একটা রাত ঘুমাতে চাই। তখনই ও চলে যেত, সেই থেকে আত্মহত্যার রোগটা চাগিয়ে ওঠে। ওর মৃত্যু

আমার মৃত্যুবোধকে সহজ করে তোলে, গতরাতেও অনেকদিন পর আমার সেই ভাই এলো, জানো আমি যখন সিলিং ফ্যানে ওড়না পেঁচাচ্ছিলাম, তখন তোমার ব্যস্ত করুণ মুখটা আমার চোখের সামনে আবছায়া খেলে গেল, কিন্তু আমার তখন দুর্মর ভাবে মনে হলো, যার জীবন এত ব্যস্ততায় পূর্ণ সে কখনই কোনো সংকটময় মুহূর্তে আমার সামনে দাঁড়াতে পারবে না। আমার মৃত্যু ওকে একই সাথে বিপর্যস্ত আর মুক্ত করবে।

ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে অতীনের মুখ। ও কম্পিত চোখে ঘড়ি দেখছে। ওর মুখে অকল্পনীয় বেদনার ছায়া। আমি মাথা নত করে আছি। অতীন দাঁড়ায়, আমি আজ যাচ্ছি নন্দিনী, আমি কথা দিচ্ছি, এরপর তোমার প্রতিটি সংকটে তোমার পাশে এসে দাঁড়াব।

বুঝলেন মিস্টার এম., প্রতিটি মানুষের মধ্যেই বাস করে এক আশ্চর্য ইউটোপিয়া। এদিক থেকে সেরা ছিল অতীন। ও সেদিন তার পরবর্তী এসাইনমেন্টটাকে বাদ দিয়ে আমার সাথে দীর্ঘক্ষণ থাকে নি। ওর দায়িত্ববোধ ওকে তা করতে দেয় নি। তাই বলে কি আমি ভাবব, ও আমাকে ছেড়ে চলে যাওয়া মাত্র ওর মাথা থেকে আমি উবে গেছি ? ও বিশ্বাস করত, আমার সংকটে ও জাগতিকভাবে আমার পাশে দাঁড়াতে পারবে। যেভাবে মৃত বাবার বই ট্রেনের বেঞ্চে রেখে সে নেমে এসেছিল, যেভাবে আমাকে প্রচণ্ডভাবে বুকে গাঁথার পরও আমার ঠিকানা না নিয়ে ও চলে যাচ্ছিল, সেই রকম বিশ্বাসে ও প্রায়ই অনেক প্রতিশ্রুতি আমাকে দিত, ওর এইরকম দিন থাকবে না। প্রচুর ভাইবোনের দায়িত্ব পালন থেকে এক সময় ও নিষ্কৃতি পাবে, আমাকে নিয়ে সে পাহাড়ে যাবে, সমুদ্রে যাবে— আমি তার সেই স্বপ্নের মাঝে আকাঙ্ক্ষার মাঝে এক বিন্দু ফাঁক পাই নি। কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষা সেইসব মুহূর্তেই সেইসব স্বপ্নের মাঝে জাগতিকভাবে দাঁড়িয়ে পড়ত বলে, আমরা ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু এবং ভঙ্গুর হওয়ার অবচেতন খেলায় লিপ্ত হয়ে পড়লাম।

মিস্টার এম.-এর অফিস কক্ষ।

দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে।

তিনি মাঝে দুটো ফোন রিসিভ করলেন। আমি থেমে পড়লেও তাঁর কোনো প্রশ্ন নেই, শুধু চোখের মাঝে... তারপর ? আমিও সেই ইঙ্গিতের সূত্র ধরেই বলি, অতীনের স্বপ্ন ছিল ও ভাস্কর হবে। ছেলেবেলায় ও হিন্দু বাড়িতে বসে বসে দেখত, কেমন মাটি দিয়ে, খড় দিয়ে— এক অনিন্দ্য সুন্দর দুর্গা তৈরি হয়ে গেল। বই-এ ছাপা পাথরের স্কালপ্চারও তাকে অভিভূত করত। অতীন না বললেও আমি বুঝি, পারিবারিক টানাপোড়েনে সেই পথে ওর আর যাওয়া হয় নি। আমি জয়নুলের ভাস্কর্যের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম এবং তার মধ্যে জয়নুলকে না পেয়ে আহত হচ্ছিলাম, আমার এই বিষয়টাই ওকে গভীরভাবে টেনেছিল। ও বলতো, অবশ্য এই দেশে আমি যা বানাতে চাই, তা পারতাম কি-না সন্দেহ। ওগুলো স্টুডিওতেই পচে মরত।

কী বানাতে চাও তুমি ?

ন্যুড!

আমি রক্তাভ হয়ে উঠি।

অতীন বলে, মাইকেল এ্যাঞ্জেলো কী বলেছে জানো, মানব দেহ সুন্দর। রেখে ঢেকে শিল্পের দোহাই দিয়ে তাকে বিকৃত করা নিষ্প্রয়োজন। পরবর্তী সময়ে রদ্যাঁ তার ন্যুড মূর্তি দ্বারা দারুণ প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিশেষ করে মাইকেল এ্যাঞ্জেলো 'ডেভিড'কে নগ্ন করে গড়েছেন, এটা দেখে দেখে রদ্যাঁ তো রীতিমতো অভিভূত। মাইকেল এ্যাঞ্জেলো আরো অনেক ভাড়া করা মেয়েদের ন্যুড মূর্তি গড়েছেন। তা ভাড়া করা কেন? উনি কি বিয়ে করেন নি?

রদ্যাঁ উত্তরে বলেছিলেন, না! মাইকেল এ্যাঞ্জেলো বিয়ে করেন নি, লিওনার্দো বিয়ে করেন নি, রাফায়েল সাইত্রিশ বছর বয়সে মারা যান, সম্ভবত বিয়ে করেন নি, তাতে কী?

জানেন মিস্টার এম.— অপূর্ব মিরাকল! আমি যেন আমারই আরেক সত্তাকে অতীনের মধ্যে দেখলাম। আমি ওর কথা শুনছিলাম আর দেখছিলাম সেই ভাস্কর তরুণকে... হা! ছেলেবেলা! ছায়া রাস্তা পেরিয়ে দেখছি, একজন তরুণ ঠক্ঠক্ পাথর কাটছে...।

অতীন বলে, রদ্যাঁ তারপর নিজে সাহসী হলেন, তুমি কি এই গল্প শুনেছ?

না!

রদ্যাঁর জীবনীতেই এ পাওয়া যায়। দণ্ডায়মান এক তরুণ, তার ডান হাত মাথায়, যেন ক্ষোভে দুঃখে, অপমানে পরমুহূর্তেই ও মাথার চুল ছিঁড়তে শুরু করবে। সেই হাতটা যেন বলছে, হে আমার নেতার দল, গদীর মোহে এ-কী তোমরা করলে? বাঁ হাতে একটা যষ্ঠি। তাতে সে ভর দিয়েছে। সেই হাতটা যেন বলছে, তবুও ভেঙে পড়লে তো চলবে না!

মূর্তিটা প্রদর্শনীতে দিলে ওর পার্টনার প্রচণ্ড উত্তেজিত, রদ্যাঁ, এই মূর্তি প্রচলিত ধারার ধারেকাছে নেই। এটা এত বাস্তব, এত বিপ্লবাত্মক যে দর্শকরা একে গ্রহণ করবে না। অন্তত একটা অলিভ পাতা দিয়ে তুমি ওর নগ্নতাকে ঢেকে দাও— মিস্টার এম. আমি কি আপনাকে ক্লান্ত করে তুলছি?

না।

চায়ে চুমুক দিয়ে ফের শুরু করি, সেই গল্প করার সময় অতীনের মুখে সে-কী ঘোর! তার মধ্যে খেলা করছিল নিজে ভাস্কর না হওয়ার যন্ত্রণাকর বেদনা তরঙ্গ। ও বলে, রদ্যাঁ রীতিমতো রুখে ওঠে, অলিভ পাতা! এটা কি রোমান শিল্প? এই উনবিংশ শতাব্দীতে অলিভ পাতা কোথায় পাব?

ওকে তবে একটা ল্যাঙ্গট পরিয়ে দাও।

রদ্যাঁ আহত, ছি ছি, সে-তো অশ্লীল!

না! ঐ পরিদৃশ্যমান যৌনাঙ্গটাই অশ্লীল।

রদ্যাঁ ফের উত্তেজিত— ডেভিডকে কি মাইকেল এ্যাঞ্জেলো নগ্ন করে গড়েন নি?

মাইকেল এ্যাঞ্জেলো একজন ব্যতিক্রম। সহস্র শতাব্দীতে অমন শিল্পী একবারই জন্মায়।

মানছি। কিন্তু তার ডেভিডকে যারা মেনে নিয়েছিল, তারা সাধারণ মানুষ। তারা বছর বছর জন্মায়।

তুমি গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখবে নন্দিনী, আমাদের পাঠকরা, শ্রোতারা অনেক সরল, কোনো বিষয় যখন সত্যিকার শিল্প হয়ে ওঠে, তখন তারা এত মুগ্ধ হয়, তার মধ্যে

অশ্লীলতা আছে কি-না, জান্তব চিৎকার আছে কি-না— খোঁজে না। পৃথিবী জুড়ে বোদ্ধারাই বোদ্ধাদের শত্রু, শিল্পটা তারা হাড়ে হাড়ে বোঝে বলেই প্যাঁচ কষে ওর মধ্য থেকে দ্রুত বাজে গন্ধটা খুঁজে পায়, এবং সেই গন্ধ সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেয়।

উল্টোটাও হয়, আমি বলি, জীবনানন্দ দাশকে বুদ্ধদেব বসু যেভাবে আবিষ্কার করেছিলেন...।

সেটা বছরে একটা ঘটার বিষয়, নোবেল পাওয়ার আগে রবীন্দ্রনাথ সেইসব বুদ্ধিজীবীদের তোপের মুখে পড়ে নিশ্চিহ্ন হতে বসেছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথ এবং তার সময়ের বুদ্ধিজীবীরা জগদীশ গুপ্তের শক্তিকে নাকচ করে দিয়েছেন— কত শুনবে উদাহরণ ? পৃথিবীর বেশির ভাগ শিল্পী যে স্বীকৃতি পান না, তা বুদ্ধিজীবীরা তাদের ব্যাপারে হয় নীরব থাকেন বলে, নয় কিছু হয় নি— বিশ্লেষণ করে তা জনসম্মুখে তুলে ধরেন বলে— রদ্যাঁ এই জন্যই এই বিষয়ে আর তর্কে যান নি।

বুঝলেন মিস্টার এম.— যেন স্তূপ স্তূপ ধুলো জমেছিল এক কঠিন সিন্দুকে। তার তালায় জং, আমি দেখি আমার বুকের কুয়াশা ভেদ করে ভেতরে ঢুকে অতীন আমার সেই সিন্দুকের ওপর জমে থাকা ধুলো সরাচ্ছে, আমি চব্বিশ বছর সেই সিন্দুকে যে বিষয় লুকিয়ে রেখেছি তার চাবি অতীনের হাতে। আমি স্থির করি, একমাত্র ওকেই আমি সেই বোরাকের ঘোড়ার গল্প বলব এবং আমার উরু চামড়ায় মৃত্যু অবধি কালো মাটির মতো এঁকে থাকা শিল্পচিত্রটি দেখাব। হায়! শিল্প! আমার চোখ ভিজে উঠতে থাকে, যীশুকে যখন ক্রুশবিদ্ধ করা হলো, কী অপূর্ব অভিনব দৃশ্য— যেন তিনি দুটি ডানা দুদিকে উড়িয়ে দিয়েছেন— সেই ক্ষত থেকে যেন রক্ত নয়, বিচিত্র রঙের নহর বইছে। যেন নগরের ক্যানভাসে টাঙিয়ে দেয়া হলো কোনো ভাস্কর্য... হায়! শিল্প!

সুশোভনাকে আমি জলের কাছে পেয়েছি। উদভ্রান্ত, অস্থির। আমি খোলা জায়গা পেলেই নিজের নাম ধরে ডাকি। আমার নাম কি আদৌ নন্দিনী ? নাকি আমিও এই গল্পে নিজের একটা ছদ্মনাম ব্যবহার করছি! তবুও নিজের আসল নাম লুকানোর স্বার্থে আমি এই নামকে আমার অস্থি মাংসে রক্তে হৃৎপিণ্ডে এমনভাবে গেঁথে ফেলেছি, এই নাম ছাড়া আমার আর কোনো নাম নেই। রমনা পার্কে যখন উড়ছিল ঝাঁক ঝাঁক তেঁতুল পাতা, আমপাতা, কড়ুই পাতা, যখন বাতাস, যখন ঢেউ, সহসা দেখি একটা মেয়ে জলের পাশে বসে বই পড়ছে। আমি রীতিমতো স্তম্ভিত। অন্তত আমাদের দেশের বাস্তবতায় কোনো মেয়ের পার্কে, রেলস্টেশনে বসে বই পড়াটা একটা অসম্ভব বিষয়। এবং অসম্ভব বলেই সুশোভনা আমাকে নন্দিনীই-ই... ডাকের তেঁতুল বাতাসের ঘূর্ণি থেকে বের করে তার দিকে টেনেছিল!

মেয়েটির চুল বাতাসে উড়ছে। বইয়ের পৃষ্ঠা উড়ে যাচ্ছে বলে সে মুখ তুলে জলের দিকে চেয়ে অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল। রমনায় এখন একটা চিনে রেস্তোরাঁ হওয়ায় দিনের বেলায় বাজে আড্ডা কম। তবুও দুতিনটা ছেলে ওকে ফলো করছে দেখে মূলত ও একা এখানে আসে নি, আমিও ওর সাথে এসেছি, এটা বোঝাতে ওর পাশে খুব অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে বসি। ছেলেগুলো চলে যায়।

সুশোভনা মুখ তোলে, ওকে দেখে কেন যে মনে হয়, ও আমারই যমজ ছায়া, আমি এর সূত্র আবিষ্কার করতে পারি না। এবং আশ্চর্য, সে-ও! কতকালের চেনা, এই স্বরে বলে, সন্ধ্যার আগের সময়টায় প্রকৃতি বড় রহস্যময় হয়ে যায়... রাতের পোশাক পরার প্রস্তুতি পর্বটা বড় সুন্দর।

আমি বলি, তুমি কিন্তু প্রকৃতি না দেখে বই পড়ছিলে।

সুশোভনা ঘোর চোখে তাকায়। এরপর পাশে রাখা মিনারেল ওয়াটারের বোতল থেকে এক ফালি জল গিলে বলে, আমি যা পড়ছি, তা ঘরে বসে পড়লে এর স্বাদই পাল্টে যেত। আমি এইখানে বসে এই গ্রন্থটি পড়ছি বলেই, আমি যা পড়ছি সেইসব জায়গায় মুহুর্মুহু চলে যেতে পারছি। আমার মনেই হচ্ছে যেহেতু ওপরে আকাশ, চারপাশে মুক্ত বাতাস আমি একই সঙ্গে পাঠ এবং প্রাচীন লোকে চলে যেতে পারছি।

তাহলে তো আমি তোমাকে বিরক্ত করলাম!

সে-কী! তুমিও তো এতক্ষণ আমার পাঠেরই অংশ ছিলে। আমি একবার জল, একবার গ্রন্থ এবং একবার তোমাকে দেখছিলাম। আমি কোনো মেয়েকে খোলা মাঠে নিজের নাম ধরে ডাকতে শুনি নি।

কী করে বুঝলে ওটা আমারই নাম ?

এ-তো খুবই সহজ। তুমি কাউকে খুঁজছিলে না। নিজের মধ্যে নিজে বুঁদ হয়ে ঘুরে ঘুরে মানুষ নিজেকে ছাড়া আর কাকে খুঁজবে ? জানো তুমিও কিন্তু ততক্ষণে আমার এই গ্রন্থের একটা চরিত্র হয়ে উঠেছ। তোমার সেই ঘূর্ণায়মান অবস্থার মধ্যে আমি দ্রৌপদীকে দেখেছি, যার একটি লাঞ্ছনাকর অতীত আছে। দ্রৌপদী কেবল লাঞ্ছিতার প্রতীক নয়, সে সেই সময় কেবল পঞ্চপাণ্ডবের স্ত্রী নয়, তাকে আমরা ইন্দ্রপ্রস্থের অর্থমন্ত্রী হিসেবেও দেখতে পাই। দ্রৌপদী কেবল সৌন্দর্য এবং লাঞ্ছনার জন্য নয়, সে-কালের রাজনীতিতেও দ্রৌপদীর একটি ভূমিকা ছিল।

তুমি মহাভারত পড়ছ ?

আমার এই প্রশ্নে মেয়েটি হেসে ওঠে, না। আমি মহাভারতে রচিত নারীদের সম্পর্কে বিভিন্ন বিশ্লেষণাত্মক গ্রন্থের একটি পড়ছি।

কিন্তু তুমি আমার মধ্যে কী করে দ্রৌপদীর মতোন একজনকে আবিষ্কার করলে, যে তার পাঁচ স্বামী দ্বারা প্রতিনিয়ত শৃঙ্খলিত ?

হে নারী, তুমিও তা-ই। রমনায় একা হেঁটে বেড়ালেই যে-কোনো নারী মুক্ত হয়ে যায় না। তুমি যদি এতই মুক্ত হতে তবে চিৎকার করে রমনার বনান্তর ফাটিয়ে এমন কাউকে ডাকতে, যে তোমার প্রাণের মধ্যে বাস করে, অথবা যাকে তুমি খুঁজছ। আজ এই যে একাকী প্রান্তরে তুমি নিজের নাম ধরে নিজেকেই খুঁজছ এ তোমার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার স্বপ্ন মাত্র— বলতে বলতে মেয়েটি দাঁড়ায়, ওর বইটা আমার কাছে রেখে হেঁটে যেতে যেতে বলে, আমি কিন্তু দ্রৌপদী নই, সুশোভনা, তুমি ওর অধ্যায়টা পড়ে দেখ তো!

মিস্টার এম., সুশোভনা সম্পর্কে এর পরে আমি পড়েছি। প্রতিটি নারীই বোধহয় তার পঠিত চরিত্রদের মধ্যে নিজের ছায়া খুঁজে বেড়ায়। শুধু নারী বলব কেন, প্রতিটি মানুষেরই হয়তো প্রবণতা এই— খুঁজতে খুঁজতে কোনো একটা চরিত্রের মধ্যে প্রায় অনেকটাই নিজেকে পেয়ে গেলে সেটাই হয়ে ওঠে তার সবচাইতে প্রিয় চরিত্র, হয়তো দেখা গেল সেই গ্রন্থটি মানের বিবেচনায় তেমন অসাধারণ কিছু নয়, তবুও মানুষ এই জায়গাটায় সাংঘাতিক আত্মকেন্দ্রিক।

মহাভারতের সুশোভনার মধ্যে নিজেকে খোঁজার মধ্যে ওর একটা বিচিত্রতা ছিল। সুশোভনা মোটেই সনাতনী নারীর সুন্দর রূপ নয়, সে ছিল ছলাকলাময়ী, রহস্যময়ী। মুকুণ্ডরাজ আয়ুর অপূর্ব রূপসী কন্যা সুশোভনার চরিত্র নিষ্ঠুর নিচতায় পূর্ণ। সে পুরুষদের নিয়ে খেলতে পছন্দ করে, গৃহিণীর জীবনকে সে খাঁচায় বন্দি এক কিংকরীর জীবন ছাড়া কিছু মনে করে না। সুশোভনা তার বন্ধজালে প্রেমিকের কাছে নিজের পরিচয় গোপন রেখে বলে যে, একটি শর্তে সে প্রেমিকের সাথে প্রণয়ে রাজি— 'মেঘমেদুর দিনে আমাকে তমাল বৃক্ষের নিচে নিয়ে যাবেন না প্রিয়। আমার অভিশাপ আছে, বর্ষার দিনে তমাল তলায় গেলে আমার মৃত্যু হবে'।

এ শর্তে রাজি করিয়ে সুশোভনার শুরু হয় পুরুষটির মন জয়ের খেলা। ক্রমে ক্রমে পুরুষটি আকণ্ঠ প্রেমে নিমগ্ন হলে সুশোভনার মধ্যে নিষ্ঠুরতার জন্ম হয়, সে নিজেকে সরানোর জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। একদিন আকাশ মেঘে ঢেকে গেলে সে প্রেমিককে আবেগ স্বরে বলে, চলুন প্রিয়, আমরা প্রমোদ কাননে যাই। এরপর প্রেমিককে ঘোরে ফেলে তমাল বৃক্ষের নিচে উপস্থিত হয়ে সুশোভনা প্রশ্ন করে, এই সুন্দর গাছটির নাম কী দেব ?

ঘোরগ্রস্ত প্রেমিক সত্য উচ্চারণই করে, কেন, তমাল ?

উত্তর পাওয়ার সাথে সাথে কপট ছলনায় সুশোভনা মুখ বিষণ্ন করে বলে, দেব, আপনি অঙ্গীকারভ্রষ্ট হলেন, আজকের দিনে আমাকে তমাল দেখালেন : এবার আমাকে হারাবার জন্য প্রস্তুত থাকুন। হাহাকার করে ওঠে, পুরুষ, পায়ে লুটিয়ে পড়ে, সুশোভনার হৃদয় গলে না। সে দৃঢ় কণ্ঠে একা থাকার ইচ্ছে ব্যক্ত করে। এইভাবে একের পর এক পুরুষ হৃদয় রক্তাক্ত করে যে সুশোভনা— সুশোভনার মতো এক পঠন পাঠনে সমৃদ্ধ মেয়ে কী করে নিজের চরিত্রের সাথে তাকে মেলায় ?

মিস্টার এম., সিগ্রেট ধরিয়ে অজান্তেই সামনে বলয় তৈরি করে ইতস্তত বোধ করেন, দুঃখিত! শেষ পর্যন্ত মহাভারতের সুশোভনা কি তেমনই ছিল ? কোনো পুরুষের কাছে সে পরাস্ত হয় নি ?

দেখুন মিস্টার এম., আমি আসলে সুশোভনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে অহেতুক অনেকটা সময় নষ্ট করলাম। হয়তো কোনো একটা গ্রন্থে বর্ণিত চরিত্র কোনো একটা সমাধানের দিকে যায়, সুশোভনারও গেছে, এক পুরুষ তাকে পরাস্ত করেছে, কিন্তু আমার বান্ধবী সুশোভনা শহরের মেয়ে, তার জীবন চলমান, তার সম্পর্কে আমি কী করে কোনো একটা পরিণতি তৈরি করি ?

তবে এটা ঠিক, সুশোভনার একাধিক প্রেমিক ছিল, বিশেষ কোনো একজনের কাছে কখনোই সে সমর্পিত হয় নি। সে প্রেম বুঝত, গভীরতা বুঝত, সাথে সাথে এটাও সে

অনুভব করত, আকাশে রঙধনু উঠার মতো, জলে তরঙ্গ বয়ে যাওয়ার মতো প্রেমটা হয়ে উঠার বিষয়। প্রেম কখনো নির্মাণ করা যায় না। সে নিজেকে দুর্ভাগা মনে করত, তার গভীর গভীর স্তরে কাউকে কেন্দ্র করে সেই অর্থে প্রেম নেই।

তবে তোমার প্রেমিকেরা ? আমি সুশোভনাকে প্রশ্ন করতাম। আমার এই প্রশ্নে সে বলত, ওরা না প্রেমিক, না বন্ধু— এই জন্যই কোথায় গিয়ে ওদের নিয়ে তাড়িয়ে তাড়িয়ে খেলতে ভালো লাগে। যে-কোনো সাধারণ রহস্যের কাছে এসে ওরা এমন বোকা আর হতবাক হয়ে যায়! খেলাটাই এই জন্যই আমার জন্য এত সহজ! তুমি লক্ষ করলে দেখবে নন্দিনী, পৃথিবীর কোনো কীর্তিমান পুরুষ কিংবা উপন্যাসে রচিত পুরুষ চরিত্র সতীসাধ্বী সরল স্ত্রীর মধ্যে নিজেকে আমূল সমর্পণ করতে পারেন নি। তাঁরা ঘরে তেমন স্ত্রী-ই চান, তাঁদের প্রতিনিয়ত উদ্দীপিত করে, রোমাঞ্চিত করে, হয় লাস্যময়ী বারবণিতা, নয় বহির্মুখী আধুনিক কোনো নারী। আমি এই জন্যই কোনোদিন কারো স্ত্রী হতে ঘৃণা বোধ করি।

কিন্তু সুশোভনা এ-তো তোমার ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে, ঘরের স্বামী তোমাকে একঘেয়ে করে তুলল।

তা-তো করবেই। বিয়ে করে আমরা দু'জন দুটো মন এবং শরীরসম্পদের আজন্ম মালিক হতে চাইব, আমি এক্ষেত্রে আমার স্বামীর চাইতে নিজেকে নিয়ে বেশি আশঙ্কায় ভুগি। আমি যদি কাউকে গভীর প্রেমে পড়েও বিয়ে করি, তাও আমাকে বেশিদিন আক্রান্ত করে রাখবে না।

এ তুমি কী বলছ সুশোভনা ? তুমি যা করছ, বিভিন্ন জনের সাথে বিভিন্ন সময়ে— এ-তো আরো অগভীর। হালকা, রীতিমতো চটুল!

সুশোভনা বলে, এই জন্যই তো এর নাম সেই অর্থে প্রেম নয়, এ হলো এক ধরনের তরঙ্গ, খেলা, নিজেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনের চোখের সামনে ঝলসে ঝলসে প্রতিনিয়ত নিজেকে সুন্দর দেখা, সুন্দর হিসেবে আবিষ্কার— নন্দিনী... বলতে বলতে গভীর ঘুমে ঢলে পড়তে থাকে সুশোভনা... মিস্টার এম., আপনাকে কী বলব, মেয়েটা দিনের পর দিন ঘুমের মধ্যে প্রখর চোখে জেগে জেগে পথ হাঁটত, চাকরি শেষে সে কখনো একা, কখনো বন্ধুদের সাথে এ্যালকোহলের নেশায় ডুবে থাকত যা হোক, আমার ভাগ্যের সবচাইতে আশ্চর্য কী জানেন মিস্টার এম., আমার জীবনের সাথে সহসা কেউ জড়ায় না, সহসা আমি নিজেকে কারো সামনে মেলে ধরি না, আমার জীবনে ক্রমে ক্রমে প্রাণের গভীর তলায় ছাপ কেউ ফেলল এই বিষয়টাও নেই— সহসা আমার মধ্যে কেউ ছাপ না ফেললে সে আমার গভীর প্রাণের কেউ হওয়া কষ্টকর। আমি পাথরের সামনে অতীনকে পেয়েছি, সে কারো পরিচয়ের সূত্র ধরে আমার জীবনে আসে নি, তেমনি জলের ধারে সুশোভনাকে— আর আপনাকে মিস্টার এম., আমি বইমেলায় প্রথম দেখেছি, কিছুতেই আপনার সাথে প্রথমদিনই আমার এত আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠত না, আমরা যদি না— আমি থেমে যাই, মিস্টার এম.-এর চোখেমুখে উজ্জ্বল হাসি ফুটে ওঠে, তিনি বলেন, আসলেই বিস্ময়কর, আমরা দু'জনই স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে এক সাথে উচ্চারণ করলাম— একদম এক সাথে, এক ইঞ্চিরও হেরফের হয় নি— 'আচ্ছা ? ইলিয়াসের 'খোয়াব নামা' বলে আমরা দু'জনই দু'জনের মুখের দিকে অবাক হয়ে যেই তাকাতে গেলাম, আমাদের হাতের নাড়া খেয়ে স্টল থেকে মাটির মধ্যে সেই বইটাই পড়ে গেল... নন্দিনী, আশ্চর্য! আশ্চর্য। আমরা দু'জনই উবু

হয়ে এক সাথে বইটাতে হাত রাখলাম— আমার শরীরের মধ্যে রীতিমতো একটা তরঙ্গ বয়ে গেল!

আমি হঠাৎ রক্তাভ হয়ে উঠি, তরঙ্গ বয়ে গিয়েছিল, সত্যি ?

এইবার মিস্টার এম., সলজ্জ মুখে নিজেকে সামলালেন— না, না, সে-তো হবেই, কী আজব মিরাকল!

আমি নতমুখে বলি, আপনি কিন্তু চেহারায় মোটেও তা বুঝতে দেন নি— বরং লটারীতে জিতেছেন এমন ভঙ্গিতে শব্দ করে হাসছিলেন।

আমি এইরকমই— বলে মিস্টার এম. কণ্ঠে সুর তুলতে যান— তা তার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে ভেঙে চুরচুর হয়ে যায়।

আমি বলি, যার মুখে এমন একটা হাসি হাসি মুখোশ সারাক্ষণ লটকে থাকে, যেই মুখোশ ভেদ করে কখনো এক মুহূর্তের জন্যও ভেতরের এক বিন্দু বেদনা ছায়া উঁকি দিতে পারে না, তাকে বুঝে নিয়ে নিয়ে আর গল্প করা যায়, মিস্টার এম., আজ দিনটা একটু ভেবে দেখুন তো কতটা অনুভব থেকে আর কতটা গল্প শোনার কৌতূহল থেকে আপনি আমার গল্পগুলো শুনে যান... না, না আমাকে বুঝে নিতে বলবেন না... তাহলে জীবনে হাসি, কান্না, বিষাদ, আনন্দ প্রকাশের নানা রূপ থাকত না... ভেতরে সব আটকে রেখে শুধু নিজেকে ঢেকে রাখার ক্ষমতা আছে বলেই মানুষ বিশেষ একটা ভঙ্গিকেই সারাক্ষণ অন্যের সামনে লটকে রাখত। আজ আমি যাচ্ছি।

ঘুমের মধ্যে কুঁকড়ে উঠি। দার্জিলিংয়ের চুড়োগুলোর ফিনফিনে মেঘ এক পশলা ধোঁয়ার মতো এসে গা ভিজিয়ে চলে যেতেই এসে দাঁড়ায় সেই ভাস্কর ছেলেটি। তুমি এখন কোথায় থাকো গো ? প্রশ্ন করতেই দেখি সে হিমালয়ের স্তম্ভ কেটে কেটে তাকে একটা মূর্তিতে রূপ দিতে চাইছে... এ-কী সর্বনাশ! সব যদি মূর্তি হয়ে যায় তবে মূর্তির সৌন্দর্য কে রক্ষা করবে! এছাড়া হিমালয়ের সহজাত রূপ... এ তুমি পার না। তোমার ছেনির শক্তি আছে বলেই... ঠক্ ঠক্ ঠক্... ছেলেটি যেন মেঘের ওপর দাঁড়িয়ে আছে... আরে! চুড়োটিতো একটি মস্তকে রূপান্তরিত হচ্ছে... বরফগুলো এমনভাবে কাটছে যেন জয়নুলের শাদা চুল... অন্তু, ওকে তুমি ঠেকাও ঠেকাও... পাহাড় থেকে পা বাড়াতে গিয়ে গড়িয়ে পড়ছি—

একা!

চতুষ্কোণ এক কক্ষ! ঘুম ভাঙতেই ভয়াল রাত্রির থাবা। বালিশ খামচে নিজেকে ধাতস্থ করে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসি। ভাঙা গলায় ডাকতে থাকি... সুশোভনা... সোনা...! মনে পড়ে, ও অফিসের কাজে এই শহরের বাইরে গেছে। আমাকে এখন এক গ্লাস জল দেয় কে ? আমার সমস্ত শরীরে যে ঝিঝি ধরে গেছে।

কাচের পাল্লায় সশব্দ বৃষ্টির ধাক্কা। কড়মড় শব্দে বাজ পড়ছে ঠিক আমার ঘিলুটার ওপর! সহসা হাতড়ে সুইচ খুঁজে পাই না। সুইচ খুঁজে পেতে দেখি বৃষ্টিপাতময় লোড শেডিংয়ের খপ্পরে পড়েছি। যেভাবেই হোক, পাথরে হোক, জলে হোক এবং মধ্যরাতের প্রিয় গ্রন্থে হলেও নিজেকে হারানো দরকার... ধ্যান... এর বিকল্প নেই... আমি অসাড় শরীর

বিছানায় নিজেকে পেতে নিশ্চল ধ্যানে পড়ি... নাহ্, আজ মগজ ক্রিয়া করছে... সেখানে ভাস্কর ছেলেটির ছেনি... এতকাল কোথায় লুকিয়েছিল সে ? যেন আমি নিজেই জং ধরা কফিনের পাল্লা খুলে তার আত্মাকে বের করে দিয়েছি— সে আর আমাকে রেহাই দেবে না। আমি সেই সোডিয়াম রাতে অতীনকে এই কাহিনী বলার পর থেকে ভেতর থেকে হালকা হওয়ার বদলে ওর ছেনির আঘাতে দশগুণ রক্তাক্ত হচ্ছি। তারপরও বিষয়টিকে আমি হালকা কোনো রূপছকের মধ্যে ফেলতে চাই নি। আমি এমন একজনকে আমার সেই ঘটনা প্রথম বলেছিলাম, যাকে আমি ভালোবাসতাম, এবং এখন পর্যন্ত— বাসি। ওর ব্যক্তিত্ব, পরিমিতিবোধ আর স্থৈর্যের সমকক্ষ কোনো পুরুষ এই জীবনে আমি দেখি নি।

কেবল যোগাযোগহীনতা— তবুও, বাসি— এটা সত্য... সম্ভবত বাসবোও... যদি আউট অফ সাইট... আমার জন্য সত্যি না হয়। এই তো সেদিন ওর প্রবন্ধ পড়তে পড়তে আমার আমূল আত্মা শিরশিরিয়ে উঠল। যেন পেপারের মাঝে প্রবন্ধ নয়, জ্যান্ত দাঁড়িয়েছে সে, হাত বাড়িয়ে বলছে, তুমি ছাড়া এই পৃথিবীতে আমাকে কে আর অত বোঝে ?

নাহ্! নিশ্চল ধ্যান হচ্ছে না... বিড়বিড় করি... ঘুম... ঘুম... তোমার সব আছে... স..ব আছে.... স...ব... শোনো অন্তু, তোমাকেই আবার বলি, সেদিন অত কোলাহল চারপাশে... এছাড়া আমি প্রচণ্ড বিধ্বস্ত ছিলাম, কখনো ভাবি নি কাউকে বলব... অত সূক্ষ্মভাবে সব বলতে পারি নি... আচ্ছা, আমি কি বলেছিলাম বোরাকের ছোট ঘোড়ার মূর্তিটি নিয়ে যখন আমি ঘর থেকে বেরোই, তখন চারপাশে গভীর তুফানের মতো কুয়াশা ছিল ? এক ইঞ্চি সামনের মানুষের মুখ দেখা যাচ্ছিল না ? বলো, অন্তু বলেছি কি-না!

সুশোভনা! তুমি এ-কী করলে! একজন লেখককে এই কাহিনী বলে বিষয়টাকে একটা নিছক গল্প বানিয়ে ফেললে ? তুমি একে শিল্প বানিয়ে ফেললে ? আমি মিস্টার এম.-এর সহানুভূতির তলায় এই ঘটনা বিছিয়ে অন্তত একে গল্পের হাত থেকে রক্ষা করে এর যথার্থ বেদনার যন্ত্রণাকর, অপমানকর সত্যটাকে বাঁচাতে চাই— এবং এটা তখনই ঘটবে যখন মিস্টার এম.-এর মুখোশটার মধ্যে এই কাহিনী সাংঘাতিক কালো এক ছায়া ফেলবে। মুখোশটা খসে পড়বে এবং সেটা হবে।

মিস্টার এম., আমি আমার সেদিনের ব্যবহারের জন্য দুঃখিত!

আমার সাথে ভদ্রতা করতে হবে না— মিস্টার এম. বলতে বলতে কয়েকটা ফাইলে সই করেন, আসলে ভালো একটা পরিবেশ পাচ্ছি না, আপনি বিশ্বাস করেন যে-কোনো পরিবেশ মানুষের কথা পাল্টে দেয় ?

বিশ্বাস করি... বলতে বলতে নিজের অজান্তেই নিজের ওপর ঢলে পড়ি। মনে পড়ে অতীনকে, না, এই পরিবেশের কথার পরিপ্রেক্ষিতে নয়, যদিও পরিবেশ আমাদের অনেক আন্তরিক অনুভব প্রকাশের ক্ষেত্রে অন্তরায় হতো— তবুও সেটাকে আজ বিশেষ কিছু মনে হচ্ছে না... যেটা বুকে রক্তক্ষত তুলে প্রবলভাবে মনে পড়ছে— আমি জানতাম ওর যা পারিবারিক অবস্থা সেখানে আমাকে আজীবনের জন্য ওর জীবনের সাথে জড়ানোর কল্পনা পর্যন্ত ও করতে পারত না। একদিন দুর্মর এক যন্ত্রণাকর অনুভব থেকেই আমি সেই

জায়গাটাই চেয়ে বসলাম, আমি বললাম, আমি তোমার প্রতিটি নিঃশ্বাসের সাথে প্রতিমুহূর্তে চলতে চাই, যেটা এই সমাজে বিয়ে ছাড়া সম্ভব নয়।

অতীনের মুখে অন্ধকার ছায়া পড়ে, সে বলে, তুমি তো তাহলে আমার জীবনে এর আগে আসা অন্য নারীদের মতো হয়ে গেলে, সম্পর্কের প্রগাঢ়তার মধ্যে শর্ত জুড়ে দিচ্ছ।

আমি তোমার পাশে সারাক্ষণ থাকতে চাই, অন্তু এ-তো তোমারও আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিত, তুমি এ-কে শর্ত বলছ, তুমি নিজে হিসাব করে দেখেছ, সবচাইতে বড় শর্ত— অন্তত গোড়া থেকেই, শব্দাকারে না বলে হলেও তুমি আমার ওপর চাপিয়েছ? অবাক হয়ে অতীন আমার দিকে তাকায়— তুমি কী বলতে চাও?

তুমি আমাকে প্রতিমুহূর্তের নিঃশ্বাসের শব্দে জানিয়েছ, তোমার জাগতিকতার দায় বড় মারাত্মক, আমি যেন এর মধ্যে তোমার সাথে সারা জীবনের একসাথে চলার স্বপ্ন না দেখি— জানেন মিস্টার এম., সেদিন আমার মধ্যে কী ভয়ঙ্কর এক জেদ ভর করল। আমি জানতাম আমার এই প্রস্তাবে অতীন অসহায়, অতীন বিপন্ন— কিন্তু কোথায় জানি প্রেম বিষয়টা বেহিসাবের মধ্যেই পূর্ণতা খুঁজে পায়, আমি জানতাম মিস্টার এম., এরকম একটা প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে অতীনের যা বাস্তবতা তা আমাকে অপমানিত করবে— তবুও আমি এক অশরীরী ছায়ার ভরে সেই প্রস্তাবই তার কাছে রাখলাম— আমাকে যদি তুমি বিয়ে কর, তোমার সাথে চলব। যদি না কর, তবে কাল থেকে অন্তত জাগতিক পৃথিবীতে আমি তোমাকে চিনি না।

অতীনের মুখ ছাই হয়ে গেল। পরক্ষণেই সেই মুখে ফুটে উঠল জেদ, তুমি যদি প্রেমের মধ্যে এই শর্ত চাপাও, তবে তুমি তোমার মতো করে যা খুশি সিদ্ধান্ত নাও।

বলতে বলতে মিস্টার এম.-এর টেবিলে আমার মাথা নুয়ে আসে। আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়।

মিস্টার এম. অস্ফুটে উচ্চারণ করেন, তারপর?

আমার চোখ ভিজে গেছে। মিস্টার এম. স্থির।

আমি বলি, চিরকালই আমার অনুভব আর যুক্তি আমাকে বাঁচিয়েছে। জানেন, আমার একমাত্র বেহিসাবি জায়গা ছিল অতীন। আপনি লক্ষ করে দেখবেন, মানুষের বাস্তবতা সাংঘাতিকভাবে প্রভাবিত করে তার যে-কোনো অপার্থিব অনুভবকে পর্যন্ত। আমার চাইতে বিপন্ন এবং বিপর্যস্ত ছিল অতীনের অবস্থান। সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করা মানে, সে চাইছিল না তার সেই অসহায় বিপন্নতার সাথে আমার জীবন জড়াক, সে জানত, তাতে কিছুদিন পরই স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণায় আমি অস্থির হয়ে পড়তে পারি, সে এই কারণে আশঙ্কিত হয়ে আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

আমি চুপ হয়ে যাই।

মিস্টার এম. প্রশ্ন করেন— এরপরই অতীনের সাথে আপনার বিচ্ছেদ ঘটে?

প্রচুর প্রচুর প্রতিজ্ঞা ভেঙেছি ওর সাথে সম্পর্কের সময়— আমি বলি, যে সম্পর্ক প্রাণের, প্রাণের মধ্য তার মৃত্যু ছাড়া কী করে একটা বিচ্ছেদ ঘটে? ও যদি আমার স্বামী হতো, তাহলে তালাকের কাগজে সই করে একটা চিরকালীন বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেয়া যেত। কিন্তু আমরা দু'জনই দু'জনকে গভীর প্রাণ থেকে অনুভব করছি, দু'জনই অসহ্য কষ্টে পুড়ে খাক

হচ্ছি, বাস্তবতার প্রেক্ষিতে দু'জন একসাথে বাস করব না বলে দু'জন দু'জনকে আর চিনব না, কী করে সম্ভব ? অথচ আমি তা-ই করেছি, ওর হাত আমার হৃৎপিণ্ডের ওপর চেপে রেখে বলেছি, এরপর যদি যোগাযোগ কর, আমার লাশের সাথে করবে— আপনার কাছে বিষয়গুলি ছেলেমানুষী মনে হতে পারে, মিস্টার এম., গভীর প্রেমে দু'জন পরিণত বৃদ্ধবৃদ্ধাও সদ্য প্রেমে পড়া তরুণ তরুণীর মতো আচরণ করে। অন্যের কাছে বিষয়গুলিকে হাস্যকর, ভীমরতি নানা কিছু মনে হতে পারে, অন্তত অন্তত অতীনের মতো জাঁহাবাজ প্রাবন্ধিক সেই শপথের প্রেক্ষিতে পুড়ে খাক হয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে রাতের পথ হাঁটতে পারে, অনেক রাত অব্দি আমার বাড়ির অদূরের ল্যাম্পপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, ওকে যারা চেনে তারা এটা মরলেও বিশ্বাস করবে না। আমি সেই প্রতিজ্ঞার পর একটা রাতও ঠিকমতো যায় নি, সকাল সকাল ওর অফিসে গিয়ে হাজির হয়েছি। ওর চোখে সারারাতের অনিদ্রা, ও সন্তর্পণে পেপার ওয়েট টেবিলে রাখার ছল করে আমার বাড়ানো হাত ছুঁয়ে বলে, প্রতিজ্ঞা আমি করি নি, এই আমি লাশের মধ্যে প্রাণ স্থাপন করলাম।

মিস্টার এম.-এর মুখে ছায়া। তিনি অস্ফুটে বলেন, তার মানে অতীন আপনার জীবন থেকে অতীত হয়ে যায় নি, সে এখনো...?

ওহ্‌হো, আপনাকে তো সুশোভনার অনেক কথাই বলা হয় নি, আমি হঠকারীভাবে প্রসঙ্গ ঘোরাই, বিশেষত একটা বিষয়ে, না আজ আর আমি ওর প্রবণতা আর প্রেমিকদের গল্প করব না। আমি কেন ওকে বোরাকের কাহিনী বলতে বাধ্য হয়েছিলাম আজ সেই গল্প বলব। আমি যেদিন ওকে বোরাকের ঘোড়ার গল্প করি, তখন ও ছিল সাংঘাতিক ডিপ্রেস্‌ড্ মানে সে নিজের আত্মাকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে। একে ওকে চিঠি পোস্ট করেছে, শেষ বিদায় জানিয়ে। আমাকে একটা পাঁচতারা হোটেলে নিয়ে গিয়ে খুব ঠাণ্ডা মাথায় জানাল নিজের সিদ্ধান্তের কথা। যেন মস্ত কোনো ডিগ্রি নিয়ে বিদেশ যাচ্ছে, এরকম ছিল তার মুখের ভঙ্গি... প্রচুর খাবারের অর্ডার দিল এবং বলল, যেহেতু মৃত্যুর পর কিছুই দেখতে পাব না, সব অন্ধকার, তা-ই আগে থেকেই সবাইকে বলে কয়ে সবার কী কী অনুভূতি হয়, দেখে যেতে পারছি। নন্দিনী, যারা আত্মহত্যা করে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তারা নিঃশব্দে কাউকে কিছু বুঝে উঠতে না দিয়েই কাজটা করে। যেন এটা না করলে সবাইকে জানালে তাকে কেউ আর মরতে দেবে না। আরে, সিদ্ধান্ত যদি আমার স্থির থাকে, একজন মানুষ আরেকজনকে কতক্ষণ পাহারা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারে ? খুব অল্প সময়ের মধ্যে তুমি আমার সবচাইতে, কাছে চলে এসেছ, এই জন্যই সবার কাছে বিদায়পর্ব শেষ করে তোমাকে নিয়ে বসেছি...।

আমি ওর মুখের ঠাণ্ডা কাঠিন্য দেখে, বুঝলেন মিস্টার এম. বিষয়টাকে আর হেঁয়ালি হিসেবে নিতে পারলাম না। যারা এইসব ক্ষেত্রে চূড়ান্ত আপসেট থাকে তাদেরকে তবুও দু'চার পাঁচ কথা বলে ফেরানো যায়। কিন্তু সুশোভনা রীতিমতো রাজ আয়োজন করে বিদায়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং মৃত্যু বিষয়টাকে ইতোমধ্যে সে নিজের মধ্যে এমন বর্ণাঢ্য করে তুলেছে যে এ থেকে কেউ তাকে এক বিন্দু সরাতে চাওয়া মানে যেন সে তার জীবনের মহা এক শত্রুতে রূপান্তরিত হবে।

আমার প্লেটে সুশোভনা চিংড়ির ফ্রাই তুলে দিতে দিতে বলে, সব ধ্বংস করে দিয়েছি, স..ব। শুধু তোমাকে একটা গভীর দায়িত্ব পালন করতে হবে, তুমি আমার ঘরের ড্রয়ার

খুললে দেখতে পাবে একটা কবিতার পাণ্ডুলিপি, আমার মৃত্যুর পর, যত বছর লাগুক কোনো প্রকাশককে সেটা দিয়ে তুমি একটা বই বের করবে।

আমার গলায় চিংড়ির ফ্রাই বরফ হয়ে আটকে যায়, শেষে প্রাণের উত্তাপ দিয়ে সেটাকে গলাতে গলাতে বোধ করি আমার ভেতরের ঝড়, তাপ-উত্তাপের কিছুই সুশোভনাকে বুঝতে দেয়া যাবে না। এখন ঠাণ্ডা মাথায় সমস্ত পরিস্থিতি ফেইস করাটাই হবে সবচাইতে কাজের, আমিও তাই করি, কী ব্যাপার সুশোভনা, কখনো তো জানাও নি তুমি কবিতা লেখো!

ভদকার গ্লাসে চুমুক দিয়ে সুশোভনা বলে, ওটা আমার কবিতার পাণ্ডুলিপি না। এই পাণ্ডুলিপির যিনি লেখক ওর নাম... বলতে বলতে মিস্টার এম.-এর সামনে খেই হারাতে থাকি, এ ক্ষেত্রে আমি সুশোভনার কাছে দায়বদ্ধ, ওর যথার্থ নাম আমি এখন বলব না... কী নাম দেয়া যায় ওর ?

মিস্টার এম. খানিক ভেবে আমাকে বলেন, ধরা যাক যীশু...।

আমি আহত মাথা তুলি... এ-তো আমি অতীনকে মনে করি, আপনি জানেনও সেটা, কেন এই নাম বললেন ? মিস্টার এম. শান্ত হাতে সিগ্রেট জ্বালিয়ে বলেন, আমার মনে হচ্ছে ওই চরিত্রটাও ক্রমশ প্রধান হয়ে উঠবে, এবং আপনি 'যীশু' বললেই ওর সম্পর্কে আন্তরিকভাবে বলতে পারবেন।

আমি চুপ করে থাকি। এরপর শান্ত কণ্ঠে বলি, আমি যে-কাউকে যীশু ডেকে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না।

মিস্টার এম. বলেন, আমি দুঃখিত, আপনার কথার ব্যাঘাত ঘটালাম।

আপনি কিন্তু অতীনকে ঈর্ষা করছেন!

মিস্টার এম. বলেন, করছি।

বলেই কণ্ঠে সুর তোলার চেষ্টা করেন, এটা তার নিজেকে ঢাকার প্রয়াস— আমি টের পেয়ে কুঁকড়ে যাই। মিস্টার এম. বলেন, আমি ভেবেছিলাম অতীন আপনার জীবন থেকে চলে গেছে, ঈর্ষা করে কী হবে নন্দিনী ? বরাবরই আমি যুক্তির কাছে পরাজিত মানুষ, সেই যুক্তি দিয়ে আমি আমার দুর্ভাগ্যকে মেনে নিয়েছি। আমার জীবনে যে-ই এসেছে, কারোরই আমি প্রধান মানুষ হতে পারি নি, পৃথিবীর কোনো পুরুষ, কোনো নারীর দ্বিতীয় মানুষ হয়ে নিজেকে অকপট উজাড় করে দিতে পারে না। এ হয়তো মানুষেরই সহজাত প্রবণতা। ঠিক আছে আপনি সেই কবির অন্য নাম দিন— আমার মাথায় হিসাব আছে, চূড়ান্ত বেহিসাব আছে, সেই বেহিসাবও চলে তার চাইতেও চূড়ান্ত হিসাবের ছকে, আমি ইচ্ছে করে বেহিসাবি হই, আমি জানি আমি কতটুকু বেহিসাবি হচ্ছি, কতটুকু বেহিসাবি আমার হওয়া চলে... তারপর ?

আজ থাক, বলে আমি দাঁড়াই।

সুশোভনার আত্মহত্যা ?

আরেকদিন বলব।

আচ্ছা।

এই শহরের পথ ধরে হাঁটি। উত্তপ্ত পিচঢালা বৈশাখী রাস্তা। মাথার ঘাম গলা গড়িয়ে... গড়িয়ে... গড়িয়ে... শূন্যে চোখ তুলতেই— আহারে দুই পাশে সারি সারি কত যে দিগন্ত জোড়া কৃষ্ণচূড়া! একটা গাছের সাথে পিঠ গেঁথে গেলে এর রূপ দেখে বোবা হয়ে যাই... পৃথিবীর সমস্ত গনগনে লালের মধ্যে এ-ই একমাত্র লাল— যে হিম... যে বরফের মতো ঠাণ্ডা, যে হিমালয়ের কথা মনে করিয়ে দেয়... আমার ঠোঁটে চুমু খায় অতীন— বলে, তুমি আকাশ নন্দিনী, আমার আছে একটা আকাশ, সেই আকাশে কখনো রঙধনু, কখনো রোদ্দুর, কখনো মেঘের খেলা, কখনো বিকট ঝড়... এত যার বিচিত্রতা, তাকে ছেড়ে শূন্য হবো! পাগল!

ঘোর রোদ্দুরে ঢেকে যায় শব্দাবলি। সুশোভনা আমাকে সেদিন পাঁচতারা হোটেলে নিয়ে গিয়েছিল। মাসের সমস্ত বেতন ঢেলে ফতুর হয়ে সেই রাতেই মৃতলোকে চলে যাবার কথা ছিল তার। সেই কবি, ঠিক আছে, না হয় তার নাম মৈনাক দেয়া গেল। যেহেতু সুশোভনা আমাকে বলেছে, জয় গোস্বামীর 'মৈনাক যখন তোমার চুল নিয়ে খেলছিল। আমি ঠাকুরকে ডাকছিলাম...' এই কবিতা পাঠের মধ্য দিয়েই ওদের দু'জনের পরিচয়। যেহেতু গভীর তলাকার বোধের জায়গায় সুশোভনা আমার অস্তিত্বেরই আরেক অংশ। মিস্টার এম.-এর সাথে সুশোভনা প্রসঙ্গে কথা বলতে আমি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছি, যেহেতু আমি বুঝতে পারছি, তিনি আমার বিষয়ে কথা শুনতেই বেশি আগ্রহী। কিন্তু সুশোভনা, অতীন এদেরকে বাদ দিয়ে আমি তো পূর্ণাঙ্গ কেউ নই। যে বোরাকের ঘোড়া আমার সামনে পেতে দিয়েছিল গনগনে অন্ধকার, সেই ঘোড়ার কাহিনীই সেই বর্ণাঢ্য হোটেলের পুল সাইডে সুশোভনাকে মৃতলোক থেকে জীবনে ফিরিয়ে এনেছিল। কিন্তু কেন ছিল সুশোভনার মৃত্যুসিদ্ধান্ত?

সুশোভনা বলেছিল, আমি যুক্তি দিয়ে আমার সমস্ত অনাচারকে নিজের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারি। আমি ভীষণ ক্ষতিকর! আমি মানসিক এবং শারীরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিজের আনন্দকে বড় করে দেখি। পাপ বলতে আমি বুঝি, ধর্ষণ, খুন, পরধন লুট... কিন্তু ধরো সকালে আমাকে কেউ তুমুল আদর করে গেল, আমি সেই ঘোরে ভাসছি... দুপুরে আমার আরেক প্রেমিক এলো, তখন ভয়ানক গ্লানি, অস্বস্তি হতো প্রথম প্রথম— মনে হতো আমি সবাইকে ঠকাচ্ছি... কিন্তু আমার সেই অনুভব আমার দ্বিতীয় প্রেমিকের কাছে নিজেকে সমর্পণ করার ক্ষেত্রে কখনো বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় নি... এইভাবে এক সময় গ্লানি কেটে গেল, দ্বিধা কেটে গেল, আমার মনেই হতে শুরু হলো, প্রাণটা যেহেতু আমার, শরীরটাও... এ নিয়ে আমার কারো সাথে কোনো দায় নেই... তোমাকে বোঝাতে পারব না নন্দিনী ওইসব সম্পর্কের সময়ও আমার জীবনে মৈনাক ছিল, তার কবিতা ছিল, কিন্তু তার কোনো ব্যাপক প্রভাব আমার মধ্যে ছিল না। অথচ একসময় ওইসব বন্ধুদের মাঝখান থেকেই এক সময় মৈনাক হয়ে উঠল আমার প্রাণের পরম প্রধান জন।

সে-কী সুশোভনা, তোমার জীবনেও তেমন কেউ ছিল?

সুশোভনা হাসে, তুমি দেখবে, বেশ্যাদেরও গভীর প্রেমের একজন থাকে, যেখানে তারা মনসহ শরীরটাকে পেতে দেয়, টাকার হিসাব সেখানে তুচ্ছ...!

সুশোভনা! কী বলছ তুমি? তুমি এখন তোমার সেই প্রেমিকদের অপমান করছ! তারা তাদের প্রেম নিয়েই তোমাকে স্পর্শ করত!

আসলে নন্দিনী, আমি ভয়ানক দুমড়ে গেছি— তাই হয়তো যুক্তির মধ্যেও গিঁট লেগে যাচ্ছে, আমি লাগসই কোনো শব্দে মৈনাককে বোঝাতে পারছি না— ও আমাকে কী প্রচণ্ড ভালোই না বাসত, পাগলের মতো বাসত, আমার জন্য মরতে পারত, এবং অসাধারণ কবিতা লিখত, এবং তা লিখত আমার উদ্দেশেই, যা সে বই হিসেবে বের করে সবার করে ফেলতে চায় নি। নন্দিনী, প্রতিটি মানুষের কিছু কিছু আলাদা সৌন্দর্য থাকে, যা একজনের মধ্যে পাওয়া যায় না। আমি ওর মধ্য থেকেই যার যা সৌন্দর্য নিয়ে নিয়ে নিজেকে পূর্ণ করে এই সিদ্ধান্তে এলাম যে, কোনো আনন্দে পাপ নেই। আনন্দ সব সময়ই সুন্দর। কিন্তু হলো কী জানো, ক্রমে ক্রমে গভীরতা হারাতে শুরু করলাম। এমনও হয়েছে, আমার প্রেমিক আমার মাংসকে স্পর্শ করছে, আমার ভেতর কোনো খবর হচ্ছে না নন্দিনী। নিজেকে নিয়ে খুব ভয় শুরু হলো। এর মধ্যে একমাত্র মৈনাকই আমাকে স্পর্শ করত না। সারাক্ষণ আমার ভালোমন্দের খোঁজ নিত। আমার বন্ধুদের বিষয়ে ওর মুখ ঈর্ষায় বিষাক্ত হয়ে উঠলেও ও কোনো কথা বলত না। এক সময় নন্দিনী, আমি টের পেতে শুরু করি আমার সমস্ত শারীরিক অনুভূতি মরে যাচ্ছে। প্রেমিকদের সান্নিধ্য আমার ভালো লাগে, অসহ্য ঠেকে শরীরটাকে। কিন্তু ওরা তো শরীরসহই আমাতে অভ্যস্ত, ওরা একেকজন প্রথমে ক্রোধ, পরে বিপন্নতা, পরে... নানাভাবে মরতে শুরু করল... এর মধ্যে একরাতে আমি একা রাত্রিজ্বরে ছটফট করছি, মৈনাক ফুল নিয়ে এসে হাজির হলো। সারারাত আমার সেবা করে ভোরে চলে যাবে, ওকে আমি খামচে ধরি, তুমি আমাকে ঘৃণা কর, না ?

মৈনাক বলে, না।

কর! কর! না করলে প্রমাণ দাও।

কীভাবে ?

কেন ? আমাকে স্পর্শ করে ?

সুশোভনা! স্পর্শ এমনই একটা দিগন্তজোড়া অপার্থিব বিষয়, যার মধ্যে প্রমাণের কোনো জায়গা থাকতে পারে না!

তুমিই একমাত্রজন, যার কাছে আমি কিছুই গোপন করি নি, মৈনাক, তুমি আমাকে স্পর্শ করে আমার শরীরের সব গ্লানি মুছে দাও।

মৈনাক বলে ছিঃ সুশোভনা— এখন তুমি তোমার প্রেমিক, তাদের স্পর্শ এবং প্রেমকে ছোট করলে!

কী করব আমি ? বলে কান্নায় ভেঙে পড়ি, আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়, অণু-পরমাণু তোমার স্পর্শের স্বপ্নে দুমড়ে, মুচড়ে মরতে বসেছে... তুমি আমাকে স্পর্শ করে আবার আমার শরীরে নতুন প্রাণ দাও, নতুন রোমাঞ্চ দাও... বাকি জীবনটা আমি একমাত্র তোমার স্পর্শ নিয়েই বাঁচি।

ওয়েটার পাঁচ নম্বর গ্লাস দিয়ে গেলে বরফ আর লেবুর গোল চাকতির মিশ্রণে গুঁড়ি গুঁড়ি হয়ে ওঠে সুশোভনার গেলাস। আমি দেখি, ডাইনে নীল জল... দুই তিনজন শাদা বিদেশী মৎসের মতো ঘাই দিয়ে জলে পড়ে সাঁতার কাটছে।

আমি কোকের গ্লাসে চুমুক দিয়ে সুশোভনার ঢুলু হয়ে আসতে থাকা চোখ দেখি, ইচ্ছে হয় বলি, আর খেয়ো না, কিন্তু কী লাভ ? যে আজ রাতেই মরার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাকে

কি এই শব্দ ঠেকাতে পারবে? সামনে সারসার খাবার ঠাণ্ডা হচ্ছে। আমি তার চাইতে বরং আশেপাশের গোল গোল টেবিলের চারপাশে বসা মানুষদের নিম্ন কণ্ঠের তর্ক থেকে ভব্যতা শেখার চেষ্টা করি। যে বিষয়ে একেকজন কথা বলছে, পাঁচতারা হোটেল না হলে টেবিল ভাঙা চিৎকারে কান ফেটে যেত।

কাঁটা চামচে চিকেন ফ্রাই ভাঙতে হবে? আমি যখন এই সংকটে পড়েছি সুশোভনা হাত দিয়ে মুখে চিকেন ফ্রাই ঢুকিয়ে কুড়মুড় খেয়ে মৃত্যুর আগের স্বাদে পূর্ণ করে।

সবতো হলো, সুশোভনাকে আমি এখন কী করে ঠেকাই? রুদ্ধশ্বাসে চেয়ে থাকি ওর চোখের দিকে। সুশোভনার মুখে শীতলতা... কী যেন গভীরভাবে ভাবছে ও। আমি প্লেটে কাটা চামচ দিয়ে টুং টুং শব্দ করি, তারপর?

সুশোভনা গভীরতল থেকে উঠে আসে... আমি আজ জল থেকে মুখ ঘুরিয়ে রেখেছি। নইলে কোন ফাঁকে কখন যে সুশোভনার এই সংকট থেকে আমি যে কোথায় কোথায় উড়ে যাই!

সুশোভনা বিড়বিড় করে বলে, যেদিন মৈনাক আমাকে স্পর্শ করে, তোমাকে বোঝাতে পারব না কী অলৌকিক সেই স্পর্শের ধ্বনি, আমি কোনোদিন জানতাম না আমার শরীর এবং মনের এত এত গভীর স্তরে লুকিয়েছিল এমন উন্মাদনা...

সুশোভনা কাঁদতে থাকে।

খাবারগুলি যথারীতি ঠাণ্ডা হচ্ছে!

ওয়াও... বলে পাশের টেবিলে চেঁচিয়ে ওঠে কেউ... ঝাঁকড়া চুলের ফরেনার। সে-ও আমাকে দেখছে, কিন্তু তাতে কী, আমি এখন সুশোভনাতে... সুশোভনা আশ্চর্য মেয়ে, এইরকম একটা গভীর যন্ত্রণা অথবা প্রেমময় অবস্থা থেকে নিজেকে তুলে নিয়ে বলে, আমি তোমাকে আগেই বলেছি মানুষের সাথে মানুষের মানসিক এবং শারীরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমার মধ্যে পাপ পুণ্যের কোনো অনুভব ছিল না, এই যেমন, ফায়ার ছবিটা দেখার আগে আমি কল্পনাও করতে পারতাম না একটা মেয়ে আরেকটা মেয়েকে স্পর্শ করে কী সাংঘাতিকভাবে জেগে উঠতে পারে! নন্দিনী, আমাতে যা দাগ কাটে তাতে আমি সাংঘাতিক অনুপ্রাণিত হই। এই সমাজে বন্ধুদের কেন্দ্র করে আমার বদনাম এবং ঢিঢির সীমা নেই, আমার নিজের সিদ্ধান্ত ছিল কোনোদিন বিয়ে করব না। যাহোক, ফায়ার দেখে মনে হলো, এই সমাজ একজন মেয়ের সাথে আরেকটা মেয়ের সম্পর্ককে সম্মানের, সহানুভূতির চোখে দেখে। কিন্তু আরেকটা মেয়ের প্রতি প্রেমময় শারীরিক অনুভব? নন্দিনী, বানিয়ে সম্ভব? সম্ভব হলে আমি তোমাকে চেষ্টা করে দেখতাম, না, না উত্তেজিত হয়ো না, আমি আমার অনুভবটা বলছি মাত্র, কারণ এই সমাজটি মেয়ের বন্ধুত্বকে সবচাইতে পবিত্র আর সুন্দর চোখে দেখে। অথচ সেই সম্পর্ক নানারকম অবদমনের কারণে অশ্লীল আর সাংঘাতিক হয়ে উঠতে পারে, এ এই সমাজ কল্পনাও করতে পারে না। তারা একজন ছেলের সাথে একজন মেয়ের সাধারণ বন্ধুত্বের সম্পর্ককেও গোড়া থেকেই সন্দেহের চোখে দেখে। তারা দুটি মেয়ে বছরের পর বছর এক বিছানায় ঘুমালেও কিচ্ছু সন্দেহ করে না। অন্যান্য আধুনিক দেশে দুটো মেয়ে হাত ধরাধরি করে চলা বিষয়টা অশ্লীল, আর এই দেশে দু'জন ছেলেমেয়ে দুই থেকে চারদিন এক সাথে চললেই তার মধ্যে কুৎসিত গন্ধ খুঁজে পায়। সত্যি নন্দিনী,

আমার মধ্যে যদি সেই বোধ থাকত, অন্তত এই বাস্তবতার বদনাম এড়ানোর জন্য আমি তোমাকে চেষ্টা করে দেখতাম। তাতে আমার সব কূলই ঠিক থাকত।

সুশোভনা... তুমি এই কথা কীভাবে বলো ? তুমি নিজেই কি সমাজের সন্দেহের বাইরে কিছু করেছ ? বন্ধুত্বের মূল্য তো তুমিও রাখ নি, তুমি তাদের সাথে শারীরিক সম্পর্ক করেছ, যা হোক তুমি তোমার মূল প্রসঙ্গ থেকে সরে যাচ্ছ। সুশোভনা ফের ভদকায় চুমুক দিয়ে বলে, এরাও কি ভেজাল মেশায় ? ঠিক ধরছে না কেন বলো তো ? যাহোক, আমি তবে সেই বিকেলের ঘটনাটা তোমাকে বলি, আমার বন্ধুদের মধ্যে একজন, যে আমাকে সবচাইতে বেশি ভালোবাসত... না না... বন্ধু না, প্রেমিকদের একজন, সে যখন টের পেল তার স্পর্শেও আমি নিজেকে মৃত বোধ করছি, তার মাথা খারাপ হয়ে গেল, সে অফিসে যায় না, চাকরি করে না— কী যে বেহাল অবস্থা! শেষে আমাকে ফোন করে বলল, আজ বিকেলে তোমার বাসায় আসছি। এই আমার শেষ আসা। তুমি যদি আমার স্পর্শে জেগে না ওঠো, জীবনে আমি আর তোমার পথে আসব না। তুমি ভেবে দেখো নন্দিনী, কী বিপদে আমি পড়লাম! কিন্তু ওর যা অবস্থা তখন মনে হচ্ছিল ভান করে হলেও আমার জীবনে ওর স্পর্শের মূল্য আছে, ওকে এটা বোঝানোই মনে হলো আমার প্রধান দায়িত্ব। এদিকে মৈনাক— ওর সাথে দায়বদ্ধতা— আমি ভেঙেচুরে খাক হয়ে বিকেল অব্দি— এই বলে খেই হারিয়ে সুশোভনা আরেক পেগের অর্ডার দেয়।

আমি বলি, তারপর ?

কী হবে শুনে ? ফণা তোলে সুশোভনা, আমার মৃত্যুর পরও তুমি আমাকে ঘৃণা করবে।

তারপরও বলো, আমি বলি, মৃত্যুর পর কে তোমাকে কী করল, কী এসে যায় তাতে তোমার ?

সেটাই তো আসল! সুশোভনা হাসে, যদি তাই হতো তবে সবাই এই ভোগের জীবনে গা ভাসিয়ে মরে যেত, এবং আমিও, তোমাদের কিছু না বলে গলায় দড়ি দিতাম। জন্ম ক্ষণস্থায়ী নন্দিনী, মৃত্যু অসীম... নন্দিনী, সেই রাতে আমি আমূল মৈনাকের স্পর্শে উদ্ভাসিত হয়ে বলেছিলাম, আজন্ম এই স্পর্শ নিয়েই থাকব... ছিলামও তাই... দুই রাত দুই দিন... মৈনাক তখন শহর থেকে বাইরে গেছে কাজে, আমি মন এবং শরীরের যেখানে স্পর্শ করি মৈনাকের নিঃশ্বাস, মৈনাকের স্পন্দন... আমি অমন আধমড়ার ঘোরে জীবনে পড়ি নি... বলতে বলতে চেঁচিয়ে ওঠে সুশোভনা— ওয়েটার। এই খাবারগুলো নিয়ে যান, দেখছেন না আমরা খাচ্ছি না!

অন্তু! অন্তু! কোথায় তুমি ?

তোমার সমস্ত কথা কেন এত গভীর আর নৈঃশব্দ্যে পূর্ণ ?

যে তোমার সারাদিনের কথার পরেও মনে হয়, তুমি কিছু বলো নি!

সুশোভনা!

সুশোভনা, তারপর ?

টেবিল খালি! সুশোভনার মুখে রক্ত জমাট বাঁধা। চোখে কী ? কী ? খুঁজে পাই না। অসহায় বোধ করে মুখ থুবড়ে থাকি।

সুশোভনা বলে, দু'দিন পর এক বিকেল, আমি নিজেকে তৈরি করলাম এইভাবে, যেন ওই প্রেমিক পেসেন্ট, আমি ডাক্তার, ওর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্য আমার যা যা করা দরকার আমি তাই করব... এক সময় সে এলো, আমার দিকে অসহায়, যন্ত্রণাকাতর, ক্রুদ্ধ চোখে সে তাকাল, আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না, আমি কী করব, আমিও তাকিয়ে থাকলাম তার মতোই বিপন্ন চোখে, শেষে সে এগিয়ে এলে আমার মনে পড়ে গেল, এই মুহূর্তে ওকে বাঁচানো আমার দায়িত্ব, ও বুঝুক, ওর স্পর্শের মূল্য আছে, আমি ভেতরে ভেতরে নিস্তেজ, নিষ্ক্রিয় হয়ে ওকে চুম্বন করলাম, অভ্যাসবশে আচরণ করতে শুরু করলাম সেই আগের মতো, যা তার সাথে আমি করতাম— আমি ভুলে গেলাম, দরজা ভেজানো, যে কেউ আসতে পারে— এর হয়তো একটাই কারণ আমার মধ্যে তখন একজন চিকিৎসকই ভর করেছিল...।

মৈনাক দরজায় এসে দাঁড়াল।

নন্দিনী, আজ থাক। এরপর কী হতে পারে, সে তো তুমি আন্দাজ করতেই পার। পুরুষের শরীর এবং ঈর্ষা দ্রুত উত্তপ্ত হয়। পৃথিবীতে কোথাও দাঁড়াতে পারি নি... কী অসহ্য অপমান... মৈনাকের চোখ... কী অপমান! জানো, ও টাকা ছুঁড়ে মারল আমার দিকে, বলল, আমি ওর চাইতে বেশি দাম দেব, তুমি ওকে ছেড়ে আমাকে নাও... নন্দিনী, সব সয়ে বাঁচা যায়, অপমান! আমি মৃত্যুর বিনিময়ে মৈনাককে বুঝিয়ে যাব, ও ভুল বুঝেছে, আমাকে অনুভব দিয়ে কেনা যায়, টাকা দিয়ে নয়, এটা ও কী করল নন্দিনী, কী করল... পুরুষের ঈর্ষা এত সাংঘাতিক হতে পারে, আমি জানতাম না। আর ওকে দোষ দিয়েই কী লাভ, ও-তো নিজ চোখেই দেখেছে, ওর দু'দিনের অনুপস্থিতিতেই আমি ওর স্পর্শ ভুলে ফের পুরনো পথে পা বাড়িয়েছি।

মিস্টার এম., আজকের বাতাস ভীষণ সুন্দর, আকাশের মেঘ, কী বলেন?

যে-কোনো সময় বৃষ্টি আসতে পারে।

সে-তো পারেই, প্রকৃতির কখন কী হবে, আমরা কী জানি? তাই বলে তো আমরা হাঁটা বন্ধ করতে পারি না। আজ যদি কাঠফাটা রোদ হতো, এই গরমে এই জায়গায় হাঁটাই যেত না। মেঘলা প্রকৃতি আমাকে যে কী করে! কেবল জাগতিক মানুষগুলি কটকট চোখে আমার উজ্জ্বল সরল কাণ্ড দেখে অবাক হবে, এই ভয়ে ঘরে বন্দি থাকি, জানালা দিয়ে বৃষ্টিগুলোকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে কারাগারের দুঃসহতা ঘোচাই। আজ আপনিই দেখুন, রমনার ধুলোগুলো পর্যন্ত, পাতা বাতাসের সাথে উড়ে উড়ে কী কাণ্ডই না করছে... আহা! দিন না এক মস্ত লম্বা ফুঁ— বলতে বলতে আমি বৈশাখী ঝড়ে উড়তে থাকা ধুলোপাতার দিকে তাকাই এবং মিস্টার এম.-এর নিস্তরঙ্গ মুখ দেখে ক্রমশ নিভে আসতে থাকি, আমি সহসা খুঁজে পাই না এরপর কী বলা যায়!

কেনরে বুকের মধ্যে ঘা দিচ্ছিস অন্তু? এরকম পরিবেশে কী করত সে? আমাকে ঘাস মাটির মধ্যে ঠেসে স্থির চোখে চেয়ে থাকার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠত।

আমার শরীর কাঁপছে।

নিজেকে ঘোচাতে ফের শব্দের কাছে সমর্পিত হই— মিস্টার এম., ওইযে রমনার জলের ঘাটটা দেখছেন, ওইখানেই আমার প্রথম পরিচয় সুশোভনার সাথে।

মিস্টার এম. চোখ কুঁচকে বাতাসের দুর্মর বেগ সামলে বলেন, চলুন জলের ধারে যাই।

আমার হাত-পা হিম হয়ে আসে— না।

কেন?

না।

এইযে আপনিও হিসেবি হচ্ছেন। নিজের ওপর আপনার আস্থা এত কম কেন নন্দিনী?

আমি ভয়ে ভয়ে বলি, আমার নিজের ওপর আস্থা ঠিকই আছে মিস্টার এম., জলের ওপর আস্থা নেই।

অতীন এবং সুশোভনার সময় কিন্তু আপনি জলকে ভয় পান নি।

সে অন্য বিষয়।

তাহলে আমাকে এ-ই মেনে নিতে হবে, নিছক জল এবং পাথর নয়, তার সাথে সম্পর্কযুক্ত মানুষ আপনাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়!

না। তা-ও ঠিক না।

এবার কিন্তু অতীন আর সুশোভনাকে আপনি গড়পড়তায় ফেলে দিলেন! আপনি যার সাথেই জল আর পাথরের সামনে দাঁড়ান, সেই আপনাকে ভাসিয়ে নেয়?

না!

মিস্টার এম. রমনার ভূমণ্ডল কাঁপিয়ে হা হা শব্দে হাসেন, আপনাকে আর বিপদে ফেলতে চাই না, এখন কিন্তু আকাশ থেকে জল পড়বে, চলুন কোথাও আশ্রয় নিই।

বৃষ্টি পড়ছে। চারপাশটা মিশমিশে দাউদাউ আঁধারে কাঁপিয়ে অস্থির করে সশব্দ বাতাস প্রথমে! এরপর গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির তীক্ষ্ণ ফণা, সেই তোড়ের স্রোতে আমার বুকের আঁচল কখনো স্থির, কখনো অনাবৃত... দেয়ালের মধ্যে আমার দেহ ঠেসে যাচ্ছে... মিস্টার এম. অদূরে ইশারা করছেন তাঁর গাড়ির ড্রাইভারের প্রতি—

ভাগ্যিস এই হিসাবটা তাঁর আছে। বৃষ্টি তাকে উন্মাদ করে না। তবে তার আকাঙ্ক্ষার কাছে আমার অসহায় হয়ে যাওয়ার একটা বিষয় ঘটতে পারত। মানুষটার পরিমিতিবোধ আমাকে মুগ্ধ করছে... সাথে সাথে অকল্পনীয় উত্তাপে অনুভব করছি অতীনকে— এই অপার্থিব রমনার বৃষ্টির মধ্যে তার আমূল সুন্দর চোখের নিচে ঢাকা পড়ত আমার চোখ... ঈশ্বর... এই হিসেবের পৃথিবীতে কেন আমার জন্ম হলো!

তুমুল বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চলছে। মিস্টার এম. সামনে ঠাণ্ডা চোখ রেখে চালাচ্ছেন। কেউ কথা বলছি না।

আমি দেখছি উন্মাদ কৃষ্ণচূড়া!

বলুন! মিস্টার এম. কান পাতেন।

কী?

তারপর?

কী বলব আমি ? এই কথা বলে ঘুটঘুটে শহরটাকে দেখি। আমার কেবলই সুশোভনার কথা বলতে ইচ্ছে করছে।

তবে তার সম্পর্কেই বলুন।

কিন্তু তার সম্পর্কে আপনাকে কখনো আগ্রহী হতে দেখি না, এজন্যই থেমে যাই।

আপনি ভুল বুঝছেন নন্দিনী, ওর বিষয়ে কিছুটা নিস্পৃহতা আমার প্রথম পর্যায়ে ছিল, এখন মনে হচ্ছে আপনাকে বুঝতে গেলে সুশোভনাকে বোঝাও আমার জরুরি।

গাড়ি চলছে।

আছড়ে বিছড়ে পড়ছে জলবাতাস। হিমহিম অনুভূতিতে আমি যে কোথায় কোথায় যাই। নাহ! অন্তত মিস্টার এম.-কে নিয়ে সমুদ্রের ধারে যাব না। ওঁর সাথে মিশতে হলে অন্তত অনেকটাই ওঁর মতো হওয়ার ব্যাপার আছে। এখানে হাত-পা মেলে পাখি হওয়ার সুযোগ নেই। তাতে উনি ভীত হতে পারেন। আমি তাঁর কথা থেকে নয়, জীবনপ্রণালি দেখে দেখে এই সিদ্ধান্তে এসেছি, তিনি দায়িত্ব নিতে ভয় পান, তার নির্মিত পরিমিতিস্তরের বাইরে কিছু হলে চিন্তিত বোধ করেন, তার মানে একজন বেহিসাবি মানুষের সাথে কম-বেশি হিসাবের সম্পর্ক। অবশ্য নিজের হিসাব-বেহিসাব সম্পর্কে উনি নিজেও তা-ই বলেছেন।

আমি ক্রমশ টের পেতে থাকি পুরুষের শক্তিমান হওয়ার সূত্রপাত মূলত তার কোনো-না-কোনো পরাজয় বা দৈন্য থেকে। মেয়েরা কম বেশি দৈন্যে, অসহায়ত্বে হিংস্র হয়ে ওঠে, কখনো হয়ে ওঠে ছলনাবাজ ; পুরুষরা অবয়বে লটকে নেয় স্থৈর্যের মুখোশ।

কী জানি মানুষ সম্পর্কে যে-কোনো স্থির সিদ্ধান্তে কী করে আসা যায়, যে মানুষের মূল প্রবণতাই প্রায়শ স্ববিরোধিতায় পূর্ণ ?

যদি অতীন হতো, পৃথিবীর কিছুকে তোয়াক্কা না করে নেমে পড়ত জলে। যে গাড়ির কাচ ভেঙেচুরে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য জলেরা উন্মাদ হয়ে পড়েছে তাদের উন্মাদনাকে উপেক্ষা করে কী করে নিজের গল্প করি ? এছাড়া আমি ঠিক মিস্টার এম.-কে নিয়ে জলের তোড়ে হলেও কোথাও ভেসে গিয়ে আত্মনিমগ্ন হতে পারি না। এ ক্ষেত্রে কোথায় জানি আমাদের গভীর তলাকার গভীর অমিল সারাক্ষণ তার সামনে আমাকে সচেতন রাখছে। মিস্টার এম. হয়তো সেই মানুষ যে প্রচণ্ড প্রেমে বিছানার সম্পর্কের কিছুক্ষণ পর অন্য এক মুখ নিয়ে ব্যবসার কথা বলবেন। তাঁর সাথে এর আধঘণ্টা পর রাস্তায় দেখা হলেও সেই সম্পর্কের কিছুমাত্র ছাপ মুখে না রেখে কাটকাট কথায় কুশল জানতে চাইবেন। সেদিন তার মুখে এক আজব হাহাকার দেখেছি। তিনি আমার যে-কোনো বেদনাপূর্ণ অতীতকেই ঈর্ষা করে বলছিলেন, আপনার জীবন এত কাঁটা আর ক্ষত-যন্ত্রণায় পূর্ণ, কী সৌভাগ্য আপনার ? তার মানে তিনি তাঁর সহজ সরল অতীত জীবনকে তাচ্ছিল্য করে আর দুর্বিষহ অতীতের প্রতি আগ্রহী হয়ে আমাকে রীতিমতো ভাগ্যবান মনে করছিলেন।

নাহ্! দুঃসহ ঠেকছে। আমার মাথার শিরাগুলো শিরশির করছে, আর উড়ন্ত অতলান্ত শরীর এই মুহূর্তে মিস্টার এম.-এর পরাধীন গাড়ির মধ্যে দম চেপে মরতে বসেছে প্রায়। কী হয়, মিস্টার এম.-এর বিস্ময় উপেক্ষা করে গাড়ির পাল্লা খুলে উন্মাদ শহরে বেরিয়ে পড়ি। সারা শহরের ছাতা মাথায় লোক অবাক স্থবির দাঁড়িয়ে পড়েছে। আমি পাগলের

মতো ভিজতে ভিজতে একটা রিকশা নিয়ে দেখি, মিস্টার এম.-এর গাড়ি তেমনই অদূরে স্থির, সে তো আর অতীন নয়, আধপাগল, বিচলিত হয়ে ছুটতে ছুটতে আমার পেছনে আসবে!

ক্ষের ঘুমের মধ্যে কুঁকড়ে উঠি। অথবা আধঘুমে, অথবা তন্দ্রায়, অথবা জাগরণ ভাবনায়, হে সদা প্রভু আমি এক অপার আসমান স্বপ্নকে এনে বন্দি করেছিলাম কুয়োয় এবং তথাপি নিজেও প্রবেশ করে ভেবেছিলাম এ হতেই জন্ম নেবে সৌরজগত... বিছানা থেকে উঠে সুশোভনার দেয়া পাথরের ছোট্ট মেয়ে মুখটির সামনে দাঁড়াই... সেই মেয়ের দুই হাত দুই উর্ধ্বপানে প্রসারিত হয়... ক্রমশ সেই আদলে কার মুখ? এ-কী! ডানায় পেরেক কেন? সুশোভনা তো আমাকে নারী মুখই উপহার দিয়েছিল! নাহ্ ঝাপসা লাগছে। মাথার কোঁকড়ানো ঝাঁকড়া চুলের মাঝখানে যীশু... তার দুই হাত দিয়ে রক্ত পড়ছে... টপটপ... আমি বেদনায় ভিজে যেতে যেতে ওর মধ্যে সেই ছেলেবেলার ভাস্করকে দেখি... ওর ঘরেও মস্ত এক যীশু ছিল। আমি স্তব্ধ দরজায় দাঁড়ালে মধুর হেসে বলেছিল, কি, সুন্দর?

তখনই জানলাম শিল্পীরা স্বার্থপর। তারা মৃত্যু-দৃশ্য চমৎকার রূঢ়তায় ফুটিয়ে তুলতে পারলেও অভিভূত হয়। এর ক'দিন পর ওর ঘরে আর যীশুকে দেখি নি!

কই?

সে বলে, ওটা একটা গির্জার অর্ডার ছিল, আমাকে তো খেয়েও বাঁচতে হয়, নাকি?

সদা প্রভু!

শূন্য ঘরে পাক খেতে খেতে ব্রহ্মপুত্রের সামনে গিয়ে বসি... পোড়া চাঁদের চক্রে পড়ে উত্তাল হয়ে উঠেছে স্রোত... মরা কাশবনগুলো পর্যন্ত সেই অসম্ভব স্রোতের নিঃসীমে হারিয়ে গেছে... আমি আজ একা! যে অতীন আমার জাগতিক কক্ষেও পাশে নেই, কী করে তাকে আমি উড়িয়ে এনে জলের ধারে ফেলি? তবুও আজকের বৃষ্টির পথ আমাকে চিরে চিরে দেখিয়েছে... তুমি একা! একা!

সদা প্রভু, আমি সেই স্বপ্নসহ সৌর জগতে উড়াল দেয়ার জন্য কত মই খুঁজলাম! কত মস্তক ঠুকলাম দেয়ালে দেয়ালে... জয়নুলের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে সেই স্বপ্ন পেয়ে আমি এমন উন্মাদ হয়েছিলাম, আমি ডোবা, দিঘি, ঘাস, মাটি সব চরণে তাচ্ছিল্যে মাড়িয়ে সদা প্রভু সেই কুয়োর মধ্যেই রূপ-রঙ-গন্ধ দিয়ে স্পর্শ নির্মাণের দুঃসহ চেষ্টা করতে করতে যখন অনুভব করলাম চারপাশ বদ্ধতার ক্রূর গন্ধ হয়ে আমার নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে আমার কণ্ঠনালী চেপে ধরছে, তখন আমার একাকীত্বের অহং চূর্ণ হলো, আমি পাগল প্রায় হয়ে দিঘিকে ডাকলাম, ডোবা ঘাসকে ডাকলাম, তারা তাচ্ছিল্য ভরা কণ্ঠে হাসতে শুরু করল। প্রকৃতি আমাকে নাশ করার আগেই, সদাপ্রভু আমি আমার শেষ অহংটুকু নিয়ে নিজেকে নাশ করব... প্রচণ্ড শব্দে ঘামতে ঘামতে টের পাই সুশোভনার মূর্তি আমাকে সুশোভনাতে রূপান্তরিত করেছে।

হায়! এ-কী আমি করছি! ধুঁকে ধুঁকে হলেও আমি জীবনের পক্ষের লোক। ছটফট করে আঁধার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখি পাকা আমের মতো স্থানে স্থানে ঝুলতে থাকা বাতিগুলি।

মনে পড়ে সুশোভনাকে সেই পাঁচতারা হোটেলে শেষ অব্দি আমি তাকে জানাতে বাধ্য হয়েছিলাম বোরাকের গল্পের কথা...।

'নগরে ভ্রমণকারী প্রহরীরা আমাকে দেখিতে পাইল, তাহারা আমাকে প্রহার করিল, ক্ষতবিক্ষত করিল, প্রাচীরের প্রহরীবর্গ আমার বস্ত্র কাড়িয়া লইল।' (সোলেমান, পরমগীত)

আরে! আসুন আসুন... আমি ভাবতেই পারি নি আপনি আমাদের বাসায় আসতে পারেন। খুব ভোরে মিস্টার এম.-কে দরজায় দেখে আমার হৃদয় আবেগজলে পূর্ণ হয়ে যায়।

সোফায় বসে ছোট্ট ঘরটায় চোখ বুলিয়ে তিনি মৃদু হাসেন, ভালোই সাজিয়েছেন।

আমি বলি, সুশোভনা থাকলে দেখতেন সব নষ্ট হয়ে আছে, ভাগ্যিস ও ট্যুরে, নইলে আপনি বলতেন এরা এত অগোছালো! আমি গোছাই, ও এলোমেলো করে।

গতকালকের বৃষ্টিপাতময় শহরে আমার নেমে আসা... আমি আড়ষ্ট বোধ করি, সেই আড়ষ্টতা কাটাতে বলি, মজার বিষয় কী, সুশোভনা মদ খেয়ে প্রায়শই চাইত, আমি কেন, সে মদ খেয়েছে— কেউ যেন এটা টের না পায়। মদ খেলে সে খুব গোছালো হয়, সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটি এমন গোপন জায়গায় লুকায়, পরদিন তা খুঁজে হন্যে হতে হয়, ঘর গোছানো মানেই...। তিনি শুধু এইটুকুই বলেন, জানি না সঙ্গগুণে কি-না সুশোভনার ভূত আপনার মাথাতেও মাঝে মাঝে ভর করে।

আপনি হয়তো ঠিকই বলেছেন মিস্টার এম., সবার মাথাতেই তা কম-বেশি করে, একজন কট্টর কঠিন বাস্তববাদীও হয় চূড়ান্ত ক্ষিপ্ততায়, নয় চূড়ান্ত আবেগে দেখবেন এমন কাণ্ড করে বসতে পারে, তখন সহসা তাকে সুস্থ মনে হবে না। আমি একজন পুলিশ ইন্সপেক্টরকে চিনতাম, চিনতাম কী বলছি, আমার চাচা, বিশ্বাস করুন জীবনে তাকে কেউ হাসতে দেখে নি। সে বাইরে থেকে এলে আমার চাচি এত জবুথবু হয়ে তার হুকুমগুলো তামিল করত, আমি ভেবে পেতাম না ঠিক কোন প্রক্রিয়ার ফলে সেই ঘরে সন্তানের জন্ম হয়। বাচ্চারা তার হুংকারের ভয়ে তার ধারে কাছে যেত না। একদিন ট্রেনে চাচার সাথে দাদার বাড়ি যাচ্ছি, শব্দ করে দম ফেলতেও আমার ভয় হচ্ছিল... হঠাৎ দেখি অপর পাশের সিটের পিলপিলে এক ফর্সা বাচ্চা এসে দুম করে চাচার পায়ে ঘুষি মেরে দিল। আমার তো রক্ত বন্ধ হওয়ার অবস্থা... কিন্তু চাচার মুখ বিকৃত ভাঁজে ফেঁপে উঠলে বাচ্চাটা হাততালি দিয়ে বলে, বাবা! কী সুন্দর হাসি!

বেকায়দা অবস্থায় পড়ে চাচা যেন তার সারা জীবনের আটকে রাখা হাসিটাকে ছেড়ে দিলেন! হা... হা... হা। এরপর পিচ্চিটা... দাদু দাদু বলে কখনো চাচার ঘাড়ে ওঠে, কখনো তার মুখে চিপস পুরে দেয়— চাচা জগতের সবাইকে ভুলে ট্রেনের সব যাত্রীর অবাক চোখের সামনে পিচ্চিকে খুশি করতে এমন বাঁদর নাচ জুড়ে দিলেন...।

নন্দিনী, আপনি মোটেই তেমন সহজ সাপ্টা মেয়ে নন, যে হঠাৎ কিছু আপনার ওপর ভর করলে আপনি আচরণের ভারসাম্য হারান। আপনি, সুশোভনা— আমার মনে হয় আপনাদের দু'জনের কোথায় সূত্রের মধ্যে কঠিন এক ঐক্য আছে। আপনি যুক্তি-বুদ্ধি-বিচার দিয়ে নিজেকে বেঁধে রাখেন, স্রোতের মধ্যে গা ভাসান না, মিস্টার এম. বলেন, সুশোভনা

ভাসায়— অন্যদিকে জল আর সমুদ্র আপনাকে যা করে, তা যে-কোনো সহজাত সাধারণ নারীকে করে না. আপনারা দু'জন যা-ই বলুন— বিচিত্র! এক কাপ চা হবে ?

অবশ্যই।

চা বানাতে বানাতে রান্নাঘর থেকেই চেঁচিয়ে গল্প করি, এমনিতে আমি কিন্তু ভালো চা বানাই. কিন্তু আপনাকে একলা বসিয়ে বেশিক্ষণ জল ফুটাতে পারব না। এখন বলুন, চিনি কম না বেশি!

একদমই না।

যাক, চিনি বেঁচে গেল। ট্রে সামনে রেখে মিস্টার এম.-এর মুখোশ পরা নিস্তরঙ্গ মুখের দিকে তাকাই— তিনি নিঃশব্দে চুমুক দিয়ে আমাকে অবাক করে দিয়ে বলেন, আজ শুধু আপনার বোরাকের কাহিনী শুনতে এসেছি!

আমি চায়ে চুমুক দিতে ভুলে যাই। সারারাতের বারান্দা-আঁধার আর যীশু-অস্থিরতা আমাকে অসাড় করে দেয়। যদিও এই কাহিনী আমি আরো দু'জনকে বলেছি, অতীনকে বলার সময় ছোবলের কোপে ফালাফালা হয়ে গেছি, সুশোভনাকে বলার সময় বেদনার তীব্রতার চেয়ে আমাকে মরিয়া করে তুলেছিল ওকে বাঁচানোর স্পৃহা— সুশোভনা, আমি সেই ছেলেবেলায় ভূমিষ্ঠ হয়ে বেড়ে উঠেছি বলা যায় অপমানের বীজ থেকে। যে বয়সটায় মানুষ সবে স্বপ্নে দেখতে শেখে, তার মধ্যে গেঁথে দেয়া হয়েছিল অগ্নি দগদগে লৌহ পেরেক। তাতে আমার যে ক্ষতি হয়েছে, আমি বাস্তবের ভয়ে স্বপ্নে আশ্রয় নিয়ে বাঁচতে শিখেছি। স্বপ্নকে হাতে নিয়ে খেলতে শিখি নি— শিখি নি চাকরির ভাঁজে ভাঁজে স্বপ্নের রূপতরঙ্গকে ভাঁজে ভাঁজে ফেলে জীবনটাকে ন্যূনতম হলেও বাস্তবতার মধ্যে উপভোগ করতে। আমি চাকরি করি বাঁচার দায়ে, মানে পেটে দানাপানি দেয়ার জন্য, চাকরি বিষয়ে অবশ্য সবাই তা-ই বলে। কিন্তু তাদের অনুভবের সাথে আমার অনুভবের পার্থক্য তর্ক-যুক্তির মধ্যে সামান্য— অনুভবে ব্যাপক।

আমি চাকরির মধ্যে একবিন্দুও মুক্তির আশ্রয় পাই না। কেবল দাসত্ব পাই। তবে ? যদি চাকরি আমার না থাকত ? কেবলই কি স্বপ্নের মধ্যে হাঁটতাম ? না— তাও না। আমার চাওয়ার মধ্যে এটাই প্রখর ছিল, চাকরি হোক, যে-কোনো কাজই হোক— যা হবে আমার জাগতিক বাঁচার আশ্রয়— তখন তার মধ্যেই থাকবে কঠিন দায়িত্ববোধ। কাজ শেষে ঘরে ফিরতে ফিরতে আমি দেখব স্বপ্ন। কিন্তু আমার কাজের শরীরভাঁজ জুড়ে জুড়ে সারাক্ষণ বাস করে স্বপ্ন— আমার কাজে দক্ষতা হয় না, প্রমোশন হয় না— আমার কেবলই ভুল হতে থাকে... আমি চাকরির পর চাকরি পাল্টাই। ভাগ্যিস আমাকে এক নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ দত্তক নিয়ে, তার আসবাবপত্রসহ বাড়ি আমার নামে লিখে দিয়েছিলেন! কী স্বার্থপর আমি! আজ তার মৃত্যুর পাঁচ বছর পর তার কথা মনেও পড়ে না।

মিস্টার এম. চেয়ে আছেন আমার দিকে।

আমার কী হয়, স্বভাববিরুদ্ধভাবে চিৎকার করে উঠি, কী শুনতে চাইছেন আপনি ? সরস কোনো অপমানকর, বেদনাকর কাহিনী ? যা প্রায়শ ধর্ষিতাদের অপমানবোধের বয়ান থেকে পড়ে পাঠকরা আন্দোলিত হয় ? কী শুনতে চান ? কী ?

মিস্টার এম. তার স্বভাবজাত প্রবণতায় তেমনই শান্ত। কিছু বলছেন না।

আমি সারা ঘরে অস্থির হয়ে হেঁটে তার সামনে বসি, কী বলব আপনাকে ? আমি বিশ্বাস করে সুশোভনাকে বাঁচাতে এই কাহিনী বলেছিলাম, দুঃখিত! আমি হয়তো তার আচরণেই উত্তেজিত হয়ে এরকম ব্যবহার করছি! সুশোভনা বেঁচেছে ঠিকই, কিন্তু এই দেশের স্বনামধন্য লেখককে সে এই কাহিনী জানিয়েছে, এই বিষয়ে সে আমার কিছুমাত্র পরামর্শ গ্রহণ করে নি। আমি ঠিক জানি না কোন সেই বেদনাতুর অনুভব থেকে সে সেই বিশিষ্ট লেখককে এই কাহিনী বলেছিল, কিন্তু আমি যখন তাকে বাঁচাতে এই ঘটনা বলেছি, তখন কল্পনাও করি নি যে আর কারো সাথে সে এই গল্প করতে পারে!

সেই বিশিষ্ট লেখকের সাথে ছিল তার নিগূঢ় সখ্য! আপনাকে আগেই আমি বলেছি, তার অনেক বন্ধু ছিল। এর মধ্যে তার প্রাণের লোক ছিল মৈনাক, আর তার বুদ্ধি মেধাকে বহুমাত্রায় ব্যাপক করার জন্য সে সেই লেখকের ওপর সাংঘাতিক নির্ভর করত।

মিস্টার এম., সুশোভনা হয়তো অত বিবেচনা করে কিছু করে নি। কোনো অন্তরঙ্গ মুহূর্তে সে তার বন্ধুকে অবচেতনে আমার এই কাহিনী বলে দিয়েছে, কিন্তু লেখক এবং শিল্পীরা যে বেদনাকেই শিল্পের মূল থিম করে এটা বোধহয় ওর জানা ছিল না... আপনি শুনলে অবাক হবেন আমার সেই কাহিনীর সাথে খুব জোরালোভাবে মুক্তিযুদ্ধকে মিলিয়ে সেই লেখক এমন এক অসাধারণ উপন্যাস রচনা করেন, যা সেই গ্রন্থটিকে সেই বছর এদেশের এক অসামান্য পুরস্কারে ভূষিত করে!

এবার মিস্টার এম.-এর চায়ের চুমুক থেমে যায়। তিনি শুধু এটুকু শব্দই উচ্চারণ করতে পারেন, মুক্তিযুদ্ধ ? এই ঘটনার সাথে মুক্তিযুদ্ধের সম্পর্ক কী ?

সেটাই তো মজার বিষয়— হাসতে হাসতে আমার চোখ ভিজে আসে। আমি মিস্টার এম.-এর পায়ের কাছে বসে বলি, আমার এই রূঢ় অপমানকর যন্ত্রণাকর বিষয়টাকে নিছক গল্প এবং কাহিনীর ঘনঘটা থেকে আপনি উদ্ধার করুন, হ্যাঁ, আপনাকে আমি বলব, আমি বলব— আজই... কারণ আমি এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আপনার সাথে যা করছি তাতে আপনারও মনে, আপনার অবচেতনে একটা ঘনঘটা পূর্ণ কাহিনী শোনার স্বপ্ন জাগতে পারে। যে-কোনো সাধারণ ঘটনাকে লেখকরা আড়ম্বরপূর্ণ করে তুলতে পারেন, যেটা তার কলমের দক্ষতার বিষয়। সেই বিশিষ্ট লেখক তা-ই করেছিলেন— বলতে বলতে ফের সোফায় বসে আমি ঠাণ্ডা চায়ে চুমুক দিই।

মিস্টার এম. তার স্বভাবজাত আচরণে চুপ।

যে-সময় ঘটনাটা ঘটে সে-সময় সত্যিই দেশে যুদ্ধ চলছিল। বিশ্বাস করুন, এই ঘটনাটা যখন দেশে যুদ্ধ চলছে না, অন্য কোনো কারণে কারফিউ চলছে, সে সময়ও ঘটতে পারত। কিন্তু লেখকদের কলমের ম্যাজিক আশ্চর্য, আপনি লক্ষ করে দেখবেন যখন কোনো বিশেষ জোতদারের ব্যবহারের কারণে কোনো বিশেষ পরিবার নিঃস্ব হয়ে যায়, তখন সেই পরিবারের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে একজন লেখক তাবৎ জোতদার গোষ্ঠীকে এমনভাবে আক্রমণ করে বসেন, তাতে সেই চিহ্নিত জোতদারটি হারিয়ে যায়। সুশোভনা আমাকে একদিন বলেছে, সে সেই লেখককে একদিন তার নিজের জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার সময় বলেছিল, চাকরির জন্য সে একজন ভদ্রলোকের বাসায় গেলে সে সুশোভনাকে বেডরুমে টেনে নিয়ে যেতে চায়...।

লোকটি কী করে ? প্রশ্ন ছিল লেখকের।

সুশোভনা বলে, একজন ব্যবসায়ী।

তাতে যেন তেমন জুৎ হচ্ছিল না লেখকের। শেষে হালকা চালে সুশোভনার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে— সে একজন রাজনীতিবিদ। ব্যস্! যেন বিরাট এক সম্পদ পেয়ে গেলেন লেখক। সুশোভনার অপমানের চেয়ে তার কলম তীব্র হয়ে উঠল একটি বিশেষ রাজনৈতিক গোষ্ঠীকে আক্রমণে। আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে এরকম সরাসরি আক্রমণযুক্ত লেখা পছন্দ করি না। আমার সেই লেখাই ভালো লাগে, যার মধ্যে ভেতরের বিষয়টা খুঁজে বের করার আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়, যেখানে লেখাটা শেষ করা মাত্র লেখক আসলে কী বলতে চাইলেন— তা কেন্দ্র করে অনেকক্ষণ ভাবনায় আচ্ছন্ন হওয়ার বিষয় থাকে... তার মানে বিমূর্ত যা কিছু... কিন্তু অবাক বিষয় কী, সেই লেখক আমার জীবনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে যদিও এই একটি উপন্যাসে প্রেক্ষাপট হিসেবে মুক্তিযুদ্ধকে বেছে নিয়েছিলেন, তবুও সেখানে আমার বেদনা, যন্ত্রণা, অপমান, অসহায়ত্বকে এত গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তুলে এনেছিলেন— আমি রীতিমতো বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। যদিও আমার সাথে প্রমিজ ভঙ্গের কারণে সুশোভনা অত্যন্ত ভেঙে পড়েছিল, কিন্তু সেই উপন্যাস পড়ে আমার সুশোভনার প্রতি রাগ কমে যায়। আমার মনে হয়, এই লেখক জন্মের পর থেকে আমাকে খুঁটে খুঁটে দেখে বড় হয়েছেন। আমার কল্পনা, চিন্তার একদম ভেতর তলাকার বিষয়কে তিনি এমনভাবে উপন্যাসে তুলে ধরেন... আমি অস্থির হয়ে পড়ি তার সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর জন্য... বুঝলেন মিস্টার এম., আমার মধ্যে সাংঘাতিক উত্তেজনা কাজ করতে থাকে। যদিও প্রেক্ষাপট হিসেবে যুদ্ধটাকে হাইলাইট করার জন্য আমি খুব বিরক্ত বোধ করেছিলাম, কেন একজন লেখক সারাক্ষণ শিল্প বাদ দিয়ে তার সমাজের কাছেই দায়বদ্ধ থাকবেন? এ ক্ষেত্রে চিত্রশিল্পী সুলতানের একটা বিশ্বাস আমাকে খুব অনুপ্রাণিত করে। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল— 'সারা পৃথিবীতে যখন অ্যাবস্ট্রাক্ট পেইন্টিংয়ের স্রোত, তখন তিনি কেন সেই বিষয়টাকে তত গুরুত্ব দেন নি?' সুলতান বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, পেইন্টিংয়ে তো ভাঙচুর হবেই। আমি ফিগারগুলোকে মাসকুলার করেছি, কেউ এলংগেটেডও করতে পারে। সেটা তার ছবির থিমের ওপর নির্ভর করবে।' বুঝলেন, আমার মনে হয়েছে, সেই লেখকের থিমটাই সেই বিষয়ের গভীরে যায় নি— ঠিক যতটা গুরুত্ব দেয়া হয়েছে মুক্তিযুদ্ধকে সেই উপন্যাসে। যা হোক, তারপরও একজন মানুষ আমাকে না দেখে, না চিনে হুবহু আমার একটা মূর্তি বানিয়ে ফেলল, আমার ঘুম নষ্ট হয়ে যায়। আমার মনে হয় আমি তাঁর সামনে দাঁড়ানো মাত্র সেই লেখক অভিভূত হয়ে চেয়ে থাকবেন আমার দিকে— তাঁর গভীর আচ্ছন্ন চোখ বলবে কোথায় লুকিয়েছিলে? ভেবেছিলে কেউ তোমাকে খুঁজে পাবে না, না? চিন্তায় স্বপ্নে তার সাথে আমার চিরকালীন আত্মীয়তা হয়ে গেল— কিন্তু...।

আমার মাথা নুয়ে আসে।

মিস্টার এম. চুপ। বাইরে ঝড় শুরু হয়েছে। আমি উঠে গিয়ে জানালার পাল্লাটা হালকা করে খুলে দেই। আমার প্রাণের হিম সরিয়ে নিয়ে বাতাসের ক্ষণিক উত্তাপ আমাকে ওমে ঢুকিয়ে দেয়, আমার চোখ বুঁজে আসে। আমার ভাবনার দুঃসহ রেণুগুলো অবাক বলাকা হয়ে চারপাশের বাতাসের সাথে মিশে যায়। আবার সামনে থেকে সরে যায় মুক্তিযুদ্ধ, লেখকের মুখ... অতীন... সুশোভনা... আমার সামনে কেবল সেই ভাস্কর আর তার পাথর শব্দের নিঃসীম ধ্বনি... বাতাসে শব্দ নেই... প্রতিধ্বনিহীন নিস্তব্ধতা...

আমি এবার পেছন ফিরি।

মিস্টার এম. কি মানুষ, না পাথর ?

তার সামনে বসে সহসা ঠাহর করতে পারি না।

আশ্চর্য প্রশ্নবোধক ঠাণ্ডা চোখে চেয়ে আছেন আমার দিকে। শব্দ করছেন না। আমার কাচ টেবিলে আঙুল দিয়ে রেখা তৈরি করে বলি, খুবই হয়তো মামুলি বিষয়...ধর্ষণও তো মামুলি, আমরা যারা পেপারে পড়ি, হত্যা মামুলি... পেপারে পড়ি, অথচ যে ধর্ষিতা, যেখানে হত্যা তার কাছে বিষয়টা, ভেবে দেখুন... আপনি মর্মান্তিক, অকল্পনীয় কোনো বিষয় শোনার লোভ করবেন না প্লিজ মিস্টার এম. দুঃসহ! দুঃসহ এসব ভূমিকা— এবার সরাসরি মূল বিষয়ে আসি— বলতে বলতে আমি অস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ফের তার সামনে বসে যাই, আমার পিঠ ঠেসে যেতে থাকে বেত চেয়ারের মধ্যে বসে থাকা তুলোর ওমে। আমি খানিকটা সময় নিয়ে ধীর লয়ে শুরু করি—

আমার বয়স তখন কত ? না, আর ভান করব না... বারো, যে বয়সটায় একজন মেয়ে বেড়ে ওঠা পৃথিবীর দিকে পা বাড়াতে গিয়ে পেছনের পৃথিবীটাকে ফেলে যেতে থাকার যন্ত্রণায় কেবলই বিভ্রান্ত হয়। সত্যিই তখন এই দেশে যুদ্ধ চলছিল! সে-কী লেলিহান যুদ্ধের তাণ্ডব, ঘরে আতঙ্ক... মাথার ওপর যুদ্ধ বিমান উড়ছে, কখন কার মাথায় পড়ে! যাহোক সে প্রসঙ্গে পরে আসছি!

আমার আজন্ম স্বপ্ন ছিল বোরাকের ঘোড়া! দাদার মুখে আমি শুনেছি সেই ঘোড়া যাকে যখন যেখানে নিয়ে যায় সময়ের ভেদ মুছে যায়। মোহাম্মদ সেই ঘোড়ায় চড়ে সাত আসমানের ওপর আল্লাহ্‌র দর্শনে গিয়েছিলেন। একবছর পরে তিনি ঘরে ফিরে দেখেন, তেমনই অজুর পানি গড়াচ্ছে! এক বছর এবং এক মুহূর্তের মধ্যে কোনো দূরত্ব নেই। পরে শুনেছি শুধু সেই মহামানবের ক্ষেত্রেই এই ঘটনা ঘটেছে। এই ঘোড়ার জন্ম বিশেষ করে মহামানবের আল্লাহ্ দর্শনের জন্যই হয়েছিল। কিন্তু সেই ঘোড়ার ছবি আমাকে টানে অন্য কারণে। একটি ঘোড়ার মুখে কোঁকড়ানো চুলের নারী মুখের ছবি ? আশ্চর্য! পরাবাস্তবতা...। আমি যখন গভীর অবাকে বুঁদ, আমাকে বলল সেই ভাস্কর ছেলে, আচ্ছা নন্দিনী পরী কী ? বলো ? কখনো দেখেছ ? মানুষের হাতে ডানা! সম্ভব ? অথচ দেখো পরী আমাদের কাছে স্বাভাবিক, কেননা আমরা তার গল্প পড়ে এবং তার ছবি দেখে অভ্যস্ত। অথচ দেখো, আমি পাথরের মধ্যে এক রাজকুমারের মুখে দৈত্যের মুখ বসিয়ে দিয়েছি— এটা তোমরা কেউ মেনে নিতে পারছ না। নন্দিনী, পশুপাখিদের সাথে সংসার করে এমন মানুষকে কেউ অস্বাভাবিক মনে করতে পারে, এটার একটাই কারণ, সে সেই জীবনটা দেখে অভ্যস্ত না। অথচ যে সেই জীবন যাপন করছে তার কাছে ঘর গেরস্থালীর সাধারণ জীবনটাকেই হয়তো অস্বাভাবিক মনে হতে পারে। নন্দিনী আজ আমি এই শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছি, আমার একটাই কষ্ট, একটাই ভয় আমার সব শিল্পকে মিলিটারিরা হয়তো ধ্বংস করে দেবে— বলতে বলতে বুঝলেন মিস্টার এম., সেই প্রথম সেই ভাস্কর আমাকে হাত ধরে তার স্টুডিওর নিজস্ব রুমে নিয়ে যায়। এবং বসার টুলের মধ্যে আমাকে বসিয়ে বলে, আমি অনেকদিন ধরে তোমাকে দেখছি। তোমার চোখ সাংঘাতিক! আমাকে ঘিরে তোমার কৌতূহল স্বপ্ন সব আমাকে খুব খুব টানে... নন্দিনী, এই জীবনে কোনোদিন হয়তো

আমাদের দেখা হবে না, আজ যাওয়ার আগে আমি আমার একমাত্র ভক্তের সবচাইতে বড় স্বপ্ন পূরণ করতে চাই।

বাইরের বৃষ্টি থামছে না কেন ? থিরথিরে শীতে আমি কাঁপতে থাকলে মিস্টার এম. বলেন, আপনি কি এক গ্লাস পানি খাবেন ? ঘোর অতলান্ত থেকে নিজেকে টেনে তুলে ছায়াচোখে তার দিকে তাকিয়ে আমি প্রায় বিড়বিড় স্বরে বলি, আপনাকে আগেই বলেছি আমার স্বপ্ন কী ছিল। বোরাকের বিরাট একটা ছবি। ছবিটা ওর ঘরে টাঙানো ছিল। কেন যে জানালার ফাঁক দিয়ে, ওর দরজার ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে আমি ওই ছবিটিই দেখতাম! একদিন আমাকে সেই ভাস্কর প্রশ্ন করে, নন্দিনী, ওর মধ্যে কী এমন দেখো ?

আমি ওর পিঠে চড়ে উড়তে চাই।

তারপর ?

চলে যাব পরীর দেশে।

তোমার মা-বাবা ?

সেখান থেকে তাদের জন্য অনেক অনেক মণিমুক্তা পাঠাবো, তাদের অভাব থাকবে না। তখন আমার কথা তাদের মনেই পড়বে না!

জানেন মিস্টার এম., সেদিন এক লিচুবাগানের নিচে বসে বড় বড় চোখ করে সে বলল, আমার জন্য সে এক বোরাকের ক্ষুদে মূর্তি বানাবে, যার সাথে আমি পরীর দেশে চলে যেতে পারব।

এরপর কতদিন... কতদিন গেছে! আমি ওর জানালায় চোখ রেখেছি... ওর স্টুডিওর সামনে ঘণ্টা ঘণ্টা স্বপ্ন নিয়ে হেঁটেছি... মিস্টার এম., সেই ছেলেবেলাকার অনুভূতি কী করে আপনাকে বোঝাব ? একজন একটা শিশুর মধ্যে একটা স্বপ্ন গেঁথে দিয়ে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে সব ভুলে গেল, আমি রাত রাত কাঁদতাম... মিথ্যে সব... মিথ্যে প্রলোভনে একজন শিশুকে ভুলিয়েছে সে...।

আমি থেমে গেলে মিস্টার এম. তার স্বভাববিরুদ্ধ প্রবণতায় আমাকে প্রশ্ন করেন, আপনি আপনার বাবা-মাকে ছেড়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতেন কী করে ? অন্তত সেই বয়সে ?

আমি মৃদুকণ্ঠে বলি, অভাব! আমার বাবা-মার সংসারে স্বপ্নের কোনো জায়গা ছিল না। তারা সারাক্ষণই পরকাল নিয়ে ব্যস্ত থাকত। ছেলেমেয়ের মুখে খাদ্য তুলে দেয়ার চাইতে তাদের মধ্যে প্রবল ছিল পরকালের লোভ। বাবা-মা দিন রাত নামাজ-রোজায় ব্যস্ত থাকতেন। বাবা নিজের মুদির দোকান ফেলে চলে যেতেন তবলিগে, নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে। তারা বিশ্বাস করতেন ইহকালের ক্ষুধা দারিদ্র্য মানুষকে পরকালে বেহেস্ত দান করে। পরকালের বেহেস্তের লোভ তাদের এমনই আচ্ছন্ন করে রাখত, তারা পুত্রকন্যার প্রতি পর্যন্ত ভালোবাসা হারিয়ে বসেছিল।

যাহোক, সেই ভাস্করের ছিল আশ্চর্য ক্ষমতা, যা হয়তো একজন মঞ্চ নির্দেশকের থাকে, সে খড়-মাটি-পাথর যা যা ব্যবহার করত আমি এখন হিসেব করে দেখতে পারি অন্তত টাকার দামে তার মূল্য এমন কিছু বেশি ছিল না, আপনি দেখবেন একজন মঞ্চ নির্দেশকও অনেক কম খরচে মঞ্চটাকে এমনভাবে সাজান যার মধ্য থেকে আমরা একটি জীবনের পুরো

বাস্তবতাকে দেখতে পাই। যখন যুদ্ধ চলছে দেশে, শহর ছেড়ে মানুষ পালাচ্ছে... বোম পড়ছে এখানে ওখানে... সেই ভাস্কর তার টুলে আমাকে বসিয়ে আমার কপালে চুমু খেয়ে বলল, এই নাও তোমার স্বপ্ন!

আমি পাথরের মতো হিম!

সে ঘরের কোণ থেকে নিয়ে এলো এক ক্ষুদ্রাকৃতির ডানাওয়ালা বোরাক... আপনাকে বোঝাতে পারব না মিস্টার এম., সেই ক্ষুদ্র ঘোড়াটার মধ্যেই ছিল একজন মঞ্চ নির্দেশকের মতো আস্ত পৃথিবী ধরার ক্ষমতা— সেই ধবধবে শাদা পাথর ঘোড়াটা আমার হাতে দিয়ে সে বলল, এর পেটে খড়...।

না... না আমি শুনতে চাই না ভেতরে কী ?

তুমি অদ্ভুত সুন্দর মেয়ে! একদিন এই পৃথিবীকে পায়ের তলায় মাড়িয়ে তুমি হাঁটবে, তখন হয়তো আমি মরে যাব!

না... না!

কী... না! না!

কিছু না... বলে আমি কাঁপতে কাঁপতে সেই ঝাঁকড়া চুলের বোরাকের ঘোড়াটাকে দেখি। এর চুল কালো নয়, ধবধবে সাদা... সবটাই সাদা... এমন সাদা আমি জীবনে দেখি নি। আমি বুকে চেপে ধরি ঘোড়াটাকে... আমি কাঁদতে থাকি। ভাস্কর ফিসফিস করে আমাকে বলে— আমার নিজের জীবনকে নিয়ে কোনো ভয় নেই, শুধুই একটা ভয়— পালানোর সময় আমার মূর্তিগুলোকে বাঁচাতে পারব কি-না! নন্দিনী, আমি অনেকদিন পাথরে ছেনি কাটতে কাটতে, একা পথে হাঁটতে হাঁটতে তোমার কথা ভেবেছি... দেশে এখন আগুন জ্বললেও এ সময় যদি আমি অন্তত তোমার সবচাইতে সেরা স্বপ্নটা পূরণ করতে পারি, আমার মৃত্যু সার্থক হতো। আমি থর থর কেঁপে সেই ভাস্করের ঝাঁকড়া চুলের নিচে চাপা পড়া বিপন্ন চোখের দিকে তাকাই— যেখানে আলো... দূরবর্তী আলো... সে ধীর স্বরে বলে, শোনো কাল খুউব খু-উব ভোরে, তুমি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়বে, বুঝেছ নন্দিনী। আজানের আগে, যখন কুয়াশায় রাস্তা দেখা যাবে না... নন্দিনী, পরীর দেশে গিয়ে তোমার কি আমার কথা মনে পড়বে ? ভাস্করের চোখ জলে ভিজে আসে— আমি একজন ব্যর্থ মানুষ... আমার ব্যর্থ স্বপ্নের ভার আরেকজনের হাতে তুলে দিয়ে গেলাম।

কী করব আমি ? প্রশ্ন করি তাকে।

সেই কাঠফাটা ভোরে হাঁটতে হাঁটতে তুমি চারকোণা রাস্তার গির্জাটার সামনে দাঁড়াবে। এরপর তুমি সেই গির্জার সিঁড়ির একদম শেষ ধাপটায় পা রেখে বুকের মধ্যে এই মূর্তিটাকে চেপে ধরে বলবে, হে বোরাকের ঘোড়া, আমি তোমার কাছে এসেছি, তুমি আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাও! নন্দিনী, সাবধান— তোমার হৃৎপিণ্ডের একদম মাঝখানে চেপে ধরবে এই ঘোড়াটাকে, একবিন্দু যেন না সরে... এরপর তোমার স্বপ্ন পূরণ হবে। আকাশ থেকে ডানা কাঁপিয়ে নেমে আসবে এক বিরাট বোরাকের ঘোড়া। সে উবু হয়ে তোমাকে পিঠ পেতে দেবে। তখন এই ছোট্ট পাথরের ঘোড়াটা ওর মধ্যে বিলীন হয়ে যাব।

ছুটির দিনের সকাল কখন যে কোথায় উড়াল দিচ্ছে... মুহূর্ত হাঁটছে আমার রক্তকণিকার পথ ধরে ধরে...

মিস্টার এম. ক্রমশ টান টান...

আমার আঙুল ঠেসে গেছে কাচ গ্লাসে... আমার গলা ক্রমশ ভেঙে আসছে...

কিন্তু স্লিপারে চড়ে বসেছি... গড়িয়ে পড়তেই হবে... ঘরটা এমন ছায়া ছায়া অন্ধকার হয়ে গেছে কেন? সকাল বেলায় মোমবাতি জ্বালাব! হা! তাতেই হবে! ছায়া আঁধারে মোমের শিখা জ্বলছে... নিজেকে সেই আলোর সামনে অকপট খুলে ধরতে...।

মিস্টার এম.-এর কিঞ্চিত অবাক চোখের সামনে তা-ই করি। বাতাসের দাপট থামাতে জানালার কপাট বন্ধ করতে হয়। মোমের শিখা থেকে যন্ত্রণা খসে খসে পড়ছে... মিস্টার এম. নিষ্পলক চেয়ে আছেন। তারপর সারারাত... ফিসফিস করে বলি... আমার অবস্থাটা বুঝে দেখুন... অভাব হোক... বেহেস্তের স্বপ্নে হোক, এতদিন একসাথে জড়াজড়ি করে থেকেছি... আমি কি আমার বাবা-মার চাইতে কম লোভী? তারা মৃত্যুর পর বেহেস্তের স্বপ্ন দেখতেন। আর আমি সেই ছেলেবেলায় প্রায় একই রকম স্বপ্নপরীদের সাথে থাকার লোভে বোরাকের ঘোড়ায় চেপে তাদের ছেড়ে চিরজীবনের জন্য চলে যেতে চাইছি।

ঘুমাতে পারি না। প্রচণ্ড শীতেও ঘামতে ঘামতে মা'র নাকফুল দেখি... দেখি বাবার চিরকালীন কুঁচকানো কপাল। ভাইবোনগুলোর অসহায় মুখ। সবাই ঘুমিয়ে পড়ে বাতি নিভিয়ে। আমি ভূতের মতো রাতভর মেঝেতে বসে থেকে এক সময় বাইরের উঠোনে নেমে আসি— তারপর চাঁদ... মিস্টার এম., আমি হুহু শীতে কাঁপতে কাঁপতে সেই প্রথম অপেক্ষা করি, কখন চাঁদের মৃত্যু হবে, কুয়াশায়, ঢেকে যাবে ভোর, আর সকাল আসার আগের সময়টায় আমি ঝাঁপ দিয়ে পড়ব গির্জার সামনে... আমি উঠোনের ঘাসমাটিতে বসে বুকে বোরাকের ঘোড়াকে চেপে বিড়বিড় করে ডাকি ভোরকে... এসো হে প্রভাত... এসো...। হঠাৎ উঠোনে আধঘুমন্ত অবস্থায় অনুভব করি, যেন আমার বুকের ওপর চেপে থাকা ঘোড়াটি ডানা নাড়তে শুরু করেছে, তার চুল উড়তে শুরু করেছে, সে মায়াময় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে... ভয় নেই, ভয় নেই, আমি আছি তোমার সাথে। আমার রক্ত স্পন্দন বেড়ে যায়, সাহস বেড়ে যায়, আমি মরে যেতে থাকা চাঁদের দিকে তাকিয়ে সেই ভাস্করের কথা স্মরণ করে প্রায় চিৎকার করে কেঁদে উঠি— কোনোদিন দেখা হবে না? কোথায় যাবে সে? এই ঘোড়ার যে স্রষ্টা, তার সাথেই যদি দেখা না হবে, পরীর দেশে গিয়ে আমি কী করব?

তবুও... তবুও... এই ঘোড়া তার সৃষ্টি। সে যখন মৃত্যুর সামনে পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে, শেষ উপহার হিসেবে সে এই স্বপ্ন সৃষ্টিকেই আমার হাতে তুলে দিয়েছে... আমি শেষ বারের মতো তাকিয়ে দেখি আমার ঘরের কোণের ডালিম গাছ... ঝাঁকঝাঁক শিম ফুল... টিনের চাল... আমি দেখি সকালের রোদ পোহানো উঠোন— এরপর ছুটতে ছুটতে রাস্তায়।

সত্যিই কুয়াশা। একদম মিশমিশে শাদা কুয়াশা, এক ইঞ্চি সামনের পথ দেখা যায় না, বুকে আমার থর থর কাঁপুনি, বরফশীত... চামড়ায় উত্তপ্ত ঘাম... তবুও সেই বোরাকের ঘোড়াটাকে বুক থেকে ছাড়ি না— সারারাত বাবা-মা'র মধ্যে সে-কী ভয়! কালই শহর ছেড়ে গ্রামে চলে যাবে। সকাল ছ'টা থেকে কারফিউ... কারফিউ শেষ হলেই এই শহরে কেউ থাকবে না। ওপরে প্লেন উড়তে দেখলেই আমরা ঘাসমাটি ঢাকা মাটির গুহায় আশ্রয় নেই। পাক আর্মিদের মূল টার্গেট শহর। পাশের পাড়ায় ওরা আগুন জ্বালিয়ে মেয়েছেলেদের ধরে

নিয়ে গেছে। আমি সেই ভয়ঙ্কর শাদা আঁধার পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে দেখি ভাস্করের দরজায় তালা! ও চলে গেছে? আমার বুকের রক্ত সরে যায়। কিছুক্ষণ মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকি। চলে গেছে? যে ঘরটা আমার কাছে ছিল শৈশবের রূপ-গন্ধ-বর্ণময় শাশ্বত এক পৃথিবী, সেই দরজাই যদি বন্ধ তবে, আমার উড়ে যেতে অসুবিধে কী? মিস্টার এম., আপনাকে ভাষায় বোঝাতে পারব না, কী কঠিন কুয়াশা... কী করে ভাস্কর জানত আজ এমনই জটিল কুয়াশা হবে? আমার বুকের মধ্যে একদিকে স্বপ্ন অন্যদিকে ভয়... উড়ে যাব? উড়ে যাব? আমার বুকে চেপে রাখা ঘোড়াটা জীবন্ত এক রূপ পাবে? তখন বাবা-মা-ভাই-বোনের জন্য খুব কান্না পেতে থাকে। কিন্তু মানুষের রহস্যের লোভ বড় মারাত্মক... আমি শাদা কুয়াশার পথ ধরে হাঁটি, আর শরীরের কোষে কোষে টের পাই অজানা রহস্যের গন্ধ— সরু গলি। একটি কুকুরেরও তখন ঘুম ভাঙে নি। এই ভূপৃথিবীতে কেউ জেগে নেই। কেবল আমি যখন গির্জার সিঁড়িটার শেষধাপে পা রাখব, তখন আসমান থেকে ধেয়ে নামবে বোরাকের ঘোড়া। সে উবু হয়ে আমাকে উঠার জন্য পিঠ পেতে দিলে তার মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে আমার বুকে চেপে থাকা পাথরের ঘোড়াটি।

আমি তার ওপরে চেপে বসতেই তার দুই ডানার ঝাপটানি... সে আলগোছে পা উঠিয়ে দেবে ওপরে... এরপর মহাকাল...।

আমি হাঁটছি। আমার রক্তে রক্তে ভয়, কৌতূহল... হঠাৎ দেখি... কুয়াশার মধ্যে আবছা আবছা গির্জার কাছটায় কিছু মিলিটারি টহল দিচ্ছে। আমার মনে পড়ে যায় কারফিউ। ঘর থেকে বেরোনো মাত্র গুলি! কিন্তু সেই বয়সেও আমার মধ্যে এই আস্থাটা ছিল হুট করে তারা কোনো শিশুকে গুলি করবে না। এছাড়া বাকি সামান্য পথ আমি কুয়াশার আড়ালে পালিয়ে পালিয়ে ঠিক পৌঁছে যাব।

যেন আসমান ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে আছে গির্জাটি। আমি কত গেছি এই পথ ধরে! কখনো এ-কে এত অলৌকিক আর রোমাঞ্চকর মনে হয় নি! আমি একটা ঘোরের মধ্যে হাঁটছি, হঠাৎ গর্জন— হঠ যাও! চারপাঁচজন মিলিটারি আমাকে ঘিরে ধরে। তারা প্রশ্ন করে, আমি কি জানি না কারফিউর মধ্যে ঘর থেকে বেরোনো নিষেধ?

আমি মাথা নেড়ে বলি, জানি।

একজন আধা বাংলায় চার্জ করতে শুরু করে, তবে আমি বেরিয়েছি কেন?

আমি গির্জায় যাব।

তারা আমার নাম জিজ্ঞেস করে। আমি তখন আমার সত্যিকার নামটাই বলি। নাম শুনে হতবাক হয়ে তারা বলে, মুসলমান মেয়ে হয়ে গির্জায় তোমার কী কাজ? বুঝলেন মিস্টার এম., আমার মনে হলো আমার স্বপ্নের রাজ্যে যেতে বাধা দিতে কিছু দৈত্য এসে দাঁড়িয়েছে আমার সামনে। বুকের মধ্যে ঘোড়াটাকে চেপে ধরে আমি কেঁদে উঠি, আমাকে ছাড়ুন। আমাকে গির্জায় যেতেই হবে! ওদের একজনের চোখ পড়ে আমার বুকে জড়ো করা হাতে। ওরা জানতে চায়, ওর মধ্যে কী?

কিছু না! বলে আমি ছুটতে যাব— খপ্ করে তিনজন আমাকে ধরে ফেলে! আমি কি তখন মৃত্যুর বিনিময়েও ঘোড়াটাকে বুক থেকে সরাবো? না! ওদের তিনজন তিনদিক থেকে কষে আমাকে চেপে ধরে, একজন যেন হৃৎপিণ্ড খুলে ঘোড়াটাকে আমার বুক থেকে তুলে

নেয়। সবাই মিলে ঘোড়াটাকে দেখে প্রায় আর্তনাদ করে উঠে— এ-তো সাংঘাতিক মেয়ে! মুসলমান হয়ে পবিত্র বোরাকের ঘোড়ার মূর্তি নিয়ে ঘুরছে। একজন আমার চুল খামচে ধরে জানতে চায়, ধর্মের এই সর্বনাশ কে করেছে? কে বানিয়েছে এই ঘোড়া? আমি ভয়ে ভয়ে সত্য বলি এবং বলি সেই ভাস্কর কাল রাতে এই শহর ছেড়ে চলে গেছে।

দেখি দেখি... আরেকজন আর্মি দেখতে চাওয়ায় সেই মিলিটারি ওই ঘোড়াটাকে ওই আর্মির হাতে ছুঁড়ে দেয়। আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। আমি চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে ঘোড়াটাকে ওদের কাছে চাইলে... ওরা অশ্রাব্য গালি-গালাজ করে এবার আমাকে নিয়ে লোফালুফি খেলতে শুরু করে। ওরা আমাকে শিশুরূপী শয়তান বলে আছড়ে ফেলে মাটিতে... আমি মরিয়া হয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে একজনের কাছ থেকে ঘোড়াটাকে খামচে নিয়ে পাগলছুট দেই। মিস্টার এম., আমার আহত শরীরে কোত্থেকে এত শক্তি পেয়েছিলাম আমি বলতে পারব না। আমার সামনে তখন একটাই স্বপ্ন— কোনো রকমে গির্জার শেষধাপটায় পা রাখা। একবার যদি পা রাখতে পারি, তখন বোরাকের ঘোড়াই আমাকে ওদের খপ্পর থেকে বাঁচিয়ে মহাকাশে উড়ে যাবে!

এদিকে প্রতি মুহূর্তে আতঙ্ক... এই বুঝি পেছন থেকে আমার দেহটাকে কেউ খামচে ধরল... পেছনে বুটের শব্দ... এই তো গির্জা... একটা সিঁড়ি... দু'টা সিঁড়ি... হা আল্লাহ্... তিনটা সিঁড়ি... শেষ ধাপটায় পা রেখে ঘোড়াটাকে বুকে চেপে চোখ বুজতেই চারপাশ থেকে খামচে ধরে ওরা... কারফিউ ভেঙে মুসলমানের মেয়ে হয়ে ঘোড়ার পূজা! দাঁড়া, তোকে জনমের শিক্ষা দেই...। একজন প্রচণ্ড কষে আমার গালে চড় বসায়... এরপর মিস্টার এম., পর্যায়ক্রমে ঘটনাগুলি ঘটতে থাকে... আবছা... আবছা... আমার চোখের সামনে ওরা ঘোড়াটাকে সিঁড়ির মধ্যে আছড়ে ভেঙে ফেলে... ওরা ফিসফিস করে কী সব বলাবলি করে, চুলের মুঠি ধরে হেঁচড়ে হেঁচড়ে একজন বলে, তুই কে? কোনো মুক্তিযোদ্ধার চর না তো? ওরা ভাঙা ঘোড়াটাকে পরখ করতে থাকে ওর ভেতরে অন্যকিছু লুকানো আছে কি-না। আমি চিৎকার করে কেঁদে উঠি— আমার ঘোড়া! তোমরা ওকে মেরে ফেললে? এ-কী সর্বনাশ করলে তোমরা? কী সর্বনাশ করলে!

পিশাচি! সারাজীবনের জন্য তোর ঘোড়া তোকে ফেরত দিচ্ছি... বলে দুইজন আর্মি আমার দুই হাত ঊর্ধ্বপানে ধরে রাখে... একজন কুয়াশা সিঁড়ি বেয়ে ক্রমশ আমার কাছে এসে টান দিয়ে খুলে ফেলে আমার হাফপ্যান্ট... উফ! কী সাংঘাতিক তারপরের ঘটনা!

আমার থরথর কম্পিত হাত টেবিলে ঠেসে যায়। মিস্টার এম. নিঃশব্দে সেই হাতে স্নেহের হাত রাখেন!

আমি ভূতগ্রস্তের মতো বলে যাই, এই সময়ের মধ্যে একজন আর্মি কোত্থেকে এক অগ্নিলৌহ খণ্ড নিয়ে আসে। ওই আর্মির হাতে পোড়া লৌহখণ্ড... ওরা চিৎকার করে হাসতে থাকে... বলে, আপনি তো ভালো ছবি আঁকেন— এঁকে দিন না ওর উরুতে! সেই আর্মি শিল্পী নিপুণ হাতে আমার উরুর মধ্যে সেই অগ্নিলোহা দিয়ে ঘোড়ার ডানা আঁকে... সামনে যীশু... আমার বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে... আমাকে বলে' এই যে তোর বোরাকের মুখ... এই যে লেজ... চারপাশ থেকে সবাই ধরে রেখেছে আমাকে, একজন আমার উরুর মধ্যে আগুন দিয়ে আঁকতে থাকে... আমার চোখের সামনে টাল খেয়ে উঠে যীশু... তার হাত বেয়ে টপটপ খসে পড়া রক্ত... আমার মনে হতে থাকে কেউ আমাকে দোযখের আগুনে ফেলে

দিয়েছে' আমি আসমান-জমিন ফাটিয়ে গোঙাচ্ছি... আমার চারপাশ আঁধার হয়ে আসছে... এই তোর ঘোড়া তোকে ফেরত দিলাম— সেই আর্মি শিল্পী চিৎকার করে হাসতে হাসতে বলে।

আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।

যীশু সম্পর্কে ওশো রজনীশ বলেছিলেন— যীশুর সামনে কেউ এসে যদি বলে, আমি এই পাপ করেছি, ওই পাপ করেছি, যীশু তাদের মাথার ওপর হাত রেখে বলে দেন যে, তোমাকে মাফ করছি... ওশো রজনীশের ভাষ্য হলো, তাতেই কি লোকটার পাপ মাফ হয়ে যায়? অতীন বলেছিল, রজনীশের বিশ্লেষণ ছিল এইরকম, মানুষের জীবনের আসল ঘটনা পাপ নয়— স্মৃতি! পাপ নয়, কাজ নয়, যা তার সাথে সেঁটে যায়, তা স্মৃতি! কেউ হত্যা করেছে, এটা বড় কথা নয়, যে হত্যা করেছে, এই স্মৃতি কাঁটার মতো তার পিছু নেবে। এটা তার পিছু তাড়া করবে। যখন ছুরি, যখন হত্যা— সেই কাজ তো তখনই হয়েছে, অনন্তের মধ্যে হারিয়ে গেছে। স্মৃতিটাই তার বুকের মধ্যে পাথরের মতো গেঁথে থাকবে। হত্যা, ছুরি, সব করেছে অনন্ত, যে করেছে সে বৃথাই দাঁড়িয়ে বলছে, আমি করেছি। যীশু বলেন— তুমি স্বীকারোক্তি করে দাও, আমি তোমাকে মাফ করে দেব। তখন পাপী যীশুর ওপর ভরসা করে পবিত্র হয়ে ফিরে যায়। আসলে কি যীশু কাউকে পাপ থেকে মুক্ত করতে পারেন? আসল সত্য যীশু পাপ থেকে মুক্ত করতে পারেন না, কিন্তু স্মৃতি থেকে মুক্ত করতে পারেন। নন্দিনী, এখানে না তুমি হত্যা করেছ, না চুরি... তুমি একটা দুঃসহ অপমান বছরের পর বছর বয়ে বেড়াচ্ছ, আরেকজনের অত্যাচারের ভার সারাজীবন তুমি কেন বয়ে বেড়াবে? তুমি আমার হাত চেপে বলছ, তোমাকে সেই বোরাকের ঘোড়ার অপমান থেকে রক্ষা করতে। সেই ঘটনা থেকে আমি তোমাকে কী করে বাঁচাব? এখন তুমি বলতে পার, সেই অপমানের, যন্ত্রণার স্মৃতি থেকে তোমাকে বাঁচাতে... তা-ও কি আমার পক্ষে সম্ভব? রজনীশের সাথে আমি এই জায়গায় দ্বিমত পোষণ করি, অন্তত কোনো সংবেদনশীল মানুষের কোনো নাজুক স্মৃতিও কোনো মহাপুরুষ মুছতে পারেন না। এটা সহই মানুষের জীবন। নন্দিনী, তুমি এটা তোমার চেতনা থেকে মুছে ফেলতে চাইছো মানে তুমি তোমার ধিক্কার থেকে সেই অসভ্য মিলিটারিদের সারা জীবনের জন্য নিষ্কৃতি দিতে চাইছো, কেন নন্দিনী? মানুষের বাঁচার লোভ কেন এত তীব্র হবে, সে তার ঘৃণার সাথে আপোস করবে? আমি অতীনের বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে উঠি, তুমি দেখবে সেই চিত্র? যা আমি আজীবন লুকিয়ে রেখেছি, দেখবে? তোমার হাতের স্পর্শের বাতাসে আমি অন্তত বাকি জীবনটা নিঃশ্বাস টেনে বাঁচি? না, অন্তু, আমি আর অপমান ভুলতে চাই না। আমি চাই আমার এই বেদনার আরেকজন সঙ্গী হোক, যাকে আমি জীবনের সর্বস্ব মনে করি... বলতে বলতে আমি অচেতন ঘোরে পড়ে যেতে থাকি।

আমি আর অতীন বসেছিলাম ব্রহ্মপুত্রের ধারে। অতীন ঢিল ছুঁড়তে ছুঁড়তে বলে, আজ এখানে বসেই আমার সাথে কথা বলবে, মানুষ যখন গভীরভাবে কাউকে ভালোবাসে, বাস্তবে সেই মানুষ যখন তার কাছে এসে বসে, তাকে কল্পনায় উড়িয়ে নিয়ে তার মধ্যে অন্য

এক রূপ বসিয়ে দেয়া মানে নন্দিনী, তার সান্নিধ্যকে ছোট করা, আমি বোঝাতে চাইছি, যেখানে শূন্যতার বিষয়, সেই ঘাটতিই মানুষ স্বপ্ন দিয়ে পূরণ করে। আমি জানি, এ তোমার সহজাত প্রবণতা, জলের কাছে এলে তোমার শূন্যে উড়ে যাওয়া বিষয়টির মধ্যে তোমার কোনো হাত নেই। তবুও আজ আমি জলের সাথে যুদ্ধ করব। এই দাঁড়িয়েছি ব্রহ্মপুত্রের সামনে, আজ ব্রহ্মপুত্র আমার প্রতিদ্বন্দ্বী, দেখি সে কতটা শক্তিমান, সে আমার কাছ থেকে তোমাকে অন্য কোথাও উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে কি-না!

আমি অতীনের হাত ধরে কাঁপতে থাকি। এ তোমার কেমন ঈর্ষা অতীন ? তুমি আমার পাশে না থাকলে জলের কী এমন শক্তি যে কারোর সাথে আমাকে উড়িয়ে নেবে ? আমি তোমার সাথেই উড়ি... তোমার সাথেই—।

কেন নন্দিনী ? এই যে বাস্তবের আমরা বসে আছি... সামনে মায়াবী ব্রহ্মপুত্র... আমাদের এই সান্নিধ্যের মধ্যে আলগা বর্ণ লাগানোর কী দরকার ? ঠিক আছে, মাঝে মাঝে হতে পারে, জীবনের বিচিত্রতার জন্য... কিন্তু সব সময় কেন ?

অন্তু! তুমি আমাকে শক্ত করে ধরে রাখো।

না! আমি তা কিছুতেই করব না। যে আমার, তাকে শক্ত করে ধরে আটকাতে হবে কেন ? বরং এই যে ছেড়ে দিচ্ছি— সমস্ত আকাশটাই এখন তোমার, এখন তুমিই অনুভব কর ডানার ভারে ক্লান্ত হয়ে কোথায় নামতে তোমার ভালো লাগবে ? কে তোমাকে টানছে ? কোথায় তুমি নিজেই বাঁধা পড়েছ ?

অন্তু! তুমি আমার সেই শাদা ঘোড়ার কালো ছায়াচিত্রটা স্পর্শ কর!

অতীন বিপন্ন চোখে আমার দিকে তাকায়... এরপর লম্বা একটা নিঃশ্বাস টেনে বলে, করব।

এরপর দিন যায়। রাত্রি যায়। অতীন এই বিষয়ে কিচ্ছু বলে না আমাকে। কাহিনীটা ওকে বলার পর থেকে আমার যে কী হয়েছিল, রাস্তাঘাটে, যেখানে সেখানে আমার চোখ জলে ভিজে আসত। দীর্ঘদিনের জমাট এক পাথরকে আমি অতীনের সামনে ভেঙে দিয়েছি। এখন এর বেগে নামতে থাকা রক্তস্রোতকে কী করে আমি সামলাই!

সন্ধ্যার আঁধারছায়া ফুটপাথ ধরে অতীনের সাথে হাঁটি। আমার পা চলে না। ঝড়ো বাতাসে চুল উড়িয়ে সে পাঠ করে—

"ওগো মেঘ, যদি সে-সময় দেখো যে সে নিদ্রা সুখ উপভোগ করছে, তবে গর্জন না করে পিছনে এসে ক্ষণকাল অপেক্ষা কর। হয়তো স্বপ্নে সে আমাকে দেখছে কিংবা গাঢ় আলিঙ্গনে আমাকে বেঁধে ফেলেছে। এই সময়ে ঘুম ভেঙে গেলে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ আমার কণ্ঠ থেকে তার বাহুলতার বন্ধন শিথিল হয়ে যাবে— তা যেন না হয়।"

নন্দিনী, আজ থেকে তোমার সব বেদনার ভার নিলাম। তোমাকে নিলাম!

শুনতে শুনতে আমি ওর হাত চেপে বসে পড়ি।

কী হয়েছে তোমার ? অবাক চোখে প্রশ্ন করে সে।

কিছু না... কিছু না বলে ওর হাত চেপে নিজেকে থিতু করি। এই লোকোত্তর অলীক মানুষটাকে আমার মনে হচ্ছিল নিষ্ঠুর। তোমার সব বেদনার ভার নিলাম— বলার পরও সে

দেখতে পর্যন্ত চাইল না সেই ক্ষত! প্রগাঢ় অভিমান আর কষ্টে আমার বুক ভেঙে আসে। এ আমি কার সাথে চলছি? যে নিজের ব্যস্ততা এবং জাগতিক জীবনের ভাঁজে ভাঁজে স্বপ্নকে নিয়ে হাঁটে? এবং কল্পনায় জাগতিক ভার নেয়?

রাতকষ্টে ছিঁড়ে যাই। দিনকষ্টে মৃতপ্রায় বোধ করি। অতীনের দিকে তাকাতে পারি না। শূন্য ঘরে নিজেকে নগ্ন করে বহুকাল পর যেন ভুঁই ফুড়ে ওঠা উরুর ওপর অঙ্কিত শ্বেত ঘোড়াটার কালো চিত্র দেখি... যুদ্ধ... কারফিউ... আর এক পা এগোলেই অমৃতলোকের ঘোড়া... আমাকে নিয়ে লোফালুফি খেলছে মিলিটারিগুলো... গির্জার সিঁড়িতে ভেঙে গুঁড়িয়ে খাক হয়ে যাচ্ছে আমার বোরাক। হায় ভাস্কর! আমাকে অমন নিষ্ঠুর মিথ্যে স্বপ্নের ফাঁদে কেন ফেলেছিলে তুমি? কেন সেই সরল স্বপ্নবালিকার সাথে অমন নির্মম প্রতারণার খেলা?

কেন তা ভাবছ? অতীন সেদিনই এ বিষয়ে আমাকে বলেছিল। কেন নন্দিনী এটা ভাবছ না, সেই ভাস্কর বিশ্বাস করত তা হবে। অথবা এ-ও হয়তো একজন শিল্পীর আত্মঘাতী খেলা। সে জানত যুদ্ধের ওই সময়টায় মিলিটারিরা তার মূর্তিগুলোকে ধ্বংস করে দেবে, এ-তো কোনো অলংকার, বা দ্রব্য ছিল না যা সে কোথাও লুকিয়ে রাখতে পারবে, অথবা মাটির নিচে পুঁতে রাখবে। সে হয়তো তার স্বপ্নের অক্ষম মৃত্যুর মধ্যে তোমার স্বপ্নকে জীবন্ত হিসেবে দেখতে চেয়েছিল... একজন শিল্পী দেশের ওই রকম বিপর্যস্ত মুহূর্তে কোনো বিশ্বাস থেকে আরেকটা মেয়ের হাতে তুলে দেয় সেই মেয়ের চিরকালীন স্বপ্নের ঘোড়া, নন্দিনী, আমি সেই বিশ্বাসের মূলকে কোন শক্তিতে ধরব? তোমার কি এটা বিশ্বাস হয় কোনো মানুষ ওইরকম পরিস্থিতিতে তার শিল্পকর্মের সবচাইতে সরল ভক্তের সাথে প্রবঞ্চনা করতে পারে? তার স্বপ্ন নিয়ে হেঁয়ালির খেলা খেলতে পারে? নন্দিনী এ অবিশ্বাস্য?

আহত মাথা তুলে আমি এবার নির্মম সত্যটা বলি, ওর স্টুডিওটা গুঁড়িয়ে দিয়েছিল মিলিটারিরা... আর!

অতীন আমার পায়ের কাছে এসে বসে!

আমার চোখ ফের ভিজে আসে। আমি ওর হাত শক্ত করে চেপে ফিসফিস স্বরে বলি, ভাঙা মূর্তির তলায় ওর লাশ পড়েছিল। সাতদিন পর যখন গন্ধ ছড়াল—!

উফ্ নন্দিনী! আমিও এরকমটাই ভেবেছিলাম। এর বাইরে ওর আর কী হতে পারত!

আজ, মিস্টার এম., আপনাকে সেই লেখকের গল্প বলব। তার আগে সুশোভনার একটা অভিজ্ঞতা বলি, এক পত্রিকার রিপোর্টার তাকে একটি সত্য ঘটনা জানিয়েছিল। ঘটনাটা এমনই বেদনার বলতে বলতে রিপোর্টার সুশোভনার সামনে প্রায় কেঁদে ফেলেছিল। পতিতাপল্লী থেকে উদ্ধার পাওয়া কয়েকজন মেয়ের একজনের নাম ধরুন কুসুম... যা হয় ওদের জীবনের ইতিহাস... বাবার মৃত্যু... রিকশাওয়ালার সাথে মেয়েটার বিয়ে, যৌতুকের জন্য ছাড়াছাড়ি, শেষে দালালের খপ্পরে পড়ে পতিতাপল্লী। কিন্তু এই মেয়েটাকে দিনের পর দিন ঘরে বন্দি রেখেও সর্দারনী কিছুতেই তাকে বশে আনতে পারছিল না। সেখানে ঔষধ খাইয়ে দিনে তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হতো, বাধ্যতামূলকভাবে মদ্যপান করাত... ব্লু ফিল্ম দেখাতো... মেয়েটি এই দুঃসহ অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টা

করেও ব্যর্থ হয়। যাহোক কী করে এর মধ্যে মেয়েটির গর্ভে বাচ্চা এসে যায়। মেয়েটি সিদ্ধান্ত নেয় পেটের মধ্যেই বাচ্চাটিকে মেরে ফেলবে। সর্দারনী মেয়েটিকে কব্জা করার এই সুযোগ হাতছাড়া করে না। সে মনে করে মেয়েটি বাচ্চার মায়ায় হলেও এখানে থেকে যাবে। মেয়েটি বাচ্চাটাকে নানাভাবে পেটের মধ্যে হত্যা করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। শেষে বাচ্চাটার জন্মের পর ওর বুক থেকে সর্দারনী বাচ্চাটাকে কেড়ে নিয়ে তিনদিনের মাথায় পুরুষদের সাথে শুতে বাধ্য করে। এদিকে মেয়েটি চেপে চেপে বুকের দুধ ফেলে আর বোবা যন্ত্রণায় কাঁদে। একবার কী কারণে সর্দারনীকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেলে মেয়েটি বাচ্চার সাথে একমাস কাটানোর সুযোগ পায়। সেই প্রথম মেয়েটি অনুভব করে মাতৃত্বের সাধ। পুলিশকে ঘুষ দিয়ে পতিতাপল্লীতে ফিরে এসে ফের সর্দারনী বাচ্চাটিকে নিয়ে নেয়।

এক সময় পতিতাপল্লীতে পুলিশী অভিযান চলে। সমাজকল্যাণ সংস্থার নারীকর্মীরা কিছু পতিতাকে যখন উদ্ধার করে বাইরে বেরোচ্ছে, তখন মেয়েটি ঘুমিয়ে ছিল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে এই দৃশ্য দেখে সে পোটলাটা বুকে নিয়ে লাফ দিয়ে গেটের কাছে এসে বলে, আমিও যামু—।

সে তখন মুক্তির আনন্দে অস্থির। বাচ্চার কথা তার ঘুণাক্ষরেও মনে নেই। রাস্তায় বহুদূর আসার পর যখন তার বাচ্চার কথা মনে পড়ে, আকুল কান্নায় ভেঙে গিয়ে টের পায়, আর ফেরার পথ নেই।

সুশোভনা লেখককে এই কাহিনী বললে লেখক সুশোভনাকে প্রশ্ন করেন, তুমি রিপোর্টারকে প্রশ্ন কর নি, বাচ্চার কথা সে সেই সময় কী করে ভুলে গেল?

করেছি। সুশোভনা বলে, রিপোর্টারকে মেয়েটি চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বলেছে, আমার লগে তো সারাক্ষণ পোটলাটাই থাকত। আমি হেইহানে ঢুকছি অব্দি খালি পোটলা লৈয়া পালানির খোয়াবই দেখতাম! আমি দিশেহারা হৈয়া হেই পোটলা লৈয়াই বাইর হয়া পড়ছি। আমার বাচ্চারে আপনেরা বাঁচান, নাইলে হে-ও আমার মতো বেশ্যা হৈবো...। ওরে বাঁচান! বাঁচান!

বাচ্চাটাকে উদ্ধারের কোনো চেষ্টা করা যায় না? লেখক প্রশ্ন করেন।

রিপোর্টার আমাকে কী বলেছে জানেন, সুশোভনা লেখকের এই প্রশ্নে হাসে, বলেছে, তা যদি করা হতো ট্রিমেন্ডাস একটা রিপোর্ট করা যেত। ওই চক্কর থেকে শিশু উদ্ধার! সহজ কথা?

স্ট্রেঞ্জ! সুশোভনা। রিপোর্টার এই ভেবেছে? লেখক এবার অবাক, আমি তোমার কাহিনী শুনতে শুনতে ভাবছিলাম, এর মধ্যে কী এমন বিশেষত্ব আছে? তুমি আমাকে কাহিনী বলছিলে আর আমি তার মধ্যে খুঁজছিলাম, গল্পের থিম... শেষে মনে হলো, বাচ্চাকে ভুলে পোটলা নিয়ে বেরিয়ে আসাটাকেই মূল থিম করে যদি কোনো লেখায় এগোনো যায়, মানে এই বিষয়টা আনকমন... মানুষের অস্তিত্ব সংকট!

এইবার সুশোভনার বেদনাতুর হাসির পালা, সে লেখককে বলে— আপনারা তিনজনই মূলত এক সূত্রে গাঁথা। রিপোর্টার সেই কাহিনী শুনে কেঁদেছে ঠিকই, তার চেয়েও তার মধ্যে বাস্তব হয়ে উঠেছে এই বিষয়টা, এ নিয়ে কত সুন্দর রিপোর্ট লেখা যায়, আর আপনিও, মেয়েটির প্রতি সহানুভূতিশীল, তার চাইতেও আপনার মধ্যে এই অন্বেষণ জোরালো, কোন আনকমন অংশটাকে উপন্যাসের থিম করা যায়—।

লেখক সিগ্রেটের ধোঁয়া ছুঁড়ে গম্ভীর মুখে বলেন, আচ্ছা ? এত তুমি দুই জনের কথা বললে...।

বাকি জন ওই মেয়েটা— কুসুম... যার কাছে সেই মুহূর্তে বাচ্চার চাইতে পোটলাটাই প্রধান হয়ে উঠেছিল!

মিস্টার এম. নিঃশ্বাস আটকে বসে থাকেন।

মিস্টার এম., আপনাকে বোঝাতে পারব না, সুশোভনার জীবনবোধ কত প্রগাঢ়। আমি জানি না সে কত গভীরভাবে আমার কাহিনী লেখককে বলেছিল। কতটা আমাকে জানে সে ? আমি তো আমার প্রগাঢ় অনুভূতির অণু-পরমাণুর বেশিরভাগই শেয়ার করি নি তার সাথে, বরং তার কাহিনী শুনেছি বেশির ভাগ, তার প্রেম, পুরুষদের সাথে ছলচাতুরী, শেষে মৈনাককে কেন্দ্র করে গভীর বেদনাবোধ। সেই রাতের পাঁচতারা হোটেলের সন্ধ্যায় ঘোর মৃত্যুর সিদ্ধান্তে অটল সুশোভনা আমার শৈশব ঘোড়াকাহিনী শুনে টানটান দাঁড়িয়ে পড়েছিল— নন্দিনী, তোমার অভিজ্ঞতার কাছে আমার অপমান তুচ্ছ... আমার জীবনে মৈনাক না থাকুক... আমি বাঁচব নন্দিনী। তুমি আমাকে আজ বাঁচিয়ে দিলে!

সেই সুরাক্রান্ত মেয়ে কতটা গভীর মনোযোগে তুলে নিয়েছিল আমার কথা ? মিস্টার এম., বিশ্বাস করুন, আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি লেখকের উপন্যাস পড়ে। আমার নিজের মুখে শুনলেও তিনি এতটা সত্য, এতটা বাস্তবগ্রাহ্য করে তুলতে পারতেন কি-না সেই কাহিনী, আমার সন্দেহ হয়।

উপন্যাসের শুরুর যুদ্ধের অংশটা যদিও আমি বলেছি আমার আরোপিত মনে হয়েছে। তবুও উপন্যাসের বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে সেই যুদ্ধের বিস্তার। যেখানে ভাস্কর নায়ক... কিশোরী মেয়েটির হাতে বোরাকের ঘোড়া তুলে দিয়ে সে স্টুডিওতে তালা দিয়ে শহর থেকে গ্রামে পালাতে গিয়ে আর্মিদের হাতে ধরা পড়ে। একজন রাজাকার ওকে চিনিয়ে দেয়— এই ছেলে মূর্তি বানায়। এবং ও মুক্তিযোদ্ধাদের মূর্তিও বানিয়েছে।

আর্মিরা ওর চোখ বেঁধে ওকে জিপে উঠালো। চোখ বাঁধা। অন্ধকার। ভাস্কর কোথায় যাচ্ছে বলতে পারছে না। প্রথমে তারা ওকে মেজরের সামনে নিয়ে যায়। মেজর ক্রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করে, তুমি মুক্তিযোদ্ধাদের মূর্তি বানাও ?

না!

সাথে সাথে বুটের লাথি। ভাস্কর মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে। সেই উপন্যাসে তিনি ভাস্করের একটা নাম দিয়েছেন— সেই নাম আমি এখন আর বলছি না। যা হোক, সেই মূর্তিগুলোর জন্য তাকে মেরে আধমরা করে আর্মিগুলো বলে— ঠিক আছে, মূর্তি লাগবে না, কার কার মূর্তি তুই বানিয়েছিস, সেই নামগুলো বল।

ভাস্কর তখন অর্ধমৃত। বাকরুদ্ধ! ওই অবস্থায় তাকে আর্মিরা একটা সেলের সামনে দাঁড় করালো। সেন্ট্রি সেল খুলে দিলে মেজর তাকে তার ভেতর বন্দি করে চলে গেল। চারদিকে প্রচণ্ড গুলি এবং অর্ধমৃত মানুষদের কান্না। ভাস্কর ফের অচেতন হয়ে লুটিয়ে পড়ে— উপন্যাসে এমন আছে মিস্টার এম., ভাস্কর স্বপ্নে দেখছে সবচাইতে পেশিবহুল শক্তিমান মুক্তিযোদ্ধার দুটো ডানা হয়ে গেল, সে যুদ্ধ বিমান হয়ে উড়তে থাকল পশ্চিম পাকিস্তানের আকাশে।

ওরা ভাস্করকে ফের ঔষধ দিয়ে ভালো করে তোলে। এরপর হাত-পা-চোখ শক্ত রশি দিয়ে বেঁধে বাইরে নিয়ে যায়। সেই অবস্থায় আবার জিপ যাত্রা। এরপর ওরা অন্ধকার এক গুহাঘরের মাঝখানে ভাস্করের পাছায় লাথি দিতে দিতে নিয়ে ফেলে। চোখ খুলে দিলে ভাস্কর দেখে, আরো অনেক অর্ধমৃত মানুষ। কারো গায়ে গরম জল ঢালা হচ্ছে, কারো মুখে পেশাব ঢেলে দেয়া হচ্ছে, লোহার গরম রড দিয়ে পেটানো হচ্ছে কাউকে। এরপর আবার আর্মিরা জড়ো হয়— তুই কার কার মূর্তি বানিয়েছিস, এখনো সময় আছে বল।

মৃতপ্রায় ভাস্কর বলে, সবই পরী আর দেবদূতদের, কোনো মানুষের মূর্তি নয়।

আবার চারপাশ থেকে বুটের লাথি। রাইফেলের বাট দিয়ে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আঘাতের পর আঘাত। কিচ্ছু খাবার নেই, শুকনো রুটি আর গুয়ের মতো ডাল। তা-ও একবেলা। রাত বাড়তে থাকে। বিকারগ্রস্তের মতো ভাস্কর স্বপ্নে দেখে এক বালিকাকে— সে বোরাকের ঘোড়ায় চেপে গির্জার সিঁড়িতে এসে নামে। ভাস্করকে হাত বাড়িয়ে বলে, এসো, এইসব অসভ্য নির্যাতন থেকে বেরিয়ে স্বর্গলোকে যাই।

ঘুম ভাঙার পর ফের প্রশ্ন— কোথায় মূর্তি?

না! না! কোনো মূর্তি নেই।

এরপর ভাস্করকে ন্যাংটো করে চেইন দিয়ে সে-কী মর্মান্তিক প্রহার! প্রমিথিউসের মতো ভাস্কর অচেতন হয়ে গেলে নির্যাতন বন্ধ। জ্ঞান ফিরলে ফের জীবন! নতুন কলজের জন্ম... তাকে ঠুকরে খায় সুবিশাল শকুনেরা। ভাস্করের স্মৃতিরা এগিয়ে আসে। ট্রাঙ্ক নিয়ে শত শত মানুষ শহর থেকে পালাচ্ছে। মানুষের গগনবিদারী চিৎকার। তালা ভেঙে আর্মিরা ঘরে ঘরে ঢুকে অসহ্য অত্যাচার করছে। গীতবিতান, মেঘদূত... তলা পড়ছে গুঁড়ো গুঁড়ো দেয়ালের নিচে... তার চাইতে মর্মান্তিক, তার সবগুলো মূর্তির ডানা ভেঙে ভেঙে বুলেটের তলায় মিশিয়ে দেয়া হচ্ছে... ভাস্করের হাঁ করা মুখের মধ্যে যখন ফুটন্ত রক্ত ঢেলে দেয়া... তখন স্তূপ স্তূপ লাশের নিচে পড়ে সে দেখছে জানালার ফোঁকড় দিয়ে চোখ মেলেছে এক কিশোরী... সে বলছে, ভাস্কর তুমি আবার একটা ডানার ঘোড়া নির্মাণ কর। আর্মিরা ওটা আছড়ে ভেঙে ফেলেছে। আমরা নতুন ঘোড়ার পিঠে চড়ে স্বর্গে যাব। তোমার এই শিল্পকর্মটি জীবন্ত এক রূপ পেয়ে আমার সাথে অলৌকিক এক উদ্যানে যাবে, তুমি সেখানে গিয়ে এই ডানার রূপ দেখে আবার নতুন করে শুরু করবে কাজ... ফের তোমার শুরু হবে নতুন শিল্পজীবনের... মিস্টার এম., সেই কিশোরীর সাথে ভাস্করের গভীরতর প্রেমটার অনেকটা অধ্যায় বাদ দিলে, কিশোরীর প্রবণতা, স্বপ্ন, মনস্তত্ত্ব সেই লেখক যা ধরেছেন, আমি আগেই বলেছি— হুবহু আমি! অভূতপূর্ব!

আমি থেমে যাই।

মিস্টার এম. প্রশ্ন করেন, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়টাকে আপনার আরোপিত মনে হলো কেন?

যথাযথভাবে আসে নি বলে, আমি বলি, মুক্তিযুদ্ধ আসলে যা, তার ইতিহাস, প্রেক্ষাপট, এর ভেতরকার গূঢ় ষড়যন্ত্র এবং এরপর ধ্বংসযজ্ঞ— এসব বিষয়কে থিম করে দাঁড় করাতে হয় চরিত্রগুলি, সংকট তৈরি হয় সেখানেই— যুদ্ধটাকে হাইলাইট করতে গিয়ে কখনো চরিত্র মার খায়, চরিত্র দাঁড় করাতে গিয়ে বড় মোটা দাগে মুক্তিযুদ্ধ আসে— লক্ষ করবেন, আগাগোড়া একটা প্রেমের উপন্যাসেও হঠাৎ হয়তো কোনো যুবক বলে বসল,

আমার বাবা মুক্তিযুদ্ধে মারা গেছে... এটা হয়তো ঠিকও, অনেকের বাবা-ই যুদ্ধে মারা গেছেন, কিন্তু যে উপন্যাসে একজন চরিত্রের বাবা যুদ্ধে মারা গেলে যা, রাস্তার এক্সিডেন্টে মারা গেলেও সেই একই কথা হয়ে যায়, তখন কোনো একটা লেখাকে খামোকা একবিন্দু ভারি করার অপচেষ্টায় মুক্তিযুদ্ধটাকে সালাদ হিসেবে ব্যবহার করে এর সত্যিকার সম্মান নষ্ট করার কোনো মানে হয়? সেই লেখকের অবশ্য উপন্যাসের অনেকটা জুড়েই মুক্তিযুদ্ধ ছিল, কিন্তু তা-ছিল বড় মোটা দাগের। আমাকে যেটা সাংঘাতিক টেনেছে, তার চরিত্র বিশ্লেষণ ক্ষমতা।

আমি ফের থেমে যাই।

অপার নৈঃশব্দ্য!

ধীরে ধীরে মিস্টার এম. বলেন, আমার এক সাহিত্যিক বন্ধু একটা সত্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটা গল্প লিখেছিল। পরে সে সেটা ছিঁড়ে ফেলে দেয়। সে নিজে মুক্তিযোদ্ধা ছিল। সেই গল্পে এদেশের নিরীহ জনতাকে পাক আর্মিদের বাঘের খাঁচায় ভরে হত্যা, ওদের নিপীড়ন উৎপীড়ন সবই ছিল। যা হোক, ওই মুক্তিযোদ্ধা একসময় তেমনই এক পাক আর্মিকে ধরে ফেলে... গল্পের মূল বিষয় শুরু হয় এখান থেকে। সে রাইফেলের বাঁটের আঘাতে সেই পাক আর্মিকে মারতে মারতে প্রায় আধমড়া করে বলছে জয়বাংলা বল। তো পাক আর্মি তো কিছুতেই বলে না, সে শুধু বলে, পাকিস্তান জিন্দাবাদ। মুক্তিযোদ্ধার মাথায় রক্ত চড়ে যায়। সে খোলামাঠে ওকে ন্যাংটো করে একটা করে আঘাত করে আর বলে— জয় বাংলা বল। আর্মি বলে না। এক সময় তার সব দাঁত ভেঙে যায়, হাত-পা ভেঙে রক্ত গড়াতে থাকে... পাক আর্মি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে পড়তে বলে— পাকিস্তান জিন্দাবাদ! শেষে গল্পটা এমন ছিল, ওকে মারার শেষ পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধা ক্রমশ অসহায় হয়ে পড়তে থাকে, সেই পাক আর্মির দেশাত্মবোধ দেখে তার বুকের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে আসে, তার হাত থেকে রাইফেল খসে পড়ে।

সেই সাহিত্যিক সেই গল্প ছিঁড়ে ফেললেন কেন?

নন্দিনী, সব সত্য লিখতে নেই। মুক্তিযুদ্ধ কোনো ব্যক্তিক বিষয় নয়। অবহেলা, উৎপীড়ন, পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে এই দেশের মানুষেরা যুদ্ধ করেছে, মারা গেছে, সেখানে যদি একজন পাক আর্মির কাছ থেকে একজন মুক্তিযোদ্ধার দেশাত্মবোধ শিখতে হয়, বুঝলেন, এ হলো একজন সাহিত্যিকের দেশের সাথে কমিটমেন্টের জায়গা। সে যখন গল্পটা লেখে, তখন তাকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাটাই উস্কাচ্ছিল, পরে গল্পটা ছিঁড়ে ফেলে সে বলে, এতে করে দেশের সাথে তার বিট্রে করা হবে। মানুষ পাক-আর্মিদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়বে। সন্ত্রাসীদের সাথে অনেক ভালো মানুষও নানা অসহায়ত্বের কারণে যুক্ত হয়, তারা বাধ্য হয়ে শিশু হত্যা, নিরীহ মানুষ হত্যা করে, এখন কলমের ক্ষমতা আছে বলেই সেই অনন্যোপায় হয়ে যুক্ত হওয়া অপরাধী মানুষটাকে বড় করে একটা কিছু লিখে যদি পুরো সন্ত্রাসী দলটাকেই মহৎ করে তোলা হয়ে যায়—।

আসলেই, আমি অস্ফুট স্বরে বলি, আমাদের কতকিছু হিসেব করে চলতে হয়।

তা তো বটেই! জীবনে হিসবেটাই মূল জায়গা! এক্ষেত্রে এক বিন্দু টাল খেয়েছেন তো।

এই পর্যন্ত বলে মিস্টার এম. যথারীতি সিগ্রেট ধরান। আমি জানি, মুখে না বললেও ভেতরে ভেতরে তিনি অপেক্ষা করছেন, লেখক সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা কী হয়েছে তা শোনার জন্য।

আমি যথারীতি ধীর কণ্ঠে শুরু করি, আপনাকে আগেই বলেছি লেখকের সম্পর্কে আমার আকাঙ্ক্ষার তীব্রতার কথা। আমি সুশোভনাকে না জানিয়েই তাঁর ফোন নাম্বার জোগাড় করে তাঁকে অত্যন্ত ভদ্রকণ্ঠে বলি, আমি তাঁর একজন ভক্ত পাঠক, তাঁর সাথে দেখা করতে চাই। তিনি বলেন, প্রিয় লেখককে কখনো দেখতে নেই, তাতে স্বপ্নভঙ্গ হয়।

আমি বলি, এতে আমার স্বপ্ন আরো বাড়ছে। লেখক মানে তো কোনো প্রেমিকের আকৃতি নয়, স্বপ্নভঙ্গের ভয় আমি পাচ্ছি না। তিনি একদিন সময় দিলেন।

সেই সন্ধ্যায় তাঁর বাড়ির সিঁড়ি টপকাতে টপকাতে— মিস্টার এম., আপনাকে কী বলব, আমার দমবন্ধ হয়ে মরার দশা। আমার মধ্যে প্রচণ্ড ভয়— যদি অতীনের প্রেমকে ম্লান করে দেন তিনি ? যে তিনি আমাকে না চিনেই এত চেনেন, তিনি কি ঈশ্বর ? আমি কি অদৃশ্য বোরাকের ঘোড়ায় চড়ে সেই ঈশ্বরের কাছেই এসেছি ? তাঁর সিঁড়ির শেষ ধাপে পা রেখে আমার মধ্যে গির্জার শেষ ধাপে পা রাখার অনুভূতি হয়। বহু বহুকাল পর আমার হাত-পা কাঁপতে থাকে। মনে হয়, স্বর্গের দরজা খুলে যাওয়া মাত্র ঈশ্বর এসে দাঁড়াবেন আমার সামনে। তখন আমাকে কেন্দ্র করে তাঁর চোখে যে আবেগ, যে বিস্ময় আমি দেখব, তার সামনে কী করে নিজেকে স্বাভাবিক রাখব আমি ?

আমি তো আর সুশোভনা নই, মনের অনেক প্রকোষ্ঠ আমার, একেক জনকে একেক প্রকোষ্ঠে রাখব ?

কলিংবেল টেপার আগে নিজেকে থিতু করতে অনেক সময় নিই। জীবনে প্রথম সেসময় নিজেকে সাংঘাতিক মূল্যবান মনে হলো। একজন স্রষ্টা আমাকে চরিত্র করে একটি উপন্যাস লিখে অকল্পনীয় বিখ্যাত হয়েছেন, তাঁর অভিভূত আবেগের সামনে—।

একসময় দরজা খুলে গেল।

ড্রয়িংরুমে বসে থাকি অনেকক্ষণ। সারা ড্রয়িংরুম জুড়ে পৃথিবীর বিখ্যাত মানুষদের সাথে তাঁর ছবি।

কাজের বুয়া চা-বিস্কুট দিয়ে বলে, তিনি লেখার রুমে আছেন, এক্ষণি আসছেন।

লেখার রুমে আছেন ? ছি ছি, এটা কোন সময়ে এলাম ? আমি বরং চলে যাই— যখন এরকম অস্বস্তিতে ভুগছি ,মিস্টার এম., তখনই পাঞ্জাবি আর জিন্সের প্যান্ট পরিহিত টাক মাথার বৃদ্ধ লেখক ড্রয়িংরুমে এলেন। আমার ভেতরে তাঁর যা কাল্পনিক চেহারা ছিল, তার সাথে এই চেহারার কোনো মিল নেই। শাদা চামড়া, ঝাঁকড়া চুল... ফর্সা মুখ... পাজামা-পাঞ্জাবি... আমি তাঁর এরকম একটা রূপ ভেবেছিলাম। তিনি তা নন, তবে অত্যন্ত স্মার্ট। কোনো বৃদ্ধকে এরকম স্মার্ট দেখতে ভালোই লাগে।

তুমিই তাহলে আমার সেই ভক্ত পাঠক ? বলে তিনি অত্যন্ত কায়দা করে পায়ের ওপর পা তুলে আমার মুখোমুখি বসলেন। মুখে পরিমিত হাসি। তীক্ষ্ণ চোখে তিনি আমাকে এমনভাবে দেখছেন, আমার মধ্যে মুহূর্তে এই বোধ প্রবল হয়, তিনি আমাকে চিনে ফেলেছেন। আমার রীতিমতো ঘাম ছুটে যায়। সারাঘরে নীরবতা। কী বলব খুঁজে পাচ্ছি না।

ও-কী, চা খাচ্ছ না কেন? বলে তিনি নীরবতা ভাঙেন। আমি থতমত খেয়ে চায়ের কাপ হাতে নিলে তিনি প্রশ্ন করেন, কী কর তুমি?

চাকরি।

ওহ্ তোমার নামই তো জানা হলো না!

আমি হড়হড় করে বলি, নন্দিনী।

ভেবেছিলাম, আমাকে না চিনুন, অন্তত এই নামটা শুনলে তার মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রতিক্রিয়া হবে। কিচ্ছু হয় না, বরং তিনি বলেন, সুন্দর নাম, রবীন্দ্রনাথের নায়িকার নাম। কে রেখেছিল এই নাম তোমার?

এবার ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়ি। আমি ছুটে তাঁর পায়ের কাছটায় বসে পড়ে বলি, আশ্চর্য! আপনি আমাকে চিনছেন না?

তিনি হতবাক হয়ে বলে, ও-কী! করছ কী? ওঠো। ওঠো।

আমি নন্দিনী, আপনি যাকে নিয়ে বোরাকের ঘোড়ার উপন্যাস লিখেছেন!

সে-কী! তাই নাকি? আমাকে আগে বলবে তো! বলে তিনি আমাকে মেঝে থেকে তুলে দাঁড় করিয়ে তাঁর পাশে বসান। সহসা আমরা কেউ কথা বলতে পারি না। আমার তখন কেন জানি খুব কান্না পাচ্ছিল। আমি অপেক্ষা করছি, এরপর কী হবে? আমাকে যেটা তুমুল স্বপ্নভঙ্গের মধ্যে নিয়ে যায়, তিনি তারপরই সিগ্রেট জ্বালিয়ে তাঁর উপন্যাসের মধ্যে ঢুকে পড়েন। বলেন, এই উপন্যাস লিখতে গিয়ে আমাকে প্রচুর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই পড়তে হয়েছে, এছাড়া নন্দিনী, যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে আমিও তো এসেছি। হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন... কোনোটারই বুঝলে যন্ত্রণার বিষয়টা ছোট করে দেখার না। কিন্তু একজন ঔপন্যাসিক এইসব গতানুগতিক চিত্রকেই মূল উপজীব্য বিষয় করে একটা কিছু লিখে শুধু সামাজিক দায়িত্ব পালন করবে কেন? এই জন্যই আমি অনেকদিন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কিছু লেখার কথা অনেকবার ভেবেও বুঝলে, লিখে উঠতে পারি নি। বলতে বলতে লেখক দাঁড়িয়ে পড়েন।

বাইরে তখন ধুলো ঝড় উঠেছে, চিৎকার করে তিনি কাজের ছেলেকে ডেকে নিজেই জানালার পাল্লা লাগাতে লাগাতে বলেন, বুঝলে সব কয়টা ঠসা, বধির, এদের জন্য বিদেশ থেকে কান এনে লাগাতে হবে।

বুঝলেন মিস্টার এম., আমার তখন শরীর ঠেসে গেছে সোফায়, আমি তাঁর শরীর সঞ্চালন দেখছি, ঘরের মধ্যে ছায়াবাতাস... সশব্দে আলো জ্বলে যায়। সুইচে চাপ দিয়ে তিনি আবার সোফায় আমার কাছে বসে বলেন, নন্দিনী, আমি সুশোভনার কাছে ঋণী, সে আমাকে সাংঘাতিক আনকমন এক গল্প দিয়েছে। আর্মিরা নানারকম অত্যাচার করেছে এদেশে, কিন্তু আমার পাঠকেরা, বুদ্ধিজীবী মহল আমাকে অভিভূত হয়ে বলেছে, এই জাতীয় বিচিত্র কায়দার অত্যাচার তারা কোনোদিন দেখে নি, শোনে নি। একজন মেয়ের স্বপ্নকে আমি অলৌকিক রূপে এনেছি। যুদ্ধের সাথে এক বালিকার স্বপ্ন এবং স্বপ্নহত্যার এই চিত্র সম্পর্কে তারা কোনোদিন ধারণা করতে পারে নি। না না, আমি তোমার সেই সময়কার সেই পীড়নকে ছোট করে কিছু বলছি না, তোমার সেই কষ্ট ঘোচানোর সাধ্য আমার নেই, তবুও বলব, এটা খুব আনকমন কষ্ট। তোমার গাড়ির নিচে পড়েও একটা পা কাটা পড়ে যেতে

পারত। এখানে কোনো মেয়েকে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী লেখা মানেই তার ধর্ষণকে বড় করে দেখানো। যেন ধর্ষিতা হওয়া ছাড়া মুক্তিযুদ্ধে মেয়েদের আর কিছু করার ছিল না। তোমাকে সেই আর্মিরা ধর্ষণ করে তোমার শরীরে আগুনের ছ্যাক দিতে পারত, তাতে তোমার কষ্ট হয়তো এর চাইতেও বেশি হতো, কিন্তু তাতে আমার....।

ফোন বাজতে থাকে। মিস্টার এম., আপনাকে বোঝাতে পারব না, কী দুঃসহ হয়ে উঠেছিল আমার সেই মুহূর্ত! আনকমন এক গল্প! আমার এই পীড়ন নিছক এক সাংঘাতিক গল্প! আমার সামনেটা ছায়া, কেবল ছায়া, শরীরে মনে হচ্ছিল প্রাণ নেই... ভাবলেশহীন কানে শুনি, টেলিফোনে তিনি কার সাথে চিৎকার করছেন, আপনাকে তো বলেছিই কমপক্ষে বিশ হাজার টাকা অ্যাডভান্স না দিলে আমি আপনাকে পাণ্ডুলিপি দেব না! হ্যাঁ... হ্যাঁ... আহ্, অত কথা পেঁচাচ্ছেন কেন? আপনাদের আমার ভালো চেনা আছে। পত্রিকাগুলো কী করে? লেখা নেয়ার সময় ফেউয়ের মতো পিছনে লেগে থেকে জান কাবাব করে দেয়, সম্মানীর সময় টালবাহানা... আহ্ বলছি তো, আপনি বিশ হাজার নিয়ে আসুন, দু'মাসের মাথায় পাণ্ডুলিপি পেয়ে যাবেন... হ্যাঁ... হ্যাঁ, এখনো তো উপন্যাসটা লিখি নি, কী করে বুঝব কয় ফর্মা হবে?

আমি দাঁড়িয়ে পড়ি। ছায়া ড্রয়িংরুমে লেখকের পেছনটা দেখা যাচ্ছে... আর বিলীয়মান শব্দাবলি... মেক্সিমাম পাঁচ ফর্মা... আমি কম্পিত হাতে ড্রয়িংরুমের ছিটকিনি খুলি... আমার মাথা ঘোরাতে থাকে... আমি ছুটতে ছুটতে সিঁড়ি ভেঙে সেই বাড়ি থেকে পালিয়ে আসি।

পথে হাঁটতে হাঁটতে আজকাল কেবলই কেন যে হোঁচট খাই। অতীনকে মনে পড়ে। কৃষ্ণচূড়ার ভাঁজে ভাঁজে, কোলাহলময় নগরীর ওপরের নিঃশব্দ আকাশটার কোথায় যে ও মিশে আছে! প্রেম নিয়ে, কাজ নিয়ে, ব্যস্ততা নিয়ে— কিছু নিয়ে ওর হাহাকার ছিল না। আমার ওই ছেলেবেলার ভাস্কর ছাড়া পৃথিবীতে আর কাউকে ও ঈর্ষা করত না। তা-ও করত তার নিজের ভাস্কর না হওয়ার ঘোরতর অতৃপ্তি থেকে। ওর সবচাইতে যন্ত্রণার উৎস ছিল রামকিংকর। আমাকে বলত, সেই বয়সে যদি রদ্যাঁ না পড়তাম, আমার ভালো হতো। আমি বেঁচে যেতাম নন্দিনী। রদ্যাঁ পড়ে মনে হলো, ভাস্কর হওয়ার অনেক খরচ। এত টাকা আমি কোথায় পাব? অথচ রামকিংকরের দিকে চেয়ে দেখো, তাঁর গুরু ছিলেন অনন্ত মিস্ত্রী, বাঁকুড়ার ছুতোর পাড়ার প্রতিমা শিল্পী। তার মাটির কাজের দুর্গা, গনেশের কাজে সাহায্য করে করে এক সময় রামকিংকর নিজের পথ খুঁজে পান। তাঁর মনে হয়, মাটির মূর্তি বৃষ্টিতে ভিজে যায়, সস্তায় আর কী খুঁজে পাওয়া যায়, যা বহু বহুদিন টিকবে? কাঁকর, সিমেন্ট, লোহা দিয়ে শুরু হয় এক্সপেরিমেন্ট, সাথে গোবর মাটি, আলকাতরা... সেই কংক্রিটের মূর্তির স্থান আজ কোথায়? কত বড় মাপের শিল্পী তিনি কল্পনা করতে পার নন্দিনী? শিল্পী! স্রষ্টা! বড় বিচিত্র! কাফকা নিজের সৃষ্টি নিজের হাতে ধ্বংস করতে পারেন নি বলে আত্মহত্যার আগে বন্ধুকে বলে গেছেন ওগুলো পুড়িয়ে ফেলতে। আর রামকিংকর? নির্মমভাবে নিজের কত কাজ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন, জানো নন্দিনী, শুধু ভেঙেও তাঁর শান্তি ছিল না, সেই কাজ তিনি মাটিতে পুঁতে ফেলতেন।

কী বলছ তুমি অন্তু, ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলতেন এ মানি, মাটিতে পুঁতে ফেলতেন কেন ?

অতীনের সে-কী হাসি! তুমি দেখি ওরকম গল্প করছ, লোকটা মরে গেছে ? আহ্‌হা! ভাগ্যিস কোপটা চোখে লাগে নি! চোখটা বেঁচে গেছে!

দুটো কথা এক হলো! আমার ভীষণ রাগ পেত, তুমি আমার কথার এই অর্থ করলে ?

আহ্‌হা, চটছ কেন... ইয়ার্কী করতে পারি না ? তুমি বুঝছ না রামকিংকর হতে পারি নি বলে আমি কেমন ঈর্ষায় জ্বলে যাচ্ছি! আমার কথা অত ধরছ কেন ? বিষয়টা একজন শিল্পীর প্রবণতার তারতম্যের কারণে ঘটতে পারে। এমনও হতে পারে, নিজের নির্মিত ভাঙা খণ্ডগুলো তাঁকে কষ্ট দিত। সেটাকে মাটিতে বিলীন করে না দেয়া পর্যন্ত তিনি আর কোনো কাজে হাত দিতে পারতেন না ? আমার ভালো লাগে না নন্দিনী... এই প্রাবন্ধিকের জীবন। এ আমি হতে চাই নি। এ আমার কাজ না। প্রবন্ধের মধ্যে কবিতা ঢুকে যাওয়া কোনো ভালো কাজ নয়। আমি আরেকটা অতৃপ্তির ছায়া যদি যে কাজটা করছি সে কাজটা দাবি না করলেও তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিই, তার মধ্যে কোনো শান্তি নেই নন্দিনী। এই ফাঁক হয়তো অন্যেরা বুঝবে না, আমি গায়ের জোরে বলব, শিল্প স্বাধীন, এর নিজস্ব কোনো বৃত্ত নেই, কিন্তু আমি নিজে যদি জানি, আমি আমার অন্য এক অবদমনের ভার যা করছি তার মধ্যে ঢুকাচ্ছি, এই ফাঁকের আসল সূত্র আমি নিজে যদি জানি, নন্দিনী— এ দুঃসহ!

থামো অন্তু, থামো! জীবনটা এরকমই।

তুমি হয়তো আমারই কথা আমাকে ফিরিয়ে দেবে, পৃথিবীর বিখ্যাত মানুষদের উদাহরণ দিয়ে বলবে, যে যেটাতে সেরা হয়েছেন, সেটা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তার প্রথম পছন্দের কাজ ছিল না। আমার বিষয়টা মোটেই তেমন নয় নন্দিনী, তেমন হলেও আমার মধ্যে ন্যূনতম হলেও বাঁচার শান্তি থাকত! আমি ভাস্কর হতে পারি নি বলে জেদ করে শিল্পের স্বতঃস্ফূর্ত অন্য কোনো মাধ্যমে কাজ করি নি। আমি গল্প-উপন্যাস লেখার কথা ভাবতে পারতাম, ছবি আঁকার কথা ভাবতে পারতাম... সব বাদ দিয়ে আমি এসেছি প্রবন্ধে, নিজের বিরুদ্ধে জেদ করে সৃষ্টির মানুষ এসেছি নির্মাণে। নিজের পছন্দের বাইরে শুধু জেদের বশে পাহাড় ঠেলার কাজ শুরু করেছি, এ নন্দিনী নিজের সাথেই নিজের প্রতারণা। এ পাপ! এ নিজেকে ঠকানো! প্লিজ, তুমি এ নিয়ে আমাকে আর কিছু বোঝাতে এসো না, প্লিজ!

সুশোভনা আমার পাশে ঘুমিয়ে থাকে, অথবা নিশ্চল পড়ে থাকে। ওর জীবন থেকে মৈনাক চলে গেছে, আমার জীবন থেকে অতীন, আমরা দু'জন প্রায়শ অপ্রাপ্তির গল্প করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। এর মধ্যে একজনের নিঃশ্বাস ঘন হয়ে এলে আরেকজন হেঁটে যাই, জানালার ধারে, দূরের অন্ধকার রাত দেখতে দেখতে চোখ ঢুলে আসে— তবুও বেশ আছে সুশোভনা... ওর বেদনাকে ও জৌলুশ দিয়ে ঢাকতে পারে। মৈনাকের প্রস্থানের পর সে ফের হুলুস্থুল জীবন শুরু করেছে। ওকে সবাই খারাপ জানে, সুখী জানে, কেবল আমি ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠি, একদিন হয়তো বিয়ের পোশাক পরে ও বিষ খাবে। ভোরে উঠে দেখব রাতের কলহাস্যরত মেয়েটি আমারই বাহুলগ্ন হয়ে মৃত পড়ে আছে, তখন ফের আমার ঘোড়ার স্মৃতি লাঞ্ছিত হবে, সারাজীবন আমি এই ভেবে পস্তাব, ওকে যদি বাঁচাতেই না পারলাম—

কেন অতীনকে অসম্মান করে আমি ওর কাছে নিজের ওই স্মৃতি তুলে দিয়েছিলাম। এ-তো ছিল আমার আর অতীনের বেদনার ভার, কেন সুশোভনার সূত্র ধরে একজন লেখকের হাতে পড়ে বিষয়টা বাজারের গল্পে পরিণত হলো?

সুশোভনা ঘুমের মধ্যে আশ্চর্য স্পষ্ট স্বরে বলে, শিবকুমার! বিরাট ওই হল ঘরটায় বসে আপনি বাজান... আমি একাকী নাচতে নাচতে নাচতে...।

রাত বাড়তে থাকলে অতীনকে মনে পড়ে। কেন ওকে ভুলতে পারি না? কেন? একবার এক প্রবন্ধ সম্মেলনে যোগ দিতে অতীন এক ছোট্ট মফস্বলে গিয়েছিল। ওই দলের সাথে অনাহূতভাবে শুধু অতীনের লোভে আমিও ঝুলে পড়েছিলাম। দু'দিনব্যাপী প্রোগ্রামে যদিও প্রবন্ধ মূল বিষয় ছিল, তবুও নাচ-গান অনেক কিছু ছিল। নামে মফস্বল, আসলে প্রায় গ্রামই বলা চলে। মানুষের স্বপ্নের মধ্যে যেমন একটা তেপান্তরের মাঠ থাকে, তেমনই এক মাঠের একদম মাথায় মঞ্চ সাজানো ছিল। যেদিন প্রোগ্রাম শেষ, একে একে সব বাতি নিভে আসছে, অতীনরা খুব মদ খেল। যদিও কদাচিৎ ও মদ স্পর্শ করত। সেদিন শুধু মঞ্চের ওপর একটা বাতি জ্বলছে, তার নিচে টেবিল, চারপাশে সারসার পাতানো চেয়ারে অতীনও বসে গেল তুমুল মদ্যপানে। মঞ্চের সামনের সারি সারি চেয়ারগুলো তখনো সরানো হয় নি, আমি একা সেখানে বসে আছি কেউ খেয়াল করে নি। সবাই তখন কার্ড খেলছে। গভীর রাত। আকাশের নক্ষত্রগুলো সবে পাকতে শুরু করেছে, আর তারায় তারায় শবলীকৃত অপার হিমহিম রহস্য। আমি পেছনের অবোধ্য তেপান্তরের দিকে তাকাই। এই তো স্বপ্নে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ। পিছু হটতে থাকি। ওই তুমুল আড্ডায় পড়ে অন্তু আমাকে ভুলে গেছে? ভেতরের ক্ষণিক জ্বলে ওঠা অন্তর্জ্বলনকে প্রশ্রয় না দিয়ে ছুটতে থাকি। আহা! কী খোলা রাত্রি তেপান্তর! কল্পনা ছাড়া বাস্তবে কোনোদিন এর বুক ধরে ছুটতে পাব, স্বপ্নে কখনো ভেবেছি! না! পরক্ষণেই পা খামচে ধরে ভয়ের শৃঙ্খল! আমি বেশ খানিকটা দূর চলে এসেছি। যদিও শুনেছি এই এলাকা নিরাপদ... কিন্তু জন্মাবধি বিন্দু বিন্দু করে রক্তের মধ্যে মিশে যাওয়া আতঙ্ক ভয়ের বন্ধন থেকে সাধ্য কী, এক পর্যায়ের পর দৌড়ে না থামি?

অনেকটা দূরে মঞ্চ। টিমটিমে আলোর নিচে হট্টগোলরত মানুষেরা। আমি জীবনে ভুলব না সেই দৃশ্য। যেন আমি এই দু'দিন এই মঞ্চে কিচ্ছু অনুষ্ঠান দেখি নি। অবাধ মুক্ত আড্ডায় মিশে গেছে রাত্রি মানুষেরা। দিনের বেলায় বক্তৃতার সময় এরাই ছিল পরিশীলিত মুখোশ পরা মানুষ। আমার রক্তের মধ্যে রহস্যের প্রস্রবন। আমি এগোচ্ছি। অন্ধকার! অন্ধকার! নিকটবর্তী হচ্ছে মঞ্চ! এর মধ্যেই সামনে ছায়া! চিৎকার করে উঠব... সেই ছায়া আমাকে ফিসফিস চুম্বন করে— আমি অন্তু! এই নক্ষত্র আলোর নিচে আমাদের আজ বিয়ে হলো!

বিয়ে!

নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দে নিজেই চমকে উঠি। সুশোভনাও কি সেই শব্দ পায়? ঘুমের মধ্যে কেঁদে ওঠে সে, নন্দিনী... আমাকে বাঁচাও! ওর ঘোরগ্রস্ত কণ্ঠ মিশে যায় রাত্রিআঁধারের সাথে!

এরপর দু'জন গায়ে গা ঘেঁসে এগোচ্ছি। আমার রোমাঞ্চিত জ্বরতপ্ত শরীর পুড়ে যাচ্ছে ওর সান্নিধ্যের স্পর্শে। মঞ্চের একদম কাছটায় এসে দাঁড়িয়েছি, তখন দেখি আরেকজন সিনিয়র নাট্য নির্দেশক মঞ্চ ছেড়ে এসে বসেছেন সামনের চেয়ারে, তিনি চিৎকার করে ডাকেন— অতীন!

যেন আমার নাড়ি খুলে বেরিয়ে যায় অন্তু। তখনো মঞ্চে কার্ড খেলা চলছে। সেই প্রাবন্ধিক বলেন, দেখো দেখো মঞ্চটাকে, দেখো ওখানে আর্থার মিলারের 'ডেথ অব দ্য সেলম্যান' দেখানো হচ্ছে!

অতীনও দেখে। স্পর্শের ঘোরে আমি এসে দাঁড়িয়েছি তার পাশে! চিৎকার করেন নাট্য নির্দেশক, যিনি নাটকের ওপর প্রবন্ধও লেখেন— হুবহু এই দৃশ্য! হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই আছে, টিমটিমে আলোর নিচে কার্ড খেলা হচ্ছে! অতীন! অতীন! পেছন থেকে একজন চেয়ারের ওপর পা উঠিয়ে দিল কেন? অতীন সর্বনাশ! নাটকে এমন ছিল না। সর্বনাশ! বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে চেয়ার ফেলে দাঁড়িয়ে পড়েন নাট্য নির্দেশক।

কোত্থেকে এতরাত্রে গান ভেসে আসছে! সুশোভনা ঘুমের মধ্যে বকছে। কোত্থেকে... মেঝেতে বসে কান পাতি। 'দেহ কাটিয়া মুই বানাবো নৌকা তোমারই, দুটি কাটিয়া হাত বানাবো নৌকারই দাঁড়ি, আর বসন কাটিয়া দেবো, পাল তুফানে আমি উড়াবো, হবো ময়ূরপঙ্খী তোমারই, তোরে বুকে নিয়া সুদূরে যাইবো গো ভাইস্যা...'

মনে পড়ছে, সেই রাতে মঞ্চের ক্যাসেটে এই গান বেজেছিল। আমি অতীনের শার্টের মিষ্টি গন্ধে মুখ রেখে বলেছিলাম, তুমি যদি আমাকে কোনোদিন ছেড়ে যাও?

অতীন গভীর স্বরে বলে, তাহলে আমার যেন মৃত্যু হয়।

মিস্টার এম., আমি প্রায়ই আপনার অফিসে আসছি, আপনার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো?

মিস্টার এম. শান্ত কণ্ঠে বলেন, এখন পর্যন্ত হচ্ছে না। হলে বলব।

এরপর কী বলা যায়? সামনে চা আসে। আমি কথা খুঁজে পাই না। সেদিন বোরাকের ঘটনা শোনার পর তিনি খুব সরলভাবে দ্রুত আমার সেই দাগ দেখতে চেয়েছিলেন। আমার রক্তাভ মুখ দেখে মুহূর্তেই তিনি অপ্রস্তুত হয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা প্রসঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছিলেন। আমি সেই পরিস্থিতিতে স্পষ্ট অনুভব করেছিলাম, তিনি সেই মুহূর্তের আবেগে একজন শিশুর শরীরের অত্যাচারের দাগ দেখার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। পরমুহূর্তেই তাঁর যখন মনে পড়ে সেই দাগটি আর শিশুর শরীরে নেই, একজন যৌবনবতী রমণীর অস্বস্তিকর জায়গায় আছে— তিনি লজ্জিত বোধ করেছিলেন। তাঁর সেই সাথে সাথে দেখতে চাওয়ার মধ্যে আমি গভীরতা খুঁজে পাই নি। যে আমি আমার সেই দাগ অতীনের সামনে তুলে ধরার জন্য দিনরাত্রি এক করে মরতে বসেছিলাম— সেই দাগ শেষমেষ এক সন্ধ্যায় দেখতে চেয়েছিল অতীন। সেই নক্ষত্ররাত্রির উদার আসমানের নিচের ঘটনার পর। তার সারামুখে ছিল বিষ যন্ত্রণার দাগ, বেদনা, ভয় আতঙ্কের অশরীরী ছায়া... আমি শূন্যঘরে যখন ভাবছিলাম ওর বাসর স্পর্শ আমার দেহমনকে আগুন শিশিরে ডুবিয়ে দেবে, তখন সে

আমাকে অতলান্তে তলিয়ে দিয়ে বলে, আমি আজ তোমার বোরাকের ঘোড়া দেখব।

মিস্টার এম. আমার পিঠে যেন সেই লেখকের ছুঁড়ে দেয়া চাবুকের আঘাত পড়ল। কতদিন... কতদিন আমি অপেক্ষা করেছি! বলেছিও তাকে... অন্তু... তোমার স্পর্শের শব্দে আমার একমাত্র... কিন্তু অতীন কেন এত সময় নিল? যখন ওকে বলা যন্ত্রণার মধ্যে জমতে শুরু করেছে শ্যাওলা, আমি যখন ক্রমে ক্রমে নিজেকে বিন্যস্ত করে অতীনের স্পর্শের মোহে মাতাল হয়েছি, তখন সে কেন সেই দাগ দেখতে চাইল?

অতীন বলে, এই ক'মাস আমি মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছি। নন্দিনী, তোমার ওই ক্ষত দেখে আমি কষ্টে যন্ত্রণায় উন্মাদ হয়ে যেতে পারতাম!

না! না! আমি ছিটকে পড়ি! আজ আমার সেই আকাঙ্ক্ষা ফুরিয়ে গেছে!

অন্তু তুমি এ-কী করলে? সেদিন যখন তোমার স্পর্শে আমি আমার সারাজীবনের দুঃসহ অপমান আর বেদনার দাগ মুছতে চেয়েছিলাম, তুমি গল্প বলে, গান গেয়ে, মুখে বেদনার ছাপ তুলে সময়ের পর সময় নিলে। আমার যন্ত্রণা নিভে গেল, আমি নিজেকেই নিজে থিতু করে ফের একলা দাঁড়ালাম নিজের সামনে— তুমি তারপরও দিনের পর দিন চুপ! আজ বহুকাল পর সেই নক্ষত্ররাতের পর আমি যখন তোমার স্পর্শে উন্মাদ হতে চাইছি, তুমি মোছাতে এসেছ সেই অপমানের দাগ... কী হতভাগা অন্তু তুমি! আরো ক'বছর পর আমি যখন অন্য এক বাস্তবতায় পড়ব, তুমি নিয়ে আসবে নক্ষত্রের নিচের স্পর্শের কাঙ্ক্ষা... আমাকে ক্ষমা কর অন্তু! ক্ষমা কর! আমি সেই দাগ তোমাকে দেখাতে পারব না!

বলতে বলতে মিস্টার এম.-এর টেবিলে আমার মাথা নুয়ে আসে। আমাদের কথা আর এগোয় না।

খুউব ভোরে ঘুম ভেঙে যায়। সুশোভনা তার আদুরে পা আমার গায়ে উঠিয়ে বলে, সারারাত ঘুমাতে পারি নি। এরপর আমরা দু'জনই চুপ। আমি উঠে চা ফুটিয়ে আনলে দেখি ঝরঝরে বারান্দায় সুশোভনা বসে আছে। কেঁদেছ নাকি? ওর ফুলো চোখ দেখে প্রশ্ন করি। নিরুত্তর সুশোভনা চায়ে চুমুক দিয়ে এক আজব প্রশ্ন করে, মিস্টার এম.-কে তোমার কেমন মনে হয়?

আমি বেশ খানিকক্ষণ ভেবে বলি, নিজ থেকে উনি কিন্তু বলেন না। তবুও এই পর্যন্ত যা তাকে দেখেছি, সবচাইতে নিঃসঙ্গ, সবচাইতে সেরা মুখোশ পরা মানুষ। ধরো তিনি তোমার প্রতি আগ্রহ বোধ করছেন, তখন তিনি নিজেকে, নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করার লোভে দুর্মর হয়ে উঠেন। কিন্তু যখনই তুমি তাঁর প্রতি আগ্রহ বোধ করতে শুরু কর তখন তিনি একেবারে মাথায় বজ্রপাত পড়ার মতো নিজের সেই সহজাত রূপ পাল্টে এমন একটা রূপের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াবেন, যেন কোনোদিন তোমার সাথে কোনো আনুভূতিক সম্পর্কই ছিল না। মানুষকে বিশ্বাস করেন কম। আমি ঠিক তোমাকে বোঝাতে পারব না, ধরা যাক কোনো মেয়ে তাঁর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করতে করতে অনেক কথা বলছে, তিনি কণ্ঠে সুর তুলে ম্যাগাজিন উল্টাতে উল্টাতে এমন ভান করেন, যেন কিছুই তিনি শুনছেন না। কেউ কিঞ্চিৎ তাকে তাচ্ছিল্য করলে সেই মানুষকে জয়ের নেশা তাকে চেপে বসে... জয় শেষ

হলে ক্রমশ তিনি থিতু হয়ে উঠেন। বুঝলে সুশোভনা, আগাগোড়া তিনি যুক্তির মুখোশ পরে থাকেন ভেতরের অনুভব, অনুভূতিকে লুকানোর জন্য। কিন্তু উনি জানেন না এতে যে তিনি কত সরল, কী ভয়ঙ্কর বন্ধুহীন হয়ে পড়ছেন। সবচাইতে অদ্ভুত, যে তিনি এত গভীর মমতায় আমার কথা শুনে যাচ্ছেন, সেই তুমিই যদি তার কাছে কিছু প্রত্যাশা কর, তিনি এমন অন্য মানুষ হয়ে একটা খেলো যুক্তিকে প্রকাণ্ড করে এমন সব কথা বলব! অথচ অনেক বিষয়েই তিনি সাংঘাতিক হেল্পফুল। সাংঘাতিক মানবিক...।

তাহলে নন্দিনী, ওর কাছে যাও কেন?

তুমি কি ভাবছ, আমি ওর প্রতি আমার আকুলতার কারণে যাই? পৃথিবীতে নানা রকম মানুষ, নানা বন্ধুত্ব... তবে মিস্টার এম. যাই বলো, দুর্ভাগা। সেদিন ফোনে আমার সামনেই একটি মেয়েকে ধমকাল— তবে কেন তোমার সাথে কথা বলি? আমি তো রাস্তার ফকির, রিকশাওয়ালাদের সাথেও কথা বলি...। ফোন রেখে দিলে আমি মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম, আপনি আপনার সমান যে কোনো মানুষকে এইভাবে বলেন?

মিস্টার এম. অবাক। আমি খারাপটা কী বললাম? রিকশাওয়ালা, ভিখিরি মানুষ না? সে-ই বা এরকম অযৌক্তিক প্রশ্ন করবে কেন?— এর মধ্যেই তিনি হয়তো পরীক্ষা করে দেখতে চান, তার এসব ব্যবহারের পরও কোনো মানুষ দীর্ঘদিন তাঁর আচরণ প্রবণতা চিনে চিনে হাঁটবে। কিন্তু মিস্টার এম. কি ঈশ্বর? কার অত দায় পড়েছে...।

তিনি যদি তোমার প্রতি নির্ভরশীল হন? চায়ে ফের চুমুক সুশোভনার।

জীবনেও হবেন না। আমি বলি, আমার সাথে তার হৃদ্যিক সম্পর্ক হওয়ার কোনো যোগসূত্র নেই। যে মানুষ পরিচয়ের প্রথম দিন বই কুড়াতে গিয়ে আমার চুলের কাঁটা পড়ে গিয়েছে এটা পর্যন্ত লক্ষ করেন এবং তিনি আদৌ আমাকে দেখেছেন এর ছাপ পর্যন্ত রাখেন না, এরকম মানুষ সহসা কারো প্রতি নির্ভর করবে, সেই ধারণা করা বৃথা, মিস্টার এম.-এর মধ্যে এই আকাঙ্ক্ষা যে নেই তা নয়, কিন্তু যে মানুষ, কখনো কোথাও কোনো অবচেতনার সুযোগেও একবিন্দু যাতে অপমানিত না হন, তার জন্য নিজের মধ্যে সমস্ত ব্যবস্থা তৈরি রাখেন— আমি হয়তো তোমাকে বোঝাতে পারছি না, মানুষের মধ্যেই তো এমন হতে পারে, আমি সুশোভনা তোমাকে এক রেস্তোরাঁর উদাহরণ দিয়ে বলছি, মানে এরকম তো হতেই পারে— আমরা চারপাঁচজন কোনো দামি রেস্তোরাঁয় যাওয়ার হঠাৎ প্রোগ্রাম করলাম, তখন হট্টগোল শেষে দেখা গেল, যিনি এই প্রোগ্রামের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন তার ব্যাগে প্রয়োজনীয় টাকাটা নেই, তখন এমনও তো হতে পারে, অন্যেরাও কিছু শেয়ার করল, মিস্টার এম. কোনো ঘোরাক্রান্ত পরিবেশেও নিজের ব্যাগে যা আছে তার বাইরে কোনো অর্ডার দেন না। তিনি ভালো। সাংঘাতিক ভালো মানুষ। এটা হয়তো তাঁরই মন্দ কপাল— তাঁর এই প্রকট দেয়াল ভেদ করে সত্যিকার তাঁকে কেউ স্পর্শ করতে পারে না। তবে আমার যেটা সবচেয়ে দুঃসহ ঠেকে, তিনি নিজের জীবন সম্পর্কে একটি শব্দও কাউকে বলেন না, কিন্তু অন্যেরটা মনোযোগ দিয়ে শুনেন, এর মধ্যেও কথা আছে, কারো চূড়ান্ত বিধ্বস্ত কাহিনী তিনি যতটা অকপটে শুনেন, ততটাই এড়িয়ে যান, সেই বিষয়টার দায়িত্ব গ্রহণ করতে। আমি আসলে তাঁকে যেহেতু আমার একটা নাজুক অধ্যায় বলার শেষ মানুষ হিসেবে বেছে নিয়েছি, তা-ই ঠিক তাঁর কাছ থেকে সহসা ফিরতেও পারছি না। যদিও সুশোভনা আমার

সাংঘাতিক ভয় হচ্ছে, আমার মনে হচ্ছে এবারও আমি এই কাহিনী শোনানোর ক্ষেত্রে একজন ভুল লোককেই বেছে নিয়েছি... আমি প্রায় ডুকরে কেঁদে উঠি—।

সুশোভনা চুপ।

আমি নিঃশব্দে উঠে ক্যাসেটে চৌরাশিয়ার বাঁশি ছেড়ে দিই।

সুশোভনা নাচতে থাকে... ফিনফিনে মেঘ যেন ওর ঘাঘড়া, ধী..রে... ধীরে... নাচতে নাচতে আমার সামনে মেলে ধরে রাধা কৃষ্ণের যুগল পাথর মূর্তি— পাথর! পাথর! আমি তলিয়ে যেতে থাকলে সুশোভনা গভীর ভেজা স্বরে বলে, আমি মৈনাককে ফিরে পেয়েছি... শোনো নন্দিনী... শোনো...।

তলাতে তলাতে প্রথমে রমনার জলের সামনে...। জলের এই পাশটায় ছিন্নভিন্ন মানুষের উদাস হাঁটাহাঁটি। মৃদু ফটাস। খোসা ভেঙে বেরিয়ে আসে বাদামের যমজ বাচ্চা... চিবুতে থাকি। সদ্য লাইব্রেরি থেকে কিনে আনা তাজা গরম পুস্তকটিকে মেলে ধরি সোডিয়াম রাত্রির তমস আলোয়। অক্ষরগুলো আসমানের প্লেন থেকে দেখা যাওয়া চিকন চিকন পথের মতো।

কেন যে লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এই জায়গায় এসে বসেছি! পাথর থেকে জলে এসেও কি শান্তি আছে? দুটোই তো আমাকে ভাসায় ওড়ায়। সমুদ্র... নদী... দিঘি... বায়ে কী ডাইনে দেখলেই আটকে যাই। নিজেকে আমার মৎসের বংশধর মনে হয়। সামনে জল... সাঁই শব্দে চিৎসাঁতার ডুবসাঁতারে পড়তে পারছি না... শরীরের মধ্যে বিষযন্ত্রণার তরঙ্গ বইতে থাকে। জলের কাছে এলেই একমাত্র আমার মনে হয়, আমার শরীরের রোমকূপের রন্ধ্রে রন্ধ্রে... চাপা আগুন ছড়াচ্ছে, লাফ দিয়ে জলে ডুবে ঘণ্টা ঘণ্টা বুঁদ হয়ে না থাকলে এর উপশম হবে না।

কোনো মেয়ে একাকী সন্ধ্যার পর এরকম রমনার জলের পাশে আসে না— সাধারণত বেশ্যা ছাড়া। এসব ভাবনা চিন্তা থেকে বিযুক্ত হয়ে প্রায়ই আমি যা সাধারণত করা যায় না, তা করার ঝুঁকি নিই। কী আর হবে? কেউ হয়তো অফার করবে। তাতে আমার গায়ে অত ফোস্কা পড়ার কী আছে? ভদ্রভাবে না করে দেব, আমি ওই কাজ করি না। জনারণ্য থেকে কেউ তো আর টেনে নিতে পারবে না!

আর তা যদি পারে, দিনেও পারবে। দুর্ঘটনা তো আর প্রাত্যহিক জীবন হতে পারে না!

এর মধ্যেই আরেকজনকে পেয়ে যাই। আমার মতনই। একলা। হাঁটতে হাঁটতে ও এমনভাবে জলের দিকে যাচ্ছে... যেন অশরীরী কোনো ছায়া ওকে টানছে। বাতাসে মেয়েটির চুল উড়ছে, পাজামার প্রান্ত বেয়ে বেয়ে হাঁটু অব্দি জল উঠে গেছে, কোনোদিকে মেয়েটির ভ্রুক্ষেপ নেই। মেয়েটি যেন আমারই যমজ ছায়া। সহসা আমার এমন হয়, আমি আমার অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে এমন স্তব্ধতায় মেয়েটির দিকে চেয়ে থাকি, যেন মেয়েটি নয়, আমিই জলে নেমেছি।

মানুষ আয়নার সামনে ছাড়া নিজেকে দেখতে পায় না। আমার শরীরের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চ বইতে থাকে, আমি আমাকে দেখতে পাচ্ছি।

আমাকে সেই স্বপ্নঘোর ছায়া থেকে বের করে দেয় মেয়েটির পেছনে দাঁড়ানো একজন ঝাঁকড়া চুলের পুরুষ। সে মেয়েটির কাছে গিয়ে বলে, কী ব্যাপার পাচ্ছ না? মেয়েটি জলে মৎস খোঁজার মতো হাতড়ায়, দুলটা কান থেকে কখন যে খসে পড়ল! আমি রাত আকাশের দিকে তাকাই।

এবং এরপরই যা ঘটে, আমি আমার প্রতিবেশ ভুলে যাই। পাথর মুক্তি থেকে গিয়ে পড়ি জলবন্ধনে।

মেয়েটিকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে ফেলি কর্ণফুলি নদীর ধারে।

ছেলেবেলায় বাবার সাথে এসেছিলাম। তখনই মূলত খেলাটার শুরু। চারপাশ অন্ধকার। বাবা আর আমি গুটিগুটি বসে আছি জলের ধারে, আমি বাবাকে বলি, দেখো বাবা চাঁদটাকে পেটে গিলে নদীর জল কেমন ফুঁসে উঠেছে... ও বাবা! কত পাখি, ওই পাখিটার নাম কী বাবা, যেটার কমলা ডানা, সবুজ ঠোঁট? ও ওইরকম উন্মাদের মতো চাঁদের দিকে ছুটছে কেন? ও বাবা, বলো না!

বাবার চোখ গোল গোল! ভূতে পেয়েছে ভেবে বাবা আমাকে টানতে টানতে এনে জাগতিক কক্ষে ফেলেছিলেন।

রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি আমার কাছে দিয়ে সুশোভনা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। মৈনাককে ও পেয়েছে? কী করে? আমার এবার অন্তুর জন্য কান্না পাচ্ছে। নিজেকে লুকাতে ফের যুগল পাথরে ভেজা চোখ লুকাই। সেই রমনার জলের পাশের মেয়েটি এবার স্ব চেহারায় কর্ণফুলির সামনে মূর্ত হয়। আরে! এত সুশোভনা! ওকে কর্ণফুলির সামনে বসে আমি ব্রহ্মপুত্রের গল্প বলি, বলি, এই যে নদী, একে ঘিরে আছে কী রহস্যময়, দেখছ, রোমাঞ্চকর পাহাড়গুলি? জ্যোৎস্নার আলো আঁধারীর হাজার খেলার মধ্যে পাহাড়ের ঘাসগুলি মুছে পাহাড়গুলি হয়ে উঠেছে এমন, যেন কর্ণফুলির সব জল স্তূপ স্তূপ মাখন হয়ে সার বেঁধে ওদের গা বেয়ে উঠছে, যে নদীর পাশে এরকম পাহাড় থাকে, পূর্ণিমা যার গায়ে স্লিপ খেয়ে জলে পড়ে, তার চেয়ে রূপসী নদী কি আর কোথাও থাকে?

সুশোভনা নিবিষ্ট হয়ে আমার কথা শোনে। আমি যেন ওকে দেখছি না, আত্মনিমগ্ন হয়ে নিজের সাথেই নিজে কথা বলছি... এরকম স্বরে বলি, অথচ এখানে এলেই ব্রহ্মপুত্রের কথা বড় বেশি মনে পড়ে। ওই নদীর পাড়ে আমার জন্ম সেই নদীর শুকিয়ে আসা সরু দেহ, মরাটে কাশবন... সব আমাকে এমন মায়ায় টানে, মনে হয় আমি আমার প্রেম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো উৎসবের মোহে পড়েছি। অথচ জানো, যখন ব্রহ্মপুত্রের ধারে বসি, তখন এর কাঁধে পাহাড় বসিয়ে, চাঁদ এঁকে কর্ণফুলিকে এর মধ্যে খুঁজতে থাকি।

সুশোভনা আমার গলা জড়িয়ে ধরে, নন্দিনী! তুমিও কি আমার মতো পাগল হলে?

ঝাঁকড়া চুলের একজন পুরুষ বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে যেন আমাদের দেখে নি এই ভঙ্গিতে ঠায় চাঁদ দেখতে থাকে। আমি কোনো মানুষকে এরকম ঘটা করে চাঁদ দেখতে দেখি নি। সুশোভনার কী হয়, সহসা কাঁধ ঝাঁকিয়ে ছুটতে শুরু করে। ওর বিলীয়মান কণ্ঠ থেকে কিছু শব্দ বেরিয়ে আসে, এখানে পুরুষ মানুষের গন্ধ! এই জায়গা অপবিত্র হয়ে গেছে!

আমি দেখি সুশোভনা জলের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দূর কুয়াশার অতলান্তে মিলিয়ে গেল।

পুরুষটির প্রতি আমার জেদ জন্মায়। আমি দূর প্রকৃতির মধ্যে যতদূর চোখ যায় সুশোভনাকে তন্ন তন্ন খুঁজি। কিন্তু এই প্রকৃতি আমার নিজস্ব কোনো সম্পত্তি নয়, যে এখানে আমরা ছাড়া কোনো পুরুষ আসতে পারবে না। এইবার চাঁদ দেখতে থাকা লোকটির জন্য মায়া হয়, এখন পুরুষ বিদ্বেষী এই মুহূর্তের সুশোভনাকে মনে হতে থাকে প্রচণ্ড সীমাবদ্ধ।

আমি সুশোভনাকে ভুলতে, লোকটিকে এড়াতে পুস্তক মেলে ধরি। কর্ণফুলির চাঁদ অক্ষরগুলিকে ফুটফুটে করে তুলেছে।

কুণ্ডেরার উপন্যাস 'আনবেয়ারেবল লাইটনেস অব বিয়িং' টেরেজা টমাসের সঙ্গে থাকে কিন্তু তার ভালোবাসা তার সম্পূর্ণটুকু শক্তি দাবি করে এবং হঠাৎ সে আর এগিয়ে যেতে পারে না, তার ফিরে যেতে ইচ্ছে করে 'আরো নিচে' যেখান থেকে সে এসেছে। আমি তখন নিজেকে প্রশ্ন করি মেয়েটির কী হয়েছে? আমি উত্তর পাই, মেয়েটির মাথায় ঝিম ধরেছে। কিন্তু মাথা ঝিম ধরা বলতে কী বোঝায়? আমি সংজ্ঞা খুঁজতে চেষ্টা করি এবং বলি, 'মাথা ঝিম ধরা হলো, পড়ে যাবার অদৃশ্য ইচ্ছা, উন্মুক্ত ইচ্ছা'। পরমুহূর্তে নিজেকে শুধরে আমি সংজ্ঞাটিকে আরেকটু ধারালো করি, 'মাথায় ঝিম ধরা হলো দুর্বলতার একটা ঘোর। মানুষ সেই মুহূর্তে নিজের দুর্বলতা বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে এবং হাল ছেড়ে দেয়। দুর্বলতার মদে মাতাল হয়ে ওঠে সে। দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে ইচ্ছা হয় তার, রাস্তার মোড়ে সবার সামনে পড়ে যেতে ইচ্ছে হয়, যেতে ইচ্ছে হয় নিচে, আর নিচে'। মাথায় ঝিম ধরা হলো টেরেজাকে বুঝে উঠবার একটা চাবি।"

শুনুন। লোকটি আমার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করে। পিঠ দিয়ে চন্দ্রকে সে এমনভাবে এখন ঢেকে রেখেছে, মনে হচ্ছে ঘটা করে দেখে সে চাঁদসম্পত্তির মালিক হয়েছে। বই থেকে মুখ তুলে লোকটিকে দেখার চেষ্টা করি। আজব আলোরে বাবা, অক্ষর দেখা যায়, মানুষ না।

ওই যে মেয়েটি দৌড়ে গেল, ওকে বোঝার চেষ্টা করুন। খামোকা বেচারিকে সীমাবদ্ধ ভেবে ওর প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলবেন না। 'পুরুষের গন্ধে এই জায়গা অপবিত্র হয়েছে' এই শব্দ কোনো পুরুষকে সশব্দে শোনানো মানে, সে পুরুষটির মনোযোগ চাইছে। আপনি কি লক্ষ করেছেন মেয়েটির মুখে ভেসে ওঠা হাহাকার কত প্রকট? আর তা ঢাকতেই সে কত অহেতুক মুখর? ফ্রয়েড কী বলেছে জানেন? 'কাউকে ভালোবাসার উপায় হচ্ছে তাকে ঘৃণা করি বলে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা'। এই ঘৃণা করাটাই মেয়েটিকে বুঝে উঠবার একটা চাবি। সে শব্দগুলো বিশেষত আমাকেই শুনিয়েছে, সব পুরুষকে নয়।

আশ্চর্য!

এখানে কি একজন আরেকজনের সব ভাবনা শব্দকারে শুনতে পাচ্ছে নাকি? আমার কেমন ভয় পেতে থাকে। তাহলে ব্রহ্মপুত্র নিয়ে যে কথা, তাও নিশ্চয়ই আমি শব্দাকারে বলি নি!

আমি প্রশ্ন করি, আপনার সাথে সুশোভনার পরিচয় আছে?

কিছুক্ষণ আগে হয়েছিল। বলে লোকটি কথা বলার আমোদে চাঁদটাকে ছাড় দেয়। সে আমার কাছ থেকে খানিকটা দূরত্বে বসে কর্ণফুলির জলে ঢিল ছুঁড়তে থাকে।

লোকটি বলে, ওর নাম সুশোভনা, না? যা হোক মেয়েটি সমুদ্রের ধারে বসে লুকিয়ে মদ খাচ্ছিল। ওর হাতে ছিল একটা মিনারেল ওয়াটারের বোতল। যে কেউ ভাবছিল, ও জল খাচ্ছে। অনেকেই ওর দিকে মনোযোগী দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল, একমাত্র আমি ছাড়া। ওই গন্ধ আমি দশ মাইল দূর থেকেই টের পাই। ও কলম হারিয়ে গেছে, পায়ে ব্যথা পেয়েছে এই অজুহাতে আমার চারপাশ ঘুরে আমার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছিল। আমি লুকিয়ে মদ খাওয়ার হিপোক্রেসিতে বিশ্বাস করি না, তবে একটা ভণ্ডামি আমাকে মুহূর্তে ওর সামনে খাড়া করিয়ে দেয়, ওর মনোযোগ পেতে আমিও ওকে তাচ্ছিল্য করছিলাম। এরপর সরলভাবে ভেতর থেকে যা এলো তা-ই বললাম, ওকে হোটেলে যাওয়ার প্রস্তাব দিলাম।

তারপর?

তারপর সে-কী হিংস্র রূপ তার! খুব জোরে গাড়িতে চেপে এমনভাবে ড্রাইভ করতে করতে ও এই পর্যন্ত এলো, আমি যেন ওকে ফলো করতে পারি। আমি টানটান চোখে লোকটির দিকে চেয়ে থাকি। প্রশ্ন করি, এখন আপনি ওর কাছে কী চান?

আমার এই প্রশ্নে লোকটি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওপরে উঠতে থাকে— কিচ্ছু না। আমি এখন কেবল ওই চূড়োয় উঠে চাঁদটাকে ধরতে চাই।

পুরুষটি আমার মধ্যে এক ধরনের ছাপ ফেলে যায়। ভেতরের ছায়া বিমর্ষতা কাটাতে জলে ঝাঁপ দিই। এইখানে মৎস হতে কোনো বাধা নেই। সাঁতারের মতোন রোমাঞ্চকর মজা পৃথিবীর আর কিছুতে নেই। উথাল পাথাল মিহি ঠাণ্ডা জলের স্রোত আমার সব মিহি পোশাক ছিঁড়ে খুঁড়ে ভান ভণিতাহীন যথেচ্ছাচার প্রবেশ করছে। দু'হাত দিয়ে পাখির মতোন উড়ে উড়ে জলকে নিজের আয়ত্তে রেখে ভাসো... ভাসো... জলে সাঁতার কাটা আর আকাশে ওড়া হয়তো একই কথা। আমরা জলকে আয়ত্ত করেছি বলে ডুবছি না, এরকম আকাশকেও নিশ্চয়ই একদিন... হায়! হায়! এ-কী দেখছি আমি, কর্ণফুলির ওপর আসমান দিয়ে বালিহাঁসের মতোন এক ঝাঁক মানুষ উড়ে যাচ্ছে!

নাহ্! আর ভাবব না। ভেজা কাপড় পড়ে ওপরে উঠে চাঁদের আলোয় নিজেকে শুকাতে শুকাতে ভাবি, তার চাইতে জাগতিক কক্ষে ফিরে যাই।

আরে! এ-কী! সুশোভনা আবার আমার পাশে এসে বসেছে। আমাকে দেখে সে সলজ্জ হাসে, তোমাকে একা রেখে ওইভাবে ছুটে যাওয়া আমার ঠিক হয় নি! জানো, কিছুদূর গিয়ে আমি নিজের মধ্যে এক অবাক অনুভূতি টের পেয়েছি, আমি যেন তোমার মধ্য থেকে বিযুক্ত হয়ে খণ্ডিত হয়ে ছুটতে শুরু করেছি। এই যে তোমার পাশে এসে বসেছি, এখন নিজেকে পূর্ণ মনে হচ্ছে। বলে সুশোভনা হাঁ করে মিনারেল জল খায়।

শীতে কাঁপতে কাঁপতে প্রশ্ন করি, তুমি সারাদিন মদ খাও কেন? অনেক তো খেলে, কী লাভ হয়? সুশোভনা একহাতে মুখ ঢেকে হাসে, তুমিও তুমিও একটু খেতে পার, শীত কেটে যাবে।

তুমি তো জানোই, আমি এসব খাই না!

সুশোভনা আবারো হাসে, এটা যে অহঙ্কার নিয়ে তুমি উচ্চারণ করলে বিষয়টি তত গুরুতর নয়। কোনো সংবেদনশীল মানুষই চব্বিশ ঘন্টা সুস্থ থেকে শুদ্ধবুদ্ধির চর্চা করতে পারে না। যদি স্বাস্থ্যের ক্ষতির দিকটিকে বিবেচনা কর, তবে তুমি চর্বিযুক্ত গরুর গোশত খাও কেন? মদ খেয়ে উন্মাদ হওয়া যায়। নিজের ভেতর থেকে বেরিয়ে অন্য এক পলকা ভারে বেরিয়ে পড়া যায় অন্য মানুষ হয়ে। তাই বলে আমি বলছি না এই পরিমাণ খাওয়া ঠিক যাতে সে মাতলামী করবে, অন্যের ওপর চড়াও হবে, কিংবা অশ্রাব্য ভাষায় কথা বলবে— আমি বলছি একটা আড্ডাকে যদি অকপট মজায় উস্কে দেয় কোনো জলীয়, অথবা কোনো মানুষকে কোনো সময় উড়ন্ত করে তোলে, তাতে অন্যের কী ক্ষতি? আমি তো যে-কোনো নেশার এডিকশনকে ঘৃণা করি। যারা দাবি করে কোনোকিছু নিজের ওপর চাপিয়ে ওরা কৃত্রিম একটা অবস্থায় গিয়ে ফূর্তি করতে চায় না তারাও উন্মাদ হয়। বিচ্ছিরি ঝগড়ার সময় ওদেরকে মাতালের চেয়েও কুৎসিত দেখায়। মানুষ যদি সারাক্ষণই সুন্দর থাকতে পারত, তবে কখনই হিংস্র হতে পারত না। নন্দিনী, তুমি লক্ষ করে দেখবে, যারা সকাল থেকে রাত্রি অব্দি সুস্থিরভাবে বাঁচতে চায়, অবদমনের ভারে তারাই হঠাৎ এমন বিশৃঙ্খলা ঘটিয়ে বসে, যাতে তাকে আর সেই মানুষ বলে চেনা যায় না। আমার সাথে তাদের পার্থক্য হলো, আমি মাঝে মধ্যে নিজের মধ্যে অন্য এক আমিকে দেখতে চাই। সেই দেখায় পরিবেশ নষ্ট হতে পারে, কিন্তু আমার আনন্দ আছে। কিন্তু যে-কোনো অবদমন পরিবেশ নষ্ট করে তো বটেই, যার অবদমন, তার মধ্যেও দাউ দাউ যন্ত্রণার আগুন বইয়ে দিতে থাকে।

আমি দেখি, চাঁদটা ক্রমশ কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে, অস্ফুটে সুশোভনার হাত চেপে বলি, তোমার যুক্তি যদি সত্য জানি, তবে পৃথিবীতে কোনো নিকৃষ্ট কাজ নেই। কেননা সেই কাজের পেছনেও দেখবে খুব জোরালোভাবে পজেটিভ যুক্তি আছে। অবশ্য আমি নিজে অ্যালকোহলকে সেই মাত্রায় ফেলছি না। এ দিয়ে তুমি তোমার সাথেই খেলছ যেহেতু, এ তোমার ব্যক্তিগত বিষয়। পৃথিবীর নিকৃষ্ট কাজগুলি অন্যের ক্ষতি করে।

এ তোমার মহানুভবতা! এইবার সুশোভনা কাঁদতে থাকে। তুমি সব সময়ই আমার প্রতি সহানুভূতিশীল থেকেছ।

রাত বাড়ছে। এবার জলের স্রোতও বাতাসের ঠোক্কা খেয়ে কথা বলতে শুরু করেছে। চাঁদ আমাদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য একেবারে পাহাড়ের ঠিক চুড়োটির মধ্যে টিপ হয়ে গেঁথে বসেছে। মনে মনে লোকটিকে খুঁজি!

নাহ্! কোন অপার ঘাসের কুহকে যে সে হারিয়ে গেছে। সুশোভনা বলে, তোমার কাছে নতুন করে কী বলব, তবুও বলি— বুঝে ওঠার বয়স থেকে আমার যে বিষয়গুলি সবার কাছে অকল্পনীয় সম্মানের সাথে গ্রহণযোগ্য হয়েছে, তার অনেকটাই ভাণে পূর্ণ। আমি দিনের পর দিন বন্ধুদের সাহায্য করেছি। আত্মীয়দের নানাভাবে তুষ্ট করেছি। ওদেরকে বিছানা দিয়ে নিজে সোফায় শুয়েছি। আমি আমার বান্ধবীর অসুখের সময় রাত রাত তার সাথে ক্লিনিকে কাটিয়েছি। আমার জীবনে জানো বাহ্বার কোনো সীমা পরিসীমা ছিল না। আমি বলব না, ওইসবই আমার ভান ছিল। কিন্তু প্রায়শ অতিষ্ঠ বোধ করতাম। নিজের কোনো জায়গা খুঁজে পেতাম না বলে, দম আটকে আসত। একদিন! জীবনের প্রথম একটা পার্টিতে সব পুরুষেরা মদ খাচ্ছিল। মেয়েরা খাচ্ছিল কোক। একটা মেয়ে আমার কানে ফিসফিস করে বলল, যদি

একজন মেয়েও খেতো, আমি খাওয়ার ভরসা পেতাম। আমার স্বামী তাহলে আমাকে এলাউ করত।

সেই প্রথম ওকে সঙ্গ দিতে খাওয়া। ও ওর স্বামীর সাথে বসেছিল। সব প্রায় অজানা পুরুষদের মধ্যে আমি একলা। আমাকে ওরা বেশ আধুনিক টাধুনিক বলল। এরমধ্যে একজন যে তার বান্ধবীর কাঁধে মাথা রেখে মদ খাচ্ছিল, সে ভাবছিল, যে মেয়ে একা পার্টিতে মদ খায়, তাকে অন্য অফার করলেও বিষয়টি সে হয়তো আধুনিকতার সাথেই নেবে। ওর বান্ধবী অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লে ও ফিসফিস করে আমাকে বলে, তোমার মতো একজন পার্টনার আমার প্রয়োজন ছিল। কাল কি আমরা কোথাও দেখা করতে পারি?

বুঝলে, কোনো তিক্ততা থেকে মদ খেতে নেই। সে-ই প্রথম বুঝলাম। ক্রোধে হতবাক হয়ে আমি আরো খেলাম, অনেক খেলাম।

আমার সেই ক্লিনিকের বান্ধবীর বাসায় বিশেষ কারণে আমাকে থাকতে হয়েছিল। সে আমার এই বিচ্যুতি মানতে পারে নি। বুঝলে, প্রচণ্ড তিক্ততা ছিল ভেতরে, বেদনাও ছিল প্রচণ্ড, সে এক মুহূর্তও আমার সেই বেদনাকে ছাড় দেয় নি, সে আমাকে এমন তীব্র কঠিন অশ্লীল ভাষায় 'কুৎসিত' বলল, সে খেয়াল করে নি, ওকে তখন কতটা নির্মম আর অসুন্দর দেখাচ্ছিল! আমি বুঝলে, ছোটবেলা থেকে জঙ্গলে মাঠে বড় হয়েছি, তবে একটা স্বশিক্ষা আমাকে প্রায়ই স্থির রাখে, কত সুন্দর পরিশীলিত ভাষায় কোনো ঘৃণিত লোককেও আঘাত করা যায়, লজ্জা দেয়া যায়, সেটা আমি জানি। ওর সেই ভাষা আমাকে আমার সনাতনী বৃত্ত থেকে বের করে নতুন জেদের আগুনে নিয়ে ফেলল। আমি আমার সেই সম্মানিত বন্ধুদের সামনে মাঝেমধ্যেই আমার চিরন্তন রূপ থেকে বেরিয়ে অসহিষ্ণুতা, যন্ত্রণা এসব প্রকাশ করতাম। ক্রমে ক্রমে আমাকে সবাই ছেড়ে চলে যেতে থাকল... এই দুদিন আগেও, মৈনাক যখন সিরিয়াসলি আমার জীবনে আসে নি এর মধ্যেও আমার দু'একজন আন্তরিক ছেলেবন্ধু আমার কল্যাণ চাইত, চাইত আমি সুস্থিরভাবে বাঁচি— কিন্তু ওদের আন্তরিকতাও আমাকে আর টানে না। সুশোভনা জলের মধ্যে বোতল ছুঁড়ে ফেলে বলল, আজ আমার খেলা শেষ। দেখা শেষ নন্দিনী, তুমি শেষে যে লাইনগুলি বললে, এটা আমার ব্যক্তিগত খেলা... তোমার এই কোমল সহানুভূতিশীল বিশ্লেষণ আজ আমাকে এই নেশার প্রতি তিক্ত করে তুলেছে। তুমি তো জানোই আমার প্রবণতা আমি যা বেশি খাই, বেশি যা চর্চা করি, তার প্রতি ক্রমশ আগ্রহ হারাতে থাকি। আমি কিচ্ছুতে চিরন্তন আসক্ত হই না।

আমি আর মদ খাব না!

আমরা দু'জন সহসা অভিভূত হয়ে যাই। সেই পাহাড়ের চূড়োয় দাঁড়ানো লোকটি যেন স্থির কোনো ভাস্কর্য। চন্দ্র তার ললাট বরাবর। চারপাশের আলোছায়া ওকে অলৌকিক করে তুলেছে। সুশোভনা দাঁড়ায়, আমি যাই। বেচারা! আমিই ওকে চাঁদ ধরে দিতে বলেছিলাম। বলেছিলাম, তুমি যদি তা পার, তবেই আমি মদ ছেড়ে দেব। বুঝলে, আমার লিভারটার অবস্থা খারাপ। ও সারাক্ষণ এ নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভোগে।

আমি স্তম্ভিত— ও কে?

এইবার সুশোভনা পাহাড়ের ঢালু বেয়ে উঠছে, যেন মহাপৃথিবীর ওপার থেকে ওর কথা ভেসে আসে— আমরা দু'মাস হয় বিয়ে করেছি। ও মৈনাক!

দম ছেড়ে দেয়া কণ্ঠে প্রশ্ন করি, তবে যে ও বলল...?

সুশোভনার মধুর হাসি জলের মধ্যে তরঙ্গিত হতে থাকে— এসবই জ্যোৎস্না রাতের খেলা! কত গল্প যে ও বানাতে পারে!

"আমার অজ্ঞাতসারে আমার প্রাণ আমাকে স্থাপন করিল আমার মহোদয় জাতির রথরাজির (মধ্যে)।"

[সোলেমান, পরমগীত]

মিস্টার এম.-এর মাথা ক্লান্তির ভারে বেতের চেয়ারে নুয়ে পড়ে।

আমরা কেউ কোনো কথা বলছি না।

দীর্ঘক্ষণ আমাকে চুপ দেখে তিনি শুরু করেন, দেখুন, আমি যুক্তির মানুষ। অনুভবের মানুষ হলে হয়তো বুঝতাম, কী করে একটি লাঞ্ছনাকে, বেদনাকে আরেকজন মানুষ 'গল্প' হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচাতে পারে।

আপনি অনুভবেরও মানুষ, যুক্তির শক্ত লৌহবর্মের আড়ালে অনুভবকে ইচ্ছে করে হত্যা করেন...।

আমি কিন্তু সহসা কথা বলি না নন্দিনী, আপনি আমার কথার শুরুতেই কথা বলতে শুরু করেছেন—।

আমরা কি সেমিনারে এসেছি মিস্টার এম.? একজনের বলা শেষ হলে আরেকজন বলব ? আপনার যে-কোনো কথার সাথে দ্বিমত কিংবা একমত পোষণ করলে আমি তো সাথে সাথেই প্রতিক্রিয়া জানাব এবং সেটাই স্বতঃস্ফূর্ত আর স্বাভাবিক।

আমি কিন্তু আপনার কথা নিঃশব্দে শুনে গেছি।

সেটা আপনার স্বভাব! কিন্তু তাতে আমার কী লাভ হয়েছে ? আমি এখন পর্যন্ত জানতেই পারি নি আমার এতসব কথা জলে ডুবল না বাতাসে ভেসে গেল! আমি পাথর না কোনো মানুষের সামনে আমার জীবনের এত গল্প করলাম!

এক কাপ চা হবে ?

ছটফট করতে করতে চা বানিয়ে নিয়ে এসে দেখি মিস্টার এম. ভাবলেশহীন সিগ্রেট ধরিয়েছেন। বন্ধের দিন। সকালে আজও তাঁকে আমি দরজায় দেখে যতটা অভিভূত হয়েছিলাম— ততটাই বেগে ক্রমশ নিভে আসতে থাকি।

সুশোভনা মৈনাকের সাথে চলে গেছে, না ?

হ্যাঁ।

অতীন এখন কোথায় ? সিগ্রেটের ধোঁয়ায় ঘরে ছায়া তৈরি হয়, মিস্টার এম.-এর এই প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত না থাকায় হতচকিত হয়ে পড়ি। এরপর ধীরে ধীরে জানালার ধারে দাঁড়াই, এই শহরে আজকাল এত কৃষ্ণচূড়া! এত বৃষ্টি! আমি অস্ফুট কণ্ঠে বলি, দেশের বাইরে। সেই সন্ধ্যায় সে যখন আমার ক্ষত দেখতে চাইল, তারপর থেকেই কেমন নিভে আসতে থাকল সে। বুঝলেন মিস্টার এম., আমি চাইতাম ওই ফনফনা যুবকটিকে, পাগলের

মতো চাইতাম, ও নিজেকে বুঝতে দিত না, শেষে আমারই হিংস্র আক্রমণ, প্রশ্ন, অভিযোগের ভারে ক্লান্ত হতে হতে ও অসুস্থ হয়ে পড়তে থাকল— একমাত্র ও-ই যেহেতু আমার সব অস্থিরতা, অত্যাচার সহ্য করত, আমি আমার সহজাত প্রবণতার বাইরে গিয়ে ওর মিনিট মিনিট বিচ্যুতি খুঁজে কী অসহ্য অত্যাচার যে করতাম! কেন যে আমি তা করতাম, আমি কিছুতেই ওকে ক্ষমা করতে পারতাম না, কেন সে সময়ের চেয়ে সব সময় পেছনে হাঁটে ? আসলে তা-ও না...। নিঃশব্দে ও দেশের বাইরে যাওয়ার কাগজ তৈরি করছিল। অনেকদিন ওর সাথে দেখা নেই, পত্রিকা ছেড়ে দিয়েছে... কেন ও আমার সাথে অমন ব্যবহার করছে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারতাম না। আপনাকে বোঝাতে পারব না কী আধপাগল জীবন গেছে তখন আমার... বৃষ্টির ঝাপটা হাতে এসে লাগছে। ভিজে চুপসে যাচ্ছে নারকেল গাছের ডানাগুলি...।

আমি আত্মনিমগ্ন হয়ে প্রসঙ্গ পাল্টাই, জানেন, জয়নুলের সংগ্রহশালায় প্রতিবছর পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপিত হয়। সেই ছেলেবেলায় ওই উৎসবটার প্রতি কী যে দুর্মর আকর্ষণ ছিল! খুব... খু..উব ভোরে উঠে গাছপালা ঘেরা ছিমছাম পথটা ধরে এগোতে এগোতে শুনতাম... কোরাস... এসো হে বৈশাখ... এই একটি কোরাস ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো কোরাস আমি সহ্য করতে পারি না। যেন স্বর্গ থেকে, তুলোর মতো, মেঘের মতো ভেসে আসছে... এসো হে বৈশাখ... মিস্টার এম. সবচাইতে আশ্চর্য বিষয় কি জানেন, আমি অনেক চেষ্টা করে অনেক আগে ঘুম থেকে উঠেও সেই গানটিকে কোনোদিন সামনে বসে শুনতে পারি নি। আমার কেবলই দেরি হয়ে যেত... আর দূর থেকে গানটা শুনতে হতো।

তাহলে অতীনের ট্র্যাজেডিকে মানছেন না কেন নন্দিনী ? ওর নিয়তিও হয়তো তা-ই ছিল, ওর দেরি হয়ে যেত!

আমার কোনো একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা তো আমার পুরো জীবন নয় মিস্টার এম., সময়ের সাথে দু'জন মানুষ যদি এক সাথে না হাঁটে শেষ মাথায় গিয়ে দেখা গেল একজন যৌবনে পড়ে আছে আরেকজন বৃদ্ধ হয়ে গেছে... আজকে আসলে আমার সাংঘাতিক কষ্ট হচ্ছে— মিস্টার এম., আমি বোরাকের ঘোড়াকে কেন্দ্র করে যেন জঘন্য কুৎসিত একটা চক্রের মধ্যে পড়ে গেছি। মনে হচ্ছে নিজেকে ফাঁস লাগিয়ে আছড়ে হত্যা করি।

মিস্টার এম.-এর নিঃশব্দ ধোঁয়ার চক্র ঘরময়।

মিস্টার এম., আমার কেবলই মনে হচ্ছে আমাকে চারপাশ থেকে ঘোর তমসাবৃত অভিশাপ গ্রাস করছে। আমার ললাটে চন্দ্রের মুকুট ছিল, চরণতলে হীরকবালি, আমার সারা প্রাণে মহাসাগরের গভীর তলাকার বোধ... তারপরও আমি কোন সে অজানা অমোঘ অভিশাপে বৃত্তবন্দি হচ্ছি! অতীন... হ্যাঁ, সেই সমুদ্র দেখে তার লোভে হীরক মাড়িয়ে, মাথার মুকুট খুলে দিকভ্রান্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে চরণে রক্ত তুলে দেখলাম! হায়! সমুদ্র এক অসহায় বৃক্ষে পরিণত হয়ে স্তব্ধ নির্বাক ভীত চোখে দেখছে এক অভিশপ্ত নারীর ভূলুণ্ঠিতা রূপ! মিস্টার এম., এরপরেও আমার ভেতর থেকে সমুদ্রের স্বপ্ন যায় না। মিস্টার এম., এ-কী সর্বনাশ আমি করেছি! কেন আমি নিজের মধ্যে রাখলাম না... আমার শৈশবের সেই অমূল্য সম্পদকে, যা আমাকে এক অলৌকিক ভাস্কর দান করেছিল! কেন আমি এটা জনে জনে বিলিয়ে বেড়ালাম! জানেন... জানেন... তুমুল বৃষ্টি হচ্ছিল সমুদ্রে। চারদিকে পাগল করা

ঠাণ্ডা ধোঁয়ার ঝাপটা। বৃষ্টি আমাকে সমুদ্রে ঠেলে দেয় তো চতুর্গুণ বেগে সমুদ্র ঠেলে দেয় চরাচরের বৃষ্টির দিকে। এই উন্মাতাল খেলার মধ্য থেকেই যেন হুহু চরে জন্ম নেয় এক ক্ষুদে শ্বেত ঝিনুক। আমি বুকের ভাঁজে করে সেই ঝিনুক অন্তুর জন্য নিয়ে শহরে এসে দেখি কখন যে সেটা হারিয়ে ফেলেছি! বলতে বলতে আমি মিস্টার এম.-এর পায়ের কাছে ভেঙেচুরে উত্তেজিত হয়ে বসি... অতীন যেদিন চলে যায়, আমার মুখের সামনে ছুঁড়ে মেরেছিল সেই গ্রন্থ, যে গ্রন্থ আমার সেই দুঃসহ ঘোড়ার কাহিনী নিয়ে লেখা! কী বিস্ময়, কী বেদনা, কী ক্রুদ্ধতা অতীনের চোখে! এত লোভ তোমার নন্দিনী ? এ বাজারে বিকোবার বিষয় ? এ-কী করলে তুমি ? কী করলে ? আমি ঝিনুক হারিয়েই জেনেছিলাম অন্তুকে হারাতে হবে। নিঃশব্দে দেখলাম অতীন চলে যাচ্ছে... আমার কণ্ঠ বোবা হয়ে গেল, শরীরের মধ্যে কেউ যেন বসিয়ে দিল আস্ত পাথর... আমি দূরবর্তী আঁধারে ওকে মিলিয়ে যেতে দেখলাম— কিচ্ছু বলতে পারলাম না!

মোবাইলে ফোন বেজে ওঠে। সারাঘরের মুহ্যমান আলো আঁধারীর মধ্যে আমার শরীরটা যে কোথায়, নিজেই খুঁজে পাই না। সেই তরঙ্গ ছায়ার মধ্যে মিস্টার এম. এর উদ্বিগ্ন কণ্ঠ— আসছি! আমি এক্ষুণি আসছি...। নন্দিনী, একটা সাংঘাতিক দুঃসংবাদ, আমি এক্ষণি যাচ্ছি।

ত্রিকাল ধেয়ে বৃষ্টি নামছে। দরজা খুলে যায়... সিঁড়ি খুলে যায়। আমি নিজেকে টেনে বারান্দার জল বাতাসে যাই। বৃষ্টির মধ্যে কান্না আর হিংস্রতার তাণ্ডব। হে পৃথিবীর সমস্ত পাথর আর জল কণিকা, হে দেবতাগণ! আজ আপনাদেরকে আমি আমার জীবনের সবচাইতে কঠিন নিঃশব্দ সত্যটা বলব... আমি যেন প্রকাণ্ড এক মাঠের সামনে এই জীবনের প্রথম একাকী দাঁড়াই, আমার কণ্ঠ কান্নায় বুঁজে আসতে থাকলে বলি, জীবনে আমি ভালোবেসেছি একজনকেই, সেই শৈশবে... এবং যৌবনকাল অব্দি... এবং মৃত্যু অব্দি, সেই ভাস্করকে যে আমাকে অলৌকিক এক ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে স্বর্গলোকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল।

ক্রুশকাঠে কন্যা

গত সন্ধ্যার মর্মবিদারক তাজা ক্রন্দন, অসহনীয় শোক ক্রমশ থিতিয়ে এসেছে। মসজিদে খবর দেয়া হয়েছে, মাগরিবের নামাজের সময় জানাজা হবে। মৃতের লাশ বেশিক্ষণ বাইরে রাখলে তাঁর আত্মার কষ্ট হয়। ফলে চারপাশে কোরআন শরীফ পাঠ, তসবি গোনা চলতে থাকলেও সবার ভেতর বাবার জন্য এক চাপা অস্থিরতা কাজ করছিল। গলির সামনে কোনো রিকশা বা স্কুটার এসে থামলেই পোলাপানদের সাথে বড়রাও ছুটে যাচ্ছে, এই বুঝি তিনি এলেন।

শীতের রোদ্দুরগুলোও কেমন মরাটে। দিন পেরোতে না পেরোতেই ঝিমিয়ে পড়ে। আমি দেয়ালে হেলান দিয়ে ঠায় বসে দেখছিলাম বারান্দার ম্রিয়মান আলো কেমন রঙধনুর মতো মিলিয়ে যাচ্ছে। আমার হাতেও ছিল তসবিহ্, আমিও প্রতি দানার মধ্যে একবার করে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু বারবারই আমার ভুল হচ্ছিল, আশ্চর্য সব ভাবনার বিভ্রম এসে আমার জিভে জট পাকিয়ে দিচ্ছিল। আমার বাকি চারবোন কোরআন খতম করার ফাঁকে, তসবিহ্ গোনার মধ্যে থেকে থেকে ফুঁপিয়ে উঠছে। ছোট বোনটা, আফসানা, গত সন্ধ্যা থেকেই মাথায়-গায়ে ওড়না পেঁচিয়ে পোটলার মতন হয়ে আছে, থেকে থেকে ছুটে যাচ্ছে মার কাছে, আর মাথার কাফনের গিঁট ছুটিয়ে তাঁর কালচে হয়ে ওঠা মুখ দেখতে দেখতে শোকস্তব্ধ বাড়িটার মধ্যে অকস্মাৎ এমন চিৎকার দিয়ে উঠছে; সবার মধ্যে সেই আর্তনাদ সঞ্চারিত হয়ে চারপাশে কেমন ঢেউয়ের মতন পাতলা কান্নার গুঞ্জরণ উঠে ফের সেটা দোয়া দরুদের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে।

সেই অর্থে আমাদের মাথার ওপর কোনো অভিভাবক নেই। মসজিদে ইমাম সাহেব খতম পড়াচ্ছেন, এই খরচ বাদ দিলেও গত সন্ধ্যা থেকেই লাশ গোসল, কাফনের কাপড়, গোর খনন ইত্যাকার নানা খরচের ধকল আমাকেই সামলাতে হচ্ছে। বড় বোন সায়রার স্বামী জরুরি কাজে আটকে গিয়েছিল বলে কিছুক্ষণ আগে এসে পৌঁছেছে। মেঝবোন দিলারার স্বামী যেখানে যতটুকু পারছে টাকা দিয়ে জোড়া লাগাচ্ছে। তবে সেটা এত যৎকিঞ্চিৎ, আমার তাতে তেমন কোনো উপকার হয় না। আমার সঞ্চয়ে অল্প কিছু ছিল, শায়লার সঞ্চয়েও ভাঙন ধরেছে, কিন্তু তাতে কোন কূল রক্ষা হচ্ছিল না। তাছাড়া মাসের শেষে আমার মা কোনোদিন মরে যেতে পারেন, বিন্দুমাত্র এই প্রস্তুতি ছিল না বলে আমাকে প্রচুর ধার দেনা করতে হচ্ছিল। আমার বড়বোন দু'জন গতকাল পালাক্রমে অজ্ঞান হয়েছে, আজ ওদের শরীরের অবস্থা ভালো না, বিভিন্ন বাসা থেকে খাবার এলেও ওরা তা থেকে কিচ্ছু গ্রহণ করতে পারছিল না বলে আমি আর্থিক জটিলতা থেকে ওদেরকে দূরে রাখি।

কারো মৃত্যু হলে প্রথমেই তাকে কেন্দ্র করে কিছু উল্লেখযোগ্য স্মৃতি ঘাই দিয়ে মানুষকে আবিষ্ট করে রাখে, নয় আরো তুমুল কান্নায় ভাসিয়ে নেয়। আশ্চর্য, মরা রোদ্দুর দেখতে দেখতে আমার কিচ্ছু মনে পড়ছিল না, কিচ্ছু না, শুধু মেঘ, কুয়াশা, শীত ছায়া আর দিন বদলের আশ্চর্য সব রঙের মধ্যে আমার চোখে জ্বলজ্বল করছিল মা'র নাকফুলটি যা তাঁর মুখের সব বেদনা ঢেকে রাখত।

সেই নাকফুলের সূত্র ধরে ধরেই এগিয়ে আসে এক শ্যাওলা ধরা গাছপালায় আকীর্ণ বাড়ি। মফস্বলে আমরা সেখানে থাকতাম। মা-কে কেন্দ্র করে আজ সেই বাড়িটির এক তরল স্মৃতি আমাকে হঠাৎ স্থবির করে দেয়।

জড়াজড়ি করে আমরা পাঁচবোন এক বিছানায় দুপুর-ঘুম দিচ্ছিলাম। কী এক শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলতেই টের পাই অকারণে বুক কাঁপছে, কতইবা বয়স তখন, দশ কী এগারো। আমি ওদের ঘামের বাঁধন থেকে সন্তর্পণে নিজেকে খুলে নিয়ে মেঝেতে নেমে আসি। স্তব্ধ দুপুর ভেদ করে কী এক ক্ষীণ, অস্পষ্টতম শব্দ আমার ইন্দ্রিয়ের মধ্যে পাতলা এক ভয় ঢুকিয়ে দেয়। এখনো মনে করতে পারি না, কেন কিচ্ছু না দেখে, কিচ্ছু না জেনে এক ঘুমভাঙা দুপুরে আমি এমন ভয় পেয়েছিলাম।

মা ?

ডাকতে গিয়ে কণ্ঠে স্বর ধ্বনিত হচ্ছিল না। সূর্য কি মেঘের খপ্পরে পড়ে গেল ? চারপাশ ছায়া হয়ে এলে আমাদের লতানো গাছঘেরা পাঁশুটে বাড়িটার মধ্যে আশ্চর্য এক শীত নেমে আসে। আমি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকা আমার বোনদের দিকে তাকিয়ে চৌকাঠে পা রাখি, মা ?

গেটের মাঝখানে ঘাস। তার মাঝে পেট ফুঁড়ে উঠেছে মাটি। দূরবর্তী রান্নাঘরে মাটির চুলোর আধপোড়া লাকড়ি মাথা চাগিয়ে পাতিলকে হেলান দিয়ে ফেলেছে। নিঃশ্বাস টেনে বিপদের গন্ধ পাই। ছুটে রান্নাঘরে গিয়ে দেখি আধসেদ্ধ তরকারি শুকিয়ে উঠেছে, পাশে খাড়া দা, মা সচরাচর যেটাকে কাত করে ঘর থেকে বেরোন। উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ফের ভয়ে ভয়ে ডাকি, মা ?

আকাশের দিকে তাকাই। পাকা আতাফল ঠুকরে খাচ্ছে কোনো এক পাখি। আমি ওটাকে তাড়াতাড়ি পাকার জন্য ন্যাকড়া দিয়ে মুড়িয়ে রেখেছিলাম। পাখিটার ঠোঁটের ধারে কাপড় ছিঁড়ে গেছে। মুহূর্তে সব ভুলে হেইস করতে যাব— অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ পাই।

আমার পায়ের তলায় রক্ত জমাট বেঁধে যায়। আমি দেখি, পাশের ঘরটায় ছিটকিনি বন্ধ। নিজেকে টেনে জানালার কাছে নিয়ে দেখি, অস্পষ্ট আলো-ছায়ায় পাক খাচ্ছে দু'জন নরনারী। আমার প্রাণের মধ্যে কনকনে ভয় ঢুকে যায়, আমি বাবা-মা'র রাত্রিকালীন দৃশ্য দেখেছি, অনেকটা ওরকম কাণ্ড, পাল্লা টেনে আড়ষ্ট চোখে ফের তাকাতে দেখি, বাবা। আলোতে এখন তাঁকে অনেকটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এবং হায় আল্লা, তিনি আমার মা'র গলা চেপে ধরেছেন!

মা! মা! ভূমণ্ডল ফাটিয়ে চিৎকার করি। মুহূর্তে বাবার ছিটকে যাওয়া দেহ থেকে মা'র নিশ্চল অস্তিত্ব মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে।

আমি তো সেদিনই মা'র মৃত্যু দেখেছি। জেনেছি, এই মুহূর্ত থেকে আমি মাতৃহীন হলাম। এরপর হাসপাতাল, মা'র পুনর্জন্ম, ফের বাবার সংসারের গারদে তাঁর নিজেকে সেঁধিয়ে দেয়ার পরে ক্রমশ ভুলে গিয়েছিলাম সেই মৃত্যুদৃশ্য। মা যদি ভুলতে পারেন, আমার ভুলতে দোষ কী ? কিন্তু সেইদিন থেকে আমাকে আজ অব্দি চেপে ধরেছে যে হিম নিঃসঙ্গতা, আমি তা থেকে আজ অব্দি বেরোতে পারি নি। সেই প্রগাঢ় নৈঃশব্দ্যের মাঝখানে মাথার ওপর মা ছিলেন আমার একমাত্র ছায়া। আজ সেই ছায়ার ওপর রাশি রাশি গন্ধধোঁয়া, আমার দৃষ্টি অস্পষ্ট হয়ে আসে।

খাটিয়ায় লাশ রওয়ানা দিয়েছে। আমার চাচিমা সেই মুহূর্তে আর্তনাদ করে উঠলেন, হতভাগী মা, পুতের ঘাড়ে চইড়া কবরে যাওনের ভাগ্য হইল না। মা'র এই দুর্ভাগ্য মুহূর্তে

চতুর্পাশকে আন্দোলিত করে। সবাই নতুন করে ফুঁপিয়ে ওঠে। আমার মেঝো বোন দিলারা বুক থাপড়ে বলতে থাকে অন্য কথা, মা, তুমি কী পাপ করছিলা, মরণের সময়ও স্বামীর দেখা পাইলা না ?

এবার বিষয়টির মূল জায়গায় সবার চোখ পড়ায় সবাই ততধিক বেদনায় হাহাকার করে ওঠে। তাই তো, মাগরিব চলে আসছে, আর অপেক্ষা করা যায় না, যথারীতি বাবার অবর্তমানেই মা-কে জানাজার জন্য মসজিদে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমার ছোটবোন শায়লা, যে গভীরভাবে নিমগ্ন ছিল তসবীহ্ গোনায়, আমাকে আঁকড়ে ধরে চিৎকার করে, মা যে চলল বুবু, তুমি শেষ দেখা দেখলা না ?

হু হু কান্নায় ভেঙে পড়ি আমিও, কী দেখতে কস আমারে ? মার মরা মুখ ? কী লাভ সেইটা দেইখা ?

আমার হতভাগ্য মায়ের পাঁচ সন্তানের কেউই জানাজায় যেতে পারল না। যখন মসজিদ থেকে লাশ বেরিয়েছে, শীতের জীর্ণ সন্ধ্যায় আমরা নিঃশব্দে শবযাত্রার অনেক পেছন পেছন হাঁটতে থাকি। বাবার বিরুদ্ধে সবার মধ্যে নতুন করে ধিক্কার উঠছে। আমি যার প্রতি ধুয়ে মুছে প্রত্যাশা হারিয়ে ফেলি, তার প্রতি আমার মধ্যে নতুন কোনো অনুভব জন্ম নেয় না। ফলে বাবার আসা না আসা নিয়ে গোড়া থেকেই আমার মধ্যে কোনো রকম তাপ-উত্তাপ ছিল না। মায়ের পেছন পেছন হাঁটছে ধীর মন্থর শাদা পোশাক পরা মানুষগুলো। তারও অনেক পেছনে আমি হাঁটতে হাঁটতে দেখি প্রগাঢ় কুয়াশার মধ্যে ছায়া হয়ে গেছে সূর্য। বাতাসের ছোবলে ছোবলে এগিয়ে আসছে শীত তিমিরের রাত্তির। আর এক ভয়াল অচেনা পথ ধরে অলৌকিক কোনো গোপন গুহার দিকে হেঁটে চলেছেন আমার চির বঞ্চিত, অসহায়, যন্ত্রণাকাতর মা। মৃত্যু যাঁকে বাঁচার নিষ্কৃতি দিয়েছে।

সিঁড়ি দিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে নামি। ঘরের দেয়ালঘড়িটা আধ ঘণ্টা স্লো ছিল। নিজেকে গুছিয়ে হাত ঘড়িটা পরার সময় বিষয়টা লক্ষ করি। আর তখনি মাথাটা প্রায় ঝিমঝিম করে ওঠে।

নিজেকে নিয়ে উড়তে উড়তে এবং জীবনের প্রথম রিকশা ভাড়া না দিয়ে আমি সশব্দে সিটে চেপে বসি। হাত পায়ে কেমন শীত শীত লাগছে। এমনিতেই প্রচণ্ড টেনশানের রোগে ভুগি আমি। এরমধ্যে রিকশা যে-ই রওয়ানা দিয়েছে, অমনি যেন মহাকাশের ওপার থেকে ইস্রাফিলের শিঙ্গা-ধ্বনি ভেসে এলো। সামনে বিকট এম্বুলেন্স গলির মধ্যে ঢুকতে না পেরে কলজে কামড়েধরা শব্দে ফুঁসে যাচ্ছে। এই একটি যন্ত্রদানবের শব্দ শুনলে আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সারসার বরফকুচি ঢুকে যায়। কিন্তু এই মুহূর্তে সেই ভাবালুতা নয়, আমাকে অস্থির করে তোলে চিপা গলির মুখ আটকে থাকা এম্বুলেন্সের মূর্তিমান উপস্থিতি। এত সংকীর্ণ অন্ধগলি, দু'টি রিকশা পাশাপাশি গেলেই ঘষা লেগে যায়। কোন সাহসে এরকম একটা গলির মুখে এসে গুঁতোগুতি করছে এম্বুলেন্সটি, বোঝা মুশকিল। নাহ্! কাজটা আজকে ফস্কে গেল। এই এনজিওর ডিরেক্টর শুনেছি ভীষণ সময় সচেতন মানুষ। আমি নিজেও সচেতন, তবে এই কাজটা নিয়ে রাত থেকেই স্নায়বিক চাপটা একটু বেশি ছিল। রাতভর ছটফট করতে করতে সকালে তন্দ্রাটা না লাগলে আমি আরো আগে ঘর থেকে বেরোতে পারতাম। এবং সেই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কুয়াশার মতন মিশে যেত এই স্লো আধ ঘণ্টা।

রিকশার একটা ঠ্যাং রাস্তার পাশের স্তূপ-আবর্জনার মধ্যে পড়ে থাকা পচা আনারসের মধ্যে গেঁথে আছে। দুঃসহ গন্ধে এখানে টেকাই দায়, এর মধ্যে হাতের ডাইনের সরু লাঠির মতো গলিটা থেকে কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। ঝিরিঝিরি মেঘ-স্তব্ধতায় মূক ক্ষীণ আকাশ।

রিকশা টানতে গিয়ে তোতলা পথে ঘাম জমে চালকের দেহে। টেনে কী হবে। গলির মুখ তো ছিপি দিয়ে বন্ধ হয়ে আছে। আমি নেমে যেতাম কিন্তু দেয়াল ঘেঁসে মানুষ হেঁটে যাওয়ার জায়গাটাও যে নেই।

এইসব মুহূর্তগুলোতেই বড় ডানার কথা মনে হয়। মনে হয়, চোখ বুজে দু'পা দিয়ে মাটিকে ধাক্কা দিয়ে শূন্যে উঠে পড়ি। এইবোধ আমার মধ্যে এত প্রবল, দুঃসহ জ্যামে পড়ে প্রায়ই প্রহর প্রহর স্বপ্নচারী হয়ে থাকি।

একই পাড়া। কার অমন অসুখ হলো? এতক্ষণে বিষয়টির আসল জায়গায় চোখ পড়ে। নাগরিক জীবনে আবার পাড়া! পাশের ফ্ল্যাটের মানুষের সাথে মুখচেনা সম্পর্ক। দূরে কোথাও দেখা হলেই কেবল, কেমন আছেন— প্রশ্ন করা হয়। এ তো সেই তুলনায় দিব্যি দূরের বাড়ি। আমি দেখি, সেই ডালের মতো চিকন গলিটার মধ্যে ভিড়। স্ট্রেচারে করে কিছু লোক একজন মহিলাকে এম্বুলেন্সের কাছে আনার চেষ্টা করছে। গুঞ্জনরত আত্মীয়দের ফোঁপানো বিলাপ ছাপিয়ে উঠেছে রোগিনীর আর্তচিৎকার।

কী হয়েছে? আমার মধ্যে এই প্রশ্ন দানা বেঁধেও মুহূর্তে জল ছেড়ে দেয়। আমি ছটফট করতে করতে ঘড়ি দেখি। এতক্ষণে যথাস্থানে পৌঁছে যাওয়ার কথা ছিল। আহারে, কখন ছাড়বে এই জট? আমার রিকশা হু হু পা ফেলবে ঘণ্টাপথে।

আর গিয়ে কী হবে? এই ভাবনা মুহূর্তে কেমন এক অবসাদ এনে দেয়।

চাকরি তো একটা করছিই, এত অস্থির হওয়ার কী আছে? সারারাতের ক্লান্তি এবার ভার হয়ে সারাশরীর ছেকে ধরে। চারপাশে চাপা গুঞ্জন শোনা যায়, গ্যাসের চুলোয় আগুন লেগে...।

আমি গ্রীবা বাড়িয়ে এবার স্ট্রেচারের দিকে তাকাই। আমার সমস্ত মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরে ওঠে।

চারপাশে এক তীব্র পোড়া ঝাঁঝালো গন্ধ সঞ্চারিত হচ্ছে। এর মধ্যে চামড়া উঠে প্রায় থেঁতলে পড়ে থাকা রমণী স্ট্রেচারের মধ্যে থেকে বেহুঁশের মতো চিৎকার করে যাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখার পর প্রায় আচ্ছন্নের মতো আমি সমুখে দণ্ডায়মান গাড়িটির দিকে তাকাই।

চারপাশে, এবং পেছনে গাড়ি আর রিকশার দীর্ঘ জটলা জমেছে। এর মধ্যে কান ঝালাপালা করে দিচ্ছে মানুষের বিরক্তি মেশানো হল্লা আর হই-চই। এইসব বাস্তবতার ভেতরও আমার ভেতরে যন্ত্রণাকর খচখচ ওঠে— চাকরিটা হয়ে যেতে পারত, হোক সকাল সন্ধ্যা টানা পরিশ্রম, কিন্তু যে কাজটা আজ আমি করছি, তার চেয়ে তো বেতন বেশি।

আকাশটা কেমন গর্জে উঠল।

বৃষ্টি হবে নাকি? আমি ওপর দিকে তাকাই। গিজগিজ ইলেট্রিকের তার আর ঘিঞ্জি দালানের মাথায় বদ্ধ হয়ে আছে ওপর-শূন্যতা।

রোগিনীকে সবাই মিলে গাড়িতে তুলল। পেছনে যানবাহনের ভিড়ে এখন এম্বুলেন্সটি নড়তে পারছে না। কিছু ছেলে চিল্লাচিল্লি করে পেছনের ভিড় ঠেকানোর চেষ্টা করছে, এসব করতে করতে এত সময় পার হয়ে যায়— আমার চাকরির শেষ আশাটিও ফুরিয়ে আসে।

বড় রাস্তায় আসার পর দুঃসহ জ্যাম। এবার বিপরীত এক অনুভব এসে আমার ভেতর কেমন এক মজা ঢুকিয়ে দেয়। চাকরিটা নিয়ে এখন আর টেনশান করে লাভ নেই, আজ ওখানে যাওয়ার ক্ষেত্রে আর কী কী প্রতিবন্ধকতা আমার পথ আগলে দাঁড়াতে পারে এখন এটাই দেখার বিষয়। সোনারগাঁও হোটেলের সামনের কী সুন্দর ফোয়ারা! যেন হাঁসের রূপালি সব ডিম বসিয়ে দেয়া হয়েছে। চারদিক থেকে পেটমোটা সব পথ এক বিন্দুতে মিশেছে কিন্তু বিন্দু পরিমাণ স্থান নেই। এত মানুষ আর মানুষ বহনকারী যন্ত্রসব আর তাদের কানে ঝাঁ ঝাঁ লাগানোর মতো শব্দসব, রীতিমতো অসহ্য লাগে। বৃষ্টির গর্জন রাক্ষুসে থাবায় পেটে ঢুকিয়ে কটমট করে উঠেছে সূর্য। বিচ্ছিরি ঘামে আমার শরীর ভিজে ওঠে। হাত পা কাটা ল্যাংড়ার মতো গা ঘষটে ঘষটে রিকশাটা জ্যামের পেছন পেছন এগোচ্ছে। সামনে ওয়ানওয়ে রোড, আর কী সব পাতালপুরীর পথ হওয়ার খোঁড়াখুঁড়ি চলছে। রিকশা বাঁয়ে মোড় নিয়ে যখন জাহাজের ফার্নিচারের দোকানগুলোর সামনে, তখন আমার হঠাৎ মনে হয়, নাহ্, রিকশা ঘুরিয়ে নিই। আজ গিয়ে কিছু লাভ হবে না।

সামনের গিজগিজে মাথার ভেতর কিছু দূরে রিকশায় হঠাৎ সায়রাবুকে দেখে রক্তস্রোত প্রবল হয়। মা'র মৃত্যুর পর আজই প্রথম দেখা। মা'র চল্লিশা শেষ হলে আমরা মিরপুর ছেড়ে শহরের মাঝখানে শায়লার গার্মেন্টিসের কাছাকাছি এক বাসায় চলে এসেছি। এখানে এসে একটাই লাভ হয়েছে, মা'র স্মৃতির ছায়া থেকে অনেকটা দূরে আসতে পেরেছি। এ বাসায় সায়রাবু আসে নি। জীবনের এক বিপন্ন সময়ে মা'র দূর সম্পর্কের বোন, আমার এক খালা, যে আমাকে এক সময় আশ্রয় দিয়েছিল, যার ওখানে থেকে আমি বি.এ পরীক্ষাটা দিয়েছিলাম, বিধবা সেই খালা ছেলেদের কাছে আশ্রয় না পেয়ে আমাদের এখানে এসে উঠেছেন। আমরাও মা'র মতন একজন অভিভাবক পেয়ে অনেকটা হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি। এত বিবর্ণ আর পাণ্ডুর হয়ে গেছে সায়রাবুর মুখ, চেনা যায় না। আমি হাত নেড়ে চিৎকার করতে করতেই বিপরীত রাস্তার ভিড়ে রিকশাটি হারিয়ে যায়। আর আমার চারপাশ মুহূর্তে আঁধার হয়ে আসে। কী যে হয়, এই ক্ষুদে কন্টকগুলি, দেখা না হলেই কেমন ঘুমিয়ে থাকে, দেখা হলেই খচখচ, সেই শ্যাওলা পড়া বাড়িতে লতায় পাতায় জড়িয়ে থাকার দৃশ্য এগিয়ে আসে। নিজেকে সেইসব মুহূর্তে মনে হয় বৃন্তচ্যুত, যেন এই মাত্র কষ ঝরেছে।

যদিও জীবনের প্রথম যে দ্রব্যে আকর্ষণ জন্মেছিল, ত্যাগ করতে হয়েছিল এই সায়রার জন্যই। এরপরে আমার আর কোনো দ্রব্যে মোহ জন্মায় নি। দোকানে দেখেছিলাম নীল এক পাথর, ক্ষুদে পোকার মতন দেখতে, ভীষণ সাধ হয়েছিল লকেট বানাবো। আমরা পাঁচবোন শওকত মামার সাথে গিয়েছিলাম দোকানে। সেদিন কী হলো, মামা উজাড় করে আমাদের জিনিস কিনে দিলেন। পাথরটায় আমার চোখ গেঁথে যেতেই সায়রা হাতে নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। স্বপ্নলব্ধ জিনিসের মতো মুহূর্তে পাথরটার প্রতি আমার যে-রকম লোভ জন্মেছিল, বুবুর উজ্জ্বলতা দেখে মুহূর্তে তাও নিভে এলো। জিনিসটা এত অস্থির করে রেখেছিল আমাকে, আমি অনেকদিন ওর চেইনের দিকে তাকাতে পারতাম না।

এর অনেক পরে, বুবু যখন এক রাতে বাড়ি থেকে চিরদিনের মতো চলে যায়, চেইনসহ লকেটটি আমার গলায় পরিয়ে দিয়েছিল। ততদিনে সেই সময়ের তরঙ্গগুলি আমি হারিয়ে ফেলেছি। আমার ভেতর সেই দুর্মর পাথর মাটির ঢেলার এক বোধ এনে দিয়েছিল।

সায়রাবু ছিল দক্ষ সাঁতারু।

দিনে তিনবার জলে নামত। কেমন অদ্ভুত ক্ষেপাটে স্বভাব ছিল তার। সাঁতার জানি না জেনেও একদিন হিড় হিড় টানতে টানতে আমাকে সেই ভয়ার্ত ছায়াঘেরা জলের মধ্যে নিয়ে ফেলল।

তখন ছিল রাত্রি।

আমি সেই বয়সেই ছিলাম বড় আচ্ছন্ন, বড় প্রকৃতিকাতর। টানা বরষায় আমি অসুস্থ হয়ে পড়তাম। সন্ধ্যার হলুদ নিভন্ত রূপ আমাকে জানিয়ে যেত, মৃত্যু আসছে, মৃত্যু আসছে। আমি বড় বুবুর কোমর জড়িয়ে ধরে স্বপ্ন দেখে কেঁদে উঠতাম, ঘোর কুয়াশায় আমার কথা স্তব্ধ হয়ে যেত। সেদিন, আমি জ্যোৎস্নার তরঙ্গমথিত টানে ভূতগ্রস্তের মতো হাঁটতে হাঁটতে শ্যাওলা ঘাটে বসেছিলাম। পাশের বাড়ির ছাদে বসে বাঁশি বাজাচ্ছিল অমল। রোজ রাতেই বাজায়, জানি অন্য একজনের প্রণয়সঙ্গী সে, তবুও আমাকে অস্থির করে মজা পেতে বাজায়। এ এক আশ্চর্য খেলা মানুষের। বাঁশির শব্দ শুনে আমার রক্তে, তরঙ্গে, শিরায়, মজ্জায় আগুন ধরে যায়। দাউ দাউ অগ্নির মধ্যে পুড়তে পুড়তে আমি কী করি, কী খাই, কী চলি, কিছু ওর জানা থাকে না, কেবল সেই রাত নিয়ে সে আমাকে নিয়ে খেলে, যে রাতে আমি এক উদ্ভট আচ্ছন্নের মতো ঘর পেরিয়ে, আধোগলি পেরিয়ে, সিঁড়ি টপকে টপকে উঠে গিয়েছিলাম তার ছাদে, মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম তার বাঁশি বাজানোর অপার্থিব ভঙ্গি, আমি গুটি গুটি নিঃশব্দে বসে গিয়েছিলাম তার পেছনে, সে নিজেও লক্ষ করে নি, হু হু রাত্তিরে ডুবে ছিল নিজের সুরের মধ্যে... এক সময় থেমে, আমাকে দেখে সে কী চোখ কপালে! তুই ? যা! যা! সর্বনাশ হয়ে যাবে!

কী সর্বনাশ! কেন সর্বনাশ! আমি তার কী জানি। কেবল তখন জানা হয়ে গেছে, একটি বাঁশির সুরে যে কেউ আমার সর্ব অস্তিত্ব কিনতে পারে।

চলে এসেছিলাম।

তারপরও বিশেষ সেই সুরটা কেন অমল বারবার বাজায় যে সুরে উন্মাদ গোখরোর দশা হয়েছিল সেদিন আমার ? আমার সেই বিপন্নতা নিয়ে এ-কী নিষ্ঠুর খেলা তার, যাকে সে আশ্রয় করতে পারে না ?

সেই রাতেও সেই পোড়া জ্যোৎস্না, পোড়া বাঁশির টানে আমি স্থবির দাঁড়িয়েছিলাম ঘাটে। এক অলৌকিক সুরপাগল আলোর সাথে মিলেমিশে জলের তরঙ্গে তৈরি করছিল এমন এক বিষয়ের, যে বিষয় পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত হিম মৃত্যু, উন্মাদ জন্মের সৃষ্টি করে, যা স্বাভাবিক নয়, সহজ নয়... আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় ঝাঁঝাঁ করছিল, আমি আকাশের সেই প্রকাণ্ড আলোকখণ্ড চিবিয়ে খেতে খেতে কাঁদতে ভুলে গিয়েছিলাম— সেই মুহূর্তে আমার রাত্তিরেস্নান সায়রা বুবু— তোর ভূত ছাড়াই— বলতে বলতে আমাকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে ফেলল জলে।

এরপর সেই জল, যে গভীর জলকে ভূতের মতন ভয় আমার, আমার সামনে দণ্ডায়মান... আমি নিঃশ্বাস টানলে কপালে উঠে যাচ্ছে স্রোত, সেই আলোকোজ্জ্বল জল মৃত্যু যন্ত্রণা নিয়ে আমার গলা চেপে ধরেছে। সামনে মৃত্যু, সবুজ মৃত্যু আর গুঁড়ি গুঁড়ি হিম ঠাণ্ডা, আমাকে আমার প্রিয় বুবু জলের ভয় তাড়াতে চেপে রেখেছে জলের মধ্যেই, জান আটকে মরার সময় জলের নিচে চোখের সামনে কেবল এক বিকট ছায়া দেখি, যার মস্তক নেই... কেবল শরীর, আর দু'টি প্রকাণ্ড হাত, যা আমার দিকে প্রসারিত।

আমাকে জল থেকে তুলে সায়রা বুবুর সে কী হি হি হাসি! সেই বুবু'র কীনা বিয়ে হলো একটা রাক্ষসের সাথে। কী দেখে যে বুবু ওর সাথে পালিয়ে গিয়েছিল, আল্লা জানে। ওই ব্যাটার কারণেই বুবু'র সাথে আমাদের কোনো যোগাযোগ নেই। আমার মনে হয় ওর হাতে খুন হওয়ার আগে বুবুর ওর হাত থেকে মুক্তি নেই।

এনজিওতে ঢুকে মহাস্বস্তির এক সংবাদ শুনি। ভীষণ সময় সচেতন এনজিও ডিরেক্টর গতরাতে এক সপ্তাহের জন্য দেশের বাইরে গেছেন।

আশ্চর্য এদের আচরণ! দেশের বাইরে যাবেন, এটা কি দু'দিন আগে তিনি জানতেন না ? কিন্তু দিব্যি আমাকে আজকে ডেট দিলেন। যা হোক, নিজের গাফিলতির জন্য আমাকে কিছু হারাতে হলো না বলে প্রাণের মধ্যে আমি খুব আরাম বোধ করি। ফিরতে ফিরতে আমার অকারণেই মনে হয়, শায়লার গার্মেন্টসে একটা ঢুঁ দিয়ে যাওয়া যেত ?

ঘড়ি দেখে সিদ্ধান্ত পাল্টাই। তাহলে নিজের অফিসে যেতে দেরি হয়ে যাবে।

রোদের হল্কা কড়কড় শব্দে মগজে ঢুকতে থাকলে আমি মাথায় হুড উঠাই। কোত্থেকে যেন ভেসে আসছে ধ্বনি...এই প্রচণ্ড রোদেও আমার শীত লাগতে থাকে ফের, সামনে অবারিত জনারণ্য! একটা বাসা বদলের ঠেলাগাড়ি সামনে গ্যাঞ্জাম সৃষ্টি করেছে। রিকশাওয়ালার তেলা মেরুদণ্ড অনড় হয়ে আছে, কেমন ঝাপসা লাগছে সামনেটা, সকালের হুড়মুড় করে জেগে ওঠা বিশাল পৃথিবীটাকে ভীষণ ভয় লাগতে থাকে আমার। কী সেই ধ্বনি ? আমি রিকশা আঁকড়ে ধরি!

সেই থ্যাতলানো পোড়া আর্তনাদের ওপর ঘূর্ণায়মান এম্বুলেন্সের শব্দ।

অন্যসময় আমার কাছে এসব কোনো বিষয়ই না। একদিন আমার চোখের সামনে একজন টাল খেয়ে যখন ম্যানহোলের তলায় চলে গিয়েছিল, আমার মনে হয়েছিল ম্যাজিকবাজি কিংবা রূপকথার ছবির কোনো দৃশ্য... এক বিকট দৈত্যের হাঁ— এর মধ্যে ঢুকে গেল কোনো পুতুল মানব... আজ বড় খারাপ লাগছে।

এতক্ষণে মনে পড়ে, সকালে আমার নাস্তা করা হয় নি।

ভেতর থেকে ঠেলে বমি উঠছে। থোপ থোপ মাথাগুলোকে বড় আজব লাগছে দেখতে, এসব ফুঁড়ে ফুঁড়ে এক তেজীয়ান ট্রাক সাঁই শব্দে কান মাড়িয়ে গেলে আমি রিকশা ঘুরিয়ে বাসার পথ ধরি। যেখানটায় এম্বুলেন্স হল্লা করেছিল, সেখানে রিকশার জটলা। পাশের ছোট্ট দোকানে ডালপুরি ভাজা হচ্ছে। আমার মনে পড়ে, এবং বুক ফুঁড়ে ফুঁড়ে দীর্ঘশ্বাসের মতন, আজ অফিসে সাপ্তাহিক মিটিং, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম আজ রোববার। ডালপুরি দেখতে দেখতে বারের কথা মনে হলো কেন ? বড় আজব তো! ভাবতে ভাবতে নিজেকে বিন্যস্ত করে সেই ঝুপড়ি দোকানের গনগনে কড়াইয়ের সামনে নিজেকে দাঁড় করাই, এখন যদি রিকশা ঘুরিয়ে ফের অফিসে যেতে হয় তবে বলতে হবে, সকাল থেকে বেশ ক'টি কচকচে নোট আজ যাতায়াত বাবদ গচ্চা। ভেতরটা খচখচ করে।

ঘেমো শ্রমজীবী মানুষের ভিড়ে বসে পুরি খেতে খেতে আমি শায়লার কথা ভাবি, এত পরিশ্রম ও কী-করে করে ? একটা মেয়ের সকাল থেকে গভীর রাত্তির অব্দি অফিস ছাড়া কোনো জীবন নেই। এইরকম ভয়ঙ্কর জাঁতাকলে কী করে ও নিজেকে সেঁধিয়ে দিচ্ছে ? আমি কী চিনি না কী দুঃসহ অমানবিক সেই জীবন ? আমি তো পারি নি, ও কী করে পারছে! এইসব ভাবতে ভাবতে নিজের মাথার ঝিমঝিমানি নেমে যায়। কী সব সৌখিন অসুখে

ভুগতে ভুগতে আমি বাড়ির পথ ধরেছিলাম, এটা ভাবতে গিয়ে অন্য এক স্বস্তি এসে মন ভরিয়ে দেয়, এই যে আজকে রিকশা ভাড়াটা আমি গচ্চা দিতে পারলাম, এই যে এইটুকু সামর্থ্য তৈরি হয়েছে, এর জন্যই তো বাঁচা।

সামনে জটলা করতে থাকা ন্যাড়া মাথার ছাবালগুলোকে হুশ করে উড়ানোর ভঙ্গি করে আমি যখন ফের রিকশায় চেপেছি, রোদ্দুর ডুবে গিয়ে চারপাশটা কেমন ছায়া ছায়া হয়ে ওঠে।

আমি পেটপুরে আকাশ দেখি।

নিজেকে আমার অসম্ভব সুখী মনে হয়।

রাত্তিরে চিলে বারান্দায় বসে শায়লার জন্য অপেক্ষা করতে করতে মাঝবয়সী রমণীটিকে দেখি। চারপাশে দেয়াল দিয়ে মোড়ানো বাড়িটির মধ্যে রাজ্যির গাছপালা। এরকম একটা ইট সুরকি পরিপূর্ণ অন্ধ গলির মধ্যে এমন কোনো বাড়ি কল্পনা করা যায় না। যেন কোনো আলাদীন দৈত্য এসে কোনো প্রাকৃতিক এলাকা থেকে বাড়িটিকে খাবলা দিয়ে তুলে এনে এই গলির এক ফাঁকে বসিয়ে দিয়েছে। দীর্ঘ দীর্ঘ রাত এই বাড়ির বারান্দায় বুঁদ হয়ে বসে থাকেন এক মাঝবয়সী রমণী। এই বাসায় আসার পর এই মহিলাটি আমার প্রধান এক বিস্ময়। কোনোদিন কাউকে এ বাড়িতে ঢুকতে দেখি নি, কারো সাথে মহিলাকে কথা বলতে দেখি নি...

বড় দুশ্চিন্তা হয় নীলুফার, খালা ভেতর থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়ান, রোজ শায়লা এত রাত কইরা ফিরে, একলা একটা মেয়ে—

আমি বলি, একলা দেখলা কই, ওর সাথে তো পাশের বাসার শামীমাও ফেরে।

দুইটাই তো মেয়ে, নাকি ?

এইটা আর নতুন কী ? আমি আধো বাতির তলে নিমজ্জমান মহিলার দিকে চোখ স্থির করে বলি, তুমি ঘুমাইতে যাও। কতবার কই দুইজনে এক সাথে রাইত জাইগা লাভ কী ? তোমার যদি এতই ইচ্ছা, চল কাম ভাগ কইরা লই, এক রাইত তুমি অপেক্ষা কর, এক রাইত আমি।

তুই-ই ক নীলুফার, এইটা কোনো মানুষের চাকরি ?

যাও যাও তুমি ঘুমাও গিয়া, আর আল্লাহর কাছে শুকরিয়া কর, বহুত ভালা আছি। আইজ অফিস থাইকা ফিরতে ফিরতে দেখি, ডাস্টবিনে শুইয়া এক নতুন বাচ্চা চিৎকার করতাছে।

আহারে, তারপর ?

তুমি এখনো এইসব শুইন্যা আহারে কও ? আমরা তো যাই না কারো ঘরে— কাউরে চিনি না, প্রত্যেকটা ঘরে দেখবা এক একটা কাহিনী, নিষ্ঠুর, রূঢ়... পত্রিকায় তো আসমান থাইকা খবর আসে না, রোজ সকালেই পড়ি আর মনে করি এইসব গল্পকাহিনী কোনো জীবন থাইকা নেওয়া না। বারো বছরের বাচ্চারে ধর্ষণ কইরা ছুরি দিয়া জবাই কইরা পানির ট্যাংকির মধ্যে ফালায়া রাখছিল, সকালের খবর দেখো নাই ? এই নিয়া জিগাইছো কিছু ? অথচ এইটা এই শহরেরই ঘটনা... যাও খালা., লেকচার বেশি হয়া যাইতাছে—

খালার মুখ কেমন মলিন হয়ে ওঠে, এই জন্যই তো ভয় পাই। শায়লারে লইয়া সাধে চিন্তা করি ?

চিন্তা কইরা কী করবা ? বিপদের কোনো ঘর দরজা আছে ? এখন যদি পাশের আম গাছ বাইয়া উইঠা কেউ বন্দুক লইয়া আমাদের বারান্দায় আইসা দাঁড়ায়, কী করতে পারমু ? এইরকম ঘটনা কি ঘটতাছে না ? আর আজকাল কামের বেটিরা বিবি সাইবদের খুন করতাছে, খাবারে বিষ মিশাইতেছে, তুমি চিন্তা বন্ধ কর তো, ধর্ষণ কেমন বাড়ছে, লক্ষ করছ ? আইজ পড়লাম, মেয়ের ধর্ষণের মামলা তুইলা না নেওয়ায় শয়তানগুলা মায়েরেও ধর্ষণ করছে। জীবন এইরকমই।

খালা ভেতরে চলে গেলে আমার বড় ইচ্ছে হয়, আলোছায়ায় ঢেকে থাকা মাঝবয়সীর মুখটার মধ্যে সজোরে একবার টর্চের আলো ফেলি।

এই খিচিখিচি ছ্যাতলা পরা বাড়িগুলোর মাঝখানে নির্মিত ওই বাতিছায়া বৃক্ষলতাময় রমণী বড় রহস্যময়। বিষয়টি শায়েদকেও আকৃষ্ট করেছে। ওর মতো চির নির্বিকার ছেলেও একদিন কৌতূহলী হয়ে, পত্রিকা থেকে এসেছে, এই রেফারেন্স দিয়ে ও বাড়িতে ঢুকতে চেয়েছিল, কিন্তু দারোয়ান কিছুতেই ঢুকতে দেয় নি। বলেছে, রানীমার নিষেধ, কোনো আত্মীয়কেও তিনি নাকি এলাউ করেন না।

ঘনান্ধকার রাত্রি।

একে একে সব বাসার বাতি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এ এক মজার খেলা দেখা। আমি ভাবি, প্রতিটি আলোকোজ্জ্বল জানালার ঘরে ঘরে আমারই মতন মানুষেরা, কাছাকাছি অনুভব, বাঁচার স্বপ্ন, যুদ্ধ, প্রত্যেকটি ঘরে কিছু মানুষ এক সুতোয় বাঁধা পড়ে নানারকম সুখ দুঃখে আবর্তিত হচ্ছে, অথচ এরা কত অচেনা আমার। কোনো ঘরের মৃত্যু চিৎকার হয়তো মুহূর্তের জন্য আমাকে কাঁপিয়ে দেয়, কিন্তু দীর্ঘ কোনো বেদনা দেয় না, অনুভব দেয় না, আমার ঘরে শায়লা ফিরে আসছে না বলে পাশের বাসার বাতি বন্ধ হওয়া থামবে না। অথচ এদের কারো সাথেই এক বিবাহে বেঁধে দিলে সেই চির অচেনা মানুষটিই হয়ে উঠত জীবনের সবচাইতে নিকটবর্তী কেউ। কিন্তু একেক ঘরের একেক সময় বাতি বন্ধ হয়ে যাওয়া দেখতে বড় মজা লাগে। যেন খেলা দেখছি, দেখছি, কোন ঘরে কখন দিনের হলাহল বন্ধ হয়ে রাত্তিরের ঘুম নেমে আসছে।

নিকটবর্তী কেউ ?

অসুখী সায়রাবু'র কথা মনে পড়ে। ওর স্বামীকে দেখে আমি মানুষ আর জন্তুর ভেদ বের করতে পারি না। কী করে ওই মানুষেরা নিকটবর্তী হয় ?

হয়। তারপরও সবচাইতে নিকটবর্তী মানুষ সে-ই হয়। তার সাথেই জীবনের প্রতিমুহূর্তে ঘষা খাওয়া, সেই ঘষায় বিদ্যুৎ, আগুন, দহন, যন্ত্রণা, সুখ, সন্তান। মা-বাবা-ভাই-বোন সেই বাস্তবতায় পড়ে এক সময় কত দূরের মানুষ হয়ে ওঠে।

সেই রহস্যময় বাড়ির বিমূর্ত নারী দাঁড়িয়েছে! কত রাত হলো ? ভাবতে ভাবতে আমি দেখি ভেতরে না গিয়ে মহিলা ধীর পায়ে হেঁটে শ্বেতকরবী গাছটার নিচে এসে দাঁড়িয়েছে। তার চুল ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া, কপালে মস্ত লাল টিপ। গ্রিলের অনেক কাছে এসে আমি চেয়ার টেনে বসি। আমার কেমন গা ছমছম করতে থাকে। অলৌকিক কোনো কিছুতে আমার বিশ্বাস নাই। কিন্তু অনেক সময় পরিবেশটাই হয়তো এমন হয়ে ওঠে, যাতে মনে হয়, এক্ষুণি সব অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটতে শুরু করবে।

গাছের নিচে থোপ থোপ শ্বেতকরবী পড়ে আছে। নিচে দাঁড়িয়ে মহিলা অপূর্ব কায়দায় হাত ঘুরিয়ে তার মধ্যে কী যেন দেখতে থাকেন। ওঁর হাতে কী ? আমার শরীরে ঘাম জমতে থাকে। মৃদু বাতাসে আঁচল উড়তে শুরু করল। আমার মনে হয়, মহিলা এক্ষুণি ছায়ার সাথে মিশে যাবে, আমি কেমন যেন নিশ্চিত হয়ে যেতে থাকি এই মহিলা মানুষ না, অশরীরী কিছু।

কলিংবেলের শব্দ।

আমি যেন নিঃশ্বাস টানার সুযোগ পাই। দরজা খুলতেই শায়লা। ক্লান্ত ভঙ্গিতে আমার হাতে কাঁধের ব্যাগটা দিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকতে থাকে।

আর ভেতরে ঢোকার আগে শেষবারের মতো আমি সেই রহস্য বাড়িটির দিকে তাকাই। না, শ্বেতকরবীর নিচে কেউ দাঁড়িয়ে নেই।

ছোট্ট টেবিলটায় বসে ভাত খেতে খেতে অনেকদিন পর শায়লা বলে, এইভাবে আর ভালো লাগে না।

ঠিকই তো, আমি বলি, এত কাজ, এত রাত হয়, কী যে অশান্তির মধ্যে থাকি...।

আমি জানি, এদেশের প্রতিটি গার্মেন্টিস শ্রমিকের পশুরও অধম জীবনের সমান্তরালে শায়লা নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। আশ্চর্য মনোবল ওর, আর ও প্রখর বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন। নিজের কাজ আর জীবনকে সে সহজভাবেই গ্রহণ করেছে। কিন্তু একজন চাকরিজীবী কখনো ভেঙে পড়বে না, ওর এই বিষয়টাই মানতে পারি না আমি। বরং আজ যে শায়লা বলল, 'ভালো লাগে না', বড় স্বস্তি এনে দিল আমার মনে।

আমি রাতের জন্য বলতেছি না, রাত নিয়া আমার ভয় নাই। শায়লা ক্লান্ত স্বরে বলে, আইজ শামীমার জন্য বড় খারাপ লাগল।

শামীমার আবার কী হইছে ?

কী আর হইব ? তিনদিন ধইরা বেহুঁশ, জ্বর লইয়া কাম করছে, আজ বাড়াবাড়ি অবস্থা হওনের পরে বলল আজ ওভারটাইম করতে পারব না। কপালে হাত দিয়া ম্যানেজার বলে, কই তোমার গায়ে তো জ্বর দেখতাছি না, খালি কাজে ফাঁকি ? বইলা চইলা গেল। প্যারাসিটামল খায়া তখনই কেবল শরীল থাইকা জ্বরটা নামছিল। আহারে বেচারী! কাম করতে করতে শেষদিকে অজ্ঞান হয়া পড়ল।

এই অবস্থা ? আমি বিমর্ষ হয়ে উঠি, তারপরে ?

তারপরে আর কী ? পানির ঝাপটা দিয়া জ্ঞানটান ফিরায়া ওরে বাসায় পৌছায়া দিয়া আইলাম।

ধুর! এইসব শুনলে আর বাঁচতে ভালো লাগে না।

তুমি বুবু খালি নেগেটিভ, আমার এর পরেও বাঁচতে ভালোলাগে। বাঁচনের জন্যই এত কিছু, সারাক্ষণই যদি ভাবি, লাঙ্গলের নিচে মাথা ঢুকায়া আছি তাইলে এত পরিশ্রম কইরা যে এক ফোঁটা বাঁচন— সেইটারেই যে মাইরা ফেলা হয়। ঢক ঢক করে পানি গিলে শায়লা বলে, খালার রান্নার হাত নষ্ট হয়া যাইতাছে, যা পচা হইছে তরকারি, শোনো, আজ রাতে অফিস নিয়া আর কুন কথা না, এক প্যাচাল প্রত্যেকদিন ভালো লাগে না, আজ গোসল দিয়া টানা একটা ঘুম দিমু, ঠিক আছে ?

সেই অশরীরী মহিলার কথা মনে হয়। ওই ছায়াঘেরা ভুতুড়ে বাড়িটা আজ আমাকে বড় টানতে থাকে। এইরকম বদ্ধ ঘরের হাওয়ায় বাস করে ওরকম একটা বাসার কথা কেবল কল্পনাতেই ভাবা যায়। টেবিলের খাবার গুছিয়ে কী এক টানে আমি ফের বারান্দায় যাই। বারান্দায় নিঃসঙ্গ বাতি, আর নিঃসঙ্গ বৃক্ষগুলি। কিন্তু বারান্দা লাগোয়া ঘরটায় আলো জ্বলছে। মহিলা কি নিদ্রাজয়কারিনী?

বুবু ফোন! বলতে বলতে শায়লা বাথরুমে ঢোকে।

রাত কয়টা বাজে? আমি ঘড়ি দেখে বিস্ময়ের চূড়ান্তে পৌঁছে ফোন ধরি, হ্যালো! শায়েদ, তুমি এত রাতে? বাসায় ফোন নিয়েছ নাকি?

শায়েদ বলে, আমার ভাগ্য তো আর তোমাদের মতন ভালো না, বাড়িওয়ালার ফোন বিনা খরচায় ভোগ করতে পারব। বন্ধুর বাসা থেকে করছি। ফোনটাকে ফ্রি দেখে রাত টাতের হিসেবটা আর ঠিক থাকল না। তুমি ভালো আছ তো?

খোঁচা দিচ্ছ? মাসে মাসে ফোনের বিলটা তো আমাকেই গুনতে হয়, নাকি? বাদ দাও, ভালো আছি কি-না বুঝতে পারছি না, সারাটা দিন আজকে যাচ্ছেতাই কেটেছে, তোমার খবর বলো।

আমার কোনো খবর নেই, তুমি লক্ষ করেছ নীলু, আমরা দিনদিন কেমন আর প্রসঙ্গ খুঁজে পাচ্ছি না?

আমি বলি, এর একটাই কারণ হতে পারে, আমরা শুধু আমাদের প্রসঙ্গেই কথা বলতে চাই। নিজেদের প্রসঙ্গগুলোকে আলো হাওয়ায় বাঁচতে দিতে চাইলে আমরা এর ওপর চেপে না বসলেই পারি।

শায়েদ সহসা উত্তর খুঁজে পায় না।

আমি বলি, জানো, কিছুক্ষণ আগে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম, তোমার সেই পড়ন্ত সুন্দরী শ্বেতকরবী গাছের নিচে দাঁড়িয়ে মুহূর্তে হাওয়ার সাথে মিলিয়ে গেল।

আমার পড়ন্ত সুন্দরী? বাক্য ঠিক কর, তুমি সেই নির্জন রহস্যময়ীর কথা বলছ?

কী বিশেষণ! আমি একটু ক্ষীণ খোঁচা খাই, তোমার মতো শান্ত মানুষও সেদিন ওর ওখানে যাওয়ার জন্য এমন অস্থির হয়ে উঠল, আমার তো রীতিমতো চিন্তাই হচ্ছে।

ধুর! এতরাতে এসব কথা শোনার জন্য ফোন করি নি, অন্য কথা বলো।

নিজেদের কথা? আমি হাসি।... মাথাটা প্রচণ্ড ধরেছে শায়েদ।

রাখছি। ঠাণ্ডা হয়ে ওঠে শায়েদের কণ্ঠ, জানতাম ভালোলাগার কেউ ফোন করলে মানুষের নাকি মাথা ব্যথা সেরে যায়, আসলেই নীলু, আমি তোমাকে বুঝি না।

ভুল বুঝছ কেন? এইবার আমি একটু তেতে উঠতে থাকি। আমার মনে হচ্ছে আমরা বড্ড একটা কুয়োর মধ্যে পড়ে ঘোল খাচ্ছি। তুমি নিজে কোনো কাজ করবে না, বাবার কাছ থেকে হাত খরচ নিয়ে চলছ, মানে আমি তোমার বিষয়ে আর আশাবাদী হতে পারছি না, মানে—।

নীলু, এইসব ছাড়া তোমার কোনো কথা নেই?

জীবনের সবচাইতে জরুরি কথা রেখে প্রেমের কথা বলব? তুমি শায়েদ ওসব মুখস্থ ডায়লগ শুনতে পারলেই খুশি হও। মানুষের কাজ, চিন্তা, অনুভব সব মিলিয়ে তার একটা

ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়। জীবনের এই পর্যায়ে এসে চিনে বাদাম ভেঙে খাওয়ার প্রেমে মন বসে না, আমারও তো একদিন ইচ্ছে হতে পারে, তুমি আমাকে কিছু একটা উপহার দাও, কোথাও খেতে নিয়ে যাও।

তুমি এসব করেছ বলে খোঁটা দিচ্ছ? শায়েদের এই কথায় মহাবিরক্ত আমি চেঁচিয়ে উঠি প্রায়, তোমার সাথে কথা বলে মাথাটা নষ্ট করার কোনো অর্থ হয় না। আগে তোমার মধ্যে কিছু সূক্ষ্ম বোধ ছিল, অলস জীবন কাটাতে কাটাতে এখন তা-ও হারাতে বসেছ, আজ ফোন রাখছি, আজ আর ভালো কোনো কথা হবে না। প্লিজ, তুমি কিছু মনে নিও না, আজ আমি রাখছি, শায়লা টায়ার্ড হয়ে ফিরেছে, এখন ঘুমুবে।

ফোন রেখে আমি আকুলভাবে শায়লাকে অনুভব করি। রাতের বিছানায় দু'জনের অনেক গল্প, সেই গল্পের মধ্যে আমি দেখি এমন আত্মপ্রত্যয়ী এক মেয়েকে জীবন যার ভেতর থেকে ক্রমশ কোমলতা তুলে নিচ্ছে।

ঘুম থেকে উঠে শায়লা একটু ঝুঁকি নিয়েই অফিসে গেল না। যদিও আজ শুক্রবার তবুও শিপমেন্টের সময়, এখন অফিসে কাজের চাপ খুব বেশি। এসময় অফিস বাদ দেয়াটা চাকরির জন্য খুব ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু গত দু' সপ্তাহ যাবৎ তাকে অমানবিক পরিশ্রম করতে হয়েছে। গড়ে আট ঘণ্টা ওভারটাইম করেও কুলিয়ে ওঠা যায় নি। আজ সকালে শরীর বেঁকে বসল। অফিসে যাওয়ার কথা মনে হতেই যেন ওর সারা অস্তিত্ব কেমন ঘুলিয়ে উঠল। এছাড়া এক সপ্তাহ যাবত বেনুবালা অফিসে আসছে না, মেশিনের মতো খাটতে পারে মেয়েটা। তিনদিনের ছুটি চেয়ে এপ্লিকেশন পাঠিয়ে সাতদিন সে লাপাত্তা। অফিস ওর বিরুদ্ধে এ্যাকশান নিচ্ছে। বেনুকে খুব স্নেহ করে শায়লা। ওর মধ্যে আশ্চর্য এক তেজ আছে, যা শায়লাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। গার্মেন্টিসের অনিয়ম আর শোষণের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে দু'টি চাকরি হারিয়ে এখানে এসে অপারেটরের কাজ নিয়েছে। শায়লা বলে— বুবু, ওর মেশিন চালানোর ভঙ্গি দেখলে মুগ্ধ হয়া যাইতে হয়। অদ্ভুত নিখুঁত ওর কাজের গতি। ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, অসুখ বিসুখ কিচ্ছুকে তোয়াক্কা করে না। সেই মেয়ের কী এমন কাণ্ড হইল যার জন্য সে সাতদিন ধইরা লাপাত্তা? এইসব কথা বলতে বলতে শায়লা বিমর্ষ হয়ে ওঠে, এরপর আমার দিকে তাকায়, তুমি আমার সাথে একটু যাইবা?

কই?

বেনুবালার বস্তিতে।

চল যাই, বলতে বলতে আমরা তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ি। হাঁটতে হাঁটতে আমি ডিমের খোসা পা দিয়ে মাড়াই। সকালের রোদ্দুর চিড়চিড়িয়ে বাড়ছে। এই অগাস্টেই হাজার গরমেও চামড়ার মধ্যে কী এক খসখসানি। আমি শীত আসার গন্ধ পাচ্ছি। বড্ড বেশি শীত পিরিতি আমার। পুরো আশ্বিন কার্তিক আমি উন্মনা হয়ে থাকি। কী এক ঘোরে নিঃশ্বাস টানতে থাকি। রোদ্দুরে হাত মেলে বসে থাকি। আর আশ্চর্য কিছু পেয়ে যাওয়ার মতো বলতে থাকি— এই যে টের পাচ্ছি, এসে গেছে, এসে গেছে।

যে কেউ ভাববে আমি যেন কোনো অলৌকিক পুরুষের পায়ের শব্দ শুনছি। কোন সব ইন্দ্রিয় প্রখর হলে যে মানুষ এরকম ভাবালুতায় আচ্ছন্ন থাকতে পারে, শায়লা আবার সেটা বুঝে উঠতে পারে না। ওর বাস্তবজ্ঞানবোধ আমাকে প্রায়ই আহত করে।

ঘরে ঘরে যেন উৎসব চলছে। ঘিঞ্জি গলিটার ঠাসাঠাসি বাড়িগুলোর মধ্যে এমন কোনো ঘর নেই যেখানে টেলিভিশন হল্লা করছে না। হিন্দি ছবি, হিন্দি গান, কেমন যেন বিভ্রম লাগে, অন্যদেশের কোনো গলি ধরে হাঁটছি না তো? এসব বিষয়ে শায়লার কোনো বিকার নেই। অপসংস্কৃতি, আগ্রাসন এইসব শব্দ বলতে বলতে আমি যখন একদম ভেঙে পড়ি, আমাদের কী হবে শায়লা? শায়লা হতবাক হয়ে যায়। এইসব বিষয়ের সাথে আমাদের বাঁচা-মরার সম্পর্ক কী, সে বুঝে উঠতে পারে না। পৃথিবীতে কিচ্ছুকে সে ডরায় না। তার ভয় একটাই, শুধু ভয় না, বিভীষিকাময় ভয়, কোনোদিন যদি এমন হয়, হাতে একটি টাকাও নেই? অর্থ কষ্টকে সে ঘৃণা করে। দরকার হলে বিন্দু বিন্দু করে প্রতিমুহূর্তে রক্ত দেবে তবে এক বেলা না খেয়ে থাকার কষ্ট সে সহ্য করতে পারবে না।

অর্থকে কেন্দ্র করে ধাপে ধাপে আমাদের স্বপ্নগুলো বাড়ছে। প্রায়ই কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে না পারার কষ্ট বুকের মধ্য খচখচ করে।

মোড়ে এসে আমরা রিকশা নেই।

কাছেই বেনুবালাদের বস্তি। ভাড়া মিটিয়ে দাঁড়াতেই পাটপচার মতো অজানা এক গন্ধ এসে নাক রুদ্ধ করে দেয়। পাশেই সুবিশাল ড্রেন। তার পাশে হামাগুড়ি খাচ্ছে, এক অবোধ শিশু। ওকে একা ফেলে উৎসবে মেতেছে কালো কাকের মতোন ন্যাংটো শিশুগুলো। দৃশ্যটা ঠায় দাঁড়িয়ে দেখি। ওইটুকুন হামাগুড়ি শিশুও নিজের গতির সীমারেখা জেনে গেছে। ড্রেনের কাছে এসে সে বাঁক ঘুরে অন্যদিকে চলতে থাকে। ঘরে ঘরে চুলো জ্বলছে। চাটাই চট আর ভাঙা টিন দিয়ে তৈরি করা ঘরগুলো দেখলে মনে হয় ওগুলো পাখিরা তৈরি করেছে। স্তূপ করা কাগজের টুকরো, পচা টায়ার এইসব ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে আগুনের মধ্যে। মুরগির ভুঁড়ি নিয়ে গুলতানি মারছে কাকপাখিগুলো আর ওপারেই স্তূপ স্তূপ আবর্জনার ওপর ঘুমোচ্ছে কয়েকটা রোয়া উঠে যাওয়া কুকুর। সামনে সার বেঁধে পাঁচজন মহিলা একজন আরেকজনের উকুন বাছছে। প্রায় নিঃশ্বাস আটকেই বেনুবালার ঘরে ঢুকতে হয়। সমস্ত শূন্য ঘরের এক কোনায় দলা মোচড়া কিছু কাপড়, কিছু হাঁড়ি-পাতিল আর ক্ষয়িষ্ণু এক মেয়ে। চোখ বাড়িয়ে শায়লা চিনতে পারে, অন্য গার্মেন্টিসে কাজ করে, চম্পাবালা। বেনুই একদিন হাসতে হাসতে বলেছিল, নাম ছিল চম্পা, আমার লগে মিলায়া সাথে বালা কইরা দিলাম।

আমাদের দেখে মেয়েটি জড়সড় হয়ে উঠে বসে। মাথায় রাজ্যির তেল, এর মধ্যেও বাহারি ফিতা দিয়ে চুল বেঁধেছে। কালো কুচকুচে চামড়ার নিচে তলিয়ে থাকা চোখ দু'টি নিষ্প্রভ। সর্বাঙ্গে ঘোর অসুস্থতার ছাপ।

সে ক্লিষ্ট হেসে বলে, বেনু দোকানে তেল আনতে গেছে।

আমরা পিঁড়ি টেনে বসতে বসতেই বেনুবালা চলে আসে। এসেই তার তিরতিরানি স্বভাব নিয়ে হই হই করে ওঠে, কী ভাগ্য আমার। বস্তি ঘরে হাত্তির পা।

তোমারে বস্তিতে থাকতে কে বলছে? শায়লা প্রশ্ন করে, চাকরি কর, একটু ভালো জায়গায় থাকার কথা ভাব না কেন?

কী যে কন আপনে, বেনুবালা তেল রেখে শায়লার মুখোমুখি পলিথিন বিছিয়ে বসে, চাকরি— ভাবলেই মনের মধ্যে একটা ফুটানি ফুটানি ভাব আসে, কয় টাকা আর বেতন, বলতে বলতে লজ্জার চোখে আমার দিকে তাকায়, আপনে আইছেন? বড় খুশি হইলাম।

তুমি অফিসে যাইতেছো না ক্যান? শায়লা প্রশ্ন করে। শরীল তো দিব্যি ভালা দেখতাছি।

এইবার বড় করে দম টানে বেনুবালা, কেমনে যাই, ওর অবস্থা দেখছেন? টাইফয়েড হইয়া মরতে বইছিলো, আমি চব্বিশ ঘণ্টা সেবা না করলে—।

আমি স্পষ্ট দেখি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েছে শায়লা। বেনুবালার আধফরসা লাল মুখটার মধ্যেও ক্লান্তির ছাপ পড়েছে। যে মেয়ে নিজে নিঃশ্বাস বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত অবলীলায় কাজ করে যায়, সে বান্ধবী চম্পাবালার সেবা করতে গিয়ে নিজের চাকরি খোয়ানোর ঝুঁকির মধ্যে যায় কী করে? বেনুর এই মহানুভবতায় ফের গা রি রি করে শায়লার। যেন বস্তিতে থাকা মেয়ের এটা চরম সৌখিনতা, কিছুতেই এটা বরদাশ্‌ত করা যায় না। এরই প্রতিফলন আমি তার কণ্ঠে শুনতে পাই। সে ঝাঁঝ চেপে বলে, তাই বইলা টানা সাতদিন গ্যাপ দিবা? তুমি জানো, তোমার চাকরির অবস্থা?

বেনুবালা কেমন নির্বিকার স্বরে বলে, জানি। কিন্তু মানুষের জান আগে না চাকরি আগে? বাইচ্যা থাকলে অনেক কাম পামু, কিন্তু ওর সেবা করতে না পারলে নিজেরে আমি মাফ করতে পারতাম না।

ঝুপড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে বেনুবালার বড় ভাই ওসমান। আমি অলক্ষ্যে দেখি, শায়লাকে দেখে তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। শায়লা আমাকে বলেছে, ও মাঝে মধ্যে অফিসে বেনুর কাছে আসে। দেখতে বেশ সুন্দর আর পরিপাটি। শায়লার সামনে দাঁড়িয়ে সেই ছেলে নাকি প্রায়ই ঘামতে থাকে আর কথাবার্তায় জট পাকিয়ে ফেলে। এখন কোন এক কোম্পানিতে সে সেলসম্যানের চাকরি পেয়েছে।

আজ শায়লাকে দেখে ভালোমন্দ কিছু জিজ্ঞেস না করেই সেই ছেলে কেমন হামলে পড়ে, ম্যাডাম, আপনে একটু বেনুরে বুঝান। আমি একটা ছোট বাসা ভাড়া করছি, কত কইলাম, আমার সাথে চল্, এইখানে মানুষ থাকে? না, সে শুনব না।

আমি চম্পারে ফালায়া কুথাও যামুনা— বেনুবালার ঠাস উত্তর। শায়লা বলে, তাইলে ওরে লইয়া লও।

কেমনে নিমু? ওর কুন ভাই তো আর সেলসম্যানের চাকরি পাইছে না। বাড়ির সংসারটা ওর দিকেই চায়া থাকে। ও সমান ভাড়া না দিয়া আমার সাথে থাকব না, কিন্তু সমান ভাড়া দেওনের মতো অবস্থা ওর নাই।

যাকে নিয়ে কথা সে সামনে না থাকলে এ প্রসঙ্গে বেনুবালাকে ঝেড়ে ফেলা যেত। কিন্তু এই বিষয়টার মধ্যেও বেনুবালার মহানুভবতা জড়িত। এতসব মহানুভবতায় ভীষণ বিরক্ত শায়লা দাঁড়ায়, আমি আর কী বলব। নিশ্চয়ই তোমার নিজের ভালো তুমি নিজেই বুঝছ। তুমি কাল অবশ্যই অফিসে আসবা। আমি তোমার পক্ষ লইয়া ফাইট করতাছি।

কিছু খাইবেন না? হা-হা করে ওঠে বেনুবালা, আপনেরা একটু বসেন, আমি চা লইয়া আসি।

ওসমান বলে, কিছু যদি মনে না করেন, সামনের ক্যান্টিনে গিয়া আমি আপনেদেরে চা খাওয়াই। কথা তো একই হইলো, এইখানে যে গন্ধ!

ওসমান আর শায়লা সামনে, আমি কী এক নিমগ্নতায় হাঁটতে হাঁটতে পেছন পড়ে যাই। রাস্তার পাশের বকুল গাছের তলে রাজ্যির ফুল পড়ে আছে। কয়েকটা মেয়ে বিক্রি করার জন্য সেগুলি প্রাণপণে কুড়োচ্ছে। রোদের তীব্রতা বাড়ছে, এর মধ্যেই চারপাশে এমন হাওয়া ওঠে, শায়লা লম্বা করে নিঃশ্বাস টেনে এক মুঠো ফুল তুলে নেয়।

ওসমান বলে, আপনেও ফুল কুড়ান ?

কেন ? আমারে পাথর মনে করেন নাকি ?

বেনু যা বলে তাতে—।

বেনু কী বলে ?

বলে, ভীষণ কঠিন আপনে, ভীষণ শক্ত।

শায়লা হাসতে থাকে। সেই হাসির সাথে সাথে তার শ্যামলা চামড়ায় এমন তরঙ্গ ওঠে, বাতাসে এমন চুল উড়তে থাকে, গভীর কালো চোখ দুটি এমন দ্যুতিময় হয়ে ওঠে আমি ঝাপসা চোখে দেখি, ওসমান মুগ্ধ হতেও ভয় পাচ্ছে। শায়লা বলে, ও ঠিকই বলেছে। উল্টাপাল্টা আবেগ আমি দুই চক্ষে দেখতে পারি না, এই ফুলগুলা আমার বোন নীলুফারের জন্য কুড়াইলাম। বলতে বলতে শায়লা ফুলগুলো আমার হাতে তুলে দেয়। তীব্র কাঠিন্যের আড়ালে ওর এই রূপ দেখে আমি অভিভূত হয়ে যাই। ওসমান আমাকে বলে, আপনারা বড় সুন্দর! কতদিন আমি সুন্দর দেখি না!

সুন্দর দেখেন না ? আমি হেসে বলি, কী বলছেন আপনি ? আপনার বোন বেনুবালা বন্ধুর জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করছে, এর চেয়ে সুন্দর কী আছে ?

গরম জিলিপি ভাজা হচ্ছে, ওসমান উঠে গিয়ে অর্ডার দিয়ে আসে। আমি ভাবি, আহা! চা-টা পরে খেলেই হতো। ভিড় বাড়ছে। টেবিল না পেয়ে কিছু লোক দাঁড়িয়ে আছে। ওসমান টেবিলে হাত ঘষতে থাকে। দেখে ভেতরে ভেতরে আমি মজা পাই, ওর আঙুল কাঁপছে, কপালে ঘাম জমছে। ও বেনুবালার ভাই— এটা ভাবতেই পরমুহূর্তে ভেতরটা নিঃসাড় হয়ে ওঠে। আর যাই হোক, শায়লার জীবনের সাথে ওকে ভাবা যায় না। শায়লা বলে, যাই বলেন, এইটা বেনুর বাড়াবাড়ি।

আমিও তাই বলি। চম্পা ওরে জাদু করছে, ওরে না ডুবায়া ছাড়ব না, প্রসঙ্গ পেয়ে যেন ওসমান হাঁপ ছেড়ে বাঁচতে থাকে, আপনেরাই বলেন, সমাজে আমার একটা সম্মান আছে না ? ওর জন্য কত জায়গায় আমারে জবাব দিতে হয়। সবাই মনে করে আমি স্বার্থপর, ভাই হয়া দায়িত্ব এড়াইতেছি।

এইসব কথা শুনতে শুনতে অকারণেই আমি কেমন বিমর্ষ বোধ করি। ছোট্ট দুটো চেয়ারে গা ঘেঁসাঘেঁসি দু'বোন বসে আছি। মুখোমুখি ওসমান, একসময় শায়লাকে বলে, যত কঠিন বলা হয়, তত কঠিন আপনে না, বলে সলজ্জ হাসে। আর নিজের দাম বাড়াতে শায়লা বলে অন্য গল্প, আমি কঠিন কি-না তা আমাদের অফিসের প্রোডাকশন ম্যানেজাররে জিজ্ঞাসা কইরেন। আমি দেখি, ছায়া হয়ে উঠেছে ওসমানের মুখ— বিষয়টা বুঝলাম না!

বুঝলেন না ? জিলিপিতে কামড় বসিয়ে শায়লা রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসে, আমি কঠিন, এইটা জাইন্যাও একজন মানুষ আমারে ডরায়, আমার চাকরি খায় না, বুঝেন না ক্যান ? কথা আর এগোয় না।

ওসমানকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা বাসার পথ ধরি। ভিড় ঠেলে, রিকশা গাড়ি পাশ কাটিয়ে আমরা অনেকটা পথ হাঁটি।

কাঁচা বাজারে ঢুকে দু'বোন আধসেদ্ধ হয়ে বাজার করার পর অদ্ভুত হেসে শায়লা বলে, তাড়াতাড়ি বাসায় চল বুবু, হাফটাইম অন্তত অফিসটা কইরা আসি।

খুব ভোরে, যখন চারপাশে ধ্বনিত হচ্ছে আজানের শব্দ, কী এক অস্থিরতায় আমি বিছানা থেকে উঠে বসি। চারপাশে তখনো ছোপ ছোপ ছায়া, এর মধ্যে যেন ডুবে আছে শায়লার ঘুমন্ত দেহ। নিঃশ্বাস টেনে বুক চেপে ধরি। ভেতরে কেউ যেন ঘণ্টা পেটাচ্ছে। যেন সামনে দিন নয়, গ্রাসমান রাত্তির। আমার এই প্রকাণ্ড আনন্দমুখর পৃথিবীকে ভয় লাগতে থাকে। আমি বিছানা থেকে নেমে নিজের অস্থিরতা কাটাতে ড্রয়িং রুমে গিয়ে সশব্দে বাতি জ্বালাই। কোনায় বিছানো খাটে খালা ঘুমোচ্ছেন। মনে পড়তেই বাতি নিভিয়ে নিজের ঘরের মেঝেতে উপুড় হয়ে বসি। ছটফটানিটা কিছুতেই শরীর ছেড়ে যাচ্ছে না। বারান্দায় যেতে যেতে ভাবি, হঠাৎ এমন হলো কেন ? কোনো দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম কি ? বারান্দায় বসে আমি ছায়াচোখে ভোর দেখতে থাকি। রাত্তিরের খোসা ভেঙে কাঁচা দিন নামছে। এই নাগরিক আকাশে কোত্থেকে যে এত পাখির কিচিরমিচির! এর মধ্যে সেই রহস্যময় নারীর বাড়িটা স্থির জলচিত্র। সামনে বিস্তৃত শত সবুজ কুর্চিকা। তার ওপর ধেয়ে নেমেছে কবুতরগুচ্ছ। কীসব খুঁটছে আর নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করছে।

দেখতে দেখতে এক অচেনা বোধ আমাকে চেপে ধরে। হঠাৎ আমার মনে হয়, কেউ যেন অসীম শূন্য থেকে আমাকে ডাকছে... নীলুফার...! নীলুফার...!

কে ? কে ? ফের কাঁপতে থাকি। নিজেকে নিয়ে আমার সন্দেহ ঘনীভূত হতে থাকে, আমি কি আদৌ নীলুফার ?

এই নিয়ে কিছুক্ষণ খেলা চলে। নীলুফার কী ? কে আমাকে সারা জীবনের জন্য এই নামের মধ্যে গেঁথে দিল, যে এই নাম উচ্চারণমাত্র আমার চেহারাটাই আমার মনে পড়বে ?

নাহ্! নিজের চেহারা মানুষ কদাচিৎ স্মরণ করতে পারে। কী হতভাগ্য মানুষ, আয়নায় নিজের নকল আরেকটা কপি দেখে। নিজের আসল সত্য রূপটা কখনই দেখতে পায় না।

কে নীলুফার ?

নিজেকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখি। এই যে আমি আছি, সেটা কতটা সত্য ? আমি মানুষ, আমার অস্তিত্ব আছে, তা-ই আমি আছি, মৃত্যুমাত্র অথবা জন্মের আগে চির অন্ধকার... মানুষ কী ?

ঘর থেকে হন্তদন্ত শায়লা বেরিয়ে আসে, বলে কাল হাফটাইম অফিস কামাই দিয়েছি, আজ দেরি হয়ে গেল, চাকরিটা থাকলে হয়। ও চলে যাওয়ার পর ফের করোটির মধ্যে ধোঁয়া জমে... চাকরিটা থাকলে হয়— এই একটা বাক্য সারা মগজে ঘোল খেতে খেতে সর্ব অস্তিত্বে প্রবেশ করে, হৃদকম্পন বৃদ্ধি পায়, যে অবস্থায় আমরা আছি, এ থেকে আর্থিকভাবে উত্তরিত হওয়ার কথা ভাবা যায়, নামার কথা কল্পনা করা যায় না। শায়লা তো এক সাবলীল বাক্যে অস্তিত্ব সংকটের ইঙ্গিতই করে গেল।

চাকরিটা থাকলে হয়... পাশের বিল্ডিংয়ে পানির ট্যাংকি পরিষ্কার করছে কিছু লোক। তাদের কর্মতৎপরতা থেকে চোখ ফিরিয়ে আমি গলার সাথে গলা লেগে থাকা নোংরা

দালানগুলো দেখি, সামনে ওই রমণীর বৃক্ষসর্বস্ব একতলা বাড়িটা না থাকলে যে বাসায় আমরা থাকি, সেটাকে এক বদ্ধ দেশলাই মনে হতো... চাকরিটা থাকলে হয়... আমার মাথা গ্রীলের মধ্যে ঝুঁকে আসে... কোত্থেকে কারখানার মেশিন চলার খটখট শব্দ ভেসে আসছে... আর সবজিঅলা মাছঅলাদের অবিরাম চিৎকার, আমার কী হলো ? হায়! আমার কী হলো ?

নাস্তা খাবি না ?

খালার ডাকে জ্ঞান ফেরে।

শরীর খারাপ ? খালার এই আন্তরিক প্রশ্নে ভাঁজ ভেঙে দাঁড়াই, না।

অফিসে গিয়ে প্রথমেই আমি চিঠিপত্রের খামগুলি খুলি। মানুষ বড় সমাজ সচেতন। তেলের দাম বৃদ্ধি, সমাজে হু হু করে ধর্ষণ প্রবণতা বাড়ছে, যানজট সমস্যা, বেকারত্ব সমস্যা, যুবকরা ড্রাগে আসক্ত হয়ে পড়ছে, মানুষের মধ্য থেকে মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটছে, সড়ক দুর্ঘটনা অকল্পনীয় ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে— এইসব বিষয় নিয়ে চিঠিপত্রগুলো ভাবগম্ভীর হয়ে উঠেছে।

অফিসে চিল্লাচিল্লি চলছে। কাগজের অফিসের মজাটাই এখানে। বেশিক্ষণ বিষণ্ন হয়ে থাকার উপায় নেই। সবাই নিজের টেবিল ছেড়ে নির্বাহী সম্পাদকের রুমের সামনে ভিড় করছে, কী একটা ছবি, সবাই এক সাথে দেখতে চাইছে।

আরিফ সামনে এসে চেয়ার টেনে বসে।

আমি প্রশ্ন করি, ওখানে কী হচ্ছে ?

তাইতো এলাম, সবাই দেখছে, আর আপনার কোনো কৌতূহল নেই, আরিফ হাসে, দিব্যি কাজ করে যাচ্ছেন।

আপনারও তো কোনো কৌতূহল দেখছি না।

আরিফ বলে, বিষয়বস্তু শুনে কৌতূহল হারিয়ে ফেলেছি, এক বিবাহিতা মহিলা তার প্রেমিকের সাথে ডেটিং করতে গিয়ে খুন হয়েছে, নিউজটা কাল যাবে পত্রিকায়, আজ সবাই তার তাজা ছবি দেখছে।

আমি বড় বিমর্ষ বোধ করি। আরিফ এই পত্রিকার এসিস্টেন্ট এডিটর। ওর ব্যক্তিত্বের কারণেই অফিসের মধ্যে ওকে সবচাইতে বেশি পছন্দ করি আমি। হেসে বলি, কাণ্ড! আরিফ বিভ্রান্ত চোখে তাকায়, কার কথা বলছেন ? সেই মহিলার কথা ?

না, এত বছর পত্রিকায় কাজ করেও যখন পত্রিকার লোকজন এরকম একটা ছবির ওপর হামলে পড়ে, আমার ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে ওঠে, বড় বিচ্ছিরি লাগে।

আরিফ হাসে, যা-ই বলুন, আমাদের দেশের পৃথিবী ঘোরা ছেলেও 'পরকীয়া' শব্দটি শুনলে চনমন করে ওঠে।

আমি চিন্তিত মুখে বলি, আমি ভাবছি অন্যকথা। কাল পত্রিকায় নিউজটি বেরোলে দেখবেন, মেয়েটির খুনের ব্যাপারটি তুচ্ছ হয়ে গেছে, অনেকেই বলবে, খুন হয়েছে ভালো হয়েছে, উচিৎ শিক্ষা হয়েছে ওর। সব ছাপিয়ে পরকীয়া বিষয়টিই রসালো হয়ে উঠবে। আর এর তোপে পড়ে মেয়েটির পরিবারের কথা ভাবুন ? ওর মৃত্যুর জন্য কারো কষ্ট পাওয়ার কোনো অবকাশ থাকবে না।

সম্পাদকের রুম থেকে ডাক পড়লে আরিফ উঠে যায়। সবাই যার যার টেবিলে নিজের কাজে নিমগ্ন হয়ে পড়েছে। 'মানবিক বোধের মৃত্যু ঘটছে' শিরোনামের এক চিঠি পড়তে পড়তে আমি শায়লার কথা ভাবি। রাতে বিছানায় শুয়ে সে বেনুবালার বিষয়ে চূড়ান্ত ক্ষিপ্ততা প্রকাশ করেছিল। ওর কাছে বেনুবালার মহানুভবতাকে কঠিন এক অপরাধ বলে মনে হচ্ছে। আশ্চর্য মানুষের অনুভব। আসলে মানুষ হয়তো নিজের মধ্যে থেকে যা হারিয়ে ফেলে তা অন্যের মধ্যে দেখলে অসহ্যবোধ করে। শায়লার এই প্রবণতা আমাকে ক্রমশ বেদনাতুর করে তোলে।

আজ রাত্তিরে গলিটার ভেতর ঢুকতেই কেমন গা ছমছম করে ওঠে। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে, এর মধ্যে সারা এলাকায় বাতি নেই। ছেঁড়া পলিথিন ফুঁড়ে বৃষ্টির ছিটা আমার সালোয়ারের অনেকখানিই ভিজিয়ে দিয়েছে। আমি চোখ বাড়িয়ে দেখি, সামনেটায় এমন আলোছায়ার মিশেল, সহসা ঠাহর করা যায় না, আমি কোথায় এসেছি।

রিকশা কিছু দূর যেতেই খাড়া সোডিয়াম বাতি মেরুদণ্ড বাঁকিয়ে রেখেছে। রাস্তার জনশূন্য ভাবটাই কেমন জানি ভেতরটায় একটা শীত শীত ছায়া ঢুকিয়ে দেয়। রাত আমার কাছে নতুন কোনো বিষয় নয়, আমি যেদিন থেকে রাতের ভয়কে জয় করেছি সেদিন থেকে প্রাণের ভয় ছাড়া আমার জীবনে আর কোনো ভয় নেই। তবুও হঠাৎ কী হয়, জীবনের বিরাট বিষয়গুলো পর্যন্ত আশ্রয় দেয় না। দেখা যায়, সন্ধ্যার রোদ্দুর মরে যেতে দেখে ভয় হচ্ছে।

আজও তেমন, এক ঝাঁক ছেলে আমাকে টেনে রিকশা থেকে নামাচ্ছে, এরকম ভাবনা আতঙ্কিত করছে না। আর ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মধ্যে গলির ভেতর বাতি নেই, এই বিষয়টাই কেমন হিম করে দিচ্ছে বুক।

নীল গেটের বাড়িটার সামনে রিকশা থামে। অন্ধকারে টাকাগুলো ছুঁয়ে, চিনে, ভাড়া মিটিয়ে বেল টিপি। বড্ড দেরি হয়ে গেছে। রাস্তায় মিছিলের পেছনে আটকা পড়ায় পাক্কা এক ঘণ্টা সেখানে খেয়ে এসেছি। ভেতরে চাপা এক অস্থিরতা কাজ করে।

টানা এই ক'মাস আমি মাকে নিয়ে ভাবতে চাই নি। নানা কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে যখনই অনুভব করেছি আমার সমস্ত স্নায়ু অবশ করে দিয়ে সেই মুখ এগিয়ে আসছে, আমি কাটিকুটি করে তার ওপর প্রজাপতি এঁকেছি, নগর এঁকেছি। আমি ভুলে যেতে চেয়েছি আমার প্রাণের প্রগাঢ় নৈঃসঙ্গে বাস করা একজন নারীকে শান্তি দেয়ার যোগ্যতা আমার ছিল না। শেষ সময়টায়, বাবা যখন মফস্বলের বাড়িটা বিক্রি করে দিলেন, মা ঢাকায় আমাদের সাথে এসে থাকতে শুরু করেন, তখন পুরো সময়টাই তাঁর আধপাগলা অবস্থায় কেটেছে। তখনো আমরা বাঁচার যুদ্ধে এত ব্যস্ত ছিলাম, তাঁর যথাযোগ্য সেবাটাও করতে পারি নি।

পুত্র সন্তানের আশায় বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন। ওই ঘরে পুত্র সন্তান হয়েছে। প্রায় অনেকদিন বাবার সাথে আমাদের যোগাযোগ নেই। আজ ভোরে বাবার দ্বিতীয় স্ত্রী আমাকে প্রথমবারের মতন ফোন করে বলেছেন, বাবার শরীর খুব খারাপ, তিনি একমাত্র আমার সাথেই কিছু কথা বলতে চাইছেন।

আমি ঠাণ্ডা কণ্ঠে বলেছিলাম, আমার সময় হবে না। পরমুহূর্তে ভদ্রমহিলার কথায় আমি স্তম্ভিত হয়ে সহসা আর কথা খুঁজে পাই নি। তিনি বলেন, তুমিও যদি তাঁর মতন ব্যবহার

কর, তাহলে তো তার প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেল, একজন পাপীকে এত সহজে নিষ্কৃতি না দিলেই কি ভালো হয় না?

ভদ্রমহিলার এই একটি বাক্যে এই সংসারের চিত্রটাও আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। আজ এই বাড়িতে আসাটা আমার জন্য এত সহজ হতো না, তিনি যদি ওরকম অকপট উচ্চারণ করতে না পারতেন।

বাবার সাথে আমার শেষ দেখা হয়েছে মা'র লাশ কবরস্থ হওয়ার পর। সেই শীতের রাত্তিরের প্রতিটি মুহূর্ত আমার সর্বস্নায়ুতে গেঁথে আছে। বাবা এসে শান্ত হয়ে বসেছিলেন চেয়ারে। তার নিস্তরঙ্গ মুখ দেখে অভিব্যক্তি বোঝার উপায় ছিল না। প্রবল শীতেও তাঁর মুখটির নিচে জমছিল ঘাম। তিনি মাথা নত করে নিঃশব্দে বসেছিলেন। তার চারপাশে নানা শব্দ, নানা কথাবার্তা, কীভাবে কী হলো, কখন থেকে মা'র কষ্ট শুরু হলো, কখন নিঃশ্বাস আটকে এলো, মৃত্যুর সময় তিনি কী বলেছেন..., তিনি যেন এইসব কিছুই শুনছিলেন না, গভীর নৈঃশব্দ্যে নিজেকে সঁপে দিয়ে এমনভাবে বসেছিলেন, গাঢ় আঁধার কেটে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা বাতির নিচে, আমি দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট দেখেছিলাম তাঁর ক্লান্ত মাথা ঝুঁকে পড়ছে নিচ দিকে।

এক সময় তিনি নিজের সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, তাঁকে কেন্দ্র করে মার শেষ ইচ্ছে কী ছিল, জানতে চাইলেন। বাবার এই কথায় সবাই পরস্পরের মুখের দিকে চাইতে থাকলে আমি নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়েছিলাম।

গত কয়েক বছর মা আপনার সম্পর্কে একটা কথাও উচ্চারণ করেন নাই।

আমি বাবার মুখে দেখেছিলাম আশ্চর্য এক লোভের মৃত্যু। মানুষের বোধহয় প্রবণতা এই, যাকে আঘাত দিয়ে দিয়েও শেষ পর্যন্ত ক্ষমা পাওয়া যায়, তার কাছে নিজেকে কেন্দ্র করে মহান কোনো অনুভবই শেষ পর্যন্ত জীবিত আছে, এই গল্প শুনে ইন্দ্রিয় সুখ লাভ করা। বাবা হয়তো এই ভেবেছিলেন, মৃত্যুবধি মা তাঁর নামই নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে জপে শেষ প্রাণ ত্যাগ করেছেন।

দরজায় বেল টিপে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকি। কাজের বুয়া দরজা খুলে আমাকে ড্রয়িং রুমের সোফায় বসতে বলে ভেতরে চলে যায়। মামুলী সংসার। এক সেট বেতের সোফা, সাইডে সিঙ্গেল খাট, ছোট্ট শোকেসে কাপ-পিরিচ। দেখতে দেখতে দেয়ালে চোখ যায়। হাস্যোজ্জ্বল এক কিশোরের ছবি। এই তাহলে সেই বিখ্যাত বংশের বাতি। এই ছবি দেখেই আমার ভেতর অদ্ভুত এক চাপা যন্ত্রণা শুরু হয়। আমার তীব্র, ঘৃণিত চোখ সেই কিশোরের হাসিকে বিদ্ধ করতে থাকলে নিজেকে সামলাতে আমি মাথা চেপে ধরি নিচ দিকে।

আমাদের সেই শ্যাওলা ঘেরা বাড়ির পেছনে দিঘি, দিঘির ওপর পদ্ম, আর উড়ে আসা বুনোপাতা, খড়বিচালি, আসন্ন সন্ধ্যায় সায়রাবু ঘাটে কাপড় রেখে ব্লাউজ পেটিকোটে নেমে পড়েছে জলে, তরঙ্গ উঠছে... তরঙ্গ উঠছে... সায়রা নেই... এক সময় গুচ্ছ পদ্মের মাঝখানে ভুস... আমাকে ডাকে আয়... আয়... আমি যে সাঁতার জানি না, জলকে আমার মহাপৃথিবীর মতন ভয়ঙ্কর মনে হয়।

সিঁড়ি দিয়ে এক পা দুই পা নামি।

তক্ষুণি ভুস... হায় রে আঁধার নামছে ধরিত্রীতে... বুবুকে কোথায় খুঁজি? আজ কোন কুহকের টানে তার এই উথাল পাথাল? জলের মধ্যে সাপের মতন মাথা বের করে সায়রাবু

হাঁটে, আমি দেখি, ভয়ে ভয়ে দেখি, দূরের ছ্যাতলা পড়া দেয়ালের ওপর বসেছে জন্তুর মতন একজন মানুষ, সেই বয়সে গোঁফ আর বুকে লোম মানুষকে বড় ভয় হতো, দেখে চিল্লাতে যাব, জলের মধ্যে হিস হিস তরঙ্গ ফেলে বুবুর সে.কী হাসি, লোকটি ঢিল ছোড়ে, বুবু ছোড়ে জল, আমি দেখি, ভয়ে ভয়ে দেখি, অকস্মাৎ জল থেকে ঘাই দিয়ে উঠে বুবু তাকে ভেজা স্তন দেখাচ্ছে...।

মা এসে নিঃশব্দে দাঁড়ান।

তাঁর চোখ নিরুত্তাপ। আমার হাত চেপে বলেন, এক এক করে চইলা গেলে বাঁচি। চইলা গেলে বাঁচি।

মাথার ওপর বাবা তখনো ছিলেন। হিংস্র, ক্রূর। আমাদের না পারেন রাখতে, না পারেন ফেলতে। ঘরে ফিরে ভাত খেয়ে বিছানায় সটান শুয়ে পড়েন। তিনি বাড়িতে এলে কবর স্তব্ধতা নেমে আসত। তখনই এক রাতে, মা'র কাছে ফিসফিস শুনি, আমাকে গর্ভে মেরে ফেলার জন্য বাবা কত গাছের রস, কত গরমজল মা-কে খাইয়েছেন। এক রাতে মায়ের পেটের ওপর ভয়ানকভাবে চেপে বসেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, স্বপ্নে দেখছি গর্ভের সন্তান কন্যা। মা আর্তনাদ করতে করতে বলেন, যদি পুত্র হয়? যদি হয়?

এরপর আমার জন্ম।

মা'র কোল থেকে খাবলা মেরে নিয়ে বাবা আমাকে বিছানার ওপর ঝপাৎ শব্দে ফেলে দিয়েছিলেন।

শুনতে শুনতে ভুলে গিয়েছিলাম, জন্মের সাধ কী, মৃত্যুর ভয় কী? ঘৃণা কী, আনন্দ কী? জেনেছিলাম পৃথিবী শাসন করছেন ভয়াল শক্তির অধিকারী সৃষ্টিকর্তা, এরপর আমাদের জীবনের অধিকর্তা আমাদের জনক। তাঁর ভ্রূণে আমাদের জন্ম বলে তিনি আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রাণ নিয়ে যা খুশি তা-ই করার ক্ষমতা রাখেন, আমরা বাবাকে সেই ভাবেই নিয়েছিলাম। সর্বশেষ বোনটি, আফসানা, ওর জন্মের পর বাবা যখন অন্যত্র চলে গেলেন, বিয়ে করে, আমাদের সে-কী আনন্দ! রাতভর আনন্দময় হট্টগোলের মাঝখানে আমরা ভেবেই পাচ্ছিলাম না, মা'র এতে এত কান্নার কী আছে?

সায়রাবু বলেছিল— তখন সে কলেজে, শরীর বেচব। দ্বিতীয় বোন দিলারা, মা'র অবসন্ন দেহ নিজের ঘাড়ে ফেলে বলেছিল, টিউশনি করব।

আমি বলেছিলাম, পাতা কুড়ায়া বেচব।

আমার ছোট শায়লা, বলেছিল, ভিক্ষা করব... কেবল তার ছোট আফসানা মা'র বিপদটা বুঝছিল, আঁতুড় ঘরে সে-কী তার গলাফাটা চিৎকার!

সেইসব মুহূর্তে মা'র গলায় কী করে যে সুর উঠত, আর সখী কন্যাগো। জননীগো... কোনোদিন গানের অর্থ খুঁজি নি, কন্যা জননী কী করে সখী হয়, ধান ভেঙে কী করে মুক্তো হয়। চিরকাল এক ঘেয়ে একটা সুর শুনে গেছি শুধু।

ভেতর থেকে বেরিয়ে আসেন মাঝবয়সী এক মহিলা। আমাকে বলেন, বড় খুশি হলাম তুমি এসেছ।

আমি নিঃশব্দে নখ খুঁটতে থাকি।

দেখতে তিনি খুবই কুশ্রী। কালো চামড়ার মধ্যে মেচতার ছোপ ছোপ দাগ। কমলা রঙের শাড়ির মধ্যেও রুচির কোনো চিহ্ন নেই। তবুও তিনি এই জীবনের হিসেবে জিতে আছেন, তিনি আমাদের বাবার সেই কাঙ্ক্ষিত পুত্রের অহঙ্কারী জননী। তিনি বলেন, তোমার বাবা খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছেন। আমি আঙুলে ওড়না পেঁচিয়ে দেয়ালের দিকে চেয়ে থাকি। কিছুক্ষণ নীরবতা। আমার ভেতর উৎসারিত দ্রুত নিঃশ্বাসের ঝাপটায় সামনেটা ছায়া হয়ে যায়। তিনি আমাকে ভেতরে নিয়ে চলেন।

ক্ষুদে রুম। এরমধ্যে অবিন্যস্ত বিছানার সাথে বাবার পাতলা দেহটা মিশে আছে। এই সেই অসীম শক্তিমান, বোঝার বয়স থেকে যার ভয় আমরা কাটাতে পারি নি। সামনের টেলিভিশনে কারিশমা কাপুর নাচছিল। বাবা কম্পিত আঙুলে রিমোট কন্ট্রোলে চাপ দেন। ওই যে হয় না, জীবনের সব ভয় কাটালেও মানুষের এমন কিছু ভয় থাকে, যা থেকে অনেক শক্তিধর মানুষও বেরোতে পারে না। কারো শুঁয়োপোকাকে ভয়, সাপকে ভয়, কারো রাতকে ভয়। আমি বহুদিন পর বাবাকে দেখে ঘৃণা আর অনীহার বদলে স্নায়ুর মধ্যে এক ছমছম ভয় অনুভব করি।

তিনি বালিশ থেকে মাথা উঠানোর চেষ্টা করলে আমি অস্ফুট স্বরে বলি, আপনি শুয়ে থাকুন। এদের পুত্র সন্তানটিকে বড় দেখতে ইচ্ছে হয়। ভদ্রমহিলা এ ঘরে এক অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে আমাকে ফেলে কোথায় চলে গেছেন। ফ্যাকাসে বাতির নিচে বাবার খোঁচা দাড়ির মুখটিকে বড় বুড়োটে দেখাচ্ছে। যতটা অসুস্থ ভেবেছিলাম, ততটা খারাপ অবস্থায় তিনি নেই। তবে কেন আমাকে ডেকেছেন ? এইবার ভিন্ন এক প্রশ্ন আমার ভেতরটাকে নিঃসাড় করে ফেলে। আমার মধ্যে এদের কোনো রকম কথা শোনার মতন বিন্দুমাত্র প্রস্তুতি নেই। বাইরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বাবা পিঠ উঠিয়ে জানালার পাল্লা লাগাতে থাকলে আমি অস্থির বোধ করি।

রাতে তুমি খেয়ে যাবে— ভেতর থেকে রমণী চেঁচিয়ে বলেন, এবং প্রত্যুত্তরে আমি এত সশব্দে না বলি, সেই নির্জন ঘরে আমার এই প্রতিবাদ নিজের কানেই বড় ভয়ঙ্কর ঠেকে।

বাবা কিছু বলার জন্য উসখুস করছেন। কী বলতে চান তিনি ? এক জীবনের অপরাধ একবারের দুঃখ প্রকাশের মধ্যে দিয়ে সমস্ত মুছে ফেলতে চান ? নইলে কী ? আমার যে অসহ্য ঠেকছে। মনে হচ্ছে আর এক মুহূর্ত তার সামনে বসে থাকলে দম আটকে মরে যাব।

দোষ আমার একার ছিল না— এইভাবে শুরু করেন তিনি, তোমার মা চিরকাল তোমাদের সামনে আমার কুৎসিত রূপই তুইলা ধরছে—

বড় আজব লাগে তাঁর কথা, যাহোক তিনি শুরু করতে পেরেছেন, এইবার আমার নিঃশব্দে শোনার পালা। তিনি জোরে কাশেন, জোরে নিঃশ্বাস টানেন, ফের শুরু করেন— তোমরা এখন বড় হইছ। তখন ছোট ছিলা। আমার ক্রুদ্ধতা দেখছ, রাগ দেখছ। কেন আমার এই রাগ, কেন যন্ত্রণা, তখন তোমরা তা বুঝতে পারতা না বইলা আমারেই ঘৃণা করছ, অপছন্দ করছ।

জানালার পাল্লা খুলে গেছে।

ঝিরিঝিরি বৃষ্টি এসে বাবার পাশের তোশক ভিজিয়ে দিচ্ছে। আমার সামনে সশব্দে এগিয়ে আসে সেই দৃশ্য... নিঝঝুম এক দুপুর... আমি ভয়ার্ত পথে চলছি... মা... মা... বাবার হিংস্র আঙুলের চাপে নিশ্চল হয়ে নিচে পড়ে গেল একটা দেহ— আমার কলজে থেকে

বিষ নিংড়ে পড়ে, আমার কানে কোনো শব্দ পৌছায় না, আমি জানালার বাইরের আলোজলের দিকে ঠায় চেয়ে থাকি, দিলারা আমার হাত চেপে ধরে, নীলুফার চল পালাই, এ বাড়িতে থাকলে মইরা যাব।

ক্যান মইরা যামু?

তুই বুঝবি না। সায়রা পলাইছে— আমি পলামু, এইখানে থাকলে দম আটকায়া মইরা যামু।

তখনো বাবা কিছু কিছু টাকা পাঠাতেন। এছাড়া চিরঅবিবাহিত শওকত মামা নিয়েছিলেন আমাদের পরিবারের দায়িত্ব। মাটি কামড়ে বাঁচতে হয় নি আমাদের। তবুও কেন নিঃশ্বাস বন্ধের প্রশ্ন? দিলারা বলত, সব তুই বুঝবি না— বড় ঘেন্নার, বড় লজ্জার এই বাঁচা।

ভাবতে ভাবতে তল থেকে উঠি।

শওকতের সাথে তোমার মা'র অবৈধ সম্পর্ক ছিল— এমন আচমকা, এমন নাটকীয় ভাবে বাবা এই প্রসঙ্গটা তোলেন, আমার সশব্দে চমকে ওঠাটাই স্বাভাবিক ছিল। তিনি এরকম একটা গুমোট বিষয় ভেতর থেকে বের করতে পেরে এমন স্বস্তি লাভ করেন, আমি স্পষ্ট দেখি মুহূর্তে আমার প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য তিনি টানটান উঠে বসেছেন। আমি এইবার সরাসরি বাবার মুখের দিকে তাকাই।

আমার চোখ নিস্তরঙ্গ। অভিব্যক্তিতে নিস্পৃহতা।

তোমাদের দুর্ভাগ্য তোমরা একটা পচা গর্ভ থাইকা জন্ম নিছ। কেন তোমাদের প্রতি আমার মায়া থাকবে? আমি কি জানি তোমাদের মধ্যে কে কে আমার সন্তান আর...।

কাঁধে ব্যাগ নিয়ে আমি সশব্দে দাঁড়াই।

তিনি আমার এই আচরণে হতচকিত হয়ে পড়েন। আমি ছুটতে ছুটতে ড্রয়িং রুমের ছিটকিনি খুলে বৃষ্টিবহুল অন্ধকার নগরীতে নেমে আসি।

প্রায় ভিজে ডুবো হয়ে ঘরে এসে দেখি, আফসানার জ্বর উঠেছে। খালা ওর কপালে জলপট্টি দিচ্ছে। সারা রাস্তায় রিকশায় অয়েলক্লথ মাথা অব্দি টেনে নিজেকে আড়াল করেছিলাম, ভেবেছিলাম, বাসায় এসে অঝোরে কেঁদে নিজেকে হালকা করে নেব। কিন্তু আফসানার জ্বর আমার প্রাণে চেপে বসা দুঃসহ বোধের অনেকটাই গিলে ফেলে। থার্মোমিটার দিয়ে মেপে দেখি একশ তিন।

খালা বলে, তোমার বাবার শরীর কেমন?

অস্পষ্ট স্বরে 'ভালো' বলে কাপড় চোপড় নিয়ে বাথরুমে ঢুকি। শাওয়ারের অঝোর জলের তলায় নিজেকে হালকা করে বেরিয়ে আফসানার সারা শরীর ভেজা কাপড় দিয়ে স্পঞ্জ করে দিই। বিবর্ণ, ক্লান্ত স্বরে সে বার বার একটি শব্দ উচ্চারণ করছে— মা! মা!

নাহ্।

আমি এইসব শব্দের চক্র থেকে বেরোতে চাই। ছটফট করে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতেই ঝমঝম বৃষ্টি পড়তে শুরু করে। সারাদিনের ফিসফিসে কান্না এইবার অঝোর শব্দে ভেঙে পড়ে। আমার নিজের মধ্যেও চাপ অনুভব করি কিন্তু নিজেকে ছেড়ে দিয়ে টের পাই,

বেদনাটা কেমন মরে গেছে। গ্রীল উপচে উত্তাল বৃষ্টিপুঞ্জে হাত পাঠিয়ে দিই। বৃষ্টির জল প্রশ্রয় পেয়ে কাঁধ অব্দি চলে আসে।

চতুর্পাশ গাঢ় কৃষ্ণ মেঘে ছায়া করে বৃষ্টি ঝরতে থাকে।

এর মধ্যেই বেল বেজে ওঠে।

আমি চমকে উঠি, কে ?

আমি! আমি! বৃষ্টি ভেজা জলজ কণ্ঠ ভেসে আসে। দরজা খুলে দিলে আধভেজা শায়েদ ঘরে ঢোকে। আমি অবাক হয়ে বলি, তুমি এ সময়ে কোত্থেকে ? বলতে বলতে মাথা থেকে টাওয়াল খুলে দিই। চুল মুখ মুছতে মুছতে শায়েদ বলে, আমার বৃত্ত তো একটাই, ঘোর খেতে খেতে দেখি, বার বার এক বিন্দুতে এসে আটকে যাচ্ছি।

বৃত্তটা ভেঙে ফেল— বলতে বলতে আমি ভেতর থেকে চেয়ার টেনে নিয়ে আসি।

এই ঘোর বৃষ্টির রাতে সেটা ভাঙতেই তো এলাম, বলে চেয়ারে বসে শায়েদ— আহারে কী বৃষ্টি, আমি তো ধরেই নিয়েছি এরকম সময়টায় তুমি খুব আলুথালু হয়ে থাকবে।

বলতে বলতে আমার শীতল হাত শায়েদ তার উষ্ণ তালুর মধ্যে টেনে নেয়। মরা বেদনাটাকে ভিজিয়ে বড় শব্দ করে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। বাতাসের সশব্দ নিনাদ, জলস্রোত এলোমেলো করে দিচ্ছে। ফাঁকে ফাঁকে বিদ্যুতের ফলা সামনের বৃক্ষময় বাড়িটাকে চমকে চমকে জ্বালিয়ে দিচ্ছে। আমার চোখ জ্বালা করে। শায়েদ পরম গভীরতায় তার মুখ আমার ঠোঁটের কাছে নিয়ে এলে বাবার পাণ্ডুর মুখটা ঘাই দিয়ে জেগে ওঠে। আমি হকচকিয়ে সরে যাই, শায়েদ— না।

না ? শায়েদ অবাক— নীলুফার কী হয়েছে তোমার ? এরকম পাগল বৃষ্টিও তোমাকে... ?

আফসানার জ্বর! কঠিন মুখে বলে আমি যুদ্ধরত বৃক্ষগুলোর দিকে তাকাই। ভিজে একশা হয়ে দূরের সোডিয়াম বাতি মেরুদণ্ড বাঁকা করে নিচ দিকে চেয়ে আছে। আমার হাত ছেড়ে শায়েদ ভেতরে যায়, আফসানার জ্বর, আমাকে আগে বলবে না ? তুমি নীলুফার ওকে রেখে বারান্দায় বসে আছ কেন ?

ওর এই নিজেকে সামলে নেয়ার ব্যবহারটুকু আমাকে মুগ্ধ করে। আমি চেয়ারে ঠায় বসে থাকি। সায়রাবু সারারাত জলের মধ্যে সাঁতার কাটে... আমি দেখি, বৃষ্টির তোড়ে সামনের নারকেল গাছটা হেলে পড়তে চাইছে জাম গাছটার মাথার ওপরে... আফসানা আধো বারান্দায় দাঁড়িয়ে বলছে, বাথরুমে যেতে ভয় করছে মা... সামনের ছ্যাতলা পড়া বিল্ডিংগুলো গোবেচারার মতন ভিজছে, গৃহশিক্ষকের কম্পিত হাত টেনে নিচ্ছে দিলারার ভয়ার্ত আঙুল... সাঁই সাঁই বেগে আসা জলের স্রোতে আমি ভিজে যাচ্ছি... শায়লা বলছে, মা দেইখো, আমি ঠিক বাবার ঘুমন্ত মুখের ওপর একদিন বালিশ চাইপ্যা ধরব... শায়েদ এসে বলে, তুমি তো একদম ভিজে গিয়েছ, তোমার আজ কী হয়েছে নীলুফার ?

আমি ওর হাত চেপে ধরি, আমি কেন পালাতে পারি না শায়েদ ? সবাই সব ভুলে যায়, আমি কেন পারি না ?

এই জন্যই তো তুমি অন্যরকম, শায়েদ আমার মাথা ওর শরীরের কাছে টেনে নেয়। আমি জানি না তুমি কোন বিষয়ে কথা বলছ। তবুও সময়টা বড় খারাপ হয়ে গেছে নীলু,

ভান দিয়ে, ভণিতা দিয়ে, মিথ্যা দিয়ে সবাই নিজের গভীর প্রাণের জায়গাগুলোকে নষ্ট করে ফেলছে। সবাই পালাচ্ছে, সবাই ভুলে যাচ্ছে। এটা তো কোনো সুস্থ কথা নয়, তুমি যে নিজের সাথে পেরে ওঠো না, সহজ সুখে বাঁচার স্বপ্নে কোনোকিছু থেকে পালাও না, তোমার এই বিষয়টাই আমাকে বড় টানে, আমি নিজেও পলায়নবাদী, আমি আমাকে ঘেন্না করি নীলু।

আমি ওকে আঁকড়ে ধরি।

শায়েদ বারান্দার দরজা বন্ধ করে আমার ভেজা শরীরের সাথে নিজের শরীরটা চেপে ধরে। আর আশ্চর্য... বরাবরের মতোই এতে আমার মধ্যে থেকে চূড়ান্ত কোনো অনুভব স্ফুলিঙ্গের জন্ম হয় না। ওর স্পর্শ আমাকে উন্মাদ করে না, ঘোরে ফেলে দেয় না, আমার কাছে এ বরং এক স্থির মজা, যা আমি খুব স্বাভাবিকভাবে উপভোগ করি। কিছুক্ষণ পর ভেতরে খালার কথা মনে পড়ে।

মনে পড়ে আফসানার জ্বরের কথা। নিজেকে সন্তর্পণে ছাড়িয়ে আমি ফের শায়েদের সাথে দর কষাকষির জায়গায় গিয়ে পড়ি, একটা কিছু কর শায়েদ, নিজেকে পলায়নবাদী বলে ছেড়ে দিও না। আমার কি পৃথিবীতে একটা জায়গাও থাকবে না, যেখানে আমি নির্ভর করতে পারি ?

শায়েদ বিমর্ষ হয়ে পড়ে।

বৃষ্টি থেমে গেছে। আমি আর শায়েদ অবাক চোখে দেখি, সেই নির্জন বাড়ির রহস্যময়ী মহিলা স্থানুর মতো বাসার সামনের প্রকাণ্ড পাথরের ওপর বসে আছে। বৃষ্টির ঘোর কেটে যাওয়ায় সামনেটায় অনেক আলো এসে ভর করেছে। এতক্ষণ এইভাবে বসে তুমুল বৃষ্টিতে ভিজেছে সে। বৃষ্টি কমে যাওয়ার পরও তার এই চেতনারহিত অবস্থা আমাকে বিস্ময়ের চূড়ান্তে নিয়ে ফেলে। আমি শায়েদকে বলি, আমি যেভাবেই হোক ওর কাছে যাব, ওর ব্যাপারটা আমাকে বুঝতে হবে। শায়েদ অভিভূত হয়ে এমনভাবে তাকিয়ে থাকে, যেন সে কোনো দুর্লভ প্রস্তর মূর্তি দেখছে।

আমি ছটফট করে বলি, আসলে ভড়ং। ও আসলে টের পায় আমরা ওকে দেখি, সেই জন্যই—।

শায়েদ দরজা খুলে চলে যেতে যেতে বলল, আজকের সারাদিনের প্রাপ্তি তোমার এই ছোট্ট ঈর্ষার প্রকাশটুকু। আজ রাতটা আমি এটা নিয়েই গেলাম।

অনেক অনেক রাতে ঘরে ফিরে শায়লা কান্নায় ভেঙে পড়ে। আমি নিঃশব্দে ওর পাশে বসে ওকে কাঁদতে দিই। ক'দিন যাবৎ অমানবিক পরিশ্রম যাচ্ছে ওর। চোখের নিচে কালসিটে দাগ পড়েছে। আমি যে বর্বর জীবনটা যাপন করতে না পেরে নিজেকে সেখান থেকে উত্তরিত করেছি, শায়লা সেই জীবনটাকেই নিজের স্বাভাবিক জীবন হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। আমার বড় অপরাধবোধ হয়। বিশেষ করে ওর মতো শক্ত ধাতের মেয়েকে আজ কাঁদতে দেখে অজানা আশঙ্কায়, দুর্মর বেদনায় আমার হাত পা অসাড় হয়ে আসে।

স্নান সেরে এসে সে ক্লান্তিতে বিছানায় ঢলে পড়ে। আমি ওর হাত আঁকড়ে ধরি, কী হয়েছে শায়লা ?

কিছু না, বলে সে পাশ ফিরে শোয়।

ওর হাত ছেড়ে দিয়ে ফের আমি অন্য যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়ি, আমাকে কি ও স্বার্থপর ভাবতে শুরু করেছে? একই সংসারে আমরা সমান সুবিধা, সমান অধিকার ভোগ করি, অথচ এর জন্য ওকে আমার চেয়ে চারগুণ বেশি শ্রম দিতে হচ্ছে। বাড়িওয়ালার পরিবার বিদেশ যাওয়ার আগে ফোনটা আমাদের জিম্মায় রেখে গেছে। তারা ফিরে এলে আবার ফেরত দিতে হবে। শায়লা এই ফোনটার ঘোর বিরোধী ছিল। মাসে মাসে খামোখা কিছু বিল গুনতে হয়। আমি ফোনটা নিখরচায় পাওয়ার মোহে বিলের বিষয়টা কষ্ট করে মেনে নিয়েছি। এই মুহূর্তে এই কারণেও অপরাধ বোধ হয়। আমি অস্থির স্বরে বলি— চাকরিটা তুই ছেড়ে দে।

অবসন্ন দেহটা টেনে তুলে শায়লা দেয়ালে ঠেস দিয়ে শোয়। এরপর আশ্চর্য ভঙ্গিতে হাসে, তুমি আমারে খাওয়াইবা?

সেই কথা হইতেছে কেন? অন্য কোনো কাজ, অন্য কোনো—

আমার যা পড়াশোনা, আয়ার কাজ নিতে পারি, তাতে যদি সমাজে তোমাদের কোনো অসুবিধা না হয়।

শায়লা, কেন ঘোল পাকাইতেছস? কী হইছে তা-ই বল!

এরপর শায়লার কাছে আমি যা শুনি, এরচেয়ে ভয়াবহ জীবন আমি পেরিয়ে এসেছি। বিশেষত যখন মফস্বল থেকে ঢাকায় এসেছি। সেই সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত প্রতিটি পর্যায় মনে হলে এখনো আমার কলজের মধ্যে হু হু শীত ঢোকে। কিন্তু তারপরও সংবেদনশীল মানুষের অনুভব হয়তো হাজার ঘা-য়েও ভোঁতা হয় না। আমি নিজেকে তা-ই জানি। আজ শায়লাকে কাঁদতে দেখে আমি শেষ পর্যন্ত বড় স্বস্তি পেলাম। ওর সব অনুভব এখনো তাহলে মরে যায় নি।

সকাল থেকে টানা রাত দুটো পর্যন্ত কাজ করে শায়লারা যথারীতি দলবেঁধে ফিরছিল। সবাই যার যার আস্তানায় ফিরে গেলে গলির মাথায় শামীমা আর শায়লা এসে একা হয়ে যায়। টহল পুলিশ এসে দু'জনকে চার্জ করে, এত রাতে তারা কোত্থেকে ফিরছে? শায়লা বলে, আমরা গার্মেন্টিসে কাজ করি। রোজ রাতেই তো ফিরি। পুলিশ বলে, কোনো ভদ্রমেয়ে রাত দুটোয় রাস্তায় থাকে না। এরপর সে জানতে চায়, ওরা যে গার্মেন্টিসেই কাজ করে তার প্রমাণ কী?

শায়লা যথারীতি ব্যাগ খুলে আইডেন্টি কার্ড দেখায়। গার্মেন্টিসের লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের মতন শামীমার কোনো আইডেন্টি কার্ড ছিল না। শামীমা বলে, আমি অনেকদিন যাবৎ গার্মেন্টিসে কাজ করি, ওরা হাজার বলা সত্ত্বেও আমাকে কার্ড দিচ্ছে না। পুলিশ শামীমার হাত চেপে ধরে বলে, বেশ্যা! এরপর শায়লার দিকে ফেরে— ওকে আমরা আটকে রাখছি, আপনি চলে যান। পুরো ঘটনায় হতবিহ্বল শামীমা কাঁদতে শুরু করলে পুলিশ ওকে টানতে টানতে নিজেদের আস্তানার দিকে নিতে শুরু করে। শায়লার মাথায় রক্ত চড়ে যায়, সে রাস্তা থেকে ইট তুলে পুলিশের দিকে ছুঁড়ে মারলে শামীমাকে ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে সে শায়লার কাছে ছুটে আসে। বৃষ্টি ধোয়া নির্জন রাস্তায় পুলিশ শায়লাকে গলা চেপে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলতে চাইলে বাকি দু'জন পুলিশ এসে তাকে উদ্ধার করে।

দেয়ালে ঠেস দিয়ে শায়লা ফের কাঁদতে থাকে, বুবু, বেশ্যা! আমরা বেশ্যা, না? কী ঘেন্না এই বাঁচার মধ্যে! থু থু দেই নিজের জীবনরে। থু থু দেই!

আমি ওর মাথাটা টেনে বুকের মধ্যে নিই, তুই আবার পুলিশের খপ্পরে পড়লি? আবার? আমার হাতে পত্রিকা আছে, কলম আছে, আমি এইসব নিয়া লিখব। আমি ওদের ছাড়ব না!

কী যে কথা কও তুমি, পত্রিকা দিয়া কলম দিয়া প্রতিশোধ নিবা? কারো কিচ্ছু হবে না। মাঝখান থাইকা কিন্তু পাঠক রসালো কাহিনী পইড়া মজা পাইব। বুবু, তুমি যদি দেখতা শামীমার অবস্থা। শরীর খারাপ নিয়া কাজ কইরা যাইতেছে। কাজ শেষে যখন ফিরতেছে ও রীতিমতো ঢুলতেছিল, আমারে বলছিল, এই রাস্তায় ঘুমায়া পড়ি? সেই অবস্থায় এসে পুলিশের সাথে হুজ্জত। ঘরের সামনে এসে বমি করতে করতে জানো সে-কী করুণ চোখে তাকাইছিল আমার দিকে, বলছিল, বেশ্যা! এইটা কি আমার জন্য নতুন কোনো শব্দ? এই যে এত রাত কইরা ফিরি, রোজ রাইতে ঘরেই শুনি আমি সেই শব্দ! এই যে শরীর আমার ঢইলা পড়তেছে, বাবা বলবে, আজকে গায়ে কয় ব্যাটারে উঠাইছস? বলবে, আমরা তো ভাত খাই না, রক্ত খাই, পেশাব খাই। শায়লার মুখে এইসব কথা শুনতে শুনতে আমি শক্ত করে ওর হাত চেপে ধরি, থাম! থাম! আমি সহ্য করতে পারতেছি না।

বিকেলে নিচতলা থেকে ছাত্রী দু'টি আসে। খালা আচার তৈরি করছেন। আমি ছাত্রীদের পড়িয়ে সন্ধে হলে বারান্দায় গিয়ে বসি। দিনের অন্তিম সময়। ধীরে ধীরে কেউ গুটিয়ে নিচ্ছে চাদর আর তাতেই কোরাসময় পৃথিবীর মধ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছে অসহ্য ছায়াবেদনা। রেলিংয়ে মাথা ঠেকিয়ে আমি কাঠের সিঁড়ি টপকে টপকে কোথায় যে নামতে থাকি!

আমার শৈশবের শ্যাওলা ঘেরা বাড়িটায় যেন সারা বছর শীত লেগে থাকত। সেখানকার স্মৃতি মনে হলেই শীতের দিনগুলো ছাড়া আর কিচ্ছু তেমনভাবে মনে পড়ে না। শৈশব থেকে বুঝে ওঠার বয়সটাতে স্মরণে আসে যে স্মৃতি, তা-ও শীতকালের। সায়রাবুর আঙুল চেপে ছোট্ট পথটা ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমি দেখেছিলাম আকাশে নানা রঙের ঘুড্ডি উড়ছে। কী লোভনীয়! কী কাঙ্ক্ষিত! দেখতে দেখতে মস্ত এক হোঁচট খেয়েছিলাম। আর মনে পড়ে সন্ধ্যাগুলোর কথা। অন্ধ দাদি টানা ডেকে যেতেন— অ...বউ। বাতি দে ঘরে। একা কোথাও যাওয়া হতো না। সেই দাদি মারা গেছে কবে মনেও পড়ে না। একদিন কেমন সীমানা ভাঙার ইচ্ছে জাগল মনে। পাড়া পেরিয়ে কী এক আচ্ছন্নতার মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর গিয়ে আমি অনুভব করেছিলাম, বাড়ির পথ হারিয়ে ফেলেছি। কী ভয়ঙ্কর সেই অনুভূতি! মনে হচ্ছিল আস্ত শহর আমাকে হাঁ হাঁ করে গিলতে আসছে। ভয়ে চোখের কান্না শুকিয়ে গিয়েছিল। এরপর দই-অলার পেছন পেছন হেঁটে কিছুদূর, রিকশার পেছনে ঝুলতে ঝুলতে কিছুদূর, ছোট্ট মিছিলের পেছন পেছন হেঁটে কিছুদূর। আমি যত এসব করছিলাম তত আমার বাড়ির পথটায় লেগে যাচ্ছিল অন্ধ গিঁট। একসময় চারপাশে সন্ধ্যা নেমে এলো। উস্কো চুলে জমতে শুরু করল কুয়াশা। এক বাড়ির সিঁড়ির মধ্যে বসে হাউমাউ শব্দে কেঁদে ওঠার সময়টাতেই চোখে পড়েছিল হন্তদন্ত শওকত মামার হেঁটে যাওয়ার দৃশ্য। সেই দৃশ্যটা এখনো আমার চোখে প্রচণ্ড জীবন্ত। ভয়ে আধখানা হয়ে গিয়েছিলাম আমি। কিন্তু আমাকে পাওয়ার আনন্দে শওকত মামা এত অভিভূত হয়েছিলেন, দোকান থেকে তিনি কয়েক সের গরম জিলিপি কিনেছিলেন। শওকত মামা তখনো স্থায়ীভাবে আমাদের মাথার ওপর এসে দাঁড়ান নি। তখনো বাবা ছিলেন। মামা মাঝে মধ্যে এসে আমাদের বাসায় উৎসব লাগিয়ে দিতেন।

ছিন্নভিন্ন ভেসে আসে নানা দৃশ্যছবি।

বড়বোন সায়রা কলেজে পড়ত।

মেঝো বোন দিলারা ক্লাস টেনে।

আমাদের সংসারে কোনো পুত্র সন্তান ছিল না বলে, এবং ওই একটি প্রধান কারণে আমাদের জীবনে কোনো শান্তি ছিল না। বাবার মেজাজ সারাক্ষণ তিরিক্ষি হয়ে থাকত। তিনি ঘরে এলেই আমাদের হাসির শব্দ থেমে যেত। শুধু মেয়ে হয়ে জন্মানোর অপরাধে আমরা কুঁকড়ে থাকতাম। মাথার ওপর ঢেউ খেতে খেতে যাচ্ছে যখন সেসব দিন, আমি বড় হচ্ছি, আমার আড়ষ্টতা বাড়ছে, লজ্জা বাড়ছে, ছেলেদের শিস শুনে হতচকিত হাত থেকে খুলে পড়ছে বই, সায়রাবুর সাথে দেখা করতে আমাদের বাড়িতে এলো এক ছেলে।

শাদা কাগজে কাটা কম্পাস দিয়ে বৃত্ত আঁকছিলাম। তখনো সন্ধ্যা। হারিকেনের সতেজ সলতে সবে পাকতে শুরু করেছে, আমি বাইরের ঘরে টেবিলে উবু হয়েছিলাম, হঠাৎ মাথা তুলতেই পুরো বৃত্তটা টাল খেয়ে চৌকো হয়ে গেল।

ফিনফিনে পাঞ্জাবি, পাতলা গোঁফ... বিব্রত মুখে বলল, আমি রঞ্জন, বাসায় সায়রা আছে?

কেন যে সেই ছেলেটাকে প্রথম দেখে আমি এতটা কুণ্ঠিত হয়ে উঠেছিলাম, কেন যে রক্ত জমেছিল মুখে, কেন যে কথা লোপ পেয়েছিল আর নিজেকে জীবনে প্রথম মনে হচ্ছিল অসুন্দর, পরবর্তী জীবনে অনেক ঘেঁটেও সেই যুক্তিহীন ঢেউয়ের অর্থ উদ্ধার করতে পারি নি। ওকে বসতে বলতে পর্যন্ত ভুলে গিয়ে আমি নিজেকে উড়িয়ে আতাফল গাছের তলায় নিয়ে গিয়ে বিমূঢ় হয়ে বসেছিলাম। চারপাশে রাত ঘনিয়ে এলে অজানা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে যখন আমি দরজায় পা রেখেছি, সায়রার সে-কী চিল্লাচিল্লি, ছিঃ নীলুফার! এই শিখছস? একজন গেস্ট আসছে আমার কাছে, আমারে খবর দিবি না?

কী যে কী হয়ে গেল। ভেতরে সারাক্ষণ চাপা অস্থিরতা। কে সে? কোথায় তার বাস?

ইস্কুলে যেতে যেতে পা ভারি হয়ে যায়। আপার পড়া কানে যায় না। প্রাণ ফেটে যায় তবুও সায়রাবুকে জিজ্ঞেস করা যায় না, তার বৃত্তান্ত কী?

এ-ই বোধ হয়, যেভাবে দেহের মধ্যে নানারকম গাছপালা হয়, ভেতরে জমা হয় লজ্জা, ভয়, গ্লানি, সেইভাবেই কখনো যুক্তিহীন প্রেমও আসে। আমি তখন কিছুতেই বুঝে উঠতে পারতাম না, আসলে আমি কী চাইছি। লুকিয়ে আয়নায় মুখ ফেলে নিজেকে খুঁটে খুঁটে দেখতাম, চোখে কাজলের রেখা টানতাম, আর অপেক্ষা করতাম, আর একদিন যদি আসে?

মা আমার এই পরিবর্তনে খুব অবাক হলেন। বিশেষত ফার্স্ট টার্ম পরীক্ষায় যখন আমি অকল্পনীয় খারাপ রেজাল্ট করলাম, তখন বাড়িতে আমার অবস্থা গুরুতর হয়ে উঠল। বাবা নিজে নিলেন আমাকে পড়ানোর দায়িত্ব, কিন্তু কিছুতেই বৃত্ত আর গোল হয় না। নিঃশ্বাস আটকে আমি বাবার কথায় মন দিতে চাই, কিন্তু ছায়ার মতো ভাসতে ভাসতে সেই মুখ এসে সব অসাড় করে দেয়।

বাবা আমার গালে কষে থাপ্পড় বসালেন। আমার পৃথিবী শূন্য হয়ে গেল।

নিজেকে বিন্যস্ত করে ফের যখন সবকিছুতে আমি মন দিতে শুরু করেছি, ইস্কুল থেকে ফেরার পথে তালগাছের নিচে দেখা। আমি বই বুকে চেপে নিজেকে সামলাতে ব্যস্ত হলে সে বলে— আমি রঞ্জন। ওর দিকে সহজভাবে তাকাতে পারি না আমি।

আশ্চর্য, আমাকে চিনছ না! ভারি আশ্চর্য মেয়ে তুমি। এত ভয় পাও কেন? আমি আমার স্থবির পা দুটোকে টেনে সামনে নিয়ে গেলে সে পথ আগলে দাঁড়ায়, কেউ কিছু প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে হয়, এটা সাধারণ ভদ্রতা।

আমি ফের এগোতে চাই।

সে হাসতে হাসতে বলে, আমারই ভুল হয়েছে, তুমি যে কথা বলতে জানো না, সেটা আমার জানা ছিল না।

ডিরেক্টর বিদেশ থেকে ফিরেছেন, সকালে ফোনে এই তথ্য জেনে অ্যাপয়েন্টম্যান্ট না করেই আমি বাসা থেকে বেরোই। গলির মুখে শায়েদের সাথে দেখা, সে অবাক হয়ে বলে, আজকাল ভোরে অফিস করছ নাকি?

পাতলা জিন্সের শার্ট, শাদা প্যান্টে ওকে দেখাচ্ছে বেশ। শ্যামলা মুখের ওপর পড়ে থাকা ঝাকড়া চুল ওকে এক আলাদা সৌন্দর্য দিয়েছে, আমি চেয়ে থাকি।

প্রথম দেখছ মনে হয়?

ভালোই তো দেখাচ্ছে।

আমার পাশে রিকশায় বসে শায়েদ হাসে, প্রশংসা করতে জানো তাহলে। আসলে আমার ভাবতে ভীষণ অবাক লাগে, তুমি সব ব্যাপারে ভীষণ বেহিসেবী, কোমল, অন্যরকম— আমার ব্যাপারেই তুমি একমাত্র শায়লার মতো প্র্যাকটিক্যাল।

রিকশা চলতে শুরু করতেই সামনে গ্যাঞ্জাম। প্রাইভেট কারের সামনে এক লোক রাজ্যির বাঁশ নিয়ে এসে বিপদে পড়ে গেছে।

আমি বলি, তোমার জায়গাটাই যে আমার জীবনে সবচাইতে প্র্যাকটিক্যাল জায়গা।

তুমি এটা কেমন কথা বলছ নীলুফার? এই জায়গাটা মানুষের সবচাইতে স্বপ্নের, সবচাইতে কল্পনার জায়গা।

এটা তো প্রেম পর্যায়ের কথা হচ্ছে, আমি রিকশা থেমে থাকায় অসহিষ্ণু বোধ করি, দাম্পত্য জীবন মানে জানো? প্রথম রাত থেকেই বাসা ভাড়া, বাজার, এ-ই বিল, সে-ই বিল, আমার সমস্যাটা হয়েছে সেদিন থেকেই, যেদিন থেকে তুমি আমাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছ। কোনো প্রস্তুতি ছাড়া এই সাহস তুমি কর কী করে?

সিগ্রেট ধরিয়ে জ্বলে উঠতে থাকা রোদ্দুরের দিকে ধোঁয়া উড়ায় শায়েদ, যত টাকা হলে আমার চলবে, তত টাকা উপার্জনের কোনো পথ আমার জানা নেই, সেই জন্যই কিচ্ছুর জন্য চেষ্টা করার উৎসাহ পাই না। ছোটবেলা থেকেই প্রচণ্ড ধনী হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম আমি। কোনোদিন এই আধপেট খেয়ে ধাক্কা দিয়ে চলা জীবনে বাঁচতে চাই না, হয় উপোস থাকব, নয় রাজার মতো বাঁচব।

এই কথা আর কত শুনব? সামনের জঞ্জাল সরে গিয়ে রিকশা চলতে শুরু করায় আমি স্বস্তিবোধ করি, এইরকম মানসিক অবস্থা নিয়ে তুমি বিয়ের কথা ভাবছ কী করে?

হাতিরপুলে ফের জ্যাম।

গিজগিজে মাথাগুলো দেখে আমি ক্লান্ত বোধ করি। শায়েদ বলে, আমি বিয়ের প্রস্তাব না দেয়া পর্যন্ত বিষয়টাকে তোমার কাছে অর্থহীন মনে হচ্ছিল। তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে

পারছিলে না। ভাবছিলে আমি তোমার সাথে সময় কাটাতে সম্পর্ক করেছি। তুমিই বলো, আমি কোনদিকে যাব ?

তুমি তোমার অনুভব পাল্টাও, তোমার যা যোগ্যতা তার মধ্যেই একটা কিছু করার কথা ভাব।

আমার যা যোগ্যতা মানে ? কী বলতে চাইছ তুমি ? আমার টাকা ছিল না ? আমি ব্যবসা করার চেষ্টা করি নি ? শুধু দুই নম্বরী করতে পারি নি বলে পেটে লাথি খেয়েছি।

এই প্রতিযোগিতার পৃথিবীতে ব্যবসায় তুমি আনফিট। আমি তেতে উঠতে থাকি, তাই বলে তুমি চাকরির চেষ্টা করবে না ?

আমি নেমে যাচ্ছি... বলতে বলতে রিকশা থেকে সত্যিই নেমে শায়েদ ভিড়ের মধ্যে হাঁটতে শুরু করে। এবং অদ্ভুত ঠোঁটে হাসে, আনফিট! আমার সততাকেও তুমি এইভাবে দেখলে! আমার নিঃসাড় চোখের সামনে সে ক্রমশ ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে যায়।

শায়েদ নেমে চলে যাওয়ার পর আজ এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটেছে আমার জীবনে। রাত্তিরের বারান্দায় বসে বহুদিন পর নিজেকে উজাড় করে দিয়ে আমি কাঁদি। গ্রীলের ঠাণ্ডা ফ্রেম ভিজিয়ে সেই নোনতা জল নিঃশব্দে নিচের দিকে পড়তে থাকলে আমার ফের সেই মফস্বলের কথা মনে পড়ে। দীর্ঘ বছর পর এমন প্রগাঢ় যন্ত্রণা ঠেলে ওঠে, সবদিন ছিঁড়ে ফুঁড়ে কচি বয়সের একটা অধ্যায়, যা থেকে অদ্ভুত এক গন্ধ এসে লাগে, সেই অধ্যায় বড় আনন্দের, বড় বিষাক্ত, নিজের সাথে কী তীব্র যুদ্ধ সেই দিনে, সেসব দিন ফের এসে দাঁড়ালে হয়তো আমি ভয়ে মুষড়ে যাব, জীবনের এই প্রান্তে এসে মনে হয়, নিজের সাথে কী করে এত যুদ্ধ করতে পেরেছিলাম ? তবুও সেই গন্ধে এত নেশা, সেই দিনকে ছোঁয়ার তৃষ্ণায় মৃত্যু এসে দাঁড়ায় , রক্ত ওঠে অনুভূতিতে, ভেবেছিলাম রঞ্জনকে কেন্দ্র করে সব মরে গেছে, সব হারিয়ে গেছে, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে বড় বেশি জীবনের চেয়ে মূল্যবান ছিল সেই দিন, সেই অনুভূতি আমি এই জীবনে কাউকে কেন্দ্র করে আর অনুভব করি নি। নিজেকে সামলাতে আমি গ্রীল খামচে ধরি, আয় সখী সহোদরা... সায়রাবু... সায়রাবু, তুমি আমার কাচের চুড়ি, সোনার নথ, প্রথম পুরুষ সায়রাবু— বন্দে মাতরম্... পরক্ষণেই হিস হিস শব্দে জেগে ওঠে— পড়শী যদি আমায় ছুঁতো— কী তৃষ্ণা! কী আগুন! সব থামিয়ে দেয় সেই সুর— কোয়েলিয়া গান থামাইবার কুহুতান— ফের রঞ্জন— সেই তালগাছের নিচে, তোমার জন্য সব পারি নীলু, জানতে চেও না, কেন কিছুই পারছি না। কেমন শিরা উপশিরায় আগুন ধরে যাচ্ছে, বরফ নামছে রক্তে... এরমধ্যে এমন জীবন্ত, এমন প্রগাঢ় রঞ্জনের মুখ। শায়েদ চলে গেলে রিকশা ফের চলতে শুরু করলে আমি বিমর্ষ বোধ করছিলাম। কেমন একটা পাথর চেপে ছিল বুকের মধ্যে। দীর্ঘ সময় আমার আর চারপাশের কিচ্ছু নজরে পড়ছিল না। এনজিওতে নেমে ভেতরে দেখা করার জন্য স্লিপ পাঠাই। কী চমৎকার অফিস। টিপটপ কাজ করছে মেয়েরা। ওয়েটিং রুমের সোফায় বসে এখানে কাজ করার জন্য ভেতরটা লোভী হয়ে ওঠে। অনেক সময় পেরিয়ে যায়, কোনো খবর আসে না। অস্থির হয়ে আমি আবার স্লিপ পাঠাই।

কিছুক্ষণ পর খবর আসে, উনি আপনাকে আগামী সপ্তাহে আসতে বলেছেন।

নিজের ভারি শরীরটা টেনে গেটের সামনে আসতেই আমার সারাদেহে ঝিম ধরে যায়। ভেতরে একটা নীল গাড়ি ঢুকছে এবং তার ভেতর, আমি মুহূর্তের মধ্যে দেখে ফেলি, রঞ্জন। ঠাটা পড়া মানুষের মতো গেটের কাছে আমি আটকে যাই এবং আমাকেও দেখে ফেলে রঞ্জন

গাড়ির গেটখুলে বাইরে বেরিয়ে আসে। হে সৃষ্টিকর্তা! আমাকে শক্তি দাও, আমি নিজের জড়তা ভাঙতে আত্মার মধ্যে কুড়াল বসাই এবং প্রাণপণে মুখে হাসি এনে প্রশ্ন করি, তুমি এখানে কাজ কর ?

তুমি এখানে ?

আমি মিথ্যে বলি, আমার এক বান্ধবীর সাথে দেখা করতে এসেছিলাম। রঞ্জন অনেক সুন্দর হয়েছে। ফর্সা হয়েছে, স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে। আমি নিজেকে সহজ করতে মেঝেতে পা ঠুকি।

আমি একটা প্রাইভেট ফার্মে আছি, এখানে বিশেষ একটা কাজে এসেছি, বলতে বলতে রঞ্জন মানিব্যাগ খুলে কার্ড বের করে। এমন একটা অবস্থায় তোমার সাথে দেখা হলো, আমি কল্পনাও করতে পারি নি, তুমি ফোন করবে তো ?

আমিও নাম্বার দিই। এবং এই প্রথম নিজের বাড়িতে ফোনটা থাকায় মহাস্বস্তি বোধ করি। বাসায় ফোনের খরচ বহন করার মতো অবস্থা আমার আছে, এই বিষয়টা রঞ্জনের সামনে আমাকে অনেক সহজ করে তোলে।

গাড়িটা আমার হৃৎপিণ্ড মাড়িয়ে সাঁই শব্দে ভেতরে ঢুকে যায়।

আয় সখী পড়শী আয় সখী স্বপ্নবাজ, স্মৃতিচরের খোসা ভেঙে লহ্ তুলি লহ্ তুলি...। একটা ছবি দেখেছিলাম, একটি মেয়ে অন্ধ, যখন সে সে-ই অন্ধকার জীবনে প্রবল অভ্যস্ত, চিকিৎসা করে ওর চোখ সারানো হলো। হাসপাতাল থেকে মেয়েটি বেরিয়ে দেখে, আকাশ থেকে সার সার বরফ পড়ছে। সে চির অভ্যস্ত অন্ধের ভঙ্গিতে হেঁটে চোখ বুজে স্পর্শ করে সেই ঠাণ্ডা! ওহ গড! এ দেখছি তুষার!

এই রাত্তিরে দিনের এই দৃশ্যটা আমাকে কেমন এক বিভ্রমের মধ্যে ফেলে দেয়। আমি এই জীবনে কোনোদিন না পাওয়া রঞ্জনকে বহুকাল পর সেই অন্ধ মেয়ের মতো ছুঁতে গিয়ে টের পাই, ভেতরটা ভেঙে যাচ্ছে। আমি কল্পনাও করি নি, আমার সেই বয়সের সেই অকল্পনীয় বেদনা আমার মধ্যে থেকে মরে নি তো বটেই, যেন এক দুঃখ পাথরের তলায় চাপা পড়েছিল। আজ যেন সশব্দে সেই পাথরের মুখটা সরে গেল। খালা এসে দাঁড়ান পেছনে— কী হইছে নীলু ? খালার হাত ধরে ফুঁপিয়ে উঠি, কিছু না, কিছু না।

যেন জীবন ডাকছে মৃত্যুকে, আমি তখন টিলা পেরিয়ে অনেক দূর চলে গেছি, সমস্ত বাঁশ কেটে নেওয়া হয়েছে, সেই মস্তকহীন, তনুহীন মোথাগুলোর মাঝখান ফুঁড়ে এমন বেমক্কা, বিশ্বাস কর রঞ্জন, এত বিশাল শুধু একটাই বাঁশগাছ, এত উঁচু, আর অজগরের মতন মোটা, আমার কেমন গা ছম ছম করে উঠল। যেন সবাইকে খতম করে একা এই রাজ্য দখল করেছে, কিন্তু পর মুহূর্তে কিসের কী ভয় ? ওই যে জীবন ডাকছে, সে-ই টানেই ওপরে তাকাই, ডাহুকের ডানার বাতাস, ওমা, দেখি রঙ, পাখির ডানার শব্দে বাতাসের মধ্যে কি রঙ তৈরি হয়ে যায় ?

ধাঁধা নাকি ?

না, তাও না, আসলে তখন সূর্যও ঘাড় বাঁকিয়েছে, সারাদিন হেঁটে বুড়ি থুত্থুরি খুকির মতো, যেন অনুমতি চাইছে, এক... দুই... তিন বলতেই যদি না থামাও, গেলাম কিন্তু... কী আহ্লাদী, মিঠে সুর! বলতে বলতে পা পা এগুচ্ছে, ফলে তেমন আহলাদে নারীর মুখের মধ্যে

যেমন নানা রঙ খেলতে থাকে, তারই বর্ণফালি এই ডাহুকের বাতাসে লেগে— ইস্‌স্‌... চুপ, সামনের ঝোপটা নড়ছে, আমি তখন ক্ষুদে শিশু, ঋতুপরিবর্তনের রোগে ভুগতে ভুগতে পলকা হয়ে শূন্যে মেশার আগে দাঁড়িয়েছি, সবার অলক্ষ্যে বেরিয়েছি ঘর থেকে, এরপর প্রকৃতির অবিনাশী ডাক। আশ্চর্য! কঠিন একটা রোগ শিশুকে বয়স্ক মানুষের মতো জীবনবোধ এনে দেয়। আমার মনে হলো, এই প্রথম আমি বাতাস দেখছি, কচুরিপানার ওপর বক দেখছি, নিঝঝুম দুপুর পেরোনো দেখছি। আমি এক ডাগর নারী হয়ে উঠেছি।

বিরান গ্রামভূমি।

আমার মনে পড়ছিল সায়রাবুর কথা। এই প্রথম, ওকে ছেড়ে কোথাও বেরিয়েছি। আমার বোঝার বয়স থেকে একজন আরেকজনের ছায়া হয়ে একসঙ্গে চলেছি। ও ওর ন্যাংটো শরীর আমাকে দেখিয়েছে, আমারটা ওকে... আমরা বলেছি, কেউ কিছু লুকোব না। এত বোকা ছিলাম, যদি ওকে কেউ বলত, বিয়ে করবি? ও বলত, করব।

কাকে?

ও তখন আমার নাম বলে দিত। আমি বলতাম, আমি শওকত মামাকে বিয়ে করব। তাতে ও ঈর্ষায় জ্বলে যেত। বলত, আমি শওকত মামাকে খুন করব। এই দীর্ঘ অসুখ আমার কাছ থেকে ওকে জীবনের মতন পর করে দিয়েছে। আমার অসুস্থ শিয়রে দিনের পর দিন থেকে আমার প্রতি মায়া কাটিয়ে ওর ঘেন্না এসে গিয়েছিল, আমি যন্ত্রণায় পুড়ে খাক হয়ে দেখেছি, ও আমাকে দেখিয়ে অন্য এক বালিকার সঙ্গে খেলছে, ওর চুল ধরে টানছে, ওকে আদর করছে।

অথচ শামুক ভাঙা, ছিপি দিয়ে আম কাটা, ঝিরিঝিরি বর্ষার জলে তিতপুঁটি মাছ ধরা, এ আমরা একসঙ্গেই করতাম। আমরা জানতাম, সারাজীবন আমরা এভাবেই ছায়া হয়ে থাকব, কেউ কাউকে এড়িয়ে একা কিছু করব না। আমার একটা অসুখ— আমাদের সেই ব্রত শূন্যে উড়িয়ে নিল। বুঝলে রঞ্জন, সায়রাবু বড় বিচিত্র মেয়ে ছিল। সবাইকে বাদ দিয়ে আমার সাথে ওর একটা গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। এই নাগরিক রাত্তিরে আজ বহুকাল পর আমি তোমাকে অদ্ভুত এক কাহিনী শোনাব। দাদি তখনো বেঁচে ছিলেন। সায়রাবুর গ্রাম খুব প্রিয় ছিল। প্রায়ই সে যেত। আমিও ওর ছায়া হয়ে ওর সাথে লটকে-পটকে চলে যেতাম। শোনো, সে বার কী হলো—।

ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে আশ্চর্য এক জন্তু। সমস্ত নিঃসীম চরাচর বিকট এক পাথর হয়ে আমার মাথায় চেপে বসে আমাকে মাটির সঙ্গে ঠেসে রাখে, আমি ভাষা হারিয়ে নিঃশব্দে কাঁপতে থাকি। একদম ময়ূর যেন। অন্তত পালকগুলো তেমনই, ইয়া বড় লেজটা এমনই আজব, হুলোবেড়াল না বাঘ শনাক্ত করতে পারি না। মুখটা ছুঁচালো, ইঁদুর রূপসী হলে যেমন হতো, খাঁজকাটা আদলের মধ্যে তেমনই এক ভাব, আমার চৌদ্দপুরুষ এরকম প্রাণী দেখে নি, বিশ্বাস কর, এ আমার সারাজীবনের প্রশ্ন, তবে কি ও আসমান থেকে নেমে এসেছিল? আমাকে দেখেই ওর সতর্কগ্রীবা টান হয়ে ওঠে।

আর তখনই চোখে পড়ে, ওর একটা ডানা ভাঙা। সব মিলিয়ে ওর মধ্যেও তখন রঙ, ধরো পেঁয়াজ রঙ, কিন্তু আহত ডানা তুলতেই আরো গভীর রঙের কিছু আভা আমাকে বিমূঢ় করে দেয়, আমি তখন সায়রাবুকে হারিয়েছি, সেই হাঁ হাঁ শূন্য বুক নিয়ে আমি ওর ওপর চেপে বসতে চাইলাম, কিন্তু মৃত্যুভয় হয়তো প্রাণীকে তেজী করে তোলে, আমার কল্পনার

বাইরে ক্ষিপ্রবেগে ও ছুটতে থাকে। ডানার জন্য কখনো ঘষটে, কখনো হেলে... আমিও ওর পেছন পেছন প্রাণান্ত ছুট দিই। ওকে নিয়ে সায়রাবুর বুকে ঈর্ষার আগুন লাগিয়ে দেব। তাছাড়া ও আমার এমনই এক সম্পদ হবে, যা আমরা জন্মের পর কেউ দেখি নি... ছুটতে ছুটতে ও একটা কলাগাছের গুঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস নেয়। এই সময়টা আমি ওর সঙ্গে বেঈমানি করে ওকে খপ্ করে ধরতে চাই; না, বরং আমার ওপর ওর আস্থা আনতে মিহি সুরে শিস দিই... ভয় পাও ক্যান গো সোনা ? ভয় পাও ক্যান ? কিন্তু আমাকে ও বিশ্বাস করে না। দম নিয়ে ফের দৌড় লাগায়। আহারে, আমারও তো তখন শালিকের মতন পলকা শরীর, ল্যাংড়াটার সঙ্গেও পেরে ওঠার শক্তি নেই, বাঁচার জন্য যে ছুটছে, তার সঙ্গে কি আমি তখন পারি ?

কিন্তু ওকে হারালে আমি আর কী নিয়ে ফিরে যাব ? বাতাসের রঙ বুকে নিয়ে জীবন পেরোনো যায় ? আমিও ওর মতো, এইবার পা হ্যাঁচড়ে, কিছুটা টলে গিয়ে ফের ছুটতে শুরু করি।

সামনে কাঁটাঝোপ, আম, কালাই বন, কোকিলদের প্রাণফাটা কোরাস; সামনে অপরাহ্ন, হলুদ রোদ্দুর, আর স্তব্ধ গ্রামের অজানা ধোঁয়া; খোলা জায়গা পেরিয়ে বনের কাছাকাছি এসে আমি ওকে হারিয়ে ফেলি। আমার শরীর তখন ভেঙে আসছে।

আমি অসাড় দেহে শুকনো পাতাগুলোর ওপর ঢলে পড়ি।

আশ্চর্য! আমাকে ভয় পেল ? আ-মা-কে ? যে কিনা অসুখে পড়ে পৃথিবীকে অচেনা দেখেও কোনো শব্দ পর্যন্ত করতে পারে নি ? এই শালিকদেহ ? করুণ-কাতর মুখ, এই দেখে ? ও তো সাধারণ প্রাণী না, তবে কেন ওর আচরণ সব ভীতু বোকা প্রাণীদের মতো হবে ?

সামনেই ক্ষুদে ডোবা। যন্ত্রণা সামলাতে সেই নিভাঁজ জলে ঢিল ছুঁড়ে দিই, আঘাত খেয়ে জল ভড়কে গিয়ে ছটফট করে উঠতেই বহুকাল পর যেন আমি হাসি— হি-হি।

ফের শব্দ।

আমার মৃত স্নায়ুগ্রন্থিগুলো চিড়িক দিয়ে ওঠে। আমি টাল খেয়ে দাঁড়িয়ে দেখি আজব আগুন। মৃত্যুর আগের পিশাচ লাল রক্ত দিয়ে জঙ্গলটাকে রক্তাক্ত করে তুলেছে সূর্য। ফের শব্দ। প্রথমে মনে হয়, রক্তের শব্দ পেয়ে পাতাগুলো হিস হিস করছে, বাতাসকে বলছে, এ রোদ্দুরের ঘোরতর অন্যায়— না, কেমন গোঙাচ্ছে কেউ... আর প্রাণান্তকর নিঃশ্বাস ফেলছে। সামনে ইয়া বড় বড় লতার ডগা, বুড়ো বটটাকে খাবলে ধরে রেখেছে। এবার আমার পায়ে ভয় জমে; আশ্চর্য, তখনো আমার পেছনে ফেরার কথা মনে পড়ে নি একবারও, তুমি একদিন বলেছিলে— আমি একজন ব্যর্থ মানুষ! স্পষ্ট করে তখন তুমি আর কিছু বলো নি। আমি তখন সেই কথার ভেতরের ঝড়টা দেখতে পাচ্ছিলাম, আসলে এসব ভানই আমাদের সুন্দর রেখেছে... যা হোক, বট পেরিয়েছি, আমার দেহ তখন লতাগুল্মের তলায়, শুধু চোখ দুটো পাঠিয়ে দিয়েছি, দেখি, একজন নারী, ওর সারা শরীর পেঁচিয়ে রেখেছে একটি ত্যানা আর ওর ঘাড়ের মধ্যে একটি ক্ষুদে মাংসপিণ্ডের মতো ঢলে আছে একটি শিশু... জানো, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, সদ্যভূমিষ্ঠ। নারীটির কোমরের নিচ থেকে অঝোরে রক্ত পড়ছে, ওর শাদা ত্যানার মতো শাড়িটা চুবে যাচ্ছে রক্তের মধ্যে, বাঁ হাতে মরাটে স্তনের ওপর শিশুটিকে ঠেসে সে অদ্ভুত চোখে চেয়ে আছে।

তার পাশেই একজন পুরুষ। আশ্চর্য ফেরেববাজ চেহারা, গর্ত খুঁড়ছে। মেয়েটি যেন গর্ত নয়, মাটির দলা নয়, ম্যাজিক দেখছে, এমনই বিহ্বলতা ছিল তার চোখে।

ওর শরীর উপচানো রক্তের রেখা ছুটতে ছুটতে গর্তের মধ্যে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ছে।

জানো, ওখান থেকে ফেরার পথটা আমার স্মৃতির মধ্যে নেই, শুধু মনে আছে টিলার ওপর বসে আমি আবর্জনা সরে যাওয়া ফকফকা আকাশটা দেখছিলাম।

প্রচণ্ড পেট ব্যথা করছিল, আর ঘুলিয়ে উঠছিল বমি... ফের ধাঁধা লাগে, ওর শাড়ি যে চোবানো ছিল, রোদ্দুরের রঙে নয়তো?

সায়রাবু বলত, নীলু, তুই তাকা তো!

তাকাতাম।

বলত, তোর চোখ খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে হয়।

কেন? আমি প্রশ্ন করতাম।

বলত, তোর চোখ শালুকের মতো।

কী আশ্চর্য মানুষের আগ্রাসী প্রবণতা! আমি গলি-ঘুপচি হেঁটে দিনের পর দিন দেখেছি, আস্ত গরু, ঠোঁট, রঙ, দেহ, সুন্দর, প্রাণ... সব মানুষের খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে হয়। ফলে যৌথ বিষয়ের প্রতিই কেমন ঘৃণা এসে গেল। দু'জন হলেও পারস্পরিকভাবে অনুভূতি আদান-প্রদানের প্রশ্ন। দু'জন হলেই সেই উপমাগুলো, তোর গাল আপেলের, ঠোঁট কমলার কোয়া, দাঁত ডালিমদানা— মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে জাগতিক খাদ্যগুলো, প্রবল প্রেমের উপমার ক্ষেত্রেও মানুষ এরই মধ্যে আবর্তিত থাকে। এরপরই আমার মনে হলো, সবচেয়ে সুন্দর এবং স্নিগ্ধ একাকী একজন মানুষ।

এই খেয়ে ফেলার প্রবণতা থেকেই মানুষ দাম্পত্যজীবনের প্রথম দিকে একজন আরেকজনকে বুভুক্ষের মতন খায়। নিজের সম্পত্তি ভেবে একে অন্যকে ভেঙে নিংড়ে অশিল্পিত করে তোলে, শেষে ঘর্মাক্ত দেহে জীবনের প্রথম পর্যায় অতিক্রম করে দেখে, সব তরঙ্গ গিলে দু'জন অসাড় আর ম্রিয়মাণ হয়ে উঠেছে...।

যাহোক, সেই থেকে, তলপেটের ব্যথার প্রাবল্যে, কিংবা পা চুইয়ে পড়া অবাক লাল স্রোতের বিভ্রম থেকে বেরিয়ে আমি নিজেকে নির্ভার করতে দিঘিতে নেমে টের পাই, আমার চারপাশের জল লালচে হয়ে উঠছে।

আমি বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে দেখি, রোদ্দুর নয়তো?

না, শ্যাওলাগুলো সরিয়ে সরিয়ে দেখি, লাল!

ওই একদিন। আমার হাজার বছরের বাস্তবতা পাল্টে দেওয়ার দিন। আমি রাত্তিরে ভেজা শরীরে খড়ের গাদায় শুয়ে ঠকঠক কাঁপছিলাম। আমাকে সারা বাড়ি খুঁজে সেদিন কেউ পায় নি।

পরদিন ভোরে কলশব্দ।

অদ্ভুত চোখে চেয়ে আছে সায়রাবু। চাচিরা আমাকে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে গেলেন, কী হইছে তোর? কী হইছে? আর আমার বাবা, অচেনা চোখে তার ক্ষুদে মেয়েকে দেখছেন।

আমি শুকনো জিবে ঠোঁট ঘষে নিজেকে দেখাই। আর আমার চোখ ছায়া করে স্বপ্নের মতন জেগে ওঠে সেই পাখিটা, তার বহুবর্ণ বিন্যাস, আর রঙ, কত যে রঙ... আর...। জ্বরে, ক্লান্তিতে ফের আমি নেতিয়ে পড়ি।

চাচিদের মধ্যে উৎসবের বাতাস লাগে।

তারা চাপা স্বরে কী সব বলে, হাসাহাসি করে। বলে, তুমি যুবতী হইছ। এরপর তারা হলুদ চন্দনবাটা দিয়ে ঘষে সাফ করে অপূর্ব করে সাজায় আমার মুখখানি, তারা বিয়ের গীত গায়, আমার সামনে এনে রাখে জলভরতি গামলা, সেই জলে আজ রোদ্দুরের কাঁচা রঙ পড়েছে। হলুদ শাড়িতে আমার ক্ষুদে পাতলা দেহটা মুড়িয়ে ওরা আমাকে বলে, পানির দিকে চাও।

আমি তাকাই।

নিজেরে দেহো।

আমি দেখি।

নিজেরে তুমি রাজকন্যার লাহান সুন্দর দেহো।

কী করে নিজেকে সত্যের বাইরে ওরকম দেখা যায়, সে বয়সে আমার জানা ছিল না। আমি জলে নিজেরই হলুদমাখানো শালিকের মতন মুখটা দেখি, আর বলি সেই আশ্চর্য প্রাণীটার কথা। ওরা হাসাহাসি করে বলে, দিনখোয়াবে ধরছিল তুমারে। প্যাঁচাল রাইখা তুমি পানিতে নিজেরে সুন্দর দেহো, সাবধান পচা দেইখো না, দেহো, আর মনে মনে বলো, এই রহম সুন্দর আমার একটা সন্তান হও, বলো...!

সন্তান!

সেই ছায়াজঙ্গল, রক্তের ধারা, সেই অসহ্য দুটি চোখ... আমি ছটফট করে দাঁড়িয়ে বলি, না!

সেন্ট্রাল রোড পেরিয়ে রিকশা নিই... এরপর কাঁচা বাজারে এসে মাছ-মাংস দরদাম করে ব্যাগে ভরে বাসায় ফিরি। অফিসে যাই। অফিসে সারাক্ষণ অস্থির থাকি অনাবিল আড্ডায়। অফিস থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তোমার গাড়ি নেমে আসার দৃশ্য নিয়ে ভাবি। কিছু দেখা হয় না। কসমেটিক্সের ঘ্রাণ শুঁকে শুঁকে, মিষ্টির দোকান— কী মজার মালাইকারি! একা একা খাই।

এইভাবে সময়ের পর সময়... এইভাবে স্নায়ু দিয়ে, প্রতি মুহূর্তের অনুভব দিয়ে সময়, তার ভাঁজ, গন্ধ, বর্ণ, এসব চেনা। এক সময় শায়েদকে প্রশ্ন করি, আমাকে কি পুরোমাত্রায় সুস্থ মনে হয়?

শায়েদ বলে, পুরোমাত্রায়। তবে ধন্দ লাগে তোমার জৌলুস দেখে, প্রশ্ন জাগে, তোমার কি নিঃসঙ্গতা থাকতে পারে?

দেখো রঞ্জন, কেমন দক্ষ অভিনয়বাজ আমরা। কাউকে কি বলা যায়, শীতের রাত্তিরগুলো কেমন হুল ফুটিয়ে বলে, তুমি একটা গাছ, সেই বাঁশগাছটার মতো, তুমি নিজে এগুতে পার না, তোমাকেও কেউ ছুঁতে পারে না। নিজের আতঙ্কে তুমি নিজেই শেকড় তলায় পাঠিয়ে দিয়েছ!

তারপর ?

আমি পরদিন ছুটছি সেই জঙ্গল ধরে। চাচিরা বলেছে, তুমি এখন ঘরে থাকবে। বাহির তোমার জন্য পাপ। আমি সেসব দুঃসহ শব্দের প্রাচীর ভেঙে ছুটতে গিয়ে ফের সেই টিলায় তলপেটের যন্ত্রণায় উবু হয়ে বসে পড়ি। ভয়ার্ত কম্পিত দেহে অনুভব করি, আমার পায়ের পাতা বেয়েও সেই খুনরঙের ঢল নামছে। কতক্ষণ কেঁদেছি বলতে পারব না। এক হিমহিম বসন্ত বাতাস আমার নোনা চোখে তন্দ্রা এনে দিতে থাকলে, বিশ্বাস কর, আমি দেখি সেই আশ্চর্য প্রাণীটা। আমি এসেছিলাম বটের ওপারটায় যাব বলে। প্রাণীটাকে দেখে গন্তব্য ভুলে যাই। দেখি, ডোবায় মুখ চুবিয়ে ও জল খাচ্ছে।

বাঁশঝাড়ের একলা একা গাছটিতে শাদা পাখিরা। আর রাজ্যির মিহি সুর কোকিলের, প্রাণীটা আমার মধ্যে অদ্ভুত এক স্বপ্ন এনে দেয়, আমি নিজেকে ঘুরে ঘুরে দেখি, কী সুন্দর শব্দ। যুবতী। এই তো আমার পথ তৈরি হয়েছে। শালিকের মতো স্ফীত দেহে গজাবে হাজার হাজার ঝালর দেওয়া পালক, শরীরে মাংসে আমি নারী হবো— এই অহঙ্কার ঢেকে দেয় এক তীব্র হিম আর্তনাদ! খুন! আমি হকচকিয়ে তাকাই। সেই মৃত শিশুটি মাটির নিঃসীম তলা থেকে করুণ শব্দে কেঁদে উঠছে।

পানি কেটে কেটে আহত প্রাণীটি ক্রমশ শুয়ে পড়তে থাকে। আমি প্রেতের মতো নিজেকে ছায়ায় ঢেকে, বুঝলে, সূর্য তখন ডুবে যাচ্ছে, ওটাকে খপ করে ধরে ফেলি; আশ্চর্য, যেন ও আমাকে চিনেছে, এই চোখে আমার দিকে তাকায়, যেন, ও তুমি ? কী ভয়টাই না পেয়েছিলাম! এরকম নির্ভরতায় আমার ওপর নিজেকে ছেড়ে দিতেই আমি ওর গলা চেপে ধরি, ওর হাঁ হয়ে আসা মুখ থেকে যে বাতাস বেরিয়েছিল, আমি দেখি, তারও হাজার বর্ণ, যেন ওর ভেতর পাথরের মতো আটকে থাকা দম আমার চাপ খেয়ে গলে ভেঙে ঝিরিঝিরি বাতাস হয়ে— না, এ আমার গল্প নয়, তুমি যে রঞ্জন, যে এক সময় আমার ঘিনঘিনে জীবনের মাঝখানে স্বপ্ন হয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলে, তোমাকে বানিয়ে গল্প বলে কী লাভ বলো ? অথবা গল্পই। একটি স্বপ্ন পাখিকে হত্যা করে আমিও প্রতিশোধ নিতে পারি, যে আমি জীবন ভর নিঃশব্দে দু'হাত পেতে আঘাত নিয়েছি, সেই আমি কোনো এক কালে পাল্টা আঘাত করেছিলাম, এ হয়তো আমার নিজেকে উদ্দীপ্ত করার তেমনই এক দৃশ্য... এরপর আমি হাজার মানুষের সঙ্গে চলেছি, নিজেকে বুঝিয়েছি, আমি এক কঠিন কঠোর পাথর-নারী, কেবল আমিই জানি, মুহূর্তগুলোকে এই করে করে কতটা অসাড় আর প্রলম্বিত করেছি, কেন আমার এতটা নিঃশব্দ প্রহর; রঞ্জন— বহুকাল পর আজ তোমাকে দেখে অনুভব করছি যন্ত্রণার জায়গা ধীরে ধীরে জুড়ে বসছে স্বপ্ন, তৃষ্ণা; এই যে আজ হাত বাড়িয়েছি, বিশ্বাস না হয়— ছুঁয়ে দেখো...।

আমার ঘুম চোখের অবিশ্রান্ত জলের ধারায় বালিশের জামা ভিজে যেতে থাকে।

অফিসে বসে নারীদের লেখাগুলি পড়ি। বড় বেশি বৃত্তাবদ্ধ, এলানো। ভাষার গভীরতা নেই, বিষয়ের বিচিত্রতা নেই। নারীদের পাতা সম্পাদনা করতে গিয়ে একেক সময় রাগ ধরে যায়, জীবনের সব বিষয়ে তারা এগিয়ে যাচ্ছে, সফল হচ্ছে, সাহিত্যের জায়গাটায় এসে কী যে এক ছকের মধ্যে পড়ে যায় তারা, একজন তুখোড় সচেতন নারীও কলম ধরলে কেমন বোকা

হয়ে যায়। এবং যা হয়, অমনোনীত লেখাগুলো থেকে কিছু লেখা কম্পোজে দিয়ে মাথা চেপে চেয়ারে বসে থাকি। প্রিন্সেস ডায়না আজ ভোরে প্যারিসে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছে। সারা অফিস এই বিষয় নিয়ে ফেটে পড়েছে। আমি নিজেও অফিসে ঢুকে কিছুক্ষণ এই বিষয়ের মধ্যে ছিলাম। এক সময় ক্লান্তিবোধ করে নিজের টেবিলে চলে এসেছি।

মাথার মধ্যে ঘোর খাচ্ছে একটার পর একটা কলজে তাতানো বিষয়। সে-ই নির্জন রাতে শায়লাকে পুলিশের চেপে ধরার দৃশ্যটি ক্রমশ জীবন্ত হয়ে উঠে আমাকে মর্মান্তিকভাবে দংশন করছে। ওর তীব্র আপত্তির কারণেই বিষয়টি আর পত্রিকায় দিতে পারি নি। এই ঘটনাটি আমার ভেতরটাকে রক্তাক্ত করে নিয়ে যাচ্ছে অতীতের অন্য এক বিষয়ের দিকে। আশ্চর্য বেদনাদায়ক মিরাকল। সেখানেও ছিল রাত্তির এবং পুলিশের দ্বারা শায়লার চূড়ান্ত অপমান। শায়লার যন্ত্রণা এবং অপমানের কাছে নিজের এই সহজ স্বাভাবিক জীবনকে বড় তুচ্ছ মনে হয়। আমি ওর মুখের দিকে তাকাতে পারি না। তবে এইসব বিষয়ের ওপর বিশেষ একটা কাজ করার ইচ্ছা আমার অনেক দিনের। শায়লা এখন যে জীবনে আছে তার চেয়ে শতগুণ মর্মান্তিক জীবন আমরা দু'বোন পার করেছি এই একই চাকরি করতে গিয়ে। আমার জীবনে একফোঁটা আকাশ ছিল না, এক চিলতে সুখ ছিল না। আমি ঘুমের সময়টুকু পাঠ্যবই পড়ে পড়ে নিজেকে ওই যক্ষপুরী থেকে বের করার জন্য প্রতিনিয়ত তৈরি করেছি। তখন থেকেই, এইসব জীবন নিয়ে দীর্ঘ কোনো ফিচার বা গ্রন্থ লেখার ইচ্ছে আমাকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। সমস্যা একটাই আমি সম্পাদনা করতে পারি, ভালো খারাপ বুঝতে পারি, তবে খুব ভালো লিখতে পারি না। কিন্তু সেদিন শায়লার ওই ঘটনার পর ভেতর থেকে কি এক স্রোত আমাকে ঠেলছে— চেষ্টা করে দেখা যাক না, যা-ই হয়। লেখার পর আরিফের সাহায্য নিয়ে একটা কিছু তো দাঁড়িয়েও যেতে পারে।

আরিফের টেবিলের সামনে গিয়ে বসলে সে চশমা ওপর দিকে তুলে গম্ভীর চোখে তাকায়, কী চাই?

আমি হেসে ফেলি, আমি যা চাই, তা তো আপনি আর দিতে পারবেন না, আপাতত ভিন্ন এক বিষয়ে কথা হোক। আরিফ নড়ে চড়ে বসে। আপনি কি করে নিশ্চিত হলেন, আপনি যা চান, তা আমার পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়?

আমি হেসে ফেলি, একটু বাজিয়ে দেখলাম আপনাকে, কতটুকু দিতে পারেন, যা হোক অনুমতি দিলে ভিন্ন বিষয়টা বলতে পারি। আরিফ কেমন নিভে আসে। চাকরির শুরুতেই আমাকে কেন্দ্র করে তার মুখের নানা রকমের রঙবদলের বিষয়টি আমি বেশ উপভোগ করি। আমি অনেক রাতেই শায়েদের পাশাপাশি আরিফকে ভাবতে গিয়ে সারাজীবনের চলার জায়গাটায় আরিফকে প্রাধান্য দিয়েছি বেশি। শায়েদ কিংবা আরিফ কাউকে কেন্দ্র করেই আমার ভেতর গভীর কোনো অনুভব নেই। তবুও আমি তীব্রভাবে আরিফকে গ্রহণ করতে পারছি না এজন্যই, আমি ঠিক জানি না তার এই মুখের রঙ বদলের ক্ষেত্রে আমাকে কেন্দ্র করে আসলে তার কাঙ্ক্ষার দৌড় কতটুকু। এদিকে আমি শায়েদকেও অগ্রাহ্য করতে পারছি না, তাহলে এক ঘোর নিঃসঙ্গতার দিকে নিজেকে ঠেলে দেয়া হয়। আমার প্রায়ই মনে হয়, নিজের অস্তিত্বের স্বার্থে এ এক ঘোর অন্যায়। কিন্তু সেই বোধও স্থায়ী হয় না, আমার কাছে অস্তিত্বের স্বার্থের বিষয়টাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। জীবন আমাকে ভেঙে নিংড়ে শিখিয়েছে, আমার বাঁচার ক্ষেত্রে হিসাব কতটা মূল্যবান। ফলে, ভাবাবেগ, স্বপ্ন, কল্পনা আমাকে নিয়ে

যখন গভীর খেলায় লিপ্ত হয়, তখন বাঁচার জাগতিক হিসেব আমাকে সেসবের ভেতর থেকে টেনে এনে জীবনের মুখোমুখি দাঁড় করায়। নিজেকে নিয়ে এ আমার চরম বিভ্রান্তিকর এক স্ববিরোধী খেলা।

অফিসের হৈ হুল্লোড় ক্রমশ তীব্র তর্কে মোড় নিচ্ছে ডায়নার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। কয়েকজন কয়েকটি বিচ্ছিন্ন দলে পরিণত হয়ে প্রত্যেকে যার যার নিজের মতকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। কেউ বলছে এ জন্য প্রিন্স চার্লস দায়ী, কেউ দায়ী করছে ডায়নার স্বেচ্ছাচারী আচরণকে, কেউ বলছে বেপরোয়া সাংবাদিকরাই এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। আমি এইসব সুর-তরঙ্গের মাঝখানে বড় বেসুরো বেজে উঠি। আরিফ ভাই, আমি গার্মেন্টস এর মেয়েদের নিয়ে একটি দীর্ঘ ফিচার লিখতে চাই, আপনি যদি আমাকে সাহায্য করেন, আমি কাজটা শুরু করতে পারি।

আরিফ নিস্পৃহ কণ্ঠে বলে, আমি কী সাহায্য করব? আমি তো ওদের জীবন সম্পর্কে জানিই না।

ওদের জীবন আপনাকে জানতে হবে না, আমি হুল্লোড়ের মাঝখানে গলা চড়িয়ে বলি, জীবনের বিষয়টি আমি দেখব। দেখার পর বাক্যের বিষয়ে, ভাষার বিষয়ে আপনি যদি আমাকে একটু সাহায্য করেন।

কৌতূহলী চোখে তাকায় আরিফ— আপনি হঠাৎ এই বিষয়ে আগ্রহী হলেন কেন? আপনি তো এই পত্রিকার রিপোর্টার নন।

আমি কেমন নেতিয়ে আসতে থাকি। আমার চারপাশে সশব্দে বেজে ওঠে— বেশ্যা! আর আমারই সহোদরা উদোম রাস্তায়— আমি নিঃশ্বাস চেপে উঠে দাঁড়াই, বলি, আমি যাচ্ছি— আপনাকে হয়তো অহেতুক বিরক্ত করলাম।

বিচলিত হয়ে দাঁড়ায় আরিফ, আরে! আপনার সাথে দেখি কথাই বলা যাবে না। বসুন, বসুন! এখন একটু বিস্তারিত বলুন তো, আসলে আপনি কী করতে চাইছেন?

সামনের কাগজে আঁকিবুঁকি করি। কী হয়— বুকের পাশটা ঘাই দিয়ে যন্ত্রণাকাতর করে এগিয়ে আসে সেই মুখ... রঞ্জন, আমি যাকে ফের দেখার পর ওকে ভুলতে চেয়ে অনুভবে রক্ত তুলে ফেলছি, আমার সামনেটা ছায়া হয়ে আসে, আমি সহসা আর কথা বলতে পারি না।

রাস্তায় বেরিয়ে দেখি, রোদ্দুর হেলে পড়েছে। ঝাঁক ঝাঁক গাড়ির কালো ধোঁয়া দৃষ্টি বন্ধ করে দেয়। সেই শ্যাওলা বাড়ির নির্জন দিঘির ঘাটে এসে দাঁড়ায় রঞ্জন। হিমতরঙ্গ আমার রক্তের স্রোতে স্রোতে... নীলু তুমি সাঁতার জানো?

না।

আমিও জানি না।

তাহলে কী করে হবে?

তাই তো, কী করে হবে?

সেই বিক্ষিপ্ত শব্দাবলি যেন মহাশূন্য থেকে ভেসে এসে আমার প্রাণে বিষ ঢুকিয়ে দেয়। এক জঘন্য ক্লেদলিপ্ত জীবনে বাসকারী বালিকা দেখেছিল জীবনের প্রথম অলৌকিক স্বপ্ন। কী মদির গন্ধ সেই স্বপ্নে! কী বিষাক্ত বেদনা। সাঁতার না জানার সাথে কী না হওয়ার সম্পর্ক কিছু না জেনে, দু'জন মানুষ সেই ছোট শব্দেই দেখেছিল সামনের অন্ধকার।

না, আমি ফের সেই চক্রে ঢুকতে চাই না। যেখানে এসে রক্তের রেখা শুকিয়ে গেছে আমি সেই বদ্ধ মুখ ছুটাতে চাই না বিষাক্ত আলপিন দিয়ে। সব ভুলতে আমি এই শহরের বড় চেনা যোদ্ধা মানুষগুলো দেখি, আর দেখি বুড়ো রিকশাঅলার সঞ্চালনমান বাঁকানো মেরুদণ্ড... সহজাত প্রবণতায় ফের ভাবতে থাকি— আমি যে বিশ্বাস করি, নিরন্তর সুখী থাকে অজ্ঞেরা, যারা প্রতিনিয়ত খোঁজে, তারা এমনকি যন্ত্রণা খুঁড়ে খুঁড়েও সুখ বের করতে পারে।

চৌকস গাড়ি থেকে লাফাতে লাফাতে রঞ্জন নামে, যেন হাওয়ায় ভেসে, যেন উড়ন্ত, কী অদ্ভুত অনির্বচনীয় কায়দায়... আমি সদ্য ফেলে আসা সেই দৃশ্যের দিকে তৃষ্ণার্ত চোখে চেয়ে থাকি... গলির কাছে এসে টের পাই— দুঃখ ব্যথায় আমার সারা অস্তিত্বে কাঁপুনি ধরে গেছে, বড় নিভৃতে জানা হয়ে যায়, বেদনায় অভ্যস্ত হওয়া যায় না।

আজ গলির মুখে ফের এম্বুলেন্স।

আমাদের পাড়ায় হলোটা কী ? ভাবতে ভাবতে অবাক চোখে দেখি— সেই রহস্যঘেরা বাড়ি থেকে একটি স্ট্রেচার বেরিয়ে এসেছে। ক'জন লোক ছুটতে ছুটতে সেই স্ট্রেচার নিয়ে এম্বুলেন্সে উঠলে আমি দ্রুত রিকশার ভাড়া মিটাই। পেছনে কাঁদতে কাঁদতে আসছে সেই বাড়ির দারোয়ান ছেলেটা। যেন কতদিনের চেনা, এইভাবে ছেলেটাকে প্রশ্ন করি, বাড়িতে তালা দিয়ে এসেছ ?

ছেলেটি হতচকিত চোখে তাকায় আমার দিকে, হ্যাঁ দিয়েছি। এসো, বলতে বলতে কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই আমি ছেলেটিকে সাথে নিয়ে এম্বুলেন্সে চেপে বসি।

যখন চারপাশে গাঢ় হয়ে সন্ধ্যা নেমেছে, কলজে হিম করা শব্দে এই যানজটের শহর মাড়িয়ে ছুটে চলছে এম্বুলেন্স... ফিসফিস প্রশ্ন করি— কী হয়েছে রানীমা'র ? অস্ফুটে কেঁদে ওঠে সে। পরমুহূর্তেই নিজেকে সামালে নিয়ে চাপা স্বরে বলে, গলায় দড়ি দিয়েছে।

রাতে অবসন্ন দেহে ঘরে ফিরলে খালা জানায়, ঘরে কিচ্ছু বাজার নাই। আফসানা ইলিশ খাওয়ার জন্য দিনভর কাঁনছে, ওকে একা বাসায় ফেলে কি কইরা যাই আমি, এছাড়া হাতের টাকাও যে ফুরায়া আইছে। খালার এইসব কথা বড় ভিন্ন ভিন্ন হয়ে আমার করোটির মধ্যে ঝনঝন শব্দ তোলে। যে আফসানা ইলিশের জন্য কেঁদেছে ওর জন্যও কোনো মমতা বোধ করি না... আমি থেকে টের পাচ্ছি, আমার মধ্যে ধস নেমেছে, আমি হাজার চক্রের মধ্যে নিজেকে ঢুকিয়েও তার ভেতর থেকে পালাতে পারছি না।

সারা সন্ধ্যায় একজন মৃতপ্রায় নারীকে নিয়ে জীবন মৃত্যু করতে করতেও এক মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারছিলাম না, আমার অতীতকে। একদিকে দুর্মর আতঙ্ক, মহিলা বাঁচবে তো ? পরমুহূর্তেই সেই শহরের বৃহদাকায় তালগাছ, তার নিচের বাতাস... আমি রঞ্জন... আমি রঞ্জন... আমার হাতের তালু শুকিয়ে আসতে থাকলে ফের নিজেকে টেনে হাসপাতালের বারান্দায় ফেলি... চারপাশে আহত বেদনার আহাজারি, বিপন্ন জীবনের ক্রন্দন... আমি জানতাম, এমন একটা কিছু ঘটবে... মহিলা অকল্পনীয় নিঃসঙ্গ ছিল, কৌতূহল চিড়িক দিয়ে ওঠে, কে এই নারী ? তার জীবনের এ-কী রূপ ? পৃথিবীতে তার কেউ নেই ? এ হয় ? সারা বারান্দায় আমি আর ওই ক্রন্দনরত ছেলেটি... দেখতে দেখতে ছায়ার মধ্যে ঘুলিয়ে ফেলি

সব... আশ্চর্য বহ্নিশিখা, ঝলসে উঠছে আমার স্বপ্নাতুর চোখ, আমার কী সুন্দর ?

তোমার ? সব সুন্দর।

যুবতী হয়েছিলাম গো, সেদিন নিজেকে চিনেছিলাম, আর জেনেছিলাম, পৃথিবী অনেক সুন্দর! সারারাত মরা জ্যোৎস্নায় এক শব্দের অনুরণন— তোমার সব সুন্দর... তোমার সব... তোমার...।

যেন রিসিভারটার দিকে ভূতে টেনে নেয় আমাকে। আমি কম্পিত, অস্থির আঙুলে রঞ্জনের কাছ থেকে নেয়া ওর বাসার নাম্বারে ঘোরাই, গভীর রাত্তিরে, আমি আমার মধ্য থেকে বিমুক্ত হয়ে, দিন রাতের সব হিসেব, জীবনের হিসেব হারিয়ে ফেলি... দিঘির শিয়রে তরঙ্গ এসে ধাক্কা খায়,

আহ! এত জীবন্ত, এখনো এত টাটকা সেই বেদনা!

হ্যালো!

কণ্ঠ শুনে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি।

হ্যালো... হ্যালো! আমি কান পেতে রঞ্জনের কণ্ঠ শুনি। রিসিভার রেখে বিছানায় অবসন্ন দেহে লুটিয়ে পড়তে পড়তে ভাবি, স্বপ্নের চূড়ান্তে গিয়ে যে বোধের গলা চেপে ধরেছিলাম, তার আত্মাকে জাগতে দেব না। আমার পৃথিবী শত কন্টকে আকীর্ণ, সেখানে আর কোনো স্বপ্নভঙ্গের বেদনা নয়।

রঞ্জনকে আমি চিনতাম।

এখন চিনি না।

পরদিন নিজেকে সুস্থির করে ক্লিনিকে যাই। ভদ্রমহিলাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। অবস্থা এখন অনেকটা ভালোর দিকে। ছিমছাম টিপটপ ক্লিনিক। নিজের বিপদের সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে সুলেখা সব সময় কৈলাসের কাছে বেশ মোটা অংকের টাকা গচ্ছিত রাখেন। কৈলাস তা দিয়েই পরিস্থিতি ঠেকা দিচ্ছে। শাদা পর্দা উড়ছে, তার ওপাশে ধবধবে দেয়ালে বিদেশী মহিলা শিশুকে স্তন পান করাচ্ছে। একটা ছোট টেবিল ঘিরে বসে তিনজন ইয়াং ডাক্তার গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে কথা বলছে। ঔষধ-পত্তর আর ডেটলের গন্ধে ক্লিনিকের বাতাস বিশুদ্ধ। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দারোয়ান কৈলাসের কাছ থেকে মহিলা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পেরে তাঁর সম্পর্কে কৌতূহল আমার দ্বিগুণ বেড়ে যায়। কৈলাস এই আত্মীয় পরিজনহীন নগরে আমাকে পেয়ে অথই জলে যেন খড়কুটো খুঁজে পায়। মহিলার নাম সুলেখা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক সময় কোলকাতা ফিল্মের জাঁহাবাজ অভিনেত্রী ছিলেন। তাঁর রূপ আর অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে বহু তরুণের জীবন নষ্ট হয়েছে, বহু তরুণীর দুঃসহ ঈর্ষার রাত্রি অতিবাহিত হয়েছে। যখন জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়ছে, তখন এখানকার এক বড় ব্যবসায়ী, বিপত্নীক বুড়ো ভদ্রলোক তাকে বিয়ে করে এপারে নিয়ে আসে। ভদ্রলোক নিঃসন্তান ছিল। সুলেখার গর্ভেও কোনো সন্তান হয় নি। মৃত্যুর আগে ওই বুড়ো সুলেখার নামে এই বাড়ি আর ব্যাংকে প্রচুর টাকা লিখে দিয়ে যায়। তারপর থেকে মহিলা একা।

দিদি, আমি ছোটবেলায় ওদের বাড়ি মানুষ হয়েছি, কৈলাস কাতর স্বরে বলে, আসার সময় তিনি শুধু আমাকে সাথে নিয়ে এসেছেন।

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করি, বাড়িতে আর লোক নেই কেন ? তাঁর স্বামীর কোনো আত্মীয় স্বজন ছিল না ?

ছিল না আবার ? সম্পত্তির কারণে ওরা রানীমাকে খুন করতে চেয়েছে পর্যন্ত। সব দেখে শুনে ঘেন্নায় রানীমা অন্তঃপুরবাসিনী হয়েছেন।

ক্লিনিক থেকে বেরিয়ে বহুদিন পর দিলারার কথা মনে পড়ে। আমরা পাঁচবোন, যত নিকৃষ্টই হোক সেই জীবন, একসময় একটি বৃন্তে বাঁধা ছিলাম। ক্ষুধা, যন্ত্রণা, আনন্দ সবকিছু ভাগ করে নিতে নিতে আমরা অনেক সময়ই ভেবেছি দূরে কোথাও পালিয়ে যাই, ভেবেছি, সামনে হয়তো এমন মহাজীবন অপেক্ষমান, যার ভেতর গিয়ে আমরা বাঁচার গ্লানি ভুলে যাব। একটি অপ্রশস্ত বিছানায় ঘেমোগন্ধে এক হয়ে আমরা প্রত্যেকের প্রবণতা মুখস্থ করেছি। জেনেছি আফসানাকে বাথরুমের জন্য মধ্যরাতে জাগিয়ে দিতে হয়, শায়লা আমার গায়ে পা উঠিয়ে দেয়, দিলারা মধ্যরাতে ঘুমের মধ্যে কাঁদে, সায়রা নিষ্প্রাণহীনতায় ভোগে। জেনে গেছি, দেরিতে ঘুম ভাঙে সায়রার, দিলারা ভোরের পুকুরপাড়ে বাতাস খায়। শায়লা এক্সারসাইজ করে, প্রতিভোরেই ঘ্যান ঘ্যান করে আফসানা... আগে বাথরুমে যাওয়া নিয়ে, ইলিশের পেটি খাওয়া নিয়ে, সংসারের কাজ কে বেশি করেছে এই নিয়ে ধাক্কাধাক্কি হুলুস্থুলের মধ্যে সেই অপেক্ষমাণ মহাজীবনের স্বপ্নে আমরা কখনো নিজেকে বিচ্ছিন্ন ভাবতাম না। এমনকি সায়রাবু, যেহেতু জানত দ্রৌপদীর গল্প, এই প্রস্তাবও একদিন রেখেছিল, ওই কাহিনীর উল্টা হইলে কেমন হয় ? আমরা পাঁচবোন এক স্বামীর ঘর করলাম। সেটা শুনে ক্ষুদে আফসানার সে-কী বায়না, যখন স্বামীর রাত ভাগ করছিল সায়রাবু, আচমকা কাঁদো কাঁদো স্বরে আফসানা বলে ওঠে, আমার ঘরে তিনি তিনরাত থাকবেন। এটা শুনে সায়রাবু হাসতে হাসতে খুন, তিনরাত ওই ব্যাটা কি তোর সাথে লুডু খেলবো ? তোর শরীরে তো কিচ্ছু ফোটে নাই। দিলারা বলছিল অন্যকথা, ইসলামে চারটা পর্যন্ত পারা যায়, পাঁচটা তো সে চাইলেও পারতেছে না। সায়রাবু ভেবে বলছিল, তাহলে আফসানা বাদ। ও আমাদের সবার সংসারে ভাগ ভাগ কইরা থাকব।

হায়রে এটা শুনে সে-কী কান্না আফসানার!

আমাদের মধ্যে দিলারা ছিল সুশৃঙ্খল। আমাদের ওইরকম বখাটে সংসার থেকে সে নিজেকে সন্তর্পণে সরিয়ে যত্নের সাথে বড় করেছে। নিঃশব্দে স্কুলে যেত, স্কুল থেকে এসে পাঠ্য বইয়ে মুখ গুঁজে থাকত।

ওর স্কুলের এক মাস্টার ওকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন। তিনি বিনা খরচায় দিলারাকে পড়ানোর দায়িত্ব নিলে আমরা সবাই বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমার এখনো স্পষ্ট চোখে ভাসে সেই সন্ধ্যাকালীন পড়ার দৃশ্য... মাঝখানে হারিকেন, খাতায় নিজেকে উপুড় করে দিয়েছে দিলারা, আর সেই মাস্টার, পৃথিবী বিস্মৃত হয়ে চেয়ে আছেন তার দিকে। তখনো রঞ্জন আসে নি আমার জীবনে, আমি জানতাম না, একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে এমন কি জাদু করতে পারে, যার ঘোরে শুধু দেখার নেশায় মানুষ চতুর্পাশ ভুলে যায় ? ক্রমশ বদলে যেতে থাকে সন্ধ্যার দৃশ্য... আমি দেখি, সলতে কাঁপছে, বিচ্ছুরিত আলোর স্রোতে কাঁপছে দিলারাও, তার সামনের খাতা টাল খেয়ে টেবিলের কার্নিশ ধরে ঝুলছে।

দিলারা ভাগ্যবতী, তার স্বপ্নভঙ্গ হয় নি। আমরা ওই নিরানন্দময় সংসারে প্রথম মজা করেছিলাম দিলারার বিয়েতেই। কিন্তু তারপর কী হলো, ক্রমশ দূরে সরে যেতে থাকল সে। তার স্বামী ভালো, সন্তানেরাও উচ্ছ্বাসময়, সে নিজেও সুখী-কিন্তু আমরা কেউ গেলেই সে বড় ইতস্তত করে, শাশুড়ির সেবা করতে ভেতরে চলে যায়, কেমন যেন তার মুখ থেকে হাসি নিভে যেতে থাকে, অথচ তার স্বামী আমাদের দেখলে প্রচণ্ড খুশি হয়, আমরা কম যাই বলে নানা অনুযোগ করে... আমি জোড়াপট্টি দিয়ে কিছুতেই কিছু মেলাতে না পেরে, যা পারি, তাই করি। ওর সাথে যোগাযোগ কমিয়ে দেই। এখন তিন মাসে একবার আমাদের দেখা হয় কী না সন্দেহ। আজ ভেতর থেকে কেউ যেন তাড়া দিচ্ছে, একবার গিয়েই দেখি না, কেমন আছে ও ? ভিড় রাস্তায় দুচোখ বধির করে কান জেগে ওঠে— ও আমরা পাঁচবোন, পাঁচবোন চম্পা, এক সুরে গান গাই, এক সুতোয় চুল বাঁধি, এক ঘুমে মরে যাই...।

এর মধ্যে পুলিশ দ্বারা ধর্ষিতা ইয়াসমিন হত্যার রায় হয়েছে। তিন পুলিশকে ফাঁসির আদেশ দেয়ায় আন্দোলনকারী নারী কর্মীরা আবার আশার আলো দেখতে পাচ্ছে।

প্রেসক্লাবের সামনে মহাগ্যাঞ্জাম।

গার্মেন্টিস এর মেয়েদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দাবি দাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কদিন যাবৎ-ই বিভিন্ন সংগঠন মিটিং মিছিল করে আসছিল। শায়লা দু'দিন আগেই বলছিল, সেদিন বিভিন্ন নেতা যখন একটা গার্মেন্টিসের সামনে দাঁড়িয়ে বিশাল জনতার সামনে সেই মেয়েদের অমানবিক জীবনের বর্ণনা দিচ্ছিল, তখন সেই বদ্ধ খাঁচার মধ্যের মেয়েগুলো যার যার মেশিন ছেড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল বারান্দায়। তারা বক্তৃতা শুনে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে কেউ কাঁদছিল, কেউ হাত নাড়ছিল, কেউ চিৎকার করে বলছিল— তোমাদের সাথে আমরা আছি। এবং এই সবকিছুর পরিপ্রেক্ষিতে গার্মেন্টিস মেয়েগুলোকে মালিক পক্ষ টেনে হিঁচড়ে ভেতরে নিয়ে অশ্লীল গালি-গালাজসহ মর্মান্তিকভাবে ওদের ওপর চড়াও হয়েছিল। তাদেরকে মাটিতে ফেলে এলোপাথাড়ি লাথি, বেত দিয়ে পিটিয়েছিল। পরে দেখা গেছে, বিভিন্ন গার্মেন্টিস থেকে প্রায় বিশ হাজার কর্মচারীকে ছাঁটাই করে দেয়া হয়েছে এই আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করার জন্য।

এতদিন শায়লা, যেহেতু সুপারভাইজার, অপারেটরদের মতো অতটা দুঃসহ জীবন যাপন করতে হয় না, নিশ্চুপ ছিল। আজ প্রেসক্লাবের সামনের মিটিংয়ে সে হাফটাইম কাজ করে চাকরির ঝুঁকি নিয়ে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আমি হয়তো ভীরু, আপোসকামী, গত রাতে বলেছিলাম, এতে করে তোর চাকরিটা চইলা যাইতে পারে। শায়লার সে-কী তড়পানি! তুমি পত্রিকায় কাজ কইরাও যদি একথা বলো! তুমি চিরকালই পলায়নবাদী। সব জাইনাও তুমি বলতেছ এরকম একটা পরিস্থিতিতে ভীতুর মতো আপোস করতে ? আমরা টান না দিলে ওই বলদগুলো, যারা দিনের পর দিন আপোস কইরা চলতেছে, আরো আরো জঘন্য কুৎসিত জীবনের দিকে নিজেদের ঠেইলা দিব। বুবু, এই আমার প্রথম সুযোগ ওদের সামনে নিজের সত্য রূপটা প্রকাশ করার। আমি সুপারভাইজার, আমারে ওরা বিশ্বাস করে না, মনে করে আমি মালিক পক্ষের লোক, আমি অফিসার, ওরা শ্রমিক, ওদের দুঃখ আমি বুঝব না... প্রেসক্লাবের সামনে আমি ওদের সবার

হয়া এমন জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিমু,... বুবু, এই সময় আমি তোমার কাছ থাইকা সাহস চাই, তুমি ভুইলা গেছ সেইসব দিনের কথা? তুমি নিজেও এই জীবনের মধ্যে ছিলা, তুমি যদি...।

আমার শরীর হিম কাঁপিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল অতীত, বাবা-মা'র সংসারের বাইরে প্রথম পা রাখার লোমহর্ষক অধ্যায়, আমি শায়লার কথার উত্তরে সহসা কিছু বলতে পারি নি, শুধু ফিসফিস করে এটুকুই উচ্চারণ করেছিলাম— এই আন্দোলন, এই প্রতিবাদ সভায় আদৌ কিছু হইব কি-না আমি জানি না, তুই নিজেই যথেষ্ট ভালো বুঝস।

রিকশা ছেড়ে আমি রোড ডিভাইডারে বসে শায়লাকে খুঁজি। সন্ধ্যা পেরোচ্ছে। গণসংগীত চলছে। ঝাঁকড়া চুল নেড়ে অপূর্ব কায়দায় একজন হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে, সামনে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন মানুষ, বেশির ভাগই রাস্তায় আসন গেড়ে বসেছে... বাঁয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে পুলিশ জড়ো হচ্ছে আর আকাশে রাজ্যির লাল জট পাকাচ্ছে... এর মধ্যেই কানে আসে গানের লাইন— "আমারে তালা বন্ধ রেখে, আমারে আগুনে পুড়িয়ে মেরে, শুধু প্রেসনোট শুধু প্রেসনোট আমি চাই না, বন্ধ— দমবন্ধ ঘরে আমারে আটক, আমি মানব না..."।

আমি কেমন বিমোহিত হয়ে শুনি। এরমধ্যে ব্যানার টাঙিয়ে বিভিন্ন সংগঠন শ্লোগান দিতে দিতে আসছে, আমি একটা মিছিলের অগ্রভাগে শায়লাকে দেখি। আমার হাত-পা কেমন শির শির করতে থাকে। আশ্চর্য এক ভয় আমাকে চারপাশ থেকে ছেঁকে ধরে। নিজের অস্তিত্ব সংকটের বিষয়ে যে শায়লা এত সচেতন, সে কিনা এরকম একটা বিপদজনক আন্দোলনের মধ্যে নিজেকে সেঁধিয়ে দিল! ওর চরিত্রের সাথে এই বেহিসেবী আবেগটাকে আমি কিছুতেই মেলাতে পারি না। আজকের এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যদি ওর চাকরিটা চলে যায়? বিভিন্ন নেতারা বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছেন এর মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসছে বিভিন্ন চিত্র। মালিকদের লুটপাট, অবহেলা এবং সরকারের দায়িত্বহীনতার জন্য কিছুদিন পরপরই অগ্নিকাণ্ডে শত শত শ্রমিক নিহত হচ্ছে। মাসে একদিনও ছুটির ব্যবস্থা না রেখে, সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত ন্যূনতম মজুরির বিনিময়ে কি অমানবিকভাবে মালিকরা শ্রমিকদের শ্রম আদায় করছে, গার্মেন্টস শ্রমিকদের কোনো নিরাপত্তা নাই, যে-কোনো সময়ে মালিকদের দালাল এবং মাস্তানরা তাদের ওপর কি অবলীলায় হামলা করে পার পেয়ে যায়... শুনতে শুনতে আমি দেখি শায়লাকে, উত্তেজিত হয়ে ফিসফিস করে দু'তিন জন ছেলেকে কি সব যেন বলছে... ওকে দেখে আমার রক্তস্রোত উষ্ণ হয়ে ওঠে, আমাকে ও লক্ষ করে না... বিশীর্ণ আঁধার ফুঁড়ে জ্বলে উঠছে ঝাঁক ঝাঁক বাতি... বাবার মুখটা মনে পড়ে... আমার বুকে বল্লমের খোঁচা দিয়ে জেগে ওঠে শব্দ... তোমার মা'র সাথে শওকতের... কান্না ভরা কণ্ঠে চিৎকার করছে একজন শ্রমিক— আমরা যে মানুষ-অন্তত এই সার্টিফিকেটটা আমাদের দিন... আমরা বেশি বেতন চাই না, রক্ত বিক্রি করা শ্রমের বিনিময়ে যে মজুরি আমরা পাই, মাসের পর মাস সেটা আপনারা আটকে রাখবেন না... আমাদের জীবনের নিরাপত্তা দিন... সীমা, পারুল, ইয়াসমীনসহ সব শ্রমজীবী নারীর ওপর নির্যাতনকারী হত্যাকারী পুলিশ, মাস্তান, খুনীদের বিচার করুন... বাতির তলায় গাঢ়কৃষ্ণ আঁধার... পুলিশেরা জড়ো হয়ে কী সব গল্প করছে... পেছনের রাস্তায় চলাচলরত কিছু রিকশাওয়ালা থমকে দাঁড়িয়ে কিছুদূর বক্তৃতা শুনে ফের চলতে শুরু করেছে... আকাশটা মেঘে থমথম হয়ে উঠতে থাকলে আমি শায়লাকে খুঁজি... সামনের মানুষ ঢেকে যায় আঁধারে, মা'র আঁচল টেনে ধরি... আমার ভয় করতেছে মা, বাথরুমটা দূরে... বাইরে রাজ্যির রাত, মা আমাকে নিজের গন্ধভরা শাড়ির

সাথে চেপে ধরেন... কিছু ভয় নাই মা... শওকত মামা দিলারার সামনে গম্ভীর হয়ে বসে থাকেন— তাহলে তুমি পড়বানা ঠিক করছ ? নির্জন দিলারা সাপের মতন ফুঁসে ওঠে— আপনের টাকায় পড়ব না... আর মা... মধ্যরাতে আমাকে জড়িয়ে সে-কী ফিসফিস কান্না তাঁর... নীলুফার, আমার বড় ভয় করতেছে, আমি বোধহয় আর পারলাম না—।

সামনের সারিসারি মাথার ওপর দিয়ে ধেয়ে আসছে শায়লার কণ্ঠ... আমি চকিতে মুখ তুলি... এই শায়লাকে কি আমি চিনি ? বিচ্ছুরিত আলোর নিচে গনগনে হয়ে উঠেছে তার মুখ, আগুন বেরোচ্ছে কণ্ঠ থেকে... শ্রমজীবী নারীর ওপর হামলাকারী ধর্মীয় ফতোয়াবাজদের বিচার চাই... কাজ চলাকালীন কারখানা তালাবদ্ধ রাখা চলবে না, বিকল্প সিঁড়ি তৈরি করতে হবে... রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের অব্যবস্থা, অচলাবস্থা, দুর্নীতি এবং বিরাষ্ট্রীয়করণের নামে লুটপাট বন্ধ করতে হবে... গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নারীশ্রমিকদের মজুরি বৈষম্য দূর করতে হবে— আমার যে কী হয়েছে, মাথা ঝিমঝিম করে... আকাশে বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে... এক সময় আমার চোখের পাতা আমূল কাঁপিয়ে জল আসতে চায়... রঞ্জন... রঞ্জন... এই শহরের কোথায় আছ তুমি ? তুমি কোনো উপন্যাসের চরিত্র নও... কোনো রূপকথা নও... পর্দার কোনো ছবি নও... বাস্তব, জীবন্ত, আমার অনেক চেনা, তা-ও কেন এত সুদূরের ? এত স্পর্শাতীত ? তোমার ছায়া হাতড়ে হাতড়ে আমি কাউকে কেন্দ্র করে রোমাঞ্চ কী, তরঙ্গ কী, প্রেম কী কিচ্ছু চিনতে পারলাম না... শায়লা, আমি পলায়নবাদী, আমি তোদের এইসব কষ্ট বুঝি, কিন্তু তার ছায়ায় আশ্রয় নিতে পারি না—।

এইবার শায়লার কণ্ঠ ভেসে আসছে, আপনারাই বলুন, আমি কি বেশ্যা ? শামীমা বেশ্যা ? শেষ নিঃশ্বাসটা মেশিনের মধ্যে ঢেলে বাড়ি ফেরার পথে পুলিশ যদি বলে, তুই বেশ্যা! বেশ্যা! বেশ্যা! আপনারাই বলেন, আমি এই বাঁচার গ্লানি কোথায় লুকাব ?

পুলিশগুলি উন্মুখ হয়ে শুনছে... পেছনে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেছে অনেক অনেক যানবাহন... আমি তল থেকে উঠে আসি, আমার বড় অদ্ভুত লাগতে থাকে সবকিছু... পুরো পরিবেশের নাটকীয়তায় আমার সর্ব অস্তিত্ব রোমাঞ্চিত হয়ে অন্য এক বোধের জন্ম হয়। আজকের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শায়লা যদি ছাঁটাই হয়, আমি ওর পাশে দাঁড়াব।

ধুধূ রিকশায় দু'বোনের কোনো কথা হয় না। আমি যেন আজ ওকে আর চিনতে পারছি না। ও অবশ্য চিরকালই শক্ত ধাঁচের, বাস্তববাদী... তবে আজ নিজের অস্তিত্বের কথা চিন্তা না করে যে ঝুঁকি সে নিল, সেই শায়লাকে আমি যেন আর ছুঁতে পারছি না... আমার আড়ষ্ট হাত ওর পিঠে রাখতেই ও যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল, কিছু বলতেছ ? হাওয়া ঘোরাতে আমি বলি— আমার বড় ইচ্ছা ছিল, দিলারাবুর বাসায় যাই।

কী লাভ বুবু ? ওর ভালো থাকাটাই বড় কথা, আমরা না গেলে ও যদি ভালো থাকে, তাহলে সেটাই তারে থাকতে দেওয়া উচিত।

কিন্তু শায়লা, আমার বড় জানতে ইচ্ছা করে, কেন ও আমাদের ছাড়া ভালো থাকবো ? আমরা তো কোনো স্বার্থ নিয়া তার কাছে যাই না, এই প্রশ্নটাই শক্ত কইরা ওরে আমি করবো।

কিসসু লাভ নাই... শায়লা বড় রহস্যময় স্বরে বলে, যত এসব ঘাটবা স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় তত বেশি কাঁদবা, তোমার কী দরকার... জগতের সবাই ভালো থাকুক... ভালো থাকাটাই বড় কথা।

ভালো থাকাটাই বড় কথা ? আমি অবাক কণ্ঠে বলি, তুই আজ বলতেছস এই কথা ? যে কঠিন খারাপ থাকার মধ্যে কিছুক্ষণ আগে নিজেরে ঠেইলা দিয়া আইল ?

রাত্তিরের বাতাস ওঠা রাস্তায় বড় অদ্ভুত দেখায় শায়লার মুখকে... এ তো ভালো থাকার জন্যই, এতদিন তো শুধু বাঁইচাছিলাম, ভালো থাকার কথা তো কখনোই ভাইবা দেখি নাই।

ফোনের শব্দে ঘুম ভাঙে। মা'কে স্বপ্নে দেখছিলাম, দেখছিলাম আমি আর মা বিশাল এক মরুভূমির পথ ধরে হাঁটছি, ঝাঁঝালো সূর্যের তাপে পুড়ে যাচ্ছে বালি... আর হ্যালো! বলতে গিয়ে টের পাই বুক ধড়ফড় করছে, কণ্ঠ কাঁপছে, আর ওপাশে— আপনি কি নীলুফার বলছেন ?

বলছি... না, ছায়া কাটছে না, মাথাটা কেমন টাল খাচ্ছে, এর মধ্যে নিঃশ্বাস আটকে আসে। ওপাশের কণ্ঠে— আমি রঞ্জন!

ও মাই গড! সমস্ত ধূধূ সকাল উল্টে-পাল্টে যায়, আমি দেখি জানালা ছাপিয়ে ধেয়ে আসা রোদ্দুরের রঙ কেমন মরচে... আর বাতাসটা যেন থমকে গেল হঠাৎ, যেন বিছানা নয়, জলে শুয়ে আছি, এইভাবে শরীরটাকে খুঁজি। চাদর খামচে... উঠে বিষ— আশ্চর্য ! কথা বলছ না কেন ?

ফের ভূমণ্ডলে শব্দ ওঠে... আমি রঞ্জন! আমি রঞ্জন!

না, স্বপ্ন, এ বিভ্রম... আমি গভীর চোখে নিজের ঘরটাকে দেখি, আশ্চর্য! এত তৃষ্ণা জমা ছিল আমার অস্তিত্বে ? তুমি ভালো আছ নীলু ? কী হয়েছে ? কথা বলছ না যে ? এইবার আমার নিজেকে গোটানোর পালা, নিজের বিপন্নতা কাউকে দেখতে দেয়ার চাইতে মৃত্যু ভালো। স্ব-উচ্ছ্বাসে আমি ভান করি, ভালো আছি। আসলে আমি ভাবতে পারি নি তুমি ফোন করতে পার, বেশ একটু অবাক লাগছে।

তুমি বেরোতে পারবে ?

তার এই আচম্বিত আহ্বানে শরীরে ফের কাঁপুনি অনুভব করি, নিজেকে সামলে বলি, কোথায় ?

তুমিই বলো, কোথায় ?

আমি কেমন অসংলগ্ন হয়ে উঠি, আমি ঠিক জানি না, কোথায় ? সে নিজেও যেন এলোমেলো হয়ে যায়— কোথায় ? কোথায় ? আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না... রেস্তোরাঁ, পার্ক, না, কোথাও কথা বলার পরিবেশ নেই, তবে তোমার সাথে আমার কথা হওয়া খুব দরকার।

সেটা আমাকে দেখার পরই বুঝি মনে পড়ল ? ফোন টেনে আমি মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসি, এই শহরেই তো ছিলাম এতকাল দরকারের কথা মনে পড়ে নি ?

পড়েছে নীলু, অনেকবার পড়েছে, কিন্তু তোমার সামনে দাঁড়ানোর সাহসটাই নিজের মধ্যে তৈরি করতে পারি নি, সেদিন ওরকম অবাক রাস্তায় দেখা হওয়ায় প্রথম ধাক্কাটা সামলে উঠেছি। এখন মনে হচ্ছে, একটা বিষয় তোমার কাছে পরিষ্কার হওয়া দরকার, নইলে—।

কী আর হবে এইসব শুনে? আমি বিমর্ষ কণ্ঠে বলি, সবাই যার যার মতো তো ভালোই আছি, এখন আর কিছু বললে কারো জীবনে কি কোনো পরিবর্তন আসবে?

আমি কিছুক্ষণ পরে তোমাকে ফোন করি?

তার এই কথা শুনে নিঃশব্দে বসে থাকি, সহসা কিছু বলতে পারি না। নীলু, আমার অফিসের কিছু এমপ্লয়ী এসেছে আমি কাজটা সেরেই তোমাকে আবার করছি।

ফোন রেখে দিই।

পায়ে স্যান্ডেল ঢুকিয়ে বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে মুখে দ্রুত জলের ঝাপটা দিই। দিতে দিতে হাত ভার হয়ে আসতে থাকলে তোয়ালে নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াই। পাশের বাসার রেলিংয়ের ওপাশে অনাবিল হাত নাড়ছে একটা শিশু। সামনের বৃক্ষময় বাড়িটাকে আজ ভূতুড়ে লাগছে... আমার বুকের কাঁপুনি কমছে না, সাথে যন্ত্রণা, অসহ্য এক অভিমান... ফোন বাজছে, ছুটতে ছুটতে যাই, রঞ্জন বলে, জীবনের পরিবর্তনটাই কি সব নীলু? একজন পাপিষ্ঠও জীবনে মিথ্যা রেখে মৃত্যুর কথা ভাবতে পারে না, মানুষের মৃত্যুর পর তার আর থাকে কী? ফেলে যাওয়া জীবনে কি তার মিথ্যা, কি তার ভুল এ নিয়ে তখন কি আসে যায় ওর? কিন্তু তবুও সে মৃত্যুর সময়টায় নিজেকে সবার কাছে পরিষ্কার রেখে মরতে চায়, এত যে ভয়ঙ্কর কঠিন মৃত্যু, তার মধ্যেও মানুষের শান্তি লাভের লোভটা থাকে।

আমি নিঃশব্দে কান পেতে শুনি।

...আমি আরো কিছুক্ষণ পরে তোমাকে ফোন করি?

তুমি বাইরে বেরোনোর কথা বলেছিলে।

আসলে আমি ভেবেছিলাম আজকের দুপুরটায় কাজ কম থাকবে, একটু ফ্রি থাকতে পারব, কিন্তু কিছুক্ষণ আগেই বড় একটা ফ্যাসাদে আটকে গেলাম, তুমি আছ তো বাসায়?

আছি।

বলে দ্রুত কাপড় পাল্টাই। খালা এসে নাস্তা দিয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন। আমি ভূতগ্রস্তের মতন সামনে শুধু ছায়া দেখি, মানুষ দেখি না। কাঁধে ব্যাগ নিয়ে বেরোতে গেলে পেছনে খালার অবাক কণ্ঠ শুনি, খায়া গেলি না? ততক্ষণে সিঁড়ি টপকে নিচে নেমে এসেছি।

গলিটা ঝড়ের বেগে পার হয়ে একসময় টের পাই, শ্লথ হয়ে আসছে গতি।

মাথার ওপর পাগলের মতো কৃষ্ণচূড়া ফুটেছে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে অমলের বাঁশি, সায়রাবুর জল সাঁতার, আর তালগাছের নিচে, আমি— রঞ্জন। এ কী দুর্বিপাকের মধ্যে পড়লাম এই বয়সে এসে? জানতাম তো ঘুণ শুধু কাঁচা বাঁশকেই কাটে। তবে? যেন এক অসম্ভব বোধ সত্তার মধ্যে নিরবে ঘাপটি মেরেছিল, হঠাৎ ঘাই খেয়ে, গুঁতো খেয়ে তরতর শব্দে সমস্ত রক্তের মধ্যে ছড়াতে শুরু করেছে। আমার দম ভারি হয়ে আসে, ওর আরেকবার ফোন করার কথা ছিল... ধাই ধাই কৃষ্ণচূড়ার দিকে তাকিয়ে নিজেকে শান্ত করি, কী হবে আর ফোন রিসিভ করে? ওকে কেন্দ্র করে যে বিপদজনক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে নিজের ভেতর, ওর সাথে যোগাযোগ সেই বিষয়কে মর্মান্তিক করে তুলবে। নীলুফার, তোমার হিসেবের জীবনে এই বোধকে প্রশ্রয় দেয়ার সৌখিনতা মানায় না, সুস্থ মানুষ সামনে হাঁটে, পেছনে হাঁটে দুঃখ বিলাসিরা। অন্তত দুঃখটাকে বিলাসে নিয়ে যাওয়া মানে দুঃখকে তোমার অপমান করাই হবে। সেই যোগ্যতা তোমার কই? ভাবতে ভাবতে আচ্ছন্নের মতো ফের

ঘরের দিকে হেঁটে আসতে থাকি। সিঁড়ি টপকাই। প্রচণ্ড শরীর খারাপ লাগছে। খালা অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন, কী হইছে তোমার? ফিরা আইলা যে?

আমি নিঃশব্দে ভেতর ঘরে যাই, আমার অবচেতন হাত ব্যাগ থেকে বের করে কার্ড, নাম্বার ঘোরাই... মশিউর হাসান সাহেব কি আছেন? ওর ভালো নাম... আমার বুক কাঁপতে থাকে... উত্তর আসে... উনি বিশেষ কাজে কিছুক্ষণ আগে অফিস থেকে বেরিয়ে গেছেন।

পরদিন অফিসে যাওয়ার জন্য রিকশায় চেপে বসি। রিকশা চলতে শুরু করেছে। আমি বড় বুবু সায়রার ছেলে বুলবুলকে দেখি চারপাঁচটা ছেলের সাথে জনবহুল শহরেই একটা স্কুটার আটকে রেখেছে। আমার রক্তস্রোত প্রবল হয়। ও কি ছিনতাই করছে? ওর সম্পর্কে আমি এই তথ্য জানি, কিন্তু আজ চোখের সামনে... আমার মাথা খারাপ হওয়ার যোগাড় হয়। মুহূর্তে আমি রিকশা ঘোরাই। কিছুক্ষণ সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে মস্ত এক ভার অনুভব করি। অনুভব করি, আমি যেন চলৎশক্তিহীনভাবে নিজেকে টেনে নিয়ে চলেছি। এইভাবে রিকশা যখন এসে সিগনালে দাঁড়ায় দেহটা ক্রমশ কেমন হালকা হয়ে আসে। সেই সাথে মাথার খিচিমিচি জটও খুলতে শুরু করে। কোনো মস্ত আঘাত নিয়েও আমি বেশিক্ষণ ভুগতে পারি না। জন্মের পর থেকে জীবনের অন্ধকার দিকগুলো দেখে বড় হতে হতে আমার অবস্থাটা এমন দাঁড়িয়েছে, কোনো বিষয়কেই খুব অশ্লীল, বিপদজনক, গুরুতর মনে হয় না। মাঝে মাঝে নিজেকে আমার বেশ্যা পাড়ায় বড় হওয়া মানুষ বলে মনে হয়, যে তার মায়ের বিভিন্ন জনের নিচে শুয়ে থাকাকে মায়ের জীবনের স্বাভাবিক রূপ মনে করে।

রঞ্জন! রঞ্জন! পরিচয়ের পর বড় স্বপ্নময়, বড় প্রকৃতিকাতর, বিপ্রলব্ধ মনে হয়েছিল ওকে। ওকে যত দেখেছি ওর সাথে ঘনীভূত হয়েছে অনুভব, আমি যেন অনেকটাই চিনতে পেরেছিলাম পাপ, শুদ্ধতার ভেদ, আমার কাঙ্ক্ষা আর মর্ম অনুভব করেছিল একেই আমি খুঁজছিলাম। এর কাছেই সঞ্চিত আমার যাযাবর জীবনের মহার্ঘ্য। একজন শিশুর কাছে তার মায়ের স্তনই যেমন হয়ে ওঠে তার বিশ্ব, তার খাদ্য, তার সেরা খেলার পুতুল, যা তাকে সুস্থির রাখে, ওকে দেখলে একসময় আমার অনুভব অনেকটা ওরকম হতো। আমি আমার পেছনের অন্ধকার পৃথিবী ভুলে মনে করতাম আলোর নিচে এসে বসেছি। আমি রঙধনু দেখে উদ্ভাসিত হতে শিখি, বৃষ্টি আমাকে নস্টালজিক করে তোলে, আমি নিঃশ্বাস পেতে ঋতু পরিবর্তন টের পাই, জীবনের বাঁচার হিসেবের জায়গাটায় এসে সে-ই আমিও, ক্রমশ কেমন বদলে যেতে শুরু করি। তালগাছের নিচে বৃষ্টি এলো। নিজেদের বাঁচাতে আমরা ঠেসে গেলাম গাছের সাথে। সন্তর্পণে স্পর্শ সরিয়ে রেখেছিল সে। জলের শব্দের সাথে এক হয়েছিল ওর নিঃশ্বাসের শব্দ, তারপর ও গেয়ে উঠল, আহ্! কি অপার্থিব গান— অসীম ধনতো আছে তোমার তাহে। সেই ধন রঞ্জন দেখল না, ছুঁলো না— অদ্ভুত নিস্পৃহতায় একদিন মাড়িয়ে গেল! স্মৃতি! মিথ্যে স্মৃতি যত্তসব!

চারপাশে হাওয়া উঠেছে, তার নিচে চাপা পড়েছে রোদ্দুরের তেজ।

আমি রিকশা ঘোরাই।

মতিঝিলে নেমে লম্বা করে নিঃশ্বাস টানি। সমস্ত নগরের প্রাণকেন্দ্র এই স্থানের সুউচ্চ প্রাসাদগুলির দিকে তাকালে নিজেকে বড় অসাড় মনে হয়। এই জায়গার প্রতিটি মানুষ দম দেয়া পুতুলের মতন কত বিচিত্র কাজের মধ্যে যে উন্মাদ হয়ে আছে। কর্মমুখর এক

অট্টালিকার সিঁড়ি ঘষটে ঘষটে আমি এসে দাঁড়াই এমন এক জায়গায়, যে জায়গায় এসে দাঁড়ানোর কথা কল্পনা করলে আমার বুক ঠেলে ঘৃণা উপচে ওঠে। সামনে ছোট্ট টেবিল, তার ওপর স্তূপীকৃত কাগজ, ওপাশে টাক মাথা, পান খেয়ে রসালো হয়ে ওঠা ঠোঁট, সবচেয়ে জঘন্য যেটা, প্রায় পলকহীন পিটপিটে দুটি চোখ। বামুনাকৃতির এই লোকটি আমাকে দেখে এমন ভাব প্রকাশ করে, যেন রোজই আমার সাথে তার দেখা হয়।

আমি চেয়ার টেনে বসি।

লোকটি ফাইলে নিমগ্ন থেকে বলে, এদ্দিন পর কী মনে কইরা? আমি কিছুক্ষণ কথা বলতে পারি না।

কথার জবাব দেওনা ক্যান?

সায়রাবু কেমন আছে?

সেইটা আমার বাসায় গিয়া খোঁজ নিয়া দেখো।

আমি অসহিষ্ণু হয়ে উঠি, একটা দৃশ্য দেখে মাথাটা খারাপ হয়ে যাওয়ায় আপনার এখানে এলাম, বুলবুলকে দেখলাম রাস্তায় ছিনতাই করছে, ছেলে কী করে, কোথায় যায়...

আমার ভগ্নীপতি প্রায় খেঁকিয়ে ওঠে— তোমার ব্যাগ ছিনতাই করছে?

আমি সশব্দে দাঁড়াই, আপনি যে মানুষ না, সেটা জানতাম। কিন্তু একটা পশুর গুণাবলিও যে আপনি হারিয়ে বসে আছেন জানতাম না, চলি।

ছুটে বেরিয়ে আসতে গিয়ে টের পাই চারপাশে অনেক শব্দ, অনেক চেয়ার টেবিল, অনেক কর্মব্যস্ত মানুষ, সব ছাপিয়ে সেই বামুনাকৃতির লোকটি, যার নাম মন্তাজ মিয়া, যে আমার বড় বোনের এমন একজন স্বামী, বছরের পর বছর ধরে আমার বোনকে যে নিজের কব্জায় জিম্মি করে রাখার ক্ষমতা রাখে, তার কণ্ঠ উচ্চকিত হয়ে উঠেছে, চা খায়া গেলা না?

আমি সরে দাঁড়াই, ধন্যবাদ।

লোকটির গলার স্বর ঘ্যাড়ঘ্যাড় করে ওঠে— তুমার বইনের জন্ডিস হইছে।

আমি ঘুরে দাঁড়াই, ডাক্তার দেখাইছেন?

জন্ডিস একটা রোগ হইল? যাও, যাও, পিতলা দরদ আমার ভালা লাগে না।

গনগনে মাথা নিয়ে মতিঝিল থেকে বেরিয়ে সায়রার বাসায় যাওয়ার জন্য বাসে চেপে বসি। বুকের মধ্যে অসহ্য তড়পানি আর ঘিনঘিনে অপমান বোধ নিয়ে মানুষের ভিড়ে থিতু হয়ে বসে থাকি। চারপাশ থেকে ভুর ভুর করে ভেতরে ঢুকছে ধোঁয়া, পোড়া পেট্রোলের গন্ধ... মন্তাজ মিয়া কেমন একটা হনুমানের মতো গলা বাড়ায়, ওর সামনে থেকে পালাতে শায়লাকে নিয়ে পড়ি, ওর চাকরিটা আজ থাকলে হয়। বুক ঢিব ঢিব করে, আমার অফিসেও রাজ্যির কাজ জমে আছে। সময় পেরিয়ে গেছে, কম্পিউটারে এখনো ম্যাটার জমা দেয়া হয় নি। অকস্মাৎ বাসটা ঝাঁকুনি খায়, সামনের হ্যান্ডেল ধরে থাকা গুমোট গন্ধের লোকটা আমার কোলের ওপর বসে পড়ে... মাগো! চিৎকার করে উঠি প্রায়, লোকটি কাতর মুখে 'দুঃখিত!' বলতে বলতে দাঁড়ায়। মেজাজ এমন খিচড়ে ওঠে, শাহবাগে বাস এসে দাঁড়ালে ইচ্ছে হয়, নেমে পড়ি। তখনই আমাকে স্থবির করে দিয়ে ভেতরে এগিয়ে আসে রঞ্জন— আমাকে ওর কি বলার ছিল?

স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে পেপার কিনি। মনটা অন্য এক বিমর্ষতায় ভরে যায়— 'মাদার তেরেসা আর নেই।' এরপর লক্ষ করি তেরেসার মহান মৃত্যু ঢেকে গেছে ডায়নার মৃত্যুর চমকের তলায়।

সায়রাবুর বাসায় গিয়ে যখন পৌঁছাই, দুপুর পেরিয়ে যায়। ক্ষিদেয় আমার নাড়িভুঁড়ি উল্টে আসার উপক্রম হয়। অন্ধগলির শেষ মাথায় স্যাঁতসেঁতে আস্তর পড়া বাড়ি। সামনের মাধবীলতার ঝাড় জলের অভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে। চিকন সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে বাঁয়ে বেল বাজাই। আমার মাথা থেকে সব খিচখিচে বাস্তবতা সরে বারবারই ঘা দিচ্ছে রঞ্জন, কী বলার ছিল ওর ? ক্ষিদের প্রচণ্ডতায় হাত-পা নুয়ে আসছে। আমি রীতিমতো কাঁপতে কাঁপতে দেখি, দরজা খুলে দিয়েছে দিলারা। ওকে দেখে আমি অবাক হয়ে ক্ষিদের কষ্ট ভুলে যাই, আর দিলারা, আমাকে দেখে সে তার দীর্ঘদিনের আচরণ ভুলে শিশুর মতো উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, আমাকে প্রায় জড়িয়ে ধরে সে ভেতরে নিয়ে যায়, সায়রাবু, দেখো, কে এসেছে ?

ভেতরের ঘরে যে বিছানায় সায়রাবু শুয়ে আছে, তার ওপরের স্ট্যান্ডে ময়লা মশারী ঝুলছে। বাথরুমের ভেতর থেকে ধেয়ে গন্ধ আসছে এবং মেঝেতে রাজ্যির ধুলো, তেল চিটচিটে চাদরের ওপর শুয়ে থাকা সায়রাবু গলা বাড়ায়, কে ?

হাড্ডিসার, মরাটে, চোখ গর্তে ঢুকে থাকা এই নারীকে আমি চিনি না... আমার কম্পন দ্রুততর হয়, আমি এই মাংসহীন মুখে পাগলের মতো খুঁজতে থাকি সেই মুখ, যে মুখ আমি জলে সাঁতার কাটা নারীর মধ্যে দেখতাম... কেমন একটা রাজকুমারীর ভাব ছিল ওর মধ্যে, স্বপ্ন আর রহস্যের মধ্যে ছিল নিরন্তর বাস। আমাকে বলত, বিয়ার পরে ঘাগরা পইরা আমি যখন সিঁড়ি দিয়া নামতে থাকবো, তখন আমার দাসীরা আমার যাওয়ার পথে বালতি বালতি দুধ ঢালতে থাকবো, আরো কত কথা! উদাস হয়ে বলত, আগের জন্মে আমি রূপচান্দা মাছ আছিলাম, দেখছ না পানি আমারে কেমন ভূতের মতন টানে! বলত, আচ্ছা নীলু, বিয়ার পরে স্বামী যখন আমারে হাজার হাজার অলঙ্কার দিবো, আমি কই পরমু ? আমার তো মোটে একটা শরীর।

সেই ছেলেবেলায় আমিও পড়তাম ভাবনায়, মনে হতো বিয়ের পরে সায়রাবুর এ এক গুরুতর সমস্যা, কিছুতেই কূল কিনার করতে পারতাম না। সায়রাবু হাসতে হাসতে বলত, তোরে কিছু দিয়া দিমু। তোরে না দিয়া কারে দিমু ক ? তুই হইলি গিয়া আমার জীবনের পয়লা প্রেম!

আহারে স্বপ্ন! রাতে আমার ঘুম আসে না, আমারওতো মোটে একটাই শরীর, এত গয়না দিয়ে আমি কি করব ? সায়রাবুকে আমার এমন লাগত, মনে হতো পৃথিবীতে ও যা চাইবে তা-ই হবে, অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছে ও, শুধু ওর কিছু চাইবার ইচ্ছাটাই নেই বলে কিছু হচ্ছে না। কী সব ঘোরে এমন আচ্ছন্ন হয়ে থাকত ও। আমার মনে হতো, কিছু চাইবার স্পৃহাই ওর ছায়াচ্ছন্নতার তলায় সারাক্ষণ ডুব মেরে থাকে। সেই বুবু এক রাতে আমাকে বলল, আমি হাওয়ায় মিলায়া যাওনের জাদু জানি।

গভীর রাত্তির, আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বারান্দায় এনে— এই কথা শুনে তো আমার মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়, চারপাশে ঘুটঘুটে আঁধার, সায়রার যা অসম্ভব প্রিয়, সেই আলো দীপিকার লেশমাত্র নেই, আমি ক্ষুদে শিশু অতবড় পৃথিবীর কীই-বা আর জানি,

তবুও... তবুও... বুকের ভেতরটা ফাঁকা হয়ে আসতে থাকায় প্রশ্ন করি— হাওয়ায় মিলায়া কই কই যাওয়া যায় ?

সায়রাবুর সে কী অপূর্ব সাজ! আঁধারে ঠিক মতো ঠাহর হয় না, তবুও সে এক সময় আঁধার ঘোচাতে মোমবাতি জ্বালায়। তাতেই তার চেহারা এমন রাজকুমারী, এমন অনিন্দ্য সুন্দর অচেনা— আমি বিমোহিত হয়ে চেয়ে থাকি।

সায়রাবু আমাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে বলে, আমি যেইখানে চাইবো, সেইখানে পরীরা যাইতে পারে, মানুষ পারে না। বুঝলি নীলু, সবচাইতে কষ্ট হইবো তোর জন্য। বিপত্নীক, সন্তানহীন শওকত মামা তখন আমাদের অভিভাবক, ক্ষুদে চিলেকোঠা টাইপের ঘরটায় রাত্তিরে থাকেন। নিঃশব্দে আমাদের পরিবারের সবাই তাঁর অভিভাবকত্ব মেনে নিয়েছে। আমি প্রথমে বোকার মতো তাঁর প্রসঙ্গেই প্রশ্ন করি— মামারে বইলা যাইবা না ?

না, কঠিন হয়ে ওঠে সায়রার মুখ... মোমবাতির আলোয় সেই মুখ দেখে আমি ভেবে পাই না, আমি কি এমন ভুল প্রশ্ন করলাম। হাওয়া ঘোরাতে পরমুহূর্তে বলি, ফিইরা আসবা কবে ? এইবার সায়রাবুর চোখে স্বপ্ন, যেন সে বেহেশতে যাচ্ছে, হিসেব নিকেশ হয়ে গেছে, পৃথিবীর মায়া বলে নিজের মধ্যে কিছু নেই, আমাকে বলে— আর ফিরব না।

আমি ভয়ে কাঁপতে থাকি— মা'রে ডাকি ?

না, বলতে বলতে কালো চাদরটা গায়ে চড়িয়ে সায়রাবু বলে, তুই চোখ বন্ধ কর। ভয়ে ভয়ে আমি চোখ বন্ধ করি। আমার শরীরে শেষ স্পর্শ করে, আমার ঠোঁটে শেষ চুমু খেয়ে অনেক কষ্টে সায়রাবু নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়।

সামনের কামরাঙা গাছে ঝিরঝির বাতাস বয়, সায়রাবুর এত প্রিয় পদ্মপুকুর থেকে বুনো গন্ধ আসে, পেছনে মা, আমরা সবাই, যারা এতদিন একসাথে লটকে পটকে থেকেছি... এইসব সহজ স্বাভাবিকতা থেকে এ কী আজব দুনিয়ায় উড়ে যেতে চাইছে সে ? প্রাণে কি তার মায়া নাই ? ভয় নাই ? আমি ফের তাকাই। যেন অমোঘ এক ভূত তাকে টানছে এইভাবে ফিসফিস করে সে চোখ বন্ধ করে— আতঙ্কে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসতে থাকলে আমি চোখ বন্ধ করি, জ্বলন্ত মোম আমার হাতে গলে পড়তে থাকলেও আর্তনাদ করি না, সায়রাবু ধীরে ধীরে বাতাসের সাথে মিলিয়ে যায়।

এই সেই বামুনাকৃতির রাজকুমার, যাকে দুপুরে আমি অফিসে দেখে এসেছি। এই রাক্ষসই সে রাতে জাদু করে সায়রাবুকে নিজের কব্জায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

সায়রাবুর এই কাণ্ডে আমি স্বপ্ন, সুন্দর আর কুৎসিতের ভেদ ভুলে গিয়েছিলাম। এই জীবনে এই জন্যই হয়তো জীবনের হিসেবে এত আমার গণ্ডগোল!

নীলুফার! বলতে বলতে সায়রাবুর অসাড় চোখ বেয়ে ঝর ঝর জল পড়তে থাকে। আমি ওর চুলের ভেতর আঙুল ঢুকাই। সায়রাবু হলদেটে মরাটে আঙুলগুলো দিয়ে আঁকড়ে ধরে আমার হাত আর চিরতৃষ্ণার্ত মানুষের মতো বিড়বিড় করে, নী... লু... নীলু...।

এই তো আমি... এই তো...। ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে আমি শিশুর মতো ফুঁপিয়ে উঠি, আর কিছু বলতে পারি না।

এর মধ্যে সায়রাবুর বাকি তিনজন ছেলে-মেয়ে জবুথবু পায়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কেমন ঢ্যাঙ্গা আর লম্বাটে হয়ে উঠেছে ওরা। আমি কাছে ডেকে মাথায় হাত বুলাতে গিয়ে টের পাই, যেন এরা অনেক দূরের, প্রাণ থেকে এদের আমি ছুঁতে পারি না।

দুপুরে কিছু খাইছস? দিলারার এই প্রশ্নে খাই খাই ক্ষিদেটা আমার মাথায় চড়ে বসে। আমি প্রায় কাঁপতে কাঁপতে বলি— না।

দিলারা দ্রুত রান্না ঘরে যায়। সায়রাবুর চোখের তৃষ্ণা মেটে না, বড় সুন্দর হইছস দেখতে, আফসানা... আফসানা কেমন আছে?

ভালো।

কোন ক্লাসে পড়ে এখন?

নাইনে।

শায়লা?

ভালো, বলতে বলতে ফের ওর মাথায় হাত রাখি, তোমার এই অবস্থা হইছে? ডাক্তার দেখাও না ক্যান?

দেখাই নাই আবার? তোর দুলাভাই তো অস্থির... আইজ এই ডাক্তার... কাল...। তার এই আরোপিত উচ্ছ্বাসে আমার বেদনা চতুর্গুণ হয়, আমি অসহায়ের মতন বলি, তুমি এইরকম বললে তো আমি তোমার কোনো সেবাই করতে পারব না। দুলাভাইয়ের কথা বাদ দেও, তুমি নিজে একজন ডাক্তার দেখাও। এই কথায় সায়রাবু অদ্ভুত চোখে আমার দিকে তাকায়, সহসা বাক্যের সূত্র ধরতে পারে না।

এরমধ্যে ভাত দিয়ে টেবিলে ডাক দেয় দিলারা।

আমি প্রায় হাত না ধুয়েই হামলে পড়ি খাদ্যের ওপর। কিছুক্ষণ পৃথিবীর কোনোদিকে না তাকিয়ে খেতে খেতে হঠাৎ মাথা তুলে দেখি দিলারার চোখ জলে ভরে উঠেছে।

আমি কেমন ক্ষেপে ওঠি, তুমি কাঁদবা না, সাবধান আমার সামনে কাঁদবা না, তোমার বাসায় গেলে এই মায়া কই থাকে? দুনিয়াতে আমার কেউ নাই, আমার সেইটাই ভালো।

দিলারার মুখ ছায়া হয়ে আসে। সে কোনো কথা বলে না। প্রচণ্ড ক্ষিদের সময় খেতে থাকলে যা হয়, কিছুতেই পেট ভরে না, দুর্বলতা কাটে না, আমার সেই দশা হলেও আমার ইচ্ছা হয়, আমি এই মুহূর্তে দিলারার কাছ থেকে আমাদের সাথে তার অদ্ভুত ব্যবহারের কারণটা জেনে যাই। কিন্তু সে কিছু না বলে একসময় উঠে যায়। এবং আমার সামনের ভাতগুলো হঠাৎ আমার কাছে অসাড় হয়ে ওঠে। আমি হাত ধুয়ে সায়রাবুর পাশে এসে বসি। ব্যাগ খুলে পাঁচশো টাকা বের করে দিয়ে বলি, আমার কাছে এর বেশি নাই, তুমি আমার টাকায় যদি একবার ডাক্তার দেখাও, আমি খুব শান্তি পামু। সায়রাবু টাকাটা নেয়, তার চোখ ফের কান্নায় ভরে ওঠে। আমার কি হয়, আলটপকা মা'কে মনে পড়ে, আমি আবেগপ্রবণ হয়ে উঠি, আইজ যদি মা থাকতো।

মার কথা থাক— দিলারা পেছনের চেয়ারে বসে আমাকে হঠাৎ থামিয়ে দেয়, শায়লা কী চাকরি করে? শুনছি চাকরির কোনো ইজ্জত নাই, কোনো ভদ্রলোকের মেয়ে গার্মেন্টিসে কাম করে?

আমি দাঁড়াই। সায়রাবুর এই অবস্থায় বুলবুলের ছিনতাই প্রসঙ্গে আর বলা হয় না। বাচ্চাগুলোকে আদর করে সায়রাবুর হাত চেপে বিদায় নেই। এরপর অসহ্য চোখে দিলারার দিকে তাকিয়ে বলি— আমরা আবার ভদ্রলোকের মেয়ে হইলাম কবে থাইকা?

খুবতো তেছড়া কথা শিখছস... দিলারাও ভেতরের বিরক্তি চেপে রাখতে পারে না, তাতো কইবিই, তোরা স্বাবলম্বী, স্বাধীন। আমাগো মতন কাওরে তোয়াজ কইরা থাকতে হয় না।

তুমি তো সুখেই আছ... বলতে বলতে আমি বেরোনোর জন্য পা বাড়াই, আমরা যাই না যাই তাতে তো তোমার সুখের মধ্যে কোনো পোকা ঢুকতেছে না, তুমি রাগ কর ক্যান? রাগ তো করমু আমরা, যাগোর মাথার উপরে ছায়া নাই, স্ট্যাটাস নাই— আমাগো রাগেই কার কী আসে যায়, দুঃখেই কার কী আসে যায়, চললাম।

রাত্তিরে বারান্দায় বসে টের পাই, ক্রমশ আমার মধ্যে ক্ষয়িষ্ণুতা ভর করছে, আমি ক্রমশ সবকিছুর প্রতি প্রেরণা হারিয়ে ফেলছি। আজ বোনদের সাথে দেখা হওয়ায় সুতো ছিড়ে যাওয়ার বিষয়টি প্রবলভাবে টের পেয়েছি। খালা, আফসানা কমবেশি আমার ওপর নির্ভরশীল। শায়লাকেও বুঝে উঠতে পারি না। শুধু এইটুকু বুঝি, ব্যাপক কোনো জীবনের হাতছানি চকিতেও তাকে আমার কথা মনে করাবে না। আর আছে শায়েদ— যার নিজের পায়ের তলায়ই কোনো মাটি নেই। জীবনের বাস্তবতাগুলো এমন, পায়ের তলায় মাটিহীন মানুষগুলো যদি প্রেমের জন্য আত্মহত্যা করে সেই প্রেমও যেন ঠিকমতো দাঁড়ায় না। তা-ও মনের এক চিলতে কোঠায় ওর প্রতি আমি একটা অদৃশ্য নির্ভরতা টের পেতাম। রঞ্জনের সাথে দেখা হওয়ায় এই বিষয়টাকেও আমার এমন মনে হচ্ছে যেন আমি নিজস্ব জগতটার মাঝখানে এক অথই জলে নিমজ্জমান ছিলাম। শায়েদ যেন ওর মধ্যে ছিল খড়কুটোর মতন, বাঁচার তাগিদে আমি ওকে আশ্রয় করতে চাইতাম, প্রাণের জায়গাটায় কিছুতেই ওকে বসাতে পারতাম না বলে ও সেই জায়গাটায় যতবার হাত বাড়াতে চাইত, ততবারই জাগতিক বিষয়গুলো ওর সামনে তুলে তুলে ওকে আমি এমন একজন মানুষ বানাতে চেয়েছি, আমার প্রাণের অনুভবগুলো যার বোঝার দরকার নেই, যে আমার দেহটাকে বাঁচাবার দায়িত্ব নিতে পারে। কিন্তু প্রাণের ধূধূ শূন্যস্থানে রঞ্জন একদম ঝড়ের মতন, ব্যাপক এক স্রোতের মতন হঠাৎ এসে ধাক্কা দেয়ায় আমার বাঁচা এবং অনুভব— সব জায়গা থেকেই শায়েদ যেন কেমন ছিটকে পড়ছে। প্রাণের এই বিপন্ন মুহূর্তে আমি ওর চেহারা দেখার স্পৃহাটাও ক্রমশ হারিয়ে ফেলছি।

রাত বাড়তে থাকলে শায়লার জন্য ছটফট করি। কী হলো ওর? একটাই ক্ষীণ স্বস্তি, খারাপ কিছু হলে অফিসে গিয়েই চলে আসত। সারাদিন যেহেতু আসে নি। চাকরিটা যায় নি।

খালা এসে বলে, তোমার ফোন।

ভেতরে গিয়ে রিসিভার ধরি। কণ্ঠ শুনে স্থবির হয়ে যাই। রঞ্জন বলে, সেদিন তোমাকে পেলাম না, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, তুমি আমার এই যোগাযোগটাকে সহজভাবে নিতে পেরেছ কি-না।

আমি নিজেকে দৃঢ় করি, তারপর সহজ কণ্ঠে বলি— আসলে ঠিক তা-না, খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম, তাই।

আমি ফোন রাখছি। এইবার রঞ্জনের স্বর কঠিন শোনায়— আমার মনে হতো একমাত্র তুমিই কোনো ভান জানো না।

রঞ্জন! আমি প্রায় আর্তনাদ করে উঠি, আমার বড্ড ভয় হচ্ছে, এতবছর পর আমি আর ভেতরের বিষ খুঁড়ে বের করতে চাই না।

আফসানা এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরে, আমি অবচেতনেই ওর সাথে তিক্ত ব্যবহার করি, প্লিজ একটু ওঘরে যাও... আহ্ আফসানা...। ও দপদপ পা ফেলে চলে যায়, দরজা দিয়ে ধুলোবাতাস ঢোকে, ক্যালেন্ডার কাঁপতে থাকে... আর আমি নিজের মধ্যে থেকে বিচ্যুত হয়ে মেঝেতে বসে পড়তে পড়তে শুনি, রঞ্জন বলছে— আমার মনে হচ্ছে, যে-কথাটা আমি তোমার সামনে বলতে চাইছিলাম, তার সুযোগ আর আসবে না। আমি তোমাকে ফোনেই বলছি নীলু, যেটা তোমাকে কখনই আমার পক্ষ থেকে সেইভাবে জানানো হয়ে উঠে নি, আমি তোমাকে ভালোবাসতাম।

এইবার বাতাস ঘরের মেঝেতে ক্ষুদে ঘূর্ণির সৃষ্টি করে, আর টের পাই ঝিরঝির বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। আমি কেমন বিপন্ন হয়ে পড়ি, রঞ্জন বলে, নানা কারণে, নানা বাস্তবতায় দু'জন মানুষের এক সাথে সংসার করা হয়ে ওঠে না। জীবনে সেইটাই বড় কথা নয়। আমি চিরকালই প্রকাশ একটু কম করতে পারি, নিজেকে বোঝাতে পারি না। কিন্তু বহুদিন মনে হয়েছে, অন্তত এই সত্যটা তুমি জানো, তোমাকে কেন্দ্র করে আমার মধ্যে দুর্মর এক কষ্ট আছে, যা আমি আমার আচরণ দিয়ে, প্রাণের উত্তাপ দিয়ে তোমাকে কোনোদিনই বোঝাতে পারব না, আজ ফোন ছাড়ছি নীলু, তুমি যদি যোগাযোগ কর, তবে অন্যদিন কথা হবে।

কী অতল গাড্ডা! আয় সখি বান্ধব, লখীন্দর, নদের চাঁদ, আয় আয় ঢেলা ফুঁড়ে, শ্যাওলা ঘাটের বাঁশি ফুঁড়ে, জলের ওপর ভাসতে ভাসতে, আয় সখি নাগর, ভেলার ওপর ভাসতে ভাসতে অচিন দেশে যাই।

এর কদিন পরই হঠাৎ আমার কাছে হন্তদন্ত হয়ে কৈলাস আসে। আমাকে চোখ বড় করে বলে, রানীমা এক্ষণি আপনাকে একটু যেতে বলেছেন।

আমি অবাক হয়ে বলি, তিনি ক্লিনিক থেকে কবে ফিরেছেন?

এই তো গতকাল!

আমি বিব্রত হয়ে বলি, ছিঃ ছিঃ আমার মনেই ছিল না। এমন ঝামেলার মধ্যে ছিলাম, যা হোক এতদিনে তোমার রানীমা তবে কোনো মানুষের সাথে কথা বলতে চাইছেন।

সরল হাসিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে কৈলাসের মুখ। বলে, তাই তো এমন দৌড়ে এলাম। আমাকে খুঁটে খুঁটে জিজ্ঞেস করেছেন, তাঁর ওই বিপদের মুহূর্তে আমি কিভাবে কি করলাম, কে আমাকে সাহায্য করল— দিদি আপনি শিগ্‌গির চলুন, আপনাকে আমি দিদি মেনেছি, যেহেতু এই দেশে আসার পর এই প্রথম উনি কারো সাথে কথা বলতে চাইছেন, আপনি কায়দা করে ওঁকে একটু বুঝাবেন, যে জীবন উনি যাপন করছেন, সেইটা কোনো মানুষের জীবন না। আপনার পায়ে পড়ি দিদি, আপনি ওঁর একটু দায়িত্ব নিন।

নিজেকে গুছিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামার মুখে শায়েদের সাথে দেখা। আমার মুখে রহস্যময় তরঙ্গ খেলে যায়, ভালো সময়েই এসেছ, তোমার সেই স্বপ্নের প্রাচীরে ঢোকার আজ একটা চাবি পেয়েছি।

শায়েদ বিরক্ত হয়, কি হেঁয়ালী করছ, আমি সকাল সকাল আরো তোমাকে ধরতে এলাম, তুমি আবার... বলতে বলতে কৈলাসের ওপর ওর চোখ পড়ে। এইবার সে নিজেই কৌতূহলী হয়ে ওঠে, সেই বিখ্যাত অভিনেত্রীর বাসায় যাচ্ছ?

তাহলে বলছি কী, তার সাথে দেখা করতে তুমি কৈলাসের সাথে কত কায়দা করলে!

তুমিও তাহলে ঈর্ষাবোধ কর, প্রাণের মধ্যে বড় শান্তি পাচ্ছি নীলু... বলতে বলতে শায়েদ হাসে। ততক্ষণে আমরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে নিচে এসে দাঁড়িয়েছি।

সকাল গড়াচ্ছে।

বিভিন্ন বাসা থেকে বস্তা বস্তা ময়লা এনে রাস্তার এককোণে জড়ো করছে কাজের বুয়ারা, আর জেগে ওঠা নগরীর রাজ্যির শব্দে ঝমঝম করছে চতুর্পাশ। বাসা থেকে বেরিয়ে ডানে ঘুরলে গেট। খুলে গেলে চৌরাশ পথ। ভেতরে ঢুকতেই কেমন গা ছমছম করে। এদ্দিন দূর থেকে, ছবির মতন দেখেছি বাড়িটাকে। নানা কল্পনায় মনে হয়েছে এ আমার এক কল্পিত পৃথিবী, একে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না। দিনের পর দিন একজন নারীকে দেখেছি কখনো স্থির, কখনো চলমান। কখনো তাকে আমার মানুষ মনে হয় নি। মনে হয় নি এই নারীর ক্ষুধা, যন্ত্রণা, অভাব এইসব জাগতিক দুঃখ থাকতে পারে। সেইদিন আত্মহত্যা করতে গিয়ে সেই নারীকেই যখন ঘর থেকে বেরোতে হলো, আমি কাছ থেকে দেখেছি তাঁর মুখ। এককালে প্রচণ্ড রূপসী ছিলেন তা তো বোঝাই যায়, এখন মুখের বলিরেখাগুলোকে মনে হয় খাঁজকাটা তরঙ্গ। তিনি নিজেকে হত্যা করতে চেয়েছেন এই বিষয়টা তাঁর প্রতি আমার কৌতূহলকে অদম্য করে তুললেও আমি নিজের যন্ত্রণার আবর্তনের কারণে তার আর খোঁজ নিতে পারি নি। ছেলেবেলায় যেমন হতো, সিনেমা হলে ঢুকলে মনে হতো অলৌকিক কোনো পৃথিবীতে ঢুকে পড়েছি। লাল পর্দা যখন দুপাশে সরতে থাকত, শরীরে সে-কী কম্পন। এমনই বিমূঢ় বোধ করতাম, জাতীয় পতাকার সামনে দাঁড়াতে ভুলে যেতাম। এরপর, প্রথম দৃশ্য আসার আগ মুহূর্ত হায়রে না জানি কী দেখব— এই টেনশানে দম বন্ধ হয়ে আসার জোগাড় হতো। আজ বহুদিন পর প্রায় কাছাকাছি তেমন অনুভব হয়। আসলে নিজেও প্রচণ্ড মানসিক বিপন্নতার মধ্যে আছি। বিশেষত রঞ্জনের দ্বিতীয় টেলিফোনের পর, এবং এটা সত্যি আমি সেই ফোনেই প্রথম জেনেছি, বিষয়টা আমার একতরফা ছিল না। ভয়াবহ অনুভূতি আমাকে সারারাত এমন বিভোর করে রেখেছিল, শায়লা তার চাকরি সংক্রান্ত কিসব বিপর্যয়ের কথা আমাকে বলছিল, কিছু আমার কানে যায় নি। আমার বারবার মনে হচ্ছিল, রঞ্জনের সেই সব শব্দাবলির মধ্য দিয়ে আমার নারী জন্মের স্বার্থকতা ঘটল, সাথে অশরীরী বেদনা। তাহলে কেন সে নিজেকে এইরকম সরিয়ে রেখেছিল? কেন সে আমার কাছে একমুহূর্তের জন্যও ধরা দেয় নি?

এইসব ছিন্নভিন্ন আবেগে আমার সমস্ত অস্তিত্ব প্রগাঢ় দুর্বলতা হয়ে ওঠাতেই হয়তো একটি জঙ্গুলে বাড়ির নির্জনতা এমনভাবে আমাকে চেপে ধরতে পারছে।

কৈলাস সামনে এগিয়ে গেছে।

শায়েদ সন্তর্পণে আমার হাত চেপে ধরে। পথের দু'ধারে সার বাঁধা ফুলগুচ্ছ। গাছগুলোর নিচে ফরফর পাক খাচ্ছে পাতা। আর কবুতরেরা, প্রায় আমাদের পায়ের ওপর দিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছে। এইটুকু পথ, মনে হচ্ছে অনন্ত, মনে হচ্ছে মহিলার সামনে দাঁড়ালেই সে দশহাতের দুর্গা হয়ে উঠবে, নইলে হাসতে হাসতে বাতাসে মিলিয়ে যাবে... এইবার

আমার মধ্যে অন্য আশঙ্কা ভর করে, মহিলা যদি মানুষের মতন আমাদের সাথে ভদ্রতা শুরু করেন, তাহলে তো আমার ভেতর পুরো বিষয়টির মৃত্যু ঘটবে।

আমি ক্রমশ উৎসাহ হারিয়ে ফেলতে থাকি। সেই বৃক্ষসম্ভার, সেই বাংলো টাইপের বাড়ি, এই ইটক্লিষ্ট নগরের বিচ্ছিন্ন শ্যামলিমা আমাকে বাতাসের মতো শোনায় রঞ্জনের কণ্ঠ— আমি তোমাকে ভালোবাসতাম।

অতীত— বাসতাম... বাসতাম... বাসি নয়, অথচ রঞ্জন, আমি চিরকাল জলে স্থলে অন্তরীক্ষে তোমার মুখটিই খুঁজেছি। তুমি সেই মানুষ, যুক্তিহীন ভাবে প্রথম দেখাতেই যে আমার মধ্যে আজন্ম ছাপ ফেলেছ। প্রথম দেখায় কিছু হওয়া— এ তো প্রেম নয়, ভালোবাসা নয়, এক তাৎক্ষণিক ঘোর— অথচ আমি জীবন দিয়ে প্রমাণ দিচ্ছি, এ আমার এক অলৌকিক প্রেম ছিল... মোহ ছিল... কী বলছ নীলু? অতীত? তোমারও 'ছিল'? 'আছে' নয়? বুক ফেঁড়ে কান্না ঠেলে উঠলে শায়েদের সাথে সাথে পর্দা ঠেলে ভেতরে ঢুকি।

দেয়ালের ওপর চিতাবাঘের চামড়া। তার নিচে কাঠের তক্তপোষের ওপর ঝালর দেয়া চাদর বিছানো, তার ওপরই বসে আছেন তিনি। ঘরে ঢুকলে তাৎক্ষণিকভাবে এটাই প্রথম চোখে পড়ে। কপালে সূর্যের মতন লালটিপ। গরদের ঘিয়ে শাড়িতে লাল পাড়, তার ওপরে মুখ, চামড়ায় হরপ্পার শিলালিপি, নানা ভাঁজে আকীর্ণ। আমি উদ্ভাসিত মুখে এগিয়ে যেতে যেতে একটি চিরসাধারণ ভদ্রতার দৃশ্য দেখার জন্য প্রস্তুত হই।

মুহূর্তে পা থেমে যায়, আমাদের দেখে দপ করে এক ফালি হেসে মহিলা কায়দা করে হাত ঘোরাচ্ছেন। আমি শায়েদের হাত চেপে ধরি, কচি সবুজ সুতোর মতন একটা সাপ মহিলার আঙুল জড়িয়ে আছে। এ রকম অসম্ভব সম্ভাষণে আমি বেশ বিমূঢ় হয়ে পড়ি, মহিলার যেন এতক্ষণে চৈতন্যোদয় হয়, পাজিটাকে কিছুতেই বশে আনতে পারছি না, হাত ছেড়ে ঘাড়ে উঠবে।

এবং আমি নিজেও কী বুঝে তৎক্ষণাৎ সহজ হয়ে উঠি, পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীর স্বভাবই এই।

আরে এসো... বলে মহিলা দাঁড়ায়, তুমিই হয়তো—।

নীলুফার! বলে আমি তাঁর বাড়ানো উষ্ণ হাতে হাত রেখে শায়েদের দিকে তাকাই, ও আমার বন্ধু শায়েদ।

তিনি যেন এতক্ষণে লক্ষ করেন আমার পাশে আরেকজন মানুষ আছে। তাঁর মুখে কেমন এক তরঙ্গ খেলে যায়, শা-য়ে-দ... ও বসুন বসুন!

কৈলাস গদীঅলা মোড়া এনে দেয়। আমরা দুজন তাঁর মুখোমুখি বসি। তাঁর হাতের সাপটির সঞ্চালনমতার দিকে তাকিয়ে আমার গা শির শির করে। তিনি এইবার অস্বস্তিবোধ করে সহসা কথা বলতে পারেন না।

শায়েদ বলে, বিষাক্ত না?

অবশ্যই!

তাঁর এই কথায় আমি আতঙ্কিত হয়ে পিছিয়ে যাই, ঠাট্টা করছেন?

ঠাট্টা! এই শব্দটি সুলেখা এমন বিস্ময়ের সাথে উচ্চারণ করেন, যেন আজই প্রথম শুনেছেন এবং বড় নিভৃত তরঙ্গে গা কাঁপিয়ে হাসেন, জানো, আমি কোনোদিন ঠাট্টা জানি না।

এমনভাবে কথা হচ্ছিল— যেন আমরা অনেককালের চেনা, অথবা হঠাৎ কোথাও দেখা হয়েছে, উনি আমাদেরকে আসতে বলেন নি। আমি বড় অভিভূত বোধ করি উনি আমাদের ইতিহাস বৃত্তান্ত জানতে চাইছেন না বলে, অথবা প্রথমেই যা উচিৎ ছিল, আসলেই তিনি যে জন্য ডেকেছেন, তাঁর মৃত্যুর সময় আমি অপরিচিত একজন মানুষ হয়ে তাঁর সাথে ক্লিনিকে গিয়েছি বলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। এসব কিছু না করে যে হেঁয়ালী তিনি করছেন, তা তাঁর জীবন যাপনের সাথে বেশ মানিয়ে যাচ্ছে।

শায়েদ প্রশ্ন করে-আপনি একা থাকেন?

নাহ্! বড় কায়দা করে ভুরু নাচালেন তিনি। একটা বেড়াল, একটা হরিণ, অনেক অনেক কবুতর, একটা ময়না, হনুমানও আছে একটা, বড় দুর্লভ কালেকশান। এইতো অনেক কিছু, আর সারাক্ষণ আমার গায়ের সাথে লেপটে আছে এই পাজিটা... বলে সাপটার ঠোঁটের সামনে মৃদু টোকা দিলেন... আঙুল ছাড়িয়ে স্বর্ণলতার মতো বারবার সেটা ওপর দিকে গলা বাড়াচ্ছে... সুলেখা আমার অস্বস্তি দেখে বলেন, কামড়াবে না, একশো পার্সেন্ট পোষ মানা।

আর কথা এগোয় না।

বাঘের চামড়া ছাড়িয়ে নিচদিক থেকে ওপরে উঠে গেছে শিশু বাঁশঝাড়। আমি সেই চিরচিরি পাতাগুলো দেখতে থাকি। সুলেখা দীর্ঘশ্বাসের মতো উচ্চারণ করেন, অনেককাল পর মানুষের সাথে গল্প করছি, আমি আসলে জঙ্গুলে হয়ে গেছি, জানিই না কী করে শুরু করতে হয়, কী করে শেষ করতে হয়। একজন ডাক্তার অবশ্য আসেন, তিনি আমার মানসিক চিকিৎসা করেন, তিনি তো আর মানুষ নন, ডাক্তার, নয় কি? শায়েদ হেসে ফেলে— ডাক্তার মানুষ নয়?

না, তা নয়, আসলে তাঁর প্রতি আমার কোনো আস্থা নেই। কোলকাতাতেও অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি, আসলে মানসিক ডাক্তাররা বদ্ধ পাগল ছাড়া আর কারো চিকিৎসা জানে না। এই ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা বড় খারাপ। একসময় আমার নেশা-ই ছিল মানসিক ডাক্তারদের কাছে যাওয়া। আমার খুব লোভ জাগতো মানুষের মন সম্পর্কে, তাঁরা কী ভাবে, সেটা জানার... বড়... বড় বাজে অভিজ্ঞতা।

সাপটা বিরক্ত করছে। অপার শূন্যতার মধ্যে কিছু বিষয় পেয়ে আমি কেমন ঝকঝকে হয়ে উঠি। তিনি কী এক সুইচে চাপ দেন। কৈলাস একটা চিকন তারের খাঁচা নিয়ে হাজির হয়। তিনি সাপটাকে চুমো খেয়ে খাঁচার মধ্যে রেখে মুখ আটকে দেয়ালের আংটার সাথে ঝুলিয়ে দেন।

আমি লক্ষ করি, গভীরভাবে লক্ষ করি, তার সমস্ত অভিব্যক্তিতে অভিনেত্রীসুলভ কায়দা। দেহের গঠনে আঁটোসাঁটো চুম্বক টান, মনে হয়, এখনো তিনি যে কাউকে পুড়িয়ে ফেলার ক্ষমতা রাখেন, কিন্তু এমনভাবে শাড়ি পেঁচানো চামড়ার একাংশও দেখা যায় না বলে আমি খেই হারাতে থাকি। তাঁর যা কথার ভঙ্গি, লীলাপরায়ণ অভিব্যক্তি, তার সাথে এতটা দেহের পর্দা ঠিক মানায় না... তবে মুখমণ্ডল বলছে, কিছুতেই তিনি এক জায়গায় নিজেকে আটকাতে পারেন নি... মনে হয় সামনে বসে আছে প্রাচীন দেবকন্যা।

কৈলাস ঝুড়িভর্তি নানারকম ফল এনে সামনে রাখে। আজ ওকে বড় আনন্দিত দেখাচ্ছে। সুলেখা নিজের মধ্যেই নিমজ্জিত। বলেন, একবার হলো কী, আমাকে খুব শীত

রোগে ধরল। চারপাশ আঁধার করে আমার মনে হতো আমাকে শ্মশান কাঠের নিচে শুইয়ে রাখা হয়েছে, আর সে-কী শরীর কাঁপুনি। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারতাম না... তো এক ডাক্তারের কাছে গেলাম, সে শুরু করল গৎবাঁধা প্রশ্ন, ছেলেবেলায় বাবা-মা'র ঝগড়া দেখেছি কি-না, ছেলেবেলায় ভূতের গল্প শুনলে ভয় পেতাম কি-না... ধুর এ কোন কথা? ছেলেবেলায় ভূতে তো প্রায় সবাই ভয় পায়, কথা সেটা না, শীতের সাথে তাঁর প্রশ্নের কোনো সম্পর্ক ছিল না, যেহেতু আমি পাগল না, পাত্তাও দিল না বেশি, এই ধরুন দশ পনের মিনিট কথা বলে কী সব ঔষধ দিল খসখস... ঠোঁট বাঁকিয়ে মনোরম ভঙ্গিতে হাসেন সুলেখা... বুঝলে, ভালো হলাম না।

শায়েদ উদগ্রীব হয়ে জানতে চায়, এখনো সেই রোগ আছে?

কমেছে। বলে একটু থামলেন তিনি, তবে সেটা আমি নিজেই নিজের সাথে যুদ্ধ করে কমিয়েছি... বুঝলে, এক সময় পৃথিবীতে সবচাইতে ভয় পেতাম সাপকে।

শায়েদ সুলেখায় আটকে গেছে।

আমি সন্তর্পণে দাঁড়াই... এরপর ঘুরতে থাকি। হেঁটে হেঁটে বাড়িটাকে দেখি। বেতের সারবাঁধা সোফা, গাছের গুঁড়ি, নানারকম ডেকোরেশন পিস... আমার সামনে লাফ দিয়ে পড়ে বেল্লিক তেলাপোকা... আমি ছিটকে দরজার কাছে এসে এইবার এখান থেকে উল্টো দৃশ্য দেখি, জানালার পাশে বসে আছে আফসানা, আজ ওর স্কুল বন্ধ। আমার এই বোনটা বড় নিভৃতে, বড় নিজের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে বড় হচ্ছে। এখান থেকে নিজেদের আস্তর উঠে যাওয়া বাড়িটাকে চেনা যায় না। শায়লাকে মনে পড়ে, ওর চাকরিটা সেদিন চলেই যাচ্ছিল, ওদের প্রোডাকশন ম্যানেজার মালিকদের সাথে বহু বোঝাপড়া করে ওর চাকরিটা টিকিয়েছে। আন্দোলনের শাস্তি হিসেবে ওর এক সপ্তাহের বেতন কাটা গেছে। শায়লার জেদ এমন তুমুল হয়ে উঠেছিল, সেদিনই চাকরি ছেড়ে দেয়, শেষে সেই রাতেই আমাকে ফিসফিস করে বলেছিল, যে রাতে আমি ছিলাম আসমান জমিন রঞ্জনের মধ্যে, বুঝলে বুবু, জেদটা বাড়তে বাড়তেও কেমন থিতায়া আসল, প্রোডাকশন ম্যানেজার তো আমার প্রেমে পড়ছে, সে কি আর চায় আমি চাকরিটা ছাড়ি? আমারে কত বুঝাইলো, বলল, মাথা ঠাণ্ডা কর নীলু, পেটের যন্ত্রণা না থাকলে কেউ গার্মেন্টিসে আসে না, এইটা ভাত রুটি জোগাড়ের জায়গা, আন্দোলনের জায়গা না... আর আমারও ফণাটা কেমন নাইমা আইলো, খালারে, তোমারে, আফসানারে মনে পড়ল—

যেন এক ঘোর ধূম্রপাকে বসে আছে দুজন নরনারী। আমি দরজায় দাঁড়িয়ে দেখি, শায়েদ সুলেখা কি এক আশ্চর্য গভীর গল্পে ডুবে গেছে, পাদপ্রদীপের নিচে কি ম্রিয়মান ছায়া, মুহূর্তে অন্য এক বেদনা আমাকে অস্থির করে তোলে, আমি ছুটতে ছুটতে সামনের জমিনটা পার হই। এরপর কৈলাসের আপত্তি উপেক্ষা করে গলির মাথায় এসে রিকশা নিই। শ্যামলীতে এসে, আহা কী ছায়াশীতল কড়ুই গাছের পাতাগুলো, ময়ূরের পুচ্ছের মতো নিজেদেরকে বিস্তার করে রেখেছে।

আমি বোধবুদ্ধিহীন মানুষের মতো রিকশা ভাড়া মিটিয়ে নিজেকে ঠেলতে ঠেলতে রঞ্জনের অফিসের দিকে নিয়ে যাই। ভেজানো দরজা একটানে খুলে দেখি, রঞ্জনের টেবিলের সামনে কয়েকজন ভদ্রলোক বসে আছে।

আমাকে দেখে সে হতবাক হয়ে যায়। আর এতক্ষণে নিজের এই চিন্তা বিবেচনাহীন কাণ্ডের জন্য আমি কেমন মাটির সাথে মিশে যেতে থাকি। মুহূর্তে সে নিজেকে সামলে নেয়। আমাকে বলে, আরে তুমি? এতদিন পর? এসো এসো...।

লোকগুলো উঠে পড়ে চেয়ার এগিয়ে দিলে আমি তুমুল অস্বস্তি বোধ করি। দু'জন ভদ্রলোক বেরিয়ে যায়, তিনজন কী সব ফাইল সংক্রান্ত আলোচনার মধ্যে রয়ে যায়। আমি চেয়ার টেনে বসলে রঞ্জন বলে একটু অপেক্ষা কর, আমি ওদের সাথে কাজটা সেরে নিই। শিওর— বলে আমি চারপাশের স্তূপস্তূপ ফাইলপত্তরগুলো দেখতে থাকি। আমার গলা শুকিয়ে আসছে, জলতৃষ্ণা পাচ্ছে। ওর চেহারার মধ্যে এমনই স্থির এক ব্যক্তিত্ব, যার সামনে এলে অন্য সব হিসেব উল্টে যেতে বাধ্য। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, কৈশোরের সেই ঢ্যাঙ্গা রঞ্জনকে ছাপিয়ে আমি এ সময়ের তীব্র আকর্ষণ ক্ষমতা সম্পন্ন রঞ্জনকে ভালোবাসতে শুরু করেছি। সবচেয়ে আশ্চর্য, দুটো প্রেমই ঘটেছে আমার প্রথম দেখায়। যে রঞ্জনকে আমি সেদিন গাড়ি থেকে নামতে দেখেছিলাম, সে কিছুতেই সেদিনের সেই আড়ষ্ট ঢ্যাঙ্গা কিশোর নয়, ও যদি আমার পূর্ব পরিচিত না-ও হতো, ওকে প্রথম দেখেই আমি বেদনার্ত হতাম, পরিচয় থাকায় একটাই সুবিধা হয়েছে, ওর কাছে পৌঁছতে আমাকে কোনো প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে না। এই আমাকে দেখে ওর মধ্যে কোনো অনুভব না-ই জাগতে পারত। পুরনো নষ্টালজিয়া অন্তত প্রাথমিক পরিচয়ের দুর্মর বাধাগুলোকে ঠেলতে পেরেছে।

এক এক করে লোকগুলো চলে গেলে সারা ঘরে সীমাহীন অস্বস্তি নেমে আসে। আমি টেবিলের কাছের চেয়ারে গিয়ে বসি। আর নিজের চোখ দুটোকে কোথায় রাখব খুঁজে পাই না। রঞ্জন আমাকে গভীরভাবে সরাসরি দেখছে, এটা টের পেয়ে আমি পেপারওয়েট নাড়তে নাড়তে, ওড়না টানতে টানতে আরো কুঁকড়ে যাই।

রঞ্জন বলে, আমি ভাবতেও পারি নি, তুমি আসবে। আমি সামনের চুল পেছনে সরিয়ে কেমন শিশুর মতো ভঙ্গি করি— ভালো হয়েছে?

খুব ভালো হয়েছে। বলে রঞ্জন ফের তাকিয়ে থাকে, অনেক সুন্দর হয়েছ তুমি।

আমি ঠিক জানি না, এরকম স্তুতির পর কী বলতে হয়, ফলে খেই হারিয়ে ফেলি, আচ্ছা? তা-ই?

তারপর ও আর কথা বলে না। আর আমিও এই পরিস্থিতির মোহ কাটিয়ে সরল কোনো কথা তৈরি করতে পারি না। সবচেয়ে সহজ হয় যেটা, সেটাই বলি— আজ তাহলে যাই।

সে-কী! এক্ষণি যাবে কেন? বসো।

না, আমার কেমন অসুস্থ লাগছে, আসলে কিচ্ছু চিন্তা না করে হঠাৎ করে এসেছি তো, এখন ঠিক বুঝতে পারছি না, কেন এলাম।

পৃথিবীতে সব কাজ কি হিসেব করে ছক বেঁধে হয়? বলে রঞ্জন ভারি পাওয়ারের চশমা চোখ থেকে খোলে। আমি জীবনে যে কয়টা কাজ হিসেব করে করেছি, কোনোটাই আমার জন্য ঠিক হয় নি।

খুব ইচ্ছে করে আমার, ওর বিয়ের প্রসঙ্গটা তুলি। ওইটাই ওর সবচাইতে বেশি হিসেব করে করা। খুব জানতে ইচ্ছে করে, ওই জীবনে ও অসুখী, এটা ওর কাছ থেকে শুনি— কিন্তু এই প্রসঙ্গটাই আমাকে এমন নিঃসাড় করে দেয়, আমি কথাটা তুলতে পারি না। তাহলে যেন আমার সামনে রঞ্জনের আর একক কোনো অস্তিত্ব থাকে না, যে রঞ্জনকে ওর বিয়ের পর ওর

স্ত্রীর সাথে এক রিকশায় আসতে দেখে যন্ত্রণায় পুড়ে খাক হয়ে আমি দেয়ালের ওপাশে লুকিয়েছিলাম, সেই যুগল অস্তিত্বটাই আমার সামনে প্রধান হয়ে ওঠে।

দরজায় একজন লোক এসে দাঁড়ায়, আসতে পারি স্যার?

কী বিষয়?

স্যার, আমার একটা ফাইল ছিল আপনার কাছে।

পরে এসে নিয়ে যাবেন।

জি স্যার, স্লামুয়ালাইকুম!

আমি মাথা নিচু করে বসে থাকি। রঞ্জন বলে, অথচ আমি দায়িত্ববান ম্যানেজার। হিসেব করেই প্রতিটা কাজ আমাকে করতে হয়। এত বেশি হিসেব করে করতে হয় বলেই, হিসেব ভাঙার স্বপ্নটা আমার মধ্যে প্রবল।

স্বপ্ন! আমি অদ্ভুত ঠোঁটে হেসে এই শব্দটা নিয়েই খেলি, স্বপ্ন! বড় দুর্লভ, বড় মধুর শব্দ। মানুষ বেঁচেই থাকে এই স্বপ্নের ওপর ভর করে। যখন সেই স্বপ্নটা তার চোখের সামনে ঝোলে, তখন তা পাওয়ার জন্য সে অস্থির হয়, এরপর তা পেয়ে গেলে সে আরো গভীরতর স্বপ্নের দিকে এগিয়ে যায়, তা না পেলে সেটাকে হত্যা করে অন্য স্বপ্ন খুঁজতে থাকে। যারা হিসেবের জীবনে বাস করে স্বপ্ন দেখে, এদের কাছে স্বপ্ন দেখার নেশাটাই আসল, সেটা পাওয়ার জন্য ঝুঁকিটা আর তাদের নেয়া হয়ে ওঠে না, আর আমার মতন যারা স্বপ্নের ভারে মরতে বসে ঝুঁকি নিতে চায়, তারা স্বপ্নকে নিজের মধ্যে যন্ত্রণাকরভাবে লালন করতে বাধ্য হয় এই জন্য, যাকে কেন্দ্র করে স্বপ্ন, তার জীবনের হিসেব হিসেবটাই তার দরজা রুদ্ধ করে দাঁড়ায়।

নীলু, আমি তোমার সাথে বিট্রে করি নি। এইবার কিঞ্চিৎ কঠিন শোনায় রঞ্জনের কণ্ঠ, তোমার সাথে আমার পরিস্থিতিই সেইভাবে যায় নি।

রঞ্জন, আমি আমার অতীত ধরে তোমাকে কিছু বলছি না। বিট্রে— এইরকম হালকা শব্দ বলে তুমি নিজের কাছ থেকে পালাতে চাইছ কেন? তুমি নিজেই বলেছ, আমাকে ভালোবাসতে, এই কথার সূত্র ধরে আমিই তোমাকে বিট্রেয়ার বলতে পারি যদি আমি বিয়েটাকেই ভালোবাসার একমাত্র পরিণতি ধরি। কিন্তু আমি তো তা বলছি না। তুমি এখন কেন আমাকে ফোন করেছ? তুমি যদি অনুভব কর, যা ছিল সব ঠিক ছিল তাহলে দুঃখ প্রকাশের জন্য নিশ্চয়ই আমাকে তোমার ফোন করার দরকার ছিল না? তুমি সেই কৈশোরের নীলুফারকে একদম ছেঁটে ফেলে বলো, এই যে তোমার সামনে এখন এসে বসেছি যে আমি, তোমার কাছে এর আবেদন কতটুকু?

নিঃশব্দে বসে থাকে রঞ্জন।

আমি স্পষ্ট করে তাকাই, এইখানে এসে তুমি ঝুঁকি অনুভব করছ, এখন তুমি কিচ্ছু বলবে না, সেটাই স্বাভাবিক।

নীলু আমি ভয় পাই, আমাদের এখানে সম্পর্ক মানেই তার একটা পরিণতির স্বপ্ন। সেটা না হলে ঠিক যেন পাওয়া হয়ে ওঠে না, ঠিক যেন নির্ভরতাটা আসে না, আমরা ভীষণ পেতে চাই, তুমি আমার জীবনের বাস্তবতাটা জানো না, তোমার পক্ষে অনেক কিছু বলা স্বাভাবিক। আমি এইসব ক্ষেত্রে মানুষের ভেঙে পড়া দেখেছি, বড় যন্ত্রণার, বড় দুঃসহ, তা-ই ভয়টা আমার বড় বেশি।

আমি ব্যাগ নিয়ে দাঁড়াতেই আরো দু'জন সহকর্মী দরজায় এসে দাঁড়ায়— আসতে পারি স্যার ?

রঞ্জন কেমন অস্বস্তির মধ্যে পড়ে যায়।

আমি ম্লান হেসে বলি— আজ আসছি, অন্য একদিন আসব।

এসো।— রঞ্জনের এইটুকু উচ্চারণের মধ্যে আমি এমন আকুতি, এমন মায়া টের পাই সিঁড়ির কাছে এসে আমার পা আটকে যায়। আমি নিঃশ্বাস নেয়ার জন্য দাঁড়াই। চারপাশে গুঞ্জরিত মানুষ। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কার্পেটে মোড়ানো, বড় ঝকঝকে অফিস। আমার প্রাণের ওপর পাথর চেপে বসে। মনে হয় সিঁড়ি টপকে আবার ছুটে যাই তার ঘরে... পরমুহূর্তে অসহ্য অপমানবোধ আমাকে আলুথালু করে দেয়... আমার ভয় লাগে... মানুষের ভাঙন আমি দেখেছি... কী ভেবেছে ও ? আমি একটা পরিণতির জন্য ওর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে পারি ? এত সাধারণ, এ-ত সাধারণ ও ? ফের যোগাযোগের শুরুতেই সম্পর্কের ছকটা আগে ঠিক করে নিতে চাইছে। হিসেব ওকে এতটা হিসেবি করেছে ? আসলে আমার কিছু ছাপ নেই ওর মধ্যে, এ আমার একার স্বপ্ন, একার দহন, আমি ওর ফোন পেয়ে বিষয়টাকে পারস্পরিক ভেবে ভুল করছিলাম। একটা মিছিল আসছে ব্যানার ঝুলিয়ে। চারপাশ মুখরিত হয়ে উঠেছে। আমি স্লোগান লেখা দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াই... আমি সেই জনবহুল রাস্তার দিকে তাকিয়ে ক্রমশ থিতু হয়ে আসতে থাকি, আসলে অনুভব হয়তো এমনই, কখনো কাউকে ছোটাতে ছোটাতে চরম একটা জায়গায় নিয়ে ফেলে, যখন ফেলে, তখন মনে হয়, এই বুঝি আমার মৃত্যু হলো, আর বুঝি এগোনো গেল না। কিন্তু অসীম তার কাঙ্ক্ষা... সে ফের উঠে দাঁড়ায়, শেষ বয়স অব্দি মানুষের সাথে তার এই হয়তো নিরন্তর খেলা। নিজেকে দাঁড় করাতে আমি সেই দৃশ্য দেখি, ধূম্রপাকে ডুবে আছে দু'জন নরনারী... খাঁচার মধ্যে সাপটা পাকিয়ে পাকিয়ে গলা বাড়াচ্ছে, আর এক বয়স্ক বালিকা এক এক করে খুলছে তার সুগন্ধী পাক... আশ্চর্য, শায়েদ হতবিহ্বল হয়ে কী শুনছিল ? বুকের কোণে সূক্ষ্ম ঈর্ষা বোধ করি। নিজেকে বাঁচাতেই আমি শায়েদকে আঁকড়ে ধরি, এতসব হিসেবি মানুষের মাঝখানে কী বোকা আমি! শায়েদকে এক জাদুকরীর খপ্পরে কী অবলীলায় ফেলে চলে এসেছি!

অফিসে পনের তারিখ পেরিয়ে যাচ্ছে, বেতন দিচ্ছে না। যত দিন যাচ্ছে অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে পত্রিকার ভবিষ্যৎ। আমি নিজেও বিভিন্ন পত্রিকা অফিসে ধরনা দিচ্ছি। যেখানে যে পরিচিত লোকজন আছে, বলে রাখছি, সুযোগ হলে আমাকে যেন বলে। পত্রিকা ঘেঁটেও বিভিন্ন জায়গায় দরখাস্ত পাঠাচ্ছি। এইবার ভেতরে সত্যি সত্যিই ভয় ঢুকে গেছে, এরকম চলতে থাকলে এই শহরে আমার টেকাই যে মুশকিল হয়ে যাবে। আমি সকাল থেকে সন্ধে অব্দি মৃত্যুর মতো পরিশ্রম করতে রাজি আছি। বিনিময়ে এই শহরে নিঃশ্বাস টেনে বাঁচার শান্তিটুকু চাই।

আরিফ আমার টেবিলের সামনে চেয়ার টেনে বসলে সেই কথাই বলি, কাগজটা বন্ধ হয়ে যাবে না তো ? ওকেও খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছিল, আমাকে বলে— সেই ভয় তো আমিও পাচ্ছি। এখানে থাকতে থাকতেই যদি অন্য কোথাও ভেগে পড়া যেত তাহলে শেষকুল রক্ষা হতো। চেষ্টা তো করছি কিন্তু...।

ওর বিমর্ষতার সুযোগে ঠোঁটে তরঙ্গ খেলিয়ে হাসি, চলুন এক কাজ করি, জঙ্গলে চলে যাই, ঘাস খাব, পাতা খাব।

অস্তিত্ব সংকটের ঘেরাটোপ থেকে উঠে আসে আরিফও, আপনি যাবেন?

তাহলে আর বলছি কী, এই শহরে থেকে প্রতিদিন নুন ভাতের চিন্তা করে মরতে জন্ম নিয়েছি নাকি? জীবন তো মোটে একটা, কি দুর্লভ একটা জীবন। আমরা কি সব ভাত ডালের পেছনে শেষ করে দিচ্ছি, আমাদের পেটের ক্ষুধা কেমন মারাত্মক, সেটা লক্ষ করেছেন?

আরিফ হাসতে থাকে, অন্তত ভাত ডালের চাইতে ঘাসপাতা ভালো, কি বলেন? তাহলে আর দেরি করছি কেন, চলুন একটা সিদ্ধান্তে এসে যাই।

আমি ক্রমশ নিভে আসি... গহীন সুরঙ্গ বেয়ে উঠে আসছে রঞ্জন... আমি সেখান থেকে এসে পাগলের মতো ওর অফিসে চেষ্টা করেছি। কখনো শুনি সীটে নেই, কখনো বাইরে গেছেন। যখন ফোন ধরে সামনে অনেক লোকের কথাবার্তা শোনা যায়, আমাকে ব্যস্ত কণ্ঠে বলে, আমি তোমাকে পরে ফোন করছি।

আমার সীমাহীন অপেক্ষা! খেতে গিয়ে দেখি খাদ্যগুলো অসাড় হয়ে উঠেছে। দরজার বেল শুনে টেলিফোনের শব্দ ভেবে ছুটে দাঁড়াই। ছটফট করতে করতে বারান্দায় যাই, কি বলতে চেয়েছে ও? আমাকে কি মনে করেছে? কী করে সে ভাবছে আমি তার কাছে চলে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছি?

শায়েদের ফোন আসে, আমি ছুটতে ছুটতে 'হ্যালো' বলে নিঃশব্দে ভেঙে পড়ি— ও তুমি? কেমন আছ?

তোমার কণ্ঠ এমন শোনাচ্ছে কেন?

না, না— ঠিকই আছে, কিচ্ছু হয় নি।

নীলু, তুমি আমাকে মনে হয় ভুল বুঝেছ, কাল সুলেখাদির ওখান থেকে ওভাবে চলে গেলে, এরপর তোমার বাসায় কয়েকবার গিয়েছি, তোমাকে পাই নি, বিশ্বাস কর ভদ্রমহিলার প্রতি স্রেফ কৌতূহল—।

আমি কিছু মনে করি নি, বলতে বলতে ক্রমশ ঢলে পড়ি, আজ রাখছি, আমার শরীরটা ভালো লাগছে না।

অধঃপাতে ডুবে যাই, বন্ধু, র-হো সাথে...। না, নুসরাত ফতেহ্ আলি... স্রোত... স্রোত... অচলায়তন, গান গাইছে পঞ্চক... রিমঝিম ঝিম... কী গভীর কৃষ্ণকালো মেঘ। আমাকে মৃতপ্রায় করা যে-কোনো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য! ছন্দ তুলছে পাতারা, তবলা... আশ্চর্য অলৌকিক দুটি জাদু হাত, সুর আঙুল... ধিনাক। ধিনাক... আহ্? টাল খেয়ে পড়ে গেল চাকার নিচে... রক্ত রক্ত... কী? আমি নীলুফার! ধুর! ওই যে হাত পা উড়ছে পরদেশী পরদেশী— ঘুম পাচ্ছে, ওলো সই, ওলো সই, ওলো—। সামনে নিকষ ছায়া, তারমধ্যে গোল গোল রঙিন চাকতি... কেন ফোন করছে না রঞ্জন? হা আল্লাহ! আমি যে আবার নিজেকে নামাতে শুরু করেছি... আমার বিপন্ন হাত নাম্বার ঘোরায়, কে একজন বলে, উনি বাসায় চলে গেছেন।

গভীর রাত পর্যন্ত বারান্দায় বসেছিলাম। শায়লা এলেও আমার কম্পিত শরীর কিছুতেই খাড়া হতে চাইছিল না। আমি নিজেকে শাপশাপান্ত করছিলাম, অভিশম্পাত দিচ্ছিলাম, যার জীবনে বাঁচার সংগ্রামটাই প্রধান, মনোরোগে ভোগা, অপমানে অস্থির হওয়াটা তার জন্য কতটা যৌক্তিক ? কিন্তু কিছুতেই নিজেকে আমি কোনো যুক্তি দিয়েই স্থির করতে পারছিলাম না। রাতভর অঘুমে জ্বর জ্বর কাটলে সকালে ফোন করে রঞ্জনকে পেয়ে যাই, আমি ওর পরিবেশ পরিস্থিতির কোনোরকম তোয়াক্কা না করে হড়হড় করে বলে যাই, ভয় তুমি নিজেকে নিয়ে পাও না রঞ্জন ? ভেঙে পড়ার ভয় তোমার নিজেকে নিয়ে নেই ?

রঞ্জন নিভৃত শব্দে হাসে— নীলু, ভয়টা তো আমি নিজেকে নিয়েই পাচ্ছি।

হেই পতপত ঘুড্ডি,

আমি তোর সাথে উড়ে যাব। এই তো আমি আমার মূল্য বুঝতে পারছি, এই তো আমি টের পাচ্ছি, আমারও প্রাণ আছে, আমি খোসাবন্দি কুসুমটুকু শব্দে ভেঙে গড়িয়ে পড়ছি অসীম অসীম বালুচরের দিকে, মা, তোমার চোখের তলায় এত কালি কেন ? না, তোমার যুদ্ধ, বাবার নির্মমতা, আমার দারিদ্র্য, আমাকে কিচ্ছু তুচ্ছ করে নি... যেন রঞ্জন নয়, ছায়া ফুঁড়ে আমার সামনে দাঁড়ায় আশ্চর্য এক প্রদীপ... আমি ছুঁতে গিয়ে পুড়ে যাই, জ্বলে যাই, কিন্তু পালাতে পারি না... এইরকম মুহূর্তে আরিফকে কি বলা যায় ? রঞ্জন তো আমার গভীর কোটরে রাখা হীরকখণ্ড, তাকে তুলে রাখা অলৌকিক বই। ও নিজেকে নিয়ে যত ভয়ই পাক, ওকে আমার জীবনের সাথে মেশানোর দুর্লভ স্বপ্ন দেখার কোনো অর্থ হয় না। কিন্তু আমাকে যে প্রতিদিন প্রাত্যহিকতার সাথে যুদ্ধ করে বাঁচতে হবে, সেখানে আমার চূড়ান্ত নিঃসঙ্গ মুহূর্তে আমাকে কে বাঁচাবে ? রঞ্জনের মোহে আমি জীবনের সব হিসেব উল্টে দেব ? আমার কি হয়, প্রায় অসহায় কণ্ঠে বলি, আরিফ, আমার বড় ভয় করে। নিজেকে নিয়ে বড্ড ভয় পাই আমি। প্লিজ, সিরিয়াস কোনো কথা আপনি হালকা করে বলবেন না। আরিফ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, এবং গম্ভীর স্বরে বলে, আমি মোটেই হালকা করে কিছু বলি নি। বিশ্বাস করুন, আমি আপনাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারি না।

অফিস থেকে বেরিয়ে কোলাহলময় শহর দেখি, আসলে আমি কিচ্ছু দেখি না, ভাবি শুধু ভাবি, সেই ভাবনায় রঞ্জনের মুখ প্রধান হয়ে উঠতে থাকলে আমি ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে সেখানে সজোরে স্থাপন করি সুলেখার মুখ। আশ্চর্য মহিলা! বড় মায়া হয় তাঁর জন্য। কোন সে গভীর দুঃখে সে এই অদ্ভুত রহস্যের তলায় আশ্রয় নিয়েছে, কে জানে ? অবশ্য পারফর্মারদের ক্ষেত্রে অনেকটাই এমন ঘটে থাকে। মধুবালা, মিনাকুমারী, সুচিত্রা সেন, মেরিলিন মনরো— অনেকের ক্ষেত্রেই পড়ন্ত বয়সে এমন বিচিত্র বিকারের কথা শোনা গিয়েছে। কিন্তু এই বয়সে, বিশেষত তেমন কোনো মহিলা আত্মহত্যার দিকে যখন নিজেকে ধাবিত করে, সে যদি তখন কারো ওপর আশ্রয় করে সেটা বড় মারাত্মক হয়। নিজের কামকলার শেষ বিন্দু ঢেলে দিয়ে হলেও সে সেখানে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। শায়েদের প্রতি তাঁর সেদিনের মনোযোগটা খুব স্বাভাবিক ছিল না। এইবার আমি অবারিত রাস্তায় সেদিনের দৃশ্যের প্রতিটি আকুতি স্পষ্ট দেখতে পাই।

শায়েদের মধ্যে বিষয়টির ছাপ কেমন প্রগাঢ়ভাবে পড়েছে কে জানে ? আসলে আমার বিয়ের বয়স পেরোচ্ছে। জীবনের ক্ষেত্রে একটা সিদ্ধান্তে আসার সময় এসেছে। আমাদের আত্মীয় পরিচিতদের মধ্যে দিয়ে যেসব প্রস্তাব আসে, সেখানে নানা ডিমান্ড, নানা

কায়দাকানুনের খেলা। ওসবের সাথে কুলিয়ে উঠা আমার সামর্থ্যের মধ্যে নেই। অন্তত বিয়ে বয়সের এমন একটা পড়ন্ত জায়গায় এসে শায়েদকে হারানোর ঝুঁকি নেয়াটা বড্ড বোকামি হয়ে যাবে। ও হয়তো এখন কিছু করছে না, কিন্তু নিশ্চয়ই বিয়ের সিদ্ধান্তের প্রশ্নে সে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে না। আর আছে আরিফ। ওর আগ্রহকে কেন্দ্র করে আমার উপলব্ধির ব্যাপারে কোনো ভুল নেই। কিন্তু সেই আগ্রহের রূপটা তো আমি ঠিক জানি না। হতে পারে, সে আমার সাথে প্রেম করতে চাইছে। একটা সম্পর্ককে নতুন করে প্রেমের মধ্যে টেনে টেনে এক সময় বিয়ের অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার মতো সময় কিংবা মানসিক অবস্থা কোনোটাই আমার নেই। এ ছাড়া তার নিজেরও চাকরির অবস্থা টলটলায়মান। তার চাইতেও বড় কথা, শায়েদের সাথে আমার একটা দায়বদ্ধতা রয়েছে। আমি যদি নিজের বিবেক, নীতি, অনুভব বিসর্জন দিয়ে বিয়েটাকে একটা নিশ্চিন্তে ভাত ডাল খেয়ে বাঁচার আশ্রয় হিসেবে নিতে চাই, সেক্ষেত্রে শায়েদকে উপেক্ষা করে আরিফকে গ্রহণ করার মতো অবস্থানে আরিফ নেই। শায়েদকে আমার সংসার করার একটা উপযোগী জায়গায় নিয়ে পৌঁছাতে হবে। তাহলে নিখরচায় আমার বিয়েটা সম্পন্ন হতে পারে— এইসব ভাবছিলাম আর কলজের নিচে টপ টপ করে ঝরে পড়া রক্তস্রোত সামলাচ্ছিলাম, কী বোকা আমি! নিজের মূল্য, অবস্থান সব ভুলে রঞ্জনের মতো একটা দুর্লভ সৌখিন দুঃখে নিজের বাঁচার হিসেব পর্যন্ত ভুলতে বসেছিলাম।

বেনুবালাদের বস্তির কাছে রিকশা এসে দাঁড়ালে কী বুঝে নেমে পড়ি। বাকি পথটা বাসায় হাঁটতে হাঁটতেই যাব। ভাড়া চুকিয়ে রিকশা চলে গেলে হুঁশ হয়, আরে! এখানে তো কোনো বস্তিই নেই। ছোট ছোট ছাপড়া তুলে কামলারা ড্রেন ভরাটের কাজ করছে। ওদেরকেই প্রশ্ন করি, বস্তির মেয়েরা সব কোথায় গেছে? ওরা হাসে, বস্তির লোক আর কাউয়ার অবস্থা একই। কে কোন হানে বয়, কই খায়, কই উইড়া যায়, কে তার হদিশ রাখে?

বহুদিন পর ভিড় রাস্তায় ভূতের মতন হাঁটি! হেহ্! ভূত হাঁটে নাকি? যা হোক, না হাঁটে, হাঁটায় তো! শহীদ মিনারের সামনে হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয়েছে। কোলকাতা থেকে রণেশদাশগুপ্তের লাশ এসেছে। আমি বিমর্ষ হয়ে শুনি, এই বিশাল অভিমানী অগ্নিপুরুষ দীর্ঘ বাইশ বছর পর মৃত্যুর আগে দেশে আসার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। এইসব ছাপ নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শামীমাদের বাসার সামনে এসে পা থেমে যায়। জানি সে এখন গার্মেন্টিসে, তবুও কি মনে হয়, ভাবি, ওদের সংসারে একটা টুঁ দিয়ে যাই। শীত এসে গেছেই প্রায়। চারপাশে ঝুপ করে রাত্তির নেমে আসে। যে বাড়িতে এম্বুলেন্সটা ঢুকতে পারছিল না সেই বাড়ির কাছ ঘেঁষেই শামীমাদের ছ্যাতলাপড়া ঘর। সেই আধপোড়া মহিলাটির কথা মনে পড়ে। এখন কেমন আছে, কে জানে?

সামনে ট্যাপের পানি পড়ছে, তার নিচে ডাঁই করে রাখা হাড়ি বাসনের সামনে কলরবরত মহিলারা। গার্মেন্টিস বিষয়ে একটা ফিচার লেখার ইচ্ছা একবার টুঁ দিয়েই মিলিয়ে গিয়েছিল। শায়লাকে প্রায় পাওয়াই যায় না, আমি ওর সাহায্য নিতে পারছি না, আজ মনে হয় একটা পরিবার হেঁটেই তো ওদের এখনকার বাস্তবতাগুলো জানা যায়! চিপা সিঁড়ি ভেঙে একটা ভগ্ন দরজায় নক করি। কালসিটে শাড়ি পরিহিত এক মরাটে মহিলা দরজা খুলে দেয়। আমি শায়লার বোন হিসেবে নিজের পরিচয় দিলে মহিলার নিষ্প্রভ চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ভেতরে কারো গোঙানির শব্দ পেয়ে আমি শক্ত হয়ে উঠি। কে কাঁদছে?

আমাকে হাত ধরে ভেতরে নিতে নিতে মহিলা বলে— কে আবার ? শামীমা।

ও আজ অফিসে যায় নি ?

মহিলা অবাক চোখে তাকায়, ওতো ছাঁটাই হয়া গেছে। ওর তো চাকরিই নাই। শায়লা তোমারে কিছু কয় নাই ? এইবার বুঝি কদিনের হৃদ্যিক টানাপোড়েন আমাদের দুবোনের মধ্যে কতটা দূরত্ব এনে দিয়েছে। বেশির ভাগ রাতেই আমার নিমগ্নতার সুযোগে শায়লা নিঃশব্দে বিছানায় আছড়ে পড়েছে। ওর সাথে আমার আজকাল কথা হয় না বললেই চলে। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায়।

সুমন চট্টোপাধ্যায়ের দশফিট বাই দশফিট গানটা মনে পড়ে। ঘরের আকৃতি এমনই। পাশে একটা চৌকি বিছানো। গাদাগাদি করে বসে আছে শামীমার পাঁচ ভাইবোন। এরমধ্যে একবোনের আবার বিয়ে হয়েছে। স্বামী এখানেই থাকে। আমি ভাসা ভাসা শুনেছিলাম এদের সম্পর্কে। শামীমার বৃদ্ধ বাবা ঘরের কোণের পিড়িতে বসে ঢুলছে। মেয়ে জামাইটাকে দেখি না। লাগোয়া ছোট্ট একটা রান্নাঘর আর একটা বদ্ধ বাথরুম। যার ভেতর থেকে ভুসভুস করে ঘরে গন্ধ ঢুকছে। মেঝের মাঝখানে দাঁড়ানোর জায়গা নেই বললেই চলে। সেখানেই একটা কাঁথার ওপর শুয়ে পেটের যন্ত্রণায় তড়পাচ্ছে শামীমা। এখানকার এই সুতীক্ষ্ণ ক্রন্দন ছাপিয়ে আমার মধ্যে প্রবল বিস্ময় দুর্মর হয়ে ওঠে, এদের বসবাসের প্রক্রিয়াটা ঠিক কেমন ? রাতে শামীমার বোন আর বোন জামাই কোন সময় কীভাবে সবার চোখ আড়াল করে সহবাসে লিপ্ত হয় ? আর এদের বাবা মা ? রিটায়ার করে ফেলেছে ?

আমার মাথা বনবন করে।

আমি শামীমার কাছ ঘেঁসে উবু হয়ে বসি, কী হয়েছে তোমার ? চোখ গর্তে ঢুকে গেছে, তলায় রাজ্যির কালি। যন্ত্রণায় মুখের শিরা উপশিরা নীল হয়ে উঠছে। সে আমার দিকে তাকায়, কিন্তু আমাকে দেখে না, কেমন হেঁচকি তুলতে থাকে। আমি স্তম্ভিত হয়ে দেখি, ওর গায়ের শাড়ি লটকে পটকে গেছে, শায়া গড়িয়ে রক্তের স্রোত নামছে।

আপনারা পাগল হয়ে গেছেন ? আমার এই উচ্চকিত কণ্ঠে ঘরের সবগুলো নিঃশব্দ মুখ চমকে ওঠে, এই অবস্থায় ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছেন না কেন ?

মহিলা বিড়বিড় করে বলে, জামাই ঔষধ আনতে গেছে।

ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া এমন রোগীকে কী ঔষধ দেবেন ? আমি প্রায় ক্ষেপেই উঠি, আপনারা বসে বসে কী করে ওর মৃত্যু দেখছেন, আমি তা-ই ভেবে পাচ্ছি না।

এইবার ওর বাবা, হাঁটু থেকে গনগনে মাথা তোলে, ও মরুক। ওর মতো পাপিষ্ঠার মরণই উচিত। ওর আন্দোলনের কারণে তিনবইন এক লগে ছাঁটাই হইছে, হারামজাদি, বারো ভাতারী মাগি, পেটে ভাত নাই, আন্দোলন করস এর মধ্যে করছস কুকাম— যান আপনে যান, লেকচার শুনতে আর ভালা লাগে না, অত দরদ থাকলে নিজের গ্যাটের পয়সা খরচ কইরা ওরে ডাক্তার দেখান গিয়া, আমাগোর এখন ঘাস খাওনের মতনও অবস্থা নাই।

আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই। হকচকিয়ে ওঠে শামীমার মা। আর শামীমা, অসহ্য চিৎকার থামিয়ে টলতে টলতে রুদ্রমূর্তিতে দাঁড়ায়, দাঁতের চাপে ওর ঠোঁটে রক্ত এসে যায়, সে হাতের কাছের একটা ব্যাগ ছুঁড়ে মারে বাপের মুখ বরাবর, মুখ বন্ধ করলি ? ঘাটের মড়া, মরতে পারস না ?

বেরিয়ে আসি। হায়! আমি চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়েছি। জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এত কিছু দেখেছি, এত বিষ, এত ক্ষরণ, তবুও দেখা শেষ হয় না, জীবন থেকে কিছু শেখা হয়ে ওঠে না। নিচে দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস টানতে চাই... কিন্তু অধঃপাত... কেবলই নিচে টানতে থাকে, আমার গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু কানের কাছে ওইরকম একটি নির্মম ঘর রেখে কলপাড়ে যেভাবে মহিলারা আড্ডায় মেতেছে, এটা দেখে আবার কেমন কান্নাটা হজম হয়ে যায়। জীবন তো এই, আমি আগে নিজেই কি কম উল্টেপাল্টে দেখেছি? কী এমন নতুন দেখা হলো, কী এমন অসহ্য বাস্তব, যা আমি কখনো দেখি নি? যে অবস্থা আমাকে আগে কখনো পেরোতে হয় নি?

সুতো-মেশিনের জীবনের সাথে আমাদের সবার জীবনই যে গাঁথা। যাদের যাদের জীবন গাঁথা, তাদের একজনের বাস্তবতার সাথে আরেকজনের বাস্তবতার কি এমন দূরত্ব? আমাদের দু'বোনের তখন বিয়ে হয়ে গেছে। শওকত মামা নিজেও বুড়ো বয়সে বিয়ে করে সংসারী হওয়ায় তিনি আমাদের মাথার ওপর থেকে সরে গেছেন। আফসানাকে মার কাছে রেখে আমরা দুবোন তখন ঢাকার এক অজানা পৃথিবীতে পা রেখেছিলাম। শায়লা সবে মেট্রিক পাশ করেছে, আমি ইন্টারমিডিয়েট সেরে বিএতে ভর্তি হয়েছি।

ঢাকায় এসে প্রথমে এক দূরাত্মীয়ের বাসায় উঠি। এরপর যা হয়, দূরাত্মীয়দের বিরক্তি আর অপমানের মাথা খেয়ে একে ওকে ধরে আমরা দু'বোন একটা গার্মেন্টিস এ অপারেটরের চাকরি নিই। প্রথম কয়েকমাস অবশ্য হেলপার হিসেবে কাজ শিখে তারপর আমাদের অপারেটর হিসেবে পদোন্নতি ঘটেছিল। সে এক বিচিত্র জগত। শিক্ষা দীক্ষার কোনো দাম নেই। বিভিন্ন বাসার কাজের মহিলারা ঘরের দাসত্ব ছেড়ে এখানকার দাসত্বের নিচে এসে আশ্রয় নিয়েছে। ওদের পাশাপাশি বসে নিজেকে ওদের চাইতে উঁচু স্তরের কেউ ভাববারই কোনো অবকাশ ছিল না। বাবার সংসারে থাকতে একরকম যুদ্ধ, যে যুদ্ধের সাথে প্রবলভাবে অর্থসংকটও ছিল, কিন্তু ভাতের চিন্তাটাতো আমাকে করতে হতো না। শওকত মামা এসে আমাদের জীবনের রূপটাই পাল্টে দিলেন। আমরা ভাত ডালের বাইরেও জীবনকে চিনতে শিখলাম। আমরা বেড়াতে যেতে শিখলাম, কিছু একটা সৌখিন জিনিসও কিনতে শিখলাম। কিন্তু সেখানে ভাতের গ্লানি ছিল না— সেখানে ছিল বাঁচার গ্লানি। একজনের দয়ায় আমাদের বাঁচতে হচ্ছে, এ নিয়ে শহরে নানারকম টিপ্পনী ছিল, ফলে সেই বাঁচার মধ্যে কোনো স্বস্তি ছিল না। তিনিও যখন সরে গেলেন, তখনই আমাদের জীবনে ঘাস খেয়ে বাঁচার পরিস্থিতিতে পড়তে হলো। মা'র বাড়ির অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। আমার মামারা নিজেরাই চরম অর্থ কষ্টে দিন কাটাতেন। ফলে, আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সংসারের হাল ধরা ছাড়া আর কোনো পথ ছিল না।

চাকরি নিয়ে হাড়ে হাড়ে টের পাই, জীবন কী জিনিস। এ কোন আজব জগত যেখানে ভোর থেকে গভীর রাত অব্দি নিজেকে এক মুহূর্তের জন্যও মানুষ ভাবার সুযোগ নেই? আমরা যে গার্মেন্টিসে কাজ নিয়েছিলাম, সেখানকার প্রোডাকশন ম্যানেজার ছিল মহাখচ্চর লোক। সেলাই মেশিনগুলো বস্তির মতন একটার সাথে আরেকটা ঘিচঘিচে করে বসানো। এর মধ্যে গাদাগাদি বসে চড়া লাইটের নিচে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিঃশ্বাসহীন কাজ করে যাওয়া। আমাদের বাথরুমের জন্য বরাদ্দ ছিল দুই মিনিট আর লাঞ্চের জন্য আধঘণ্টা। দুইশত শ্রমিকের জন্য বরাদ্দ ছিল একটিই বাথরুমের চাবি, সিরিয়াল আসতে আসতে চাপে ভুগে

একেক সময় মৃত্যু দশা হতো। সেই দুই মিনিটের বেশি এক মিনিট গেলেই বেতন কাটা যেত, তার চাইতেও ভয়াবহ ছিল, এই কাজের শাস্তি স্বরূপ প্রোডাকশন ম্যানেজার পিঠের মধ্যে এমন জোরে বেত দিয়ে আঘাত করত— চারপাশ অন্ধকার হয়ে আসত।

কয়েকদিনেই সব দেখে শুনে আমরা দু'বোন মহাহিসেবী হয়ে গেলাম। দুজন ব্রত গ্রহণ করি, দম আটকে মরে যাব, তবুও মালিকপক্ষকে আমাদের ভুল ধরার কোনো সুযোগ দেব না। কেননা আমরা সেখানে বড় নির্মমভাবে জীবনের আরেক বাস্তবতা দেখেছি, কাজে ভুল পেলে, কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রোডাকশন ম্যানেজার চাকরি যাওয়ার ভয় দেখিয়ে মেয়েদের শরীর পর্যন্ত ভোগ করত।

দূরাত্মীয়ের বাসা থেকে বেরিয়ে আমরা অন্যান্য গার্মেন্টিস এর মেয়েদের সাথে প্রথমে একটা বস্তিতে উঠেছিলাম— না, আমি সেই জীবন ভুলতে চাই, রাত্তিরে গলি ধরে হাঁটতে হাঁটতে নিজের বাড়ির সামনে এসে ছায়া দেখি, সেখানে ঘাই দিয়ে ওঠে শামীমার গ্যাঁজলা উঠা, যন্ত্রণাকাতর মুখ। আজ এই মেয়েটা ঘা দিয়ে জাগিয়ে তুলছে সেইসব দিনকে, যা আমি স্বপ্নেও স্মরণ করতে চাই না। যে জীবনে ভোর রাতে সার বেঁধে ভূতের মতো ঘুমুতে থাকা মেয়েগুলোকে, এমনকি নিজেকেও মনে হতো, কসাইয়ের ছুরির তলায় পড়ে থাকা গরু, আমি সেই জীবন ভুলতে চাই।

সামনে এইবার সত্যিই ছায়া, ক্রমশ আঁধার ফুঁড়ে মূর্ত হয়, অল্প আলোয় শায়েদের মুখটাকে বড় অপার্থিব মনে হয়। আমি যেন এতক্ষণ নিজেকে ছেড়ে দাঁড়িয়েছিলাম, এইভাবে ওর হাত চেপে ধরি।

ও ফিসফিস কণ্ঠে বলে, উফ, কী ভয়ই না পেয়েছিলাম, ভেবেছিলাম ওই অভিনেত্রীর কারণে তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ, উফ, তুমি গ্রেট নীলুফার! আমার মনটা অনেক বড় হয়ে গেল।

এরপর একদিন হঠাৎ করেই আমার রঞ্জনের সাথে দীর্ঘ সময় দেখা এবং কথা বলার সুযোগ হয়ে গেল। আমাকে ফোন করে সে নিউমার্কেটের সামনে আসতে বলে। সেদিন বন্ধের দিন এবং সবে সকাল গড়াচ্ছে। কৌতূহলে, উত্তেজনায় আমার সমস্ত স্নায়ু অবশ হয়ে আসতে থাকলে আমি ছিরিবিরি মুখ নিয়ে আয়নার সামনে বসি। চেহারা আমার খুব একটা খারাপ না, কিন্তু রঞ্জন ফোন করে দেখা করতে চাওয়ায় সেটা ক্রমশ কেমন ফ্যাকাশে আর বিবর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। আমি কম্পিত হাতে চোখে কাজল ঘষি, সেটা লেপটে কেমন মোটা হয়ে যায়। অনেকদিন পর শাড়ি পরে খেয়াল হয় ঘরে ম্যাচিং কোনো টিপ নেই। নিজেকে হাজার ঘষেও কিছুতেই যখন সুন্দর করে তুলতে পারি না তখন অসহায় হয়ে ঘড়ি দেখে আর কোনো উপায় না পেয়ে বেরিয়ে পড়ি।

আচ্ছা! জীবনে এত ঝড় এত দহন এত যুদ্ধের পরেও আমার মধ্যে থেকে কৈশোরিক বোধগুলো মরে না কেন? রঞ্জনের সাথে দেখা না হলে আমি তো জানতামই না কোনো পুরুষকে কেন্দ্র করে কম্পিত হওয়ার, অস্থির হওয়ার মনটা এখনো আমার মধ্যে সুপ্ত আছে। আমি দীর্ঘ দীর্ঘ দিন পুরুষদের সান্নিধ্যে ম্রিয়মান সময় কাটিয়েছি। কুমারীত্ব হারিয়েছি আমি বারো বছর বয়সে, সেইসব স্মৃতির বিস্ময় আমার রক্তে এমন মর্মান্তিকভাবে প্রবাহিত, পরবর্তী

জীবনে আমি ভুলেও তার সামনে আর নিজেকে দাঁড় করাতে চাই নি। এরপর আরো একজন, গার্মেন্টিস এ কাজ করার সময়, এক রাতে বস্তির এক ছেলে আমাকে যখন চেপে ধরল, আমিও হালকা তরঙ্গে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিলাম। যাহোক, সবশেষে শায়েদ— আমি এই সমস্ত পুরুষের স্পর্শেই এমন এক হালকা সাময়িক উত্তেজনা বোধ করেছি, সেই মুহূর্ত পার হওয়ার পরই যার মধ্যে সুখের রেশ পর্যন্ত ছিল না। অন্তত শায়েদের সাথে তো আমার প্রেমের সম্পর্ক, প্রথম কয়েকদিন ছাড়া বাকি দিনগুলোতে ওর স্পর্শকে আমার মনে হয়েছে এমন মরা মরা যেন হ্যান্ডসেক করছি। মায়া আছে, মমতা আছে তেমন অর্থে রোমাঞ্চ নেই। রঞ্জন ছাড়া আমি কখনোই কোনো পুরুষকে দেখে কেঁপে উঠি নি। যার ফলে আমার কাছে রঞ্জন এমন একটা বিষয়, যে বিষয়কে কিছুর বিনিময়ে আমি আমার মধ্যে থেকে হত্যা করতে চাই না। কষ্ট থাকুক, যন্ত্রণা থাকুক, স্নায়ু অবশ করা প্রহর থাকুক তবুও আমার জীবনে রঞ্জন মানে একটা স্বপ্ন। মানুষের গহীন ভেতরে কোনো স্বপ্ন যদি না থাকে, সেই মানুষের জীবন এক প্রাণহীন দম দেয়া পুতুলের জীবনে পরিণত হয়। এতদিন আমার তাই ছিল, এক জীবনে স্ফুলিঙ্গের মতো আমাকে জ্বালিয়ে ফের নিভিয়ে যে চলে গিয়েছিল, অন্য এক পরিণত জীবনে তার যেন পুনর্জন্ম হলো। ফলে আমি ভাবতে পারছিলাম না, সেই স্বপ্নের মানুষের এই আহ্বানের রূপটা কী? আমার মধ্যে হাজার রূপের তরঙ্গ, কিন্তু খোসা বন্দি কুসুমের মতো আমি নিজের মধ্যে ছলকাই, নানা প্রক্রিয়ায়, নানা কায়দায়, কিন্তু নিজ থেকে উছলে পড়তে পারি না। কেন সে ডেকেছে আমাকে? আমরা দু'জন কি মানুষের ভাষায় সাধারণ কথা বলব? ছায়া ফুঁড়ে আশ্চর্য সব তৃষ্ণাগুলি ভাঁজ খুলে নাচতে শুরু করে, নিউমার্কেট থেকে কোথায়? আমাদের চারপাশে মুহূর্তে কি অদ্ভুত সব আঁধার নেমে আসবে? যে আঁধারের মাঝখানে গেলে চাকতির মধ্যে জ্বলজ্বল করবে এক পিণ্ড আলো, আমি তার ওপর দাঁড়িয়ে আমার আঁধার মুখে তুলে ধরব মোমের শিখা, রঞ্জন কি আমার আঁধার তৃষ্ণার্ত মুখের ভাঁজগুলো ছোঁয়ার জন্য তার অভিনব আঙুলগুলো বাড়াবে?

রাস্তায় জ্যাম। আমার মগজের কোষগুলি এলোমেলো হয়ে যায়। গতরাতে শায়লার সাথে অনেক কথা। এই প্রথম আমি ওর সাথে রঞ্জনের বিষয়ে কথা বলেছি। একজন মানুষকে আমি ক্রমশ অলৌকিকতায় নিয়ে যাচ্ছি অনুভব করে ও হেসেছে, বলেছে, তোমার অনেক কিছুই আমি বুঝি না। ও আতঙ্কিত হয়েছে, সাবধান করেছে এই বিষয়টাকে জীবনের প্রধান করে আমি যেন আমার জাগতিক শান্তি নষ্ট না করি। এরপর ও নিজেও খুলে ধরেছে তার বেদনা। শামীমাকে কেন্দ্র করে তার গ্লানি আর যন্ত্রণার শেষ নেই। পুলিশের ওই উচ্চারিত 'বেশ্যা' শব্দ শামীমাকে কয়েকদিন বিকারগ্রস্ত করে রাখলে কি এক জেদে কি এক যন্ত্রণায় সে ক্রমশ পা বাড়িয়েছিল সেই পথেই। মালিক পক্ষের কোনো এক ছেলের সাথে প্রায় রাতেই বেরিয়ে যেত। একসময় এই করে সে গর্ভে সন্তানের উপস্থিতি টের পায়। সেই ছেলে সটকে পড়ে, শামীমা পড়ে অপার শূন্যতায়; দাবি দাওয়া প্রসঙ্গে আন্দোলনের কারণে ওদের চাকরি যাওয়ার পর কোথায় জানি ওর মা ওকে নিয়ে গিয়ে এ্যবরশন করায়। কাজটা মনে হয় ওরা নিখুঁতভাবে করতে পারে নি। বাসায় আসার পর শুরু হয় ব্লিডিং। শায়লা বলে— সেইদিনই বোধ হয় তুমি গেছিলা। রাইতে বেগতিক দেইখ্যা ওরে হাসপাতালে ভর্তি করা হইছে।

এরপর সে নিজের জীবন নিয়েও ভেঙে পড়ে, বেনুবালার ভাই ওসমান বড় পিছনে লেগেছে বুবু। ওরে বিয়া করলে কেমন হয়?

ধুর! ও একটা পোলা হইল? আমি হেসে উড়িয়ে দিই. তোর প্রোডাকশন ম্যানেজারের খবর কী?

এইবার শারলা হাসে, তুমি মনে কর সে আমারে বিয়া করতে চায়? এইডা হইলো গিয়া ওর চাকরির বিনোদন। কারো প্রতি প্রেম প্রেম একটা ভব থাকলে চাকরিটা করতে মজা লাগে। বিষয়টারে আর কষ্টের মনে হয় না। একটা জব্বর খেলা চলতাছে ওর সাথে, সিরিয়াস কিছু না। নিউ মার্কেটের গেটের সামনে হাজার ফেরিঅলা আর ঝাঁকঝাঁক মানুষের মাঝখানে আমি মহা অস্বস্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। আমার তো মাত্র দুটো চোখ... মুহুর্মুহু ঘুরতে থাকে রিকশায়, নানা রকম মুখে, বলাকার সামনের পোস্টারে, আশ্চর্য! সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, আমার হৃৎপিণ্ডের কাঁপুনি তীব্রতর হচ্ছে, রঞ্জনের দেখা নেই। টেনশানে, ঘামে আমার যখন গলা শুকিয়ে আসছে বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে মাস্তান গোছের এক ছেলে আমার গা ঘেঁসে দাঁড়ায়, কার লাইগ্যা অপেক্ষা করতাছেন? আমি বিব্রত মুখে বলি, আমার এক বোন, মানে—।

কিছু মনে করবেন না, আপনেরে ঠিক স্বাভাবিক মহিলা মনে হইতাছে না, তার ফিসফিসে কণ্ঠ কর্কশ শোনায়, বাজারের সামনে খাড়ায়া বইনের লাইগ্যা অপেক্ষা—।

আমি প্রচণ্ড বিপন্ন হয়ে পড়ি। এই শহরে বাস করে আমি জানি এদেরকে কিছু মাত্র ঘাঁটানোর পরিণতি কী হতে পারে। আমার শান্তি নষ্ট হয়ে যায়, আমি বলি, এটা তো নিউমার্কেট, কোনো খারাপ জায়গা না, এখানে তো আমি কারো জন্য অপেক্ষা করতেই পারি।

আপনি কী করেন?

পত্রিকায় কাজ করি।

আপনের কার্ড আছে?

এইবার বিপদে পড়ে যাই। প্রায় একবছর কাজ করছি, আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার নেই, কার্ড নেই... অসহায় স্বরে বলি, নতুন ঢুকেছি, এখনো কার্ড পাই নি, বলতে বলতে গা ঘষটে ঘষটে ভিড়ের মধ্যে নিজেকে সেঁধিয়ে দিতে থাকি। কিছুক্ষণ হারিয়ে গিয়ে দেখি, ছেলেটি আমার গা ঘেঁসে হাঁটছে, পলাইতাছেন ক্যান? বইনের লাইগ্যা অপেক্ষা করবেন না?

আমার চেতনা থেকে সব স্বপ্ন, সব মোহ উবে গেছে। আমি এই অসহনীয় জঘন্য পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রায় দৌড়েই রিকশার কাছে গেলে খুলে যায় রঞ্জনের গাড়ির পাল্লা,আমি সেই হিম হিম শীতে নিজেকে সেঁধিয়ে দিয়ে অস্থির কণ্ঠে বলি, প্লিজ রঞ্জন, জোরে চালাও।

বেশ কিছুক্ষণ আমি প্রায় চেতনারহিত থাকি। রঞ্জন অবাক কণ্ঠে প্রশ্ন করে, কী হয়েছে নীলু?

কিছু না! কিছু না।

আমি দুঃখিত! বেরোনোর মুখে এমন আটকে গেলাম।

এক অদ্ভুত ছায়াশীতল রেস্টুরেন্টে আমরা বসি। ওর কপালের ওপর পড়ে থাকা চুল আর ছায়াঘন মুখ দেখে কিছুক্ষণ আগের জঘন্য তিক্ততা ভুলে যাই। মাথার ওপর খড়ের চাল। চারপাশে গাছগাছালি, পাশে ছোট্ট দিঘি। খাবারের অর্ডার দিয়ে রঞ্জন আমার দিকে তাকিয়ে

বসে থাকে। আমি আড়ষ্ট বোধ করি, হাতের তালু চুলকাই, নিজেকে সহজ করতে কণ্ঠে সুর তোলার চেষ্টা করি... ওপর শূন্যতার মহাচক্র থেকে ঘাঘরা ঢেউ তোলে শিশু বাতাস, এইবার আমি অপলক তাকাই ওর দিকে।

গভীর! বড় গভীর ওর চোখ, ওর অস্তিত্বের সব ঢেউ, সব ভাষা, সব তরঙ্গ এসে এখানে স্থির হয়ে দাঁড়ায়, আমি টিকতে পারি না, ফের নুয়ে পড়ি এবং এই পুরো বিষয়টিকে আমার স্বপ্নে ঘটছে বলে ভ্রম হতে থাকে। আমার মুহূর্তে মনে পড়ে যায় আমার অতীত... ঘৃণিত, ক্লিশিত, মনে পড়ে সেই গার্মেন্টিস জীবনের বস্তির ইতিহাস, এবং জীবনের এইসব জাগতিক মাপকাঠিতে নিজেকে দাঁড় করিয়ে মুহূর্তে মনে হয়, আমি এই পরিবেশের যোগ্য নই। আমার কম্পন ফুরিয়ে আসতে থাকে। আমি ফিসফিস কণ্ঠে বলি, নিজেকে আমার কলার ভেলার ওপর দাঁড়ানো মানুষ মনে হচ্ছে।

রঞ্জন বলে, তুমি কিন্তু সাঁতার জানতে না।

মুহূর্তে অতীতের এক মমতাময় ঢেউ এসে আমাকে আচ্ছন্ন করে দেয়। আমার সর্ব অস্তিত্ব রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে, তোমার মনে আছে?

লাইটার দিয়ে ফস শব্দে সিগ্রেট ধরায় রঞ্জন, এবং আগুনের দিকে চেয়ে থাকে, আমি কিচ্ছু ভুলি না।

আমি টেবিলের ওপর রাখা ব্যাগের মধ্যে আঁকিবুঁকি করে বলি, কেন আসতে বলেছ আমাকে?

নিশ্চয়ই চাকরিতে জয়েন করতে নয়, রঞ্জনকে কিঞ্চিৎ হতাশ দেখায়। কে কাকে ডেকেছে, কোন বিশেষ প্রয়োজনে ডেকেছে সেটাকে কি খুব জরুরি মনে হচ্ছে তোমার কাছে?

আসলে আমি কথা খুঁজে পাচ্ছি না, এইবার আমার কণ্ঠ বিপন্ন শোনায়, এবং মনে হয় এরপর একটার পর একটা বোকার মতো কথা বলতে থাকব।

দিঘির মধ্যে শাপলা, তার ওপর ফড়িং... সায়রাবু সাঁতার কাটছে, অপার্থিব জ্যোৎস্না এসে ঢেকে দিচ্ছে সেই বাড়ির সব বেদনা, মা'র হৃৎপিণ্ড ফুঁড়ে বেড়ে উঠছে বিশাল এক বটগাছ... আমরা পাঁচবোন সেই গাছে বসে দোল খাচ্ছি। গাছ... গাছ... হ্যাঁ, এই তো এগিয়ে আসছে অভিনব আরেক স্মৃতি, আমাদের শ্যাওলা দিঘির এক কোনার ঝাঁকড়া জামগাছটির কথা মনে পড়ছে, তখন আর কত বয়স? ক্লাস ফাইভে পড়ি, ঘাটে বসে দেখতাম আর দেখতাম, ওই সাবলীল ঋজু গাছটিকে আমার অপূর্ব এক পুরুষ মনে হতো। শিশুকাল থেকেই আমি তন্নতন্ন করে সেই গাছের শরীর ঘেঁটে... আমি যখন পঞ্চম শ্রেণী, এক অপরাহ্নে টের পাই সেই গাছের বিশাল মোটা ডালটির সাথে আমার সমস্ত শরীর গেঁথে যাচ্ছে, জীবনের প্রথম এক অপার্থিব শারীরিক অনুভূতি... যার আবিষ্কারে আমি বিস্মিত, কম্পিত, বিহ্বল... আমার নিঃশ্বাস ঘন হয়ে আসছিল, প্রচণ্ড ইন্দ্রিয় সুখে ঘুম নেমে এসেছিল চোখে, এরপর জীবনে এলো রঞ্জন, কদিনের পরিচয়েই প্রচুর বইপত্তর আর ক্যাসেট, জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আমার জীবনে শুরু হলো নিজেকে নির্মাণের পাঠ। বৃক্ষ ছেড়ে প্রথমে আমি গিয়ে পড়লাম আমজাদ আলী খার চেহারায়, এর পর সুরে— দীর্ঘ বছর পর, আমি যখন যুবতী, এই এখনো, শায়লা যখন দেরিতে ফেরে, আফসানা খালার সাথে শোয়, শওকত মামার দেয়া ক্যাসেট রেকর্ডারে সুর ছেড়ে আধো বাতি জ্বেলে মেঝের মধ্যে গড়াতে গড়াতে

আমি সেই সুরের সাথে সঙ্গম করি। এবং এমন ইন্দ্রিয় সুখে আচ্ছন্ন হই, যা আমি কোনো পুরুষের স্পর্শে হই না।

রঞ্জন বলে, তুমি কেমন আছ নীলুফার?

আমি বড় সরল স্বরে বলি, আমি কোনোদিন সুখী ছিলাম না, আমার জীবনে একদিনের জন্যও কোনো সুখ নেই, কেউ একজন আমার মধ্যে একটা প্রাণ বসিয়ে দিয়েছে, তার পায়ের ওপর ভর করেই বাধ্য হয়ে প্রতিদিন হাঁটতে হচ্ছে।

ঘাসের মধ্যে ছাই ঝেড়ে রঞ্জন বলে, তোমাকে বিখ্যাত একটা গল্প বলি, একজন কোটিপতি লোকের সব ছিল, বিশাল বিশাল খামার, নানারকম গাড়ি, সৌখিন দ্রব্য, অনেক অনেক নারী, তারপরও তার সারাক্ষণ মনে হতো, কী যেন তার নেই, সে সুখী হতে পারত না। সুখের সন্ধানে সে পাড়ি দেয় আফ্রিকায়, সেখানেও সে নানা ভোগ বিলাসে ক্লান্ত হয়ে অনুভব করে, কী যেন তার নেই... সারা পৃথিবী ঘুরে হঠাৎ তার নিজের ঘরের কথা মনে হয়, সে ফিরে এসে দেখে সেখানে তার সন্তানেরা, তার মেয়ের ইস্কুলের বেতন— কোনোদিন যেসব দিকে সে মন দেয়ারই সুযোগ পায় নি...।

আমি হেসে বলি, দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া— তুমি কি ভাবছ রঞ্জন এইখানে এসেই, লোকটি অতঃপর সুখী হইল এই ফুলস্টপ দেয়া যায়? হ্যাঁ, এখানে এসে তার মনে হতে পারে সে সুখী... কিন্তু সেই অনুভবই বা কতটা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে? রঞ্জন, তুমি যে গল্প বলছ— আমার জীবনের বেদনা সব পূর্ণতার মধ্যে শূন্যতা খোঁজার বেদনা নয়, আমি এখনো সেইসব জীবনের বহু বহু স্তর নিচে বাস করছি। আমার নিয়তি আমাকে কখনো পরিপূর্ণভাবে হাসতে দেয় না।

রঞ্জন বিমর্ষ কণ্ঠে বলে, এই গল্প আমি নিজেকেও শোনালাম। এই গল্প জানি বলেই সুখ খোঁজার চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছি। প্রথম বয়সে যে আন্না কারেনিনার রূপে মুগ্ধ হয়, যে তাকে জীবনের কাঙ্ক্ষিত দুর্লভ নারী মনে করে, বাস্তবের কারো সাথে তার যে জীবনের বাস, সে এক দীর্ঘ আপোস ছাড়া আর কী। কিছু বই আর কিছু গান আমার জীবনে সর্বনাশ ডেকে এনেছে। কেউ যখন বলে বই পড়া, গান শোনা তার শখ, বড় অদ্ভুত লাগে। তাদেরকে আমার ঈর্ষা হয় যে এইসব অস্তিত্বের অংশগুলোকে তারা সখ হিসেবে নিতে পেরেছে, তুমি দেখবে বহু শিল্পী গান গায়, কিন্তু গানের কথাগুলোকে প্রাত্যহিক জীবনে ধারণ করতে পারে না, কোনো একটা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সুর তার সন্তানের মুখে ভাত তুলে দিতে থাকা হাতটাকে অসাড় করে দেয় না, কিংবা পাঞ্জাবির বোতাম খুলতে থাকা আঙুলগুলোকে কাঁপিয়ে দেয় না— আমি কি প্রসঙ্গ থেকে সরে যাচ্ছি নীলু? এইসব কথা বলার আমার কী যোগ্যতা আছে, যে আমি সার্বিকভাবেই একজন ব্যর্থ মানুষ?

তুমি কিন্তু সুন্দর কবিতা লিখতে— আমি এইভাবে বলতে শুরু করলে রঞ্জন থামিয়ে দেয়, সে এককালে বহু লোকই বহু কিছু করত, এখন কী করছি সেটাই বড় কথা, বাঁচার তাগিদে জঘন্য, অসভ্য, দাসত্বগিরি।

প্লেটভর্তি কাবাব আসে।

তাহলে সেই বয়সে, যে বয়সে আমি রঞ্জনকে কেন্দ্র করে এক ঝুলন্ত মৃত্তিকার মধ্যে নিজের পা দুটোকে স্থাপন করতে চাইছিলাম, ওর সর্ব অস্তিত্ব জুড়ে ছিল আন্না কারেনিনা? বয়সের এই প্রান্তে এসেও বড় যুক্তিহীন ঈর্ষা হয়, আমি রঞ্জনকে বলি, তুমি এটা বিশ্বাস

কর— কোনো বই কিংবা পর্দার চরিত্র তার সারাজীবনকে এতটাই আচ্ছন্ন করতে পারে, সে তার জীবনে বাস্তবে আসা কোনো মানুষকে নিয়ে সুখী হতে পারে না ?

রঞ্জন বলে, অন্তত প্রথম জীবনে তেমন মারাত্মকভাবে ভেতরে কেউ ছায়া ফেললে তাই হতে পারে, সে সারাজীবন বিভিন্ন মানুষের মধ্যে তার ছায়া খোঁজে।

ধুর! এ কি হয় ? আমি হেসে ফেলি, মানুষ কি সারাক্ষণই একটা আচ্ছন্নতার মধ্যে বাস করতে পারে ? যেখানে সারাক্ষণই তাকে বাস করতে হচ্ছে এক অসম্ভব বাস্তবতার মধ্যে ?

হ্যাঁ, পৃথিবীর সবাই বিষয়টাকে সেইভাবেই নেয়। কাবাবের প্লেট এগিয়ে দেয় রঞ্জন, পর্দার বিষয়টা বা বইয়ের চরিত্রটা তার একটা অবসরের কল্পনা, কিন্তু সবার যা হবে আমারও ঠিক তাই হবে, তা তুমি আশা করছ কেন ? আমি তো এমন একজন মানুষ দেখি না যার মধ্যে সেইসব অভিব্যক্তির উপকরণ আছে।

রঞ্জন, তুমি জীবনের এইপ্রান্তে এসেও এইভাবে ভাবছ ? সেসব তো কল্পিত, নির্মিত, গোটা একটা ফিল্মের সিংহভাগ ছেঁটে এক জীবনকে ধারণ করে যে ছবি— তার সাথে তুমি মানুষের জাগতিক জীবনের প্রাত্যহিকতাকে মেলাতে চাইছ।

অথচ তুমিই একদিন— মনে আছে নীলু, যেদিন আমাদের শেষ দেখা হয়, সেই তালগাছটার নিচেই, আমাকে বলেছিলে, তুমি জীবনের প্রথম প্রেমে পড়েছিলে এক ডানাঅলা ঘোড়ার ছবির। মানুষের জীবনে এইসব শিক্ষা দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে হয় না, তুমি আমাকে অকপটে বলেছিলে সেই ঘোড়াই হয়ে উঠেছিল তোমার জীবনের সবচাইতে কাঙ্ক্ষিতজন। এবং একজন মানুষ তোমাকে সেই ঘোড়ার কাছে নিয়ে যাবার লোভ দেখিয়ে এক ভাঙা প্রাচীরে তোমার শরীর ভোগ করেছিল, নীলু—।

রঞ্জন! আমি প্রায় আর্তনাদ করে উঠি, তুমি কি সেইদিন সেই ঘোড়াটাকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবেছিলে ?

না! না নীলু, আমি... কেবল আমিই তোমার শরীরটাকে প্রথম ছুঁতে চেয়েছিলাম।

এটা পৃথিবীর সব পুরুষই চায়। কৈশোর পেরোনোর পর অনেক পরে সেদিন তোমার সাথে আমার শেষ দেখা হয়েছিল। আমি ততদিনে তোমার দেয়া লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার পর্যন্ত পড়ে ফেলেছি, আমার মনে হয়েছিল তোমাকে কিচ্ছু লুকোনো আমার পাপ হবে, এই বিষয়টাকে তুমি সহানুভূতির সাথে দেখবে। যেহেতু আমি ছবির মায়া কাটিয়ে ততদিনে তোমাতে অন্ধ হয়েছি।

আমি টের পেতাম, তুমি অন্ধ... কাবাব ঠাণ্ডা হয়ে যেতে থাকে, রঞ্জনের সিগ্রেটের মুখ শুকিয়ে যায়, তাই এতকাল পর বড় দেখতে ইচ্ছে হলো, খোলা চোখে, পরিণত মনে আমাকে কেন্দ্র করে তোমার অনুভবটা কেমন ?

আমাকে কেন্দ্র করে সত্যি তোমার কৌতূহল আছে ? আমার কণ্ঠ কেমন ভেঙে আসতে থাকে, তুমি চিন্তা করে কথা বলছ রঞ্জন ? যে তুমি আন্না কারেনিনাকে সারাজীবন...।

রঞ্জন সস্নেহে আমার হাতে মৃদু চাপ দেয়, যে মেয়ে ডানাঅলা ঘোড়ার স্বপ্নে নিজের দেহের শুদ্ধতার কথা ভুলে যায়, সে এই জীবনে যত যুদ্ধই করুক, আমার কাছে সে সেইসব চরিত্রের মতনই।

অথচ তুমি এই কারণেই আমাকে ছেড়ে গিয়েছিলে... আমি ম্লান খাদ্যগুলোর মধ্যে ভেজা চোখ লুকোতে চাই, তুমি দেহের সেই অশুদ্ধতা মানতে পার নি।

আরো অনেক কারণ ছিল, রঞ্জনও ক্রমশ বিমর্ষ হয়ে ওঠে, হ্যাঁ তুমি ঠিকই ধরেছ, বয়স কম ছিল, বিষয়টা আমাকে আঘাত দিয়েছিল, কিন্তু বয়স যত বেড়েছে, চিন্তার ব্যাপকতা বেড়েছে, সেই বিষয়টাই হয়ে উঠেছে আমার কাছে তোমার সবচাইতে বড় সৌন্দর্য। আমার মনে হয়েছে, বাস্তবতার জঘন্য পেষণও অন্তত তোমার স্বপ্নকে হত্যা করতে পারবে না।

এরপর আমি চাকরির ধান্দায় ঘুরি, জমানো টাকাগুলো ভাঙতে থাকায় অনিশ্চয়তায় ভুগি, শায়লার গার্মেন্টিস জীবনের অসুখী জীবনের সাথে একাত্ম হয়ে রাত্তির যন্ত্রণাময় করে তুলি, কিন্তু আমার জীবন যেন এইসব কিছুর মাঝখানেও হঠাৎ অর্থবহ হয়ে ওঠে। সেই প্রথম জীবনে যখন রঞ্জনের দেয়া বইগুলো আমি পড়ছি, ওর চিন্তার সাথে এক হয়ে নিজেকে আলোকিত মনে করছি, সেই সময়টায়ই একমাত্র আমি নিজের কাছে নিজের মূল্য বুঝতে পেরেছিলাম। পৃথিবীর বিখ্যাত মানুষের জীবনের সাথে নিজেকে মিলিয়ে মনে হতো, নিশ্চয়ই আমার ভেতর কিছু একটা শক্তি আছে, এই গ্লানির জীবন পেরিয়ে একদিন সেই শক্তির স্ফুরণ ঘটবে। আমি গান গাইতাম না, লিখতাম না, ছবি আঁকতাম না... তবুও... তবুও আমি সুর চিনতাম, ভায়োলিন শুনতে শুনতে আমি দেখতাম চারপাশ ছায়া হয়ে আসছে, একটা আলোকস্তম্ভের ওপর আমি... কেবল আমি। উপন্যাসের চরিত্রগুলো হয়ে উঠত আমার সবচাইতে নিকটজন। আমার যদি হেরম্বর সাথে দেখা করতে ইচ্ছে হতো আমি রঞ্জনের দেয়া দিবারাত্রির কাব্যটা খুলে তার সাথে দেখা করতে যেতাম। উভচর মানুষ খুলে কথা বলতাম ইকথিয়ান্ডরের সাথে। এরকম দশ বারোটা বই ছিল আমার ঘরে, যে চরিত্রগুলো ছিল আমার নিকট আত্মীয়। আমি টের পেতাম, আমার ভাষার সাথে আমার সহপাঠীদের, এমনকি আমার বোনদের ভাষাও মিলছে না। আমি ক্রমশ বাস্তব পৃথিবীতে একা আর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে শুরু করেছিলাম। তখন, তখনই আমার মনে হতো আমার একটা আশ্চর্য শক্তি আছে, যা আমি খুঁজে পাচ্ছি না।

এরপর গার্মেন্টিসের জীবনে এসেই আমি প্রথম নিজের মূল্য হারাতে শুরু করি। নিজেকে আলাদা, স্বতন্ত্র, মূল্যবান ভাবলে সে কাজ করা সম্ভব ছিল না। আমি ভুলে গিয়েছিলাম রঞ্জনকে, হেরম্বকে, আন্না কারেনিনার ভ্রনস্কি কিংবা লেভিনকে। মেশিনের নিচে বলির পাঠার মতো আমি আমার মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। বস্তির ঘুপচি ঘরটার মধ্যে শুয়ে, ঘেমোগন্ধের মহিলাদের সাথে কাজ করে মাঝরাত্তিরে ঘরে ফিরে নিজের অস্তিত্ব সংকটটাই তখন প্রধান হয়ে উঠেছিল। কি করে দ্রুত কাজ শেখা যায়, কি করে দুটো পয়সা বেশি উপার্জন করে নিজে বাঁচা যায়, মাকে টাকা পাঠানো যায় এসব চিন্তায়ই দু'বোন দিশেহারা হয়ে থাকতাম। আমরা যে বস্তিতে থাকতাম, সেটাকে গার্মেন্টিস পল্লী বললে ভুল বলা হবে না। নানা গার্মেন্টিসের মেয়েরা নানা রকম দুঃখ সুখের আবর্তনের মধ্যে সেখানে সারাদিনের ক্ষুদে একটা অংশ কাটাতো। আমি কয়লা খনির শ্রমিকদের জীবন পড়েছি, তাদের জীবনের সাথে আমাদের সেই জীবনকে মিলিয়ে মিলিয়ে বাঁচার স্বস্তি খুঁজেছি। আমাদের কারো কোনো মর্যাদা ছিল না, না অফিসে, না রাস্তায়, না নিজের বাড়িতে।

মানুষের বাড়িতে দাসত্বের সাথে এখানকার একটা মৌলিক পার্থক্য ক্রমশ টের পেতে শুরু করি। এখানকার মেয়েরা এইরকম অমানবিক জীবনের মধ্যেও সেই দুঃসহ পয়সায় লিপস্টিক কিনতে শেখে। ঢুলু চোখে কাজল লাগিয়ে ওরা যখন পথে বেরোত, তখন রাস্তার

ছেলেদের টিপ্পনির মুখে যে মেয়েগুলো কুঁকড়ে থাকত, সেই মেয়েগুলোই আশ্চর্য সাহসের সাথে, আশ্চর্য শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে উল্টো শিস দিয়ে, উল্টো বুকের কাপড় উন্মোচন করে সেই কুশ্রীভঙ্গিরত ছেলেদের সামনে হেসে গড়িয়ে পড়ত। যেহেতু তারা চলত ঝাঁকে ঝাঁকে, তাদের সেই হিহি হাসিতে গড়িয়ে পড়া অবয়ব দেখে ছেলেগুলোর মুখ পাংশু হয়ে উঠত, তারা কেমন পিছিয়ে যেত। আর তাই দেখে আমরা দু'বোন অদ্ভুত মজা পেতাম।

আমার পাশেই থাকত এক বৃদ্ধা, বৃদ্ধ। ওদের ছেলে দুটো ছিল বাউণ্ডুলে। মেয়েটি রাতে অবসন্ন দেহে ঘরে ফিরে যখন পাগলের মতো বালিশ খুঁজত, প্রতিরাতেই বুড়োবুড়ি মরাকান্না জুড়ে দিত, মেয়ের কামাই খেয়ে এক ধিক্কারের জীবনের মধ্যে তাঁদের বাঁচতে হচ্ছে বলে। একটা ছোট্ট তক্তপোষের ওপর গাদাগাদি করে তিনজন ঘুমুত। কয়েক মাসের মধ্যেই ওই একটি বস্তির মধ্যেই কয়েকটি বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটেছে। আমাদের সাথে খুব খাতির ছিল একজন মেয়ের। উপকূলে সর্বস্ব হারিয়ে ঢাকায় এসে বেশ ক'বছর চাকরি করে কিছু টাকা জমিয়ে সে একজনকে ভালোবেসে বিয়ে করে। টাকাগুলো শেষ হলে তিনমাসের মাথায় মেয়েটিকে বাজারের মেয়ে বলে স্বামী তালাক দিয়ে চলে যায়। এর আগে তারা সুখেই দিন কাটাচ্ছিল। কিন্তু একদিন মেয়েটি স্বামীকে বলে যায় রাত দশটার মধ্যে ফিরতে পারবে। কিন্তু অফিসে গিয়ে কাজের চাপে আটকে তার শেষরাত হয়ে যায়, স্বামী তাকে এই নিয়ে বেদম প্রহার করে, সারা রাইত কই আছিলি মাগি ? কার লগে হুইয়া আইছস ?

সেই মেয়েটির চোখে পরবর্তী সময়ে সেকি আগুন! থুঃ! বিয়ার মুখে সাতবার লাথি দেই। সবচাইতে মারাত্মক অবস্থা হতো গর্ভবতী মেয়েদের ক্ষেত্রে। গর্ভধারণের অপরাধে মুহূর্তে অফিসে তার কদর কমে যেত। মাথা টলুক, অন্ধকার হোক চারপাশ, বমি আসুক... কারো কোনো সহানুভূতি নেই। এক মুহূর্ত ফাঁকি দিয়েছ তো বেতন কাটা থেকে শুরু করে নানা রকমের শাস্তি। আর রাত বিরেতে ঘরে ফেরার অপরাধে সন্দেহকাতর স্বামীদের লাথি, ঝাড়ু পেটা তো আছেই, হাচা কইরা ক এই বাচ্চা কার ?

ওই জীবনের সমান্তরালে বেঁচে থাকা আমার আবার আলাদা মূল্য! মধ্যরাতের ঢুলুনির মধ্যেও হাসি আসত মুখে, এই মেয়ে, হেরম্বর কাছে যাবে ? ওই যে দেখো চারপাশে বেড়াঘর আর টিনের চালের মটমট, ওই যে বৃষ্টি এসেছে... কি শুনতে পাচ্ছ ? সেতারের শব্দ ? ছোঃ!

কাজের মধ্যে মন ছিল না, শ্রদ্ধা ছিল না, স্বপ্ন ছিল না— এক অসহনীয় মেশিনের মধ্যে নিজেকে ঠেলে দিয়ে একেক সময় টের পেতাম হাত পা ভেঙে আসছে। সবচেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি হতো শিপমেন্টের সময়। দশ তারিখ মাল সাপ্লাই দিতে হবে, হাতেগোনা দিনের মধ্যে দিনরাত খেটেও দেখা গেল দুই হাজার পিস বাকি রয়েছে। অফিসের অবস্থা তখন এমন গনগনে হয়ে থাকে, কেউ কাশি দেয়ার জন্য সময় নষ্ট করলেও বসের মাথা গরম হয়ে যায়। সকাল-দুপুর-রাত, শেষরাত... কাজ করতে করতে মাথা ঘুরাত, বমি আসত, কিন্তু এই কাজটা চলে গেলে এই অচেনা নগরীর রাক্ষুসী হাঁ-টা মুহূর্তে চোখ অন্ধকার করে দিলে আবার মাথা তুলে দাঁড়াতাম। বিনিময়ে যে ন্যূনতম ওভারটাইম মিলত, তাতে মনে হতো কারো বাড়ি গিয়ে ঝি-গিরি করি।

আমাদের এখানকার পুলিশকে আমরা ট্যাক্স দিয়ে রাতের রাস্তার নিরাপত্তার বিষয়টা ঠিক রাখতাম। একেকদিন মধ্যরাতে আমরা দলবেঁধে নিজেকে হেঁচড়ে প্রায় ঘুমুতে ঘুমুতে ঘরে ফিরে দেখতাম... রাতের ধূধূ পথ... কুকুর... বাঁশির শব্দ... আর সুখী মানুষদের বন্ধ

জানালাগুলি। ওর মধ্যেই ফুটফুটে মেয়ের মতো এগিয়ে আসত মায়ের মুখ, যেন হাসতে হাসতে সে হাত বাড়াত, আমার পয়সা ? আমি দেখতাম গাছগুলি, পাতাগুলি ঘুমিয়ে পড়েছে, ঘুমিয়েছে জলের মাছেরা, আর রাস্তার বাতিগুলোর ঘুমন্ত চোখ কি নিষ্প্রভ আলোয় বিচ্ছুরিত... আমি সেই আধো চোখে এরপর আমার পাশে গড়াতে থাকা মেয়েগুলোর রাত্রির মুখ দেখতাম, কাঙ্ক্ষা নেই, স্বপ্ন নেই, ভবিষ্যৎ ? ভোর সাতটা পর্যন্ত বিছানায় এক পশলা ঘুম। শুয়ে শুয়ে শায়লার ভেঙে পড়া ঘুমন্ত দেহে হাত রেখে টিনের চালের দিকে চেয়ে থাকতাম, না, এই জীবন যাপন করার জন্য আমার জন্ম হয় নি। আমি এইভাবে বাঁচতে পারব না। সেদিন যেভাবে শায়লা সত্য বলার জন্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সেসময় আমার একা এর চেয়ে তীব্রতর ইচ্ছে জেগেছিল। মনে হতো চাকরির নামে এই অমানবিকতার শেষ হওয়া দরকার। আমার ইচ্ছা হতো সেই রাতের সবচাইতে উঁচু জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে আমি চিৎকার করে বলি, আমি মানুষ! মানুষ!!

মনে পড়েছিল পূর্বপুরুষদের, সত্য বলার অপরাধে জল্লাদেরা খনার জিহ্বা কেটে নিয়েছিল। অথচ পুরাকালের সীমাহীন অন্ধকারে খনার বচনগুলি ছিল বিজ্ঞান আর সংস্কৃতির অগ্রগামী। সেই বোবা মেয়ের আর্তনাদ তখন কেউ বুঝতে পারে নি।

আমিও, কল্পিত আমি রোজ রাতে উঁচু একটা প্রাচীরের ওপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে করতে ঢলে পড়তাম, আর নিজেকে তৈরি করতাম, অন্তত গ্র্যাজুয়েশনটা কমপ্লিট করতে হবে। ভাবতে শুরু করেছিলাম, আমি মানুষ নই... ওই দিনরাত খটখট শব্দ করতে থাকা মেশিন, আমার জীবনে আর যা-ই থাকুক, ঘুম থাকা চলবে না। আমার ভেবে আশ্চর্য লাগে, সে সময় এই মন এবং শরীরের জোর আমি কোথায় পেয়েছিলাম ? যেদিন রাত আটটা দশটার মধ্যে ফিরতে পারতাম, প্রায় রাত পার করে দিতাম পাঠ্য বইয়ে মুখ ডুবিয়ে।

এর মধ্যেই হঠাৎ একমাস থেকে অফিসে বেতন দেয়া বন্ধ হয়ে গেল। মাসের পনেরো যায়, বিশ যায়, বেতন পাই না। কারণ হিসেবে মালিকপক্ষ জানায়, তাদের কয়েক লাখ টাকার মালে খুঁত ধরে বিদেশী কোম্পানিগুলো সেগুলো বাতিল করে দিয়েছে। এছাড়াও গার্মেন্টস এর অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো যাচ্ছে না। আমরা যেন কিছুদিন অপেক্ষা করি। আমাদের বস্তির সামনে একটা মুদির দোকান ছিল। আমরা সেখান থেকে বাকিতে বাজার করে কোনোরকম একটা মাস কাটিয়ে দিলাম। পরের মাসেও পনেরো পেরিয়ে যায়, আমাদের মাথা খারাপ হওয়ার উপক্রম হয়, বেতন নিয়ে কোনো শব্দই নেই। গার্মেন্টস এর অবস্থা খারাপ হলে আমাদের খাটুনি তো অন্তত কমত। দিনরাত পরিশ্রম করছি আর তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করছি, কবে বেতন পাব। এদিকে পরের মাসও পেরিয়ে গেলে মুদির দোকানদারকে হাত পা ধরে বোঝানো যায় তো বাড়িঅলাকে বোঝানো যায় না। শায়লা আমার হাত চেপে ধরে বলে, বুবু কী হইব ? সমস্ত কর্মচারীদের মধ্যে ক্ষোভ, যন্ত্রণা, চাপা অসন্তোষ, কেউ প্রকাশ্যে ক্ষিপ্ততা প্রকাশ করতে পারছে না ছাঁটাই হয়ে যাওয়ার ভয়ে। ইতোমধ্যে কিছু কর্মী ছাঁটাইও হয়ে যায়। আমরা প্রতিদিনই অপরাধীর মতো মুখ কাঁচুমাচু করে মালিকের দরজায় যাই— কবে ?

বেতন হলে তো জানতেই পারবে, ওরা উল্টো ঝাড়ি দেয়, রোজ রোজ এসে খোঁজ নেয়ার কী আছে ?

এদিকে মুদির দোকানদার জিনিসপত্র দেয়া বন্ধ করে দিয়ে বলে— আমার আগের টাকা বুঝায়া দেও, নইলে পুলিশ ডাকুম। বাড়িঅলা এসেও হম্বিতম্বি করে যায়, সেও পুলিশের ভয় দেখায়। শায়লা রাতে ফিসফিস করে বলে, বুবু, শরীল বিক্রি করি?

আমি ওর মুখ চেপে ধরি। এরপর এই জীবনে বাঁচারই যে-কোনো অর্থ থাকবে না। অথচ ভয়ে দুর্ভাবনায় আমারও তখন মরণদশা। আমরা দু'বোন অনেক প্রস্তুতি নিয়ে মুদির দোকানের সামনে যাই, ব্যাটা আমাদের দেখে খেঁকিয়ে ওঠে, ট্যাকা আনছ? আমি প্রায় আর্তনাদের মতো বলি, আর কয়টা দিন চালান। আপনে আমাদের সাথে অফিসে চলেন, আমাদের তো আর চাকরি চইলা যায় নাই, কোম্পানির সাময়িক একটা খারাপ অবস্থা যাইতেছে। তিনমাসের বেতন এক সাথে দিবো, তখন সুদসহ আপনেরে—।

সুদ লাগব না— ব্যাটা প্রচণ্ড ঢঙে ধমকে ওঠে, আমার আসল ট্যাকা বুঝায়া দেও, আর এক কানাকড়ির মালও দিমু না।

রাতের বারান্দায় বসে সেই রহস্যবাড়ির দিকে তাকাই। ভুতুড়ে এক ছায়ার মতো মহিলা হাঁটছে। শায়েদ এসেছিল সন্ধ্যায়, কোথায় একটা চাকরি জুটিয়ে ফেলেছে। ধনী হওয়ার ভূত ওর মাথা থেকে নেমে যাওয়ায় আমিও খুশি। প্রবল এক স্বস্তিতে আমার মনটা ভরে ওঠার মুহূর্তে সে বারান্দার দরজা ভেজিয়ে দিয়ে আমাকে বলে— ঘুষ দাও।

চাকরি করবে তুমি, আর ঘুষ দেব আমি?

বাহ্‌রে! চাকরি তো আমি তোমার জন্যই করছি।

সেই ঘুষ দিতে গিয়েই বেঁধেছিল বিপত্তি। আমি ক্রমশ নারীত্বহীনে পরিণত হচ্ছিলাম। আশ্চর্য! একটা ছেলে আমার সর্বঅস্তিত্বে হাত চালাচ্ছে আমাকে চুমু খাচ্ছে আর আমি ক্রমশ হিম... আড়ষ্ট থেকে আড়ষ্টতর হয়ে উঠছি, সেই ছায়ারেস্তোরাঁ, ওপরের খড়ের ছাদ, আমার শাদাকণিকার মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত অগ্নিস্রোত, সেই তার চোখ, গভীর গভীর চোখ, তার সেই বাক্য, যে মেয়ে ডানাঅলা ঘোড়ার স্বপ্নে—। এক দুর্লভ পুরুষের স্বপ্নে শায়েদ আমার কাছে মৃত হয়ে ওঠে, আমি ওর শার্টে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠি— প্লিজ শায়েদ আজ নয়, প্লিজ।

শায়েদ চলে গেছে অনেকক্ষণ। শায়লার অফিসে চাপ কম। তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে নিজেকে বিন্যস্ত করে আবার বেরিয়ে গেছে। কোথায় যাস— জানতে চাইলে কোনো উত্তর দেয় নি। ইদানীং ওর সাথেও দূরত্ব বাড়ছে। আমার জীবন যুদ্ধ কি আমার আত্মনিমগ্নতার সাথে হেরে যাচ্ছে?

হায়! আমার সহোদরা।

আমি শক্তিহীন পায়ে একদিন তাকে অন্ধকারে চলে যেতে দিয়েছিলাম, তার অভিজ্ঞতা আর যুদ্ধের সামনে কতটাইবা বড় আমি?

সেই অমানবিক দিনগুলোর একদিন, বাড়িঅলা যেদিন আক্ষরিক অর্থেই পুলিশে খবর দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, আমরা দুইবোন ঘরের চৌকির মায়া কাটিয়ে কিছু কাপড় চোপড় আর হাঁড়িপাতিল চাদরে বেঁধে ভোর রাতে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি। গন্তব্য, সেই দূর আত্মীয়ের বাসা। যেখানে আমরা এসে প্রথম উঠেছিলাম। ঠিক করি, ঘাড় ধাক্কা না দেয়া পর্যন্ত ওখান থেকে বেরোবো না। কি কঠিন শীতের রাত।

আমরা দুইবোন, শীতে, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বস্তির সামনের জলপাই গাছটা অতিক্রম করি। চারদিকে ধূধূ কুয়াশা আর প্রেতস্তব্ধ রাত্রি। বাড়িঅলার বাড়িটার দিকে তাকাই, মনে হয়, এক্ষুণি ওর মধ্যে থেকে এক বৃহদাকায় দৈত্য বেরিয়ে আসবে। দুই পায়ে দৌড় খেলার মতো আমরা দু'বোন জমাট পা খুলে খুলে সামনের দিকে ছুটতে ছুটতে ড্রেনের কাছে এসে কিছু মানুষের সঙ্গ পাই। মুহূর্তে আমাদের প্রাণের জল শুকিয়ে যায়। আমরা পা পা পিছিয়ে কয়েকটা দোকানের পেছনের দেয়ালের মধ্যে নিজেদেরকে সিঁটিয়ে দিই।

যেন উড়ে আসছে সার সার বাজপাখি, তাদের নখর আঙুল, সুতীক্ষ্ণ চঞ্চু আমাদের ছিন্নভিন্ন করে দেবে, আমরা চোখ বুঁজে সৃষ্টিকর্তাকে ডাকি, আর শুনি মাস্তান টাইপের কয়েকটি ছেলে খিস্তি খেউর করতে করতে সামনের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। ওদের পায়ের শব্দ দূরে মিলিয়ে গেলে দেখি, কুয়াশা কেটে গিয়ে আমাদের দেহে স্রোত স্রোত ঘাম। হাঁপ ছেড়ে শূন্য রাস্তায় প্রায় দৌড়েই গিয়ে পরিচিত পুলিশের সামনে পড়ি। কেঠো হাসি দিয়ে পাশ কাটাতে যাব, ব্যাটা হেঁকে ওঠে, হাতে কী ?

আমরা থমকে দাঁড়াই। জোয়ান পুলিশের পাশে একটা বেঞ্চের ওপর বসে বুড়ো পুলিশ ঢুলছে।

শায়লা বলে, আমাদের জিনিসপত্র।

তোমাদের জিনিসপত্র ? জোয়ানটা এগিয়ে আসে, নিজেদের জিনিস নিয়া কেউ ভোর রাইতে পলায় নাকি ?

আমি হেসে বলি, পালাব কেন ? আপনি তো আমাদেরকে চেনেনই। আমরা আত্মীয়ের বাড়ি যাচ্ছি বলে, পা পা করে হাঁটতে যাব, ব্যাটা ফের চিল্লিয়ে ওঠে, এত সশব্দে যে, বেঞ্চে ঢুলতে থাকা বুড়োটা কেঁপে ওঠে।

কোথায় রে আলাদীন ? আশ্চর্য প্রদীপ ফুঁড়ে আয়! আমার শীতার্ত ঠোঁট সৃষ্টিকর্তার নাম ভুলে যায়। জোয়ানটা বলে, আগে তোমাদের বস্তিতে চল, আসল বিষয় আগে বুইঝা নিই, তারপর দেখা যাবে, তোমরা কোন আত্মীয়র বাড়িতে যাইতেছ।

আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। সারা শরীরে মুহূর্তে জ্বর লেগে যায়, মাথা টলতে থাকে, আমি দু'হাত জড়ো করতেই শায়লাকে দেখি আগুনের মতো হিলহিল করে উঠেছে, ক'মাসের জীবনযুদ্ধ ওকে কোথায় নিয়ে ফেলেছে সেই প্রথম আমি উপলব্ধি করি। সে বোচকাটা আমার হাতে ধরিয়ে জোয়ানটাকে ডেকে দেয়ালের কাছে যায়, ওদের মধ্যে কিসব ফিসফিস কথা হয়। এবং ছায়া কুয়াশায় আমি দেখি শায়লার হাত, বুবু আমি আসতেছি। জীর্ণ বাড়িটির পেছনে জোয়ানটির সাথে শায়লা মিলিয়ে যায়।

আমি যেন গভীর সুরঙ্গে, অথবা ভূমিকম্পে চূর্ণ হওয়া বিল্ডিংগুলোর নিচে, অথবা অগ্নিকুণ্ডে, অথবা কুম্ভীপাকের মধ্যে, অথবা... থরথর শব্দে হাতে পুটলী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, বুড়োটা কাশতে কাশতে শীতের তীব্রতা নিয়ে কথা বলে, এইবার রংপুরে কয়জন মারা গেছে ?

আমি শকুন চোখ বিদ্ধ করে আছি একটি নির্দিষ্ট ছায়ার দিকে, বিশাল জলের কোন জায়গাটিতে তার শিশু পড়েছে, একজন মা'র চোখে যেভাবে সেই জায়গাটিকে কিছুতেই স্রোত ঢাকতে পারে না, কুয়াশা ছায়ার ধূম্রপাকের ঠিক কোন ছায়ায় আমার সহোদরা মিলিয়ে গেল, আমি ঠিক সেইভাবে সেই জায়গা থেকে নিজের চোখ সরাতে পারি না।

বুড়োটি খেঁকানো স্বরে বলে, বললে না রংপুরে কয়জন মারা গেছে?

আমি আস্ত পুটলীটি বুড়োর মাথায় ছুঁড়ে দিয়ে সমস্ত রাত্তির ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠি— কুত্তার বাচ্চা!

সামনের বাড়ির বাতিগুলো নিভে আসছে। খালা এসে আমার মাথায় সস্নেহে হাত রাখেন, তোমার কী হইছে নীলু? নিজের চেহারার দিকে তাকায়া দেখছ? চোখের নিচে কালি পড়ছে।

আমি কেমন ভেঙে পড়ি, সবাই সবকিছু ভুলতে পারে খালা, আমি ক্যান পারি না?

মায়েরে মনে পড়ছে?

নিজেকে সামলে দাঁড়াই, না, খালা। অফিসে বেতন দিতাছে না, আরেকটা কাজও পাইতেছি না, বড় চিন্তা লাগতাছে।

জীবনে আটকাইছো কোনোদিন? খালা আশ্বাস দেন, আল্লাহর ওপর ভরসা রাখ।

আমরা হইছি গু খাওয়া, জবাই হয়া বাঁইচা থাকা মানুষ। কঠিন স্বরে আমি বলি, আল্লাহ্ কি আর আমার জীবনে আটকানোর কোনো জায়গা রাখছে? তাঁর সাধ্য কি আমারে আটকায়?

খালা আমার মুখ চেপে ধরেন, এইভাবে কয় না মা, পাপ হবে! পাপ হবে!।

অন্ধকারে শ্লেষ হাসি ছুঁড়ে দিই, পাপ!

এর কিছুদিন পর থেকেই আমি শরীরে অদ্ভুত এক ধরনের অসুস্থতা লক্ষ করি। কোনো একটা কাজ করে দাঁড়াতেই চারপাশটা ছায়া হয়ে আসে। পায়ের পাতা থেকে একটা ঝিমঝিমে ভাব তরঙ্গিত হয়ে হয়ে মাথা স্পর্শ করে ফেলে। ইতোমধ্যে চারপাশে পেকে শীত পড়তে শুরু করেছে। এরও আগে এমন একটি ভয়াবহতম দুর্ঘটনা ঘটে যার কারণে— আমরা বেশ কিছুদিন বিমূঢ় হয়ে থাকি। শায়লাদের গার্মেন্টিস এ শর্ট সার্কিটের মাধ্যমে আগুন লেগে যায়। আমি তখন অফিসে মেকআপ ঠিক রাখার জন্য ম্যাটার কেটে কেটে স্কচটেপ দিয়ে জোড়া লাগাচ্ছিলাম। কে যেন গেটে এসে খবরটা আমার কাছে পৌঁছে দিতে বলে ছুটতে ছুটতে চলে যায়। আমার তো মাথা খারাপ হওয়ার দশা হয়। আমি তিন লাফে দৌড়ে কোন বায়ুযানে চড়ে যে তাদের গার্মেন্টিসের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম, আমি বলতে পারব না।

রাস্তার মধ্যে হাজার হাজার মানুষের ভিড়। আঁটোসাঁটো খিচখিচে গার্মেন্টিসের মাথার ওপর বিকটাকৃতির মেঘের মতো কালো কালো ধোঁয়া। ইতোমধ্যে যা হওয়ার হয়ে গেছে। এক ঘণ্টা ধরে দমকল পানি ঢেলেছে। স্ট্রেচারে করে সার সার ঝলসে যাওয়া মড়া আধমড়া মানুষকে এম্বুলেন্সে উঠানো হচ্ছে। এই প্রথম আমি অনুভব করি, মানুষের মগজ কোন মুহূর্তে ফাঁকা হয়ে যায়। আমি কিছুক্ষণের জন্য স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে অচেতনের মতো দাঁড়িয়ে থাকি। চারপাশের বুক ফাটানো ক্রন্দনের শব্দে হুঁশ ফিরে এলে আমি উন্মাদের মতো ভিড় ঠেলতে থাকি। কয়েকজন যুবক মালিকদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে গার্মেন্টিসের দিকে ইটপাটকেল ছুঁড়ে মারছে। রাস্তার গাড়ি ভাঙছে। মানুষ আর কাপড় পোড়ার মর্মান্তিক গন্ধে চারপাশ ভারি হয়ে আছে। চারপাশে ছিন্নভিন্ন মন্তব্য... একটাই সিঁড়ি, তাও রাখে তালা দিয়া— আরে ভাই এরা কি মানুষ? হ্যাঁ হ্যাঁ ওপর থাইক্যা ফাল দিয়া পইড়া কয়েকজন মরছে।

আমি এইসব প্রাচীর ভেদ করে কিছুতেই সামনে এগোতে পারি না। আমার হাত পা নিথর হয়ে দাঁতে দাঁত লেগে যেতে থাকে, আমার ফাঁকা বুকে, শায়লা যেন মৃত, এইভাবে এগিয়ে আসে... তার, শৈশব, কৈশোর, টানা বিনুনীর নিচে তার অকপট সাধারণ মুখ, টোলপড়া হাসি... তার চাইতেও বেশি করে, সেই কুয়াশার মধ্যে জোয়ান পুলিশটার পাশে তার উত্তোলিত হাত, আমি আসতেছি— যেন জীবনের মহান কোনো কাজে যাবার ডাক এসেছে তার, এইভাবে সে এক অভিনব ছায়ার মধ্যে মিশে যাচ্ছে।

ভিড়ের মধ্যে আমি হঠাৎ ওসমানকে দেখে চিৎকার করার জন্য হাঁ করি, আমার কণ্ঠ থেকে শব্দ বেরোয় না, যেন শত শত মড়া পোড়াচ্ছে, আমি শ্মশানের ওপর দাঁড়িয়ে আছি, প্রচণ্ড ভিড়ে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে নিজেকে উঁচু করি, তীব্র ধোঁয়া আর শব্দের নিচে আমার কণ্ঠ ঢেকে যেতে থাকে— ওসমান! ওসমান!

আশ্চর্য!

সিঁড়ির কাছটায় দাঁড়িয়ে ও অমন হাউমাউ করে কাঁদছে কেন ? এইবার মানুষগুলো যেন পাটগাছ আর আমি যেন দড়িছুট হিংস্র ষাঁড় এইভাবে সবাইকে গুঁতিয়ে, নিজেকে চিড়ে চেস্টা করে সশব্দে এগিয়ে যাই। ভিড়ের মধ্যে শব্দ ওঠে, দিলেন তো আঙুলটা ছ্যাচা কইরা, আরে... আরে... আমি প্রায় ছুটে ওসমানের শার্টের কলার চেপে ধরি, ওসমান, শায়লাকে দেখেছ ?

ওসমান হতচকিত চোখে আমার দিকে তাকায়।

আগুন নেভার পর বিল্ডিংটাকে বজ্রাহত বটগাছের মতো দেখাচ্ছে। স্থানে স্থানে ভেজা জলের নিচে, তারের মধ্যে, কাপড়ের স্তূপে গুমরানো আগুনের কান্না। নিঃশ্বাস টানতে গেলেই যেন পোড়াবারুদ গলার ভেতর অব্দি তেতো করে দেয়।

ওসমান যেন চেতনা ফিরে পায়, এরপর পায় আর্তনাদ করে ওঠে, আপা বেনুবালা—।

আমি যেন কিছু শুনতে পাই না, চারপাশের তীব্র আহাজারির কিছু আমার কানে আসে না, সামনের জলন্ত বিল্ডিংয়ের সমস্ত আগুন এখন আমার কোষের মধ্যে— ওসমান, শায়লা কই ?

শায়লা ? ওসমান যেন এই নাম কোনোদিন শোনে নি এইভাবে আমার দিকে তাকায়, এরপর বিড়বিড় করে বলে, মরে গেছে।

কী ? কী বলছ তুমি ? আমি ওর শার্ট খামচে উন্মত্তের মতো ওকে মাটিতে বসিয়ে ফেলি।

ওসমান হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে, পায়ের তলায়, চাপা পইড়া বেনুবালা মারা গেছে।

শায়লা ?

সক্রোধে আমার দিকে ওসমান তাকায় জানি না।

শায়লার তেমন কিছু হয় নি। কিন্তু অন্যদেরকে রক্ষা করতে গিয়ে তার চুল এবং পিঠের খানিকটা পুড়ে গিয়েছিল। এই সামান্য আঘাত নিয়েও তাকে কম ভুগতে হয় নি। কীভাবে জানি সে তখন গার্মেন্টিসের নিরাপদ জায়গাটাতেই ছিল। এই বিষয়ে তাকে প্রবলভাবে সাহায্য করেছে তার মানসিক শক্তি। সবাই যখন মেশিন ছেড়ে বাঁচার চেষ্টায় উন্মাদপ্রায় হয়ে ছোটাছুটি করে বাইরে বেরোতে চাইছে, শায়লা আগুনের ধরনধারা দেখে সন্তর্পণে খুঁজে

নিয়েছে একটা নিরাপদ জায়গা, আমি যখন ওর পিঠে মলম ঘষছি ও তীব্র কণ্ঠে বলে বুবু, আমি মৃত্যু দেখতেছিলাম, আর দেখতেছিলাম বাঁচনের লাইগ্যা মানুষের আকুতি, বিশ্বাস কর, আমার ভয় লাগে নাই।

আমি ওর কথা শুনতে শুনতে দেখছিলাম ওর অন্তরের আগুনের শক্তি। যেন আপাতত সুখী থাকার শর্তে সে সেই আগুন নিভিয়ে রেখেছে।

পরপরই শায়লা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল, বুবু, নিজের কথা ভুইলা ছিলাম বইলাই পুরা দৃশ্যটা দেখতে পারতেছিলাম, কী ভয়ানক, কী মর্মান্তিক... যাদের সাথে দিনের পর দিন এক ঘরে কাজ করছি, তাদের কেউ কেউ আগুনের কুণ্ডলীর মধ্যে ঢুইকা চিৎকার করতাছে, কেউ ওপর থাইক্যা ঝাঁপ দিয়া পড়তাছে, কেউ শত শত পায়ের তলায় পইড়া— দোযখ! বুবু দোযখ!

আমরা দুবোন প্রথমেই হাসপাতালে যাই। বারান্দার মধ্যে স্বজনহারাদের সে কি মর্মবিদারক কান্না! কাঁদতে কাঁদতে কেউ মাটিতে গড়াচ্ছে, কেউ অজ্ঞান হয়ে পড়ছে... আর সেই বিষাক্ত চামড়া পোড়ার গন্ধ... ওদেরকে সন্তর্পণে ডিঙিয়ে আমরা লম্বা রুমটায় ঢুকে দেখি সার সার প্লাস্টার বাঁধা নারী পুরুষের আহাজারি। শায়লা সেই শাদা মুখোশের মাঝখানের মুখগুলোর কাছে অস্থির হয়ে ছুটে যায়, চোখ দেখে খুঁজতে চেষ্টা করে, তুমি আয়েশা না ?

চামেলি ? চামেলি কই ?

কম্পিত হাতে চামেলি শায়লাকে চেপে ধরে, তার কণ্ঠ থেকে অস্পষ্ট গোঙানির মতো শব্দ বেরোয়... ডাক্তার এসে আমাদের ধমকাতে থাকেন, কেন বিরক্ত করছেন ? প্লিজ, আপনারা বেরোন। মেঝের ওপর উবু হয়ে বসে পড়ে শায়লা, উহ্ বুবু, আমি ক্যান শকুনের মতো বাঁইচা আছি ?

এর বেশ কিছুদিন পর আমি আমার মধ্যে স্নায়বিক রোগ অনুভব করি। রোগটা যে স্নায়বিক তা আমি কখনই বুঝতে পারতাম না, যদি না সুলেখা আমাকে ধরিয়ে দিতেন। একদিন মনে হলো, তার বাড়িতে প্রথমে গিয়েই ওভাবে চলে আসাটা খুব অভদ্রতা হয়ে গেছে। সেই বোধ থেকেই গিয়ে দেখি, মহিলা ছোট বাটিতে করে সাপটাকে দুধ খাওয়াচ্ছেন। আমি ঢুকেই বলি— আপনি ওকে সরান, না হলে আমি সামনে আসতে ভয় পাচ্ছি।

সুলেখা হাসেন, আরে তুমি ? বলে সাপটাকে ছোট করে আদর করে তারের বাক্সে ঢুকিয়ে রাখলেন। কপালে যথারীতি বিশাল সূর্যের টিপ। গলায় বরই দানার মালা। খুব নিখুঁত করে সাজতে জানেন তিনি। বয়সটা অনেকটাই ঢাকা পড়ে, সাজটা বোঝা যায় না।

সেদিন যে এসেছি, সেই প্রসঙ্গে না গিয়ে বললেন, তোমরা আমাকে মরতে সাহায্য করলে না কে ?

আমি ব্যাগ রেখে মোড়া টেনে তাঁর মুখোমুখি বসে আশ্চর্য চোখে তাকালাম— আপনার কথা আমি বুঝলাম না।

সুলেখা বলেন— সেদিন আমি মরার জন্য গলায় দড়ি দিয়েছিলাম, তোমরা সবাই মিলে আমাকে ক্লিনিকে নিয়ে...।

আপনি সেদিন মরতে চান নি, আমি তীব্র কণ্ঠে বলি, মরতে চাইলে আমাদের কিছুই করার থাকত না।

ভ্রুকুতে ভাঁজ ফেলে অদ্ভুত চোখে তিনি তাকান, এইবার আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না। তুমি কি বলতে চাইছ, আমি সেদিন নাটক করেছি? তুমি জানো, আত্মহত্যার প্রবণতাটা আমার মধ্যে কেমন সাংঘাতিক? আমি এর আগেও কয়েকবার চেষ্টা করেছি।

আমি নিস্তরঙ্গ স্বরে বলি— কোনোবারই প্রাণ থেকে মৃত্যুটা চান নি। আত্মহত্যার জন্য বারবার চেষ্টার প্রয়োজন হয় না, এক্ষেত্রে ইচ্ছার তীব্রতার মধ্যে অন্য কোনো মোহ না ঢুকলে সেটা একবারের চেষ্টাতেই ঘটানো সম্ভব। আপনি মরতে চাইলে কিছুতেই আপনার দরজার ছিটকিনি খোলা থাকত না, কৈলাস কিছুতেই আপনাকে দেখে ফেলতে পারত না।

তাঁর মুখে ঝাঁক ঝাঁক রক্ত এসে জমা হয়, এরপর তিনি অকস্মাৎ জ্বলে ওঠেন, তুমি আমাকে সাংঘাতিক অপমান করছ। তুমি বুঝতে পারছ, তুমি কী বলছ?

আমি ওড়নায় আঙুল পেঁচিয়ে হেসে ফেলি, আপনাকে একদিন দেখেই আমার মনে হয়েছিল, আপনি নিজের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান না।

কেমন নিভে আসেন সুলেখা, এইটাই তোমার সবচাইতে ভুল ধারণা। আমি নিজের সামনে দাঁড়াতেই সবচাইতে বেশি ভয় পাই। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ, মৃত্যুটা আমার স্বপ্ন, আমার একটা বিলাসময় চেষ্টা, কিন্তু এর শেষটায় যখন অন্ধকার দেখি, তখন কেমন ভয় লাগে, নিজের কাছে বড় হেরে যাই, তাহলে এই চেষ্টা করি কেন বলো তো? আমার জীবনে এমন কোনো মানুষ তো নেই, যে আমার এই প্রবণতায় কাতর হবে, যাকে এই চেষ্টা দেখিয়ে আমার প্রতি আকুল করে তুলতে পারব, তবে?

আমি কী করে বলব? ছায়া ঘরটার সব ঘ্রাণ, সব সৌন্দর্য নিঃশ্বাসে টেনে নিতে নিতে আমি বলি, এ বিষয়ে একজন মানসিক ডাক্তার ভালো বলতে পারবেন। আমার মনে হয়, আপনি বড্ড নিজের প্রেমে ডুবে থাকেন, আপনার কাঙ্ক্ষিত, স্বাপ্নিক, লোভী সত্তাটা আপনার শূন্য, হতাশ সত্তাটাকে দেখাতে চায়, জীবনের প্রতি আপনার মোহ নেই। আত্মহত্যার চেষ্টাটা আপনার নিজের সাথে সেই রকমই এক অন্তর্দ্বন্দ্বের খেলা। আমার শাদা মাথায় বিষয়টাকে এইরকমই মনে হলো, তবুও আপনি নিজ থেকে না বললে আমি কিছুতেই জানতে চাইব না, আপনি এরকম জনবিচ্ছিন্ন জীবন বেছে নিলেন কেন? আপনি কি বুঝতে পারেন, আপনার জীবনযাপনের পুরো ধরনটার মধ্যে কোনো স্বাভাবিকতা নেই?

এইবার তিনি তার সহজাত প্রবণতায় ফিরে যান, যেন টের পেয়ে যেতে থাকেন, স্বভাবের বাইরে গিয়ে অবচেতনেই তিনি নিজেকে খুলতে শুরু করেছেন। আমার কথার উত্তর না দিয়ে তিনি নিঃশব্দে উঠে যান, আর আমি বোকার মতো সেই শূন্য ঘরে কতক্ষণ হতভম্ব বসে থেকে উঠতে যাব, দেখি তিনি ট্রে ভর্তি করে টি-পট আর কাপ নিয়ে এসেছেন।

নিখুঁত হাতে কাপে লিকার ঢেলে তিনি প্রশ্ন করেন, চিনি?

আমি বলি, কম।

শায়েদ কোথায়? তাঁর এই প্রশ্নে আমি এইবার ঘোর তলায় ঢুকে যাই। আমার যা সহজাত প্রবণতা, ইদানীং যে রোগটা সর্বগ্রাসী হয়ে আমাকে খামচে ধরছে, গিলে খেতে চাইছে তা আমাকে গ্রাস করে— শা-য়ে-দ... শায়েদ কে? যেন এই নাম আমি কোনোদিন শুনি নি, এইভাবে খুঁজতে থাকি। আমি অস্ফুট কণ্ঠে বলি, জানেন, কদিন ধরে আমার কি

হয়েছে, মেঝেতে পা রাখতে পারি না। মনে হয় কেউ এক হাত দিয়ে আমাকে কিছুটা শূন্যের ওপর ধরে রেখেছে, যে ধরে রেখেছে, তার হাত ব্যথায় ফেটে যাচ্ছে, আমাকে নামাতে পারছে না, আর আমিও, ছেলেবেলার রাতে বাথরুমে যাওয়ার জন্য বিছানা থেকে নামতে গিয়ে কিছুতেই যেমন মাটি খুঁজে পেতাম না, তেমন, নামতে যাই, মেঝে পাই না, পেলেও মনে হয় পায়ের তলায় ঝিঁঝি ধরে গেছে, সারা শরীরে ঝিঁঝি ধরে গেছে, সুলেখাদি, মনে হয় আমার রক্ত স্পন্দন বন্ধ হয়ে গেছে, এই বিরাট পৃথিবীটাকে এত ভয় লাগতে থাকে!

স্নায়ুরোগ! ছোট্ট করে বলে তিনি আমার দিকে তাকান, অন্তত তোমার বলার ধরনে আমি তাই বুঝতে পারছি। একসময় এই রোগটা আমাকে খুব চেপে ধরেছিল— এটুকু বলেই তিনি থেমে যান, খুব আরোপিতভাবে নিজেকে খোলার রাস্তাটা এইবারও বন্ধ করে দেন তিনি, এবং এরপর যথারীতি এরকম একটা আন্তরিক পরিবেশে আমার স্বস্তি নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। আমি ফিসফিস করে বলি, ও, শায়েদ ? একটা চাকরি পেয়েছে। খুব ব্যস্ত হয়ে গেছে।

সেদিন ও আমাকে বলেছিল একটা ডাহুক এনে দেবে, সুলেখার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। প্রথম পরিচয়েই ও আমাকে খুব টেনেছে বুঝলে, আমার তো সমস্যাই এটা আমি সহসা নিজেকে খুলতে পারি না, কাউকে গ্রহণও করতে পারি না। একটা সময় জীবনে যখন শব্দ ছিল, আলো ছিল, গান ছিল, প্রেমকাতর পুরুষদের দেখে দেখে মুহুর্মুহু রোমাঞ্চিত হতাম, আমার একটি কথা শোনার জন্য হাজার মানুষ আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকত, তখনকার বাস্তবতা আলাদা, তারপর যখন চারপাশে নিজের মূল্য হারাতে শুরু করেছি— যা হোক, এইভাবে খণ্ডাংশ তোমাকে বলার কোনো অর্থ হয় না, আমার বড় ডাহুক পোষার সখ, খাঁচায় রাখব না, খোঁপায় বসিয়ে ঘুরব। শায়েদ বলেছিল, জঙ্গল থেকে অথবা গ্রাম থেকে নয়তো পাহাড় থেকে এনে দেবে, ডাহুক না নিয়ে সে আমার এখানে আর আসবে না। ওকে বলো, ডাহুক পরে হলেও চলবে, ও যেন আসে।

ধুঁকে ধুঁকে পত্রিকাটা চলছে। এক মাসের বেতন পরের মাসের শেষে গিয়ে ঠেকছে। ফলে আমাদের সংসারের হিসেবের ছকের মধ্যে বেশ একটা গণ্ডগোল লেগে যাচ্ছে। আমি টিউশনি বাড়িয়ে দিয়েছি, খালাও চেষ্টা করছেন বেশি করে আচার বানাতে। কিন্তু বড় কোম্পানির সাথে ঘরে তৈরি আচার খরচে কুলোতে পারে না। ফলে খালার ব্যবসাটা মার খাচ্ছে। আমি টিউশনি বাড়ালেও একরাত নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারি না, নভেম্বর শেষ হলে বাচ্চাদের পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে। সবগুলো টিউশনি এক সাথে ছুটে যাবে... এরপর হায়! তেলাপোকার জীবন, হেঁটে ছেনে যা খাদ্য পাও, মুখে পুরে নাও। এইসব বিপর্যয়ের মধ্যে রঞ্জন আমার হৃদস্পন্দন বন্ধ করা আশ্চর্য এক ছায়া, ওর সাথে দেখা হয় না, স্পর্শ হয় না, কদাচিৎ কথা হয় ফোনে, সেই এক চিলতে কণ্ঠ আমার সারাসময়কে ভূতের মতো আচ্ছন্ন করে রাখে। অভাব দরজা দিয়ে এলে— এই মহান বাক্যটি আমার সহজাত প্রবণতার কাছে বারবারই মার খায়। যখন চাকরির চিন্তায়, অর্থ চিন্তায়, ভবিষ্যৎ চিন্তায় কলজেটা ঠাণ্ডা হয়ে আসতে থাকে তখন রঞ্জন বিকট এক দৈত্যের মতো সেই কলজে চেপে ধরে সেখান থেকে সব রক্ত ঝরিয়ে ফেলে। আমার সমস্ত বিপন্নতা, দৈন্য, অসহায়ত্ব একটি বিন্দুতে স্থির হয়ে যায়। জাগতিক জগৎ ছেড়ে বেলুনের মতো হালকা হয়ে ওঠা এই আমি অলৌকিক এক জগতে প্রবেশ করি।

এরপর সেই বেলুনে যখন জল ঢুকতে থাকে, প্রচণ্ড ভারে মুখ থুবড়ে পড়ি। এ তো এখন প্রমাণিতই. জীবনের কোনো যুদ্ধ, কোনো কুৎসিত রূপই আমার স্বপ্নকে হত্যা করতে পারে নি। আমার যা প্রকৃতিগত স্বভাব, প্রকৃতি থেকে বোঝার বয়স থেকেই যে বর্ণ-গন্ধ-শব্দগুলি নিয়ে আমি নিজেকে প্রতিনিয়ত বিচ্ছিন্ন করে তুলেছি তার মধ্যে রঞ্জন দিয়েছিল ভাষা, তার সেই বই. সেই গান, সেই জীবনকে গভীরভাবে দেখার মতোই, একবার নিজেকে শিখিয়েছি, জলের হাজার দাপটে ভেসে গেছি, কিন্তু ভুলি নি। জানি না, নিজের ভবিষ্যতের অন্তঃসারশূন্য রূপটা দেখেই কী না, আমার স্নায়ুরোগটা ক্রমশ বাড়তে শুরু করে।

রোগটার নানারকম প্রতিক্রিয়ায় আমি যন্ত্রণায় ভুগতে ভুগতে বুঝতে পারি না এর চিকিৎসা কোনো ডাক্তার জানে ? বিশেষত যখন শীত নামতে শুরু করেছে, আমি কোনো সন্ধ্যায় জানালার পাশে বসে আছি, আমার হাড়মজ্জা এক হয়ে মনে হয়, আমি একটি দিনের জীবন্ত মৃত্যু দেখছি।

তখন, ঠিক তখন বড় অসহায় হয়ে যাই, শায়েদের কথা ভেবে। ও সুলেখাকে জঙ্গল থেকে, পাহাড় থেকে ডাহুক এনে দিতে পারে ? ওর মধ্যে কখনো এই রূপটা থাকতে পারে, আমি কোনোদিন দেখি নি। যেমন ও জানে না আমার সম্পূর্ণ অতীত, জানে না আমার এই শতছিন্ন জীবনেও সুরের কেমন ব্যাপক প্রভাব, ও জানে না, কোনো একজন মানুষের সান্নিধ্যের বিনিময়ে আমার অনেক হিসেব আমি ত্যাগ করতে পারি। ওর সাথে বৈষয়িক এবং জাগতিক জীবন ছাড়া খুব কমই আমার কথা হয়েছে। ও ছিল আমার জীবনে একটা চাকরির মতো, যাতে প্রবেশ করা মাত্রই ফাইলপত্র, হিসেব, মেশিনপাতি, আমাদের পারস্পরিক স্পর্শও ছিল তাই, যেহেতু আমরা প্রেম করছি এই মর্মে সিদ্ধান্তে এসেছি, সেই প্রেমের নিয়মের মধ্যেই তো চুম্বন, ছোঁয়াছুঁয়ি এই জাতীয় বিষয়গুলো আছে। যেহেতু আমি আগেই শরীরের জড়তা কাটিয়েছি, আমাদের সময়ের অন্য অনেক প্রেমিক প্রেমিকার মতো আমি বিষয়টিকে চুমুর মধ্যে স্থির রাখি নি। ডাহুক পাখির বিষয় থেকে নতুন করে আমি শায়েদের প্রতি মনোযোগী হই, কিন্তু ও এলে আশ্চর্য এক দ্বিধা আমাকে স্তব্ধ করে রাখে। আমার যে-কোনো স্পর্শকাতর কোমল আচরণকে এখন আর ও স্বাভাবিক ভাবে নেবে না, হয়তো ভাববে ওর চাকরির সাথে সাথে ওর প্রতি আমি আমার ব্যবহার পাল্টেছি। ফলে ও এলেও, বড় বিমর্ষভাবে নিজের বিপন্নতার কথা-ই বলি, এই চাকরিটায় আমার চলছে না, আরেকটা কাজ কি করে কোথায় পাব— শুনতে শুনতে আমার ঠাণ্ডা মুঠো শায়েদ নিজের হাতে তুলে নেয়, তুমি এসব ছাড়া আর কোনো কথা জানো না নীলু ? আমার বড় চিন্তা হয় তোমাকে নিয়ে, তুমি খুব তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে যাবে।

যে আমি 'রঞ্জন' শব্দটি উচ্চারণ মাত্র নিজের মধ্যে এক অনন্ত বালিকার নিক্কণ শুনতে পাই, তাকে শায়েদ বলছে, বুড়ো হয়ে যাবে, আর যে শায়েদ পাহাড় থেকে ডাহুক আনার স্বপ্ন দেখতে জানে, তাকে আমি বলি, আমাদের ভাতের কী হবে ? আমরা দু'জনকে দুজন এইভাবে বুঝে জেনে বিয়ের সিদ্ধান্তে এসেছি। আসলে তো বিষয়টাও তা-ই, অন্তত বিয়ে বিষয়ে আমার মধ্যে কখনই কোনো স্বপ্ন নেই। অলৌকিক বাঁশিঅলার মতো একদা রঞ্জন সেই স্বপ্ন নিয়ে দূর ছায়ায় মিলিয়ে গিয়েছিল। এরপর আমি বাবা মাকে দেখেছি, সায়রাকে দেখেছি, দিলারাকে, আমার আশেপাশের অনেক দম্পতিকে, বিয়ে কখনই সুরের সাথে সঙ্গম নয়, পাহাড়ের ডাহুক নয়, বিয়ে হলো বাঁচা মরার সাথে সম্পৃক্ত এক কঠিন বাস্তবতা। যেখানে

স্বাপ্নিক মানুষেরা ক্রমশ অযোগ্য আর অর্থহীন হয়ে পড়ে। আমি বরং শায়েদের সাথে বিয়ের প্রশ্ন আসার পর থেকেই নিজেকে বৈষয়িক, হিসেবি, বাস্তববাদী হিসেবে তৈরি করে বিবাহিত নারী হিসেবে নিজেকে যোগ্য করে তুলতে চেয়েছি। এই প্রস্তুতিগুলো আগে থাকলে বিয়ের পরের কঠিন বাস্তবতায় গিয়ে প্রেম জীবনের স্বপ্ন, আবেগ, স্মৃতি এইসবের সাথে পরবর্তী জীবন মিলিয়ে মুহুর্মুহু স্বপ্নভঙ্গের কিছু থাকবে না, সেই প্রেমের জীবনের আকুতিগুলোকে অপমান করে দাম্পত্য জীবনে গিয়ে নিজেদের মধ্যে কোনো হাসি উঠে আসবে না।

এসব আমি কী ভাবছি ?

রাতের বালিশ খামচে ধরি। মাথার দু'পাশের রগ দপদপ করছে। লেপ ফুঁড়ে হু হু ঠাণ্ডা ঢুকছে ভেতরে। আমার বড় ইচ্ছে করে হাতটাকে শায়লার শরীরের ওপর রাখি কিন্তু ইদানীং ওকে আমি বুঝতে পারি না, ছুঁতেও পারি না, আমাকে হয়তো ওর স্বার্থপর মনে হয়। আমি ওর চাইতে কম পরিশ্রম করি, আমার ভেতর এখনো স্বপ্ন বেঁচে আছে, আমি জানি না কেন, আমার স্নায়ুরোগটাকেও ওর মনে হচ্ছে বিলাসী মানুষের যন্ত্রণা— এর চাইতে আমার যক্ষ্মা কিংবা কুষ্ঠ হলে যেন খুব স্বাভাবিক হতো। আর আফসানা, চির অবহেলিত বঞ্চিত, আমার সময় কই ওর মাথায় হাত রাখি ? এইটুকু মেয়ে স্কুল থেকে ফিরে এসে ঘণ্টা ঘণ্টা কারো সাথে কথা বলে না, বিষয়টা কতটা স্বাভাবিক ?

এর ক'দিন পর দরজায় শব্দ। দরজা খুলে দিলারাকে দেখে আমার বিস্ময় চরমে। ঘাড়ে সস্নেহে হাত রেখে ভেতরে ঢোকে। এরপর আমার গোল গোল চোখ দেখে বলে, কোনো দুঃসংবাদ বা সুসংবাদ নাই, এমনিতেই আসছি।

তুমি এমনি আসছ ? বলে যেন দূরের কোনো মেহমান এইভাবে খাতির করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ি, তোমারে যে কই বইতে দেই।

একটা চড় লাগামু— বলে গম্ভীর হয়ে পড়ে দিলারা, আমার সাথে ভদ্রতা করলে চইলা যামু, আফসানা কই ?

স্কুলে।

আহারে, দেখা হইলো না, বলে রান্নাঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, এই মড়াগুলারে পোড়াইবার লাইগ্যা খালা এখনো তুমি কাঠে আগুন দিতাছো ?

খালা আঁচলে মুখ মুছে হেসে ওঠেন, তওবা! মড়া কারে কও! আরে মা, তুমি আইছো, আমি ঠিক দেখতাছি তো ?

আমার কী হয়, যমের মতো ভয় পাই যে ছায়াকে, চারপাশ আঁধার করে দিয়ে গ্রাস করতে থাকে, মড়া! ঠিকই তো! আমরা তো তা-ই, কেবল আগুন পোড়ার মটমট শব্দে ভেবে যাচ্ছি, প্রাণ আছে! দিলারা এত অকপটে জীবনের যে গভীর বিষয় নিয়ে মীমাংসায় আসতে না পারার কষ্টে ভুগছি, তার একটা সীমারেখা টেনে দিল ? কখনো কি ভেবে দেখেছি, জোয়ান পুলিশ যে মেয়েকে নিয়ে অন্ধকার ছায়ায় মিলিয়ে যায়, তার মধ্যে স্বপ্ন থাকাটাই কত মস্ত এক অসুস্থতা হতে পারে ? আমার স্বপ্ন আছে, আমার স্বপ্ন থাকে, আমাকে শায়লা ঘৃণা করবে, এটাই তো স্বাভাবিক। এক রাতে রঞ্জনের কথা বলতে বলতে আমি তুমুল আলো আর অসীম বেদনায় যখন ভাসছিলাম তখন অদ্ভুত শ্লেষ শব্দে হেসে উঠেছিল সে, তুমি আবার প্রেমে পড়ছ ? নিজেরে তোমার ঘেন্না লাগে না ?

আমি সেদিন তার এই কথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, শায়লা একটা যন্ত্র হয়ে গেছে, ও কোনো স্বাভাবিক মানুষ নয়। কিন্তু, মড়া— এইভাবে নিজেকে তো জানি নি ?

কী আশ্চর্য! চারপাশের চামড়া পোড়ার গন্ধকে আমি স্বপ্নের মধ্যে পুষ্পঘ্রাণ ভেবে নিজেকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছি!

আমার বিহ্বল মুখের মধ্যে দিলারা টোকা দেয়, তুই হঠাৎ ম্যাদা মাইরা গেলি যে ?

অনেক জল ঘেঁটে ঘুটে ওপরে উঠে আসি। দিলারা বলে, চল বেডরুমে গিয়া বসি। আইজ দুপুরে খায়া যামু, খালা রান্না কী ?

খুব হুলুস্থুল করে দু'জন বিছানায় আসন গেড়ে বসে টের পাই, শুরু থেকেই আন্তরিকতার কি ভানটাই না হয়েছে। আমরা দু'জন আর কথা খুঁজে পাই না। দু'বোন বহুকাল পর দেখা হলে যা হয়, যে প্রসঙ্গ সবচাইতে বেশি জমে ওঠে, ছেলেবেলার গপ্পো, কখনো সেই প্রসঙ্গ তুলতে গিয়ে লক্ষ করেছি, দিলারা যেন ওই অধ্যায়টা নিজের মধ্যে থেকে সমূলে কেটে ফেলে দিয়েছে। সে যেন বিবাহিতা জীবনেই প্রথম ভূমিষ্ঠ হয়েছে। এইভাবে জীবনকে নিয়ে সে সুখে আছে। আমি হাতড়ে হাতড়ে মার কথা তুলি, দিলারাবু আর একমাস পরেই মায়ের মৃত্যুবার্ষিকী। কেমন কঠিন হয়ে ওঠে দিলারার মুখ, তাতে কি হইছে ? কয়জন ফকির খাওয়াইয়া দিবি।

আমি কেমন মরিয়া হয়ে উঠি, মা'র প্রসঙ্গ উঠলেই তুমি চেইতা যাও ক্যান ? তুমি কি দুনিয়াতে আসমান থাইকা উইড়া আইছ ? তুমি বাবার ওপরে চেততা, আমার কোনো দুঃখ থাকতো না।

চারপাশে অকস্মাৎ স্তব্ধতা নেমে আসে। দিলারা ছোট একটা নিঃশ্বাস নিঃশব্দে গিলে বলে, এইসব প্রসঙ্গের জন্যই আসতে ইচ্ছা করে না।

ক্যান ? বলে আমি নিজের অজান্তেই ঝরঝর শব্দে কেঁদে ফেলি, মা'র জীবনে একটা মুহূর্তও ছিল, তিনি শান্তিতে ছিলেন ? আমাদের জন্য, ওই যে তুমি মড়া কইলা... হ্যাঁ, দাউদাউ আগুনের উপরে উনি চিরকাল কাঠের মতন ভাসছেন।

সকাল পেরিয়েছে।

বিছানা থেকে লেপ কাঁথা এখনো গুছিয়ে রাখা হয় নি। দিলারা তার অস্থির পা দুটো তার নিজেও সেঁধিয়ে একদম নিভে যায়। আমিও আজ অসহ্য হয়ে উঠি, তার এই নিঃশব্দতা, অনীহা, শ্লেষ এইসব আজ ভাঙতে হবে। আমার জানতে হবে, নিজের জন্মকে ছেঁটে ফেলার অধিকার কে তাকে দিয়েছে ?

তুমি কথা বলবা না ?

দিলারা কঠিন চোখে তাকায়, তুই মনে করস মা একজন মহান নারী ছিল ?

কী বলতে চাও তুমি ? আমি দিলারার নিস্তরঙ্গ ঠাণ্ডা চোখে আমার যন্ত্রণাকাতর চোখ দুটি রাখি, তাঁর কি অন্যায় ছিল ?

দিলারা যেন সশব্দে বিষ উগড়ে দেয়— সে অসতী ছিল!

আমার সমস্ত রক্ত জল হয়ে যায়। ভেতর থেকে ঠেলে উঠতে থাকা গতির পিঠে কেউ সশব্দে চাবুক মারে, আমি তো জানি সব, আমি ছাড়া কে আর সব জানে ? কিন্তু এরা বিষয়টি

এইভাবে জানে, এদের কাছে সেই বিষয়ের ব্যাখ্যা এরকম, আমি ঘুণাক্ষরেও বিষয়টি জানতাম না, বাবার সাথে এদের তাহলে মৌলিক দূরত্বটা কোথায় রইল? সমস্ত অনাচারের মূল যে বাবা, তাকে সবাই এইভাবে সন্তর্পণে ক্ষমা করে দিয়ে যাবতীয় কুশ্রীতা এবং জঘন্যতার প্রতীক হিসেবে এরা মা-কে দাঁড় করিয়েছে? ঠিক এই প্রসঙ্গে এসে আমার দশা হয় জ্বলন্ত মোমবাতির, মাথায় দাউদাউ আগুন নিয়ে কঠিন পিলসুজের সাথে আমার যেন পা আটকে যায়,... শিশিরের মিহি শব্দসহ ক্ষুদে জানালা দিয়ে হালকা বাতাস আসে, আর আসে কচি এক ফালি রোদ্দুর, আমি সেই তির্যক আলোয় দেখি অসংখ্য পোকার মতো বালুগুলো যেন প্রাণ পেয়ে ধেই ধেই শব্দে নাচছে।

ভেতর থেকে মা'র সম্পর্কে অমন একটা কঠিন শব্দ বলে ফেলে দিলারা ক্রমশ যন্ত্রণাকাতর হয়ে ওঠে, তোর দুলাভাই বিষয়টা বিয়ার আগেই, আমারে যখন পড়াইত, জানত। এইজন্যই সে আমার ফ্যামিলিরে ঘৃণা করে। আমি মা'র জন্যই কোনোদিন আমার সংসারে মাথা তুইলা দাঁড়াইতে পারি না।

আর বাবা? আমি প্রায় চিৎকার করে উঠি, বাবারে নিয়া তোমাদের ঘিন্না হয় না?

বাবা তো মা'র মতন ব্যভিচার করে নাই, দিলারা লেপ ছুঁড়ে দিয়ে দাঁড়ায়, বিয়া করছে, যে সংসারে মা অসতী হয়—।

তুমি থাম! থাম! আমি দু'হাত দিয়ে কান চেপে ধরি, আমিই আসলে তোমাদের যোগ্য না, তুমি আর আইসো না, আমিও যামু না, তবুও তোমরা সুখে থাক।

দিলারা চলে গেলে শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে মার মুখটার কথা ভেবে কাঁদতে চাই... কিন্তু বেদনাটা কেমন শুকিয়ে গেছে। মনে পড়ে, বাবার বিয়ের পর কয়েকমাস আমরা বেশ ভিখিরির জীবন যাপন করেছিলাম। সায়রা কলেজে যাওয়া ছেড়ে খালি ধান্দা করছিল, কার ঘাড়ে ঝুলে পড়া যায়। নানা কায়দায় সে ছেলেদের পটাতো, কাউকে ভালোবাসত না। দিলারা, পাড়ার মেয়েদের কাপড় সেলাই করতে শুরু করে দিয়েছিল। মা চতুর্দিকে ঋণ করে যখন আমাদের একবেলা খাবারের ব্যবস্থা পর্যন্ত করতে না পেরে উন্মাদপ্রায়, তখন প্রবাস থেকে এসে মাথার ওপর বিশাল এক ছায়া হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন শওকত মামা। পৃথিবীতে আমরা ছাড়া তাঁর কেউ ছিল না। মা'র দূর সম্পর্কের কেমন এক ভাই। জীবনে স্নেহ বলতে, সচ্ছলতা বলতে, আদর বলতে কি জিনিস আমরা তার কাছ থেকেই সব পেয়েছিলাম।

এক গভীর রাতে আমার ঘুম ভেঙে যায়। বাবা চলে যাওয়ার পর মা আমাদের ঘরেই মেঝেতে ঘুমাতেন। আমি দেখি, মেঝেতে মা নেই। উঠে বসে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করি, ভাবি, বাথরুমে গেছেন হয়তো। বুকের ভেতরটা কেমন কাঁপতে থাকে। বোনদের আগল থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে, ভেজানো দরজা খুলে বাইরে যাই। আমার ভীষণ ভয় লাগতে থাকলেও শব্দ করে মাকে ডাকার শক্তি পাই না। বারান্দায় স্থানুর মতন দাঁড়িয়ে থেকে দেখি, আলুথালু মা পাশের শওকত মামার ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন।

বারান্দার বাতির নিচে আমাকে দেখে তাঁর মুখ রক্তশূন্য হয়ে ওঠে। তিনি কাঁপতে কাঁপতে আমার হাত চেপে ধরেন, কাউরে বলিস না... বলে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেন। আমার মনে আছে, সেই বয়সেই বিষয়টির মধ্যে আমি অন্যায় কিছু দেখি নি। ওরকম ভয়ঙ্কর জন্তুর মতন লোক, শুধু আমার বাবা হওয়ার যোগ্যতায় মা'র সাথে শোবেন, আর তাঁর নিচে

ভয়ে কন্যা জন্মের ভয়ে আমার মা ডুকরে কাঁদতে থাকবেন— এরচেয়ে হাজার সুন্দর এই সম্পর্ক। শওকত মামার মতন অমায়িক উদার পুরুষ মাকে যদি পছন্দ করেন, গ্রহণ করেন এর মধ্যে মা'র এত যন্ত্রণার কী আছে? সেই রাতে মাকে আমার মনে হচ্ছিল আমার এমন এক হতভাগ্য বোন, যার জন্য কাঁদতে মা বারান্দায় উবু হয়ে বসে পড়লে আমি ফিসফিস কণ্ঠে বলেছিলাম, কিচ্ছু হয় নি, তুমি এত কাঁদছ কেন?

কিছু হয় নি? মা শিশুর মতো অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন।

তুমি ওর সাথে চলে যাবে না তো?

না! না!— মা এইবার সশব্দে কেঁদে উঠেন।

মা, বুবুরা জাইগা যাইব, শিগ্‌গির চলো, আমি কাউরে কিছু বলব না।

শাওয়ার উপচে অঝোরে জল ঝরছে। আমি ফিসফিস শব্দে কেঁদে উঠি, অসতী! তোমাদের কারো কোনো যোগ্যতা নাই, মা সম্পর্কে এরকম শব্দ উচ্চারণ করার। মা নিজের শেষ রক্ত বিন্দু বিক্রি করে আমাদের মুখে ভাত তুলে দিয়েছেন। জল! জল! স্রোতের তলায় আমার যন্ত্রণাকাতর নগ্নদেহ নোনা রসে সাঁতরায়... বিচ্ছুরিত বহ্নিশিখার পথ ধরে আমার চোখ চলে যায় দূরে... ছাদের ওপর অমল বাঁশি বাজাচ্ছে, হায়! আমি পাপ পুণ্য, খারাপ ভালোর ভেদ বুঝি না, তাই তো বড্ড অচেনা ঠেকে মানুষের ভাষা, নিজেকে কোথাও আমি স্থাপন করতে পারি না... বাঁশির তরঙ্গ, না শাওয়ারের জল? ওই তো হেঁটে যাচ্ছে অর্ফিয়ূস... আমার চির স্বপ্নের কুহক... হায়! সার সার ফুল ঝরছে আমার নিদ্রিতা জননীর কবরে। হায়! এই সবই আমাদের অদৃষ্টের গান!

এইভাবে দিনগুলো পেরোতে থাকে। স্বপ্নহীন, আলোহীন এক ঘূর্ণায়মান অন্ধকারের মতো। এইসব দিনের পথ ধরেই বিবর্ণ, ক্লিষ্ট শায়েদ এসে আমাকে জানায়, চাকরিটা সে ছেড়ে দিয়েছে। কথাটা শুনে কিছুক্ষণ আমি বজ্রাহতের মতো বসে থাকি, জেদ, রাগ যন্ত্রণায় ওর মুখের দিকে তাকাতে পারি না। সে নিজেও আমার মুখের অবস্থা দেখে সহসা কিছু বলার সাহস পায় না। আমি ম্লান কণ্ঠে বলি, আমার জীবনে এমন ঘটবে, এটাই তো স্বাভাবিক। আমার ভেবে আশ্চর্য লাগে, আমি কোন সাহসে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি?

শায়েদ মরিয়া হয়ে বলে, তুমি তো আমার পরিবারের অবস্থা জানোই। চাকরিটা হতেই বড় ভাই আমার মাথার ওপর সংসারের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে সরে পড়েছে। এদিকে মাত্র আড়াই হাজার টাকা বেতনের ওপর আমার সংসারের প্রতিটা লোকের লোভ যদি তুমি দেখতে, আমার যাতায়াত, দুপুরে খাওয়া, একটা চাকরি করছি, এই ফুটানি নিয়ে ওই বেতনে বাঁচা—।

তুমি যাও শায়েদ, বলে আমি ক্ষুদে জানালায় থুতনি রেখে নিঃশব্দে বসে থাকি। কিছুক্ষণ পর অনুভব করি, আর কিচ্ছু না বলে ও ওর স্বভাবের বাইরের আচরণে ধীর পায়ে চলে গেছে। বুকের মধ্যে দুঃসহ চাপ নিয়ে নিচতলা থেকে আসা ছাত্রীগুলোকে পড়াই।

এরপর নিজেকে টেনে বাইরে বের হই। এই প্রথম একদম উদ্দেশ্যহীন, গন্তব্যহীন। নিচে নেমে টের পাই নিঃশ্বাস আটকে আসছে। দম নেয়ার জন্য ওপর দিকে তাকাতেই সেই ঝিমঝিমে অনুভূতি, যেটা আমাকে কখন চেপে ধরবে, কখন অগাধ শূন্যতার জলে

থ্যাতলাবে, কখন চলে যাবে, আমি জানি না। ঝিঝি ধরে যাওয়া পা না পারি সামনের দিকে বাড়াতে, না পারি সিঁড়ি দিয়ে ওপর দিকে তুলতে। কোনার মধ্যে জটলা করছে পাড়ার পিচ্চি মাস্তানগুলো, এদের বিড়ি টানার ভঙ্গি দেখলে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। আমি ওদের ছিন্নবিচ্ছিন্ন হাত দেখি, মাথা দেখি, শব্দ দেখি, পূর্ণ কোনো অবয়ব দেখি না।

গত কয়েকদিনে একবারই রঞ্জনের সাথে কথা হয়েছে। ওকে নিয়ে আমার কল্পনার বিস্তার এত বেশি, বাস্তবে ওর সাথে কোনো কথা কোনো যোগাযোগের কথা ভাবলেই বুকের মধ্যে মস্ত এক ভার অনুভব করি। এমনকি, গত কয়েকমাসে আমি প্রবল শূন্যতা কিংবা চরম বিপর্যয়ের মধ্যে ওর চেহারাটা মনে করে আমার বাঁচার অর্থ খুঁজে পেয়েছি। টেলিফোনে যা-ই ছিন্নবিচ্ছিন্ন কথা হয়েছে, তার মধ্যে আমি অনুভব করেছি আমাকে কেন্দ্র করে ওর আকুতি আর যন্ত্রণার গভীরতা কি প্রবল! ও বলেছে, কি হবে যোগাযোগ করে, যে যোগাযোগের সবটাই অন্ধকারে ঢাকা? এর মধ্যেই ওর প্রবণতার বাইরে গিয়ে এক ঘোর দুপুরে সে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো বলে উঠেছিল, কোনোদিন আমি কিছুতে সহসা বিস্মিত হই নি, তাজমহল দেখে আমার মনে হয়েছে, যা ভেবেছিলাম, তাই। কিচ্ছুতে কখনো আমার লোভ হয় নি, নীলু তোমাকে একবার ছুঁয়ে দেখার বড় লোভ ছিল!

লোভ! এই শব্দও এত অনির্বচনীয় হয়ে উঠতে পারে আমার জানা ছিল না। ওর এই শব্দের ওপর নির্ভর করেই আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়ে এমন ধাঁ-ধাঁ আগুন ধরে গেল, এমন নিদারুণ অগ্নি, আমি জ্বরতপ্ত রাতগুলো নিজের গায়ে স্পর্শ করেই টের পেয়েছি, আমার হাত পুড়ে যাচ্ছে। যেন কেউ ডিমের খোলসে চামচ ঠুকেছে, এইভাবে বিছানায় আমি ভেঙে পড়তে পড়তে জীবনের প্রথম কোনো পুরুষের স্পর্শের স্বপ্নে তৃষ্ণায় জ্বলে খাক হয়ে গেছি। বহু বহু রাত আমি নিঃশ্বাস টেনে, চোখের পালক মেলে, গুচ্ছ চুলে মুখ ঢেকে হাতড়ে হাতড়ে রঞ্জনকে ছুঁয়েছি, বিস্তারমান আঙুল দিয়ে ঢেকে দিয়েছি তার মুখ, আর নিজের মধ্যে আবিষ্কার করেছি আশ্চর্য এক লীলাপরায়ণ নারীকে, যে প্রকৃতির কাছ থেকে কামকলার চূড়ান্ত শিক্ষাটা নিয়েছে।

সশব্দে প্রবাহিত হয়েছে রঞ্জনের হাত, আমার নগ্নদেহ ঢেউ খেয়ে উঠেছে— লোভ! আমি দেয়ালের দিকে পিছু হটতে হটতে দেখেছি লজ্জা কত ভয়ঙ্কর বর্ণকাতর। আমি ভুলে গিয়েছি আমার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, আমার মনে হয়েছে এই স্পর্শ জরুরি, আমার প্রাপ্য, এরপর যদি পৃথিবীতে মৃত্যু থাকে, নিঃসীম আঁধার থাকে— থাকুক, আমি অন্তত ভাবতে পারব জীবনে একদিন আমি আমার সমস্ত স্বপ্নের রূপ দেখতে পেয়েছিলাম।

দিনের বেলার নিষ্ঠুর বাস্তবতার চঞ্চু ঠুকরে খায় বোধ, আমি রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে, অফিসের কাগজ ঘাঁটতে ঘাঁটতে ছাত্রদের পড়াতে পড়াতে টের পেয়েছি সেই স্বপ্নও ক্রমশ এমন এক বোঝা হয়ে উঠেছে, সেই স্বপ্নের সাথে রঞ্জনের বাস্তবতার দূরত্ব এত বেশি, আমি এই বোঝা বহনে অসমর্থ হয়ে উঠেছি। ফলে নিজেকে প্রতিমুহূর্তে হত্যা করার যে মর্মান্তিক চাপ, তা ক্রমশ আমার স্নায়ুর মধ্যে আসন গেড়ে বসছে, আহা! কারো ওপর নিজের দেহটা ফেলে একরাত যদি নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারতাম?

আমি কিছুতেই রঞ্জনকে পাই না, কিছুতেই না। আমার মনে হয়, কর্ম তাকে এমন শৃঙ্খলে বন্দি করেছে, সে কেন কর্ম তা ভেবে দেখারই সুযোগ পায় না। কদিন অফিসে বসে যখন মাথা ঠেকে যাচ্ছে টেবিলে, তখন ফোন আসে। আমার শরীরে থরকাঁপুনি শুরু হয়, আমি

আমার সর্ব অস্তিত্ব দিয়ে নিংড়ে নিংড়ে ওর কণ্ঠ শুনি, সে কী বলে কোনো শব্দ আমার কানে যায় না, কেবল ভরাট ধ্বনি... ধ্বনি... আমি বলি, রঞ্জন, তুমি একদিন আস, একদিন, নয়তোবা আমাকে ডাকো, আমি শুধু একদিন তোমাকে ছুঁয়ে দেখব, তুমি সত্য কি-না, তুমি মানুষ কি-না।

রঞ্জন বলে, নীলু এ হয় না। আমার বাস্তবতা, আমার জীবনযাপন আমাকে এমন এক অসহ্য কীট বানিয়ে ফেলেছে যেখানে বসে আমি অন্ধকার নির্মাণ করতে পারি, স্বপ্ন পারি না। নীলু, আমি চাদরটা উন্মোচন করে তোমাকে হাড় মাংসগুলি দেখাতে চাই না, তার চাইতে এই ভালো, আমরা আমাদের সীমাবদ্ধতাগুলোই ভালো করে বুঝতে শুরু করি নীলু, আমি পারলাম না।

আমার যে কী হয়েছে কদিন ধরে, যেখানে সেখানে চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। ফোন রেখে এমনভাবে টেবিল গেঁথেছিলাম, যে কারো মনে হতে পারে, এই মাত্র আমি আমার প্রাণের কারো মৃত্যুসংবাদ শুনেছি। মাথা তুলে দেখি, ছায়া, তার মধ্যে একটা মুখ... আরিফ বলে, কী হয়েছে নীলুফার?

জললজ্জায় রক্তাক্ত মুখ আমি ওড়নায় চেপে ধরি। আরিফ বিচলিত হয়ে পড়ে, কার ফোন এসেছিল? কোনো দুঃসংবাদ?

আমি নিজেকে ঢাকতে বড় হেঁয়ালি করে ফেলি, অদ্ভুত চোখে হাসতে হাসতে বলি, আমার ভীষণ ইচ্ছে, ভীষণ, সারারাত এই শহরটার হু-হু রাস্তার মধ্যে চক্কর খাই, আপনি আমাকে নিয়ে ঘুরবেন?

আরিফ বলে, কী হয়েছে বলবেন তো?

আমি সহজ কাঁধে ব্যাগ তুলে নিয়ে বলি, আমার মা মারা গেছেন।

সিঁড়ি দিয়ে আমার সাথেই ছুটতে ছুটতে নামে আরিফ, কী বলছেন? আপনার মা বেঁচে ছিলেন?

না।

তাহলে?

আমাকে কী এক মজায় পেয়ে বসে, আমি ওকে বলি, ওই যে দেখছেন রেললাইন, আমার ভীষণ ইচ্ছে, আপনি ওর মাঝখানে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যান, ওই যে ট্রেন আসছে...।

আরিফ ভয় পেয়ে যায়, এই বিরাট সড়কে আপনি রেললাইন কোথায় পেলেন, বলতে বলতে কষে আমার হাত চেপে স্কুটারে নিয়ে বসে, আমি বিশেষ কাজে একটা অফিসে যাচ্ছি, আপনি আমার সাথেই থাকেন।

নিজেকে একজনের ওপর ছেড়ে দিয়ে বড় নির্ভার লাগে।

নীলু... চাদর উন্মোচন করে আমি হাড়মাংস... কেন আমার সমস্ত পৃথিবীতে এমন অর্থহীনতা নেমে আসছে? আমি আসলে কী চাইছিলাম ওর কাছে?

সন্ধ্যার রাস্তায় হু-হু শব্দে স্কুটার চলতে থাকে। আমার হাত কষে ধরে রেখেছে আরিফ। কিছুক্ষণ পর আমার দম আটকে আসতে থাকে, পুরো পরিস্থিতি আমার কাছে হাস্যকর হয়ে ওঠে।

আমি বলি, আমার হাতটা ছাড়বেন ? আমার খুব রাস্তায় নামতে ইচ্ছে করছে।

এতে আরো ভয় পেয়ে যায় সে। বাতাসের দমকে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় তার কণ্ঠ, সে বলে, কী হয়েছে, আমাকে বলবেন না ?

কিচ্ছু না। প্লিজ, আপনি দয়া করে আমার হাতটা ছাড়ুন।

আরিফ কণ্ঠ নামায়, নীলুফার ট্যাক্সি ড্রাইভার কী মনে করবে বলুন ? এই অবস্থায় আপনাকে আমি ছাড়তে পারি না।

আমি এইবার সশব্দে হেসে উঠি, আপনি কি ভাবছেন আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে ? রাস্তায় নেমে আমি ট্রাকের নিচে বুক পেতে দেব ?

আরিফ এইবার সাঁড়াশি আঙুল দিয়ে আমার হাত চেপে ধরে, এসব কি ভয়ানক কথা বলছেন ? চলুন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিই। আমার জেদ বাড়তে থাকে, আমি বলি, আমার হাত না ছাড়লে আমি কোথাও যাব না। প্লিজ, আমাকে এখানে নামিয়ে দিন, আমি একা যেতে পারব।

সিনক্রিয়েট করবেন না নীলুফার, আমি যা বলছি করুন, কি হয়েছে যদি না বলেন, চুপচাপ আমার কথা শুনে যান।

চারপাশে কী অপরূপ সন্ধ্যা! আমার ভীষণ ইচ্ছে হতে থাকে ছায়া ফুটপাত ধরে উন্মুক্ত পথে একটু হাঁটি। ও আমার হাত চেপে থাকায়, আমাকে আটকে রাখায় ইচ্ছেটা আরো দুর্মর হয়ে ওঠে, আমার নিজেকে প্রচণ্ডভাবে বন্দি মনে হতে থাকে, আমি ছটফট করে হাত ছাড়াতে চাই, আমি এখানে নামব, আপনি আমাকে ছাড়ুন।

নীলুফার! আরিফ ফিসফিস করে বলে, একটা দিন আমার কথা শুনুন, আমি আপনাকে এই অবস্থায় রাস্তায় ছাড়তে পারছি না।

এই অবস্থা কী ? আমি কেমন ভুঁই ফুঁড়ে উঠি, আমার কিছু হয় নি, আপনি বিশ্বাস করুন।

যত নিজেকে উন্মোচন করতে যাই, তত ওর সামনে জট পাকিয়ে যাই, তাই তো, কি এমন হয়েছে আমার, এই ক্লিষ্ট দৈন্য জীবনে একজনকে দেখে জ্বলে উঠতে থাকা স্বপ্নের মৃত্যুর গন্ধই তো— এটা কি এমন ?

আমার মাথা ফাঁকা হয়ে আসতে থাকে, আমি যে শকুন, রাক্ষসের মতো আমার বাঁচার সাধ, এতকাল পর এই রকমভাবে খুঁজে পাওয়া অলৌকিক স্বপ্নটাকে যদি হারিয়ে ফেলতে হয়, আমার আর থাকে কী ? কী ধূ ধূ রাস্তা! জান ফাটিয়ে নামতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু একজন সুহৃদের আতঙ্ক উপেক্ষা করে আর কাঁহাতক ছাড়ুন, ছাড়ুন বলা যায়। তার চেয়ে এই মুহূর্তের এই কঠিন বন্দিত্বের মধ্যে নিজেকে নিঃসাড় করে ছেড়ে দিই না কেন ?

একটা অফিসে ঢুকে আমাকে রুমের এক সাইডে রাখা সোফায় বসিয়ে এক হাত দূরে একটা চেয়ারে গিয়ে বসে আরিফ। অপর পাশে জরুরি মুখে একজন ভদ্রলোক তার কথা শুনছে। এখন যদি আমি এখান থেকে ছুটে পালাতে যাই, পুরো অফিসে একটা লজ্জাকর পরিস্থিতি তৈরি হবে। কিন্তু আরিফের সামনে আজ নিজেকে এই রকম একটা অবস্থায় ফেলায় এইবার আমার প্রচণ্ড অস্বস্তি হতে থাকে। সমস্ত অফিসটাকে আমার কাছে শ্মশানঘাট মনে হয়, মনে হয়, আমার সামনে, চারপাশে কিচ্ছু নেই, এক ভয়াল হা হা

শূন্যতা... আমার সামনে কোনো বাতাস না থাকায় আমি হাঁসফাঁস করতে করতে স্মৃতি দৃশ্যে নিজেকে ডুবাই। সেই দৃশ্য! যখন গ্রামে যেতাম... কী নোনতা... কী মিষ্টি, এগিয়ে আসতে থাকে।

এক রাতে খেয়ালি সায়রাবু , চল চান্দ দেখতে যাই, বলে আমাকে নিয়ে বিশাল এক ক্ষেতের মধ্যে নিয়ে ফেলল।

এরপর সে হাওয়া।

তার এইসব ভূতুড়ে স্বভাব আমার চেনা। কোথাও লুকিয়ে আমার কথা ভুলে নির্বিকার বাড়ি চলে যাবে। খাঁ খাঁ রাত্তিরের মাঠ। হায়রে কী চাঁদের ঢল। আমার ভেতর থেকে ভয় চলে যায়, শীত চলে যায়, উদ্দাম আলোগুলোতে নিজেকে খুব এক চোট চুবিয়ে নেয়ার লোভ হয়। সবুজ কচি ঘাসগুলোর ওপর বসে আমি চারদিকে তাকাই, কেউ নেই... কেউ নেই... জ্যোৎস্নাগুলোকে আমার অবিশ্রান্ত বৃষ্টির জল মনে হয়, এর মধ্যে নিজের কামিজটাকে মনে হয় এক হাস্যকর বেড়া। আমার যে কি লোভ হয়, কি লোভ হয়, কুচি কুচি আলোকখণ্ড একদম চামড়ার তলা দিয়ে মাংসের মধ্যে পাঠিয়ে দিই।

আমি ঘাড়ের চুল সরিয়ে, অপার্থিব আলোয় টান টান বাহু মেলে জ্যোৎস্নার জল নিতে নিতে টের পাই আলোর স্পর্শ নেয়ার জন্য শরীরের মধ্যে আগুন ধরে যাচ্ছে। এইবার আমার নিজেকে নিয়ে প্রচণ্ড ভয় হয়। কী ভয়! কী লজ্জা! কামিজ খুলে ফেলব ? নিজের মধ্যে রীতিমতো কাঁপুনি শুরু হয়ে যায়। চারপাশটায় আধো আধো তাকিয়ে আমি একটানে মাথা গলিয়ে কামিজটা খুলে শুয়ে পড়ি মাঠের ওপর। এরপর নিষিদ্ধ কিছু করার উন্মাদনায়, জলের মধ্যে এক বিশাল ডুব দেয়ার মজায় নিজেকে জ্যোৎস্নার জলে ভিজিয়ে ছটফট করতে করতে মাথা গলিয়ে ফের কামিজ ঢুকাই— এর পরে বিচিত্র এক অনুভূতির মধ্যে পড়ে যাই।

আরিফ কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে সন্তর্পণে আমাকে লক্ষ রাখছে... আমি সেই নির্জন জ্যোৎস্নারাতে ম্লান স্বরে ডাকতে থাকি... সায়রাবু... সায়রাবু...। ঘাই খেয়ে উঠে রঞ্জন... যে মানুষ নিজের ক্লিষ্ট জীবনকে পরম আরাধ্য মনে করে, যে, বাঁচার জন্য, প্রতিমুহূর্তের জন্য নিজের অসুস্থ যন্ত্রণাকাতর জীবনকেই স্বাভাবিক জীবন হিসেবে বেছে নিয়ে স্বপ্নের জায়গাটাকেই মনে করে ছেঁটে ফেলে দেয়ার, অস্বস্তির, তার শক্তির সাথে বিপন্নতার সাথে অন্য যে-কোনো মানুষ কি করে পারে ? 'আমার তরী ছিল চেনার কূলে, বাঁধন যে তার গেল খুলে, তারে হাওয়ায় হাওয়ায় নিয়ে গেল কোন অচেনার ধারে— ও চাঁদ।'

নিজেকে আমার আরিফের বিশাল থাবা-খপ্পরে বন্দি মনে হয়। আমার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে মৃত্যুর মতো ধপাস ধপাস শব্দ হয়, মনে হয় কেউ আমার গলা চেপে আমার দেহটা দেয়ালের দিকে ঠেসে দিচ্ছে। এতক্ষণে আমার হুঁশ হয়। আমার দুটি পা আছে। আমার সর্ব অস্তিত্ব ফুঁড়ে এই পা দুটি প্রকাণ্ড হয়ে ওঠে, আমি মরিয়া হয়ে সেই দুটি পায়ের ওপর ভর করে ছুটতে ছুটতে রাস্তায় নেমে আসি। রাতের জনারণ্য ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমি টের পাই ভিড় কত সুন্দর... সেই ভিড়ে নিজেকে সেঁধিয়ে ভেজা চোখ সামলে বলি, অনেক স্বপ্ন হয়েছে, আর না।

কৈলাস আমার হাত ধরে টানতে থাকে, দিদি, এভাবে দাঁড়িয়ে আছেন কেন ? আমাদের বাসায় চলুন!

আমার পায়ের ঝিঁঝি কাটছে না। এর মধ্যে মগজটার মধ্যে যেন কুয়াশা ঢুকে গেছে। আমি স্পষ্ট করে ওর মুখ দেখতে পাই না। ও ছেলেমানুষের মতো হিড়হিড় করে টানতে টানতে আমাকে সুলেখার সামনে নিয়ে ফেলে।

দেয়াল ঘেঁসা মোড়ায় আমি প্রায় অচেতনের মতো চোখ বুঁজে থাকি। সুলেখা সাধারণ মানুষের মতো অস্থির হয়ে উঠেন, কী হয়েছে তোমার ?

আমি কিছু বলি না।

সুলেখা আমার ঠাণ্ডা হাতে নিজের উষ্ণ তালুতে ঘষতে থাকেন, তুমি ডাক্তার দেখাচ্ছ না কেন ?

আমি কিচ্ছু বলি না।

তোমার কী কষ্ট নীলু ? এই রোগ কষ্ট থেকে, যন্ত্রণা থেকে হয়, কী কষ্ট আমাকে বলো ?

আমি ছায়াচোখ বিস্তার করে দেখি প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে উজ্জ্বল এক মুখ, নিজেকে কেটে কেটে ক্রমশ একটা রূপের মধ্যে টেনে এনে হেসে বলি, আমার কোনো কষ্ট নেই, তবে—।

সুলেখা হামলে পড়ে সেই শব্দের ওপর— তবে ?

আমার একটা চাকরির বড় দরকার, আর একমাস পর আক্ষরিক অর্থেই আমার পায়ের নিচে আর মাটি থাকবে না।

সুলেখা গভীর মমতা নিয়ে আমার সেবা করেন। আমি তার আশ্চর্য সুন্দর এক শাশ্বত রূপ দেখি। ঠাণ্ডা জলের মধ্যে সুগন্ধী কিসব মিশিয়ে আমাকে সরবত খেতে দেন। এরপর কি এক ঔষধ খাওয়ান আমাকে। আমি ধীরে ধীরে নিজের মধ্যে শক্তি অনুভব করি। সুলেখা আমার চুলের মধ্যে সস্নেহে আঙুল চালান। বহুকাল পর আমি মানুষ পেয়েছি, তোমাদের পেয়েছি, আত্মহত্যা নিয়ে সেদিন তুমি যা বললে, আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। তুমি লিখলে সাইন করতে পারতে। আমি তোমার মতো প্রখরবোধসম্পন্ন মেয়ে কম দেখেছি।

আমি ম্লান চোখে তাঁর দিকে চেয়ে থাকি।

সুলেখা ক্রমশ আশ্চর্য এক আবর্তনের মধ্যে ঢুকে যেতে থাকেন, তুমি জানো না, এই রোগটা একসময় আমাকে কেমন প্রচণ্ডভাবে গ্রাস করেছিল। ছেলেবেলাটা আমার হাওড়ায় কেটেছে, বোঝার বয়স থেকেই রূপ... রূপ... চারদিকে আমাকে নিয়ে এত গুঞ্জন, আমি মনে করতে শুরু করেছিলাম আমার এমন এক সম্পদ আছে, যা মানুষ পৃথিবীর বিনিময়ে অর্জন করতে পারে না। খুব অভাব ছিল সংসারে, পাড়ার মাস্তানদের হাতছানি ছিল আর আমার ছিল স্বপ্ন, এই সম্পদকে ঘরের মধ্যে পচতে দেয়া যাবে না।

বাড়ি থেকে পালিয়ে টালিগঞ্জে গেলাম।

হ্যাঁ, এই রূপ আর শরীরকে পুঁজি করে ধীরে ধীরে সেখানে আমি নিজের বিকাশ ঘটাতে শুরু করলাম।

একটু থমকে থেমে গেলেন তিনি।

শাড়ির মধ্যে আঙুল পেচাতে থাকলেন।

এই বাড়ির মধ্যে এমন এক গন্ধ আছে, যা মগজের কোষকে ক্রমশ শিথিলভাবে চারপাশে ছড়াতে থাকে। রূপ আর শরীরকে পুঁজি করে... রূপ... শরীর, জীবনের প্রথম আমার কুমারীত্ব হারানো, জামগাছটার প্রেমে পড়ার কিছু আগে, ডানাঅলা ঘোড়ার স্বপ্নে সেই ঘিনঘিনে লোকটার নিচে নিজেকে পেতে দেয়ার আগে, আমার সায়রাবু, আমার দেখা প্রথম অদ্ভুত চরিত্রের রহস্যময় নারী, সবাই যখন ঘুমে আমাকে নিঃশব্দে ডেকে বারান্দায় নিয়ে— বারান্দায় তখন আকাশের আলো ছিল, আমাকে বলল, কাপড় খোল।

বিস্ময়ে লজ্জায় আমি হতবাক।

সায়রাবু আমার চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে ক্রমশ উষ্ণ নিঃশ্বাসে কাতর হয়ে পড়ছে। এরপর নিভৃত মমতায় এক এক করে আমার সমস্ত পোশাক খুলে আধোছায়ায় শীৎকার করে উঠেছে— তুই এত সুন্দর। সায়রাবুর ব্যক্তিত্বকে ছাপিয়ে সেই বয়সে আমার পক্ষে কিচ্ছু করা সম্ভব ছিল না। আমার সারা শরীরে আদর করতে করতে সায়রাবু যেন কোনো মহাজাগতিক পৃথিবীর দিকে হেঁটে যাচ্ছিল, ঠা-ঠা রাত্তিরে সে কী ভয় আমার, সে কী লজ্জা! না, আমি এক ফোঁটা সুখ পাই নি, ইন্দ্রিয়ের মধ্যে বোধ করি নি কাতুকুতু ছাড়া অন্য কোনো অনুভব... আমার শরীরের ওপর সেই রাতে সায়রাবুর সে কী অপার্থিব সাঁতার!

এরপর মাঝে মধ্যেই। আমার ঘেন্না হতো, বিশ্রী সব অনুভূতি হতো, কিন্তু সায়রাবুর ধমকের ভয়ে কিচ্ছু বলতে সাহস পেতাম না। ক্রমশ তার প্রতি আমার এক মানসিক আকর্ষণ জন্মেছিল, আমার মনে হতো পৃথিবীর যাবতীয় অলৌকিকতা আছে ওর মধ্যে, ওর হাসি, রহস্যময়তা, হেঁয়ালি, জলে সাঁতার কেটে কেটে আমাকে বলা— এই দেখ, আমি তোর ওপর শুয়েছি, আমাকে ভীষণ টানত। তার সাথে এই সম্পর্কের কারণে সেই সময় তার মতন নারীর সমস্ত মনোযোগ আমার ভেতর কেন্দ্রীভূত— এই বিষয়টা আমাকে পুলকিত করত।

সেই জন্যই, যে রাতে সে ছায়ার মধ্যে মিলিয়ে গেল, আর আমাকে বলল, তোর জন্য সবচাইতে বেশি কষ্ট হবে, আমার পৃথিবীটা ভয়ানক শূন্য হয়ে উঠেছিল।

আমি ফিসফিস করে বলি, যৌনতা। আমাদের সেই ভাঙা পরিবারের চারটি নারীকে নানা সময় নানাভাবে গ্রাস করেছে, এই অমোঘ ছায়া আমাদের কখনই নিরাপদ থাকতে দেয় নি।

তুমি কিছু বলছ? সুলেখার এই কথায় আমি ফের নিজেকে তল থেকে টেনে তুলি— তারপর?

তারপর? তারপর... সুলেখা খেই হারাতে থাকেন, কি হবে এই গল্প বলে, এত বিরাট জীবনের এতসব বিচিত্র ঘটনা, কতটাই বা তোমাকে বলা সম্ভব?

আমি তাঁকে সাহায্য করি— ওই রোগটা সম্পর্কে বলুন।

আমি তাকে সূত্র ধরিয়ে দেয়ায় তিনি যেন খড়কুটো খুঁজে পান— হ্যাঁ, ওই রোগটা... একের পর এক ছবি হিট হতে শুরু করল, আমি ক্রমশ মানুষের স্বপ্নের নায়িকা হয়ে যেতে থাকলাম, উফ নীলু! সে কী প্রচণ্ড অনুভূতি! নিজেকে পরী মনে হতো, অপ্সরা মনে হতো, হাঁটতে গিয়ে কেবল উড়তাম... সেই বছরগুলি... আমার মনে হয় জীবনের বাইরের ঘটনা, সারাদিন টানা কাজ, রাতভর বিচিত্র ব্র্যান্ডের এ্যালকোহল... ফূর্তি ফূর্তি এর মধ্যেই বিদেশ

থেকে আগত এক বিরাট ব্যবসায়ীর খপ্পরে পড়ে গেলাম। ব্যাটা এমন পেছনে লাগল... কি থেকে কি হলো বুঝলে, লোকটাকে বোকার মতো আমি বিয়ে করে ফেললাম। ভুরুতে ভাঁজ পড়ায় সুলেখার কপাল থেকে টিপ খসে পড়ে। আশ্চর্য! একটা টিপ তার সারা অস্তিত্বকে একটি বিন্দুতে বিন্যস্ত করে রেখেছিল। খসে পড়তেই মুহূর্তে মুখটা অচেনা হয়ে যায়। শাড়ির ভাঁজ থেকে খুঁজে ফের আমি তাঁর কপালে চেপে লাগিয়ে দিয়ে তাঁর আসল মুখটা খুঁজে পাই। সুলেখা গল্পের মধ্যে ঢুকে গেছেন— বুঝলে, কিছুদিন পরই আমরা পরস্পরের প্রতি মোহ হারাতে শুরু করি, এটা তো সত্য বেশির ভাগ স্ত্রীই তার স্বামী সহবাসে শীতল থাকে আর পুরুষেরাও স্ত্রী সহবাসে একটা পর্যায়ে গিয়ে চূড়ান্ত তৃপ্তি পায় না— আমাদের মূল সংকটের সূত্রপাত সেখান থেকেই, তবুও আমি আর পাঁচটা সাধারণ নারী হলে নিজেকে সবার মতন মানিয়ে নিতাম... কিন্তু আমার রক্তের মধ্যে তখন হাজার মানুষের স্বপ্নের রূপ, আমি একজনের বৃত্তে বন্দি হয়ে কি করে সুখী হই!

কৈলাস কফি দিয়ে যায়। কাপে চুমুক দিয়ে সুলেখা ফের গম্ভীর হয়ে উঠেন।

তারপর ?

এই, আমার মাথাটা বড্ড ধরেছে, বুঝলে, এরপর আমার স্নায়ুরোগ হলো, সে অবশ্য অনেক পরে, ওই তো, রোগ হলো প্রচণ্ড ভুগতে হলো— আমার গল্প শেষ— বলতে বলতে এইবার সুলেখার মাথা ঢলে পড়ে, বহুদিন টানা কথা বলার অভ্যাস নেই, অন্য একদিন বলব, হ্যাঁ নীলু তোমাকেই বলব, চেনা নেই, জানা নেই, একজন মৃতপ্রায় মানুষকে তুমি বাঁচাতে গিয়েছিলে, সময় বড় নিষ্ঠুর! কে কার জন্য এটা করে বলো ?

নিজেকে ভুলে, ভুলিয়ে বাঁচতে থাকি। কেবল রঞ্জনের কথা মনে হলে এই শহরটা দানবের মতো এগিয়ে এসে আমাকে পিষে ফেলতে চায়। আমি পালাতে থাকি। পালাতে থাকি। নিথর আঙুলে ফোনের ডায়াল ঘোরাই— এইট ওয়ান... এরপরে নাম্বারগুলিতে আঙুল এগোতে চায় না। প্রচণ্ড ভয় হয়, হাত পা হিম হয়ে আসে। যদি কানের কাছে সেইকণ্ঠ সশব্দে বেজে ওঠে, যদি সেই শব্দে এই পৃথিবীতে অনন্ত স্তব্ধতা নেমে আসে ? তবুও ঘোরাই... পুরো নাম্বারগুলি... তাঁর কণ্ঠ শুনি... নিঃশব্দে রিসিভার রাখতে রাখতে দেখি থকথকে জলে মুখে ভেসে যাচ্ছে...।

জীবনের এসব চড়াই উৎরাইয়ের মধ্যে একদিন একটি প্রাইভেট ফার্মে আমার চাকরি হয়ে যায়। বহু বহুদিন পর বিষয়টি আমাকে এত অভিভূত করে, জয়েনিং লেটার হাতে নিয়ে ছুটতে ছুটতে আমি রাস্তায় এসে আমার আচরণের ভারসাম্য ভুলে যাই। আমি অনেক রিকশা, অনেক মানুষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একদম একা এমন বেমক্কা শব্দে হেসে উঠি, চতুর্পাশের স্বাভাবিক রূপটা মুহূর্তে পাল্টে যায়। কয়েকজন গতি থামিয়ে, কাজ থামিয়ে আমাকে দেখতে শুরু করে।

লাফিয়ে রিকশায় উঠে আমি পালিয়ে বাঁচি। আকাশের রোদ্দুর, রিকশাঅলার রঙ জ্বলে যাওয়া শার্ট— ট্রাফিক জ্যাম, অন্ধ ভিখিরি, কৃষ্ণচূড়া গাছ... সব কিছুকে আমার কাছে অসম্ভব সুন্দর আর মধুর মনে হতে থাকে।

ফকিরাপুলের চিপাগলিতে ঢুকে শায়েদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে অকস্মাৎ আড়ষ্ট বোধ করি। ও অনেক বেলা অব্দি ঘুমায়, নিশ্চয়ই এখন বাসায় আছে, তবে বিষয় সেটা না, ওদের

ফ্যামিলি খুব রক্ষণশীল, তাদের ছেলের মেয়ে বন্ধু থাকতে পারে বিষয়টিকে তারা অশ্লীল চোখে দেখে। ফলে শায়েদ একদিন দূর থেকে ওর বাসাটা দেখিয়েছিল, এ পর্যন্তই, কখনোই আমার ওদের বাসায় যাওয়া হয় নি।

চাকরি ছেড়ে দেয়ার পর মাঝে সে কয়েকদিন আমাদের বাসায় এসেছে, আমার অফিসে গেছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে অন্তরঙ্গ কোনো কথা হয় নি। আজ আমার চাকরিটা হয়ে যাওয়ায় আমার প্রত্যয় অনেকগুণ বেড়ে গেছে, আমি যে আসলে স্বার্থপর না, শায়েদকে আজকেই দেখানোর প্রথম সুযোগ।

ওকে এই মুহূর্তে দরকার, অথচ ওদের বাসায় গেলে পরিবেশটা এমন হয়ে উঠতে পারে, দেখা যাবে আমার চাকরি পাওয়ার আনন্দটাই ভেস্তে গেল।

ইতস্তত করতে করতে ফিরে আসব, থ্যাংক গড, বাসা থেকে শায়েদ বেরিয়ে আসছে। ছিরিবিরি তারে আকীর্ণ, প্রেসের খটখট শব্দে অস্থির, আর গিজগিজে মানুষে ভর্তি গলিটার মাঝখানে আমাকে দেখে শায়েদের চোখ মহাগোল হয়ে উঠল।

লোকে জমজম, শব্দে জমজম, গন্ধে জমজম শহরটার মাঝখান ধরে রিকশা যখন চলছে, শায়েদের বিস্মিত মুখ আমার ওপর নিবদ্ধ, বিষয়টা কি নীলু?

আমি কায়দা করে হাসি, চোখের কটাক্ষে রহস্য ফোটাই, শব্দ করি না। ভাড়া মিটিয়ে পরিষ্কার রেস্তোরাঁ দেখে ঢুকি। সপ্রশ্ন তাকাই ওর দিকে, কী খাবে বলো?

ওর কোঁকড়া চুল কপালে পড়েছে, শ্যামলা চামড়ায় ব্রণ পড়েছে, শাদা শার্টে কালসিটে দাগ পড়েছে— বড় মধুর মনে হচ্ছে ওকে, আমি রেস্তোরাঁর চারপাশে তাকিয়ে আমাদের থেকে অন্য কাস্টমারদের দূরত্ব মেপে শায়েদের হাত চেপে ফিসফিস উচ্ছ্বাসে বলি— একটা প্রাইভেট ফার্মে আমার চাকরি হয়ে গেছে।

হাত বাড়াতে গিয়ে মৃদু ধাক্কায় গ্লাস উল্টে পড়ে, ক্ষীণ জল টেবিল বেয়ে নিচে গড়াতে থাকে। শায়েদের মুখের উত্তেজনা এক ফুঁয়ে নিভে যায়। সে গ্লাস ঠিক করে নিচ দিকে মাথা নামিয়ে জলের মধ্যে আঁকিবুঁকি করতে থাকে।

আশ্চর্য! তুমি খুশি হও নি?

আমার এ কথায় সে চমকে তাকায়, এরপর মৃদুকণ্ঠে বলে— আমি তোমার যোগ্য না।

কী যে মিডিলক্লাস কমপ্লেক্সে ভোগো, বলে আমি তেতে উঠি, আমি ঠিক বুঝি না—

কমপ্লেক্সটা তুমিই আমার মধ্যে ঢুকিয়েছ, শায়েদ আহত চোখে তাকায়, আমার নিজের কাছে নিজের আর কোনো মূল্য নেই। নিজেকে আমার আজকাল এমন একটা প্রাণী মনে হয়। আমি ফের ওর হাত চেপে ধরি, কেন আমি ওইরকম করি অন্তত তুমি যদি আমার বাস্তবতাটা না বোঝো আমি কোথায় দাঁড়াই বলো তো? একটু সুখ একটু স্বস্তি দেখার অধিকার তো আমার আছে, নাকি? স্বপ্নটা তো আমি তোমাকে নিয়েই দেখি, নাকি আমার কল্পনার মধ্যে একশ মানুষ আছে... আমার কথাগুলো শায়েদকে উদ্ভাসিত করতে থাকে আর আমি ডুবে যেতে থাকি ঘোর ছায়ায়, আমার কেমন শীত লাগতে থাকে... মাথার মধ্যে কুয়াশা জমতে থাকে, কী নির্লজ্জ মিথ্যা... সারাক্ষণ... সারাক্ষণ রঞ্জনকে নিঃশ্বাসে রেখে, অনুভূতির চূড়ান্ত জায়গাটাতে রেখে আমি এসব কী বলছি শায়েদকে? আমি ছেঁকে ধরতে থাকা সেই যন্ত্রণাকর ছায়া কাটাতে প্রায় চিৎকার করেই বলি— আগে দু'কাপ চা!

তুমি অনেক ভালো নীলু... শায়েদ বড় নরোম স্বরে বলে, এজন্যই অনেক রাগ হয়েছে অনেক সময়, অনেক ভুল বুঝেছি তোমাকে, কিন্তু তারপরও বারবার আমি তোমার কাছেই ছুটে গেছি।

এই যে স্যার, আমি কটমট চোখে বলি, সামনা সামনি বেশি হয়ে যাচ্ছে, এখন দয়া করে বলুন— কী খাবেন?

শায়েদ হাসতে হাসতে কণ্ঠ নামায়, আমি যা খেতে চাই, তা কি আপনি এখন দিতে পারবেন?

খুব দ্রুত উত্তর দিই— পরের পরিস্থিতি আপনি সামলাতে পারলে আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি।

পরিস্থিতি ক্রমশ নির্মল আনন্দে পূর্ণ হয়ে ওঠে। রাস্তার দিকে মুখ করে বসায় আমি শীতরোদে উজ্জ্বল শহরটা দেখতে পাচ্ছি। আর শায়েদ সবুজ প্লাস্টার করা দেয়ালের দিকে চেয়ে কয়লা দিয়ে লেখা বাংলা অক্ষরগুলো উদ্ধারের চেষ্টা করছে। ভিড় কম রেস্তোরাঁয়, যারা এসেছে, তাদের কণ্ঠও উচ্চকিত নয়, সব মিলিয়ে বেশ স্বস্তি... এবং যা হয় আমার, যখন এই মর্মে সিদ্ধান্তে আসি স্বস্তি, ফুটো করার জন্য পেরেক নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে কেউ, কলজে অবশ করা অনুভূতিতে রঞ্জনকে মনে পড়ে, মনে পড়ে সেদিনের কাবাব, হাওয়া, সেদিনের খড়ের ছাদ, আমি চোখবুজে নিঃশ্বাস টানি... এক অলৌকিক ঘ্রাণের মিহি নিঃশ্বাস আমার ইন্দ্রিয় স্তব্ধ করে দেয়।

এখন বলো প্রদীপের দৈত্যটা কে? বেয়ারা মোগলাই পরোটা দিয়ে গেলে তার পেটে কাঁটা চামচ ঢুকিয়ে শায়েদ প্রশ্ন করে। আমি অবাক চোখে তাকাই— বুঝলাম না।

আমি প্রশ্ন করছি, হুট করে চাকরিটা তোমাকে কে দিল?

আমি কিছুক্ষণ নিঃশব্দ থাকি, পরিবেশটাকে নাটকীয় করার জন্য, এরপর দম টেনে রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসি— সুলেখা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভেবেছিলাম, বেশ একটা চমক দিলাম, শায়েদ আকাশ থেকে পড়বে।

আমাকে অবাক করে দিয়ে সে নিস্পৃহ স্বরে বলে— মহিলা না জনবিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা, তার আবার চাকরির পথ ঘাটও জানা আছে নাকি?

তাতে আমিও কি কম অবাক হয়েছি? মোগলাই মুখে দিয়ে ডিমের স্বাদ ছাড়া আর কিছু পাই না, গিলতে গিয়ে টের পাই হেঁচকি উঠছে, পানি খেয়ে নিজেকে ধাতস্থ করে ফের শায়েদের মুখের দিকে তাকাই, সত্যিই মহিলা চিজ একটা, যা-ই বলো আজব, একদিন আমি তাঁর বাসায় গিয়ে খুব একটা নাজুক মুহূর্তে আমার চাকরি দরকারের কথা বলছিলাম, সেদিন জানো, তিনি এমন ভাব করলেন যেন আমার কথা শুনেন নি, দুদিন পর কৈলাসকে দিয়ে আমাকে তাঁর বাসায় জরুরি যেতে খবর পাঠালেন এরপর আমাকে খাম ভর্তি একটা চিঠি দিয়ে বললেন, আমার স্বামীর বন্ধুর কোম্পানি, তুমি তার সাথে আজই গিয়ে দেখা করবে। অনেকদিন যোগাযোগ নেই, তবুও এই চিঠি পেলে সে পোস্ট ক্রিয়েট করে হলেও তোমাকে চাকরি দেবে, তুমি দয়া করে এই বিষয়টা নিয়ে আমার সাথে আর একটি কথাও না বললে আমি সুখী হবো। আমি তো শায়েদ হতবাক, জীবন যে কত বিচিত্র, আমার তো রীতিমতো মনে হয় মিরাকল... কে বলেছে জীবনে বাঁচার জায়গা নেই? মহিলার কাছে আমার সারা জীবনের ঋণ তৈরি হয়ে গেল, ক'দিনের পরিচয় বলো... অবশ্য তার মধ্যে এমন বহু বিষয়

আবিষ্কারের আছে, তিনি কখনোই আর দশজনের মতো না, এসব তো আমরা বারান্দায় বসে তাকে দূর থেকে দেখেই বলতাম, না? প্রগাঢ় উচ্ছ্বাস আমি গড়গড় করে কথা বলতে বলতে দেখি শায়েদ নিঃশব্দে আমাকে দেখছে।

আমি ভীষণ লজ্জা পেয়ে ফের পানি খাই, আসলে চাকরিটা পেয়ে জানো, আমার এত ভালো লাগছে।

চাকরিটা করার সময় প্রথম কয়েকদিন, কাজ শেখার সময়টায়— প্রচণ্ড এক স্নায়বিক চাপে ভুগতে থাকি। শনি আমাকে সারাক্ষণ তাড়া করে ফেরে তাই সহসা নিজের ভাগ্যের ওপর আস্থা রাখতে ভয় হয়। অফিস সহকর্মীরা খুব সাহায্য করে, ফলে কাজের ক্ষেত্রটায় কয়েকদিনের মধ্যেই আমি নিজেকে একটা স্বস্তির জায়গার মধ্যে নিয়ে আসতে পারি।

এরপর যখন আমি নিজেকে জাগতিক ছকে কঠিনভাবে বাঁধতে শুরু করেছি একদিন আমাকে অদ্ভুত স্রোতে ভাসিয়ে রঞ্জন ফোন করে, আমাকে বলে, আমি হেরে গেছি নীলু, তুমি আমার সেই ক্লিষ্ট জীবনের এক মাত্র স্বপ্ন। আমি স্বপ্নহীন হতে ভয় পাচ্ছি। অনেক যুদ্ধ করেছি নিজের সাথে, হেরে গেছি আমি, হেরে গেছি।

এরপর রঞ্জনের সাথে আরো ঘনীভূত হয়ে ওঠে সম্পর্ক। এই প্রথম সহজ অনাবিলতায় কাউকে আমি প্রায় জীবনের সব গল্প বলি। ছিন্নভিন্ন ফোনে, কখনো থেমে গিয়ে ফের চলতে শুরু করে। ফোন, যেখানে কণ্ঠ দিয়ে জীবনের সমস্ত অভিব্যক্তি পৌঁছানোর দুর্গম কাজটি করতে হয়, আমি তার মধ্য দিয়েই যতটুকু পারি নিজেকে ওর কাছে মেলে ধরতে থাকি। এক সময় টের পাই, বহু বহুকাল নিঃশ্বাসের তলায় চাপা পড়ে থাকায় আমার ভেতর থেকে অন্ধকার চিত্রগুলো বেশি উঠে আসছে। আমি জানি সারাজীবনের মধ্যে পাওয়া এ আমার একমাত্র গহীন গোপন স্বপ্ন একে আমি পেতে চাইব, সমান করে তুলব, এটাই হয়তো স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এই জীবনে কেউ আমার ভাষা বোঝে নি, কাউকে দেখেই আমার মনে হয়নি, কুকুরের সঙ্গমকেও শিল্পময় করে তোলার ব্যাখ্যা কারো জানা থাকতে পারে। ফলে, সেই ডানাঅলা ঘোড়ার বিশ্লেষণে রঞ্জন আমাকে ঘৃণাতুর করার বদলে স্বপ্নময় করে তোলায়, আমার মনে হয়, বুকটা দু ফাঁক করে দিলে একমাত্র রঞ্জন পারে, নখের সূক্ষ্ম ধারে, একদম যন্ত্রণা না দিয়ে ঠিক জায়গা থেকে কাঁটাটা বের করে আনতে। আমার যে দেহ গেঁথে আছে অনন্ত ক্রুশ কাঠে, রঞ্জনই পারে, দু' হাতের পেরেকগুলি সন্তর্পণে খুলে আমাকে মুক্ত করতে। তাই ওকে চাইতে ভয় হয়, পেতে ভয় হয়। ওকে বলি, সব... প্রায় সব, ছেলেবেলা থেকে এই পর্যন্ত কোথায় আমার বাঁচার গ্লানি, কোথায় আমার ক্লেদ, শক্তিহীনতা, আপোস, বলতে বলতে গাঢ় সন্ধ্যায় বিছানায় এলিয়ে পড়ি, রঞ্জনের দীর্ঘশ্বাস প্রলম্বিত হয়। সে বলে, কোথাও নিজেকে ঠিকভাবে দাঁড় করাতে পারলাম না। জীবনের প্রতিটি পর্যায় অতিক্রম করেছি এমন অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে, যে অভ্যাসকে আমি ঘৃণা করি। আমার জীবনে যা যা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সবটাই ভুলে পূর্ণ। অথচ বাঁচার স্বার্থে সেই ভুলকেই অসহ্য শক্তির সাথে বহন করে চলেছি। একসময় তোমার মা-কে কেন্দ্র করে— আজ তোমাকে বলি, এমন স্ক্যান্ডাল উঠেছিল শহরে, আমি অনেকটা এজন্য সেসময়ও আমার পরিবারের সামনে দাঁড়াতে পারি নি। তখন তোমাকে বলতে পারি নি, তুমি কষ্ট পেতে, আমারও সাহস ছিল কম।

আজ বলি, এ নিয়েও নিজের মধ্যে আমার গ্লানি আছে।

আমার বাক স্তব্ধ হয়ে যায়। ফোঁপানো জলে আমি রিসিভার ভিজিয়ে ফেলতে থাকলে কাতর হয়ে ওঠে রঞ্জনের কণ্ঠ— আমি আশা করি নীলু, জীবন আর সময় তোমাকে সেই শক্তি দিয়েছে তুমি তোমার মাকে যেমন ঘৃণা কর না, তেমন আমার একযুগ আগের বাস্তবতাকেও তুমি ঘৃণা করবে না। আমি তাহলে বড় অসহায় হয়ে যাব।

এরমধ্যেই একদিন সে কী আনন্দ... আনন্দ! রঞ্জন ফোনে জানায়, আমার বাসায় আসবে, আর কী আশ্চর্য, সেই আসার মধ্যেও সে কোনো স্বাভাবিকতা রাখে না, আমাকে বলে, তোমাদের বারান্দা থেকে জ্যোৎস্না দেখা যায়?

আমি অবাক স্বরে বলি— যায়, কেন?

তাহলে আগামী পূর্ণিমায় আসছি, একদম সন্ধ্যার পর, যখন পরিপূর্ণভাবে চাঁদটা উঠবে, তখন চলে যাব, আমরা একসাথে জ্যোৎস্না দেখব... নীলু, তোমাকে কেন্দ্র করে এটা আমার স্বপ্নের প্রথম ধাপ...।

রিসিভারে কান পেতে থাকি। আমার ভেতর থেকে যাবতীয় শব্দ নির্জলা বাতাসের সাথে মিলিয়ে যায়।

তোমাদের বাসায় কোনো অসুবিধে নেই তো?

আমি নিঃশব্দে বলি, না।

এটা শেষ ধাপও হতে পারে, রঞ্জন ক্রমশ বিমর্ষ হয়ে ওঠে, আফটারঅল তোমার জীবনের যা বাস্তবতা, আমার অধিকার নেই একটার পর একটা স্বপ্নের কথা বলে তোমাকে চিরদিনের নিঃসঙ্গতার দিকে ঠেলে দেয়ার, আমি নীলু...।

আমি কাতর স্বরে বলি— এই মুহূর্তে হিসেবটা না করলেই চলছে না? নিশ্চয়ই জীবনের বাস্তবতা বোঝার মতো আমাদের দু'জনেরই বিবেচনাটা আছে।

দুঃখিত! রঞ্জন মৃদুকণ্ঠে বলে, বয়সটাই হয়তো একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, বেহিসেবী হতে চাইলে হিসেবের চিন্তাটাই সবচাইতে আগে আসে।

রঞ্জন... রঞ্জন থাম, আমি এই মুহূর্তে চাই না হিসেব শব্দটি রোগের মতো চেপে বসে অনুভবকে হত্যা করুক।

তাহলে আগামী পূর্ণিমায়।— বলে রঞ্জন নিঃশব্দে রিসিভার রেখে দেয়।

এই নাগরিক আকাশে কবে পূর্ণিমার চাঁদ ওঠে? কোনোদিন হিসেব করে দেখি নি। আমি ক্যালেন্ডার উল্টে, ডায়রি ঘেঁটেও পূর্ণিমার হিসেব পাই না। চারপাশে রাত্তির নেমে আসছে। যেন কোনো জাদুকর রিসিভারে ফুঁ দিয়ে আমাকে প্রেতজগতের মধ্যে নিয়ে ফেলেছে, আমার রক্তের মধ্যে এমনই এক বোধের খেলা শুরু হয়। মুহূর্তে সমস্ত জগত টাল খেয়ে একটি মাত্র শব্দের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে যায়, পূর্ণিমা।

আমি কাপড় পাল্টে ছুটতে ছুটতে সিঁড়ি দিয়ে নামি। সামনে শীতের এমন এক রাত্তির ছড়ানো, যা দ্রাক্ষাপূর্ণ, আমাকে টেনে নিয়ে চলে অপার্থিব ইন্দ্রধনু... মা-কে দেখতাম পঞ্জিকা ঘেঁটে পূর্ণিমার হিসেব, অঘ্রানের হিসেব, রোজার হিসেব— এইসব বের করতেন। এই শহরের কোথায় পঞ্জিকা পাওয়া যায়?

রাতের রিকশায় যেতে যেতে সেই প্রেত জগতে বসে একমাত্র মাকেই হাতড়ে হাতড়ে ছুঁতে পারি। রোদ্দুরে তাঁর কাপড় মেলে দেয়া, তরকারির ঝোল জিভ দিয়ে ছুঁয়ে দেখা, ভেজা

লাকড়িতে কেরোসিন দিয়ে ঘোর বৃষ্টির সন্ধ্যায় আগুন জ্বালানো, কারবালার কাহিনী পড়তে পড়তে কাঁদতে থাকা— কত যে দৃশ্যছবি আমার চোখের সামনে ধাঁই ধাঁই করে ভেসে ওঠে, আমার কাছে মার জীবনের আড়াল বলে কিছু ছিল না। মনে পড়ে শওকত মামার সাথে রাত্তিরের ঘটনার পর আমিই হয়ে উঠেছিলাম তাঁর প্রধান সহচরী।

প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর বাবা মা'কে দ্বিতীয় বিয়ে করেছিলেন। তখন মা'র বয়স আর কত? চৌদ্দ! দরিদ্র পরিবারে কোরআন খতম আর দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে পাঠ চুকিয়ে ফেলা— এই ছিল মা'র যোগ্যতা। আজন্ম খেলার সাথী জালালকে কেন্দ্র করে মার মধ্যে সবে যখন স্বপ্ন জমতে শুরু করেছে তখন গোফঅলা, বুকে লোমের ইয়া বড় পুরুষ বাবাকে বিয়ে করাটা ছিল মা'র জীবনে প্রথম ভয়। মা'কে বিয়ে করে নিয়ে বাবা শহরের বাসে উঠছেন, দূরে সজনে গাছটার নিচে জালাল এক ঠায় দাঁড়িয়ে আছে— এই দৃশ্যের বর্ণনা মা যতবার দিয়েছেন, জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও তাঁর চোখ ভিজে উঠেছে।

এরপর বাবার সংসারে শুরু হয় মা'র দোযখবাস। অসহ্য এক বোবা প্রাণীর মতো তিনি দিনের পর দিন বাবার অশ্লীল গালিগালাজ, বেদম প্রহার এইসব সহ্য করে গেছেন। বাবার মা'কে ঘায়েল করার প্রধান অস্ত্র ছিল মা-র দারিদ্র্য। প্রায়ই বাবা মাকে ফকিন্নীর ঝি বলে সম্বোধন করতেন। বলতেন, অচল মাল গছিয়ে দিয়ে নানা তাঁর সাথে প্রতারণা করেছে। কিসে মা অচল— এই বিষয়টা কোনোদিন মা বুঝে উঠতে পারেন নি। তবে কী কী সব জিনিসপত্র দেবে বলে নানা সেসব বাবাকে দেয় নি, সারাজীবন বাবার আক্রোশের ওটাও একটা মূল জায়গা ছিল। মা'কে বাবা তাঁর পরিবারের সাথে চিরকালের জন্য সম্পর্ক ছিন্ন করিয়েছিলেন। এরপর একের পর এক কন্যা সন্তান জন্ম দিয়ে সংসারের মধ্যে মা'র শেষ জায়গাটাও নষ্ট হয়ে যায়। বাবা বলতেন, একটা গুণও যদি থাকত, ফকিন্নীর ঝি জন্মাইছে একটা পচা পেট লইয়া, মাইয়া ছাড়া কিছু বিয়াইতে জানে না। মা নিজেও বাবার দেয়া এইসব বিশেষণ বিশ্বাস করে সারাক্ষণ এমন ভীত, এমন সংকুচিত থাকতেন, তাতে বাবার ক্রোধ তিনগুণ বেড়ে যেত, বাড়া ভাতে লাথি দিয়ে তিনি বলতেন, ওই খানকী, জবাব দেসনা ক্যান? তুই বোবাও নাকি?

মা প্রাণের মধ্যে দোযখ জ্বেলে জীবনের পর জীবন আমাদের হাসাতে চেয়েছেন... নীলক্ষেতের বইয়ের মার্কেটে রাত্রির স্থিত কোলাহল... প্রগাঢ় নিমগ্নতায় ছটফট করতে করতে আমি দিলারাকে ঘৃণা করি। জীবনের লোভ তোমাদের বোধবুদ্ধিহীন করে তুলেছে। তোমাদের এই রকম বাঁচাকে আমি ঘৃণা করি।

অথচ ওরা সব দেখেছে, মা'র ওপর জঘন্য উৎপীড়ন, বাবাকে অসুর ভেবেছে, কিন্তু ওরা মা'কে মানুষ ভাবতে চায় নি। চেয়েছে মৃত্যুবধি এইসব সহ্য করে করে মা এমন একটা বেদিতে গিয়ে বসুক, যাতে সারাজীবন মাকে তারা পূজা করতে পারে। বাবার অন্যত্র বিয়ের পর শওকত মামা এসে মাথার ওপর দাঁড়ালে সবাই খুব খুশি, তাঁর দেয়া সুযোগ সুবিধা সবাই নির্লজ্জভাবে ভোগ করেছে, কিন্তু কোনো বিনিময় ছাড়া একটা সংসারে এরকম বাস্তবতাটা কি করে এত সহজ আবীলতায় পূর্ণ হতে পারে— ও নিয়ে কারো মধ্যে কোনো চিন্তা ছিল না।

আমি তো দেখেছি নিজেকে বিকাতে গিয়ে কী অসহ্য ক্রন্দনের মধ্যে মা পড়েছিলেন। সংসারের একটা বোবা প্রাণীকে সেই প্রথম আমি শিশুর মতো কাঁদতে দেখি। এরপর হয়তো

ধীরে ধীরে শওকত মামার প্রতি মা'র প্রেম জমতে শুরু করেছিল। মামার গল্প করার সময় মা নিভৃতে আমাকে দিঘির ঘাটে নিয়ে যেতেন, তাঁর মুখের রক্ত, চোখের তরঙ্গ আমাকে আশ্চর্য এক সুখ দিত। মনে হতো, মা'র জীবনের সবটাই তাহলে অর্থহীন হয়ে যায় নি। এই প্রথম তিনি বাঁচার শান্তি খুঁজে পাচ্ছেন। মা এমন কিশোরীর মতো আচরণ করতেন, অন্তত মামার গল্প করার সময়, আমার মনে হতো আমি তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ কোনো বান্ধবী, আফসানা তখন ক্ষুদে শিশু। সবাই ঘুমিয়ে গেলে, ওকে স্তন পান করিয়ে রাতে ফিসফিস করে মা আমাকে ডাকতেন। আমি গুটি গুটি পায়ে নিঃশব্দে নিচে নেমে আসতাম। এরপর সন্তর্পণে দরজা ভেজিয়ে সলতে কমানো হারিকেন নিয়ে আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতাম, মা শওকত মামার ঘরে চলে যেতেন। মা আমাকে রাখতেন নিজের নিরাপত্তার জন্য। কেননা সবাই জানত আমি একা বাথরুমে যেতে ভয় পাই।

মা আমাকে বলতেন, পুরুষগুলো কত খারাপ হয় তা তো জানস না নীলুফার, আমার জোয়ান চারটা মেয়ে, কত ভয়ে থাকি, শওকত ভাই ভাগ্যি মাথার ওপরে আইসা খাড়াইছিল। এত বড় একটা সংসারের ভার, সোজা কথা ? সে তো আমার যুবতী মেয়েদের দিকে হাত বাড়াইতে পারত! ওর মতন মানুষ হয় না।

যথারীতি শওকত মামাও আমাকে আলাদা স্নেহ করতেন। বলতেন, তোর যে নাকটা বোঁচা নীলু, তোরে আমি কার সাথে বিয়া দেই ?

আমি তাকে ইয়া মস্ত এক ঘুসি মারলে সে কি হাসি তাঁর, যা যা তোরে বিয়া দিমু না, সাপের বাক্সের মধ্যে বন্দি কইরা রাখুম, ওই কিলবিল দাঁত ভাঙা সাপগুলান হইব তোর বন্ধু। কত খরচ হইতো তোর বিয়ায়, বাঁইচা গেলাম। এক রাতে আমাকে টানতে টানতে দিঘির ঘাটে নিয়ে গিয়ে বললেন, এই বয়সেই তোদের এমন মন মইরা গেছে ক্যানরে নীলু— দেখ দেখ আসমানে কত্ত বড় চাঁদ।

চাঁদ... পূর্ণিমা... পূর্ণিমায় আমি আসব... বইয়ের মার্কেটে দাঁড়িয়ে আমি পাণ্ডুরোগে ভুগি, 'অমাবস্যায় পূর্ণিমা হয়, শুভ যোগ সেই চান্দে উদয়, লালন বলে সে-ই সময় দণ্ডেক রহেনা, সময় গেলে সাধন হবে না'... আমার সুখ হয় না, আনন্দ হয় না, অসহ্য এক চাপের ভারে ছটফট করি। রঞ্জনকে মনে হয় স্বার্থপর; মনে হয়, আমার স্বাভাবিক জীবনকে হত্যা করার জন্য সে বুদবুদের মতো ফের আবির্ভূত হয়েছে। সব বুঝি, অনুভব করতে পারি, কিন্তু যে পূর্ণিমার সন্ধানে রাতের পথে বেরিয়েছি, তাকে ফেলে ঘরে ফেরার কথা ভাবতে পারি না।

ঘিঞ্জি দোকানপাট। ভাগ্যিস শীত, নইলে ঘেমে একসা হয়ে যেতাম। একটা দোকানে পঞ্জিকা পেয়ে যাই। এরপর রিকশায় ফিরতে ফিরতে অনুভব করি, আগামী পূর্ণিমা! এইবোধ আমাকে রোমাঞ্চিত করে যত বেশি তার চেয়েও বেশি ভীত করে তোলে। রাতের রাস্তার বিপদের কথা ভুলে আমি দীর্ঘ-দীর্ঘক্ষণ সেই ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে থাকি।

ঘরে ফিরে দেখি শায়লা বাথরুমে ঢুকে স্নান করছে। আমার কি হয় পঞ্জিকাটাকে বুকের ব্রার মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলি। প্রতিমুহূর্তে আমার আশঙ্কা হতে থাকে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আমার মুখ দেখেই শায়লা সব শব্দ পাঠ করে ফেলবে। নিজেকে থিতু করতে আমি বিছানায় মাথা চেপে বসে থাকি।

তোমার মাথা ধরছে ? শায়লার এই প্রশ্নে হতচকিত মুখ তুলে বলি— না।

তোমার চেহারা এমন দেখাইতেছে কেন ? শায়লার এই প্রশ্নে নিজের শক্তিকে অভিশম্পাত দিই, কেন আমি ভেতরের ঝড় লুকোতে পারি না ? কেন আমার সবকিছু সবাই দেখে ফেলে ? এতদিনে তাহলে কী অর্জন করলাম ? আমাদের এই হতবিপন্ন জীবনে কোন কারণে পত্রিকা খুঁজে পূর্ণিমা বের করা এমন এক অন্যায়ের জীবন্ত রূপ, যে রূপ জীবন থেকে পলায়নবাদকে স্পষ্ট করে তোলে। অন্তত শায়লার কাছে বিষয়টা এমন মনে হবে, যুদ্ধের মাঠে বসে আমি তালপাতার বাঁশি বাজাচ্ছি। এর চাইতে যেন অনেক সহজ, অনেক স্বাভাবিক বিবাহের শর্তে কোনো যোগ্য পুরুষের তলায় নিজেকে বিছিয়ে দেয়া।

ওড়না দিয়ে কামিজের নিচে চেপে রাখা পত্রিকা ঢেকে আমি শায়লার মুখের দিকে চেয়েই একসময় আমার কেঁপে ওঠা তরঙ্গগুলিকে মরে যেতে দেখি।

অনেক, অনেক রাতে সবাই যখন ঘুমে, আমি দিন গুনে বের করি, পূর্ণিমা আসতে আরো এক সপ্তাহ বাকি... মরুভূমিতে কচি কচি ঘাসবাতাস ওঠে, মৃতপ্রায় তরঙ্গগুলো কাঁপতে কাঁপতে এক নিঃসীম বোধের সামনে আমাকে দাঁড় করায়। কত কোটি বছর যোগ করলে এক সপ্তাহ হয় ?

হায়! স্বপ্নশরাব ঢেউ!

আমি অচেতন, ভাসতে থাকি।

খুব ভোরে নাকে মুখে নাস্তা গুঁজে অফিসে যাই, সন্ধ্যায় ফিরে আসি। এই কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজারের প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসেবে আমি খুব দ্রুতই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়ে যাই। অফিসের অন্য সহকর্মীদের থেকেও আমাকে বেশি সহযোগিতা করেন আমাদের জেনারেল ম্যানেজার। ড্রাফট তৈরি, বসের প্রোগ্রাম টুকে রেখে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয়া, তাঁর গেস্টদের আপ্যায়ন করা, মিটিংয়ের সারবস্তু তৈরি করা এসব কাজে আমি বেশ কয়েকদিন কোনো দক্ষতা দেখাতে পারি না। দেখা গেল বসের জরুরি একটা মিটিংয়ের কথা স্মরণ না করিয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা আমি তাঁকে তিনবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তিনি অত্যন্ত সহানুভূতির সাথে আমার এই বিচ্যুতিকে গ্রাহ্য করলে কাজ শেখার পরিবেশটা আমার কাছে সহজ হয়ে ওঠে। আমি নতুন করে বাঁচার প্রেরণা পাই। এবং এই সুখে আমার পূর্ববর্তী জীবনে পেরিয়ে আসা দুঃসহ দিনগুলি ভুলে যেতে থাকি। এর হয়তো একটাই প্রধান কারণ, রঞ্জন আমাকে মূল্য দিয়েছে, আমার স্বপ্ন দেখার পুরোমাত্রায় অধিকার আছে, সে-ই প্রেরণা দিয়েছে। আমি জেনে গেছি, জন্মের পর থেকেই কিছু মানুষের মাথায় রাহু গ্রাস করে থাকে, ফলে তারা বেশিরভাগ সময়ই স্বাভাবিক জীবনটা পায় না, এক অস্বাভাবিক জীবনে তারা অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। কয়েকদিন রঞ্জনের সাথে কথা বলে আমি আবিষ্কার করেছি এমন এক মানুষকে যার সহ্য শক্তির সাথে খুব কম লোকই লড়তে পারে। আমি নিজেকে ক্রমশ বিপন্ন আর শক্তিহীন হিসেবে আবিষ্কার করে অসহায় হয়ে যেতে থাকি। চাকরি সংসার সব মিলিয়ে যে এক দমবন্ধ মানুষের জীবন যাপন করছে। স্পষ্ট করে সে তারা স্ত্রী সম্পর্কে কিছু বলে না। তবে আমি এটা বুঝি যে চূড়ান্ত গতানুগতিক জীবন সে যাপন করছে। যার সবটাও তার না করলে চলে, অথচ দায়িত্ববোধ তাঁকে সবটাই করাচ্ছে, সবটার মধ্যে নিজেকে সরিয়ে। অর্থাৎ পুতুলের জীবন, মেশিনের জীবন, এবং যে বেদনা ও কষ্টে অন্তত মানুষ অভ্যস্ত হয় না, তাতেও সে অভ্যস্ত। এত বেশি অভ্যস্ত যে, সে সুখ নির্মাণের কথা আগে ভাবার চাইতে

নিজের মধ্যে আরো অসীম বেদনার মুখোমুখি পড়ার জন্য প্রস্তুতি রাখে। আমি যদি যোগাযোগ করি, তাতে হয়তো তার মধ্যে একটা অভ্যস্ততা তৈরি হবে, যদি কখনো দুঃসহ যন্ত্রণার চাপে পড়ে যোগাযোগ না করি, একসময় সেই শূন্যতার প্রতিও তার অভ্যস্ততা তৈরি হয়ে যাবে। আমি বিপন্ন স্বরে বলি, যে মানুষ নিজেকে প্রকাশ করতে জানে না, কেবল অন্যের প্রকাশ গ্রহণ করে, সে স্বার্থপর। প্রচণ্ড ব্যস্ত রঞ্জন ফোন রাখতে রাখতে বলে— কি জানি, আমি হয়তো তাই। কিন্তু এইসব কথার পরও যে রঞ্জন পূর্ণিমার স্বপ্ন দেখে, তাকে আমি কতটুকু চিনি ?

প্রথম কিছুদিন কাজ বুঝতে চলে গেলে অফিসের ভেতরের অন্য একটা বিচ্ছিরি রূপকে দেখার সময় হয়ে ওঠে না। কিন্তু কদিন যেতেই, ওই যে আমার মাথার ওপর ছায়া করে থাকে যে অপদেবতা সে চিতাকাঠি নাড়তে নাড়তে আমার স্নায়ুর মধ্যে এক বিভ্রান্তিকর দোলাচল ঢুকিয়ে দেয়। খুব সন্তর্পণে, নিভৃতে অফিসের মধ্যে এক অশ্লীল কাজের খেলা চলে, আমি টের পাই। বাবাকে দেখেছি, সায়রাবুর স্বামীকে দেখেছি, তাদের চরিত্রেরই আরেক অসহ্য রূপ আমাদের ফার্মের মালিক, সুলেখার স্বামীর বন্ধু মিস্টার জিন্নাত আলী। এই অফিসের কয়েকজন মেয়ের সাথে তাঁর রয়েছে আপত্তিকর সম্পর্ক। হুট করে বিষয়টা বোঝা যায় না। সুন্দর ছিমছাম অফিস। নারীপুরুষ চমৎকার ক্ষিপ্রতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। এর মধ্যে জিন্নাত আলীর রুমে কখনো কারো ডাক পড়লে— যাচ্ছে, রুম থেকে বেরিয়ে সেই মেয়ে এমন মুখ করে টেবিলে এসে বসছে, যেন কাজে গাফিলতির কারণে সে খুব একচোট বকা খেয়ে এসেছে। জিন্নাত আলীর চেহারার মধ্যে আছে আশ্চর্য এক ব্যক্তিত্ব। কথার মধ্যে পরিমিতি বোধ। আমাকে যতবার ডেকেছেন। মুখ তুলে তাকান নি, চেয়ার ঘুরিয়ে ফাইল নাড়তে নাড়তে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, কাজ কেমন লাগছে ?

আমি নখ খুঁটে বলি— ভালো।

এরপর নিস্তরঙ্গ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছেন— সুলেখা বৌদি কেমন আছে ?

আমি ইতঃস্তত স্বরে বলি, আসলে যাওয়া হয় নি।

যাবেন। রেগুলার যাবেন। আপনি অসাধ্য সাধন করেছেন, সেই জন্যই আপনার শক্তির ওপর আমি খুব আস্থা রাখি। বহুকাল সে জনবিচ্ছিন্ন ছিল, আমরা অনেক চেষ্টা করেছি। ওর স্বামীর কাছে আমার ঋণের শেষ নেই। সুলেখা কারো সাথে যোগাযোগ করতে পারে, কাউকে পছন্দ করতে পারে, তার চাকরির জন্য সুপারিশ করতে পারে... এ্যাবসার্ড... এটা আমার কল্পনার অতীত ছিল। তার প্রতি আপনার কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ.. বলতে বলতে তিনি কিছু কাগজে সই করেন— তাকে একটু লক্ষ রাখবেন... ঠিক আছে, আসুন।

কিন্তু এরমধ্যেই অতি নিভৃতে চলছে অন্য এক কাণ্ড। প্রথমে বিষয়টি আমার সহকর্মী রেজোয়ানা আমাকে বলে, আমি খুব প্রশংসা করছিলাম ম্যানেজিং ডিরেক্টরের, বলছিলাম, এরকম একজন লোক ফার্মের মালিক থাকলে কাজের আনন্দই আলাদা হয়। আমার কথা শুনে রহস্য-হাসিতে রেজোয়ানার মুখ পূর্ণ হয়ে ওঠে। আমি অবাক স্বরে বলি, হাসছেন যে!

রেজোয়ানা সরল মেয়ে। অকপট, প্যাঁচহীন। চেয়ার টেনে আমার মুখোমুখি বসে বিষয়বস্তুর বিবরণে আড়াল রাখে না। সে যা বর্ণনা করে তাতে আমার হাত-পা অবশ হয়ে আসে। সে বলে, চাকরির কিছু দিনের মধ্যেই এম্প্লয়ীর সাথে জিন্নাত আলীর শারীরিক সম্পর্ক

গড়ে ওঠে। তাঁর একটা নাকি অদ্ভুত শক্তি আছে, মেয়েরা তাঁকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। এছাড়াও মেয়েদের চাকরির ভয়ের বিষয়টাতো আছেই। কোনো মেয়ে এতে রাজি না হলে নানা কায়দায় তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়। এ দেখছি আরেক গার্মেন্টস কারখানার মধ্যে এসে পড়লাম— ভাবতে ভাবতে আতঙ্কিত কণ্ঠে বলি— আপনাকে অফার করে নি ?

করে নি আবার ? আমি স্ট্রেইট না করে দিয়েছি।

এখন ?

ভ্রূ নাচিয়ে হাসতে থাকে রেজোয়ানা— অপেক্ষা করছি, চাকরি চলে যাবে।

আচ্ছা, ওর অফারের কায়দাটা কী বলেন তো ?

এমন কিছু কামকলা নেই— আমাদের পাশ ঘেঁসে কাগজ নিয়ে অন্য একজন সহকর্মী কম্পিউটার রুমের দিকে যেতে থাকলে রেজোয়ানা কণ্ঠ নামায়, আরেকদিন বলব, এছাড়া আপনি তো আছেন, নিজেই একদিন টের পেয়ে যাবেন।

যথারীতি আমার স্বস্তির মধ্যে এক যন্ত্রণাকর কাঁটা ঢুকে যায়। সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফিরে আমি ধোঁয়াশা মগজ নিয়ে সুলেখার বাড়ির সামনে দাঁড়াই।

সুলেখা অসুস্থ।

এই প্রথম তাঁর ভেতর ঘরে যাওয়ার সুযোগ হয়। বিছানায় শায়িত বিবর্ণ ক্লিষ্টতার মধ্যেও বড় উজ্জ্বল কপালের টিপ।

কী হয়েছে ? উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাই। জবাবে তিনি নিঃশব্দে হেসে কোমল শব্দে আমার হাত চেপে ধরেন। শরৎচন্দ্রের চাকরদের মতন দরজায় দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছছে কৈলাস।

এই ঘরে বিশাল এক মাটির ফুলদানী। তার পাশে আয়না। বিছানায় ঝালর দেয়া ময়ূরঙের এক চাদর বেছানো। একটা অদ্ভুত পাখিঘড়ি। চঞ্চু বের করছে আর ঢোকাচ্ছে। দিনের বেলাতেও ঘরে ধূপের গন্ধ। একটা জ্যান্ত বাগান বিলাস গাছ গোলটবের মাটি ফুঁড়ে কোনার মধ্যে ঝাঁকড়া মাকড়া ছড়িয়ে আছে।

কী হয়েছে ?

উজ্জ্বল চোখে বাঁচার ক্লান্তি, অস্ফুটে বলেন, আর পারছি না।

এরপর তাঁর ঘোর বিবর কণ্ঠ মিহিবাতাসে পাক খেতে থাকে, আমার কবুতরের কী হবে ? বিড়ালের কী হবে ? শিম্পাঞ্জির কী হবে ? এদের কে দেখবে ?

আমি একজন মানুষ জোগাড় করে দিই ? বলে আরো প্রগাঢ় মমতায় তাঁর মুঠো চেপে ধরি, আপনার দেখাশোনা করবে, সেবা করবে। তিনি ম্লান হাসেন— জানো, আমার সারাজীবনের সমস্যা কী ছিল ? আমি এই অব্দি নিজেকে কখনই যুবতী ছাড়া কিছু ভাবতে পারি নি। কেউ আমার সেবা করবে সেই অবস্থায় যাওয়ার আগে আবার নিজেকে হত্যা করার চেষ্টা করে দেখব। দেয়ালে পুরো পিঠ ঠেকে গেলে সেই চেষ্টায় আর ফাঁক থাকবে না। চিরকাল আমি পর্দার নারী ছিলাম, সংসারে কোনোদিন মন বসে নি, কারো কাছে দেবী, কারো কাছে অপ্সরা, পুরুষের পর পুরুষ পাল্টে নিজের না শরীরে না মনে, কোনো অনুভব আর সরল সুন্দর রাখি নি। নীলু, যেদিন টের পেলাম দিন পড়তে শুরু করেছে, আগের মতো ছবি হিট করছে না, আমার প্রতি মানুষের আকর্ষণ কমতে শুরু করেছে— উফ, তোমাকে

বোঝাতে পারব না এই বোধ মানুষকে কত অসহায়, কত যন্ত্রণাকাতর, কত কাঙাল করে তুলতে পারে। তুমি জানো, পত্রিকায় খবর তৈরি করার জন্য আজব সব কাণ্ড করতাম, কখনো হাত পা কেটে হাসপাতালে ভর্তি হতাম, কখনো ছেলের বয়সী নায়ককে ধরে ওপেন জায়গায় চুমু খেতাম, কখনো— আহ্ কত কী করেছি... এরপর নিজের মধ্যে প্রচণ্ড এক অসুখ টের পেলাম... হ্যাঁ, মেঝেতে পা রাখতে পারতাম না, মনে হতো রক্তের মধ্যে হাজার হাজার শুঁয়োপোকা ঢুকে গেছে। জানো, চামড়ার কাঁপনে অস্থির হয়ে কতদিন ব্লেড দিয়ে রক্ত কেটেছি, ওরকম মুহূর্তে এখানকার একজন ব্যবসায়ী, যে ছিল আমার সারাজীবনের ভক্ত, আমার প্রেমে পড়ল। নীলু, সেই মুহূর্তে সে আমাকে মৃত্যু থেকে ফিরিয়ে এনেছে, আমাকে বলেছে, তোমার যখন বাজার গরম ছিল, এলে নিশ্চয়ই পাত্তা দিতে না! বড় মোক্ষম সময়ে আমি এসেছি। শ্বাস টানার জন্য সুলেখা একটু থামেন। আমি আচ্ছন্নের মতো তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকি। তিনি কেমন খেই হারিয়ে প্রশ্ন করেন, শায়েদ আসে নি?

আমি বলি— না।

তিনি বলেন, যা বলছিলাম, আমি তাঁকে খড়কুটোর মতো আঁকড়ে ধরে এ পাড়ে চলে আসি, সে ছিল আমার জীবনের সবচাইতে খাঁটি প্রেমিক, কিন্তু আশ্চর্য কি জানো, আমি তাঁকেও ভালোবাসি নি। এরপর তিনি হাসতে থাকেন, বড় আশ্চর্য মেয়েদের প্রেম। কোনো জীবনত্যাগ, কোনো নির্ভরতা, বিশ্বস্ততা তাঁকে ভোলাতে পারে না, সারাজীবন খুঁজতে খুঁজতে দেখা যাবে সে এক সময় একটা লম্পটের মধ্যে তার কাঙ্ক্ষিত সৌন্দর্যের সব রূপ দেখতে পাচ্ছে। তবুও, আমি কৃতজ্ঞ আমার এই স্বামীর কাছে। ব্যাংকে টাকা, এই বাড়ি আমার মৃত্যুবধি আমার নিরাপত্তার সব ব্যবস্থা তিনি করে গেছেন... বলতে বলতে সুলেখার চোখ ভিজে ওঠে, তুমি জানো, এপাড়ে এসে আমি তাঁর প্রতিও বিশ্বস্ত ছিলাম না। আমি তাকে ফাঁকি দিয়ে, গোপনে তার এক বন্ধুর সাথে সম্পর্ক গড়েছিলাম। বলতে বলতে সুলেখা আমাকে হতবাক করে দিয়ে বলে, জিন্নাত আলী সেই লোক। লোকটা লম্পট, কিন্তু আমাকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে তার প্রচণ্ড এক গভীরতা ছিল। তুমি দেখবে, অনেক চোর, অনেক ডাকাত, অসভ্য হিংস্র লোকের মধ্যেও কোনো একটা জায়গায় হয়তো তার প্রচণ্ড এক সততা থাকে। আমি তার অফিসের পরিবেশ সম্পর্কে জানি, কিন্তু আমি পাঠিয়েছি তোমাকে, সে কখনোই তোমার দিকে হাত বাড়াবে না।

গভীর স্বস্তিতে আমার হৃদয় পূর্ণ হয়ে ওঠে। আমার বুকের মধ্যে থেকে প্রকাণ্ড পাথরটি নেমে যাওয়ার পরই জ্যোৎস্নারাতের মিহি নিক্কণ হাতছানি দেয়... ওহ্ গড! ও আমার হাত স্পর্শ করলেই যে আমি পুড়ে যাব। সেই মুহূর্তে দাহ থেকে কে আমাকে রক্ষা করবে? সুলেখার বালুচরী নকশা শাড়িতে চোখ রেখে আমি শায়েদকে আমার মধ্যে মরে যেতে দেখি। ওর অস্তিত্ব আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে, গত সন্ধ্যায় আমি যখন তীব্র স্বপ্ন ঘোরে কাঁপছি, তখন ও এসে আমার হাত স্পর্শ করা মাত্র আমার ভেতর থেকে ঠেলে বমি উঠছিল। আমি ওর মুখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না। প্রচণ্ড হতাশা নিয়ে সে চলে গিয়েছিল।

এই ক'দিনে রঞ্জনের সাথে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন কথার সময়, আমার মনেই হচ্ছিল, আকাশটা আমার হাতের কাছে নেমে এসেছে। আমি শূন্যতায় সাঁতার কেটেছি— রঞ্জন... রঞ্জন, এই শীতটায় আমি যদি তোমার সাথে না হাঁটি, সামনের শীতে আমি তোমাকে ভুলে যাব। শীতে আমার বুকে কেউ ছাপ ফেললে আমি সেই ছাপ নিঃশ্বাসের তলায় লুকিয়ে রাখি... আমি

কতকাল এই শীতছাপের অপেক্ষায় আছি। ওকে মূর্তি বানিয়ে রাখার দুঃসহ ত্যাগের মধ্যে আমাকে যেতে হবে না। নিঃশ্বাস চেপে একবার শুধু প্রশ্ন করেছিলাম, তোমার— তোমার স্ত্রী ? সে নিঃশব্দে বলেছিল, এই বিষয়টা থাক।

এরপর... এরপর আর কী প্রসঙ্গ ? রঞ্জন তো নিজ থেকে কিছু বলে না, আমি গভীর গভীর অপেক্ষায় ক্লান্ত হয়ে, অস্থির হয়ে শেষে নিজের স্বভাব ভেঙে নেমে আসি, রঞ্জন, আমি তোমার জীবনের কোন জায়গাটায় ?

এটা কি প্রশ্ন করে জেনে নেয়ার বিষয় ? আমাকে অধঃপাতে ডুবিয়ে রঞ্জন বলে, বিষয়টার মধ্যে কিছু যদি থাকে, তবে তুমি নিশ্চয়ই অনুভব দিয়ে কখনো বুঝতে পারবে। আমি বিশ্বাস করি নীলু, ভালোবাসা বিষয়টা হওয়ার, বলার না। ওর সাথে যুক্তিতে কি পারি ? কিন্তু আমার প্রতি মুহূর্তের তৃষ্ণা আমাকে যখন নোনাজলে সাঁতলায়, আমি আচ্ছন্নের মতো বিছানায় পড়ে থেকে বিড়বিড় করি— যখন বুঝবে আমি তোমার সাথে যুক্তিতে পারছি না, তখনই বুঝবে তুমি আমার কাছে অনুভবে হেরে যাচ্ছ। সংসারে কথায় পারা যায় না এমন লোকের সংখ্যাই তো বেশি। এইভাবে আমি রঞ্জনকে নিজের মধ্যে সহজ করতে, সাধারণ করতে অস্থির হয়ে উঠি; যাতে সে ভূতের মতো চেপে বসে আমাকে প্রতিমুহূর্তের মৃত্যুর মধ্যে ঠেলতে না পারে। কিছুক্ষণ এইবোধ আমাকে স্বস্তি দেয়। আমি নিজেকে ঝেড়ে যেই গলায় সুর তুলতে যাব... অমনি কিছু কারণ ছাড়া ফের আমার কলজে ঠাণ্ডা হয়ে আসে। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় অসাড় করে দিয়ে মনে হয়, রঞ্জনকে এই যে আমার পাওয়া, এ একটা মুহূর্তের ঘটনা মাত্র। আমার সামনের সারাজীবনের বাস্তবতার সাথে তার কোনো যোগ নেই। এইবার শায়লার ঘৃণাটা নিজের দিকে ছুঁড়ে দিই— স্বপ্ন দেখছিস! নিজেকে ঘেন্না লাগে না ?

শায়েদ আসে নি ? স্তব্ধ স্বরে মৃগীরোগীর মতো কেমন কঁকিয়ে ওঠেন সুলেখা, আজ তো ওর আসার কথা ছিল।

ওর আসার কথা ছিল ? আমি ভূতল ফুঁড়ে জেগে উঠি। সুলেখা যেন নিজের মধ্যে নেই, যেন তিনি নিজে কথা বলছেন না, তাঁর মধ্য থেকে তাঁকে কেউ কথা বলিয়ে নিচ্ছে, এইভাবে বলতে থাকেন, হ্যাঁ। গত সন্ধ্যায় সে এসেছিল। অনেক রাত পর্যন্ত ছিল। মানুষ সবকিছুই নির্মাণ করতে পারে, ভালোবাসা পর্যন্ত, কিন্তু মোহ নির্মাণ করতে পারে না। জীবনের এই প্রান্তে এসে ওকে কেন্দ্র করে আমার মধ্যে এমন মোহ জন্ম নিল... আমার মনে হলো, সারাজীবন ধরে আমি একেই খুঁজছি। আমি জানতাম মোহ মানুষকে রোমাঞ্চিত করে, আন্দোলিত করে কিন্তু এই মোহ আমার মধ্যে মৃত্যুর বোধ এনে দিচ্ছে, আমি সহ্য করতে পারছি না নীলু।

সুলেখার শক্ত হাত থেকে আমার শিথিল মুঠো খসে পড়ে।

এক সপ্তাহ পেরিয়ে যায়, যদিও প্রকাণ্ড ওজন ছিল এই সপ্তাহের। প্রতিটি মুহূর্তের। আমার তন্ত্রীর মধ্যে ছোবল দিয়ে দিয়ে জানিয়েছে মিনিট কত দীর্ঘ হতে পারে। তবুও সপ্তাহে গেছে, তারপর আরো সপ্তাহ... তারপর আরো... জীবনের কাছে নতিপরায়ণ আমি বোধের দিক থেকে আরো এক ধাপ এগিয়েছি, অন্তত জীবনের কাছে আমার কিছু প্রত্যাশা করাটা অর্থহীন। যে গড্ডলিকা ঢেউয়ে জীবন নিয়ে যায়— যাব, যে ঘূর্ণি জলে চোবাতে চায়, ডুবব। মানুষ স্বপ্ন ছাড়া বাঁচে না— এই পাঠ প্রতিটি আশাবাদী মানুষ নিজেকে শোনায়। আমি

সারেন্ডার করছি— আমি পলায়নবাদী। আর আমি তো এ-ও জেনে গেছি, পৃথিবীর সবকিছুর পুনঃনির্মাণ সম্ভব, কিন্তু কাউকে কেন্দ্র করে ভেতর থেকে একবার প্রেম ফুরিয়ে গেলে তার পুনরুজ্জীবন সম্ভব নয়— তো ভিখিরির আর ভয় কী? দরজা জানালা খুলে ঘুমাও।

অফিসে ব্যাগ খুলতেই বুকের মধ্যে মস্ত এক চাপ অনুভব করি। একজন গার্মেন্টস কর্মীর ডেথ সার্টিফিকেট। ধেয়ে আসে সেই অকল্পনীয় বেদনাতুর দিনগুলি... মর্গের সামনে স্বজনদের বুক ফাটানো আর্তনাদ, পোড়া পিঠে ইনফেকশান হলো শায়লার। রাতভর সে কি ছটফট তার, সে কী চিৎকার। আমি মলম ঘষতে থাকলে আকুল চোখে তাকিয়েছে আমার দিকে— এইটুকুন ব্যথা সহ্য করতে পারতেছি না, বুবু— তুমি হাসপাতালে যারা আছে ওদের কথা ভাব।

তখনো এই চাকরিটা আমার হয় নি। আমি রেগুলার শায়লার সাথে হাসপাতালে যেতাম। ওদের সূত্র ধরেই মৃত মেয়েদের স্বজনদের সাথে পরিচয় হয়। একদিন অন্ধগলির পথ ধরে ওদের বস্তিতে যাই... মৃত্যুর কান্না থিতু হয়ে সারাবস্তি জুড়ে চামড়া পুড়ে যাওয়া দীর্ঘশ্বাস।

মল-মূত্র এঁদো গন্ধের মাঝখানে কুকুরের মতো মানুষের বাস। হাড়মাংস খুলে পড়তে থাকা কালচে বেড়াগুলোর ফাঁকে ফাঁকে স্তূপ স্তূপ মানুষ! উফ! এরা মানুষ! জঘন্য অস্বাস্থ্যকর মেঝের মধ্যে রাত্তির কাটিয়ে মাস মাস নারীগুলো পেট বড় করে, আশ্চর্য এর মধ্যে শব্দ করে হাসেও! মাথা নিচু করে একটা ঘরে গিয়ে বসলে রাজ্যির মানুষ জড়ো হয়, যাদের অধিকাংশেরই নিকট আত্মীয় সেই দোযখ গহবরে মিলিয়ে গিয়েছে। বেদনা কাটিয়ে এরা উপকূলবাসীর মতন এখন দাঁড়িয়েছে অস্তিত্ব সংকটের সামনে। উপার্জনক্ষম মেয়েটি চলে যাওয়ার পর তাদের কারো বৃদ্ধ বাবা মা, কারো শিশু সন্তানেরা এক ভয়াবহ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সামনে দাঁড়িয়েছে। সরকার ঘোষণা দিয়েছে, প্রতিটি পরিবারকে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। সেটারও একটা প্রক্রিয়া আছে, প্রতিটি মৃতমেয়ের জন্য ওয়ার্ড কমিশনারের কাছ থেকে ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে মালিকদের কাছে জমা দিতে হবে। ঘোষণা শুনে সবাই সার্টিফিকেট জোগাড় করে হাতে নিয়ে ঘুরছে, পুড়ে যাওয়া গার্মেন্টসে তালা, মালিকদের দেখা পাওয়া কঠিন। এছাড়া সরকারের কাছে যাওয়ার পথঘাট অধিকাংশেরই জানা নেই। যারা পথ খুঁজে বের করতে পারছে, তাদের আবার আছে নানা হুজ্জত, বলছে, অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার নিয়ে আসতে। গার্মেন্টসের আশি পার্সেন্ট শ্রমিকদেরই এই বিষয়টি নেই। ফলে অধিকাংশরাই বঞ্চিত হচ্ছে। এরমধ্যে ধুরন্ধর লোক জুটে গেছে, যে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে অনেক আগেই, সে স্বামী সেজে টাকাটা জোগাড় করে মেরে দেয়ার ধান্দা করছে। আমাকে এই বিষয়ে খোঁজ নিতে দেখে অবোধ অনিশ্চিত মানুষগুলো ভেঙে পড়ে— আপা, আপনি শিক্ষিত মানুষ, একটা পথ বের করেন। ওরা এক এক করে অনেকেই আমার ব্যাগে মেয়েদের ডেথ সার্টিফিকেট গুঁজে দেয়।

সেই সন্ধ্যায়, বস্তি থেকে বেরিয়ে নির্জন পথটায় আমি ছিলাম একা। আমার ব্যাগটা প্রকাণ্ড এক পাথর হয়ে আমার বুকে এমন শব্দে চেপে বসেছিল দম নেয়ার জন্য ওপর দিকে তাকাতে হয়েছিল। আমার মনে হচ্ছিল ডেথ সার্টিফিকেট নয়, আমি যেন অনেকগুলো পোড়া লাশ ঘাড়ে বহন করে চলেছি। হায় আকাশ! প্রতিটি পোড়া মাংস থেকে বের হয়ে যাওয়া

আত্মার বাতাসে কী ক্লিষ্ট তোমার রঙ। সেদিন ধীরে ধীরে জ্যোৎস্না উঠতে শুরু করলে, কী ভয়ানক বিষাক্ত মনে হয়েছিল আমার সেই রঙকে!

অথচ এর ক'মাস পরই রঞ্জন পূর্ণিমার স্বপ্ন দেখালে আমি এক বিশ্রী কামচঞ্চল নারীর মতো সেই শববহন করা জ্যোৎস্না রাত্রিকে একবারও স্মরণ করি নি বলে নিয়তি আমাকে অভিশাপ দিয়েছিল। একটা সপ্তাহ আমি অফিস করেছি, রাত্তিরে বিছানায় শুয়েছি, টিউশনি করেছি এক ঘোর স্বপ্নকাতর জ্বরে পুড়তে পুড়তে। আমি আমার জীবন বাস্তবতা আর নিয়তির সাথে বিদ্রোহ করার স্পর্ধা দেখিয়েছিলাম। আয়নার সামনে ঘনীভূত হয়ে উঠেছে যেন চোখ। কেউ প্রথমে আমাকে চোখ দিয়ে শুরু করে নি... ওর উষ্ণ নিঃশ্বাস কি স্পর্শ করবে সেই পাতা ? ওর অলৌকিক আঙুলগুলো লতার মতো ঘিরে ধরবে আমার কোমর ? আর আমার এলোচুলগুলো ঘাড় থেকে সরিয়ে সেই উপত্যকায়... আচ্ছা, ওর প্রখর চুম্বন ধাবিত হতে হতে বলবে তো— তোমার ঠোঁট সুন্দর ?

কে কবে আমার কী সুন্দর বলেছিল, তার কিসসু আমার মনে নেই। আমি যাতে তাড়িত হই না, সে লক্ষ মানুষ হোক, আমার কিছুকে সুন্দর বললে আমি সেই প্রসঙ্গে একটা ধারণায় আসি, কিন্তু আমি যার কাছে নির্মিত হতে চাই, সে সেই চিহ্নিত সৌন্দর্যকে নাকচ করে দিয়ে যখন আবিষ্কার করে অন্য একটি দিক, পেছনের সব আমার ভেতর থেকে মুহূর্তে মুছে যায়। কিংবা লক্ষ মানুষের নির্ধারিত বিষয়কে সে যদি বলে সুন্দর, আমার সর্ব অস্তিত্ব রোমাঞ্চিত হয়ে অনুভব করে— এই প্রথম শুনছি। রঞ্জন বলে— নীলু, বড়ে গোলাম আলী শুনেছ ? হায়! এই শহরে কতদিন সেইভাবে গান শুনি না! সে বলে, লক্ষ করবে, ক্লাসিক্যাল মিউজিকের সাথে শারীরিক সম্পর্ক আর ক্রিকেটের খুব মিল আছে, প্রথমে খুব ধীর ছন্দে শুরু হয়... ক্লাসিক্যাল গান এমনই এক বিষয়, যা একা একজন শোনার বিষয়, অথবা দুইজনে একজন হয়ে শোনার বিষয়। আমার চিরবেদনার তন্ত্রীর মধ্যে বাজতে শুরু করেছিল সুর, আমার প্রাণছাদের ওপরে টিকটিক করতে থাকা বাতাস আমাকে বলেছে— এরপর মৃত্যু অর্থহীন নয়... যেন কুঞ্জবন... আমি পুচ্ছ তুলে নাচতে শুরু করেছি... আর শুনেছি অলৌকিক হ্রেষাধ্বনি! কী বিষ জিভে, কী মিষ্টি বিষে... কী... আফসানাকে নিয়ে খালা বেড়াতে গেছে। আমি সন্তর্পণে সেই ব্যবস্থা করেছি। সমস্ত বাড়ি আমি নিখুঁত ছন্দে সাজিয়েছি... বারান্দায় রেখেছি চাঁপাফুল... আমার চিরতমসার প্রাণে ঢেউ লাগতে লাগতে সন্ধ্যা এসেছে, আশ্চর্য মদের নেশা! চিনতাম না তো ? সুবিশাল পাহাড় থেকে সুরার প্রস্রবন... আমি আনাড়ি সাকী... হে রাজকুমার অলৌকিক স্বপ্নবাজ... কোন অভিব্যক্তির তরঙ্গে তোমাকে ভাসিয়ে নিলে তোমার মনে হবে, এ সম্পূর্ণ নতুন ? এ তুমি আর কখনোই দেখ নি ? কী সেই ভাষা ? কী সেই শব্দ ? কী সেই সূক্ষ্ম অনুভূতির গাঢ়তা ? আমি যে প্রবল তাড়নার কাছে আমার সব নিজস্বতা হারিয়ে বসে আছি।

আমি ভুলে গেছি, শায়েদ আজকাল সুলেখার ভেতর জীবনের আশ্রয় খুঁজছে, আমি সন্তর্পণে ওকে সুলেখার জীবনে যাওয়ার পথ করে দিয়েছি। এরপর রাত্তির।

খুব গাঢ় করে চাঁদটা উঠল।

আমার উন্মীলিত কান বাতাসের শব্দেও চমকে উঠছে— এই বুঝি তিনি এলেন।

প্রহর যায়।

প্রহর যায়।

আমার নিঃশ্বাসের ওপর চেপে বসে আমার আস্ত জীবনটা। হি হি শব্দে হাসতে থাকে রাতের প্রবল প্রেত চাঁদ। ধীরে ধীরে রাত বাড়তে থাকে।

বারান্দায় আলুথালু পড়ে থাকে আমার হিম নিশ্চল দেহ।

রঞ্জন আসে না।

পুড়ে যাওয়া গার্মেন্টসে এসে ছবি তুলছিল ফটোগ্রাফাররা। ছিন্নবিচ্ছিন্ন লাশ পড়েছিল এখানে ওখানে। একজনের মুণ্ডুর সাথে গেঁথে গিয়েছিল আরেকজনের হাত। খণ্ড খণ্ড পোড়া মাংস মেঝেতে, মেশিনের সাথে লটকে পটকে ছিল। সেইসব মাংসখণ্ড জড়ো করে ভরা হচ্ছিল বিভিন্ন বস্তায়। এই সবই আমার শায়লার কাছ থেকে শোনা। চিৎকার করে কাঁদছিল সে, বুবু, তুমি যদি দেখতা, একটা বস্তার মধ্যে হয়তো ঢোকানো হইল সাড়ে তিনজন মানুষ, কোনোখানে পৌনে চাইরজন; এরা আর মানুষ আছিল না। অফিসের শব্দ আমার কানে ঢোকে না। ডেথ সার্টিফিকেটটা দেখে আমার কাছে সেই রাতের সেই ভয়াবহ জ্যোৎস্নাটার কথা মনে পড়ে। পূর্ণিমা শব্দের মোহে থেকে আমি ভুলতে বসেছিলাম। আমি এই সার্টিফিকেট নিয়ে অনেক দৌড়েছি। মালিকদের কাছে সেসব পৌঁছে দিয়ে মৃতদের আত্মীয়দের বলেছি এর পেছনে লেগে থাকতে। কোন একটা তারপরও রয়ে গেছে আমার ব্যাগে। একটি ধবধবে অফিসের কর্মব্যস্ততার মধ্যে সেই সার্টিফিকেট আমার মধ্যে এমন এক বোধ এনে দেয়, যেন অকস্মাৎ শূন্য থেকে একটি প্রকাণ্ড লাশ আমার ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল। আমি মাথা তুলতে পারি না, নিজেকে নাড়াতে পারি না, চেয়ারের সাথে এক অনড় মূর্তির মতো গেঁথে যেতে থাকি। আমি নিজেকে আরো কঠিন শাস্তি দেয়ার জন্য স্মরণ করাই— তুমি একটি ফিচার লিখতে চেয়েছিলে। এইখানেও তুমি নিজেকে ফাঁকি দিয়েছ। যারা শুধু ভাবে, করে না, তুমি তাদের দলে চলে গেছ। এবং তারপরই অনুভব করি, আমার সর্বাঙ্গে ঝিঁ ঝিঁ ধরে গেছে, মাথার কোষগুলো ধোঁয়াশে হয়ে আসছে... সেই ধোঁয়ার মধ্যে ধেয়ে আসে এক প্রগাঢ় পূর্ণিমার রাত্তির, যে রাত্তিরে মাংস খসে যাওয়া এক দঙ্গল লাশ দড়ির মধ্যে দোল খেতে খেতে হি হি শব্দে হেসে উঠছে।

রঞ্জন আমাকে পরদিন ফোনে বলেছে, ওর স্ত্রীর শরীর সেদিন খুব খারাপ করেছিল। সেদিন তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হয়েছে। সে নিজেও খুব বিমর্ষ ছিল। শেষে বলেছে, সম্পর্কটাকে তাৎক্ষণিকভাবে নেয়ার কিছু নেই, মানুষের সম্পর্ক তৈরি হওয়ার জন্যও একটা ভিত্তি দরকার। আমাদের নিজেদের জানার বোঝার বিষয়টাও এক্ষেত্রে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। পরস্পরকে বোঝা, মায়া মমতা এসবের ওপরই একটা সম্পর্ক দাঁড়ায়। নিশ্চয়ই সামনে এমন দিন আসবে যে, দিনটা এসবকে ভিত্তি করেই সুন্দর হয়ে উঠবে।

ওর যুক্তি অগ্রাহ্য করা কঠিন।

কিন্তু নিরন্তর যে বাস আমার ক্লিশিত বাস্তবতার সাথে, সে স্পর্শ করতে চেয়েছিল অলৌকিকতাকে, সে বাস্তব নয়, স্বপ্নের স্পর্শের মধ্যে নিজের নিরন্তর বিক্ষত অস্তিত্বকে হারাতে চেয়েছিল। আমি জানি না, রঞ্জন যে ব্যাপক পৃথিবীর যুক্তিতে বিষয়টিকে বড় একটি জায়গায় নিয়ে দাঁড় করাতে চাইছে, আমাদের ভবিষ্যত বাস্তবতা এক্ষেত্রে কতটুকু সহায়ক হবে। কিন্তু মানুষের জ্বলে ওঠা বিষয়টা মুহূর্তের, সেই মুহূর্তকে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে জীবন প্রদীপ

হয়তো জ্বালানো যায়, সেই প্রদীপের আলোয় সারা জীবনের পথে হাঁটা যায়, কিন্তু ওই যে জ্বলে ওঠা, না নেভালে ওই মুহূর্তের ঘটনা মানুষের জীবনে দুর্লভ। সেই দুর্লভ সময়টির লোভ হয়তো সবার মধ্যে একভাবে কাজ করে না।

আমি রঞ্জনের বাস্তবতা, সততাকে গ্রাহ্য করেই অনুভব করছি, অন্তত সেই পূর্ণিমার রাতে আমি সায়রাবুর কাছে হারানো নীল পাথরের মতন আমার এমন রোমাঞ্চময় স্বপ্ন হারিয়েছি, যা অঢেল সম্পদেও পূর্ণ হওয়ার নয়। রঞ্জন হয়তো স্বপ্ন হতে চায় নি, জীবনের সাথে গাঁথতে চায় নি কোনো বুদবুদকে, কিন্তু হায়! বাস্তবতার দূরত্ব কে ঘোচাবে?

আমার এই জীবনে কাঙ্ক্ষাই যে ছিল, এক মুহূর্তের জন্য হলেও স্বপ্ন স্পর্শের কাছে নিজের সমস্ত বাঁধ খুলে দেয়া। যন্ত্রণায় পুড়তে পুড়তে আমার একসময় লজ্জা হতে থাকে— আশ্চর্য! আমি প্রবল এক ঘোরে পড়ে অনির্বচনীয় স্বপ্নে মুড়িয়ে দুটি নরনারীর স্পর্শের বিষয়কে অলৌকিক এক রূপ দিয়েছিলাম। রঞ্জন সেদিন না এসে, আমাকে এক বায়বীয় শূন্যতা থেকে সজোরে মাটিতে আছড়ে ফেলে দেখিয়েছে, বিষয়টি দুটি মনের সমন্বয়ে রচিত শারীরিক সম্পর্কের স্বাভাবিক আকুতি ছাড়া আর কিছু না, যা পৃথিবীর কোটি কোটি নরনারীর মধ্যে ঘটছে। হেঃ! মোহ মানুষকে এমন অন্ধ করে দেয়, যে সম্পর্ক ওর স্ত্রীর সাথে ওর রাত্তিরের বিছানার, যে সম্পর্ক শায়েদের সাথে আমার... তার মধ্যে কল্পিত স্বপ্ন চাপিয়ে... আহা! দৈহিক সম্পর্কই তো, না কি? যা প্রেমে গভীর হয়, অভ্যাসে মায়ার হয়, প্রেমহীনতায় শরীরের হয়— এই তো? কী আর হতো? গভীর হতো? অথবা মোহে স্ফুলিঙ্গের হতো? আমি সেই স্বাভাবিকতার মধ্যে মৃত্যুর মতো তৃষ্ণা চাপিয়ে... স্বপ্ন চাপিয়ে— আমার চোখ ভিজে উঠতে থাকে— বিষয়টাকে কী শ্বাসরুদ্ধকরই না করে তুলেছিলাম!

কিন্তু আমার যে জন্মই হয়েছে, জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে বিবেচনা দিয়ে বাস্তবতাকে মেনে নেয়া, গ্রহণ করা। চূড়ান্ত স্বপ্নের জায়গাটাতেও এসে আমাকে সেই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। একদিন রঞ্জন আমাকে ফোন করে খুব জরুরি গলায় বাইরে বেরোতে বলে। আমি বেরোই। সন্ধ্যায় ওর হিমহিম গাড়িতে চড়ে আমরা একটা বাগান বিলাসফুল বাড়ির সামনে দাঁড়াই। আমার সর্ব অস্তিত্ব নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে। আমার মাথায় কিচ্ছু কাজ করে না। কোনো কৌতূহলে না, কোনো আবেগ না। গেট পেরিয়ে একটি আধোছায়া বাড়িতে ঢুকি। ড্রয়িং রুম, নানা ছবি, রাজ্যির বই পেরিয়ে ওর 'এসো' আহ্বানে ভেতরে যাই। এই ঘরে অন্ধকার।

বাইরে থেকে আসা একফালি আলো ঘরের পেটটাকে দ্বিখণ্ডিত করেছে। আমি অনড় মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে পড়ি। রঞ্জন বাতি জ্বালায়। ভুতুড়ে ঘরটা সেই আলোর শব্দে চমকে ওঠে এবং আমার স্নায়ু কাঁপিয়ে কেউ চিৎকার করে ওঠে— আহ্, বাতি বন্ধ কর।

হুইল চেয়ারে বসে আছে একজন নারী। চুল আলুথালু। নিরাভরণ। ফর্শা চামড়ার নিচে ঠেসে আছে পাণ্ডুর দুটি চোখ। আমাকে রঞ্জন ধীর কণ্ঠে বলে— আমার স্ত্রী।

আমি হকচকিয়ে নড়ে উঠি।

রঞ্জন নিঃশব্দে সেই মহিলার হাত মুঠো করে ধরে বলে, ও নীলুফার। ছেলেবেলায় আমরা এক শহরেই ছিলাম। আজ ও আমার অফিসে এলো, তোমার সাথে পরিচয় করাতে নিয়ে এলাম।

মহিলা আশ্চর্য সন্দেহাতুর চোখে আমার দিকে তাকায়। এরপর সশব্দে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। রঞ্জন প্রগাঢ় মমতায় আরো ঝুঁকে পড়ে ওর দিকে— ও তোমাকে দেখতে এসেছে, কথা বলো!

মহিলা কঠিন কণ্ঠে বলে, বাতি বন্ধ কর। তুমি জানো না, আমি আলো সহ্য করতে পারি না?

আমি পেছন হটতে থাকি। রঞ্জন দাঁড়ায়, নীলুফার, তুমি একটু বিছানায় গিয়ে বসো, আমি চা বানিয়ে নিয়ে আসি। ও চলে গেলে নির্জন কক্ষে মহিলাটিকে আমার ডাইনী বলে ভ্রম হতে থাকে। মনে হয় এক্ষণি ওর পঙ্গু পা দুটি হয়ে উঠবে ভয়ানক দুটি সাঁড়াশি এবং তা আমার কণ্ঠ রোধ করবে।

আমার যে প্রাণ গেঁথে আছে পেরেকের তলায় আমি সেখান থেকে কি করে নিজেকে নামাই? কিন্তু প্রচণ্ড নির্জন কক্ষে অকস্মাৎ জল। আশ্চর্য! মহিলা কাঁদতে শুরু করেছে।

এইবার আমি উবু হয়ে ওর মুঠো চেপে ধরি, এরপর নিজেকে ফিসফিস শোনাই, অনেক হয়েছে, আর না নীলুফার! আর না।

এইসব কন্টক শ্যাওলা খসিয়ে একসময় আমি আমার জীবনের মূল বাস্তবতার মধ্যে নিজেকে থিতু করতে চাই। মাঝখানে শায়লার গার্মেন্টসে সংকট, আমার নিজের এক চাকরি ছেড়ে আরেক চাকরিতে বিন্যস্ত হওয়ার মাঝের সময়টার অর্থনৈতিক সংকটকে আমরা ঋণ করে, জোড়াপট্টি দিয়ে অতিক্রম করে এসেছি। এখনো সেই সময়ের ঘানি টানতে হচ্ছে। ফলে, জীবনের এই বাস্তবতায় এসে, এই মর্মে সিদ্ধান্তে আসা যায়, আমার মাথার ওপরের ভগবান হলো আমার এই চাকরি। আমার সামনে পেছনে আর কোনো স্বপ্ন বা অন্ধকারের কোনো স্থান নেই। আমি সেটার মধ্যেই নিজেকে প্রাণপণে গুঁজে দিতে চাই। কিন্তু ওই যে অপদেবতা, আর কাঠের ফ্রেমে আমাকে আটকে রাখা বিষ পেরেক, যা আমাকে আমার মতো বিন্যস্ত হতে দেয় না, তার অভিশাপেই আমাকে পড়তে হয় এমন ভয়ানক রোমহর্ষক অবস্থায়, যার জন্য আমার মধ্যে ন্যূনতম প্রস্তুতি পর্যন্ত থাকে না।

ধুর! নিয়তিবাদে বিশ্বাস করে কল্পনাবিলাসীরা, পলায়নবাদীরা। না, জীবন আমাকে এতটা ঠকায় নি— আমি এসব গাঢ় কৃষ্ণ অলৌকিক বিষয়ের মধ্যে নিজেকে কষে বেঁধে অনন্তবিলাপ গাইব। বরং এ মেনে নেয়া সহজ, আমার জীবনে যা স্বাভাবিক, তারই মুখোমুখি বারবার আমাকে হতে হচ্ছে। মুহূর্তের সুখের বিলাসে যা আমি ভুলতে চাই, তা-ই আমাকে প্রবল ঘা দিয়ে দেখাচ্ছে— তোমার মূল জায়গা তো এটা নয়। আমার এক গর্ভবতী বান্ধবী তার সন্তান প্রসবের যন্ত্রণাকর অবস্থাটা আমার সামনে তুলে ধরেছিল এইভাবে— নীলু, পেটে নয়, কোমরের ভাঁজটাতে বেদনাটা এমনভাবে ঘা দিত, মনে হতো কেউ মাটির মধ্যে বল্লম ঢুকিয়ে দিয়েছে... বুঝলি, মুহূর্তকাল, পরমূহূর্তে বল্লমটা তুলে নিলে এমন ঘুম নামত চোখে... কিন্তু পরক্ষণেই ফের বল্লমের ঘায়ে মরণকান্নায় জেগে উঠতাম, ভোররাত পর্যন্ত আমার এই ছিল রক্ত আর ঘুমের খেলা। স্বপ্নের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে ডুবে যাওয়াটা আমার সেই প্রসব বেদনায় কাতর সেই বান্ধবীর ঘুম আসার মুহূর্তগুলোর মতো। আমার সেই বিষয়টি মনে পড়ায় ধূ ধূ জনবহুল রাস্তায় এমন তুমুল হাসি পায়, আমি নিজের ভাগ্যকে নিয়ে সেই ঠাট্টায়

মেতে উঠি— একদা এক কোমল বয়সে যে ঠাট্টার ওপর আমার জমেছিল সীমাহীন ভয়, অজস্র কান্না।

সন্ধ্যার রাস্তার ট্রাফিক জ্যামে আটকে আছে রিকশা। পাশের রিকশায় মোবাইল ফোনে কথা বলছে একজন লুঙ্গি পরা লোক। তিনজন মেয়ে এক রিকশায় বসে বিরক্তির বদলে প্রচণ্ড হাসিতে মেতে উঠেছে। আর যার যার গাড়িতে মানুষের নানা মুখ থিতু হয়ে আছে এক রঙে— অসন্তোষ। আমি গভীর পর্যবেক্ষণে মানুষের মুখগুলো দেখতে দেখতে ভাবার চেষ্টা করি, ঠিক কতদিন আগে আমি কিছু মুহূর্তের জন্য হলেও সব ভুলে সহজ হাসিতে মেতে উঠেছিলাম... কাপড়ের খুঁট ধরে টানতে থাকি... প্রান্ত খুঁজে পাই না, আমার নিজের প্রতি মায়া হওয়ার সময়টাতেই ঝটিতে ভেসে আসে একটি দৃশ্য। একটি ঘাস প্রান্তরে আমি হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ দেখি, যেখানে আমার পা পড়ছে সেই ঘাসের তলায় মিশে থাকা খুদে প্রজাপতি গুলো চমকে ঝাঁক ঝাঁক করে লাফিয়ে উঠছে। বিষয়টি লক্ষ করে আমার শিশুর মতো আনন্দ আর ধরে না, আমি দেখি... ঘাস ঘাস... আর কিসসু নেই... কিন্তু নাচের ভঙ্গিতে আলতো ছুটে যে-ই পা রাখি... তল থেকে ফরফর শব্দে ভেসে ওঠে প্রজাপতি... তারা আমাকে ঘিরে পাক খেয়ে ফের ঘাসের তলায় ডুবে যায়... নিজেকে ওদের মাঝখানে আমার পরী মনে হয়েছিল।

রিকশা চলতে শুরু করেছে।

মনে পড়ে সেই নির্মম ঠাট্টা... এপ্রিল মাসের এক তারিখ ছিল, আমি আমাদের প্রতিবেশী এক হতদরিদ্র নানার বাড়িতে সাজানো বাটিতে বালু ভরে নিয়ে গিয়ে বলেছিলাম, নানা, পোলাও নিয়া আইছি।

ছিন্নঘরের ভেতরে ছিল তাঁর অসুস্থ বৃদ্ধা স্ত্রী... নানার মুখ করুণ সুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, ভেতরে স্ত্রীকে ডেকে তিনি বিহ্বল স্বরে বলেছিলেন— ওগো, শুনছ... পোলাও আনছে ওরা, পোলাও... দেখ তো কী কাণ্ড!

সন্ধ্যার রাস্তায় আমার চোখ ভিজে আসে।

এরপর আমার জীবনে পর পর কয়েকটি ঘটনা ঘটে। মানুষের জীবনে নাকি তুফান আসে... আমি ঠিক জানি না, তার রূপটা কী, কতটা প্রকট তার চেহারা... তবে ইদানীং আমি বিশ্বাস করতে শুরু করেছি, আমার মরুদ্যানে এসে সেই বাতাস পুড়ে যাবে। একাকী ঘরে হাঁটতে হাঁটতে আমি সারারাতের নির্জন বিছানা দেখি। আর পরিমাপ করতে চেষ্টা করি, একটি ক্ষুদে বিছানার মধ্যে দু'জন মানুষকে দিনের পর দিন দুটো ভিন্ন পৃথিবীর মধ্যে রাখতে পারে, এতটা দূরত্ব তৈরি করার ক্ষমতা রাখে যে বিছানা, তার শক্তি কতটা প্রখর।

এক সপ্তাহ আগে শায়লা বিয়ে করে এ-বাড়ি থেকে চলে গেছে। সেই রাতে খোঁপায় ফুল জড়িয়ে এমন একটা ছেলেকে আমাদের বাসায় নিয়ে আসে, যাকে আমি কোনোদিন দেখি নি। এর চাইতেও বড় কথা, এর সম্পর্কে ছিটেফোঁটাও আমি শায়লার কাছে কোনোদিন শুনি নি।

শায়লা আমাকে হাসতে হাসতে বলে— বুবু, আনোয়ার, আমার বর, আজই আমরা বিয়ে করলাম। ফ্লাগ্নিং প্রিন্টিংয়ের কাজ করে, আমাদের অফিসের প্যাড, ভিজিটিং কার্ড ছাপত, সেই সূত্রেই... কেমন সারপ্রাইজ দিলাম বলো?

হাবাগোবা চেহারার ছেলেটা আমার পায়ের দিকে হতচকিত হাত বাড়ালে... আমি নিজের স্থবির হয়ে আসা দেহটাকে সজোরে ঝাঁকুনি দেই... সে-কী! না, না, সালাম লাগবে না...। কী কাণ্ড!

আমার সেই প্রতিবেশী নানাও বলেছিলেন... কাণ্ড! আচমকা সেই শব্দটাই হি হি ঠাট্টার মধ্যে আমার কান স্তব্ধ করে দেয়। পেছনে হু হু শব্দে খালা কেঁদে উঠেছেন। আর আমি নিজেকে বিন্যস্ত করে শায়লাকে জড়িয়ে ধরি— এত চমৎকার! এত অসম্ভব সারপ্রাইজ তুই দিতে পারস শায়লা... একেবারে তাক লাগায়া দিলি... ধুর, বারান্দায় দাঁড়ায়া এইসব কি বলতেছি... ভিতরে আয়।

এর ক'দিন পরই আফসানার প্রচণ্ড জ্বর ওঠে। এত বেদম জ্বর, আমি ওকে জলে চুবিয়ে, গা স্পর্শ করেও সেই জ্বর নামাতে পারি না। জ্বরের ঘোরে ও খিঁচুনি দিয়ে দিয়ে শুধু মাকে ডাকে, মা, আমার কেউ নাই, আমারে তুমি লইয়া যাও। ওর পাণ্ডুর অগ্নিদেহ নিজের বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে অনেকদিন পর হু হু শব্দে কাঁদি, আমি আছি সোনা, আমি আছি। ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসিয়ে আমি দেখি, সামনে ছায়াগোল কণিকার আবর্তন... শুকনো ঠোঁট জিভ দিয়ে ঘষে সে যেন আমার বুকে ছুরির ঘা দিয়ে দিয়ে রক্ত তোলে... মা! মা!

মা'র মৃত্যুবার্ষিকী চলে গেছে নিঃশব্দে। আমি সেদিন, খুব ভোরে শীতে কাঁপতে কাঁপতে একদম একা চলে গিয়েছিলাম তাঁর কবরের কাছে, তাঁর হারিয়ে যাওয়া কবরের পাশে আগর বাতি জ্বালিয়ে নিঃশব্দে বসেছিলাম অনেকক্ষণ! কান্নাটা শব্দে রূপ নেওয়ার আগেই অবসন্ন দেহ টানতে টানতে বাসায় চলে এসেছিলাম। এরপর নিজেকে গুছিয়ে অফিস যাওয়ার মুহূর্তটায় কপালে টিপ দেয়ার জন্য আয়নার কাছে যেতেই... হ্যাঁ, এইরকম ছায়াবল কণিকা, আর সেই রাতে রাস্তা থেকে দেখা বাতি জ্বলা বাড়িটা, যেখানে মা'র লাশ শায়িত ছিল... আমার চোখের সামনেটা আঁধার করে দিয়েছিল।

আফসানা খাতুন... কম্পাউন্ডারের এই ডাকে সংবিৎ ফিরে পাই। হাতড়ে ঘেঁটে ছায়া কণিকা সরাতে সরাতে ওর মাথাটা আমার ঘাড়ের মধ্যে ফেলে ভেতরে যাই।

সামনের টেবিলের ওপারে ফিটফাট মাঝবয়সী ডাক্তার। বৃত্তান্ত শুনে পর্দা টানা বিছানায় ওকে শুইয়ে নানা রকম দেখে শুনে একগাদা টেস্ট দিয়ে একটি নির্দিষ্ট ল্যাবরেটরির নাম বলে বলেন, ওখানে সব টেস্ট করিয়ে কাল রিপোর্ট নিয়ে আসবেন। আমি একেবারে ভেঙে পড়া কণ্ঠে বলি— মাঝে মাঝেই জ্বর ওঠে। খারাপ কিছু না তো ?

ডাক্তার নিস্তরঙ্গ স্বরে বলেন, রিপোর্ট না দেখে কী করে বলি বলুন, কিন্তু লক্ষণে মনে হচ্ছে ভাইরাসই... দুর্বল শরীর, তাই সহজে ধরে ফেলছে।

একটি আশ্চর্য যন্ত্রের মতো অফিসের কাজগুলো নিখুঁতভাবে করি... আর করি আত্মোপসনা, তুমি ছাড়া তোমার কেউ নেই... কেউ নেই... স্যার, বিকেল পাঁচটায় মিস্টার খান আসবেন অফিসে... জি... জি... আচ্ছা, কী দিয়ে যেন শুরু হতে চেয়েছিল নারী শ্রমিকদের নিয়ে তৈরি করা ফিচারের ভাষা ? ছাপা লিফলেট ওড়ে— "তোমার শ্রমের সাথে তোমার স্বপ্নের এবং তোমার স্বপ্নের সাথে তোমার বিজ্ঞানের মিলন কোথায় ?"

জি স্যার, ড্রাফ্ট তৈরি করেছি, এক্ষণি কম্পোজ হয়ে আসছে... নীলু ধরে নাও... আফসানা মরে যাবে, যেহেতু বহুদিন বাঁচতে হবে, সেইহেতু যাতে প্রাণটা দু'ফালি না হয়ে যায়, নিজের মধ্যে সেই প্রস্তুতি রাখো... বাঁধ দাও...।

দাঁড়িয়ে পড়ি, স্বয়ং এম.ডি-র ফোন।

তাঁর শীতাতপ কক্ষে ঢুকে আশঙ্কায় কাঁপতে থাকি। সমস্ত পৃথিবী ভেঙে পড়ুক আমার মাথার ওপর, ভয় নেই। পৃথিবীর সব ভয় থিতু হয়েছে এক স্থানে— এই চাকরিটা।

এবং একসময়, যেমন দুর্বল শরীরে সহজেই গ্রাস করে অসুখ... অন্তত চিকিৎসক তা-ই বলে, এই চাকরিটাকে কেন্দ্র করে এমন এক রোমহর্ষক অসুস্থ বাস্তবতার সামনে আমাকে পড়তে হয়, অন্তত চাকরির জীবনে মানুষকে যত সংকটেই পড়তে হোক, এই রকম বিচিত্র বাস্তবতার মুখোমুখি আমি ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনো মানুষকে পড়তে হয়েছে কি-না সন্দেহ। অবশ্য পৃথিবী জুড়ে বুদ্ধিমানেরাই তো তৈরি করছে পৈশাচিক নারকীয়তাকেও আরো নারকীয়, আরো হিংস্র হিসেবে তৈরি করার শিল্পমণ্ডিত পথ, তো, আর কী... সব দেখে শুনে... কানে তুলো দাও, চোখে বসাও গ্লাসপুঁতি... আর স্নায়ুর মধ্যে গেঁথে দাও বিন্দু বিন্দু সীসা। রেজোয়ানার সূত্রে ইতোমধ্যে জেনে গেছি, ভেতরের নিভৃত কাণ্ড! চাকরি ছেড়ে চলে গেছে সে। পায়ের তলায় মাটি আছে, আপোস করার দুঃসহতা থেকে মুক্তি পাওয়ার ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে। সুলেখা আমাকে ভরসা দিয়েছিল, অন্তত এইসব কুশ্রীতার শিকার আমাকে হতে হবে না। মানুষ চিনতে তার ভুল হয় নি। অন্তত কোনো নখ এখন পর্যন্ত আমার দেহ বিদ্ধ করে নি। কিন্তু, শীতাতপ কক্ষে ডেকে নিয়ে মিষ্টার জিন্নাত আলী কি কথা বলার জন্য যে অনেক বাংলা কথা খরচ করতে থাকেন, আমি অন্তত মাতৃভাষার এই সব শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ সহসা উদ্ধার করে উঠতে পারি না। নিজেকে তিনি অসুখী বলেন, বঞ্চিত বলেন, কত কষ্টে যুদ্ধ করতে করতে এই স্থানে এসে পৌঁছেছেন, সেসব বলেন— শুনতে শুনতে আমার অসাড় মাথা ভারি হয়ে আসতে থাকে, তিনি বলেন, মানুষের জীবনে ইন্দ্রিয়সুখ জরুরি, যারা কামনাকে মাথায় নিয়ে ঘুরে, তারা জীবনে বড় কিছু করতে পারে না— তা তো বটেই! তা তো বটেই... ভাবতে ভাবতে একসময় শুনি, উনি বলছেন আপনার সাহায্য আমার দরকার। আগে এই কাজটা রেজোয়ানা করত, সে যেহেতু চলে গেছে—।

এত বড় কোম্পানির মালিকের দরকার আমার সাহায্য? নিজেকে আঁচড় কেটে চিনতে চাই, উনি কি আমাকে নীলুফার চিনেই কথাগুলো বলছেন?

বিশাল কক্ষের এক পাশে সোফা।

দেয়ালে বিশাল ঘড়ি আর তৈলচিত্র।

ঘরের মাঝখানে পুরো কার্পেটের ওপর বসানো বৃহদাকায় কাগজপত্তর, পেপারওয়েট, হেনো তেনো দিয়ে সাজানো গ্লাস টেবিল। আমি বিমূঢ় মুখ তুলি। এইবার তিনি বাংলার সাথে কিঞ্চিৎ ইংরেজি মেশাতে বাধ্য হন, এবং ভিখিরির কাছে আমরা মাফটা যেমন ধমক দিয়ে চাই, তেমনই নির্দেশের ছদ্মবেশে তিনি আমার কাছে এক অভিনব কায়দায় সাহায্য প্রার্থনা করেন।

আফসানার মাথায় জলপট্টি দিতে দিতে আমার অনুভব হয়, ওর গায়ের পুরো জ্বরটা আমার রক্তস্রোতের মধ্যে চলে আসছে। কাঁপতে কাঁপতে আমি বারান্দায় গিয়ে ওয়াক শব্দে বমি উগড়ে দিই। না, আফসানার টেস্ট করি নি। খোঁজ নিয়ে জেনেছি, সবসহ খরচ হবে পাঁচ হাজার টাকা। শায়লা চলে গেছে। এই বাড়িটা একা বহন করার ক্ষমতা আমার নেই। ছেলেবেলায় এমন বহু জ্বর হয়েছে আমাদের, টেস্ট ছাড়াই আমরা ভালো হয়েছি। এখন কি করে এই বাস্তবতা পেরোনো যায় সেটা জরুরি। দুর্মর জেদে বারান্দা থেকে নিজেকে তুলে এনে ফের আফসানার কপালে আমি জলপট্টি দিই, দেখি ওর গায়ের তাপ আমার ঠাণ্ডা জলের সাথে কতক্ষণ লড়তে পারে? খালা বিছানার কাছে মোড়া টেনে বসে আমার বাঁ হাত চেপে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন, আচারের ব্যবসাতেও তো সুবিধা করতে পারলাম না, অন্তত আমি আমার পথ দেখি, একজন মানুষের খরচ তো কমল।

আমি অগ্নিচোখে তাকাই— তুমি আর বাদ থাক ক্যান, যাও। আল্লায় নিশ্চয়ই মড়া পাহারা দিবার জন্য দুনিয়াতে তোমারে পাঠায় নাই।

নীলুফার! এই পর্যন্তই উচ্চারণ করতে পারেন তিনি, বাকি শব্দ কান্নার তলায় ডুবে যায়।

খালা, আমার সমস্যা কি জানো, জীবনে এমন কোনো শব্দ নাই, যা আমার স্মৃতির মধ্যে থাকে না। মানুষের খালা কিছু জিনিস ভুলতে হয়, সেই খালি জায়গায় আইসা বসে নতুন বিষয়, নতুন শব্দ। মড়া যদি না পচত একটা কবরের উপরে আরেকটা কবর মানুষ কি কইরা দিত? আমার সমস্যাই সেইটা, মড়া পচে না, কিন্তু উপরে কবর ঠিকই হয়। গার্মেন্টিস এর চাকরি ছাইড়া আমি তুমার কাছে আশ্রয় না পাইলে কেমনে বি.এ পাশ করতাম? জীবনে স্বার্থ ছাড়া কেউ আমার জন্য একটা মিনিটও খরচ করে নাই। আমি তোমার কে আছিলাম? তুমি...।

নীলুফার! থাম্! থাম্! আমি কিস্‌সু জানি না, আফসানারে তুই বাঁচা।

আমাকে ডানাঅলা ঘোড়ার স্বপ্ন দেখিয়ে এক লোক মৃত্যুর মতো যন্ত্রণা দিয়ে ভোগ করেছিল। একটা ঘোড়ার ছবি সামনে রেখে আমি সেই ঘিনঘিনে বাস্তবতাকে জীবনের জন্য নিজের কাছ থেকে আড়াল করে রেখেছিলাম। জীবনের প্রথম শেখা যন্ত্রণা কত বিকট হতে পারে। আমি সেটাকে জীবনের যন্ত্রণাসহ্যের পাঠ হিসেবে নিয়েছিলাম। যে মেয়ে এইসব অভিজ্ঞতা পেরিয়েছে, তার এ জাতীয় ঘটনায় নতুন করে বমি করে দেয়ার কি আছে? কিন্তু পরিস্থিতির মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কিছু ছিল, দুপুরে আমার সামনে যা ঘটল, তা আমার মনুষ্য সত্তাকে প্রচণ্ড অপমান করেছে। এর চেয়ে পরিস্থিতির মূল শিকার যদি আমি নিজে হতাম, তা হয়তো অনেক স্বাভাবিক হতো। কী তুখোড় বুদ্ধিদীপ্ত, শিল্পমণ্ডিত মানুষের কায়দা। রেজোয়ানার মতো প্রথম কিছুদিন অফিসে আমার সতী ইমেজ প্রতিষ্ঠিত করা হলো। এরপর জিন্নাত আলীর সাথে সম্পর্কিত নারীদের একজনকে ডাকা হলো তাঁর রুমে। তিনি বললেন— জরুরি মিটিং আছে। রুমে আমরা তিনজন, ফলে বাইরে থেকে কারো সন্দেহ করার কিছু থাকে না। জিন্নাত আলী নিশ্চিন্তে ছিটকিনি আটকে দেন। কি ঘটতে যাচ্ছে সহসা বুঝতে না পেরে আমি দম নিতে ভুলে যাই। এরপরই, টেবিলের ওপাশটার কার্পেটের ওপর মেয়েটাকে শুইয়ে... মাঝখানে শুধু একটা চেয়ার টেবিলের আড়াল, ঘৃণায়, যন্ত্রণায়, লজ্জায় আমার নিচু

মাথা এমনভাবে গ্লাস টেবিলে আটকে যায়, বেশকিছু সময় আমার নিজেকে শায়লার বর্ণিত সেই পোড়া লাশগুলো মনে হতে থাকে, মেশিনের সাথে যাদের শরীর গেঁথে গিয়েছিল।

আমার হাতের তীব্র চাপে ছটফট করতে করতে আফসানা উঠে বসে, তার জ্বরতপ্ত মুখ আমার আগুন চোখ দেখে কেমন ভীত হয়ে উঠে, গা ঘষটে ঘষটে সে অসহায়ের মতো পিছু হটতে থাকে, বুবু তোমার কী হইছে? কী হইছে?

নিজের ভয়ে আমি ছিটকে বাইরের রুমে এসে দাঁড়াই। হাঁপাতে হাঁপাতে দেখি, দেয়ালের মধ্যে এমন একটা মানুষ কাঁপছে, যার রক্ত নেই, মাংস নেই, প্রাণ নেই, তার পুরো অবয়ব একটি মাত্র রঙে কেন্দ্রীভূত... কালো, তাও গভীর কালো নয়, ছাইয়ের মতো রঙ, আমি আচ্ছন্নের মতো এগিয়ে যাই— কে?

যেন নিজের আসল প্রতিবিম্ব দেখে ফেলছি, যেন ওটা ছায়া নয়, পুড়ে যাওয়া অনেক অনেক লাশের একজন, আমার ভয় প্রলম্বিত হয়ে আমাকে ফের বিদ্ধ করতে থাকলে বাতি বারান্দায় এসে দাঁড়াই। ওহ্ খালা, খালি বারান্দায় বাতি জ্বলে ক্যান— এই হিসেবের মধ্যে নিজেকে ঢোকাতে গিয়ে টের পাই ঝাঁঝালো হয়ে উঠছে কণ্ঠ— মাসে মাসে খালা তোমারে তো বিল গুনতে হয় না, তুমি কী বুঝবা? বাতি নিভিয়ে রেলিং খামচে দাঁড়াই।

সামনে সুলেখার বাড়ি।

বুড়ি ডাইনী... অতৃপ্ত আত্মা... বিড়বিড় করি, রহস্য না ছাই, যত ভড়ং, একজন যুবককে একবেলা পেয়েই থলের মধ্যে ভরে ফেলেছে, বদলে আমাকে ঘুষ, তুমি তোমার নাগরকে আমাকে দাও, আমি তোমাকে ভাত দিচ্ছি, চাকরি দিয়ে মহানুভবতা! ঘোড়ার ডিম! তোমাদের আমি রক্তে রক্তে চিনি!

আঃ? কী সব ভাবছি আমি। নিজের ভারে ক্রমশ বসে পড়তে থাকি, তুমিই আরো অধিক স্বপ্নের লোভে বাস্তবতাকে পায়ে ঠেলেছিলে নীলু, ওই লোভের খেসারত তোমাকে পলে পলে দিতে হবে!

টেবিলের ওপাশে হিসহিসে শীৎকারধ্বনি— আঃ! মাগো! আমি মাটি খুঁজে পাচ্ছি না, কোথায় দাঁড়াই বলো তো!

একদিন রাতে শায়েদ আসে। ইতোমধ্যে একটাই স্বস্তি, আফসানার জ্বর সেরে গেছে। এক বিকেলে অফিস থেকে ফিরে আমি ওকে নিয়ে বাইরে যাই, বর্তমান অবস্থায় বিষয়টা সাধ্যের বাইরে গেলেও রিকশায় করে ওকে নিয়ে ঘুরি। ক্রিসেন্ট লেকের পাশের হলুদাভ আলোর নিচে ওর পাণ্ডুর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে— বুবু তুমি ভালো। খুব ভালো।

চাকরিতে এসে এরকম পরিস্থিতিতে পড়ার আগ পর্যন্ত আমার অনেকবার মনে হয়েছে, শায়েদের কাছে যাই। ওর বর্তমান পরিস্থিতিটা বুঝে আসার চেষ্টা করি। প্রেম না হয় পুনঃনির্মিত হয় না, কিন্তু জীবনে এক সাথে বাস করতে চাওয়ার সিদ্ধান্তে একটা বোঝাপড়ার চেষ্টা তো করেই দেখা যায়, যেহেতু এখন পর্যন্ত এতটা চরমস্থানে গিয়ে পৌঁছাই নি, সারাজীবন একা থাকার সিদ্ধান্ত নেব।

কিন্তু গিটে গিটে ছেঁকে ধরেছে আড়ষ্টতা। এখন আমার দশা তো সাঁতার না জানা মানুষের মতো, আমার নাকে মুখে জল, সামনের জীবন নিয়ে ভাবার সময় আমার কই।

আমি তেমন পরিস্থিতিতে দেখি শায়েদ নয়, যেন এক প্রতিবিম্ব, যেন এক ছায়া বসে আছে আমার সামনে।

তোমার শরীর খারাপ ?

ওর এই প্রশ্নে ভূতল থেকে উঠি, হেহ্!

হাসছ যে ?

হাসছি নাকি ? অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাই, আমার চেহারাটাই এমন, হাসিকে কান্না বলে ভ্রম হয়, কান্নাকে হাসি বলে ভ্রম হয়, আসলে কোনটা যে সত্যি—।

তাহলে কাঁদছ কেন, তাই বলো ?

হাসির কিছু না থাকলে কাঁদব না ?

নীলু হেঁয়ালী বাদ দাও, আমি তোমাকে একটা খবর জানাতে এসেছি, ফ্যানের বাতাসে এলোমেলো হয়ে উঠে শায়েদের চুল, আমি দেশের বাইরে চলে যাওয়ার ধান্দা করছি। ধান্দাই বলতে পার, বিষয়টা সততার সাথে হচ্ছে না।

নিশ্চয়ই সুলেখার মাধ্যমে ?

রূঢ় চোখে শায়েদ আমার দিকে তাকায়, তুমি ওর কাছে ঋণী, ওর সম্পর্কে খোঁচা দিয়ে কোনো কথা বলো না। আমিও ঋণী। ও আমাকে আস্থা দিয়েছে, মূল্য দিয়েছে, আর আমি ওকে দিয়েছি গুরুত্ব, চামড়ায় ভাঁজ পড়ে গেছে অনুভব করে সে সারাক্ষণ নিজেকে কাপড়ে মুড়িয়ে রাখত, ভেতরের বালিকা আর বাইরের প্রৌঢ়ার মধ্যে এই ছিল ওর মৃত্যুর মতো দ্বন্দ্ব। আমি চেষ্টা করেছি ওর দুটো সত্তার সমন্বয় ঘটাতে। আমি ওকে এই স্বস্তি দিয়েছি, প্রতিটি বয়সের একটি আলাদা সৌন্দর্য আছে।

এত কথা কেন বলছ ? আমি অসহিষ্ণু হয়ে উঠি। আমি ওঁর সম্পর্কে কোনো বাজে মন্তব্য করি নি। তুমি নিজে যদি খোঁচার ভয়ে বর্ম পরে এসে থাক, আমি সেখানে কী করতে পারি!

আমাদের কথোপকথন কোনো একটা সুস্থির জায়গায় দাঁড়ায় না। আমি নিস্পৃহ চোখে দেখি, একসময় সে উঠে যাচ্ছে, দরজার ছিটকিনিতে হাত দিচ্ছে, সিঁড়ির ওপাশে তার দেহটা মিলিয়ে যাচ্ছে।

প্রাণের প্রচণ্ড অস্থিরতার সময় যুক্তি সেই পণ্ডিতের কাজ করে যিনি ছাত্রদের বোধবুদ্ধির ধার না ধেরেই নিজেকে জাহির করে যান, অস্থিরতার সময় নিজেকে যুক্তি দিয়ে মুক্তির চেষ্টা করার চেষ্টার চাইতে এমনকি কলাগাছের সহজ পাতাগুলোর দিকে চেয়ে থাকা শ্রেয়— নীলু, তোমার যা বাস্তবতা তাতে এই কাজ করতে তুমি বাধ্য, নীলু তুমি জীবনে এর চাইতেও ঘৃণিত অবস্থা পেরিয়ে এসেছ— এইসব বলে বলে যখন টের পাচ্ছিলাম, মাথার ভার আরো বাড়ছে তখন অন্য অনুভব থেকে আমি নিজেকে নিজের মধ্যে থেকে বিযুক্ত করে এমন এক আমিতে পরিণত করি, যে কখনো প্যাথেডিন আক্রান্ত, কখনো জড়, যে সামনের দিকে চেয়ে থাকে, কিছু দেখে না। অফিসের এই বাড়তি দায়িত্ব পালনের সময় মূলত আমাকে এই ভূমিকা নিতে হয়, টেবিলের এই পাশে বসে আমি প্রায়শ নিজেকে অচেতন ভাবার চেষ্টা করি। কিন্তু প্রকৃতির ধরন বড় মারাত্মক, আমি টের পাই, এতে করে সবচেয়ে রক্তাক্ত হচ্ছে

আমার স্নায়ু। আমি সেখান থেকে বেরিয়ে অফিসের কাজে গণ্ডগোল করি, সেই অচেতনতা কখনো আমাকে বিপদজনক রাস্তায়ও গ্রাস করে।

তেমনই এক অবস্থায় আমি একদিন রিকশা থেকে ছিটকে রাস্তায় পড়ে যাই। আমার কানের কাছটা সশব্দে মাড়িয়ে একটা বাস চলে যায়। লোকজন ভিড় করে আমাকে টেনে তোলার সময় লজ্জায় আড়ষ্ট হওয়ার আগে খুঁজতে চেষ্টা করি, ঠিক কতক্ষণ আগে থেকে আমি চেতনারহিত ছিলাম?

বড় বিপদ থেকে অল্পের জন্য বেঁচে যাই। কিন্তু পায়ে আঘাত লাগায় ক'দিন খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয়। একদিন আমাদের ম্যানেজার ডিকটেট করে যাচ্ছেন, আমি লিখছি... হঠাৎ অনুভব করি কানের কাছে দুটি শরীর ঘর্ষণের হিস হিস শব্দ এসে আমাকে নিথর করে তুলছে। চারপাশ ছায়া হয়ে আসতে থাকলে আমার প্রচণ্ড ভয় লাগতে থাকে। আমার কম্পিত আঙুল বসের কোনো কথা শুনতে পায় না। ম্যানেজার ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলেন, নীলুফার! এরকম চলতে থাকলে আপনি তো চাকরি করতে পারবেন না!

নিজেকে টেনে তুলে আমি মনে মনে হাসি, এই অফিসে এখন আমার যে যোগ্যতা, আমার চাকরি কে খায়? কিন্তু পরক্ষণেই ভেঙে পড়ি, ফিসফিস কণ্ঠে বলি, স্যার, আমি মরে যাব। আমি নিজের সাথে আর পারছি না। আপনি আমাকে বাঁচান।

উজ্জ্বল ঘরটার মধ্যে মুহূর্তে ছায়া হয়ে আসে ম্যানেজারের মুখ। তিনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে ধীরে ধীরে আমার দিকে তাকান। আমি সব জানি, কিন্তু চাকরিটা যে আপনার খুব দরকার।

আমি কাঁপতে থাকি, এই অফিসে সবাই সব জানে স্যার, তবে আমার ভেতরে থাকার দরকার কী? আমি ঠিক বুঝছি না—।

আস্তে কথা বলুন। বস্ সতর্ক কণ্ঠে বলেন, ওপেন সিক্রেট শব্দের অর্থ জানেন? এটা অনেকটা তাই। সবাই সব জানে, কিন্তু আবার কেউ কিছু জানে না। শুধু অফিসের লোক তো মূল বিষয় না, বাইরের মানুষও তো আছে, সবার সামনে এটা হলো নিজেকে সিকিউর্ড রাখার এক জঘন্য পন্থা।

ভেতরে আসতে পারি স্যার? আমাদের এক সহকর্মী দরজায়। আসুন।— বলে ম্যানেজার আমার দিকে তাকান, হ্যাঁ, লিখুন।

দিনের পর দিন আমার অসুখটা বাড়তেই থাকে। বোধ-বুদ্ধি-মগজ সবকিছু মেনে নেয়, কিন্তু আমার অনুভূতি, আমার স্নায়ু কিছুতেই বিষয়টিকে এক মুহূর্তের জন্যও সহ্য করতে পারে না। বিকারগ্রস্তের মতো আমার রাত্তির কাটে। আর দিনের বেলাটা অফিসে নিজেকে সংহত রাখার জন্য মুখে রক্ত তুলে হলেও ভয়ঙ্কর অভিনয় করে যেতে হয়। এইভাবে দিন যায়, এইভাবে রাত যায়, এর মধ্যেই বাসা বদল ঘটে। সুলেখাদির পাড়া ছেড়ে আমাদের চলে যেতে হয় ফের মীরপুরে, যেখানে বাসে চেপে আমার অফিস করার সুবিধাজনক একটা পথ আছে।

ছোট ঘরটা গুছিয়ে নিয়েছে খালা। ঘর তো না, একটা দেশলাইয়ের বাক্স। ওরকম একটা বারান্দা বাড়ি ছেড়ে, যেখানে বসে নাকি আবার পূর্ণিমা দেখা যেত, এরকম শ্বাসরুদ্ধকর ঘরে এসে আমার যন্ত্রণার মাত্রাটা বহুগুণ বেড়ে যায়।

রাতে সবাই শুতে গেলে ছাদের দিকে চোখ মেলে আমার প্রায়ই এমন হয়, আমি কী এক তিক্ত ঘোরে নিঃশ্বাস নিতে ভুলে যাই। শেষে সে-ই ঘাটতি পূরণের জন্য যখন বারবার শ্বাস টানতে থাকি, কিছুতেই সুস্থ বাতাসে প্রাণ পূর্ণ হয় না। রঞ্জনকে মনে পড়ে, আবছায়া, যেন আগের জীবনের কেউ, ওই বাসায় থাকতেও ফোন করেছে এরপরে কয়েকবার, আমার মনে হয়েছে, এই পৃথিবীর হাজার মানুষের কণ্ঠের সাথে ওর কণ্ঠ মিশে গেছে। আমি নিজের মধ্যে কোনো তাপ উত্তাপ অনুভব করি নি। শেষ ফোনটায় ক্লান্তিতে ঢলে পড়ছিল আমার মাথা, আমি বলেছিলাম, এই অর্থহীন সম্পর্কের কোনো মানে হয় না। এই সম্পর্কটা আমাদের দিনের পর দিন একটা সংকীর্ণ জায়গায় নিয়ে দাঁড় করাচ্ছে। রঞ্জন, জীবন বাস্তবতার পেষণে অস্থির আমরা এই সম্পর্কটাকে এমন ভাবে নিয়েছি— একটু পার্কে বেড়াতে যাওয়ার মতো— যে সম্পর্কের মধ্যে সাহস মরে যায়, যে সম্পর্কে দিনের পর দিন অসহায়ত্ব মেনে নেয়া ছাড়া আর কোনো বাস্তবতা থাকে না, সেই সম্পর্কের ঘানি টেনে কী লাভ বলো? নিজের জীবনকে ছেনে ঘেঁটে আমার মধ্যে এমন সন্দেহও ঘনীভূত হতে শুরু করে, আমি শায়েদের সাথে বিবাহের আপোসে, রঞ্জনের সাথে প্রেমের আপোসে, চাকরির আপোসে জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে নিজের আপোসগুলোকে যুক্তি দিয়ে নিজের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছি, এইভাবে যা হতে পারত পাপের, গ্লানির; তা আমার কাছে হয়ে উঠেছে আমার প্রয়োজনীয়, সহজ। আমি এইসব চক্রে পড়ে নিজের জায়গাটা আরো গভীর অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে ফেলতে থাকি।

এর মধ্যে আমার নিষ্কৃতির জায়গা একটাই, আমার বাসায় এখন ফোন নেই। শেষ দিকে এমন হয়েছিল, সেটটার দিকে তাকালেই হু হু করে উঠত শরীর। আমি বাড়িঅলার ফোন লাইন কেটে তার আত্মীয়ের কাছে বুঝিয়ে দিয়ে এইসব হিবিজিবি ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়েছি।

অফিসের সহকর্মীদের সাথে মজার সব গল্প হয়। আশ্চর্য, আমি হাসিও! ছায়ামাথাটাকে সজোরে স্থিত করে আমার বসের কাজগুলো করে যাই। প্রতিদিন নয়, দু'একদিন পর পরই ডাক পড়ে এম. ডির রুমে, কি অনাড়ম্বর ভঙ্গি— মিস্ নীলুফার, আপনি একটু আসুন— তো! ওই এক ডাকের ভয়ে আমার প্রতিটি মুহূর্তের কাজের মধ্যে মুহুর্মুহ জট পাকিয়ে যায়। আমি অবাক চোখে মেয়েগুলোর দিকে তাকাই, যারা একটি ঘরে আমার উপস্থিতি সত্ত্বেও ওই লোকের নিচে সহজ শরীর পেতে দেয়, ঘর থেকে বেরোনো মাত্র তাদের দেখি নিখুঁত কর্মব্যস্ত চেহারা! অথচ, আমার ভাবনা এমন ছিল, ঘরে একটি বিড়াল থাকলেও, এমনকি দেয়ালে ফ্রেম করা কারো ছবি, যে সরাসরি তাকিয়ে আছে, এসবের উপস্থিতিতে আর যাই হোক দুটি শরীরের সহজ মিলন অস্বস্তিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

যত দিন যাচ্ছে, এদের সাহস বাড়ছে। শরীর মিলনের সময় এরা বাৎসায়ন, কামকলা নিয়ে নানা কথা বলে। আর আমি, ওদের তেতে উঠতে থাকা সময়টাতে, আমার হিম চামড়ায় চিমটি কেটে কেটে এগোই, "ওইতো মা রোদ্দুরে মেলে দিচ্ছে কাপড়—" কানে অস্ফুট হি হি কাম শব্দ ভেসে আসে— "ওই তো সায়রাবুর মুখ জন্ডিসে হলুদ হয়ে উঠেছে" আহ্ ছাড়ুন তো! "নিজেকে কষে বেঁধে দিলারার সামনে দাঁড়াই— সে বলে, তুই পাপিষ্ঠা, মারে পাপ কাজে সাহায্য করছস..." উম, এইবার পুরুষ কণ্ঠ, এই মেয়ে নখরামী ছাড়ো... "শায়লা বলে, তোমার স্বপ্ন মরে না, তুমি স্বার্থপর বুবু, আমি তুমারে ঘেন্না করি..." এরপর...

"উহ্ আল্লাহ্! তুমি পৃথিবীর কোন প্রান্তে আছ, আমাকে অন্ধ আর বধির করে দাও..." মেয়েটি আদুরে কণ্ঠে বলছে, নীলুফারের শরীর খুব সুন্দর, আপনার পছন্দ হয় না ? সমস্ত ঘরে ভূতের মতো হিসহিস কণ্ঠ ধ্বনিত হয়, এই মেয়ে, চুপ! "আফসানা কেঁদে ওঠে। মা, আমি তুমার কাছে যামু" "আর সার সার মেয়ে, যাদের শরীর থেকে গলে গলে পড়ছে পোড়া মাংস, হাউ মাউ করে আমার চারপাশে আবর্তিত হতে থাকে।"

বহুদিন পর আমার সেই দৃশ্য মনে পড়ে, অন্ধকার রাস্তায়, আমরা ঢুলু চোখের মেয়েরা হাঁটছি, শায়লাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে অন্ধকার, আমি সশব্দে চোখ মেলে কি হয় সেই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হিম কক্ষে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে থাকি— আমি মানুষ! আমি মানুষ! আমি আর পারছি না! এরপর অচেতন, ঢলে পড়ি।

হাঁটতে গেলে পায়ের নিচে মাটি পাই না, চোখ মেলতে গেলে ছায়া ছাড়া কিছু দেখি না, খেতে গেলে বমি... বমি... অফিস কামাই দিয়ে নিশ্চল বিছানায় পড়ে থাকি। চোখের সামনে দাউ দাউ অগ্নি, তার মধ্যে ভস্ম হয়ে যায় সব... আমি দেয়ালের সাথে আরো প্রবলভাবে সেঁটে যেতে থাকি, ক্রুশের শরীর বেয়ে তাজা রক্ত গড়াতে থাকে, ঈগলের সুবিশাল চঞ্চু আমার কলজে ছিঁড়ে খায়। ফের জন্ম নেয় নতুন কলজে।

নিজেকে থামাতে হেরম্বকে খুঁজি, সুর খুঁজি... না,এইবার সিদ্ধান্তে আসা যায়, ভেতরে মড়া পচতে শুরু করেছে ওপরে কবর হবে, আমার আর বাঁচতে ভয় কী ? আমি মাঝে মধ্যে অফিসে যাই, আমি নিজে না, আমার অবচেতন প্রাণ অফিসের সহকর্মীদের কাছে দীর্ঘশ্বাস বিলায়। আমি তলায় ডুবতে ডুবতে সহকর্মীদের বলি, সত্যিই আমি পারছি না আপনারা আমাকে বাঁচান।

একজন সহকর্মী, সাইফুল আনাম, আমাকে বলেন, আপনি কি নীলুফার চাকরিটা করতে চাইছেন না ?

তার টেবিলের সামনে ঝুঁকে পড়ি, জীবনের বিনিময়ে হলেও চাকরিটা আমার দরকার, কিন্তু এই কাজটা আমি পারব না, আপনি আমাকে একটা বুদ্ধি বলুন।

গলার স্বর নামিয়ে সাইফুল আনাম বলেন, চাকরিটা আপনার থাকবে না। আমি নিজে ভেবে পাচ্ছি না, সুস্থ মানুষ হয়ে কি করে আপনি এটা সহ্য করছেন ? আর সহ্যই যদি করছেন, তবে বিষয়টা জনে জনে বলে বেড়াচ্ছেন কেন ? আপনি জানেন, কথাটা স্যারের কানে গেলে বিষয়টার পরিণতি কী হতে পারে ? যদি না পারেন, ছেড়ে দেন, বোকার মতো চাকরিও ছাড়তে চাইছেন না, অথচ চাকরিটা চলে যাওয়ার সব পথঘাট তৈরি করছেন।

পেছনের ক্যালেন্ডার বাতাসে উড়তে থাকে। চামড়ার তলায় শীত ফিকে হয়ে আসে। চেয়ার ঠেলে উঠার সময়টাতেও মাথায় সাইফুল আনামের কথার বিলোড়ন চলে। আমার খুব ভয় লাগতে থাকে। আমি ফের সহকর্মীদের টেবিলে টেবিলে যাই, আমি যে এসব বলেছি, প্লিজ স্যারকে বলবেন না। আসলে এসবের কিছু সত্য নয়। আমার মাথায় মাঝে মাঝে কি যে হয়!

এরপর সত্যিই চারপাশ ছায়া কুয়াশায় ডুবে যায়। এর মধ্যেই একদিন এম. ডির রুমে ডাক আসে। টেবিলে বসে আমি আমার কাজগুলি গুছিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছিলাম। ফোনে

এম. ডির চাপা ক্রুদ্ধ কণ্ঠ— নীলুফার, আপনি এক্ষণি আমার রুমে একটু আসুন তো!— আমাকে মৃতপ্রায় করে তোলে। কর্মচঞ্চল অফিস। সবাই যার যার কাজে ব্যস্ত, এরমধ্যে আমি একা সেই রূপকথার গল্পের অর্ধ-মানুষপাথর হয়ে যাই। দাঁতে দাঁত চেপে পা বাড়াতে চাই, নিজেকে ঝাঁকুনি দিয়ে, নাহ্! কিছুতেই নিজের মধ্যে নিক্রিয় তরঙ্গের চলমানতা টের পাচ্ছি না। ফের ফোন আসে, এম.ডি সাহেব প্রায় চিৎকার করে ওঠেন— নীলুফার! আমি সেই ধমকের ধাক্কায় নিজেকে ছিঁড়ে প্রায় ছিটকে তাঁর রুমের মধ্যে গিয়ে পড়ি।

তিনি কোনো ভণিতার মধ্যে না গিয়ে বলেন, আপনি অফিসে কী সব কথা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছেন ?

এইবার আমার নিজেকে বাঁচানোর পালা। আমি প্রায় আর্তনাদ করে উঠি, বিশ্বাস করুন স্যার, আমি কাউকে কিছু বলি নি। ওরাই মাঝে মধ্যে জিজ্ঞেস করে।

প্রিন্টের শার্টের মধ্য থেকে হাঁসের মতন গলা বাড়ান জিন্নাত আলী— কী জিজ্ঞেস করে ?

আমি কাঁপতে থাকি, ঢোক গিলতে থাকি এবং বলতে থাকি— জিজ্ঞেস করে, আপনারা কী অত ঘন ঘন মিটিং করেন ? মিটিংয়ে কী হয় ?

কে জিজ্ঞেস করে ?

স্যার, অনেকেই, অনেকেই।

অনেকেই কে ? নাম বলুন।

চেয়ারের মধ্যে আমার মাথা ঢলে পড়ে, স্যার বিশ্বাস করুন, ওরা আমাকে হিংসা করে, আপনি আমাকে পছন্দ করেন, এটা ওদের সহ্য হচ্ছে না... ওহ্ সামনে এত ছায়া কেন ?

মিস নীলুফার! কী হলো আপনার ? আপনি অসুস্থ ? এই শরীর নিয়ে অফিসে এসেছেন কেন ?

বদ্ধ ঘরটার দেয়ালগুলো আমার অস্তিত্বের ওপর চেপে বসে। বিছানায় শুয়ে টের পাই, আমাকে কবরে শোয়ানো হয়েছে। পায়ের তলায় ঘাস, পা পড়তেই প্রজাপতি... ফরফর উড়তে থাকে... এরপর জীবনের বেশির ভাগ। কুশ্রী চিত্রাবলি... আমার স্বপ্ন এবং রূঢ়তা— দুই যমজ বোন আমাকে ফের গেঁথে দিতে থাকে দেয়ালের সাথে... ধেয়ে ধেয়ে আসে শীত রাতের কুকুরগুলি, মা'র মৃত্যুর পর যারা আমার চারপাশ ঘিরে বসেছিল। সার বেঁধে আসমান পথে সবুজ উটেরা যাচ্ছে... কই যাও গো তোমরা ?

তাহলে মারা যাচ্ছি... স্নায়ুর তলার শিরশিরে বোধ আমাকে এই সিদ্ধান্ত দিলে আমি নখ দিয়ে সামনের ছায়া কাটতে থাকি— আমার মাথার ওপর ঝুঁকে আসে আশ্চর্য সজ্জিত এক মুখ... কী লাল টিপ! কী ঘন কাজল! আমার হাত চেপে শায়লা ফিসফিস কণ্ঠে কাঁদে—বুবু— তোমার কী হইছে ?

ওর ওপর থেকে নিস্তরঙ্গ চোখ ফিরিয়ে আমি ফের নিজের চক্রে ডুবে যাই, যেন মানুষ নয়, দুটি কুকুরের যৌন মিলন দৃশ্য দেখছি, এইভাবে আমি আমার চাকরির বাস্তবতার দিকে চেয়ে থাকি।

এইসব ছায়াচ্ছন্নতার মধ্যে আমি একদিন অফিসে আমার পরিস্থিতি পাল্টে যেতে দেখি। কীভাবে জানি অফিসে খবর হয়ে যায় চাকরির নড়বড়ে অবস্থা টের পেয়ে আমি জিন্নাত আলীকে অশ্লীল প্রস্তাব দিয়েছি। অফিসের ফিসফিস, গুঞ্জরণ থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট শুনি— চাকরিটা নিয়ে মিস নীলুফার সাংঘাতিক আপসেট হয়ে পড়েছিলেন! তাই বলে...।

আয় সখী, জননীগো, জননীগো জননী, জল দিয়ে জন্মের কালি ধুই, সহোদরা জননীগো, কাজলের কালি দিয়ে কলঙ্ক কালি ধুই—। রাতে ফরফর উড়তে থাকা ক্যালেন্ডারে চোখ পড়ে। আমার স্থির দৃষ্টি বিদ্ধ হয়ে থাকে একটি সংখ্যায়, এবং লক্ষ করি, আজ সারাদিন, এখন অব্দি আমার জন্মদিন। এই দিনটাকে আমার মানুষের জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ মনে হতো। আমার অনেকদিনই মনে হয়েছে, আমার যদি প্রচুর অর্থ থাকত প্রিয়জনের জন্মদিন, এমনকি আমার নিজের জন্মদিন নিয়েও হাস্যকর রকমের বাড়াবাড়ি করতাম।

সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার বয়স কত হলো ? নাহ্! ঝিমঝিমে মাথায় কোনো সংখ্যাই আর খেলছে না। আফসানা আর খালার বেষ্টন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে খেয়াল হয়, কি এক ভাবনায় বুঁদ থেকে বাতি বন্ধ করি নি। মা'র বর্ণিত আমার জন্মের কথা মনে পড়ে, চারদিকে কনকনে শীত ছাপিয়ে শুরু হলো বৃষ্টি। ছোট একটা ঘরের মেঝেতে পড়ে ছটফট করছেন মা, ধাত্রী এসে মাথায় হতে বোলাচ্ছে ধৈর্য ধর বোন, ধৈর্য ধর। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় মা যখন টের পাচ্ছিলেন, চারপাশ আঁধার হয়ে আসছে, মা বললেন— জানস নীলুফার, দরজায় আমি স্পষ্ট আজরাইলরে দেখলাম, আমার পানি ভাঙতাছে, পানি ভাঙতাছে, অসীম সাগরের উপরে আমি ভাসতাছি... তখনই বাচ্চার চিক্কোর, আমি মরণ থাইক্যা ওইঠা ধাত্রীর হাত চাইপা ধরলাম, পোলা, না মাইয়া ?

ধাত্রীর মুখ ছাই হয়া গেল।

সবচাইতে তলায় ঠেকে গেলে পিঠ— নিজেকে নিয়ে অদ্ভুত এক হাস্যাত্মক বেদনাতুর স্বপ্নখেলা শুরু হয় আমার, এখনো তাই হয়। সবাই ঘুমোচ্ছে, বাতি নিভিয়ে আমি মেঝের মধ্যে জ্বালি মোমবাতি... ছত্রাক ছত্রাক ছায়া সব ভেতর থেকে মাঝে মাঝে কচলে বের করছে আলোপিণ্ড... হেপি বার্থডে টু ইউ... ফিসফিসে সুরে গাইতে থাকি, হেপি বার্থ ডে টু ইউ... হেপি বার্থডে টু নীলুফার... আমার বুকের ডালপালা বেয়ে ওপর দিকে উৎসারিত জল চোখে জমা হয়, আমার জিভ নোনতা হয়ে ওঠে, শিখা বরাবর আগুনের আঁচে তাতাচ্ছে আমার মুখ, সেই জল দপদপে আলোতে পড়তে থাকে... হেপি বার্থডে টু ইউ... আগুনটা নেভে না।

খুব ভোরে ঘুম ভাঙার সময় যখন আমি জানি না, আমি কে, কোথায় আছি, আমার ঘুম ভাঙার পরের পৃথিবীটা কেমন, তার আগেই, সম্পূর্ণ অচেনা আমি একটা জিনিসই শনাক্ত করতে পারি, এক অসীম প্রকাণ্ড জগদ্দল পাথর আমার বুকের মধ্যে চেপে আছে। ঘুম ভাঙতে ভাঙতে আমি সেই বেদনার চাপে সহজভাবে নিঃশ্বাস টানতে পারি না। এটা ইদানীং প্রায়ই হচ্ছে, আজ আরো বেশি হয়, সারারাত ছটফট করে সেই মুখগুলোর কথা ভেবেছি, আমার সহকর্মীরা, যারা আমার নামে টি টি ছড়াচ্ছে, আমাকে দেখে সন্তর্পণে টিপ্পনী কাটছে। যারা যত কায়দা করে মেরুদণ্ড বাঁকিয়ে চলে আর যত সূক্ষ্ম অভিনেতা হতে পারে, তারা তত বেশি

চাকরিতে সাইন করে, বড় হতে পারে। এরা সবাই জানে অফিসের পরিস্থিতি, সবাই জানে এটা আমাকে খতম করার এক মোটা দাগের চাল, তবুও এরা অফিসের হাওয়া বুঝে, নিজেদের চাকরি ঠেকাতে সেই হাওয়াতে নিজেদের ছেড়ে দিয়েছে, আশ্চর্য আমার বস্ পর্যন্ত, আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মুহূর্তে নিজের মুখের ছায়া পাল্টে ছটফট করে উঠলেন, এই বোকামিটা কেন করলেন নীলুফার ? সেই আপোসই যদি করতে চাইলেন, জনে জনে বলে বেড়ালেন কেন ? সবাইকে বলে নিজের ফাঁসে নিজে আটকা পড়ে নিজেকে বিকানোর সিদ্ধান্ত কি করে আপনি নিলেন ? আমি কিন্তু আপনাকে অন্যরকম...।

আয় সখী নীলুফার, কুড়োলের কোপ থেকে, আয় সখী আয় বোন, ধনুকের ফলা থেকে, আয় সখী আমি তুই... জীবনের সুর থেকে প্রাণরস তুলে নিই।

বিষাক্ত, ক্লেদাক্ত ঘৃণার বিকট পাথরটাকে নাড়াতে পারছি না বুক থেকে। বিছানায় শুয়ে আমি যেন দরজায় মা'র বর্ণিত সেই বিকট জন্তুটাকে দেখি। নির্জন শহরের রাস্তা ধরে আমার কম্পিত ছায়া হেঁটে যায়— সেই সুউচ্চ প্রাচীরের ওপর... চেপে থাকা নিঃশ্বাস ছেড়ে সে বহুদিন পর আ... আ... আ... শব্দে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে।

শীত চলে গেছে। আমি আমফুলের ঘ্রাণের গভীর তলায় সুন্দরী কোকিল খুঁজি। এখন কত রাত ? আমি নিভন্ত বাতির তলায় বসে হাতড়ে হাতড়ে মৃদু কোমল বাতাসে সময়কে ছুঁতে চাই।

আজ চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছি। সন্ধ্যায় অফিস থেকে বেরিয়ে অনেক রাত অব্দি চিনে রেস্তোরাঁয় বসে থেকে ব্যাগের প্রায় শেষ টাকা দিয়ে এক বাটি স্যুপ খেয়েছি। রাত্তিরে বাসস্ট্যান্ডে এসে দাঁড়িয়ে দেখি, সামনে কত যে রঙ, কত যে বিচিত্র ছায়ার খেলা।

দোতলা বাসের হু হু জানালায় বসে অনুভব করি, আজকের রাত আমার বোধ-বুদ্ধি বিবেচনাকে ভীত করে তুলছে, কিন্তু আমার অনুভূতি আর রক্তাক্ত স্নায়ুগুলো যেন বহুকাল পর টেনে নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচছে।

প্রকাণ্ড পৃথিবীকে আমার আর ভয় করে না।

—

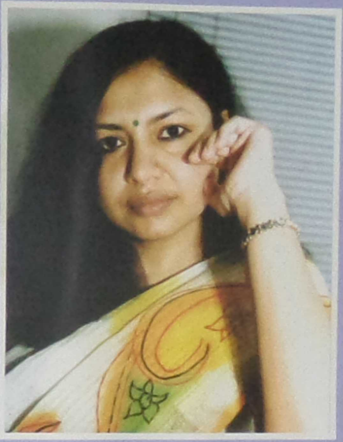

নাসরীন জাহানের জন্ম ১৯৬৪ সালের ৫ মার্চ, ময়মনসিংহে। পৃথিবীতে শিল্প আছে বলেই, নিজে শিল্পের ঘোরে হাঁটতে পারছেন বলেই, বোধ করেন, বাতাস বইছে, তিনি নিঃশ্বাস টেনে বাঁচছেন।

লেখা ছাড়া আর কিছুই পারেন না বলে প্রতিনিয়ত তার বহুবর্ণিত কলম চলতে থাকে এবং যখন তিনি তার মধ্যে আচ্ছন্ন, তখন অনুভব করেন... কালি নয়, বুক থেকে কাঁটাবিদ্ধ নাইটিংগেল পাখির মতো ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে। এক অদ্ভুত আচ্ছন্নতা তাঁকে অসুস্থ করে রাখে।

নাসরীন জাহান বিশ্বাস করেন, কোনো একটি গ্রন্থ আরেকটি গ্রন্থকে অতিক্রম করার জন্য রচিত হয় না। শিল্প কোনো রেসের মাধ্যম নয়। নিজস্ব ভাষারীতি আর মূল সুর ঠিক রেখে যথাসম্ভব একটি বিষয় থেকে আরেকটি বিষয়কে আলাদা করাই শিল্পের কাজ। এবং একটি গ্রন্থ বেরোনোর পর ঘোর অতৃপ্তি থেকে তিনি আরেকটি গ্রন্থ রচনায় ঢুকে পড়েন।

এর মধ্যে তিনি শিল্পশৈলীর অনবদ্যতার জন্য পেয়েছেন ফিলিপস সাহিত্য পুরস্কার, আলাওল সাহিত্য পুরস্কার, বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, বৃহত্তর খুলনা রাইটার্স ক্লাব পদক। পেশাগত জীবনে তিনি পাক্ষিক অন্যদিন পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক।

আলোকচিত্র বিশ্বজিৎ সরকার

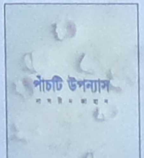

Panchti Upanyash

a collection of novels by Nasreen Jahan
price Bdt 500.00 only
US $ 20.00
anyaprokash<< dhaka<< bangladesh

an *ANYAPROKASH* publication

ISBN 984 868 245 7